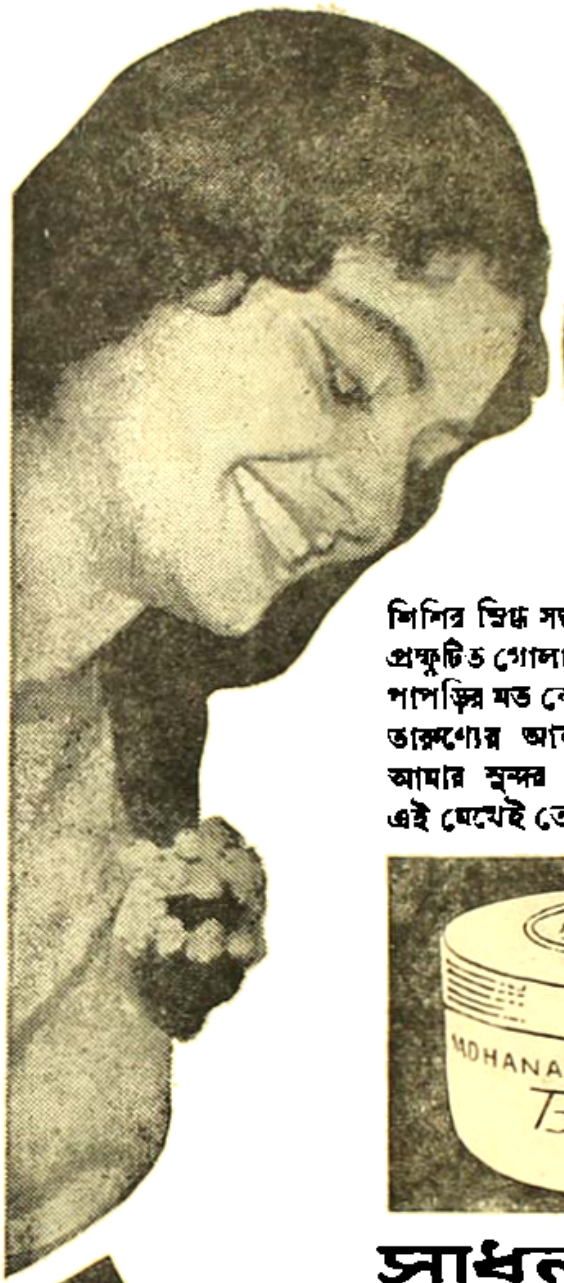

এর কোমল স্পর্শে সৌন্দর্য বিকশিত হয়

শিশির স্নিগ্ধ সন্ত
প্রস্ফুটিত গোলাপের
পাপড়ির মত কোমল ও
তারুণ্যের আভায় উজ্জ্বল
আমার সুন্দর দেহশ্রী
এই মেয়েই তো !

সাধনা বিউটি স্নো

একটি অতি আধুনিক অনুরাগ

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
কলিকাতা-৫

৫৪৮-৮/০

ক

আমাদের শক্তি শুধু ইস্পাতেই নয়,
মানুষেও। বাঁচার মত বাঁচতে হ'লে শুধু খাওয়া
পরা নয়, তার সঙ্গে চাই সঙ্গীত, নৃত্য ও
অন্যান্য আনন্দের খোরাক। জামসেদপুরের
নাগরিক জীবনে তার সবরকম সুযোগ
সুবিধা আছে।

টাটা স্টীল

গল্প-ভারতী

GALPA-BHARATI
শ্রাবণ ১৩৭৭, JULY, 1970
ষড়বিংশতি-বর্ষ

সম্পাদক : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক : কল্যাণ রায়

মূল্য : এক টাকা
বার্ষিক : পনের টাকা

শ্রীদোল বিহারী দত্ত কর্তৃক ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
২৭১বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও কল্পনা প্রেস প্রাঃ লিঃ
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

অস্বাস্থ্যকর মাড়ীই
দাঁতের ক্ষয় ও মুখের দুর্গন্ধের কারণ

মাড়ীর সুস্থতার জন্য **নিমের** উপকারিতা হাজার হাজার বছরের পরীক্ষিত

নিম টুথ পেস্ট-এ **নিমের** সমস্ত গুণই রয়েছে

ক্যালকাটা কেমিক্যাল-এর তৈরী

CAF-18-6981

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas

Ex. Judge, Calcutta High Court.
Ex-Law Member, Govt. of India

আমি লক্ষ্মী-ঘিই ব্যবহার করি। অন্য ঘিয়ের তুলনায় এ'ঘি অনেক ভাল ও বিশুদ্ধ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সত্যেন মজুমদার
সম্পাদক—আনন্দবাজার পত্রিকা

লক্ষ্মী ঘি ব্যবহার করে আমার বেশ ভাল লেগেছে। এটা সত্যিই ঘি।

—শিশিরকুমার ভাদুড়ি

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল জিনিষ।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই ভেজালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—দৈনিক বসুমতী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজারে প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক ওগে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

শ্রীসীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখরোচক হয়।

শ্রীশান্তা দেবী

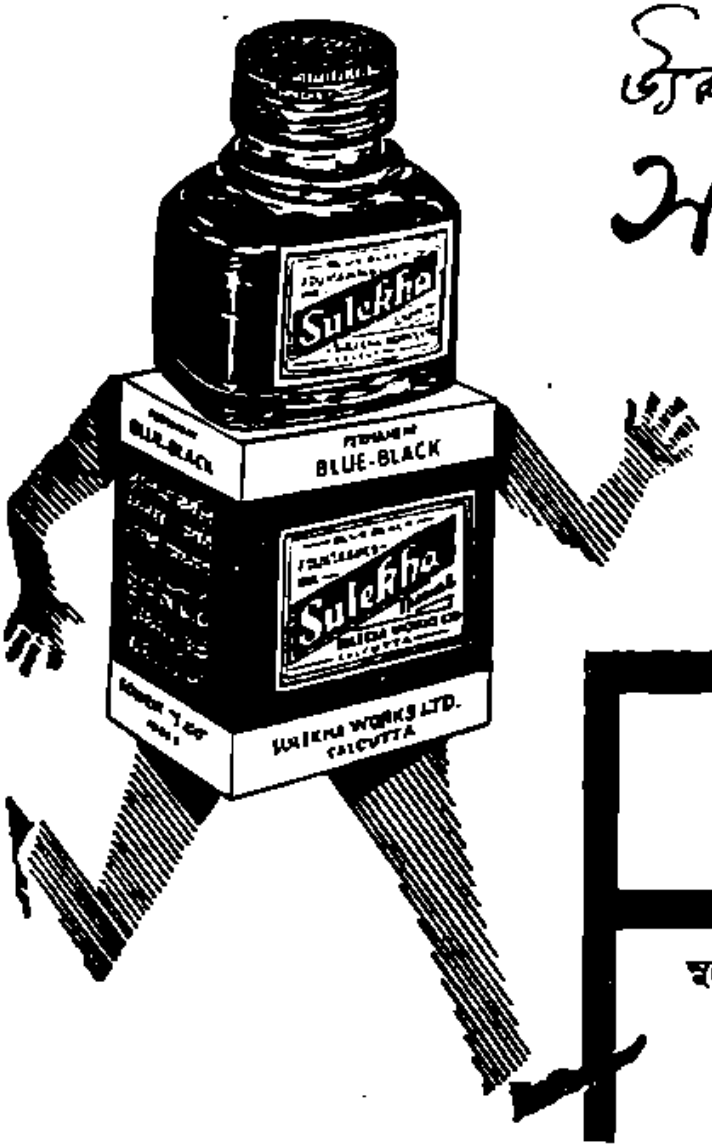

ঐতিহ্য ও ঐকান্তিকতা

সবার আগে সুলেখা

ভারতে সর্বাধিক বিক্রয়ে তো বটেই, ক্রমবর্ধমান রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে সুলেখা আজ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব পালন ক'রে চলেছে।

দেশ-বিদেশে সমাদৃত

সুলেখা-উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে আছে : 'অ্যাডসল' পেস্ট এবং গাম, 'সিকিউরিটি' সিলিং ওয়াক্স, 'পেনসল', স্ট্যাম্প প্যাড, বিভিন্ন লেখার কালি এবং স্টেনসিল, স্ট্যাম্পিং, মার্কিং ও ড্রইং-এর কালি।

সুলেখা

স্পেশাল

ফাউন্টেন পেনের

কালি

ব্লু ব্ল্যাক, রয়্যাল ব্লু, ব্ল্যাক, এবং ব্রাউন রঙে এবং ৩০, ৬০, ১২০, ৩৬০ ও ৭১২ এম-এল-সাইজে পাওয়া যায়।

প্রস্তুতকারক : সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ

সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২

ভারত।

সাজপোষাক যাই থেক
মাথার তেল চাই
কেয়ো- কার্পিন

কেয়ো- কার্পিন
কেশ তৈল

ইউকোব্যাঙ্ক
উন্নতির
পথ সুগম করে

উন্নতির পথ এগিয়ে যেতে চান তো ইউকোব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তার সুযোগ নিন। কৃষিকার্য, ক্ষুদ্রশিল্প, স্বাধীন হস্তশিল্পী ও কারিগরী, পরিবহন পরিচালক ও ছোটখাটো ব্যবসায়ীদের জন্য ইউকোব্যাঙ্কের এই পরিকল্পনা।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য আপনার কাছাকাছি ইউকোব্যাঙ্কের শাখায় খোঁজ করুন।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

হেড অফিস : কলিকাতা

বিজ্ঞাপনদাতা : আর. বি. শাহ

বাটার সর্বাধুনিক ওয়েদারপ্রুফ জুতো সত্তরের দশকের জন্য

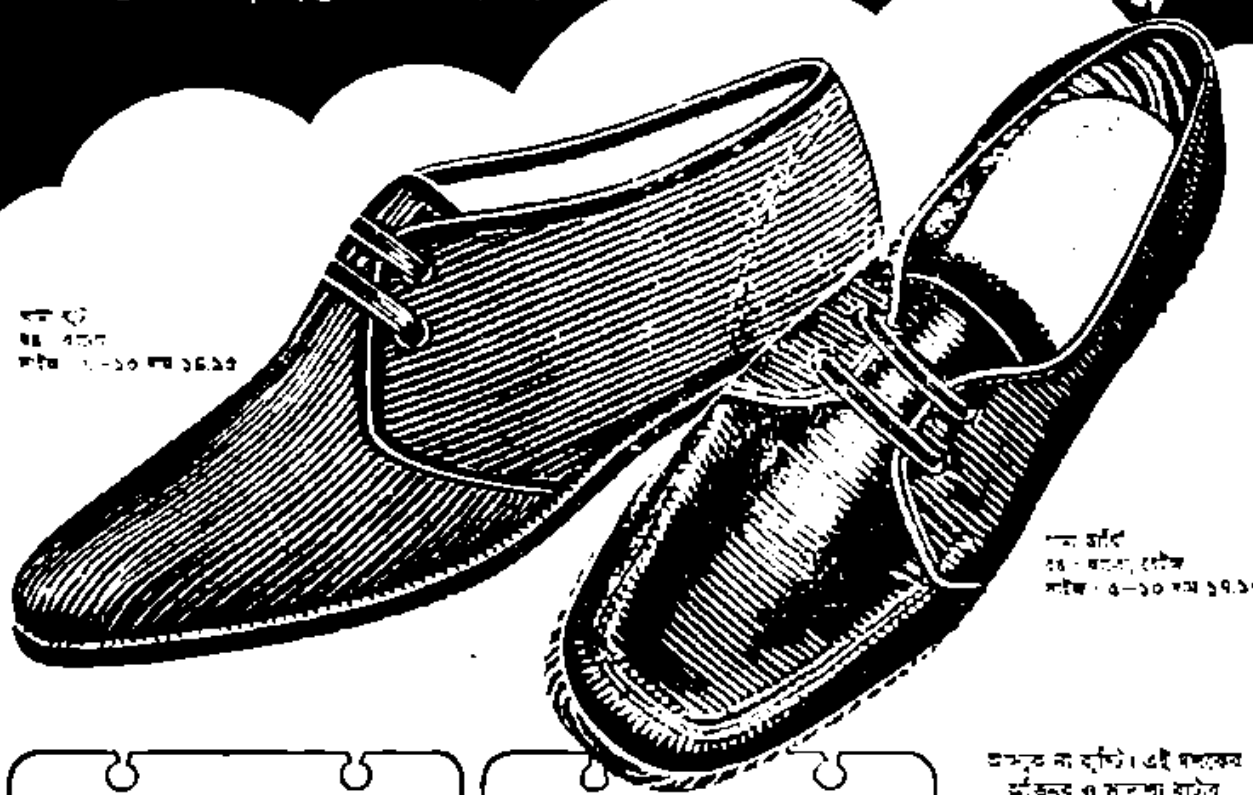

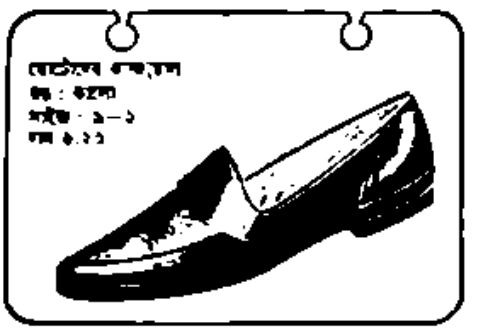

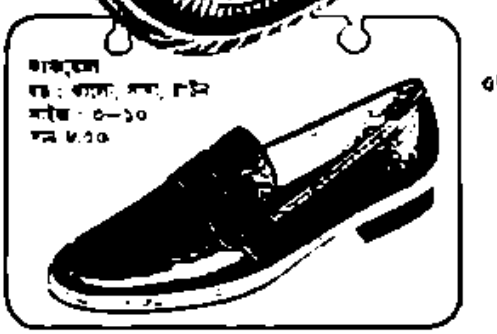

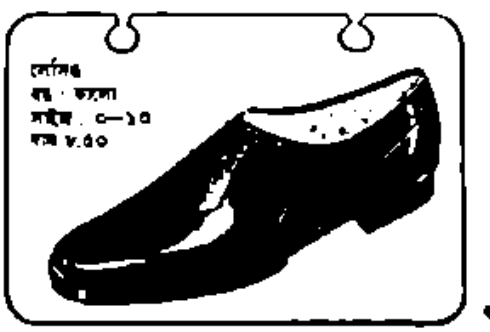

প্রস্তুত না বৃষ্টি। এই বছরের অভিনব ও সুলভ বাটার ওয়েদারপ্রুফ জুতোর বৃষ্টির মধ্যেও আপনি লোভন বৃষ্টির মধ্যে অনায়াসে ছেটে বেড়াতে পারবেন। দেখে নেবার মতো রঙ অভিনব নকশা ও ঢঙ; আবার টেকসই রবারে তৈরি বলে সহজে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। ভিতরে উৎকৃষ্ট কাপড়ের আস্তর এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বৃষ্টির মধ্যে হাঁটবার সময়েও পায়ের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য বজায় থাকবে সারাক্ষণ। আজই আসুন বাটার যে-কোনো শোরুমে, বেছে নিন আপনার মনের মতো অভিনব জুতো—বহুল বছরের মধ্যেই যা সর্বাধুনিক—মূল্যেও সুলভ ও গুণেমানেও।

Bata

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়—

কিছু রঙ্ কিছু বেরঙ্ (উপন্যাস) —বিমল মিত্র

কার্টুন :

বন্যা কন্যা (উপন্যাস) —অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ৪

ফিরে ফিরে চাই —প্রভাত মুখোপাধ্যায় ১৮

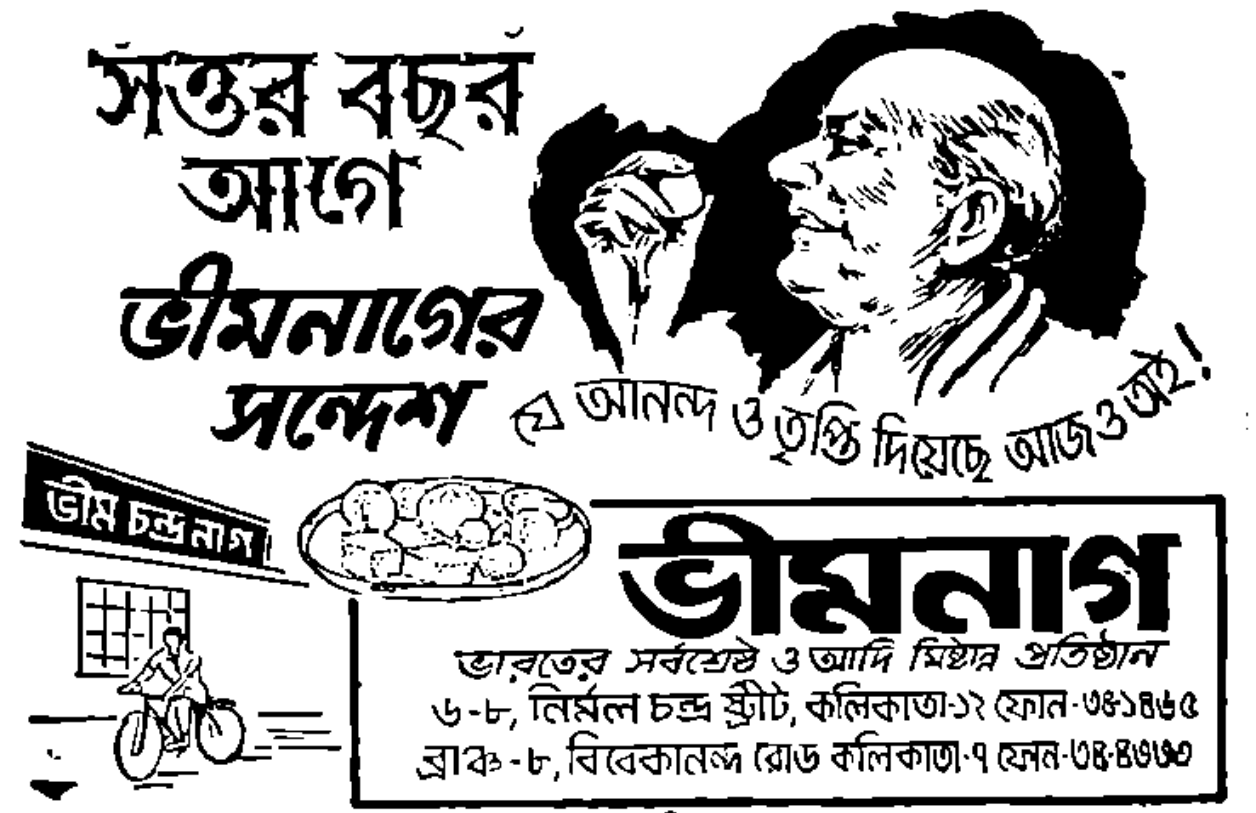

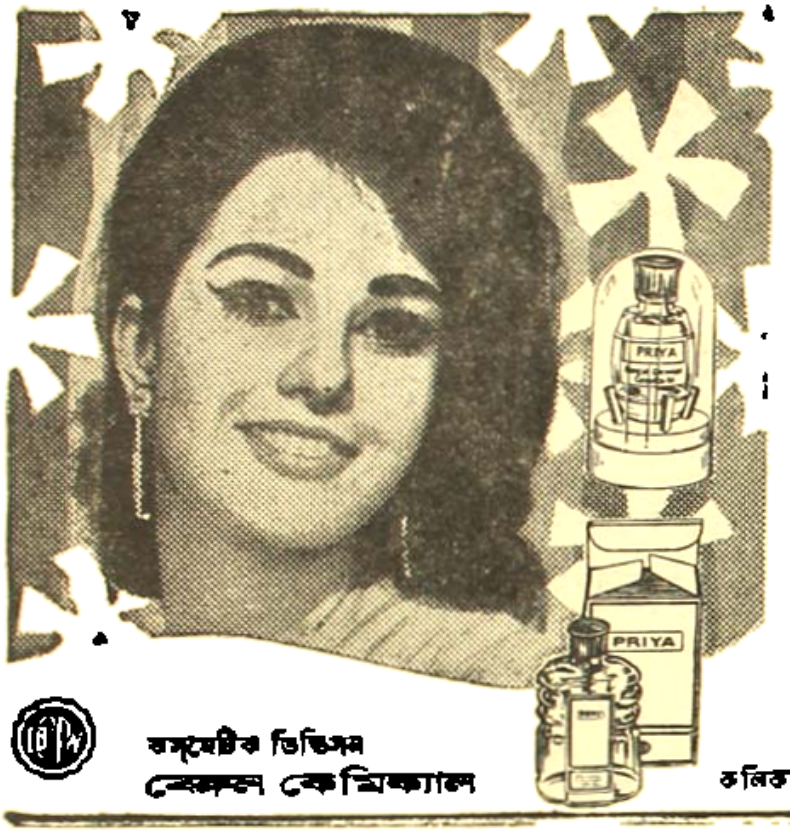

তন্বী, তব
তরুণ তনু ঘিরে
বসন্তের সুরভি যত
উচ্ছ্বসিয়া ফিরে !

প্রিয়া সুরভি মেখে যেখানেই যাবেন সেখানেই আপনার অধিকার। আপনার সান্নিধ্য মধুর হবে সবার কাছে।

প্রিয়া পারফিউম

বসুমেটিক ডিভিসন
মেসার্স কেমিক্যাল

কলিকাতা বোম্বাই কানপুর দিল্লী মাদ্রাজ

গল্প-ভারতী

- আষাঢ় মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ।
- যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়।
- বার্ষিক চাঁদার হার সডাক ১৫৲ টাকা।
- বার্ষিক গ্রাহকগণ কোন অতিরিক্ত মূল্য না দিয়াও পূজা ও অন্যান্য বিশেষ সংখ্যাগুলি পাইয়া থাকেন।

আজই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন

প্রতি মাসে গ্রাহকদিগের নিকট সার্টিফিকেট অব পোষ্টিংয়ে পত্রিকা পাঠান হয়। যথাসময়ে পত্রিকা যদি কেহ না পান, অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে, ব্যবস্থা করা হয়।

পত্রিকা বিক্রয়ের জন্য ভারতের সর্বত্র সহরে ও গ্রামে সম্ভ্রান্ত এজেন্ট আবশ্যক।

লেখকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক লেখার কপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন। অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

গল্প-ভারতী

২৭৯ বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—৬

এই সংখ্যায়

আবার সেই জেল		—দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়	২৫
জীবন নাট্যের খণ্ডচিত্র :			
শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ		—অনাথ উপাধ্যায়	৩৩
যে কাহিনী চিরকালের :			
আনন্দমঠ-বঙ্কিমচন্দ্র		—সুজন রায়	৩৭
লেটার বক্স	(গল্প)	—মানবেন্দ্র পাল	৪৭
লুণ্ঠন পর্ব	"	—শক্তিপদ রাজগুরু	৬০
ইউক্যালিপ্‌ট্যাস্‌	"	—সুমথনাথ ঘোষ	৬৭
এক পাঞ্জাবী, তার আট পকেট	"	—আশীষ গুপ্ত	৭৪
নাটমঞ্চ		—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৮৫
খেলাধূলা		—জ্যোতির্ময়	৯৫
জীবন যেমন :			
ফকির সাহেবের কাণ্ড		—ভবানী মুখোপাধ্যায়	৯৯

বাংলার তাঁতবস্ত্র উৎসবে ও নিত্য প্রয়োজনে ব্যবহার করুন

সমবায় সমিতিতে উৎপাদিত তাঁতবস্ত্রের প্রাপ্তিস্থান :

ওয়েস্ট বেঙ্গল ষ্টেট হ্যাণ্ডলুম উইভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
৬৭, বক্সীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
এবং
শাখা কেন্দ্রসমূহ :
গভর্ণমেণ্ট সেলস্‌ এমপোরিয়াম
৭/১, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ● ১২৮/১, বিধান সরণি, কলিকাতা ● ১৫৯/১/এ, রাসবিহারী এভেন্যু, কলিকাতা
১৮এ, গ্র্যাণ্ড ট্রাংক রোড (সাউথ) হাওড়া।

তাঁত শিল্প—বাঙালীর রুচি ও কৃষ্টির ধারক ও বাহক।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রচারিত

HOUSE OF NRM

NATIONAL RUBBER MANUFACTURERS LTD.

THE LARGEST MANUFACTURERS OF INDUSTRIAL RUBBER PRODUCTS

Inchek Tyres Limited

MANUFACTURERS OF TYRES FOR INDIAN ROADS AND CLIMATIC CONDITIONS.

এই সংখ্যায়

পর্বতারোহণে বাঙালীর অবদান	—শম্ভু মহারাজ	১০৪
বাংলার তথা ভারতের নব জাগরণের এই পথ [অনুশীলন সমিতি]		১০৮
গল্প ভারতীর পাতা থেকে		
ফতুল্লা—মূল : বলেশ্লাভ্ প্রুস অনুবাদ	—হিরণ্ময় ঘোষাল	১১৬
অবিস্মরণীয় মুহূর্ত	—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	১২৫
খবরের গল্প		১২৯

বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী
সন্দেশ বিক্রেতা
সিমলার বিখ্যাত
বিনোদ বিহারী নাগ
গণেশ চন্দ্র দত্ত
হেড অফিস : ৫৬/৫, রামদুলাল সরকার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন : ৫৫-১৪৪৩

পোড়া ···· কাটা ···· পোকার কামড়

এই সব আকস্মিক **দুর্ঘটনায়**

শিশুদের কোমল ত্বকের
পক্ষেও নিরাপদ
দাগ লাগে না

হাতের কাছে
রাখুন

এ্যাক্রিমেণ্ট

নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য
চর্বিবর্জিত এ্যান্টিসেপটিক মলম
সংক্রমণ প্রতিরোধক
সত্বর আরামদায়ক

বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী

OBL

এই সংখ্যায়

●

এই প্রথম

দুই প্রেমিকের এক প্রেয়সী	—অশোক বর্মা	১৩৩
অপরাহ্নবতী (উপন্যাস)	—সুবোধ সিংহ	১৩৫

॥ ক্রোড়পত্র ॥

● মেয়ে মজলিশ ●

আজকের সমস্যা	—বেলা দে	১
গৃহ-আদর্শ	—সংযুক্তা রায়	৩
পোষাকে অতি আধুনিকতা	—কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়	৫
রান্নাঘরে	—শকুন্তলা	৮

লক্ষাধিক প্রচারিত
নির্ভীক, নিরপেক্ষ,
স্বাধীন, সংবাদপত্র

যুগান্তর

সুষ্ঠু ও সবল জনমতের
স্বচ্ছ দর্পণ।

ষড়বিংশতি বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের যোগাযোগ নিবিড়, তাঁরাই জানেন মাসিক সাহিত্য-পত্রিকা পরিচালনার বিড়ম্বনা। নানাবিধ ফুলে শাখি ভরিয়ে—গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ এবং বাংলা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের প্রতিটি বিভাগের সরস আলোচনা দিয়ে প্রতি মাসে নিয়মিত প্রকাশ করে সাহিত্য অনুরাগী জনগণের হাতে পৌঁছে দেবার গুরু দায়িত্বভার যাঁরা গ্রহণ করেন—তাঁদের কৃতিত্বের ওপর নির্ভর করে সেই সব পত্রিকার স্থায়িত্ব এবং পরমায়ু। অর্থবল যাঁদের প্রচুর এবং লোকসান বহন করবার সামর্থ্য যাঁদের অপরিমিত, তাঁরা হয়ত একখানি পত্রিকাকে অনেকদিন টেনে নিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু পত্রিকার সর্বপ্রধান কর্তব্য—জনমনোরঞ্জনে যদি সক্ষম না হয় তাহলে তার বেঁচে থাকা না থাকা সমান হয়ে উঠে, একদিন না একদিন তাকে অকাল মৃত্যু বরণ করতে হয়।

সাহিত্যে অনুরাগী জনগণের মনোরঞ্জন করতে পেরেছে বলেই গল্পভারতী বিগত পঁচিশটি বছর ধরে সগৌরবে এগিয়ে চলেছে। এই আষাঢ়ে সে ছাব্বিশ বৎসরে পদার্পণ করলো।

এ তার অহংকৃত বাণী নয়, দর্প নয়, এ তার গৌরব।

গল্পভারতীর পঁচিশটি বৎসরের জীবনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সে বাংলা সাহিত্যে যে কীর্তি স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে, যে সুনাম ও জনপ্রিয়তার জন্য আজ সে সম্মানের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত তার পেছনে রয়েছে তার একনিষ্ঠ সাধনা ও লক্ষ্য পথে পৌঁছোবার অবিচলিত ও অদম্য উৎসাহ ও শক্তি।

গল্পভারতী প্রতিমাসের প্রথম তারিখে তার পাঠক পাঠিকার দ্বারপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছোতে পারে না এই তার অপরাধ। তার এই অনিয়মিত প্রকাশ-ব্যবস্থার জন্য বহুবার সে তিরস্কৃত হয়েছে সত্য, কিন্তু বহিষ্কৃত হয় নি। কোনও গ্রাহক-গ্রাহিকাই তাকে পরিত্যাগ করেননি। গ্রাহক-গ্রাহিকার সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়েছে বই কমেনি কোনদিন। এমন কি বিশেষ সংখ্যাগুলির চাহিদা এক-একসময় এত বেশি বেড়ে ওঠে যে তা পূরণ করা আমাদের সাধ্যের সীমা অতিক্রম করে যায়। তখন সবিনয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করা ছাড়া আমাদের আর গত্যন্তর থাকে না।

এর কারণ কি?

কারণ আর কিছুই নয়, সত্যানুসন্ধানের যে আদর্শ নিয়ে গল্পভারতী তার জয়যাত্রা সুরু করে ছিল, শত প্রলোভন সত্ত্বেও সে আদর্শ থেকে সে ভ্রষ্ট হয়নি কোনো দিন।

আজকাল আমাদের বাংলা সাহিত্যে বিশেষ একটা উত্তেজনা প্রবল হয়ে উঠেছে। সেটা যৌনমিলনের দৈহিকতা নিয়ে। শরীর বিজ্ঞানের কাঠামোতেই তার প্রধান স্থান। মানুষ সেখানে পশু। অপটু সাহিত্যিক তার অক্ষম রচনা দিয়ে অতি সহজেই মানুষকে উত্তেজিত করে তুলতে পারে। এবং সেই উত্তেজনাকেই একমাত্র মূলধন করে অনেকে সাহিত্যের বাজার মাৎ করছে।

এই যৌন সাহিত্য আর হিন্দী সিনেমার যৌনমিলনের নোংরা ছবি দিয়ে গল্পভারতী নিজেকে কোন দিন কলঙ্কিত করে নি। কখনও করবে না।

অথচ বাংলা সাহিত্যে এইরকম দুঃসাহসের হাওয়া বইতে সুরু করেছে অনেক দিন থেকে। এই নিয়ে বহু পটু এবং অপটু লেখকের লেখনী মুখর হয়ে সাহিত্যের চরিত্রকে কলুষিত করে তুলছে। গল্পভারতী চিরদিনই সেই সব দুষ্কৃতের সাহিত্য থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

গল্পভারতী জানে—সাহিত্য সব সময়েই এবং সর্বাংশে কল্যাণধর্মী এবং সেই পথই সে প্রথম দিন থেকে বেছে নিয়েছে। সেই তার ধর্ম, সেই তার আদর্শ।

এই জগতের মধ্যে প্রতিনিয়ত আমরা দুটি প্রকাশের ধারাকে প্রত্যক্ষ করছি। একটি ধারা তার কর্মের প্রকাশ। আর একটি ধারা ভাবের। এই ভাবের প্রকাশ দেখি সাহিত্যে। হৃদয়ের রঙে ও রসে সঞ্জীবিত এই ভাবের প্রকাশ একটি হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়ে আর-একটি হৃদয়কে স্পর্শ করে। এখানে কারবার শুধু আনন্দের। এবং সেই কল্যাণধর্মী আনন্দের অনুভূতি এমন একটি চিরন্তন সত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয় যাকে আমরা না পাই মনে, না পাই বাচনে—পাই একমাত্র আনন্দের বোধে। এ বোধের স্থান—আত্মার সুধা। মানুষ এই বোধের দ্বারা নিজেকে চিনতে পারে। যে-প্রেমে, যে ধ্যানে যে দর্শনে এই বোধের সুধা মেটে তাই স্থান পায় সাহিত্যের চারুকলায়।

প্রার্থনা করি—গল্পভারতী যেন সেদিক দিয়ে অবহিত থাকে। তা হ'লেই তার বেঁচে থাকা সার্থক হবে।

নইলে সব বৃথা।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

• • • •

প্রকাশের বিচিত্র মূর্তির মধ্যে মানুষের আত্মা আপনার কোন্ নিত্যরূপ দেখাইতে চায় তাহাই সাহিত্যের মধ্যে যথার্থ দেখিবার জিনিষ। সে আপনাকে রোগী না ভোগী না যোগী কোন্ পরিচয়ে পরিচিত করিতে আনন্দবোধ করিতেছে, জগতের মধ্যে মানুষের আত্মীয়তা কতদূর পর্য্যন্ত সত্য হইয়া উঠিল, অর্থাৎ সত্য কতদূর পর্য্যন্ত তাহার আপনার হইয়া উঠিল, তাহাই জানিবার জন্য সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করিতে হইবে।

—রবীন্দ্রনাথ

কিছু রঙ কিছু বেরঙ

ধারাবাহিক উপন্যাস

বিমল মিত্র

কদমতলী থেকে তিন মাইল দূরে কোয়লপুর। সেখানে একটা পাঠশালা আছে। শশীপদ এই তিন মাইল তিন মাইল রাস্তা হেঁটে পাঠশালায় যায় আর আসে। আর বর্ষার দিনে এক-পা কাদা নিয়ে বাড়ি ঢোকে।

বাড়িতে ঢুকে চেঁচায়। বলে—কই, কোথায় গেলে গো, এক ঘটি জল দাও, পা ধোব—

সেই সন্ধ্যেবেলা মানুষটা বেরিয়েছে পাঠশালা করতে, আর ফিরেছে রাত বিরেতে। বউএরও বাতের ব্যামো। সারাদিন পা ম্যাজ-ম্যাজ করে, কোমর টন্‌টনিয়ে ওঠে। একটা হাতে কাঠ-কুটো জোগাড় করা থেকে সুরু করে রান্না-বান্না করে খাওয়ানো, সবই একলা করতে হয়।

—জানো, আজ এক কাণ্ড হয়েছে—

পা ধুতে ধুতে শশীপদ কথাগুলো বউকে শোনাতে যায়। কিন্তু যাকে শোনাবার জন্যে কথাগুলো বলে, সে তখন রান্নাঘরে। রান্নাঘরটা বেশি দূরে নয়। শোবার ঘরের দাওয়ায় বসে কথা বললে রান্নাঘর থেকে শোনা যাওয়ার কথা। তবু শশীপদ পা ধুয়ে রান্নাঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। বউ একমনে তখন থালায় ভাত বাড়ছে।

শশীপদ বললে—জানো, আজকে এক কাণ্ড হয়েছে দক্ষিণপাড়ায়—

—কী কাণ্ড?

কথাটা বউ বললে বটে, কিন্তু যেন তার শোনবার জন্যে তেমন গরজ নেই।

—আরে, বর্ডার ফোর্সের একটা জিপ্ গাড়ি এসে কালি ঘোষের বাড়িতে ধাক্কা দিয়েছে। জানো। আমার তো দেখে বুকটা ধড়াস-ধড়াস করছে!

বউ তবু কোনও আগ্রহ দেখালে না। ভাতের থালা নিয়ে শোবার ঘরের দাওয়ায় রেখে দিয়ে এল।

শশীপদ আর কিছু কথা বললে না। আস্তে আস্তে দাওয়ায় গিয়ে খেতে বসলো। তারপর গ্রাসের পর গ্রাস মুখে দিতে লাগলো। কয়েকবার ভাত মুখে পুরে একটু যেন ঝিমিয়ে পড়লো।

বউ তখন একটা বাসিতে আরো ভাত নিয়ে সামনে এসেছে।

শশীপদ মুখ তুলে চেয়ে বললে—আমার ওপর রাগ করেছ, না? রাগ করে আমার সঙ্গে কথা বলছো না তুমি—আমি বুঝতে পেরেছি—

তারপর একটু থেমে বললে,—না, আর ভাত দিতে হবে না। অত ভাত খেয়ে কি মরবো বাকি বলতে চাও?

বউ হঠাৎ একেবারে হাউ হাউ করে জ্বলে উঠলো।

বললে—তুমি মরবে কেন? যে মরবে সে তোমার সামনে জল-জ্যান্ত দাঁড়িয়ে আছে—

শশীপদ সঙ্গে সঙ্গে এক কাজ করে বসলো। তাড়াতাড়ি ভাতের থালা ছেড়ে উঠে উঠানের দিকে চলতে লাগলো। বলতে লাগলো—তোমার যদি অত মরবার সখ তো তুমিই ভাত দিলে মরো না, আমার পাতে অত ভাত দিচ্ছ কেন?

বলতে বলতে কুয়োতলার ঘটিটা হাতে ধরতে গিয়ে হাত থেকে পড়ে গেল। আর পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ঝন্-ঝন্ করে শব্দ করে এক বিপর্যয় কাণ্ড বাধিয়ে দিলে।

বউ সেই দাওয়ার ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কাঠের পুতুলের মত মানুষটার কাণ্ড দেখছিল। শেষকালে আর পারলে না।

বললে—ভাঙো ভাঙো, ওই একটা ঘটিই তো আস্ত আছে, ওটাও ভাঙো—ওটাই বা কেন আর আস্ত থাকে!

কথাটা শুনে শশীপদর মাথায় রক্ত চড়ে গেল। সে চিৎকার করে বলে উঠলো—বেশ করবো ভাঙবো, হাজার বার ভাঙবো, আমি তোমার বাপের জিনিস ভাঙছি যে আমাকে বলতে এসেছ? এ আমার জিনিস আমি ভাঙছি, বেশ করছি—কার বাবার বলবার কী সাধ্যি আছে—এই তো আবার ভাঙছি আমি—

বলে ঘটিটা কুড়িয়ে নিয়ে আবার পাথরটার ওপর দড়াম-দড়াম করে আছড়ে ফেলতে লাগলো শশীপদ। যতবার আছড়ায় ততবার ঝন্‌ঝন্ করে একটা শব্দ হয়। আর নিস্তব্ধ কদমতলীর রাত্রের আবহাওয়াটা খান্ খান্ করে ভেঙে টুক্‌রো হয়ে গুঁড়িয়ে যায়।

হঠাৎ বাইরে থেকে আওয়াজ এলো—ও শশী, শশীপদ—

আওয়াজটা কানে যেতেই শশীপদর বউ মাথায় ঘোমটা দিয়ে ঘরের ভেতরে সরে গেল। শশীপদ যেন তখন জ্ঞান ফিরে পেয়েছে। কাপড়ের খুঁটে ভিজে হাতটা মুছে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

বললে—খুড়োমশাই? আসুন—

নিবারণ চক্রবর্তী গ্রাম সম্পর্কে শশীপদর খুড়োমশাই। শশীপদর বাবা গদাপদ সরকার মারা যাবার সময় নিবারণকে বলে গিয়েছিলেন—তুমি রইলে নিবারণ, শশীকে দেখো—

এসব বহুদিন আগেকার কথা। কদমতলী তখন এমন কদমতলী ছিল না। তখন মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক আরো নিবিড় আরো ঘনিষ্ঠ ছিল। আর তা ছাড়া কদমতলীর লোকসংখ্যাও এখন অনেক বেড়ে গেছে। তখন এই কদমতলীর দক্ষিণে ইছামতী পেরিয়ে ওপার থেকে মালপত্র আসতো। এপারের লোকের জমি-জমাও ছিল ওপারে, ওপারের লোকের জমি-জমাও ছিল এপারে। জিনিসপত্রের দাম ছিল সস্তা।

নিবারণ চক্রবর্তী শশীপদর গলার আওয়াজ পাবার আগেই উঠোনে ঢুকে পড়েছেন। এক হাতে লাঠি আর এক হাতে হ্যারিকেন লণ্ঠন।

শশীপদ অভ্যর্থনা করে বললে—এত রাত্তিরে কী ব্যাপার খুড়োমশাই?

নিবারণ চক্রবর্তী বললেন—এসেছিলাম তো একটা কাজে, কিন্তু দরজায় দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম ভেতরে ঢুকবো কিনা—

শশীপদ বলে উঠলো—তা ভাইপোর বাড়িতে ঢুকবেন তাতে আবার আপনার অত সঙ্কোচ কেন খুড়োমশাই? এ কি পরের বাড়ি মনে করেন আপনি?

নিবারণ চক্রবর্তী বললেন—না তা নয়, তুই যে বউমার সঙ্গে ঝগড়া করছিলি শুনতে পেলাম—

শশীপদ বললে—ও আপনার বৌমার দোষ খুড়োমশাই, আমি কিছু করিনি—

—কিছু করিনি মানে? তুই বউমাকে ছেলেমানুষ পেয়ে যা ইচ্ছে তাই বলবি আর বৌমা ভালো মানুষের মেয়ের মত সব সহ্য করবে ভেবেছিস? কোথায়? বৌমা কোথায়? ডাক্ বৌমাকে আমার কাছে—ডাক্—

শশীপদ যেন কেমন দো-টানায় পড়লো।

বললে—আজ্ঞে খুড়োমশাই, সংসার করতে গেলে ও রকম একটু কথা কাটাকাটি হয়ই—

—তোর অত কথা কাটাকাটি করতে হবে না। আমি যা বলছি তাই কর্। বৌমাকে ডাক্।..... না থাক্, তোকে আর ডাকতে হবে না, আমিই ডাকছি বৌমাকে—

বলে উঠোন পেরিয়ে শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন—বৌমা, অ বৌমা—বৌমা! আমার সামনে লজ্জা করো না, একবার শুনে যাও—

অনেকক্ষণ পরে বৌমা অন্ধকার ঘরের ভেতর থেকে ঘোমটা দিয়ে বেরিয়ে এসে নিবারণ চক্রবর্তীর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে।

—থাক্ থাক্ থাক্, কী হয়েছে বলো তো বৌমা, শশী তোমার সঙ্গে ঝগড়া করছিল কেন বলো তো? বলো বলো, লজ্জা কোর না। বড়দা যাবা যাবার সময় আমাকে বারবার তোমাদের দেখতে বলে গিয়েছিল। তা শশীর যদি এতই দেমাক তো তুমি তোমার খুড়ীমার কাছে গিয়ে থাকবে চলো,—ও বেটার কাছে থাকতে হবে না

বৌমা কিছু বললে না। ঘোমটার আড়ালে মুখ ঢেকে তেমনি করে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

নিবারণ চক্রবর্তী খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে থেকে বললেন—কই, চলো চলো—

বৌমা এতক্ষণে কথা বললে।

বললে—এখানে আমার কোন অসুবিধে হচ্ছে না,—

—তাহলে কথা দিচ্ছ, এবার ও ঝগড়া করলেই তুমি আমার ওখানে চলে যাবে? দাও, কথা দাও—

বৌমা তবু কথা দেয় না। তেমনিই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

নিবারণ চক্রবর্তী এবার শশীপদর দিকে চেয়ে ঠিকরে উঠলেন। বললেন—বলি হাঁ করে দেখছিস কী? তুই ভেবেছিস বউ সারা দিন হাত ভাঙা খাটুনি খেটে রান্না-বান্না করবে আর তুই পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে হুকুম চালাবি? আমি থাকতে ওসব চলবে না, এই বলে গেলাম—

বলে নিবারণ চক্রবর্তী আবার সদরের দিকে চলে যাচ্ছিলেন, কিন্তু যেতে গিয়েও পেছন ফিরলেন।

বললেন—হ্যাঁ যে-কথা বলতে এসেছিলাম, বলি দক্ষিণপাড়া দিয়ে তো এলি? ওদিকে কী হয়েছে রে? শুনলাম বর্ডার কোর্সের জিপ্ গাড়িতে নাকি কালি ঘোষের ছেলেটা চাপা পড়েছে?

শশীপদ খুড়োমশাইএর পেছন পেছন আসছিল। খুড়োমশাই দাঁড়াতে সে-ও দাঁড়িয়ে পড়লো।

বললে—হ্যাঁ খুড়োমশাই, ছেলেটা একেবারে আধা-পাশ-তলা চাপা পড়েছে—

—মারা গেছে নাকি?

শশীপদ বললে—মারা যায়নি, তবে মারা যেতেও পারে। তাকে সদরের হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়ে তবে আসছি। সঙ্গে যাবার একটা লোক পাইনে, এদিকে নিজেও যেতে পারিনে। এই আমার এক জ্বালা

হয়েছে। আমি গেলেই অবশ্য ভালো হতো, শেষকালে কেতুকে পাঠালাম সঙ্গে। কালি ঘোষ বুড়ো মানুষ, তার সঙ্গে একজন জোয়ান কেউ না থাকলে কি চলে?

—কীসে করে পাঠালি? গরুর গাড়ি কে দিলে?

শশীপদ বললে—গরুর গাড়ি কেন, ওদের কম্যাণ্ডিং অফিসারকে বলে তাদের জিপ গাড়িতেই পাঠালাম।

তারপর একটু থেমে বললে—আমি সঙ্গে যেতাম, কিন্তু আপনার বৌমা বাড়িতে একলা, না ফিরলে আবার ভাববে।

—তা বেশ করেছিস। দিনে দিনে এ-সব কী হলো বলতো? গাঁয়ে বাস করা তো দায় হলো দেখছি। এতদিন এক-রকম ছিলাম, এ আবার কী পাপ ঢুকলো গাঁয়ে।

শশীপদ বললে—না খুড়োমশাই, কম্যাণ্ডার-সাহেবের কোনও দোষ নেই। আসলে দোষ ওই কালি ঘোষের। কালি ঘোষ বাড়ির সামনে গরুর গাড়ি খুলে রেখে দিয়েছিল। জিপ চালাতে চালাতে অন্ধকারে একেবারে গরুর গাড়ির ঘাড়ের উপরে গিয়ে পড়তেই জিপটা বাড়ির দাওয়ায় উঠে গিয়েছে—

নিবারণ চক্রবর্তীর রাত হয়ে যাচ্ছিল। বললেন—তাহলে আমি এবার আসি। তুই শুগে যা, কাল সকালবেলা যদি পারি তো একবার দক্ষিণপাড়ার দিকে যাবো'খন—

বলে নিবারণ চক্রবর্তী লাঠি আর লণ্ঠন নিয়ে বাড়ির দিকে চলতে লাগলেন।

কদমতলী গ্রামের মানুষ বড় শান্তিপ্রিয়। এমনিতে তারা বড় একটা কোনও ব্যাপারে মাথা ঘামায় না। মাথা ঘামানোর সময়ই নেই তাদের। গ্রামে ভদ্রলোক বলতে ওই দু'ঘর। এক চক্রবর্তীরা আর ওই শশীপদ।

শশীপদর বাবা গদাধর সরকার যখন বেঁচে ছিল তখন নিবারণ চক্রবর্তী ছিল তার নিকট প্রতিবেশী আর বন্ধু। দু'জনে ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে। তারপর বিয়ে-থা করে সংসার করে যে-যার কাজ নিয়ে জড়িয়ে পড়েছিল। জমি-জমা যা কিছু সামান্য ছিল তাই চাষ-আবাদ করেই সুখে দুঃখে জীবন কাটিয়ে দিয়েছিল। পাশা-পাশি বাড়ি হওয়ার দরুণ কাজ-কর্মের শেষে এসে গদাধর নিবারণের কাছে বসতো। তামাক খেতো। তারপর সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত হবার সঙ্গে সঙ্গে উঠতো।

বলতো—যাই নিবারণ—

নিবারণ জিজ্ঞেস করতো—তোমার ক্ষেতে এবার সরষে কেমন হলো বলছো?

গদাধর বলতো—হলো আর কই? মেয়ে কেটে যাবার সরষেটা যদি হয় তো আর এবার দোকান থেকে তেলটা কিনতে হবে না।

তারপর উঠতো ছেলে-মেয়ের কথা। দু'টো ছেলে গদাধরের। বড় ছেলেটা ভালো। লেখা-পড়া করতো মন দিয়ে। তার পেছনে অনেক টাকা খরচা করেছিল গদাধর। সহরের ইস্কুল থেকে লেখা-পড়া শিখে কলকাতার কলেজে পড়তে গিয়েছিল। আশা ছিল সব সংসারের অবস্থা ফিরিয়ে দেবে। মোটা মাইনের চাকরি করে বুড়ো বয়েসে বাপকে সাহায্য করবে। শেষ বয়েসে ক্ষেতে-খামারে ঘুরে ঘুরে গদাধরকে আর পায়ে ছাতা ধরাতে হবে না।

কিন্তু সেই ছেলে কলকাতায় ডাক্তারি পড়তে পড়তে একদিন হঠাৎ মারা গেল।

সে এক দুর্যোগের দিন গেছে সরকার পরিবারে। গ্রাম শুদ্ধ লোক এসে জুটেছিল সরকার-বাড়ির সামনে। সরকার-বাড়ির এত বড় বিপর্যয়ে কদমতলীর সবাই মিলে সেদিন ভাগ করে নিতে সঙ্কোচ করেনি এতটুকু। গ্রামের একটি মাত্র গর্ব করবার মত ছেলে, সেও চলে গেল। তাহলে গ্রামের আর রইলো কী?

ওই শশীপদ তখন ছোট। দুই ভাই-এর মধ্যে বয়েসের অনেক তফাৎ। গঙ্গাধরের স্ত্রী তারপর আর বেশিদিন বাঁচেননি। তার এক বছর পরেই গঙ্গাধরকে ছেড়ে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেছিলেন।

তখন গঙ্গাধরের সংসার বলতে ওই শুধু শশী।

নিবারণ চক্রবর্তী জিজ্ঞেস করতেন—তোমার শশী কেমন লেখা-পড়া করছে বড়দা?

গঙ্গাধর শেষ বয়েসে সংসারে থেকেও সংসার-বিরাগী হয়ে গিয়েছিল।

বলতো—কে জানে কী লেখা-পড়া করছে! আমি আর ওসব দেখি নে—

নিবারণ চক্রবর্তী বলতেন—ও-কথা বললে চলে? যে গেছে, সে গেছে, কিন্তু তা বলে শশী তোমার কাছে কী দোষ করলো? ও-ও তো তোমার ছেলে! ওর দায়িত্বও তো তোমার।

গঙ্গাধর বলতো—আমি ভালো করে ভেবে দেখেছি ভাই, সবই ভাগ্য। ভাগ্যে থাকলে ও মানুষ হবে, আর নয় তো কদমতলীর আর পাঁচজন ছেলে যা করছে ও-ও তাই করবে। মাছ ধরবে, তাস খেলবে আর বারোয়ারিতলায় বসে বসে বিড়ি ফুঁকবে!

কিন্তু না, শশীপদ তা করলে না। কদমতলীর আর পাঁচজন ছেলে-ছোকরার মত মাছ ধরলে না, তাসও খেললে না। এমন কি বারোয়ারিতলায় বসে বসে বিড়িও ফুঁকলে না। কোথায় ঘুরে ঘুরে যে কী করতে লাগলো, তার বাপ গঙ্গাধরও তা টের পেলে না।

শেষকালে একদিন ছেলেকে ডাকলে গঙ্গাধর।

বললে—কোথায় থাকিস রে তুই সারাদিন?

শশী বললে—কেন?

গঙ্গাধর বললে—তুই আবার জিজ্ঞেস করছিস, কেন? এই রকম করে সারাদিন আড্ডা দিয়ে ঘুরে বেড়ালেই জীবন চলবে? কাজ-কর্ম কিছু করতে হবে না? আমি যদ্দিন আছি তদ্দিন না-হয় চললো; কিন্তু তারপর? আমি তো আর চিরকাল থাকবো না। তখন তো সব তোকে একলাই করতে হবে। কোথায় আমার কত জমি-জমা আছে তাও তো একবার দেখে নিতে পারিস! তখন যে লোকে তোকে ঠকিয়ে সব কেড়ে কুড়ে নেবে। এখন কি আর সে সব দিন-কাল আছে? এখন কি কেউ কারো বিপদে-আপদে দেখে?

শশী কথাগুলো শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর মুখ তুলে বললে—আমি ওসব কিছু দেখতে পারবো না—

—দেখতে না পারলে খাবি কী? হাওয়া খাবি? হাওয়া খেলে পেট ভরবে?

এর পরে আর বেশি দেরি করেনি গঙ্গাধর। নিবারণ চক্রবর্তীর পরামর্শে গঙ্গাধর তাড়াতাড়ি ছেলের বিয়ে দিয়ে দিয়েছিল। সম্বন্ধটা করেছিলেন ওই নিবারণ চক্রবর্তীই। নিবারণ চক্রবর্তীর দূর সম্পর্কের এক বেয়াই থাকতেন মণিরামপুরে সেখানকার এক মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। তাকেই পুত্রবধূ করে নিয়ে এল গঙ্গাধর। বিয়ে হলো, বৌভাত হলো। কদমতলীর দু'সাতশো লোক পাতা পেড়ে ভোজ খেলে। সাধ্যমত সবাই শশীর বৌকে আশীর্বাদও করে গেল।

আর তার কিছুদিন পরেই গঙ্গাধর সংসারের সমস্ত ঝামেলা চুকিয়ে দিয়ে পরলোকের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলে।

এ-পর্যন্ত সমস্তই মোটামুটি এক-রকম ঠিকই ছিল। মৃত্যু বড় সাধারণ জিনিস। সংসারে জন্ম মৃত্যুর চেয়ে পুরোন সত্য আর কিছুই নেই। অনাদিকাল থেকে প্রতি সংসারে জন্ম মৃত্যু ঘটে আসছে। কিন্তু তবু যখন আমাদের প্রত্যক্ষ চোখের সামনে ও দুটোকে ঘটতে দেখি তখন বিস্ময়ে আমাদের চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। জন্মের সময় আমরা যেমন আনন্দে আত্মহারা হই, শোকে আবার তেমনি বিচলিত হয়ে উঠি। কিন্তু সংসার তার আপন দাবি যেমন করেই হোক আদায় করে নেবেই। সেই কারণেই শশীপদও কোমলপুরের নাইট-ইস্কুলের চাকরিটা তেমনি করে আদায় করে নিয়েছিল। ওইটুকু ছাড়া গঙ্গাধরের মৃত্যুতে কদমতলীর জীবন-যাত্রার আর কোনও পরিবর্তন আসতে পারেনি।

পরিবর্তন এলো যখন ইছামতীর ওপারটা হয়ে গেল পাকিস্তান, আর এপারের নামটা হলো হিন্দুস্তান।

কিন্তু সে সব কথা পরে।

তার আগে দক্ষিণপাড়ার কালি ঘোষের ছেলের গাড়ি চাপা পড়া নিয়ে যে কাণ্ডটা ঘটে গেল তা বলতে হবে। রাত্রে আর শশীপদর কোনও কথা হলো না বউএর সঙ্গে। বাসন পত্তোর মেজে ঘরে বউ যখন শুতে এল তখন শশীপদর বোধহয় অর্ধেক রাত। অন্ততঃ লক্ষ্মীর তাই-ই মনে হলো। সেও আর কোনও কথা বললে না। তক্তপোষটার এক পাশে রোজকার মত শুয়ে পড়লো। সারা দিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর তখন তার চোখের পাতা দু'টো এক করতে যা দেরি।

শশীপদর কিন্তু আর ঘুম এলো না। পরের দিনের কাজগুলোর কথা ভাবতে গিয়ে তার ঘুম আসতে অনেক দেরি হতে লাগলো। কালি ঘোষের বউএর কান্নাটা যেন তখনও তার কানে বাজছে। একটা মাত্র ছেলে কালি ঘোষের। বছর কয়েক হলো ওপার থেকে এপারে উঠে এসে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। পাঁচ-সাত বিঘে জমিও কিনেছে। ক্ষেত মজুরি করে। এখন দু'টো বলদ কিনেছিল মহাজনের কাছে চড়া সুদে টাকা ধার করে। ঠিক সেই সময় এই বিপর্যয়!

কালি ঘোষ শশীপদর পা দু'টো দুই হাতে জড়িয়ে ধরেছিল।

বলেছিল- এ আমার কী সর্বোনাশ হলো মাষ্টারমশাই, আমার ছেলের এ কী হলো? আমি এখন কী করবো?

শশীপদ সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেছিল কালি ঘোষকে। কিন্তু বাড়ির ভেতরে মরা ছেলেকে জড়িয়ে ধরে কালি ঘোষের বউ যে কান্না জুড়ে দিয়ে ছিল তা যেন তখনও শশীপদর কানে এসে বিঁধছিল।

দক্ষিণপাড়ার আবাল-বৃদ্ধ সব লোক জড়ো হয়েছিল কালি ঘোষের বাড়ির সামনে। এ যেন একলা কালি ঘোষের বিপদ নয়, বিপদ সকলের। অপরাধী অন্য কেউ হলে তার প্রতিকার করা হয়ত চলতো। কিম্বা তার শাস্তির ব্যবস্থাও হয়ত করতো শশীপদ। কিন্তু এ যে বর্ডার ক্রোস। বর্ডার ক্রোসের কম্যাণ্ডার স্বয়ং হরবিলাস সিং নিজেই যে আসামী। তার শাস্তি বিধান যে শশীপদ কী করে করবে তা হঠাৎ ভেবে পেলে না।

তা ছাড়া গাড়ি চাপা পড়া ছেলেটাকে হাসপাতালে পাঠানোই হলো প্রথম সমস্যা। সেই

ব্যবস্থা করতেই রাত তিন প্রহর কেটে গেল। এখন ভোর বেলা উঠেই প্রথম কাজ হলো সমরের হাল-পাতালে যাওয়া। দাত কোপ ঘুরে সমর। যেতে আসতেও বেশ সময় লাগে না। তারপর যেতে হবে বর্ডার কোর্টের ক্যাম্পে। কম্যাণ্ডারের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে হবে এর প্রতিবিধান কী ভাবে হবে।

তারপর আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে কখন যে শশীপদর চোখে ঘুম নেমে এসেছিল তার খেয়াল ছিল না। লক্ষ্মীর ঠেলাঠেলিতে যখন ঘুম ভাঙলো তখন শশীপদ চোখ মেলে দেখলে বাইরে বেশ ফর্সা হয়ে গেছে।

লক্ষ্মী বললে—ওঠো ওঠো, বর্ডার-কম্যাণ্ডার-সাহেব এসেছে—

শশীপদ ধড় মড় করে উঠে বসলো। বসে আর দেরি করলে না। ঘর থেকে সমরের দিকে এগিয়ে গেল।

[ক্রমশঃ

• • • •

ফরাসীদেশের সম্রাট হবার পর নেপোলিয়ন একদিন ছদ্মবেশে কর্সিকা দ্বীপে বেড়াতে গেলেন। পোষাক ছিল তাঁর সাধারণ গ্রামী লোকের মত। অবশ্য তাঁর শরীররক্ষীরা একটু দূরে দূরেই রইল।

সেখানে একটা পাঠশালার গুরুমশাইকে তিনি চিনতে পারলেন, তাঁর বাল্য বন্ধু বলে।

এগিয়ে গেলেন তিনি তাঁর কাছে। পরিচয় না দিয়ে বেশ খানিকটা আলাপ পরিচয় করে নিলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন: তোমার এখন চলে কি শুধু মাষ্টারী করে? না আর কিছু কর?

—কি আর করব? ভাবছি একবার বোনাপার্টির কাছে চিঠি লিখবো,—সে ছিল আমার বাল্য বন্ধু। কিন্তু ভয় হয়, সে হোল সম্রাট,—আর আমি একজন নগণ্য গ্রামবাসী। সে নিশ্চয়ই আমাকে ভুলে গেছে।

নেপোলিয়ন তখন আবেগে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বললেন ভুলিনি বন্ধু:—আমিই তোমার সেই পুরান বন্ধু নেপোলিয়ন বোনাপার্টি।

মা যা হবেন।

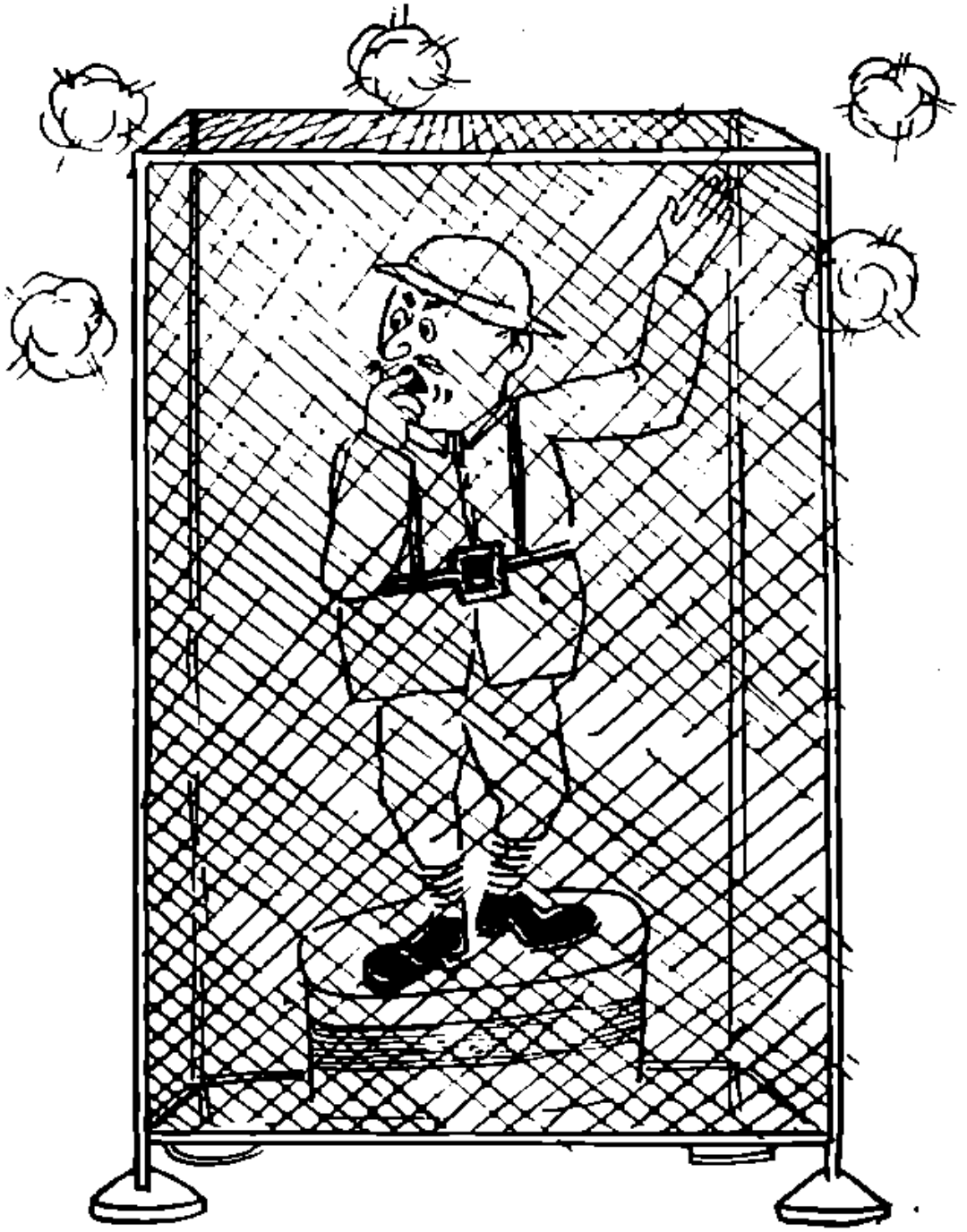

আইন ও শৃঙ্খলা

"ক্যালকাটা ক্লাব"

কলকাতা সহরের বাঙালী অভিজাত শ্রেণীর এই স্বনামখ্যাত ক্লাবটীর পেছনে একটা ইতিহাস আছে। যা পড়ে আজিকার বাঙালী মাত্রই গর্ববোধ করবেন।

বৃটীশ আমলে যখন কলকাতা সহরে বিলিতী সাহেবদের একটা ক্লাব ছিল, নাম বেঙ্গল ক্লাব। নামে বেঙ্গল হলেও এই ক্লাবে কোন বাঙালীকে ঢুকতে দেওয়া হতো না। এই ক্লাবের এক বাৎসরিক অধিবেশনে, তদানীন্তন বাংলা সরকারের প্রধান কর্মকর্তা স্যার জন উডবার্ণ নিজে ব্যক্তিগত ভাবে স্যার আর.-এনকে আমন্ত্রণ করলেন। স্যার আর.-এন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে যখন ক্লাবের ডিনার হলে প্রবেশ করলেন তখন ক্লাবের বিলিতী সাহেবেরা সেই অনাচারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তাঁরা উঠে গিয়ে পাশের হল-ঘরে বসলেন। স্যার জন উডবার্ণ ব্যক্তিগত ভাবে তাঁদের অনুরোধ করলেন ডিনার হলে ফিরে যেতে। কিন্তু তাতে কোন ফললাভ হলো না।

স্যার আর.-এন সেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে প্রতিজ্ঞা করলেন। তিনি নিজে একটি ক্লাব গড়ে তুলবেন। রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি বিলিতী সাহেবদের মতন জাতি-বিদ্বেষে অন্ধ হয়ে বল্লেন না যে এ ক্লাবে সাহেবরা ঢুকতে পারবে না। তাঁর শিক্ষা বিলিতী সাহেবদের চেয়ে ঢের বেশী উদার ছিল। তিনি বল্লেন, যাঁরা মানুষের মর্যাদা দিতে জানে, তাঁরাই এই ক্লাবের-সভ্য হবে। সেই ক্লাবই হল 'ক্যালকাটা ক্লাব' এবং সেদিন যে-সাহেবরা তাঁকে দেখে ডিনার-হল থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল তাদের কেউ কেউ পরে স্যার আর.-এন-এর মাথায় ছাতি ধরে তাঁর পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়িয়েছে।

সেদিনের বাঙালী স্যার আর.-এন (রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব শিক্ষাদীক্ষা, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও উদারতার গুণে শুধু বাঙালী বা বাংলার নয় সারা ভারতের মুখোজ্জ্বল করেছিলেন এবং তাই আজ তিনি প্রাতঃস্মরণীয় হয়েছেন।

বনকন্যা

উপন্যাস

অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত

[পূর্বকথা : সরসিজ মজুমদারের মেয়ে বনছায়া। বাপ বড়লোক হওয়া সত্ত্বেও বনছায়া চাকরি করে, গল্প উপন্যাস লেখে। বড় সাহিত্যিক হবার স্বপ্ন দেখে। কখনও বা ভাবে জার্নালিস্ট হই যেহেতু আজকাল সাহিত্যের চেয়ে জার্নালিজমেই বেশি ম্যাষায়। সম্পাদক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক অনেকের সঙ্গেই হরদম-মহরম করে। সুবীর নামে এক আধুনিক কবিকে ভালোবাসে। যে কিনা বড়লোকের মেয়ে সরিৎকে ভালোবাসতে পারে, ভালোবাসতে পারলেও বিয়ে করতে পারে, এমন প্রবাদে বিশ্বাস করে না। বনছায়া যেমন কবিকে ভালোবাসে তেমনি এক ঔপন্যাসিককেও ভালোবাসে। তার নাম সন্দীপ সেন। কিন্তু সুবীর যদি সমুদ্রের মত উত্তাল, সন্দীপ পাহাড়ের মতই ধীরস্থির। সন্দীপও দুঃস্থ কিন্তু আদর্শনিষ্ঠ। দারিদ্র্য যেন তার আদর্শকে ম্লান করতে না পারে সে সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ। সরসিজ মেয়ের জন্যে হিমাংশু বোস নামে এক কৃতী এঞ্জিনিয়র ঠিক করেছে, কিন্তু বনছায়া তাকে বিয়ে করতে রাজি নয়। তাকে রক্ষা করতে কে এগিয়ে আসবে? সন্দীপ না সুবীর? না, বনছায়া শেষ পর্যন্ত হিমাংশুকেই বরণ করবে? হিমাংশুর বন্ধু আর মুরুব্বি দেবজ্যোতি ভৌমিক, যে অফিসে বনছায়ার বস্, তার দৃষ্টিও না কোন বনছায়ার দিকে। বনছায়া প্রেমের জন্যে কেরিয়র মাটি করবে, না কেরিয়রের জন্যে প্রেম?

অতঃপর সরসিজের বাড়িতে টি-পার্টিতে নিমন্ত্রিত হল হিমাংশু। বনছায়াকে পাত্রী হিসাবে মনোনীত করল। তার কার্মে অনেক চাকরি আছে—বনছায়া চাইল সুবীরকে সুপারিশ করতে। সে সুপারিশ গ্রহণ করল হিমাংশু, সুবীরকে চাকরি দিল। সুবীর ভাবতেই পারেনি এমন অঘটন ঘটতে পারে। আর সুবীরের চাকরি হবার পর তার সঙ্গে বিয়ের নোটিশ দিল বনছায়া। এ ব্যাপারে হিমাংশু অন্ধকারে।

হিমাংশুর সঙ্গে বিয়ের তারিখটা পিছিয়ে দিতে পারলেই নোটিশের মেয়াদ অন্তে সুবীরের সঙ্গে বিয়েটা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হতে পারে। সেই মতলবে হিমাংশুর কাছ থেকে মিথ্যা ওজুহাতে বিয়ের তারিখটা পিছিয়ে নিল বনছায়া। সরসিজবাবু জানলেন হিমাংশুর নিজের সুবিধের জন্যেই তারিখটা লম্বা করছে। এখন বনছায়ার ভয় তার আগেই সুবীরের সঙ্গে তার বিয়ের রেজিস্টা পাকা করতে পারবে কিনা।

সুবীরের সঙ্গে বনছায়ার বিয়ে নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হল। কিন্তু প্রথম মিলনক্ষণেই মনে হল যেমনটি চেয়েছিল তার চেয়ে কিছু কম পড়ল। আরো কম পড়ল যখন নরসিংবাবু এ ব্যাপারে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেলেন। বনছায়া বুঝল পিতৃগৃহ ত্যাগ না করলে বাবা শান্ত হবেন না।

একটা সুটকেস আর বিছানা নিয়ে বনছায়া বাপের বাড়ি ছেড়ে সুবীরের ঘরে গিয়ে উঠল। যাবার আগে ছোটবৌদি শাশ্বতীর সিঁদুর কৌটো থেকে সিঁদুর নিয়ে সিঁথিতে ঘন করে রেখা টানল—জনান্তিকে জানাবার জন্তে যে সে জয়ী, সে সুখী।

সুবীরের কবি-বন্ধুরা ঠিক করল এ বিয়ে-উপলক্ষে সম্পাদক পীযূষ দত্তের বাড়ির ছাদে একটা পার্টি হবে। স্বামীর ঘরে নির্জনে বসে বনছায়া যখন সাজছে তখন দরজায় হিমাংশুর টোকা পড়ল। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল বনছায়া, দরজা খোলে কি না খোলে। কিন্তু স্পষ্ট করে কিছু স্থির করবার আগেই দরজা খুলে দিল।

হিমাংশু ঘরে ঢুকে দেখল এক-ঘরের ফ্ল্যাটে ধনিতা মেয়েটা সুখে সৌভাগ্যে একেশ্বরীর মত বিরাজ করছে। ভাবছে তার এই অহঙ্কারটা চূর্ণ করা যায় কী করে? সে গেল বনছায়ার বস্ দেবজ্যোতি ভৌমিকের কাছে নালিশ করতে। দেবজ্যোতি বললে, সুবীরকে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিন। আর হিমাংশু বললে, বনছায়ার কাপটোরও শাসন হওয়া উচিত। দেবজ্যোতি সায় দিল। বললে, দেখি, ভাবি, কী করা যায়।

আসলে দেবজ্যোতি বনছায়ার মাইনে পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দিল। বনছায়া যে প্রেমের যুদ্ধে জয়ী হয়েছে, কৃতী ও বড়লোক বলে হিমাংশুতে আকৃষ্ট হয়নি, এ যেন তারই পুরস্কার। কিন্তু সুবীরের মুখে এ মাইনে-বাড়ার খবর পেয়ে হিমাংশু ক্রুদ্ধ হল। সুবীর ভেবে পেল না এ প্রতিক্রিয়ার অর্থ কী।

হিমাংশু নানা প্রশ্নে জেনে নিল একটা ছোট ঘরে সুবীর আর বনছায়া কেমন সুখে দিন কাটাচ্ছে। সঙ্গে সান্নিধ্যে তাদের সন্ধ্যাগুলি কী রমণীয়। স্বামীর মাইনে কম স্ত্রীর মাইনে বেশি এ তাদের কাছে কোনো সমস্যা নয়। হিমাংশু চাইল তাদের মধ্যে বিরোধের ছুরি চালাতে। শত্রুতাতেই এখন তার শান্তি। আর শত্রুতার মহত্ত্ব সূক্ষ্মতম কারুকার্যে —অন্যথায় হত ইতি গজে।

হিমাংশু সুবীরের জন্তে অফিসে ওভারটাইমের ব্যবস্থা করলে। টাকা রোজগার বেশি হবে বুঝে সুবীর তাতে আনন্দিত হল। আর এদিকে বনছায়ার সন্ধ্যাগুলি নিঃসঙ্গ হয়ে উঠল। হিমাংশুই তার রঙিন মদির সুন্দর সন্ধ্যাগুলি নিল হরণ করে। আবার দেবজ্যোতি বনছায়ার জন্তে একটা বাড়ি দেখে দিল বলে হিমাংশুও সুবীরের জন্তে আরেকটা দেখে দিল। সেটা তুলনায় খারাপ হলেও সুবীর দাবি করল সেটাই তার কোয়ার্টার, সেখানেই বনছায়াকে যেতে হবে। সুবীর যেমন তার বস্-এর হুকুম মানে, বনছায়ারও তেমনি সুবীরের কথা মানা উচিত।

অফিস থেকে অভিরামকে পাঠানো হল কাজ করার জন্য। কিন্তু নিঃসঙ্গতার নির্যাতন থেকে রেহাই পেল না বনছায়া। ভাবল কোথাও গিয়ে ঘুরে ছুটি। সন্ধীপের কথা মনে পড়ল। সন্ধীপের কাছে গিয়ে বসল বনছায়া। সে উপন্যাস রচনায় রত। মনে হল বনছায়ার উপস্থিতি থেকেও সাহিত্যই বুঝি তার প্রিয়তর—তাতে না থাক টাকা না থাক নাম-যশ। বনছায়ার যে বিয়ে হয়ে গেছে এতেও যেন তার ভালোবাসার কোনো ক্ষতি নেই। বাড়ি ফিরে এসে দেখল সুধীর লিখছে। কিন্তু কবিতা নয়, অফিসের রিপোর্টের বাংলা অনুবাদ। তারপর থেকে রোজ সন্ধ্যায়ই বনছায়া বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় একা একা। এডায়টাইম করে সুধীর কতক্ষণে ফিরবে তার প্রতীক্ষা করে না।

বনছায়াকে বাইরে বেরুনো থেকে নিরস্ত করবার অভিসন্ধিতে সুধীর তার সঙ্গ নিতে চাইল, নিতে চাইল হিমাংশুর বাড়ি। বনছায়া গেল না। একদিন হিমাংশুই সুধীরের ফ্ল্যাটে এসে হাজির। বনছায়া ঘরে নেই, সুধীর গেল চা দিতে। হিমাংশু বলল, বলল, বনছায়া নিজে যেদিন চা করে দেবে সেদিন যাবে। বনছায়া ফিরে এলে সুধীর তাকে শাসন করতে চাইল আর বনছায়ার মধ্যে তার চুকল একা বাড়িতে হিমাংশুই না একদিন আক্রমণে উদ্যত হয়ে আবির্ভূত হয়। তাই কদিন পর সুধীর যখন বনছায়াকে ঘুমের মধ্যে আবদ্ধ করতে চাইল তখন দুঃস্বপ্নের মধ্য থেকে ভুল করে বনছায়া চেঁচিয়ে উঠল এ কী অন্যায়! ছি ছি ছাড়ুন ছাড়ুন—

অফিসের পার্টিতে বল-এর পাল্লায় পড়ে সুধীর মদ খেল। সেই থেকে সে নেশা তাকে পেয়ে বসল। বনছায়াকেও সে সেধে মদ খেতে। একটা কুৎসিত সন্দেহ থেকে মুক্ত হবার জন্যেই বনছায়া স্বামীর প্রস্তাবে সম্মত হল। কিন্তু সুধীর আর নিজের শর্ত পালন করল না। বিরোধ ঘনায়িত হল।

তারপর বিরোধের মধ্যে বনছায়া আবিষ্কার করল সে মা হতে চলেছে। তার পেটে সুধীরের সন্তান।

বনছায়া অনুভব করল এ সন্তান আনন্দের অভিজ্ঞান নয়, শুধু মাতলামির পরিণতি। পরাভবের অপমানের প্রতীক। বনছায়া ডাক্তার অরবিন্দের কাছে গেল, পেটের সন্তানকে নষ্ট করবে। অরবিন্দ যখন জানল এ সন্তান বৈধ, তখন প্রস্তাবে রাজি হলনা। তখন কুমারী সেজে সন্তানকে অবৈধ বলে বুঝিয়ে বনছায়া গেল আরেক ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার কমলেশ তার কি বাবদ এমন এক জিনিস দাবি করল যাতে সে রাজি হতে পারল না।

সেবারের পার্টিতে হিমাংশু বেশিকরে মদ খাইয়ে সুধীরকে মাতাল করে দিল। বাড়িতে পৌঁছে দেবার জন্যে গাড়ি ও তাতে একটি নারীর ব্যবস্থা করলে। নারীর নাম লাবণি, তাকে বলে দিল যেন সুধীরকে একেবারে তার স্ত্রীর কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। যাতে বনছায়া বুঝতে পারে সুধীর কতদূর নেমে গিয়েছে। যখন সুধীর বাড়ি ফেরে, দেখতে পায় সন্ধীপ সেন এসেছে আর বনছায়া তাকে তার উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পড়ে শোনাচ্ছে।

নিজে ধরা পড়ে যাবার ভয়ে চটে গিয়ে সুবীর সন্দীপের উপর প্রতিশোধ নেয়, তাকে গালাগাল দিয়ে তাড়িয়ে দেয় বাড়ি থেকে।

সুবীর বনছায়ার কাছে দুঃখ প্রকাশ করে বিরোধ মিটিয়ে নিল। সন্দীপের কাছে ক্ষমা চাইতে রাজি হল, বললে, তাকে একদিন বাড়িতে ডেকে নিয়ে এস। বনছায়াকে অনুরোধ করল হিমাংশুকে ধরে তাকে বথেতে উচ্চতর পদে বদলি করিয়েদিতে। বনছায়া রাজি হল না। অথচ সন্দীপকে নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে তার আলিঙ্গনে ধরা দিল।

সন্দীপের অন্তরলোকে দ্বন্দ্ব সুরু হল—শিল্পীর পক্ষে এমন কোনো আকর্ষণে লিপ্ত হওয়া উচিত নয় যাতে তার সৃষ্টির শক্তি নষ্ট হতে পারে। কিন্তু কার্যতঃ সে উদাসীন থাকতে পারল না। বনছায়ার বাড়ি গেল তার উপন্যাসের বাকি অংশ শুনে আসতে। ঈর্ষায় ক্ষুব্ধ হয়ে সুবীর সে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল আর সেই টুকরোগুলি কুড়িয়ে নিয়ে চলে গেল সন্দীপ।

ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঘরের বাঁটোয়ারা হয়ে গেল—এক ঘরে সুবীর, অন্য ঘরে বনছায়া। সুবীর তার ঘরে একটা ক্লাব বসাল যাতে বনছায়ার সাহিত্য-সাধনা বিপর্যস্ত হয়ে যায়। লেখার জন্যে নিরিবিলি জায়গা খুঁজতে বনছায়া সন্দীপেরই দ্বারস্থ হল। সেখান সন্দীপ সযত্নে তার পাণ্ডুলিপির ছেঁড়া টুকরোগুলি একটা খাতার পৃষ্ঠায় সেঁটে সেঁটে উপন্যাসের পুনরুদ্ধার ঘটিয়েছে। বনছায়া ঠিক করল সন্দীপের বাড়িতে বসে বইটার একটা নকল তৈরি করবে।

সন্দীপের বাড়িতে বসে উপন্যাস নকল করল বনছায়া। প্রবাহের সম্পাদক পীযূষ দত্তের সঙ্গে হোটেলে দেখা করবে বলে টেলিফোনে নিমন্ত্রণ করে পাঠাল। তুমি মদ খাবে? জিজ্ঞেস করল পীযূষ। বনছায়া বললে, আমি খেতে শিখে গিয়েছি।

বনছায়া পীযূষের সঙ্গে হোটেলে মদ খেল, এক ট্যাক্সিতে বেড়াল। তার উপন্যাস 'অবগুণ্ঠনা' 'প্রবাহ' পত্রিকার জন্যে মনোনীত হল। তারপর মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরলে সুবীর গর্জে উঠল: তুমি মদ খেয়েছ? বনছায়া বললে, তুমিই তো শিখিয়েছ মদ খেতে।

বনছায়ার উপন্যাসের প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হতেই পাঠকমহলে সাড়া পড়ল। কিন্তু সুবীর খুশি হতে পারল না। জানতে চাইল কোথায় বসে সে নতুন করে লিখেছে এবং কী উপায়ে বাগিয়েছে পীযূষ দত্তকে। বনছায়া বললে, অফিসে বসেই লিখেছে, আর যেহেতু পীযূষ দত্তের রুচি কিছু মোটা, তদবিরটা সে মোটা করেই করেছে। রাগে 'প্রবাহে'র কপি ছিঁড়ে ফেলল সুবীর আর তার অক্ষম ঈর্ষাকে ব্যঙ্গ করল বনছায়া। লেখাটা পড়ে হিমাংশু খুব উত্তেজিত হল। সুবীরকে ডাকিয়ে বলল, এ অশ্লীল লেখা বন্ধ করে দিন। দেবকালে আপনার নামের সঙ্গে জড়িয়ে আমার কার্যের না বদনাম হয়।

অফিসে বনছায়া অসুস্থ হয়ে পড়লে দেবজ্যোতি তাকে নিউডন নার্সিং হোমে পাঠিয়ে দিলে। দেবজ্যোতি বনছায়ার বাপের বাড়িতে খবর দিলে, খবর দিলে হিমাংশুকে। হিমাংশু সুবীরকে খবর দিল। সুবীর উদাসীন রইল। তার বিতৃষ্ণার কারণ পীযূষ দত্তের কাছে গিয়েছিল 'অবগুণ্ঠনা'র প্রকাশ বন্ধ করে দিতে আর পীযূষ তাতে রাজি হয়নি

যেহেতু বনছায়ার মতে স্বামী ও সংসারের চেয়েও তার আর্ট বড়। এই নিয়ে সুবীরের সঙ্গে বনছায়ার আবার ঝগড়া হয় আর সুবীর তাকে তার আর্টের গুরু সন্দীপ সেনের কাছে চলে যেতে বলে। নার্সিং হোমে হিমাংশু গিয়ে শোনে বনছায়ার অপারেশন হয়েছে কিন্তু গর্ভের সন্তান বেঁচে নেই।

নার্সিং হোমে অপারেশনের আগে ডাক্তারকে বনছায়া অনুরোধ করল যেন তাকে আর সন্তানধারণ করতে না হয়। ডাক্তার সেই রকম ছুরি চালাল। নার্সিং হোমে যতদিন ছিল বনছায়ার কোনো খোঁজ নেয়নি সুবীর। সন্দীপই সব দেখাশোনা করেছে। তারপর যখন ছুটি পেল বনছায়া সন্দীপের সঙ্গে সন্দীপের বাড়িতে গিয়েই উঠল।

বনছায়া সন্দীপ সেনের বাড়িতে গিয়ে উঠেছে এ খবর পেয়ে হিমাংশু দারুণ ক্রুদ্ধ হল। প্রতিশোধ নেবার জন্যে সুবীরকে উত্তেজিত করতে লাগল। বললে আপাতত ডিভোর্সের মামলা করতে। ওদিকে লাবণি সুবীরের প্রতি প্রেমমুগ্ধ হল, চাইল গৃহিণী হতে। সেই স্বার্থেও তো বনছায়ার সঙ্গে বিবাহের বিচ্ছেদ দরকার। সুবীর গেল উকিলের পরামর্শ নিতে।]

বত্রিশ

সুবীর উকিলবাড়ি গিয়েছে খবর পেয়ে আশ্বস্ত হল হিমাংশু। তাই আরেক সন্ধ্যায় ডাক দিয়ে বাড়িতে এনে তাকে অনায়াসেই মদের গ্লাস এগিয়ে দিল।

'কী ঠিক করলেন?'

'মামলাই করব।' যেন বলতে হয় এমনি ভাবে সুবীর বললে।

'নিশ্চয়ই করবেন। অধিকার কখনোই ক্ষুণ্ণ হতে দেওয়া নয়।' সুবীরকে সতেজ করবার জন্যেই যেন হিমাংশু উদ্দীপ্ত হল: 'আপনার স্বাধীনতায় কে হাত দেয়?'

'হ্যাঁ, প্রেমের স্বাধীনতা।' গ্লাসে চুমুক দিল সুবীর: 'জীবনে একটা প্রেম ব্যর্থ হয়েছে বলে গোটা জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যায় না। আরো প্রেম আছে। আরো বিয়ে।'

'আমিও তো সেই কথাই বলছি। ডিভোর্সই একমাত্র রেমেডি। উকিল আপনাকে ঠিক পরামর্শ দিয়েছে। জিদির বাঁড়ুয্যে বাঘা উকিল—ঠিক আপনাকে ডিক্রি পাইয়ে দেবে।'

'ডিক্রি তো পাইয়ে দেবে, কিন্তু আমার ভয় হয়,' সুবীরকে কেমন যেন বিমর্ষ শোনাল: 'ডিক্রির পর বনছায়া না ফুড়ুৎ করে ফিরে আসে।'

'ডিক্রির পর আবার ফিরে আসবে কী!' হিমাংশু তাকাল অদ্ভিতের মত: 'ডিভোর্সের পর আবার ফিরের ফুড়ুৎ?'

'উকিল বলছে ডিক্রির পর দু বছর চুপচাপ থাকবার পরেই নাকি ডিভোর্স চালু হবে।'

'ডিভোর্স চালু হবে কী মশাই?' হিমাংশু হঠাৎ রুখে উঠল: 'আপনি তবে ফিরের মামলা করছেন?'

যেন একটু ভয়ে-ভয়ে তাকাল সুবীর। বললে, 'রেস্টিটিউশান অব কনজুগ্যাল রাইটস। স্ত্রী ফেরত পাবার মামলা।'

হিমাংশু প্রায় আকাশ থেকে পড়ল : 'আপনার স্ত্রী ব্যভিচারিণী হয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল আর আপনি তাকে ফেরত চান?'

'না, না, ফেরত চাইনা, সেও আসবেনা ফেরত, চাইবে না কিছুতে। উকিল বললে, দু বছর এমনি চুপচাপ কাটলেই ডিভোর্সের ডিক্রি পাকা হবে।'

'উকিল একটা গাধা।' হিমাংশু তিক্ত মুখে বললে, 'এ কি মশাই স্ত্রী ঝগড়া করে বাপের বাড়ি চলে গিয়েছে যে রেস্টিটিউশন অব কনজুগ্যাল রাইটস চাইবেন? এ যে মশাই হত্তরমত ব্যভিচার—বিশ্বাসভঙ্গ।'

ম্রিয়মাণ গলায় সুবীর বললে, 'আমিও তাই বলছিলাম উকিলকে।'

'আচ্ছা মশাই, আপনার কোনো যন্ত্রণা নেই?'

হঠাৎ কেমন যেন আর্ত শোনাল হিমাংশুকে। চমকে তার মুখের দিকে তাকাল সুবীর। কিন্তু প্রশ্নটা তো তার নিজের সম্পর্কে, তার উত্তর তো আর হিমাংশুর মুখে লেখা নেই, যদি থাকে তো আছে তার নিজের মনের গহনে। ততদূর পর্যন্ত পৌঁছুবে তার ক্ষমতা কই? সুবীর তাই চুপ করে রইল।

'আপনি তো ঐ মেয়েটাকে ভালোবাসতেন?' হিমাংশু এবার আর ব্যঙ্গছায়ার নামটাও মুখে আনছে না।

'তা বাসতাম বৈকি। খুব বাসতাম।' কীরকম বোকার মত না শিশুর মত বললে সুবীর।

'সেই মেয়ে কিনা আপনাকে ঠকিয়ে আরেকটা লোকের সঙ্গে সিধে বেরিয়ে গেল—আপনার মধ্যে একটা হাহাকার জাগলনা? এই আপনার প্রেম? এই আপনার মেয়েটাকে চাওয়া?'

'তাই বলে আমি তো চেঁচিয়ে পাড়া জানাতে পারিনা।'

'আপনি চেঁচাবেন কেন? আপনার শরীরের রক্ত চেঁচাবে। আপনি আক্রোশে ফেটে পড়বেন। আপনি চাইবেন সেই প্রতারক মেয়েটাকে বিধ্বস্ত করে দিতে। কী, চাইবেন না?'

'তাই তো চাইছি।'

'আর ঐ পুরুষটা? যে তুলনায় আপনার চেয়ে ঢের-ঢের ছোট, ঢের-ঢের নিচু, তার হেওয়া অমর্ষ অপমান আপনি গা পেতে সহ্য করবেন? আপনি প্রতিশোধ নেবেন না?'

'লোকটা কত টিক মাইনে পায় জানিনা, তবে—'

'কেরানির কত মাইনে হয় তা আমার জানা আছে। তার তুলনায় আপনি কত বরণীয়। আপনি একজন অফিসর, তার উপর বোর্ড আমার সুপারিশে আপনার আরো উন্নতি রেকমেণ্ড করেছে, আমি ভাবছি আপনাকে ক্যাশ ডিপার্টমেণ্টে পোস্ট করব, আপনার মাইনে আরো শ দুই বেড়ে যাবে—ঐ লোকটা আপনার জুতোর ফিতে বাঁধবারও উপযুক্ত নয়—অথচ—'

সুবীর আরো একটু নাকাই গাইল : 'কিন্তু লোকটা সাহিত্যিক। জনপ্রিয় বলে ইদানীং বেশ কিছু কামাচ্ছে।'

'রাখুন!' হিমাংশু এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতে চাইল : 'জনপ্রিয় সাহিত্য কী, তা জানা আছে। প্রথমটায় হাস—পরে সব ঠ্যারস! তা সে যাই হোক, স্টেটাসে নির্ঘাৎ সে আপনার ইনফিরিয়ার—আপনিই তো প্রথম পুরুষ, অধিষ্ঠিতাল স্বামী, আপনাকে ও ত্যাগ মেরে দিল আর আপনি তাই হজম করবেন? শুধু

স্ত্রী-ধন চাইবেন? ঐ লোকটার বিরুদ্ধে কোনো স্টেপ নেবেন না? পৃথিবীকে জানতে দেবেন না ওর অপরাধের কথা? জানতে দেবেন না ও কতদূর অধম? শুনুন,' মাপে নতুন করে মন দিল হিমাংশু: 'ম্যাডালটারির গ্রাউণ্ডে ডিভোর্সের মামলা করাই আপনার একমাত্র প্রতিকার।'

'কিন্তু উকিল বলছে ম্যাডালটারি প্রমাণ হবেনা।'

'কেন প্রমাণ হবে না? একশোবার হবে। আপনার চোখের আড়ালে দুজনে হাত ধরাধরি করে একসঙ্গে বেরিয়ে গেল, বেরিয়ে গিয়ে একবাড়িতে একত্র বসবাস করতে লাগল, এ ম্যাডালটারি ছাড়া আর কী। হ্যাঁ, বুঝেছি—ঐ হল, এক বাড়িই এক ঘর, এক বিছানা—শুয়ে শুয়ে চার করতে কোর্টের কখনো ভুল হবে না। তাছাড়া প্রমাণ তো পরের কথা, আপনি আগে মামলা তো ফাইল করে দিন—'

তবু যেন যথেষ্ট ভরসা হতে পারছে না সুবীর। বললে, 'কিন্তু উকিলের ধারণা—'

'রাখুন উকিলের ধারণা! উকিল আমাদের কেস করবে, আমরা উকিলের কেস করব না। দরকার হলে আমরা অন্য উকিল লাগাব। দরকার হলে,' হঠাৎ গলা নামাল হিমাংশু: 'আমি আপনাকে সাক্ষী জোগাড় করে দেব।'

দারুণ উৎসাহিত হল সুবীর: 'সাক্ষী পাওয়া যাবে?'

'বাঘের দুধ পাওয়া যায় আর মামলার সাক্ষী পাওয়া যাবে না? আপনাকে আমি আই, উইটনেস, চোখে-দেখা সাক্ষী এনে দেব—হান্ডরর্ড পারসেন্ট রিলায়েবল উইটনেস।'

'তাহলে আর কথা কী।' সুবীর মড়ে-চড়ে উঠল: 'ত্রিদিববাবুকে গিয়ে তবে বলি, ম্যাডালটারির কেস করুন।'

'নিশ্চয়ই। যে কেসটা প্রত্যক্ষ, ন্যায্য, সেটাই করা উচিত। সেটার মধ্যেই সত্যের সুর বাজে। নইলে, তার বদলে কিনা স্ত্রী-ধন! যে স্ত্রী কলঙ্কিনী তার আবার কেউ ধন চায়?'

কেউ চায় না, সুবীরও না। তাই বলে তার স্ত্রীকে কলঙ্কিনী বলার অধিকার হিমাংশুকে কে দিল? মনে হচ্ছে এ যেন হিমাংশুরই নিজের অপমান, নিজের লাঞ্ছনা। নিজের মোকদ্দমা।

কিন্তু বাঁকা করে কোনো কথা বলে এমন সাধ্য নেই সুবীরের। সম্প্রতি আবার তার চাকরিতে উন্নতি হতে চলেছে। দুশো টাকার লিফ্‌ট!

যেন কী সব অবিশ্বাস্য উত্তেজনার মধ্যে এসে পড়েছে সুবীর। সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে-যেতে তাই চাচ্ছিল ভাবতে। বনছায়ার প্রস্থান, লাবণির প্রবেশ, নতুন করে আবার ঘর বাঁধবার স্বপ্ন। নতুন জীবন ব্যয়সাধ্য হবে বলেই আবার বুঝি সৌভাগ্যের স্পর্শ—চাকরিতে উন্নতি। কত রকমের রোমাঞ্চ। এবার নাটক আদালতের অঙ্গনে। বনছায়া সন্দীপ সেনের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত—তাতে আবার প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য। নাটকের পর নাটক—মামলায় বনছায়ার হার—নিঃশেষ অপসারণ।

ত্রিদিব ব্যানার্জির বাড়ির উদ্দেশে ট্যাক্সি নিল সুবীর।

মামলায় হারের পর আরেক দিক দিয়ে হয়তো জিতবে বনছায়া। সে সন্দীপ সেনকে বিয়ে করবে। সেটা এমন কিছু আশ্চর্যের বা অসহ্যের ব্যাপার নয়। যা আসলে বিঁধছে কাঁটার মত তা হচ্ছে সন্দীপ সেনকে সে সন্তান উপহার দেবে আর সে সন্তান নিশ্চয়ই জীবন্ত সন্তান। শুধু তার বেলায়ই সে এক মৃত সন্তান কামনা করেছে। গোড়া থেকেই সে তার শিশুর উপর বিরূপ, বীতশ্রদ্ধ, তাকে সে তার আনন্দিত অনুভব দিয়ে ঘিরে-

ভিলে শাসন-বর্ষন করেনি, মূলে, দেখতে গেলে, বনছায়াই তার নিজের প্রাণহন্তা। সেই দিক দিয়ে তার উপর কোনো প্রতিশোধ নেওয়া হবেনা এটাই সুবীরের আপশোস থেকে যাবে।

দূর! কোনো জন্ম-মৃত শিশুকে নিয়ে কেউ কখনো সেন্টিমেন্টাল হয়? মন থেকে ও সব শৈশব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিল সুবীর। উকিলের চেম্বারে ঢুকে নমস্কার করে দাঁড়াল।

'এই যে আসুন। বসুন।' ত্রিদিব ব্যানার্জি প্রশান্তিত হল: 'কী ঠিক করলেন?'

'ম্যাডালটারির গ্রাউণ্ডেই সরাসরি ডিভোর্স চাইব।' সুবীর বললে স্থির কণ্ঠে।

'কি, কোনো সাক্ষী পাবেন?'

'পাব।'

'কেমনতরো সাক্ষী?',

'তা এখনো ঠিক জানিনা। বস, মিষ্টার ঘোষ ঠিক করে দেবেন।'

'যদিও দরখাস্তে এডিলেড ডিসক্লোজ করার দরকার হয় না, তবু উকিলের তা জানা উচিত।' ত্রিদিব তার ঠোঁটের কোণে একটু হাসল। প্রশ্ন করল: 'কী মনে হয়, কনটেস্ট করবে?'

'বোধহয় না। ডিভোর্স হলে তো ওরই সুবিধে। ও নাচতে-নাচতে সন্ধীপ সেনকে বিয়ে করে বসবে।'

'কনটেস্ট না করলে অবশ্যি সাক্ষী সাবুদের দরকার পড়বে না, তবু সেদিন বলছিলেন, আঁহাবাজ মেয়ে, কখন কী করে বসে তার ঠিক নেই। তাই,' ত্রিদিব গম্ভীর হল; 'সব আঁটঘাঁট বেঁধেই নামা উচিত।'

'নিশ্চয়ই। যেন না অসাবধানের মার খাই।'

'তবে কটা রেলেভেন্ট ডেট আমাকে দিন, আমি ড্রাফ্ট করি। কাল সকালেই মামলা ফাইল করে দেব।'

'কত খরচ পড়বে?'

মুহুরি খরচের হিসেব দিল। তাতে উকিলের কি পঞ্চাশ টাকা।

'আপনার কি—'

'ও তো কম করে ধরেছি।'

'বস, মিস্টার ঘোষ বলছিলেন আপনার কি ইত্যাদি কার্যের একাউণ্টে ধরা হবে।'

'এটা তো কোনো কার্যের কেস নয়, এটা ইনডিভিডুয়ালের কেস, এটার খরচ একাউণ্টে যাবে কেন? আপনার ডিভোর্সে কার্যের কী ইণ্টারেস্ট?'

কে জানে কী ইণ্টারেস্ট—বস বলেছিল বলেই কথাটা পেড়েছিল সুবীর, নইলে উকিলের পয়েণ্টটা বুঝতে কিছুমাত্র অসুবিধে হলনা। কুণ্ঠিত মুখে বললে, 'তাতো ঠিকই, তবে অত টাকা আজ সঙ্গে নেই।'

'বেশ, কাল সকালে আসবেন।'

সুবীর ফাঁকটা আরো একটু লম্বা করল, বললে, 'আসছে রোববার সকালে আসব। এর মধ্যে সাক্ষীর জোটপাট কী হল না হল তাও জানা যাবে।'

'বেশ, তাই ভালো।'

উকিলের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে সুবীর ভাবল কোথায় যায়। নিজের নির্জন অন্ধকার ঘর ছাড়া আর কিছুই সে ভাবতে পারলনা। চকিতে ঘরের চাবির কথা মনে পড়তেই পকেটে হাত চোকাল সুবীর। দুই চাবি কই? ত্রস্তহাতে এ-পকেট ও-পকেট খুঁজতে লাগল—চাবির রেখা নেই। এখন এত রাতে কী করে কাকে দিয়ে সে চাবি খোলাবে? আগে-আগে আর কোথাও ডুপ্লিকেট চাবির ব্যবস্থা ছিল, তখন এমন পথে বসার মত হত না। এখন কী হবে?

লাবণির ফ্ল্যাটে যাবে? ওরে বাবা, তার পরিবারের লোক সেখানে সুবীরকে পাত্তা দেবে কেন? কে জানে লাবণিই হয়তো তাকে খুঁজতে আসবে আর ঘর বন্ধ দেখে ফিরে যাবে হতাশ হয়ে? অসম্ভব। গায়ের জোরেই দরজা ভেঙে ফেলতে হবে—উপায়ান্তর নেই। নইলে রাত কাটাবে কোথায়। কাল অফিস করবে কী করে?

কিন্তু ভাঙা দরজা ঘরের কোনো সমাধান নয়। তখন আবার মিস্ত্রী ডেকে দরজা মেরামত করো।

একবার ভাঙো আরেকবার মেরামত করো এমনি করেই বুঝি এখন দিন যাবে।

কত অসুবিধের মধ্যে পড়েছে, মামলা, উকিল, সাক্ষী, তারপর খাওয়া দাওয়ার অনিয়মের পর এখন আবার ঘুমের লোকসান। ঘুম ছাই, কাছে-পিঠে কোনো মনিকাননে গিয়ে আশ্রয় নিই, সেখানে মদ মিলবে, ঘুম মিলবে, যদি মন চায় মিলবে অঘুবদ। সংসারে ঘরছাড়া চাবি-হারা মানুষের আর কোথায় এমন আচ্ছাদন?

একটা রিকশা ডেকে উঠতে যাচ্ছে হঠাৎ রুমালের মধ্যে কী একটা শক্ত জিনিস হাতে ঠেকল। এই তো, এই তো চাবি! কত কাছে অথচ কী অপার দূরে, অগম অন্ধকারে চলে গিয়েছে মনে হয়েছিল। রুমালের কুণ্ডলীর মধ্যে ঢাকা পড়েছিল বলেই খুঁজে পাওয়া যায়নি। এখন ফিরে পাবার পর সুবীরের দেহে-মনে স্বাস্থ্য ও সাহস ফিরে এল। ফিরে এল জীবনের আকর্ষণ। সচেতন হল সে একজন সম্ভ্রান্ত অফিসর, তাকে তার গৌরবের মর্যাদাকে সবলে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, নিতে হবে অবমাননার প্রতিশোধ। হ্যাঁ, কোর্টেই যাবে সে উকীল হয়ে, নিজের পকেট থেকেই উকিল পুষবে, যদি লড়াই যায় লড়বে শেষ পর্যন্ত। কোনো অস্ত্রে-শস্ত্রে, করণে-উপকরণে, কোনো পদক্ষেপেই সুবীর পেছপা হবে না।

এতে শুধু বিশ্বাসঘাতকতারই শাসন হবে না, নিজের মুক্তিও নিষ্কণ্টক হবে।

আর ঘরে-বাইরে অমন সর্বহারার মত থাকবার কী হয়েছে? তার সম্পদ কি কম, তার আকাঙ্ক্ষা কি একটুখানি? এমন রিক্ত আকাশ কার যেখানে আশা সাত রঙের রামধনু আঁকে না?

আচ্ছা লাবণি যে বলেছিল ঘরের জন্যে কাজের লোক জোগাড় করে দেবে তার কী হল? আর বস মিস্টার ঘোষ বলেছিলেন সাক্ষী জোগাড় করে দেবেন তারই বা কদ্দুর?

অভিরামকে ডাকাল হিমাংশু।

'তোমার মার খবর কী?'

মা! চমকে উঠল অভিরাম। মার কথা বলছে?

'সেই যে সুবীরবাবুর স্ত্রী—যার ওখানে একদিন কাজ করতে।'

'ও, হ্যাঁ, মা—' চিনতে পারল অভিরাম।

'তার খবর কিছু জানো ?'

'না।'

'তার নতুন বাড়িতে তার একবারও খোঁজ করতে যাওনি ?'

'আমার তো দেকার আর নেই—আপনিই তো ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন—'

'তা তোমার মা-ই তো এখন নিজে ছেড়ে গিয়েছেন। তবু পুরোনো লোক, একটু খোঁজখবর নিতে দোষ কী। তোমাকে দেখলে নিশ্চয়ই খুশি হবেন।'

কী ব্যাপার, কিছু আঁচ করতে পারল না অভিরাম। যার প্রতি সবাই বিরূপ তার খোঁজখবরে কার কী দরকার ? তবু নিরীহ মুখে অভিরাম বললে, 'যদি বলেন তো একবার ঘুরে আসতে পারি।'

'মন্দ কী, একবার দেখে এস না।' হিমাংশুর কণ্ঠে উল্লাস ফুটে উঠল : 'দেখ না নতুন লোকের সঙ্গে কেমন জোট বেঁধেছে। কেমন আবার সুরু করেছে ঝগড়াঝাটি।'

'একদিনের দেখায় অতশত বোঝা যাবেনা।'

'খুব যাবে, একবারের দেখায়ই হবহু সব বুঝে নিতে পারবে। আর, বেশ তো,' হিমাংশু যেন গভীরে কী বিবেচনা করল : 'যদি তোমাকে কাজের লোক হিসেবে কদিন তার বাড়িতে রাখতে চায় তো থেকে যেও, বোলো, আমার আপত্তি নেই।'

অভিরামই আপত্তি তুলল। বললে. 'ওঁরা তো কেউ আমাদের আফিসের লোক নন, আমি কেন ওদের বাড়িতে কাজ করতে যাব ?'

'তা ঠিক বলেছ।' যুক্তিটা হিমাংশু মেনে নিল। বললে, 'ওখানে কাজ করতে হবেনা। তুমি এক নজরে যা দেখে আসবে তাতেই কাজ হবে। 'ওদের ঠিকানাটা জানো তো ?'

'ঠিক বার করে নেব।'

'না, আমার কাছ থেকে জেনে নাও।' একটা কাগজের স্লিপে ঠিকানা লিখে দিল হিমাংশু। বললে, 'দেখবে রাস্তার উপর হলদে রঙের ছোট দোতলা বাড়ি। রোয়াক নেই, রাস্তার উপরেই জানলা। কলিং বেল-টেল নেই বোধহয়, জানলা দিয়ে ভিতরে তাকিয়েই ডাকতে পারো কাউকে।'

'তার জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না। সব দেখে আসব।'

সন্ধের পর যেও—ওদের অফিস থেকে বাড়ি ফেরার সময়টাই ভালো।'

'যেমনি বলবেন, তাই হবে।'

বেশ অনুগত অভিরাম—কথা শুধু শোনে না, কথা বোঝে। যত কিছুর খবর মনে রেখে হিমাংশু ওকে বনছায়ার সংসারে ঢুকিয়েছিল, কিন্তু সে সব খবর উদরে পরিপাক হল—কাজে লাগল না। যদি রাত্রে কোনো নির্জন মুহূর্তে শব্দ শুনে দরজা খুলে তাকে ভিতরে ঢুকতেও দিত অভিরাম, সেই অভিরামই আবার অনিদ্রুক বনছায়ার রক্ষী হয়ে দাঁড়াত। আসলে বনছায়াই যে উদাসীন। সে যদি বশ্যতা দিত তাহলে অভিরামকেই বা কী দরকার। বনছায়ার যে সামান্য কৃতজ্ঞতা পর্যন্ত নেই। নেই সামান্য তোষণের কর্তব্যবোধ।

কদিন পরেই অভিরাম এল খবর নিয়ে। বাড়িতে দেখা করা প্রশস্ত—হিমাংশু সুধীরকেও ঠিক সময়ে হাজির থাকতে বললে।

দরজার ছিটকিনি তুলে দিল হিমাংশু। কে কখন এসে পড়ে কী শুনে ফেলে সাবধান হওয়া ভালো।

এত কী তোড়জোড় লাগতে পারে ভেবে পেলনা অভিরাম।

'তারপর বলো কী দেখলে?'

দেখবার এখন আর কী আছে? বনছায়া এখনো সম্পূর্ণ সেরে ওঠেনি, দুটি আরো বাড়িয়েছে। নিচের তলায়ই থাকে, এখনো প্রায় পুরোপুরি বিশ্রাম। তাই বলে হাঁটাচলা একদম করেন না এমন নয়, তবে এখনো বাইরে বেরুবার ছাড় পাননি। যেটুকু করেন, নিচে ঘরের মধ্যেই করেন।

'উপরে যান না?'

'না। সিঁড়ি ভাঙা বারণ।'

'উপরে যাবার দরকার নেই। উপরই নামতে পারেন নিচে।'

আরো একটু বলবার ছিল, বলা শেষ করল অভিরাম। দুটি মেয়েছেলে বনছায়ার দেখাশোনা করে, একজন ঝাঁদুনি, অন্যজন ঝি বলুন ঝি দাই বলুন দাই। অভিরাম তার কোনো কাজে লাগতে পারে কিনা জিজ্ঞেস করলে বললে তার দরকার হবে না।

'অভিরাম থাকলে যে পাশের বাজারে ঢোল বাজবে। সে যে পক্ষপক্ষের লোক। সে যে সাক্ষী হবে। তা তোমাকে দরজা খুলে দিল কে?'

ঝি খুলে দিল। চেনা লোকের নাম শুনে বনছায়া তাকে ভিতরে আসতে বললে।

'ঘরে ঢুকেই প্রথম নজরে তুমি কী দেখলে?'

'দেখলাম একটা ছোট খাটে মা শুয়ে আছেন আর কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসে সন্দীপবাবু তাঁকে কী একটা লেখা পড়িয়ে শোনাচ্ছেন।'

'বাঃ এতেই হবে, চমৎকার হবে।' সঙ্গে-সঙ্গেই দরজায় ঘা পড়তে হিমাংশু উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল: 'খুলে দাও, নিশ্চয়ই সুধীরবাবু এসেছেন।' আর দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে সুধীরের আবির্ভাব হতেই হিমাংশু উল্লাসের ঢেউ তুলল: 'আপনার মামলায় সাক্ষী চাচ্ছিলেন? এই অভিরামই আপনার সাক্ষী। মোস্ট রিলায়েবল উইটনেস। ও নিজের চোখে দেখে এসেছে।'

সুধীর অভিরামের দিকে তাকাল। দেখল অভিরামের দুই চোখে স্পন্দন নেই।

'দেখে এসেছে বনছায়া আর সন্দীপ সেন একই খাটে কম্প্রোমাইজিং পজিশনে শুয়ে আছে।'

'না, না, অতটা দেখিনি। আমি দেখেছি—কাছাকাছি—'অভিরাম চাইল প্রতিবাদ করতে।

'ঐ, ঐ জড়াজড়ি, লেপটালেপটি—ও একই কথা।' হিমাংশু হেসে উঠল: 'অনুমানে যা সত্য তাই আইনের ভাষায় অবিকল করে প্রকাশ করা। তাই আর ভাবনা নেই,' হিমাংশু সুধীরের দিকে তাকাল: 'উকিলকে বলুন মামলা ডাইল করে দিতে। অভিরাম আই-উইটনেস, অভিরাম সাক্ষ্য দেবে।'

'না, আমি পারব না।' অভিরাম বললে স্থির কণ্ঠে।

'কী পারবে না?' হিমাংশু প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

অভিরাম দু হাত একত্র করল, বললে, 'মাপ করবেন। যার বিরুদ্ধে আমি মিথ্যে সাক্ষী দিতে পারব না।'

ঘরটা এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল। পরে সেটা কাটিয়ে উঠে হিমাংশু বললে, 'তাবি শাস্ত্র আওড়ালে! তোমার কেমনতরো মা, একেবারে সতীত্বের শিরোমণি! নিজের স্বামী ছেড়ে দিয়ে পরপুরুষের বিছানায় গিয়ে শুয়েছেন। তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে পারবেনা! যাও যাও, তোমাকে ছাড়াও ঢের ঢের

সাক্ষী পাওয়া যাবে। ঝি আছে, দাঁদুনি আছে, উপরতলারও চাকর বাকর মিলবে নিশ্চয়ই। এসব মামলায় ঝি-চাকরই তো প্রধান সাক্ষী—'

অভিরাম চলে গেল আর সুবীর যেমন হেঁট হয়ে বসেছিল তেমনি বসে রইল চুপ করে। বনছায়া যতই তার পক্ষ হোক, বিশ্বাসঘাতিনী হোক, হিমাংশু কেন গালাগাল করবে, বিশেষত তার সামনে, তাকেই শুনিয়ে-শুনিয়ে? কিন্তু এর প্রতিবাদের ভাষা সুবীরের অভিধানে নেই।

'কী মদ খাবেন?' কী রকম যেন ঘুম পেয়ে গেল হিমাংশুকে।

এ নৈরাশ্যে মদ ছাড়া আর বন্ধু কে? মুখে বলতে হলনা, সুবীরের চোখই প্রশ্ন হল।

'লাবণির খবর কী?' মদ ঢালতে ঢালতে জিজ্ঞেস করল হিমাংশু।

'কয়েকদিন দেখা নেই। এখানে আসে না?'

'এখানে আসা ছেড়ে দিয়েছে। দেখছি ও আপনার প্রতিই বেশি দুর্বল। যাই বলুন, আপনার কিন্তু খুব প্রেম-ভাগ্য।' ঈর্ষার নয় অভিনন্দনের হাসি হাসল হিমাংশু: 'কিন্তু দেখবেন একটা মেয়েকে বাংলো করেছেন বলে এটাকেও করবেন না।'

'কী যে বলেন!'

'মেয়েটা আসলে গরিব। একটু দেখবেন।' সিগারেট ধরাল হিমাংশু।

দরজায় কেউ টোকা দিল বুঝি। বোধহয় লাবণি এল। উন্মন হয়ে তাকাল সুবীর। না, কেউ নয়। হরজা খোলা।

হরজায় ঘা পড়তেই খুলে দিল বনছায়া। অন্যান্য দিন ঝি খুলে দিত আজ বনছায়া নিজে খুলল।

সামনে মুখে দেখা দিল সন্দীপ। বনছায়ার কপালের কাছেকার চুলগুলি ছুঁয়ে আদর করে বললে, 'আমি বাইরে থেকে দরজায় ঘা দেব, আর ভিতর থেকে আমার আকাঙ্ক্ষিত জন দরজা খুলে দেবে, আমার এ স্বপ্ন সফল এত দিনে।'

বনছায়া হাসি-হাসি মুখে বললে, 'আজ যেন একটু সকাল-সকাল ফিরলে।'

'তুমি ছুটির পর আজ প্রথম অফিস গেলে, কোনো অসুবিধে হল কিনা, তাই তাড়াতাড়ি এলাম তোমার খোঁজ নিতে। কেমন আছ?'

শরীরে ক্লান্তির এতটুকু স্পর্শ নেই, বনছায়া বললে, 'ভালো আছি।'

'বাইরের দুনিয়া কেমন দেখলে?'

'সব আগের মত। শুধু বস, মিস্টার ভৌমিক এক ঝুড়ি ধান্যবাদ উপহার দিলেন। তোমার যেমন কেবল পরামর্শ আর পরামর্শ, ভৌমিকের তেমনি কেবল হিতোপদেশ আর হিতোপদেশ।'

'আমার বুঝি কেবল পরামর্শ?'

'ওরে বাবা, তোমার তো নানারকম বিবেচনা—স্বাস্থ্য, ধৈর্য, শুভবুদ্ধি, দায়িত্ববোধ—আমি অতশত কথা শুনিওনি কোনোদিন। দাঁড়াও না আমি এবার কী শোনাই!'

'না, না, আজ আমি কোনো পরামর্শ নিয়ে আসিনি।' চেয়ারে বসল সন্দীপ। বললে, তিনটি শুভ সংবাদ নিয়ে এসেছি।'

'শুভ সংবাদ!' উজ্জ্বলতর হল বনছায়া।

'এক, বাংলাদেশের সেরা পাবলিশার মার্ডক পাবলিশার্স তোমার উপন্যাস ছাপবে বলে মোটা চেক এডভান্স দিতে চাইছে। দু' একটা ফিল্ম কোম্পানিরও নজর পড়েছে ওদিকে। তোমার ঠিকানা খুঁজছে।'

'তুমি এসব খবর পেলে কোথায়?'

'শীবুর দত্তর কাছ থেকে।'

'তাহলে নিছক গুজব নয়। আর তৃতীয়?'

'সেটা মধুরতম। সুধীর আমাদের বিরুদ্ধে ডিভোর্সের মামলা করেছে।'

'করেছে?' মুহূর্তে অন্ধকার হয়ে গেল বনছায়া। বললে, 'সমন এসেছে?'

'আসেনি এখনো। তবে আসবে শিগগির।'

'আসুক।' বনছায়া গম্ভীর মুখে বললে, 'আমি সে মামলা কনটেস্ট করব।'

[ক্রমশঃ

জার্মানীর এক সঙ্গীত বিদ্যালয়।

গানের মাষ্টার গান শেখাতে এসে একটা নূতন সুর বেহালায় বাজিয়ে শোনালেন, বল্লেন,—এতে নদীর তরঙ্গ কল্লোল শুনতে পেয়েছ তোমরা?

ছাত্রেরা বললে: আজ্ঞে হাঁ, ঠিক যেন কুলু কুলু বয়ে যাচ্ছে নদী।

শুধু একটি ছেলে বললে: নদীতে যখন তুফান জাগে, সে সুর কিন্তু আলাদা।

মাষ্টার মশায় বল্লেন: ঠিক কথা, কিন্তু সে সুর তোলা একটু শক্ত।

ছেলেটি বললে: নদী যখন সাগরে মেশে তখন নদী মোহানায় এক সঙ্গে নদী ও সাগর কথা কয়।

মাষ্টার মশায় বল্লেন: সেটা প্রায় অসম্ভব, অন্তত এখন সংগীতজ্ঞ কেউ আছে কিনা আমি জানি না।

ছেলেটি বল্লে: আমি জানি।

আশ্চর্য্য হয়ে মাষ্টার বলেন: আমি ত কোন দিনই তাকে দেখিনি, তার কথা শুনিও নি।

এই কথা শুনে ছেলেটি বেহালায় তান তুলল। সত্যই ত নদী আর সাগর একসঙ্গে গর্জন করছে।

স্তম্ভিত হয়ে মাষ্টার বিটোফেনের মাথায় হাত রাখলেন।

ফিরে ফিরে চাই

প্রভাত মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

'অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্' যিনি বলেছিলেন তাঁর ওই সব বালাই-এর প্রয়োজন ছিল না, তাঁর আদর্শে কৌপীনবন্তরাই দুনিয়ায় সুখীতম। আমাদের সংসারেও তাই হলো। যতদিন বাবার জ্যেঠামশায় বেকার ছিলেন ততদিন আমার বাবার উপরই সমস্ত সংসারের ভার ছিল। কাকারা সহরে আমাদের সঙ্গেই মানুষ হয়েছিলেন। বড়কাকা বারাকপুরে সরকারী স্কুলে মাস্টারের কাজ পেলেন। বড় ঠাকুরদা মেদিনীপুরে নাড়াজোল এস্টেটের ম্যানেজারের পদ পেলেন। ফলে সবাই চলে গেলেন মেদিনীপুরে। অর্থ এলো সংসারে, অনর্থের সূত্রপাত হলো।

এমন সময়ে বড়কাকা ও মেজকাকার বিবাহের সম্বন্ধ এলো। মেজকাকা তখন বোধহয় স্কুল ছেড়ে মেদিনীপুর কলেজে ঢুকেছেন, সেকালের আদর্শে ছেলেদের বিবাহের বয়স হয়ে গেছে। যে--ঘর থেকে বিবাহের সম্বন্ধ এলো, তাদের বংশে খুঁত ছিল বলে বোধ হয় যৌতুকের অঙ্কটা ভালই পেলেন। অর্থ এলো ঘরে। খুঁতের কথাটা বলি,—বড়কাকার শ্বশুর ছিলেন কৃষ্ণনগরের উকিল ললিত চাটুজ্যে—তিনি বিবাহ করেছিলেন যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের এক কন্যাকে—আর যোগেন্দ্রনাথের পত্নী ছিলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কারের বিধবা কন্যা।

এই চাটুজ্জে-বাড়ির দুই মেয়ের সঙ্গে বিবাহ হলো দুই কাকার। সেই অ-শাস্ত্রীয় বিবাহের জন্য সবাই পণ্ডিত! দুই ভাইয়ের বিবাহ হয় কুইয়ার কাছে কয়া গ্রামে। বাবা বর-কর্তা হয়ে সেখানে যান। দাদা বাড়ির বড় ছেলে বলে বাবার সঙ্গ নেন। দাদার কাছে শুনি রবি ঠাকুরের সুন্দর নৌকোয় নাকি ওঁরা পড়াই নদী পার হয়ে কয়ায় গিয়েছিলেন।

বিবাহের পর দেশে ফিরে এলে আমরা সবাই গ্রামে গেলাম বউভাতে। মনে পড়ছে বড় কাকীমাকে। রঙ কর্সা সুন্দরী ষোলকপরা মেয়ে। মেজকাকীমা শ্যামবর্ণ, দাঁতের দাঁত সামান্য উঁচু, কিন্তু দেখা যায় না। মনে পড়ছে কাকাদের দুখানি ঘরের একটি তক্তপোষের উপর দুই বৌ জড়সড় হয়ে বসে। আমি ওঁদের ভাসুরপো। সুন্দর মুখ ও সম্বন্ধের খাতিরে পরিচয় হতে সময় লাগেনি। মেজোকাকা ও এই কাকীমা যতদিন জীবিত ছিলেন আমরা দূরে চলে গেলেও আমাদের খোঁজ খবর রাখতেন। ওঁদের কন্যা ও তাদের সন্তান সন্ততিদের সঙ্গে দেখা-শোনা হয় মাঝে মাঝে।

আজ ভাবি কাকীমারা যে বয়সে বধূ হয়ে সংসার করতে এসেছিলেন আজ সে বয়সের মেয়েরা স্কুলের ছাত্রী, ফাংশানে নাচে গান আবৃত্তি করে, মিনিস্কার্ট পরে সাইকেলে চড়ে স্কুলে যায় আসে। কাকীমার মেয়ের

মেয়েরা বি. এ পাশ করে মাস্টারি করছে। বিয়ে এখনো হয়নি! কালের কী পরিবর্তন হয়ে গেছে তিন পুরুষের মধ্যে।

অর্থ অনর্থের মূল বলে কাহিনীর সূত্রপাত করেছি। কালে অর্থ বা নগদটাকার বিষক্রিয়া দেখা দিল। বরপণের টাকা ভাগ করে ভোগ করা যায় না তো। তাই স্থির হলো গ্রামের বাড়ি তাঁরা মেরামত করবেন সুতরাং ঘরবাড়ির পার্টিশন হলো। ঘর বাড়ি যা আস্ত ছিল সেসব কাকাদের থাকলো. বাবার ভাগে পড়লো 'সিংহদ্বারে'র পাশের একটি ঘর যা এককালে বৈঠকখানা রূপে নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু তারও দেয়াল চৌচির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাত্র। তাকে মেরামত করে খাড়া রাখা যাবে না তাই সে-ঘরটা ভেঙে ফেলা হয়। ভগ্নস্তূপের মধ্যে বাবা বাড়ির নক্সা করলেন। নূতনে-পুরাতনে মিশিয়ে কাজ সুরু হলো। এটা কাকাদের মা সহ্য করতে পারলেন না। ভেবেছিলেন আমার বাবা শহরেই বাস করবেন। গ্রামের বাকিটুকু আছে আম-কাঁঠালের বাগান, খিড়কীর পুকুর, সব তাঁদেরই ভোগে আসবে। গ্রামে বাস করতে হবে এই আদর্শবাদ নিয়ে বাবা অনেক টাকা নষ্ট করে বেশ বড় বাড়ি নক্সা করলেন।

মনে পড়ছে পুজোর ছুটির সময়ে প্রতিদিন প্রাতে বাবা সকালের ট্রেনে গ্রামে যেতেন, সন্ধ্যায় ফিরতেন। সেখানে তাঁর জ্যেঠিমা কোনদিন দুপুরে খেতেও বলতেন না, মুখ দর্শনও করতেন না। পাড়ার চুহুরী পাড়ার মা উনোন ধরিয়ে, বড়নো মেজে চাল ভাল বেছে ধুয়ে ঠিক করে দিত, বাবা হাঁড়ি চড়িয়ে ডালে চালে আলু সিদ্ধ করে একটু গাওয়া ঘি ও লবণ সংযোগে আহার করতেন।

মাঝে মাঝে বাবার সঙ্গে গিয়েছি বাড়ি তৈরি করা দেখতে। মিস্ত্রীরা সবই মুসলমান-রাখাল বিশ্বাস, নিমাই মণ্ডল, করীম শেখ; মজুর বা মজুরাণী সবই বাঙালী হিন্দু চুহুরের মেয়ে। দোতলার ছাদ পিটানো হচ্ছে। দুটো কলসী মাথায় চাপিয়ে মই বেয়ে উঠে যাচ্ছে। সেরকম স্বাস্থ্যের বাঙালী মেয়ে আজ চোখে পড়েনা কেন? আবহাওয়ার দোষে না আমার চোখের দোষে কে জানে। মনে পড়লো একটা দিনের কথা। বাবার পিসিমা বালবিধবা, ভাইয়ের সংসারে সর্বময় কর্ত্রী। মাঝেমাঝে শহরে এসে থাকতেন বিশেষ করে মা যখন আঁতুড়ে আটকা পড়তেন। আমি ঠাকমার কাছেই শুই। ভোর হলে একটি পয়সা আঁচল থেকে খুলে হাতে দেন, বলেন, 'হাজারি ময়রার দোকান থেকে যা খুশি কিনে খেগে যা।' হাজারি নূতন ময়রার দোকান করেছে। মানিক তাঁতির খুব পসার—তাই খুব সস্তায় খাবার বিক্রী করতো হাজারি ময়রা। একটা পয়সা 'বউনি' করে এক ঠোঙা খাবার কিনে আনতাম। খাওয়া প্রায় শেষ করে অবশিষ্ট কিছু ছুটকে দিয়ে বলতাম খেতে! সেই ঠাকমা গ্রামের বাড়িতে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গিয়েছেন খবর পেয়ে সবাই আমরা ভোরের গাড়ি ধরে বাড়ি যাই। মনে পড়ছে সেই পুরাতন জীর্ণ ঘরের মেঝেতে ঠাকমা পড়ে আছেন। কত ডাকলাম 'ঠাকমা, ঠাকমা' বলে—কোনো সাড়া পেলামনা। আমাদের বলা হলো কানের কাছে 'তারকব্রহ্ম' নাম শোনাতে। শোনালাম নাম। মৃত্যুকে এই প্রথম দেখলাম নিকট থেকে কিন্তু মৃত্যু কি তা জানতাম না। আজও কি জানি—মৃত্যু কি?

দেশের বাড়ি তৈরী হলো। পাঁজি দেখে শুভদিনে গৃহ প্রবেশ করতে চললাম। স্টেশনে নেমে মা পালকি চাপলেন, সঙ্গে বীণা ও ছোটভাই মু। আমরা সব গরুর গাড়িতে চাপলাম। গ্রামের বাড়ির দেউড়িতে এসে দাঁড়ালাম সবাই। মঙ্গলাচরণ হলো। কুমোর পাড়ার গোপালের বউ, পাঁচির মা, চুহুরী পাড়ার সব মেয়ে-বউরা হাজির। আর এসেছিলেন ভাসুর-জ্যেঠার স্ত্রী—আমাদের জেঠিমা। গৃহপ্রবেশের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান তিনিই করালেন। ঘট থেকে গঙ্গাজল ছড়াতে ছড়াতে, শাঁক বাজাতে বাজাতে সবলে

চললেন ঘরের দিকে। সেদিন দেখতে পেলামনা কাকাদের কাউকে। তারা কেউ আসতে পারেন নি মাতৃশাসনে।

গৃহ প্রবেশ উপলক্ষ্যে বাবা নূতন বাড়িতে ভোজের আয়োজন করলেন। মা, বাবা-কাকাদের বাড়ি গিয়ে সবাইকে নিমন্ত্রণ করে এলেন। কিন্তু তাঁরা ভোজে এলেন না। এলো গ্রামের আর সবাই। আমি গেলাম মেজোকাকীমার কাছে: "ওমোলাম, "কাকীমা, তুমিও আসবে না?" ছলছল চোখে বললেন, "তুমি বুঝতে পারবে না, মার নিষেধ, খেতে কি পারি?" সেদিন বুঝি নি, পরে বুঝলাম জাতির মতো শত্রু নেই, প্রতিবেশীর মতো দুষমন নেই!

বড়ঠাকমা তাঁর ঈর্ষাকে চেপে রাখতে পারতেন না, তাই আমাদের বাড়ির পুবদিকে পুকুরে যাবার রাস্তাটা নোঙরা করে রাখতেন লজ্জা-সরমের মাথা খেয়ে। বেশ বোঝা গেল গ্রামে বাস সহজ সুন্দর হবে না।

মা ভাই বোন গ্রামে থাকে—আমরা দুইভাই আর বাবা থাকি শহরের বাসায়। সপ্তাহান্তে শনিবার বিকালে ফিরি—বাবা ফেরেন সন্ধ্যায়। শনিবার হাফ্‌ডে অর্থাৎ দুটোয় ছুটি। আড়াইটায় ট্রেন। তারপর দু'ঘণ্টা পরে গাড়ি। বাবা এসে ঘুরে দাঁড়ান কয়মিনিট আগে, ক্লাস থেকে বের হবার অনুমতি নেই শিক্ষকের কাছ থেকে। তারপর ছুট ছুট। এ গাড়ি যদি 'ফেল' করি—তবে মায়ের কাছে পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। মার কাছে যাবার জন্য কী ব্যগ্রতা ছিল সে বয়সে। স্টেশনে এসে দেখি ট্রেন দাঁড়িয়ে—টিকিট কেটে চলি—দেখি সবাই ইনজিনের সামনে দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে। আমরাও ভাবছি ট্রেনের সামনে দিয়ে রেল পার হবো কি না, ওভার-ব্রিজ দিয়ে যেতে দেরী হলে, যদি ট্রেন ছেড়ে দেয়। লাইনই পার হই! কিন্তু ইনজিন যদি চলতে আরম্ভ করে! অনেক লোক যাচ্ছে লাইন পেরিয়ে তাই তাদের সাথে সাথে চলি।

বাবা আসবেন সন্ধ্যায়। একটা খালি ইনজিন রোজ সন্ধ্যায় কাঁচড়াপাড়ার লোকো শেডে ফিরে যায়। বাবা ড্রাইভারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে তাতে করে আসেন। অন্ধকার হয়ে যায়—অরণ্যময় পথ—সাপ শেয়াল এমনকি বাঘও চলাফেরা করে। 'বাবু' আসছেন না—মা ঘর বার করছেন। বাবা এলে নিশ্চিন্ত হন। সেকালের চাকদহ স্টেশন ও তার আশে পাশের কথা আজ কেউ জানেনা।

গ্রীষ্মকালের লম্বা ছুটিতে আমরা দেশের বাড়িতে থাকি, কাকারা আসেন মেদিনীপুর থেকে। গরমে ছুটির সময় আম কুড়ানো ও আমপাড়ার কথা আজও স্পষ্ট মনে আছে। ঝড় উঠলেই দুইভাই ছুটি বস্তা নিয়ে গিয়ে দেখি ছোটকাকাও হাজির পদা চুহুরীকে নিয়ে। ঝড়ের মধ্যে ছুটোছুটি করে আম কুড়ানোর সুখ—আম শেওড়ার ঝোপ বা শেয়াকুলের কাঁটা গ্রাহ্য করে কে?

আম পাকলে সবাই মিলে পাড়তে চলি। পদা চুহুরী ওঠে গাছে। হাতে তার লম্বা আঁকশি, আঁকশির মাথায় জাল। জালের মধ্যে আমটাকে আটকে আঁকশি টানে, আমটা মাটিতে পড়ে না, জালের মধ্যে থাকে। নিচে আমরা 'তোলা' ধরি বস্তা নিয়ে। সে যে কী উত্তেজনা—তা যারা এই আনন্দ কোলাহলে যোগ দেয়নি জীবনে তাদের হৃদয়ঙ্গম হবে না।

পাড়া আম অফো হলো। চারটে ভাগ করে পদা চুহুরীকে পাড়ানি ভাগ দেওয়া হলো একটা। তারপর একটা ভাগ থেকে আম দুই শরিকের ভাগে গেল। তখন আমরা যে যার ভাগ নিয়ে মহোল্লাসে ঘরে ফিরতাম। নিচের তলায় একটা ঘরে, আম, কাঁঠাল, নারকেল বোঝাই থাকতো। অতো কাঁঠাল

খাবে কে? কালিন্দী গাই পর্যন্ত মুখ ফেরায়। তারও অরুচি কাঁঠালে। কাঁঠালের বিচি শুকিয়ে কলসীতে বালি দিয়ে সংগ্রহ করা থাকতো।

কালিন্দী গাই যেমন 'ধন্যি' তেমনি দুধলো। কথায় বলে যে গরু দুধ দেয়, তার চাই বা লাথি সহ্য হয়। কালিন্দীকে দুইতে পারতো দুটি আর পারতো পালপাড়ার সুবল গোপ। কালিন্দীর মতোই ঝিলকালো পাথরের মত দেহ—সে বাঁকে করে শিউলের খড়ার ভরে দুধ এনে বিক্রী করে।

মেলেরিয়ায় গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে গেছে বহুকাল। জঙ্গলে বড় বড় অট্টালিকাকে গ্রাস করেছে। বট অশ্বত্থ গাছ বাড়ির পাঁজরার মধ্যে প্রবেশ করে শিথিল করে দিচ্ছে ইটের গাঁথনি। বিড়কীর পুকুরের পুবপাড় পেরিয়ে যে ভীষণ জঙ্গল ছিল একদিন তা সাফ করালেন বাবা। শহর থেকে এক ওড়িয়া মালি এলো বট সাথে নিয়ে। পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে তার জন্য ঘর উঠলো। মালির তত্ত্বাবধানে 'বাঙড়' ও 'মুনোরা জঙ্গল হটিয়ে দিলে। নূতন জমি সূর্যের মুখ দেখলো যুগান্ত পরে। অহল্যার ঘুম ভাঙলো! জঙ্গল সাফ হলে দেখা গেল কলম্ব আম-কাঁঠালের গাছ রয়েছে। সেই জমি থেকে সেগুন শেওড়া গাছের গুঁড়ি তুলে দিয়ে তরকারীর বাগান হলো। ছয় গাড়ি ঘুমড়ো বিক্রী করে ৩৬ টাকা পাওয়া গেল। গ্রামে বেশ আছি, মনে হচ্ছে আরামে দিন কাটবে। কিন্তু মেলেরিয়ার প্রকোপ এড়াতে পারা গেল না। খুঁদে খুঁদে মশা কী বিষ যে ঢেলে দিয়ে যেতো মানুষের দেহে কে জানে।

পূজার সময়ে দেশের বাড়িতে আছি, মেলেরিয়ার প্রথম বলি হলো ছোটবোন বীণা। বিজয়া দশমীর দিন আমরা গেছি লালপুর গ্রামে ধনীচাষীর বাড়িতে ঠাকুর দেখতে। গ্রামে টিম্ টিম্ করে পূজো হতো বসু, মিত্র, সিংহদের বাড়ি। নূতন পয়সায় ধনী চাষী খুব জাঁকিয়ে পূজো করছে। বিরাট ঠাকুর তৈরী করিয়েছে—তমলাম। কৃষ্ণনগরের কুমোররা কারিগর। ঠাকুর দেখে ফিরে এসে আমি জ্বরে পড়লাম। —বীণারও জ্বর হলো। কয়েকদিন তার জ্বর বিকার। ভুগে ভুগে আমাদের সবারই সমান হাল—কত যে ভি. গুপ্ত' ও 'গোবিন্দ সুধা' খেয়েছি তার ঠিক নেই। জ্বরটা চাপা পড়তো, ব্যাধিটা সারতো না। কোজাগর পূর্ণিমার রাত। ঘুম ভেঙে দেখি বীণা পাশে নেই। পুবের বারান্দায় যাই—নিঝুম রাতের জ্যোৎস্না বারান্দায় এসে পড়েছে—দেখি এককোনে বীণা শুয়ে। সারারাত ছটফট করেছিল, এখন দেখি সব শান্ত। কাছে যেতেই বুঝি বললে, 'ছুঁয়োনা'। একটু আগে অবশ্যে উঠে বোনের মুখে জল ঢেলে খাইয়েছিলাম—সে এখন নিস্পন্দ, সে এখন অস্পৃশ্য। এতো কাল যাকে কত আদরে ঘরে রেখেছি আজ তাকে গৃহ থেকে চিরবিদায় করার জন্য কী ব্যস্ত।

আজও মনে পড়ে কত কথা তার সম্বন্ধে। প্রায় সত্তর বৎসর সে মারা গেছে—তখন তার বয়স কত? সাত আট বৎসর, তবুও তার সেই মুখটি মনে পড়ে। আমরা দুই ভাই-এর পর বীণা বোন এলো সংসারে, কী ঘটা করেই তার 'ঠুষ্টি' করা হলো। ষষ্ঠিতলা ছিল বাড়ির কাছেই। সেখানে পালকি চড়ে মা গেলেন খুকিকে নিয়ে—আমরা দুইভাই খই, পয়সা, বুরানি ছড়াতে ছড়াতে চলেছি পালকির পাশে পাশে।

বীণা এখন বড় হয়েছে। একদিনের কথা মনে পড়ছে। আমরা দুই ভাইবোন বাইরের ঘরে বাবার টেবিলের পাশে বসে কী একটা ছবি দেখছি। বাড়ির ভিতরে মা আছেন আর কেউ নেই, দাদা ও কাকারা স্কুলে, বাবা কাছারিতে। হঠাৎ ঢাকা দেওয়া টেবিলটা ঘটাৎ করে সরে গেল। চড়কডাঙার মেলায় কেনা মাটির তৈরী হলদে রঙ-করা হরিণের মুণ্ডটা দেয়ালের গায়ে ব্র্যাকেট থেকে পড়ে চুরমার হয়ে গেল। ঝুলন্ত ডিটুমারের আলোটা সবেগে দুলছে কেন? চারদিকে শাঁখের আওয়াজ। বারান্দায়

এলাম—পা কাঁপছে কেন? দীপা আমার হাতটা ধরেছে চেপে। বাড়ির কাছেই থাকে তোনতো খোপা। সে রাস্তা দিয়ে ছুটছে চিৎকার করতে করতে—গেল গেল সব গেল। তাকে ভাল করেই চিনি। কতবার গেছি তার বাড়িতে ভাঁটি খেলতে। কখনো ময়লা কাপড় দিয়ে আসতে। তোনতো সন্ধ্যার সময়ে মদ খেয়ে তার খড়ের ঘরের পিঁড়িতে বসে তালে হাতদিয়ে বেসুরে চিৎকার করে গান করতো। কিন্তু আজ তার কী হলো—পাগল বলো নাকি? ভিতরে গেলাম—দেখি মা উঠোনে বসে মাথায় হাতদিয়ে। দুটি পাশের বাড়ি থেকে এসে গিয়েছে—সে বলে, 'ভূমিকম্প। পাতালে মা বাসুকি কথা বন্ধ করলেন। সহস্র ফণা মা বাসুকির—মাঝে মাঝে এক ফণা থেকে পৃথিবীকে আর এক ফণায় নেন, তখনই ভূমিকম্প হয়। পরে বড় হয়ে জানি ১৩০৫ জ্যৈষ্ঠ ২৩ (১৮৯৭)-এ পূর্বভারতে যে ভূমিকম্প হয়, এটা সেই দিনের ব্যাপার। সেদিন নাটোরে প্রাদেশিক সম্মেলন ভেঙে যায়, রংপুরের জমিদার ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নামতে গিয়ে প্রাণ হারান। এসব কথা কয়দিন পরে 'বেঙ্গলি' দৈনিকে প্রকাশিত হল। বাবা পড়ে শুনছিলেন মার কাছে।

'তামাদি'র সময় বৈঠকখানা ঘরে, বারান্দায় কয়দিন থেকে মক্কেলদের কী ভিড় জমেছে। ঘরের মধ্যে অর্ধেক জুড়ে আছে কাঠের খাট, তার উপর সতরঞ্চ—সেটা ঢাকা চাদরে—চাদর মসিলাঞ্ছিত। একপাশে বসেন দীনু চক্কোত্তি—বাবার মুহুরী। বালক বয়সে আসে বাড়িতে মাসুষীর কাজ করবার জন্য; বাবার বাড়ি বাঙাল, প্রিয়দর্শন ছেলেটির প্রতি মায়া বসে বাবা মা'র সবারই। ভাত ছুটলে চেঁচাতো, 'মা ভাত নামাবো কেমনে? আসেন আসেন।' মা গিয়ে তার সমস্যা পূরণ করে আসতেন। বুদ্ধিবলে কালে মুহুরীর কাজকর্ম শিখে নেয়। মা তার বিয়েও দিয়ে দেন। দেশ থেকে বউ এনে পাশের একটা বাড়িতে বাসা করে থাকেন তিনি। কিন্তু পয়সার মুখ যারা কখনো দেখেনি, তাদের হাতে পয়সা এলে একদল হয় কৃপণ, অর্থগৃধ্নু পিশাচ, আর একদল হয় উড়নচণ্ডী! দীনু চক্কোত্তি এই শেষ দলে। কালে যজমান হয়ে পড়েন। মনে আছে এক একদিন অর্ধরাত্র অবস্থায় বাড়ি ফিরেছেন, আমরা মাথায় জল দিয়ে তার প্রলাপ শমিত করবার চেষ্টা করছি—তেঁতুলের জল এনে মা খাইয়ে দিচ্ছেন। সেই দীনু চক্কোত্তি রোজ সকালে এসে বসেন সেই প্রকাণ্ড ঘরের অর্ধেক জোড়া তক্তপোষের উপর কাঠের একটা বাক্স সামনে করে। সেটা লেখবার ডেস্ক এবং মক্কেলের মূল্যবান কাগজপত্র রাখার আধারও বটে। তামাদির সময়ে কাজের চাপ বেশি, তখন দ্বিতীয় মুহুরী নিযুক্ত হন আশু ঘোষ। তিনি মাদুর পেতে বসেন বারান্দায়। আশুদা বোসপাড়ার ছেলে, নামকরা জোয়ান—হাতগুলো ছিল লোহার মতো কড়া—হাত ভাঁজ করলে পেশীগুলো কী ফুলেই উঠতো। বলতেন কীল ঘুসী মারো। মারতে মারতে আমরাই ক্লান্ত হয়ে পড়তাম। সেই আশুদার ডাক পড়তো তামাদির সময়ে। তামাদি কী তা আজকালকার পাঠকদের বুঝিয়ে বলা দরকার, কারণ যুগ পরিবর্তন হয়ে গেছে। নির্দিষ্ট পর্ব বা সময়কে আরবী ভাষায় বলে 'তমাদী'; সেই পর্বের মধ্যে প্রজা বা রায়তকে জমিদারের বার্ষিক খাজনা দিতে হয়; তিন বৎসর পর্যন্ত তাঁরা খাজনার জন্য অপেক্ষা করেন। তিন বৎসর পার হয়ে গেলে খাজনার দাবী আর জমিদার করতে পারেন না। তাই তিন বৎসর শেষ হবার পূর্বেই অর্থাৎ চৈত্রসংক্রান্তির আগেই জমিদারদের মামলা রুজু করতে হতো বকেয়া খাজনার জন্য।

সেকালে জমিদারদের প্রবল প্রতাপ। তাঁরা গভর্নমেণ্টের ঘরে নির্দিষ্ট দিনে খাজনা পৌঁছিয়ে দিয়ে আসেন। সরকারকে প্রজার ঘরে ঘরে ঘুরে খাজনা আদায় করতে হয় না। সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ

সাহেবরা সকরে বা শিকারে বের হলে যানবাহন, খানা-পিনাদির যাবতীয় ব্যবস্থা তাঁরা করে কৃতার্থ হন। 'স্বদেশী' ছোঁড়ারা গ্রামে আসা-যাওয়া করে কিনা তার খবর রাখে গোমস্তা নায়েবরা। জমিদার সে সব তথ্য সরবরাহ করেন পুলিশ সাহেবের দরবারে। তাই প্রজাদের দিয়ে তাদের অত্যাচার অবিচারের প্রতীকার পেতে দরিদ্রলোকে নাজেহাল হয়ে যেতো। ১৭৯৩ সালে তাদের রাজস্ব চিরকালের মতো ধার্য হয়ে আছে। কিন্তু প্রজার সঙ্গে তাঁরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন না, শস্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে, জমির উন্নতি হয়েছে ইত্যাদি অজুহাতে খাজনা বৃদ্ধি করার অধিকার আইন মতে জমিদারের আছে। জমিদার জমির মালিক, প্রজা সেখানে ভাড়াটিয়া। পাকা বাড়ি করতে পুকুর কাটতে জমিদারের হুকুম চাই এবং সেই হুকুম পেতে হলে দক্ষিণা দিতে হয় মোটা অংকের। জমি হস্তান্তর হলে নূতন দখলীদারকে জমিদার স্বীকারই করবেন না—জমির মূল্যের বেশ বড় অংশ না পেলে। বসত-বাটির উঠোনের ফলন্ত গাছের ফল ভোগ করতে পারে, কিন্তু প্রয়োজন হলে গাছ কাটতে পারবে না। প্রজার কাছ থেকে কত উপায়ে যে বে-আইনী কর বা আওয়াব আদায় হতো তা আজ কল্পনাতীত। হক্ সাহেবের মন্ত্রিত্বকালে বাংলা একটা সাপ্তাহিক প্রকাশিত হতো, তাতে বাংলাদেশের নানাস্থানে ৬৪ প্রকারের আবওয়াবের তালিকা দেখেছিলাম। জমিদারের মেয়ের বিয়ে, ছেলের অন্নপ্রাশন, বাপের শ্রাদ্ধ, এমনকি জমিদারের মোটরগাড়ি কেনার জন্য 'উপরি' কর আদায় করা হতো।

জমিদারদের অত্যাচার দেখেছি শুনেছি কত। পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ জমিদার ছিলেন হিন্দু ব্রাহ্মণ। ময়মনসিংহের নামকরা জমিদার—তাঁর নায়েব ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু-ব্রাহ্মণ। বাল্যকালে রাজার শিক্ষক ছিলেন বলে তাঁর প্রতি অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস। তিনি দেখেন একদিন তাঁর কাছারিতে পাশের গ্রামের এক মুসলমান প্রজা খড়ম পায়ে কাছারিতে এসেছে। মুসলমান হয়ে জুতো বা খড়ম পরে হিন্দু জমিদার কাছারিতে আসবে—এত বড় স্পর্ধা! নায়েবের হুকুম মিঞা-সাহেবকে খড়ম মাথায় করে দাঁড়িয়ে থাকতে হলো।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে নায়েব ও স্থানীয় মুন্সেফবাবু বেড়াতে বেড়াতে সেই মুসলমান গ্রামের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। নায়েবকে দেখেই মুসলমানরা ছুটে এসে ধরলো এবং বললে, 'জুতো মাথায় তোলো।' বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নায়েব হতভম্ব। মুন্সেফবাবু গ্রামের লোকদের কত বোঝালেন, মিনতি করলেন—তারা খড়ম মাথায় তোলার প্রতিশোধ নেবে জুতো মাথায় করিয়ে।

নায়েব সহরে ফিরে গিয়ে জমিদারের সঙ্গে দেখা করে কাজে ইস্তফা দিতে চাইলেন। জমিদারের শিক্ষাগুরু তিনি—কেন কি হয়েছে যে হঠাৎ কাজে ইস্তফা দিতে এসেছেন? ব্যাপারটি শুনে জমিদার হুকুম দিলেন তাঁর একশত হাতীর মাহুতদের—ঐ গ্রাম তছনছ করে দিয়ে এলো। পাইক, লেঠেলরা গেল। পুলিশ সাহেবকেও জানানো হলো দুর্দান্ত প্রজাদের শাসন করা হচ্ছে, থানায় যেন কোনো এজাহার নেওয়া না হয়। এটি শোনা প্রত্যক্ষদর্শী হিন্দুর মুখ থেকে, সত্য মিথ্যা জানি না। তবে নানা জনের মুখ থেকে শুনেছি অকথ্য অত্যাচার করতেন তাঁরা। তাই পার্টিশনের কথা ওঠা মাত্র তাঁরাই সর্বাগ্রে ধনদৌলত নিয়ে দেশত্যাগী হন। তাঁদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলো সাধারণ হিন্দুরা। যাক সে কথা।

জমিদারের বিশাল 'সাম্রাজ্য'—একা সামলাতে পারতেন না—তাই তিনি 'পত্তনী' দিতেন একশ্রেণীর লোকদের—তাঁরা আবার ভাগ করে দিতেন দর-পত্তনীদার মধ্যে—অনেকটা ব্রিটেনের কিউডাল ব্যবস্থার মতো। জমিদার পত্তনীদার দর-পত্তনীদার সে-পত্তনীদার সবাই তাঁর প্রাপ্য অনাদায়ী খাজনার জন্য নালিশ করু

করতেন। বাবার কয়েকটি বাঁধা জমিদার ঘর ছিল। তাঁদের তামাদির সব মামলা তাঁর কাছেই আসে।

তামাদির সময় বাবাকে কী খাটতে দেখতাম। টেবিলের উপর রুপোর টাকা স্তূপ হয়ে উঠছে। মুহুরীরা আজি লিখে বাবার টেবিলে পেশ করছে—বাবা চোখ বুলিয়ে সহি করছেন। মনে পড়ছে রুপোর টাকার কথা বিশেষভাবে, কারণ আজকাল সে পদার্থটা দেখা যায় না। রুপো দিয়ে টাকা গড়া উঠে গিয়েছে। সেকালে রুপোর টাকা তিন রকমের—মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সম্রাজ্ঞী মার্কা Empress of India মাথায় মুকুট। ১৮৭৭ সালে সাম্রাজ্ঞী ঘোষিত হবার পূর্বের টাকা ছিল রুঁটিবাঁধা ভিক্টোরিয়া মহারাণীর মূর্তি, তখন তিনি কুইন, এম্প্রেস্ হন নি। তারও পূর্বের টাকা ছিল ৪র্থ উইলিয়ামের টাক-মাথা মূর্তি। এসব টাকা সবই রুপোর তৈরী, তাই টাকা ভেঙে রুপোর অলঙ্কার করা হতো, বিশেষ করে মেয়েদের মল ও কোমরের গোট। রুপোর টাকা ছাড়া রুপোর আধুলি, সিকি, দুয়ানী ছিল। তখন টাকায় ছিল ৬৪ পয়সা। তাই আধুলির মূল্য ছিল ৩২, সিকির ১৬ ও দুয়ানির ৮ পয়সা, এখনকার মুদ্রার কথা তুলছিনে। পয়সা ছিল তামার, তবল পয়সা বা দুটো পয়সার মুদ্রা ছিল। দুটো আধলা পয়সায় একটা পয়সা হতো। তার নিচে ছিল 'সিকি পয়সা'—বারোটা সিকি পয়সায় এক আনা। কিন্তু বাজারে সিকি পয়সার ব্যবহার দেখতাম না। সেটা দেখতাম দাদা মশায়ের বাসায় যখন তিনি মাইনে পেতেন—বোধহয় সূক্ষ্ম হিসাব করে কিছু 'পাই' পয়সা প্রাপ্য হতো।

এখন তো একটাকা থেকেই কাগজের 'নোট্' চালু দেখা যায়। সেকালে ১০, ৫০, ১০০, ১০০০ টাকার 'নোট্' ছিল। আজ তো এক, দুই, পাঁচ, দশ, একশ টাকার নোট চলছে। রুপোর টাকা দিয়ে বাজারে যে মাল পাওয়া যেতো, তা কি আর কাগজের নোট্ দিয়ে পাওয়া যেতে পারে? প্রথম মহাযুদ্ধের পর পরাজিত জার্মেনীতে এক পেয়ালা চা খেতে হলেও বহু সহস্র মার্ক নোট বের করতে হতো। তারপর একদিন বস্তা বস্তা মার্ক মূল্যের নোট্ কাগজের কলে গেল পাল্প্ তৈরীর জন্ত।

প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর পর্বে মার্ক-এর মূল্য কমে গিয়ে কী অবস্থায় পৌঁছয়, তার দুটো গল্প মনে পড়ছে। যুদ্ধের পূর্বে এক ভদ্রলোকের মাথা খারাপ হওয়ায় তাকে উন্মাদ-আশ্রমে চিকিৎসার জন্ত পাঠানো হয়। সুস্থ হয়ে বেরিয়ে এসেছেন, তখন যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। অপিসে গচ্ছিত সোনার মার্ক কয়েকটা ছিল, তাই নিয়ে পথে এলেন। রাস্তায় ট্যাক্সি ধরে বাড়ি মুখো রওনা হলেন। বাড়ির অদূরে নেমে ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে একটা মার্ক দিলেন। লোকটি 'আমি মার্ক ভাঙিয়ে আনি' বলে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে দেখে একটা ঝুলি, পিঠে বিরাট এক বস্তা নিয়ে আসছে। লোকটি শুধোয়, 'বস্তায় কি আছে?' ড্রাইভার বললে,' আপনার সোনার মার্ক ভাঙিয়ে আনলাম। কয়েক লক্ষ মার্ক। লোকটি ভাবলো আমার মস্তিষ্ক বিকৃতি সারে নি তো নিশ্চয়ই ভুল করছি এসে। আমি ঘরে ফিরে যাব না। ড্রাইভারকে বললে,:'আমাকে আশ্রমে ফিরে নিয়ে চল।'

দুইভাই ছিল। বাপের বিপুল সম্পত্তি পায়। জ্যেষ্ঠ হুশিয়ার—টাকা ব্যাংকে রাখে। যুদ্ধ শেষে ব্যাংকের গচ্ছিত টাকা বহু কোটি টাকা হয়েছিল কিন্তু একদিন সে সব নাকোচ হয়ে গেল—কাগজের কলে নতুন তৈরীর জন্ত বস্তা বস্তা নোট চলে গেল—সে নিঃস্ব হয়ে পথে দাঁড়াল, তার কনিষ্ঠ ভাই সমস্ত টাকা মদ খেয়ে উড়িয়ে দিল, যুদ্ধ শেষে মদের বোতল বিক্রী করে নূতন টাকা এতো পেলো যে, তাতে তার খাতাভাব হলো না।

(ক্রমশঃ)

আবার সেই জেল

দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(ছয়)

আপত্তি জানালেন সবাই। যাকে বলে ঘোরতর আপত্তি।

দমদম জেলের সরকারী বাড়ীতে বিনে ভাড়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে হাত পা মেলে থাকবার সুযোগ পাবার পর কেন আর পড়ে থাকবেন এই দুখানা পায়রার খোপে ভাড়া দিয়ে? টাকা বাঁচবে, আরাম পাবেন, তবু কেন মাসখানেক পর যাবেন?

যদুবাবু বললেন, কি আছে মশাই, এই চণ্ডীতলায় আকর্ষণ? একটিমাত্র সরকারী বাস, তাও কখন যাবে আসবে, ভগবান জানেন। একটুখানি বৃষ্টি হল ত হাঁটু সমান জল। ট্রামডিপো প্রায় এক মাইল। ট্যাক্সিকে টাকা বেশী দিলেও আসতে চায় না। বেশী বর্ষা হলে টালিগঞ্জ পোলের নীচে সমুদ্র! কে থাকে মশাই এই টালিগঞ্জে, এই চণ্ডীতলায়?

কথাটা সম্পূর্ণ সত্য। চণ্ডীতলা বাসের অযোগ্য জেনেও কিন্তু এইখানেই দশটি বছর কাটিয়ে দিলাম সেই ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হবার অব্যবহিত পর থেকে। আগে এই অঞ্চলে ছিল বিস্তীর্ণ জলাভূমি, ধান চাষ হত। তারপর চুকল বাদুর কোম্পানী। বাটি ফেলে জলাভূমি উঁচু করা হল, ছোট ছোট প্লটে ভাগ করে জমি বিক্রি করা হল। কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের সুযোগ পেয়ে মধ্যবিত্তেরাই জমি কিনতে লাগলেন এবং তাঁদের মধ্যে প্রায়ই পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু। সামান্য টাকা আনতে পেরেছিলেন, বাড়ী করতেই সে টাকা শেষ। বসবাসের চাইতে ভাড়া দেয়াই ছিল আসল উদ্দেশ্য। তাই একটি বাড়ীরও ছিরি-ছাঁদ নেই। সারি সারি পায়রার খোপের মত ঘর, রান্নার ব্যবস্থা টানা বারান্দায়। বাড়ীওয়ালাও থাকেন এবং অন্য সব পরিবারের মত তাঁরও কোন আব্রু নেই। জল নিয়ে, কথা নিয়ে, কখনও কখনও বিনা কারণেই ঝগড়া লেগেই আছে। কাঁচা রাস্তা, রাস্তার পাশে কাঁচা ড্রেন, কিন্তু সেই

মরলা জল গিয়ে যে কোথায় পড়ছে, তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। কেউ নালী কেটে ছেড়ে দিয়েছেন কোন খালি প্লটের ওপর, কেউ নামিয়ে দিয়েছেন কোন এঁদো ডোবায়। রাস্তার ড্রেন ছাপিয়ে কোন কোন বাড়ীর প্রবেশ-পথই বারোমাস প্যাচপেচে কাদায় ভর্তি থাকে, ইটের ওপর দিয়ে যাতায়াত করতে হয়।

সেই সময় অকস্মাৎ চণ্ডীতলা ছাড়তে হয়েছিল।

ভেবেছিলাম, বাঁচা গেল। আর ও নরকে ফিরে যাব না।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে এক বন্ধুর বাড়ীতে পেয়িংগেষ্ট হয়ে একক জীবন খারাপ লাগছিল না। পুত্রকন্যা নিয়ে স্ত্রী ছিল গিরিডিতে তার মেজদার কাছে। আমি চাকরি করতাম কলকাতা কর্পোরেশনের ইলেকশন ডিপার্টমেন্টে।

কিন্তু বছরখানেক যেতে না যেতেই সংসারের তাগিদে আবার 'বাসা' করতে হল এবং সুবিধে মত অন্য কোথাও স্থান না পেয়ে আবার এই চণ্ডীতলাতেই এসে উঠলাম। উঠলাম চণ্ডীতলার উত্তরাংশে বড়ুয়া রোলিং মিলের পাশেই একখানা বাড়ীতে। তখন কর্পোরেশন ছেড়ে দিয়ে সিনেমায় ঢুকেছি। সুশীল মজুমদারের পরিচালনায় 'রাত্রির তপস্যা' ছবি তৈরী হচ্ছে, আমি সহকারী পরিচালক। কাছেই ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিয়োতে স্যুটিং চলছে, যাতায়াতে খুব সুবিধে।

দেখতে পেলাম, গত এক বছরে চণ্ডীতলার অনেক উন্নতি হয়েছে। অনেক বাড়ী উঠে গেছে, অনেক উঠছে। মাটির রাস্তায় খোয়া পড়েছে। শুনলাম, শীগগিরই পীচও দেয়া হবে। বড় রাস্তা থেকে ইলেকট্রিক পোষ্ট অনেকখানি ঢুকে পড়েছে। অনেক বাড়ীতে লাইট জ্বলছে। এঁদো ডোবাগুলো ভরাট করা হচ্ছে। পাড়ার মধ্যে দুচারটে দোকানও খোলা হয়েছে।

দক্ষিণাংশে একটা ভাল বাড়ীর সন্ধান পেয়ে সেখানে উঠে গেলাম।

চণ্ডীতলায় তখন অনেক লোক। অনেক ছেলেমেয়ে। সুতরাং ফুটবল এসে গেল, মণিমেলা স্থাপিত হল, বারোয়ারী দুর্গাপুজো আরম্ভ হল, নাটকের দলও সুরু হয়ে গেল।

এর কিছুদিন পর সত্যিই রাস্তায় পীচ পড়ল, কাঁচা ড্রেন পাকা হল, লাইট-পোষ্টে রাস্তাগুলো ছেয়ে গেল, টেলিফোনের তারও দেখা যেতে লাগল, আধুনিক ফ্যাশানের বাড়ী তৈরী হতে লাগল, বাড়ীর সম্মুখে বিলিতি ফুলের বাগান, গ্যারেজে ঝকঝকে মোটর গাড়ী, দরজা জানালায় ঝকঝকে পরদা, গেটে কুকরী-আঁটা নেপালী দারোয়ান।

জড়িয়ে পড়লাম চণ্ডীতলার সঙ্গে।

নানারকম সংস্থার সঙ্গে স্থাপিত হল 'উদয়ন ক্লাব'। উদ্দেশ্য ছেলেদের লেখাপড়া ও খেলাধুলায় উৎসাহদান, আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন ও সমাজসেবা। না, এর মধ্যে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না। আসতে বা আনতে মানা ছিল। গঠনতন্ত্রে অতি স্পষ্ট করে এর উল্লেখ ছিল। আর সে গঠনতন্ত্রের প্রধান রচয়িতা ছিলাম আমি।

উদয়ন ক্লাব নিয়ে মেতে গেলাম। এক বাড়ীওয়ালা খানিকটে জায়গা ছেড়ে দিলেন, ক্লাবের নিজস্ব ঘর তৈরী হল। নিজস্ব লাইব্রেরী, 'জ্ঞানতীর্থ।' নিজস্ব হাতবা চিকিৎসালয়ে একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার বিনামূল্যে ওষুধ দিতে লাগলেন। অবৈতনিক প্রাথমিক বৈশ বিদ্যালয় খোলা হল।

কর্পোরেশন অফিসার আমাদের ক্লাব পরিদর্শন করে লাইব্রেরীর জন্য আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করে দিলেন। আর ক্লাব গৃহের সম্মুখেই একটা টিউবওয়েল বসিয়ে দিলেন।

যে বাড়ীতে ছিলাম, সেখানে থাকা আর সম্ভব হলনা। বিরাট তিন তলা বাড়ী, অনেক ভাড়াটে। কিন্তু অনেকেই নিয়মিত ভাড়া দেন না। মাড়োয়ারী বাড়ীওয়ালা প্রতি মাসে বড়বাজার থেকে এসে শূন্য হাতে ফিরে যান। তাই নিয়ে অনেক অশান্তির সৃষ্টি হল। অবশেষে আমরা উঠে গেলাম আরও দক্ষিণে একখানা দোতলা বাড়ীর নীচের তলায়। সেখানে আরও দুঘর ভাড়াটে।

অবশেষে সে বাড়ীও ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছি আজকের বাড়ীতে। সারা নীচের তলাটা আমাদের। হোক না ছোট দুখানা শোবার ঘর, তবু পৃথক রান্নাঘর, নিজস্ব টিউবওয়েল। প্রাণ খুলে কথা কওয়া যায়, হাসা যায়, ইচ্ছে করলে গানও করা যায়।

আমার সুখ ফ্ল্যাটে আমি সম্রাট!

আমাদের বাড়ীর উলটো দিকের বাড়ীতে থাকেন বরদা বাবু। একদা ছিলেন নাথ ব্যাঙ্কের অফিসার। কুমিল্লায় অফিস ছিল। দেশ বিভাগের পর চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় চলে এসেছেন, ব্যবসা করেন। আমার বড় ছেলের নাম বাবুল, তাঁর বড় ছেলের নামও তাই। সুতরাং বাবুলের সঙ্গে বাবুলের বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তারপর বন্ধুত্ব হল তাঁর ছোট মেয়ে মুনুর সঙ্গে আমার ছোট মেয়ে মুক্তুর। তারপর ওঁর মেজো ছেলে সমীরের সঙ্গে আমার ছোট ছেলে বেবুলের। ওঁর বড় মেয়ে মালবিকা আমার বড় মেয়ে বুলুর 'প্রিয় মালবিকাদি' হয়ে গেল। ছেলেমেয়েদের বন্ধুত্বের উত্তাপে দুই বাড়ীর গিন্নী দুজনও উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন এবং অনেক নিরালা দুপুরে প্রথমে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, তারপর ঘেঁষাঘেঁষি বসে এবং তারপর পাশাপাশি শুয়ে মনের কথা বলাবলি করে একে অপরের অভিন্ন হৃদয় বান্ধবী হয়ে গেলেন।

অবশেষে, একদিন ঘোরালো বন্ধুত্বের পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে আমি গিয়ে হাজির হলাম বরদাবাবুর বাড়ীতে, সোজা বললাম, আপনার সঙ্গে মশাই, বন্ধুত্ব করতে এসেছি।

বরদাবাবু জুড়ে দিলেন, 'কারণ ছেলে মেয়ে আর গিন্নি দুজন অবস্থা যা করে তুলেছে, এখন আমরা যদি বন্ধুত্ব না করি, তাহলে কোনঠাসা হয়ে পড়ব।'

এমনি করে চণ্ডীতলার কতজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। শহরের সেই ওজন-করা ভদ্রতা আমরা মানি না। একে অপরের খোঁজখবরই যে শুধু নিয়ে থাকি, তাই নয়, আমরা একে অপরের দুঃখে কাঁদি, অপরের সুখে আনন্দ পাই। পাশের বাড়ীতে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে আমার রেডিও বন্ধ থাকে। কারুর পাশের খবর এলে সে বাড়ীতে ভোজ লেগে যায়।

উদয়ন ক্লাব-ঘরে পাড়ার মুরুব্বিদের সভা বসে। সভার সিদ্ধান্ত মানাবার জন্য কোনো আইনের চোখ রাঙানির প্রয়োজন হয় না।

আমরা যেন একটা আদর্শ উপনিবেশ স্থাপন করেছি।

আমরা চণ্ডীতলার। চণ্ডীতলা আমাদের।

তথাপি, দীর্ঘ দশ বছরের স্মৃতিবিজড়িত চণ্ডীতলা একদিন চিরকালের জন্য ছাড়তে হল।

রজনীবাবু অবসর গ্রহণের মাত্র সাত দিন পূর্বে এসে উঠলাম দমদম জেলের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্টের সরকারী বাসভবনের দোতলায়।

রজনীবাবু এই কয়েক দিনের জন্য নীচের তলায় নেমে গেছেন।

বাড়ীটা শুধু বিরাট নয়, বিশাল। বাড়ী নয়, অট্টালিকা। সবই তার বিরাট। যেমন দোতলায় কাঠের সিঁড়ি দিয়ে এক সঙ্গে পাশাপাশি পাঁচজন নামতে পারে, তেমনি প্রায় দুটো-মানুষ-সমান উঁচু জানালা আর দরজা। বিরাট ঢাকা বারান্দা, তারপর বিরাট দুটি হল, একটির পর একটি। দ্বিতীয় হলটির দুপাশে বিরাট দুটি কক্ষ, তার যে কোন একটার মধ্যে আমাদের চণ্ডীতলার পুরো ফ্লাটটাই ঢুকিয়ে দেয়া যেতে পারে। তারপরেও ফাঁকা থাকবে। এক-একটি হল-এ অনায়াসে স্টেজ বেঁধে একটা জলসা করা যেতে পারে এবং শ'খানেক দর্শককে বসতে দেয়া যেতে পারে।

জেলের নাম দমদম জেল হলে কি হবে, স্থানটির ইংরেজী নাম দমদম ক্যান্টনমেন্ট আর বাংলা নাম 'দমদমা'। শোনা যায়, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে এই বাড়ি ও একই ধরণের তৈরী জেলের সিপাইদের ব্যারাকে থাকত গোরা সৈন্যদল ও তাদের অফিসাররা। এখানকার দুটি বাড়ী সে যুগে একখানা গোটা বাড়ী ছিল। তারপর সৈন্য দলের কোনো অফিসারকে পৃথক বাড়ী দেবার জন্য গোটা বাড়ীটার মাঝখানের কতকাংশ ভেঙে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়েছে। সেই নিশ্চিহ্ন করা স্থানে এখন তৈরী করা হয়েছে দুটি লম্বা লম্বা এ্যাসবেসটসের ছাউনি-দেয়া শেড সিপাইদের থাকবার জন্য। সিপাইদের ব্যারাকগুলোকে জেলীয় ভাষায় বলা হয়, 'সারধ।' সেই সামরিক অফিসারের বাড়ীখানাই এখন ডেপুটি সুপারের কোয়ার্টার্স।

নীচে উঁচু রেলিং দিয়ে ঘেরা বেশ বড় প্রাঙ্গন। একপাশে বড় বাবুর্চি ও মশলচিদের জন্য কোয়ার্টার্স, অপর প্রান্তে প্রশস্ত এ্যাসবেসটস-শেড্-এর গোয়াল ঘর। অর্থাৎ রজনীবাবুর গরুবাছুরদের কোয়ার্টার্স। এই গোয়াল ভবনেই এখনও বাস করছেন তাঁরা, যাঁরা রজনীবাবুর পরিবেশিত ব্রেকফাষ্ট না পেলেই ব্যা-ব্যা করে সারা পাড়া মাথায় করেন।

অথচ, আশেপাশে পাড়ার চিহ্নমাত্র নেই। পূবে সিপাইদের ব্যারাক, পশ্চিমে অবলাকান্ত সাহার রেলিং-ঘেরা মাঠ, উত্তরেও ছোট মাঠ আর দক্ষিণে জেলের সিপাইদের প্যারেড গ্রাউণ্ড ও ফুটবল খেলার মাঠ। পশ্চিমে অদূরে মিউনিসিপ্যালিটির প্রস্তুতি সদন, তারপরই প্রকাণ্ড দীঘি।

চণ্ডীতলার জমজমাট সাম্রাজ্য ছেড়ে এই ফাঁকা মাঠে এসে আস্তানা পেতে মনে হতে লাগল যেন হস্তকারণ্যে নির্বাসিত হলাম!

সরকারী চাকরি ত ১৯৫৩ সাল থেকেই করছি। তবে দু বছর যে চাকরি করেছি, সেটা ছোট, ভাড়াটে বাড়ীতে থেকে ট্রাম বাসে ঝুলতে ঝুলতে অফিসে যেতে হত। আর এটা বড় চাকরি। বিনা ভাড়ায় সরকারী ভবনে অবস্থান এবং ইউনিফরম পরিহিত বডিগার্ডগণ সট সট করে যেতে হবে মাত্র দু সো গজ ঘুরে অফিসে। তারপর একবারেই সেনট্রাল জেলের ডেপুটি সুপার!

সুতরাং, আমি যতখানি খুশী হলাম, আমার আত্মীয় পরিজন পুলকিত হয়ে উঠলেন তার চাইতে হাজার গুণ বেশী। কলকাতা ও অন্যত্র থেকে অভিনন্দন জানাতে অনেকেই আসতে লাগলেন এবং শুধু চা ও খাবার দিয়েই কৃতজ্ঞতার পালা শেষ করতে পারলাম না, দু এক বেলা তাঁরা খাবার টেবিলও মুখরিত

করতে লাগলেন। কোন কোন দল দিকদিক করবার এমন সোভনীয় স্পটের আকর্ষণ এড়াতে পারলেন না। যাঁরা একবার এলেন, তাঁরা আমাদের এসে আমায় অনুগৃহীত করবার উদাত্ত প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন।

বীরেন বাবুর দূর সম্পর্কীয় ভাইয়ের মেয়ে সাবিত্রী হরহম রেল-ষ্টেশনের ওপারে সুভাষ নগরে শ্বশুর বাড়ী থেকে একদিন সকালবেলা গোটা চারেক আত্মীয়াকে হাটিয়ে ও একটি কয়েক মাসের শিশুকে কোলে নিয়ে এসে হাজির। সিঁড়িতে থাকতেই চীৎকার করে ডাকল, অ বৌদি, বৌদি কনে গেলে গো? দাদার কাছে খবর পালাম তুমি এখানে আইছ, তাই শুনে কদিনের জন্য ছুটোতে আলাম।

বীরেন বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও পরিচয় চণ্ডীতলায়। তেমনি পরিচয় হয়েছিল ওখানকার অনেকের সঙ্গেই। কিন্তু তাঁর দূর সম্পর্কীয় বোন সাবিত্রীর সঙ্গে আমার দেখাই হয় নি। না হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, কারণ প্রথমতঃ, সাবিত্রী দূর সম্পর্কীয়, দ্বিতীয়তঃ, সে বিবাহিত, তৃতীয়তঃ, সে থাকে তার শ্বশুর বাড়ী হরহমের সুভাষ নগরে। এর মধ্যে কবে চণ্ডীতলায় দাদার ওখানে গিয়ে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করে একেবারে বৌদি-ভাজ সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলেছিল, গুরুত্বপূর্ণ সেই সংবাদটি আমার জানা ছিল না। তাই খবরই রাখিনি যে, সাবিত্রী নামে আমার একটি প্রিয় বোন শ্বশুর বাড়ীতে ভীষণ জ্বালায় জলে পুড়ে খাক হয়ে অধীর আগ্রহে দিন গুণছিল কবে তার প্রিয় দাদাটি হরহম জেলের ডেপুটি সুপার হয়ে আসবে আর সে সপুত্রকন্যা তার বাড়ীতে এসে দিন কয়েক 'জুড়োয়ে' যেতে পারবে!

সরলবলে বোনটির আগমনে আমি হাঁ হয়ে গেলে কি হয়, তার বৌদিকে কলিনোসের দাঁত বেঁচিয়ে বেরিয়ে এসে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে হল।

আর একদিন এলেন আমার মেজ শ্যালিকার মামা-শ্বশুরের বিধবা কন্যা একজন বান্ধবীসহ। আসছেন পাঁতরাপাহি থেকে। ট্রেনে, তারপর বাসে। শ্যালিকার মুখে শুনে থাকবেন আমার এই 'রাজকীয়' চাকরির কথা।

ওঁরা জানতেন, জেলখানায় জেলারই ত সবার বড়, তাহলে নিশ্চয়ই আমি জেলার হয়েছি। জেল গেটে জিজ্ঞেস করেছেন, সিপাই গেটের ওপরে জেলারের বাড়ীর সিঁড়ি দেখিয়ে দিয়েছে।

কলিং বেলের বোতাম দেখতে না পেয়ে তাঁরা প্রথমটা দরজায় কড়া নেড়েছেন, পরে অসহিষ্ণু হয়ে, এত নিকট-জনের বাড়ীতে সঙ্কোচ দেখানো যোরতর অন্যায় সিদ্ধান্ত করে সোজা ঢুকে পড়েছিলেন। সম্মুখেই যে মহিলাটিকে দেখতে পেলেন, তিনি ত আদৌ আত্মেয়ীছি নন। কিন্তু তাতে ঘাবড়ালেন না, মহিলাটিকে পাশ কাটিয়ে ওঁরা গট গট করে একেবারে শয়নকক্ষে গিয়ে হাজির হলেন। জেলার নিবারণ সেন সুদি পরে দি-প্রহরে একটুখানি নিদ্রার উদ্যোগ করছিলেন, ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, ওঁরা কপাল কোঁচকালেন, না, ইনি ত দাদাবাবু নন। তবে?

ঘটনা শুনে নিবারণ সেন সবিনয়ে নিবেদন করলেন যে, তিনিই জেলার।

বিশ্বাসই করলেন না ওঁরা, বললেন, তাইলে কি আপনে কইতে চান যে, আমরা মিছা কথা কইছি? তিনি নয়া চাকরি পাইছেন, অ্যালায় হইছেন, আছিলেন টালিগঞ্জের চণ্ডীতলায়, আমি কত গেছি তেইনগো বাড়ীতে, শোনলাম, কয়েকদিন হইল উইটা আইছেন সরকারী বাড়ীতে—

নিবারণ সেন মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি বোধহয় মিঃ গাঙ্গুলীর কথা বলছেন—

হ, হ, আমার দাদাবাবু দ্বিজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী—

তিনি জেলার নন, ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট, নিবারণ বাবু জানালা দিয়ে আমার বাড়ী দেখিয়ে দিয়েছেন, ঐটে তাঁর বাড়ী।

পল্লীবের বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিয়ে কৃতার্থ করবার জন্ত যাঁরা কষ্ট করে মিছিল করে আসতে লাগলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই সাবিত্রীর মত কয়েকদিন 'ঝুড়োয়ে' যেতে লাগলেন।

এদিকে আমাদের প্রাণান্তকর অবস্থা। আর কিছুতে না ঠেকলেও এই নিদারুণ মশার হাতে অত বিছানা ও মশারী কোথায় পাব? অবশেষে অনেক বিবার পর নীচের তলায় অনুরোধ পাঠানো হল, যদি থাকে। ওমা, তৎক্ষণাৎ এসে গেল তোষক, চাদর, বালিশ, মশারী এবং, প্রত্যেকটি জিনিষ আনকোরা নতুন, ব্যবহারই হয়নি। রজনীবাবু বলে পাঠালেন প্রয়োজন হলে আরও কয়েক প্রস্থ দিতে পারেন।

এত জিনিষ কেন তৈরী করিয়ে রেখেছেন, যা ব্যবহারে লাগছে না, ঠিক বুঝতে পারলাম না।

আমাদের নিজেদের জিনিষগুলো প্রোলিটারিয়েট মার্কা। ছিলাম ছুটি কবুতরের খোপে, এসে পড়েছি বিশাল অট্টালিকায়। চৌকি, মাদুর, পুরোনো বিছানাপত্র যেন লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়াল। সেগুলো একটুখানি ঢাকাঢুকি দেবার জন্ত প্রথমেই জেল থেকে কিনে ফেললাম বিরাট বিরাট দরজা জানালার বিরাট পরদা।

আত্রেয়ী ঠাট্টা করল, বুদ্ধিটা মন্দ বার করনি, আগেই ঢাকনা; ঢাকনার পরিপাট্য। কি ঢাকা পড়ল, তা চট করে চোখে পড়বে না! আজকালকার বইয়ের মত, সবার আগে মলাট। মলাটেই এ্যাট্রাক্টোক্যাপী!

অকস্মাৎ এল মর্মান্তিক ঘটনা!

আমি সবার আগে বেশ ভোরেই উঠে থাকি। উঠে বিরাট বারান্দায় মর্নিংওয়াক করি বলা যায়। আত্রেয়ী ও ছেলেমেয়েরা ওঠে কিছুক্ষণ পর। সেদিন পায়চারী করবার সময় অকস্মাৎ আমার অর্ডারলি লালমণি রায়ের হাঁকডাক শুনতে পেলাম নীচে। ব্যাপার কি? অত চেঁচাচ্ছে কেন?

নীচে নেমে এলাম। দেখলাম, রজনীবাবুও সাইরের পরিচর্যা ফেলে চলে এসেছেন। উত্তেজিত কণ্ঠে লালমণি বলল, হুজৌর, রাইফেলকা সোলীসে শান্ত্রী চুনীলাল খুন হইয়ে গেছে।

খুন হয়ে গেছে? কে খুন করল? কখন খুন করল?

সে সব কিছু জানে না লালমণি। শুধু শুনে এসেছে, রাত তিনটে থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত চুনীলালের সেনট্রি ডিউটি ছিল। গেটের বাইরে কাছাকাছি একটা গুমটিতে সেনট্রি পাহারা থাকে। সেই গুমটির মধ্যে কে তাকে খুন করে গেছে। সেখানেই মরে পড়ে আছে সে, রাইফেলটা পাশে পড়ে আছে। পুলিসকে খবর দেওয়া হয়েছে, বড় সাহেব তি আ গিয়া।

এ যে সাংঘাতিক কথা। সশস্ত্র বন্দুকধারীকে খুন!

পোষাকটা পরে বেরিয়ে পড়লাম। রজনীবাবুও পেছন পেছন এলেন।

গিয়ে দেখি, সুপারিনটেনডেন্ট বন্দুবরাবও এসে গেছেন। চারিদিকে অনেক সিপাই। থানা থেকে কেউ তখনও এসে পৌছোয়নি।

জেল গেটের বাইরে সেনট্রি বক্স। সর্বক্ষণ সেখানে বন্দুকধারী সিপাই পাহারা থাকে। দু'ঘণ্টা করে ডিউটি। চুনীলাল মুখোপাধ্যায়ের ডিউটি ছিল রাত তিনটে থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত। রাত্রে গেটের ভিতরেও একজন বন্দুকধারী সিপাই পাহারা থাকে। তাছাড়া আরও দুজন সিপাই।

রাত প্রায় চারটের সময় হঠাৎ গেটের সিপাই হুসেন বন্দুকের আওয়াজ পায়। আওয়াজ পেয়েই

সে বন্দুক বাগিয়ে গেটের কাছে এসে বাইরে তাকায়। নাঃ, কাউকেই ত দেখা যাচ্ছে না। তবে আওয়াজ এল কোত্থেকে কার বন্দুক থেকে? দ্বিতীয় বন্দুক ত চুনীলালের কাছে। সে ডাকল, চুনীলাল।

কোন উত্তর নেই।

আবারও ডাকল খগেন, চুনীলাল!

কোন সাড়া নেই।

সন্দেহ হল খগেনের।—তাহলে কি বাইরে থেকে কেউ চুপিচুপি এসে সেনট্রি বক্স-এ কোন রকম হামলা করেছে?

জেলের ভেতরে রাউণ্ড দিচ্ছিল জমাদার সীতারাম সিং। গেটের সিপাইরা তাকে ডাকল।

সীতারাম গেট খুলে সেনট্রি গুমটিতে চুনীলালকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল না, ছুটে গেল, গুমটিতে গিয়ে দেখল, চুনীলাল মেঝের পড়ে রয়েছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে, রাইফেলটা পড়ে রয়েছে। চীৎকার করে ডাকল সে রিজার্ভ সিপাইদের। চীফ হেড ওয়ার্ডারকে ডাকল।

ছুটে এল সবাই।

তৎক্ষণাৎ সুপারের বাড়ীতে খবর পাঠানো হল, আরেকজন ছুটল ডাক্তারের কাছে, আরেকজন থানায়। জেলারের কাছে গেল একজন।

দেখলাম, চুনীলাল চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছে। বিরাট চেহারা; ছয় ফুটের কাছাকাছি হবে। যেমন কর্সা, তেমনি মুখের গড়ন। পুরো ইউনিফরম পরা। বুট, পট্টি, শর্ট, গলাবন্ধ কোট, বেল্ট, পাগড়ী, বুকের ওপর লম্বমান ব্যাণ্ডোলিয়ার, তাতে আঁটা রয়েছে কুড়িটি বাকশট কার্তুজ। না, কুড়িটি নয়, উনিশটি। একটি কার্তুজ ব্যবহার করে সে আত্মহত্যা করেছে। বুকের ওপর কোটে একটি ছিদ্র দেখা যাচ্ছে।

মজুমদার বললেন, লাশ যেমন আছে, তেমনি থাকুক। পুলিশ এসে যা করবার, করবে। ওর বাড়ীর ঠিকানা জানা থাকলে খবর পাঠাও। আর লাশ গার্ড দাও।

হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল, বুক পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বেরিয়ে রয়েছে। চীফ হেড ওয়ার্ডারকে ওটা আলগোছে বার করতে বললেন।

এক চিলতে চিঠি, পেন্সিলে লেখা, যারা চেনে, তারা দেখে বলল, এ লেখা চুনীলালের।

লেখা রয়েছে, 'মোরা, আমার মৃত্যুর জন্য তোমাকে দায়ী করছি না। তোমার বাবাকে না, ভগবানকে না, কাউকে না। কিন্তু এর পর আমার বেঁচে থেকে লাভ কি বলতে পার?' নীচে নিজের নাম লেখেনি চুনীলাল।

মজুমদারের মুখ গম্ভীর হল, বললেন, ওটা পকেটেই রেখে দাও।

কিন্তু এ যে দেখছি, একটি উপন্যাস!

চুনীলালের সহকর্মিদের কাছে খোঁজ নিলাম।

জেলের কাছেই একটি ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানার অনেক এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান অফিসারের বাড়ী। মোরা তাঁর রূপসী যুবতী কন্যা। চুনীলালের সঙ্গে তার ভালবাসা হয়েছিল। শুধু চিঠি লেখালেখি নয়, গোপনে ওদের দেখা সাক্ষাৎও চলত। চুনীলাল বি. এ. ক্লাশ পর্যন্ত পড়েছিল, সুতরাং ওদের আলাপ আলোচনায় অসুবিধে হত না। আর মোরা ভাল বাংলা পড়তে না পারলেও সহজ বাংলা বুঝতে পারত, ঠেকে ঠেকে বলতে পারত।

সহকর্মী সিপাইরা বার বার বারণ করেছিল চুনীলালকে, বামন হয়ে চাঁদের আশা করলে শেষটায় পস্তাতে হবে।

কর্ণপাত করেনি সে, কারণ দুজনেই তখন পাগল হয়ে উঠেছে।

নোরা একদিন বলল সে নাকি তার মাকে জানিয়েছে। প্রথমটা ঘোর আপত্তি জানালেও পরে সম্মতি দিয়ে যা বলেছেন নোরার বাবার মত ছাড়া এ বিয়ে হতে পারে না।

নোরা চুনীলালকে লিখেছিল তার বাবার সঙ্গে কথা বলতে।

গিয়েছিল চুনীলাল মাসখানেক আগে।

নোরার বাবা ওকে শুধু খাতিরটাই করে আপমানই করেননি দারোয়ান দিয়ে বার করে দিয়েছেন।

এবং দিন সাতেক আগে তাঁদের মনোনীত পাত্রের সঙ্গে নোরার বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। নোরা স্বামীর কাছে চলে গেছে।

সহকর্মী সিপাইরা বলল, বোধহয় তার, সেই দুঃখেই—

যা ভেবেছিলাম, চমৎকার একটি উপন্যাসের প্লট। কোটাল পুত্র হয়ে রাজকন্যার সঙ্গে প্রেম করতে যাবার শোচনীয় পরিণতি!

কিন্তু উপন্যাস ত আর কোন আজগুবি ও অসম্ভব ঘটনার বিবরণ নয়। যা দেখেছি, দেখছি, ঘটেছে বা ঘটছে, উপন্যাসে চিত্রিত হয় তারই প্রতিচ্ছবি।

কিন্তু চাকরি করতে এসে কয়েক দিনের মধ্যেই আবার বাড়ীর এত কাছে উপন্যাসসুলভ একটি শোচনীয় ঘটনায় মনটা কেমন যেন খারাপ হয়ে গেল।

একটি সম্ভাবনাময় জীবন কেমন সহজেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল!

মনে হতে লাগল চুনীলালের মা বাবার কথা!

[ক্রমশঃ

জীবন-নাট্যের খণ্ডচিত্র

শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ

অনাথ উপাধ্যায়

তাঁর দীর্ঘ জীবনে বহু মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ। ছোট বড়, ধনী নির্ধন, অভিজাত, গ্রাম্য—সকল শ্রেণীর মানুষ! শহরে বা শান্তিনিকেতনে যখন থাকতেন তখন হয়ত ইচ্ছামত গ্রামের বা সাধারণ 'জনগণ' মানুষদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেতেন না। কিন্তু শিলাইদহে যখন ছিলেন তখন সে বাধা ছিল না। গ্রামের পথে বেড়াতেন, যে খুশী এসে আলাপ করত। আর মানব-দরদী রবীন্দ্রনাথ প্রাণখুলে তাদের সঙ্গে আলাপ করতেন, যতখানি সম্ভব তাদের অভাব বা দুঃখ মোচন করতেন। শিলাইদহে তাঁর বর্ণ-সমুজ্জ্বল জীবন-নাট্যের একটি বিশেষ দিক উদ্ঘাটিত।

একবার শিলাইদহে থাকাকালে তিনি একদিন বিকালে একটি নতুন রাস্তা কেমন তৈরী হয়েছে তাই দেখতে দেখতে খানিকটা পথে এগিয়ে গেছেন, সঙ্গে কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মচারী আছেন, এমন সময় একজন বিচিত্র ধরণের মানুষ এসে তাঁর সামনে দাঁড়ালো। সে এক আধ-পাগল গোছের মানুষ, সেই গাঁয়ে থাকে, লোকে তাকে বলে লালা পাগলা।

কর্মচারীরা হাঁ হাঁ করে উঠলেন, কিন্তু লোকটা বাধা না মেনে রবীন্দ্রনাথের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললে, হুজুর সেলাম।

রবীন্দ্রনাথ কথা বলতে বলতে চলেছিলেন, তেমন লক্ষ্য করেন নি, তাই দেখে লোকটা আর একবার সেই ভাবে সেলাম করে বললে, হুজুর, আমি পাগল বলে আমার সেলামটা নিলেন না! আমি কি হুজুরের পেরজা নই?

রবীন্দ্রনাথ তার কথা শুনে চমকিত হলেন, সহাস্যে বললেন বেশ, বেশ, তুমি বুঝি আমার প্রজা! তা তোমার সঙ্গে তো আগে আলাপ হয়নি। চল, তোমার সঙ্গে গল্প করতে করতে যাই।

আমলারা তো অবাক, বিব্রত! কোথাকার কে এক ট্যানাপরা পাগল, সে কি না বাবুমশায়ের সঙ্গে সঙ্গে চলল, আর তাঁরা পড়ে রইলেন পিছনে।

চলতে চলতে লালা পাগলা বাবুমশায়ের সঙ্গে খুব গল্প জুড়ে দিলে। ছড়া কাটতে লাগল। ছড়ার পর ছড়া কেটে বললে, হুজুর, লোকে বলে আমি নাকি পাগল, যারা আমায় পাগল বলে তারা সব ছাগল।

এই বলে হি হি করে তার সে কী হাসি!

হুজুর, একটা ছড়া বলি শুনুন—

হুজুর গো, আমি হচ্ছি এক পাগল
আমায় দেখে গাঁয়ের লোকের মাথায় ধরে গোল!

তার ছড়া শুনে রবীন্দ্রনাথ প্রাণ খুলে হাসতে লাগলেন। কিন্তু আমলাদের মুখ অন্ধকার। লালা উৎসাহিত হয়ে বললে, হুজুর, আমি অনেক রকম ছড়া জানি, নিরিবিলি পেলে হুজুরকে শোনাবো।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, বেশ তো কাল সকালে এসো, তোমার ছড়া আমি শুনবো।

পরদিন সকালেই লাল পাগলা রবীন্দ্রনাথের বোটের কাছে এসে হাজির। তার কাঁধে একটা প্রকাণ্ড আখ। রবীন্দ্রনাথ তখন বোটের ছাদে বসেছিলেন, লালা বললে, হুজুরের দেবার জন্যে এই বোম্বাই গাণ্ডারী এনেছি! ভারী মিষ্টি খেতে হুজুর।

এই বলে আখটা বোটের উপর রাখল।

রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, তোমার পদ্য শোনাও।

লালা অমনি হাত জোড় করে শুরু করল—

সত্যি কথা হুজুর
আমি আপনার মুজুর।
পাকা বাড়ি ঘরে
মিথ্যে কথা কবো কেমন করে?
হুজুর বিনে সবাই খেতায় মরে।

পর পর অনেকগুলো ছড়া শোনাল লালা, তারপর বললে, হুজুর, নালিশ আছে।

নালিশ! কিসের নালিশ!

লালা বললে, ভারী জোর শীত পড়েছে। বড্ড কষ্ট হচ্ছে! একটা কাপড় পেলে গায়ে দিয়ে বাঁচি।

রবীন্দ্রনাথ তাকে একখানা র‍্যাপ দেবার হুকুম দিলেন। সেই কম্বল পেয়ে লালার সে কী অট্টহাস্য আর উদ্দাম নৃত্য।

কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথ তার অবস্থা জেনে নিয়েছেন। বাড়ির লোক তাকে মারধর করে, খেতে দেয় না। তিনি বোটের লোকদের হুকুম দিলেন, লালা যেদিন বোটের কাছে আসবে সেদিন যেন তাকে খেতে দেওয়া হয়।

তারপর থেকে লালা প্রায়ই আসতে লাগল। একদিন দিব্যি করে বললে, হুজুর, মরে গেলেও আমি আর গাঁজা খাবো না। আপনি যখন মানা করেছেন।

সত্যিই রবীন্দ্রনাথের কথায় লালা গাঁজা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল এবং বছর খানেকের মধ্যে ভাল হোয়ে গিছল। তারপর অনেকদিন সে বেঁচে ছিল, অনেক ছড়া বানিয়েছিল। তার ছড়া সেকালে গোয়ালা রাখালরা গাইত। একটা ছড়া বহুদিন পর্যন্ত লোকে মুখে মুখে ফিরেছে!

আমার হুজুর জমিদার
নাই তুলনা তাঁর।
তাঁর মুখখানি হয় চাঁদের নাগাল
হাত দুটি সোনার।

* * * *

শিলাইদহের সদর কাছারী বাড়ীতে বাৎসরিক পুণ্যাহ অনুষ্ঠানে ছিল এক বিরাট আড়ম্বরপূর্ণ ব্যাপার। এই উপলক্ষে কীর্তন, যাত্রা, লাঠিখেলা, কুস্তি, দরিদ্রনারায়ণ সেবা, প্রজাদের ভোজ, ইত্যাদি নানা

আয়োজন হোত চারদিন ধরে। জমিদার বাবু স্বয়ং পুণ্যাহ সভায় বসতেন। সেই উপলক্ষে সদর কাছারীর একতলার প্রকাণ্ড হলঘর সুন্দর করে সাজানো হত।

পুণ্যাহ সভায় প্রজাদের পদমর্যাদা এবং জাতি ধর্ম হিসাবে বিভিন্ন রকমের আসনের ব্যবস্থা থাকতো। হিন্দুরা একধারে, তার মধ্যে ব্রাহ্মণরা পৃথকভাবে, মুসলমানরা অন্যধারে পৃথকভাবে পৃথক আসনে, সম্ভ্রান্ত প্রজারা আর সদর মফঃস্বল কাছারীর কর্মচারীরাও নিজের নিজের অধিস্তন অনুসারে আলাদা আলাদা আসনে বসতেন। আচার্য, রাজ পুরোহিত, গ্রহাচার্য, পুণ্যাহবাচকদের জন্যে পৃথক পৃথক নির্দিষ্ট আসন থাকতো।

রবীন্দ্রনাথের তখন যুবা বয়স। সবেমাত্র জমিদারী দেখাশোনার ভার পেয়েছেন। সেই প্রথম তিনি পুণ্যাহ উপলক্ষে শিলাইদহে এসেছেন।

প্রকাণ্ড পালকিতে চড়ে তরুণ জমিদার পুণ্যাহ সভায় এলেন। তিনি আসার সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের আওয়াজ হল, সানাই বাজতে শুরু করল, প্রজারা জয়ধ্বনি করল, মেয়েরা শাঁখ বাজালো, হুলুধ্বনি দিল।

অভিষেকের আয়োজন প্রস্তুত। পুষ্পমালা, চন্দন, পূজার উপকরণ। রাজপুরোহিত মন্ত্রপাঠ করে জমিদারকে অর্চনা করবেন।

কিন্তু একী! জমিদার তো তাঁর আসনে গিয়ে বসছেন না! তিনি যেন স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। অদূরে ভেলভেট-মোড়া সিংহাসনের কাছে না গিয়ে তিনি দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন। প্রকাণ্ড হলঘর বহুলোকের সমাগমে সমগম করেছে। সবাই দাঁড়িয়ে আছে—জমিদারের বসবার অপেক্ষায়।

জমিদারের গম্ভীর ভাব দেখে সবাই অবাক! ম্যানেজার ও আমলারা মহা চিন্তিত হলেন। কী ত্রুটি ঘটল, কী অপরাধ হল, যার জন্যে জমিদারবাবু ক্ষুব্ধ হয়েছেন, আসনে গিয়ে বসছেন না! কী হল! একটু পরে সদর নায়েব, অর্থাৎ ম্যানেজার, রবীন্দ্রনাথের সামনে গিয়ে জোড় হাতে তাঁকে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, নায়েব মশাই, একী ব্যাপার। পুণ্যাহ সভায় এত হরেক রকম বসবার ব্যবস্থা কেন? মানুষের বসবার জন্যে এত বিভিন্ন রকম আয়োজন কেন?

বিস্মিত হোয়ে নায়েব বললেন, এখানে পুণ্যাহ সভায় এইরকম ব্যবস্থাই তো চিরকাল চলে আসছে, হুজুর! জমিদারীর নায়েব এবং অন্য কর্মচারীরা, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, সূত্র, চাষী, সদ্গোপ, বিভিন্ন জাতের জন্যে, সম্ভ্রান্ত এবং সাধারণ প্রজাদের জন্যে, মুসলমান প্রজাদের জন্যে, সব মর্যাদা অনুসারে আলাদা আলাদা বসবার ব্যবস্থা তো নতুন নয়, এ এখানকার চির প্রচলিত প্রথা।

ব্যথিত কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ বললেন, এমন একটা শুভ উৎসবেও আমাদের মিলনে এত বাধা, এত ব্যবধান থাকবে কেন। দেখুন, আমার অনুরোধ, এই সব হরেকরকম আসন উঠিয়ে দিন। আজকের দিনে এই উৎসবে আমরা সবাই একাসনে বসব। সেটাই হবে আজকের এই শুভ অনুষ্ঠানের সার্থকতা।

রবীন্দ্রনাথের কথা শুনে সবাই বিস্ময়ে হতবাক। একী বলছেন তরুণ জমিদার! নায়েব অত সহজে হবার পাত্র নন, বললেন, এটা হচ্ছে জমিদারীর একটা বিশেষ আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা। এখানে সবাই এক সঙ্গে বসবে কি করে? এই প্রাচীন রীতি তো বদলাবার উপায় নেই।

রবীন্দ্রনাথ ঘাড় নেড়ে বললেন, তাহলে আমিও বসব না। এটা হবার নয়, এটা আমাদের সকলকার মিলন সভা। আমি বলছি, এসব আসন তুলে দিন।

এদিকে পুণ্যাহের শুভক্ষণ এসে পড়েছে। সদর নায়েব পুনরায় বললেন, হুজুর, তা হওয়া সম্ভব নয়। আপনি দয়া করে আসন গ্রহণ করুন। লগ্ন বয়ে যায়।

স্থিরকণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ বললেন, না, আমি বসব না। এমন একটা উৎসবে কখনই এত বড় বিভেদ সৃষ্টি হোতে দেব না। সাধারণ প্রজারা আজ কি অপমান সইবার জন্যে এই শুভ অনুষ্ঠানে এসেছে! আমরা সবাই আজ এক। সরিয়ে নিন, সব সমান একাসন করে দিন। এই আমার হুকুম।

নায়েব মাথা নীচু করে সরে গেলেন। অন্য সব আমলারাও গম্ভীর! হঠাৎ শুরু জমিদারের একী বিচিত্র খেয়াল! জমিদারীর সম্ভ্রম যে যায়!

চারিদিক তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথ কণ্ঠস্বর চড়িয়ে প্রজাদের সম্বোধন করে বললেন, আজ এমন একটা উৎসবের দিনেও কি আমরা একত্র মিলিত হবার সুযোগ হারাবো, দূরে দূরে বসে থাকবো। না, তা হবে না। আমরা সবাই এক আসনে বসব, কাছাকাছি বসব, কোন বিভেদ থাকবে না আমাদের মধ্যে। তোমরা আমার কথা শোন। সরিয়ে নাও এই সব চেয়ার, সরিয়ে নাও রাজ-সিংহাসন। এসো, আমরা সবাই আজ এক আসনে বসে আলাপ পরিচয় করি, উৎসব করি। এসো, সব সরিয়ে নাও।

তারপর যেন ভোজবাজী ঘটে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই হল ঘরের চেয়ার চৌকী ইত্যাদি সরিয়ে নেওয়া হল। সমস্ত হলঘর জুড়ে প্রকাণ্ড ফরাস পাতা হল। কেবল জমিদার বাবুর জন্যে মাঝখানে জরি ও ভেলভেটের কাজকরা একটি গালিচা এবং তাকিয়া দেওয়া হল।

রবীন্দ্রনাথ সবার আগে গিয়ে বললেন। উচ্চহাস্যে হলঘর মুখরিত করে বললেন, কী আনন্দ বলতো এখন! এসো, বস সবাই, আসুন নায়েব মশাই আসুন।

তখন প্রজাদের সে কী উল্লাস আর জয়ধ্বনি! পুণ্যাহ উৎসব সুসম্পন্ন হল! ছোট বড় সকল প্রজা নির্বিশেষে সবাই যেন সম্মোহিত, অভিভূত! একী দেবমূর্তি তাদের মাঝখানে! একী অনির্বচনীয় দেবদুর্লভ কণ্ঠস্বর! তারা যেন আজ সাক্ষাৎ দেবতার দর্শন পেল।

সেইদিন থেকে পুণ্যাহ সভায় জাতিভেদের ব্যবস্থা উঠে গেল। সেইদিন থেকে পুণ্যাহ সভায় আর চেয়ার, সিংহাসন পাতা হয়নি, আলাদা আসনেরও ব্যবস্থা হয়নি, সেইদিন থেকে প্রবর্তন হয়েছে প্রকাণ্ড ফরাসের আর জমিদার বাবুর জন্যে গালিচা ও তাকিয়ার! এই ব্যবস্থাই শেষ দিন পর্যন্ত বলবৎ ছিল।

• • • •

"ঐক্য ও সাম্যের দ্বারাই নিখিল মানবের মুক্তিকল্পে তার কল্যাণের পথ প্রশস্ত করতে হবে।"

— রবীন্দ্রনাথ

যে কাহিনী চিরকালের

আনন্দমঠ : বঙ্কিমচন্দ্র

শুভম রায়

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বহু অবিস্মরণীয় সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে "আনন্দ মঠ" নিজস্ব বৈশিষ্টে একক্ষেত্রেই দ্বিতীয়। এই উপন্যাসে মানুষের মনে দেশাত্মবোধ জাগাতে, মানুষকে মহৎ প্রেরনায় উদ্বীপ্ত করতে বঙ্কিমচন্দ্র যে মহত্তম রচনা শৈলীর স্বাক্ষর রেখেছেন তা বাংলা সাহিত্যে তুলনাহীন। আনন্দমঠের "বন্দে মাতরম" আজ ভারতের অন্যতম জাতীয় সংগীত। বন্দেমাতরম কণ্ঠে নিয়ে বাংলার বহু বিপ্লবী বীর শহীদ হয়েছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের মূলমন্ত্র ছিল এই "বন্দেমাতরম"। এই মন্ত্রমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিল একদিন আসমুদ্র হিমাচলের প্রতিটি ভারতবাসী।

॥ এক ॥

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বাংলাদেশের ইতিহাসে চিরকালের জন্যে স্মরণীয় হয়ে আছে। ১১৭৬ সালে এই মন্বন্তর ঘটেছিল এবং তাতে হাজার হাজার মানুষ না খেতে পেয়ে প্রাণ হারিয়েছিল। বহু গ্রাম অরণ্যে পরিণত হয়েছিল। দেশের দিকে দিকে বুককাটা হাহাকার উঠেছিল।

পদচিহ্ন গ্রামের ধনী জমিদার মহেন্দ্র সিংহ। কিন্তু এই ভীষণ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে তিনিও আজ নিঃসহায়। বাড়ীতে আত্মীয় স্বজন যারা ছিল তারা কতক মারা গেছে। অবশিষ্ট সকলে পালিয়েছে। ঝি-চাকর সব চলে গেছে। বিরাট বাড়ির মধ্যে তিনি তাঁর স্ত্রী কল্যাণী এবং শিশুকন্যা সুকুমারী ছাড়া আর কেউ নেই।

মহেন্দ্র ভাবছিলেন, অতঃপর কি করা যায়?

স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলেন অবস্থা যে রকম দাঁড়িয়েছে তাতে গ্রাম ছেড়ে রাজধানীতে না গেলে প্রাণ বাঁচানো যাবেনা।

পরদিন স্ত্রী কন্যার হাত ধরে মহেন্দ্র বেরিয়ে পড়লেন। সঙ্গে নিলেন কিছু টাকা এবং বন্দুক ও গুলিবারুদ। কল্যাণী সঙ্গে নিলেন একটি ছোট বিষের কৌটো—বিপদের সময় নারীর শেষ আশ্রয়।

সন্ধ্যার আগে তাঁরা একটি চটিতে গিয়ে পৌঁছোলেন।

কিন্তু চটি শূন্য। লোকজন কেউ নেই।

মহেন্দ্র স্ত্রীকে বললেন, তুমি একটু সাহস করে মেয়েকে নিয়ে থাকো, আমি দুধের জোগাড় দেখি। দুধ না পেলে মেয়েটা মারা যাবে।

মহেন্দ্র বেরিয়ে গেলেন।

একা একা কল্যাণীর বড় ভয় করতে লাগল।

দরজা জানলা বন্ধ করবেন তার উপায় নেই। কোন দরজা জানলারই কপাট নেই।

কিছুক্ষণ কাটল।

তারপর সভয়ে কল্যাণী দেখলেন, দালানের দরজার দিকটায় কার ছায়া মূর্তি!

দেখতে দেখতে একে একে অনেকগুলো প্রেতের মতো মানুষ ঘরে ঢুকে তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল। কল্যাণী ভয়ে মূর্ছিতা হলেন। তখন সেই কালো মূর্তিগুলো তাঁকে এবং সুকুমারীকে তুলে নিয়ে বনের মধ্যে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে মহেন্দ্র দুধ নিয়ে ফিরে এলেন। কিন্তু কোথায় কল্যাণী? কোথায় সুকুমারী?

এদিকে সেই দস্যুরা বনের এক স্থানে গিয়ে কল্যাণী ও সুকুমারীকে নামাল। কল্যাণীর কাছে যেসব গয়নাগাঁটি ছিল, সেগুলো তারা আগেই কেড়ে নিয়েছিল। এখন সেগুলোর ভাগ বাঁটোয়ারা করতে বসল।

একজন ডাকাত একটা গয়না নিয়ে সর্দারের গায়ে ছুঁড়ে মেরে বললে, সোনারূপো নিয়ে কি করব? খিদেয় প্রাণ যায়। চাল দাও। খেতে দাও।

তখন অন্য সকলেও সেই সুরে চেঁচাতে লাগল এবং ক্ষেপে উঠে সর্দারকে প্রহার করতে শুরু করল। ঘায়ের চোটে অনাহারক্লিষ্ট দলপতি মরে গেল।

একজন ডাকাত বললে, শেয়াল কুকুরের মাংস খেয়েছি, এসো সবাই আজ এই ব্যাটাকে খাই।

আর একজন বললে, বুড়োর মাংস খেয়ে কি হবে? তার চেয়ে এসো ঐ কচি মেয়েটাকে পুড়িয়ে খাই!

তার কথায় অন্য সবাই আনন্দে হাততালি দিয়ে বলে উঠল, বহুকালী! আজ নরমাংস খাব।

কিন্তু কোথায় সেই শিশু বা তার মা? তারা নেই।

ডাকাতরা যখন নিজেদের মধ্যে ঝগড়া মারামারি করছিল তখন সেই সুযোগে কল্যাণী মেয়েকে নিয়ে সেখান থেকে পালিয়েছিলেন।

কিন্তু অন্ধকার অপরিচিত পথে বেশিদূর যেতে পারলেন না। পদে পদে হোঁচট খেতে লাগলেন।

পিছনে "ধর, ধর" শব্দ। ডাকাতরা ছুটে আসছে।

কল্যাণী হতাশ হয়ে মেয়েকে কোলে নিয়ে একটা গাছের তলায় বসে পড়ে ভগবানকে ডাকতে লাগলেন।

হঠাৎ দূর থেকে যেন স্বর্গীয় সঙ্গীতের সুর ভেসে এলো—"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।

আশ্চর্যের মতো চোখ মেলে কল্যাণী দেখলেন, তাঁর সামনে শুভ্রকান্তি শুভ্রকেশ এক ঋষিমূর্তি।

তাঁকে প্রণাম করতে গিয়ে আবার চেতনা হারালেন।

জ্ঞান হবার পর কল্যাণী দেখলেন, তিনি একটি পাতা ঘরের মধ্যে রয়েছেন। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে সেই দেবকান্তি মহাপুরুষ।

মহাপুরুষ বললেন, মা, এ দেবতার ঠাঁই। ভয় কোরো না। মেয়েকে কিছু খাওয়াও। নিজে কিছু খাও।

কল্যাণী সুকুমারীকে দুধ খাওয়ালেন। কিন্তু নিজে কিছু খেলেন না। শুধু কলসী থেকে জল

নিয়ে মহাপুরুষের পায়ে ঠেকিয়ে পান করে বললেন, বাবা, এই আমি অমৃত পান করলাম। স্বামীর খবর না পাওয়া পর্যন্ত আর কিছু খাবো না।

মহাপুরুষ কল্যাণীকে আশ্বস্ত করে মহেন্দ্র সিংহের সন্ধানে বেরোলেন।

॥ দুই ॥

চটিতে স্ত্রী-কন্যাকে না পেয়ে মহেন্দ্র নগরাভিমুখে অগ্রসর হলেন।

স্থির করলেন সেখানে গিয়ে রাজকর্মচারীদের সাহায্যে স্ত্রী-কন্যার খোঁজ করবেন।

কিছুদূর পথ চলার পর মহেন্দ্র দেখলেন, কতকগুলি গরুরগাড়ি চলেছে। সঙ্গে প্রায় পঞ্চাশজন সশস্ত্র সেপাই।

তাদের জিজ্ঞাসা করে জানলেন, তারা খাজনার টাকা নিয়ে চলেছে।

ইংরেজ তখন বাংলার দেওয়ান। তারা এইভাবে নানা জায়গা থেকে খাজনা আদায় করে কলকাতায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছিল।

মহেন্দ্রকে দেখে এবং তাঁর কথা শুনে সেপাইরা ভাবল, তিনি একজন ডাকাত।

তারা তাঁকে বেঁধে গরুর গাড়িতে তুললো। স্ত্রী-কন্যার শোকে মহেন্দ্র অত্যন্ত কাতর হোয়ে পড়েছিলেন। তাই বিশেষ বাধা দিতে পারলেন না। নিরুপায় হোয়ে নির্জীবের মতো গাড়ির মধ্যে পড়ে রইলেন।

কিছুদূর গিয়ে সিপাইরা দেখল, পথের উপর একজন গেরুয়াধারী লোক। তারা ভাবল এও একজন ডাকাত। তাকেও ধরে হাত পা বেঁধে তারা গাড়িতে উঠিয়ে মহেন্দ্র সিংহের পাশে ঠেলে দিলে।

গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীর নাম ভবানন্দ, মহাপুরুষের নির্দেশে তিনি মহেন্দ্রকে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন।

গাড়ি চলতে লাগল। একসময় ভবানন্দ মহেন্দ্রের কানে কানে বললেন, মহেন্দ্র সিংহ, তোমাকে আমি চিনি। তোমাকে সাহায্য করবার জন্যেই এসেছি। যা বলি সাবধানে তাই কর। তোমার হাতের বাঁধনটা চাকার ওপর রাখ।

বিস্মিত মহেন্দ্র সন্ন্যাসীর কথামত কাজ করলেন। চাকার ঘর্ষণে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দড়ির বাঁধন কেটে গেল।

সন্ন্যাসীও সেইভাবে নিজের বন্ধন কেটে ফেললেন।

গাড়িগুলো তখন একটা পাহাড়ের পাশ দিয়ে জঙ্গলের রাস্তা ধরে যাচ্ছিল।

কিছুক্ষণ কাটল। তারপর হঠাৎ 'হরি হরি' ধ্বনি শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে দু'শো অস্ত্রধারী লোক ছুটে এসে গাড়িগুলোকে ঘিরে ফেলল।

যুদ্ধ বেধে গেল। হঠাৎ সেপাইদের সাহেব সৈন্যাধ্যক্ষ তরবারির আঘাতে প্রাণ হারালো। তাই দেখে সেপাইরা প্রাণভয়ে রণে ভঙ্গ দিলে। খাজনার টাকা ভর্তি থলেগুলো নিয়ে সেই দু'শো লোক মুহূর্তের মধ্যে যেন মিলিয়ে গেল।

অনতিদূরে দাঁড়িয়ে বিস্মিত অন্তরে মহেন্দ্র এই কাণ্ড দেখলেন। ভাবলেন এরা সব ডাকাত।

ভবানন্দ তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, এইবার আমার সঙ্গে চল। তোমার স্ত্রী-কন্যাকে দেখতে পাবে।

দু'জনে নীরবে পথ চলতে লাগলেন।

আকাশ জ্যোৎস্নায় প্লাবিত।

কিয়দ্দূর গিয়ে ভবানন্দ গান শুরু করলেন—

বন্দেমাতরম্!
সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্য শ্যামলাং মাতরম্।

গান থামল। মহেন্দ্র বললেন, এতো বেশ। এতো মা নয়।

ভবানন্দ বললেন, আমরা অন্য মা জানি না, মানি না। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমাদের মা নেই, বাপ নেই, ভাই নেই, বোন নেই, বন্ধু নেই, স্ত্রী-পুত্র নেই, বাড়িঘর নেই। আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা মাতৃভূমি। এই বলে আবার গাইতে শুরু করলেন :

শুভ্র-জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীম,
ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীম,
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিনীম
সুখদাং বরদাং মাতরম।

যাহতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।

সপ্তকোটি কণ্ঠ কল কল নিনাদ করালে,
দ্বিসপ্তকোটি ভুজৈধৃত খর করবালে,
অবলা কেন মা এত বলে।
বহুবল ধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদল বারিণীং মাতরম।
তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম
ত্বং হি প্রাণা শরীরে।

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ ধারিণীং
কমলা কমলদল বিহারিণীং
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাম
সুজলাং সুফলাং মাতরম্
বন্দে-মাতরম্।
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম
ধরণীং ভরণীং মাতরম।

। তিন ।

ভবানন্দ মহেন্দ্রকে সন্ন্যাসীদের আশ্রয়স্থল আনন্দ মঠে নিয়ে গেলেন।

সেখানকার সর্বাধিনায়ক স্বামী সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে স্বাগত জানিয়ে বললেন, চল, তোমাকে তোমার স্ত্রীকন্যার কাছে পৌঁছে দি। তার আগে এসো আমার সঙ্গে।

সত্যানন্দের পিছনে পিছনে মহেন্দ্র মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। বিস্ময়ভরা চোখে দেখলেন, সামনে এক অপরূপ জগদ্ধাত্রী মূর্তি।

মহেন্দ্র সত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইনি কে?

সত্যানন্দ বললেন, মা যা ছিলেন। অর্থাৎ দেশমাতার অতীত রূপ।

আর এক ঘরে গিয়ে মহেন্দ্র দেখলেন—কালী মূর্তি।

সত্যানন্দ বললেন, দেখ, মা যা হয়েছেন। অর্থাৎ দেশমাতৃকার বর্তমান রূপ। তিনি আজ ছত্রভঙ্গবস্থা। তাই কালী নগ্নিকা, বস্ত্রহীনা। দেশ আজ শ্মশান, তাই মা কঙ্কালের মালা পরেছেন।

আর একটি ঘরে গিয়ে মহেন্দ্র দেখলেন, সোনার ষোলকলা মূর্তি।

সত্যানন্দ বললেন, মার ভবিষ্যৎ রূপ। অদূর ভবিষ্যতে অত্যাচাররূপী অসুর ধ্বংস হবে। দেশে লক্ষ্মীর আবির্ভাবে গ্রাম নগর ধনধান্যে পূর্ণ হোয়ে উঠবে। সরস্বতীর কৃপায় মায়ের সন্তানরা শিক্ষিত হবে। কার্তিক হবেন বলবীর্য। গণেশ হবেন সিদ্ধি। যাকে প্রণাম কর।

দু'জনে জোড় হাতে প্রণাম করলেন।

তারপর সত্যানন্দ বললেন, মন্দিরের বাইরে গেলেই তোমার স্ত্রীকন্যাকে দেখতে পাবে। যাও।

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে দেখে প্রথমে খুব খানিকটা কাঁদলেন। তারপর সত্যানন্দের দেওয়া প্রসাদ নিয়ে মনের খাইরে একটি নদীর ধারে গিয়ে বসলেন।

মহেন্দ্র কল্যাণীকে জানালেন, কল্যাণী ও সুকুমারীকে বাড়িতে রেখে তিনি আনন্দ মঠে যোগ দেবেন, সন্তানদলে ভর্তি হবেন।

মনে মনে দারুণ বিহ্বল হোলেও কল্যাণী বললেন, স্বামীর ইচ্ছায় তিনি বাধা দেবেন না।

দু'জনে কথাবার্তা বলছেন, তার ফাঁকে সুকুমারী কল্যাণীর অগোচরে তাঁর বিয়ের কৌটাটি নিয়ে খেলা করতে করতে সেটা খুলে ফেলে তার ভিতরকার বিয়ের বড়িটা বার করে মুখে পুরে দিলে।

হঠাৎ তার মুখের একটা অস্ফুট শব্দ শুনে কল্যাণী মুখ ফিরিয়ে দেখেই আর্তনাদ করে উঠলেন।

তাড়াতাড়ি তিনি কন্যার মুখ থেকে বড়িটা বার করলেন বটে কিন্তু বিষের ক্রিয়া ততক্ষণে শুরু হয়ে গেছে। দেখতে দেখতে সুকুমারী নেতিয়ে পড়ল।

তাই দেখে কল্যাণী হাহাকার করে অবশিষ্ট বড়িটা মুখে পুরে গিলে ফেললেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। স্ত্রী-কন্যার অবস্থা দেখে হতচকিত মহেন্দ্র আকুল হোয়ে কাঁদতে লাগলেন।

সেই সময় সত্যানন্দ সেখানে এসে মূর্ছিত মহেন্দ্রের মাথা কোলে নিয়ে বসলেন। এবং গান গাইতে লাগলেন—

হরে মুরারে, মধুকৈটভারে……

এমন সময় সেখানে একদল সেপাই এসে উপস্থিত হল।

তারা সরকারের আদেশে ডাকাতদের খোঁজে বেরিয়েছিল।

রাজস্বের টাকা লুঠ! রাজধানীতে তাই নিয়ে হুলুস্থুল পড়ে গিয়েছিল।

সরকার খবর পেয়েছিল, একদল সন্ন্যাসী সেই টাকা লুঠ করেছে। অতএব রাজার পাইক বরকন্দাজ সন্ন্যাসীদের তল্লাসে চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছিল।

এমনি একদল সেপাই সেই জায়গায় এসে সত্যানন্দ আর মহেন্দ্রকে দেখে ভাবল, এই সন্ন্যাসী হচ্ছে একজন ডাকাত এবং অন্যজন তার অনুচর।

এই ভেবে তারা সত্যানন্দ আর মহেন্দ্রকে ধরে নিয়ে নগরের ফাটকে আবদ্ধ করল।

মহেন্দ্র তখনো স্ত্রীকন্যার শোকে অত্যন্ত কাতর হয়ে আছেন দেখে সত্যানন্দ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, সন্তানরা যা করবার তা করবে। আর, আজ রাত্রেই আমরা কারাগার থেকে মুক্ত হব।

॥ চার ॥

সত্যানন্দ আর মহেন্দ্রকে সেপাইরা যখন ধরে নিয়ে যাচ্ছিল তখন সত্যানন্দ গান গাইছিলেন :

ধীর সমীরে তটিনীতীরে বসতি বনে বরনারী
যা কুরু ধনুর্ধর গমন বিলম্বন, অতি বিদুরা সুকুমারী।

অদূরে এক গুপ্তস্থানে দাঁড়িয়ে জীবানন্দ সেই গান শুনে তার সংকেত বুঝতে পারলেন।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি নদীর দিকে অগ্রসর হলেন এবং কিছুদূর গিয়ে কল্যাণী ও সুকুমারীকে দেখতে পেলেন।

এ কী! মা মরে গেছে। কিন্তু মেয়েটি বেঁচে আছে! জীবানন্দ মেয়েটিকে কোলে তুলে নিয়ে বন থেকে বেরিয়ে নিকটবর্তী ভৈরবপুর গ্রামের একটি ছোট বাড়িতে প্রবেশ করলেন।

এই বাড়ীতে থাকে তাঁর ছোট বোন নিমাইমনি। আর থাকেন তাঁর স্ত্রী শান্তি।

জীবানন্দ সুকুমারীকে নিমাইমণির কোলে তুলে দিলেন। তারপর স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর দেখা হল এবং অনেক কথাবার্তা হল।

দীক্ষাপ্রাপ্ত সন্ন্যাসীদের পক্ষে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করা একান্ত নিষিদ্ধ। সেই ব্রত ভঙ্গ হলে তার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত—মৃত্যু।

শান্তির দুঃখ দেখে জীবানন্দ একবার ভাবলেন, আর আনন্দ মঠে ফিরে যাবেন না।

কিন্তু শান্তি বললেন, তা হয় না। তুমি তোমার বীরধর্ম কখনো পরিত্যাগ কোরো না।

শান্তির কথায় জীবানন্দের চমক ভাঙলো। তিনি আনন্দ মঠে ফিরে চললেন।

এদিকে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অপর এক নায়ক ভবানন্দ ঘোড়ায় চড়ে সত্যানন্দের খোঁজে নদীতীর দিয়ে যাবার সময় কল্যাণীর অচেতন দেহ দেখে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে তাঁকে পরীক্ষা করে দেখলেন।

পরীক্ষা করে তাঁর মনে হল এখনো হয়ত এই রমণীকে বাঁচানো যেতে পারে।

তিনি বনজ পাতার রস কল্যাণীর মুখে দিয়ে অল্প অল্প তাঁর চেতনা ফিরিয়ে আনলেন। তারপর সেই অর্ধজীবিত দেহ ঘোড়ার পিঠে তুলে নগরের দিকে যাত্রা করলেন।

॥ পাঁচ ॥

সন্তান সম্প্রদায় জানতে পারল, সত্যানন্দ আর মহেন্দ্র নগরের কারাগারে বন্দী।

সেই সংবাদ প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার সন্তান আনন্দমঠে এসে উপস্থিত হল এবং সেই রাত্রেই তারা কারাগার আক্রমণ করল।

কয়েদখানা ভেঙে রক্ষীদের বেঁধে সন্তানরা সত্যানন্দ আর মহেন্দ্রকে বার করে এনে আনন্দে নৃত্য করতে লাগল।

কিন্তু ইংরাজরাও নিশ্চেষ্ট রইল না। কারখানার আক্রমণের খবর পাবা মাত্র তারা একটা কামান সমেত একদল সেপাই পাঠিয়ে দিলে।

সন্তানদল তাদের সঙ্গে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করলেও শেষ পর্যন্ত কামানের মুখে হার মেনে পালাতে বাধ্য হল।

পরদিন আনন্দমঠে এক সভা বসল। সেই সভায় সত্যানন্দ সন্তানদের বললেন, তোমরা বীর, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তোমাদের অস্ত্র চাই। শুধু লাঠিসোঁটা বল্লমে কাজ হবে না। ওদের মত আমাদেরও কামান বন্দুক দরকার। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আমি তীর্থযাত্রা করব। সেখান থেকে কারিগর পাঠিয়ে দেব। পদচিহ্ন গ্রামে কারখানা বসিয়ে সেইখানে অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করতে হবে। মহেন্দ্রের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। সেও আজ ব্রত গ্রহণ করবে।

তিনি আরও জানালেন, মহেন্দ্রের সঙ্গে আরও একজন নবাগত তরুণকে তিনি দীক্ষা দেবেন। তিনি তাকে পরীক্ষা করে দেখেছেন, যুবকটি খাঁটি সোনা।

এই তরুণ যুবা ছদ্মবেশে জীবানন্দের স্ত্রী—শান্তি।

স্বামী চলে আসবার পর তিনি সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে মঠে এসে উপস্থিত হয়েছেন। উদ্দেশ্য—স্বামীর সঙ্গে থেকে তাঁর ব্রতে সহায়তা করা।

যথারীতি মহেন্দ্র এবং শান্তির দীক্ষা হল।

শান্তির নতুন নাম হল—নবীনানন্দ।

দীক্ষার পর সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে বললেন, এই বার আমাদের পরিকল্পনা মত কাজ কর। পদচিহ্নে গিয়ে দুর্গ তৈরী কর। সেখানে কামান বন্দুক তৈরী হবে আর সন্তানদের অর্থভাণ্ডারও সেইখানে থাকবে।

মহেন্দ্র স্বীকৃত হয়ে প্রস্থান করলেন।

অন্য সকলে যে যার কাজে চলে গেল। তখন সত্যানন্দ শান্তিকে কাছে ডেকে বললেন, ছি, মা! আমার সঙ্গে প্রতারণা!

শান্তি বললেন, প্রভু, এমন দোষই বা কি করেছি। স্ত্রীলোকের বাহুতে কি শক্তি থাকে না?

সত্যানন্দ বললেন, তাই নাকি! আচ্ছা, পরীক্ষা দাও তো দেখি।

তিনি শান্তিকে একটি ইস্পাতের ধনুক এবং লোহার তীর দিয়ে বললেন, এই ধনুকে গুণ দাও, তোমার শক্তি দেখি।

শান্তি অবলীলাক্রমে ধনুকে শর যোজনা করে গুণ দিলেন।

সত্যানন্দ বিস্ময়ে নির্বাক!

এই কঠিন পরীক্ষায় এর আগে মাত্র চারজন উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি নিজে, ভবানন্দ এবং জীবানন্দ আর জ্ঞানানন্দ।

শান্তি আনন্দমঠে থাকবার অনুমতি পেলেন।

॥ ছয় ॥

মন্বন্তর শেষ হল। দেশ শস্যশালিনী হল। কিন্তু দেশে অরাজকতা কমল না।

এদিকে সন্তানসেনা দিন দিন অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

একাধিকবার তারা সরকারী টাকা লুঠ করল। অনেক ইংরাজ রাজপুরুষ তাদের হাতে লাঞ্ছিত হল। তাদের খবর ইংলণ্ড পর্যন্ত পৌঁছলো।

তখন এই সন্ন্যাসী বিদ্রোহ দমন করবার জন্যে গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস কৃতসংকল্প হোয়ে ক্যাপ্টেন টমাসের নেতৃত্বে একদল সৈন্য নিযুক্ত করলেন।

অনেকবার সন্তানদলের সঙ্গে ক্যাপ্টেন টমাসের সংঘর্ষ হল।

সেইসব লড়াইএ প্রতিবারই সন্তানসেনা জয়লাভ করল বটে কিন্তু অনেক সন্তান মারাও পড়ল।

সত্যানন্দ মঠে ফিরে এলেন।

সমবেত হাজার হাজার সন্তানদের সম্বোধন করে বললেন, হে বীর সন্তানবৃন্দ, ক্যাপ্টেন টমাস আমাদের বহু সন্তানকে মেরেছে। আজ রাত্রে আমরা তাকে সসৈন্যে বধ করব। পদচিহ্ন দুর্গ থেকে সতেরোটা কামান আসছে। কামান এসে পৌঁছলেই আমরা যুদ্ধযাত্রা করব।

কিন্তু তার আগেই ক্যাপ্টেন টমাস আনন্দমঠ আক্রমণ করল।

এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণে সন্তানসেনা প্রথমটা হতবুদ্ধি হল।

ইংরেজের তোপ গর্জন করতে লাগল। মহসা সমূহ বিপদ ঘনিয়ে উঠল।

তখন সত্যানন্দের নির্দেশে জীবানন্দ দশহাজার সন্তান নিয়ে মধুপথ করে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হলেন।

ভীষণ যুদ্ধ হল।

ভবানন্দের রণকৌশলে ক্যাপ্টেন টমাস বন্দী হল বটে, কিন্তু অপর দুই ইংরেজ অধিনায়ক ক্যাপ্টেন হে ও লেফটেনাণ্ট ওয়াট্‌সন মুহুর্মুহু কামান দেগে সন্তানদলকে ছিন্নভিন্ন করতে লাগল।

এমন সময়ে দুই দলকে চকিত করে দূরে কার কামান গর্জন করে উঠল।

ক্রম্, ক্রম্, ক্রম্।

দেখতে দেখতে ইংরাজ সেনাদলের উপর সেই কামান থেকে অগ্নিবৃষ্টি হতে লাগল।

সতেরোটা কামান নিয়ে মহেন্দ্র এসে পৌঁছেছেন।

সেই কামান গর্জনে বনভূমি প্রকম্পিত হল। ইংরেজদল ভয়ে চোখ বুজল।

সন্তানসেনা আনন্দে উৎফুল্ল হোয়ে বিগুণ তেজে ইংরাজদলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শত শত ইংরাজ সৈন্য মরতে লাগল।

তখন হে আর ওয়াটসন হার স্বীকার করে বলে পাঠালো, আমরা তোমাদের হাতে আত্মসমর্পণ করছি। আর হত্যা কোরো না।

জীবানন্দ এবং ধীরানন্দ যুদ্ধ থামাতে সম্মত হলেন, কিন্তু ভবানন্দ রাজী হলেন না।

আজ তাঁকে প্রাণ বিসর্জন দিতেই হবে। কারণ তিনি সন্তানদের ব্রত ভঙ্গ করেছেন। কল্যাণীকে তিনি পৌরী দেবী নামে এক পরিচিতা বৃদ্ধার বাড়ীতে রেখে এসেছেন এবং তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন।

সন্তানদের পক্ষে এ যে মহাপাপ! ভবানন্দ মনে করলেন, এই ব্রতভঙ্গের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু। মৃত্যু ছাড়া তাঁর আর অন্য গতি নেই। তিনি একা অবশিষ্ট ইংরাজ সেনার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন এবং অল্পক্ষণ পরেই প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

॥ সাত ॥

যুদ্ধ জয়ের আনন্দের মধ্যেও বিষাদ।

ভবানন্দের সঙ্গে আরও অনেক বীর সন্তান প্রাণ হারিয়েছেন।

প্রধান সন্তানদের একত্রিত করে সত্যানন্দ বললেন, আমাদের ব্রত সফল হোয়েছে। নগর ছাড়া সমস্ত বীরভূম আমাদের অধিকারে। তোমরা এখানে সন্তানরাজ্য প্রতিষ্ঠা ও প্রচার কর। প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায় কর।

তারপর মহেন্দ্রকে ডেকে বললেন, মহেন্দ্র, তুমি তোমার কাজ করেছ। এবার তুমি সংসারী হোতে পারো।

মহেন্দ্র কেঁদে বললেন, ঠাকুর কাকে নিয়ে সংসারী হব? আমার স্ত্রী কন্যা নেই। আমার কেউ নেই।

সত্যানন্দ বললেন, তোমার সব আছে মহেন্দ্র। আমি নবীনানন্দকে নির্দেশ দিয়েছি। সে তোমাকে তোমার স্ত্রী-কন্যার কাছে নিয়ে যাবে।

অতঃপর শান্তির মাধ্যমে মহেন্দ্র স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে মিলিত হলেন এবং শান্তির প্রতি অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

কল্যাণী আগেই জেনেছিলেন, এখন মহেন্দ্রও জানালেন, নবীনানন্দ শান্তির ছদ্মবেশ এবং তিনি জীবানন্দের ধর্মপত্নী।

॥ আট ॥

এবার সন্তান দমনে এলো এক নতুন ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ। তার নাম মেজর এডওয়ার্ডস্।

সন্তান নিয়ে মেজর এডওয়ার্ডস্ জানতে পারল, পদচিহ্নই সন্তানদের দুর্গ, সেখানেই তাদের অস্ত্রাগার এবং ধনাগার।

এডওয়ার্ডস্ স্থির করল, সর্বাগ্রে পদচিহ্ন দখল করতে হবে।

সেই পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করবার জন্যে চতুর এডওয়ার্ডস এক কৌশল আঁটল। রটনা করে দিল, মাঘীপূর্ণিমার দিন নদীতীরে যে মস্ত মেলা বসবে সেই মেলা সে আক্রমণ করবে।

কিন্তু তার আসল মতলব ছিল ভিন্ন।

সন্তানগণ নিশ্চয় মেলায় আসবে। পদচিহ্ন দুর্গ প্রায় অরক্ষিত থাকবে। সেই সুযোগে সে মেলা আক্রমণ না করে পদচিহ্ন দুর্গ আক্রমণ করে অধিকার করবে।

মাঘী পূর্ণিমার দিন শান্তির সাহস আর কৌশলে খবর পাওয়া গেল ইংরাজ সৈন্য পদচিহ্ন অভিমুখে ধাবিত হয়েছে।

সংবাদ পেয়ে একটা টিলার পাশে মহেন্দ্র শিবির স্থাপন করলেন।

টিলার ওধারে ইংরাজ সৈন্য।

যে আগে টিলার উপর উঠতে পারবে তারই জয় হবে।

তখন সেই টিলার অধিকার নিয়ে তুমুল যুদ্ধ হোতে লাগল।

ইংরাজ সৈন্য আগে টিলার উপর উঠে পড়ল এবং উপর থেকে কামান দেগে শত শত সন্তানকে হতাহত করতে লাগল। তখন জীবানন্দ নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও ঘোড়া ছুটিয়ে শত্রুর কামান কাড়বার জন্যে অগ্রসর হলেন।

এমন সময় পঁচিশ হাজার সন্তানসেনা নিয়ে সত্যানন্দ পিছন থেকে ইংরাজ বাহিনীকে আক্রমণ করলেন।

তা দেখে মহেন্দ্রের সন্তানসৈন্যও উৎসাহিত হোয়ে শত্রুপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

দু'দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে ইংরাজ সৈন্য নিঃশেষে সাবাড় হয়ে গেল।

কলকাতার গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর কাছে খবর নিয়ে যায় এমন একজনও অবশিষ্ট রইল না।

॥ নয় ॥

নিস্তব্ধ নির্জন রণক্ষেত্র পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় প্লাবিত।

চতুর্দিকে হতাহত ইংরাজ ও সন্তানসেনা পড়ে আছে।

তারই মাঝে একাকিনী শান্তি জীবানন্দের দেহ খুঁজছিলেন।

অনেক খুঁজেও যখন পেলেন না তখন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন।

এমন সময় এক জটাজুটধারী মহাপুরুষ এসে সস্নেহে শান্তিকে বললেন, মা, ওঠো কেঁদো না। তোমার স্বামীর দেহ আমি খুঁজে দিচ্ছি। এসো আমার সঙ্গে।

সেই মহাপুরুষ শুধু যে জীবানন্দের দেহ খুঁজে বার করলেন তাই নয়, বন্য লতা পাতার ওষুধ দিয়ে তাঁকে বাঁচিয়ে তুললেন।

জীবানন্দ চোখ মেলে শান্তিকে দেখলেন। কিন্তু সেই মহাপুরুষকে দেখতে পেলেন না। তিনি অন্তর্হিত হয়েছেন।

তখন শান্তি আর জীবানন্দ দু'জনে হাত ধরাধরি করে সেই অন্তর্হীন জ্যোৎস্নালোকে মিলিয়ে গেলেন।

* * *

রণক্ষেত্র থেকে মহাপুরুষ এলেন আনন্দ মঠে।

সত্যানন্দ পরম ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম করলেন।

মহাপুরুষ বললেন, সত্যানন্দ, তোমার কার্যসিদ্ধি হয়েছে। এখন ইংরাজ দেশ শাসন করবে। তারাই রাজা হবে। অতএব তুমি আমার সঙ্গে চল।

সত্যানন্দ দুঃখ করে বললেন, হায় মা, শেষ পর্যন্ত তোমায় উদ্ধার করতে পারলাম না।

মহাপুরুষ বললেন, সত্যানন্দ, কাতর হ'য়ো না। এখনো সময় আসেনি। এখনো দেশের মধ্যে জ্ঞানের প্রসার হয়নি। অতঃপর শিক্ষার ফলে দেশের মানুষের জ্ঞান বাড়বে। তখন আবার দেশ জেগে উঠবে। তোমার এখানে আর কোন কাজ নেই। তুমি আমার সঙ্গে হিমালয়ের মাতৃমন্দিরে চল। সেখানে তোমার জ্ঞানলাভ সম্পূর্ণ হবে।

এই বলে মহাপুরুষ সত্যানন্দের হাত ধরলেন। তারপর দু'জনে চলতে লাগলেন।

লেটার-বক্স

মানবেন্দ্র পাল

নতুন রাস্তা তৈরি হয়েছে। অনেক বেনো জমি তছনছ করে অনেক খাল-বিল বুজিয়ে তৈরি হয়েছে নতুন রাস্তা। মসৃণ পিচঢালা রাস্তা। কিছুদিনের মধ্যেই বাস-সার্ভিস খোলা হল। সে যেন এক কল্পনাতীত ব্যাপার! এই কিছুকাল আগেও ঘোষপুকুর কিম্বা নাটাগড় অঞ্চলের লোকেদের কালনা যেতে গেলে রেলপথ ছাড়া উপায় ছিল না। সারাদিনে কখানিই বা ট্রেন চলে! দীর্ঘপথ হাঁপাতে হাঁপাতে পায়ে হেঁটে এসে শেষ পর্যন্ত যদি ট্রেনটি ধরতে না পারে তা হলে থাকো বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বর্ধমান হলে তো কথাই নেই। সময়, পরিশ্রম তার ওপর ট্রেন-বদলের হাঙ্গামা! কিন্তু এখন বাসরুট খোলা হয়েছে। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিট অন্তর বাস। একেবারে গ্রামের কাছ দিয়ে বাস যায় হর্ণ বাজিয়ে। ব্যাণ্ডেল থেকে বাস ছাড়ে, দুঘণ্টার মধ্যে গুপ্তিপাড়া ঘুরে কালনায় পৌঁছে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে বাস ছাড়ছে বর্ধমান—মেমারি—মন্তেশ্বর!

বাসরুট খোলায় সুবিধে যথেষ্ট হয়েছে। তবু কাউকে কাউকে মাইলখানেক পথ হেঁটে এসে তবে বাস ধরতে হয়। এই দূরত্বের জন্যেই প্রথমে শ্যামলীর কলেজের পড়া নিয়ে ঘোরতর আপত্তি উঠেছিল। না, রাগে উঠতে পারলে আর ভাবনা নেই। তখান থেকে কালনা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের পথ। তা ছাড়া অন্য মেয়েরাও আসছে আরও দূর থেকে। কিন্তু এই এক মাইল পথ? এ যে একেবারে জনশূন্য! কোথাও দুপাশে ধানজমি, কোথাও পাটের খুঁই—কোথাওবা নিবিড় বাঁশঝাড়। এরই মধ্যে রাস্তা—কোথাও একটা আস্তানাও নেই।

কিন্তু শ্যামলী শোনেনি। সে জেদ ধরেছিল কলেজে পড়বেই। তা ছাড়া ঐ রাস্তা কি তার অচেনা? সে কি এখানকার মেয়ে নয়?

অগত্যা মত দিতে হয়েছে। এখন প্রায় রোজই সাড়ে ন'টা নাগাদ এই নির্জন পথে দেখা যায় শ্যামলীকে। হাতে ছোট্ট সেভিন ছাতা, বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে আছে একরাশ বইখাতা। ধীর গম্ভীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে—পরনে তার কোনদিন বা হাল্কা সবুজ শাড়ি - সবুজ বনশ্রীর সঙ্গে মিশে যেন শিল্পীর তুলির টানে আঁকা সে এক অপরূপ সৃষ্টি!

কিন্তু রোজই যে শ্যামলী বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা পথেই বাসরুটে আসে তা নয়। মাঝে মাঝে ব্যতিক্রম ঘটে। শেতলাতলার মাঠের কাছে এসে যখন পৌঁছয় তখন এক একদিন বুকের ভেতরটা কেমন করে। একবার এদিক ওদিক দেখে নেয়, তারপর পথ ছেড়ে বাঁ দিকে নামে। অল্পদূরে একটা বটগাছ। এগ্রামের ঐটাই সীমানা। সেই বটগাছের বুকে ঝুলছে লাল একটা চিঠির বাক্স। কবে থেকে যে রয়েছে ওটা কে জানে। রঙ চোটে গেছে—মরচে ধরেগেছে টিনে। তা থাক তবু ওটা লেটার-বাক্স। বড়ো গোপন—বড়ো বিশ্বস্ত বন্ধু।

ছোটোখাটো একটা ডাকঘর আছে হাটতলার দিকে। সেখানে বড়ো ভিড়—সব চেনামুখ। কিন্তু এখানে এতদূরে গ্রামের কেউ বড়ো একটা আসে না। তাই শ্যামলীর এইখানেই সুবিধে। মেটারবক্সটির কাছে এগিয়ে এসে একবার দাঁড়ায়। ভয়ে ভয়ে আবার একবার এদিক ওদিক দেখে। না, কেউ কোথাও নেই। বটগাছের কোটরে কোথায় একটা ঘুঘু ডাকে। শ্যামলী সন্তর্পণে বইয়ের মধ্যে থেকে খামখানা বের করে। অনভ্যস্ত—তাই হাতটা কাঁপে। ঠিকানাটা আরও একবার ভালো করে দেখে। তারপর কোনরকমে খামটা ঢুকিয়ে দেয় মেটার-বক্সের মধ্যে। দিয়েই চলে আসেনা। আর একবার হাত দিয়ে দেখে কোথাও আটকে নেই তো! তারপর দ্রুততর পদক্ষেপে উঠে আসে রাস্তায়। বাসের আর দেরি নেই।

সেদিন শ্যামলী একটা চিঠি পেয়েছিল। খামখানা নিয়ে নিরিবিলিতে পড়বার সুযোগ খুঁজছিল। এ চিঠি তাকে আসেনি। ও নিজে হাতে দিয়ে গেছে।

দিয়ে গেছে সেই দুপুরে, কিন্তু পড়বার সুযোগ পায়নি। বাড়িতে লোক বেশি নেই। শুধু মা আর ছোটভাই অধীর। তবু বাবা অনেক।

একই বাড়ি, মাঝখানে শুধু পাঁচিল। ওপাশে থাকেন কাকা কাকীমা আর এপাশে শ্যামলীরা। বাবার মৃত্যুর পর সব ভার একরকম কাকার ওপরই পড়েছে। এটা তাদের দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কী। যতদিন বাবা বেঁচে ছিল ততদিন একরকম ছিল, কিন্তু কাকীমা যেন এখন বেশি কর্তৃত্ব করছে। এরা যে বর্তমানে সম্পূর্ণ তাঁদের অনুগ্রহের ওপর—কাকীমা যেন সাড়ম্বরে তা ঘোষণা করতে চান।

যেমন কাকিমা তেমনি তাঁর মেয়েটি। সবে তেরো পূর্ণ হয়ে চোদ্দর পা দিয়েছে। এরই মধ্যে মায়ের মতো উঁকিঝুঁকি মারতে শিখেছে। এবাড়িতে নতুন কেউ এলে আর কালবিলম্ব নয়—মা অমনি মেয়েকে পাঠাবে। মেয়ে হাজির। কিছু একটা ছুতো করে আসবেই। এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শুনবে। তারপর যথাস্থানে যথাসম্ভব রঙ চড়িয়ে তার বর্ণনা। সময় সময় শুনি এবাড়ি থেকে নড়তেই চায়না। শ্যামলী যখন যে ঘরে যায় পেছনে পেছনে তটিও ছায়ার মতো। এ যে তার দিদির ওপর দস্তুর আকর্ষণ নয় শ্যামলীর মাও তা বোঝেন।

শ্যামলী খুব সাবধানে খুব আদরে খামখানা ছিঁড়ছিল। খামটা বেশ ভারী। যাক এবার তাহলে বড়ো করে চিঠি লিখেছে।

…তবু এই কাকীমার মতো আত্মীয়া এবং প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে মিলেমিশে হাসিমুখে শ্যামলীকে চলতে হয়। সরল প্রকৃতির হলেও ওর যেশবার একটা ক্ষমতা আছে। তাই আজও কারো সঙ্গে অশান্তি বাধেনি।

একবার বাধবার উপক্রম হয়েছিল—সেটা শ্যামলীর পড়াশোনা নিয়ে। শ্যামলী যে বেশি পড়াশোনা করে এটা ওর কাকীমার মোটেই ইচ্ছে নয়। (সেটা কি তটির পড়াশোনায় বিরাগের জন্যই?) মুখে বলেন মেয়েদের আবার পড়েশুনে কী হবে? বেশি পড়লে মেয়েরা বেহায়া হয়ে যায়। তবু শ্যামলী জেদ করেছিল, সে পড়বেই। কাকীমা নারাজ। শ্যামলীর মা ভয়ে আর সংকোচে জায়ের মুখের ওপর কিছু বলতে পারেন না। মেয়েকেও বোঝাতে পারেন না। পরিস্থিতিটা যখন এইরকম তখন হঠাৎই একদিন কলকাতা থেকে নিখিল এসে হাজির।

নিখিল এখানকারই ছেলে। একটা আমবাগানের পরেই ওদের বাড়ি। অবস্থাপন্ন। প্রচুর বাসজমি। তার ওপর কলকাতায় চাকরি করছে। সেখানে যতদিন না ছেলের বিয়ে দিচ্ছেন ততদিন

ওর বাবা মাও কলকাতায় গিয়ে রয়েছেন। এখানে এখন কেউ থাকেনা। কিন্তু তাতে অসুবিধে তেমন নেই কারণ কাকীমার সংসারে সে বড়ো আদরের অতিথি। অনাদর অবশ্য শ্যামলীদের সংসারেও নেই। কিন্তু শ্যামলীর কাকীমা যেভাবে নিখিলকে আঁকড়ে থাকেন, শ্যামলীর মা আর তাকতে সাহস পান না।

অবশ্য না ডাকতেই নিখিল এ বাড়ি আসবেই। সেদিনও এসেছিল। শ্যামলী খবর পেয়েছিল আগেই, চুপ করে তাই নিজের ঘরটিতে বসেছিল পুরনো একটা বই হাতে করে। মন বইয়ের দিকে ছিল না, কান পেতে ছিল—কোনো দূরাগত পথিকের পরিচিত পদশব্দ পায় কিনা। নিখিল অনেকদিন পর এই এসেছে দেশে।

শ্যামলীর মা সলজ্জকোচে ঘরে ঢুকলেন। মেয়ের নির্লিপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করে বললেন, নিখিল ও বাড়ি এসেছে। একবার দেখা করবি নে?

শ্যামলীর ভুরু কুঁচকে উঠল। বলল, আমি কেন দেখা করতে যাব? নিখিলদার যদি আমাদের কথা মনে থাকে, ইচ্ছে হয়, নিজেই আসবে।

কথা শেষ হতে না হতেই বাইরের উঠোনে ভারী পদশব্দ।—মাসিমা!

—এসো বাবা, এসো! বলতে বলতে শ্যামলীর মা বেরিয়ে এলেন। শ্যামলীর বুকের ভিতরটা আনন্দে কেঁপে উঠল। সে প্রাণপনে নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করতে লাগল।

নিখিল এল একটু পরেই। অনেকদিন পর দুজনের দেখা।

—কেমন আছ?

শ্যামলীর মুখটা অকারণেই লাল হয়ে উঠেছিল।

—ভালো। তুমি?

নিখিল এর স্পষ্ট উত্তর না দিয়ে একটু হাসল।

—আমাদের তো ভুলে গেছ, দেশকেও ভুলে গেলে?

নিখিল বললে, ভুলতে আর পারলাম কই? এই তো এসেছি।

—তবে বুঝি মানুষের টানে নয়? দাঁড়াও, কাকীমাকে বলে দিচ্ছি।

—দেশতো মানুষকে বাদ দিয়ে নয়। আজ তোমরা যদি না থাকতে তাহলে শুধু কি মুনো জায়গা আর পোড়ো বাড়িটার জন্যে ছুটে আসতাম?

এমনি সময়ে ভলি এসে হাজির। একবার শ্যামলীর মুখের দিকে আর একবার নিখিলের দিকে তাকিয়ে কী যেন বোঝবার চেষ্টা করে সেখানেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল।

শ্যামলীর কথা বলার উৎসাহ কমে গেল। বললে, তোমার জন্যে চা নিয়ে আসি।

ভলি তৎক্ষণাৎ বললে, আমরা চা পরোটা মিষ্টি খাইয়ে দিয়েছি।

শ্যামলী কথাটা শুনেই থমকে নিখিলের দিকে তাকালো। নিখিল বললে, চায়ে আমার অরুচি নেই। বেশ ভালো করে চা তৈরি করো। আমি কিন্তু—

—স্ট্রং চা পছন্দ কর এই তো? মনে আছে গো মশাই! বলে হাসতে হাসতে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

নিখিল এসেছিল তাদের পুরনো বাড়িটা সংস্কার করতে। শনিবারে এল, রবিবারটা থেকে সোমবার কলকাতা ফিরে গেল। বলে গেল আবার হয়তো একটা শনিবার বাদ দিয়ে আসতে পারি।

আসতে আরম্ভ করল। এবেলা শ্যামলীদের বাড়ি ওবেলা কাকীমাদের বাড়ি। দু ঘরেই সমান আদর।

এমনি আসা-যাওয়ার মধ্যেই হঠাৎ একদিন শ্যামলীর পড়ার ব্যাপার নিয়ে কথা উঠল। কথা উঠল শ্যামলীর মা আর কাকীমার সামনেই। নিখিল বললে, সে কী কথা। একটু দূরে যেতে হবে বলে পড়বে না? বাড়ির খেয়ে কলেজে পড়ার সুবিধে ও'জনে পায়? কী বলুন ছোটো মাসি?

কথাটা এমনভাবে বললে যেন শ্যামলীরই ইচ্ছে নেই। সে যেন দূরের পথ বলে ভয় পাচ্ছে।

কাকীমা কোনো মন্তব্য করলেন না। একটা হুতো করে চলে গেলেন।

সেবার রবিবার সন্ধ্যার ফেরবার সময়ে নিরিবিলিতে শ্যামলীর সঙ্গে নিখিলের দেখা হয়ে গেল। দৈবাৎ দেখা হয়ে গেল যে তা নয়, শ্যামলী ইচ্ছে করেই অপেক্ষা করছিল। নিখিল কাছে আসতেই হঠাৎ প্রণাম করে হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল।

—এ আবার কী?

মুখটা একটু সরিয়ে শ্যামলী বললে, তোমার কথা শুনে মা বলেছে যেমন করে হোক আমাকে পড়াবেই।

এই বলে নিখিলের শার্টটা ধরে মৃদু টান দিয়ে বললে, এবার এসে দেখবে মশাই—এ গেঁয়ো মেয়েকে আর চিনতে পারবে না। তখন কলেজ-গার্ল!

…খামটা ছিঁড়ে ফেলল শ্যামলী। কী কষ্টে যে সেই দুপুর থেকে কৌতূহল চেপে আছে তা সেই জানে। ডলি তো সর্বক্ষণ এ বাড়িতে। যেন চোখে চোখে রাখছে দিদিকে। একটু ফুরসৎ দেয়নি।

একটার পর একটা ভাঁজ খুলতে লাগল শ্যামলী। না, বেশ বড়ো চিঠিই লিখেছে। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পড়তে লাগল শ্যামলী। পড়তে পড়তে দুই চোখ খুশীতে ভরে উঠল—"জান, কলকাতার পথে যখন চলি তখনো দেখি তুমি সেখানে রয়েছ। তোমাকে কষ্ট করে ভাবতে হয় না, প্রতিমুহূর্তে তুমি যে আমার সঙ্গেই রয়েছ। নিশান যেমন পথিকের মাথার ওপর উড়তে উড়তে যায় তেমনি তোমার সমস্ত সত্তা আমার সব ভাবনা সব চিন্তার ওপরে দুলছে। আমি আলিপুর রোডের পাশ গাছে ঘেরা নির্জন বাড়িটির সামনে দাঁড়িয়ে কল্পনা করেছি তোমাকে, আষাঢ়ের কালো মেঘের দিকে তাকিয়ে তোমার বিরহকেই মেনে নিয়েছি সর্বান্তঃকরণে। কিন্তু তুমি কি আমাকে ভাব কখনো এমনি করে?

পাতা ওল্টাচ্ছিল শ্যামলী, হঠাৎ উৎকর্ণ হল। বাইরে কার পায়ের শব্দ। কে যেন আসছে। দরজার শব্দ হল ঠক্ ঠক্।

শ্যামলী তাড়াতাড়ি ব্লাউজের ভেতরে চিঠিটা লুকিয়ে দরজা খুলে দিল।

—কী করছ ঘরে খিল দিয়ে?

ডলি হাসল।

এরই মধ্যে ডলি মাঝে মাঝে শাড়ি পরছে। যেন দেখাতে চায় সেও তার দিদির নাগাল ধরে ফেলেছে। দুনিয়ার মূল রহস্য যেন সে এরই মধ্যে আয়ত্ত করে ফেলেছে। আজ আবার পথ করে ডলি পান খেয়েছে। ঠোঁটটা রসে জব জব করছে—বিশ্রী লাল হয়ে গেছে। জিব দিয়ে নীচের ঠোঁটটা মুছে নিয়ে ডলি বললে, চলো বাইরে গিয়ে বসে একটু গল্প করি। ঘরে খিল দিয়ে কী যে তুমি কর!

শ্যামলীর সর্বাঙ্গ রাগে জ্বলছিল। মায়ের আদর আর প্রশ্রয় পেয়ে দিন দিন কী বেয়াদপই না হচ্ছে। অথচ কিছু বলতে যাও—হোক-না নিজের বোন, কাকীমা অমনি ফোঁস করে উঠবে।

শ্যামলী বললে, কাকীমা এসেছেন নাকি?

ভলি গালে হাত দিয়ে বললে, এই সন্ধেবেলা মা নইলে আমি কি একা বেরোতে পারি? হলেই বা একই বাড়ি। মা বলে, এখন বড়ো হয়েছিস খবরদার কোথাও একা যাবিনে।

শ্যামলী সে কথার উত্তর না দিয়ে বললে, আমার বড্ড মাথা ধরেছে। তুই এখন যা। আমি শোব।

ভলি চলে যেতেই শ্যামলী সশব্দে খিল দিল বটে কিন্তু চিঠি পড়ার মতো মন আর রইল না। আলোটা কমিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল।

মাথার কাছে খোলা জানলার ফাঁক দিয়ে একটু পরে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ দেখা দিল। বাঁশবাগানে ডেকে উঠল শেয়াল। শ্যামলী শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল, এখান থেকে কলকাতা কতদূর? এখন কি ও-ও তার কথা ভাবছে?

এ ঘটনাটা ঘটছে শ্যামলী যখন উঠেছে সেকেণ্ড ইয়ারে। এই সময়টুকুর মধ্যে পৃথিবীতে আর কোথাও কিছু অগ্রসর হয়েছে কিনা বলতে পারি না তবে এরা দুজনে এগিয়েছে অনেক দূর। এখন এদের সম্পর্কটা যেন সকলের জানাজানি হয়ে গেছে। তাতে কাকীমা অত্যন্ত বিরক্ত। তিনি দেখলেন নিখিল যে তার কাছে আসে সেটা একটা ছুতো মাত্র। আসলে তার আকর্ষণ শ্যামলীর ওপর। তিনি একদিন শ্যামলীর মাকে বলে দিলেন—নিখিল এখানে আসে আমি পছন্দ করি না।

—তার অপরাধ?

—সে কি তুমি বোঝ না?

বোঝেন বৈকি। তাই তিনি উত্তর দিতে পারলেন না। নিঃশব্দে চলে এসেছিলেন।

বাড়িতে অশান্তির ছায়া দেখা দিল। নিখিল তখনো কিছু জানত না। যেমন আসছিল তেমনি আসতে গিয়ে প্রথম ধাক্কা খেল কাকীমার কাছে। কাকীমা স্পষ্টই বললেন, নিখিল, তোমাকে ঘরের ছেলের মতো মনে করেই ডাকতাম। কিন্তু এখন দেখছি তোমার উদ্দেশ্য মন্দ। যে উদ্দেশ্যে আস তা আমি টের পেয়েছি। তুমি এখন থেকে ও বাড়িতেই যেয়ো, এ বাড়ি নয়।

লজ্জায় অপমানে নিখিল ম্লান হয়ে গেল। ফিরে যাচ্ছিল হঠাৎ ও-বাড়ির বাগানের দিকের জানলা থেকে হাতছানি।

নিখিল ফিরে দাঁড়াল। তারপর ধীরে ধীরে জানলার কাছে এসে দাঁড়াল।

শ্যামলী বললে, খিড়কির দরজা খোলা আছে। ভেতরে এসো!

নিখিল সসংকোচে চিরপরিচিত বাড়ির মধ্যে অপরাধীর মতো ঢুকল।

শ্যামলী নিখিলের একেবারে নিশ্বাসের সান্নিধ্যে এগিয়ে এসে বিনা ভূমিকায় বললে, এবার থেকে কি তুমি সত্যিই আসা বন্ধ করবে? আমি তোমায় না দেখে থাকব কেমন করে?

নিখিল সেই নির্জনতাকে সাক্ষী মেনে অকস্মাৎ ওর হাতটা নিজের মুঠোয় ধরে বললে, এত অল্পে আমায় পেছিয়ে গেলে চলবে না। তোমার অন্তরের স্পর্শ যদি পাই, তাহলে আমি কোনো কিছুকেই ভয় করি না। কোনো বাধাই আমার কাছে বাধা নয়। আমি আসব।

শ্যামলীর দু'চোখ জলে ভরে উঠল।

নিখিল আসতে লাগল।

কিন্তু শ্যামলীর হিসেবেও একটু ভুল হয়েছিল। সে ভেবেছিল কাকীমা বিরূপ হলেও অন্তত তার মা নিখিলকে অনাদর করবে না। কিন্তু দেখা গেল নিখিল এলে তিনি আর তেমন করে কথা বলেন না।

শ্যামলী নিখিলের সম্বন্ধে উৎসাহ করে কিছু বলতে গেলে মাও মুখ ফিরিয়ে নেয়। এ যেন শ্যামলীর কাছে অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। সে কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল। নিখিল এলে আর আগের মতো মাদুর পেতে বসে গল্প করতে সাহস পায় না। তবু নিখিল আসে—শ্যামলী মাদুরটি পেতে দিয়েই সরে যায়। নিখিল কিছুক্ষণ বসে থাকে, বই নিয়ে নাড়াচাড়া করে, এই সময় হয়তো অধীর ফুটবল খেলে ফেরে। তাকে পেয়ে নিখিল যেন বেঁচে যায়। ওই যেন তার এখন একমাত্র বন্ধু—ওর জন্যেই যেন এখানে আসা।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাগানের পথ দিয়ে ছুপা এগোতেই শ্যামলীদের পিছনের জানলায় অল্প একটু শব্দ। অন্ধকারে ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে শ্যামলী। বাড়ির কেউ ভাবতেই পারে না, এই অন্ধকারে বাগানের পথ দিয়ে কেউ যায়—কিম্বা অন্ধকার অব্যবহার্য ভাঁড়ার ঘরে কেউ অমন অপেক্ষা করে থাকতে পারে।

ক্রমে রবিবার সন্ধ্যের পর এই অন্ধকারেই তাদের দেখা সীমাবদ্ধ হয়ে এল। একজন জানলার আড়ালে ভাঁড়ার ঘরের মধ্যে। আর একজন জানলার বাইরে বাগানের মধ্যে। কথা কিন্তু হত না। নিঃশব্দে নিখিল একটা চিঠি আর একটা খাম গুঁজে দিয়ে যেত। সেই সঙ্গে আঙুলে আঙুলে একটু স্পর্শ।

সেই চিঠি রাত্তিরে নিজের ঘরে খিল দিয়ে লণ্ঠনের আলোয় শ্যামলী শুয়ে শুয়ে পড়ে। উত্তরও লেখে সঙ্গে সঙ্গে—'রাত এখন কত জানি না। বাড়িসুদ্ধু সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু আমারই ঘরে আলো জ্বলছে। কেউ দেখলে ভাববে বোধ হয় পড়ছি। এইরকম নিস্তব্ধ নিস্তুতি রাত না হলে তোমাকে চিঠি লেখা যায় না। এটা যে আমার পক্ষে অস্বস্তিকর তা মনে কোরো না। বরঞ্চ ভালোই লাগে। তোমাকে সম্পূর্ণভাবে পেতে গেলে এমনি পরিবেশই চাই। এ তো শুধু কল্পনা নয়—এ যে ধ্যান!···

তুমি যেমন কলকাতার পথে পথে আমায় অনুভব কর তেমনি—বিশ্বাস কোরো, আমিও রোজ শোবার আগে তোমার নাম কাগজে লিখে মাথার কাছে রেখে দিই। সে যে আমার কী শান্তি বোঝাতে পারব না।··· ···

সেই রাত্রেই চিঠিখানি যত্নে ভাঁজ করে খামে ভরে তার ওপর শত চুম্বনের চিহ্ন এঁকে শ্যামলী বুকের মধ্যে রেখে ঘুমোয়। তারপর সকাল সাড়ে নটায় কলেজ যাবার পথে শেওলাতলার মাঠে সেই বটগাছে ঝোলানো লেটার-বক্সে চিঠিখানি ফেলে দিয়ে যায়।

ফেরবার পথে দূর থেকে শ্যামলী লেটার-বক্সটির দিকে একবার তাকায়। দু চোখে কেন কৃতজ্ঞতা উছলে ওঠে। সে চিঠি নিশ্চয় এখন আর ওখানে নেই—নিরাপদে এতক্ষণ রওনা হয়েছে কলকাতার পথে। মনে মনে এই জড় লেটার-বক্সটির সঙ্গে শ্যামলী যেন কেমন গোপন আত্মীয়তা অনুভব করে। তার যেন মনে হয়—এখানে এই লেটার-বক্সটি যতো নিঃসঙ্গ। বোধ হয় একমাত্র সে ছাড়া আর কেউ চিঠি ফেলতে আসে না। কবে থেকে—কত দিন চারিদিকে নিস্তব্ধ নিঃসঙ্গতার মধ্যে ঐ বিবর্ণ লেটার-বক্সটি ঝুলছে। কেউ যদি ওখানে চিঠি না ফেলে তবে সার্থকতা কোথায়? তখন শ্যামলীর মনে হয় শুধু সে লেটার-বক্সটিই তার বিশ্বস্ত বন্ধু তা নয়, সেও তার বন্ধু। কারণ সে-ই একা ওকে সার্থকতা দান করছে।

কিন্তু—

কিন্তু এভাবে তো চির দিন চলবে না। গোপনে চিঠি ফেলারও তো শেষ আছে। তখন?

একদিন শ্যামলী লিখল—চোরের মতো চুপি চুপি তোমার কাছ থেকে চিঠি নিতে মন আর সরে না। অথচ সোজাসুজি লিখতে বলি বাড়ির দিকে তাকিয়ে তেমন সাহসও পাই না। তবু বলছি—যে পন্থাহে

আসবেনা একটা পোস্টকার্ড লিখো—আমাকে নয়, তোমার ছোট্ট বন্ধু অধীরকে। মা মুখে যতই গম্ভীর হয়ে থাকুন মনে মনে তোমায় ভালোবাসেন। ভালোবাসবেন নাই বা কেন? কী তোমার অপরাধ? যদি কোন কিছুতে তোমার অপরাধ হয়েই থাকে তবে তার সমান দায়িত্ব আমারও। তাই বলছিলাম চিঠি লিখো। সব শেষে আমার নামটা একটু উল্লেখ কোরো। তোমার হাতে লেখা আমার নাম দেখতে কী যে ভালো লাগে!

কয়েক দিনের মধ্যে হঠাৎ শ্যামলীর নামেই এল চিঠি। পোস্টকার্ড নয়—খাম। এরকম চিঠির জন্যে শ্যামলী প্রস্তুত ছিল না। তাহলে সতর্ক থাকতো। চিঠিখানা এলো একেবারে মায়ের সামনে।

শ্যামলীর মা কৌতূহলবশে জিজ্ঞাসা করলেন, কার চিঠি?

শ্যামলী কোনো উত্তর না দিয়ে চিঠিটা আঁচল ঢাকা দিয়ে ঘরে ঢুকে গেল। মা গম্ভীরভাবে তাকিয়ে রইলেন মেয়ের দিকে।

এভাবে মায়ের সামনে ধরা পড়ায় শ্যামলী শুধু যে লজ্জায় পড়ল তাই নয়, তার কেমন রাগও হল নিখিলের ওপর। এত দুঃসাহস? তা যদি এতই সাহস থাকে তবে শুধু চিঠিতে কেন? এগিয়ে এসো-না?

ভাবলে খুব কড়া ক'রে এবার চিঠি লিখবে। কিন্তু চিঠিখানা পড়ে তার মন ভরে গেল। লিখছে—লুকোচুরি আর আমিও চাই না। এবার সোজাসুজি আত্মপ্রকাশ করব। এ চিঠি তারই দূত। একটা কিন্তু প্রস্তাব করব এবার তোমার মায়ের কাছে। কিন্তু তার আগে তোমার সঙ্গে নিভৃতে আমার কিছু কথা আছে।

বাইরে কার পদশব্দ। উৎকর্ণ হয়ে শ্যামলী তাড়াতাড়ি চিঠিটা লুকোবার চেষ্টা করল।—ঘরে ঢুকলেন মা।

—এভাবে অশান্তি বাড়িয়ে তুলে লাভ কী? যখন তোমার কাকীমার ওপর নির্ভর করেই চলতে হবে তখন—

শ্যামলী তৎক্ষণাৎ কোনো কিছু বিবেচনা না করেই মায়ের হাতে খোলা চিঠিখানা এগিয়ে দিল।

মায়ের হাতটা লজ্জায় কাঁপল—কিন্তু কৌতূহলও যথেষ্ট। চিঠিখানি নিলেন—আর ঠিক সেই সময়ে ভলি এসে হাজির।—ও কার চিঠি আন্টি মা?

শ্যামলীর মা চমকে উঠে এমনভাবে চিঠিখানা লুকোবার চেষ্টা করলেন যে, ভলির বুঝতে কিছু বাকি রইল না। সে ঠোঁট টিপে হেসে একবার শ্যামলীর নতমুখের দিকে আর একবার তার আন্টির চোখের দিকে তাকিয়েই হাসতে হাসতে ছুটে চলে গেল। খবরটা এখনই মাকে দিতে হবে।

এবার রঙ্গমঞ্চে কাকীমা স্বয়ং আবির্ভূত হলেন। তিনি বললেন মা-মেয়েতে মিলে যে বেহায়াপনা শুরু হয়েছে তা তিনি আর বরদাস্ত করবেন না। হয় নিখিলের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে হবে, নইলে বাধ্য হয়ে দু' বাড়ির পাঁচিলের মধ্যে যে গরলা তা চিরদিনের মতো এঁটে দেওয়া হবে।

এ পর্যন্ত তবু সহ্য হচ্ছিল, কিন্তু সর্বশেষে তিনি আর একটি আদেশ জারি করলেন—কাল থেকে শ্যামলী আর কলেজ যেতে পাবে না।

শ্যামলী এইবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কিন্তু সে কান্না নিষ্ফল।

ভাগ্যের বিদ্রূপ—ঠিক এমনি সময়ে চাঁপাকুই থেকে একটি আবার বিয়ের সম্বন্ধ এল শ্যামলীর জন্যে। কিন্তু শ্যামলী এক কথায় না বলে দিল। পাত্রপক্ষ মাথা নিচু করে ফিরে গেল।

সপ্তাহ তিনেক পরে এক শনিবার নিখিল নিজেই এসে পড়ল। অনেক দিন হল শ্যামলীর কাছ

থেকে কোনো চিঠি পায়নি। এমন তো হয় না। তবে কি শ্যামলীর মনের পরিবর্তন হল? কিছুই আশ্চর্য নয়। এইসব গ্রামের মেয়েদের সে জানে। এদের ভালোবাসা যত গভীর, সাহস তত নেই। তার ওপর চক্ষুলজ্জা তো আছেই। তাই ব্যাপারটা বুঝে নেবার জন্যে সে দুঃসাহসে ভর করে নিজেই চলে এল। সে জানত, এমনিতেই সে এখন গ্রাম সকলের চক্ষুশূল, তার ওপর ওভাবে সোজাসুজি শ্যামলীকে চিঠি লেখায় নিশ্চয় অশান্তি আরও ঘনা পাকিয়েছে। তবু সবকিছুই মোকাবিলা করার জন্যে সে এল।

বাগানের পথ দিয়েই এল। কিন্তু সেই জানলায় কাউকে দেখা গেল না। সেখানে আজ অবশ্য শ্যামলীর দাঁড়াবার কোন কথা ছিল না, কারণও ছিল না—তবু নিখিল যেন মনে মনে আশা করেছিল।

এবার সে বাড়ি ঢুকল।

—অধীর!

শ্যামলীর মা বেরিয়ে এলেন। নিখিলকে দেখবেন আশা করেন নি। একটু চমকে গেলেন। নিজেকে সামলে নিয়ে শুধু বললেন, ও তো এখন ও-বাড়িতে নেই। ও-বাড়ি গেছে।

বলেই রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন। বলতে পর্যন্ত বললেন না। আবার মুখের ওপর দরজাও বন্ধ করে দিলেন না।

নিখিল কী করবে ভাবতে লাগল। শ্যামলী ও-বাড়ি গেছে শুনতে ভালো লাগল না। তবু ও-বাড়ি তো খুব দূর কিছু নয়। ডেকে দিতে কতক্ষণ? কিন্তু মাসিমা যেন ডেকে দিতে চাইলেন না।

এমনি সময় অধীর ফিরল বল খেলে।—আরে নিখিলদা! অনেক দিন পরে যে? এখানে এমনি করে দাঁড়িয়ে? দিদির সঙ্গে দেখা হয় নি?

নিখিল একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে, না। দিদি বোধ হয় ও-বাড়ি।

—এখনো ফেরেনি! শোভনদা বোধ হয় ছাড়ছে না। দাঁড়ান ডেকে দিচ্ছি।

নিখিল খপ্ করে অধীরের হাত চেপে ধরে বললে, না, ডাকতে হবে না। আমি বরঞ্চ পরে আসব। শোভনদা কে?

—দিদিদের কলেজের প্রফেসার। আমার কাকীমার মামাতো ভাই। কিছুদিন হল এসেছেন। এখানে প্রায় আসেন। আমাদের বাড়িও অনেকক্ষণ বসেন। কাল সকালে তো মা ওঁকে নেমন্তন্ন করেছেন।

শুনতে শুনতে নিখিলের ধমনীতে ধমনীতে রক্তস্রোত দ্রুততর হল। কোনোরকমে অধীরের হাত ছাড়িয়ে সে বললে, আচ্ছা আমি এখন চললাম।

—দিদির সঙ্গে দেখা করবেন না?

—কাল করব। বলেই নিখিল চলে গেল।

শ্যামলী ফিরল আরও কিছুক্ষণ পরে। শ্যামলীর মা জিজ্ঞেস করলেন, শোভন চলে গেল?

—হ্যাঁ।

—বাস পাবে?

—না পেলে ফিরে আসবেন।

—কাল আবার আসতে ভুলে যাবে না তো?

শ্যামলী হেসে বললেন, উনি ভোলবার চেষ্টা করলেও কাকীমা ভুলতে দেবেন না। জামাকে পিঁট বেঁধে দিয়েছেন।

এত কথা বললেন তবু শ্যামলীর মা ইচ্ছে করেই নিখিলের কথা জানালেন না। বেশ কিছু কাল আসেনি, নিশ্চিন্তে ছিলেন। আবার এসেছে। না জানি আবার কী অশান্তি ঘনিয়ে ওঠে।

কিন্তু শ্যামলী নিজের ঘরে ঢুকতেই অধীর বলে উঠল—দিদি, তুই কীরে! নিখিলদা এতক্ষণ তোর জন্যে বসে বসে চলে গেলেন।

শ্যামলী যেন চমকে উঠল।—নিখিলদা!

—হ্যাঁ রে, আজই এসেছেন কলকাতা থেকে।

—আমায় ডাকলি নে কেন?

—ডাকতে যাচ্ছিলাম, নিখিলদাই বারণ করলেন।

শ্যামলীর মুখটা মুহূর্তে ম্লান হয়ে গেল। সে যেন সব বুঝতে পারল। বললে কাতর স্বরে, তুই একটা কাজ করনা ভাই, একবার ছুটে যা ওদের বাড়ি। গিয়ে ওকে বলবি, দিদি ডাকছে। একটি বার যেন আসেন।

অধীর একটু আপত্তির সুরে বললে, বাঃ রে, এখুনি মাকে নিয়ে যে রামায়ণ শুনতে যাব।

—তার আগে এক ছুটে বলে আয়-না। তুই তো ভালো ফুটবল খেলিস—এইটুকু দৌড়তে পারবি না?

প্রথমে নিখিলের আসতে ইচ্ছে করেনি। অধীর তবু যখন বলতে লাগল, না গেলে দিদি খুব রাগ করবে, আমাকে বকবে—তখন নিখিল বললে, মাথা ধরেছে, যদি ভালো থাকি তাহলে একটু পরে যাব।

অধীর চলে গেলে নিখিল উঠে বসল। আজ অনেক দিন শ্যামলীর সঙ্গে দেখা নেই। যখন ও ডেকে পাঠিয়েছে তখন যেতে ক্ষতি কী? একথা মনে হতেই, এতক্ষণ সেই নবাগত নায়কটির সঙ্গে শ্যামলীর যে কাল্পনিক সম্পর্ক তৈরি করে নিজের বুকে নিজেই বারে বারে ছুরি মারছিল—এখন সেই ক্ষতে প্রলেপ লাগাতে ব্যস্ত হল। আবার আগের সেই পুরনো প্রেমিক মন নিয়ে শ্যামলীদের বাড়ির দিকে চলল। সদর রাস্তা দিয়েই চলল—কারণ, শ্যামলী আজ তাকে ডেকেছে। সব দায়িত্ব আজ শ্যামলীর।

অনেকদিন পর দুজনের এই সান্নিধ্য লাভ। সেই বাইরের ঘরটি—যেখানে একটি মাদুর পেতে ওরা দুজনে বসে স্বচ্ছন্দে গল্প করত। ঘরের এক কোণে টিম টিম করে লণ্ঠন জ্বলছিল। ইচ্ছে করেই আলোটা কমানো। সমস্ত ঘরে কেমন যেন ছায়া-ছায়া ভাব। নিখিল এসে দাঁড়ালো। শ্যামলীও দাঁড়িয়ে। দুজনেই যেন দুজনের কাছে অপরাধী। নিখিলের অজস্র জিজ্ঞাসা। তার মধ্যে বোধ হয় প্রথম কথা—কেন চিঠির উত্তর দাওনি? শ্যামলীরও জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। হয়তো প্রথম প্রশ্ন—আমার সঙ্গে দেখা না করেই চলে গেলে?

কিন্তু অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বলতে পারল না। শ্যামলী কেমন একরকম ভাবে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল নিখিলের চোখের দিকে। নিখিল সে দৃষ্টি সহ্য করতে পারছিল না। মনে হচ্ছিল ঐ দৃষ্টিতে যেন কেমন একটা সম্মোহনী শক্তি আছে। ঐ দৃষ্টি তাকে যেন আকর্ষণ করছে। এখনি বুঝি ভয়ংকর কিছু একটা করে ফেলবে।

এমনি সময়ে শ্যামলীই প্রথম কথা বলল, তুমি কখন এসেছিলে?

নিখিল বললে, বিকেলে। ট্রেন থেকে নেমেই।

—চলে গেলে কেন?

—শরীরটা খারাপ করছিল, জ্বর জ্বর ভাব।

শ্যামলী হঠাৎ এগিয়ে এল কাছে—একেবারে নিখিলের বুকের কাছে। তারপর দুপায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে নিজের গালের ওপর ওর কপালটা টেনে নিয়ে উত্তাপ পরীক্ষা করল।

ঠিক সেই সময়ে বাইরে কিসের যেন শব্দ। নিখিল চমকে উঠল। শ্যামলী হেসে বললে, রান্নাঘরের টিনের ওপর পিটুলি পড়ল।

নিখিল যেন একটু লজ্জিত হল।

—কই জ্বর তো তোমার হয়নি।

নিখিল নিরুত্তর।

—এখানে এসে আমায় দেখতে পাওনি বলে খুব রাগ করেছ না?

নিখিল সে কথার জবাব না দিয়ে বললে, এ বাড়িতে এবারের এই আসা কতখানি তা ভাবতে পার?

—পারি।

—কার জন্যে এসেছিলাম?

শ্যামলী নিখিলের হাতটা নিজের মুঠোয় শক্ত করে ধরে বুকের ওপর টেনে নিয়ে বললে, আমার জন্যে।

নিখিল আবেগকম্পিত স্বরে বললে—এবাড়ি-ওবাড়ির এত অবহেলা আর ভ্রূকুটি সহ্য করেছি কার জন্যে বলতে পার?

শ্যামলীর দুচোখ জলে ভরে উঠল। রুদ্ধরোদন-কণ্ঠে বললে, আমার জন্যে—আমার জন্যে—।

নিখিল আস্তে আস্তে শ্যামলীর মুঠো থেকে নিজের হাতটা সরিয়ে নিচ্ছিল। শ্যামলী ছাড়াতে দিল না। আরো শক্ত করে ধরে রইল।

নিখিল বললে, কেউ যদি এই সময়ে এসে পড়ে—

—কেউ আসবে না। অধীরকে নিয়ে মা গেছে রামায়ণ শুনতে। ওবাড়ির দরজায় খিল দিয়ে দিয়েছি।

আবার চুপচাপ কয়েক মুহূর্ত।

নিখিল ভাবছিল, চিঠির উত্তর দেয়নি কেন এখনি জিজ্ঞেস করবে কিনা। ভয় হচ্ছিল—যদি বলে ও চিঠির আর উত্তর কী দেব—তাহলে এই মুহূর্তে এই নির্জন ঘরটিতে যে স্বর্গলোক গড়ে উঠেছে তা যে একান্ত অসময়ে চুরমার হয়ে ভেঙে যাবে। তাই সে চুপ করেই রইল।

শ্যামলী গাঢ়স্বরে বললে, তুমি আজ আমায় এতখানি আঘাত দিলে কেন?

—আঘাত তো আজকাল দিইনি। তুমি ওবাড়ি ছিলে তাই ডাকিনি। আর মাসিমাও তো আমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলেন নি। তাই চলে গেলাম। ছোটো মাসির সঙ্গে এখন বোধ হয় তোমাদের আর তেমন অশান্তি নেই।

শ্যামলী কিছুক্ষণ নিখিলের মুখের দিকে তাকিয়ে যেন বোঝবার চেষ্টা করল। তারপর হেসে বললে, তুমি যা জানতে চাইছ তা আগে পরিষ্কার করে বলি।—তোমার চিঠি নিয়ে কী যে অশান্তি হয়ে গেল তা বোঝাতে পারব না। কাকীমা এবাড়ি এসে জানিয়ে দিলেন তোমার সঙ্গে আমরা যেন আর

যোগাযোগ না রাখি। পাছে চিঠিপত্র লিখি তার জন্যে বাড়ি থেকে বেরোন বন্ধ হল—কলেজ যাওয়াও নিষেধ। সঙ্গে সঙ্গে পাত্রের সন্ধান। বাংলাদেশে তো মেয়ের অভাব নেই। যেমন-তেমন একটা পুরুষের সঙ্গে ভিড়িয়ে দিলেই হল। আমি এই প্রথম বাড়ির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলাম। পাত্রপক্ষ ফিরে গেল।

কিন্তু কলেজ যাওয়া? বাড়ি থেকে বেরোতে না পারলে তোমায় চিঠি দেব কেমন করে? দুর্ভাবনায় ঘুম হয়না। কেবলই ভয় হচ্ছে, তুমি না জানি কী ভাবছ! এমনি সময়ে ভগবানের আশীর্বাদের মতো এলেন শোভনবাবু। আমাদের কলেজের নতুন প্রফেসর। জানা গেল কাকীমার সঙ্গে তাঁর খুব আত্মীয়তা—নিজের মামাতো ভাই। উনি এলেন আমার সঙ্গেও আলাপ হল। জিজ্ঞেস করলেন—পড়ছ না?

আমি চুপ করে রইলাম। কাকীমা ছিলেন সামনে। কী আর বলেন—একটু মিথ্যে কথাই বললেন—হ্যাঁ, পড়ছিল তো—তবে খুব দুর!

শোভনবাবু হা-হা করে হেসে উঠলেন। বললেন—এযুগে দূর বলে কিছু নেই। দূরত্ব আজ মানুষের আয়ত্তে।

কাকীমা চুপ করে রইলেন। তারপর হঠাৎই মত দিয়েছেন কলেজে যাবার।

শ্যামলী একটু থামল। একবার দেওয়াল-ঘড়িটার দিকে চকিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিল। তারপর বলল, আজও তিনি ও বাড়ি এসেছিলেন। আমায় ডেকেছিলেন শোভনবাবু। এঁকে কাকীমার ভাই, তার ওপর আমাদের প্রফেসার। ভদ্রতাটুকু তো করতে হবে।

সেটুকু অবশ্য নিখিলও জানে। তবু আরও কিছু শোনার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল। কিন্তু শ্যামলী আর কিছু বলল না।

এমনি সময়ে রাস্তায় আলো দেখা গেল। শ্যামলী চমকে উঠল। অধীর ফিরে আসছে।—

—আমি তবে যাই?

শ্যামলী ফিস ফিস করে বললে, এসো।

বাড়ি ফিরে এসে নিখিল কিছুতেই তবু মন থেকে সব গ্লানি ঝেড়ে ফেলতে পারল না। শ্যামলী সবই বলল, কেবল বলল না, কাল রবিবার তাদেরই বাড়িতে শোভনবাবুর সাদর নেমন্তন্ন আছে।

পরের দিন রবিবার। নিখিল সাধারণত সকালের দিকে পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করে, চায়ের দোকানে বসে চা খায়। কিন্তু আজ কি মনে হল বেলা দশটা নাগাদ হঠাৎ গিয়ে হাজির শ্যামলীদের বাড়ি। জানত, এসময়ে তাকে দেখে শ্যামলী আশ্চর্য হবে, হয়তো বিরক্তও হবে। তবু ইচ্ছে করেই গেল।

বাড়ির কাছে যেতেই সেই বাইরে ঘরে শোনা গেল শ্যামলীর উচ্ছ্বসিত হাসির ঝংকার। সেই সঙ্গে অপরিচিত কোনো পুরুষের রহস্যালাপ। ঘরে বোধ হয় ছোট মাসিও ছিলেন। নিজের ভাইটির আদর যত্ন কেমন হচ্ছে দেখতে এসেছেন সম্ভবত।

স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইল নিখিল। কী করবে এখন? যে সন্দেহ মোচনের জন্য এসেছিল তা তো প্রমাণিত হল। তাহলে? চুপি চুপিই ফিরে যাবে?

এমনি সময়ে জানলার সামনে ডলি এসে দাঁড়ালো। শাড়ি পরেছে, চোখে কাজল, ঠোঁটে অপরিণত হাতে রঙের প্রলেপ। অনেকদিন পর নিখিলকে দেখে অবাক হল। তার পরেই ঠোঁটের একটা ভঙ্গি করে শ্যামলীকে ডেকে বললে, এদিকে এসো গো ছোড়দি। তোমায় ডাকছেন বোধ হয়।

শ্যামলী এল এবার। জানলার গরাদ ধরে দাঁড়ালো। একটু আগের হাসির ছটা এই মুহূর্তে

মিলিয়েছে। মুখের ওপর তারই অন্ধকার। একটু বিব্রত গাম্ভীর্যে বললে, এখানে দাঁড়িয়ে? ভেতরে আসুন!

নিখিল বললে, না, সময় নেই। আমি দুপুরের ট্রেণেই আজ কলকাতায় চলে যাচ্ছি। তাই জানাতে এলাম।

ঠিক সেই মুহূর্তে শ্যামলী কী বলবে ভেবে পেল না। পেছনে শাসনের ত্রুটি আর সামনে নিখিল দ্রুত পায়ে বাগানের পথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ব্যাণ্ডেল-কালনা রুটে বাস চলেছে নিয়মিত। কন্‌ডাক্টার হাঁকছে—হাজরা পাড়া—বলাগড়—পুঁইকোলড়া ঘোষপুকুর!—

সকাল সাড়ে নটার বাসের কন্‌ডাকটার এইখানে এসে অপেক্ষা করে। একটি প্যাসেঞ্জার উঠত নিয়মিত। ঐ যে দেখা যাচ্ছে দূরে মাঠের ওপর সবুজ শাড়ি!—যেন মূর্তিমতী বনদেবী এগিয়ে আসছে।

কিন্তু আজ যেন বাস ধরার তাড়া নেই। এ বাস কি ছেড়ে যেতে? কন্‌ডাকটার একবার হাঁক দেয়—কালনা—কালনা—

সে ডাক হয় তো শ্যামলীর কানেও যায়। কিন্তু তার মন এখন চঞ্চল। বাসের আশা ছেড়ে দিয়ে সে নেমে পড়ে সেতলা-তলার মাঠে।

আবার সেই বুড়ো বটগাছ। আবার সেই লাল লেটারবক্স। বইয়ের ভেতর থেকে বের করল খামখানা। ঠিকানাটা ভালো করে দেখল ঠিক লেখা হয়েছে কিনা। অনেক রাত জেগে অনেক কথা লিখেছে। তার প্রত্যেকটি অক্ষর যেন ক্লান্ত মানুষের মতো কথা বলছে।—তুমি আমায় অবিশ্বাস কোরো না—অবিশ্বাস কোরোনা। আমি যে কী সমস্যায় পা দিয়েছি একমাত্র অন্তর্যামী ছাড়া আর কেউ তা জানবে না। তুমি সামনের সপ্তাহে এসো। সোজা বাড়ির ভেতরেই এসো। একটু কথা বলতে না পারলে আমি আর বাঁচব না। সোভনবাবুকে দেখলে আমার এখন রাগ হয়। মনে হয় উনি আমার সর্বনাশ করতে এসেছেন। কিন্তু আমার বলবার কিছু নেই। কাকীমার ভাই! তার ওপর মায়েতে কাকীমাতে নিত্য কী সব পরামর্শ চলেছে। মনের এ অবস্থায় তুমিও যদি এমনি করে ভুল বোঝ আমি তা হলে ভরসা করি কার ওপর? চিঠিটা ফেলে দিয়ে আরও একবার শ্যামলী ভালো করে হাত দিয়ে দেখে নিল, টিনের কোনো খাঁজে আটকে গেছে কি না। তারপর দ্রুত পায়ে চলল বাস রাস্তার দিকে। সাড়ে নটার বাসটাতো চলে গেছে। এখন পরেরটা।

নিখিল এল না। তবে চিঠির জবাব এল যথাসময়েই। সে চিঠি পড়ে শ্যামলী মর্মাহত হল। নিখিল লিখছে—সমস্যা? অবশ্যই সমস্যা। তাই রাখি, না ভুল রাখি! আমি বলি, ভুলই রাখো। আজ যে পরিজন—কাল সে প্রিয়জন হতে বাধা কী?

সেই রাত্রিরেই শ্যামলী লিখল—তবুও আমায় এত অবিশ্বাস! বাড়িতে অতিথি এলেই কি সে প্রিয়জন হয়ে যায়? ভালোবাসা এতই সহজ?

চিঠিটা লেটারবক্সে ফেলে দিয়ে আর আর হাতড়ে দেখল না শ্যামলী। এ জগতের সব কিছুর ওপরই যেন কেমন বিতৃষ্ণা জন্মে যাচ্ছে। এমন কি এই লেটারবক্সটির উপরেও।

যথাসময়ে উত্তর এল নিখিলের কাছ থেকে।—বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়। এইই সত্য। যেখানে সকলের আনুকূল্য মেয়েরা সেখানেই সহজে সম্মত। অশান্তির ঝড় মাথায় করে দীর্ঘদিন অনিশ্চিতের পথে

চেয়ে থাকার ধৈর্য সব মেয়েদের নেই। চোদ্দ বছর বয়েস থেকে মেয়েরা যখন নিজের দেহের দিকে তাকাতে শেখে তখন থেকেই যে শুরু হয় তাদের দিন গোনা।

আবার শ্যামলী এসে দাঁড়ালো সেই বটগাছ তলায়। আবার সেই লেটার-বক্স। জিভ দিয়ে খামের মুখটা ভিজিয়ে নিল। মুখটা আঁটবার আগে কী মনে হল আর একবার পড়ল চিঠিখানা। না, একটা লাইন যোগ করা হয়নি। খুট করে ব্লাউজে-গোঁজা পেনটা বের করলে। লিখলে একটা লাইন—আমাকেও কি সেই সব দেহসর্বস্ব মেয়ের দলে ফেললে?

সে চিঠির জবাব আর এল না। শ্যামলী চিঠির জন্যে অপেক্ষা করেই চলে।·· নিষ্ফল সে প্রতীক্ষা।

দীর্ঘদিন কেটে গেল এর পর। শেষ হয়ে গেল শ্যামলী-নিখিলের প্রণয় ইতিহাস। অসমাপ্ত সে ইতিহাস। অথবা এইই হয়।

তবু মানুষের জীবনতো চরে-আটকানো কাগজের নৌকোর মতো এক জায়গায় থেমে থাকে না। শুরু হল আর এক অধ্যায়।

মা অন্তর্যামী—তাই আকে পাকা কথা দেবার আগে মেয়েকে আড়ালে ডেকে বললেন, নিজের মন বুঝে কথা দাও। ওখানেই রাজি তো?

শ্যামলী নিঃশব্দে মাথা নাড়ল।

না! চমকে উঠলেন শ্যামলীর মা।

—বিয়ে করবি না?

যদি করতেই হয় এখানে নয়, চাঁপাকইয়ে।

—সে কী! সে ছেলে যে একটা পাশও দেয়নি! সে যে কোনো অংশে তোর যোগ্যই নয়।

শ্যামলী তার কোনো জবাব দিল না। উদ্গত চোখের জল ঠোঁট টিপে সামলাতে সামলাতে ঘরের ভেতর চলে গেল।

বিয়ে চাঁপাকইতেই হল। সেদিন সে কী দুর্যোগ! কড় বৃষ্টিতে সব আয়োজন লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। তবু বিয়েটা হল।

পরের দিন। গোরুর গাড়ি চলেছে বাস-রাস্তার দিকে। এ গ্রামের মেয়ে বধূ হয়ে চলল অন্যগ্রামে। বড়ো সুন্দর লাগছিল আজ শ্যামলীকে। রাত-জাগা চোখে কাজল—সিঁথি ভ'রে টকটকে সিঁদুর।

আজও আকাশ মেঘলা। সে মেঘে বৃষ্টি হয় না। শুধু বিষণ্ণ ছায়া-ছায়া ভাব। শ্যামলী ছইয়ের ফাঁক দিয়ে দেখতে দেখতে যাচ্ছিল। নিমগাছটা প্রতি বছরের মতো এবারও ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে। গোলকচাঁপার গাছটা যেন আলো হয়ে আছে। ঐ যে নিখিলদের বাড়ি। যেমনভ হচ্ছিল—শেষ হয়নি। এ অবস্থা নিশ্চয়ই চিরদিন থাকবে না। শুধু অসমাপ্ত থেকে গেল আর-একটা দিক। এ জীবনে আর তা সম্পূর্ণ হবে না। গাড়ি এল পেতলাতলায়। ঐ যে সেই বুড়ো বট গাছটা!

শ্যামলী ভেবেছিল ওদিকে কিছুতেই তাকাবে না। কিন্তু পারল না। ফিরে তাকাতেই হল।—

লেটার-বক্সটা নেই।

বোধহয় কালকের ঝড়ে মরচে-পড়া তারের বাঁধন ছিঁড়ে গাছের তলায় ভেঙে পড়ে আছে।

লুণ্ঠন পর্ব

(ছোট গল্প)

শক্তিপদ রাজগুরু

ভোর হবার মুখে গাছ গাছালিগুলোকে ভিজে ভিজে বোধহয়, পাখীদের ঘুম ভেঙেছে। ওরা ডাকাডাকি করে বাসা ছাড়বার আয়োজন করছে। তাদের মধ্যে দুচারটে পাখী বোধহয় একটু চালাক আর দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন, কিছু কেরাণী আছেন যারা দেরী করে অফিস যাওয়াটাকে অপরাধ বলে মনে করেন, উঠি কি পড়ি করে তারা সাত সকালেই বাড়ির লোকদের অতিষ্ঠ করে স্নান খাওয়া সেরে অফিস দৌড়বেন, কিছু পাখীও বেন তেমনি।

সকাল হবার আগেই কলরব কিচির মিচির করে তারা বাসা ছেড়ে শশব্যস্তে বের হয়, খাবারের সন্ধানে। তারপর আলো জাগে।

এখানের আলো জাগার রূপটাকে শ্রীনিবাসবাবু দীর্ঘ কয়েক বৎসর ধরে দেখে আসছে, কারণ এই খানে বাড়ি করেছে অনেক আগে। অবশ্য বাড়ি বলতে যা বোঝায় এ তা নয়।

তখন চারিদিকে ছিল জলা আর ধানক্ষেত। ষ্টেশনটা অনেক দূরে। এদিকে কেউ এগোতো না। জলায় ছিল হোগলার বন আর আগাছার জঙ্গল। তখনই শ্রীনিবাসবাবু অফিস এর কোঅপারেটিভ থেকে ধার নিয়ে গিন্নীর হার বিক্রী করে আড়াই কাঠা জায়গা কিনেছিল।

গিন্নী অন্নপূর্ণা বলেছিল ওমা, এতো জলা—হোগলা বন। এখানে বাড়ি হবে কি করে? একেবারে মাঠের মধ্যে!

অবশ্য সে আজ পঁচিশ বছর আগেকার কথা। শ্রীনিবাসের মনে পড়ে এখনও স্পষ্টভাবে। স্মৃতির আলোয় তা আজও বর্ণময়। অন্নপূর্ণাকে আশ্বাস দিয়েছিল শ্রীনিবাস—দেখবে এমন থাকবে না। বাড়ি ঘর অনেক উঠবে। রাস্তাঘাট হবে।

অর্থাৎ তারাও নিজেদের বাড়িতে বাস করবে। দিন বদলাবে। নীতিশ তখন ছোট, সেও এসেছিল বাবা মায়ের সাথে জায়গা দেখতে। ছোট ছেলেটার দুচোখে কৌতূহল। কোলকাতার বিল্ডি একতলায় এঁদো স্যাতসেতে বাড়ির কোনে পড়ে থাকে—সূর্যের আলোয় মুখ দেখেনি, সেই ছেলেটা হঠাৎ এখানে এই ফাঁকার মধ্যে এসে খুশীতে আত্মহারা হয়ে ওঠে।

—কবে বাড়ি হবে মা?

অন্নপূর্ণার কাছে এই পরিবেশ বিশ্রী লাগে। কলকাতার ওই ঘিঞ্জীর মধ্যে থেকেও সহরের ভক্ত হয়ে উঠেছিল সে। সপ্তাহে তবে সিনেমায় যাবে তারই পথ চেয়ে থাকতো, তাছাড়া অন্নপূর্ণা স্বামীর সামান্য মাইনের মধ্যেও নিজে ছিমছাম থাকার চেষ্টা করতো। তার নিজের রূপ সম্বন্ধে একটা চাপা গুমোরও ছিল। আর সেটাকে সে পাড়াপড়শীর সামনে একটু জাহির করতে পেরে খুশীই হতো।

এখানে এই ফাঁকা মাঠে, জলার ধারে তার সেই রূপ কিছুই থাকবে না।

আচ্ছা নেই, সিনেমা থিয়েটারও হামেশা দেখা হবে না। একটু সেজেগুজে বৈকালের দিকে গোলদিঘীর দিকে বেড়াতে যায়—অনেকেই তার দিকে চেয়ে থাকে।

এখানে সেসব কিছুই নেই। অন্নপূর্ণা ছেলের কথায় বলে,

—জানিনে বাছা। খুঁজে খুঁজে আর জায়গা পেলে না তোর বাবা! যমের!

শ্রীনিবাস সেদিন চুপ করেই ছিল। ও বোঝাতে পারে না তার স্ত্রীকে যে সামান্য চাকরী করে কলকাতার বুকে বাড়ি করার স্বপ্ন দেখা বাতুলতা মাত্র। তাদের ওই আলো কলমল জগৎ থেকে সরে থাকতেই হবে। সেখানে তাদের ঠাঁই নেই।

সংসারের বোঝা একে একে বাড়তে থাকে।

দীর্ঘ পঁচিশ বছরে অনেকগুলো দাগই পড়েছে শ্রীনিবাসের বুকে, মাথের গুটিতে বয়সের অতিক্রমণের আঁকর রেখে যায় প্রকৃতি, সেটা তার সঙ্গে মিশিয়ে থাকে, শ্রীনিবাসের দেহে মনে সেই কালাতিক্রমণের দাগটা বাইরেও পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

রূপ বদলেছে এখনকার, দিন বদলেছে সারা দেশের—সমাজের, আর ভাবনাও পরিবর্তিত হয়েছে। শুধু পরিবর্তিত নয়, সব ভাবনাগুলো কি প্রচণ্ড ধাক্কায় সব বাঁধন আর শালীনতা হারিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।

—এই যে! উঠেছো সাতসকালে আর উঠেই চা চা রব। আর পারি না।

টেবিলের উপর ঠক্ করে চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে দিল অন্নপূর্ণা।

শ্রীনিবাসবাবু জানলার বাইরে চেয়েছিল, পুবের আকাশ করসা হয়ে গেছে, ওস্তাদের বাড়ির নারকেল গাছের পাতায় সকালের আলো পড়ে সবুজ হলুদ রং ধরেছে, ওদিক থেকে কাকের চীৎকার কলরব শোনা যায়।

সকালের আলো একফালি এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে, অন্নপূর্ণার মুখে পড়েছে সেই আলো। অন্নপূর্ণার চেহারাও বদলে গেছে। পঁচিশ বছরেই তার সেইরূপ পুড়ে বিবর্ণ কালচে হয়ে গেছে, চুলের সাদা রংটা আজ প্রকট। নিটোল স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে। সেই সুশ্রী মেয়েটা আজ সংসারের অভাবের চাপে আর আঘাতে বয়স বুড়িতে পরিণত হয়েছে কণ্ঠস্বরে জমেছে ততই জ্বালার কাঠিন্য।

অন্নপূর্ণা বলে—একটু ঘুরে ফিরে এসো, ঘরে বসে থাকলেই চলবে? আর ও চা সিগ্রেটটা ছাড়ো। খর্চা কতো পড়ে ওতে মাস মাস তা জানো?

অন্নপূর্ণা এইবার শ্রীনিবাসবাবুর ওই বিলাসটুকুর দিকে নজর দিয়েছে। বিলাসই। চায়ের দাম বাড়তে বাড়তে কোথায় এসে ঠেকেছে তা সবাই জানে। দু'আনা পাউণ্ডের চা আজ দাঁড়িয়েছে পাঁচ টাকায় চিনি দুধও বেড়েছে সেই হারে। আর দশ পয়সা প্যাকেটের সিগ্রেট-এর দর এখন আসমান ছুঁই ছুঁই করছে।

—যাপি।

মেয়ে ঘরে ঢুকলো। পঁচিশ বছর আগের হিসাবে মেয়ের চাই কি সে নয়।

কুন্তলা বলে,—তোমার অফিসের দরখাস্তটার একটু তদ্বির করোনা? তাহলে চাকরীটা হয়ে যায়।

শ্রীনিবাসবাবু মেয়ের দিকে চাইল, ওকে সুন্দরীই বলা যায়। তবু কুন্তলার দেহে মনে কোন জেল্লা আর চাকচিক্য নেই, শুধু অন্নপূর্ণার মুখ আর দেহের আবেশটুকু মাত্র পেয়েছে।

বিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল শ্রীনিবাসবাবু, কিন্তু একসঙ্গে এতটাকা যোগাড় করার সাধ্য তার ছিল না, রোজকার সংসার চালিয়ে একজন অতিসাধারণ কেরাণীর সঞ্চয় কিছু থাকে না যা দিয়ে এইসব ঘায় মেটানো যেতে পারে। তবু আশা করেছিল তার ছেলের উপর। নীতিশ হয়তো তার পাশে দাঁড়াবে, তাই ওকে পড়াবার চেষ্টা করেছিল তার জন্য ধার কর্জও করেছিল। অফিসের দারোয়ান বাবুদের কাছেও টাকা ধার করেছিল শ্রীনিবাসবাবু। বাড়ি এই কুলপিটুকু দাঁড় করাতেই সর্বস্বান্ত হয়েছিল।

তারপর চরম আঘাত দিয়েছিল তার ছেলে নীতিশ।

চাকরীতে রিটায়ার করার সময় এসেছে বয়স হয়ে গেছে এতখানি পথ হেঁটে স্টেশনে গিয়ে ওই ঠাসা বোঝাই ট্রেনে উঠে শিয়ালদহ অবধি গিয়ে আবার অফিস পর্যন্ত হাটতে শরীর নারাজ হয়েছিল অনেকদিন আগেই। তবু যেতে হতো তাকে। কারণ সংসারের বিরাট বোঝা তার ঘাড়ে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছে, তাই অফিসের বড়সাহেবকেও বলেছিল।

—দু এক বছর এক্সটেনশন দিন স্যার।

বড় সাহেব পাইপটা মুখ থেকে নামিয়ে ওর জরাজীর্ণ চেহারার দিকে চেয়ে জবাব দিলেন না। ফাইলের পাতা উলটে যান—যেন জবাব দেবার দরকারই বোধ করেন না। বের ঘরে এল শ্রীনিবাস।

বড় সাহেব ওর আবেদনে কর্ণপাত করেননি, আর ছোট সাহেব তো চটে আগুন,

—আপনাকে কে ওঁর ঘরে যেতে বলেছিল?

শ্রীনিবাসের পায়ের নীচে থেকে মাটি সরে গেছে তখন। নিজের সংসারের ভাবনা আর পেটের জ্বালাই তাকে এই পথ নিতে বাধ্য করেছিল।

—জবাব দিন! ছোট সাহেবের গলা গর্জে উঠেছে।

শ্রীনিবাসবাবু জানায় - ছেলেটাও কথা শুনল না। ভেবেছিলাম পাশে দাঁড়াবে।

এদিকে মেয়েরও বিয়ে দিতে পারিনি, সংসার চালাই কি করে? তাই লিখেছিলাম।

—আপনার সংসারের ভাবনা ভাবার কথা অফিসের নয়। রিটায়ার করবার সময় হয়েছে, চলে যাবেন। টেন্‌স্যালিড লোকদের পুষবার জন্য এটা দাতব্য নয়।

—চুপ করে রইলেন যে বাবা? কুন্তলা বাবার এই ভাবনাগুলোর খবর সঠিক জানে না। শ্রীনিবাস-বাবুর চোখের সামনে এই ভাবনাগুলো ভিড় করে আসে, ওকে যেন গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে ওরা অফিস থেকে, তার জায়গায়। নোতুন লোকও নেওয়া হয়েছে। পরে খবর নিয়ে জেনেছে শ্রীনিবাস লোকটি ছোট সাহেবের কোন আত্মীয়। তাই ওকে তাড়াবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল ছোট সাহেব।

এরপর অফিসে তার মেয়ের জন্য বলতে গিয়েছিল, কিন্তু সেখানেও কোন ফল হয় নি। চাকরীর উপর নাকি পুরুষানুক্রমিক কোন দাবী জানোও থাকতে পারে না ওরা তাই জানিয়ে দিয়েছিল শ্রীনিবাসকে।

অন্নপূর্ণা বলে—থাম বুদ্ধি। ইস্কুলে যা যাইনে পাস তাই নিয়ে ওই চাকরীই করগে। অফিসে চাকরী করে বেবে তোর বাবা? মুরোদ দেখা আছে। বুকলি, নিগুণে পুরুষের কুলাঙ্গারা চক্কর। মেজাজ

আছে, বলতে হয় তালে ওই মণীবাবুর কথা। সোনার চাকরী করে লোকটা। ছেলে দুটোকে জামাইকে ভাইপোকে কেমন পট্ পট্ করে ঢুকিয়ে দিল। নিজেও এখনও জমিয়ে চাকরী করছে। আর উনি কিনা একটা ছেলে তাকেই চাকরীতে ঢোকাতে পারলো না।

শ্রীনিবাসবাবুর সারামনে একটা বেদনা রয়ে গেছে।

নীতিশ পাশই করতে পারল না, পড়ল না। বিগড়ে গেল।

ধপ্ করে জ্বলে ওঠে অন্নপূর্ণা। ওর মুখের সব কমনীয়তাটুকু আগেই মুছে গিয়ে সেখানে ফুটে উঠেছে কাঠিন্য। মনের ভেতর কেবল একটা আগুন জ্বলে রয়েছে। ও চেয়েছিল অনেক কিছু। পাড়ি-গহনা বাড়ি ছেলের চাকরী মেয়ের বিয়ে—একটু বিলাসের জীবন: আশপাশে দেখেছে অনেককে তার থেকে বেশী কিছু পেতে।

যতই বঞ্চিত হয়েছে অন্নপূর্ণা এই সব থেকে ততই জ্বলে উঠেছে সে মনে মনে সব জ্বালাটাকে ঝেড়েছে ওই শ্রীনিবাসের উপরই, সেই এসব কিছুর জন্য দায়ী।

তবু ছেলের জন্য কোথায় অন্নপূর্ণার মনে একটা নরম জায়গা রয়ে গেছে। স্বামীর রোজকার-এর কদর জানে সে এবং তাই নীতিশের কাজগুলোকে সে সমর্থন করে গোপনে।

কুন্তলা বাবার দিকে চেয়ে থাকে।

অসহায় একটি মানুষ ওরকম তার মনে বেদনা জাগে। ও বেশ বুঝেছে বাবার সাধ্যও নেই। ও চাকরী তার হবে না কোন দিনই।

বেলা বাড়ছে। সকালের গিন্নিপনা রোদ হলুদ হয়ে আসে নারকেল গাছে পাতায়। খোয়াকেলা পথ দিয়ে বাজারে চলেছে লোকজন।

শ্রীনিবাসবাবু জানলার বাইরে চেয়ে থাকে ছেলেমেয়েরা স্কুলে চলেছে, পাড়াগাঁয়ের দিক থেকে তরকারী-শাকসব্জী নিয়ে চাষীরা বাজারে চলেছে, এদিকে বাজার পত্র ছিলনা। সেই জন্য হোগলাবন বুজিয়ে মানুষ এসেছে ঘর বেঁধেছে। সেই সঙ্গে রেল লাইনের ধারে গড়ে উঠেছে বাজার-দোকান। দু একটা কারখানাও গড়ে উঠেছে, তো বাজছে তাদের।

ওই একটানা শব্দটা শান্ত বাতাসকে কর্মব্যস্ততায় সুরে ভরে তুলেছে।

শ্রীনিবাসবাবুদের মত কেরানীর দৈনন্দিন জীবনে ওই বাঁশীর সুরের একটা মূল্য আছে। অন্নপূর্ণা আপাতঃ ওই ঝগড়া মুলতুবি রেখে রান্নাচালা থেকে মরলা স্টোভটা এনে দাঁড়িয়ে দিয়ে বলে—বাজারে যেতে হবে না। ওদিকেতো এখুনি ভাত কোলের সামনে দিতে হবে। পারি না আর সাতসকালে ওই কল্পি পোয়াতে।

কুন্তলা তার হোগলার বেড়াঘেরা ছোট একখানি ঘরে ফিরে গেছে। ও যোগেন্দ্র বিদ্যালয়ের তলাবেকে পাট করা হাতে কাচা শাড়ি ব্লাউজ বের করে সেগুলো পরে বেরবার জন্যে তৈরী হচ্ছে। কলোনীর বেড়াঘেরা একটা স্কুলে বাচ্চাদের পড়ায়। স্পেশাল ক্যাডারের টিচার, বেতন পঁয়ষট্টি টাকা। ওই ওর ভবিষ্যৎ এবং ওই তার বর্তমান।

—বাজারে যেতে হবে না? কি হয়েছে তোমার বলোদিকি? দিনে দিনে হাড়িয়েছো?

অন্নপূর্ণার ঝাঁঝালো কণ্ঠস্বরে শ্রীনিবাসবাবুর চমক ভাঙে।

উঠে দাঁড়ালো লোকটা, ধুতির উপর কতুয়াটা গলিয়ে থলিটা তুলে নিয়ে বেরোবার আয়োজন করে। শুধোয় শ্রীনিবাসবাবু,

নীতিশ কোথায় ?

অন্নপূর্ণা স্বামীর দিকে চাইল। ছেলেটার মতিগতি কেমন বদলে গেছে। কোথায় থাকে—কখন ফেরে কি করে তার কোন হিসাব হদিশ নেই। নীতিশ মাঝে মাঝে রাতবিরেতে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। চেহারায় কঠিন একটা ভাব। কথাবার্তা বিশেষ বলে না সে।

অন্নপূর্ণা প্রথম প্রথম এসব কথা চেপে যাবার চেষ্টা করতো শ্রীনিবাসবাবুর কাছে। ক্রমশঃ সেটা বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নানা কথাও কানে আসে।

নীতিশ মাকে বাবাবার জন্যই মাঝে মাঝে পঞ্চাশ একশো টাকা দিয়ে বলে—কাজ, কারবার করছি। তাই মাঝে মাঝে বাইরে যেতে হয়। বুঝলে, ব্যবসাটা জমিয়ে তুলতে পারলে দেখবে একবার।

অন্নপূর্ণা ছেলের দিকে চেয়ে থাকে। মনে মনে আশা করে স্বামীর আমলে পয়সার মুখ দেখেনি, ছেলে তার সব অভাব দূর করবে। তবু শুধোয় অন্নপূর্ণা।

—কিসের ব্যবসা রে ?

—সে তুমি বুঝবে না।

অন্নপূর্ণা আর বুঝতে চায় নি, মাঝে মাঝে কিছু টাকা পেয়েই খুশী হয়েছে। কিন্তু সেদিন সুজলা কথাটা জানায় মাকে, ওই নীতিশের চলনবলনের কথা।

রাতের অন্ধকারে মাঝে মাঝে নীতিশকে মাতাল হয়ে ফিরতে দেখেছে অন্নপূর্ণা। শ্রীনিবাস তখন ঘুমুচ্ছে। সব কেমন বিশ্রী লাগে আজ শ্রীনিবাসকে নীতিশের কথা শুধাতে দেখে অন্নপূর্ণা তবু চাকবার চেষ্টা করে।

শ্রীনিবাসবাবু চুপ করে রইল। অন্নপূর্ণা ওই কথা চাকবার জন্যই বলে—বাজারের দেরী হয়ে যাচ্ছে। যাও দিকি।

বেলাটা তবু ঠিক গড়িয়ে চলে চারিপাশের জীবনযাত্রার মতই। অফিস যাত্রীদের ভিড় বেড়েছে। কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ রিক্সায় চলেছে ষ্টেশনের দিকে।

ভোঁটা বাজছে। নটার ভোঁ।

শ্রীনিবাসবাবু চমকে ওঠে। দেরী হয়ে গেলে অফিসের হাজিরা খাতা চলে যাবে ছোট সাহেবের ঘরে আর তিনিও লাল কালির চ্যারা দিয়ে বেশ জোরে ঘাস কাটবেন। দুদিন হলেই একদিন ছুটি কাটা যাবে।

শ্রীনিবাস একটু নিশ্চিন্ত হয়। একদিক থেকে আজ সে মুক্ত। ছুটি আর কাটার কেউ নেই জীবনটাই অখণ্ড অবসরে ভরা ছুটির মতই। রোজগার নেই, দাদা পরিবারের বোঝা টেনে চলার ব্যর্থ চেষ্টার দৈন্যটা এবার রূপরূপে ফুটে উঠবে। সম্বল বলতে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের তিন হাজার টাকা। ওই দিয়েই টুকটাক একটা দোকান করবে ঠিক করেছে। ঘরও একটা যোগাড় হয়ে গেছে বাজারের ধারে।

তবু সময়টা কাটবে। আর রোজকার কিছু করবে সেই সঙ্গে। নীতিশের কোন খবর নেই, শ্রীনিবাসের ডান হাতটা যেন ভেঙে গেছে। সুজলার কাছেও নিজেকে অপরাধী বলে বোধ হয়। তার সবকিছু চক্রব্যূহ হয়ে গেল, শ্রীনিবাসবাবু কোনদিকই সামলাতে পারেনি।

জীবনের শেষ বছরগুলোর সম্বন্ধে তার মনে একটা ছবি আঁকা ছিল, কিন্তু সেই ছবিটা দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে আমূল বদলে গেছে। অন্নপূর্ণাকে বলতে পারেনি তার রিটায়ার করার কথাটা। ও এমনিই বদলে যাবে। আর এই রিটায়ার করানোর জন্য শ্রীনিবাসই দায়ী এইটাই ভাববে। নিজেকে ওর অনুকম্পার পাত্র করে তুলতে সে পারবে না। শ্রীনিবাস এই কথাটা স্ত্রী মেয়ে কাউকে জানাতে পারেনি।

তাই রোজকার মতই নটা ছাব্বিশের ট্রেনে বের হয়েছে শ্রীনিবাস। আজ আর অপিসে গিয়ে সেই চেয়ারে তাকে বসতে হবে না। অন্য লোক সেখানে বসে গেছে। শুধু তাইই নয় কোম্পানী আজই তাকে ওর পাওনা গণ্ডা বুঝিয়ে দিয়ে বিদায় করে ছেড়ে যাতে ওর আর সেখানে যাবার কোন দরকারই না হয়।

ট্রেনটা চলেছে। কামরার অপিসযাত্রীদের কথাগুলো শোনা যায়, অপিসের নানা কাজ আর তার নিজের এলেম নিয়ে ওদের মত অনেক গল্প করেছে শ্রীনিবাসও, আজ সে সব অতীতের কথা হয়ে গেছে, অপিসের খাতা থেকে বাতিল একটি মানুষ সে। কোন দাবী কোথাও নেই। নিঃস্ব রিক্ত পরিচয়হীনের মত ওই আলোচনাগুলো শুনছে।

ছেলের কথা মনে পড়ে। ভেবেছিল নীতিশকে চাকরীতে ঢোকাবে, তার শেষ জীবনের দিনগুলো শুধু ভালো ভাবে কাটবে। কিন্তু সব ব্যর্থ হয়ে গেছে।

অন্ধকারের অতলে মানুষগুলো হারিয়ে গেছে। নীতিশের সম্বন্ধে কথাগুলো শুনেছে সে। নানা কথা শুনে শিউরে উঠেছিল শ্রীনিবাস।

আজ তাই নিজেকে শেষ জীবন অবধি সেই ঘানি টেনে চলতে হবে। অন্নপূর্ণা কুন্তলা সবাই-এর কাছে সে অপরাধী। নীতিশও তাকে অগ্রাহ্য করেছে বোধহয় তার অক্ষমতার জন্যই।

ওরা জানেনা তার চাকরী আজ থেকে খতম হয়ে গেছে। বন্যার স্রোতের আবর্তে পড়ে ভেসে যাওয়া খড়কুটোর মত একটি প্রাণী এই টালমাটালে টিকে থাকার বৃথা চেষ্টা করছে।

অপিসে আজ ঢোকে সে অপরিচিতের মত, দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছরের পরিচয় একদিনেই মুছে গেছে। ওরা মন দিয়ে কাজ করছে, ওকে দেখে মুখ তুলে চাইল মাত্র, কেউ শুকনো কথায় অভ্যর্থনা করে।

—এই যে দাদা!

ওই পর্যন্ত। হৃদয়হীন উত্তাপহীন সেই কণ্ঠস্বর, তার নিজের আয়নাটাও বদল হয়ে গেছে। এই অপিসের পরিবেশে যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে তার। তাই তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে বের হয়ে আসতে চায়। অপিসে আজ এসেছে সে মূর্তিমান অশুভের মত অপিসের বাবুরাও তাই ওকে যেন এড়িয়ে চলে।

টাকাগুলো বুঝে নিল শ্রীনিবাস ক্যাশ থেকে।

একটা মাত্র সই করে কোম্পানীর সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছে সে, অজানতেই চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসে। এখানের আর সে কেউ নয়, এজগৎ থেকে ও বিতাড়িত এখানে সে অবাঞ্ছিত একটি মানুষ।

শ্রীনিবাস একহাতে টাকাগুলো নিয়ে কোঁচার খুঁটে বেঁধে কোমরে জড়িয়ে নিল।

ক্যাসিয়ার বলে—টাকাটা সাবধানে নিন।

বিড় বিড় করে কি জবাব দিল সে ঠিক বোঝা গেল না। চোখের সামনে সবকিছু ঝাপসা হয়ে আসে, বের হয়ে এল শ্রীনিবাস পঁয়ত্রিশ বছরের সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে।

বহুদিনপর বৈকালের আলো দেখে সে। আজ অফিস নেই, আটকে থাকার প্রশ্ন নেই। কাল থেকে কেউ তাকে এরা চিনবে না। আজই ভুলে গেছে।

আনমনে হাটতে থাকে। বৈকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমেছে।

ফিরতি ট্রেনের ভিড়ও ঠিক বজায় আছে। কতজন আজ রিটায়ার করেছে কে জানে, তাদের আশা-যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল; তবু ভিড় কমে না। শ্রীনিবাসবাবু বেঞ্চের এককোণে বসে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। এই ট্রেনে অনেক চেনামুখ অফিস দেরে ফেরে। তারাও কাল যথারীতি আসবে কিন্তু যাত্রা থেমে গেল তারই।

বৃষ্টি পড়ছে। কে বলে—কেরানী জিনে বৃষ্টি, ঠিক ছটায় আসবে তোড়জোড় করে।

স্টেশনে নেমেছে শ্রীনিবাসবাবু। বাজারে এসময় অফিসফেরা বাবুদের ভিড়। কালকের বাজার সেরে ফেরে অনেকে। শ্রীনিবাসবাবুও অভ্যাসরত ওদিকে যেতে গিয়ে থামলো—কাল থেকে তার আর বাজার নেই।

দোকানে বেচকেনা চলেছে, সেও এমনি দোকান একটা করবে। নীতিশ যদি একটু চেষ্টা করে ভালো হতে পারে—দোকানটা চলবে মন্দ নয়। কিন্তু তার দেখাই মেলে না একেবারে আহারান্তে গেছে সেটা।

অন্ধকারে গুড়িগুড়ি বৃষ্টি পড়ছে, জনহীন রাস্তা গাছ গাছালিগুলো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ছে বড়ো হাওয়ায়।

হঠাৎ কয়েকটা ছায়ামূর্তি ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

—কি আছে বের করে দাও—এক্ষুনিই। চীৎকার করলে খতম করে রেখো।

শিউরে উঠে শ্রীনিবাস। তার কোমরে বাঁধা তিন হাজার ছুশো বত্রিশ টাকা তার সারাজীবনের সঞ্চয়, বাকী জীবনের অবলম্বন সংসারের ওই শেষ নির্ভর সেইটুকুই ওরা কেড়ে নিতে চায়।

গলার কাছে বাড়ানো ছুরির ফলাটা এসে ঠেকে।…আবছা অন্ধকারে চকচক করে সেটা নিশ্চিত মৃত্যুর মত। চীৎকার করতে পারে না। তার সব শরীর কাঁপছে। স্তব্ধ হয়ে গেছে কণ্ঠস্বর।

তারার আবছা আলোয় ছায়ামূর্তিদের একজনের দিকে চেয়ে চমকে ওঠে শ্রীনিবাস। অন্ধকারে তাকে চিনতে পেরেছে।…শ্রীনিবাসবাবু কি বলতে যাবে, একজন গর্জন করে ওঠে—খতম করে রেখো। বের কর টাকা, বুড়ো তার কোথাকার।

ওরা ওর কাপড়ের খুঁট থেকে জোর করে এক ধাক্কায় টাকাটা কেড়ে নিল। অন্ধকারে শ্রীনিবাসবাবু চীৎকার করার চেষ্টা করে।

ওরা ততক্ষণে অন্ধকারেই মিশিয়ে গেছে। ঘৃণায় লজ্জায় আর অসহায় রাগে কাঁপছে মানুষটা। টাকাগুলো সব গেছে আর তার সবকিছু ছিনিয়ে নিয়ে গেছে ওই নীতিশই।

নীতিশ তার ছেলে, সব আশা নির্ভর অনেকদিন আগেই সে ছিনিয়ে নিয়েছে; আজ ছিনিয়ে নিয়ে গেল সে ঘুণের গ্রাস সব স্বপ্ন আর শ্রীনিবাসবাবুর ভবিষ্যৎকেও।

অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেল শ্রীনিবাসের সবকিছু।

দিন বদলের সর্বনাশা পালায় শ্রীনিবাস একটি মৃত চরিত্র মাত্র। তার করার কিছুই নেই।

সব হারিয়ে লোকটা টলতে টলতে চলেছে। ওই অন্ধকারে, তবু চলতে হবে তাকে, কারণ থামা মানেই মৃত্যু।

ইউক্যালিপ্‌টাস্

শ্রীসুরথনাথ ঘোষ

দ্রুত পায়ে হন্‌হন্ করে হাঁটছিল রমলা।

লেকের এদিকটায় বাড়ীঘর অনেক হয়েছে বটে, তবু উত্তর কলকাতার বিশেষ করে শ্যামবাজার কি হাতীবাগানের তুলনায় বেশ ফাঁকা। কেবল লোকজন গাড়ীঘোড়ার ভীড় কম নয়, রাস্তাঘাট-গুলো পরিচ্ছন্ন, আর চওড়া চওড়া।

অনেককাল পরে এ অঞ্চলে এলেও সমীরের বাড়ীটা খুঁজে পেতে ওকে এতটুকু বেগ পেতে হয়নি।

ফটকের দু'পাশে ওই বড় বড় 'ইউক্যালিপ্‌টাস্' গাছ দুটো দেখেই চিনতে পেরেছিল।

এ অঞ্চলে বহু ধনীলোকের সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা ও তার সঙ্গে হরেকরকমের বৃক্ষলতা শোভিত ছোটবড় ফুলের বাগান ফটকের সামনে থাকলেও, 'ইউক্যালিপ্‌টাস্' গাছ ওখানের কোন বাড়ীতেই ছিল না।

সমীরকে তাই বাড়ীর ঠিকানা কেউ জিজ্ঞেস করলে বলতো, নম্বর মিলিয়ে ওখানে বাড়ী খুঁজে পাওয়া শক্ত, গ্রেট নম্বরের কোন ঠিক নেই, শুধু 'ইউক্যালিপ্‌টাস্' গাছওলা বাড়ী, ওই পাড়ায় ওই এক এবং অদ্বিতীয়। অন্যকে জিজ্ঞেস করলেও বলে দেবে।

আঠারো উনিশ বছর আগের কথা, এখনো যেন রমলার কানে বাজে!

সমীর যখন ওই বলে তার বাড়ীর ঠিকানা কাউকে দিতো, সে শুধু আড় চোখে একবার সমীরের মুখের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট একটু হাসি টিপে নিতো ঠোঁটের কোনে।

রমলার এই সূক্ষ্ম হাসিটুকু হয়ত অন্যের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতো, কিন্তু সমীরের চোখকে ফাঁকি দিতে পারতো না। সে জানতো ওর ওই ক্ষীণ হাসির মধ্যে কতখানি অহঙ্কার প্রচ্ছন্ন আছে।

সমীরকে আড়ালে ডেকে, রমলা বলতো কেমন জব্দ করেছি। এত বড় বাড়ী, এত বাগানবাগিচা ও দামীদামী ফুলের গাছ থাকা সত্ত্বেও শেষকালে তোমার বাড়ীর পরিচয় হয়ে দাঁড়ালো, আমার দেওয়া ওই গাছ দুটো?

সমীর চট্ করে চোখটা একবার ঘুরিয়ে দেখে নেয় কেউ কাছাকাছি আছে কিনা। তারপর মুখটা ওর কানের আরো নিকটে নিয়ে গিয়ে অস্ফুটস্বরে বলে···' তুঁহারি গরবে গরবিনী হাম রূপসী তুঁহারি রূপে ·'

যাঃ অসভ্য! এখন আর ওই বলে আমায় ভোলাতে হবে না। সেদিন যখন গাছ দুটো তোমায় উপহার দিয়েছিলুম, কি বলেছিলে মনে আছে?

অকস্মাৎ তার মনটা চলে যায় আরো দূরে আগের সেই দিনগুলোতে। রমলার চোখের সামনে

স্পষ্ট হয়ে ওঠে সব কিছু। সে তখন ক্লাস নাইনে পড়ে। একমাস টাইফয়েড-এ ভুগে শরীর সারাবার জন্যে ডাক্তারের পরামর্শে মধুপুরে গিয়েছিল হাওয়া বদলাতে।

সমীর গিয়েছিল তাদের গাড়ীতে তুলে দিতে। ছোট ছুটি ভাই বোন ও তার মত অসুস্থ এক রোগীকে নিয়ে, একা ওর বাবা হাওড়া ষ্টেশনের ওই ভীড়ে রাতের গাড়ীতে উঠতে ঠিক ভরসা পাচ্ছিলেন না। তাই রমলার মা ওকে অনুরোধ করেছিলেন, বাবা সমীর তুমি যদি একটু ট্রেনে আমাদের তুলে দাও ত বড় উপকার হয়।

নিশ্চয় যাবো মাসীমা। এ আর এমন একটা বড় কথা কি?

সেদিন ট্রেণে কেবল তুলে দেয়নি সমীর। বিছানা খুলে বেঞ্চির ওপর বিছিয়ে আগে রমলাকে বসিয়ে তারপর র‍্যাকের ওপর ছোট ভাই বোনদের শোবার ব্যবস্থা করে, ট্রাঙ্ক, বাক্স, পুঁটলি পোঁটলা, সব গোছ গাছ করে বেঞ্চির নীচে সাজিয়ে দিয়ে প্রথম ঘন্টা পড়তেই গাড়ীর ভেতর থেকে নেমে প্লাটফর্মে ঠিক রমলার জানলাটার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল।

রমলাও মুখটা যতদূর সম্ভব জানলার ওপর চেপেধরে ফিসফিস করে সমীরের সঙ্গে কথা কইছিল। ওর বাবা মা, তখন জিনিষপত্রগুলো সব এক, দুই, তিন, করে গুনে গুনে হিসাব মিলতে ব্যস্ত।

চং চং করে ঘন্টা পড়বার সঙ্গে সেই গার্ডসাহেব সবুজ আলো দেখালেন, অমনি গাড়ী ছেড়ে দিল। গাড়ীর গতির সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে চলতে বেশ খানিকটা যখন এগিয়ে এলো সমীর, তখন একটা হাত বাইরে বার করে সমীরের সঙ্গে চট্ করে 'সেকহ্যাণ্ড' করে রমলা সেই হাতটা সোপনে ভেতরে টেনে নিতে গেল সমীর অমনি বললে, আমার জন্যে কি আনবে ওখান থেকে?

কিচ্ছু না! বলে চোখেমুখে দুষ্টুমির হাসি উছলে দিয়েছিল। তারপর বাবা মাকে শুনিয়ে বলেছিল তুমি কি ছোট্ট ছেলে যাদুর মত, যে তোমার জন্যে খেলনা, পুতুল আনতে হবে?

মুখে ও কথা বললেও মনে মনে রমলা ঠিক করে রেখেছিল, ওখান থেকে এমন কিছু একটা জিনিষ এনে ওকে উপহার দেবে, যা দেখে বিস্ময়ে ওর দুচোখের পলক অনেকক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য রমলার যে মধুপুরে তেমন কিছুই সে খুঁজে খুঁজে পেলে না। ওখানকার স্থানীয় লোকদের জিজ্ঞাসা করেও দেখেছে, তারা বলে, এখানে অন্য কিছু পাওয়া যায় না, হাটে শুধু লোহার বাসন বিক্রী হয়, শহরের মেয়েরা যারা ওখানে হাওয়া খেতে আসে, ফেরার সময় বোঝা করে কিনে নিয়ে যায়। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যেও মা বোনেরা ওই লোহার বাসনের সেট্ নিয়ে যায়। এছাড়া এখানের হাটবাজারে এমন কিছু জিনিষ পাওয়া যায় না, যা দেখে কলকাতার লোকদের চোখ ধাঁধিয়ে যাবে।

দেখতে দেখতে দুটো মাস কেটে যায়। ওদের ফেরার দিনও এগিয়ে আসে। রমলা কিছুতেই ভেবে পায় না, কি নিয়ে যাবে সমীরের জন্যে! বড় দুঃখ করে সে নিজে যখন কথাটা বললে।

কালিপুর টাউনে লাহিড়ীবাবুর যে বাংলোটায় ওরা উঠেছিল ভারী সুন্দর বাগান তার চারিপাশে। গোলাপ, বেল, জুঁই, কাঠালি চাঁপা, রক্ত করবী আরো হরেকরকমের ফুল ফুটে থাকতো সেখানে। কিন্তু রমলার সবচেয়ে ভাল লাগত ওই সারিসারি 'ইউক্যালিপ্‌টাস' গাছগুলোকে, পাঁচীলের ধারে ধারে সারা বাগানটা জুড়ে তারা যেন দাঁড়িয়ে আছে হাসি হাসি মুখে—তন্বী, রূপসী তরুণীদের মত। তাদের মাথায় রুক্ষ চুলের বোঝা, অদৃশ্য হস্তে সেই চুলগুলিকে দুলিয়ে-কাঁপিয়ে দুলিয়ে নাড়িয়ে নাচিয়ে কে যেন তাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে সব সময়।

তাকিয়ে তাকিয়ে যেন রমলার আশা মেটে না। সে যেন ওদের প্রেমে পড়ে যায়। এই গাছগুলোকে যে এত সুন্দর দেখতে রমলা তা জানতো না।

বাড়ী খুঁজতে বেরিয়ে কালিপুরের এই অঞ্চলটাকে তাই ওর সবচেয়ে বেশী ভাল লেগেছিল। বাবাকে বলেছিল, এই খানেই একটা কোন বাড়ী ঠিক করে ফেলো বাবা, ভাড়া দু'চারটাকা বেশী দিলেও উসুল হয়ে যাবে। চেয়ে দেখো কি সুন্দর 'ইউক্যালিপ্‌টাস্‌' গাছের বাহার এখানে! আর ওই রাস্তাটার দিকে দেখো।

সত্যি! অপূর্ব দৃশ্য! চওড়া রাস্তাটার দু'ধার বরাবর মোটা মোটা ইউক্যালিপ্‌টাস গাছ যেমন চলে গেছে, তেমনি দু'দিকে যত বাগানবাড়ী. প্রত্যেকটাতেই পাচীলের ধারে, বাগানের ভেতরে, এখানেওখানে ছোটবড় অগুন্তি ইউক্যালিপ্‌টাস।

সকালের কাঁচা রোদে এর পাতাগুলো যখন ঝিল্‌মিল্‌ করে কিশোরী তরুণীর মত তাদের নরম, মৃদু, কোমল দেখায় রমলার চোখে। দুপুরে তেমনি আর একরূপ: মনে হয় চকচকে ঝকঝকে বেশে, জরির কিতে মাথায় দিয়ে, সিল্কের শাড়ী পরে, মুখে পেন্ট করে যেন যৌবনবতী নারীরা দাঁড়িয়ে আছে তার পথে। আবার সন্ধ্যা হলে, চাঁদের আলো এসে যখন গাছের মাথায় পড়ে তখন ওর মনে হয় যেন দেহের সমস্ত অলঙ্কার খুলে ফেলে নিরাভরণ হয়ে সতী সীমন্তিনীরা যেন প্রিয়মিলনের প্রতীক্ষায় উন্মুখ!

কালিপুর টাউনের সেই রাস্তাটায় হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে রমলা। চেয়ে থাকে অপলক দৃষ্টিতে ওই গাছগুলোর দিকে। সকাল, সন্ধ্যা, দুপুর, বিকাল সব সময় সে চটিটা পায়ে দিয়ে বেড়ায় এই রাস্তায়। এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো - বার বারবার আসে। একবার, দু'বার, তিনবার—তবু ক্লান্তি আসে না। একঘেয়ে লাগে না। ইউক্যালিপটাস-এর গন্ধে যেন এখানকার রাস্তা, বাড়ীঘর, গাছপালা আকাশ বাতাস সব ভরপুর। সব সময়ে মনে হয় যেন ইউক্যালিপ্‌টাস্‌-এর বড় বোতল কে ভেঙে ফেলেছে। তার গন্ধ ওর নাকে মুখে, বুকে সর্বাঙ্গে।

অদ্ভুত এই গাছগুলো! যত রূপ তত গন্ধ—একই সঙ্গে। অন্যসব গাছ ফুলফুটলে তবে গন্ধ দেয়। কিন্তু এ ফুল ফোটার অপেক্ষা রাখেনা। একই সঙ্গে চোখ এবং মনকে ভরিয়ে দেয় রূপে ও গন্ধে।

বেড়াতে বেড়াতে রমলার চোখ দুটো একদিন হঠাৎ করে জ্বলে ওঠে। পেয়েছি, মনে মনে বলে, হাঁ, এই সমীরের উপযুক্ত উপহার। এই গাছ নিয়েগিয়ে তাকে সে উপহার দেবে! মধুপুর থেকে নিয়ে যাবার এরচেয়ে উৎকৃষ্ট আর কিছু তার চোখে লাগেনা।

দুটো চারাগাছ নিয়েগিয়ে যখন সমীরের হাতে দিয়েছিল রমলা, সমীর চিনতে পারেনি। বলেছিল এ কী গাছ?

এর নাম ইউক্যালিপ্‌টাস! রমলা চোখ বড় বড় করে, বলে একটু বড় হলে দেখবে কি সুন্দর গন্ধ বেরুবে?

ফুল ফুটলে তবে গন্ধ বেরুবে ত?

না। ফুল না ফুটলেও এ গন্ধ দেয়। এইখানেই এর বিশেষত্ব! এর পাতায় পাতায় গন্ধ। এর সারাদেহে গন্ধ অন্তরে ও বাহিরে গন্ধভরা! তোমার শোবার ঘরের জানলার পাশে পুতে দিয়ো, দেখবে রাত্রে যখন ঘরে শুতে যাবে ইউক্যালিপ্‌টাসের গন্ধে ঘর ভরে আছে।

না। সমীর বলে, তারচেয়ে এই গাছ দুটো আমি ফটকের সামনে লাগিয়ে দেবো!

রমলা বলে, ফটকটা নিশ্চয় তোমার ঘর থেকে অনেকটা দূরে। তাহলে তেমন গন্ধ হয়ত এতদূর থেকে পাবেনা। তখন যেন আমায় গালাগাল দিয়োনা কি একটা বাজে গাছ দিয়েছে বলে।

মুচকি হেসে জবাব দেয় সমীর। না বরং ধন্যবাদ দেবো, বাড়ী থেকে বাইরে যাবার সময় তোমার এইগাছের গন্ধ বুকের মধ্যে ভরে নিয়ে পথ চলবো, আবার যখন ফিরে আসবো, তোমারই গন্ধ বুকে নিয়ে ঘরের ভেতর গিয়ে ঢুকবো।

ধ্যেৎ অসভ্য! বলে শুধু জিব কেটে এর-জবাব দিয়েছিল রমলা!

ফটকের সামনে এসে, ওই গাছদুটোর ওপর চোখ পড়া মাত্র রমলার পা দুটো কাঁপতে থাকে! মনেহয় ওর পায়ে কোন শক্তি নেই, যেন পক্ষাঘাত হয়েছে এখনি বুঝি পড়ে যাবে।

পুরনো দিনের সবকথা মনে পড়ে যায় রমলার।

একদিন এই ফটকের মধ্যে দিয়ে টোপর মাথায় সমীরের সঙ্গে রাজরাণীর মত এই বাড়িতে ঢুকবে মনে মনে সে কত স্বপ্ন দেখেছিল। সমীরকেও চুপিচুপি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তোমাকে ছাড়া আর কারুর গলায় কোনদিন মালা দেবোনা।

কিন্তু সবকিছু ভেঙেচুরে তচনচ করে দিয়েছিলেন ওর বাবার আপিসের বড়বাবু। তাঁর ভায়ের সঙ্গে ওর বিয়ের দিন ক্ষণ সব স্থির করে। রমলার বাবা মার্চেন্ট আপিসে চাকরী করতেন। বড়বাবুর মতের বিরুদ্ধে যাবার সাধ্য তাঁর ছিলনা। কাজেই বাবার চাকরীর মুখচেয়ে ভাগ্যকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। তারপর পাঁচটা বছর না যেতেই রমলার কপাল পুড়লো। স্বামীর, পথে হঠাৎ মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো। একটি মেয়েকে নিয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে ওর দিনকাটে। ভাশুর, দেওর থাকলেও তাদের সকলেরই নিজ নিজ সংসার আছে। ক্রমশই তাদের গলগ্রহ হয়ে ওঠে রমলা, অধিকাংশ নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের বিধবাদের মত।

তাই মেয়ের বিয়ে যখন স্থির হলো তখন পাত্রপক্ষের সামান্য যাকিছু দাবী সানুন্যে সবমিলিয়ে তিনহাজার টাকার মত, কেমন করে কোথাদিয়ে তা যোগাড় করবে, এই চিন্তায় রমলার আহার নিদ্রা চলে যায়। শ্বশুরবাড়ী ও বাপেরবাড়ীর আত্মীয় স্বজন সকলের কাছে ভিক্ষাকরেও যখন তেড়হাজারের বেশী সংগ্রহ করতে পারলে না তখন সহসা একদিন গভীররাত্রে মনে পড়ে যায় তার সমীরকে। সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত চিন্তা এসে তার গলা টিপেধরে। সে ভাবে যদি সমীর তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয় বাড়ী থেকে। তাকে বলে, ঠগ, মিথ্যাবাদী, বিশ্বাসঘাতিনী, তাহলে কি বলার আছে তার? চোখের জলে বালিশ ভেসে যায়।

কিন্তু এখনো যে তেড়হাজার টাকা বাকী। ওটা নাহলে মেয়ের বিয়ে যে কিছুতেই হবেনা। মেয়ের রং কালো লেখাপড়া বিশেষ শেখেনি না—অনেক কষ্টে পাত্রপক্ষ সম্মত হয়েছে, যদি এটা ফসকে যায়, তাহলে? কিন্তু তার আর যাবার স্থানই বা কোথায়? এই দুর্দিনে কার এমন অবস্থা ভাল যে তাকে এই টাকা দিয়ে সাহায্য করবে।

এমনিভাবে ক'রাত ধরে মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্ষত বিক্ষত হয়ে শেষে নিজেই বেরিয়ে পড়েছিল সমীরের বাড়ীর উদ্দেশ্যে! যদি তাড়িয়ে দেয়, অপমান করে ত করুক। অন্ততঃ রমলা জেনে নিশ্চিন্ত হতে চায়, আর কোথা থেকে তার কিছু পাবার বা আদায়করার সম্ভাবনা নেই।

অনেক কষ্টে পা দুটোকে টেনে টেনে রমলা যখন ভেতরে এসে দাঁড়াল একজন চাকর বেরিয়ে এসে বললে, কাকে চাই?

রমলা জবাব দিলে, সমীরবাবু আছেন ?

আছেন। বসুন এই ঘরে। বলে বৈঠকখানার দরজাটা খুলে রমলাকে বসিয়ে ভেতরে চলেগেল।

একটু পরে সমীর এসে ঘরে ঢুকলো। এবং রমলার মুখের ওপর তার বড় চোখ দুটো রেখে স্থির হয়ে রইলো।

কি চিনতে পারছেন না ত ? রমলাই প্রথম কথা বললে।

কোথায় দেখেছি বলুন ত ?

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বুকের মধ্যে চেপে নিয়ে রমলা বললে, এইখানেই দেখেছেন এই কলকাতার শহরেই তবে উনিশ কুড়ি বছর আগে।

ওঃ—তারমানে আপনি—তুমি সেই রমলা ?

হাঁ এ হতভাগিনী সেই বটে। মনে যখন পড়েনি, তখন আমার চলে যাওয়াই উচিত ছিল কিন্তু।

এবার সমীর মুচকী হেসে জানলা দিয়ে সেই ইউক্যালিপ্‌টাস্‌ গাছ দুটোর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, ভুলতে যাতে না পারি তুমি নিজেই ত সে ব্যবস্থা করে দিয়েছিলে মনে আছে ? তবে হাঁ, সেদিনের রমলার সঙ্গে আজকের রমলার অনেক তফাৎ তাই চিনতে পারিনি। তারজন্যে অপরাধ নিয়ো না।

অপরাধ আমি নেবো কি ? তুমি বরং তার আগে আমায় ক্ষমা করো। আমি তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। তোমায় যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম, রক্ষা করতে পারিনি।

ছি ছি ও কথা বলো না। তোমার কি দোষ! এমনকি তোমার বাবারও কোন অপরাধ নেই। অপিসের বড়বাবুর কথা ঠেলতে পারার সাধ্য শুধু তাঁর কেন, কোন কেরানীর যে নেই, তা আমি জানি। কাজেই ওসব পুরানো কথা তোলার কোন দরকার নেই। বলো, এখন কি জন্যে তুমি এসেছো ?

রমলা চোখের জল মুছে ধীরে ধীরে সব কথাই সমীরকে বললে।

একটু থেমে সমীর বললে, মোট কত টাকার জন্যে তোমার মেয়ের বিয়েটা আটকাচ্ছে।

দেড় হাজার টাকার।

আচ্ছা এই নাও, বলে চাবি দিয়ে সামনের ড্রয়ারটা খুলে রমলার হাতে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। বললে, এখুনি অপিসে বেরুতে হবে। দেরী হয়ে গেছে। কিছু মনে করো না।

রমলা কি বলতে যাচ্ছিল তাতে বাধা দিয়ে সমীর বললে, থাক, থাক, ওসব মামুলি কৃতজ্ঞতাটতার কথা আর বলতে হবে না। যাও তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে যাও···

রমলা নিঃশব্দে শুধু চোখের জল মুছে রাস্তায় বেরিয়ে এলো। মনের মধ্যে যেন যে কিসের এক নতুন উদ্দীপনা নতুন উৎসাহ অনুভব করে। অনেকদিন, অনেক কাল পরে কিসের এক নতুন আনন্দ বুকের মধ্যে, থেকে থেকে যেন উথলে ওঠে, চাপতে গিয়েও সে পারে না।

হন্‌ হন্‌ করে পা চালিয়ে দেয় রমলা বাড়ীর দিকে।

ঘরের মধ্যে ঢুকতেই সমীরের স্ত্রী সরমা প্রশ্ন করে, হাঁগো, এই মহিলাটি কে, এতক্ষণ ধরে তোমার সঙ্গে কি কথা কইছিল ?

মুখটাকে যথাসম্ভব বিরক্ত ও বিকৃত করে সমীর উত্তর দেয়, কন্যাদায়, তাই ভদ্রমহিলা সাহায্য চাইতে এসেছিল।

বাবা, কিসের এত সাহায্য যে অপিসের সময় হয়ে যাচ্ছে, খেয়াল নেই। দিলে নাকি কিছু ?

হাঁ। না নিয়ে কি ওঠে?

কত দিতে হলো?

একটু চোক গিলে, শান্তকণ্ঠে সমীর বললে, ছেড় হাজার!

এঁ্যা—ছেড়হাজার টাকা, তুমি ওই একটা অপরিচিত মেয়েকে দিয়ে দিলে? সত্যি সত্যি তার মেয়ের বিয়ে দিলা, একবারও খোঁজ নিলে না পর্য্যন্ত।

সমীর একটু চোক গিলে বলে, হাতে পায়ে ধরে কান্না, বলে গরীব বিধবার কন্যাদায় উদ্ধার করুন—আমার আর কেউ কোথাও নেই—

—মিথ্যে কথা! সহসা সরমার কণ্ঠ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। বলে, পর্দ্দার আড়াল থেকে আমি সব শুনেছি। সত্যি করে বলো, ও তোমার কে? ওর সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক!

এবার ঘাবড়ে যায় সমীর। একটু ইতস্ততঃ করে বলে, ও আমার কেউ নয়। এককালে ছোটবেলায় আমাদের বাড়ীর পাশেই ওরা ভাড়া থাকতো, তখনই হয়েছিল আলাপ···তারপর এই দীর্ঘ আঠারো উনিশ বছর আর কোন পাত্তা ছিলনা, হঠাৎ আজ এসে হাজির। কুমারী বেলায় দেখেছিলুম, আর আজ দেখলুম বিধবা! সেই সূত্র ধরেই সাহায্য চাইতে এসেছিল।

সেই সূত্র ধরেই, না আরো কিছু গোপন সূত্র ছিল, তোমার ও তার মধ্যে, যার জন্যে এতখানি দাবী সে তোমার ওপর করতে পারে? সত্যি করে বলো! হঠাৎ সরমার দু'চোখ জলে ভরে এলো। ভাঙা ভাঙা গলায় বললে, এখনো পর্য্যন্ত তুমি আমার সঙ্গে লুকোচুরি করো।

সমীরের গলা এবার চড়ে ওঠে, লুকোচুরি কি করেছি। তোমার প্রতি কোন কর্ত্তব্যের এতটুকু-ত্রুটি কি কোনদিন দেখেছো!

সেইটে দেখলেই, খুশি হতুম! স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক শুধু কর্ত্তব্যের বন্ধনে নয় বরং তার ত্রুটি বিচ্যুতিতে! বলেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো সরমা।

সমীর বললে, সরমা তুমি বৃথা অপরাধ দিচ্ছো। যে আমার বাল্যকালের খেলার সঙ্গিনী ছিল, যে তার হাসিখুশি দিয়ে, তার মধুর সঙ্গ দিয়ে, আমার অতীতের এক একটি মুহূর্ত্তকে আলোকময় করে তুলেছিল, তার প্রতি কি আমার কোন কর্ত্তব্য নেই! তখন আমি ছিলুম গরীবের ছেলে, কিছু দেবার সাধ্য ছিল না। সেও কোনদিন মুখ ফুটে কিছু চায় নি। আজ যখন সে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো, তখন কেমন করে তাকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেবো বলো? তুমিও মেয়ের মা, নিজেকে একবার কল্পনায় ওর অবস্থায় নিয়ে ভেবে দেখো যদি, তাহলে আর আমাকে কিছু বলতে পারবে না, স্থির জেনো··

আমি আর কিছু জানতে চাই না। তোমার যা ইচ্ছে করগে, বলে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সরমা।

ওদিকে রমলার ভাসুর দেওর, জা, ননদ, সকলের মধ্যে একটা চাপা গুঞ্জন শুরু হয়ে যায়। ছেড় হাজার টাকা, এই দুর্দ্দিনের বাজারে, দিয়ে দাঁড়াতেই মেজবৌকে দিয়ে দিলে, কে এমন ধনী আমীর আত্মীয় আছে ওর, নাম ও তার শুনিনি কখনো।

রান্নাঘরে কলতলায় ফিস্ ফিস্, কানাকানি চলে মেয়েদের মধ্যে। ছোটবৌয়ের গায়ে চিমটি কেটে ননদ হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে, বলে, ওগো সিরীতের নাগর। মেজবৌদিকে আমার ছেলেবেলায় দেখতে

খুব সুন্দর ছিল। বুঝতেই ত পারছো! নইলে দু' দশ টাকা না একেবারে দেড় হাজার টাকা, চাওয়া মাত্র কেউ একেবারে হাতে তুলে দিতে পারে! গোপনে গোপনে চিঠিপত্র হয়ত চালাচালি ছিল। কে জানে?

আবার রাত্রে শুয়ে শুয়ে মেয়ে প্রশ্ন করে মাকে, হাঁ মা, এত টাকা কে তোমায় দিলে?

কমলা বলে, সে খবরে তোর দরকার কি, সেই দিক না কেন।

মেয়ে বলে, মা পিসিমা, ছোটকাকিমা সবাই তোমার নামে যা-তা আলোচনা করছিল, তোমায় নাকি বিয়ের আগে দেখতে খুব সুন্দর ছিল। সেই সময় যাঁর সঙ্গে তার ছিল - এ টাকা তিনি দিয়েছেন।

চুপ কর, কালামুখী! বলেই মেয়ের মুখটা হাত দিয়ে চেপে ধরে কমলা। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বলে, আজ তিনি দয়া না করলে, তুই কোথায় দাঁড়াতিস? কি করে তোর বিয়ে হতো, ভেবে দেখেছিস একবার! বলে গলাটাকে একটু খাটো করে কমলা বলে, হাঁ, মা শুনেছিল তা সত্যি। একদিন ওঁরই সঙ্গে আমার বিয়ে হবার কথা ছিল কিন্তু তোর দাদুর দুরবস্থার জন্যে হয়নি! তোর বিয়ের জন্যে আমি লোকের দোরে দোরে যাতে আর ভিক্ষাপাত্র নিয়ে না যাই, তাই একসঙ্গে সবটা দিয়ে দিয়েছে সে! সত্যি সত্যি আমিও অবাক হয়ে গেছি। এত টাকা যে সে দেবে, আমি ভাবতেই পারিনি! সে মানুষ না দেবতা।

এবার মেয়ে আস্তে আস্তে প্রশ্ন করে, তোমাকে নিশ্চয়ই খুব ভালবাসতেন।

অনেকক্ষণ নীরব থেকে শেষে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বুকের মধ্যে চেপে নিয়ে কমলা বলে, কি জানি! হয়ত তাই! বলে মেয়ের দিক থেকে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে পেছন ফিরে শোয়। রাত্রি গভীর থেকে গভীর হতে থাকে। তবু চোখে ঘুম আসে না। বারংবার নিজেকে নিজে তিরস্কার করেও সারা রাত জেগে থাকে কেন, একমাত্র অন্তর্যামী জানেন।

• • • •

কাল মানুষের দেশ থেকে, যুবক গিয়ে পড়লো সাদা মানুষের দেশে
সাদা মানুষের সমান হওয়ার জন্যে ··

সেদিন কালোর দেশের লোকদের ধারণা ছিল আই. সি. এস পাশ করলে, কাল হয়ে যায় সাদা। আর কালো যদি সাদা না হতে পারলো, তাহলে কালোর মরণই ভালো। কিন্তু মাঝখান থেকে গোলমাল করলো, নীলসাগরের ঢেউ···

কালো মানুষের মনে সে আগিয়ে তুলেছে নীলসাগরের সংগীত, তীর ভাষায় জয়গান···। সাদা মানুষের দেশে জেমস্‌ ম্যাকলিন নামে এক সাদা লোক প্রকাশ্য সভায় দাঁড়িয়ে বলো, ভারতবর্ষের আবার সভ্যতা কোথায়? তার ইতিহাস তো গোলামীর ইতিহাস। জেমস্‌ ম্যাকলিন পার্লামেন্টের সভ্য। চিত্তরঞ্জন সেখানে দাঁড়িয়ে শুনছেন, মাত্র একজন ভারতীয় ছাত্র···। সে-সভায় আরো অনেক ভারতীয় লোক ছিল। কিন্তু প্রতিবাদ করে উঠলেন, একা চিত্তরঞ্জন···। শুধু প্রতিবাদ নয়, জেমস্‌ ম্যাকলিনকে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করালেন। সাদা লোকদের সব নজর গিয়ে পড়লো সেই কাল যুবকটীর উপর···। সেদিন কালোর দেশ থেকে আর এক দুঃসাহসী লোক গিয়েছিল সাদার দেশে তাদের শাসন-সভার সভ্য হতে···দাদাভাই নৌরজী তার নাম ··তিনি ঠিক করলেন পার্লামেন্টের সভ্য হবেন···

এক পাঞ্জাবী, তায় আট পকেট

আশীষ গুপ্ত

কয়েক বছর আগের ঘটনা।

—সেদিনের ধারাবর্ষণের রকম দেখে আমাদের বহুবাজারে বাড়ীর কথা মনে পড়ছিল। তার ছাদ দিয়ে ঠিক চালুনীর মত জল পড়ত! অনেক সময় বাইরে বৃষ্টি পড়বার আগেই আমাদের ঘরের ভিতরে বসে "এস কর স্নান নবধারা জলে" গাওয়ার অবস্থা হত। বৃষ্টি নামার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু করে দিতাম আমরা ঘরে ঘরে হাপাহাপি। এখানকার খাট ওখানে সরাচ্ছি, ওখানকার টেবিল আরও কোণের দিকে ঠেলছি, একটা চেয়ারের ওপর আর একটা চেয়ার সাজাচ্ছি - আর তাদের তলায় তলায় জড়ো করছি বই খাতা কাগজ!—এদিকে বসাচ্ছি গামলা, ওদিকে বসাচ্ছি বালতী, এপাশে রাখছি কড়াই, ওপাশে রাখছি হাঁড়ি। অর্থাৎ যেখানেই জল পড়ছে সেখানেই তা যাতে ঘরময় না ছড়ায় তার বন্দোবস্তের জন্য বাড়ীসুদ্ধ লোক ঘরের চালের দিকে তাকিয়ে আছি। কিন্তু বলা হচ্ছে এই যে, যে জায়গাতেই হাঁড়িকড়াই টেনে আনি তখনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সেখানটায় জলপড়া বন্ধ হয়। তখন বিগুণ উৎসাহে "ওই, ওই, ওই" শব্দ করে সকলে মিলে নূতন বিপদের জায়গা নির্দেশ করে ঘটি বাটি কড়াই কলসী বসাবার নবীন বন্দোবস্ত করি। সোফার উপর চট চাপা দিই, গদির উপর রাখার জন্য আলমারী টেবিল চাকবার জন্যে ঘুপাকার করি কাগজ জামা! কী সে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।

এমনি ছিল আমাদের বহুবাজারের বাড়ী।—সেদিনকার ধারাবর্ষণে আমাদের সেই অপরূপ বাড়ীর কথা মনে পড়ল। বর্ষণমুখর আকাশের অবস্থা দেখে আমাদের আর বুঝতে বাকি রইল না যে কলকাতা শহরের লোকেরা সবাই হঠাৎ শৈলেদের বাড়ীর ভাড়াটে হয়ে গিয়েছে। শৈলেদের বহুবাজারে বাড়ীর সহস্রছিদ্র-বহুল ছাদ যেন তাদের মাথার উপরে। বর্ষণসিক্ত লম্বস্বন্ধের আর তাদের শেষ নেই, দুর্গতির আর তাদের অবধি নেই।

তিনচারদিন ধরে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে শহরে, কিন্তু থামবার নাম নেই। কলকাতার পথে সর্বত্রই হাঁটুজল, অথচ এমন অবস্থাতেও আমাদের বাইরের ঘরে চার পাঁচজন সুহৃদ সমাগমের ত্রুটি হয়নি। নিজের মুখে বলতে নেই,—আমাদের বাড়ীতে অভ্যাগত আপ্যায়নের বন্দোবস্তটা চিরদিনই একটু ভালো। এই মহাদুর্যোগের মধ্যেও যখন আমার এই বন্ধু ক'টি আমাদের বাইরের ঘরে আরুষ্ট হয়ে এসেছেন তখন সে-বন্দোবস্তের উৎকর্ষ সম্বন্ধে বেশী কিছু বোধ হয় না বললেও চলে।

চিংড়ি মাছের কাটলেটের দ্বিতীয় কিস্তা সবে শেষ হয়েছে, ভৃত্য যমেশ খাবার বাসন নিতে এসেছে। সুধীর জিজ্ঞাসা করল যমেশকে "আজ আর কি হয়েছে রে?"

বিস্মিত রবি প্রশ্ন করল, "যাই কেন না হয়ে থাকুক, তবুনশানেক কাটলেট তো already গিলেছ, আরও কিছু খাবার জায়গা আছে ?

"আছে বৈকি !" নিরীহ নিরুত্তাপ উত্তর। "বৌদি আমাকে খাইয়ে কত আনন্দ পান জানিস ? আমার সাধ্যমত না খেলে তিনি কত বেদনা পাবেন তার খোঁজ রাখিস ?—না না, সে আমি পারব না। সামান্য খাবার জন্যে তাঁর মনে কোন ব্যথা দিতে আমি পারব না। নিয়ে আয় বাবা রমেশ, আর যা যা আছে নিয়ে আয় একটু জলদি করে।—বৌদিকে খুশী করবার জন্যে যা থাকে বরাতে বলে গিলে ফেলি !"

সুধীরের কথাবার্তায় মনের সাধনে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ শহীদ-শহীদ ভাব।

এমনি সময়ে বাইরের মুষলধারা অগ্রাহ্য করে গোবিন্দদা ও রামকৃষ্ণপুরের হাবলার প্রবেশ! আমরা তো যেমন বিস্মিত তেমনি আনন্দিত। বস্তুত গোবিন্দদাকে কাছে পেলে খুশী হয় না এমন কাউকে আমি জানি না। হাড়জিরজিরে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত মফস্বলী গ্রাম্য ভদ্রলোক। সভ্যসমাজের অনুপযুক্ত চেহারা, হঠাৎ দেখলে আঁতকে উঠতে হয়। কিন্তু আমার বন্ধু অরবিন্দর ভাষাপতি, আমাদের এই সার্বজনীন গোবিন্দদা হলেন মাকাল ফলের ঠিক বিপরীত, অর্থাৎ পঞ্চতন্ত্রের ভাষায় "রূপেতে কি করে বাপু, গুণ যদি থাকে" জাতীয় মানুষ।

গোবিন্দদা মুখ খুললে নিজেদের মুখ খুলতে লজ্জাবোধ হয়। এমনি অপূর্ব গল্প বলতে পারেন গোবিন্দদা। হাতার কাজের কাজী ইনি, অর্থাৎ কিনা অতীতকালে করেননি জীবনে এমন কর্ম খুব কমই আছে। বুএনস আইরেস-এ কাপড় কেচি করেছেন, নিউ ইয়র্কে করেছেন চাকরগিরি। লিভারপুলে মদের কারখানায় কাজ করতেন। আমিয়েঁতে কাজ করতেন রেশমি রুমালের। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ছিলেন কর্মরত রণক্ষেত্রে, তারপর রুশ-এল-আসারায় সেনাপতি টাউনশেণ্ড-এর সঙ্গে তুর্কী সৈন্যের হাতে বন্দী হন। ছাড়া পান শান্তি প্রতিষ্ঠার পর। জাপানে গিয়েছিলেন খেলনা তৈরী শিখতে, সুবিধে হল না। সাংহাইএর এক টিম্বার-মার্চেন্টের অফিসে কাজ নিলেন। দেখে শুনে স্থির করলেন নিজেই কাঠের ব্যবসা করবেন। এলেন সাসিয়োর পথে ব্রহ্মদেশ। আপার বার্মা ঘুরে নিচে নেমে এলেন ট্যাভয়। মার্গুই। পরে এসে স্থায়ী হয়ে বসলেন রেঙ্গুনে। কাঠের ব্যবসা দু'বছর খুব ভালো চলল,—অবশেষে একদিন কেমন করে আগুন লেগে সে ব্যবসা হল শেষ।

গোবিন্দদা এবার ফিরলেন দেশে। নিজেদের গ্রামে গিয়ে চাষবাসের কাজে আত্মনিয়োগ করবেন ঠিক করলেন। হুগলী জেলার গ্রাম, সে গ্রামের অন্য নাম ম্যালেরিয়া। ধরল গোবিন্দদাকে বেশ ভালো করে। তাঁর পৃথিবী ঘোরা seasoned wood মার্কা পাকা শরীরেও দিল ঘুণ ধরিয়ে। তারই ফলে রুশ-এল আসারায় যাঁর নাম ছিল "ভারতীয় হার্কিউলিস" সেই গোবিন্দদাকে আমি বর্ণনা করেছি হাড় জিরজিরে মফস্বলী গ্রাম্য ভদ্রলোক বলে।

—"গোবিন্দদা ! এত বৃষ্টিতে।" আমাদের সম্মিলিত কণ্ঠে আনন্দোল্লাসের সুর।

"হাঁ গোবিন্দদাই বটে। বৃষ্টিতে এসেছি হাবলার compensation পাঞ্জাবী দেখাতে। শীগগির কিছু শুকনো কাপড়ের আর তোয়ালের বন্দোবস্ত কর নাহলে আমাদের ফুলটুসকি হাবলা নির্ঘাৎ স্বর্গীয় হবে।" মৃদু হেসে বললেন, "আর তার সেই তুতুড়ে কাঠামোয় তাহলে পাঞ্জাবী পরতে পারবে না।"

শুনে হাবলা গম্ভীরমুখে চুপ করে রইল। চেয়ে দেখলাম সে একটা বেঢপ রকমের লম্বা পাঞ্জাবী পরেছে, হাঁটুর নিচে নেমেছে তার দৈর্ঘ্য, আলখাল্লার মত তার চেহারা এবং তার চারটে পকেট! জলে ভিজে সেঁটে গিয়েছে সেই বিচিত্র পাঞ্জাবী হাবলার গায়ে।

"চার পকেটওলা পাঞ্জাবী!" ভোলা একেবারে আকাশ থেকে পড়ল।

"চার নয়, আট। ভেতরে আরও চারটে আছে, দাদা খুললেই দেখতে পাবি।" বললেন গোবিন্দদা মাথা মুছতে মুছতে।

"খোদ্রে হাবলা, পাঞ্জাবী খোল্। গা'টা মুছে ফ্যান ভালো করে। নইলে পাঞ্জাবী পরার আর বেশী opportunity পাবিনে।"

সুধীর চেঁচামেচি আরম্ভ করে দিল, "রমেশ ও রমেশ! গোবিন্দদা আর হাবলার জন্যে গরম গরম কিছু খাবার দাবার নিয়ে আয় বাবা,—একটু বেশী করেই আনিস্—এত বৃষ্টিতে কৃষ্ণের প্রাণী দু'টি এসেছে! তাছাড়া আমরাও আছি।"

"উঃ, তোর তো পেট নয়, বয়লার।" অকৃত্রিম বিস্ময়ে মন্তব্য করল পল্লপতি।

"হাঁ, বয়লার তো বয়লার। তুই এতে কয়লা ঢুকিয়েছিস কোনদিন?"

"ওরে বাবারে! ফেউলে হয়ে যাব তাহলে।" আঁৎকে উঠল পল্লপতি।

কিছুটা হাবলার এবং বেশীর ভাগটা গোবিন্দদার মুখে শুনে গল্পটা শেষ অবধি যা দাঁড়াল তা হল এই :

কয়েকদিন আগে গোবিন্দদা এসেছেন হুগলী থেকে রামকৃষ্ণপুর। ওখানে গোবিন্দদার শ্বশুরবাড়ী। যখন কলকাতায় আসেন তখন সাধারণত ওঠেন রামকৃষ্ণপুরেই। ওখানকার সব চাইতে প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন ক্লাব "যাদুলালয়"-এর উনি হলেন প্রতিষ্ঠাতা।

এবারও কলকাতায় এসে উঠেছেন শ্বশুরবাড়ী। ইচ্ছে ছিল দিন সাতেক ঘোরাঘুরি করে ফিরে যাবেন। তাছাড়া গত মঙ্গলবার রামকৃষ্ণপুরের সতীনাথের বিয়েতে উপস্থিত থাকবার জন্যে একটা জোর নেমন্তন্নও ছিল। এই সময় কলকাতায় আসবার সেটাও একটা কারণ বটে।

কিন্তু সতীনাথের বিবাহোপলক্ষে কলকাতায় এলেও গোবিন্দদা বরযাত্রী যেতে পারলেন না। সকাল থেকেই পেটের গোলমাল।—তাই বললেন যতিনাথকে, "বরযাত্রী যাচ্ছিনে চাটুয্যেমশাই, কারণ justice করতে পারব না। তবে বৌভাতের দিন পুষিয়ে দেব।"

—সতীনাথের বিয়েটা প্রেম করে বিয়ে। তাদের বংশে এই ধরণের বিয়ে এই প্রথম। সতীনাথরা বেশ ধনী। কিন্তু কন্যাপক্ষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। তাছাড়া মেয়েও খুব সুন্দরী নয়। অর্থাৎ সতীনাথের বাবা যতিনাথের চোখে। সতীনাথ অবশ্য এবিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করে। ঘোটের উপর যতিনাথ এবং তাঁর বাড়ীর লোকেরা এ বিয়েতে খুশী নন। কিন্তু তবুও সবদিকে বিবেচনা করে পুত্রের বিয়েতে যতিনাথ সম্মতি দিয়েছিলেন। সম্মতি না দিলেও সতীনাথ এ বিয়ে করবেই একথা প্রাক্ উপলব্ধি করেই বুদ্ধিমান যতিনাথ আগেভাগে সম্মতি দিয়ে নিজের মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন।

কিন্তু একটু রগচটা মানুষ এই যতিনাথ। মনে মনে তিনি ক্ষেপে রইলেন। তাঁর মতে কন্যার ধূর্ত বাপ মা ও আত্মীয় স্বজন সরলপ্রকৃতি সতীনাথের নির্বুদ্ধিতার সুযোগ নিয়ে তাকে হাত করেছে। তাদের চক্রান্তের ফলেই এ বিয়েটা সম্ভব হচ্ছে। সতীনাথ হয়ে পড়েছে কন্যাপক্ষের হাতের পুতুল।

যতিনাথ মনে মনে স্থির করলেন কন্যাপক্ষকে তিনি উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়বেন। সোনার চাঁদ ছেলে তাঁর। কত বড় বড় আয়গা থেকে তার সম্বন্ধ আসছিল। অনেক রাজস্ব ও রাজকন্যা পেতে পারত

ওই ছেলে। অথচ যেসব কিছু না হয়ে এক হাবরের মেয়ে আসছে তাঁর পুত্রবধূ হয়ে। সে মেয়ের না আছে জোরালো বংশ পরিচয় না আছে রূপের জৌলুস, না আছে বিদ্যার গরিমা, অথবা সবকিছু ঢেকে দেওয়া গহনা ও টাকার চোখ ঝলসানো চাকচিক্য। যতিনাথ যে ক্ষিপ্ত হয়ে রইলেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

পাড়ার ছেলেদের মধ্যে যারা বরযাত্রী যাবে তাদের ডেকে অনেক গোপন পরামর্শ করলেন যতিনাথ। ছেলেগুলোরও যেন কেমন একটা ঘড়ঘড়-ঘড়ঘড় ভাব। সব কিছু গুড়িয়ে পাওয়া গেল একটা গণ্ডগোলের পূর্বাভাস।

—অবশেষে এল সতীনাথের বহুকাঙ্ক্ষিত বিয়ের দিন। সাড়ম্বরে বরযাত্রীদের রওনা করে দিয়ে গোবিন্দরা বাড়ী ফিরলেন।

বিয়ের লগ্ন প্রায় বারোটায়। বরযাত্রীরা সব একটু দেরী করেই রওনা হল। কাছেই কনের বাড়ী, মাইল খানেকের মধ্যে। খাওয়াদাওয়া সেরে বিয়ে চুকে বরযাত্রীরা সব হাঁটতে হাঁটতে বাড়ী ফিরবে ঠিক করল।

রাত্রি তখন প্রায় একটা। গোবিন্দরার দরজার কড়া নড়ে উঠল। ভেতর থেকে সদ্য নিদ্রোত্থিত গোবিন্দরা বিস্মিতকণ্ঠে বললেন, "কে?"

"দরজা খোল গোবিন্দরা,—আমরা।" কান্নাকান্না গলা।

"তোরা! তার মানে বরযাত্রীরা?—এত রাত্তিরে গোজা বাড়ী না ফিরে এখানে এলি যে?" —গোবিন্দরার আর বিস্ময়ের অন্ত নেই।

কিন্তু দরজা খুলেই তাঁর চক্ষুস্থির। রাস্তার গ্যাসের আলো এককড়ির মুখের ওপর পড়েছে, তার কালো গালে প্রচণ্ড চপেটাঘাতের চার আঙুলের সমাস্তরাল চিহ্ন। এমন তা ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণ যে চামড়া কেটে রক্ত বেরিয়ে গিয়েছে।

এককড়ির সিল্কের জামাটার সামনের বোতামের ঘরগুলো শুধু আছে।—সেই বোতামের ঘরের চেন সমেত সোনার বোতাম চারটে এককড়ি প্রাণপণ শক্তিতে দু'হাত দিয়ে আগলে ছিল। গোবিন্দরার বাড়ী পৌঁছেও সে দু'হাতের মুঠো খোলেনি।—তখনও সে বোতাম আগলাচ্ছে!

সিল্কের জামার বাকি অংশ যত্রতত্র যেমন-তেমন অবস্থায় কানি হয়ে উড়ছে। এমন কি পাঞ্জাবীটার নিচেকার গেঞ্জীটারও শতচ্ছিন্ন অবস্থা, কালরের মত তা ঝুলছে। এবং সবচেয়ে অসম্মানজনক কথা হল তার পরিহিত বস্ত্রের কাছার অংশটি কাঁচি দিয়ে যেখানে কেটে নেওয়া হয়েছে। এবং কোঁচার অংশটুকু কোন প্রকারে বজায় থাকায় অন্তে এককড়ি একটা কোঁচাসমেত লুঙ্গি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে একথা মনে করা যেতে পারত।

—"মেরেছে, গোবিন্দরা! ভীষণ মেরেছে।" এককড়ি ডেউডেউ করে কেঁদে উঠল।

"কে মেরেছে রে? কেন মেরেছে? কি ব্যাপার!—বরযাত্রী সেজে দল বেঁধে গেলি!—আর সব কোথায়? কেন মারলে তোকে? কি করেছিলি?—জিতে, হেবো, পটলা, হলো, গোৎকা, চণ্ডে, উবো ওরা সব কোথায় ছিল? তোকে ধরে পিটলে, আর ওরা সব কেউ কিছু বললে না। আর তাছাড়া পিটলেই বা কেন? তাজ্জব কাণ্ড! সে-ছোঁড়াগুলোই বা গেল কোথায়?"—গোবিন্দরার অনর্গল প্রশ্ন এবং অচিরিতার্থ বিস্ময়।

"জিতে, হেবো, পটলা, হোৎকা সবাই আমার পেছনে আসছে গোবিন্দদা। আমি স্পোর্টসে দৌড়োনর মত করে দৌড়ে এসেছি কিনা, তাই আগে এসেছি। আমি তো আমাদের এদিককার long distance race-এ সবসময়েই ফার্স্ট হই, তাই ওরা পেছনে পড়ে গেছে।—ওদেরও মেরেছে গোবিন্দদা! খ্যাদার নাক তো খুব বেশী একটা কোনদিনই ছিল না। সেই নাকও ওরা ঘেঁষাটের গায়ে আচ্ছাসে ঘসে দিয়েছে! গেল বোধ হয় বেচারার নাকটা একেবারে!"

নিজের বেহদা ভুলে খ্যাদার কথা মনে করে একেবারে বিচলিত হয়ে উঠল এককড়ি।

"খ্যাদা আর নিশ্বাস নিতে পারবে তো গোবিন্দদা?"

"না দেখলে বলতে পারিনে। Thorough examination—এর পর বলব।" বললেন বিজ্ঞ গোবিন্দদা অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে।

"শিরীষকা'র দুতি কেড়ে নিয়েছে ওরা। শিরীষকা' আমাদের সকলের চেয়ে একটু বেশী চেঁচামেচি করেছিল, তাই তার এই শাস্তি। শিরীষকা' শুধু পাঞ্জাবী পরেই দৌড়ে আসছে রামকেষ্টপুরের রাস্তা দিয়ে। নিচের দিকে তার আর কিছু নেই,—এমন কি জুতোজোড়া অব্‌দি কেড়ে নিয়েছে।"

হতচকিত গোবিন্দদা প্রশ্ন করলেন, "বুঝলাম না হয় তোর শিরীষকা' Lady Godiva-র বেশে রাতদুপুরে রামকেষ্টপুরের রাস্তা দিয়ে লম্বাদৌড়ের চ্যাম্পিয়নের গতিবেগে অগ্রসর হচ্ছেন,—কিন্তু করে ছিলি কি তোরা?"

"সে অনেক কথা গোবিন্দদা, দাঁড়াও আগে একটু দম নিই!—" বলে বাঁ হাতের চেটো দিয়ে এককড়ি মুখটা মুছে নিল। হঠাৎ কি একটা কথা স্মরণ হওয়ায় আতঙ্কে তার সর্বশরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল,—"বাপ্‌রে কী মার! অনেক-অনেক ঠ্যাঙানি খেয়েছি গোবিন্দদা,—কিন্তু এমনটি আর খেয়িনি। পাড়ার সবাই মিলে গেল বছর আমরা যেমন চাঁদা করে চোর ঠেঙিয়ে ছিলাম, এও প্রায় তেমনি। কিম্বা এ তার চাইতেও বিশগুণ বেশী ভয়ঙ্কর!"

বলতে বলতে দেখা গেল জিতে আসছে দৌড়ে। কাছে এলে তার চেহারার সাম্প্রতিক যে-রূপ চোখে পড়ল তাতে পাষাণেরও চোখ ফেটে জল আসে। পরনে আণ্ডারওয়্যার, দুতি অদৃশ্য, এবং ওপরের দিকেও জামা নেই, গেঞ্জি নেই, কিচ্ছুটি নেই! নিচের দিকের সেবগ্রাহ্য জুতো নেই! খালি গায়ে, খালি পায়ে, জিতে যে কত দুঃখে রামকেষ্টপুরের রাস্তায় marathon race দেখাচ্ছিল তা কেবলমাত্র সে-ই জানে!

গভীর ক্ষোভের সঙ্গে এককড়ি বলল, "জিতে একটু সৌখীন মানুষ গোবিন্দদা, অথচ দেখ ওরা কী হাল করেছে ওর। যে-জিতে সদাসর্বদা ফিটফাট জামাইবাবুটি সেজে থাকে, চুলের পাট একটু এদিক-ওদিক হলেই যার আয়নার কাছে ছুটবার দরকার হয় সেই জিতে দিব্যি তিনেক চাঁটি খাওয়া মাথা নিয়ে রাত দুপুরে সদর রাস্তায় দৌড়োচ্ছে এ যদি কেউ দেখত তাহলে বড়ই লজ্জার কথা হত গোবিন্দদা!"

জিতেকে দেখে এককড়ি বোধ হয় কিছুটা উৎসাহিত হয়েছিল, কারণ জিতের অবস্থা এককড়ির চাইতে খারাপ। সর্বাগ্রে পৌঁছে, গোবিন্দদার সান্নিধ্যে মানসিক স্থৈর্যও তার ফিরেছিল কিছুটা। অতিশয় সহানুভূতির সুরে সে বলল, "এ যে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের চাইতেও ভয়ানক। সে-ভদ্রমহিলার তবু শেষ অব্‌দি মানরক্ষা হয়েছিল। কিন্তু জিতের তো সেটুকু সান্ত্বনাও নেই। তবে এরই মধ্যে কিছুটা বাঁচোয়া যে তাকে রামকেষ্টপুরের রাস্তা দিয়ে অনসূন্ন বাঁকরাতে দৌড়োতে হয়েছে।"

হেবো, পাটলা, খ্যাদা প্রভৃতি পৌঁছে গেল ইতিমধ্যে। হেবোর মাথার একদিকটা কামানো,

পটলার কান কেটে নিতে চেয়েছিল বলে সে দু'হাতে কান চাপা দিয়ে কোন রকমে ছুটে পালিয়েছে। এখনও কান চাপা দেওয়া রয়েছে তার সেই আতঙ্কে। খ্যাদার নাক দেওয়ালের গায়ে ঘসে দিয়েছিল। ছড়ে যাওয়া নাকের ডগায় এখনও তার চুন লেগে।

গোবিন্দদা বললেন, "মাথা ঝিমঝিম করছে। হতাহতের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে, কিন্তু এখনও যুদ্ধের কারণ নির্ণীত হল না—"

ঝিতে মাথা নিচু করে ঘুম নিচ্ছিল, এইবার সে মাথা তুলল,—"একটা ধুতি দাও গোবিন্দদা, বড় লজ্জা করছে।—আর—আয়না চিরুনীটা।"

ধুতি আর আয়না-চিরুনী এলে সযত্নে ধুতি পরবার পর মুখচোখ ও চুলের অবস্থা দেখে একেবারে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল ঝিতে। কাতর-কণ্ঠে এককড়ি সান্ত্বনা দিল, "কাঁদিসনি ঝিতে, অমন করে কাঁদিসনি। তোর কান্না দেখে আমাদের বুক ফেটে যাচ্ছে। ময়ূর ছাড়া কার্তিককে ওরা একেবারে বকাসুর বানিয়েছে গো!"

ক্রমে ক্রমে ঘটনাটা পরিষ্কার হল। যতিনাথ বলেছিলেন, ওদের জব্দ করতে হবে, ছেলের দল সোৎসাহে সম্মতি দিয়েছিল ঠিক হায়। বরযাত্রীরা পৌঁছোতেই আদর আপ্যায়নের আর সীমা রইল না। "আসুন, আসুন" বলে মেয়ের বাবা যোগেশবাবাবু নিজে এসে সকলকে ডেকে নিয়ে গিয়ে প্রতিবেশী জনৈক বাবুদের বাইরের ঘরে বসালেন। বিশাল ফরাস পাতা। এদিকে ওদিকে সাটিনমোড়া পাশবালিশ ছড়ানো। ওখানেই বরযাত্রীদের বসবার স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল।

"চা নিয়ে আয়, চা নিয়ে আয়—"

—শিরীষবাবু গম্ভীরমুখে বললেন, "চা যদি খাওয়ানই যোগেশবাবু তাহলে অনুগ্রহ করে তাতে স্যাকারিন দেবেন। আমরা কেউ চিনি খাইনে, আমাদের সব ডায়াবেটিস্"।

"সর্বনাশ! সব ডায়াবেটিস্! কেউই চিনি খাননা?" যোগেশবাবুর চোখ কপালে উঠল।

—যোগেশবাবু মানুষটা একটু সোজা ধরণের, কিন্তু যাঁরা মানুষ চাঁর ভাই রমেশ। এক নিমেষেই সে বুঝে নিল, গোলমাল বাধবে। দাদাকে একপাশে ঠেলে এগিয়ে এল সে।

"তা ডায়াবেটিস থাকলে চিনি না খাওয়াই ভালো। স্যাকারিনেরই বন্দোবস্ত করছি আমরা।"

রান্নার তদারক করছিল যে ছেলেটি তাকে ডেকে বলল রমেশ, "অনন্ত, বরযাত্রীদের রসগোল্লা লেডিকেনি গুলো বেশ ভালো করে ধুয়ে আলাদা করে রাখ। আর সন্দেশগুলো আমাদের নিজেদের অতিথিদের জন্যে একপাশে সরিয়ে রেখে দে। এঁদের সকলের ডায়াবেটিস কেউ চিনি খান না—"

রাতদুপুরে রামকৃষ্ণপুর বাজারে লোক পাঠিয়ে উমাপতি ডাক্তারের ডিসপেনসারী থেকে স্যাকারিন এনে চা তৈরী হল,—সেই চা পরিবেশিত হল বরযাত্রীদের মধ্যে। শিরীষবাবু এবং অনুগামীরা মুচকে হাসলেন পরস্পরের পানে চেয়ে, ভাবটা এখনই হয়েছে কি? এইতো সবে শুরু, অনেক এখনও বাকি!

৫৫৫'র টিন এগিয়ে দিতে লাগল কন্যাপক্ষের ছেলেরা বরযাত্রীদের দিকে। এবারও শিরীষবাবু মুখ খুললেন, "সিগারেট খেলে খোঁট ক্যান্সার হয়। তাই আমরা কেউ সিগারেট খাইনা, তামাক খাই আমরা সবাই। গড়গড়া হলেই ভালো হয়, না হলে নিদেন পক্ষে হুঁকো কল্‌কে।"

"সেকি। এত হুঁকো কল্‌কে কোথায় পাব রাতদুপুরে!" আঁৎকে উঠলেন যোগেশবাবু।

"ছিঃ ছিঃ, এ আপনি কি বলছেন!" বললেন যতিনাথবাবু বেদনার্ত বিস্মিত কণ্ঠে।

আপনার কন্যা আজ আমার পুত্রবধূ। আমার সংসারের জন্যে সে যখন করে আনছে কল্যাণ, যখন করে আনছে মঙ্গল। শ্বশুর কুলে তার মর্যাদা শাস্ত্রজ্ঞীর মর্যাদা, আচার-আচরণের দ্বারা যেন সে তার নবগৃহের সকলের প্রসন্নতা ও প্রীতি অর্জন করতে পারে এই আশীর্বাদই করব।"

কামেলা মিটল, কিন্তু রেশ রইল। অর্থাৎ মূল গায়েনরা যদি বা তালঠোকা বন্ধ করলেন, সঙ্গতীরা রইলেন আসর জমাবার তালে।

যোগেশবাবু বললেন, "সবাইকে ডাকুন, ক্ষমা চাইব আমি নিজে। অপরাধ করেছি সন্দেহ নেই, সকলের সামনে তা স্বীকার না করলে আমার মন শান্তি হবে না।"

গিরীশবাবুর হল বলল, অম্পেনসেশন চাই। অন্দর মহলেও সোরগোল উঠেছিল অত্যধিক। সতীনাথের মা অগ্নিশর্মা হয়েছিলেন—বধূর ওপর নয়—কন্যাপক্ষের ওপর। আর অন্যদিকে যোগেশবাবুর স্ত্রী তো মাতা ধরিত্রীর গর্ভে প্রবেশ করতে পারলে বাঁচেন এমনিতর অবস্থা।

গোবিন্দদাকে সতীনাথের মা শ্রদ্ধা করতেন, যতিনাথ তাঁকে অনুরোধ করলেন স্ত্রীকে বোঝাতে। গোবিন্দদা সিধে বললেন, পারব না। মেয়েলি ব্যাপারে আমি নেই।

যতিনাথের বাইরের ঘরে বসে কথা হচ্ছিল। ছেলের হলও হাজির। বললেন গোবিন্দদা "বিয়ে একটা অবশ্য করেছি চাটুজ্যে মশাই কিন্তু সেটা incidental accident। পুরোন আমলের লোক, তাই সংস্কারবশে সেটিকে ছাড়তে পারিনি, নইলে কবে—। কিন্তু যাকগে সেকথা। নারীঘটিত বিপদের একটা কাহিনী বলি তাহলে হয়ত কিছুটা বুঝতে পারবেন যে কেন আমি আশঙ্কা করি গণ্ডগোল বাধিয়ে ফেলব।

"বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে বেড়িয়েছি, মেয়েলোক তো কম দেখিনি, আলাপ পরিচয়ও কম হয়নি। কিন্তু তাদের সংসর্গে কোনদিনই স্বস্তি অনুভব করিনি। শেষের দিকে একবার তো বেকায়দাতেই পড়ে গেলাম। সেই কথাই এখন বলছি।

ব্রহ্মদেশের এমুড়ো থেকে ওমুড়ো পর্যন্ত অনেক ঘাটের জল খেয়ে শেষে নিয়েছিলাম রেঙ্গুনে এক সরকারী চাকরি মাস কয়েকের জন্য। দেশে ফিরবার কিছুদিন আগে।

"কয়েকজন কর্মপ্রার্থিনীর interview নেবার ভার পড়ল। questionnaire তৈরী ছিল দেখে দেখে প্রশ্ন করব। ভাবনাটা কি?

প্রথম জনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'নাম?'

'মা থিন তান।'

'বিবাহিত, না অবিবাহিত?'

'অবিবাহিত।'

'তার পরের প্রশ্ন লেখা ছিল, Children। তাই জিজ্ঞেস করলাম, 'ছেলেমেয়ে?'

মারতে উঠল মা থিন তান। ভুল হয়ে গিয়েছে টের পেলাম। ক্ষমা চাইলাম অজস্র। বাকি প্রশ্নগুলো তো কোন রকমে কাটল। তারপর দেখা দিল দ্বিতীয় মেয়ে।

এবার ঠিক করলাম উলটে জিজ্ঞাসা করব প্রশ্ন ছুটো, তাহলেই আর এমনতর বিভ্রাট ঘটবে না।

'নাম ?'

'যা হ্‌লা তিন।'

'ছেলেপুলে।'

'দুটি।'

'বিবাহিত, না অবিবাহিত ?'

"প্রশ্ন শুনে রাগে মেয়েটার মুখ লাল হয়ে উঠল। উত্তেজনায় কথা গেল আটকে! কী মুশকিল রে বাবা! যেদিকে যাই সেদিকেই ফ্যাসাদ! তাড়াতাড়ি দুঃখ প্রকাশ করলাম, ত্রুটি স্বীকার করলাম, মার্জনা চাইলাম। মেয়েটার লাল মুখ এবার লালচে হল। কিন্তু আর কোন প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সে গটমট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নিজের নাড়ী দেখলাম, pulse মিনিটে ১১০।১২০র কম হবে না! বড় কর্তার কাছে গেলাম, বললাম, স্ত্রীলোক আমার বাঘিনী সদৃশ, অতএব আমার দ্বারা আর ও কাজ হবে না, অন্য লোক দেখুন।"

ঘরের মধ্যে সকলেই উপস্থিত এবং মেজাজী আবহাওয়াও ছিল উত্তপ্ত। কিন্তু হেসে উঠল সবাই গোবিন্দদার কথায়। এক ঝলক দখিন হাওয়া ঘরে প্রবেশ করল যেন।

নয়েন বলল, "কিন্তু গোবিন্দদা, বৌদিও তো নিশ্চয়ই স্ত্রীলোক ?"

"সন্দেহ নেই, সন্দেহ নেই। বন্ধ্যা নারীর স্ত্রীত্ব সম্পর্কে সব সময়েই কিছু না কিছু অবিশ্বাস থাকতে পারে, কিন্তু তোদের বৌদি ছুটি পুত্রকন্যাসংঘের proud mother, অতএব তিনি সংশয়াতীতরূপে স্ত্রীলোক। কিন্তু কথা তো তা নয়। উনি হলেন পুরোন দিনের গোখমানা মহিলা, একেবারে বটগাছের মত শিকড়বাকড় গজিয়ে বসে আছেন। দৃঢ়মূল অস্তিত্ব, সুকঠিন চেহারা। কিন্তু 'লতায়ানমনীয়া' ওঁদের tackle করা সোজা। কেবল কিছুতেই ছেড়ে যাবেন না, এই যা দুঃখ!"

এবারও নয়েন বলল, "ছেড়ে গেলে খুশী হন ?"

"হয়তো হই! বিদেশে দেখেছি মেমসাহেবরা সাহেবদের হাত ধরে খুরে বেড়াচ্ছেন গভীর ভালবাসা কিনা, তাই হয়তো সাহেব একটু শক্ত করেই হাত ধরে রাখে। হাত একটু আলগা দিলেই মেমসাহেব হবেন হাওয়া, ভালবাসা এবং প্রচুর মালকড়ি সমেত।"

দুঃখের সঙ্গে বললেন, "আমার ক্ষেত্রে তেমনটি হবার জো নেই!"

লঘু হাস্যপরিহাসে সকলেরই মন অনেকটা শান্ত ও পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল। সম্ভবত গোবিন্দদার উদ্দেশ্যও ছিল তাই। এবার তিনি বললেন যতিনাথকে, "প্রথমে মাঠাকরুণকে বোঝাব। তাঁকে প্রভূত পরিমাণে সান্ত্বনা দেব, জিজ্ঞাসাবাদ করব। তারপর যাব শ্রীমতী ঘোষেদবাবুর কাছে। সেখানে আবার এক প্রস্থ মেঘ বৃষ্টিঝড় সইতে হবে, এবং এ সবেরই মধ্যে করতে হবে সময়য় সাধন! ওরে বাবা সে আমার দ্বারা হবে না। তার চাইতে আপনি ওদিকটা দেখুন চাটুয্যেমশাই। ছেলের হলের দায়িত্ব আমার।"

অবশেষে তাই স্থির হল।

ছেলেদের সঙ্গে পরামর্শে বসলেন গোবিন্দদা। যোগেশচন্দ্র বলেছিলেন, ওরা যা চায় তাইতেই আমি রাজী গোবিন্দবাবু। আমার মত অসুবিধাই হক না তাতে আমি গ্রাহ্য করব না। আপনি শুধু দেখবেন ওদের মনে যেন কোন ক্ষোভ না থাকে।

সকলের মনের অসম্মানের গ্লানি যতক্ষণ না অপনোদিত হচ্ছিল ততক্ষণ যেন আর শান্তি পাচ্ছিলেন না যোগেশবাবু।

সকলকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে গোবিন্দরা রাজি করালেন। শিরীষবাবু কিন্তু শেষ অবধি মুখ গোমড়া করেই রইলেন।

জিতে ও শিরীষবাবুর জন্যে শান্তিপুরী ধুতি ও সিল্কের পাঞ্জাবীর বন্দোবস্ত হল আর কাপবার্টসনের জুতো।

এককড়ি বলল আমি একটা বিলিতী স্যুট নেব। সবাই তো শুনে অবাক। কিন্তু তাই, তাই সই।

পটলার কান কেটে নিতে চেয়েছিল, সুতরাং ওর একটা কিংখাবের কানঢাকা টুপি চাই।

বেবোর মাথায় একদিকটা কামানো, সুতরাং সেদিকে তাড়াতাড়ি চুল গজাবার জন্যে কোটির তেল চাই। আর অন্তবর্তীকালীন জরির টুপি।

ঘ্যাদা বলল তার নাক চেপটে গিয়েছে, অনেকটা তুলতে হবে। বোম্বাইএ চ্যাপটা নাক ঘুষিকে চাপ দিয়ে লম্বা করে তোলবার যন্ত্র এসেছে। শ'খানিক টাকা হাত সেই একটা চাই তার।

এমনিতর সব বন্দোবস্ত হল। টাকার অঙ্ক বাড়াল অনেক। যতিনাথ ও গোবিন্দরা ঘোরতর আপত্তি করলেন, কিন্তু যোগেশচন্দ্র হাত জোড় করে বললেন, "আমাকে একটু শান্তিভোগ করতে দিন।"

হাব্‌লা বলল, আমার জামা একদম ছিঁড়ে গ্যাছে। আমার একটু খুব লম্বা পাঞ্জাবী চাই,—যাতে অনেক কাপড় থাকে—আর তার অনেক পকেট।

গোবিন্দরা বললেন, "একটা বোম্বা নে না।"

হাঁড়িপানা মুখ করে হাবলা বসে রইল, জবাব দিল না।

অবশেষে তৈরী হল হাবলার আলখাল্লা পাঞ্জাবী তার আটটা পকেট। ওই শ্রাবণ সন্ধ্যায় হাবলার গায়ে সেই ঐতিহাসিক পাঞ্জাবীই আমরা দেখেছিলাম।

---

* * * *

মহাদেববাবু বললেন পৃথিবীর স্বাধীন দেশের লোকেরাও তো চোরা কারবার করছে বলে শোনাযায়!

আমি উত্তর দিলেম হ্যাঁ সে কথা সত্যি! তবে কি জান তার মূলে মুনাফার যে প্রাপ্তি তা' দুক্ষেত্রে এক হলেও দুয়ের চেহারা পৃথক। অন্য দেশে লোককে অনাহারে মেরে কিংবা তাদের বিবস্ত্র ক'রে লোকে চোরাকারবার চালায় না। —এই হলো তফাৎ

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আজকের নাটক ও নাট্যশালা

আমাদের নাটক ও নাট্যশালা চিরদিনই জাতিকে অনুপ্রাণিত করেছে, চলার পথে মশাল হোয়ে অন্ধকারকে করেছে আলোকিত।

তেইশ বৎসর স্বাধীনতা পেয়েও দেখা গেল, আমরা খাদ্যের জন্যে বিদেশের দ্বারে আজো ভিক্ষুক, ভেজাল খাদ্য এবং ঔষধে আমাদের জীবন জর্জর, চোরাকারবার ও মুনাফাবাজীতে আমাদের জীবন দুর্বিষহ, আমাদের দেশের শতকরা সত্তরজন লোক আজো নিরক্ষর, জাতীয় ঋণে আমরা আকণ্ঠ নিমজ্জমান। সর্বোপরি ঘরে ঘরে আজ বেকার।

অথচ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত দেশগুলি ১৯৪৭ সাল থেকে পুনর্গঠনের কাজে ব্রতী হয়েছিল, ঠিক যে ১৯৪৭ সালে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছিলাম। এই তেইশ বছরে সেইসব সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি আজ কোথায়, আর আমরা কত নীচেই না নেমে গেছি!

আমাদের নাটক ও নাট্যশালা যদি সমাজসচেতন না হয় তবে ধর্মভ্রষ্ট হবে।

সমাজ সচেতন নাটকের মাধ্যমে আজ বলবার দিন এসেছে, গত তেইশ বছরের সমাজব্যবস্থা আমাদের স্বর্গে তোলেনি, রসাতলে নিক্ষেপ করেছে।

এই রসাতল থেকে উত্তরণের আভাস নাটকের মধ্য দিয়ে আমরা দিতে পারি। নাটক আজ আর বিলাস নয়, জাতীয় সংগ্রামের, জীবন সংগ্রামের হাতিয়ার, একথাটা আমরা যেন না ভুলি।

মন্মথ রায়

• • •

শ্রীমন্মথ রায় আজীবন নাট্যসাধনায় ব্যাপৃত। নাটক ও নাট্যশালা সম্বন্ধে তাঁর চিন্তার গভীরতা অনস্বীকার্য! তাই তাঁর উপরোক্ত কথাগুলি বিশেষভাবে আজকের সাধারণ নাট্যশালার পরিচালকদের ও অগণিত ক্ষমতাবান নব-নাট্য সংস্থার অধিনায়কদের পক্ষে প্রনিধানযোগ্য।

আজকের সাধারণ নাট্যশালায় সামাজিক নাটকেরই প্রাধান্য। কিন্তু শ্রীরায় যেদিক দিয়ে সমাজ সচেতন নাটকের কথা বলেছেন, সেদিক দিয়ে কোন প্রতিষ্ঠিত সাধারণ রঙ্গালয়ের নাটকগুলিতে বেশী দেখা

যায় না। অবশ্য তাঁদের পরিবেশিত সামাজিক নাটকগুলিতে আমাদের জীবনের কিছু কিছু অন্ত ধরণের সমস্যার উপস্থাপন দেখা যায় বটে, কিন্তু শ্রীযুত আজকের যে সর্বগ্রাসী সমস্যার কথা বলেছেন তার চিত্র বিশেষ পাওয়া যায় না। সাধারণ নাট্যশালার কর্তৃপক্ষরা হয়ত মনে করেন, তা দেখাতে গেলে নাটক হয়ত প্রচারধর্মী হোয়ে পড়বে এবং যেহেতু দর্শক থিয়েটার দেখতে আসেন, কিছুক্ষণের জন্তে মানসিক অবসাদ দূর করে আনন্দ পাবার জন্তে সেই হেতু সে ধরণের নির্মম বাস্তব বিশেষ কোন মতবাদ সম্বলিত নাটক হয়ত তাঁদের কাছে শ্রেয়স্কর মনে হবে। সেজন্তেই হয়ত তাঁরা কতকটা পাশ কাটিয়ে যান। অবশ্য দু' একটি নাট্য শালায় এর উজ্জ্বল ব্যতিক্রম দেখা গেছে।

আর একটা কথা। সে রকম ধ্যাননিষ্ঠ সমাজচেতন নাট্যকারই বা কোথায়! শ্রীযুত বলেছেন, আমাদের নাটক ও নাট্যশালা চিরদিনই জাতিকে অনুপ্রাণিত করেছে। কিন্তু সে তো আজ নয়, সে বহুযুগ আগে। তখন গিরিশচন্দ্র লিখেছেন, প্রফুল্ল, শাস্তি কি শাস্তি, বলিদান, দীনবন্ধু লিখেছেন, নীলদর্পণ, সধবার একাদশী, মাইকেল লিখেছেন, বুড়ো শালিক, একেই কি বলে সভ্যতা, অমৃতলাল একাধিক ব্যঙ্গাত্মক নাটকে সমাজের উপর কষাঘাত করেছেন, দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছেন, রাণা প্রতাপ, মেবার পতন, দুর্গাদাস।

সেই সব নাটক সে যুগে সমাজ-মানসে প্রচণ্ড আলোড়ন এনেছিল এবং সেই পথ অনুসরণ করে পরবর্তী যুগে শ্রীযুত রায় এবং শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তাঁদের একাধিক নাটকে জাতি ও সমাজকে উদ্বোধিত করবার চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু তারপরেই যেন মৌলিক নাটকের যুগ বদলে গেল। অভিনীত হোতে লাগল, উপন্যাসের নাট্যরূপ, শরৎচন্দ্র, অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, প্রভাবতী দেবী, এবং সেই সঙ্গে আধুনিক যুগের আধুনিক লেখকদের উপন্যাসের নাট্যরূপগুলিও প্রাধান্ত পেল।

যাকে মধ্যে দু'একটি স্মরণীয় মৌলিক নাটকের অভিনয় যে হয়নি তা নয়, তাহলেও উপন্যাসের নাট্যরূপ-গুলিই যে বেশি চলেছে এবং আজো চলছে তাতে দ্বিমত নেই। এর কারণ বোধকরি এই যে, ব্যবসার দিক থেকে এই পথ সুবিধাজনক হয়েছে, একটি ভাল কাহিনী হাতে পাওয়া গেল, সেটিকে কেটে ছেঁটে নাটকাকারে দাঁড় করানো মৌলিক নাটক লেখার চেয়ে নিশ্চয়ই অনেকখানি সহজ এবং যেহেতু সেই কাহিনীর আবেদন ইতিমধ্যেই পাঠক মনে সঞ্চারিত হয়েছে সেই হেতু নাটকের মধ্যেও তাকে ধরে রাখা সহজ হবে এবং তাহলে সে নাটক দর্শক আকর্ষণ করতেও অপারগ হবে না, গত দশ পনেরো বছরের সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত নাটক-গুলির কথা মনে করলেই এই তথ্য পাওয়া যাবে।

এর মধ্যে অবশ্য সাধারণ রঙ্গালয়ে মৌলিক নাটকের পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে। এবং কয়েকটি মৌলিক নাটক বিশেষ জনপ্রিয়তাও লাভ করেছে।

এদিক থেকে শহরের অগণিত নবনাট্য সংস্থাদেরও বিশেষ দায়িত্ব এবং কর্তব্য আছে! তাঁদের মধ্যে যেসব সংস্থা আজ বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছেন তাঁদের কাছ থেকেও কিন্তু আমরা স্মরণীয় কোন মৌলিক নাটকের অভিনয় দেখতে পাই নি। তাঁরা দেশের মানুষ দেশের সমস্যাকে এড়িয়ে গিয়ে বিদেশী নাটকের রূপান্তরকেই প্রাধান্ত দিয়েছেন।

মধ্যে মধ্যে দু'চারজন তরুণ নাট্যকারের মধ্যে মৌলিক নাটক লেখবার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গেছে, কিন্তু যেসব সংস্থা সেই সব নাটক অভিনয় করেছেন তাঁদের তেমন নাম নেই, যাঁরা নাট্যশালা নেই, আর্থিক সঙ্গতি নেই, তাই তাঁদের প্রচেষ্টা প্রশংসা লাভ করেনি।

তাই শ্রীরায়ের কথাগুলি নবনাট্য সংস্থাদের মধ্যে যাঁরা প্রধান তাঁদের পক্ষেই বেশি প্রযোজ্য বলে মনে করি—আমাদের নাটক যদি সমাজ সচেতন না হয় তবে ধর্মভ্রষ্ট হবে।

অনেক কারণেই সাধারণ নাট্যশালার মালিকদের মধ্যপথ অবলম্বন করে চলতে হয়, কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা-সন্ধানী নবনাট্য সংস্থার প্রধানদের তো ততখানি বুঁকি নেই, তাই তাঁরাই পারেন শ্রীরায়ের আশার অনুরূপ নাটক উপহার দিতে। কিন্তু তাঁরাই বা সে সম্বন্ধে সচেতন কৈ ?

বিগত যুগের মঞ্চনায়ক
ধীরেন্দ্রনাথ দাস

বাংলা মঞ্চে যে সব গায়ক-শিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছে, ধীরেন্দ্রনাথ দাস ছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রণী। গানে যেমন ছিল তাঁর নিষ্ঠা, তেমনি জনপ্রিয়তা। এককালে তাঁর নাম সঙ্গীতরসিক মানুষের মুখে মুখে ফিরতো।

বাংলা ১৯শে শ্রাবণ ১৩১০ সালে কলকাতায় ধাতুলালয়ে তাঁর জন্ম। বাল্যশিক্ষা অমৃতলালের ঐরূপ পাঠশালায়। প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে বিদ্যাসাগর কলেজে পড়তে শুরু করেন। কিন্তু মাত্র সতেরো বছর বয়সের সময়েই পিতাকে হারিয়ে লেখাপড়ায় আর বেশী দূর অগ্রসর হোতে পারেন নি।

বিদ্যাসাগর কলেজে পড়বার সময় শিশির কুমারের সংস্পর্শে এলেন এবং লেখাপড়া ছাড়বার পর শিশির কুমারের সঙ্গে দেখা করে জানালেন যে তিনি অভিনয়-জগতে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক। মনোমোহন নাট্যমন্দিরে তখন শিশির কুমারের সীতা সারা শহরকে মাতিয়ে তুলেছে।

শিশির কুমার স্নেহ বশে প্রাক্তন ছাত্রটিকে দলে ভর্তি করে নিলেন। রঘুবীর নাটকে ধীরেন্দ্রনাথের সৌখীন নাট্যাভিনয়ে হাতে খড়ি। পেশাদার রঙ্গমঞ্চেও রঘুবীর নাটকের মধ্য দিয়েই তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। নাটকের সঙ্গীতাংশে তিনি নামতেন। এখানে সীতার সব চরিত্রেও তিনি অভিনয় করেন।

তখনকার দিনের অভিনেতাদের মধ্যে সংগীত ও অভিনয় ক্ষমতার সমন্বয় কমই দেখা যেতো। ধীরেন্দ্রনাথ ছিলেন তার ব্যতিক্রম। গিরিশচন্দ্রের পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস নাটকে অভিমন্যুর চরিত্রে আগে মেয়েরাই অভিনয় করতেন—শিশির সম্প্রদায়ে ঐ চরিত্রে অভিনয় করতেন শ্রীমতী সরলা, আর ক্ষিরোদ প্রসাদের রাধাকৃষ্ণ নাটকে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে অভিনয় করতেন শ্রীমতী প্রভা। ধীরেন্দ্রনাথ এই দুই চরিত্রে অভিনয় করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাছাড়া নরনারায়ণ নাটকে বৃষকেতুর ভূমিকাটি তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে অভিনয় করতেন।

১৯২৪-২৫ সালে ধীরেন্দ্রনাথ সাধারণ সহকারী হিসাবে গ্রামোফোন কোম্পানীতে যোগদান করে শেষ পর্যন্ত গায়ক, সংগীত পরিচালক, গীতিকার ও রেখানাট্য পরিচালকরূপে যশ লাভ করেন।

কাজী নজরুলের "কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যারে আলোর নাচন" গানটিতে তিনিই প্রথম সুর সংযোজনা করেন। গানটি সেই সময় বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। গানটি গাইতেন মৃণালকান্তি ঘোষ। গ্রামোফোন কোম্পানীতে কাজ করবার সময় তাঁর লোকপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে এবং তিনি শহরের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সংগীত শিল্পীরূপে স্বীকৃতি লাভ করেন।

ছবির জগতে কবির প্রেম-চিত্রে সভাকবিরূপে তিনি প্রথম দেখা দেন। তারপর প্রহ্লাদ, যমুনা পুলিনে প্রভৃতি ছবিতে গায়ক শিল্পীরূপে জনপ্রিয় হোয়ে ওঠেন।

ক্রমে সবাক ছবির সঙ্গে যোগাযোগও তিনি অংশ গ্রহণ করতে আরম্ভ করেন এবং সাময়িকভাবে মঞ্চ থেকে বিচ্ছিন্ন হোয়ে পড়েন।

তারপর যোগেশ চৌধুরীর আগ্রহে পুনরায় নাট্যনিকেতনে যোগদান করেন এবং নরমেধযজ্ঞ ও কেদার রায় নাটকের সংগীতাংশে মঞ্চে অবতীর্ণ হন। পরে মহেন্দ্র গুপ্তের পরিচালনাধীনে স্টার থিয়েটারে যোগদান করে বিভিন্ন নাটকের সুরারোপ ও সেই সঙ্গে অভিনয় করেন।

এইচ. এম. ভি. টুইন. মেগাফোন প্রভৃতি রেকর্ড কোম্পানীতে তাঁর পাঁচশোর উপর রেকর্ড আছে। মঞ্চ-জীবনে পরে স্টারে অপরেশচন্দ্রের আমলে বিদ্রোহিনী নাটকের সংগীতে সুর সংযোজনা করেন তারপর রঙমহলে রঙ্গদীপ, রাজা রায়, স্টারে অলকানন্দা, টিপু সুলতান, দুর্গেশ নন্দিনী প্রভৃতি নাটকে ও বহু ছবিতেও সঙ্গীত পরিচালকের কাজ করেন।

১৯৪৪-৪৫ সালে বীরেন্দ্রনাথ বাংলা সরকারের প্রচার বিভাগের সঙ্গে জড়িত হন এবং পরে পশ্চিমবঙ্গ লোক সংগীত বিভাগেও কিছুদিন কাজ করেছিলেন। তাঁর এক পুত্র, অনুপকুমার, বর্তমান মঞ্চের ও চিত্রের একজন যশস্বী শিল্পী।

নাট্য এবং সঙ্গীতের আজীবন একনিষ্ঠ প্রবল অনুরাগী শ্রীঅনিল মিত্র কলকাতা এবং নিকটবর্তী অঞ্চলের জলসার আসরে এক সুপরিচিত ব্যক্তি। অসংখ্য গানের আসরে তিনি হাজিরা দিয়েছেন, বহু গায়ক গায়িকার গান শুনেছেন, অনেক ঘটনা দেখেছেন। সেদিন তিনি আমাদের কাছে সেইসব কথা বলছিলেন, তারপর তাঁর কিছু স্মৃতিকথা আমাদের জন্যে লিখে দিয়েছেন। রচনাটি নিঃসন্দেহে উপভোগ্য।—গঃ সঃ।

আমি এক শ্রোতা

অনিল মিত্র

আমি শিল্পী নই, শিক্ষার্থীও নই, শুধু শ্রোতা মাত্র। শুধু কলকাতা নয়, শ্রীরামপুর, চন্দননগর, বাণাঘাট, বালুরঘাট প্রভৃতি জায়গার আসরেও যেতে ছাড়ি নি।

১৯২২ সাল থেকে আমি নিয়মিত শ্রোতা। তার আগে শৈশব থেকেই আমি লোকের জানলায় উঁকি দিয়ে গানবাজনা শুনতাম। একদিন বাবা খেতে বসেছেন, তাঁর জন্যে দই আনতে গিয়েছি। পথে এক বাড়ির জানলায় দাঁড়িয়ে গান শুনতে শুনতে এমনই তন্ময় হোয়ে গিয়েছিলাম যে, বাড়ি ফিরে দেখি বাবা খেয়ে আপিস চলে গেছেন।

যে সমস্ত আসরে গান শুনেছি সে-সব আসরে শিল্পীরূপে উপস্থিত ছিলেন, রাধিকা গোস্বামী, কমলাবাই, চন্দন চোবে, এনায়েৎ খাঁ প্রভৃতি। যে সমস্ত ওস্তাদের বাজনা শুনেছি তাঁরা হলেন, নাসিরুদ্দিন খাঁ, আবদুল

করিম খাঁ, ফৈয়াজ খাঁ, ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, গোলাম আলি খাঁ, মস্তাক হোসেন, কেশরবাই, মঞ্জুবাই, হীরাবাই, বেগম আখতার প্রভৃতি। বাহুল্য বোধে বাংলার বিখ্যাত গুণীদের নাম আর উল্লেখ করলাম না।

শ্রোতা হয় সাধারণতঃ তিন রকমের : যেমন, (১) যাঁরা কিছুই বোঝেন না, হয়ত খেলার মাঠ বা সিনেমা ফেরৎ হঠাৎ আসরে ঢুকে পড়লেন, খানিকক্ষণ শুনে চলে গেলেন। (২) যাঁরা শাস্ত্র মুখস্থ করে সমালোচনা করেন। (৩) কিছু আছেন শিক্ষার্থী।

বর্তমানে ৬৩ বৎসর বয়সে পড়েছি। সঙ্গীত অনুরাগের জন্যে আমি সংসারী হোতে সাহস পাইনি। —পাছে আমার আসর শোনার ব্যাঘাত ঘটে। ৩৯ বছর চাকরি জীবনে রাতের পর রাত আসর শুনেছি। তখন আসরগুলোতে ধরা বাঁধা সময় ছিল না। আর সম্মেলনের পর যানবাহনের কোন ব্যবস্থাও ছিল না। প্রায়ই অনেক রাস্তা পায়ে হেঁটে ফিরতে হ'ত।

সঙ্গীত-প্রেমিক স্বর্গত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষের সৌজন্যে নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের অধিবেশনে ভারতের শ্রেষ্ঠ গুণিজনের গানবাজনা শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তখন জলসা ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি নিয়ে করা হোত না। উদ্যোক্তারা সবাই ছিলেন বিশিষ্ট সঙ্গীত-রসিক। আসরের প্রথম সারিতে থাকতেন বিশিষ্ট ওস্তাদরা। ফলে শিল্পীরা পেতেন অনুপ্রেরণা। কিন্তু এখন যুগ বদলে গিয়েছে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে আসরের চরিত্রও। এখন সামনের সারিতে প্রায়ই ধনী পৃষ্ঠপোষকরা থাকেন। হয়ত তাঁদের মধ্যে অনেকেরই তেমন সঙ্গীতানুরাগ নেই।

শিল্পীদের প্রতি শ্রোতা হিসাবে আমার বক্তব্য হল, সঙ্গীত-চর্চার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ বিশ্বমানবের মর্ম স্পর্শ করা। তাই রবীন্দ্রনাথের কথায় বলব, "একাকী গায়কের নহেত গান, মিলিত হবে দুই জনে, গাহিবে একজন খুলি গলা, আর একজন গাবে মনে।"

অনেকে দেখি চর্চা ঠিকই করেছেন, কিন্তু তান, সরগম ও লয়কারীর দিকেই যেন ঝোঁক বেশী। আমরা প্রতিমা দেখতে গিয়ে, সিংহ ভাকিনী-যোগিনী ইত্যাদি দেখব, না মায়ের শক্তিরূপিনী, দশপ্রহরিণী ও বিদ্যাধারিনীর ভাব ফুটেছে কিনা, সেটাই দেখব? তাই বলি, অলংকার আগে, না, মূর্তি আগে?

আর একটা কথা। অনেক শিল্পীই ভারতের বাইরে গিয়ে দেশের মুখোজ্জ্বল করেছেন। কিন্তু অপর দিকে দেখছি, বাইরে না গেলে শিল্পীর তেমন দর হয় না বলে অনেকে মনে করেন। এটা কেন? বিলাত ফেরৎ ডাক্তার ব্যারিস্টারের হয়ত কিছুটা মানে হয়। কিন্তু বিলাত ফেরত গায়কেরও কি সেই মানে? যেসব সাধক আশৈশব দুনিয়াটা ভুলে গিয়ে অন্ধ গুরুভক্তি নিয়ে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছেন তাঁরা কি অবহেলার বস্তু?

অনেক আসরই তো শুনলাম। কিন্তু পাথুরিয়াঘাটার স্বর্গত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের বাড়িতে ওস্তাদ নাসিরুদ্দীন খাঁ সাহেবের যে আলাপ শুনেছি তা আজো কানে বাজে। সমস্ত শ্রোতাই যেন সে আলাপ শুনে মন্ত্রমুগ্ধ ও আবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। ঐ বাড়িতেই আর একদিন ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের পুরিয়া রাগে আলাপ ও গিরিজাবাবুর খেয়াল আজো ভুলতে পারছি না।

আগে অনেক জমিদার বাড়িতে প্রায়ই বড় বড় ওস্তাদদের গান বাজনা সাধারণ লোকের শোনবার সুযোগ হত। কিন্তু আজকাল শিল্পীদের পারিশ্রমিক নির্ধারিত হওয়ায় সাধারণ শ্রোতারা সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

বড়ই দুঃখের বিষয়, শিল্পীর যত দিন কর্ম্ থাকে ততদিনই তাঁর কদর ও আদর। কিন্তু তাঁর কর্ম্

গেলেই আর তাঁকে দেখবার কেউ নেই। একথা ভাবলে মানতেই হয় যে আমরা শিল্পী ও শিল্পের প্রতি আমাদের কর্তব্য করতে পারছি না।

আমার জীবনে কয়েকটি বিশেষ সৌভাগ্যজনক ঘটনা মনে পড়ছে। একবার বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেব সাজঘরে বসে আমার মতো নগণ্য লোকের খবর নিচ্ছেন, এমন সময় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বাইরে এসে আমাকে বললেন, "আরে, আপনি এখানে? যান, যান, আপনাকে খাঁ সাহেব খুঁজছেন।"

তাড়াতাড়ি ভিতরে যেতেই হেসে উঠে আনন্দ প্রকাশ করলেন। আমার সে সময় একটি হাত প্লাস্টার করা ছিল। তিনি জানতেন আমার অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল। তিনি তার খবর নিলেন ও আল্লার কাছে আমার জন্যে প্রার্থনা করলেন। একজন নামমাত্র সঙ্গীতানুরাগীর প্রতি এত বড় একজন শিল্পীর সহৃদয়তা দেখে আমি নিজেকে ধন্য মনে করেছিলাম সেদিন! পণ্ডিত রবিশঙ্কর অনেকবার অনুষ্ঠান শেষে তাঁর বিদেশী শ্রোতাদের কাছে শ্রোতা হিসাবে আমার প্রশংসা করে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করে দিয়েছেন। একবার বলেছিলেন, "কোনদিন আপনাকে বোধ হয় লণ্ডনেও দেখবো।"

সঙ্গীত এক নেশা যার এমন মাদকতা যে তা আমাদের সোজা ঈশ্বর উপলব্ধির পথে নিয়ে যায়। এ যেন গিরিশচন্দ্রের ভাষায়,—"এ কি নেশা ধরালে বাবা। ছাড়তে চাইছে না।"

নাট্যপ্রবাহ

জামসেদপুরে রবীন্দ্র-নাট্যের অভিনয় আসর

গত ২২শে জুন থেকে ২৭শে জুন পর্যন্ত ছয়দিন ব্যাপী উৎসবের মাধ্যমে 'রবীন্দ্র মেলা' সাকচির বেঙ্গল ক্লাবের রবীন্দ্র মঞ্চে কবিগুরুর ১০৯তম জন্ম জয়ন্তী উদ্‌যাপিত করেন। রবীন্দ্র সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তির মাধ্যমে টেগোর সোসাইটী পরিবেশন করেন গীতি আলেখ্য 'বৈশাখ হে মৌনী তাপস।' মিলনী মঞ্চস্থ করেন কবির ডাকঘর। মিউ বারদুয়ারী এসোসিয়েশন জনমানসে তুলে ধরেন জনগণের কবি রবীন্দ্রনাথ। প্রজা ভারতীর চণ্ডালিকা নৃত্য-নাট্য রসিকদের আনন্দ দেয়। মৌসুমী রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের নাট্য রূপ দিয়ে অভিনয় করেন শেষ রাত্রি। বেঙ্গল ক্লাবের শাস্তির অভিনয় দেখে সকলে তৃপ্তি লাভ করে। ১৬ই ও ১৭ই জুন সন্ধ্যা ৭টায় টেলকোর রবীন্দ্র-সংসদ স্থানীয় সবুজ-কল্যাণ-সংঘ মঞ্চে শিশু উৎসব ও ১০৯ তম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালন করেন। ১৬ই জুন ১০৯টী শিশুশিল্পী অভিনয় করে "সোনার-বাঁশি"। মঞ্চ গঠন, অভিনব সাজসজ্জা, আলোক-সম্পাত, আবহ সঙ্গীত সবে মিলে এক আকর্ষণীয় মোহজাল সৃষ্টি ক'রে সমাগত দর্শকবৃন্দকে প্রচুর আনন্দ দান করে!

১৭ই জুন অভিনীত হয় "শোধ-বোধ"। অভিনয়ে সকলকে তৃপ্ত করেছিলেন সর্বশ্রী প্রদীপ চক্রবর্তী (সন্তীশ) দীপেন মজুমদী (মিঃ নন্দী) দেবাশীষ চক্রবর্তী (মিঃ লাহিড়ী) পদ্মলোচন বসু (শশধর) বিনয় চক্রবর্তী (মন্মথ) গীতা বসু (নলিনী) রত্না ঘোষ (চারু) কল্পনা গুপ্তা (মিসেস্ লাহিড়ী) দীপা চৌধুরী (মৃদুমাধী) শিবানী বন্দ্যোপাধ্যায় (বিধুমুখী) টুটুল সরকার (হরেন)।

কণ্ঠসঙ্গীতে ছিলেন—স্মিতা বসু ও দীপঙ্কর বসু।

আবহ-সঙ্গীতে—অলোক রক্ষিত, প্রশান্ত রায়চৌধুরী ও দত্তাত্রিৎ সেনাপতি।

পরিচালনায় পদ্মলোচন বসু ও ধ্রুব মজুমদার।

শেষদিন ২৭শে মে তারিখে স্থানীয় বেঙ্গল ক্লাবের রবীন্দ্রমঞ্চে, নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের প্রযোজনায় এবং ডাঃ কেশবচন্দ্র দের পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের অনন্য উপন্যাস 'যোগাযোগ'-এর নাট্যরূপ মঞ্চস্থ হয়।

দলগত অভিনয় নৈপুণ্যে সাফল্যমণ্ডিত এই নাটকের 'কুমুদ' ভূমিকায় শ্রীমতী গীতা বসু এবং 'শ্যামার' ভূমিকায় শ্রীমতী দেবী ভট্টাচার্য্যের সাবলীল অভিনয় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন সর্বশ্রী বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত (বিপ্রদাস), শ্যামল সরকার (মধুসূদন), পুণ্যব্রত সিংহরায় (নবীন), বাসন্তী সরকার (মোতির মা), কানু ঘোষ (কালু মুখুয্যে) সুবেশ সরকার (বেঙ্কট শাস্ত্রী), টুটুল সরকার (হাবুল) তুষার দাশগুপ্ত (মুরলী))

মঞ্চসজ্জা ও আবহ-সঙ্গীত নাটকের সকল রূপায়ণে যথেষ্ট সাহায্য করে।

'যোগাযোগ' উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন ডাঃ কেশবচন্দ্র দে।

—নিজস্ব প্রতিনিধি।

বিচিত্রিতা : সম্প্রতি বিগতপ্রা মঞ্চে এই সংস্থার শিল্পীরা রবীন্দ্রনাথের 'তপতী' নাটকটির অভিনয় করলেন। এযুগে তপতীর মতো নাটক নির্বাচন করে বিচিত্রিতার সভ্যরা যে প্রশংসনীয় নাট্য ঐতিহ্যের ও সাহসের পরিচয় দিয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। এই নাটকটির অভিনয় বেশী হয়নি। অত্যন্ত দুরূহ অন্তর্মুখী নাটক তপতী। মনে পড়ছে, বছর ত্রিশ আগে ঠাকুর বাড়ীর মঞ্চে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বিক্রমদেবের ভূমিকা নিয়ে এই নাটকের অভিনয় করেছিলেন তিন রাত্রি। সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা আমাদের জীবনে। তারপর শিশিরকুমার কয়েক রাত্রি এই নাটকটি অভিনয় করেছিলেন। সে অভিনয়ের প্রযোজনা হয়েছিল অপূর্ব। কিন্তু সে সময় শিশিরকুমার স্বরভঙ্গে ভুগছিলেন, তাই তাঁর অভিনয় আশানুরূপ হয়নি। রাণীর ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন শ্রীমতী প্রভা। তারপর শ্রীউৎপল দত্ত এই নাটকটিকে মঞ্চস্থ করেছিলেন বোধ করি দু' এক রাত্রি। সে অভিনয়ও দেখেছি। ভাল লাগেনি। শ্রীবন্তের রাজার ভূমিকায় অভিনয় যেন অত্যন্ত স্থূল ও কর্কশ মনে হয়েছিল। রাণীর ভূমিকায় অবশ্য শ্রীমতী শোভা সেন চমৎকার অভিনয় করেছিলেন।

বিচিত্রিতার অভিনয় দর্শকদের মোটের উপর খুশী করতে পেরেছে। রাজার ভূমিকায় প্রফুল্ল ভোস এবং রাণীর চরিত্রে মালবিকা পাঙুলী দর্শকচিত্তে রেখাপাত করতে সক্ষম হয়েছেন। সমর ভট্টাচার্যের দেবদত্ত, রাণী চৌধুরীর বিপাশা, অখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নরেশ, মানস মুখোপাধ্যায়ের রত্নেশ্বর সুঅভিনীত।

সুরভি সঙ্ঘ : সম্প্রতি অনাইএ উক্ত সংস্থার সভ্যরা নীহার গুপ্তের 'উল্কা' নাটকটির অভিনয় করে দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেছেন। অভিনয়ে রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয় চট্টোপাধ্যায়, অজয় মুখোপাধ্যায়, গীতা নাগ ও অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। অন্যান্য ভূমিকাগুলিও যথাযথ ভাবে রূপায়িত। নাটকটি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেন বিজয় চট্টোপাধ্যায়।

শিবাজী সঙ্ঘ : সম্প্রতি মহাজাতি সদনে সঙ্ঘের শিল্পীরা দীপ্তি কুমার শীল রচিত 'আমি কি বলব' নামে একটি নতুন ধরণের নাটক অভিনয় করলেন। দলগত অভিনয় উচ্চ প্রশংসার দাবী করতে পারে। তার মধ্যে বিশেষভাবে যাদের অভিনয় উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন, দিলীপ বসাক, দীপ্তিকুমার শীল, বিশ্বনাথ রায়, প্রভাত বসু ও প্রদীপ শীল।

মৌভাত : সুনীল বসুর লেখা সমাজ সচেতন নাটক শিকার-এর অভিনয় করলেন মৌভাতের শিল্পীরা গত মাসে বিশ্বরূপা মঞ্চে শ্রীমতী ছন্দা দেবীর পরিচালনায়। অভিনয়ে প্রাণের স্পন্দন জাগিয়েছেন অনিল সরকার, প্রকাশ বসু ও ছন্দা দেবী। অন্যান্য ভূমিকায় শিবানি ভট্টাচার্য, সুনীল দত্ত ও শ্যামল ঘোষাল চরিত্রানুগ অভিনয় করে দর্শকদের প্রশংসা পেয়েছেন। মঞ্চসজ্জা, আবহ সঙ্গীত ও আলোক সম্পাত উৎকর্ষের পরিচায়ক।

কারুমিক : গত মাসে মিনার্ভা মঞ্চে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মসিজীবী' নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন কারুমিক নাট্যগোষ্ঠী। অভিনয়ে সকলকে মুগ্ধ করেনঅশোক রায়। অন্যান্য ভূমিকায় নাট্য-নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখেন মণীন্দ্র বিশ্বাস। অন্যান্য প্রায় সকল ভূমিকাই সুঅভিনীত।

লিপটন ড্রামাটিক ক্লাব : গত মাসে স্টার মঞ্চে এঁরা অভিনয় করলেন নীহার গুপ্তের মায়ামৃগ। পরিচালনায় ছিলেন হীরেন রায়। অভিনয়াংশে ছিলেন, তৃপ্তি দাস, জি, গোমেশ, মৃন্ময় চৌধুরী, পঙ্কজ ভট্টাচার্য, অশোক রায় চৌধুরী, শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সরল সরকার, মানসী বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবী মুখোপাধ্যায় ও রাজলক্ষ্মী দেবী। দলগত অভিনয় ছিল সুসংবদ্ধ, ছোট ছোট চরিত্রগুলির অভিনয় সুন্দর। পরিচালনার কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া গেছে।

বীণাপাণি সঙ্গীত সমাজ। বেহালার এই সুখ্যাত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি স্থানীয় এ. পি. রায় ইনস্টিটিউটে দু'দিন দুটি নাটকে অভিনয় করলেন। প্রথম দিন, শচীন সেনগুপ্তের সিরাজদ্দৌলা, দ্বিতীয় দিন বিধায়ক ভট্টাচার্যের মাটির ঘর। পরিচালনায় ছিলেন যথাক্রমে প্রকাশ চট্টোপাধ্যায় ও অতুল চক্রবর্তী। অভিনয় এবং পরিচালনার গুণে দুটি নাটকই দর্শকদের প্রভূত আনন্দ দিয়েছে। নাটক দুটির বিভিন্ন চরিত্রে যাঁরা বিশেষ নাটনৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন তাঁরা হলেন, সুনীল ভট্টাচার্য, সুপ্রকাশ বন্দোপাধ্যায়, হারাধন চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন মজুমদার, বিশ্বনাথ পাল, বিপাসা গোস্বামী, নূপুর গোস্বামী, কবিতা গাঙ্গুলী ও সেবা দাস।

ইমপিরিয়াল টোব্যাকো। এঁদের ক্রীড়া বিভাগের বিডিরপুর শাখা গত মাসে টার মঞ্চে অভিনয় করলেন গৌরীশংকর চৌধুরীর নির্দেশনায় 'একটি পয়সা'। নাটকটির বিভিন্ন ভূমিকায় সুঅভিনয় করেছেন ডঃ সন্তোষ চক্রবর্তী, সমর বড়াল, পাঁচুগোপাল সেন, শক্তি মুখোপাধ্যায়, বিমল বন্দোপাধ্যায়, অজন ভট্টাচার্য, বিশ্বেন্দু ভট্টাচার্য, অশোক চট্টোপাধ্যায়, অজয় চট্টোপাধ্যায়, শংকর দাস, শম্ভু দাস, মনোজ ধারা, মালা দাস, রমা গুহ, মানসী বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্মিত চক্রবর্তীর নির্দেশনায় মননশীলতা ও অভিনবত্বের ছাপ ছিল। আবহ সঙ্গীতে গীতশ্রী অর্কেস্ট্রা নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে।

শিয়ালদহ স্টেশন ক্লাব। নেতাজী সুভাষ মঞ্চে উক্ত রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যরা সম্প্রতি অন্নদাশঙ্করের লৌহকপাট উপন্যাসের নাট্যরূপ অভিনয় করলেন। কমল বসুর নিপুণ নির্দেশনায় এবং ভানু চক্রবর্তী, চিত্ত দাস, জ্যোতি বাগচী, রমণী সেনগুপ্ত, অমল বসু, মালা দাস, আরতি ঘোষ, চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, কেকা বসু প্রমুখ শিল্পীদের প্রাণবন্ত অভিনয়ে সমগ্র নাট্যাভিনয়টি দর্শকদের আবিষ্ট করে রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

নবীন সঙ্ঘ। চাক এভিনিউএ রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে সংঘের শিল্পীরা হেরেম নবীর নির্দেশনায় কবিগুরুর 'ছুটি' গল্পটির নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করেছিলেন। রথীন সরকার, অজিত ভট্টাচার্য, দুলাল ঘর, শম্পা দত্ত প্রমুখ শিল্পীরা স্বচ্ছন্দ এবং প্রাণস্পর্শী অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছেন। নাটকটির প্রযোজনে কিছু কিছু ত্রুটি থাকলেও মোটের উপর কাহিনীর আবেদন বজায় ছিল এবং পরিচালনাও হয়েছিল সুষ্ঠু ও গতিপূর্ণ।

বাণীরূপা (কোচবিহার)। গত মাসে স্থানীয় ল্যানসডাউন হলে এই মহিলা-শিল্পী-সংস্থার সভ্যারা রবীন্দ্রনাথের গোরা নাটকটি বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। হারানবাবুর ভূমিকায় বাণী সেন, আনন্দময়ীর ভূমিকায় প্রতিমা দেবী, গোরার চরিত্রে সোমা গুপ্ত দর্শকদের মুক্তকণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেন। এঁরা ছাড়া অন্যান্য যাঁরা সুঅভিনয় করে নাটকটি উপভোগ্য করেছিলেন, তাঁরা হলেন, শিপ্রা রায়, সুমিতা গুপ্ত, কল্যাণী মুখোপাধ্যায়, বিজয়া রায়, শান্তি মজুমদার, গীতা ঘোষ, গৌরী দাস, অপর্ণা দাস, মীরা নাথ প্রভৃতি। নাটকটি পরিচালনা করেন আরতি সাহা। রূপসজ্জা ও মঞ্চ সজ্জা সুন্দর ও নিখুঁত।

ফ্রেণ্ডস অ্যাসোসিয়েশন। চাকুরিয়ার এই সমিতির উদ্যোগে সম্প্রতি বালিগঞ্জ শিক্ষাসদন মঞ্চে অজেন দে রচিত 'সেব নামাম' নামক নাটকটি অভিনীত হয়েছে। তপন রায়চৌধুরীর পরিচালনায় দলগত অভিনয় উচ্চমানের। বিভিন্ন চরিত্রে সুখ্যাতির সহিত অভিনয় করেন, অরুণ বন্দ্যো, ভাস্কর বন্দ্যো, পীযূষ বন্দ্যো, প্রবীর মুখোপাধ্যায়, সত্যিৎ বসু, অসিত পাল, স্বপন সোম, তপন চৌধুরী, চণ্ডী পাল, বিনয় চক্রবর্তী, শিবানি বন্দ্যো, বীণা চক্রবর্তী প্রমুখ।

শ্যামনগর ইউনাইটেড ক্লাব। গত জুন মাসে ধমধমের এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে বিচিত্রানুষ্ঠান ও নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করা হয়। নাটক ছিল ডাঃ অরুণ কুমার দে রচিত 'কার দোষ'। নাটকটির আবেদন দর্শকমনকে আলোড়িত করতে সক্ষম হয়েছিল। বিভিন্ন ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেন, তাপস মিত্র, মানবেন্দ্র মিত্র, বিকাশ রায়, স্বপন মৈত্র, অজিত দাস।

সংগঠনী (নবদ্বীপ) সুব্রত দত্তের পরিচালনায় এঁরা গত মাসে দুটি নাটক অভিনয় করলেন, শৈলেশ গুহ নিয়োগীর 'ক্যাপ্ট খুনী' ও 'বিদিশা'। বিভিন্ন ভূমিকায় সুঅভিনয় করেন, সুব্রত দত্ত, অমর সাহা, গোকুল সাহা, অলক কুণ্ডু, প্রদীপ কুণ্ডু ও সুদর্শন সরকার।

নাট্য দর্শন

যাত্রার আসরে লেনিনের বিপ্লব ঘোষণা : হিটলারের রণহুঙ্কার :
তরুণ অপেরার দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা : শান্তিগোপালের অনবদ্য অভিনয়

বিশ্ববিপ্লবের জনক রাশিয়ার লেনিন এবং বিশ্বযুদ্ধের নায়ক জার্মানীর হিটলার একদা তাঁদের কর্মের মধ্য দিয়ে সারা জগৎ তোলপাড় করেছিলেন। বাংলার জনসাধারণ তাঁদের নাম শুনেছেন, কিন্তু তাঁদের জীবনের সংঘাত, তাঁদের জীবন চর্চা বা জীবনদর্শন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল মানুষ, বাংলায় বিশেষ করে গ্রাম ও মফঃস্বল বাংলায় অথবা অন্য রাজ্যের বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে কজনই বা আছেন। তাই তাঁদের বিচিত্র জীবনের কর্মধারা নিয়ে রচিত নাটক যে বাঙালী দর্শকের মনে সাড়া জাগাবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। শম্ভু বাগের রচনা দুটি মঞ্চনাটক নয়, যাত্রা-নাটক। এবং সেই দুই পালা বাংলা, বিহার, আসাম, দিল্লী প্রভৃতি

দূর দূর জায়গায় আসরস্থ হয়ে লক্ষ লক্ষ বাঙালী দর্শককে বিশ্বের এই দুই মহানায়কের জীবনালেখ্য পরিবেশন করে তাঁদের নতুন রস নতুনতর আনন্দের সন্ধান দিয়েছে, অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, যাত্রাজগতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে বলা চলে।

অল্পদিনের ব্যবধানে আমরা পালা দুটির অভিনয় দেখলাম। প্রথমে লেনিন, তারপর হিটলার। নাটক দুটির নামেই বোঝা যায়, দুই নায়কের জীবনকে ঘিরেই যা কিছু নাট্যবিন্যাস। সুতরাং এই দুটি চরিত্রের যথার্থ রূপায়ণের মধ্যেই নাটক দুটির সার্থকতা ও সাফল্য। এই দুই চরিত্রে অভিনয় করেছেন তরুণ অপেরার যশস্বী নট শান্তিগোপাল। লেনিন বা হিটলারকে আমরা চোখে দেখিনি, তাঁদের ছবি দেখেছি, তাঁদের কিছু লেখা এবং তাঁদের সম্বন্ধে কিছু লেখা পড়েছি এবং তাদেরই সাহায্যে তাঁদের সম্বন্ধে একটা ধারণা মনের মধ্যে লালন করেছি।

আশা করি তাঁদের চরিত্র এবং সমকালীন ঘটনাবলী নিয়ে পালা দুটির নাট্যকার যে চিত্র উপস্থাপিত করেছেন তথ্যের দিক থেকে তা প্রামাণিক। তা যদি হয় তাহলে আশ্চর্য জীবন্ত রূপে ফুটে উঠেছে চরিত্র দুটি এবং বিস্ময়কর দক্ষতার সঙ্গেই চরিত্র দুটিকে রূপায়িত করেছেন শান্তিগোপাল। ভুলে যেতে হয় যে অভিনয় দেখছি, মনে হয়েছে যেন সত্যিই লেনিন এবং হিটলার রক্ত মাংসের কায়া নিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

দুটি চরিত্র বিপরীত ধর্মী, বিভিন্ন তাদের মানসভঙ্গী, জীবন-দর্শন, মূল্যবোধ আর হৃদয়ের উদ্ঘাটন। পর পর দুটি চরিত্র শান্তিগোপাল এমন নিখুঁত ভাবে অভিনয় করেছেন যে এক চরিত্রের এতটুকু ছাপ, ভঙ্গী, বা অভিব্যক্তি অপর চরিত্রের ওপর পড়েনি। এটা সাধারণ ক্ষমতা নয়। লেনিনের সমাহিত অন্তর্মুখিতা, সর্বক্ষেত্রেই পরিমিত আচরণ, পরিমিত বাচন, পরিমিত হৃদয়বত্তা যেমন সুন্দর ফুটেছে তাঁর অভিনয়ে তেমনি নিখুঁত হয়েছে হিটলারের ভূমিকায় তাঁর দুর্দান্ত লোচ্চার অতি-অভিনয়। তাঁর সহযোগিরা তাঁকে অবশ্য যথেষ্ট সহায়তা দিয়েছেন। প্রত্যেকটি শিল্পীই আন্তরিকতার সঙ্গে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, শিব ভট্টাচার্য, বর্ণালী বন্দ্যোপাধ্যায়, পুতুল দত্ত, অমর ভট্টাচার্য, প্রফেসর সরকার, সুদর্শন সেন, আরতি দত্ত প্রমুখ।

নাট্য প্রযোজনা ও পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন অমর ঘোষ। স্টেজের উপর যাত্রার অভিনয়। দেখলাম, পুরোপুরি স্টেজ আংগিকেরই অনুসরণ বা অনুকরণ। অবশ্য পরিচালনা, আবহ সঙ্গীত, ধ্বনি ব্যঞ্জনা, আলোক সম্পাত যথেষ্ট উপভোগ্য।

মহাজাতি সদনে (২০-৩-৭০) হিটলার পালার অভিনয়কালে স্টেজের উপর একটি নক্সাকাটা কোলাপ্সিব্ল চেয়ার না রেখে আর একটু প্রতীকধর্মী বসবার আসনের ব্যবস্থা করা কী সম্ভব ছিল না—চেয়ারটা দৃষ্টি কটু লেগেছে।

খেলাধূলা

জ্যোতির্ময়

একটি ঐতিহাসিক সাফল্যের নেপথ্যকাহিনী

কলকাতার মাঠে ফুটবলের উন্মাদনায় এখন সারা শহর সরগরম। বাঙালীদের মধ্যে ফুটবলের আকর্ষণ সর্বযুগেই দুর্নিবার! সেই আদিযুগে এই উন্মাদনা প্রথম জাগায় বাঙালীর সবচেয়ে প্রিয় দল মোহন-বাগান। ১৯১১ সালে আই. এফ. এ. শীল্ড জয় করে মোহনবাগান যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল তা অবিস্মরণীয়। বাঙালীর মনে সেই প্রথম আত্মচেতনা আত্মবিশ্বাস জেগেছিল যে খেলার মাঠে আমরা গোরা সাহেবদের চেয়ে কম নই। সেদিন সমগ্র বাঙালী সমাজ যেন গর্বে আনন্দে আত্মহারা হয়েছিল।

মোহনবাগানের সেদিনের সেই দুঃসাধ্য সাধনের পিছনে যে দুষ্কর তপস্যা আর সংঘাতময় কাহিনী ছিল তা আজকের দিনে মাত্র দু'একজন ঘরিয়ান ক্রীড়ারসিক হয়ত জানেন। সেই কাহিনীটি বলবার মত, বারবার শোনবার মত।

আজ শুনলে আশ্চর্য বোধ হবে যে সেই মহাসাধনালব্ধ সাফল্যের মূলে ছিল একটি ব্যঙ্গ-পত্র আর আত্মপ্রচার বিমুখ এক মহৎ মানুষের সর্বস্ব নিবেদনের নিষ্কৃত প্রতিশ্রুতি।

ফুটবল খেলায় মোহনবাগান শীর্ষ স্থান অধিকার করবে, শ্রেষ্ঠ গৌরব অর্জন করবে, সেই স্বপ্ন দেখেছিলেন ক্লাবের তদানিন্তন সেক্রেটারী শৈলেন বসু, ক্লাবের প্রেসিডেন্ট স্বনামখ্যাত ভূপেন্দ্রনাথ বসুর ভাইপো। সেই স্বপ্নকে সফল করবার জন্যে শৈলেনবাবু তাঁর সমস্ত সবল উদ্যম উজাড় করে দিয়েছিলেন, কয়েক বছর ধরে অকৃপণ দাক্ষিণ্যে পুত্র স্নেহে মোহনবাগানের খেলোয়াড়দের লালন করেছিলেন।

১৯০৫ সাল থেকে ধাপে ধাপে উঠতে লাগল তাঁর দল। আর সব সমশ্রেণীর দেশী দলগুলি অনেক পিছনে পড়ে রইল। ট্রেডস কাপের তখন খুব প্রাধান্য। বছরের পর বছর মোহনবাগান সেই কাপ জয় করতে লাগল। পর পর তিন বছর। চারদিকে মোহনবাগানের জয়ধ্বনি। "মোহনীয়া মোহনবাগান।"

পরশ্রীকাতরতা বাঙালীর যেন মজ্জাগত। মোহনবাগানের সেই বাড়বাড়ন্ত দেখে ঈর্ষায় জ্বলতে লাগল প্রতিবেশী ক্লাবের সভ্যরা। অসহ্য বোধ হোতে লাগল তাদের। কিন্তু উপায় নেই। মোহনবাগান তখন রীতিমতো দুর্ধর্ষ। ১৯০৭ থেকে ১৯০৯, তিন বছর ট্রেডস কাপ পাবার পর শৈলেনবাবু অন্ত যে স্বপ্নটি দেখেছিলেন সেকথা একদিন জানালেন তাঁর দলের অধিনায়ক ও সেরা খেলোয়াড় শিবদাস ভাদুড়িকে। আই. এফ. এ শীল্ডে তখন কেবল গোরা-পল্টন আর সাহেবদের দলগুলিই খেলতো। একমাত্র বাঙালীদল যাকে শিল্ডে খেলবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তার নাম শোভাবাজার ক্লাব, বাঙালী ফুটবলের প্রবর্তক। কয়েকটি বড় দলের সঙ্গে কয়েকবার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও শোভাবাজার কোনদিন কোন বড় কৃতিত্ব

অর্জন করেনি। তা না করলেও সেই আদিযুগে গড়ের মাঠে বাঙালী-ছেলেদের ফুটবল খেলায় উৎসাহিত করতে এবং নানা প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার নানাবিধ সুবিধার সৃষ্টি করতে, এই প্রথম-বাঙালী-ফুটবল ক্লাবের অবদান চিরকাল স্মরণীয় হোয়ে থাকবে।

১৯১০ সালে মোহনবাগান শীল্ডে নাম দিলে। কেল্লার গোরাদল গর্ডন হাইলান্ডার্স তখন বছরের পর বছর অন্য সব দলকে নির্মূল করে শীল্ড জয় করছে। মোহনবাগানের খেলা পড়ল তাদের সঙ্গে। মোহনবাগান তিন গোলে হারলো।

বড় ভাবপ্রবণ মানুষ ছিলেন শৈলেনবাবু। সেই হার তাঁর বুকে বিষম বাজলো। এদিকে মোহন বাগানের সেই পরাজয়ে ঈর্ষাতুর প্রতিবেশী-ক্লাবের সভ্যদের সে কী উল্লাস। শুধু উল্লাস করেই তারা ক্ষান্ত হল না। তারা পদ্য লিখলো আর সেই পদ্যে সুর দিয়ে দল বেঁধে গাইতে লাগল কাঁটা পুকুর পার্কে বসে, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে। সেই ছড়ার সবটা মনে নেই। যা মনে আছে অবিকল উদ্ধৃত করে দিলাম। অত্যন্ত গ্রাম্য ভাষায় লেখা বাগবাজারীর ছড়া :

কানু এবার বেদু দেখেছে,
শিবে বিজে প্যাণ্টে পটুকেছে।
ট্রেডস পেয়ে ঘরে ফিরে
হলেন গিয়ে শীল্ডে সিধে
এবার ঘড়ি পাওয়া হল শক্ত
গর্ডন হাগিয়ে দিয়েছে।
ঘুচেছে কারেন্সী অফিস
ছুটছে না আর শিকানবীশ।
তাই ভোলা প্যালা গিয়ে
এবার খোদা ছুটেছে।
পোড়া উলটে ভোড়া গেল
তার বদলে নীল এলো।
শুধু গবাক্ষ বাকী ছিল
ডেটেরনারী তা দিয়েছে,
আহা, কিকিন্ধ্যা কিবা মানিয়েছে।
অমরা তো রইল বসে
তুমি কেন এলে ক'সে?
প্রাণটা কি হারাবে শেষে
ও তোর একটা ঠ্যাং যে গিয়েছে।
কানু এবার বেদু দেখেছে।

এই পদ্যে কয়েকটি ইঙ্গিত আছে। আগের বছর শৈলেনবাবু খেলোয়াড়দের প্রত্যেককে ঘড়ি উপহার দিয়েছিলেন। তিনি কিছুদিন কারেন্সী আপিসে মুচ্ছুদ্দির কাজ করেছিলেন এবং সেই সময় সেই আপিসের

কয়েকজন খেলোয়াড় মোহনবাগানে খেলেছিলেন। বাকি যে নামগুলি, যথা কাত্ত, শিবে, বিভে, ভোলা, অমলা, ভোঙা, প্যালা, খোদা, নীল, এগুলি খেলোয়াড়দের ডাকনাম। শেষ ইঙ্গিতটির লক্ষ্য ছিলেন সুধীর চট্টোপাধ্যায়, তাঁর একটি পা সে সময় জখম ছিল।

সেই পক্ষ শৈলেনবাবুকে মর্মান্তিক আঘাত হেনেছিল। উত্তেজনায় তিনি প্রায় উন্মত্ত হোয়ে উঠেছিলেন। অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় কাতর হোয়ে পড়েছিলেন তিনি।

—শিবদাস! এতবড় অপমানও জীবনে সইতে হল!

—অপমান আর কি! খেলায় হার জিৎ তো আছেই স্যার!

—না, না। তোক নয়। চাই প্রতিকার, মুখের মতো জবাব। আর তার একমাত্র পথ···

শিবদাস বললেন, বুঝেছি। আসছে বছর দেখবো।

—পারবে?

চোখ বুজে শিবদাস বললেন, পারবো।

নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে সেদিন সে এক আশ্চর্য শপথ নিয়েছিলেন শিবদাস। পিতৃসম প্রভুর দলপতির হেঁটমাথা উঁচু করতেই হবে। শিবদাস যেন সেদিন নিজের জীবনকে বাজী ধরেছিলেন।

বছর ঘুরে এলো। শীল্ড খেলার সময় হল। মোহনবাগান আবার শীল্ডে নাম দিলে। কিন্তু এই এক বছরের নেপথ্য-ইতিহাস ক'জনই বা জানতে পারল? কে বা জানল, এই এক বছর ধরে খেলোয়াড়দের পিছনে শৈলেনবাবু কত অর্থ ব্যয় করলেন, এই এক বছর ধরে কী অবিচল নিষ্ঠায় এই দলের প্রত্যেকটি খেলোয়াড় আর দলপতির ধ্যান জ্ঞান মন প্রাণ অহর্নিশি একটি মাত্র লক্ষ্যের প্রতি ঊর্ধ্বায়িত হোয়ে রইল, দুঃসাধ্যকে জয় করবার দুশ্চর তপস্যায় অনুক্ষণ মগ্ন হোয়ে রইল।

এক বছর পরে মোহনবাগান যখন আবার শীল্ডের প্রতিযোগিতায় খেলতে নামলো তখন প্রত্যেক খেলোয়াড়ের বুকে দুর্জয় আত্মবিশ্বাস—মরণপণ মনোভঙ্গী। এতখানি মানসিক আর দৈহিক প্রস্তুতি নিয়ে বোধ করি কোন দল কোনদিন কোন প্রতিযোগিতায় যোগ দেয়নি।

শুরু থেকেই শক্ত শক্ত ঘাঁটি। যাই হোক প্রাথমিক বাধাগুলো সরে গেল। শেষ ধাপে পৌঁছলো মোহনবাগান। সেখানে প্রস্তুত হোয়ে অপেক্ষা করছে দুর্ধর্ষ পরাজয়ের গৌরবহীন ইস্ট ইয়র্ক, যাদের শেষ ব্যূহে আছে এমন এক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন খেলোয়াড় যে নাকি দুর্ভেদ্য।

বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীটের বাড়ীতে (শৈলেনবাবুর বাড়ী এবং খেলোয়াড়দের আড্ডা) কয়েকবার ঘরে বসা পরামর্শ চলল। বিপক্ষের লক্ষ্য আর চাপ শিবদাসের উপরেই সবচেয়ে বেশী পড়বে, তাতে আর সন্দেহ নেই। তারা বুঝে নিয়েছে, ওই একটা লোককে আটকাতে পারলেই আর চারজন ফরওয়ার্ড খোঁড়া।

শিবদাস বললেন, জায়গা বদল করা ছাড়া উপায় নেই, ইশারা করলেই যেজদা সরে আসবে ধীরে আর কানু তুমিও তৈরী থেকো।

কানু বললেন, তুমি পুব মুখো হলেই আমি হব পশ্চিম মুখো। ব্যাটাদের বুঝতে দেব না। দূর পাল্লার শট-এ ক্রেসিকে ভেদ করা যাবে না। তার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

অভিলাষ জানালেন, তিনি তাই করবেন। প্রাণ যদি যায়, সে তো একবারই যাবে। দু'বার তো আর নয়।

খেলার দিন ভোরবেলায় দল নিয়ে শৈলেনবাবু কালীঘাটে পুজো দিতে গেলেন। মন্দির চত্বরে ভীড়ে

ভীড়। আর কী আশ্চর্য, সেই ভীড়ের মধ্যে ওরাও তো রয়েছে, পদ্য লিখে গান গেয়ে যারা মোহনবাগানের চূড়ান্ত অপমান করেছে। ওরা এসেছে কেন?

হ্যাঁ, ওরা এসেছে, সেই পদ্য লিখিয়ে আর গান গাইয়ের দল। সেদিন সমস্ত জাতির সঙ্গে ওরাও ওদের মনের কলুষ মুছে ফেলে প্রার্থনা জানাতে এসেছে, জয় হোক মোহনবাগানের। আজ ওদের মনে কোন জ্বালা নেই, শেষ ধাপে পৌঁছেছে মোহনবাগান, সেই ধাপ থেকে তাকে উত্তীর্ণ করে দাও মা, আমাদের মুখ উজ্জ্বল কর, বাঙালীর মাথা উঁচু হোক! আজ আর মোহনবাগান তো শুধু একটা বিশেষ দল নয়, আজ সে সমগ্র জাতির সমগ্র দেশের প্রাণের প্রতিনিধি। তাই তার জয় কামনায় ওদের চোখ দিয়েও অন্তরের আকুতি গড়িয়ে পড়ছে। চতুর্দিকে সে এক অভূতপূর্ব আবেগের আলোড়ন।

সেদিনকার সেই ঐতিহাসিক খেলার বিবরণ অনেকেই জানেন। সেই খেলার উপর যাঁর প্রাণ যান নির্ভর করছিল, সেই দলপতি শৈলেনবাবু খেলার সময় সারাক্ষণ পাথরের মতো নির্বাক নিশ্চল হোয়ে বসেছিলেন।

খেলা শেষ হল। জনসমুদ্রের হরষে মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা ভেসে গেল, সারা মাঠে উদ্দাম নৃত্য।

একজন ছুটে এলো শৈলেনবাবুর কাছে। তাঁর চেতনা বুঝি এতক্ষণে ফিরলো। বললেন, খেলা শেষ হয়েছে বুঝি? শিবদাস! শিবদাস কোথায়?

—আজ্ঞে, তিনি তো এখন লোকের কাঁধে! সব খেলোয়াড়রাই লোকের কাঁধে চড়ে তাঁবুতে চলেছে।

সেদিন রাত্রে বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীটের বাড়ীতে অনেকেই গিয়ে খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানিয়েছিল। তাদের মধ্যে সেই পদ্য-লেখকরাও ছিল।

শিবদাস সবার আগে তাঁদেরই বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, এসেছিস তোরা, ভুলু, ভুসু, দাদু, বুকে আয়!—ভাগ্যিস পদ্য লিখেছিলি তোরা!!

সেই খেলা প্রসঙ্গে আর একটা কথা জানানো বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তখনকার দিনে রেফারি ছিলেন (একমাত্র বাঙালী রেফারি এ. সি. মুখার্জী ছাড়া) সবলেই শ্বেতাঙ্গ। এবং সেই সব শ্বেতাঙ্গ রেফারিরা যে ঘোরতর পক্ষপাতদুষ্ট ছিলেন, তার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যেতো। কিন্তু সে বছরকার ঈস্ট ফাইনালের রেফারি হেনরি গিলবার্ট পুলার ছিলেন এক মহৎ ব্যতিক্রম। গোরাদের কোন বেচাল তিনি সহ্য করেন নি, মোহনবাগানের বৈধ গোল অকসাইডের অজুহাতে নাকচ করে দেন নি, মোহনবাগানের বিরুদ্ধে অযথা পেনালটি ঘোষণা করেন নি—গোরা সমর্থক এবং সাহেবদের হাজার চীৎকার সত্ত্বেও। একথা সবলেই স্বীকার করেছিলেন যে পুলার সাহেবের মতো নিরপেক্ষ রেফারি না পেলে মোহনবাগানের ঈস্ট জেতা শক্ত হত।

———

জীবন যেমন

ভবানী মুখোপাধ্যায়

[একটি নাটকে যেমন অনেক পাত্র-পাত্রী, অনেক ঘটনা, অনেক হাসি কান্নার সমাবেশ, রাজা ও রাজ পরিবারের সঙ্গে দীন ভিখারীর ভূমিকাটুকুও যেমন অকিঞ্চিৎকর নয়, জীবনের মহানাটকেও তেমনই অজস্র পাত্র-পাত্রীর ভিড়, অনেক রকমের তাদের ভূমিকা। সৎ-অসৎ, ভদ্র-অভদ্র, সাধু ও চোর, ধনী ও নির্ধন সবাই পাশাপাশি মিশিয়ে আছে জীবন নাটকের পাতায় পাতায়। জীবনের রঙ্গমঞ্চ নিয়তই আবর্তিত। মেঘ ও রৌদ্র, আনন্দ-বেদনা, বঞ্চনা-অপচয়, আশা-নিরাশা নিয়ে জমে ওঠে জীবনের নাটক, প্রতি মুহূর্তে ঘটে কত অভাবিত ঘাও কত-নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত। "জীবন যেমন" পর্যায়ে সেই বিচিত্র জীবনের তথ্যভিত্তিক দেশী ও বিদেশী নানা কাহিনী পরিবেশিত হবে।]

॥ ফকির সাহেবের কাণ্ড ॥

। এক ।

এক ডাকে সবাই ওকে পাগলা সাহেব বলেই চিনত। আর কোনও পরিচয় নেই, নাম টাম সব মুছে গেছে। লোকটি খাঁটি ইংলিশম্যান। সমুদ্র পার থেকে ঠিক কবে এসেছিল বলতে পারে না, তবে সে নাকি খানি-দানি বংশের ছেলে একথা সবাই বলত।

এদেশে তখন ইংরাজ রাজত্ব চলছে পুরোদমে। কলকাতা শহর সাহেব বিবিদের দাপটে সরগরম। সেই সেকালেই এই রূপান্তর ঘটে। সাহেবরা খুবই বিব্রত বোধ করতেন এই মানুষটিকে নিয়ে। য়ুরোপীয়ান এ্যাসোসিয়েশন একবার জোর জবরদস্ত করে জাহাজে উঠিয়ে বিলাতে পাঠাবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু পাগল সাহেব সকলের চোখে ধুলো দিয়ে জাহাজ ছাড়বার আগেই নেমে পড়েছিল। ভারতবর্ষের মাটির ওপর তার নাকি ভারী টান।

একদিন কিন্তু ওর সুদিন ছিল। সেকালে বড়দিনের সময় এক আধটা বিলাতী থিয়েটার বা সার্কাস কলকাতায় আসত, কয়েক মাস এখানে ওখানে শো দেখিয়ে আবার চলে যেত বিলাতে। "সিকিভিলি প্লেয়ার্স" এমনই একটি নাট্য সম্প্রদায়। এডওয়ার্ড স্যাংকস সেই দলের অন্যতম অভিনেতা হয়ে এদেশে এসেছিল। হাস্য-কৌতুকে সে অদ্বিতীয়, গানও গাইতে পারত চমৎকার। এছাড়া প্রয়োজনানুসারে নিখুঁত ভাবে যে কোনো চরিত্রের নকল করতে পারত। কলকাতায় আসার কিছুদিন পরেই সে বহুরূপীর মত কখনও সাপুড়ে কখনও সন্ন্যাসী ফকির ইত্যাদি সেজে নাম কিনেছে। স্যাংকসের অভিনয় দেখে সবাই হেসে গড়িয়ে পড়ত।

স্যাংকসের প্রধান দোষ ছিল অতিরিক্ত মদ্যপান। কিন্তু যত অবস্থাতেও তার অভিনয়ে ত্রুটী থাকত না। কর্তৃপক্ষ অপছন্দ করলেও তার জনপ্রিয়তার খাতিরে সব সইতে হত।

শেষে একদিন অভিনয়ের সময় বিশ্রী একটা কাণ্ড ঘটে গেল। স্যাংকস অভিনয়ের ঠিক একটু আগে কোথা থেকে প্রচুর মদ্যপান করে ড্রপ ওঠার একটু আগেই এসে হাজির হল গ্রীনরুমে। এত দেরী হয়ে গিছল যে তাকে তাড়াতাড়ি মেকআপ দিয়ে স্টেজে পাঠানো হল। স্টেজের স্যাংকস সেদিনে অন্য ব্যক্তি। তার মেকআপ ছিল ভারতীয় ফকীরের। অনেক রকম ছিট জুড়ে দিয়ে একটি আলখাল্লা তার গায়ে চড়িয়ে দিয়ে নকল দাড়ি পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

দু একটি কথা উচ্চারণ করেই স্যাংকস তার পোষাকগুলি একে একে খুলতে সুরু করল। ডিসেম্বরের কনকনে শীত, সবাই প্রথমটায় ভেবেছিল এটা বুঝি অভিনয়ের অঙ্গ, কিন্তু কণ মাত্র অন্তর্বাসটুকু কটিবাসের মত গায়ে লেগে রইল তখন সবাই অবাক। ব্যাপারটি যে অন্য রকম তা কর্তৃপক্ষও বুঝলেন।

সেদিন স্টেজ থেকে স্যাংকসকে টেনে নামাতে অনেক সময় লেগেছিল। কিছুতেই নামানো যায় না, সে বিড় বিড় করে কি একটা যেন বলছিল আর একটা ছোট দণ্ড নিয়ে সকলের মাথার চারপাশে ঘোরাচ্ছিল। কেউ নামাতে পারেনা ওদের, শেষে দর্শকের মধ্যে কয়েকজন সৌখা সৌলআর ছিল তাদের মধ্যে চারজন ওকে কোলে করে তুলে নামিয়ে নিয়ে আসে।

স্যাংকসের ধারণা হয়েছিল সে একজন ফকীর—এবং ফকীরের মতই শক্তিমান হয়ে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত সে অচৈতন্য হয়ে পড়ে।

এরপর স্যাংকসের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে। থিয়েটরের কর্তারা ওকে তাড়িয়ে দিলেন। থিয়েটরের ত্রি-সীমানায় যাওয়া নিষিদ্ধ হল। এরপর স্যাংকসকে দেখা যেত রেসকোর্সের ধারে, একটা বিরাট বটগাছের নীচে ভারতীয় ফকীরের বেশ ধরে বসে থাকত। চারপাশে দু'চারজন ভক্তও জুটে যেত। ঘোড়ার খবর জানবার জন্য লোক জড়ো হত। ক্রমশঃ স্যাংকসের পসার বাড়তে লাগল, কিন্তু সাইকেল চুরীর দায়ে তার তিন মাসের জেল হয়ে গেল।

জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর একজন অফি ওকে বাঙ্গালোর নিয়ে গেল—সম্ভবতঃ বাঙ্গালোর তেমন সইলোনা, তাই স্যাংকস একদিন বোম্বাই চলে এল। কিন্তু বোম্বাই শহরও তাকে আশ্রয় দিল না। একজন পারসী হোটেলওলাকে ঠেঙিয়ে স্যাংকস পালালো। লোকটি নাকি পরে হাসপাতালে মারা যায়। পুলিশ স্যাংকসকে খুঁজতে লাগল, কিন্তু স্যাংকসকে ধরা গেল না। পুলিশের হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করে কেউ এগিয়ে এল না স্যাংকসের সন্ধান নিয়ে। স্যাংকস অনায়াসে হারিয়ে গেল।

॥ দুই ॥

স্যাংকস ফকীর হয়ে গেল। হয়ত থিয়েটরে এই ভূমিকায় অভিনয় করার ফলে ফকীরের বেশটাই তার ভালো লেগেছিল, নয়ত এদেশের মানুষকে তার সত্যই ভালো লেগেছিল। হিন্দি আর উর্দু সে বেশ ভালো বলতে পারত, সেটা কাজে লাগল। বড় বড় চোখ, বাদামী চুলের রাশ মাথায় কাকের বাসার মত উড়ছে আর অজস্র দাড়ি গোঁফের জঙ্গলে মুখটি ঢেকে গেছে। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা।

অল্প কথা বলত ভাংকল, কিন্তু যেটুকু বলত তাতেই লোকজন খুশী হত। ফকীরের সেবা করার জন্ত ভক্তজনের অভাব ছিল না। পাঠানকোটের রেল স্টেশনের পাশে ফকীর সাহেবের আস্তানা। মদ্যপানের অভ্যাস অবশ্য ছাড়তে পারেননি ফকীর সাহেব, কিন্তু মদ্যপান করলেই ফকীরের মুখ থেকে ভালো ভালো কথা বেরিয়ে আসত।

ফকীর যাঁরা তাঁদের মধ্যে একটু পাগলামির ভাব থাকে। ফকীর সাহেব উন্মত্তের মত বৃত্তা করতেন, এটা তাঁর বৈশিষ্ট্য। ক্রমশঃই গোরা ফকীরের ভক্তেরা অনেক দূর থেকে আসত নানা রকম প্রার্থনা নিয়ে। সারা অঙ্গে একটি হলুদ রঙের কটি বাস ছাড়া আর কিছুই থাকত না, শীতকালে তার ওপর একটি কম্বল। গায়ে ছাই মাখতেন হিন্দু সন্ন্যাসীদের মতো। যাঁরা ভাংকলকে আগে দেখেছেন তাঁদের পক্ষেও ফকীরকে দেখে এই যে সেই সে কথা বলা সম্ভব হলনা।

পরিব্রাজকের মত গোরা ফকীর এখানে ওখানে বেড়িয়ে বেড়াতেন। পথে প্রান্তরের ছোটখাটো মন্দির মসজিদের ধারে গোরা ফকীর মাঝে মাঝে আস্তানা করতেন। ধুনী জালিয়ে আর সবাই যেমন শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধির জন্ত ছোট মাটির কলকে হাতে নিয়ে গাঁজা সেবন করতেন গোরা ফকীরও ঠিক সেইভাবেই গাঁজার কলকে নিয়ে বসতেন। ভুলেও একটা ইংরাজী কথা বলতেন না। ফকীর সাহেব মাছ মাংস খেতেন না, দুধ আর আটার রুটিই ছিল তাঁর মূল খাদ্য।

ক্রমশঃ গোরা ফকীর মদ্যপান করা ছেড়ে দিল। তার আকৃতি যোগীর মত। শ্বেত শুভ্র দেহ, বাদামী চুল ও দাড়ি, ভাঁটার মত জ্বলন্ত চোখ এবং পরিমিত আহার গ্রহণ করার ফলে তার চেহারা দেখলে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসত।

ভারতবর্ষের মাটিতে সন্ন্যাসী ফকীরের এক বিশিষ্ট মর্যাদার আসন আছে, সেই জগতে এমন একজন দীর্ঘাকৃতি যোগী পুরুষের আবির্ভাব একটি বিশেষ চাঞ্চল্যকর ঘটনা বলা যায়। ওষুধপত্র কাউকে না দিলেও গোরা ফকীর অনুগ্রহ করে কারো দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ বিড় বিড় করে গেলেই তার উপকার হত। ফলে গোরা ফকীরের খ্যাতি চার দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

ফকীর সাহেবের পরিক্রমার যথাযথ বিবরণ কোথাও লেখা নেই। গোয়েন্দা পুলিশের রিপোর্টে যেসব কথা পাওয়া গেছে তাতে জানা যায় যে বিজাপুরে যখন হাজা হয় তখন ফকীর সাহেব সেখানে ছিলেন।

তখন রামলীলার সময়। রাম সীতার কথা নিয়ে রচিত লোক সঙ্গীত আর নাটক নিয়ে দেহাতী মানুষ দিনের পর দিন অনেকে মেতে থাকে। এই সময় মেলা বসে, নাচ গান, হল্লায় সবাই যোগ দিয়ে আনন্দ করে। বিজাপুরে রামলীলার সময় সে বছর ভারী জাঁক জমক, লাল-নীল শাড়ি পরা পল্লী বালিকারা সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে চারদিকে পাতলা পতাকা উড়ছে, তার রঙ কোথাও কাল, কোথাও গৈরিক কোথাও বা একেবারে সাদা। চারদিক বেশ সরগরম। সরু গলি পথে সারাদিন ধরেই ভীড়। বহু বিচিত্র নর-নারী যাওয়া আসা করে। কাপড়ের দোকান অনেকগুলি, এই সময় সবাই সারা বছরের প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড় রঙীন ছিট এই সব কিনে নেয়। সস্তাদরের হরেক রকম ছিট কাপড় এই সময় পাওয়া যায়। ছোটদের উপযুক্ত টিনের খেলনাও পাওয়া যায়, তখনো প্লাসটিকের এত চল হয়নি, তাই টিনের জাহাজ, রেল ইঞ্জিন, হাওয়া গাড়ি ইত্যাদি খেলনার চাহিদা ছিল খুব। আর পাওয়া যেত নানা ধরণের মাটির পুতুল।

পিতলের কলসী হাড়িরও চাহিদা ছিল, তাই কাঁসা, পিতলের দোকান ছিল অনেকগুলি। সূর্যালোকে সেইসব দোকান জল জল করত।

ফকীর সাহেব পথের ধারে একপাশে বসে সব দেখ্‌ছেন, তাঁর সঙ্গে আরো দুজন বসে আছেন, সম্ভবতঃ তারা হিন্দু সাধু, কারণ তাদের দুজনেরই মাথা কামানো। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। হাতের কমণ্ডলু আর চিমটা মাটিতে রাখা রয়েছে।

ফকীর সাহেব শুনছিলেন বড় বাজারের দিকে সন্ধ্যাবেলা একটা বড়ো সভা হওয়ার কথা ছিল। সারা দেশে সেই সময় স্বাধীনতা আন্দোলনের সংঘর্ষ সুরু হয়েছে। সভাটা এমনই কোনো স্বদেশী সভা। লালা লাজপত রায় পাঞ্জাবের সর্বজনমান্য নেতা, এই সভায় তাঁর হাজির থাকার কথা।

বড়বাজারের ওপর দিয়ে কোনো রকম মিছিল আর বড়বাজার ময়দানে সভা সমাবেশ করা নিষিদ্ধ করে ডেপুটি কমিশনার উইলমট সাহেব ১৪৪ ধারা জারি করলেন। এর ফলে একটা চাপা বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল। গাঁয়ের লোক শিক্ষিত নয়, কিন্তু তারা স্বাধীনতা আন্দোলনের সংবাদ শুনেছে। দেশমান্য নেতাদের তারা সেইকালে দেবতার মত শ্রদ্ধা করত। তাই পুলিশি জুলুমের বিরুদ্ধে সবাই ক্ষেপে উঠল। ফকীর সাহেব চুপ করে সব শুনলেন। কিছু বললেন না।

সেই বছর বিজাপুরের রামলীলার মেলায় যে পরিমাণ লোক সমাবেশ হয়েছিল তেমনটি আর আগে হয়নি। বিজাপুর ময়দানে অজস্র মানুষের ভীড়। ময়দানের এক পাশে নাগর দোলায় উঠে গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা দোল খাচ্ছে, যাদুকররা বাজনা বাজাচ্ছে. বাজনা শুনে তাদের ছাউনির সামনে লোক জড়ো হচ্ছে। খাকপুর থেকে সাপুড়েরা এসে খেলা দেখাচ্ছে, তাদের বাঁশী শুনে অনেকে সেদিকে ছুটছে। একজন ভক্ত হায়দ্রাবাদ থেকে হেঁটে এতদূরে এসেছে গাঁয়ের হনুমানজীর মন্দিরে পুজো দেবে। তার যোগ লেগেছে তাই মানত পূরণ করার জন্য সে এইভাবে এসেছে। বারানসী থেকে মুখোসধারী নাচের দল এসেছে, সেখানেও ভীড় কম নয়। আর এই যত কিছুর মাঝে বসে আছেন গোরা ফকীর। গোরা ফকীরকে কেউ কখনও হাসতে দেখেনা। চুপচাপ থাকে কদাচিৎ উর্দু বা হিন্দিতে দু একটা কথা বলে হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে।

এতসবের মধ্যে কিন্তু প্রধানতম আকর্ষণ লালা লাজপত রায়।

পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায় বেঁটে খাটো মানুষ, তেমন সুপুরুষ বলা যায়না, কিন্তু কি অসীম তাঁর জনপ্রিয়তা। বীর কেশরী লালা লাজপত রায় পুলিশের হুকুম উপেক্ষা করে মঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন তারপর কোনোরকম ভূমিকা না করেই ইংরাজ শাসকের অত্যাচার এবং অবিচারের কথা বলতে সুরু করলেন। জনতা সব ছেড়ে এদিকেই এগিয়ে এল, পুলিশের কথা কারো খেয়াল নেই।

এতক্ষন যে কল কোলাহলে মেলা প্রাঙ্গণ মুখরিত ছিল সেই মেলা প্রাঙ্গণ এখন একেবারে স্তব্ধ। তখনকার দিনে মাইক ছিলনা, লালা লাজপত রায়ের কণ্ঠস্বর ছিল সরু এবং তীক্ষ্ণ। সেই স্তব্ধ জনতার মধ্যে যেন একটা চাঞ্চল্য জেগেছে। লালাজী বলছেন, জনতা মুগ্ধ হয়ে শুনছে, যেন সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে তাঁর কথাগুলি গিলছে।

একপাশে দাঁড়িয়ে গোরা ফকীরও শুনছে লালাজীর বক্তৃতা। যে যার জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে আছে, কেউ নড়ছেনা। এমন সময় এল পুলিশ বাহিনী ঘোড়া ছুটিয়ে। তাদের নাকি লাঠি আর লালটুপি সেই ভীড়ের মধ্যে ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠল। জনতা এতক্ষণে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। লালাজী তখন ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচারের কথা উদাত্ত কণ্ঠে জনগনকে শোনাচ্ছেন। তাঁর বাণী সকলের মর্মদেশে পৌঁছেছে।

হঠাৎ কোথা থেকে কি হয়ে গেল, পুলিশদের উঠে লালাজিকে লাঠির আঘাতে ফেলে দিল, কৃশদেহ লালাজি পড়ে আছেন আর ব্রিটিশ পুলিশ সুপার তার ওপর লাঠি চালাচ্ছে।

জনতা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। ইংরাজ কুত্তাদের এই অত্যাচারের বদলা নেবে তারা চারদিকে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হল। হুড়োমুড়িতে অনেক আঘাত লেগে, অনেক পুলিশের লাঠির ঘায়ে আর গুলির আঘাতে মারেন হল।

সেই সময় বিজাপুরে সেনাবাহিনী ছিলনা, শুধু পুলিশ ছিল। সাহেবদের একটা ক্লাব ছিল। সেখানে তারা মদ খেত, টেনিস খেলত, কালা আদমীরা সেই পথে যেতে পারত না। মেমসাহেবরা নানা ভঙ্গীতে ঘুরে বেড়ায় তাই এই নিষেধাজ্ঞা নিয়েছিলেন ডেপুটি কমিশনার।

আজ কিন্তু আর কোনো বাধা নেই, সবাই ছুটল সেই ক্লাব বাড়ির দিকে।

ফকীর সাহেব অবস্থাটা বুঝলেন। সরকার সম্পর্কে তাঁর কোনো উৎসাহ নেই, কিন্তু নিরস্ত্র লালাজীর ওপর এই অত্যাচার তিনি স্বচক্ষে দেখলেন। সবাই ছুটে চলেছে ক্লাববাড়ির দিকে, তার বাঁপাশে কলেকটারের কোর্ট, ট্রেজারি আর ডান দিকে বাজার এবং নদী। ফকীর সাহেব দেখলেন তাঁটিখানা লুট। ফকীর সাহেব হাঁটু মুড়ে বসে হাত জোড়করে অনেকটা মদ পান করলেন। দীর্ঘদিন এই তরল গরল তিনি স্পর্শ করেননি। আজ আর কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। সুরাপানে তাঁর শক্তি যেন দ্বিগুণ বেড়ে গেল।

এই হাজার হাজার মানুষকে ফকীর সাহেবই নিয়ে চলেছেন। ক্লাব বাড়ি লুঠ করতে কি অস্ত্র কোথা মজুদ আছে কে জানে। উন্মত্তের ভঙ্গীতে তিনি পাশের লোকটির হাত থেকে তরবারিটা টেনে নিলেন। তারপর সেই অসংখ্য মানুষের সামনে ফকীর সাহেব সেই পুলিশ সুপারের মাথাটা একটি আঘাতে কেটে ফেললেন। পুলিশ সুপার ঘোড়া ছুটিয়ে এদিকেই আসছিল জনতা দমতে।

জনতা স্তব্ধ। কিন্তু ফকীর সাহেবের জ্ঞান নেই; তিনি আরএকজন দেহাতী মানুষের হাত থেকে লাঠিটা কেড়ে নিয়ে সেই কাটা মুণ্ডুটা তার ওপর বসিয়ে শোভাযাত্রা করে এগিয়ে চললেন।

এই অবস্থা অভাবিত। জনতা ফকীর সাহেবের মতো উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। তারা সেই রাত্রে বিজাপুরের সমস্ত ইংরাজ পরিবারকে হয়ত শেষ করে ফেলত, কিন্তু তা হয়নি।

ফকীর সাহেব যখন ট্রেজারি আফিসের সামনে এসে পৌঁচেছেন তখন ডেপুটি কমিশনার ওয়াটকিনস আগে থেকেই তার প্রতীক্ষায় ছিলেন, তিনি ফকীর সাহেবের বুক লক্ষ্য করে পিস্তল ছুড়লেন, সেই লক্ষ্য অব্যর্থ। ফকির সাহেবের অচৈতন্য দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

সহসা এই কাণ্ড ঘটে যেতে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। ততক্ষণে আরো পুলিশ বাহিনী এসে পড়ে এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়তে সুরু করেছে। শুধু ফকীর সাহেব নয় আরো অনেক গাঁয়ের লোক সেই সন্ধ্যায় ভারতবর্ষের জন্য প্রাণ দিয়ে দিল, কিন্তু ইতিহাস তাদের কথা জানেনা।

ফকীর সাহেবের হাতে নাকি উল্কীতে লেখা ছিল ই, এস। গোয়েন্দা পুলিসের মতে এই সেই এডওয়ার্ড ফ্রাংকস্, কিন্তু বিজাপুরের কবরের মাজারে লেখা আছে ফকীর ইরফান সেখ সাহেবের সমাধি।

আজো সন্ধ্যায় পর সেই অনাড়ম্বর সমাধিতে প্রদীপ জ্বলে। গ্রামবাসীরা এসে গোরা ফকীরের গল্প শোনায়। ভারতের মাটি ফকীর সাহেবের কাছে ছিল স্বর্গেরও।

পর্বতারোহণে বাঙ্গালীর অবদান

শম্ভু মহারাজ

ইংরেজরা বলেন, তাঁরা ইটনের খেলার মাঠে ট্রাফালগারের যুদ্ধ জিতেছেন। কথাটা সেকালের মত একালেও মিথ্যে নয়। আজও পৃথিবীর কোন দেশ কতখানি উন্নত, তার পরিচয় আমরা পাই অলিম্পিক ক্রীড়াঙ্গনে। পৃথিবীর প্রত্যেক উন্নতিকামী দেশ অন্যান্য উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের খেলা-ধূলার মানেরও উন্নতি করে চলেছেন। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ বোধকরি জাপান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে জাপানে যে বিরাট বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে, তার সঙ্গে সমতা রেখেই তাঁরা খেলা-ধূলার ক্ষেত্রেও সাফল্য অর্জন করেছেন। আর ভারতের ক্ষেত্রে বিপরীত অবস্থাটাই প্রকট হয়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক অবনতির সঙ্গে সঙ্গে আজ আমাদের দেশের খেলাধূলাও অবনত। সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা এবং রাজনৈতিক দলাদলি আমাদের ক্রীড়াজগৎকেও আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। আর তারই ফলে বিগত বিশ্ব অলিম্পিকে ভারত একটিও স্বর্ণপদক লাভ করতে পারে নি। যুবশক্তির কি বিরাট অপচয়—ভাবতেও দুঃখ হয়।

এই অন্ধকারের মাঝে আমাদের একমাত্র আলোকশিখা পর্বতারোহণ। মাউন্টেনিয়ারিং বা পর্বতারোহণ আজ বিশ্বে একটি শ্রেষ্ঠ খেলা বা স্পোর্টস রূপে সমাদৃত। গৌরবের কথা অন্যান্য খেলার ক্ষেত্রে ভারত যখন ক্রমেই পেছিয়ে পড়ছে, তখনই পর্বতারোহণে আমরা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করে চলেছি। আর পশ্চিমবঙ্গও সেই সুদুর্লভ সাফল্যের সুযোগ্য অংশীদার।

হিমালয় ভারতের। কাজেই বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে পর্বতের সম্পর্ক সুপ্রাচীন। সুদূর অতীত থেকে, বহু বাঙালী হিমালয়কে তাঁদের বাসভূমি কর্মভূমি ও সাধনভূমি নির্বাচিত করেছেন। এঁদের মধ্যে প্রথম বলতে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের কথা। তন্ত্রশাস্ত্র বিশারদ এই বাঙালী পরিব্রাজক ১০৪২ সালে দুর্গম হিমালয় অতিক্রম করে তিব্বতে গিয়েছিলেন।

তারপরে বলতে হয় তিব্বতীবাবার (সিলেটের নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী) কথা। তিনি কয়েক বছর চীন ও জাপানে, ৩০ বছর ব্রহ্মদেশ এবং ৩২ বছর তিব্বতে অতিবাহিত করেছিলেন। নবীনচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি জন্মগ্রহণ করে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে দেহরক্ষা করেন। ১৯০২ সালে ব্যারাঘরীয় ও ভারতীয় সার্কাসের জনক ভাস্কাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে যখন তিনি দীক্ষা দেন, তখন তাঁর বয়স প্রায় ১৬০ বছর। দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁর কোন শিষ্য বা ভক্ত তিব্বতীবাবার সুদীর্ঘ তিব্বতবাসের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী সঙ্কলিত করেন নি। কাজেই যে কাহিনী 'সোয়েন হেডিন-'য়ের 'ট্রান্স হিমালয়া-র মত জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারত, তা আমাদের অজানাই রয়ে গেল।

সেযুগে যারা হিমালয়ে গিয়েছেন, তাঁরা অনেকেই আর ঘরে ফিরে আসেন নি। যারা ফিরে

এসেছেন, তাঁরাও তিব্বতীবাবার মত সেই অজানা জগতের রহস্য ও সৌন্দর্যের কথা সবার কাছে বলেন নি। ফলে সাধারণ বাঙ্গালীর মনে হিমালয়ের প্রতি কোন ভালোবাসার সঞ্চার হয় নি। আর তাই হিমালয়ের সঙ্গে বাংলার দূরত্ব ঘোচেনি।

হিমালয়ের প্রতি আমাদের আকর্ষণ সঞ্চারিত হয়েছে পরবর্তী যুগে। এবং এই আকর্ষণের মূলে রয়েছে বিদেশী অভিযাত্রী ও লেখকদের অবদান। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বাংলাদেশের মাটিতেই প্রথম হিমালয় অভিযান আয়োজিত হয়েছে।

১৮৮৩ সালে ডাবলু. ডাবলু. গ্রাহাম নামে একজন ইংরেজ পর্বতারোহী দুজন সুইস পথ প্রদর্শক নিয়ে দার্জিলিং এলেন। তিনি সিকিম-হিমালয়ের কয়েকটি শিখর জয় করলেন। হিমালয়ে পর্বতাভিযানের সূচনা হল।

আরও গৌরবের কথা প্রায় একশ' বছর আগেই বাঙ্গালী লেখকদের দৃষ্টি পড়েছে হিমালয়ের দিকে। অন্নদার রাজেন্দ্রমোহন বসু ১৮৬৯ সালে কাশ্মীর গিয়েছিলেন। ১৮৭৫ সালে তাঁর রচিত 'কাশ্মীর কুসুম' প্রকাশিত হয়। এটি সম্ভবতঃ ভারতীয় ভাষায় রচিত প্রথম হিমালয় ভ্রমণকাহিনী। তারপরেই রায়বাহাদুর জলধর সেনের 'হিমালয়' প্রকাশিত হয় ১৯০০ সালে। তিনি ১৮৯০ সালে যমুনোত্রী দর্শনে গিয়েছিলেন।

এই সঙ্গে আরও দুজন বাঙ্গালীর নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। তাঁরা হলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় রাধানাথ শিকদার ও শরৎচন্দ্র দাস। রাধানাথ বিশ্বের উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ 'এভারেস্ট'-এর (২৯,০২৮') আবিষ্কারক। তিনি ১৮৭০ সালে দেহত্যাগ করেন। আর শরৎচন্দ্র ভারতের প্রথম পর্বতাভিযাত্রী। তিনি ২০,২০০ ফুট উঁচু জংসং লা (গিরিবর্ত্ম) অতিক্রম করে তিব্বতে যান। তাঁর রচিত 'Tibetan English Dictionary' আজও বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ! ১৯১৭ সালে তিনি পরলোকে গমন করেন।

ভারতীয় পর্বতারোহণের ইতিহাসে রাধানাথ শিকদার ও শরৎচন্দ্র দাসের অবদান অসামান্য। তবু স্বীকার না করে উপায় নেই যে তাঁদের সুমহান কীর্তি বাঙ্গালীকে হিমালয় অভিযানে উৎসাহিত করে তুলতে পারে নি। কারণ তাঁরাও বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কাছে হিমালয়ের কথা বলে যান নি।

না, বলা সেই কথা বাঙ্গালীর কাছে প্রথম বললেন শ্রদ্ধেয় সুসাহিত্যিক শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল। তাঁর রচিত 'মহাপ্রস্থানের পথে' প্রথম হিমালয়কে বাঙালীর মানসলোকের দ্বারে নিয়ে আসে। কিন্তু তারপরেও বহুকাল বাঙ্গালী তীর্থপথের বাইরে হিমালয়ের কথা ভাবতে পারে নি। এমন কি প্রবোধকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'হিমালয় পারে কৈলাস ও মানস-সরোবর', উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'গঙ্গাবতরণ', প্রবোধকুমার সান্যালের 'দেবাত্মা হিমালয়' এবং আমার 'বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা' প্রকাশিত হবার পরেও। কারণ এই সব গ্রন্থে আমরা কেবল হিমালয়ের তীর্থপথ এবং হিমালয়ের সৌন্দর্যের কথাই বলেছি। পর্বতারোহণের কথা তখনও আমাদের চিন্তায় আসে নি।

প্রথম ভারতীয় পর্বতাভিযান আয়োজিত হয় ১৯৫১ সালে শ্রীগুরদয়াল সিং-এর উদ্যোগে (ত্রিশুল-২৩, ৩৬৮০')। তবে পর্বতারোহণের প্রতি ভারতবাসীর সত্যিকার আগ্রহের উন্মেষ হয় ১৯৫৩ সালে শ্রীতেনজিং নোরগে এবং স্যার এডমাণ্ড হিলারীর এভারেস্ট আরোহণের পর থেকে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে শ্রীতেনজিং বাংলাদেশের মানুষ। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের ঐকান্তিক আগ্রহে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ১৯৫৪ সালে দার্জিলিংয়ে 'হিমালয়ান মাউণ্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের' উদ্বোধন করলেন। সেদিনই ভারতীয় পর্বতাভিযান যুগের প্রকৃত সূচনা হল। আর তাও আরম্ভ হল এই বাংলাদেশের মাটি থেকেই। আজও এই

প্রতিষ্ঠান এশিয়ার বৃহত্তম পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্র। ভারতের শ্রেষ্ঠ পর্বতারোহীরা প্রায় প্রত্যেকেই এখান থেকে পর্বতারোহণ শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।

তারপর থেকেই ভারতে পর্বতাভিযান আয়োজিত হতে থাকল। ১৯৫৫ সালে দার্জিলিং পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ মেজর নান্দু জয়ালের নেতৃত্বে ভারতীয় পর্বতারোহীরা কামেট (২৫, ৪৪৭´) ও আবিগামিন (২৩, ১০০´) শিখরে আরোহণ করলেন। ১৯৫৭ সালে চো-উ (২৬, ৭৫০´) অভিযানের জন্য ভারত সরকার একটি স্পনসরিং কমিটি গঠন করলেন। এই কমিটিই পরে ইণ্ডিয়ান মাউণ্টেনিয়ারিং ফাউণ্ডেশানে পরিণত হয়েছে। দীর্ঘকাল যাবৎ শ্রীযোহিণীকুমার চক্রবর্তী এই কমিটির সম্পাদকরূপে ভারতীয় পর্বাভোরহণ পরিচালনা করছেন।

১৯৫৮ সালে ভারতীয় অভিযাত্রীরা চো-উ, ত্রিশুল ও নন্দাখুনি (২২, ৪৩০´) শৃঙ্গে আরোহণ করলেন। কিন্তু চো-উ অভিযানে আমাদের হারাতে হল ভারতীয় পর্বতারোহণের জনক মেজর জয়ালকে।

১৯৫৯ সালে ভারতীয় অভিযাত্রীরা নন্দাকোট (২২, ৫১০´) ও বন্দরপুঁছ (২০, ৭২০´) শৃঙ্গে আরোহণ করেন এবং ১৯৬০ সালে প্রথম ভারতীয় এভারেস্ট অভিযান পরিচালনা করেন।

এই সুবিপুল সাফল্য অর্জনের পরেও কিন্তু না বলে উপায় নেই যে তেনজিং নোরগের এভারেস্ট আরোহণের পরে ভারতীয় যুবমানসে পর্বতারোহণের প্রতি যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়, কর্তৃপক্ষ তাকে প্রতিরক্ষা দপ্তরের সীমিত গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ করে রাখেন। এই বন্দীদশা থেকে ভারতীয় পর্বতারোহণকে মুক্ত করেছে বাংলাদেশ।

প্রবের উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং প্রবোধকুমার সান্যালের উদ্যোগে ১৯৬০ সালে কলকাতায় হিমালয়ান এসোসিয়েশান তথা ভারতের প্রথম বেসরকারী পর্বতারোহণ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হল। এঁরাই শ্রীসুকুমার রায়ের নেতৃত্বে নন্দাঘুন্টি অভিযানের আয়োজন করলেন। সেই সফলকাম প্রথম ভারতীয় বেসরকারী পর্বতাভিযান ভারতের জাগ্রত যৌবনের স্বপ্নকে সফল করে তুলল। এই অভিযানের কথা ও কাহিনী নিয়ে রচিত শ্রীগৌরকিশোর ঘোষের 'নন্দকান্ত নন্দাঘুন্টি' পর্বতাভিযানের ওপর রচিত প্রথম ভারতীয় গ্রন্থ।

পরের বছরও বাঙালী পর্বতারোহীরা আর একটি পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করলেন। খনামধন্য সুলেখক শ্রীশৈলেন চৌধুরীর পুত্র শ্রীপৃথ্বী চৌধুরী একক প্রচেষ্টায় কুমায়ুনের নন্দাখাত (২১, ৬৯০´) অভিযানের আয়োজন করে শিখরে আরোহণ করেন।

বাংলাদেশের তৃতীয় সফলকাম পর্বতাভিযান আয়োজিত হয় ১৯৬২ সালে, বিখ্যাত পর্বতারোহী শ্রীঅমূল্য সেনের নেতৃত্বে। সেই সফলকাম নীলগিরি পর্বতাভিযানের (২১, ২৬৫´) কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে আমার 'নীল-দুর্গম'। গ্রন্থের অপর দুই নায়ক সর্বশ্রী নিরাপদ মল্লিক ও প্রাণেশ চক্রবর্তী ১৯৬৩ সালে ভারতের বে-সরকারী পর্বতারোহণের দুর্গমতম শৃঙ্গ তীরসুলী (২৩, ২১০´) ও উচ্চতম শৃঙ্গ মানা (২৩, ৮৬০´) শিখরে আরোহণ করেছে।

নন্দাঘুন্টি অভিযানের পর থেকে একমাত্র ১৯৬৩ সাল ছাড়া এ পর্যন্ত প্রতিবছর বাংলা দেশ থেকে বেসরকারী পর্বতাভিযান আয়োজিত হয়ে আসছে। বিগত দশ বছরে আমরা একুশটি পর্বতাভিযান পরিচালনা করেছি এবং তার অধিকাংশই সফলকাম হয়েছে। এই গৌরব অর্জনের জন্য হিমালয়ের পথে আমাদের তিনটি মহৎপ্রাণ ভাসি দিতে হয়েছে—অনিমা সেনগুপ্তা, গৌরাঙ্গ চৌধুরী ও অমর রায়। অনিমাদি হিমালয় অভিযানের প্রথম মহিলা শহীদ।

এখন ভারতের বাহাত্তরটি বেসরকারী পর্বতারোহণ সংস্থার বিশটি বাংলাদেশে। এদের অধিকাংশ সংস্থাকে নিয়ে ১৯৬৮ সালে কলকাতায় 'হিমালয়ান ফেডারেশান' নামে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এঁরা পশ্চিমবঙ্গে ইণ্ডিয়ান মাউণ্টেনিয়ারিং ফাউণ্ডেশানের প্রতিনিধিত্ব করছেন। শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল ও দাশরথি সরকার এই সংস্থার সভাপতি ও সম্পাদক। ফেডারেশান 'হিমবন্ত' নামে পর্বতারোহণের ওপরে একটি ইংরেজী মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করছেন। এ ধরণের পত্রিকা ভারতে এই প্রথম।

এই সুবিধাটি সাফল্য সত্ত্বেও কিন্তু আমরা আমাদের লক্ষ্যপথে খুব বেশিদূর অগ্রসর হয়েছি, একথা বলা যায় না। কারণ হিমালয়ের দুর্গম শিখরে জাতীয়-পতাকা প্রোথিত করলেই পর্বতারোহণের মূল-লক্ষ্যে পৌঁছান যায় না। শিখরারোহণকে কেন্দ্র করে পর্বতাভিযান আয়োজিত হলেও আরোহণই পর্বতাভিযানের একমাত্র কাম্যবস্তু নয়। আনন্দের কথা বাঙ্গালী পর্বতাভিযাত্রীরাই প্রথম এই সত্য উপলব্ধি করেছেন। কলকাতার 'গঙ্গোত্রী গ্লেশিয়ার এক্সপ্লোরেশান কমিটি' তাঁদের কেদারনাথ পর্বত (১৯৬৭) ও সতপন্থ (১৯৬৮) অভিযানের সময় উচ্চহিমালয়ের উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা করেছেন। দুঃখের কথা অন্যান্য অভিযাত্রীরা তাঁদের পথ অনুসরণ করছেন না।

পর্বতাভিযাত্রীদের অভিযানকালে হিমালয়বাসীদের সেবা এবং উচ্চহিমাঞ্চলের বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা ও গবেষণা করতে হবে। অভিযানের পরে সেই সব আরোহণ গবেষণা ও হিমালয়বাসীদের কথা ছবি এবং মানচিত্র সহযোগে লিপিবদ্ধ করতে হবে। নইলে হিমালয় দেশবাসীর কাছে অপরিচিতই রয়ে যাবে।

পর্বতারোহণের রোমাঞ্চটুকু নিয়ে রোমন্থন করার মধ্যে আত্মতৃপ্তি থাকতে পারে কিন্তু তার কোন সত্যিকারের মূল্য নেই। একুশটি পর্বতাভিযান এ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে আয়োজিত হয়েছে এবং বাঙ্গালী অভিযাত্রীরা অনেকগুলি সর্বভারতীয় পর্বতাভিযানে অংশ নিয়েছেন। কিন্তু এ পর্যন্ত পর্বতাভিযানের ওপর মাত্র খান পাঁচেক বাংলা বই লেখা হয়েছে। অভিযানের যদি ইতিহাস না থাকে, তবে তা যতবড় সাফল্যমণ্ডিতই হোক, একদিন বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে যাবে। হিমালয় ভারতের, কিন্তু বিদেশী পর্বতাভিযাত্রীরা এসে তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। আজও তাঁদের বই না পড়ে, মানচিত্র না দেখে, আমরা হিমালয় অভিযানের আয়োজন করতে পারছি না। তাই একালের পর্বতাভিযাত্রী বন্ধুদের কাছে আমার আবেদন 'আপনারা আপনাদের পর্বতারোহণের ইতিহাস রচনা করুন। কারণ তাই হবে ভাবীকালের হিমালয়যাত্রীদের পরম পাথেয়।'

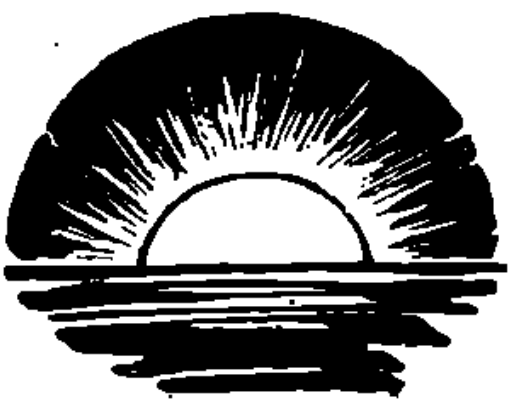

বাংলা তথা ভারতের নব জাগরণের এই পথ

অনুশীলন সমিতির

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পরিশিষ্ট (৩)

অনুশীলন সমিতির সহিত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সংযোগ

সতীশচন্দ্র বসু যে কয়জন অগ্রণী যুবকের সাহচর্য্যে ও সাহায্যে অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহাদের অন্যতম শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেঠ। যতীন্দ্রনাথ তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী শেফালিকা সেঠ প্রণীত "সঙ্গীত-শাস্ত্র কণিকা"র একস্থানে মন্তব্য করিয়াছেন—

"বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-পুস্তক গীতবিতানের স্বদেশখণ্ড সম্পর্কে একটা ঐতিহাসিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করা উচিত।

স্বদেশী আন্দোলনের উত্তাল মুহূর্ত্তে অনুশীলন সমিতির প্রধান কার্য্যালয় কলিকাতায় ৪৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের সন্নিকটস্থ যখন মিত্র মেনষ্টিট ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সমিতির যুবসঙ্ঘের সহিত কয়েকবার মিলিত হন এবং সামান্য একটি কাঠের টুলে বসিয়া তাঁহার নবরচিত কয়েকটি বাউল গান প্রাণের উচ্ছ্বাসে গাহিয়া শোনান। সেগুলির সাধারণে প্রথম প্রচার এইরূপে হয়। নিম্নলিখিত গানগুলি এইরূপে সমিতির সভ্যদিগকে তাহাদের ব্রতে উৎসাহিত করিবার জন্য মুখ্যতঃ গঠিত হয়। কবির উদাত্ত কণ্ঠে গীত আহ্বানের শ্রোতা এখনও কয়েকজন জীবিত আছেন।

১। ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা
২। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
৩। তোর আপনজনে ছাড়বে তোরে
৪। আপনি অবশ হলি তবে বল দিবি তুই কারে
৫। নিশিদিন ভরসা রাখিস ওরে মন হবেই হবে
৬। আমি ভয় করবো না, ভয় করবো না
৭। এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে
৮। নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়, খুলে যাবে এই দ্বার
৯। ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে
১০। আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে
১১। আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি

বলা বাহুল্য স্বাধীনতা সংগ্রামের দুঃসাহসিক ব্রতে ব্রতী যুবকবৃন্দকে উদ্দীপনা যোগাইবার উদ্দেশ্যেই রবীন্দ্রনাথ এই গানগুলি রচনা করিয়াছিলেন।"

এই সংযোগের সূত্র হিসাবে যতীন্দ্রনাথ আরও জানাইয়াছেন : জোড়াসাঁকো নিবন্ধক দা লেনস্থিত শিবমন্দির প্রাঙ্গণে অনুশীলন সমিতির একটি শাখা খোলা হইয়াছিল। সেইখানে রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ সভ্য হইয়াছিলেন। বয়স ১৪।১৫ বৎসর হইবে। ঐ ক্লাবে পাড়ার ২০।২৫ জন যুবক মিলিত হইত। যতীন্দ্রনাথ যত্ন লাঠি ও Boxing শেখাতেন। একদা রথীনের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ রবিঠাকুরের বাড়ী গিয়া তাঁহার সহিত এই বিষয়ে আলাপ আলোচনা করেন। রবি ঠাকুর বলেন, "তোমরা যুবক কর্মী, আমি কবি মানুষ। কবিতা লিখি, গান করি। তোমাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তোমাদের মনকে জাগাবার জন্য কতকগুলি গান রচনা করব ও শোনাব।"

রবীন্দ্রনাথ আরও বলেন তাঁহাদের বাড়ীতে তাঁহার অগ্রজেরা এবং তৎকালীন বাঙ্গালী চিন্তাশীল নেতৃবৃন্দ যথা নবগোপাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি আলোচনা করিতেন কিরূপে দেশকে স্বাধীন করা যাইতে পারে। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে কবি 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ রচনা ও পাঠ করেন।

কিছুকাল পরে দেশে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে জ্ঞানলাভের জন্য রথীন ঠাকুর, নগেন গাঙ্গুলী, সন্তোষ মজুমদার প্রভৃতি আমেরিকা যাত্রা করেন। তাঁহাদের শুভ কামনায় সমিতির কেন্দ্রস্থলে (৪৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট) একটি প্রীতি-সম্মেলনের আয়োজন হয়। তাহাতে রবীন্দ্রনাথ যোগদান করেন, সমিতিকে অভিনন্দন জানান ও সভ্যবৃন্দের সহিত আহারাদি করেন। যতীন্দ্রনাথ ১৯১০ সালে আমেরিকা যাত্রা করেন ও প্রসিদ্ধ Harvard University-তে অধ্যয়ন করিয়া B. A. degree লাভ করেন।

পরিশিষ্ট (৪)

ঢাকা অনুশীলন সমিতি

প্রখ্যাত বিপ্লবী সংস্থা ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা ও সংগঠন-প্রধান, বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম নেতা, খ্যাতনামা লাঠি ও অসি সঞ্চালক ব্যায়ামবীর শ্রীপুলিনবিহারী দাস ৩০শে শ্রাবণ ১৩৫৬ (ইং ১৭ই আগষ্ট ১৯৪৮) পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৩ বৎসর হইয়াছিল। এই বয়সেও তিনি প্রত্যহ ২৮ বৎসর পূর্বে নিজ হস্তে প্রতিষ্ঠিত তাঁহার প্রিয় সংস্থা, বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীটে অবস্থিত, বঙ্গীয় ব্যায়াম সমিতিতে শিক্ষণপথকে শিক্ষাদান করিতেন।

শ্রীপুলিনবিহারী দাস ১৮৭৬ সালে ফরিদপুর জেলার লোনসিং গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি ঢাকা কলেজে বি, এ, অধ্যয়ন করিতেন ও ১৯০৪ সালে ঐ কলেজে অধ্যাপনা করেন। ছাত্রাবস্থায়ই তিনি নিজের ও অন্যান্য ছাত্রদের ব্যায়াম চর্চায় বিশেষ উৎসাহী ছিলেন এবং তজ্জন্য একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।

ছাত্রাবস্থায়ই শ্রীযুক্ত দাস বিপ্লবী মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তিনি ছাত্রদের লইয়া প্রথম প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ আন্দোলন গড়িয়া তোলেন।

এই সময় তিনি কিছুকাল বিখ্যাত তুর্কী অসি-সঞ্চালক মার্ত্তাজার নিকট হইতে অসি ও ছোরা খেলায় ক্রীড়াকৌশল শিক্ষা করিয়া উহাতে অনন্যসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করেন। উহার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্য লাঠিখেলাও শিক্ষা করেন। তিনি অসি, ছোরা ও লাঠি খেলার বিভিন্ন দিকে এত পারদর্শিতা লাভ করেন যে, লাঠিচালনা ও অসি ও ছোরা খেলায় তাঁহার কৌশল ও বুৎপত্তি বাংলাদেশে একটা প্রবাদ হইয়া দাঁড়াইল।

১৯০৪ সালে শ্রীযুত দাস কলিকাতায় বিপ্লবী সংঘ অনুশীলন সমিতির ডিরেক্টর ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্রের নিকট হইতে বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ঢাকাতেই তাঁহার দীক্ষা হয়। ঐ সময় স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল ঢাকায় গিয়াছিলেন। অতঃপর ১৯০৬ সালে শ্রীযুত দাসের উপর সমগ্র পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গে অনুশীলন সমিতি গঠন করিয়া তুলিবার ভার অর্পিত হয়। ইহার পর হইতে তাঁহার সুযোগ্য নেতৃত্ব ও সংগঠন শক্তির বলে অতি শীঘ্রই পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে অনুশীলন সমিতির বৈপ্লবিক শাখা সমূহের প্রসার লাভ ঘটে। ১৯০৮ সালে যখন পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গে অনুশীলন সমিতি সহ বিভিন্ন সমিতি বে-আইনী ঘোষিত হয় তখন বিভিন্ন স্থানে পুলিনবাবুর নেতৃত্বে অনুশীলন সমিতির প্রায় ৬০০ শাখা সমিতি বিদ্যমান ছিল। (আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে সংগৃহীত)

পরিশিষ্ট (৩)

ROWLATT ACT

স্বদেশী আন্দোলনের সময় ব্রিটিশ সরকার বাংলা দেশে বিপ্লবের কারণ, বিস্তার ও উহা দমনের উপায় নির্দ্ধারণ জন্য যে কমিটি নিয়োগ করেন তাহার নাম সিডিশন (রাজদ্রোহ) কমিটি। ১৯১৮ সালে তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। কমিটির সভাপতি রাউলাট সাহেবের নামে উক্ত রিপোর্ট Rowlatt Act নামে সুপরিচিত।

এই রিপোর্টের প্রধান অংশে অনুশীলন সমিতির সংগঠন, সংবিধান ও কর্ম্মপদ্ধতির বিস্তারিত বর্ণনা আছে। উহার বাংলা সংক্ষিপ্তসার নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

বিপ্লবের ভাবধারায় প্রভাবিত যুবকবৃন্দ অনুশীলন সমিতি নামে একটি সংঘ স্থাপনা করে। (অনুশীলন অর্থ মনোবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন)। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলিকাতায় ও পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকায় উহা স্থাপিত হয়। চতুর্দ্দিকে উহার শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হয়। এক সময়ে ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রায় ৫০০ শাখা সহরে ও মফঃস্বলে প্রসারিত ছিল। ইহা ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলেও যুবকবৃন্দ সংঘটিত হইতে থাকে। কিন্তু সকলে একই বিদ্রোহ মনোভাবাপন্ন। তাঁহারা একজোটে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করিলেন যাহাতে তাঁহাদের দল বৃদ্ধির সহায়তা হয় ও কার্য্যকলাপের সুবিধা হয়। এইরূপ পরিবেশ সৃষ্টির প্রধান উপায় ছিল—সংবাদ পত্রে প্রচার, সভা সমিতিতে বক্তৃতা, জাতীয় উদ্দীপনাপূর্ণ সাহিত্য ও সঙ্গীত ইত্যাদি।

সমিতির সভ্যবৃন্দের শিক্ষার জন্য অদ্ভুত রকমের পাঠ্যসূচী স্থির করা হইয়াছিল। যথা—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, বিবেকানন্দ রচনাবলী, ম্যাটসিনী ও গ্যারীবল্ডির জীবন চরিত প্রভৃতি। শক্তি উপাসনার জন্য "ভবানী মন্দির" নামক পুস্তক পাঠ করিতে হইত।

এইরূপ শিক্ষা দেওয়া হইত যে প্রত্যেক ভারতবাসীকে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধান করিতে হইবে। ধর্ম্মের উপর ভিত্তি করিয়া শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে।

"বর্ত্তমান রণনীতি" নামক আর একখানি পুস্তকের মাধ্যমে প্রচার করা হইয়াছিল যে যদি সহজে বৈদেশিক নিষ্পেষণ বন্ধ করা না যায় তবে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। দেশের যুবশক্তিকে গেরিলা যুদ্ধে নিয়োজিত করিতে হইবে। তবেই তাহারা নির্ভীক ও অসিযুদ্ধে পারদর্শী হইবে। তাহাদিগকে বীর্য্যবান ও বিপদের সম্মুখিন হইতে হইবে।

পরিশিষ্ট (৬)

সমিতি সম্বন্ধে জনপ্রিয় সাহিত্যিকের মন্তব্য

অনুশীলন সমিতি সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক "বনফুল" (শ্রীবলাই মুখোপাধ্যায়) কিরূপ উচ্চ ধারণা পোষণ করেন তাহা নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠে জানা যাইবে। বিখ্যাত বাংলা দৈনিক পত্রিকা যুগান্তরে ৮ই ও ১৫ই চৈত্র ১৩৬৫ সাল, দুই সংখ্যায় তিনি দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়া স্বদেশীযুগে বাঙালী জাতির প্রাধান্য ও উন্নতির বিবরণ দিয়া বর্তমানে তাহার অবনতির কারণ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করেন। উহার শিরোনামা ছিল যথাক্রমে :

(১) একদা যাহারা বিজয় সেনানী

(২) কেনারাম বক্সী করিল জয়।

সেই সূত্রে তিনি লিখিয়াছেন

"বাংলা দেশে উনবিংশ শতাব্দীতে যখন আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল তখন নেতারা বুঝিয়াছিলেন যে যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরীরা যদি শারীরিক ও মানসিক শক্তির অধিকারী না হয় তাহা হইলে কোন আন্দোলনই সফল হইবে না। তাই প্রথমে তাঁহারা অনুশীলন সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সতীশচন্দ্র বসু। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল শরীরে ও মনে বাঙালীকে শক্তিশালী করা।

• • • •

শ্রীযুক্ত জীবনতারা হালদার লিখিত একটি পুস্তিকা হইতে আমি উক্ত সংবাদগুলি সংগ্রহ করিয়াছি। তিনি লিখিতেছেন—মানসিক উন্নতির জন্যও নানারূপ আয়োজন ছিল।—আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নানাবিধ উপদেশ ও সাধন পদ্ধতির ব্যাখ্যা প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল। নিয়মিত ভাবে স্বদেশ বন্দনা ও সঙ্গীত হইত।

• • • •

আমাদের আবার এইরূপ অনুশীলন সমিতি স্থাপন করিতে হইবে। আবার খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে সখারাম গণেশ দেউস্করকে, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে, স্বামী সারদানন্দকে, সত্যচরণ শাস্ত্রীকে।—ভিন্ন নামে তাঁহারা আমাদের মধ্যে এখনও আছেন। এই কিছুদিন পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ যে প্রশ্ন দেশবাসীকে করিয়াছিলেন সেই প্রশ্ন আবার আমাদের যুবক-যুবতীদের শুনাইতে হইবে, প্রকৃত উত্তরের জন্য তাহাদের প্রস্তুতও করিতে হইবে।

পরিশিষ্ট (৭)

বাংলায় বিপ্লববাদের প্রবর্তক স্বামী নিরালম্ব

ভারতবর্ষকে বিদেশী শাসন হইতে মুক্ত করিতে রীতিমত অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিতে হইবে, সামরিক অভ্যুত্থান ঘটাইতে হইবে, এই পরিকল্পনা যাঁহার মনে প্রথম উদয় হইয়াছিল তাঁহার নাম প্রায় অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। গার্হস্থ্য জীবনে তাঁহার নাম ছিল শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তী কালের প্রসিদ্ধ বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নামের সহিত তাঁহার নামের সাদৃশ্য থাকায় তাঁহার প্রকৃত পরিচয় অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ বাঘা যতীন শৌর্য, বীর্যে জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। পরন্তু যতীন্দ্রনাথ সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন এবং স্বামী নিরালম্ব নাম পরিগ্রহ করিয়া নির্জনে সাধনা ও সিদ্ধিলাভ করেন।

প্রকৃতপক্ষে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ই বাংলার বিপ্লববাদের প্রবর্ত্তক—ব্রহ্ম প্রপিতামহ। সুখের বিষয় স্বাধীনতা লাভের পর হইতে তাঁহার পরিচয় জনসাধারণের সম্মুখে প্রকাশিত হইতেছে। তাঁহার সহকর্মী ও সহযোগিরা প্রকাশ্যে তাঁহার যথোপযুক্ত সম্মান দিতে সক্ষম হইয়াছেন।

বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী কাটা জংসন ষ্টেশন হইতে প্রায় তিন মাইল উত্তর দিকে চাঁড়া গ্রামে ১৮৭৭ খৃঃ ১৯শে নভেম্বর তারিখে যতীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের পার্শ্বে একটি ছোট পার্ব্বত্য নদী প্রবাহিত নাম "খড়ে"। স্বাস্থ্যকর স্থান অপরূপ প্রাকৃতিক শোভাসমৃদ্ধ।

মাতৃভূমিকে দুঃখমুক্ত করিতে হইলে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হইতে হইবে—এই উদ্দেশ্য কোথায় সিদ্ধ হইবে, যৌবনকালে যতীন্দ্রনাথ তাহাই অনুসন্ধান করিতে থাকেন। তখন বাঙ্গালীতে সকলেই ভয় করিত, কোন প্রদেশে সৈন্যদলে ভর্ত্তি করা হইত না। (অবশ্য বাঙ্গালী ভারতের সর্ব্বত্র গৌরবের সহিত চাকুরী করিয়াছে।) অনুমান ১৮৯৭ খৃঃ তিনি দেশীয় রাজ্য বরোদায় গমন করেন এবং নিজের নাম বিকৃত করিয়া "যতীন উপাধ্যায়" নামে তথাকার অশ্বারোহী বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন। দৈবযোগে সেই সময় অঙ্কের শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ মহাশয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইয়া বরোদা রাজ্যে শিক্ষাব্রতী নিযুক্ত হ'ন। এই সুযোগে যতীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দের সহিত মন্ত্রণা করেন যে বিদেশে পড়িয়া থাকা বৃথা, শক্তি ও সামর্থ্যের অপচয়—বাংলায় ফিরিয়া বিপ্লবের আয়োজন করিতে হইবে। স্বাধীনতা লাভের ইহাই প্রকৃষ্ট উপায় স্থির করিয়া তাঁহারা অনুমান ১৯০২ সালে বাংলায় ফিরিয়া আসেন। তাঁহারা কলিকাতায় আসিয়া শ্যামপুকুরে ৺যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বাড়ী মিলিত হইলেন—একটি গুপ্ত সমিতি স্থাপন করিলেন এবং মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপযুক্ত কর্ম্মী সংগ্রহ ও অন্যান্য ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। পরে ১৯০৫-৬ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ জন্য যে "স্বদেশী আন্দোলন" হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহাদের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল।

ইহারই ফলে মাণিকতলা মুরারীপুকুরে সুবিদিত বোমার কারখানার উদ্ভব ও বৈপ্লবিক কর্ম্মের প্রসার। এই বোমার কারখানায় শ্রীবারীন্দ্রনাথ ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত প্রমুখ অনেক বিপ্লবী সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তখন বাংলার বিপ্লবীদের কার্যকলাপে বিদেশী গভর্ণমেণ্ট সন্ত্রস্ত হইলেন ও শাসনকার্য্য প্রায় অচল হইল। বাংলার সহিত বিভিন্ন প্রদেশের যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে যতীন্দ্রনাথ ভারত ভ্রমণ করেন। বিশেষতঃ এইজন্য তিনি পাঞ্জাব যান এবং তথায় বিপ্লবীদের এক শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সূত্রে প্রসিদ্ধ "গদর পার্টি"র নাম উল্লেখযোগ্য। "কোমাগাটামারু" খ্যাতির বাবা গুরুদিৎ সিং ও যতীন্দ্রনাথের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতীয় সৈন্যদলের সহযোগিতা করবার প্রয়োজনীয়তা জন্য তিনি প্রথম হইতেই সচেষ্ট ছিলেন।

অনুমান ১৯০৭ খৃঃ যতীন্দ্রনাথ শ্রীমৎ সোহং স্বামীর (ঢাকার বাঘ মারা জামাকাপড়) সংস্পর্শে আসে এবং গৃহের জীবন ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ও তদবধি স্বামী নিরালম্ব নামে পরিচিত হন। পরিশেষে নিজ জন্মস্থান চাঁড়াগ্রামের বহির্দেশে, লোকালয় হইতে দূরে, নির্জ্জন প্রান্তরে, নদীতীরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেইখানেই শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধযোগী ভগবান ত্রিবর্ত্তীবাবার সহিত নিরালম্ব স্বামীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল।

১৯৫০ খৃঃ ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে স্বামী নিরালম্ব বরাহনগরে শ্রীবিজয় বসন্ত বণিক মহাশয়ের উদ্যানস্থ দেহত্যাগ করেন। তাঁহার নশ্বর দেহের ভস্মাবশেষ লইয়া চাঁড়া আশ্রমে সমাধি রচনা হয়।

আধ্যাত্মিক জগতে স্বামী নিরালম্বের প্রধান শিষ্য স্বামী প্রজ্ঞানপাদ বর্তমান। তিনি ও আত্মজ্ঞানী ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ। বিপ্লববাদে তাঁহার প্রধান শিষ্য প্রসিদ্ধ বিপ্লবী নেতা ডাক্তার যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় এম. বি.।

যতীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে জনৈক লেখক অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে "বাংলার নবযুগের সূচনা করিয়াছিলেন দুইজন সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী—ধর্মক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দ ও কর্মক্ষেত্রে স্বামী নিরালম্ব। ইহা বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি নয়।

লেখকের পরম সৌভাগ্য যে স্বামী নিরালম্বের ন্যায় মুক্ত পুরুষের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সেবা করিবার এবং আশ্রমে তাঁহার সান্নিধ্যে থাকিবার সুযোগ হইয়াছিল।

(লেখক—শ্রীজীবনতারা হালদার। ভারতবর্ষ কার্তিক ১৩৫৪ সংখ্যা হইতে সঙ্কলিত)

ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত শ্রীমৎ নিরালম্ব স্বামী (ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রদূত, বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লববাদের প্রবর্তক যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) নামক পুস্তকে এই মহাপুরুষের বিস্তারিত জীবনী পরিবেশিত আছে। উহা তাঁহার স্মৃতি সভায় বিতরিত হইয়াছিল, ৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৪১ খৃঃ।

পরিশিষ্ট (৮)

বাংলার বিপ্লব আন্দোলনে অনুশীলন সমিতির ভূমিকা

অনুশীলন সমিতি বাংলাদেশে বিপ্লবের ধাত্রী। এই বিপ্লব বাঙালী যুবকের কাছ থেকে জীবনসমাধি দাবি করেছিল আর চেয়েছিল অনন্ত ভক্তি। আত্মবিস্মৃত বাঙালী আপনার এই অম্লান গৌরবের কথা ভুলতে বসেছে। লেখক সেকথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আমরা সেজন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের "অনুশীলন-ধর্মতত্ত্ব" দিয়েছেন। এই অপূর্ব গ্রন্থে ভারত-ধর্মের পুনর্বিচার করা হয়েছে যুগের প্রয়োজনে। অনুশীলন দিয়েছে অখণ্ড মানুষের আদর্শ, যার পথ জ্ঞানভক্তিমিশ্র কর্মযোগে আলোকিত ও সমৃদ্ধ। ঋষি বঙ্কিম আর আমাদের দিয়েছেন "আনন্দমঠ"। আনন্দমঠের বীর সন্তানের মৃত্যু কণ্ঠে নব্য ভারতের মাতৃমন্ত্র 'বন্দেমাতরম্'—এই আমাদের অভয় মন্ত্র, আমাদের অশোক মন্ত্র। "অনুশীলন" ও "আনন্দমঠ"-এর ভাব-মন্থনে অনুশীলন সমিতির উদ্ভব। অনুশীলনে তত্ত্ব ও আনন্দমঠে কর্ম। অনুশীলন সমিতির আবির্ভাব এই তত্ত্ব ও কর্মের সমন্বয়ের ক্ষেত্র হিসাবে। বঙ্কিমের মানস সন্তানগণ আনন্দমঠ হ'তে নেমে এসে অনুশীলন সমিতির ক্ষেত্র দিয়ে দেশে দিকে দিকে দেখা দিয়ে বঙ্গজননীর মুখ উজ্জ্বল করেছে। অনুরূপ অন্যান্য সমিতির আদি হ'ল এই অনুশীলন সমিতি। অনুশীলন সমিতি একেবারে নতুন নাম—বিপ্লবের নতুন কর্ম-সম্পাদনের রাজচিহ্ন নিয়ে এই সমিতির জন্ম হয়েছিল। অনুশীলন সমিতি—যুবকগণের সম্মুখে ত্যাগ, বৈরাগ্য, অভয়, মহাবীর্য ও অখণ্ড চারিত্রিক উৎকর্ষের ধ্বজা তুলে ধরেছিল।

বর্তমানের আদর্শভ্রষ্টতা, শ্রদ্ধাহীনতা, চারিত্রিক অবনতি ও বিশৃঙ্খলার দিনে অনুশীলন সমিতি নব সংগঠনের নতুন পথ নির্দেশ করতে পারে।

শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়

• শ্রীজীবনতারা হালদার প্রণীত "বাংলার প্রসিদ্ধ অনুশীলন সমিতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" নামক পুস্তিকা হইতে ধারাবাহিক ভাবে সম্পূর্ণ পুনঃ মুদ্রিত।

গল্প-ভারতীর আষাঢ় সংখ্যায় ডক্টর হিরণ্ময় ঘোষালের পোলিশ ভাষা থেকে অনূদিত একটি গল্প প্রকাশিত হচ্ছে এই বিজ্ঞপ্তি বেরুবার পর, অনেকেই ডক্টর ঘোষাল সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার কৌতূহল প্রকাশ করেছেন। তাই তাঁর জীবনের একটিমতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল।

ডক্টর হিরণ্ময় ঘোষাল

পোল্যাণ্ডের ওয়ারশৌ (Warsaw) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক, সুপণ্ডিত ও সুসাহিত্যিক ডক্টর হিরণ্ময় ঘোষালের জীবন ছিল অতি বৈচিত্র্যপূর্ণ। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট আত্মীয় ডঃ ঘোষালের আদি নিবাস ছিল কাঁঠালপাড়ার সন্নিহিত মাদরাল গ্রামে। ১৯০৮ সালে মাতুলালয় কালীঘাটে তাঁর জন্ম। ভবানীপুর সাউথ সুবারবান স্কুল থেকে ১৯২৪ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯২৯ সালে দর্শন শাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি. এ পাশ করেন। দর্শন শাস্ত্রে এম্. এ পড়বার সময়েই তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেত যাত্রা করেন।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময় নানা পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে তিনি নিজের খরচ নিজেই চালাতেন। ছেলেবেলা থেকেই নানান দেশের ভাষা শিখবার জন্য তাঁর একটা অদম্য আগ্রহ ছিল। স্কুলে পড়তে পড়তেই তিনি টোলে সংস্কৃত শেখেন, সেই সঙ্গে হিব্রু ও ফরাসী ভাষাও শিখে নেন। বি. এ. পরীক্ষায় তাঁর অন্যতম বিষয় ছিল ফরাসী ভাষা পরবর্তী জীবনে তিনি ১৯।২০টি ভাষায় বিশেষ দক্ষ হয়েছিলেন। এর অনেকগুলিই তিনি মাতৃভাষার মতই লিখতে ও বলতে পারতেন। ইংরেজি সাহিত্যের লেখক হিসেবে তাঁর সুনাম ছিল। এছাড়া ফরাসী, জার্মান, স্প্যানিশ্, রাশিয়ান্ এবং পোলিশ ভাষায়ও তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। ঐ সমস্ত ভাষাতেই নানা পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হ'ত।

এই সময় থেকে তিনি শিশুসাহিত্যের আসরেও নামেন এবং ছোটদের রামধনু পত্রিকায় নিয়মিত লিখতে থাকেন, বিলেতে থাকবার সময় প্রতিমাসে 'বিলেতী ডাক' নাম দিয়ে তিনি চিঠির মাধ্যমে ও-দেশের জীবনযাত্রার পরিচয় ছোটদের পরিবেশন করতে থাকেন। রামধনুতে ধারাবাহিক ভাবে তা প্রকাশিত হয়।

তিনি রুশ সাহিত্যের ওপর গবেষণা করে ওয়ারশৌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর উপাধি পেলেন এবং শেষ পর্যন্ত পোল্যাণ্ডেই স্থায়ীভাবে বসবাস করবেন স্থির করলেন। ওয়ারশৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁকে সেখানকার প্রাচ্যভাষার অধ্যাপক পদে নিয়োগ করলেন।

২য় মহাযুদ্ধের সুরুতে হিটলারের নাৎসী বাহিনী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করল। ডঃ ঘোষাল সপরিবারে সে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর বাগ্‌দত্তা পোলিশ মহিলা, নানা বাধা বিপদের মধ্যে জীবন বিপন্ন করে তিনি ভারতে ফিরে আসেন, পথে ইটালিতেই ঐ পোলিশ মহিলার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। পোল্যাণ্ড ত্যাগের পর এই রোমাঞ্চকর ঘটনাগুলি তিনি মহত্তর যুদ্ধের প্রথম অধ্যায় নামে একখানি বই-এ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে এই বইখানির মূল্য অনস্বীকার্য। পরে এই বইটির ২য় খণ্ড তিনি বার করেন—'কুলটুর ক্যাম্প' নাম দিয়ে।

দেশে ফিরে এসে বাংলাসাহিত্যের সঙ্গে তাঁর আবার নিবিড় সংযোগ ঘটল। এই সময় 'গল্প-ভারতী' বেরুতে সুরু করেছে। ডঃ হিরণ্ময় গল্পভারতীর একজন নিয়মিত লেখক হয়ে পড়লেন। গল্পভারতী মারফৎ তিনি পোলিশ সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালী পাঠকদের পরিচিত করাতে থাকেন। নূতনত্বের রসে ভরা তাঁর

অনবদ্য মৌলিক গল্পগুলোও বাঙালী পাঠকের মন কেড়ে নেয়। পাশাপাশি চলতে লাগল রায়বহুতে তাঁর রচিত কিশোরপাঠ্য গল্পগুলি। এর মধ্যে "রায় বহুদার শিকার কাহিনী" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর পোলিশ পত্নীও বাংলাভাষায় দক্ষ হয়ে উঠলেন।

যুদ্ধের সময় ভারতে যে সব পোলিশ উদ্বাস্তু এসে জড় হয়েছিল তাদের দেখাশোনার ভার পড়ল ডঃ ঘোষালের ওপর। এই সময় তিনি নিয়মিত বেতারে পোল্যাণ্ডের নানা তথ্য পরিবেশন করতেন। এরকম প্রায় ৮০০ বক্তৃতা দিয়েছিলেন তিনি বেতারে।

ভারত স্বাধীন হবার পর ডঃ ঘোষাল করেন সাহিত্যে যোগদান করলেন এবং মস্কোর ভারতীয় এম্‌ব্যাসীতে কাল্‌চারাল্ সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হলেন। রুশ ভাষায় তাঁর জ্ঞান ছিল মাতৃভাষার মতই। কিন্তু এ পদে তিনি বেশী দিন থাকতে পারেন নি তাঁর স্বাধীন চিত্তবৃত্তির জন্য।

এরপর কিছুদিন তাঁর জীবনে নানা বিপর্যয় দেখা দেয়। অত্যন্ত বেদনাময় সে কাহিনী। এমন এক সময় আসে যখন তাঁকে লণ্ডনে এসে ডাক পিয়নের কাজ নিতে হয়। পরে অবশ্য তিনি একটি মিউজিয়ামে কিউরেটারের কাজ পান। এই সময় তাঁর পত্নীবিয়োগ ঘটে।

এরপর আবার তাঁকে দেখতে পাই স্বদেশে আসামের পার্বত্য অঞ্চলে (N E F A) খণ্ড জাতিদের ভাষা আয়ত্ত করে সেগুলি সম্বন্ধে নানা তথ্য আহরণ করে, সেগুলি সুসঠিত সাহিত্যের আকারে রূপ দেবার ভার পড়ে তাঁর ওপর। বহু ভাষাবিদ্ ডঃ ঘোষাল এ বিষয়ে আশ্চর্য কুশলতা প্রদর্শন করেন এবং ঐসব খণ্ড জাতীয় ভাষায় একটি সারগর্ভ অভিধানও প্রণয়ন করেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেশ তাঁকে ধরে রাখতে পারল না। আবার ডাক পড়ল পোল্যাণ্ড থেকে। ভারশৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে ওরিয়েণ্টাল ইনষ্টিটিউটে প্রাচ্যভাষার প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করবার আমন্ত্রণ এল। হিরণ্ময় আবার ফিরে এলেন তাঁর দ্বিতীয় মাতৃভূমি পোল্যাণ্ডে।

এরপর তাঁর কাজ হ'ল পোল্যাণ্ডবাসীদের কাছে ভারতকে পরিচিত করা। ভারতের সংস্কৃতি, ভারতের সাহিত্য, ভারতের দর্শন—এদের যে কত বড় ঐতিহ্য তা প্রচার করা। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই কাজেই তিনি নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন। এই দুই দেশের মধ্যে তিনি ছিলেন এক মূর্তিমান সাংস্কৃতিক যোগসূত্র।

গল্প-ভারতীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ কিন্তু অক্ষুণ্ণই রয়ে গেল। পোলিশ সাহিত্যের রত্নরাজি সংগ্রহ করে তিনি গল্প-ভারতীর ভিতর দিয়ে বাঙালী পাঠকদের উপহার দিতে লাগলেন। এ সম্বন্ধে দিল্লী থেকে প্রকাশিত পোলিশ এম্‌ব্যাসীর মুখপাত্র পোলিশ বুলেটিন লিখেছিলেন—ডঃ ঘোষাল ভারতীয় ভাষায় একখানি শ্রেষ্ঠ পত্রিকা, গল্পভারতীতে, পোলিশ সাহিত্যের যে পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন তা অনবদ্য। এগুলি একত্র করে একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা নিতান্ত প্রয়োজন।

আমরা যতদূর জানি সে সংকলন গ্রন্থ এখনও বেরোয় নি। ইতিমধ্যে ডঃ ঘোষাল গত সেপ্টেম্বর মাসে অত্যন্ত আকস্মিকভাবে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেছেন। গল্পভারতীর তিনি একান্ত সুহৃদ ছিলেন, তাঁর অকাল বিয়োগে আমরা আত্মীয় বিয়োগের বেদনা অনুভব করছি। তাঁর কিছু কিছু অপ্রকাশিত রচনা আমরা গল্পভারতীতে প্রকাশের ব্যবস্থা করব তাঁর গুণমুগ্ধ পাঠক-পাঠিকাদের আমরা এইটুকু ভরসা দিচ্ছি।

———

ফতুয়া

—বলেস্লাভ্ প্রুস্
(মূল পোল ভাষা হইতে অনূদিত)
অনুবাদক—শ্রীহিরণ্ময় ঘোষাল

[Boleslaw Prus (বলেস্লাভ্) প্রুস্ ছদ্মনাম। এঁর আসল নাম Aleksander Glowacki আলেক্সান্দের গ্লভাৎস্কি। জন্ম ১৮৪৭ সালে, মৃত্যু ১৯১২। পোলীয় উপন্যাস ও গল্প সাহিত্যে প্রুসের নাম বহু উর্দ্ধে। সবচেয়ে নামজাদা উপন্যাস হলো "Lalka" বা "পুতুল"। তা ছাড়া আপন বাল্যকাল ও কৈশোর অবলম্বন করে যে সব কাহিনী ইনি রচনা করেছেন তা কিশোর বয়োবৃদ্ধ উভয়ের পক্ষেই সমান উপভোগ্য। এঁর রচনাকাল পোলীয় ইতিহাসে পরাধীনতার যুগ। তাই এঁর প্রায় সকল লেখাতেই একটি বিষাদ-ঘন সুর শোনা যায় যা পাঠকের মনে শোক সঞ্চার করে, অথচ কাঁদুনি-গাওয়ায় রূপান্তর নয়। এক কথায় প্রুস্ হচ্ছেন শোকবাদী, যদিও হাস্যরসেও ইনি প্রায় অদ্বিতীয়।]—অনুবাদক

এটা, ওটা, সেটা সংগ্রহ করা কারো কারো বাই থাকে—কেউ দামী জিনিষ সংগ্রহ করে, কেউ বা অন্য ধামের, যার যেমন অবস্থা। আমিও যে কিছু কিছু সংগ্রহ করি নি তা নয়, তবে তার দাম কিছুই নেই, আর তাও দুটো একটা।

এই ধরো না কেন, আমার নাটকখানা, ইস্কুলে লাতিনের ঘণ্টার লেখা···তারপর তোমার গিয়ে কতকগুলো শুকনো ফুল, সেগুলো ফেলে দিয়ে আবার টাটকা ফুল জমাতে হবে, তারপর কি বলে, যাক্···

তা ছাড়া আর কি আছে, হ্যাঁ, একটা পুরোনো. ছেঁড়া ফতুয়া।

এই দেখ না, সামনের দিকটার রঙ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, আর পেছন দিকটা ছেঁড়া। দাগ লাগা, বোতাম নেই, এই জায়গাটায় দুটো, বোধ হয় সিগারেটের ফুল্‌কি লেগে পুড়ে গিয়েছিল। এর পেছন দিককার বেল্টদুটো লক্ষ্য করবার মত। যেটাতে বকলোস আঁটা সেটাকে খাটো করে সেলাই করা হয়েছে, নিশ্চয় দর্জির কাজ নয়, আর যেটা বকলোসের ভেতর দিয়ে যায় সেটায় আগা থেকে গোড়া পর্য্যন্ত বকলোসের দাঁত বসানো।

একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে ফতুয়ার মালিক রোগা হতে হতে এমন অবস্থায় পৌঁছেছিল যখন আর ফতুয়ার দরকার নেই···

সত্যি কথা বলতে, এই এক টুকরো কাপড় নিয়ে বেশ একটু মুস্কিলে পড়েছি, কেউ চায় তো দিয়ে দিতে রাজী আছি। জিনিষপত্তর জমাবার একটা আলাদা আলমারী থাকলে কোন গোল হতো না, ঐ রোগীর ফতুয়াটাকে তো নিজের কাপড়-চোপড়ের সঙ্গে রাখা যায় না। অথচ এমন দিন ছিল যখন ওটাকে

ওর আসল দামের চেয়ে ঢের বেশী দিয়ে কিনতে দ্বিধা করতাম না, অনেক বেশী দাম দিয়ে। মানুষ তার ঘরে এমন দুটো-একটা জিনিষ রাখতে চায় যার সঙ্গে কোনো দুঃখ বা শোকের স্মৃতি জড়িত আছে।

সে শোক আমার ব্যক্তিগত জীবনের নয়। ঘটনাটা পাশের বাড়ীর। জানালা দিয়ে ওদের ছোট্ট ঘরখানার ভেতরটা বেশ দেখা যেতো।

এপ্রিল পর্যন্ত ওদের সংসারে ছিল তিনটি মানুষ : স্বামী, স্ত্রী আর অল্প বয়সের বি। মনে হয়, বি শুতো আলমারীর পেছনে দিস্যুকটার ওপরে। আলমারীর রঙটা গাঢ় তামাটে, মনে আছে। জুলাই মাসেই, না? ওদের সংসার তিনটি থেকে হলো দুটি মানুষের : স্বামী আর স্ত্রী। বি ওদের ছেড়ে চলে গেল কাদের বাড়ীতে, সেখানে বছরে তিন রবার্ট মাইনে আর রান্নার কাজ তারা নিজেরাই করে নিত।

অক্টোবর মাসে ওদের সংসারে রইল শুধু একজন—স্ত্রী। একেবারে একলা নয়। কারণ ঘরে তখনো অনেক জিনিষ-পত্তর আসবাব ভর্তি : দুটো খাট টেবিল আলমারী। নভেম্বরের গোড়াতেই অনেক অদরকারী জিনিষ নিলেমে বিক্রী হয়ে গেল। স্বামীর মৃত্যুর পর মেয়েটির কাছে মাত্র একটি স্মৃতি চিহ্ন রইলো বাকী। ঐ কতুয়াটা।

নভেম্বরের শেষাশেষি একদিন সে একজন শিশি-বোতল বিক্রীওয়ালাকে ঘরে ডেকে আনলে, ঘরখানা তখন একেবারে খালি, ডেকে এনে নিজের ছাতাটা দুআনাতে আর ঐ কতুয়াটাকে চল্লিশ গ্রামে বিক্রী করে দিলে। তারপর ঘর তালা লাগিয়ে, উঠোন পার হয়ে বাড়ীর দারোয়ানের হাতে চাবিটা দিয়ে দিলে। শুধু একবার তাদের জানলাটার দিকে তাকিয়ে দেখলে, ঝুপ্ ঝুপ্ করে তুষার পড়ছে, তারপর—ফটক পার হয়ে গেল। শিশি-বোতল-বিক্রী-ওয়ালা তখনো উঠোনে দাঁড়িয়ে। ওভারকোটের চওড়া কলারটা কাণ পর্যন্ত তুলে দিয়ে সবেমাত্র কেনা ছাতাটাকে বগলদাবা করে শীতে-জমে-যাওয়া হাতদুটো ঐ কতুয়াটায় জড়িয়ে নিলে, তারপর হাঁকলে—শি-শি-বোতল বিক্রী-ই-ই!

ডাকলায়।

—আজ্ঞে, কিছু বিক্রী-টিক্রী আছে নাকি? ঘরে ঢুকতে ঢুকতে জিজ্ঞেস করে।

—না, কিনবো।

—আজ্ঞে, এই ছাতাটা বুঝি? ইহুদী তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করে।

কতুয়াটাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে, কলার থেকে তুষারের ফুলকিগুলো ঝেড়ে ফেলে ছাতাটাকে খুলতে চেষ্টা করতে লাগলো।

—খাসা আস্‌বাব্! বলে : যে রকম বরোপ পড়তেচে তাতে এই রকম ছাতাই তো চাই আজ্ঞে ছাতা, সিল্কের ছাতা, একটা কেন আপনার দুটোও থাকতে পারে। কিন্তু সে ছাতা গরমে রোদ আটকাবার জন্যে…

—ঐ কতুয়াটার দাম কত নিবি? শুধাই।

—কোন্ কতুয়াটার?—ইহুদী বুঝতে পারে না। মনে করে বোধ হয় তার নিজের গায়ের কতুয়াটা। তারপর হঠাৎ তার মনে পড়ে। তাড়াতাড়ি মেঝে থেকে ওটাকে তুলে নেয়।

—এই কতুয়াটার? আজ্ঞে, আপনি কি এই কতুয়াটার কথা বলতেচো?

তার মনে কিসের সন্দেহ জাগে, জিজ্ঞেস করে :

—আজ্ঞে, হুজুর, এ কতুয়াটা নে আপনি করবে কী?

—বল্ না, কত দিতে হবে ?

ইহুদীর চোখের অল্প হলদে পাতা অংশটুকু জ্বল্ জ্বল্ করে, তার বাঁকানো নাকের ডগা আরো লাল হয়ে ওঠে।

—আজ্ঞে···এক রুব্‌ল্ ! ব'লে কম্বলটার যেটুকু প্রশংসা করবার মত বাকী আছে, সব আমার চোখের সামনে মেলে ধরে।

—আর রুব্‌ল্ দেবো।

—আর রুব্‌ল্···অমন পোষাকটা।···উঁহুঁ। শিশি-বোতল-বিক্রী-ওয়ালা জবাব দেয়।

—এক প্রশ্ন বেশী নয়।

—ঠাট্টা করচো, করো। আমার কাঁধ চাপড়ে বলে—এটার দাম যে কত হওয়া উচিত তা তো নিজেই জানো। বাচ্চার পোষাক নয়, একটা আস্ত মানুষের পোষাক···

—আর রুব্‌লে না দিস্ তো যা। তার বেশী পাবি নে।

—আর রাগ করেন কেন ? কণ্ঠস্বর মোলায়েম—সত্যি বলচি আর রুব্‌লে দিতে পারবো নি বাপু, কসম খেয়ে বলতিছি। আচ্ছা তুমিই বলো না কত্তা, ঠিক দাম এর কত হওয়া উচিত, সেয়া বিচেয় করে আমি তাতেই রাজী হবো। নোকসান আমারই হোক্, তুমি খুশী হলেই হলো।

—কম্বলটার সাড়ে দাম হওয়া উচিত পঞ্চাশ রুব্‌ল্, আর আমি তোকে দিচ্ছি আর রুব্‌ল্।

—আর রুব্‌ল্ ! আচ্ছা দাও, আর রুব্‌ল্ তো আর রুব্‌ল্ই দাও। গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আমার হাতে কম্বলটাকে গুঁজে দেয়—আমারই নোকসান হোক্, আমার কাচে কত্তার খেলাপ পাবে নি বাপু···ইস্, কী কন্‌কনে হাওয়া !

হাত দিয়ে জানলাটার দিকে দেখিয়ে দেয়। বাইরে তুষার সুতোর গুলীর মত পাকিয়ে পাকিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে।

পয়সা দিতে যাচ্ছি এমন সময়ে সে ঝাঁ করে আমার হাত থেকে কম্বলটা ছিনিয়ে নিয়ে তার পকেটগুলো দেখতে লাগলো।

—খুঁজছিস কী !

—পকেটে কী যেন রেখেছিনু, মনে পড়চে না ! অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে উত্তর দেয়, বলে—আর গোটা-দশেক কোপেয়েক দেবে না ?

—না, আর পাবি নে—দরজা খুলে ধরি।

—তোমার পায়ে পড়ি।···এই দেকো, ঘরে একটা ফাস্ট ক্লাস কারকোট আছে···

বাইরে থেকে গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে—কত্তার জন্যে ভেড়ার দুধের চিস্ নে'সবো নাকি ?

মিনিট দুই যেতে না যেতেই আবার হাঁকে—শি-শি-বোতল-বি-ক্রী-ই-ই।···জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই একেবারে পরিচিতের মত এক গাল হেসে অভিবাদন জানালে।

হু হু করে বরফ পড়ছে, আকাশ অন্ধকার হয়ে এলো। কম্বলটা টেবিলের ওপর রেখে ভাবতে লাগলাম ঐ মেয়েটির কথা, এই কিছুক্ষণ আগে ফটক পার হয়ে কোথায় চলে গেল, তাদের ঐ ঘরখানার কথা, একেবারে খাঁ খাঁ করছে এখন, আর ঐ কম্বলের মালিকের কথা, তার ওপর তুষারের স্তর ক্রমেই পুরু হয়ে উঠছে···

এই তো তিন মাস আগে সেপ্টেম্বরের মেঘমুক্ত দিনে ওরা কত গল্প করেছে স্বামী-স্ত্রীতে। এই যে মাসেই তো মেয়েটা গুন গুন করে গান গেয়েছে; আর ওর স্বামী রবিবারের "কুরিয়ের" পড়তে পড়তে হেসেছে। আর আজ ··

এপ্রিলের গোড়াতে ওরা আমাদের বাড়ীর ওদিকটাতে উঠে এলো। খুব সকালে উঠতো ওরা, তারপর ওদের নিজেদের সামভার থেকে চা ঢেলে, খেয়ে একসঙ্গে সহরে বেরুতো। স্বামী যেতো অফিসে আর স্ত্রী ছেলে পড়াতে।

স্বামী সামান্য কেরানী, ডিপার্টমেন্টের কর্তাদের দিকে তাকাতো ঠিক যেমন টুরিষ্টরা তাকায় তাজী-পাহাড়ের দিকে। আর কাজের অভাব ছিল না, সারাটি দিন পরিশ্রম করতে হতো। দেখেছি কখনো কখনো রাত দুপুরে নিজের ঘরে ছোট টেবিলটার ওপর ঝুঁকে পড়ে কাজ করছে।

ওর স্ত্রী তখন ওর কাছে এসে বসতো সেলাইয়ের কাজ নিয়ে। মাঝে মাঝে ওর দিকে তাকিয়ে সেলাই বন্ধ করে তাড়া দিতো:

—আজ আর থাক্, এইবার শুতে যাও।

—তুমি কখন শুতে যাবে, শুনি?

—আমি ··আর এই একটু বাকী, ওটুকু শেষ করেই···

—আমারও কাজ শেষ হয়ে এলো, এই গোটা কয়েক লাইন···

আবার ওরা দুজনে ঘাড় নীচু ক'রে আপন আপন কাজে মন দেয়। আবার কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি বলে:

—শুতে যাও না গো! আচ্ছা তো!

কখনো কখনো তার কথার পিঠে উত্তর দেয় আমার ঘড়ি, চং করে একটা বাজিয়ে।

ওদের বয়েস বেশী হয় নি, দেখতে সুন্দরও নয় কুৎসিতও নয়, তবে মুখে যেন একটি শান্ত ভাব ছিল। যতদূর মনে পড়ে, স্ত্রীর চেহারাটি ছিল পাতলা ছিপছিপে, আর স্বামীর চেহারা দোহারা, সামান্য কেরানীর মত মোটেই না।

প্রতি রবিবার দুপুরের দিকে, ওরা দুজনে হাত ধরাধরি করে বেড়াতে যেতো, বাড়ী ফিরতো বেশ রাত হয়ে গেলে। দিনের খাবার ওরা সহরেই খেতো। একবার ওদের দেখেছিলাম, ষট্যানিকাল গার্ডেন্স্ আর লাক্সেম্বুর্গ পার্কের মাঝামাঝি ফটকটার কাছে। দুটো জিঞ্জারব্রেড্ আর দু'গেলাস সরবৎ কিনছে, অথচ মুখের ভাবটা এমন যেন ওদের চারের সঙ্গে গরম হাম আর হর্স-রেডিশ সস্ ছাড়া আর কিছু মুখেই ওঠে না।

সাধারণতঃ গরীব মানুষের মনের শান্তি ঠিক রাখবার জন্যে বিশেষ কিছু দরকার হয় না। সামান্য আহার্য, প্রচুর কাজ এবং প্রচুর স্বাস্থ্য। বাদবাকী একরকম করে জুটে যায়।

আমার ঐ প্রতিবেশীদের আহার্যের অনটন হয় নি, কাজেরও না, তবে স্বাস্থ্য যে খুব ভালো ছিল, তা বলা যায় না।

জুলাই মাসে স্বামীটির একটু সর্দি কাশি হলো। তবে এমন কিছু নয়। কিন্তু হঠাৎ মুখ দিয়ে তার রক্ত উঠতে লাগলো। একেবারে জ্ঞান হারিয়ে ফেললো।

তখন রাত গভীর। ওর স্ত্রী যন্ত্রে আস্তে বিছানায় ওকে শুইয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি দারোয়ানের ঘরটুকে ডেকে আনলে। তারপর তার জিম্মায় ওকে রেখে ছুটে ডাক্তার ডাকতে গেল। পাঁচজন ডাক্তারের ঠিকানা নিয়ে ছুটোছুটি করে পেলে একজনকে, তাও রাস্তায় আকস্মিক ভাবে।

পথের ঘর আলোয় মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে রোগীর অবস্থা অনুমান করা ডাক্তারের পক্ষে কঠিন হলো না। তার পায়ুটো এলিয়ে পড়ছে অবসাদ ও ক্লান্তিতে, পথে তখন গাড়ী নেই, তাই ডাক্তার তার হাত ধরে আস্তে আস্তে চলতে চলতে বোঝাতে লাগলো। শুধু মুখ দিয়ে রক্ত ওঠাটা এমন কিছু নয়, ওতে ব্যাকুল হবার কারণ নেই।

—রক্ত গলা থেকেও উঠতে পারে, পেট বা নাক থেকেও, ফুসফুস্ থেকে কচিৎ-কখনো। তা ছাড়া আপনি বলছেন, ওঁর স্বাস্থ্য ভালোই, কখনো কাশি হয় নি ··

কাশি, হ্যাঁ, কখনো কখনো কাশতেন! মেয়েটি ঘাস নেবার জন্যে একটু দাঁড়ায়।

—হ্যাঁ, কখনো কখনো, তা এমন কিছু নয়। নিশ্চয় সামান্য ব্রঙ্কাইটিস্, কার না হয়?

—হ্যাঁ · সর্দি। মেয়েটির স্বর এবার স্বাভাবিক।

—আচ্ছা, ওঁর নিউমোনিয়া হয় নি কখনো?

—হ্যাঁ। মেয়েটি আবার দাঁড়ায়।

তার পায়ুটো আবার দুর্বল হয়ে পড়ে।

—হাঁ, তবে নিশ্চয় বহুদিন আগে! ডাক্তার তাড়াতাড়ি যোগ করে।

—হ্যাঁ, বহুদিন আগে। মেয়েটি বলে ওঠে—সে গেল বছর ছিতে।

—সেত বছর আগে।

—না ··নতুন বছরের আগে···সে তো বহুদিন হলো।

—হুঁ!···অন্ধকার রাস্তা তার ওপর মেঘ করেছে—ডাক্তার বলে।

বলতে বলতে ওরা বাড়ীতে এসে ঢুকলো। মেয়েটি ব্যস্ত হয়ে দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করে—কী খবর?

—খবর কিছু নেই। ওদের ঘরে এসে শোনে তাই, দারোয়ানের বউ বলে, খবর কিছু নেই, রোগী ঘুমোচ্ছে।

ডাক্তার তাকে আস্তে আস্তে তুলে, পরীক্ষা করে বললে, না, ও কিছু নয়।

—আমি তক্ষুনি বললাম, ও কিছু নয়! রোগী বলে।

—কিছু না! মেয়েটি স্বামীর ঘামে-ভেজা হাত ধরে বলে। রক্ত পেট থেকেও ওঠে, নাক থেকেও, তাই না? তোমার ও রক্ত নাক থেকে···তোমার শরীর তো খারাপ নয়। শুধু একটু চলা-ফেরা করা দরকার, কেবল ঘরে বসে থাকা···তাই নয় ডাক্তারবাবু, ওর একটু চলা-ফেরা করা দরকার?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলা-ফেরা করা অবশ্য ভালোই, তবে আপনার স্বামীকে দু-এক দিন শুয়ে থাকতে হবে। উনি বাইরে কোনোখানে একটু ঘুরে আসতে পারবেন কী?

—না। মেয়েটি ভারী গলায় উত্তর দেয়।

—আচ্ছা, বাইরে যাবারও দরকার নেই! তারপাতাতেই থাকবেন। আমি এসে দেখে যাবো, উনি দুদিন একটু শুয়ে জিরিয়ে নিন। আবার রক্ত উঠলে···ডাক্তার কী বলতে চায়।

—আবার রক্ত উঠলে কী হবে ডাক্তারবাবু? মেয়েটি শুধায়। তার মুখ মেঘের মত আকাশে।

—কিছু হবে না। আপনার স্বামী একটু বিশ্রাম করুন, রক্তটা শুখানেই আটকে যাবে ··

—কোথায়···নাকে? মেয়েটি ডাক্তারের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়।

—হ্যাঁ···নাকে। হ্যাঁ, অবশ্যই নাকে। আপনি চিন্তা করবেন না। তা ছাড়া, সবই ভগবানের হাত। নমস্কার।

ডাক্তারের কথায় মেয়েটি ভারী সান্ত্বনা পায়। কয়েক ঘণ্টা আগে সে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল, এখন তার মুখখানি যেন খুশীতে ভরে উঠেছে।

—কিচ্ছু হয়নি! চোখের জল চেপে মুখে হাসি টেনে বলে।

রোগীর বিছানার কাছে নতজানু হয়ে তার হাত চুমুতে ভরে দেয়।

কিচ্ছু হয় নি! স্বামী অস্পষ্ট স্বরে প্রতিধ্বনি করে। তার মুখে হাসি ফুটে ওঠে—যুদ্ধে মানুষের কতই না রক্তপাত হয়, আর তারপর সে দিব্যি সেরে ওঠে!

—চুপ করো, বেশী কথা কয়ো না, লক্ষ্মীটি! স্ত্রী অনুরোধ করে।

বাইরে ভোর হয়ে আসে। সবসময়ে কতটুকুই বা রাত!

রোগের উপশম হয় না। যত শীঘ্র যাবে বলে মনে হয়েছিল তা গেল না। স্বামীটির অফিস যাওয়া বন্ধ হলো। ছুটির দরকার নেই, সুস্থ হয়ে কাজে গেলেই চলবে, যদি অবশ্য ততদিনে তার জায়গা খালি থাকে, সামান্য কেরানীর যা হয়ে থাকে। বাড়ীতে বসে থাকলে তার স্বাস্থ্যও একটু ভালো থাকে। সুতরাং মেয়েটি সপ্তাহে আরো গোটা-কতক ছেলে-পড়ানোর কাজ জোগাড় করে, আর তাই দিয়ে কোন রকমে সংসার চালায়।

সকালে আটটায় বেরোয়। বেলা একটায় ঘণ্টা-দুয়েকের জন্যে বাড়ী ফেরে, স্টোভে স্বামীর জন্যে খাবার তৈরী করে তাকে খাইয়ে আবার বেরোয় কয়েক ঘণ্টার জন্যে।

সন্ধ্যেবেলাটা তারা কাটায় একসঙ্গে। মেয়েটির হাতে যেটুকু সময় তাকেও নষ্ট করা চলে না। তাই রাত আরো কিছু সেলাইয়ের কাজ নিয়ে বসে।

অসুখের শেষাশেষি একদিন রাস্তায় মেয়েটির ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হলো। একসঙ্গে পথ চলতে চলতে মেয়েটি ডাক্তারের হাত ধরে অনুনয় করে:

—আসবেন আমাদের ওখানে। ভগবানের দয়া হলে হয় তো···আপনি এলে ওর মনটা ভারী ভালো থাকে···

ডাক্তারের প্রতিশ্রুতি নিয়ে বাড়ী ফেরে; যেন তার চোখে জল। তার স্বামী রোগে ভুগে ভুগেই অধীর হয়ে উঠেছে। রাগের মাথায় স্ত্রীকে কী যে বলে তার ঠিক নেই। বলে, তার সেবার মাত্রা অত্যন্ত বেড়েছে, তবু সে বাঁচবে না। তারপর জিজ্ঞেস করে:

—ডাক্তার তোমায় বলে নি যে আমার বেশী হলে মাত্র কয়েক মাস?

মেয়েটি আড়ষ্ট হয়ে যায়।

—তুমি ওসব কী বলছো গা? বলে—তোমার মাথায় ও-সব কে ঢুকিয়েছে?

রোগীর রাগ পড়ে না।

—এসো আমার কাছে, এসো, চড়াগলায় বলে। তারপর স্ত্রীর হাত দুটো ধরে জিজ্ঞাসা করে—আমার মুখের দিকে চেয়ে বলো, ডাক্তার বলে নি তোমায়?

উদ্বেগ-ভরা দৃষ্টি স্ত্রীর মুখের ওপর তুলে ধরে। সে দৃষ্টির সামনে জড় পদার্থও ভেতরের কথা গোপন রাখতে পারে না।

ঐ মেয়েটির মুখের ভাবটি শান্ত। স্বামীর হিংস্র দৃষ্টির সম্মুখীন হয়ে একটু হাসলে। কিন্তু তার চোখ দুটি কে যেন কাচ দিয়ে ঢেকে দিয়েছে।

—ডাক্তার বললে—তার গলার স্বর শান্ত, বললে—কিছু হয় নি, দিন-কতক বিশ্রাম করতে হবে···

স্বামী তার হাত ছেড়ে দিয়ে থর থর করে কাঁপে আর হাসে, তারপর হাত নেড়ে বলে:

—কী বিশ্রী মেজাজ হয়েছে আমার আজকাল! হঠাৎ মনে হলো যেন ডাক্তার আমার আশা ছেড়ে দিয়েছে···যাক্···তুমি যখন বলছো···মনটা স্থির হলো।

নিজের কল্পনার কথা মনে করে হাসে।

এরপর তার মনে আর সন্দেহ জাগে নি. আর সে অমন করে মেজাজও হারায় নি। মেয়েটির ঐ হাসি-ভরা. শান্তি-ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে তার বিশ্বাস ক্রমেই দৃঢ় হয়েছে যে তার অবস্থা খারাপ নয়।

খারাপ হবে কেন?

কাশিটা আছে, তবে—ওটা শুধু সর্দির কাশি। কখনো কখনো যদি বেশীক্ষণ বসে থাকে তো ঐ একটু রক্ত—নাক থেকে বৈকি। একটু একটু জ্বর আসে, তা—ওটা শুধু কেবল ভাবে কি না তাই।

তার মনে হয় সে যেন ক্রমেই সুস্থ হয়ে উঠছে। বাইরে কোথাও একটু ঘুরে আসতে ইচ্ছে হয় —কিন্তু শক্তি পায় না। বিছানায় পড়ে থাকতে চায় না দিনের-বেলায়, পোষাক পরে চেয়ারে বসে থাকে কোথাও বেড়িয়ে আসবার জন্যে, কিন্তু ঐ দুর্বলতাটা যে একেবারেই যেতে চায় না।

একটা ব্যাপারে তার মনে হঠাৎ খটকা লাগলো।

একদিন ঐ কফুয়াটা পরতে গিয়ে তার মনে হলো যেন ওটা ভারী ঢল্ ঢল্ করছে।

—আমি কি এত রোগা হয়ে গেছি? প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ, একটু রোগা হয়ে গেছো বৈকি। স্ত্রী তাড়াতাড়ি বলে—তা বলে এমন কিছু নয় ··

স্বামী ভয়ে ভয়ে তার দিকে তাকায়। মেয়েটি সেলাই থেকে চোখ তোলে না। ওর মুখে অমন শান্ত ভাব, ওটা কি ভাণ মাত্র? ডাক্তার নিশ্চয়ই বলেছে, তার এমন কিছু শক্ত রোগ হয় নি, না, সে ও নিয়ে মন খারাপ করবে না।

সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে সেই তার জ্বর জ্বর ভাবটা কেবলই বেড়ে চললো, দিনের পর দিন জ্বর ছাড়ে না।

—ও কিছু নয়। রোগী বলে—জ্বরের পর হেমন্ত শুরু হবার সময়ে সুস্থ মানুষেরই শরীরটা কেমন করে, কেমন যেন বিশ্রী লাগে। শুধু একটা কথা বুঝতে পারি না, আমার এই কফুয়াটা অমন চলকো হয়ে পড়ছে কেন? খুব রোগা হয়ে গেছি বোধ হয়। সুতরাং গায়ে মাংস না লাগলে একেবারে সেরে ওঠা যাবে না, তার আর কী করা যাবে? একটু মোটা হলেই, ব্যস্···

মেয়েটি ভয়ে ভয়ে স্বামীর কথা শোনে, তারপর বলে—হ্যাঁ, তা বৈ আর কী?

রোজ বিছানা থেকে উঠে রোগী পোষাক পরে, অবশ্য স্ত্রীর সাহায্য না পেলে জামাটা পর্যন্ত গায়ে দিতে পারে না।

জানলার ওপর নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে বলে—শরীরে বল পাইনে, তাতে আর আশ্চর্য কী! চেহারাটা যা হয়েছে।

স্ত্রী তাড়াতাড়ি বলে—মুখ দেখে শরীর ভালো-মন্দ বলা যায় নাকি? মুখের চেহারা একটু তো বদলে যায়।

—সে কথা ঠিক, কিন্তু আমার শরীরও ক্রমেই শুকিয়ে যাচ্ছে।

—ওটা তোমার মনের ভুল নয় তো? ভীত সন্দেহের স্বরে স্ত্রী শুধায়।

স্বামী একটু ভাবে।

হ্যাঁ, দেখো, তুমি ঠিকই বলেছো···দিন কয়েক হলো মনে হচ্ছে ঐ কচুয়াটা যেন···এই একটু···

—কী যে বলো? স্ত্রী বাধা দেয়—এইবার বলবে যে তুমি মোটা হচ্ছো।

—কে জানে? কচুয়াটা দিয়ে বিচার করলে, অবশ্য···

—তা হলে গায়ে বল পাচ্ছি না কেন?

—হ্যাঁ, তোমার অমনি একদিনেই গায়ের বল চাই। শরীরটা আগে একটু সারুক। তারপর শরীর সারলেও অমনি বল পাওয়া যায় নাকি? বল পেতে এখনো কিছুদিন লাগবে।

তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা, তুমি আলমারীর পেছনে বসে বসে কী করছো গা?

—করবো আবার কী? সিন্দুকটার ভেতরে তোয়ালেটা খুঁজছি, কে জানে তোয়ালেটা পরিষ্কার কি না!

—দেখো, তুমি অমন টানা-হেঁচড়া করো না। অমন ভারী সিন্দুকটা, সরালেই হলো!

সিন্দুকটা সত্যিই ভারী, মেয়েটির কপালে ঘাম ফুটে ওঠে, অথচ তার মুখের ভাব আগের মতই শান্ত।

রোগী এবার থেকে প্রায়ই কচুয়াটা পরে দেখে, আর স্ত্রীকে ডেকে বলে:

—এই দেখো, এইবার বিশ্বাস হচ্ছে তো! কাল এইখানে আঙুল ঢোকাতে পারতাম অল্পেশে, আর আজ, এই দেখো আঙুলটাও ঢুকছে না। সত্যিই শরীরটা আমার সেরে আসছে!

একদিন রোগীর আনন্দ আর বাধা মানে না। তার স্ত্রী ছেলে পড়িয়ে ঘরে ফিরেছে খুশিতে দুই চোখ ভরে তাড়াতাড়ি স্ত্রীকে ডেকে বলে:

—শোনো, এতদিন তোমায় বলি নি একটা কথা···ঐ কচুয়াটা নিয়ে একটু ঠকিয়েছি তোমায়, জানো বুঝি? তুমি যাতে না ভাবো তাই রোজ আমি একটু একটু করে কচুয়ার পেছনে দিকটায় বেল্টটাকে খাটো করেছি, তাই ওটা অমন খাটো হয়ে এসেছে···কাল বেল্টাকে শেষ পর্যন্ত টেনে দিয়ে ভাবছি, এইবার আর চললো না, তুমি ধরে ফেলবে, আর আজ···জানো কী হয়েছে? সত্যি বলছি, আজ কচুয়াটা গায়ে দিতে গিয়ে দেখি একেবারে খাটো, বেল্টটাকে আবার আলগা করে দিতে হলো!···একেবারে খাটো, গায়ে চড়াতেই পারি না, আর কাল ঢল্ ঢল্ করছিল···এইবার আমারও বিশ্বাস, ভালো হয়ে উঠবো···নিজেই ভালো হয়ে উঠবো।···ডাক্তার যা বলে বলুক···

অতগুলো কথা বলে সে অবসন্ন হয়ে পড়ে, আবার বিছানায় গিয়ে বসে। যে মানুষের গায়ে বেল্ট খাটো না করেই কচুয়া খাটো হয়ে গেছে তার কী আর সোয়া শোভা পায়? তাই সে চেয়ারে বসার মত করে স্ত্রীর হাতে ভর করে বসে।

—দেখো দেখি একবার! আস্তে আস্তে বলে—কে ভেবেছিল? দুহপ্তা ধরে তোমায় ঠকিয়েছি, বলেছি—কচুয়াটা খাটো হয়ে আসছে, আর আজ কচুয়াটা সত্যিই খাটো হয়ে গেছে! ভেবেছিলে একবার?

ওরা দুজনে পরস্পরকে অবলম্বন করে পাশাপাশি সন্ধ্যা ঐকতানে বসে কাটিয়ে দিল।

রোগীর উত্তেজনার সীমা নেই।

—কী আশ্চর্য! স্ত্রীর হাতে চুমু খেয়ে বলে, আস্তে আস্তে—ভেবেছিলাম, ঐ রকম রোগ। হতে হতে একেবারে শেষ হয়ে যাবো। ছমাস ধরে ঐ ভাবে চলেছে, আর আজ, আজ এই প্রথম সত্যিই বিশ্বাস হচ্ছে, ভালো হয়ে উঠবো। রোগীর কাছে সবাই মিথ্যে কথা বলে, স্ত্রী সবচেয়ে বেশী। কিন্তু এই ফতুয়াটা— এটা তো মিথ্যে কথা বলতে পারে না।

• • • •

আজ ঐ পুরোনো ফতুয়াটার দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করি, তার বেল্ট দুটোর ওপর দুজনের হাতের কাজ। একজন বকলোসটা সরিয়ে সরিয়ে খাটো করেছে, যাতে স্ত্রীর ভাবনা দূর হয়, অপর জন যে বেল্টটা বকলোসের ভেতর দিয়ে যায় সেটাকে কেটে কেটে খাটো করছে, স্বামীর মনে ভরসা দেবার জন্যে।

"ওদের কি আবার কখনো দেখা হবে যখন ওরা পরস্পরের কাছে ফতুয়ার রহস্য উন্মোচন করবে?" আকাশের দিকে চেয়ে ভাবি।

পৃথিবীর ওপর থেকে আকাশখানাকে কে যেন সরিয়ে ফেলেছে। শুধু হু হু করে পড়ে তুষার, ঠাণ্ডা কন্‌কনে, কবরে কবরে মানুষের দেহাবশেষ পর্যন্ত জমে যায়।

অথচ কে বলবে, ঐ তুষারের মেঘগুলোর ওপারে সূর্য নেই?…

অবিস্মরণীয় মুহূর্ত

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

১৯৩০ সাল। সে কথা আমার জন্ম একদিন আমরা কিরকম বিপদে পড়েছিলাম তখন।

তখন আমরা ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসের ছাত্র। নজরুল আর আমি। একই দেশে আমাদের বাড়ী। একই জায়গায় কাছাকাছি দুটি স্কুলে আমরা পড়ি। একই ক্লাসের ছাত্র।

ইস্কুলের ছুটির পর বেড়াতে বেরিয়েছিলাম আমরা দুজনে।

আমাদের ইস্কুলের পাশ দিয়ে রেলের লাইন চলে গেছে। আর তারই আশে-পাশে ছোট বড় কয়েকটি কয়লার কুঠি।

সে এক বিচিত্র সুন্দর দেশ। কয়লারের বড় বড় চিম্‌নিতে ধোঁয়া উঠছে। চাকের মুখে হেড-গিয়ারের চাকা ঘুরছে।

রেললাইনের ওপর দিয়ে ট্রেন চলছে। আর তারই পাশ দিয়ে পিচ্‌ঢালা সুন্দর একটি রাস্তা চলে গেছে 'যেমন কোম্‌ কোম্পানী'র কাছারি-বাড়ীর দিকে। রাস্তার দুপাশে সমান্তরালভাবে চলে গেছে বড় বড় গাছ। গাছগুলি যে কতদিনের পুরনো তা দেখলেই বুঝতে পারা যায়। মাথার ওপর দুদিকের বড় বড় ডালপালাগুলো জড়াজড়ি করে চাঁদোয়ার মত আকাশটাকে ঢেকে ফেলেছে। ছায়াশীতল স্নিগ্ধ মনোরম পরিবেশ। রাস্তার দুদিকে গাছের নীচে কচি কচি দুর্বা ঘাস গজিয়েছে। মনে হয় কে যেন একটা নরম গালিচা পেতে দিয়েছে।

নজরুল বললে, আর হাঁটতে পারছি না। এই ঘাসের ওপর আমি—

বলেই সে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো সেইখানে।

দূরে দামোদর নদী দেখা যাচ্ছে। পড়ন্ত সূর্যের রঙিন আলো এসে পড়েছে নদীর ঝিরঝিরে জল আর বালির ওপর।

গ্রীষ্মকাল। ভারি সুন্দর মিষ্টি হাওয়া এসে লাগছিল গায়ে। আমিও শুয়ে পড়লাম তার পাশে।

বংলাদেশে প্রথম কলিয়ারী হয় এই জায়গায়—আমাদের এই রাণীগঞ্জে। নজরুল বললে।

বললাম, জানি। একটা বইও পড়েছি—এই সব জায়গা এককালে গভীর জঙ্গল ছিল। ভূমিকম্পে সেই জঙ্গল চলে যায় মাটির নীচে। জঙ্গলের সেই গাছগুলো ধীরে ধীরে কয়লায় রূপান্তরিত হয়। এখানকার এই 'এগেরা' কলিয়ারীতে প্রকাণ্ড একটা গাছের গুঁড়ি পাওয়া গেছে—যার খানিকটা কয়লা হয়েছে, আর খানিকটা তখনও হয়নি। সেই গাছের গুঁড়িটাকে সেই অবস্থাতেই তুলে নিয়ে গিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে কলকাতার মিউজিয়ামে।

নজরুল কলকাতা কখনও দেখেনি। দেখবার আগ্রহ আছে অথচ সঙ্গতি নেই। আমাকে বললে, কলকাতা যাবে একবার? তুমি তো ইচ্ছে করলেই যেতে পারো।

তা পারি। রাণীগঞ্জ থেকে কলকাতা বেশি দূরে নয়। ট্রেনের ভাড়াও যৎসামান্য। সেখানে আমাদের থাকবার খাবার জায়গাও আছে। আমার মাতামহ রায়সাহেব তখনও তাঁর নিজের বাড়ী কলকাতায় তৈরি করেননি। উখরার জমিদারদের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা যথেষ্ট। দুকিয়া হাঁটে তাঁদের বাড়ীতেই উঠি, কোথাও কোনও নিষেধবারণ নেই।

নিষেধবারণ যদি কিছু থাকে তো আছে এইখানে—রাণীগঞ্জের বাড়ীতে।

রায়সাহেবের কানে যদি কেউ তুলে দেয় তাহলেই মুস্কিল। নইলে শনিবার গিয়ে যদি সোমবারে ফিরে আসি তাহলে তিনি খোঁজও নেবেন না—ছেলেটা আছে না মরে গেছে।

তাই ঠিক হলো। অণ্ডাল গ্রামে গিয়ে দিদিমার কাছ থেকে দশ-পনেরোটা টাকা নিয়ে আসবো, তারপর একদিন নজরুল আর আমি চুপিচুপি চড়ে বসবো—হাওড়া যাবার ট্রেনে।

এমন সময় মোটরের হর্ণের শব্দে সচকিত হয়ে তাকিয়ে দেখি—রাস্তার ওপর একখানা ছত্রখোলা মোটর গাড়ী এসে দাঁড়িয়েছে।

মোটর চালাচ্ছিল একজন সাহেব। আমাদের দিকে তাকিয়ে হাতের ইশারায় আমাদের ডাকছে।

তখনকার দিনে মোটরগাড়ীর এত ছড়াছড়ি ছিল না। মোটর দেখলেই ছুটে দেখতে যেতাম। শুধু পেট্রোলের জোরে কেমন করে চলছে বুঝতে পারতাম না।

সেদিনও উঠে গিয়ে দাঁড়ালাম গাড়ীর কাছে। ঝকঝকে নতুন গাড়ী। অনেক দূর থেকে আসছে বোধহয়। গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের রাঙা ধুলো লেগেছে তার সর্বাঙ্গে।

সাহেব ইংরেজিতে কি যেন বললে। তার এক বর্ণও বুঝলাম না।

ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসের ছাত্র। ইংরাজি বই পড়ি, কিন্তু খাস্ ইংরাজের মুখের কথা বোঝবার ক্ষমতা তখন আমাদের নেই।

নজরুল তাকাচ্ছে আমার দিকে, আমি তাকাচ্ছি তার দিকে।

সাহেবের পাশে প্রৌঢ়া যে মহিলা বসেছিলেন তিনি বুঝতে পারলেন সাহেবের কথা আমরা বুঝতে পারছি না।

তিনি তখন গাড়ীর দরজা খুলে নামলেন গাড়ী থেকে।

পেছনের সিটে কমবয়সী যে মেয়েদুটি বসে ছিল তারা তখন ফিক্ ফিক্ করে হাসছে। প্রৌঢ়া মহিলাটি বোধ হয় তাদের মা।

কটমট করে মেয়েদের দিকে তাকিয়ে হাসতে নিষেধ করলেন। সেটুকু বেশ বুঝতে পারলাম। তারপর আমাদের কাছে এগিয়ে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে পরিষ্কার বাংলায় বললেন, ছেলেসকল। এক্সকিউজ্ মি টু ডিস্টার্ব ইউ। এসেন্‌সোল্।

তাঁর বাংলা শুনে নজরুল তো হেসেই খুন।

'ছেলেসকল' কি রে বাবা!

আমরা দুটি ছেলে হলাম গিয়ে—boys—মানে 'ছেলে সকল'।

ভদ্রমহিলা বললেন, এ হাসিটেছে কেনো?

—তোমার বাংলা শুনে হাসছি ঠাকরুণ। বললে নজরুল

মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এ কী বলে?

আমি বললাম, ও বলছে—এটা আসানসোল যাবার রাস্তা নয়। আপনারা ভুল করেছেন।

নজরুল বললে, যে-পথে এসেছো আবার সেই পথে ফিরে যাও। এটা ভুল পথ।

ভেবেছিলাম বাংলা-জানা মেমসাহেব এবার বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু না, কিছুই বুঝেননি। বরং উল্টো বুঝেছেন।

আজও আমার মনে আছে—কী বিপদেই-না পড়েছিলাম সেদিন।

আমি যত বলি—আপনাদের ভুল হয়েছে, উনি তত বলেন, নো। ভুল আমার হইটে পারে না।

তাঁর সে কী রাগ!

তাঁর রাগের কারণটা যে কি তা আমিও প্রথমে বুঝতে পারিনি, পরে বুঝলাম। ভদ্রমহিলা ভেবেছিলেন, আমি বুঝি তাঁর বাংলাভাষার ভুলের কথা বলছি।

তাঁরও দোষ নেই। যতই তিনি উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, ওদিক থেকে গাড়ীর পেছনের সিটের মেয়েদুটো খিল্ খিল্ করে হাসতে থাকে, আর এদিক থেকে নজরুল তার দুর্বোধ্য বাংলায় নানারকম টিপ্পনি কাটে।

শেষে অতি কষ্টে প্রাণটা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে ইংরাজিতে মেম-সাহেবকে বুঝিয়ে দিলাম—ইউ হ্যাড্ কাম ফিফটিন মাই মিনিটেক্। ইট্ ইজ আওয়ার রাণীগঞ্জ, নট্ ইওর আসানসোল।

নজরুল বললে, ইউ হ্যাড্ টু গো ব্যাক্ এণ্ড্ ক্যাচ্ গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড।

আবার আর-এক বিপদ!

কোথায় গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড? কোন্ দিকে? অথচ সেই রাস্তা ধরেই তাঁদের আসতে হয়েছে। হাত বাড়িয়ে আঙুল বাড়িয়ে রাইট্ বলে লেফ্ট্ বলে এদিকে ঘুরে ওদিকে ঘুরে কিছুতেই যখন তাঁকে বুঝিয়ে দিতে পারলাম না, মেম-সাহেব নিজেই তখন তার মীমাংসা করে দিলেন। হাত ধরে আমাদের দু'জনকে তুলে নিলেন গাড়ীতে। পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ঠিক রাস্তাটা ধরিয়ে দিয়ে আসতে হবে।

মেমসাহেব পেছনে গিয়ে বসলেন তাঁর মেয়েদের সঙ্গে। আমাদের বসতে হলো সুমুখের সিটে—সাহেবের পাশে।

মোটরকারে বসতে পেরেছি—আমাদের সে কী আনন্দ!

গাড়ী ঘুরিয়ে নেওয়া হলো।

ধীরে ধীরে দিনের আলো নিবে যাচ্ছে। শহরের পথে কেরোসিনের আলো জ্বলেছে। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড সেখান থেকে খুব কাছে নয়। অনেকখানি পথ।

যাবার সময় মোটরে গেলাম, কিন্তু ফিরবো কেমন করে?

নজরুলকে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করতেই সে বললে, পায়ে হেঁটে।

বললাম, অনেক রাত্রি হয়ে যাবে।

নজরুল বললে, হোক্ না।

বললাম, তুমি তো বলে দিলে হোক না। তোমার কি! তোমাকে কেউ কিছু বলবে না। রাত্রি হলে আমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

নজরুল বললে, তাহ'লে অতদূর গিয়ে কাজ নেই।

পরোপকার করতে গিয়ে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড থেকে রাণীগঞ্জ শহর পর্য্যন্ত হেঁটে আসা সত্যিই এক বিড়ম্বনা।

গাড়ী থেকে নামবার ইচ্ছা ছিল না তবু কিভার রোডের ওপর খাঁড়গুলির কাছে গাড়ী থামাতে বললাম।

মেমসাহেবকে বললাম, এবার এই রাস্তা ধরে আপনারা সোজা চলে যান। যে রাস্তায় গিয়ে পড়বেন সেইটেই গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। তারপর সোজা বাঁদিকে চলে যাবেন। যেখানে দেখবেন রাস্তার দুপাশে বড় বড় বাড়ীঘর দোকান-পসরা হাট-বাজার সেইটেই আসানশোল।

সাহেব বুঝলেন না, কিন্তু মেমসাহেব বুঝতে পারলেন।

আমরা নামলাম গাড়ী থেকে।

তখন আমরা ইস্কুলের ছাত্র। তারপর পরাধীন দেশ। ইংরেজ জাতটার ওপর খুশী নই আমরা। তখন বুঝতে পারিনি, কিন্তু এখন বুঝছি জাতি হিসেবে ইংরেজ খুব ভদ্র। গাড়ী থেকে আমাদের নাবিয়ে দিয়ে অনায়াসে তারা গাড়ী ছুটিয়ে চলে যেতে পারতো। আমরা কতটুকু উপকারই বা করেছি তাদের! তাদেরই গাড়ীতে চড়ে পথটা তাদের শুধু চিনিয়ে দিয়েছি।

এই কৃতজ্ঞতার ঋণটুকু তারা পরিশোধ না করে দিয়ে সেখান থেকে নড়লো না। সাহেব, মেম-সাহেব, এমন কি তাদের সেই মেয়েদুটিও নামলো গাড়ী থেকে। তারপর প্রত্যেকে আমাদের হাতে হাত দিয়ে হ্যাণ্ডশেক্ করে বললে, থ্যাঙ্ক ইউ।

ভদ্রমহিলা কিন্তু শুধু হ্যাণ্ডশেক্ করেই ক্ষান্ত হলেন না। আমাদের দুজনের দুটি হাত জড়িয়ে ধরে আবেগকম্পিত কণ্ঠে বললেন, সত্ প্লেস্ ইউ মাই চাইল্ড্।

তারপর জনবিরল সেই পথের ওপর দিয়ে অন্ধালোকিত সন্ধ্যার অন্ধকারে গাড়ীখানি অদৃশ্য হয়ে গেল। জীবনে আর কোনোদিনই তাদের সঙ্গে দেখা হবে না জানি। ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভাষা, সম্পূর্ণ অপরিচিতা অনাত্মীয়া এই ইংরেজ মহিলা। তবু সেই মুহূর্তটি অবিস্মরণীয় হয়ে আছে আমার জীবনে।

• • •

বলিদানের ঢাক-ঢোল বাজুক আপিসে, বাজুক আদালতে—বাজুক বন্দীদের শিকলের ঝঙ্কারের সঙ্গে তাল রাখিয়া। মরুক সকলে গলদ্‌ঘর্ম হইয়া শুষ্কতালু লইয়া লাগাম কামড়াইয়া রাস্তার ধূলার উপরে। কিন্তু কবির বীণায় বারবার বাজিবে—আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে—কবির ছন্দে এই মন্ত্রের উচ্চারণ শেষ হইবে না—Truth is beauty, Beauty truth—ইহাতে আপিস-আদালত স্কুল-কলেজ লাঠি হাতে তাড়া করিয়া আসিলেও সকল কোলাহলের উপরে এই সুর বাজিবে—সমুদ্রের সঙ্গে, অরণ্যের সঙ্গে, আকাশের আলোক-বীণার সঙ্গে সুর মিলাইয়া বাজিবে—যাহা কিছু সমস্তই পরিপূর্ণ আনন্দের দিকেই চলিয়াছে, ধুঁকিতে ধুঁকিতে রাস্তার ধূলার উপরে মুখ থুবড়াইয়া মরিবার দিকে নহে।

—রবীন্দ্রনাথ

আমাদের ঘরের আশে-পাশে এবং ঘুরে পৃথিবীর নানাস্থানে এমন সব ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছে যা উপন্যাসের বৈচিত্র্যকেও হার মানায়। তাদের মধ্যে আছে, হিংসা, পাশবিকতা, ক্রুরতা, ছলনা, আবার মানবিক আবেদন, জীবনের মহত্তম প্রকাশ। সেই সঙ্গে কৌতুকপ্রদ কাহিনীরও অভাব নেই। খবরের অন্তরালে যে কাহিনী তা আমাদেরই জীবনের প্রতিক্রিয়া, তাই তাদের প্রতি পাঠকদের স্বাভাবিক আকর্ষণ। আমরা এই বিভাগে দেশ-বিদেশের তথ্যনির্ভর সত্যঘটনার বিবরণ তুলে দেব, যা আশাকরি পাঠকদের আনন্দ দেবে।

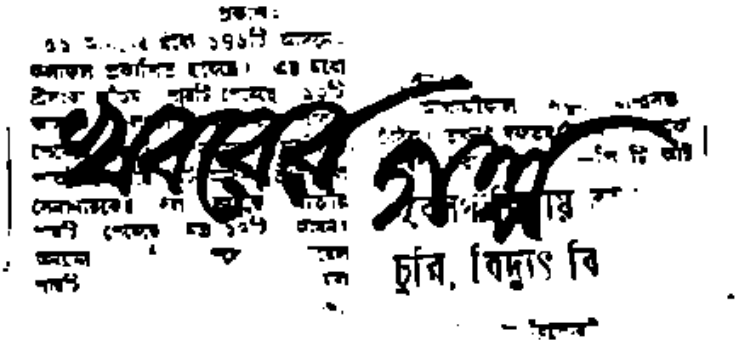

একটি অভিনেত্রী। মুঠোয় তার দেহবল্লরী, রেখায় রেখায় যৌন-আবেদন। তাকে খুন করা হল। শুধু খুন করেই হত্যাকারীরা তৃপ্ত হল না। তার দেহকে কেটে টুকরো টুকরো করে পুড়িয়ে নৈবেদ্য দেওয়া হল গুরুর চরণে।

পিশাচ-সাধনায় সেই গুরু নাকি সিদ্ধিলাভ করেছে। অদ্ভুত তার সম্মোহনী শক্তি। তার কাছে গেলে কেউ আর ফিরতে পারে না, বিশেষ করে মেয়েরা। সময় সময় এই রকম "গুরু" আর তার প্রতি অন্ধ-ভক্তি যে কী সাংঘাতিক ব্যাপারের সৃষ্টি করে, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে তারই এক বীভৎস কাহিনী এসেছে।

গুরুর নাম চার্লস ম্যানসন। বয়স পঁয়ত্রিশ। তার অনেকগুলি চেলা। তার মধ্যে তিনটি মেয়ে, সুসান অ্যাটকিনস, লিন্ডা কাসাবিয়ান, প্যাট্রিসিয়া ইনকেল, এবং একটি পুরুষ চার্লস ওয়াটসন, গ্রেপ্তার হবার পর বলেছে, গুরুর সম্মোহনী শক্তির প্রভাবে তাদের কোন জ্ঞান ছিল না, সম্মোহিত অবস্থায় তারা শারন-টেট নামে অভিনেত্রীটিকে এবং আরও ছ'জনকে খুন করেছে। কেন খুন করেছে? তা তারা নিজেরাই জানে না। তবে গুরু বলেছে, অবলীলাক্রমে মানুষ খুন করবার মতো মানসিক ও স্নায়বিক শক্তি অর্জন করতে পারলে, যোগসাধনায় তাড়াতাড়ি সিদ্ধিলাভ করা যায়।

গুরু ম্যানসনকেও ধরা হয়েছে। শিগগিরই বিচার শুরু হবে। পরবর্তী সংখ্যায় সেই বিচারের চমকপ্রদ কাহিনী আপনাদের শোনাবো আশা করছি।

• • • •

তিনটে হিংস্র গুণ্ডা আর একটি মেয়ে। গুণ্ডা তিনটে লালসায় কামনায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। ঐ মেয়েটাকে তারা আজ উপভোগ করবে। তাই তাকে ধরে এনে একটা জনশূন্য বাড়িতে তুলেছে। আমেরিকার কুখ্যাত টেক্সাস অঞ্চলের এক ঘটনা।

কিন্তু গোল বাধল গুণ্ডাদের মধ্যে—কে আগে তাকে ভোগ করবে তাই নিয়ে ঝগড়া লাগলো। এ বলে আমি আগে, ও বলে, না, আমি আগে, তৃতীয়জন সবে সবে হুঙ্কার ছেড়ে বললে, আমি সব আগে। এই বলে সে মেয়েটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর যায় কোথায়! পিছন থেকে একটা গুণ্ডা তার পিঠের উপর লাফ দিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মরণ চিৎকার! ছুরির ঘায়ে প্রথম গুণ্ডা খতম। তারপর আর দু'জনের মধ্যে লাগল তুমুলতর লড়াই। একজন মারা পড়ল, অন্যজন মৃতপ্রায় হোয়ে গোঙাতে লাগল। শিরিণ ওয়েলস নামে অপরূপা মেয়েটি সেই ফাঁকে পালাল এবং থানায় গিয়ে খবর দিল।

• • •

খেলার জগতেও যৌন-উচ্ছৃঙ্খলতা, পুরুষ ও মহিলা প্রতিযোগিদের অবৈধ আসঙ্গ লিপ্সা, অশ্লীল সম্ভাষণ বিনিময়। এরকম অদ্ভুত ব্যাপার আর কখনো কোথাও ঘটেনি। আর ঘটেছে খাস ইংলণ্ডে। এবছর নবম কমনওয়েলথ ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হচ্ছে ইংলণ্ডের এডিনবরা শহরে। বহু দেশের হাজার হাজার পুরুষও মহিলা প্রতিযোগী সেখানে গিয়ে জড়ো হয়েছে। তার মধ্যে ইংলণ্ডের দলের শিবিরে যাচ্ছেতাই সব কাণ্ড। ইংলণ্ডের প্রতিযোগীদের শিবিরের দুটি অংশ। এক অংশে পুরুষ প্রতিযোগী, অন্য অংশে মহিলা প্রতিযোগীদের থাকবার ব্যবস্থা। মধ্যে একটি আট ফুট কাঁটা তারের বেড়া। বেড়ার ধারে প্রহরী সারাক্ষণ পাহারারত।

এদিকে দেখা গেল ইংলণ্ডদলের যেসব প্রতিযোগীরা কাছাকাছি হোস্টেলে ছিল তাদের ঘরের জানলায় দরজায় নানা রকমের অশ্লীল মুখোশ দেখা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, পুরুষরা যখন দেখল যে মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করা যাচ্ছে না, তখন তারা স্লোগান ছাড়তে লাগল! কী সে সব স্লোগান শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়, "এখানে যৌন পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে, চলে এসো এদিকে", "যৌন আবেদন—এ আবেদন ধরা করে প্রাণ খুলে সাড়া দাও।" অশ্লীল স্লোগান ছাপা যায় না!

মেয়েরাও কম যায় না, তারা উত্তর দিতে লাগল, "এখানে মরদদের জন্যে কর্মখালি আছে", "লড়াই চাই না, প্রেম চাই," "আমাদের দরজা খুলে রেখেছি……"!

ইংলণ্ড দলের ম্যানেজার রিচার্ড হিংকস ভারী বিপন্ন বোধ করছেন! "পুরুষ আর মহিলাদের যৌন বিনিময় যে প্রস্রাবাগারের অশ্লীল দেওয়াল-লিপিকেও হার মানালো," লণ্ডনে বলেছেন তিনি।

শুধু পুরুষ প্রতিযোগীদের সঙ্গে অশ্লীল স্লোগান বিনিময় করেই ক্ষান্ত নেই ইংরেজ মেয়ে-প্রতিযোগীরা, তারা তাদের পরণের স্কার্ট-এর ঝুল নিয়েও মহা আপত্তি তুলেছে। তাদের স্কার্টের ঝুল হাঁটুর দু'ইঞ্চি উপরে, কিন্তু তাতে তারা সন্তুষ্ট নয়, তারা বলছে, আরও দু'ইঞ্চি ঝুল কমাতে হবে। অস্ট্রেলিয়ার মেয়েরা যদি মিনি-স্কার্ট পরে নামতে পারে, ইংলণ্ডের মেয়েরাই বা পারবে না কেন, মিনি স্কার্ট-এর জন্মই তো ইংলণ্ডে। কর্তৃপক্ষের কাছে এও এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

একদিন খবর রটে গেল, কমনওয়েলথ ক্রীড়াগ্রামে মহিলা-শিবিরের চারিধারের বেড়া ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়েছে। এক হাজার পুরুষ প্রতিযোগী চেষ্টা করছে বেড়া ভেঙে ফেলবার!

রাত দশটা থেকে ক্রীড়াগ্রামে কারফিউ চলছে। পুরুষ প্রতিযোগীরা, বড় দরজার যেখানে প্রহরী মোতায়েন, সেদিকে না গিয়ে অন্য ধার দিয়ে বেড়ার কাছে গিয়ে সুড়ঙ্গ খুঁড়তে শুরু করে দিয়েছে, এখবর পেয়ে কর্তৃপক্ষ তো স্তম্ভিত! প্রহরীদের প্রধান অফিসার জন শেফার্ড কর্তাদের কাছে গিয়ে আর্তস্বরে বললে, "কী করব এখন! ওরা সুড়ঙ্গ কাটছে। একটা গর্ত সকালবেলায় বুজিয়েছি।"

কর্তারা হুকুম দিয়েছেন, "কুকুর নিয়ে এলে পাহারা বসাও, তালকুত্তা নিয়ে এলে ছেড়ে দাও, তাহলে ওরা জব্দ হবে।"

খেলাধুলার আদর্শে নৈতিক চরিত্রটাই সবচেয়ে বড় কথা। খেলাধুলার মাধ্যমে নৈতিক চরিত্র গঠিত হয় এই ছিল এতদিনের আদর্শ—সারা জগতে। ইংলণ্ডের এডিনবরা শহরে কমনওয়েলথ ক্রীড়ায় সে আদর্শ ধূলিসাৎ হল।

• • • •

চোরা কারবার! শুনলেই যেন মনে হয় আমাদের দেশের কথা। মানে, আমাদের দেশে ওই কথাটা এতই চালু। কিন্তু ঐ কারবার পৃথিবীর কোথায় নেই বলতে পারেন? চোর ধরে ধরা পড়েছি শুধু আমরাই। মেক্সিকোয় যে বিশ্ব ফুটবল খেলা হয়ে গেল সেখানকার টিকিটের চোরা কারবার কাগজে পড়ে মনে হল, আমরা তো তাদের কাছে শিশু! এই বিশ্বকাপ ফুটবলের খেলা দেখবার জন্যে সারা মেক্সিকো যেন পাগল হয়ে গিয়েছিল। আর সেই সুযোগে টিকিটের কী চোরাকারবার। প্রথম দিনের খেলার বৃষ্টির মধ্যেই কালোবাজারিরা চালোয়া কারবার করেছে। কড়া শাস্তি, পুলিশের কড়াকড়ি কিছুই তারা গ্রাহ্য করেনি। সেদিনকার খেলা দেখবার জন্যে টিকিটের দাম ছিল ১৭০ টাকা। চোরাকারবারে সেই টিকিটের দাম উঠেছিল ৩৭৫ টাকা। আজটেক্ স্টেডিয়মে ফাইন্যাল সমেত সব কটি খেলা দেখবার জন্যে একটি সীজন টিকিটের সরকারী মূল্য ছিল ১৬৫০ টাকা। এক বৃদ্ধা মহিলা সেই টিকিট বিক্রয় করলেন ৩৭৫০ টাকায়। চতুর্দিকে সশস্ত্র পুলিশ চোরাকারবার দমন করবার জন্যে ছুটছে, ধরা পড়লে ৬০০০ টাকা অর্থদণ্ড এবং দু' সপ্তাহের জন্যে শ্রীঘরবাস, কিন্তু তার তোয়াক্কা না করে চোরাকারবারিরা নির্বিঘ্নে তাদের ব্যবসা চালিয়ে গেল! আজব ব্যাপার শুধু আমাদের দেশেই ঘটেনা।

• • • •

সোহাটি পশুশালার কর্তৃপক্ষ ৬১০ টাকা দিয়ে এক গ্রামবাসীর কাছ থেকে একটি ছাগল কিনেছিলেন। ছাগলটি এক দুষ্প্রাপ্য জাতের, একমাত্র গারো পাহাড়েই সেরকম ছাগল দেখা যায়। ছাগলটিকে পশুশালায় আনা হল। কে একজন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিলে, ছাগলটি খেনো মদ খেতে ভালবাসে। ব্যস। কর্তৃপক্ষ তাকে খেনো খাওয়াতে লাগলেন। কথায় বলে, ছাগলে কি না খায়! ঘাস আর ছোলার সঙ্গে অঢা-বন্ধন পরমানন্দে কাঁহন সেবন করতে লাগল। কিন্তু বেশিদিন গেল না। মাসখানেকের মধ্যেই সে তার ছাগলীলা সম্বরণ করল। ময়না তদন্তে জানা গেল, মদ খাওয়ার ফলে ছাগলটির যকৃত নষ্ট হওয়ায় তার এই অকাল মৃত্যু! পশুশালার কর্তৃপক্ষের বুদ্ধির মুখে ঝাঁটা! কে না কে এক দুষ্টবুদ্ধি লোক বললে যে ছাগলটা মদ খায়, আর কর্তৃপক্ষ কোন কিছু না ভেবে, না পরীক্ষা করে বেচারা বোবা ছাগলটাকে মদ গেলাতে লাগলেন! হয়ত ভেবেছিলেন, তাঁদের পেটে যখন সয় তখন ছাগলটার পেটেই বা সইবে না কেন!

• • • •

"আমি অনেক প্রতারক দেখেছি, কিন্তু এই আসামীর মধ্যে যে মূর্তিমান প্রতারক দেখতে পেলাম এমন আর কখনো দেখিনি। সে বলেছে, সে নাকি স্কুল মাষ্টারও ছিল। অন্যান্য সাক্ষীও তাই বলেছে। আমার শুধু এই প্রার্থনা, ভগবান আমাদের এইরকম দুর্নীতিপরায়ণ, দুষ্টপ্রকৃতি ও অসৎ স্কুল মাষ্টারের হাত থেকে রক্ষা করুন।"

কথাগুলি বলেছেন হাওড়া জেলার খালসানি গ্রামের মদ শ্রীজ্যোৎস্নাকুমার মিত্র একটি প্রতারণা

মামলার রায় দেবার সময়। সেই মামলার আসামী ছিল ভবতারণ সাঁতরা, স্থানীয় ব্রাঞ্চ স্কুলঘরের পোষ্ট মাষ্টার এবং স্কুল-শিক্ষক। তার বিরুদ্ধে তেরোটি তছরুপের প্রমাণ পাওয়া গিছল এবং বিচারে প্রতি অভিযোগ পিছু চার বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড এবং দু'হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ছ'মাস করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে সেই মহাপুরুষ-প্রভাসককে।

একজন ভবতারণ ধরা পড়ে সাজা পেল কিন্তু আরো কত ভবতারণ দিব্যি মনের আনন্দে আছে তার হিসেব কে রাখে! দেশে আজ অসংখ্য ভবতারণ! তাই ভাবছি ভগবান কি তাদের সবাইকার হাত থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারবেন।

• • • •

সুদূর অনন্তপুরে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জেনে যুগপৎ আনন্দিত ও শংকিত বোধ করছি! সেখানকার হাওয়া এখানেও যে আসবে না তার নিশ্চয়তা কি! সেখানকার মাদাকাস্থরা তালুকের এক গ্রামে শুধু মহিলাদের নিয়ে পঞ্চায়েৎ গঠিত হয়েছে। পঞ্চায়েতের পাঁচটি আসনেই পাঁচজন মহিলাপ্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। পুরুষেরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না স্থির করেছেন। কেন করবেন না, খবরে তা বলা হয়নি। কিন্তু আমরা জানি। সেখানে আজকাল সমার্জনী খুব চলছে, অন্তর মহলে পর্যন্ত সেরাও সেঁধিয়েছে, সেখানকার পুরুষদের জীবনে বড় দুর্দিন ঘনালো, তাতে আর সন্দেহ নেই।

• • • •

কী অব্যর্থ লক্ষ্য লোকটির! একটু এদিকে ওদিকে নয়, ঠিক কপালের মাঝখানে এসে লাগল ডিমটা, আর তার লালা গড়িয়ে পড়ল, লালা মুখে, বুকে, পরিচ্ছদে।

ইংলণ্ডের গত নির্বাচনে লণ্ডনের উত্তর সহরতলীতে ইংলণ্ডের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী স্যারলড্ উইলসন নিজের শ্রমিক দলের পক্ষে ভোট সংগ্রহের জন্যে অভিযানে বেরিয়ে এক সভায় বক্তৃতা দেবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছেন এমন সময় খুব কাছ থেকেই একটি ডিম এসে লাগল তাঁর কপালে! যে ডিম ছুঁড়েছিল সে পালালো না। বললে, তার নাম, রিচার্ড ওয়্যার। বয়স বাইশ। সে বললে, 'প্রধান মন্ত্রী বলেছেন, প্রতিবাদ জানাবার অধিকার সকলেরই আছে। তাই আমি আমার প্রতিবাদ জানালাম।'

ধরবার পাত্র নন উইলসন সাহেব। রুমাল দিয়ে মুখ মুছে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বললেন, শ্রমিক দল যদি নির্বাচনে হেরে যায়, তাহলে আপনারা জানবেন, লোকের আর ডিম খাবার পয়সা জুটবে না, ডিম ছুঁড়ে মেরে পয়সা বরবাদ করা তো দূরের কথা।

ডিমাবলেপনের ফলে সেদিন উইলসন সাহেব শাপে বর পেয়েছিলেন, ভারী জোরালো বক্তৃতা দিয়ে আসর মাৎ করেছিলেন তিনি। দুষ্ট লোক কিন্তু নাকি বলেছে, ওটা একটা সাজানো ব্যাপার। তা বিচিত্র কিছু নয়। ফুট বুদ্ধিতে ইংরেজের তুল্য আর কে আছে? কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেন নি উইলসন সাহেব নির্বাচনে তাঁর দল জিততে পারেনি, তাই তাঁকে প্রধান মন্ত্রীর গদি ছাড়তে হয়েছে।

———

◀এই প্রথম▶

[গল্প-ভারতীতে 'এই প্রথম' পর্যায়ে আমরা সম্ভাবনাপূর্ণ নবাগত লেখক-লেখিকাদের রচনা আজ বহুদিন ধরে ছেপে আসছি। নূতন লেখক সৃষ্টি করা সাহিত্য-পত্রিকার একটি বিশেষ কর্তব্য। এই ভাবে ভাবান্বিত হয়েই আমরা এই অধ্যায়টির সূচনা করি। সত্যই যাঁদের প্রতিভা আছে, সুযোগ সুবিধা পেলে যাঁরা একদিন সুনাম ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবেন তাঁদের রচনা পাঠকদের সামনে তুলে ধরে তাঁদের উৎসাহ দান করাই আমাদের উদ্দেশ্য। পৃথিবীর সর্বত্রই এমনি করে নূতন লেখক তৈরী হয়ে থাকে। একদিন এইসব নূতন লেখক লেখিকা যে প্রথম সারিতে স্থান পাবেন তা কে বলতে পারে। লেখকদের কাছে আমাদের অনুরোধ, রচনা পাঠাবার সময় 'এই প্রথম' এই কথাটির যেন উল্লেখ করেন এবং নিজের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি জানিয়ে দেন, কেন না পাঠকদের এইসব জানবার বিশেষ কৌতূহল হয়।]

সম্পাদক—গল্প-ভারতী

দুই প্রেমিকের এক প্রেয়সী

অশোক বর্মা

আমি ভালোবাসতাম রমিতাকে আর রমিতা ভালোবাসতো পরেশকে।···

আমি, রমিতা ও পরেশ ছোটবেলা থেকে একই সাথে পড়েছি, খেলেছি, জেবেছি এমন কি গানও গেয়েছি। রমিতার রসিকতা, স্পষ্টবাদিতা ও সরলতার প্রশংসা ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি। রমিতা সদা-সর্বদা পরেশের গুণ কীর্তন করতো আমার সামনে আর আমি রাগে, দুঃখে জ্বলতাম। আমার কপোলে রক্তিম আভা ফুটে উঠলে রমিতা হয়তো, কটূক্তি করতো—যার গুণ আছে প্রশংসা তার প্রাপ্য।

ক্রমে আমরা বড় হ'লাম। পরেশ ও আমি হাফ প্যাণ্ট ছেড়ে ফুল প্যাণ্ট, রমিতা ফ্রক ছেড়ে শাড়ী পরলো। রমিতা সংযত হলো, পরেশ উদাসী, আমি চঞ্চল।

আড়ালে আবডালে রমিতাকে পাওয়ার, একান্তে তার সাথে দু'চারটা কথা বলার প্রবল স্পৃহা আমাকে সারাক্ষণ বিচলিত করে রাখতো। আমার এই আকুলতা রমিতার চোখে ধরা পড়েছিলো ঠিকই।

রমিতা ছোটবেলা থেকেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালবাসতো। বিশেষ পছন্দ ছিলো তার সাদা ধবধবে। তার ঘরের দেয়ালে সে নিজে উপস্থিত থেকে চুণকাম করাতো, সাদা কাপড় পরতো।

একদিন ঠাট্টা করতে গিয়ে রমিতার মনে আমি দারুণ আঘাত দিয়েছিলাম।

—তুমি বিয়ের পর বিধবা হবে, রমিতা।

কেন? রমিতার আশ্চর্য প্রশ্ন।

—সাদা যে এত পছন্দ তোমার!

সেদিন দেখেছিলাম রমিতার চোখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, তার মার কঠিন পাথর মুখ আর পরেশের চোখে ঘৃণা।

রমিতা আঘাত সামলে নিয়ে, স্মিত হেসে বলেছিলো—আমি যদি তোমায় বিয়ে করি?

—বালাই ষাট। গর্জে উঠেন রমিতার মা।

জীবনের এক ধাপ শেষ করে অন্য ধাপে পা ফেলে চলে আসতে হয় দূর বিদেশে। পরেশও কোথায় যেন চলে গেলো, খবর রাখি নি। ইচ্ছে করেই পত্রালাপ করিনি। না করলেও গ্রামের কথা, বন্ধু-বান্ধবের কথা, পরেশের কথা, বিশেষ করে রমিতার কথা অবসর মুহূর্তেই মনে পড়তো। হৃষিকেশ একদিন কোন্তে একটিচি লেখেছিলো—পরেশ ও রমিতা জমিয়েছে খুব, পত্রে প্রেমালাপ হরদম।

সে রাতে আমার ঘুম হ'লো না। হঠাৎ আমি শিউরে উঠতে থাকি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, হে ঈশ্বর! আমার রসিকতা যেন কোন দিন সত্য না হয় প্রভু। রমিতার রাঙা বধূ-বেশ চিন্তা করতেই তার বৈধব্য-রূপ এসে আমার চোখের সামনে দাঁড়াতে লাগলো। আমি অসহায়ের মত বিছানায় পড়ে বাতি নিভিয়ে দিয়ে কেঁদেছিলাম।

গ্রামে ঢুকতেই শুনি, হৃষিকেশ বললো - তুইও এলি! পরেশ শালা দারুণ ধোঁকা দিয়েছে। রমিতা কেঁদেছিলো খুব। বিয়ে হচ্ছে দিল্লীতে। জামাই উচ্চপদে সরকারী চাকুরে।

বিয়ের দিন খেটেছিলাম খুব। রমিতার সাথে কথা বলার খুব ইচ্ছে হতো। তাকে দু'এক বার কাজের ফাঁকে দেখেওছিলাম। খুব বিষণ্ণ। ভাবলাম, বিয়ের দিন মেয়েদের এ অবস্থা স্বভাবতই হয়ে থাকে।

সন্ধ্যায় একটি টেলিগ্রাম পেয়ে রাতের ট্রেনেই রওয়ানা হতে হয়েছিলো আমাকে। যাবার আগে রমিতা একবার ডেকে পাঠালো। আমি গেলাম। রমিতা কিছু বলতে পারলো না। আবেগে তার ঠোঁট কাঁপলো শুধু; চোখ থেকে জল ঝরলো।

—আমি এবার আসি তা হ'লে। আমার গলা বন্ধ হয়ে এলো।

ফিরতেই রমিতা আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো। মুহূর্তে রমিতার প্রতি আমার সেই রসিকতার কথাটি মনে পড়লো। আমি সঙ্কুচিত হ'লাম। রমিতার চোখের জলে আমার বুক ভিজলো। রমিতাকে বুকের মধ্যে পেয়েও তার স্পর্শে শিহরিত হলাম না।

• • • •

অনন্ত চিতার উত্তাপ আমার মুখে, চোখে, দেহে অনুভব করছি। এক একদিন রমিতার রসিকতার এ ধরনের এক আভ্যন্তরীন উত্তপ্ততা আমার মনে এক আদিম ভাবের শিহরণ জাগাতো। আজকের উত্তপ্ততা বাহ্যিক। আমার চোখের সামনে রমিতার মৃতদেহ অনন্তে মিশে গেলো। আমি অনুভব করলাম রমিতার ব্যাপ্তি আকাশে।

গভীর রাতে যখন রমিতার চিতার পাশে একা একা দাঁড়িয়ে আকাশে তার ছবি খুঁজছিলাম তখন এক সময় চেয়ে দেখি হাতে একগুচ্ছ ফুল নিয়ে ওপাশে কে দাঁড়িয়ে! চিনলাম পরেশ। উত্তেজনায় আমার শরীর কাঁপছিলো। অন্ধকারেও পরেশের চোখে জল দেখলাম। কি মনে করে পরেশকে ধরবার জন্য হাত বাড়াতেই আকাশ থেকে সাদা পর্দার মত কি একটা এসে আমাকে ও পরেশকে আলাদা করে দিলো যেন!

ওধারে পরেশের কান্না শুনলাম।

সাদা পর্দাটা রমিতার শাড়ী ছিলো কিনা বুঝতে পারিনি।

অপরাহ্নবতী

সুবোধ সিংহ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নিরুদ্ধ ও অন্ধকার রাত।

বুকের নিচে বালিশ রেখে বিছানাতে উপুড় হয়ে শুয়ে পরীক্ষিৎ ডায়েরী লিখছে। তারই পাশে সুমিত্রার নরম নিশ্বাস, একখানি ঘুমের হাত, একটুকু মেয়েলি গন্ধের মিষ্টি মিষ্টি সুবাস। তারই খালি-পিঠের গা-ঘেঁষে আষাঢ়ের মৃদু উত্তাপের মত ছড়িয়ে রয়েছে সুমিত্রার স্বল্প-ভরা যুবন্ত উচ্ছ্রিত স্তবক।

বিয়ের পরে ছমাস কেটে গেছে।

সুমিত্রাকে পেয়ে চমৎকার রূপসী ও যুবতী স্ত্রী পেয়েছে বলে পরীক্ষিৎকে এখন ভাবতে চেষ্টা করতে হয়। এই চেষ্টার মধ্যে কোথায় যেন একটা বিফলতা আঁকড়ে ধরে আছে—তাকে প্রাণপণে ছাড়াতে চাইলেও ছাড়াতে পারছে না সে।

ভাবতে চেষ্টা করে—কেন এমন হল? উত্তরও সে একটা তৈরী করেছে মনে মনে। বলিষ্ঠ পুরুষের সব রকমের কামনার অনুভূতিকে সুখী ও উত্তেজিত করে, যে-সঙ্গিনী সুন্দর হয়, সে বোধ হয় কামনা বিমুখ। আশ্চর্য রূপসী যুবতীর চেয়েও অনেক বেশী সুখকর বিস্ময়ের অনুভূতি।

নিস্তব্ধ, নিথর রাত্রির শব-ব্যবচ্ছেদ ছাড়া পরীক্ষিৎ তার মনের গূঢ় ও রহস্যময় কথা জানতে পারে না। তাই কোলাহলহীন গভীর রাতে সে তার ডায়েরী লিখতে বসে। আজও লিখতে বসেছে। গভীর রাত্রির হৃৎপিণ্ড এখন থেমে আছে। এখন লেখার ভঙ্গীতে অকৃত্রিম ও স্বচ্ছ সহজ প্রেরণা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে জেগে ওঠবার মুহূর্ত-কাল। ডায়েরীর এ-সব লেখা ওর মনের চিন্ত-নির্ঝর যন্ত্র। ও আর কারো কাজে লাগবে না। পরীক্ষিৎ নিজের ভাবনার সঙ্গে শুধু পরিচিত হতে চায়। নিজের জন্যেই লিখেছে—এমন কি সুমিত্রাকেও পড়তে দেয়নি। নিজের সে-পরিচয় দিয়ে সুমিত্রার মনে আগুন ধরিয়ে দিতে চায় না।

ছমাস আগের একটা পাতা খুলে দেখতে ইচ্ছে হল তার। সেদিনকার নতুন অনুভূতির উচ্ছ্বাসকে ছেলেমি বলে মনে হল এখন,—তবু খুব ভাল লাগল পড়তে। ভাল লাগল এই লাগামহীন উচ্ছ্বাসের মানুষটিকে। প্রতিদিনই মানুষ একটু একটু করে কত বদলে যায়,— অনেক দিনের তলাতে নিজেকেই আর চেনা যায় না।

পড়তে লাগল,—

•••সুমিত্রার সঙ্গে পরিচয় খুব অল্পদিনের। তবু যে মুহূর্ত থেকে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক হল সেই মুহূর্ত থেকে মনে হল সুমিত্রা বহু জন্মান্তরান্তরের একজন অতি পরিচিত সঙ্গিনী। কেন আমার মনে হচ্ছে আমরা দুজন সহস্র-কালের অখণ্ড ও অনন্ত বিচ্ছেদের দুঃখ পেরিয়ে আজ এসে পৌঁছেছি দূর পৃথিবীর গ্রহলোকে? দূরবর্তী স্মৃতির সমুদ্র থেকে ভেসে আসছে নীল-পুষ্পের মত জাতিস্মরের অতলস্পর্শ নতুন নতুন বিস্ময়ের অনুভূতি। যদি মিথ্যে হয়, তবুও. বড় সুন্দর লাগছে আজকের এই মিথ্যে অনুভূতি। ••• বড় দেখতে পেয়েছিলাম বহুযুগ পূর্বে এই গ্রহলোকেই,—যে-ঝড় রাত্রি শেষে উঠেছিল।

সেই ঝড় এসে ছিনিয়ে নিয়ে গেল ওকে—হারিয়ে গেল সে সে-জগতের মত। কোন মেয়ের গায়ে আগুন-ধরে-যাওয়া-শহরের টকটকে লাল শিখা কি কোনবার প্রতিফলিত হয়েছিল রোমের ইতিহাসে? সেখানে কি উন্মত্ত, অস্থির, ও প্রাণভয়ে ভীত নগরবাসীর কোন সদ্য বিবাহিত নগ্ন একটি যুবক-যুবতী চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্ষুব্ধ-ক্ষিপ্ত ও উৎকণ্ঠিত কোলাহলে চিরদিনের জন্যে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল? তাদেরই কান্নার শব্দ জন্মজন্মান্তরের পথ ভেদ করে আজ কানে এসে বাজছে? আত্মীয়তার বন্ধন সহীর্ণ হয়েছে বার বার, আর ভেঙে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে স্বপ্নে-ভরা আশা আর অস্তিত্বের সুখের মোহ। ... কখনো পাহাড়ের গা বেয়ে প্রকাণ্ড পাথরের চাপের মত তীরবেগে নেমে এসেছিল পৃথিবীর প্রাথমিক গ্লেসিয়ার, কখনো আগ্নেয়গিরির গলিত লাভা, প্লাবনের সমুদ্র কখনো। আত্মার আত্মীয়তার নিবিড়-ঘন আশ্রয় জন্মজন্মান্তরের দীর্ঘ পথ-যাত্রার বিঘ্ন-বিপদের কাছে পরাজয় স্বীকার করেনি, তাই বোধ হয় আবার দুজনে এত কাছাকাছি এসেছি। সে-দুঃখের কাহিনী সুমিত্রা হয়তো ভুলে গিয়েছে আজ। কেন আমি ভুলতে পারিনি সুমিত্রার মত? সুমিত্রা আজ নিশ্চিন্ত, শুভ্র, সুন্দর ও শান্ত। কিন্তু আমি কেন এই মিলিত যাত্রার সুখসম্ভাবনায় সুস্থির ও নিশ্চিন্ত হতে পারছি না?...

ডায়েরীর খাতটা পাশে রেখে ফিরে তাকাল সুব্রত সুমিত্রার দিকে। ছোট একটা ভীরু পাখীর মত সুমিত্রা আজ তার হাতের মুঠোর মধ্যে নিতান্ত নির্ভরে এসে আশ্রয় নিয়েছে। ফিকের ঠাণ্ডা বাতাস আরো একটু ঝনঝনে হয়ে উঠল, পায়ের কাছে ভাঁজ করা সাদা চাদরটি খুলে পরীক্ষিৎ খুব সন্তর্পণে সুমিত্রার গলা পর্যন্ত ঢেকে দিল। সাদা পাখীর নরম পালকের মত সাদা চাদরটা ওরই মমত্ববোধের স্পর্শের মত নিঃশব্দে জড়িয়ে রাখল সুমিত্রাকে। পাতলা চাদরের আচ্ছাদনে একটি সুন্দর শরীরের আকর্ষণীয় গড়ন আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠল।

ডায়েরীর খাতাটা তুলে নিল আবার। একটা পাতায় তার চোখ পড়ল,—

আমাকে বিয়ে করে সুমিত্রা কি সুখী হয়েছে? এই প্রশ্নটাই মাঝে মাঝে ওঠে। মনে হয় ও যেন আরো চায়, অনেক বেশী, কিন্তু উদ্বৃত্ত। সব মেয়েরা এমন কিনা জানি না, কিন্তু সুমিত্রার উদ্বৃত্তের ওপরেই যেন ঝোঁক বেশী,—ও যা পেয়েছে—সকলে যা পায় তার দিকে সুমিত্রার লোভ নেই বিন্দুমাত্র। স্ত্রীকে সুখী করবার দায়িত্ব কেবল স্বামীরই,—স্বামীকে সুখী করবার ভার তারও যে কিছু আছে এ-কথা সে মনে করতে পারে না। সুমিত্রা কি তা মনে করে? মনে তো হয় না। বন্ধু-বান্ধব, হৈ চৈ-এর মধ্যে সুমিত্রা কিন্তু অন্যরকম—একেবারে আলাদা মানুষ, খুব হাসিখুশি, খুব প্রাণবন্ত। তাই কি ও এখানে এসে বীর হয়ে গেছে শান্ত জলের মত? সুধীন এসে মাঝে মাঝে হানা দিতে ছাড়ে না! তখনই যেন শান্ত স্থির নদীর জল একটু উছলে উঠল, একটু ছলকে গেল। আর সব বন্ধুবান্ধবের আনাগোনা অবিশ্যি ঢের কমে গেছে। আমার ইচ্ছা ও অনিচ্ছার ইঙ্গিত খুব স্পষ্টতর হয়ে না উঠলেও আমার স্বামীত্বের স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে সুমিত্রা যথেষ্ট সচেতন। অন্ততঃ আমার তাই মনে হয়। তবু ওর সম্বন্ধে আজেবাজে কথা মনে হয় কেন আমার? সুধীনের একদিনের কথা মনে পড়ে। "এবার তো তুমিই মজা লুটবে! ভাগ্যবান ব্যক্তি! প্রথম রাত্রে স্ত্রীর সুললিত কণ্ঠস্বর শুনতে শুনতে রাত্রি প্রভাত হয়। চেহারা অথবা কণ্ঠস্বর তার যেমনই হোক তোমার মনে হবে ওর রূপ দেখে চারদিকের দেওয়াল যেন হেসে উঠছে, মনে হবে দেওয়ালে ঠেকে ওর কথাগুলো যেন গান হয়ে ফিরে আসছে। দ্বিতীয় রাত থেকেই আরম্ভ হয় ওদের ছলা-কলা, ঘুণাক্ষরে বুঝতেও দেবেনা ওরা অন্য কোন পুরুষ মানুষের সংস্রবে এসেছে। ওর সুচতুর সরলতায় মুগ্ধ হয়ে বেকুব বনবে তুমি। তৃতীয় রাতের পর থেকে সারাজীবন ধরে ওরা নানারকম ইশারা ইঙ্গিত করে তোমাকে বুঝিয়ে ছাড়বে যে তোমার চেয়ে ঢের ভাল দ্বিপদতার রূপবান পাত্র হাত ছাড়া হয়ে গেছে স্রেফ অদৃষ্টের দোষে আর বাবার একগুঁয়েমি আহাম্মকিতে।

ওর মনের এই আপসোসের ভাবটা বেশী দিন কিন্তু আর অস্পষ্ট থাকবে না—সেটা ক্রমে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর এবং তীক্ষ্ণ হতে তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠবে। এমন দিন আসতে পারে যখন স্ত্রীকে আর অবলা বলে মনে হবে না তোমার। আর সে স্ত্রী যদি তেজী আর জেদী টাইপের হয় (ইঙ্গিতটা বুঝতে খুব কষ্ট হয়নি আমার) তাহলে তাকে খাঁচায় বন্দী করে রেখে খুব বেশী সহজে পোষ মানানো যাবে না। উড়তে দিতে হবে যত্রতত্র, মনের অজ্ঞাতেই ওর পাখা হয়ে গিয়েছে। মনের দিকে ওর চোখ পড়ে আছে। মাঝে মাঝে ও উড়ে যাবে, ঘুরে এসে তোমার হাতের আঙুলেই বসবে। এতে তোমার বিশেষ কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু ওর মহা লাভ—ওর স্বাস্থ্যটি ভাল থাকবে।" ওর মজার কথা শুনে খুব হেসে উঠেছিলাম বটে কিন্তু মনটা সেদিন বিগড়ে গিয়েছিল বেশ।

কয়েকটা পাতা উল্টে গেল সে। পড়তে লাগল আর একটি তারিখের লেখা,—

সুমিত্রাকে বিয়ে করে একটি মহান দৃষ্টান্তের মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছি আমি। এমন আত্মত্যাগের কথা যেন কেউ কখনো শোনেনি। একটি পালিয়ে-যাওয়া মেয়েকে নির্বিচারে গ্রহণ করে সমাজের গার্হস্থ্য জীবনে করেছি প্রতিষ্ঠা। তার অসামান্য রূপকেই যে কেবল সার্থক করে তুলেছি তাই নয়, তার নারীত্বের সম্মান রক্ষা করেছি। নইলে সুমিত্রা হয়তো ভেসে যেতো। তুমি কি ভাগ্যের সঙ্গে ঝগড়া করে টিকে থাকতে পারো? সুমিত্রাও হয়তো পারতো না। কিন্তু আমার মত শৈবালও তো বদান্যতায় এবং উদারতায় মহৎ হয়ে উঠতে চেয়েছিল। তাকে তো সুমিত্রাই সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছে। কিন্তু শৈবালের এই মহত্বের প্রতিশ্রুতির কথা কেউ আজ আর ভাবছে না। তার কথা ভুলে গেছে সবাই। শৈবাল সকলের মন থেকে মুছে গেছে।……মুছে কি গেছে? মুছে কি যায়? সবার কাছ থেকেই কি শৈবাল একেবারে মুছে গেছে? কোনদিন—কোন মুহূর্তে, মনে কি পড়ে না ওর ইন্দ্রধনুর চোখে মোহময় আবিষ্টের শুকতারা ঊর্ধ্ব আকাশে টলমল করে জেগে উঠেছিল? ভাবতে পারে না বলেই সাধারণ মানুষ এ-বিষয়ে খুব বেশী sensitive হয়ে পড়ে। তলিয়ে দেখবার সাহস নেই কারো। একটি অবিবাহিত মেয়ের জীবনে যখন তিনটি বিশেষণ এসে ভর করে তখন তার অবস্থা খুব সাংঘাতিক ও সঙ্গীন হয়ে ওঠবারই কথা। সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী ও যুবতী—এই তিনটি বিশেষণ ঘটনাচক্রে যখন একত্রে অবস্থান করে তখন অমন অনেক অঘটনই ঘটবার সম্ভাবনা থাকতে পারে। অবিবাহিত মেয়ের প্রতিই এই তিনটি বিশেষণের জোর সাধারণতঃ বেশী। এই ধরণের মেয়েকে দেখে পুরুষের চোখে চমক লাগবে না এ-কথা ভাবা খুব সহজ নয়। ওকে দেখতে ইচ্ছে হবে তোমার, কাছে যেতে ইচ্ছে হবে, একটু নিবিড়ভাবে অন্তরঙ্গ হওয়ার জন্যে লোভও হতে পারে, ওকে লুট করে নেওয়ার জন্যে মাঝে-মাঝে তুমি ডাকাতের মত হানা দিয়ে বসতেও পারো। সে-মেয়ে কি পারে সব সময় সামলাতে? তার কি অসতর্ক মুহূর্তের কোন স্পৃহার দুর্বলতা জাগতে পারে না? স্কুলের মাস্টার না দিয়ে একটু আধটু যদি ভুল-চুক হয়ে থাকে বয়েসের দোষে তা ভুলে যেতে একেবারে না পারলেও সেয়ে যেতে খুব বেশী দেরী হবে না হয়তো। সুন্দর আর সজীব এই সুমিত্রা। ওর মন-প্রাণ নির্জীব নয়—ওর চোখের চাহনির মধ্যে বিদ্রোহ আকর্ষণের আকস্মিকতা আছে, হঠকা বাতাসের মত একটি অহেতুক হাসি ঝরে পড়ে ওর মুখে-চোখে, দুর্গম খনীর অজ্ঞাত রহস্যের মত ওর মনের পরিচিতি যেন গভীর অন্ধকারে ঢেকে আছে।

ডায়েরীটা পাশে-রেখে পরীক্ষিৎ সুমিত্রার মুখের দিকে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। আকাশ-জোড়া মেঘের মত ওর যৌবন যেন ধীরে ধীরে জমে উঠেছে এই দু-বছরের মধ্যে। আরো স্নিগ্ধ, আরো শান্ত। কিন্তু ওর এই স্নিগ্ধ ও শান্ত যৌবনে যেন একটা ভয়ের রূপ লুকিয়ে আছে। ঘনঘটার আকাশের স্তব্ধতাকে প্রদক্ষিণ করছে পরীক্ষিতের মনের একটি আশঙ্কার ছায়া। যে কোন মুহূর্তে ঝড় উঠতে পারে,—নেশা ধরিয়ে দিতে পারে যে

কোন পুরুষকে,—আর বাঁশি বাজিয়ে সম্মোহিত করে তুলতে পারে মানুষের স্বপ্নকে

হঠাৎ ঘুমের মধ্যে সুমিত্রা চিৎকার করে উঠল। অস্পষ্ট, অস্বচ্ছ, অবোধ্য কতগুলো শব্দ অসংলগ্নভাবে এলোমেলো এঁকেবেঁকে ছুটে এলো। সজাগ হয়ে উঠল পরীক্ষিতের কান। ওর মুখের কথাগুলো ক্রমেই স্পষ্ট আর পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। ওর কুমারী জীবনের স্বপ্ন ভেঙে দু-একটা কথা অর্থময় হয়ে ছিটকে এল। জানা যাবে—এখনই বুঝতে পারবে সে,—পর্দা সরে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। যে-কথা অনুক্ত হয়ে ওর গতজীবনের প্রবাহের মধ্যে লুকিয়ে আছে আজ তা ঘুমের মানুষের শিথিল পাহারা এড়িয়ে শব্দময় হয়ে উঠবে হয়তো।

স্পষ্ট হল সুমিত্রার চিৎকার,—

"ভয় কিসের ভয়? ভয় করলে কি একা তোমার সঙ্গে নৌকোতে বেড়াতে আসতাম—?"

পরীক্ষিতের আগ্রহের মুখ এগিয়ে গেল ওর আরও কাছে। কিন্তু স্পষ্ট কথাগুলো সেই মুহূর্তে থেমে গেল। অশোভন আগ্রহকে অবধা প্রশ্রয় দিতে কষ্ট হল তার—সরে এল সে। পাশ বালিশের উপর কাঁধ রেখে শুয়ে পড়ল পরীক্ষিৎ কিন্তু কিছুতেই ওর মুখ থেকে দৃষ্টি সরাতে পারল না।

আবার হঠাৎ বিড় বিড় করে উঠল ঠোঁট,—

"না না—কখনো না,—তা হতে পারে না • • • না—না—না, কিছুতেই না! কখনো নয়! • • • আর আপনাকে আমি বিশ্বাস করি না!—এর বেশী আর নয়! • • • আসবেন না! কাছে আর আসবেন না। আমি সব পারি—নদীতে ঝাঁপ দিতেও পারি।"

ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল সে! পরীক্ষিৎ আর কিছু শুনতে চায় না,—সব কিছু জানা সুখের নয়, সব কিছু শোনাও বুঝি প্রকাণ্ড বড় দুঃখের। মানুষের অজ্ঞতা মানুষকে অনেক সময় শান্তি দেয়,—সেই শান্ত সুখের শান্তির জন্যে পরীক্ষিতের মন হঠাৎ ব্যাগ্র হয়ে উঠল।

গায়ে হাত দিয়ে ছুঁয়ে ওর স্বপ্নের যন্ত্রণা থেকে ওকে মুক্তি দিতে চাইল। স্পর্শ করল ওর গা। ডাকল,—

"সুমিত্রা!"

সুমিত্রার ঘুমভাঙা ভেঙে গেল আচমকা। কাজল-টানা চোখের পাতা উল্টিয়ে দেখতে পেল পরীক্ষিতকে।

"তুমি?"

"মনে তো তাই হয়—।"

"তুমি কখন এলে?"

"তোমার কি স্বপ্ন এখনও যায় নি?"

ধড়মড় করে উঠে বসল সুমিত্রা। দিনের আলোর মত চোখ পরিষ্কার হয়ে গেল। সুমিত্রা বলল,—

"ভয়ের স্বপ্ন দেখছিলাম আমি।"

"ঘুমের মধ্যে কথা বলবার অভ্যেস আছে নাকি?"

"কেন? বলেছি নাকি কিছু?"

"অনেক কথাই বলেছ। যারা মনের কথা খুব বেশী চেপে রাখে, তাদের মন অনেক সময় বিশ্বাসঘাতকতা করে ঘুমের মধ্যে।"

"তাই নাকি?" কি বলেছি-?"

"যা তুমি বলতে চাও না,—বলনি কোনদিন,—সেই সব কথা।"

"এমন কি কথা আছে যা আমি তোমাকে বলিনি?"

"বিয়ের আগে ও-সব একটু আধটু ঘুরেই থাকে—সে-সব কথা বলা যায় নাকি কখনো—? কোন কোন মেয়ের মুখ থেকে তো একটা কথাও বার করা যায় না—খুব চালাক তারা—তোমার মত।"

"আমি চালাক—?"

"অত্যন্ত। বোকা নও মোটেই। লোকের মাথায়ও ভুল করো না তুমি, ভুল করেও সত্যিবাদী হওয়ার চেষ্টা কর না।"

"তুমি খুব আজে-বাজে ভাবো তো নিজের স্ত্রীর সম্বন্ধে! এ-সব ভাবাটাও খারাপ রোগ।"

"এই রোগ নিয়েই তো আমাদের কারবার। তাই না ভেবে পারি না। তাই না ভেবে পারি না বিশ্বাসী অনুরক্ত স্ত্রীও স্বামীকে ফাঁকি দিয়ে অবিশ্বাসের কাজ করে বসে, বিয়ের আগে স্বাধীনতার মুক্ত বাতাসে গা ঢেলে দেয়, অনেক দাদা এসে জোটে দাদার বন্ধুদের মধ্যে

থেকে, কলেজের বই নিয়ে বেনারি বন্ধরে চলে যেতে হয়, পিকনিক, ফটো তোলা, চিঠিপত্র, বেড়ানো—সবগুলোই অনুচার মনে ইতিহাস হয়ে থাকে।"

"এই সব আজেবাজে কথাই লেখ নাকি পত্রেটত্রে?"

"জীবনে তা ঘটে বলেই লিখি,—সত্যি বলেই লিখি—।"

"এতো জানো? জানলে কি করে?"

সুমিত্রার পাল্টা আক্রমণটা এড়িয়ে গিয়ে বলল,—

"ভয়ের কি স্বপ্ন দেখলে, বললে না তো!"

"বলে আর কি হবে? শুনেইছ তো সব।—কি শুনেছো—?"

"শুনবার সাহস আছে তো?"

"অন্যায় তো কিছু করিনি! শুনবো না কেন? ভয় কিসের?"

"রাগ করবে না?"

"রাগ করতে যাই কেন? আমি অত সহজে রাগ করি না,—তোমার মত।"

"তোমার একটি পূর্ব প্রণয়ের ঘটনা!—ঠিক বলিনি?"

"তা জানি না। বিশ্লেষণ করে দেখবার মত বিদ্যে-বুদ্ধি আমার নেই।—হবে হয়তো। কিন্তু ভীষণ ভয়ের স্বপ্ন। ভয়ের স্বপ্ন দেখলে বড্ড ভয় হয়।" একটু থেমে পত্রীক্ষিতের বাঁয়ালো চোখের দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে সুমিত্রা আবার বলতে লাগল,—"দেখলাম—কে যেন নৌকো থেকে আমাকে ঠেলে জলে ফেলে দিচ্ছে।"

"বুঝেছি।"

"কি বুঝলে?"

"কে ফেলে দিচ্ছে তা তুমি জানো। অথচ কিছুতেই তুমি বলবে না,—বলতে চাও না। তোমার মধ্যে inhibition-টা খুব বেশী। জীবনটা শান্তিপূর্ণ ভাবে চলবার জন্যে একটু হয়তো দরকার; কিন্তু তাই বলে কি এতখানি!—এমন দেখিনি—তাই অদ্ভুত লাগে তোমাকে।"

"এই রকম আমার স্বভাব নাকি? কেবল এই আর কিছু নেই আমার চরিত্রে?"

"তুমি খুব অদ্ভুত। অদ্ভুত অদ্ভুত বিশেষত্ব আছে তোমার স্বভাবের মধ্যে।"

চকিতে উঠে বসল সুমিত্রা।

"কি! কি! কি রকম বিশেষত্ব?"

"তুমি মাতিয়ে দিতে পার পুরুষকে, কিন্তু তাতিয়ে দিতে পারো না মোটেই।"

"তোমার কথা বোঝা খুব মুস্কিল। চালাক বলেই বোধহয়—তোমাকে বোঝা খুব কঠিন। তাতানো আর মাতানো এ-দুটো শব্দের অর্থ কি?"

"অর্থ—? ওর জোরেই তো বেঁচে গেলে শৈবালের খপ্পর থেকে।"

"মন্দ কি! তবে তো স্বভাব আমার ভালই!"

"ভালোই তো! মন্দ কে বলেছে? কিন্তু এ-চরিত্র স্বামীর সম্পর্কে স্বাভাবিক নয়!"

"তোমার কথা তো বুঝতে পারছি না কিছুই! কি হলো তোমার? কি ব্যাপার? মাথাটাথা খারাপ হয়নি তো?"

সুমিত্রা পত্রীক্ষিতের মুখের দিকে তাকিয়ে ওর কথা গুলো যেন বুঝতে চেষ্টা করল।

কি ও ভাবছে তা পত্রীক্ষিৎ জানে। অনেক অনেক টুকরো টুকরো খণ্ড খণ্ড কথা ওর মনের চিন্তাকে নানা রকম ভাব-ভঙ্গীর মধ্যে দিয়ে যেন প্রকাশ করে দিয়ে যায়।

সুমিত্রা কি ভাবছে সে একটি জলৌকার মত প্রাণ-শক্তিকে পরিতৃপ্ত করবার জন্যে সুমিত্রার যৌবনের রক্তাক্ত লাবণ্যকে নিঃশেষ করে চলেছে প্রতি রাত্রির নিভৃত অন্ধকারে? সম্ভবতঃ তাই। সম্ভবতঃ পত্রীক্ষিতের মত ধীর-স্থির-সংযত ও জ্ঞানী-গুণী মানুষের কাছে সে যা চেয়েছিল তখন সে তা পায় নি। সে তখন দেখতে পায় কেবল ওর শরীরটার প্রতিই যেন তার ঝোঁক—যেন শরীরটা ছাড়া সে আর কিছু চায় না। সুমিত্রার শরীরটাকে নিয়ে মাঝে মাঝে ওর দৌরাত্ম্যের দুরন্ত প্রবৃত্তি যে আগুনের শিখার মত দপ্ করে জ্বলে ওঠে তা সে, অস্বীকার করতে পারে না! পত্রীক্ষিৎ মনে করে

সে রক্ত-মাংসের সাধারণ মানুষ। কিন্তু এই সাধারণ মানুষ সুমিত্রা চায় না।

পরীক্ষিৎ বলল, "তুমি কি ভাবছ তা আমি জানি।"

"কি ভাবছি আমি?"

"আমার ওপরে তোমার যা ধারণা, সাধারণ আর স্বাভাবিক মেয়েরা তা নিয়ে মাথা ঘামায় না, কিংবা, দুঃখ বোধও করে না। তারা বোঝে, প্রত্যেক মানুষের চরিত্রেই দুটি অংশ আছে—এক অংশ বাইরের জগতের জন্যে, অন্য অংশ কেবলমাত্র নিজের স্ত্রীর জন্যে। সে-অংশের দুর্বলতাগুলো নিয়ে বাইরের জগতের মানুষকে বিচার করতে যেও না—ভুল করবে।"

"আমি কি স্বাভাবিক নই?"

"স্বাভাবিক নও তুমি। সত্যিই স্বাভাবিক নও। তোমার রঙীন আবেগের উপেক্ষায় ক্ষত নয়—কিন্তু তোমার ভেতরটা ঠাণ্ডা ভেজা দেয়াশলাইয়ের কাঠির মত। শত ঘেঁষাঘেঁষি আর ঘেসাঘেঁষিতেও থাকব কিছুতেই জ্বলে ওঠে না। পুরুষমানুষ বেশীদিন এ-সব মেয়েকে সুন্দর বলে মনে করতে পারে না।"

সুমিত্রার চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো।

"এতদিন এইসব কথা তুমি মনে মনে পুষে রেখেছ! বলনি তো কোন দিন?"

"না, বলিনি। অনেকদিন বলতে চেয়েছি—কিন্তু বলতে পারিনি।"

"আজ পারলে কি করে?"

"একটা কথা ভাবতে খুবই খারাপ লাগে,—এখন [illegible] কোথাও পাই সেইজন্যে যখন ভাবি অন্য কোথাও—অন্য কোন মানুষের কাছে তুমি কোনদিন স্বাভাবিক হবে, সুন্দর হবে। হয়তো আমি সে-মানুষ নই।"

সুমিত্রার কণ্ঠনালী বয়ে কান্নার যন্ত্রণা ঠেলে ওপরের দিকে উঠতে লাগল।

"সব পুরুষ মানুষই তাহলে একরকম?"

"তাই নাকি?"

"তাইতো মনে হয়!"

"সৌরাণ্ড—?"

"এ-আবার কি কথা!"

"সৌরাণ্ডের নৌ-বিহারটা একেবারে বৃথা যায় নি।"

"তোমার পক্ষে ভাবাটা অন্যায় নয়। কোন কোন স্বভাবের মেয়ে এ-সব ক্ষেত্রে অনেক গোলমাল করে বসে। তবে—তুমি নিশ্চিন্ত হতে পার। আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করো না! আর কিছুই বলতে পারবো না তোমাকে।"

"বাবা আছে—?"

"তাই মনে কর?"

চুপ করে গেল সুমিত্রা। মাথা নীচু করে বিছানার চাদরের দিকে চোখ রেখে বসে রইল। বোঝা গেল আর তার মুখ দিয়ে একটা কথাও বা'র করা যাবে না। সুমিত্রার সুন্দর চুলে-ভরা নিটোল মাথার দিকে তাকালো পরীক্ষিৎ। সুমিত্রার মনের মধ্যে এখনই হয়তো সবগুলো রঙের তাস খুলে গিয়েছে,—মেলে ধরেছে সবগুলো নৌ-বিহারের চিত্র—ও দেখছে সে-সব একটার পর একটা। পরীক্ষিতকে দেখবার জন্যে শুধু একটি মাত্র রঙের তাস তার চোখের সামনে মেলে ধরেছে সে।

কিন্তু ওর এই একটি হরতনের বিবিই খেলা বোঝাবার পক্ষে যথেষ্ট।

ওর স্বভাবের মধ্যে যে বিশেষত্ব দেখে পরীক্ষিৎ এতটা বিচলিত হয়েছিল তার গোড়ার কথা কেউ হয়তো ধরতে পারেনি এ-পর্যন্ত। বিয়ের কয়েক মাস পর থেকে সুমিত্রার সম্বন্ধে যে ধারণা তার জন্মে ছিল তা আজও তার বদলায়নি। অল্প দিনের পরিচয়ের পরেই কেন জানি মনে হয়েছিল সুমিত্রা নার্সিসিজমে [illegible]। সুমিত্রা নিজেই জানতে পারেনি ও নিজের রূপে নিজেই মুগ্ধ হয়ে আছে। কেবল মুগ্ধই নয়, সুমিত্রার চার পাশের মানুষের মুগ্ধ আশা অবয়বহীন ছায়া হয়ে গেছে ওর কাছে! এই ছায়াগুলো ওর আশেপাশেই ঘুরে বেড়ায়, কাছে আসতে পারে না। নীতল জলাধারে নিজের মনোহারিণী রূপের প্রতিচ্ছবি দেখে দেখে, সুমিত্রার উষ্ণ কামনার উত্তাপ ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে জুড়িয়ে গিয়েছে। এই ছবিই ভুলিয়ে রেখেছে ওকে,—ভুলে গেছে আর সব। [ক্রমশঃ

আজকের সমস্যা

বেলা দে

সভ্যতার পটভূমিতে আজ যে পরিবর্তনের তীব্র জোয়ার বয়ে যাচ্ছে আমাদের একান্ত পারিবারিক জীবনও তা থেকে মুক্ত নয়। আজ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর বদল হয়েছে, জীবিকার প্রয়োজনে অনেককে পথে নামতে হয়েছে। আরো বহু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজে আজকের মেয়েরা অপরিহার্য হয়ে পড়েছেন। যদিও আমি আজকের সমাজ অনেক বড় আর তার মধ্যে মেয়েদের সমাজ ও তার সমস্যার প্রশ্নটা আজ সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

সমাজ সেবা বা সমাজ কল্যাণের কাজ নিশ্চই মহৎ এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় আজকের সমাজ সেবামূলক কাজে যাঁরা এগিয়ে এসেছেন তাঁরা কি সকলেই প্রকৃত সমাজ সেবী? বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় আজকাল এক শ্রেণীর মেয়েরা সমাজ সেবার কাজে বেশ তৎপর। যে সব প্রতিষ্ঠান তাঁদের এইসব কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন তাঁরা জানেন এঁরা প্রকৃত সেবিকা। 'নেই কাজ তো খই ভাজ' বলে একটা কথা আছে। তথাকথিত সমাজ সেবীরা ঘরের কাজকর্ম পরিজনদের সেবা দেখাশুনা সব বন্ধ করে সামাজিক বনের মোষ তাড়াতেই উদয় অস্ত বাইরে কাটিয়ে আসেন। এঁরা কিন্তু অধিকাংশই বেশ সম্ভ্রান্ত ঘরের শিক্ষিতা মেয়ে। আমি এমন সংসার দেখেছি বেচারী স্বামী ও পুত্রকন্যা অফিস বা কলেজ স্কুল থেকে এসে এক কাপ চাও পান না দয়াকরে লোকজনেরা যখন দেবে খাবে। অথচ সেই বাড়ীর গিন্নিটী ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে নির্বিবাদে সমাজ সেবার খাতায় নাম লিখে নাম করে যাচ্ছেন।

কিন্তু আমার মনে হয় ঘর সংসারকে অবহেলা করে বাইরের কাজ করে নাম কেনার মধ্যে কোনো সার্থকতা নেই।

পিতামাতা সংসারের মধ্যমনি। নিজের ঘর বলতে সন্তান বোঝে পিতা-মাতার সান্নিধ্য। কিন্তু তারা আজ কি দেখছে! আজকের মা বাবা কতটুকুই বা সন্তানকে সময়দান করছেন। প্রয়োজনে হোক বা লৌখীনতায় হোক মায়েদের কাছে আজ বাহিরটাই বড় হয়ে উঠেছে। ক্লান্ত দেহমন নিয়ে সমাজ সেবা করে মা যখন বাড়ী ফেরেন তখন ছেলেমেয়ে মার কাছে যেতে ভয় পায়, কারণ মার মেজাজও সময় সময় বিগড়ে থাকে। কাজেই মা ও সন্তানের নিগূঢ় সম্পর্ক তাদের সন্তানরা অনুভব করতে পারলো না। এইসব সন্তানের ভবিষ্যত কি? আজ যারা ছাত্র তারাই তো ছিল শিশু—এইসব শিশুর শৈশবে যে সব চাহিদা ছিল সেগুলি মা বাবা কোনদিন পূর্ণ করেননি। আজকের এই ছাত্র সমাজের অসংযত অশোভন ও বিদ্রোহী মনোভাবের মূলে যে কারণগুলি আছে, সেগুলির জন্য অনেকখানি দায়ী অভিভাবকেরা। ছাত্র-সমাজের সমস্যা আজ সমগ্র জাতির সমস্যার সঙ্গে জড়িত। এর আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। আশ্চর্য্যের বিষয় ছাত্রদের নৈতিক অবনতির বিষয়ে যত আলোচনা হয় সেই তুলনায় সমস্যার কারণ অথবা তার সমাধানের বিষয় কিন্তু ঠিক ততখানি শুনতে পাওয়া যায় না। এটীও এ যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য বলে ধরা যেতে পারে।

মা বাবা সন্তান সকলেই আজ স্বাধীন হয়ে উঠেছে! কিন্তু সন্তানদের লালন পালনের সময় যদি মা বাবা শাসনের ভাবটা না রাখেন সে ক্ষেত্রে উভয়পক্ষের মধ্যেই স্বার্থপরতা ও উচ্ছৃঙ্খলতায় পর্যবসিত হয় কারুর প্রতি কারুর বাধ্যবাধকতা বোধ জাগ্রত হতে পারে না। সকলেই চায় স্বাধীন-চেতা হতে—ফলে কোনোদিক থেকে সামান্যতম বাধা এলে তাতেই ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। তাই এর কিছু পরিবর্তন দরকার। সমাজসেবার কাজ দুষনীয় এমন কথা আমি বলব না এবং এ যুগ ছেড়ে আমি পিছনের যুগে ফিরে যেতেও বলব না। শুধু বলব ছেলেমেয়ে ও সংসারের দিকে চেয়ে ঘরের অভাব অভিযোগ পূর্ণ করে তারপর সমাজ সেবার দায়িত্ব নিন। প্রতিমুহূর্তে ভাবুন আপনার সন্তানের জন্য কি উত্তরাধিকার আপনি রেখে যাচ্ছেন! তাই জীবনের নানা সমস্যার মধ্যে এই সমস্যাটিও আজ আমাদের জীবনে সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে এর প্রতিকার করুন না হলে সমাজের ভাঙন অবশ্যম্ভাবী।

গৃহ-আদর্শ

সংযুক্তা রায়

শহরে আজ আমরা মাথা গোঁজবার জায়গা পাচ্ছিনে। মাটি এখন মা-টি জননী স্বরূপা নয়—মাটি এখন পাথর। আর এই পাথরের প্রসার গ্রাম-বাংলাতেও প্রসার লাভ করছে।

গ্রামের সে ধূধূ প্রান্তর আর শ্যামল অঙ্গন এখন 'ইটের পর ইট-মাঝে মানুষ কীট'। মাটি মরে যাচ্ছে। আলো নেই—বাতাস অবরুদ্ধ।

এর কারণ রাজনৈতিক—সমাজ-জীবনের পরিবর্তনের ফলেও বটে। গ্রাম আর শহর—এ দুইয়ে এখন আর এমন প্রভেদ কী?

মানুষের মনেও মাটির স্নিগ্ধতা নেই,—সূর্য্যকরোজ্জ্বল প্রভাব দীপ্তি নেই! তাই বাসগৃহ—যা নাকি মানুষের স্বাস্থ্যের প্রধান ভিত্তি—তা মাটিহীন, অপ্রশস্ত এবং আলো বাতাসহীন।

যে গৃহে শিশুর জন্ম তার পরিবেশ কী গ্রামে এবং কী শহরে যদি এমনি অস্বাস্থ্যকর হয় তবে জাতির স্বাস্থ্য ভালো হবে কী করে? জাতির সৌন্দর্য বাড়বে কী করে? এদিক থেকে চিন্তা করবার দিন এসেছে বিশেষ করে আমাদের সংসারের গৃহিনী যাঁরা তাঁদের কাছে।

বাড়ির পুরুষ তবু কিছুক্ষণ আলো বাতাসের স্পর্শ পায়—বাইরের কাজে; কিন্তু সংসারে মেয়েদের এবং শিশুদের অবস্থা কী?

এ-সম্পর্কে চিন্তা করেই আগে দরিদ্রতম গৃহস্থও আদর্শ বাসগৃহ সম্পর্কে কিছুটা সচেতন থাকতেন, আজ বাসগৃহের দুরূহ সমস্যায় সে চিন্তা বানের জলে ভেসে যাচ্ছে।

আদর্শ গৃহ বলতে যা বোঝায় তার প্রধান কথা হচ্ছে যে গৃহে সকল ঋতুতেই প্রচুর আলো ও বিশুদ্ধ মুক্ত বাতাস প্রবেশ করে। আর যে গৃহে সুগৃহিণীর সতর্ক দৃষ্টিতে সব সময় একটি শান্তিপূর্ণ ও স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া

বর্তমান, বাড়ির অধিবাসীরাও প্রত্যেকেই প্রত্যেকের প্রতি সহানুভূতিশীল আমাদের আজকের বাসগৃহে এই দুটি আদর্শই আর দেখা যায়না। অথচ এদিকে আমরা বিশেষ করে বাড়ির গিন্নীরা যদি একটু নজর দিই তাহলে এই দুই আদর্শের সমন্বয়ে বাড়িকে সুস্থ এবং স্বাস্থ্যকর করে তুলতে পারি।

বাড়িতে যাতে সূর্য রশ্মি ঢোকে তার ব্যবস্থা পরিপূর্ণভাবে করা, বিশেষ করে শহরের বাড়িতে আমাদের সাধ্যাতীত। পাশরাব পোপের মধ্যে ঠাসাঠাসি করে থাকা এ আমাদের মধ্যবিত্ত, বিশেষ করে শহরের নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের অপরিহার্য ভাগ্যলিপি।

কিন্তু একটু রোদ পোহানো, ঘরের জিনিসপত্তর এবং বালিশ, বিছানায় একটু রোদ লাগানো বোধ হয় সাধ্যাতীত নয়।

আমাদের প্রত্যেক মেয়েদের স্বাস্থ্যবিধির এটুকু জ্ঞান থাকা দরকার যে, সূর্যের আলো থেকে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য আমরা তিন রকমের রশ্মির সাহায্য গ্রহণ করি। (১) আলোক রশ্মি (২) উত্তাপ রশ্মি ও (৩) আল্ট্রা-ভায়লেট বা অতি বেগুনী রশ্মি।

প্রথমটির দ্বারা আমাদের গৃহ-পরিবেশ সুষ্ঠুভাব ধারণ করে ও অন্ধকার সরে যায়।

দ্বিতীয়টির দ্বারা জমির আর্দ্রতা দূর হয়, পচনশীল জিনিস সব শুকিয়ে ক্রমশ দুর্গন্ধহীন হয় এবং অধিকাংশ হানিকর জীবাণু মরে যায়।

সূর্যের আলো পেলেই উদ্ভিদের সবুজপাতা বাতাসের কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস থেকে কার্বন নিয়ে অক্সিজেন ছড়িয়ে দেয়। এই অক্সিজেনই প্রাণী জগতের প্রাণ স্বরূপ। এইভাবে আলো গৃহ এবং গৃহ পরিবেশের সাহায্য করে থাকে। এছাড়া অতি বেগুনী রশ্মির প্রভাবে দেহ পুষ্টির কাজ করে, দেহ বলিষ্ঠ ও কর্মঠ হয় এবং গাত্রচর্মের স্বাস্থ্যোন্নতি হয়। অতি-বেগুনী রশ্মি সেবনে দেহে ভিটামিন 'ডি' সঞ্চিত হয়। এতে অনেক অসুখ সারে ও প্রতিরোধ করে।

ছেলেবেলায় শিশুদের রীতিমত রৌদ্র সেবন করালে তাদের অস্থি পুষ্ট হয় ও রিকেট রোগ হতে পারে না।

কেবল শরীরের পক্ষে নয় শয্যা ও পোশাক পরিচ্ছদের পক্ষেও রৌদ্রস্নান নিত্য উপযোগী। গ্রামে সূর্যের আলো দুষ্প্রাপ্য নয়—শহরে অবশ্যই অনেকক্ষেত্রে

দুষ্প্রাপ্য। তবুও সূর্যের আলোর প্রয়োজনীয়তা যদি আমরা সম্যক মনে রাখতে পারি—তা হলে শরীরে মনে, ঘরের জিনিসপত্রে সূর্যের আলোর স্পর্শ পাওয়ানো কী সত্যিই অসম্ভব?

আর বাড়িতে শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করা। সকলের প্রতি সকলের সহানুভূতি জাগানো আমাদের আগেকার একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে আদর্শ-নীতি ছিল; আজ একক পরিবারের গৃহিনীরা যদি একটু সচেতন হন তা হলে বাড়ির আবহাওয়া কিছুটা ভালো রাখা যায় বৈকি! সে-কর্তব্যবোধ বাড়ির গিন্নীদের মধ্যে থাকা দরকার। মোটকথা সর্বস্ব-রিক্ত আদর্শহীন পরিবারই আজ আদর্শ গৃহ তৈরী করতে পারছেন না। এ দোষ আমাদের মেয়েদেরই বেশি।

গৃহ যে গ্রহ নয় এ ভাবকে মনে রাখতে হবে। গৃহ থেকেই মানুষের বৃদ্ধি। যেগৃহের আলোক সূর্যের আলোর মতনই চারিদিকে ছড়িয়ে থাকে তাকে গ্রহণ করার মানসিকতাকে আজ আমারা হারিয়ে ফেলেছি বলেই—আমাদের এত অশান্তি।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি পঙ্‌ক্তি 'ধন নয়, মান নয়, এতটুকু আশা, শুধু ভালোবাসা।' এ ভালোবাসা প্রত্যেক বাসাতেই বাড়ির মেয়েরা আমরাই গড়ে তুলতে পারি।

পোশাকে অতি-আধুনিকতা

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

নারীর প্রগতি অবশ্যই সকলের কাম্য, এবং সেই ব্যাপারে আজকের নারী সমাজও যথেষ্ট সচেতন। ফলে, দুশো বছরের আগেকার অনেক কিছু রীতিনীতি, সংস্কার ও দৃষ্টিভঙ্গী আজকের মেয়েরা বদলে ফেলেছেন, ভেঙে ফেলেছেন। এটা স্বাভাবিক। প্রগতি বা অগ্রগতির জন্যে পুরোনো কিছু কিছু জিনিষ ছাড়তে হয়, নতুন আইডিয়া আনতে হয়—এতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। কিন্তু সেই অগ্রগতি যেন সহজ খাতে চলে, অস্বাভাবিক পথ না ধরে, এইটাই সকল মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যেও এই প্রগতির হাওয়া বইছে। যথেষ্ট মাত্রায় আধুনিকা তাঁরা হয়েছেন ও হচ্ছেন, তাঁদের সামনে রয়েছে পাশ্চাত্য নানা দেশের নারী জগতের উদাহরণ। বিদেশিনীদের জীবনধারার পুরোপুরি অনুকরণ এদেশে এখনও আরম্ভ না হলেও, চলন-বলন আর পোশাক-আশাকে আমাদের নারীসমাজ—বিশেষত যাঁরা অপেক্ষাকৃত কমবয়সী ও নবীনপন্থী বেশ ভালভাবেই আজ ওদেশের অনুকরণ করতে চাইছে।

প্রাচ্যের পোশাক আর পাশ্চাত্যের পোশাকে দর্শনগত ব্যবহারগত ও ঐতিহ্যগত পার্থক্য আছে। ভারতবর্ষ ও অন্যান্য এশীয় দেশে নারীবেশের সঙ্গে শালীনতার সম্বন্ধ অত্যন্ত নিকট। নারী বলতে এসব দেশে পবিত্রতা শোভনতা, শ্লীলতা, সুরুচি ইত্যাদিই বোঝায়। অতএব সেই আদর্শ পোশাক-পরিচ্ছদেও পালিত হয়ে এসেছে।

আবহমানই এদেশের ও প্রতিবেশী দেশগুলির মেয়েরা সুন্দর হিসাবে গণ্য হয়ে এসেছে।

যুগের প্রভাবে পর্দা প্রথা যেমন উঠেই গেছে প্রায়, মেয়েদের আপাদমস্তক বস্ত্রা সেজে থাকার প্রথাটাও প্রায় ওঠে গেছে আজকাল। এটা খুব দোষের নয়, কেননা শুধু নাক মুখ চোখ ছাড়া দেহের আর এক ইঞ্চি অংশও দ্রষ্টব্য থাকবেনা—এর মধ্যে যুক্তি কিছু নেই। যেসব দেহাংশ উন্মুক্ত রাখলে শালীনতাও বজায় থাকে আর স্বাস্থ্যেরও উপকার হয়, সেইসব অংশ অনায়াসেই মেয়েরা অনাবৃত রাখতে পারেন। কিন্তু তার বেশী না হওয়াই ভাল।

বিদেশের নানা জায়গায় অঙ্গ উন্মুক্ত রাখতে রাখতে আজ এমন একটা জায়গায় মেয়েরা এসে পৌঁছেছেন যেখানে রমণীসুলভ আব্রু শ্লীলতা আর থাকছে না। মেয়েদের নিজেদেরই যেখানে লজ্জাবোধ নেই আর পুরুষদের নেই নারীদেহ দর্শনে অপ্রবৃত্তি, সেখানে পোশাকের এই বিপ্লবে প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করতে যাবে কে? তাই মেয়েদের স্কার্ট-গাউন ফ্রক হ্রস্ব হতে হতে মিনিস্কার্ট টপ্‌লেস্ ইত্যাদিতে পরিণত হয়েছে।

যে পোশাক এককালে মানুষ খুব জোর জলে সাঁতার কাটতে আটপৌরে হিসেবে ব্যবহার করত, সেই পোশাক এখন পোশাকী হিসাবে হাটে বাজারে অফিসে সিনেমায় যথেচ্ছ ব্যবহৃত হচ্ছে। এরপর সম্ভবত আসবে পূর্ণ বটম্‌লেস্—এবং তারও পরে বস্ত্র ব্যবসায়ীদের হয়ত একমাত্র বিক্রয় হবে পুরুষদের বস্ত্রসম্ভার।

কাপড়চোপড়ের মাপ সম্পর্কে আমাদের মেয়েরা ওদের মত এখনও অতটা নির্লজ্জ হয়ে ওঠেনি, কিন্তু যতটুকু হয়েছে, সেটাই চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে যথেষ্টই। স্লীভলেস, হাফ-স্লীভলেস, কি কোয়ার্টার-স্লীভস, অথবা ডি-কাট্ স্লীভস-কামিজ (মাত্রা বজায় রেখে) আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পক্ষে হয়ত খুব অনুপযুক্ত নয়, এবং তাতে অনেককেই খুব স্মার্টও দেখায়। কিন্তু সেখানেই যদি আমাদের আল্ট্রা-মডার্ণ মেডিরা থেমে থাকতেন, ভাল হত। কিন্তু তা তাঁরা থাকছেন না। স্লীভস যেমনি ক্রমশ চোলির আকার ধারণ করছে, শাড়ির কসি-অংশ তেমনি ক্রমশ ভূতলগামী হচ্ছে। উন্মুক্ত কটি ও নাভি তো হামেশাই আমরা দেখতে পাই পথে ঘাটে।

সৌন্দর্য্য থাকে স্বাভাবিকতায়, মাত্রাজ্ঞানের মধ্যে। বিশেষ করে আমাদের মেয়েদের বেলায়। মাত্রা ছাড়ালেই সৌন্দর্য্য অসুন্দর হয়ে ওঠে। দুঃখের বিষয়, অতিপ্রগতিবাদিনীরা এই সহজ সত্যটার দিকে খেয়াল করছেন না। দেহ প্রদর্শন করাটাই তাঁদের কাছে আধুনিকতা ও প্রগতির যেন একমাত্র উপায় অথচ সেই কর্মটি কতখানি রুচি-সঙ্গত হচ্ছে এবং দৃষ্টিকটু হচ্ছেনা, সেদিকে নজর নেই। এর ফল কি শেষ পর্যন্ত ভাল দাঁড়াচ্ছে?

মনে হয়—না।

আরেকটা কথা ধরা যাক। ফ্যাশানের নামে যিনি অঙ্গশোভা খুলে ধরতে চাইছেন পাঁচজনের সামনে, তাঁর সেই অঙ্গের সত্যকারের শোভা আছে কিনা, সেই দেহ বা দেহাংশ দেখে বিরক্তিতে কেউ মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে কিনা—সাদা কথায় সুস্বাস্থ্য সমুজ্জ্বল শরীরের অধিকারিনী তিনি কিনা,—সেই দিকে তিনি সাধারণতই অবহিত থাকেন না। ফলে, রোগা হাত-পা, অস্থিসার মুখমণ্ডল, ঠেলে উঁচু হয়ে থাকা কণ্ঠাস্থি বা ক্ষুদ্রায়তন অন্যান্য অঙ্গসকল প্রদর্শন করতে গিয়ে তাঁরা কুশ্রী, হাস্যাস্পদ এমনকি অন্যের বিদ্রূপের পাত্রী হন।

আচার আচরণের মত পোশাকে প্রগতি কালের প্রভাবে হবেই, তাকে আটকানো যাবেনা কিন্তু এই দেশের নারীর পক্ষে পোশাক সংক্রান্ত সব কিছুই উপযুক্ত কিনা সেটা আগে ভেবে দেখবার সময় এসেছে মেয়েদের পক্ষে। ঐতিহ্যগত সভ্যতাও কৃষ্টিকে নস্যাৎ করার বাহাদুরি নেই। আগু-পিছু বিবেচনা করে, বাড়াবাড়ি না করে, কাজ করাতেই মঙ্গল।

রান্নাঘরে

শকুন্তলা

'সে রামও নেই সে অযোধ্যা নেই' এই কথাটীর সঙ্গে আমরা সবাই অল্প বিস্তর পরিচিত কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে হচ্ছে দুই বাংলা পৃথক হয়ে সে পদ্মাও নেই সে গঙ্গাও নেই অর্থাৎ আষাঢ় শ্রাবণ মাসে যে বিখ্যাত ইলিশমাছ পাওয়া যেতো আজ তা থেকে আমরা বঞ্চিত। বাজারে যে সব ইলিশমাছ পাওয়া যায় তার কোনো স্বাদও নেই। তবুও এই সময়ের রান্না হিসেবে ইলিশ মাছের কিছু রান্নার প্রণালী বোনেদের বলি—ইলিশমাছের একটা অপেক্ষাকৃত হাল্কা রান্নার কথা প্রথমে জানাই। ইলিশমাছ, জিরেমরিচবাটা, লঙ্কাবাটা, সরষেবাটা, কাঁচালঙ্কা ও কালো জিরে ঠিক করে নিন। মাছ কুটে নুন হলুদ মাখিয়ে ফুটন্ত জলে ছেড়ে দিন। ঐ সঙ্গে জিরেমরিচ বাটা লঙ্কা ও সরষে বাটা জলে গুলে দিয়ে দিন। একটু ফুটলে নামিয়ে নিন অপর একটি কড়ায় তেল লঙ্কা ও কালোজিরে ফোড়ন দিয়ে এ ঝোলটি ঢেলে দিন ইচ্ছে করলে ঝিঙে, পটল, আলু ভেজেও দিতে পারেন।

ইলিশ মাছের কোর্মা—ইলিশ মাছ বড় বড় করে কেটে ধুয়ে নুন হলুদ মাখিয়ে ভেজে রাখুন। কড়াইতে তেল ঘি একসঙ্গে দিয়ে আদা পেঁয়াজ বাটা, হলুদ-লঙ্কাবাটা, নুন ও অল্প মিষ্টি দিয়ে কষে নিয়ে অল্প দই বা ভিনিগার অথবা লেবুর রস দিয়ে মাছগুলো ছেড়ে দিন। বেশ মাখা মাখা হলে নামিয়ে নেবেন।

ইলিশমাছের দইমাছ—এক সের টক দই, কাঁচা লঙ্কা কুঁচো, আদা কুঁচো, সরষেবাটা সব এক সঙ্গে করে ফেটিয়ে রাখবেন। সামান্য নুন দিয়ে মাছগুলি সেদ্ধ করবেন। এবারে এ সেদ্ধ মাছগুলো এবং মাখা মশলা দিয়ে ফুটিয়ে নিন। নামিয়ে একটু গুঁড়ো গরম মশলা দিতে পারেন।

এছাড়া ইলিশমাছ ভাজা একটি উপাদেয় খাবার। আদা পেঁয়াজের রস মাখিয়ে অল্প ঘিয়ে ভেজে নিলেও ভারী সুস্বাদু হবে।

আচ্ছা আজ এই পর্যন্ত। তবে আমাদের মেয়ে মজলিসের পাঠিকা যদি এই বর্ষাদিনের কিছু রান্না লিখে পাঠান তাহলে সেগুলি আমরা এই বিভাগেই প্রকাশ করব।

Regd. No. C3643

মন খুশীতে ভরে যায়

লক্ষ্মী ঘিয়ে তৈরী
খাবার খেলে
মন খুশীতে
ভরে যায়

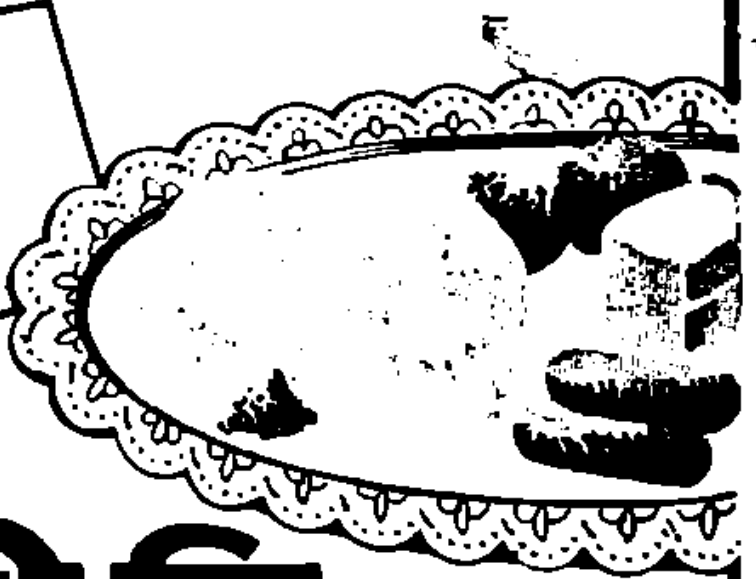

লক্ষ্মী ঘি

খাদ্যদ্রব্য
সুস্বাদু
ও
প্রীতিকর
করে

LG 11/70

শুধু উৎকর্ষ নয় সুরুচির পরিচায়ক

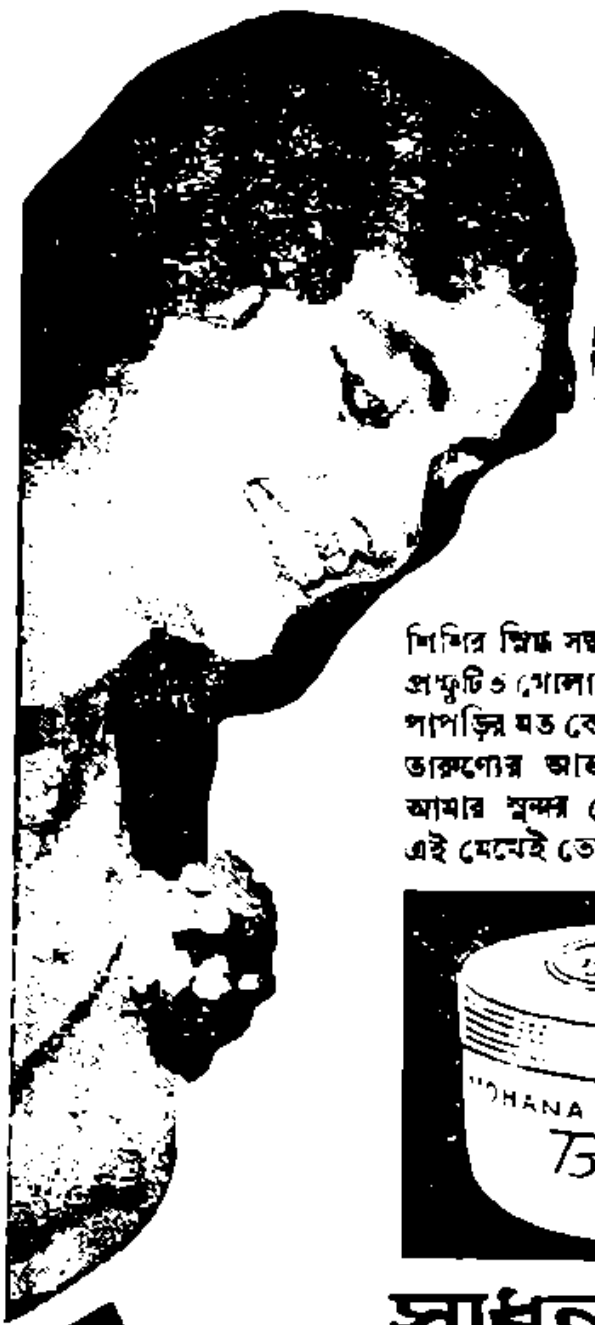

এর কোমল স্পর্শে সৌন্দর্য বিকশিত হয়

শিশির স্নিগ্ধ সন্ত
প্রস্ফুটিত গোলাপের
পাপড়ির মত কোমল ও
তারুণ্যের আভায় উজ্জ্বল
আমার সুন্দর দেহশ্রী
এই মেয়েই তো!

সাধনা বিউটি স্নো

একটি অতি আধুনিক অঙ্গরাগ

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
কলিকাতা-৫

অস্বাস্থ্যকর মাড়ীই
দাঁতের ক্ষয় ও মুখের দুর্গন্ধের কারণ

মাড়ীর সুস্থতার জন্য **নিমের** উপকারিতা হাজার হাজার বছরের পরীক্ষিত

নিম টুথ পেস্ট-এ **নিমের** সমস্ত গুণই রয়েছে

ক্যালকাটা কেমিক্যালস-এর তৈরী

CNP-1B-69M

গল্প-ভারতী

GALPA-BHARATI

শ্রাবণ ১৩৭৭, AUGUST, 1970

ষষ্ঠবিংশ পরিচ্ছেদ

সম্পাদক : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

সহঃ সম্পাদক : কল্যাণ রায়

মূল্য : এক টাকা

বার্ষিক : পনের টাকা

শ্রীদোল বিহারী দত্ত কর্তৃক ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও কল্পনা প্রেস প্রাঃ লিঃ ৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

একটি নির্ভরযোগ্য কেশ তৈল

বেঙ্গল কেমিক্যালের

ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল

কেশতন্ত্রে সম্পূর্ণ ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল ব্যবহারে আপনার কেশ-কোষগুলি হবে আরো সুদৃঢ় কেশমূল ও মস্তিষ্ক থাকবে শীতল ও চুল পড়া বন্ধ করতে সাহায্য করবে।

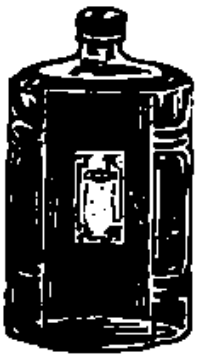

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই

জামশেদপুর • দিল্লী

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

পশ্চিমবঙ্গ

নিয়মিত পড়ুন

প্রতি সংখ্যা : দশ পয়সা

আর

নিজের ব্যবসাকে জনতার কাছে পরিচিত করার জন্য

পশ্চিমবঙ্গ

পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

বিশদ বিবরণের জন্য নিচের ঠিকানায় লিখুন

বিজনেস্ ম্যানেজার, তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার, রাইটার্স বিল্ডিংস্, কলিকাতা:-১

প. ব. (তথ্য ও জনসংযোগ) বি ২৪২৩।৭০

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়—		১৪৫
কার্টুন		১৪৭
কিছু রঙ্ কিছু বেরঙ্ (উপন্যাস)	—বিমল মিত্র	১৪৯
আজিকার ভাব-১		১৫৬
বন্যা বন্যা (উপন্যাস)	—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	১৫৯
ফিরে ফিরে চাই	—প্রভাত মুখোপাধ্যায়	১৬১
আবার সেই জেল	—দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়	১৭৭
যে কাহিনী চিরকালের :		
অলিভার টুইস্ট	- সুজন রায়	১৮৫

সত্তর বছর আগে

ভীমনাগের সন্দেশ যে আনন্দ ও তৃপ্তি দিয়েছে আজও তাই!

ভীমনাগ

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ও আদি মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান

৬-৮, নির্মল চন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ফোন-৩৪১৪৬৫

ব্রাঞ্চ - ৮, বিবেকানন্দ রোড কলিকাতা-৭ ফোন-৩৪-৪৩৩৩

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas

Ex. Judge, Calcutta High Court.
Ex-Law Member, Govt. of India

আমি লক্ষ্মী-ঘিই ব্যবহার করি। অন্য ঘিয়ের তুলনায় এ ঘি অনেক ভাল ও বিশুদ্ধ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সত্যেন মজুমদার
সম্পাদক—আনন্দবাজার পত্রিকা

লক্ষ্মী ঘি ব্যবহার করে আমার বেশ ভাল লেগেছে। এটা সত্যিই ঘি।

—শিশিরকুমার ভাদুড়ি

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল ঘিনিষ।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই ভেজালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—দৈনিক বসুমতী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজারে প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার ঘ্রাণ ও গন্ধ ভাল।

শ্রীসীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির ঘ্রাণ ভাল ও মুখরোচক হয়।

শ্রীশান্তা দেবী

এই সংখ্যায়

গল্প ভারতীর পাতা থেকে

দান প্রতিদান	—অনুরূপা দেবী	১৯৩
বসন্তের আগুন	—রবীন্দ্রনারায়ণ ঘে	১০৫
এই প্রথম		
রাজা ও রাণী (গল্প)	—সুনীলচন্দ্র সেন	২০৮
অপরাহ্নবর্তী (উপন্যাস)	— সুবোধ সিংহ	২১১
নাটমঞ্চ	—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	২১৯
খেলাধূলা	—জ্যোতির্ময়	২২৮

বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী
সন্দেশ বিক্রেতা

সিমলার বিখ্যাত

বিনোদ বিহারী নাগ
গণেশ চন্দ্র দত্ত

শাখা :
৫/৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন : ১৩ ১৮৯৯
১৮, যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ,
কলিকাতা-৬

হেড অফিস ঃ ৫৬ ২, রামদুলাল সরকার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন ঃ ৫৫-১৪৫০

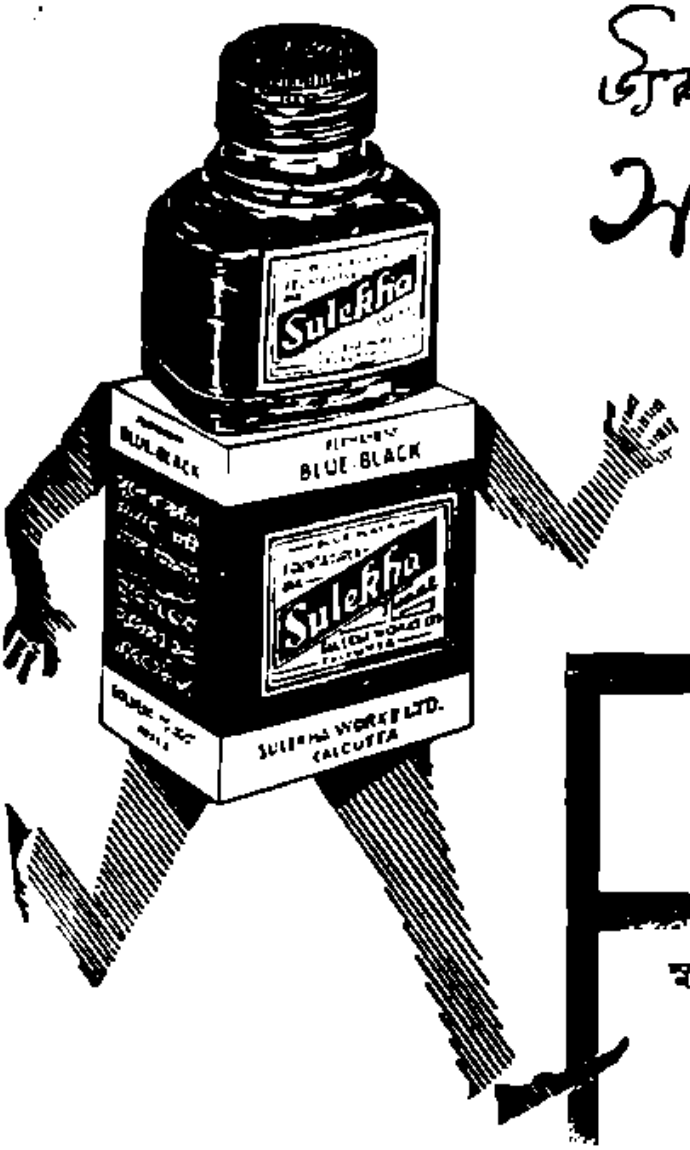

ঐতিহ্য ও উৎকর্ষতায়

সবার আগে সুলেখা

ভারতে সর্বাধিক বিক্রয়ে তো বটেই, ক্রমবর্ধমান রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে সুলেখা আজ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন ক'রে চলেছে।

দেশ-বিদেশে সমাদৃত

সুলেখা-উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে আছে :
'অ্যাডসল' পেস্ট এবং গাম,
'সিকুরিটি' সিলিং ওয়াক্স,
'পেনসল', স্ট্যাম্প প্যাড, বিভিন্ন লেখার কালি এবং স্টেনসিল, স্ট্যাম্পিং, মার্কিং ও ড্রইং-এর কালি।

সুলেখা

স্পেশাল
ফাউন্টেন পেনের
কালি

ব্লু ব্ল্যাক, রয়াল ব্লু, ব্ল্যাক, এবং ব্রাউন রঙে
এবং ৩০, ৮০, ১২০, ৩৬০ ও ১২০ এম.এল. সাইজে
পাওয়া যায়।

প্রস্তুতকারক : সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২
ভারত।

এই সংখ্যায়

জীবন যেমন		
সাজানো বিচার	—ভবানী মুখোপাধ্যায়	১৩২
খবরের গল্প	- ডাক হরকরা	১৫৭
অবিস্মরণীয় মুহূর্ত	—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	২৪১

HOUSE OF NRM

NATIONAL RUBBER MANUFACTURERS LTD.

THE LARGEST MANUFACTURERS OF INDUSTRIAL RUBBER PRODUCTS

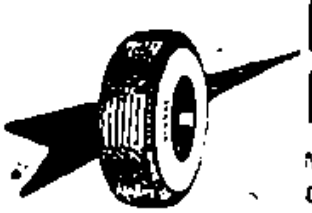

Inchek Tyres Limited

MANUFACTURERS OF TYRES FOR INDIAN ROADS AND CLIMATIC CONDITIONS.

UCO 3/70

"কাজ-ই হলো সত্যিকার সাধনা"
—এ বিশ্বাস যদি আপনার থাকে

তাহলে দেখবেন,
ইউকোব্যাঙ্ক প্রকৃত
বন্ধুর মতো
আপনাকে আর্থিক
সহায়তা দেবার
জন্য তৈরী।

ইউকোব্যাঙ্ক
উন্নতির পথ
সুগম করে

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

হেড অফিস : কলিকাতা

এই সংখ্যায়

সংযোজন

বিপ্লবীদের চলার পথ ২৪৮

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয় পতাকা
প্রথম পরিকল্পনা ও ব্যবহার ২৫১

বহির্ভারতে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ২৫৬

বিপ্লবী বীর চিত্তপ্রিয় ২৬১

নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজ ২৬৬

॥ ক্রোড়পত্র ॥

● মেয়েদের মজলিশ ●

নারী ও হিন্দু ভরণপোষণ আইন —অরুণা মুখোপাধ্যায় ১

টাক টাকি কথা —বেলা দে ৭

মুখরোচক কথা ৮

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

হেড অফিস :—মহাত্মা গান্ধী রোড, বোম্বাই-১

আগামী দিনগুলোর কথা ভাবুন—

এখন থেকেই সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে সঞ্চয় করুন।

মোট আমানতের পরিমাণ—৭০০ কোটি টাকার উর্দ্ধে।

প্রায় ৭০০ শাখা দেশের সেবায় নিযুক্ত।

বৃহৎ ও গৌণগুরুত্বপূর্ণ ব্যাঙ্কিং কাজ কারবারের জন্য আমাদের যে কোন অফিসে একটা হিসাব খুলুন।

ক্ষুদ্র শিল্প ও কৃষির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার সহ ঋণদানের বিশেষ ব্যবস্থা।

আসাম, বিহার, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গের প্রধান কার্য্যালয়—

৩৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১

এন. রামানন্দ, রাও
কাইডিয়ান

পি. সি. সেতাওয়ালা
জেনারেল ম্যানেজার

বি. সি. সর্বাধিকারী
এসিষ্টাণ্ট জেনারেল ম্যানেজার
কলিকাতা

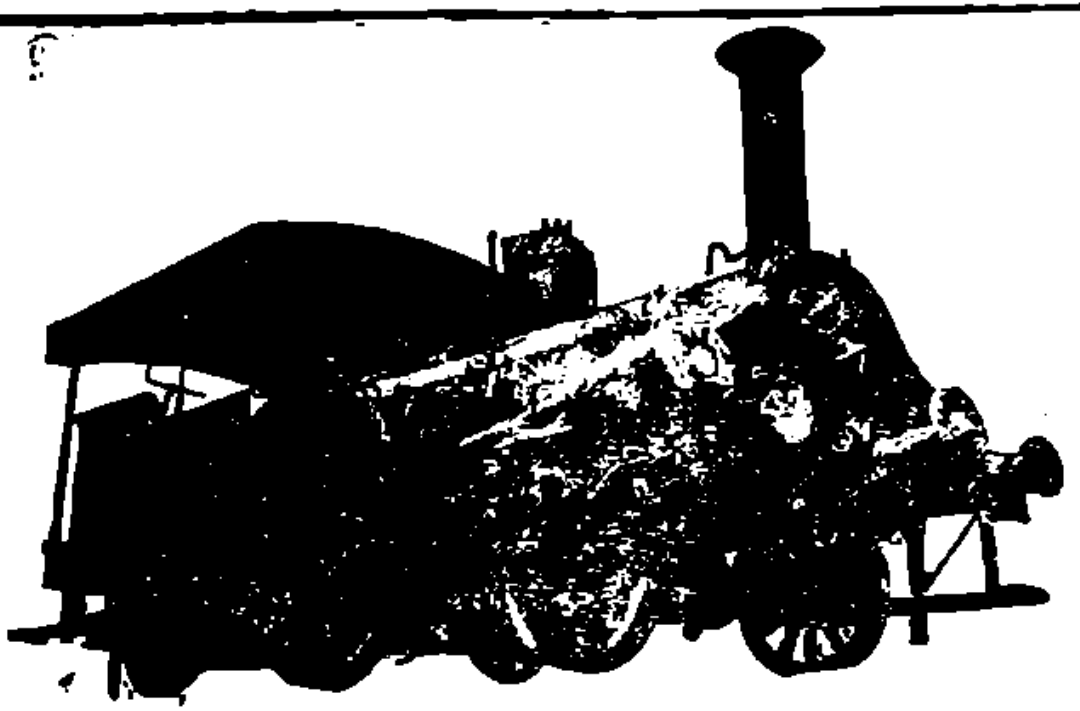

শতাব্দীব্যাপী সেবার ঐতিহ্য

১৮৫৪ সালের ১৫ই আগস্ট পূর্ব ভারতে প্রথম ট্রেন চালু হয়েছিল। হাওড়া থেকে হুগলী পর্যন্ত ৩৮ কিলোমিটার পথ তখন ঢাকে পাড়ি দিতে হয়েছিল। পরিকল্পনা দল নিয়োগের স্বেদ ও রক্তে সেদিন এক ব্যাপক পরিবহণ ব্যবস্থার ভিত্তিই শুধু স্থাপন করেননি, জাতীয় ঐক্যের এক মহৎ সম্ভাবনার বীজকেও সেদিন তাঁরা বপন করেছিলেন। শতাব্দীর ঐতিহ্যমণ্ডিত সেই পূর্ব রেলওয়ের ইস্পাত-পথ আজ ৪১৪৪ কিলোমিটার দীর্ঘ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহারের অধিকাংশ ও উত্তর প্রদেশের একাংশের শিল্প সমৃদ্ধ জনপদের সেবায় সে নিযুক্ত।

এই শতাব্দীব্যাপী সেবার ঐতিহ্যে রেলকর্মীরা উদ্দীপিত, দেশের স্বাধীনতার পর আজও যাত্রাপথে।

১৫ই আগস্ট, ১৯৭০

পূর্ব রেলওয়ে

বাটার শো-উইন্ডোর আড়ালে

বাটার যে কোনো শো-উইন্ডোই আপনাকে মুগ্ধ করবে। একবার ভাবুন আপনি প্রতিটি মোড় ঘুরে সম্পূর্ণ নতুন জগতে। চোখের সামনে ভেসে উঠবে সারি-সারি আধুনিক ডিজাইনের জুতো, সবগুলো পায়ে সুন্দর ফিটফাট জুতো, যেন সবাই একটুনি ঐ শো-উইন্ডো থেকে নেমে এলেন।

কিন্তু কী আছে ঐ শো-উইন্ডোর আড়ালে? [illegible] আরও কিছু।

আছে ২২,০০০ নিপুণ কর্মীর এক বিরাট বাহিনী, কারখানায়-কারখানায় আছে আধুনিক যন্ত্রপাতি, প্রতিদিন তৈরি হচ্ছে ২,০০,০০০ জোড়া জুতো। আধুনিক ও অভিজাতিক সু-এডুকেশনালিটিস এবং এই উৎপাদন-উৎসবের প্রতি জোড়া জুতোই শিল্পীকারিগরের ধৈর্য-যত্ন প্রযত্নের সুন্দর সাক্ষী।

আরো : আছে ১১০০টি বাটার দোকান ও এজেন্সি, আছে ৪৩০টি বি. এস. সি. পাইলিটির বিক্রয়কেন্দ্র, ডিলার এবং ডিস্ট্রিবিউটর — আছে দেশে-বিদেশে বিক্রয়কর্মীদের সাথে কুশলী হাত — উৎসবে পরে-পায়ে তারা পাঠায় যেন আপনই জুতো।

শুধু বাটা কর্মীদের বেতনের জন্য বছরে উঠবে আধুনিক ও সুপরিকল্পিত উপলব্ধ। তাঁরা যে কেবল আপনার জন্যই জুতো তৈরি করেন তা নয় — সারা জগতেই, এমনকি পৃথিবীর অন্যতম বেশভূষিতেও, তাঁদের জুতোর কদর — বছরে এই খাতে তৈরি হয় ১০,০০০,০০০ জোড়া জুতো।

এই পরিচয় তাৎপর্যপূর্ণ।

ভবিষ্যতে আরো বিস্তৃতভাবে বাটার উদ্যোগ সম্পর্কে বলবার ইচ্ছে রইলো আমাদের — আপনি কবে আসবেন দেখা হবে।

Bata

ষড়বিংশতি বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা

সম্পাদকীয়

১৪ই আগষ্ট রবিবার সকালে দেখছিলাম—খবরের কাগজে একটি ছবি ছাপা হয়েছে—আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে মুখোমুখি বসে আছেন ত্রৈলোক্য-মহারাজ।

অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত বেজিয়ো থেকে প্রচারিত হলো এক নিদারুণ দুঃসংবাদ। —গতকাল (অর্থাৎ শনিবার ৩ আগষ্ট) রাত্রি সাড়ে তিনটার সময় ত্রৈলোক্য-মহারাজ পরলোক গমন করেছেন।

আমার বাড়ীর কাজকর্ম করে যে মানুষটি, সে এসে জিজ্ঞাসা করলে—উনি কোথাকার মহারাজা ছিলেন বাবু?

জবাব দেওয়া শক্ত। তবু বললাম, উনি কোনও রাজ্যের মহারাজা ছিলেন না, উনি ছিলেন আমাদের সকলের—আপামর সাধারণের হৃদয়ের মহারাজা।

কি যে সে বুঝলো সে-ই জানে। তার মুখ দেখে মনে হলো—কথাটা বেশ গোলমেলে ঠেকেছে তার কাছে। যা সত্যি, ঠিক তার উল্টোটাই বুঝেছে। বললে, যাক্, ওঁর ছেলেমেয়েরা সুখে থাকবে।

—ছেলেমেয়ে কোথায় পাবে? তিনি বিয়েই করেননি।

শুনে খুব আফ্‌শোষ হলো তার। বললে—এত এত টাকাপয়সা—পাঁচ ভূতে লুটেপুটে খাবে।

বললাম, টাকাপয়সা কোথায় পাবেন? টাকাপয়সা কিছুই ছিল না তাঁর।

—তবে আর মহারাজ কিসের?

মহারাজ নামটাই বৃথা হয়ে গেল এই একটি মানুষের কাছে।

অথচ তিনিই ছিলেন সত্যিকার মহারাজা।

রাজকীয় মহিমায় এই বিপ্লবী বীর মানুষের অপরাজেয় আত্মার গৌরব ঘোষণা করে চিরবিদায় গ্রহণ করলেন। তাঁর জীবন যেমন গৌরবদীপ্ত, মৃত্যুও তেমনি মহিমান্বিত।

যে বিপ্লবী বীর তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের অধিকাংশ সময়ই কারা-প্রাচীরের অন্তরালে যাপন করে গেলেন, যিনি নির্ভয় নিঃশঙ্ক চিত্তে নিজের ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে নিজ মাতৃভূমির কল্যাণ কামনায় জীবন উৎসর্গ করলেন—তাঁর এই সুমহান আদর্শের প্রতি আমরা আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

দেশ স্বাধীন হবার পর স্বদেশীয় হাই পাকিস্তানে কোনও হিন্দুই যখন বসবাস করতে ভরসা পাননি, ত্রৈলোক্য-মহারাজ তখন তাঁর জন্মভূমি কিছুতেই পরিত্যাগ করেননি। বলেছিলেন, দেশত্যাগ বিপ্লবীর ধর্ম নয়।

পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রণীরূপে হয়ে সংখ্যালঘুদের মানবিক অধিকার অর্জনের সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন তিনি তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত।

পাকিস্তানের অপশাসনের অবসান একদিন ঘটবে এই কথা তিনি বিশ্বাস করতেন, আর বিশ্বাস করতেন জনগণের শুভবুদ্ধির ওপর। দেশ বিভাগের ফলে দুই দেশের মধ্যে যে তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছে এবং যার পরিণামে পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের চরম লাঞ্ছনা—দুইটি জাতির মধ্যে সেই বিরোধ এবং অবিশ্বাস নিঃশেষে ঘুচে যাবার দৃঢ় সংকল্প নিয়েই তিনি এদেশে এসেছিলেন যে-সরকারী অতিথিরূপে।

ত্রৈলোক্য-মহারাজের এই অভিযান সার্থক হোক্—এই দুটি দেশের মানুষের মধ্যে প্রীতি ও মৈত্রীর বন্ধন সুদৃঢ় হোক্—আজ আমরা কায়মনোবাক্যে সেই প্রার্থনাই করি!

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

• • •

আধুনিক কালে আমরা জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর একটা বিরোধ অনুভব করি। মৃত্যু যে জীবনের পরিণাম, তাহা নহে, মৃত্যু যেন জীবনের শত্রু। জীবনের পর্বে পর্বে আমরা অক্ষমভাবে মৃত্যুর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া চলিতে থাকি। যৌবন চলিয়া গেলেও আমরা তাহাকে টানাটানি করিয়া রাখিতে চাই।...কিন্তু একটুখানি ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি—জীবনের একটি পরিপূর্ণ পরিণাম আছে, সকল কর্ম সকল সাধনার একটি পরিপূর্ণ পরিসমাপ্তি আছে এবং সেই পরিসমাপ্তিই আমাদের প্রত্যেকের একমাত্র চরম চরিতার্থতা—তাহার নিকট আর সমস্তই তুচ্ছ।

মানুষের জীবনকে এমনি করিয়া চালাইলেই তবে তাহার আত্মগতত পূর্ণ তাৎপর্য পাওয়া যায়। তবেই সমুদ্র হইতে যে মেঘ উৎপন্ন হইয়া পর্বতের রহস্যগূঢ় গুহা হইতে নদীরূপে বাহির হইল, সমস্ত যাত্রাশেষে আবার তাহাকে সেই সমুদ্রের মধ্যেই পূর্ণতররূপে সম্মিলিত হইতে দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করি। মাঝপথে যেখানেই হউক তাহার অকস্মাৎ অবসান যেমন অসঙ্গত তেমনি অসমাপ্ত।

একথা যদি অন্তরের সঙ্গে বুঝিতে পারি তবে বলিতেই হইবে এই সত্যকে উপলব্ধি করিবার জন্য সকলকেই নানা পথ দিয়া নানা আঘাতে ঠেকিয়া বারবার চেষ্টা করিতেই হইবে।

মানুষের আত্মাকে মুক্ত হইতে হইবে, তবেই মানুষের এতকালের সমস্ত চেষ্টা সার্থক হইবে—নহিলে ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্!

—রবীন্দ্রনাথ

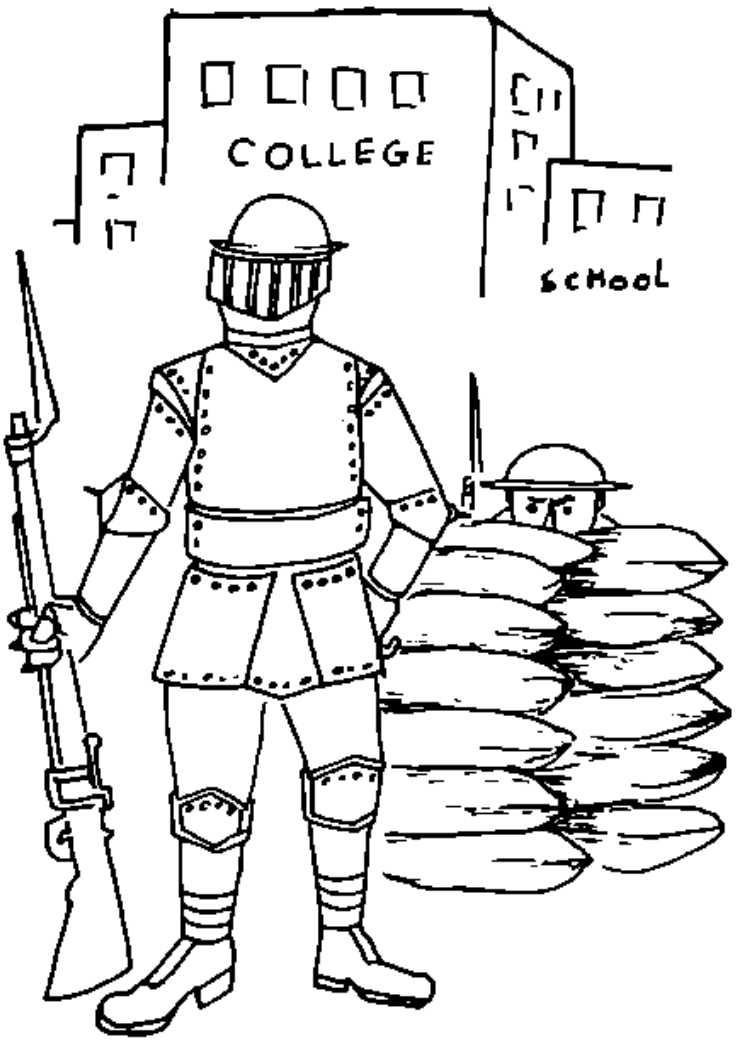

আর ভয় নাই!

শিক্ষা এখন সুরক্ষিত···

……রোগী কেমন দেখলেন ?

মোটেই ভাল নয় !

কিছু রঙ কিছু বেরঙ

ধারাবাহিক উপন্যাস

বিমল মিত্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ ২ ॥

কদমতলীর বর্ডার ফোর্সের কম্যাণ্ডার হরবিলাস সিং বৃদ্ধ-কেরৎ মানুষ। কোথায় শেয়ালকোট না পাঞ্জাবের কোন্ এক গাঁয়ে ঘটনাক্রমে জন্মগ্রহণ করেছিল। তারপরে কোথায় আফ্রিকা, কোথায় আরব, কোথায় বর্মা সিঙ্গাপুর, সব জায়গায় জীবন কাটিয়ে এসে পড়েছিল এই পাওব-বর্জিত দেশ কদমতলীতে। এ গাঁয়ে না আছে একটা বেড়াবার জায়গা, না আছে মেলামেশা করবার মত একটা লোক।

তবু চাকরি হলো চাকরিই। প্রথম প্রথম বাঙলা দেশে এসে খুব খারাপ লাগতো। ছেলে-মেয়ে বউ পড়ে ছিল সেই পাঞ্জাবের আর একটা গাঁয়ে। আর অন্য এক দেশের অন্য এক গাঁয়ে এসে ডাকাত তাড়াতে হচ্ছে।

তা ডাকাতই বটে।

প্রথম দিকে একটা জিপ্ নিয়ে ঘুরতো গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে। বাঙলা দেশের অনেক গ্রামে কাটিয়ে এসেছে হরবিলাস সিং। ওদিকে সুন্দরবন, টাকি, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি। কোনও জায়গা আর বাকি নেই ঘুরতে। তারপর এসেছে এই নদীয়া জেলায়। এই কদমতলীতে। কিন্তু ততদিনে একটু একটু বাঙলা বলতে শিখে গিয়েছিল।

বলতো—হামি বাঙলা বলতে পারি মোশাই—

হরবিলাস সিং-এর ভাঙা বাঙলা শুনে বারোয়ারীতলার সবাই হাসতো।

শুকদেব ঘোষের দোকানের সামনের খাচায় সকাল বেলার দিকে রোজ একটা আড্ডা বসতো। কদমতলীর কিছু প্রবীণ লোক এসে সেখানে হুঁকো টানতো বসে বসে। বারোয়ারীতলাটা বেশ ছায়া-ছায়া জায়গা। মাথার ওপর গোটা কয়েক অশথ আর বটগাছ ডাল-পালা মেলে জায়গাটাকে ঠাণ্ডা রাখতো সমস্ত দিন। দক্ষিণ দিকের কোণটাতে ছিল পশুপতির চায়ের দোকান। পশুপতির চায়ের দোকানের সামনেও একটা বাঁশের মাচা ছিল।

একদিন হরবিলাস সিং জিপ্-এ চড়ে সেখানে এসে হাজির।

শুকদেব কম্যাণ্ডার সাহেবের দিকে এগিয়ে গেল।

বললে—কিছু কিনবেন হুঁজুর?

হরবিলাস সিং গাড়ি থেকে নামলো। দুটো হাত জোড় করে সকলের দিকে চেয়ে বললে নমস্কার—আমি বর্ডার ফোর্সের কম্যাণ্ডার হরবিলাস সিং; আপনাদের সঙ্গে আলাপ করতে এলুম—

বেশ এক মিনিটেই ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল সকলের সঙ্গে। এর আগেও অনেক কম্যাণ্ডার এসেছে, কিন্তু এমন করে গ্রামের লোকের সঙ্গে কেউ মেলা-মেশা করেনি। তারা পুব-পাড়ার ক্যাম্প-বাড়িতে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করেছে। আর নদীর ধারে-ধারে ঘুরে ডিউটি দিয়েছে।

পশুপতি লোকটা চালাক আছে। সে এক কাপ গরম চা এনে দিয়ে বললে—একটু চা খান হুঁজুর, গরম চায়ে মুখ ভিজিয়ে নিন্—

হরবিলাস সিং তো অবাক। বললে—আমি তো ক্যাম্প থেকে চা খেয়ে এসেছি, আবার চা কেন?

পশুপতি বললে—আপনি হুঁজুর আমাদের বর্ডার ফোর্সের কম্যাণ্ডার, আমাদের গাঁয়ের অতিথি—

হরবিলাস হেসে চায়ের কাপটা নিলে। তারপর পকেট থেকে পয়সা বার করে দিতে গেল।

বললে—কত দাম?

পশুপতি হাত জোড় করে বললে—ওর দাম আর দিতে হবে না হুঁজুরকে, আমি এমনিই খেতে দিলাম—

—তা কি হয়?

বলে হরবিলাস সিং সাহেব জোর করে দু'আনা পয়সা পশুপতির হাতে গুঁজে দিলে।

বললে—নাও তুমি, নাও। তুমি গরীব মানুষ, তুমি কেন লোকসান করবে?

পশুপতি নিচ্ছিল না কিছুতেই। কিন্তু সেখানে আরো যত লোক ছিল সবাই বললে—তুমি নাও পশুপতি, হুঁজুর যখন বলছেন তখন নাও—

সকলের কথায় পশুপতি পয়সা ক'টা নিলে।

নিবারণ চক্রবর্তীও শুকদেবের দোকানে বসে হুঁকো খাচ্ছিলেন। তিনি সিং সাহেবকে বললেন—ও বড় গরীব, জানেন হুজুর। বউ মারা যাবার পর দু'টা ছেলে-পুলে নিয়ে একেবারে নাজেহাল হচ্ছে। তাই আমি ওকে চায়ের দোকান করে দিয়েছি—

হরবিলাস সিং সাহেব এবার নিবারণ চক্রবর্তীর দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলে। বেশ ভবিষ্যুক্ত চেহারা দেখে মনে হলো কয়তলীর মাতব্বর কোনও ব্যক্তি হবেন নিশ্চয়ই।

বললে—আপনিই কি চক্রবর্তী মশাই? আপনার নাম আমি শুনেছি—

নিবারণ চক্রবর্তীর মনটা খুব প্রসন্ন হলো।

বললেন—আপনি আর কতটুকু জানেন কম্যাণ্ডার সাহেব। এই যে কয়তলী গাঁ দেখছেন, এককালে এখানকার গরু-বাঘ সব আমার ঠাকুর্দার নামে এক ঘাটে জল খেত—

হরবিলাস সিং সাহেবের সঙ্গে কথাগুলো শুনতে লাগলো। নিবারণ চক্রবর্তী একবার নিজের বংশের কীর্তি-কলাপের কথা বলবার সুযোগ পেলে আর ছাড়েন না। কবে তাঁর ঠাকুর্দা একটা লাঠির ঘায়ে একশো ডাকাত হটিয়ে দিয়েছিলেন, কবে একবার তাঁর ঠাকুর্দা বর্শা দিয়ে উদোর অঞ্চলে গিয়ে বাঘ মেরেছিলেন তারই গল্প ফেঁদে বসলেন।

সকাল বেলার বারোয়ারীতলা। কম্যাণ্ডার সাহেবকে দেখে আস্তে আস্তে ক্রমেই শুকদেব ঘোষের দোকানের সামনে বেশ ভিড় জমে গিয়েছিল।

নিবারণ চক্রবর্তী ডেকে উঠলেন—এ্যাই, তোরা এখানে কী দেখছিস? একটু সরে দাঁড়া না বাপু, দেখছিস বন্দুক রয়েছে সাহেবের কাছে—

নিবারণ চক্রবর্তীর কথায় সবাই একটু দূরে সরে গিয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু একেবারে চলে যেতে পারলে না। গ্রামের লোকজন এমন বন্দুক আগে কখনও কাছ থেকে দেখেনি। আগেও কম্যাণ্ডার দেখেছে, কিন্তু এমন কাছাকাছি দাঁড়িয়ে কখনও দেখেনি।

শুকদেব আর থাকতে পারলে না। বললে—আচ্ছা হুজুর, আপনার এই বন্দুকের গুলি লাগলে মানুষ মরে যাবে?

নিবারণ চক্রবর্তী বললেন—আরে তুই থামতো শুকদেব, বোকার মত কথা বলিসনি, লোকে হাসবে। একেবারে গেঁয়ো ভূত—

কিন্তু হরবিলাস সিং সাহেব হাসলে না। বললে—এই বন্দুক দিয়ে অনেক লোক মেরেছি।

কেদার জিজ্ঞেস করলে—কত লোক মেরেছেন হুজুর, দশ বারোজন হবে?

হরিবিলাস সিং বললে—দশ বারো জন কেন, দশ হাজার পনেরো হাজার তো বেকসুর হবে—

যারা দাঁড়িয়ে ছিল আশে পাশে তারা কথাটা শুনে চমকে উঠলো। যে-বন্দুক দিয়ে দশ বারো হাজার মানুষ মারা হয়েছে তা চোখে দেখতে পাওয়াও তো ভাগ্যের কথা।

শুকদেব আগে কখনও বন্দুক দেখেনি এত ভালো করে।

সে এক অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসলো। বললে—আচ্ছা মানুষ মারতে আপনাদের কষ্ট হয় না হুজুর?

হরিবিলাস সিং সাহেব হেসে উঠলো।

বললে—কষ্ট হলে কি নোকরি থাকবে?

শুকদেব বুঝতে পারলে না কথার মানেটা। বললে নোকরি কী?

নিবারণ চক্রবর্তী রেগে উঠলেন শুকদেবের ওপর। বললেন—তুই থাম্ তো শুকদেব, বোকার মত কথা বলে তুই আর লোক হাসাস নে—নোকরি মানে চাকরি রে চাকরি—

বারোয়ারীতলায় সেদিনকার সকালবেলার আড্ডাটা তখন বেশ জমে উঠেছে। যারা শুকদেবের দোকানে সওদা করতে এসেছিল, তারাও সওদা করতে ভুলে গেল। রীতিমত লোকের ভিড় জমে গেল দোকানের সামনে। সাধারণতঃ হাটের দিন ছাড়া এমন ভিড় বড় একটা হয় না। হরবিলাস সিং সাহেব কত দেশ দেখেছে, কত দেশ ঘুরেছে, কত যুদ্ধ করেছে, কত মানুষ খুন করেছে তারই গল্প করে যাচ্ছিল। আর লোকেরা হাঁ করে শুনছিল সব কথা।

হঠাৎ ধাঁ করে জিপ্ গাড়ির হর্ণটা বেজে উঠলো।

বেজে উঠতেই সবাই চোখ ফিরিয়ে দেখে কালী ঘোষের ছেলে কেষ্ট কখন চুপি চুপি গাড়ির ভেতরে উঠে হর্ণ টিপছে।

—কে রে ওটা? কে?

নিবারণ চক্রবর্তী রেগে-মেগে গিয়ে হুঁকো হাতেই উঠে দাঁড়ালেন। অনাচার-অবিচার রোধ করা তাঁরই কাজ।

বললেন—ওটা কে ? কাদের ছেলে ?

কেদার তাড়াতাড়ি গাড়ির কাছে গিয়ে কেষ্টকে এক ধাক্কায় মেঝে নামিয়ে নিয়েছে। নামিয়ে আরো ঘা-কতক বসিয়ে দিলে। বললে—বেয়াদপ্ ছেলে কোথাকার, বলা নেই কওয়া নেই, একেবারে পুলিশের গাড়িতে বসে আছে—

নিবারণ চক্রবর্তী কিন্তু তখনও তাঁর প্রশ্নের উত্তর পাননি।

বললেন—আরে আমার কথার উত্তরই দিচ্ছে না কেউ, বলি কাদের ছেলে ওটা ? কে ও ?

গুরুদেব বললে—আজ্ঞে দক্ষিণ পাড়ার কালী ঘোষের ছেলে—

নিবারণ চক্রবর্তী তবু চিনতে পারলেন না। বললেন—কালী ঘোষ কে ?

কালী ঘোষ হচ্ছে পাকিস্তানী। জামনগর থেকে পার্টিশনের সময় নদী পেরিয়ে কদমতলী এসেছে। এসে দক্ষিণপাড়ায় একটা চালা বানিয়েছে।

নিবারণ চক্রবর্তী বললেন—ও তাই বল্ না, ফুলে গয়লার জামাই—

এতক্ষণে নিবারণ চক্রবর্তীর যেন বোধগম্য হলো ব্যাপারটা। বললেন—তোরা সোজা কথায় কখনও উত্তর দিবিনে।

বলে এগিয়ে গেলেন জিপ্ গাড়িটার দিকে। বাঁ হাতে হুঁকোটা নিয়ে ডান হাতে ফুলে গয়লার নাতির কানটা ধরলেন। ধরে খুব কষে মোচড় দিলেন। তারপর কষালেন এক চড়।

বললেন—খুব শয়তান হয়েছিস, না ?

কেষ্ট ভ্যাক্ করে কেঁদে ফেলেছে।

—আবার কাঁদে। চুপ কর হারামজাদা, চুপ কর। মেরে একেবারে মাথা ভেঙে পাট করে রেখে না। আবার কান্না হচ্ছে—

হরবিলাস সিং পুলিশের লোক হলে কী হবে। তারও বোধহয় দয়া-মায়া বলে একটা বস্তু ছিল শরীরে। সে এগিয়ে গিয়ে ছেলেটাকে ধরে ছাড়িয়ে নিলে।

বললে—গাড়িতে চক্কেছে তা কী হয়েছে বাবুজী, গাড়ি তো চড়বার জন্যেই হয়েছে—

নিবারণ চক্রবর্তী বললেন—না, ওকে অত আশ্কারা দেবেন না কম্যাণ্ডার সাহেব। বড় বজ্জাৎ ছেলে। ওরা বাড়ে-বংশে বজ্জাৎ। ওর দাদামশাই ফুলে গয়লাকে তো চেনেন না কম্যাণ্ডার সাহেব—চিনলে আর অত আশ্কারা দিতেন না ওকে—

—ফুলে গয়লা কে ? কোথায় থাকে ?

নিবারণ চক্রবর্তী বললেন—সে এখন স্বর্গে থাকে কম্যাণ্ডার সাহেব। স্বর্গে বললে ভুল হবে, নরকেই থাকে বলতে পারেন। বাদুনের চল্লিশটা টাকা ঠকিয়ে কখনও স্বর্গে কেউ যেতে পারে ? আপনিই বলুন! এখনও তো চন্দর সুযি উঠছে, না কি উঠছে না ?

কম্যাণ্ডার সাহেব স্বীকার করলেন যে চন্দ্র সূর্য উঠছে।

নিবারণ চক্রবর্তীর বাঁ হাতে তখনও হুঁকোটা তেমনি ধরা রয়েছে। রাগের জ্বালায় অতটা খেয়াল ছিল না। হাতটা কেমন একটু নড়ে গিয়েছিল। নড়ে যেতেই কলকেটা উল্টে মাটিতে পড়ে গেল। আগুনের একটা বড় টুক্রো গিয়ে পড়লো কম্যাণ্ডার সাহেবের জামার ওপর। আর সঙ্গে সঙ্গে জামাটা দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠলো।

কিন্তু হাত দিয়ে তখনই হরবিলাস সিং সাহেব আগুনটা নিভিয়ে ফেলেছে।

নিবারণ চক্রবর্তী কাণ্ড দেখে কেমন হয়ে গিয়েছিলেন। বললেন—ইস্, আপনার জামাটা পুড়ে গেল নাকি?

কম্যাণ্ডার সাহেব বললে—না, বেশি পোড়েনি,—আগুনটা নিভিয়ে দিয়েছি।

নিবারণ চক্রবর্তী পোড়া জামাটায় হাত দিয়ে দেখলেন ভালো করে। তার নিজের দোষেই কম্যাণ্ডার সাহেবের জামাটা যে পুড়ে গেল এটা তাঁর মনে হলো না। মনে হলো যেন সেই দুলে গয়লারই সব কিছু অপরাধ। আর সেই মৃত দাদামশাইকে সামনে না পেয়ে সমস্ত রাগটা যেন গিয়ে পড়লো দুলে গয়লার নিরপরাধ নাতিটার ওপর। এক মুহূর্তে আবার আগুন হয়ে উঠলেন। তারপর হাতের হুঁকোটা কেদারের হাতে গুঁজে দিয়ে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কেষ্টর ওপর।

বললেন—আয় ইদিকে, ইদিকে আয় হারামজাদা, আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন—

বলে কম্যাণ্ডার সাহেবের হাত থেকে কেষ্টকে ছিনিয়ে নিলেন। নিয়ে কেষ্টর মাথাটা একহাতে ধরে আর একহাতে একটার পর একটা চড় কষাতে লাগলেন—

হঠাৎ কে যেন সামনে এসে কেষ্টকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে নিবারণ চক্রবর্তীর সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল

বললে—করছেন কী? ছেলেমানুষ, মরে যাবে যে?

নিবার চক্রবর্তী মুখ তুলে সামনে চেয়ে দেখলে শশীপদ।

নিবারণ চক্রবর্তীও অবাক, শশীপদও অবাক।

শশীপদ তখন কেষ্টকে সরিয়ে দিয়ে বললে—যা, তুই বাড়ি যা—

কেষ্ট আর দেরি করলে না, দক্ষিণপাড়ার বাড়ির দিকে লক্ষ্য করে দৌড় দিলে।

শশীপদ বললে—ওকে অত মারছিলেন কেন খুড়োমশাই? ও যে মারা যেত!

নিবারণ চক্রবর্তী বললেন—মারবো না তো কী করবো, কোলে তুলে কেউটে সাপকে আদর করবো? দুলে গয়লা যে আমার চল্লিশটা টাকা মেরে দিয়ে পটল তুললো, সে সব কথা তোর মনে নেই?

শশীপদ বললে—কিন্তু সে তো খুড়োমশাই অনেক কাল আগেকার কথা, সে কবে চুকে-বুকে গেছে, তার নাতি এখন কী দোষ করলো?

—কী দোষ করেছে? এই ছাখ্ কী দোষ করেছে, কম্যাণ্ডার সাহেবের জামাটার দিকে চেয়ে ছাখ! ছাখ্, কত বড় হারামজাদা—

শশীপদ কম্যাণ্ডার সাহেব হরবিলাস সিং-এর জামাটার দিকে চেয়ে দেখলে। হ্যাঁ, বুক-পকেটের কাছে আগুনে সত্ত পোড়া দাগ। জামার ওপরে একটা মস্ত ফুটো হয়ে গেছে।

—আপনার জামা আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে?

নিবারণ চক্রবর্তী বললেন—তা পুড়িয়ে দিয়েছে না তো কি আমি মিথ্যে কথা বলছি? আমি বুড়ো মানুষ হয়ে মরতে চললাম আর ওই দুলে গয়লার নাতিটাই হলো সত্যিবাদী যুধিষ্ঠির?

শশীপদ সে কথার উত্তর না দিয়ে হরবিলাস সিং-এর দিকে তাকিয়ে বললে—আপনার এ জামাটা মেরামত করতে যা দাম লাগে আমি দেব। আপনি বলুন কত টাকা দিতে হবে, আমি আপনার ক্যাম্পে গিয়ে টাকা দিয়ে আসবো—

হরবিলাস সিং বুঝতে পারলে না কথাটা।

জিজ্ঞেস করলে—কীসের টাকা?

—আপনার জামা খুলে যাওয়ার ক্ষতিপূরণ—

হরবিলাস সিং বললে—ও টাকা আপনাকে দিতে হবে না।

শশীপদ বললে—আমি না দিলে কে দেবে? ওদের দেবার ক্ষমতা নেই। ওরা ও-পারের জীবনপণ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এপারে এসেছে প্রাণের দায়ে, ওরা পরের ক্ষেতে মজুরি করে যা পায় তাইতেই ওদের সংসার চলে, ওরা টাকা দেবে কোত্থেকে?

তারপর একটু থেমে বললে—আর টাকা যে আমার নিজেরও আছে তাও নয়। তবু আপনার লোকসান হোক এটা আমি চাই না। যা'হোক আমি চললাম, কাল পরশুর মধ্যে আমি আপনার ক্ষতি দিয়ে টাকা দিয়ে আসবো, এখন চলি—

বলে আর সেখানে দাঁড়ালো না। যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাৎই আমার বারোয়ারীতলা ছেড়ে বাড়ির দিকে চলে গেল।

শশীপদ যখন সকলের দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে তখন প্রথম নিবারণ চক্রবর্তীর মুখে কথা ফুটলো।

বললেন—দেখলে তো, সবাই দেখলে তো? গদাধর ছেলেটার কাণ্ড দেখলে তো তোমরা? ছলে পরলার নাতিকে মেরেছি বলে কত কথা শুনিয়ে গেল তা দেখলে তো তোমরা সবাই? আমার চল্লিশটা টাকা গচ্চা গেল তার বেলায় তো তুই এতটুকু উচ্চি-বাচ্চি করলি নে? আর তার নাতিকে মেরেছি বলে যত অপরাধ হলো আমার? হায় রে কলিকাল!

শুকদেব বললে—টাকার পরম হয়েছে বোধহয় খুড়োমশাই, শুনলেন না টাকার কথা বলে গেল আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে—

নিবারণ চক্রবর্তী তাচ্ছিল্যভরে বললেন—আরে শশী কি না আমাকে টাকার পরম দেখায়, তোমরা তো নিজের কানেই শুনলে! আমি তো সেই জন্যেই কিছু কথা বললাম না। ভাবলাম ছেলেমানুষ, বলছে বলুক। এখনও খাতা খুলে তোমাদের দেখিয়ে দিতে পারি, সতেরো টাকা তিন আনা এখনও আমার পাওনা আছে—

কেদার বললে—তা মাষ্টারমশাই তো এখন মাইনে পাচ্ছে, এখন টাকাটা চাইলেই পারেন আপনি খুড়োমশাই—

নিবারণ চক্রবর্তী বললেন—তুইও যেমন কেদার, আমি গদাধরের ছেলের কাছে টাকার তাগাদা করবো? শশীকে আমি যে জন্মাতে দেখেছি রে। শশী যদি আমার সঙ্গে খারাপ ব্যাভার করে তো আমি শশীর সঙ্গে খারাপ ব্যাভার করবো? ও যে আমার ছেলের বয়সী রে। আমার একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই?

ছেলের বয়েসী মানুষের সঙ্গে যে অসভ্য ব্যবহার করা যায় না এ-যুক্তিটা সকলের কাছেই গ্রহণযোগ্য হলো। কিন্তু এ-কথা কেউই সেদিন জিজ্ঞেস করলে না যে ছলে পরলার চল্লিশ টাকা দেনার জন্যে কেন তার নাতির বয়েসী কেষ্টর সঙ্গে অত খারাপ ব্যবহার তিনি করলেন। কিম্বা কথাটা কয়েকজনের মনে উদয় হলেও মুখ ফুটে হয়ত তা প্রকাশ করলে না। আর প্রকাশ করে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনবে এমন নির্বোধ এ-যুগে কে-ই বা আছে! বিপদে আপদে তো সকলকেই টাকার জন্যে নিবারণ চক্রবর্তীর কাছে যেতে হয়।

যা'হোক, সেদিনকার বারোয়ারীতলার সকালবেলার আসরটা মন্দ জমলো না। যারা মওকা করতে এসেছিল, কিম্বা যারা ভিড় দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছিল তারা একটা মুখরোচক খবর পেয়ে গেল বিনা খরচে!

হরবিলাস সিং কম্যাণ্ডার সাহেব আগেই ক্যাম্পের দিকে চলে গিয়েছিল। শেষে নিবারণ চক্রবর্তীও উঠলেন।

উঠে বললেন—তা যা-ই বলো নতুন কম্যাণ্ডার সাহেব ব্রেজ হলে কী হবে, মানুষটা ভালো হে, বামুনের ওপর ভক্তি-শ্রদ্ধা আছে—

বলে আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে চলে গেলেন।

এসব আজকের ঘটনা। কদমতলীর সমাজের আসলরূপটা জানতে হলে আগের ঘটনাও কিছু বলতে হবে। ওই লক্ষ্মী, শশীপদ, শুকদেব, নিবারণ চক্রবর্তী, কেদার, পশুপতি, ওরা সব কদমতলীর সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিভূ। তারপর থেকে যখন দুলে ঘোষের জামাই কালী ঘোষ উধাও হয়ে আসেনি ওরা তখনও ছিল। তখনও প্রতিদিন সকালে বারোয়ারীতলার মাচার ওপর বসে সবাই আড্ডা জমিয়েছে। আবার এখনও জমায় কিন্তু তখনও শশীপদ ওদের সঙ্গে আড্ডা দেয় নি, এখনও দেয় না।

বলে—সময় পাইনে ভাই, স্কুলে মাষ্টারি করতে হয় তো—

কিন্তু সবাই জানে ওটা আসল কথা নয়। আসল কথা শশীপদ এই গ্রামবাসী হয়েও যেন গ্রামছাড়া। অথচ গ্রাম নিয়েই তার যত ভাবনা। তাই পরের দিনই শশীপদ একেবারে সোজা ক্যাম্পে গিয়ে হাজির। সামনে বন্দুক নিয়ে পাহারা দিচ্ছিল একজন সেপাই।

শশীপদ কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—কম্যাণ্ডার সাহেব ক্যাম্পে আছেন?

সেপাইটা জানালো সাহেব নেই, ডিউটিতে বেরিয়ে গেছে।

কী আর করবে শশীপদ তাই ফিরেই আসছিল। কিন্তু রাস্তাতেই দেখা হয়ে গেল কম্যাণ্ডারের সঙ্গে। হরবিলাস সিং আগে আগে আসছিল তার পেছনে খাকী পোষাক পরা একদল বন্দুকধারী পুলিশ মার্চ করতে করতে আসছিল।

শশীপদ সামনে এগিয়ে গিয়ে বললে—আমি আপনার কাছে এসেছিলাম, কালকে আপনার জামা-পোড়ার ক্ষতিপূরণের টাকা নিয়ে এসেছি—

[ক্রমশঃ

• • •

কলকাতা সহরের বক্ষ তখন পাথরে বাঁধানো হয়নি। অনেকখানি কাঁচা ছিল···বাঁধা নালা বেয়ে গলার জল ঝর্‌ণার মতো ঝরে পড়ত আমাদের দক্ষিণ বাগানের পুকুরে। মাঝে মাঝে গলি থেকে পাল্কী বেহারার হাইহুঁই শব্দ আসত কানে। সন্ধ্যাবেলায় জলত তেলের প্রদীপ। তারি ক্ষীণ আলোয় মাদুর পেতে বুড়ী দাসীর কাছে শুনতুম রূপকথা।

—রবীন্দ্রনাথ

আজিকার ভাবনা

জাতির এই মহাসংকট মুহূর্তে আজ আমাদের একান্ত প্রয়োজন আত্মপ্রত্যয় ও আত্মবিশ্লেষণের, প্রয়োজন আত্মসমীক্ষার। আজ আমাদের এক বীরজাতি গড়ে তুলতে হবে। আজ মানুষ হওয়া ও মানুষ করাই আমাদের প্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য। স্বামীজীর সেই মহান বাণী Man making is my Mission—তাকে কার্যকরীভাবে অনুসরণ করতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর জীবনব্যাপী বিরাট সাধনায় যে আধ্যাত্মিক সাধনার ও চিত্তশুদ্ধির পথ দেখিয়ে গিয়েছেন, সেই জীবন সাধনাই হোক আমাদের কর্মপথের প্রধান প্রেরণা। আজ একান্তভাবে মনে রাখতে হবে, কি বিরাট আত্মিক ভাবসম্পদের উত্তরাধিকারী আমরা, যার কথা ভুলে আজ আমরা বিভ্রান্ত হয়ে চলেছি। আজকের বহু-মতবাদ কণ্টকিত জীবনে, ভারতবর্ষ কোন ধর্মকে আশ্রয় করে কোন পথ অনুসরণ করে তার ঐতিহাসিক সত্তার মহিমাকে বজায় রাখবে, স্বামীজী তার সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। স্বামীজীর চিন্তাধারার উত্তর সাধক নেতাজী সুভাষচন্দ্র। আজ তাঁদের জীবন আদর্শ অনুসরণ করে প্রকৃত মানুষের চিন্তা নিয়ে জাতি ও জাতীয় সংহতিগঠনে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

জাতি যখনই মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়াছে, পুঞ্জীভূত নৈরাশ্যের অন্ধকার যখনই জাতির জীবনে নামিয়া আসিয়াছে, তখনই দেশপ্রেমিক মহামনাবগণ জাগরণের গান গাহিয়াছেন। তাঁহাদের সেই আহ্বান এখনও দিকে দিকে ধ্বনিত হইতেছে। তাঁহারা যে ভাষায় জাতিকে আহ্বান করিয়াছিলেন সেই অগ্নিময়ী ভাষায় আমরা তাঁহাদের আহ্বান শুনিব।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী। আমরা বলি জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই—স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জ সমীরণ শীতলা শস্য শ্যামলা—"

—'বন্দেমাতরম্'

"এ বাহুতে কি বল নাই···

এ হৃদয়ে কি সাহস নাই? ডাক তবে মুহূর্তে মধুকৈটভভাবে।—যিনি মধুকৈটভ বিনাশ করিয়াছেন—যিনি হিরণ্যকশিপু, কংস, বজ্রবক্র, শিশুপাল প্রভৃতি দুর্জয় অসুরগণের নিধন সাধন করিয়াছেন—যাঁহার চক্রের ঘর্ঘর নির্ঘোষে মৃত্যুরও শম্ভু ভীত হইয়াছিলেন—যিনি অজেয়, রণে জয়দাতা, আমরা তাঁর উপাসক, তাঁর বলে আমাদের বাহুতে অনন্ত বল—তিনি ইচ্ছাময়—ইচ্ছা করিলেই আমাদের জয়লয় হইবে। ··· তাঁহার পদ স্পর্শ করিয়া যে মহাব্রতে আমরা ব্রতী হইয়াছি, অবশ্য সেব্রত আমাদিগকে সাধন করিতে হইবে। ··· আমাদের ভাবী মঙ্গলের বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু যেমন দৈবানুগ্রহ ভিন্ন কোন কার্য সিদ্ধ হইতে পারে না, তেমনি পুরুষকারও চাই।"

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

• • •

তবে এস, ভ্রাতৃগণ! স্পষ্ট করিয়া চক্ষু খুলিয়া দেখ, কী ভয়ানক দুঃখরাশি ভারত ব্যাপিয়া। এ ব্রত গুরুতর, আমরাও ক্ষুদ্র শক্তি। তাহা হউক, আমরা জ্যোতির তনয়, ভগবানের তনয়। ভগবানের মহিমা ঘোষিত হউক। আমরা সিদ্ধিলাভ করিবই করিব। শতশত লোক এই চেষ্টায় প্রাণত্যাগ করিবে, আবার শতশত লোক উঠিবে। প্রভুর জয়! আমি এখানে অকৃতকার্য হইয়া মরিতে পারি, আর একজন এই ভার গ্রহণ করিবে। রোগ কি বুঝিলে, ঔষধ কি তাহা জানিলে, কেবল বিশ্বাসী হও। বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি, অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি। তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, অগ্রসর হও, প্রভু আমাদের নেতা। পশ্চাতে চাহিও না, কে পড়িল দেখিতে যাইও না। এগিয়ে যাও, সম্মুখে, সম্মুখে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

'Awake, arise and stop not till
the goal is reached'.

About the glorious future of India visualised by Swamiji, he himself declared: "Once more the wheel is turning up, once more vibrations have been set in motion in India which are destined at no distant date, to reach the farthest limits of the earth." "Before the effulgence of this new awakening in India, the glory of all past revivals will pale like stars before the rising sun, and compared with this mighty manifestation of renewed strength, all the many past epochs of renaissance will be mere child's play."

• • • •

'ভারতবর্ষের লক্ষ্য ছিল সকলকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করা, কিন্তু তাহার উপায় ছিল স্বতন্ত্র। ভারতবর্ষ সমাজের সমস্ত প্রতিযোগী বিরোধী শক্তিকে সীমাবদ্ধ ও বিভক্ত করিয়া সমাজ কলেবরকে এক এবং বিচিত্র কর্মের উপযোগী করিয়াছিল; নিজ নিজ অধিকারকে ক্রমাগতই লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করিয়া বিরোধ বিশৃঙ্খলা জাগ্রত করিয়া তুলিতে দেয় নাই। পরস্পর প্রতিযোগিতার পথেই সমাজের সকল শক্তিকে অহরহ সংগ্রাম পরায়ণ করিয়া তুলিয়া ধর্ম কর্ম গৃহ সমস্তকেই আবর্তিত আবিল উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া রাখে নাই। ঐক্য নির্ণয় মিলন সাধন এবং শান্তি ও স্থিতির মধ্যে পরিপূর্ণ পরিণতি ও মুক্তি লাভের অবকাশ, ইহাই ভারতবর্ষের লক্ষ্য ছিল।

.....ঐক্যমূলক যে সভ্যতা মানব জাতির চরম সভ্যতা। ভারতবর্ষ চিরদিন ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তি নির্মাণ করিয়া আসিয়াছে। পর বলিয়া সে কাহাকেও দূর করে নাই, অনার্য বলিয়া সে কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই, অসংগত বলিয়া সে কিছুকেই উপহাস করে নাই। ভারতবর্ষ সমস্তই গ্রহণ করিয়াছে, স্বীকার করিয়াছে। এত গ্রহণ করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে হইলে এই পুঞ্জীভূত সামগ্রীর মধ্যে নিজের ব্যবস্থা, নিজের শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে হয়, পশু যুদ্ধ-ভূমিতে পশুদলের মতো ইহাদিগকে পরস্পরের উপর ছাড়িয়া দিলে চলে না।'

• • • •

• • •

'হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে—
বন্ধন হোক ক্ষয়।
তোমারি হউক জয়।'

• • •

'প্রভাত সূর্য, এসেছে রক্ত সাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে,
অন্তরবহ্নি জ্বালাও চিত্ত-মাঝে—
মৃত্যুর হোক লয়।
তোমারি হউক জয়।'

—রবীন্দ্রনাথ

বন্যা কন্যা

উপন্যাস

অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত

[পূর্বকথা : সরসিজ মজুমদারের মেয়ে বনছায়া। বাপ বড়লোক হওয়া সত্ত্বেও বনছায়া চাকরি করে, গল্প উপন্যাস লেখে। বড় সাহিত্যিক হবার স্বপ্ন দেখে। কখনও বা ভাবে জার্নালিস্ট হই যেহেতু আজকাল সাহিত্যের চেয়ে জার্নালিজমেই বেশি গ্ল্যামার। সম্পাদক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক অনেকের সঙ্গেই দহরম-মহরম করে। সুবীর নামে এক আধুনিক কবিকে ভালোবাসে। যে কিনা বড়লোকের মেয়ে পরিবকে ভালোবাসতে পারে, ভালোবাসতে পারলেও বিয়ে করতে পারে, এমন প্রবাদে বিশ্বাস করে না। বনছায়া যেমন কবিকে ভালোবাসে তেমনি এক ঔপন্যাসিককেও ভালোবাসে। তার নাম সন্দীপ সেন। কিন্তু সুবীর যদি সমুদ্রের মত উত্তাল, সন্দীপ পাহাড়ের মতই ধীরস্থির। সন্দীপও দুঃস্থ কিন্তু আদর্শনিষ্ঠ। দারিদ্র্য যেন তার আদর্শকে ম্লান করতে না পারে সে সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ। সরসিজ মেয়ের জন্যে হিমাংশু বোস নামে এক কৃতী এঞ্জিনিয়র ঠিক করেছে, কিন্তু বনছায়া তাকে বিয়ে করতে রাজি নয়। তাকে রক্ষা করতে কে এগিয়ে আসবে? সন্দীপ না সুবীর? না, বনছায়া শেষ পর্যন্ত হিমাংশুকেই বরণ করবে? হিমাংশুর বন্ধু আর মুকুলিকা দেবজ্যোতি ভৌমিক, যে অফিসে বনছায়ার বস্, তার দৃষ্টিও না কোন বনছায়ার দিকে। বনছায়া প্রেমের জন্যে কেরিয়র মাটি করবে, না কেরিয়রের জন্যে প্রেম?

অতঃপর সরসিজের বাড়িতে টি-পার্টিতে নিমন্ত্রিত হল হিমাংশু। বনছায়াকে পাত্রী হিসাবে মনোনীত করল। তার ফার্মে অনেক চাকরি আছে—বনছায়া চাইল সুবীরকে সুপারিশ করতে। সে সুপারিশ গ্রহণ করল হিমাংশু, সুবীরকে চাকরি দিল। সুবীর ভাবতেই পারেনি এমন অঘটন ঘটতে পারে। আর সুবীরের চাকরি হবার পর তার সঙ্গে বিয়ের নোটিশ দিল বনছায়া। এ ব্যাপারে হিমাংশু অন্ধকারে। হিমাংশুর সঙ্গে বিয়ের তারিখটা পিছিয়ে দিতে পারলেই নোটিশের মেয়াদ অন্তে সুবীরের সঙ্গে বিয়েটা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হতে পারে। সেই মতলবে হিমাংশুর কাছ থেকে মিথ্যা ওজুহাতে বিয়ের তারিখটা পিছিয়ে নিল বনছায়া। সরসিজবাবু জানলেন হিমাংশুর নিজের সুবিধের জন্যেই তারিখটা দেরা করছে। এখন বনছায়ার ভয় তার আগেই সুবীরের সঙ্গে তার বিয়ের রেজিস্টারটা পাকা করতে পারবে কিনা।

সুবীরের সঙ্গে বনছায়ার বিয়ে নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হল। কিন্তু প্রথম মিলনক্ষণেই মনে হল যেমনটি চেয়েছিল তার চেয়ে কিছু কম পড়ল। আরো কম পড়ল যখন সরসিজবাবু এ ব্যাপারে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেলেন। বনছায়া নূপুর নিক্কণ ত্যাগ না করলে বাবা শান্ত হবেন না।

একটা সুটকেস আর বিছানা নিয়ে বনছায়া বাপের বাড়ি ছেড়ে সুবীরের ঘরে গিয়ে উঠল। যাবার আগে ছোটবৌদি পার্বতীর সিঁদুর কৌটো থেকে সিঁদুর নিয়ে সিঁথিতে ঘন করে রেখা টানল—জগজ্জনকে জানাবার জন্যে যে সে জয়ী, সে সুখী।

সুবীরের কবি-বন্ধুরা ঠিক করল এ বিয়ে-উপলক্ষে সম্পাদক পীযূষ দত্তের বাড়ির ছাদে একটা পার্টি হবে। স্বামীর ঘরে নির্জনে বসে বনছায়া যখন সাজছে তখন দরজায় হিমাংশুর টোকা পড়ল। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল বনছায়া, দরজা খোলে কি না খোলে। কিন্তু স্থির করে কিছু স্থির করবার আগেই দরজা খুলে দিল।

হিমাংশু ঘরে ঢুকে দেখল এক-ঘরের ফ্ল্যাটে ঘসিতা মেয়েটা সুখে সৌভাগ্যে একেশ্বরীর মত বিরাজ করছে। ভাবছে তার এই অহঙ্কারটা চূর্ণ করা যায় কী করে? সে গেল বনছায়ার বন্ধু দেবজ্যোতি কৌমিকের কাছে নালিশ করতে। দেবজ্যোতি বললে, সুবীরকে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিন। আর হিমাংশু বললে, বনছায়ার কাপট্যেরও শাসন হওয়া উচিত। দেবজ্যোতি দায় দিল। বললে, দেখি, ভাবি, কী করা যায়।

আসলে দেবজ্যোতি বনছায়ার মাইনে পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দিল। বনছায়া যে প্রেমের যুদ্ধে জয়ী হয়েছে, কৃতী ও বড়লোক বলে হিমাংশুতে আকৃষ্ট হয়নি, এ যেন তারই পুরস্কার। কিন্তু সুবীরের মুখে এ মাইনে-বাড়ার খবর পেয়ে হিমাংশু ক্ষুব্ধ হল। সুবীর ভেবে পেল না এ প্রতিক্রিয়ার অর্থ কী।

হিমাংশু নানা প্রশ্নে জেনে নিল একটা ছোট ঘরে সুবীর আর বনছায়া কেমন সুখে দিন কাটাচ্ছে। সঙ্গে সান্নিধ্যে তাদের সন্ধ্যাগুলি কী রমণীয়। স্বামীর মাইনে কম স্ত্রীর মাইনে বেশি এ তাদের কাছে কোনো সমস্যা নয়। হিমাংশু চাইল তাদের মধ্যে বিরোধের ছুরি চালাতে। শত্রুতাতেই এখন তার শান্তি। আর শত্রুতার মহত্ত্ব সূক্ষ্মতম কারুকার্যে —অদৃশ্যমান হুত ইতি গজে।

হিমাংশু সুবীরের জন্যে অফিসে ওভারটাইমের ব্যবস্থা করলে। টাকা রোজগার বেশি হবে বুঝে সুবীর তাতে আনন্দিত হল। আর এদিকে বনছায়ার সন্ধ্যাগুলি নিঃসঙ্গ হয়ে উঠল। হিমাংশুই. তার রঙিন মদির সুস্বর সন্ধ্যাগুলি নিল হরণ করে। আবার দেবজ্যোতি বনছায়ার জন্যে একটা বাড়ি দেখে দিল বলে হিমাংশুও সুবীরের জন্যে আরেকটা দেখে দিল। সেটা তুলনায় খারাপ হলেও সুবীর দাবি করল সেটাই তার কোয়ার্টার, সেখানেই বনছায়াকে যেতে হবে। সুবীর যেমন তার বস্‌-এর হুকুম মানে, বনছায়ারও তেমনি সুবীরের কথা মানা উচিত।

বনছায়া সুবীরের কথা মেনে সুবীরের মনোনীত বাড়িতেই সংসার পাতল। সুবীরের

অফিস থেকে অভিরামকে পাঠানো হল কাজ করার জন্য। কিন্তু নিঃসঙ্গতার নির্বাসন থেকে রেহাই পেল না বনছায়া। তারল কোথাও গিয়ে ছদিন জুড়াই। সন্দীপের কথা মনেপড়ল। সন্দীপের কাছে গিয়ে বসল বনছায়া। সে উপন্যাস রচনায় রত। মনে হল বনছায়ার উপস্থিতি থেকেও সাহিত্যই বুঝি তার প্রিয়তর—তাতে না থাক টাকা না থাক নাম-যশ। বনছায়ার যে বিয়ে হয়ে গেছে এতেও যেন তার ভালোবাসার কোনো ক্ষতি নেই। বাড়ি ফিরে এসে দেখল সুবীর লিখছে। কিন্তু কবিতা নয়, অফিসের রিপোর্টের বাংলা অনুবাদ। তারপর থেকে রোজ সন্ধ্যায়ই বনছায়া বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় একা একা। এভারটাইম করে সুবীর কতক্ষণে ফিরবে তার প্রতীক্ষা করে না।

বনছায়াকে বাইরে বেরুনো থেকে নিরস্ত করবার অভিসন্ধিতে সুবীর তার সঙ্গ নিতে চাইল, নিতে চাইল হিমাংশুর বাড়ি। বনছায়া গেল না। একদিন হিমাংশুই সুবীরের ফ্ল্যাটে এসে হাজির। বনছায়া ঘরে নেই, সুবীর গেল চা দিতে। হিমাংশু মিলনা, বললে, বনছায়া নিজে যেদিন চা করে খেবে সেদিন যাবে। বনছায়া ফিরে এলে সুবীর তাকে শাসন করতে চাইল আর বনছায়ার মধ্যে ভয় ঢুকল একা বাড়িতে হিমাংশুই না একদিন আক্রমণে উদ্যত হয়ে আবির্ভূত হয়। তাই কদিন পর সুবীর যখন বনছায়াকে ঘুমের মধ্যে আবদ্ধ করতে চাইল তখন দুঃস্বপ্নের মধ্য থেকে ঘুম করে বনছায়া চেঁচিয়ে উঠল এ কী অন্যায়! ছি ছি ছাড়ুন ছাড়ুন—

অফিসের পার্টিতে বস-এর পাল্লায় পড়ে সুবীর মদ খেল। সেই থেকে সে নেশা তাকে পেয়ে বসল। বনছায়াকেও সে শেখাল মদ খেতে। একটা কুৎসিত সন্দেহ থেকে মুক্ত হবার জন্যেই বনছায়া স্বামীর প্রস্তাবে সম্মত হল। কিন্তু সুবীর আর নিজের দর্ত পালন করল না। বিরোধ ঘুঘায়িত হল।

তারপর বিরোধের মধ্যে বনছায়া আবিষ্কার করল সে মা হতে চলেছে। তার পেটে সুবীরের সন্তান।

বনছায়া অনুভব করল এ সন্তান আনন্দের অভিজ্ঞান নয়, শুধু মাতলামির পরিণতি। পরাভবের অপমানের প্রতীক। বনছায়া ডাক্তার অরবিন্দের কাছে গেল, পেটের সন্তানকে নষ্ট করবে। অরবিন্দ যখন জানল এ সন্তান বৈধ, তখন প্রস্তাবে রাজি হলনা। তখন কুমারী সেজে সন্তানকে অবৈধ বলে বুঝিয়ে বনছায়া গেল আরেক ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার কমলেশ তার কি যাবৎ এমন এক ভিনিস দাবি করল যাতে সে রাজি হতে পারল না।

সেবারের পার্টিতে হিমাংশু বেশিকরে মদ খাইয়ে সুবীরকে মাতাল করে দিল। বাড়িতে পৌঁছে দেবার জন্যে গাড়ি ও তাতে একটি নারীর ব্যবস্থা করলে। নারীর নাম লাবণি, তাকে বলে দিল যেন সুবীরকে একেবারে তার স্ত্রীর কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। যাতে বনছায়া বুঝতে পারে সুবীর কতদূর নেমে গিয়েছে। যখন সুবীর বাড়ি ফেরে, দেখতে পায় সন্দীপ দেন এসেছে আর বনছায়া তাকে তার উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পড়ে শোনাচ্ছে।

নিজে ধরা পড়ে যাবার ভয়ে চটে গিয়ে সুধীর সন্দীপের উপর প্রতিশোধ নেয়, তাকে গালাগাল দিয়ে তাড়িয়ে দেয় বাড়ি থেকে।

সুধীর বনছায়ার কাছে দুঃখ প্রকাশ করে বিরোধ মিটিয়ে নিল। সন্দীপের কাছে ক্ষমা চাইতে রাজি হল, বললে, তাকে একদিন বাড়িতে ডেকে নিয়ে এস। বনছায়াকে অনুরোধ করল হিমাংশুকে ধরে তাকে লেখাতে উচ্চতর পথে বহাল করিয়েদিতে। বনছায়া রাজি হল না। অথচ সন্দীপকে নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে তার আলিঙ্গনে ধরা দিল।

সন্দীপের অন্তরলোকে দ্বন্দ্ব সুরু হল—শিল্পীর পক্ষে এমন কোনো আকর্ষণে লিপ্ত হওয়া উচিত নয় যাতে তার সৃষ্টির শক্তি নষ্ট হতে পারে। কিন্তু কার্যতঃ সে উদাসীন থাকতে পারল না। বনছায়ার বাড়ি গেল তার উপন্যাসের বাকি অংশ শুনে আসতে। ঈর্ষায় জ্বর হয়ে সুধীর সে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল আর সেই টুকরোগুলি কুড়িয়ে নিয়ে চলে গেল সন্দীপ।

ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঘরের বাঁটোয়ারা হয়ে গেল— এক ঘরে সুধীর, অন্য ঘরে বনছায়া। সুধীর তার ঘরে একটা ফ্যান বসাল যাতে বনছায়ার লাহিত্য-সাধনা বিপর্যস্ত হয়ে যায়। সেখার জন্যে নিরিবিলি জায়গা খুঁজতে বনছায়া সন্দীপেরই আশ্রয় নিল। সেখল সন্দীপ সযত্নে তার পাণ্ডুলিপির ছেঁড়া টুকরোগুলি একটা খাতার পৃষ্ঠায় সেঁটে সেঁটে উপন্যাসের পুনরুদ্ধার ঘটিয়েছে। বনছায়া ঠিক করল সন্দীপের বাড়িতে বসে বইটার একটা নকল তৈরি করবে।

সন্দীপের বাড়িতে বসে উপন্যাস নকল করল বনছায়া। প্রবাহের সম্পাদক পীযূষ গুপ্তের সঙ্গে হোটেলে দেখা করবে বলে টেলিফোনে নিমন্ত্রণ করে পাঠাল। তুমি মদ খাবে? জিজ্ঞেস করল পীযূষ। বনছায়া বললে, আমি খেতে শিখে গিয়েছি।

বনছায়া পীযূষের সঙ্গে হোটেলে মদ খেল, এক ট্যাক্সিতে বেড়াল। তার উপন্যাস 'অবগুণ্ঠনা' 'প্রবাহ' পত্রিকার জন্যে মনোনীত হল। তারপর মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরলে সুধীর গর্জে উঠল: তুমি মদ খেয়েছ? বনছায়া বললে, তুমিই তো শিখিয়েছ মদ খেতে।

বনছায়ার উপন্যাসের প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হতেই পাঠকমহলে সাড়া পড়ল। কিন্তু সুধীর খুশি হতে পারল না। জানতে চাইল কোথায় বসে সে নতুন করে লিখেছে এবং কী উপায়ে বাগিয়েছে পীযূষ গুপ্তকে। বনছায়া বললে, অফিসে বসেই লিখেছে, আর যেহেতু পীযূষ গুপ্তের রুচি কিছু মোটা, তাই বইটা সে মোটা করেই করেছে। রাগে 'প্রবাহে'র কপি ছিঁড়ে ফেলল সুধীর আর তার অক্ষম ঈর্ষাকে ব্যঙ্গ করল বনছায়া। লেখাটা পড়ে হিমাংশু খুব উত্তেজিত হল। সুধীরকে ডাকিয়ে বলল, এ অশ্লীল লেখা বন্ধ করে দিন। শেষকালে আপনার নামের সঙ্গে জড়িয়ে আমার কার্যের না বদনাম হয়।

অফিসে বনছায়া অসুস্থ হয়ে পড়লে দেবজ্যোতি তাকে নিউটন নার্সিং হোমে পাঠিয়ে দিলে। দেবজ্যোতি বনছায়ার বাপের বাড়িতে খবর দিলে, খবর দিলে হিমাংশুকে। হিমাংশু সুধীরকে খবর দিল। সুধীর উদাসীন রইল। তার বিতৃষ্ণার কারণ পীযূষ গুপ্তের কাছে গিয়েছিল 'অবগুণ্ঠনা'র প্রকাশ বন্ধ করে দিতে আর পীযূষ তাতে রাজি হয়নি

যেহেতু বনছায়ার মতে স্বামী ও সংসারের চেয়েও তার আর্ট বড়। এই নিয়ে সুবীরের সঙ্গে বনছায়ার আবার কলহ হয় আর সুবীর তাকে তার আর্টের গুরু সন্দীপ সেনের কাছে চলে যেতে বলে। নার্সিং হোমে হিমাংশু গিয়ে শোনে বনছায়ার অপারেশন হয়েছে কিন্তু গর্ভের সন্তান বেঁচে নেই।

নার্সিং হোমে অপারেশনের আগে ডাক্তারকে বনছায়া অনুরোধ করল যেন তাকে আর সন্তানধারণ করতে না হয়। ডাক্তার সেই রকম ছুরি চালাল। নার্সিং হোমে যতদিন ছিল বনছায়ার কোনো খোঁজ নেয়নি সুবীর। সন্দীপই সব দেখাশোনা করেছে। তারপর যখন ছুটি পেল বনছায়া সন্দীপের সঙ্গে সন্দীপের বাড়িতে গিয়েই উঠল।

বনছায়া সন্দীপ সেনের বাড়িতে গিয়ে উঠেছে এ খবর পেয়ে হিমাংশু দারুণ ক্রুদ্ধ হল। প্রতিশোধ নেবার জন্যে সুবীরকে উত্তেজিত করতে লাগল। বলল আপাতত ডিভোর্সের মামলা করতে। ওদিকে নাবণি সুবীরের প্রতি প্রেমমুগ্ধ হল, চাইল পৃথিবী হতে। সেই স্বার্থেও তো বনছায়ার সঙ্গে বিবাহের বিচ্ছেদ দরকার। সুবীর গেল উকিলের পরামর্শ নিতে।

সুবীর বিচ্ছেদেরই মামলা করবে ঠিক হল। হিমাংশু অভিরামকে ডাকল সেই মামলায় বনছায়ার বিরুদ্ধে ব্যভিচারের সাক্ষী হতে। অভিরাম রাজি হল না। মামলার কথা সন্দীপ বনছায়াকে জানাল। এ মামলায় সুবীর ডিক্রি পেলেই তো সন্দীপের সঙ্গে বনছায়ার মিলন সুগম হবে। কিন্তু বনছায়া বলল, মামলা সে কনটেস্ট করবে।]

তেত্রিশ

সুবীরের ডিভোর্সের মামলা কনটেস্ট করবে—বনছায়ার এ অবৈজ্ঞানিক মনোভাব সন্দীপকে কেমন যেন এক অস্বস্তির মধ্যে নিয়ে এল।

'কনটেস্ট করবে মামলায়,জেতবার জন্যে?' মৃদু রেখায় অস্ফুট একটু হাসল সন্দীপ।

'নিশ্চয়। মামলায় হারবার জন্যে কে আর কনটেস্ট করে?'

'মামলায় জিতে তোমার লাভ?'

'সব জয়েই জয়ীর আনন্দ।' বনছায়া নিরর্গল হেসে উঠল: 'মামলার জয়ে আনন্দ তো আরো বেশি। সে আনন্দ একেবারে চোখের সামনে, পাবলিকের চোখের সামনে। খবরের কাগজের হেড লাইনে।'

'না, ব্যাপারটা আমি বুঝতে পাচ্ছি না।' সন্দীপ চেয়ার টেনে বসল স্থির হয়ে। গম্ভীর মুখে বললে, 'মামলায় তুমি যদি হেরে—'

'আমার সঙ্গে তুমিও হারবে।' দু'চোখ উজ্জ্বলতর করে তাকাল বনছায়া: 'আমরা দু'জনে এক নৌকোর সোয়ারি।'

'বেশ, আমরাই যদি হারি, অর্থাৎ সুবীরবাবু যদি হেরে যান, তাহলে তো বিয়েটা নাকচ হয় না। আর বিয়েটা নাকচ না হলে—'

'না হলে তো না হল!' সুধীরের উপর রাগটা ঝোঁকের মাথায় সন্দীপের উপরই ঝেড়ে বসল বনছায়া। বললে, 'তাই বলে ও আমার নামে আদালতে যা-তা বলবে? আমি তাই শুনব? মেনে নেব? জবাব দেব না?'

'ও কী বলবে?' যেন ঠিক কিছু বুঝতে পারছে না এমনি অবোধ চোখে তাকাল সন্দীপ।

'যা, ও আমাকে ব্যভিচারিণী বলবে না?'

'ও! এই কথা?' যেন আরাম পেল সন্দীপ, একটু বুঝি বা ছড়িয়ে বসল: 'তা বলুক না।'

'বলবে? আমি তোমার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত? বেশ; বলো, তুমিই বলো, আমার গা ছুঁয়ে বলো, এ পর্যন্ত তোমাতে আমাতে কোনো সম্পর্ক হয়েছে?'

'আহা, তুমি হাসপাতাল-ফেরৎ রুগ্ন মানুষ, ডাক্তারের নির্দেশে রয়েছ উপবাসে, তাই তোমাকে কী বলে বিব্রত করি? সকলের চেয়ে বড় হচ্ছে স্বাস্থ্য, শান্তি, সভ্যতা—'

'সকলের চেয়ে বড় হচ্ছে ভালোবাসা।' আয়তমণির চোখে একটি প্রদীপ জ্বালল বনছায়া।

'নিশ্চয়। সেই জন্যেই তো আজো পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছ। কিন্তু এ ব্যবস্থা তো চিরস্থায়ী নয়। সম্পর্ক একদিন তো হবে। আর সেটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয়, ততই মঙ্গল।' সন্দীপের স্বর গাঢ় হয়ে উঠল: 'এ কদিনের বিশ্রামে ও পরিচর্যায় তুমি কী সুন্দর, কত সুন্দর হয়ে উঠেছ তুমি জানো না। আয়নায় একবার দেখেছ নিজেকে?'

'তোমার দৃষ্টির আয়নায় দেখছি এখন।'

'তারপর আজ অফিস করেছ, মুক্ত জীবনের হাওয়া নিয়েছ নিশ্বাসে, তোমার মাঝে নতুন একটা স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে। আজ আমাকে তোমার গা ছুঁতে বোলো না, বলা যায় না আজ, এখুনি, পলকেই প্রলয় হয়ে যেতে পারে।'

'বিশ্বাস করি না।' স্নেহ মিশিয়ে হাসল বনছায়া: 'তুমি যেমন ভদ্র, আইনজ্ঞ তোমার অভিধানে পলকে কিছু হবার নেই।'

'কী, এই কথা?' হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সন্দীপ: 'দেখো, ঠিক তো?'

শান্তস্বরে বনছায়া বললো, 'বোসো। তোমার খাবারটা এখানে দিতে বলি।'

সন্দীপ তবুও বসছে না দেখে বনছায়া গলা খাটো করে বললে, 'এইটেই বুঝি প্রলয়ের সময়? চারদিকে বি-চাকর, ঝি-র, আই মিন, কলিকাতার এখন সবে সন্ধে, এখুনি কি সাজ-সাজ বলে রব তোলা সাজে? তুমি বোসো আমি দেখছি—'

সন্দীপ বসল কের চেয়ারে।

উপর থেকে চাকর খাবার নিয়ে এল, তাই সাজিয়ে গুছিয়ে এগিয়ে দিল বনছায়া।

'তুমি খেয়েছ?' স্নেহমেশানো স্বরে জিজ্ঞেস করল সন্দীপ।

'আমার কখন হয়ে গেছে। তবু তোমার সঙ্গে কোম্পানি রাখতে আরেক পেয়ালা চা খাচ্ছি।'

দুজনের মধ্যে আবার একটি নিস্তব্ধতা নিবিড় হয়ে উঠল।

'এমন সুন্দর একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট—উপরে নিচে দু'দুটো আলাদা সংসার—দুটো উহুন দু'প্রস্থ চাকর-বাকর, দরজায়ও তাড়া শুনে মালকাবারী রসিদ দিচ্ছি, ও বললেই এটা লিফিং ইন অ্যাডাপটারি হবে।'

'মানুষে কত কী বলে, কী আসে যায়?'

'কিন্তু ও কি মানুষ?' বনছায়া চিৎকার উঠল। চোখের কোণের জল জ্বলন্ত আগুন হয়ে।

'ও মানুষ কিনা সে বিচারে আমাদের আর কাজ নেই।' সন্দীপ গভীর সান্ত্বনার সুরে বললে, 'ও বিচ্ছেদের মামলায় বাদী, পরে একতরফা বিচারে ডিক্রিদার, তাহলেই আমাদের শান্তি—তারো চেয়ে বড় কথা, আমাদের পরিতৃপ্তি। আত্মতৃপ্তি!'

'কিন্তু তাই বলে একতরফা? ওর কদর্য গালাগালের উত্তরে একটা প্রহার করতে পারব না?'

'গালাগালটা আর কী!' সন্দীপ প্রশান্ত মুখে বললে, 'একটা চার অক্ষরের কথা—ব্যভিচার। ও আর কিছু নয়, প্রেমেরই অভিরঞ্জন। এক দেশে যা প্রেম অন্য দেশে তাই ব্যভিচার। এক দেশে যা বুলি অন্য দেশে তাই গালি। দেখছ না স্বদেশীর কাছে শহীদ, বিদেশীর কাছে খুনী। শুধু কথায় কী আসে যায়? আমরা তো তা শুনতে যাচ্ছি না। আমাদের স্তব্ধতাটাই উপযুক্ত প্রহার হবে।'

'মোটেই না।' ব্যথিত স্বরটা বনছায়া চায়ের কাপে ডুবিয়েও শান্ত করতে পারল না: 'স্তব্ধতাটা পরিপূর্ণ সম্মতি হবে। আমি ব্যভিচারী আর উনি এক প্রচণ্ড সাধু। উঃ, আমি যদি ওর বিরুদ্ধে উল্টে একটা মামলা করতে পারতাম!'

'সে পরে দেখা যাবে।' কথাটা সন্দীপ উড়িয়ে দিতে চাইল। বললে, 'যেটা সমূহ হাতের কাছে এসেছে সেটারই সুযোগ নিতে হবে।'

'না, আমি মিস্টার ভৌমিককে বলব, তিনি সব সময়েই হেলপফুল, তিনি আমাকে ভালো উকিলের সন্ধান দেবেন। আমি আইনের উপযুক্ত পরামর্শ নেব, জানব আমার কোনো প্রতিকার আছে কিনা।'

'থাকতে পারে, কিন্তু তা দিয়ে বিচ্ছেদ হবে কী করে?' সন্দীপ যেন গোলোক ধাঁধাঁর মধ্যে এসে পড়ল: 'হলেও কবে হবে, কত দেরিতে, কোন ঘুর-পথে হবে কেউ জানেনা। এ একেবারে ঘোর সোজায় গাড়ি এসে পৌঁচেছে, কোনো শব্দ-টব্দ না করে চুপচাপ চড়ে বসা আর এক নিমেষে স্বর্গের অমরাবতীতে উপনীত হওয়া।'

'সবই সুন্দর, শুধু ঐ চুপচাপ থাকাটাই অসহ্য।'

'ওটাই এ যুদ্ধে আমাদের সফল কৌশল।'

'কৌশল!' কথাটা যেন বনছায়ার পছন্দ হল না।

'কৌশলই তো সৃষ্টির একমাত্র সম্বল, আনন্দের একমাত্র উপাদান। আদালতটাই তো সমাজের এক বৃহৎ কৌশল। এখানে আমাদের স্তব্ধতা বা সম্মতির কৌশলে বিবাহ-বিচ্ছেদটা আদায় করে নেব, ঐ বিচ্ছেদের কৌশলে আদায় করে নেব আমাদের—আমাদের কী, বলো না—'

সন্দীপ ভেবেছিল বনছায়া বুঝি খুব প্রগাঢ় একটা কথা তার মর্মের বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে এনে বলাবে, কিন্তু উদ্দীপ্ত হবার পরিবর্তে কেমন যেন বিমর্ষ হল বনছায়া, দৃষ্টি নত রেখেই বললে, 'এছাড়া আর কোনো পথ নেই?'

'না। আমি তো দেখি না।'

'আমি বলি,' ধীরে ধীরে চোখ তুলল বনছায়া: 'বিচ্ছেদের কী দরকার?'

'কী দরকার মানে?' সন্দীপকে হঠাৎ যেন সাপে দংশন করল: 'তুমি—তুমি তাহলে আমার স্ত্রী হতে চাও না?'

টেবিলের উপর সন্দীপের একটা হাত জোর করে চেপে ধরল বনছায়া। বললে, 'আমি তোমার সমস্ত হতে চাই।'

হাত ছাড়িয়ে নিল না সন্দীপ। মুখের মত বললে, 'সমস্ত হতে চাও? তবে আমাদের বিয়ে না হলে তা সম্ভব হয় কী করে?'

'বিয়ে না করেও কি সমস্ত হওয়া যায় না?'

'কিছুতে না।'

'দু'জনের একসঙ্গে থাকতে গেলে বিয়েটা ঘটাতেই হবে?'

'বিয়ে না ঘটিয়ে একসঙ্গে থাকাটাই বাভিচার।' ধীরে ধীরে হাতটা ছাড়িয়ে নিল সন্দীপ।

'এতবড় সাহিত্যিক হয়ে তোমার এখনো এই কুসংস্কার?' একটু বাঁকা করে চোখের আলো ফেলল বনছায়া: 'বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির দিনে তুমি বিয়েটাকে অপরিহার্য মনে করো?'

'করি। একশোবার করি। বিয়েটাই তো বিরাট বিজ্ঞান।'

'আমি বিয়েটাকে মোটেই অবশ্যম্ভাবী মনে করি না। আমি মনে করি বিয়ে না করেও পরিপূর্ণ প্রেমের মধ্যে দুজনে জীবনের চরম সার্থকতা সম্ভোগ করতে পারে।'

'তার মানে তুমি আমাকে সংসার দেবে না? সন্তান দেবে না?' প্রায় একটা হাহাকারের মত করে বলে উঠল সন্দীপ।

কোন এক অব্যক্ত বেদনা কোন এক অদৃশ্য নিগূঢ়ে বনছায়াকে স্পর্শ করল। শুধু একবার স্পর্শ করেই মিলিয়ে গেল না। নিষ্ফল মেঘের মত সমস্ত সত্তাকে আচ্ছোপান্ত আচ্ছন্ন করে রইল। তবু তার ইচ্ছে হল দুই বাহু মেলে উচ্ছল ঢেউয়ের মতো সন্দীপের বুকে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে, অন্তরের সঙ্গে অন্তর মিশিয়ে দিয়ে বলে, 'পুরুষ যা চায়, মানুষ যা চায়, আমি তোমাকে সব দেব। তোমাকে এমন কিছু দেব যা পেলে তোমার আর কিছু চাইবার থাকবে না।'

বনছায়া এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল কেউ ধারে-কাছে আছে কি না। ঠিক আছে। নিয়তি-প্রেরিত একটা বি ঠিক ঘুর-ঘুর করছে এ সময়। তাকে উপেক্ষা করা যায় বটে কিন্তু সে উদ্যতা সন্দীপই পছন্দ করবে না। সুতরাং বনছায়ার ঢেউ হওয়া হল না, শুধু সশরীরী হাওয়া হয়ে কথা কটিই সে উচ্চারণ করে শোনাল।

'বেশ, তাই। আমি তবে এখন উঠি।' সন্দীপ উঠে পড়ল।

'আমার উপর রাগ করলে না তো?'

প্রসন্ন অন্তরে হাসল সন্দীপ। বললে, 'এখন রাগ-বিরাগের অবস্থা পার হয়ে এসেছি। এখন আর কিছুতেই ফিরে যাওয়া নেই। তুমি বিমুখ থাকলেও, আমি ছাড়ব না। আমি আমার সমস্ত প্রাপ্য তোমার কাছ থেকে আদায় করে নেব।'

বনছায়ার হৃদয় ভরে গেল। আর হৃদয় ভরে গেলেই বুঝি চোখ সজল হয়ে ওঠে।

কঠিন চেষ্টায় চোখের জলকে ঠেকাল বনছায়া। তার আবার দুঃখ কী? চোখের জল দেখলে অন্যান্য লোকেরা না ভাবে সে তার আগের সংসারের জন্যে কাঁদছে। না, সুধীরের জন্যে তার দুঃখ নেই, মৃত শিশুর জন্যেও নয়, তার চোখের পাতা সিক্ত হচ্ছে এই ভেবে যে সে সন্দীপের সমস্ত প্রাপ্য মিটিয়ে দিতে পারবে না।

'এ কী, তুমি কাঁদছ?' এক মুহূর্ত দাঁড়াল সন্দীপ।

'আনন্দে, কৃতজ্ঞতায় চোখে জল আসে না?'

'তাই বলো। এ আনন্দাজ।'

'শোনো।' ঘরের চার দেয়ালকেও শুনিয়ে বনছায়া বললে, 'আমি খাওয়া-দাওয়ার পর তোমার কাছে যাব। তোমাকে আমার নতুন উপন্যাসের আরম্ভটা শোনাব। কটা পয়েন্ট একটু ডিসকাস করবার আছে—'

'বেশ তো এস। আচ্ছা এখনই চলো না কেন?'

কী বুদ্ধি! তীক্ষ্ণ ভ্রূকুটি করল বনছায়া। এটা বুঝি সেই উপযুক্ত সময়? প্রকাশ্যে বললে, 'আমি এখন লিখব। এই আমার এখন লেখবার সময়।'

'আচ্ছা এক কাজ করলে কেমন হয়? আজকের রাতের খাওয়াটা আমার ওখানেই খেলে। খেয়ে-দেয়ে শেষে পড়া হল।'

খেতে বসে শেষে রাতে কথার জালে আটকা পড়ি। যত সব কুটকচালে কথা! খাওয়ার পাট চুকিয়ে দিয়ে গেলেই সেই তপ্ত নাটকীয় মুহূর্তটা তৈরি করা যায়—তার আগে নয়। চারপাশের লোকদের শুনিয়ে একটা উত্তর দিতে হয়, তাই বনছায়া বললে, 'বাড়িওলার বাড়িতে ভাড়াটের আবার কবে নেমন্তন্ন হয়?'

'বেশ তোমার খুশি মত এস।'

খুশির হাওয়া বইয়ে দিয়ে সন্দীপ চলে গেল উপরে—স্বস্থানে।

খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে দিয়েও আরো খানিকক্ষণ লিখল বনছায়া। তারপর চারদিক নিঝুম হয়ে এসেছে অনুভব করে উঠে পড়ল। সাজগোজ যেটুকু করবার তা আগেই এক ফাঁকে সেরে নিয়েছে, এখন চুলে-আঁচলে শেষ একটু কারিগরি করে এগোল দরজার দিকে।

বাইরের কি বিবাহ হলেও ভিতরের কি তার সদাজাগ্রত কর্তব্যের টানে বসে আছে পাহারায়! বনছায়া একান্ত মামুলি হবার চেষ্টায় সহজভাবে বললে, 'আমি একটু উপর থেকে ঘুরে আসছি।'

'দেখো যেন বেশি দেরি কোরো না।' অভিভাবিকার সুরে বললে পরিচারিকা।

'না, না, বড় জোর ঘণ্টা খানেক।'

বনছায়া বেরিয়ে যাচ্ছে, কি আবার কী একটা কথা মনে করাতে চাইল। বললে, 'তোমার লেখাটা নিলে না?'

কত দিকে কত রকম যে বাধা, বিরক্ত হয়েও আরক্ত হল বনছায়া। বললে, 'না, আমার লেখা এখনো কিছুই হয়নি, ওঁর লেখা শুনব।'

যা বোঝবার বুঝুক। আর থাকা যায় না নির্বাসনে। বনছায়া দৃঢ় পায়ে উঠতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। সন্দীপের ঘরে আলো জ্বলছে, দরজার পাল্লা দুটো ভেজানো থাকলেও ফাঁক দিয়ে আলোর রেখাটি দেখা যাচ্ছে। সে আলো প্রত্যাশা, সে আলো আশ্বাস, সে আলো দুরাশের দুরন্ত ডাক।

দরজার প্রান্তে প্রায়-অন্ধকারে চাকর বসে আছে। বাবু আলো নিবিয়ে দরজা বন্ধ করে দেবার আগে তার ছুটি কই? কখন কী দরকারে বাবু ডেকে বসেন তার ঠিক কী। ভিতরে তো দ্বিতীয় প্রাণী নেই যে মন চাইলে এক গ্লাস জল গড়িয়ে দেবে।

চাকরকে দেখে আবার একটা হোঁচট খেল বনছায়া। কিন্তু স্বর্গ যখন গিরিগৃহ থেকে একবার বেরিয়ে পড়েছে সে আর পিছু হটবে না।

'তোমার বাবু জেগে আছেন?' অনর্থক প্রশ্ন, তবু চাকরের সমস্ত মুখের দিকে তাকিয়ে এ প্রশ্ন না করে পারল না বনছায়া। আরো বললে, 'একটা মামলা সম্পর্কে কিছু পরামর্শ আছে।'

চাকর বললে, 'আপনি যান। আমি আছি এখানে।'

'আধ ঘণ্টার বেশি লাগবে না।'

কৌশল, সর্বত্রই কেবল কৌশল। সর্বত্রই একটা কপট মীমাংসা, আচ্ছাদনের কারুকার্য। দ্রুত ঘরে ঢুকে দরজা আবার ভেজিয়ে দিল বনছায়া। আলোর রেখাটুকুকে বাতিল করে দিল।

'কি দরজায় খিল দিতে পারলে না তো?' লেখা থেকে মুখ না তুলেই জিজ্ঞেস করল সন্দীপ।

'তোমার ঘর, খিল তো তুমি দেবে।'

'হ্যাঁ, আমি দেব। সেদিন তুমি আসবে না, আমি যাব।'

অভিমানভরা গলায় বনছায়া বললে, 'তুমি নিমন্ত্রণ করেছ বলেই তো এসেছি।'

'সে তো তোমার নতুন লেখা—নতুন উপন্যাস শোনাবে বলে। কই তোমার লেখা কই? এ কী, এ কী—'

সন্দীপ তাকিয়ে দেখল খাটে পাতা বিছানার উপর বনছায়া প্রসারিত হয়ে শুয়ে পড়েছে, বলছে, 'এই আমি নতুন লেখা, নতুন উপন্যাস। তুমি পড়ো, অর্থ করো।'

পেলবে-কঠিনে কী অপূর্ব ভঙ্গিমায় শুয়ে আছে বনছায়া। যেন একগাছি মনোরথের মালা, কিন্তু এখনো যেন হাতে তুলে গলায় পরবার সময় আসেনি। লগ্ন এখনো দেরি আছে। নানা কারণে বনছায়া অধির হতে পারে কিন্তু সে তো বিচক্ষণ, সে তো রূপদক্ষ, সে তো ভুল করতে পারে না, পারে না ছন্দ-ভঙ্গকে উপেক্ষা করতে।

তাই এগিয়ে এসেও বিছানা পর্যন্ত গেল না সন্দীপ। বললে, 'উপন্যাসের সূচনাটি খুব লোভনীয়, কিন্তু তার আগে কটা পয়েন্ট তুমি ডিসকাস করে নেবে বলেছিলে না?'

বনছায়া কথা বলল না, ঘুমিয়ে পড়বার ভাব করে চোখ বুজে রইল।

'প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে তোমার পাশের ঐ খোলা জানলা—'

'খোলা জানলা?' ভয় পেয়ে চোখ মেলল বনছায়া। কিছুই ঠাহর হল না। প্রশ্ন করল, 'ওখানে কী?'

'ওখানে সুধীরবাবুর চোখ।'

'বাজে কথা।' আবার চোখ বুজল বনছায়া।

'তোমার পক্ষে নিশ্চয়ই বাজে কথা। কেননা ফৌজদারি আইনে র‍্যাডালটারির চার্জ শুধু পরপুরুষের বিরুদ্ধে, স্ত্রীর বিরুদ্ধে নয়। সুতরাং আমারই শুধু জেল হবে, তুমি যে হাওয়া সে হাওয়া।'

'দ্বিতীয় পয়েন্ট?'

'চাকরের চোখ। তুমি নিশ্চয়ই তোমার ঘর খোলা রেখে এসেছ, সুতরাং বি-এরও চোখ। নীতিবোধ বলব না, ছন্দবোধের কথাও না হয় নাই তুললাম, আরো একটা বোধ আছে, সেটা হচ্ছে সময়বোধ। আমরা এমন ভুল করব না যাতে আমাদের সময়ের হানি হয়। সময় শুধু চাকরবাকরের কাছে নয়, নিজেদেরও কাছে।'

'আরো পয়েন্ট আছে?'

'আছে। এইটেই সবচেয়ে দামী পয়েন্ট।'

আকর্ণবিশ্রান্ত চোখ মেলল বনছায়া।

সন্দীপ বললে, 'সেই এক অতিথি যে পরিচ্ছেদ শুরু হবার পরে এসে আনন্দময়, পরিচ্ছেদের আগে ভূমিকায় এসে পড়লে আতঙ্কময়।'

'কে সে? সন্তান?' অকুণ্ঠে জিজ্ঞেস করল বনছায়া।

'হ্যাঁ, সন্তান। আমাদের মিলিত পূজার প্রসাদ।'

'সন্তান হবে না।'

'হবে না?' নির্মল মুখে হাসল সন্দীপ: 'তুমি জানো না নিয়তি কখন কী পরিহাস করে বসে। সমস্ত হিসেব সে কখন বানচাল করে দেয়।'

'আমি জানি, পরিহাস নয়। হবে না।' এর বেশি আর বলতে পারল না বনছায়া, কান্নার মত কী একটা গলার কাছে উঠে স্বর বন্ধ করে দিল।

'তুমি একেবারে ছেলেমানুষ।'

'ছেলেমানুষ হব কেন? আমি বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানের ছাত্রী। তুমি সব সময় যে বস্তুর গুণগান করো সেই কৌশল, সেই কৌশল অবলম্বন করব।' উঠে বসল বনছায়া, বললে, 'তার আবির্ভাব নিরস্ত হবে।'

'না। অন্ততঃ প্রথমটির সম্পর্কে নয়। সেখানে কৌশল নির্মমতা।' সন্দীপ আবার তার টেবিলের দিকে সরে গেল। বললে, 'আমার প্রথমই পরম। সে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হোক, অকৃত্রিম হোক।'

'আমি তা হলে এখন কী করব?'

'কী করবে মানে? তুমি লেখক, তোমার আবার একটা সমস্যা—কী করব! তুমি লিখবে।' তারপর নির্মল হাসিতে ছাপিয়ে গিয়ে বললে, 'আর সুবীরবাবুর মামলার সমনের জন্যে অপেক্ষা করবে। সমন এলেও নীরব থাকবে, একেবারেই কনটেস্ট করবে না।'

'আমি তবে এখন যাই।'

বেরিয়ে যাচ্ছে বনছায়া, তার হাত ধরে একটু আকর্ষণ করল সন্দীপ।

'না, থাক।' বনছায়া বাধা দিল। যেন সে আর অত অল্পে সন্তুষ্ট নয়—তারই জন্যে কৌশল করে এই অভিমানটুকু প্রকাশ করল। আর সত্যি-সত্যিই যে তার পসরা শূন্য সেই মর্মান্তিক অবস্থাটাও কৌশল করেই প্রচ্ছন্ন করল।

চাকরকে সজাগ করে দিয়ে নিচে নেমে গেল বনছায়া। ঘরে ঢুকে বি-কে বললে, 'পনেরো মিনিটও হয়নি, কী বলো? বাবু তার নতুন লেখাটা শোনালেন না। বললেন, এখনো তৈরি হয়নি। তৈরি হলে বলেছেন নিজেই একদিন শুনিয়ে যাবেন।'

কিন্তু সুবীরের মামলায় সমন কই?

সেদিন দরজায় কড়া নড়তেই বনছায়া হকচকিয়ে উঠল—কোর্টের সিওন এল বুঝি।

দরজা খুলে দেখল অভিরাম।

অভিরাম বনছায়ার পায়ের কাছে বসে কেঁদে পড়ল। বললে, 'সুবীরবাবু তাঁর মামলায় আমাকে আপনার বিরুদ্ধে মিথ্যে সাক্ষ্য দিতে বলেছিলেন। তাতে আমি রাজি হইনি। সেই কারণে রেগে গিয়ে

সুধীরবাবু আমার নামে বোস-সাহেবের কাছে নালিশ করেছেন—এমন কি এও বলেছেন আমার স্বভাব-চরিত্র খারাপ—'

'এত জঘন্য!' বনছায়া ধিক্কার দিয়ে উঠল।

'জানেন তো সুধীরবাবু বোস-সাহেবের খুব পেয়ারের লোক, তাই তাঁর কথায়, সব দিক বিবেচনা না করেই আমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দিয়েছেন।'

'কী সর্বনাশ!' বনছায়া যেন চোখে আঁধার দেখল: 'এখন কী হবে?'

'সমস্ত পরিবার নিয়ে পথে বসব।'

'তোমার কাজ চাই?'

'অত বড় কাজ আমাকে কে দেবে?'

'হাঁ, তাও তো ঠিক। তবে?'

'আপনি যদি বলেন তবে আমার কাজ বোধহয় আমি ফিরে পাই।'

'বলব, কাকে বলব?'

'বোস সাহেবকে। তিনি বললেন, তুমি তো দুজনের আণ্ডারে কাজ করেছিলে—একজন তোমার বিরুদ্ধে গিয়েছে—আরেকজন, মিসেস গুহ যদি তোমাকে ভালো বলেন, ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দেন, তা হলে অর্ডারটা বাতিল করতে পারি।' করুণ ভিক্ষায় চোখে তাকাল অভিরাম।

'কী ভাবে বলতে হবে?' বনছায়া স্পষ্ট হল: 'শোনো, দেখা করতে পারব না। লিখে সুপারিশ করাও অসম্ভব হবে। তবে—'

'যদি টেলিফোনে বলেন—'

'আচ্ছা টেলিফোনে বলতে পারি।'

'আপনি বললে হয়তো তাহলেই হবে।'

'বেশ, দেখি হয় কি না।'

তারপর অফিসে একটি অসংলগ্ন মুহূর্ত খুঁজে নিয়ে হিমাংশুকে ফোন করল বনছায়া।

[ক্রমশঃ]

ফিরে ফিরে চাই

স্মৃতিচারণ

প্রভাত মুখোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আমাদের সেকালে টাকা এত ছিল না। এখন কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের কাজুয়ার ১৪০ টাকা বেতন পায়। কোনো পরিকল্পনায় কোটি টাকার নিচে বায় হয় না। অথচ বঙ্গদেশে চল্লিশ বৎসর পূর্বে সরকারী আয় ছিল ১২।১৩ কোটি টাকা, আজ খণ্ডিত বলে দুই হাজার কোটি টাকার বেশি! নাসিকের ছাপাখানায় নোট ছাপিয়ে ঘাটতি পূরণ হচ্ছে; ফলে মজুরী ও মূল্যমান দুইই লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে।

মানুষ স্বল্পবিত্ত ছিল সত্য; তবুও দুর্ভিক্ষ না হলে আজকালকার মতো লোকে অর্ধাহারে থাকতো না। খেয়ে মেখে টিকে থাকতো কোনো রকমে। তবে মেলেরিয়ায় জ্বরে ভুগে ভুগে আধমরা হয়ে বেঁচে থাকতো। আমাদের সময়কার বাজার দর বললে, আজকাল লোকে বলবে 'গল্প ছাড়ছে।' শেয়ালদহের সময়কার বাজার দর পড়লে আমরা অবাক হই। কিন্তু আমরা ছোট বেলায় যা দেখেছি তা কাউকে বিশ্বাস করানো কঠিন। তখন ধানকল ছিল না, হাস্কিং মিলও অজ্ঞাত। চাষীরা আপন ঘরে ধান থেকে চাল তৈরী ক'রে শহরে এনে দোকানে দিত। কখনো গৃহস্থের বাড়িতে বিক্রী করে যেতো। মনে আছে এক বস্তা চা'ল (অর্থাৎ ছেড় মন) পিঠের দিকে কোমরের উপর রেখে চাষা ভিতরের রোয়াকে রেখে গেল—মা' সেটা পাঁজা কোলা করে তুলে ভাঁড়ারে তুলে রাখলেন।

চা'লের দাম শুনে লোকে হাসবে অথবা বিদ্রূপ করবে। এক মণ চালের দাম ছিল আড়াই টাকা, ভালো চাল তিন টাকা দুই আনা—অর্থাৎ চার, পাঁচ পয়সা সের—আজকের ওজন ও আজকার পয়সায় ছয়, সাত পয়সা! আমাদের বাসার সামনে রাস্তার ওপারে হরি মুদির দোকানে দিনান্তে মজুররা আসতো সওদা করতে। চারটা পয়সায় এক বেলার খাবার পেতো, চাল, ডাল, নুন, তেল, মশলা এমন কি এক আঁটি কাট—রান্নার জন্য জ্বালানি। 'বুনো' নামে একটা জাত, তখন ছিল—তারা জঙ্গল থেকে কাট ভেঙে কেটে এনে দিত হরি মুদির দোকানে;—হরিমুদি সেগুলি 'সাইজ' মতো সাজিয়ে বাণ্ডিল ঠিক করে রাখতো। এই লটকানের দোকান দিয়ে হরি মুদি তার খড়ের ঘর পাকা করে। ছোট বাজারে প্রথম পাকা দোকান করে একবার খড়ের ঘর পুড়ে যাবার পর। বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী—অবশ্য লটকানের দোকানকে বাণিজ্য বলা যেতে পারে না—নাম তার যাই দিই ধন আসতো এই পথে।

আমাদের সংসারের জন্য বাবা রোজ মাকে একটি টাকা দিতেন। আমরা ছোট বাজারে যেতাম চাকরের সঙ্গে তরিতরকারী মাছ কেনবার জন্য। তখন এসব জিনিস ওজন দরে বিক্রী হতো না—ডালা দেওয়া থাকতো এক পয়সা, দু' পয়সা, দু'আনা এমনি ভাবে। মাছ বিক্রী করতো নিকারির মেয়েরা—পেতের

মধ্যে মাছ, উপরে বড় ডালি, তাতে মাছের 'ভাগা' দেওয়া! নিকারি মেয়েদের হন্তন-গমনে সবাই সম্ভ্রম করতো। নিধুকে দেখতাম—সেখানে তার আর-এক মূর্তি।

গোয়ালন্দ-পদ্মা থেকে ট্রেনে করে ইলিশ মাছ আসতো। কী সস্তা! আজ ভাবলে অবাক্ হই—আর কী পর্যাপ্ত আসতো টুকরি বোঝাই হয়ে। বরফ দিয়ে আমার সুবন্দোবস্ত না-থাকায় মাঝে মাঝে মাছ পচে যেতো—তখন মুনিসিপালিটি থেকে সেসব মাছ মাটিতে পুঁতে ফেলা হতো।

পরাশুত বা পাওয়া ঘি বলে একটী পদার্থ আমাদের সময়ে ছিল! এখন? জানিনা কোথাও বিশুদ্ধ ঘৃত পাওয়া যায় কিনা। আর পাওয়া গেলেও তার দাম সাধারণ মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে। আমাদের শহরের কাছে রাজাপুর নামে এক গ্রাম থেকে গোয়ালাদের মেয়ে পাওয়া ঘি আনতো, মানে—একবার কি দুবার। ঘরে সর তুলে মাখন থেকে ঘি তৈরী করতো—কালো ভাঁড়ে ভরে এনে দিত। দাম পাঁচ সিকা সের—পাকির ওজন। এখনো মাঝে মাঝে দেশওয়ালি মেয়ে মানুষ মাথায় কালো কেঁড়ে—ময়লা কাপড়ে বাঁধা, হাকে 'ঘেহাড় সে খাঁটি ঘি লইয়া'। আমার এক বন্ধু চার টাকা সের শুনে তিন চার সের কিনে ফেললেন। কয়দিন পরে ঘরা ঘৃতের আসল গন্ধ এলো রান্নাঘর থেকে। সবাই নাকে কাপড় দেয়! ভালডার সঙ্গে 'বাজারে' ঘি মিশিয়ে ঘই দিয়ে জাল দিয়ে আনে;—সেই ঘিয়ের গন্ধ পাওয়া ঘি-এরই হতো। আমাদের কালের রাজাপুরের ঘি-এ ভেজাল ছিল না, ভেজাল কথাটা বোধ হয় তখনও চালু হয় নি। গ্রাম অঞ্চলে অবশ্য দুধে জল দেওয়াটাকে ঠিক ভেজাল পর্যায়ে ফেলা যায় না। ওটা গোয়ালার স্বধর্মোচিত কাজ!

সরষের তেল আমাদের শহরে, আমাদের গ্রামে কলুদের ঘানিতে পেষাই হতো। কাছের এক গ্রাম হরিষপুর কি হাসখালি মনে নেই - কলু বৌ আসতো তেল নিয়ে। রোগা আধবয়সী বিধবা—পরনে একটা আধ ময়লা ছোঁট বা 'মিলি' সাড়ি—শেমিজ কামিজ তখন এ শ্রেণীর মধ্যে অজ্ঞাত। মাথায় একটি ধামা (বেতের ঝুড়ি). তার মধ্যে বিঁড়ের উপর বসানো তেলের কেঁড়ে বা মাটির ভাঁড়। ভিতর বাড়িতে আগে নিয়ে দিবে; রোয়কে রাখে ধামা। মা বের করে দেন কাঁসার বড় বাটি—কলু বউ তেল মাপে—ধামায় আছে আধসেরী, এক পোয়ার মাপ-করা বাঁশের চোঙা। কম তেল মাপার জন্য আছে নারকেলের আধখানা মালা—তলায় ফুটো। বাঁ হাতের আঙুল দেয় ফুটোতে। তেল ভরলে আঙুল নেয় সরিয়ে ক্রেতার পাত্রে পড়ে তেল। 'পলা' বা তেল দেবার চামচ ছিল তালের খাঁটির আধখানা, হাতল কঞ্চি, খাঁটিটা এঁকেবেঁকে-গুঁকাড় করে বসানো। তাই দিয়ে তেল তোলে ভাঁড় থেকে।·· সে শিল্প বাংলা দেশে আর দেখা যায় না—চরকা সেখানে গিয়েছে, ঢেঁকি সেখানে গিয়েছে; ঘানিও সেখানে সদ্গতি লাভ করেছে—যন্ত্রদানব সব গ্রাস করেছে—আর কী গ্রাস করবার আছে তারই অনুসন্ধান চলছে হয়তো। Iodustriliza-tion হচ্ছে কার সুখের জন্য?

মনে পড়ছে গ্রামের মাঠে সরষের হলুদ ফুল আলো করে আছে। কালে কলকাতায় তেলকল স্থাপন করলেন বাঙালী বণিক বণিকরা। সরষে আমদানী হতে থাকলো উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ হতে। সেই কলের তেল গ্রামে আমদানী করলেন 'মহাজন'রা। দেখতে দেখতে গ্রামের ঘানি একটা একটা করে উঠতে সুরু করে আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মনে আছে গ্রামে একঘর কলু এসে বসত করে। ছোটবেলায় তাদের বাড়ি যেতাম। ঘানি ঘুরছে, চোখ বাঁধা বলদ চলছে, কলু কোলে তুলে নিয়ে ঘানির উপর বসিয়ে দিলে আমাকে। কয়েকবার ঘুরতেই কী রকম লাগলো—নামিয়ে দিল কলু। বলদটার মুখে মাঝে মাঝে

বৈল দিচ্ছে খেতে। এই সরষে একদিন গ্রামের মাঠে ফলতো প্রচুর, সেই সরষে মাড়াই হতো, ঘানিতে পেষা হতো, কলু পেতো টাকা, গ্রামের লোক উপকৃত হতো। আজ সব ধুয়ে মুছে গেছে।

আজ উত্তর ভারতে সরষের চাষ হচ্ছে ব্যবসার জন্য। তেলকলের মালিকরা রেলগাড়ি করে সরষের তৈল পাঠান বাংলাদেশে। বাঙালী তেল খায়, তেল পায়। সরষের ছিবড়ে বা বৈলটা তাদের দেশেই থাকে,—তাদের খেতে প'ড়ে জমির উর্বরতা বাড়ায়, তাদের গো-মহিষে খেয়ে দুধ বেশী করে দেয়। যে শিল্প ছিল গ্রামের মধ্যে ছড়িয়ে, তা আজ শহরে-নগরে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। যে ধন ছিল সহস্র মুটিয়ে ছড়ানো, তা আজ মুষ্টিমেয় শিল্পপতি টেনে নিয়েছেন আপনার কবলে!

নিতান্ত বুদ্ধিভ্রংশ না হলে বৃদ্ধ পণ্ডিতমশায় কখনো তাঁর এককালীন পাঠশালার ছাত্র গোপ-নন্দনকে এ কথা বলতে পারতেন? 'বাবাজী, বুড়ো হয়েছি, একটু খাঁটি দুধ যদি দিতে পারতে তো ভাল হতো।'

গোপ জোয়ান, উত্তরে বলে, 'পণ্ডিত মশয়, খাঁটি দুধ কোথায় পাবেন? যদি আর-জন্মে গরুর হয়ে জন্মাতে পারেন তবেই পালানে দুধ দিয়ে খাঁটি দুধ পাবেন।' দুধে জল দেওয়া, বা জলে দুধ মেশানো এটা যেন ব্যবসায়ের অঙ্গেরও অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘানি গোয়ালিনী তার ব্যত্যয় ছিল না, তব গোয়ালিনীও তাই। ঘানি ঠেঁটি বা 'বিনি' সাড়ি পরে প্রায় 'টপ্‌লিস' অবস্থায়—দুধ আনতো পিতলের চকচকে কলসী করে। খরখরে চটপটে মুখরা বিধবা গোয়ালিনী। টাকায় ষোলো সের দুধ। জল দিত—তবে তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে জানতো না। হরিণঘাটায় গোগৃহ দেখতে গেছি। বিজ্ঞানীরা আমাকে বোঝালেন যে, আমাদের পাকস্থলী খাঁটি দুধের সবটা গ্রহণ করতে পারে না; তাই দুধটাকে সহজ-পাচ্য করবার জন্য তাঁরা খাঁটি দুধে জল ও তার সঙ্গে মাখনতোলা দুধের গুড়ো (powder milk) মার্কিন মুলুক থেকে আমদানী করে এনে টোন্‌, তখন টোন্‌ দুধ তৈরী করেন। বোতলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভরে কলকাতার জীর্ণোদর বাঙালীর হিতার্থে প্রেরণ করেন। ঘানি গোয়ালিনীরা আজও আছে—তবে আজ তারা বিহারী গোয়ালা—তাদের মধ্যে এমন সব 'জাত' আছে যাদের জল হিন্দু স্পর্শ করে না, কিন্তু দুধে মিশ্রিত হলে, তা অস্পৃশ্য বা অপেয় থাকে না। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—তারা মেহনতকে ডরায় না, তাই মা-লক্ষ্মী সেখানে বাঁধা পড়েছেন। তারা অপিসের পিওন,—কারখানার দারোয়ান,—বিজলি বিভাগের মিস্ত্রী—তারা সঙ্ঘ রাখে, ঘড়ির কাঁটার মতো সময়ে গৃহস্থবাড়ি দিয়ে যায়, বৎসরান্তে প্রচুর গোবরসার বিক্রী করে মোটা টাকা রোজগার করে, অথবা সারের বিনিময়ে চাষীর কাছ থেকে খড় বিচালি নেয়। তাদের ঘরে মা-লক্ষ্মীকে দেখা যায়। আর পাড়া কাঁপিয়ে বৃহস্পতিবারে মা-লক্ষ্মীর পুজো করে, পাঁচালি পড়ে—চঞ্চলা দেবীকে ধরা তো দূরের কথা—তার দর্শনও পান না বাঙালী বাবুরা!

সেকালে লোকে মেলেরিয়ায় ভুগতো—সত্য। কিন্তু খাদ্যাভাবে এতো কষ্ট পেতো না। আজকার মতো নীরবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা 'কিউ'এ দাঁড়িয়ে থাকতে হতো না। অন্নের পরই বস্ত্র সমস্যা—না খেয়ে সে ভিক্ষায় বের হতে পারে, কিন্তু বিনা বস্ত্রে গৃহের বাইরে আসতে পারে না। সেকালে লোকে 'বিলাতী' কাপড় পেতো—কী সস্তা! আজ ভাবতে পারা যায় না। রেলির 'উনপঞ্চাশ'-থান ধুতি পরতেন বাবুরা, লাটুমার্কা ধুতি পরতো সাধারণ লোকে। কলকাতায় ছুটির সময়ে বেড়াতে গেছি। আছি মানিকতলায় একটা গলির মধ্যে একটা বাড়িতে। দুপুরে শুনি একটা লোক হাঁকছে—'এক টাকায় তিনখানা

ধুতি, একখানা কাট।' জানলা দিয়ে দেখি লোকটার কাঁধে-ফেলা ধুতির স্তূপ—হাতে একখানা ধুতি। কত বড় কাপড় তা দেখিনি, তবে আজ একটাকায় আধখানা গামছাও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

লালুপালের কাপড়ের দোকান, ছোটবাজারে চৌ-মাথায় স্টেশন থেকে যে-রাস্তা চলে গিয়েছে নদীঘাটে তার মোড়ে। নিচে দোকান, উপরে শহরের পাবলিক লাইব্রেরী। লাইব্রেরীর কথা পরে বলবো। শ্যামবর্ণ গোলগাল মানুষটি বসে থাকেন একটা কাঠের বাক্সর পিছনে। সদাই প্রসন্ন মুখ, খদ্দের এলে কি চাই জেনেই হাঁক দেন কর্মচারীর উদ্দেশে, বলতে থাকেন কোন নমুনের কি কি কাপড় নামাবে। ব্যবসায়ে লক্ষ্মী এসে ঘরে। বিরাট বাড়ি—রাস্তা থেকে একটু ভিতরে ঘুলে যাওয়া-মাসার সময় দেখতাম একটু একটু করে তৈরী হয়ে উঠলো। আজ তাঁর কাপড়ের দোকান বংশধররা চালাচ্ছেন কিনা জানি না, তবে তাঁর প্রদত্ত অর্থে তাঁর নামে লাল গোপাল বিদ্যালয় চলছে। শহরে তখন কয়টাই-বা কাপড়ের দোকান ছিল! চারপাশের গ্রামের লোককে আসতে হয় মহাকুমা শহরে নানা কাজের জন্য, ধীরে ধীরে শহর হয়ে উঠছে ব্যবসার কেন্দ্র। গ্রামের চাষীবাসীরা ধান কেনে ও প্রথম ধান উঠলে পুরাতন ধার শোধ করে, পূজার কাপড় কেনে নূতন করে—হালখাতার সময় আবার টাকা দেয়।

আমাদের সংসারের কাপড়-চোপড় আসে লালুপালের দোকান থেকে, কখনো নগদে, কখনো ধারে। পূজার সময়ের কথা বিশেষ করে মনে পড়ছে—মুটের মাথায় কাপড়ের বস্তা আসতো—তখন তো আর রিক্স ছিল না দেশে! দুর্গাপূজার সময়ে আত্মীয়-স্বজনকে কাপড় দেবার রীতি ছিল। এখন পূজা না করলেও রীতিটা চলে আসছে। বাড়ির লোকের নামে নামে ধুতি সাড়ি তো এলো। তা ছাড়া দাস-দাসী, সেবক, সেবিকাদিকে দিতে হতো। দুটি তো পাবেই, কিন্তু তার বুড়ি মা, তার ভাই রাখাল, রাখালের নূতন বউ সেদিন মাকে প্রণাম করে গেল, তাদের না দিলে কি চলে? দুটির বোন দুধুর কি অপরাধ করেছে! তার জন্য সাড়ি এলো। মানি দুধ দেয় বারোমাস—দুধে তো জল দেবেই তা বলে পূজোর সময় কাপড় পাবে না? নিরু নিরীহ মুসলমান—সে ঘরে না ঢুকলেও ঘরের লোকের মতো তাকে অবশ্যি দিতে হবে। দেশের বাড়িতে যারা আছেন তাঁদের জন্য কাপড় সাড়ি আসে। এসব মধ্যযুগীয় আভিজাত্য বলবেন আজকালকার নবীন গৃহস্থরা।

ধন-অর্জন করে লোকে ধনী হয়; কিন্তু ধনীর সন্তানেরা যখন জন্মার্জন করে সংস্কৃতিবান হন, তখনই তাদের 'অভিজাত' সংজ্ঞা আমরা দিই। কৃষ্ণকান্তির বংশধরেরা কয়েক পুরুষ পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা পেয়ে শহরে শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন। ঐ বংশের নগেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে অবসর নিয়ে শহরে এসে বাস করছেন। রোজ প্রাতে বেড়ান সদর রাস্তায়, সঙ্গে দুজন পাইক আগে পিছে যায়। একদিন আমাদের বাড়ি এলেন—মাতৃবিয়োগ হয়েছে অশৌচ পালন করছেন মাসাবধি। শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ করতে নিজে বের হয়েছেন। তিনি ভাল ভাবেই জানতেন - যারা ভিন্নিয়ের বাড়িতে শ্রাদ্ধের ভোজে যাবেন না, তবুও সামাজিক নিয়মানুসারে শহরের সকলেরও—বিশেষভাবে ব্রাহ্মণদের নিজেই নিমন্ত্রণ করতে হয়। সে-কালে লোকে মাতৃদায় পিতৃদায় হতে উদ্ধারের জন্য অনেক কিছু করতেন।

আজকাল নিমন্ত্রণ-পত্র ছাপিয়ে ডাকযোগে অথবা লোক-মারফত পাঠিয়ে গৃহস্থরা নিশ্চিন্ত হন। 'পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম, ত্রুটি মার্জনা করিবেন' লিখে মনে করেন সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা হয়েছে। অবশ্য এ শ্রেণীর নিমন্ত্রণে হাজিরা দেবার লোকও সমাজে প্রচুর। আমরা আজ পর্যন্ত এশ্রেণীর নিমন্ত্রণ পত্র পেয়ে কোনো ভোজপুরে যাইনি। এটা অনেকে মনে করতে পারেন মধ্যযুগীয় 'অবাধি'। মেনে নিয়েছি অপবাদ।

হিন্দুসমাজে এর বিপরীতটাও দেখেছি। নিমন্ত্রণ তো হয়েছে ঘরে ঘরে গিয়ে—কিন্তু নিমন্ত্রণের সময়ে ব্রাহ্মণরা কি একটা ঘোঁট বাধিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসছেন না! গৃহস্থের তখন কী দশা হয়! বাড়ি বাড়ি লোক পাঠিয়ে পায়ে হাতে ধরে আনেন—তাঁরা ভোজন না করলে স্বর্গীয় পিতৃপুরুষরা অনাহারে থাকবেন।

শহরে ব্রাহ্মণেতরদের বাড়ি বাবা বা কাকা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতেন না—শূদ্রের বাড়ি ভোজন করলে জাত যায়। বিশিষ্ট ঘর হলে মা ও আমি যেতাম—তখন 'পৈতা' হয়নি সুতরাং ব্রাহ্মণ নই—শূদ্রের দামিল। তাই লুচি ভাত মেখে খাইয়ে দিত—সদ্গোপের মেয়ের হাতে খেলেও জাত যেতো না। আমাদের সঙ্গে যেতো কোনো এক ভৃত্য। আমাদের খাওয়া হয়ে গেল—দেখি দলের সেবকটি গামছা ভরে 'ছাঁদা' বেঁধেছে—অর্থাৎ লুচি, মণ্ডা মিঠাই প্রভৃতি সব সংগ্রহ করেছে। বহু বৎসর পরে তখন সিরিষিতে থাকি। বীরেন চাটুজ্যের মা কি ব্রত পালন করছেন—বৈশাখ মাসে ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হয়; তাই আমার নিমন্ত্রণ হয়েছে। তখন কোনো প্রকার যজ্ঞ না করেও যজ্ঞোপবীত ঝুলিয়ে ব্রাহ্মণত্ব জাহির করতাম। ভোজন সেরে দেখি, পাতের পাশে ষোলোটি পয়সা! ব্যাপার কি! বীরেন বললেন, ওটা ভোজন-দক্ষিণা, নিতে হয়। না নিলে আমরা অপরাধী হব।

শহরের একটা রীতির কথা মনে পড়ছে। আমরা ছোট ছেলে, তাই অনেক সময়ে মা'র সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ি করে নিমন্ত্রণ খেতে যেতাম। দেখতাম, নিমন্ত্রণ কর্তার কোনো আত্মীয় অভ্যর্থনা করছেন ও গাড়োয়ানকে গাড়ি ভাড়া দিয়ে দিচ্ছেন। সেকালে উপহার দেবার ভয়াবহ কুৎসিত রীতি প্রবর্তিত হয় নি। তবে কাজে-কর্মে আত্মীয়-স্বজনরা অর্থ দিয়ে সাহায্য করতেন গোপনে। আজকাল বিবাহ-সভায় লেখক বা লেখিকা কর্দ তৈরী করছেন—কে কি আনলেন। 'উপহার' দেখবার জন্ম মেয়েদের মধ্যে হুড়োহুড়ি—দুই একটি মেয়ে চোর, ছোটখাটো দামী জিনিস যেমন ঘড়ি, সোনার বোতামাদি নিয়ে সরে পড়ে। লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ ভিক্ষার উল্লেখ পত্রমধ্যে থাকলেও সবাই জানে ওটা ভদ্রতার মুখোস, 'প্রেজেন্ট' নিয়ে যেতে হবেই। অনেকে 'উপহার' দেবার ভয়ে বিবাহ-সভায় উপস্থিত হন না,—বিয়ে বাড়ি যেতে আসতে ট্যাক্সি বা গাড়ি ভাড়াতেও বেশ টাকা বের হয়ে যায়।

বিবাহের পর দেখা গেল 'প্রেজেন্ট বা উপহার এসেছে ৬ খানা 'মহয়া'। এখনসব গল্প উপন্যাস বা বাড়ির অনেকেরই পড়া। বিজলি বাতি-দান গোটা চার-পাঁচ; সাড়ি শতেক খানা। ট্রাংকের মধ্যে বছর খানেক পরে দেখা গেল—অনেক সাড়ির ভাঁজে ভাঁজে কেটেছে। কে সে সাড়ি দিয়েছিল সেদিন কারও মনে পড়েনা।

হিন্দুসমাজে বর্ণশ্রেষ্ঠ বলে একটা উন্নাসিকতা ছিল আমাদের পরিবারে। তাছাড়া সেকালে উকিলদের পদমর্যাদা ছিল সমাজে—তাঁদের স্বাধীন চিন্তাধার জন্ম। নানা কারণে একটা হাস্যকর গর্ব অনুভব করতাম। আমাদের পাশের বাড়িতে যাঁরা বাস করতেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের পরিবারের কোনো সামাজিক সম্বন্ধ ছিলনা বললেই চলে। মাঝে মাঝে মাসি বা পিসী এলে পাঁচিলের এপার থেকে ইট বা কাঠের গুঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে মাথা উঁচুকরে পাশের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতো। যাওয়া আসা চলতো না—পাশাপাশি বাড়ি হলেও। সদর রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া অসম্ভব—সম্ভ্রমতায় বাধবে! এর নাম আভিজাত্য বা বর্ণ-কৌলীন্য। এর সঙ্গে ছিল ধনকৌলীন্য ও সমাজে মর্যাদার কৌলীন্য। তাদের বাড়ি না-যাওয়ার কারণ বুঝলাম একদিন মা, মাসি, পিসি গল্প করছে—আমরা উকিলবাড়ির লোক,

পড়শিরা বোকার—মামলায় জলতে আমরা ব্রাহ্মণ—ওরা ব্রাহ্মণেতর। আসল কথা—'ওরা বাঙাল!' কী কথার ছিরি শোনো না? ওদের শাড়ি পড়ার ঢংটা দেখেছো? কি রকম খোপাট্টা করে পরে।' শাড়ি প'রে তাদের উলঙ্গতা ঢাকে—সেটা অপরাধ বৈকি। ছুটি বলে; 'সেদিন বাজার গিয়েছি। দেখি ওদের বাবু ভেটকি মাছ কিনছে।' মাসি বলে, তাই বল্। সেদিন দুপুরে মড়া-পোড়া গন্ধে ঘরে টে'ষতে পারছিলাম না। মায়ের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে ছুটে বললে, 'জানো মাসি, ওরা বোয়াল মাছ খায়।' শুনেই মাসি বলে উঠলেন, 'রামো, রামো ঐ মাছগুলো তো বাহুরের মতো ডাকে। ছিঃছিঃ।' এতগুলি অপরাধ যাদের, সে বাঙালদের বাড়ি যাওয়া যায় কি? সেই সংসার থেকে আমি আজ পর্যন্ত বোয়াল মাছ খেতে পারিনে, কিন্তু সবপ্রকার সিদ্ধ নিষিদ্ধ পশুপক্ষী ভক্ষণ করেছি—কিন্তু বোয়াল শুনলেই সেদিন মুখে মাছ রোচেনা। আর যে ব্রাহ্মণ্যগর্বে বাঙালদের নিয়ে অত ঠাট্টা তামাসা চলতো, আজ আমার সংসারের সবাই পূর্ববঙ্গ।

হিন্দুর ধর্ম ও 'জাত' হাতের এপিঠ-ওপিঠের মতো অচ্ছেদ্য। জাত গেলেই ধর্ম যায়। আর অন্যজাতের হাতে ভাত খেলেই! শুতপক্ষ লুচি, মণ্ডা মিঠাই খেলে কিছু হয়না—যত অপরাধ অন্নের! অন্নও খাওয়া যায় বিপাকে পড়লে। এক ব্রাহ্মণ দুর্ভিক্ষের সময়ে দুধের ঘরে মূর্ছার্ত হয়ে অন্নগ্রহণ করেন—কিন্তু জল পান করেন নি। বাংলাদেশে দুটো মাত্র জাত—ব্রাহ্মণ ও শূদ্র—চলতি ভাষায় বামুন ও শুদ্দুর। মানুষের 'জাত তুলে' গাল দিতে ব্রাহ্মণদের মুখে বাধতো না। 'হবে না! বেটা ভঁড়ি!' 'আরে জানো না, ও তেলি—তিলি নয়। আরে রাখো, সোনার বেনের বামুন আবার বামুন! তোম হাড়ির ও তো বামুন আছে।' রাঢ়ি শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আমরা, তাতে নাকি কুলীন ছিলাম,—সুতরাং বারিন্দির, (বারেন্দ্র), বৈদিকদের ঘরে মেয়ে দেওয়া যেতো না। জাত, জাত, জাত। জাত তুলে গালাগালের ইতর অভ্যাসের পাশাপাশি ছিল প্রাদেশিকতার ইতরতা। পূর্ববঙ্গে লোকদের সম্বন্ধে যত কুৎসা ছড়াকাটা শুনতাম। 'বাঙাল পুঁটি মাছের কাঙাল, বাঙাল গঙ্গাজলের কাঙাল, বাঙাল ভাঙা পথের কাঙাল' ইত্যাদি। কেউ বোকামি করলে বলতাম 'বাঙাল নাকি?' গরীব লোক ও ছোটলোক প্রতিশব্দের মত ব্যবহার করতাম। মুসলমানরা ছিল 'নেড়ে'—তারা অস্পৃশ্য। তাদের একাসনে বসে খানা-পিনার কথা কল্পনা করা যেতো না খোলাবাজারে! নানা কারণে এখন আর জাত তুলে গালিগালাজ করতে বর্ণহিন্দুর সাহস হয় না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে অতীতদিনের লুপ্ত গৌরব ফিরে পাবার আশায় দাঁত কিড়মিড় করে বলি, 'পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে।' দুঃখের বিষয় এই শ্রেণীর লোক ভাগ্যের লেখা পড়তে পারেন না। আজও ভাবছেন দুনিয়ার দুধের সরটুকু তাঁদের ও তাঁদের বংশধরদের ভাগ্যে চিরন্তন হবে। তা যদি হতো, তবে অশোক, আকবরের বংশধরগণও রাজত্ব করতেন।

[ক্রমশঃ

আবার সেই জেল

দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সাত

চাকরীতে ঢুকতে না ঢুকতেই প্রচণ্ড একটা শক্ খেলাম।

না, চুনীলালের আত্মহত্যার জন্য নয়!

কোন্ এক সিপাই চুনীলাল কোন্ এক মোল্লার জন্য প্রাণ দিল, তা নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার দরকার কি?

কিন্তু এ যে খোদ আমার চাকরি নিয়েই টান।

গেজেটেড কর্মচারীরা নিজেরাই মাইনের বিল সই করে ট্রেজারী থেকে টাকা তুলে আনেন। কিন্তু কত টাকা দেবে ট্রেজারী? তাই চাকরীতে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে এ্যাকাউনটেন্ট-জেনারেল চাকুরেকে জানিয়ে দেন, এই তোমার মাইনে, সেই চিঠির কপি ট্রেজারী অফিসারকেও পাঠিয়ে দেন। একে বলে 'পে স্লিপ।'

আমার নিয়োগ-পত্রের তারিখ ২০ মার্চ। তাতে লেখা আছে, দু বছর প্রবেশনে থাকার পর আমার কনফারমেশন সম্বন্ধে বিবেচনা করা হবে।

চাকরীতে যোগদান করলাম ১৯৪৮ সালের ৩ এপ্রিল।

১৮ এপ্রিল পেলাম সেই শক্-লাগানো 'পে স্লিপখানা', তাতে লেখা আছে ৩ এপ্রিল থেকে আমি মাইনে পাব এত, কিন্তু ৩ জুলাই থেকে কিছুই পাব না।

অর্থাৎ ৩ জুলাই থেকে আমার চাকরি 'নট্' হয়ে যাবে।

মানে, আমার চাকরির মেয়াদ মাত্র তিন মাসের।

তৎক্ষণাৎ সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ মজুমদার লেখালেখি সুরু করলেন।

আসল ঘটনাটি ভারী মজার।

গভর্ণমেন্টের ধারণা ছিল, আমি ডেপুটি-সুপার পদে যোগদান করতে করতে ডেপুটি-সুপার বজনী

চক্রবর্তী রিটায়ার করবেন, আমি ওঁর শূন্য আসনে বসব। কিন্তু কার্যতঃ তা হল না, উনি চলে যাবার আগেই আমি প্রমোশন পেলাম। তাহলে কি করা যাবে? একটি চেয়ারের জন্য একই পদের দুজন অফিসার? এ যে আইন বিরোধী! সুতরাং তড়িঘড়ি গভর্নমেন্ট হুকুম জারি করলেন, এ্যাডিশনাল ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট। রজনীবাবু রিটায়ার করার সঙ্গে সঙ্গে এই অস্থায়ী পদেরও বিলুপ্তি ঘটবে।

কিন্তু উলটো বুঝিলি রাম! এ্যাকাউনটেন্ট জেনারেল মনে করলেন যে, রজনীবাবু ত আমার অনেক আগে থেকে চাকরি করছেন, সুতরাং তিনিই স্থায়ী পদের ডেপুটি-সুপার, আর পরে যিনি নিযুক্ত হয়ে এসেছেন, যাঁর নাম বিজেন্দ্রলাল পাঁজুলী, তিনিই এ্যাডিশনাল ডেপুটি সুপার, তিন মাস পর ওঁর চাকরি শেষ হয়ে যাবে।

যাস, এবার ঠ্যালা সামলাও! জুলাই মাসের শেষে আমার মাইনের বিল আলীপুর ট্রেজারীতে পাঠালাম, ট্রেজারী অফিসার তা ফেরৎ দিয়ে জানালেন যে, ৩ জুলাই থেকে আমার চাকরি ইতি হয়ে গেছে।

তারপর মজুমদার ও আমি বিস্তর লেখালেখি করে এই জট ছাড়াতে সক্ষম হলাম, তিন মাস মাইনে বন্ধ থাকার পর নতুন পে-স্লিপ এল, মাইনে পেলাম।

যাক জিয়ে অর ছাড়ল।

আবার এক জট বাঁধল আমার বেতার ভাষণ নিয়ে।

কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে 'সাময়িকী' পর্যায়ে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং তার সম্ভাব্য পরিণতি সম্বন্ধে প্রতি পক্ষে ভাষণ দিতেন সুপরিচিত পত্রিকা সম্পাদক ও সাংবাদিকেরা। আমিও দিয়েছি অনেকদিন। ভাষণের দিন বেলা বারোটার মধ্যে পাণ্ডুলিপি দিয়ে আসতে হত, বেতার কর্তৃপক্ষ সেন্সর করে রাখতেন, তার পরেও যদি পরিস্থিতিতে কোন পরিবর্তনের খবর পাওয়া যেত, তক্ষুণি ভেটমিতাবে ভাষণেরও প্রয়োজনীয় সংশোধন করে নিতাম প্রচারের পূর্বক্ষণে কেন্দ্রে বসে।

গভর্নমেন্ট হুকুম দিলেন, না, তা আর চলবে না। সাত দিন আগে ভাষণের পাণ্ডুলিপি আমাদের কাছে পেশ করতে হবে, আমরা সেন্সর করব।

নিবেদন করলাম, যাঁরা সেন্সর করছেন, তাঁরাও ত কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসার, বেফাঁস কথা তাঁরা বলতে যাবেন কেন?

তা হোকগে, সরকার নাক সিঁটকোলেন, তুমি আমাদের অধীনস্থ কর্মচারী, সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার হাজার বার সেন্সর করলেও তোমার ভাষণ আমরাও নিশ্চয়ই সেন্সর করব। ওটা আমাদের অধিকার, আমরা ছাড়ব না।

আবারও নিবেদন করলাম, কিন্তু সাত দিন আগেকার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যদি বদলে যায়, তাহলে আমার ভাষণও যে বদলাতে হবে, তখন?

সরকার ভ্রু কোঁচকালেন, বেশী পাকামো করো না, বলো কি অর্ডার।

আমাদের আই-জি ডাঃ বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করে সব বললাম। উনি হেসে বললেন, আমায় দেবেন, আমি সেন্সর করে দোব ইন এ্যাডিশিপেশন অব স্যাংশন, তারপর যদি বদলাতে হয় বদলে দেবেন।

বললাম, তাহলে সেন্সর করা কপির সঙ্গে যে মিলবে না সবটা।

আরে মশাই, না মিলল, বিশ্বাস আবার হাসলেন, না মিললে সে ত জানছি আমি আর জানছেন আপনি। গভর্ণমেণ্টের ফাইল আর কর্মালিটি ঠিক থাকলেই হল।

ঘটনা শুনে রজনীবাবু বললেন, এতকাল সরকারী চাকরি করে কি বিদ্যেজ্ঞান লাভ করেছি জানেন, বিজেনবাবু? গভর্ণমেণ্ট মানেই কতকগুলো ফাইল। ফাইল ঠিক রাখতে পারলেই চাকরি অটুট থাকবে।

মাত্র বারো বছরের সরকারী চাকরিতে আমি নিজেও তা বহুবার প্রত্যক্ষ করেছি। হয়ত বুঝতে পারছি একজন ফাঁকি দিচ্ছে, তার ফাঁকির ফলে ক্ষতি হচ্ছে, কিন্তু রেগেমেগে কলম ধরতে গিয়ে দেখেছি, কিছুই করবার উপায় নেই তার, কারণ তার ফাইল ঠিক আছে। অর্থাৎ চাকরির সিমেণ্ট কংক্রিটে চিড় ধোটানো যাবে না!

সরকারী ফাইল চলবার একটা প্রপার চ্যানেল আছে, পৃথিবী যদি রসাতলে যায়, তবুও সেই চ্যানেল ছাড়া তার চলবার উপায় নেই। যদি কোথাও আগুন লাগে, তাহলে যে আপনি বালতি নিয়ে ছুটে গিয়ে ঝপ ঝপ করে জল ঢালবেন, আজ্ঞে না, সেটি হবার যো নেই। অত সোজা পথে গেলে চলবে না, খু প্রপার চ্যানেলে যেতে হবে। হয়ত গিয়ে দেখবেন, আগুনের কাজ তখন শেষ, পড়ে আছে শুধু একগাদা ছাই। সে অবস্থায় আপনাকে বালতির জল ফেলে দিয়ে এক বালতি ছাই নিয়ে ফিরে এসে ফাইলে নোট দিতে হবে, 'প্রপার চ্যানেলে যাইয়া দেখি, আর জলের প্রয়োজন নাই।'

আপনার চাকরি যাবে কে?

একটা উদাহরণ দিই।

মনে করুন, আপনি একজন নির্যাতিত দেশকর্মী, স্বদেশী করে বৃটিশের আমলে জেল খেটেছিলেন, আপনার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে আপনি চলচ্ছক্তি রহিত, গভর্ণমেণ্ট আপনাকে একটা পেন্সন দিচ্ছিলেন। হঠাৎ পেন্সন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আপনি হোম ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারীকে পত্র লিখলেন, 'সরকারী অত নম্বর হুকুম অনুযায়ী আমাকে যে পেন্সন দেওয়া হইতেছিল, হঠাৎ কেন তাহা বন্ধ হইয়া গেল জানিনা। উহা সত্বর আবার চালু করিতে আজ্ঞা হয়।'

আপনার সেই পত্রখানি কিভাবে হোম সেক্রেটারীর টেবিলে পৌঁছুবে এবং কিভাবে আপনি তার জবাব পাবেন, সেই প্রপার চ্যানেলের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।

জেনারেল পোষ্ট অফিসে সংরক্ষিত ডাক খুলে রাইটার্সের পিওন সেখানা নিয়ে এসে ফেলবে সেনট্রাল ডেসপাচ সেকশনে। সেখানে সব চিঠি রিসিভ করা হয়, ইস্যু করা হয়। ওঁরা খুলবেন না আপনার পত্র, কারণ আপনি লিখেছেন হোম ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারীকে। তেমনি না-খোলা অবস্থায় সেখানা যাবে হোম ডিপার্টমেণ্টের ইউনিট ডিপার্টমেণ্টাল সেনটারে। না, সেখানেও খোলা হবে না, ক্লোজ লেটার ফাইলে বন্দী হয়ে সেখানা যাবে জনৈক কেরানীবাবুর কাছে। তিনি ওখানা খুলবেন, তারপর রবার ষ্ট্যাম্প মেরে পাঠিয়ে দেবেন রেজিষ্ট্রারের টেবিলে, রেজিষ্ট্রার পাঠাবেন এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারীর টেবিলে, তিনি পাঠাবেন ডেপুটি সেক্রেটারীর টেবিলে। তিনি পাঠাবেন হোম সেক্রেটারীর টেবিলে। হোম সেক্রেটারী মশাই ওখানা পাঠ করবেন, কিন্তু মার্জিনে লিখে দেবেন শুধু ছটি কথা, 'পুট আপ্'। অর্থাৎ ঘটনাটি কি, তার তথ্য জানাও।

তথ্য সংগ্রহের জন্য আপনার পত্রের ফাইল আবার ফিরে আসবে ক্লোজ লেটার কেরানীবাবুর টেবিলে, সেখান থেকে রিডারীর হেড এ্যাসিষ্টাণ্টবাবুর টেবিলে। নির্যাতিত দেশকর্মীর পেন্সন সম্বন্ধে যে

কেরানীবাবু কাজ করেন, আপনার ফাইল যাবে সেখানে। আপনি আবার একখানা পুরোনো দরকারী হকুমনামার নম্বর উল্লেখ করেছেন, সুতরাং আপনার ফাইল অতঃপর যাবে রেকর্ড রুমে, বার করা হবে সেই পুরোনো হকুমনামা। সেটি নিয়ে এসে কেরানীবাবু আপনার ফাইলে নোট দেবেন এবং আপনার পত্রের জবাব কি হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে একখানা খসড়াও লিখে দেবেন।

না, না, অত পুলকিত হয়ে উঠবেন না, ভাববেন না, এবার আর দেরী কি, চিঠিখানা টাইপ করিয়ে সই করে পেশ করে দিলেই ত পরদিনই আপনি পেয়ে যাবেন। আজ্ঞে না, তা হবার যোটি নেই প্রপার চ্যানেল অত সোজা নয়।

আপনার পেনশন আবার চালু করতে হলে ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের অনুমোদন চাই যে। ফাইল যাবে সেখানে। সেখানেও আছেন রেজিষ্ট্রার, এ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী, ডেপুটি সেক্রেটারী এবং খোদ সেক্রেটারী সেখানেও আছেন হেডবাবু, টেলবাবু ও অন্যান্যবাবু। আর কে না জানে যে, ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট চক্রব্যূহের মত, সেখানে প্রবেশের পথ সর্ব্বদাই হাট করে খোলা, কিন্তু বেরিয়ে আসার কোন পথ আছে কিনা সন্দেহ। সেখানকার গোলকধাঁধায় আপনার ফাইল কোন্ ব্লাইণ্ড লেনে পচা ড্রেনে পড়ে নাকানি-চোবানি খাচ্ছে, আপনি সহস্র চেষ্টা করেও তার হদিস করতে পারবেন না।

ফাইন্যান্স ঘুরে খসড়াবাবুর টেবিলে ফিরে আসবে আপনার ফাইল। তারপর টাইপবাবুর টেবিলে গিয়ে খসড়া টাইপ হবে। কম্পেয়ারিং সেকশন মিলিয়ে দেখবেন নির্ভুল টাইপ হয়েছে কিনা। তারপর এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারীর টেবিলে যাবে, তিনি সই করে দিলে যাবে ইস্থ সেকশনে। সেখানে চিঠিতে নম্বর ও তারিখ পড়বে, এনভেলপে আঁটা হবে। তারপর আবার যাবে সেন্ট্রাল ডেসপাচ সেকশনে। তাঁরা টিকিট সেঁটে পিওন পাঠিয়ে পোষ্ট করে দেবেন।

বিলক্ষণ একেই বলে থাকেন লাল ফিতার ফাঁস, অথচ জানেন না তাঁরা যে, এটাই প্রপার চ্যানেল। গভর্ণমেণ্টের প্রতিটি ফাইল বা কাগজ মহামূল্যবান, কখখনো হারায় না, হারাতে পারে না। হয়ত ফাইলের ওপর ফাইল জমতে থাকে, স্তূপীকৃত হতে থাকে, টেবিলে না আঁটলে সেল্ফ-এ, সেল্ফ-এ না আঁটলে হয়ত ঘরের মেঝেতেই, তবুও হারায় না। ফাইলে ধুলো জমতে থাকে, ফাঁকে ফাঁকে টিকটিকি ডিম পাড়ে, আরশুলা ঘোরাঘুরি করে, হয়ত মেঠো ইঁদুর ছুটোছুটি করে, তথাপি ফাইল কদাপি হারায় না। থাকে।

রজনীবাবু খাঁটি কথাই বলেছিলেন, গভর্ণমেণ্ট মানেই ফাইল। সেই ফাইল প্রপার চ্যানেল দিয়ে এগিয়ে দেয়াই আমাদের একমাত্র কাজ। আমরা, সমস্ত সরকারী কর্ম্মচারী যেন সেই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলা ফাইল-ট্রেনের কেউ ড্রাইভার, কেউ গার্ড, কেউ পয়েন্টসম্যান।

আমার স্বল্পকালীন চাকরি জীবনে উৎসাহবশে কখনও কখনও প্রপার চ্যানেলকে পাশ কাটিয়ে শর্ট লাইনের সোজা পথে ফাইল চালাতে গিয়ে যে কি দুর্বিপাক সহ্য করতে হয়েছিল, তার কয়েকটি ঘটনা যথাসময়ে আমার আখ্যায়িকায় এসে পড়বে।

ওভারসিয়ার সুরজিৎ ভট্টাচার্য্য বিনয়ের অবতার।

চিরকালই তাঁর পোষাক দেখেছি, ময়লা ধুতি, ময়লা ফুলহাতা সার্ট, হাতের বোতাম খোলা বা বোতামই নেই, ছেঁড়া স্যাণ্ডেল। সেই স্যাণ্ডেলের ফটর ফটর আওয়াজ যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণ করে পুব ভোরের অন্ধকার থেকেই একবার স্যালুট জানাবেন, তারপর টেবিলের সামনে এসে আরেকবার। দাঁড়াবেন টেবিল

থেকে অন্ততঃ এক গজ দূরে। তারপর যা বলবার, তা নিবেদন করবেন চোখের দিকে না তাকিয়ে, মুখ নীচু করে, দুই হাত কচলাবার ভঙ্গীতে সামান্য একটু ঝুঁকে। বক্তব্যের মধ্যে অলংঘ্যবার স্যার স্যার করবেন।

যদি বলি, জল উঁচু, অমনি ঘাড় কাৎ করবেন, ইয়েস স্যার।

যদি বলি, জল নীচু, তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাৎ করবেন, ইয়েস স্যার।

যদি বলি, জলই নেই, একেবারে মরুভূমি, তাহলেও সেই ইয়েস স্যার।

দিনকে রাত বললেও ইয়েস, রাতকে দিন বললেও ইয়েস, এমনি ইয়েস-ম্যান দ্বিতীয়টি আর দেখিনি। আর সেই ইয়েস বলার ভঙ্গিমাটি কি চমৎকার, বিনয়ে যেন একেবারে গলে গলে পড়েন!

আমার সামনে এমনি নিরীহ গোবেচারা ভিজে বেড়ালটি হলে কি হবে, ওঁর রাজত্বে অর্থাৎ এল ডি চালিশলোতে উনি ভীষণদর্শন সিংহ। সেখানে হনহন করে ঘুরে বেড়ান ওভারসিয়ার, ধমক না দিয়ে বন্দীদের সঙ্গে কথাই বলেন না, অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দেন, কথায় কথায় রিপোর্টের হুমকি যেন আর বন্দীরা সবাই জানত, অন্ততঃ এতকাল জেনে এসেছিল যে, ওভারসিয়ারবাবুর রিপোর্ট মানেই দাঙ্গা, কারণ ডেপুটি সাহেব ওদের শত কথাতেও কাণ দেবেন না, রিপোর্টে সই করে দেবেন। তাই এল ডি চালির টেরর্ সুরজিৎ ভট্টাচার্য্যকে বন্দীরা বাঘের মত ভয় করে। চেহারা করে ওঁর নেকনজর আকর্ষণের, তা হলেই সাত খুন মাপ।

একদিন বেলা প্রায় বারোটার সময় একখানা ফাইল নিয়ে এলেন ওভারসিয়ার। যথারীতি পুব ডোরের কাছে থেকে একবার, টেবিলের কাছে এসে আরেকবার স্যালুট জানালেন, তারপর ফাইলগুলো সন্তর্পণে টেবিলে নামিয়ে রেখে বললেন, রিপোর্ট স্যার।

জিজ্ঞেস করলাম, অপরাধীদের এনেছেন?

হ্যাঁ স্যার, ওরা ঐ ঘরে আছে। ডাকব স্যার?

ডাকুন।

প্রথম টিকেট টেনে নিলাম, ওভারসিয়ারের লেখা, Reported for continued short task and refusing to work—অর্থাৎ বরাদ্দ খাটনি করছে না এবং করতে অস্বীকার করছে।

জিজ্ঞেস করলাম, কি হে আলী মহম্মদ, কাজ করছ না কেন?

করছি ত হুজুর।

কিন্তু কম করছ যে?

পুরোটা পারছি না হুজুর, আলী মহম্মদ জবাব দিল, বাইরে হুজুর, চাষবাস করে খেতাম, তাঁত চালাতে পারব কেন? লাঙল দিন, বলদ দিন, দেখুন হুজুর, কেমন কাজ করতে পারি।

কথায় যুক্তি আছে। চাষীকে তাঁতী বানানো সহজ কথা নয়। জেলের প্রকাণ্ড সবজি বাগান আছে বটে কিন্তু আমাদের লাঙল নেই, লাঙল টানবার বলদ নেই। বন্দীরা কোদাল চালিয়ে জমি তৈরী করে।

জিজ্ঞেস করলাম, কতদিন তাঁতে কাজ করছ?

তা মাসখানেক হবে হুজুর, আলী মহম্মদ বলল, উনি বলেন, রোজ দশ গজ থান বুনতে হবে, আমি আট গজের বেশী পারছিনা হুজুর। একটুও বসে থাকিনা হুজুর, ওভারসিয়ারবাবু মিছেমিছি আমায়—

চুপ! ওভারসিয়ারের কণ্ঠে এল ডি চালির সিংহের গর্জ্জন শুনতে পেলাম, তুই বলিসনি, আর বেশী

করব না? আর মিছে কথা বলনি যে, মাসখানেক কাজ করছিস? এক মাস দশ দিন হয়ে গেছে স্যার, ইচ্ছে করে দশ দশ দুনছেনা, আমার সাহেবের কাছে এসে সাধু সাজা হচ্ছে, চাবী ছিলাম—

শুনুন ওভারসিয়ারবাবু, বাধা দিয়ে বললাম, বাইরে যে লাঙল চালাত, এখানে এসেই সে তাঁতী হয়ে উঠতে পারে না। এক মাস দশ দিন বা বেশি দু মাসের মধ্যে ও যদি আট গজ বুনতে পেরে থাকে, তাহলে আর কিছুদিনের মধ্যেই বাকি দুগজ পারবে। পারবে না আলী মহম্মদ?

পারব হুজুর।

আচ্ছা, যাও।

আলী মহম্মদ সেলাম করে চলে গেল। আমি ওভারসিয়ারকে বললাম, শুনুন, কারুর নামে রিপোর্ট করবার আগে ওর বক্তব্যটা ভাল করে শুনবেন। শুনলেন ত ওর যুক্তিপূর্ণ কথা, ছিল চাষী, করেছেন তাকে তাঁতী। অত তাড়াতাড়ি পারবে কেন? আপনি ত শ্রীরামপুর টেক্সটাইল কলেজের ডিপ্লোমা হোল্ডার, আপনাকে যদি থাকতে বলি, পারবেন?

ঘাড় কাৎ করেই ছিলেন সুরজিৎবাবু, বার বার সেই ঘাড় কাৎ করে আমার কথায় সায় দিয়ে যাচ্ছিলেন, যেই আমি রিপোর্টটা কেটে দিয়ে বললাম, বরং ওকে উৎসাহ দেবেন, অমনি বলে উঠলেন, ইয়েস স্যার।

সেই বিনয়-বিগলিত কণ্ঠ!

আরও কয়েকটা রিপোর্ট এমনিভাবে কেটে দেবার পর পেলাম গুরুতর এক অভিযোগ, making false complaint against the Instructor and showing temper, অর্থাৎ ইন্‌স্ট্রাক্টারের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা ও মেজাজ দেখানো।

আসামী আধার বর্মন।

ফরিয়াদী আব্দুল সেখ।

রজনীবাবুর কথা মনে পড়ে গেল, ওভারসিয়ারকে বলেছিলেন, showing temper জুড়ে দেবেন ওভারসিয়ারবাবু, রিপোর্টটা যাতে সিরিয়াস হয়। এক্ষেত্রেও তাই করা হয়েছে কিনা কে জানে।

সরকারী প্রসিকিউটর সুরজিৎ ভট্টাচার্য্য ততক্ষণে মামলার উদ্বোধনী ভাষণ সুরু করে দিয়েছেন। ঘটনার রোমহর্ষক বিবরণ দিয়ে পরিশেষে মন্তব্য করলেন, আধার স্যার, সাংঘাতিক বদমাস। যে সব ভাষায় ইন্সিস্যারকে গাল দিয়েছে, আপনার সামনে আমি তা উচ্চারণ করতে পারব না স্যার। বলছে কিনা ইন্সিস্যারই আগে ওকে গাল দিয়েছে, অথচ আশ্চর্য্য, পাপোশ চালিতে এতগুলো লোক কাজ করে, কেউ তা শুনতে পেল না। আমি সব সাক্ষী নিয়ে এসেছি স্যার, আপনি বললেই—

হাত তুলে বাধা দিলাম। বুঝলাম, ওভারসিয়ার একেবারে আটঘাট বেঁধে আসরে নেমেছেন এবার। জয় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছেন। মামলা কঠিন। ইন্সিস্যারের মত একজন উচ্চপদস্থ বন্দী অফিসারকে গাল দেওয়া! নির্ঘাত গুরুতর। শুধু রেমিশন কাটা নয়, সুপারের কাছে হাজির করতে পারলে সেল পানিসমেন্টও হয়ে যেতে পারে।

যাই হোক, আসামী অপরাধ স্বীকার করে কিনা জানবার জন্য জিজ্ঞেস করলাম, আধার, ইন্সিস্যারকে গাল দিয়েছ তুমি?

আধার জবাব দিল, ইন্সিস্যারই আগে গাল দিছে হুজুর—

আচ্ছা, তাহলে আসামী ফরিয়াদীর বিরুদ্ধেও নালিশ জানাচ্ছে। তাই এবার আফজলকে জিজ্ঞেস করলাম, কি হে, গাল দিয়েছিলে?

সব মিথ্যে হুজুর, সব মিথ্যে, আফজল বলে উঠল, মানুষটা হুজুর, কাজ ভাল করে, কিন্তু খালি বক বক করে। আমি তাই হুজুর বললাম, আরে ব্যাটা, কথা বলিস পরে, আগে কাজ শেষ কর্।—বাস, অমনি রেগে আগুন! বলল, ব্যাটা ব্যাটা করবি ত তোর মাথা ভেঙে দোব। আমি বললাম তুই ব্যাটা নয় ত কি মেয়েমানুষ। অমনি হুজুর, যা তা বলে গাল দিয়েছে—

আধাক ঘাড় বেঁকিয়ে উঠল, কিয় ? কিয় ব্যাটা বলবি ? কিয় গাল দিছিস ?

ওভারসিয়ার বলে উঠলেন, দেখুন, দেখুন স্যার, আপনার সামনেই কেমন রুখে রুখে উঠছে। ডেঞ্জারাস ম্যান স্যার।

আমি কিন্তু মনে মনে হাসলাম। ঘটনাটি জলের মত সহজ হয়ে গেছে বুঝতে পারলাম। জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা আধাক তোমার বাড়ী কোথায় ?

পশ্চিম দিনাজপুরে হুজুর।

আর আফজল, তোমার ?

ক্যানিং-এ হুজুর।

আপনার দেশ কোথায় ওভারসিয়ারবাবু ?

ওভারসিয়ার বিস্মিত কণ্ঠে জবাব দিলেন, কেষ্টনগরে স্যার।

মানে নদীয়া জেলায়, আমি বললাম, আপনি যেমন নদীয়া জেলার, আফজলও তেমনি চব্বিশ পরগণার। বুঝতে পারছি পশ্চিম দিনাজপুরে বোধহয় কেউ যাননি আর ও দেশে আদি অধিবাসীদের সঙ্গেও ভাল করে মেশেন নি। তাদের বলে 'বাহে'। বাহেদের কাছে 'ব্যাটা' শব্দটা আপাতত রকমের অশ্লীল গাল।

অশ্লীল! সে কি স্যার ? ওভারসিয়ারের প্রভিন্সিউটিং-সুলভ গাম্ভীর্য যেন অনেকখানি হালকা হয়ে গেল, ব্যাটা শব্দটা—

হেসে বললাম, ব্যাটা মানে আপনারা কি বোঝেন ? পুরুষ, তাই না ? তাই আফজল বলেছে, ব্যাটা না ত কি তুই মেয়েমানুষ ? আর বাহেরা ব্যাটা শব্দটাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করে ক্ষেপে যায় জানেন ? ব্যাটা মানে ছেলে, মানে সন্, ওকে সন্ বলছেন মানেই আপনি ওর ফাদার হয়ে বলছেন, তার মানেই ওর মাদারের সঙ্গে আপনি সাংঘাতিক আপত্তিজনক একটা সম্পর্কের কথা বলছেন, অর্থাৎ আপনি ওর বাবা-মা তুলে গাল দিচ্ছেন। বাপ মা তুলে গাল দিলে কে না ক্ষেপে যায়, বলুন।

ওভারসিয়ারের মুখে এবার হাসির ঝিলিক দেখা গেল, আফজলও মোটামুটিভাবে বুঝতে পেরে শান্ত কণ্ঠে বলল, আমি ত হুজুর, অতটা বুঝতে পারিনি যে, ব্যাটা বললে গাল দেয়া হয়। এবারটা আমায় মাপ করুন হুজুর।

সে কি, মুহূর্তে যে ঘটনাটি নাটকীয়ভাবে পাল্টে গেল, পাল্টে গেল নয়, উল্টে গেল! ফরিয়াদী আসামী হয়ে গেল এবং আসামী হয়ে সে গিলটি ফিল করছে! কোনও মামলায় এমনি অঘটন ঘটেছে কখনও ?

তৎক্ষণাৎ ওদের মিটমাট করিয়ে দিলাম, হাতে হাত মিলিয়ে দিলাম। ওরা সেলাম করে খুশী মনে চলে গেল।

এবার সুরজিৎবাবুকে বললাম, শুনুন ওভারসিয়ারবাবু, পান থেকে চুন খসলেই রিপোর্ট করে

বলবেন না। বাবা মা স্ত্রীপুত্র কন্যার সঙ্গ থেকে বঞ্চিত থাকার ফলে স্বভাবতঃই ওদের মেজাজ একটু খিট-খিটে হয়ে যায়। সেই মেজাজের ওপরই কোন কোন সময়ে মাত্রা হারিয়ে অপরাধ করে বসে। যতটা সম্ভব, সেসব অপরাধ উপেক্ষা করবেন বা ধমকে দেবেন, কস্ করে হাজির করে বসবেন না। আর সবগুলো চার্জের আপনিই যখন তত্ত্বাবধায়ক, তখন ওদের নামে ঘন ঘন রিপোর্ট এলে এটাও ত মনে হতে পারে যে, আপনার তত্ত্বাবধান ত্রুটিহীন নয়। বুঝলেন?

তৎক্ষণাৎ বুঝে ফেললেন তিনি এবং কথায় কথায় যেমন করে থাকেন, তেমনিভাবে সামনের দিকে ঝুঁকে, ঘাড় কাৎ করে হাত কচলাতে কচলাতে বিনয় বিগলিত কণ্ঠে নিবেদন করলেন, বুঝেছি স্যার, বুঝেছি। এবার থেকে তাই করব স্যার।

তারপর স্যালুট জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

আমি একা বসে নিঃশব্দে হাসতে লাগলাম।

বুঝতে পারলাম, বন্দীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার দিনের পর দিন পরাজয়ে মোটেই খুশী হচ্ছেন না ওতারসিয়ার হুরজিৎ ভট্টাচার্য্য।

কি জানি, হয়ত এবার আমারই পেছনে লাগবেন।

[ক্রমশঃ

• • •

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে প্যারীর পথে। কুয়াশার মত শীতল তুহিন-কণা ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে। একটি সুন্দরী তরুণী সহরের শেষপ্রান্তে এসে গাড়ী থেকে নামলেন এক পুরানো বাড়ীর সামনে।

দরজায় আঘাত করতেই এক বৃদ্ধা এসে তাঁকে নিয়ে গেলেন ভেতরে।

—কি চাই তোমার? কোথা থেকে আসছো?

তরুণী উত্তর দিল—নেভী অফিস থেকে।

কেন? উদ্বিগ্নস্বরে প্রশ্ন করলেন বৃদ্ধা।

—আপনার ছেলে লেফ্রোঁ, যিনি জাহাজের দ্বিতীয় লেফ্‌টেনাণ্ট হয়েছিলেন, তিনি আজ তিন দিন হল হঠাৎ সমুদ্রবক্ষে মারা গেছেন।

অদ্ভুত রকম শব্দ করে উঠে বৃদ্ধা ভীষণ আর্তনাদ করে মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ে অচৈতন্য হলেন। তরুণী তাড়াতাড়ি তাঁকে তুলে চেয়ারে বসিয়ে সেবাযত্ন করলেন এবং চেতনা ফিরে এলে বললেন—

—মা মা, আপনার ছেলে ভালই আছেন। এই নিন তাঁর চিঠি। আমায় ক্ষমা করবেন। আমি সারা বার্নার্ড, অভিনেত্রী, কাল আমার এই ভূমিকাই আছে!

অলিভার টুইস্ট : ডিকেন্স

সুজন রায়

এই উপন্যাসটির মধ্যে যেন সর্বদেশের সর্বকালের ভাগ্যতাড়িত নিঃস্ব বালকের জীবন বর্ণিত হয়েছে। কাহিনীর আবেদন তাই সর্বজনীন। এই রচনার মধ্যে লেখকের যে মানবতাবোধ, প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে তীক্ষ্ণ মনোভাব লোক্ষ্যায়, তা আজও পাঠকের মনকে উদ্বেল করে। প্রায় একশ বছর আগে এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসের রচয়িতা চার্লস ডিকেন্সকে বলা হয় ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী। ডিকেন্স-এর বহু উপন্যাসেই নিপীড়িত মানুষের বেদনা ভাষা পেয়েছে, বিশেষ করে তাদের কথাই তিনি বিশ্বের দরবারে পেশ করেছেন।

এক

লণ্ডনের এক অনাথ আশ্রমে একদিন একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করল। তার জন্মের পরে তার মা মারা গেল। ফলে ছেলেটির পিতৃপরিচয় জানা গেল না।

অনাথ আশ্রমের কর্তারা ছেলেটির অভিভাবকের খোঁজে পুরস্কার ঘোষণা করলেন। কিন্তু কেউই নগদে ছেলেটিকে নিজের সন্তান বলে গ্রহণ করল না।

কর্তারা ভেবেচিন্তে ছেলেটির নামকরণ করলেন—অলিভার টুইস্ট। অনাথ আশ্রমের সংলগ্ন যে শিশু বিভাগ ছিল সেইখানে অলিভারের স্থান হল।

সেই বিভাগে এক ধাত্রী ছিল, তার নাম মিসেস ম্যান। সেই ধাত্রীর উপর অলিভারের লালন-পালনের ভার পড়ল।

ধাত্রীটি ছিল যেমন লোভী, তেমনি রূঢ় কর্কশ হৃদয়হীন ছিল তার ব্যবহার। সে শিশুদের বরাদ্দ খোরাকী থেকে প্রচুর চুরী করত, ছেলেদের ঠিকমত খেতে দিত না এবং তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাতো।

এই নিষ্ঠুর ধাত্রীর কাছে অলিভারের জীবনের ন' বছর কাটল। কী দুর্বিষহ সেই ন' বছর! সেই ন' বছর ধরে অলিভার প্রতিদিন কত কান্নাই যে কেঁদেছে তা জানলেন একমাত্র ভগবান।

ন' বছরে পড়বার পর অলিভারকে শিশুবিভাগ থেকে মূল আশ্রমে আনা হল।

সেখানে তখন খাওয়াদাওয়ার বিষয় টানাটানি। ছেলেদের জন্যে কোন খাদ্য নেই, শুধু দিনে তিনবেলা তিনাটি দাও।

কর্তারা বুঝতেন, এই ভেজাল দাওয়া খেয়ে কোন বাচ্চা ছেলে বাঁচতে পারেনা। কিন্তু তাতে তাঁদের মনে বিবেকের কোন দংশন ছিল না। অনাথ ছেলেগুলো যত তাড়াতাড়ি মরে যায় ততই ভাল. তাঁদের খরচ কমে, হাঙ্গামা হ্রাস পায়।

কিন্তু তবুও ছেলেগুলো বড় হোতে লাগল। ক্রমে তারা এই নিদারুণ কষ্টকর অবস্থা মেনে নিতে গরহাজি ভাব দেখাতে লাগল। পেটের জ্বালায় তারা ছটফট করতে লাগল। রাতে না ঘুমিয়ে কোলাহল করতে শুরু করল। কেউ বা বললে, পাশের ঘুমন্ত ছেলেটাকেই আজ খেয়ে ফেলব।

অবশেষে মরীয়া হয়ে তারা ঠিক করল, এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করতে হবে, কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে জানাতে হবে।

কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে? কার এতখানি বুকের পাটা যে কর্তাদের কাছে গিয়ে প্রতিবাদ জানাবে?

ছেলেরা পরামর্শ করে ঠিক করল, লটারী করা হোক, লটারীতে যার নাম উঠবে তাকে গিয়ে প্রতিবাদ জানাতে হবে।

লটারীতে অলিভারের নাম উঠল। অতএব অলিভারকেই যেতে হবে কর্তাদের কাছে। কোন উপায় নেই।

অলিভার তখন ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে দুরু দুরু বুকে নিজের খাবারের বাটিটা নিয়ে পরিবেশনকারীর কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

পরিবেশনকারী চোখ পাকিয়ে বললে, কী চাও এখানে?

অলিভার বললে, পেট ভরছে না। আমার আর একটু খাবার চাই।

ব্যাস। আর যায় কোথায়!

পরিবেশনকারীর চোখ দুটো যেন কপালে উঠল। ছেলেটার আস্পর্ধা তো কম নয়! বলে আরো চাই?

সে তার হাতের হাতা দিয়ে অলিভারের পিঠে সজোরে দু'ঘা বসিয়ে দিল। তারপর ছুটল, আশ্রমের সরকার মিঃ বাম্বল্-এর কাছে।

বাম্বল্ ব্যাপার শুনে ছুটলো আশ্রমের বড় কর্তার কাছে।

কী হয়েছে?

সাংঘাতিক ব্যাপার! একটা ছেলে আরো খেতে চাইছে।

শুনে বড়কর্তা যেন স্তম্ভিত! যা দেওয়া হয়েছে তাতে সন্তুষ্ট না হোয়ে আবার চাওয়া? কী ভয়ঙ্কর ছেলে।

কর্তার এক সঙ্গী মন্তব্য করলেন, এ ছেলেটার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এ একদিন নির্ঘাৎ ফাঁসী যাবে, দেখে নিও তোমরা।

এমন ধারা ছেলেকে তো আর আশ্রমে রাখা যায় না।

কর্তারা স্থির করলেন, পাঁচ পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করে দেওয়া হোক। সেই পুরস্কারের লোভে কেউ যদি ছেলেটাকে নিয়ে যায় তো তাঁদের ঘাড় জুড়োবে।

পাঁচ পাউণ্ডের লোভে এলো এক কফন-ওলা। সে নিজের ব্যবসায়ের শিক্ষানবীশ রূপে অলিভারকে পছন্দ করল এবং পাঁচ পাউণ্ড অর্থ পকেটস্থ করে অলিভারকে নিয়ে গেল।

কিন্তু সেখানেও অলিভার অত্যাচার আর পীড়নের হাত থেকে নিস্তার পেল না।

ব্যবসায়ের অন্যান্য কর্মীরা এবং কারখানার স্ত্রী তার উপর এমন অত্যাচার করতে লাগল যে সহ্য করতে না পেরে অলিভার একদিন রাত্রে সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

সে লণ্ডনের নাম শুনেছিল। কেননা, লণ্ডন দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় শহর, সেখানে পৌঁছোতে পারলে সে হয়ত বাঁচবার পথ খুঁজে পাবে, হয়ত একটা আশ্রয় মিলবে তার। এই ভেবে রাস্তার পাথরের চিহ্ন দেখে দেখে সে লণ্ডনের দিকে চলল।

দুই

দীর্ঘ পথ। যেন শেষ নেই। পেটে নেই অন্ন, পকেটে নেই একটি কানাকড়ি। তার উপর প্রচণ্ড শীত। অলিভারের হাত পা অসাড় হ'য়ে আসছে। খিদের চোটে দুই চোখে অন্ধকার দেখছে সে।

ক্রমে সকাল হ'ল। কিন্তু এমনি করে আর কতক্ষণ চলা যায়?

ভিক্ষা করবার চেষ্টা করল। একটা গাড়ী যাচ্ছিল। ভিতরে একজন হোমরা-চোমরা আরোহী।

অলিভার গাড়ীর সঙ্গে ছুটতে লাগল আর করুণ স্বরে ভিক্ষা চাইতে লাগল।

কিন্তু লোকটা কি নির্দয়! বহুক্ষণ তাকে গাড়ীর সঙ্গে দৌড় করালো কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটি পেনীও দিল না।

অলিভার আর পারল না। রাস্তার পাশে বসে পড়ল। তার মনে হতে লাগল, সে বোধহয় আর বেশীক্ষণ বাঁচবে না। তার মাথা ঘুরছে, শরীর শিথিল অবসন্ন, চোখের সামনে সব ঝাপসা।

ওই বুঝি মৃত্যু আসছে! না। মৃত্যু নয়। একটি ছোকরা। সে এসে অলিভারের সঙ্গে আলাপ করল।

বয়সে সে অলিভারের চেয়ে কিছু বড়। ভারী মিষ্টি কথা আর সদয় ব্যবহার তার। দু'চার কথার পর সে দোকান থেকে খাবার এনে অলিভারকে খাওয়ালো। খাবার খেয়ে অলিভার প্রাণ ফিরে পেলে। ছেলেটির প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে উঠল।

ছোকরা তখন অলিভারের কাছে তার জীবনের কথা শুনল। শুনে বললে, তা তুমি ভাবছ কেন! তোমার উপায় আমি করে দেব!

কী উপায় করবে ভাই?

তোমাকে নিয়ে যাব আমাদের বুড়োর কাছে। তাহলেই তোমার আর কোন ভাবনা থাকবে না।

অলিভারের বিস্ময় বোধ হল, বললে, বুড়ো! সে আবার কে?

ছেলেটি বললে, সে এক চমৎকার মানুষ। আমাদের গুরু। তার খুব দয়া। সে তোমায় খেতে পরতে দেবে, কত যত্নআত্তি করবে। সে মানুষ নয়, যেন দেবতা। এমনি কত ছেলেকে সে পালন করছে সে তোমাকে নিশ্চয় আশ্রয় দেবে।

শুনে অলিভার অভিভূত হ'ল।

এমনি একটা আশ্রয়ের জন্যে তার মন তখন ব্যাকুল। সে সহজেই ছেলেটির কথা বিশ্বাস করলো এবং তার কথামত তার সঙ্গে চলল।

কয়েকটা আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে তারা একটা নোংরা পল্লীতে এসে এক পুরনো নীচু বাড়ির মধ্যে ঢুকল।

সেই বাড়িতে থাকে বুড়ো ফ্যাগিন। লোকটা জাতে ইহুদী। সে ছিল চোরদের সর্দার। তার চোরাই মালের ব্যবসা। সে চোর পোষে। কয়েকটা ছোকরা চোর তার আশ্রয়ে থাকে। তারা লোকের পকেট মেরে সিঁদ কেটে চুরী করে যা পায় বুড়োর কাছে এনে দেয়। বুড়ো সেই সব চোরাই মাল বিক্রি করে মোটা টাকা কামায়। ছেলেগুলোকে অবশ্য সে খেতে পরতে দেয়, আর কিছু কিছু হাতখরচও দেয়।

ফ্যাগিন অলিভারকে খুব যত্ন করল। তাকে পেট ভরে খাওয়ালো। একটা নতুন জামাও দিলে।

অলিভার কৃতার্থবোধ করল বটে কিন্তু দু'একদিনের মধ্যেই আসল ব্যাপার জানতে পেরে তার মন অত্যন্ত হয়ে গেল। এইভাবে চোরের রাজ্যে তাকে চোর হয়ে বাস করতে হবে?

কয়েকদিন পরেই সেই ভুখোড় ছোকরাটি তাকে বললে, চল, আমার সঙ্গে বেরুতে হবে। তোমায় কাজ শেখাবো। সর্দারের হুকুম।

অনন্যোপায় হয়ে অলিভার তার সঙ্গে রাস্তায় বেরুলো চুরী বিদ্যা শেখবার জন্যে।

পথের ধারে একটা বইএর দোকান। সেখানে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোক বই দেখছেন। তাঁর কোটের ডানদিকের পকেটে টাকার ব্যাগটি উঁচু হয়ে আছে দেখা যাচ্ছে।

অলিভারকে পকেটমারা শেখাবার জন্যে তাকে একটু তফাতে দাঁড় করিয়ে রেখে তার সঙ্গী ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে তার গা ঘেঁসে দাঁড়াল তারপর চকিতের মধ্যে তাঁর পকেট থেকে ব্যাগটা তুলে নিয়ে দৌড় দিলে।

ভদ্রলোক কিন্তু টের পেয়েছিলেন। তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে পকেটে হাত দিয়েই ঘুরে দাঁড়ালেন এবং দেখলেন, তার সুমুখে একটি ছোকরা যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে কি করবে ঠিক করতে পারছেনা। সঙ্গীর কাণ্ড দেখে অলিভার সত্যিই হতভম্ব হয়ে গিছল।

ওদিকে ওধার থেকে তার সঙ্গী তাকে ইসারা করে ডাকতে লাগল। অলিভার তখন ভয় পেয়ে ছুটতে আরম্ভ করল।

আর যায় কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে রব উঠল, চোর, চোর, ধর, ধর। অনেকগুলো লোক তার পিছনে ছুটতে লাগল। কতকগুলো কুকুরও সেই সঙ্গে ছুটলো।

অতগুলো জোয়ান লোক, তাদের সঙ্গে আবার কুকুর। বেচারা অলিভার তাদের সঙ্গে ছুটে পারবে কেন? কিছুদূর গিয়েই সে মাথা ঘুরে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে লোকগুলো এসে তাকে চেপে ধরল।

পুলিশ। পুলিশ!

মুহূর্তের মধ্যে পুলিশও এসে হাজির। সহজ ব্যাপার নয়। একটা চোর হাতে নাতে ধরা পড়েছে! অতএব চল একেবারে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে।

তারা অলিভারকে টানতে টানতে কাছাকাছি থানায় নিয়ে গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির করল। যার টাকা চুরি গিয়েছিল তিনিও সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ভদ্রলোকের নাম মিঃ ব্রাউনলো। সদাশয় মানুষ তিনি। অলিভারের আধা দেখে তাঁর মনে করুণা জাগল। তার সরল নিষ্পাপ মুখ দেখে তিনি বুঝলেন, এ ছেলে চুরী করেনি। তিনি ম্যাজিস্ট্রেটকে বললেন, মামলা তিনি করতে চান না, ছেলেটিকে ছেড়ে দেওয়া হোক।

কিন্তু বয়োজ্যেষ্ঠ হাকিম তাঁর কথা শুনে তাঁকে এক প্রচণ্ড ধমক দিলেন, তারপর অলিভারকে কাটকে রেখার হুকুম জারী করলেন।

শেষ পর্যন্ত অলিভারকে কাটকে যেতে হল না। হাকিমকে হুকুম পাল্টাতে হল। কারণ যে-বই-এর দোকানের সামনে মিঃ ব্রাউনলোর টাকা চুরী গিয়েছিল সেই দোকানের মালিক শেষ মুহূর্তে এসে সাক্ষ্য দিলেন যে অলিভার নিরপরাধ, অন্য একটি ছোকরাকে পকেট মেরে টাকার ব্যাগ নিয়ে ছুট দিতে তিনি নিজের চোখে দেখেছেন।

এরপর তো আর তাকে হাজতে পাঠানো চলে না। অগত্যা হাকিম অলিভারকে মুক্তি দিলেন।

তিন

অলিভারের অবস্থা দেখে আর তার কথা শুনে মিঃ ব্রাউনলোর বড় মায়া হল। বেচারা ধুঁকছে, হাঁটতে পারছে না। টলে পড়ছে। তিনি তাকে নিজের বাড়ি নিয়ে এলেন, তারপর তার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করে সপ্তাহ খানেকের মধ্যে তাকে চাঙ্গা করে তুললেন।

অলিভার যেন নতুন জীবন পেল।

মিঃ ব্রাউনলোর সংসারে কোন আত্মীয়-স্বজন ছিল না। তিনি ছিলেন অকৃতদার। বাড়িতে ছিল এক পুরাতন পরিচারিকা। সে-স্ত্রীলোকটিও বিশেষ দয়াবতী ছিল। সে বিশেষ স্নেহ-যত্নের সঙ্গে অলিভারের সেবা শোশা করতে লাগল।

অলিভার তার ভাগ্যতাড়িত জীবনের দুঃখ-দুর্দশার কথা সমস্তই মিঃ ব্রাউনলোকে জানিয়েছিল। তার সরল নিষ্পাপ মনের পরিচয় পেয়ে মিঃ ব্রাউনলো তাকে ভালবাসতে লাগলেন, প্রত্যহ তাকে নিয়ে কিছুক্ষণ সময় কাটাতে লাগলেন, তার লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা করে দিলেন। পরম সুখে অলিভারের দিন কাটতে লাগল। তার জন্যে তার আশ্রয়দাতা কোন কিছুরই অভাব রাখলেন না।

কিন্তু এত সুখ তার ভাগ্যে সইল না। একদিন এমন এক ঘটনা সহসা ঘটে গেল যাতে তার জীবনের গতি আবার বদলে গেল এবং সে আবার দুঃখ-দুর্দশার আবর্তের মধ্যে পড়ল।

মিঃ ব্রাউনলোর একটি বন্ধু ছিলেন। তাঁর নাম মিঃ গ্রিমউইগ্‌। ভদ্রলোক কারুর মধ্যেই ভাল কিছু দেখতে পেতেন না, সকলকারই দোষ খুঁজে বেড়াতেন। একদিন দুই বন্ধুতে বসে গল্প করছেন এমন সময় অলিভারের কথা উঠল। অলিভার যে সৎ, নিষ্পাপ, সরল, তা মিঃ গ্রিমউইগ বিশ্বাস করলেন না। অলিভার সম্বন্ধে মিঃ ব্রাউনলোর সুখ্যাতির প্রতিবাদ করে বললেন, আরে, রেখে দাও তোমার ছেলেটার সাধুতার কথা। আমি বলছি, ও একটা চোর, সুযোগ পেলেই আবার চুরী করবে।

মাথা নেড়ে মিঃ ব্রাউনলো বললেন, তুমি ভুল করছ। অলিভার সে রকম ছেলে নয়।

মিঃ গ্রিমউইগের কিন্তু সেই এক কথা, ছেলেটা কখনই ভাল নয়।

দু'জনে রীতিমত তর্ক শুরু করলেন। শেষে মিঃ গ্রিমউইগ বললেন, বেশ, একটা পরীক্ষা করে দেখ। ওকে একদিন একটি পাঁচ পাউণ্ডের নোট দিয়ে বাজারে পাঠাও, দেখবে, ও আর ফিরবে না।

মিঃ ব্রাউনলোর জেদ চেপে গেল, বললেন, একদিন কেন, ওকে আমি এখনি একটা পাঁচ পাউণ্ডের নোট দিয়ে বাজারে পাঠাচ্ছি। তুমি দেখবে, তোমার ধারণা-একদম ভুল।

এই বলে তিনি অলিভারকে ডেকে তার হাতে একটা পাঁচ পাউণ্ডের নোট দিয়ে বললেন, যেদিন যে বইএর দোকান থেকে বই কিনেছিলাম সেই দোকানে যা, আমি কয়েকখানা বই বেছে রেখে এসেছি, নোটখানা দোকানিকে দিয়ে বইগুলো নিয়ে আয়। শিগগির আসবি, দেরী না হয়। যেতে আসতে দশ মিনিটের বেশি লাগবে না।

অলিভার বললে, আমি এক ছুটে যাব আর আসব।

এই বলে সে মহানন্দে টাকা নিয়ে চলে গেল। মিঃ ব্রাউনলো বললেন, ও ঠিক মিনিট পনেরোর মধ্যেই ফিরে আসবে, দেখে নিও।

মিঃ ব্রাউনলো বন্ধুর সামনে তাঁর ঘড়ি বার করে রাখলেন। সময় কাটতে লাগল। পনেরো মিনিট গেল, তারপর আধঘণ্টা, ক্রমে এক ঘণ্টা, এমন কি দু'ঘণ্টা কেটে গেল। কিন্তু অলিভার ফিরে এলো না।

চার

অলিভার কেন ফিরে এলো না তার কারণ জানতে হলে কিছু পিছনকার কাহিনী বলা প্রয়োজন।

অলিভারের বাবার নাম ছিল এডওয়ার্ড লীকোর্ড। তিনি এক সময় সম্ভ্রান্ত এবং বিত্তশালী ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু পরে অনেক টাকা নষ্ট করে বিদেশে চলে যান।

তিনি প্রথমে যাকে বিবাহ করেন তার গর্ভে মধু নামে একটি পুত্র হয়। তারপর অনেকদিন বাদে তিনি গোপনে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। অলিভার পিতার দ্বিতীয়পক্ষের প্রথম সন্তান।

অলিভার যখন মাতৃগর্ভে সেই সময় লীকোর্ড হঠাৎ মারা যান। মৃত্যুর পূর্বে তিনি মধু-কে অলিভারের কথা বলে যান এবং নির্দেশ দিয়ে যান, তার বিমাতার গর্ভে যে সন্তান জন্মাবে মধু যেন তাকে লালন-পালন করে এবং সে বড় হোলে যেন তাকে বিষয়ের অর্ধেক ভাগ দেয়।

অলিভারের মাও স্বামীর সঙ্গে বিদেশে যান। তারপর হঠাৎ স্বামী একদিন চলে এলেন এবং তাঁর আর কোন খোঁজ-খবর পাওয়া গেল না। এদিকে মহিলাটির হাতে পয়সাকড়িও কিছু ছিল না। উপরন্তু তিনি সন্তানসম্ভবা।

এই অবস্থায় অতি কষ্টে কিছু কাল বিদেশে কাটিয়ে তিনি কোন রকমে দেশে ফিরলেন। কিন্তু কোথায় যাবেন? পথের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। একজন পল্লীবাসী দয়াপরবশ হয়ে তাঁকে এক অনাথ আশ্রমে দিয়ে এলেন। সেখানে অলিভার ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে মহিলাটি মারা গেলেন।

লীকোর্ড তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর কথা আর একজনকে বলে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর বন্ধু মিঃ ব্রাউনলো। শুধু বলে যান নি, লীকোর্ড তাঁর বন্ধুকে তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর একটি ছবিও দেখিয়েছিলেন এবং অনুরোধ করেছিলেন, মিঃ ব্রাউনলো যেন অভাগিনী রমণীর খোঁজখবর নেন।

লীকোর্ড মারা যাবার পর মিঃ ব্রাউনলো তাঁর বন্ধুর স্ত্রীর অনেক খোঁজ করলেন। কিন্তু কোন সন্ধান পেলেন না। হয়ত অলিভারকে দেখে তার মুখে ছবিতে দেখা সেই রমণীর মুখের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেই মিঃ ব্রাউনলো অলিভারের প্রতি অতখানি স্নেহপ্রবণ হয়েছিলেন।

মধু ছোকরাটি অতিশয় খল। সে চায়নি যে তার বিমাতা বা তার কোন সন্তান তাদের বাড়িতে আসে বা বিষয়ের ভাগ পায়। সে বরাবরই অলিভারের মা তারপর অলিভারের গতিবিধির উপর নজর রেখেছিল। তাই অলিভার যখন মিঃ ব্রাউনলোর কাছে আশ্রয় পেল তখন মধু বিশেষ দুর্ভাবনায় পড়ল।

যদি জানাজানি হয়ে যায় তাহলে তো অলিভারকে বিষয়ের অংশ দিতে হবে। না, তা কোন মতেই ঘটতে দেওয়া হবে না। অলিভারকে মিঃ ব্রাউনলোর কাছ থেকে সরিয়ে আনতে হবে। যেমন করে হোক।

এই রকম চিন্তা করে মঙ্ক গেল ফ্যাগিনের কাছে। যেমন করে হোক ফ্যাগিন তাকে ফিরিয়ে আনুক, তাকে পাকা চোর তৈরী করুক, তাহলে মঙ্কের দুর্ভাবনা থাকে না। মঙ্ক ফ্যাগিনকে বললে, এই কাজ হাসিল করতে পারলে মঙ্ক তাকে প্রচুর টাকা দেবে।

ফ্যাগিন তো এই চায়। সে সুযোগ খুঁজতে লাগল এবং বিল নামে তার এক দুর্দান্ত অনুচর আর তার স্ত্রী স্যান্সিকে এই কাজে নিযুক্ত করল।

সেদিন টাকা নিয়ে বইএর দোকানে গিয়ে বইএর প্যাকেটা নিয়ে অলিভার দোকান থেকে বেরিয়েছে এমন সময় সে বিল আর স্যান্সির খপ্পরে পড়ল।

বিল ও স্যান্সি নানা কৌশল করে তাকে ধরে নিয়ে গেল। অলিভার বিস্তর চেষ্টা করল, অনেক কাকুতি মিনতি করল কিন্তু কিছুতেই তাদের হাত থেকে ছাড়ান পেল না।

কিছুদিন তাকে ফ্যাগিনের বাড়ির মধ্যে একটা চোর-কুঠুরিতে লুকিয়ে রাখা হল। তারপর একদিন তাকে নিয়ে বিল্ একটা বাড়িতে চুরী করতে গেল। তাকে পাকা চোর তৈরী করতে হবে তো!

বেরুবার আগে বিল তাকে ভয় দেখিয়ে বললে, যদি সে পালাবার চেষ্টা করে বা গোলমাল করে তাহলে তাকে খুন করে ফেলা হবে। অলিভার ভয়ে ভয়ে বিলের সঙ্গে গেল।

রাতরাতে তারা সেই বাড়ির কাছে পৌঁছলো। অলিভার ছিল রোগা ছিপছিপে। অতএব তাকে একটা পাশি গলিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া অসম্ভব হবেনা। স্থির হল, সে ঘরের মধ্যে ঢুকে বাড়ির সদর দরজা খুলে দেবে। তাহলে বিল সহজেই তার কাজ উদ্ধার করতে পারবে।

অলিভার প্রথমটা চুপচাপ বিলের নির্দেশ মতো কাজ করল। কিন্তু বাড়ির মধ্যে ঢুকে সদর দরজা খুলে না দিয়ে সে "চোর, চোর" বলে চেঁচাতে লাগল। তাই দেখে ক্রোধে ক্ষেপে উঠে বিল জানলা দিয়ে তাকে গুলি করে সরে পড়ল।

অলিভারের চিৎকারে আর গুলির আওয়াজে লোকজন জেগে উঠল। এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে তারা অজ্ঞান অচৈতন্য অলিভারকে দেখতে পেয়ে ধরাধরি করে তাকে অন্য মহলে নিয়ে গেল। সেখানে ছিলেন বিধবা গৃহকর্ত্রী আর তাঁর ভাইঝি মিস্ মেইলি।

আহত অলিভারকে দেখে দয়াবতী মিস মেইলির মন মমতায় ভরে উঠল। তিনি পুলিশ ডাকতে নিষেধ করলেন এবং নিজে অলিভারের চিকিৎসার ভার নিলেন।

আঘাত তেমন গুরুতর হয়নি। অলিভার সেরে উঠল এবং প্রথম সুযোগেই মিস মেইলির কাছে নিজের জীবনের কাহিনী বললে। মিস মেইলি তার প্রত্যেকটি কথা বিশ্বাস করলেন এবং পরম স্নেহে অলিভারকে নিজের কাছে রাখলেন। অলিভার আবার আশ্রয় পেল।

পাঁচ

এদিকে মঙ্ক কিন্তু নিশ্চেষ্ট ছিল না। পুনরায় ফ্যাগিন ও বিলের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতে লাগল। কী উপায়ে আবার অলিভারকে চুরী করে আনা যায় সে বিষয়ে তারা নানা আলোচনা করতে লাগল।

একদিন বিলের স্ত্রী স্যান্সি তাদের নতুন ষড়যন্ত্রের কথা শুনতে পেল। শুনে তার মনটা খুব

খারাপ হোয়ে গেল। আহা, বেচারা ছেলেটা তো কোন অপরাধ করেনি, অনর্থক তার জীবনটাকে নষ্ট করবার জন্যে কেন এই চক্রান্ত ?

কুসংসর্গে থাকলেও স্যান্‌সির মনটা ছিল অন্য রকম। সে স্থির করল, এই ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিতে হবে।

সুযোগ বুঝে সে গোপনে মিস মেইলির সঙ্গে দেখা করে তাঁকে সব কথা জানাল এবং সেই সঙ্গে অলিভারের আসল পরিচয়ও তাঁর কাছে প্রকাশ করে দিলে।

বিল কি করে জানতে পারল, স্যান্‌সি পরপর দু'তিনদিন মিঃ মেইলির বাড়ি গিয়েছে এবং তাদের ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দিয়েছে। রাগে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে সে স্যান্‌সিকে খুন করে ফেললে, তারপর ধরা পড়বার ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগল।

একদিন একটা বাড়ির ছাদ থেকে সে দড়ি বেয়ে নামছিল। নামতে নামতে বেকায়দায় পড়ে সেই দড়ি তার গলায় জড়িয়ে গেল এবং সেই দড়ির ফাঁসে গলা আটকে ঝুলন্ত অবস্থায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে বিল মারা গেল।

স্যান্‌সির কাছ থেকে অলিভারের আসল পরিচয় পেয়ে মিস মেইলি অবিলম্বে মিঃ ব্রাউনলোকে খুঁজে বার করে করে তাঁকে সব কথা বললেন।

মিঃ ব্রাউনলো শুধু যে বন্ধু-পুত্রকে ফিরে পেলেন তাই না, তার সততারও অভ্রান্ত প্রমাণ পেলেন।

মিঃ গ্রিমউইগও ব্যাপার শুনে আনন্দ করতে লাগলেন। তিনি মিস মেইলিকে বারবার আশীর্বাদ করতে লাগলেন! আহা, বেচারা ছেলেটা তো তাঁরই জন্যে এমনধারা বিপদে পড়েছিল। তাই মিঃ গ্রিমউইগের আনন্দই যেন সবচেয়ে বেশী।

ফ্যাগিনকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল। তার বিচার হল। মামলার সময় জানা গেল, ফ্যাগিন নানা গুরুতর অপরাধে অপরাধী। বিচারে তার ফাঁসী হয়ে গেল।

বব যখন শুনল যে তাকেও পুলিশে দেওয়া হবে তখন সে মিঃ ব্রাউনলোর কাছে গিয়ে কেঁদে পড়ল এবং অলিভারকে তার প্রাপ্য বিষয় ও টাকাকড়ি বুঝিয়ে দিতে স্বীকৃত হল।

অতঃপর অলিভার মিঃ ব্রাউনলোর কাছে থেকে পরম সুখে দিন অতিবাহিত করতে লাগল।

সাহিত্য সম্রাজ্ঞী অনুরূপা দেবীর নাম একদিন বাংলা সাহিত্যে শীর্ষ স্থানে ছিল। গল্পভারতীর সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ছিল খুব ঘনিষ্ঠ। গল্পভারতীকে তিনি সত্যিই ভালবাসতেন। তাঁর বহু মূল্যবান লেখা গল্পভারতীতে প্রকাশিত হয়ে সেদিনের পাঠকদের মনোরঞ্জন করেছিল। তাঁর লেখনী অনেকদিন হল স্তব্ধ হয়েছে। বহুদিন পর তাঁর একটি গল্প পাঠকদের সামনে তুলে ধরে আমরা তাঁর স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করলেম।

—সম্পাদক

দান-প্রতিদান

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

অপরাহ্ণ সন্ধ্যায়, সন্ধ্যা ক্রমে রাত্রিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল কিন্তু লহরীমোহনের চিন্তালহরীর পরিশেষ হইল না। যেখানে যেভাবে যেমন অবস্থায় বসিয়া সে সেই তাকের চিঠিখানা পাইয়াছিল, ঠিক সেইখানে সেইভাবেই সে সেই সান্ধ্যদৈনিক সংবাদবাহী পত্র হস্তে বসিয়া রহিল। পত্রে কোন কথার পর কোন কথা লেখা ছিল, সে সব তার কিছুই মনে ছিল না, কেবল এই একটিমাত্র কথাই তার সারাটা মন জুড়িয়া তার একপ্রান্ত হইতে আর একটাপ্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটিয়া বেড়াইতেছিল আর তারই সেই মূর্চ্ছাহত পদক্ষেপের তালে তালে কোন একটা রুদ্ধকণ্ঠ বন্ধপক্ষীর নিঃস্বনে উচ্চারণ করিতেছিল, সব আশার সব আকাঙ্ক্ষার অবসান শেষ হইয়া গেল! এ পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য মানুষের যতটুকু সামান্য প্রয়োজনও থাকে, তার আজ হইতে তাহাও রহিল না।

এ পত্র লিখিয়াছিলেন তার একমাত্র জীবিত আত্মীয় এবং দারুণ দুঃসময়ের সহায়ক, তার বহুদিন পূর্ব্বে মৃতপিতার নিঃসম্পর্কিত বন্ধু। আজ একে একে অনেক কথাই লহরীমোহনের মনে পড়িতেছিল। সে সমস্ত অতীত কাহিনী তাদের প্রাচীনত্বের দাবী লইয়া অতীতের ধূম্রেশীজালে ঢাকা পড়িয়া অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল, আজ সময় পাইয়া মেঘমুক্ত সূর্য্যকিরণের মতই যেন তারা স্বপ্রকাশ হইয়া উঠিল। দূর অতীতের হারানো দিনের কত না বেদনা—বিস্মৃত স্মৃতি বিস্মৃতির মধ্য হইতে আসিয়া উঠিয়া তাহাকে যেন চতুর্দ্দিক হইতে বেষ্টন করিয়া ধরিল। তাদের প্রত্যেক স্মৃতিরেখাটুকু অসহ্য দাহ পদার্থে পরিপূর্ণ। বেদে, মনে বুকে যেন সহসাই কোথা পড়াইয়া দেয়।

লহরীর পিতা ভাল ঘরের সন্তান হইলেও লেখাপড়া শিখবার সুযোগ খুব বেশী তাঁর হয় নাই। ম্যাট্রিকে একবার ফেল করিয়াই তাঁকে স্কুলের বিদ্যা স্কুলেই ফেলিয়া আসিতে হয়। অনেক দুঃখ-ক্লেশ সহ্য করিয়া অবশেষে তাঁর একটি সামান্য মাহিনার সামান্য চাকুরী জুটিয়াছিল, এবং শুধু তাই নয়, মায়ের নির্ব্বান্ধাতিশয্যে সেই অবস্থাতেই তাঁকে এক কুলীন কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তার তাঁরই মতন নিঃস্ব অত্যধিক দুঃস্থ কুলীনপিতার কৌলীন্যরক্ষারূপ পুণ্য লাভও ঘটিয়াছিল। মেয়েটি দু'গাছি শাঁখা ও একখানি বালুচরের চেলি পরিয়া পতিগৃহে প্রবেশ করে। প্রায় পনের বৎসর কাল ধরিয়া সেওই শাঁখাসাড়ী আর বাড়তি পাওয়া সিন্দুরটুকু লইয়াই দরিদ্র সংসারের টানাটানির সঙ্গে রীতিমত লড়াই করিয়াছে, আজও বাঁচিয়া থাকিলে

হয়ত তার সে অবস্থায় কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইত না। কিন্তু সে তা থাকে নাই। লক্ষ্মীর ধনভাগ্য ছিলনা বটে, তবে পতিভাগ্যটা মন্দ ছিলনা। গভীর স্নেহ ও সহানুভূতির মধ্যে সে অত্যন্ত দারিদ্র্য ক্লেশকে সুসহ করিয়া লইয়া জীবন অপ্রতিবাদেই কাটাইয়াছিল, অন্তে স্বামীর মুখে চোখ রাখিয়া সে তার পরিশ্রমক্লান্ত অকালবার্দ্ধক্যগ্রস্ত জীবনের শান্তিপূর্ণ শেষ নিশ্বাসটী পরিত্যাগ করিল। মৃত্যুর অল্প পূর্ব্বে স্বামীর হাতে শীর্ণ হাতখানি রাখিয়া গভীর প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি তার ব্যথাক্লিষ্ট মুখের 'পরে স্থির রাখিয়া বলিয়াছিল, "আমি গেলে তুমি বেশী শোক করোনা, একেই ত আমার জন্ত ভেবে, খেটে রাত জেগে শরীর আধখানা করে ফেলেছ, এর উপর আবার, ছেলেমেয়ে রইলো ওদের ভাল করে দেখো, অমানুষ যেন হয় না নজর রেখো ভাল করে। আমার কথা মন থেকে সরিয়ে রেখ।"

স্বামীর চোখে জল করিতে দেখিয়া পুনশ্চ শীর্ণ হাতে কষ্টে অশ্রু মুছাইতে মুছাইতে গাঢ় স্বরে বলে: "কেঁদো না, আবার ত দেখা হবে, ক'টাই বা দিন? এ'তো দেখতে দেখতেই কেটে যাবে। আশীর্ব্বাদ করো" তারপর আর কথা ফুটে নাই, পাঁজরায় একটা ব্যথা ধরিয়া সেটা বুকের দিকে ঠেলিয়া আসে, সেই আক্রমনেই তার জীবন প্রদীপ নিবিয়া যায়।

লহরীমোহনের চিত্তে সেদিনকার সেই ছবি, বহুবার দৃষ্ট বহু বিনিদ্র রাত্রির, বহু তাপদগ্ধ দিবসের সেই চিত্র আজ আবার সেই অতীত দিনের মতনই নূতন হইয়া ফুটিয়া উঠিল। সে দিনকার সেই যন্ত্রণাই .. "মা মা" রব নিজেরই কর্ণপটহে বজ্ররবে বাজিয়া উঠিতেই দুটি চক্ষে তপ্ত অশ্রু ভরিয়া আসিল। নিজের কোঁচার কাপড়ের একটা প্রান্ত টানিয়া লইয়া সে তাহা ক্ষিপ্রকরে মুছিয়া ফেলিলেও উদ্গত অশ্রুপ্রবাহ নেত্র-সীমানা হইতে নামিয়া আসিলেও গণ্ডার কাছে আটকাইয়া রহিল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়া সে সেই ক্ষণ দৃষ্ট অন্তর্দৃষ্টিতে উপভোগ না করিয়া পারিল না। মা, তার মা, যার কথা মনে পড়িলে তাঁর কষ্টসহিষ্ণু অনলস কার্য্যপরায়ণ সেবা সুকুমল শান্তমূর্ত্তিটী মনোদর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়। প্রত্যূষে জাগিয়া রাত্রি দেড় প্রহর পর্য্যন্ত ঘরকন্নার সমস্তটি কর্ম্ম দুখানি কল্যাণময় করে একটার পর একটা সম্পন্ন করিয়া চলিয়াছেন, ছিন্নবস্ত্র সেলাই দিয়া তালি লাগাইয়া, ক্ষার দিয়া কাচিয়া কবলা করা, ঘরের মেজে ঘসিয়া মোছা, রান্নাঘর গোয়ালঘর মাটি দিয়া লেপা, পরটী পর্য্যন্ত একদিনের জন্ত নিজের ছেলেমেয়েদের উপরেও এতটুকু বিরক্তি নাই, মুখে ঈষৎ স্মিতহাস্তের রেখাটুকু কোনদিন এমন কি রোগ যন্ত্রণাময় শেষ দিনটীতেও মিলাইয়া যায় নাই।

মার কথা ভাবিতে গেলে যেন আজও তার সেই মঙ্গলহস্তের কল্যাণস্পর্শ সে তার সর্ব্বদেহে মনে অনুভব করিতে থাকে, কিছুক্ষণের জন্ত সমস্ত দুঃখ চিন্তা অবসাদ হইতে বিমুক্ত হয়।

এর পরের কথা ভাবিতে গেলে আজও লহরীমোহন শিহরিয়া উঠে, মাতৃহীন বিশৃঙ্খল সংসার, সে যে কি ভয়ঙ্কর জিনিস সে কথা সে তার জীবনে কোনদিনই ভুলিবেনা। লহরীমোহনরা এক ভাই তিন বোন, একটী বিবাহযোগ্যা আর দুইটী একেবারেই শিশু। হেমলতা তারই কাছে কিছু কিছু লেখাপড়া করিতেছিল। সংসারের কাজকর্ম্মে ইদানীং মাকে অনেকখানিই সহায়তা করে, বিশেষতঃ মায়ের অসুখের সময় বাড়ীর এতগুলি লোকের ভাত রাঁধার ভার সে নিজের ঘাড়ে লইয়াছিল। কিন্তু একটী বার বছরের মেয়ের শক্তি কতইবা, কতদিন সে এত বড় একটা সংসারের সমস্ত ঝামেলা বহন করিতে পারে? মায়ের আমলে তাহার যে সব কথা মনে পড়ে নাই, মা-ই পড়িতে দেন নাই, আজ চারিদিককার সহস্র বিশৃঙ্খলা সেই সকল বিস্মৃত কর্ত্তব্যের ত্রুটী বিচ্যুতির কথা স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিল। উঃ মা তার কিই না পরিশ্রম করিতে পারিতেন। আর তাই কি দু'দশদিন? সুদীর্ঘকাল ধরিয়াই অবিশ্রামে তাঁর সেই

অক্লান্ত পরিশ্রম চলিয়াছে, সে ত বড় হইয়াছিল, কেমন করিয়া এই রাজসূয় যজ্ঞ বসিয়া বসিয়া ঘটিতে দিল ? তার বাবা না হয় বিকপায়, কলিকাতায় ভেলি-প্যাসেঞ্জার ; সকাল আটটায় বাড়ির বাহির হইয়া একপ্রহর রাত্রে ঘরে ফেরেন।

লহরীমোহনের মনে পড়ে, ভোরে উঠিয়া রাত্রের সে উচ্ছিষ্ট বাসন মাজিয়া ঘর নিকাইয়া পকলে ভাত বাঁধিয়া দেয় তারপর তার স্কুলের পড়া করে, বৈকালে বাড়ী ফিরিয়াও ঐ সব ত করেই ; তাছাড়া কাপড় কাচা, ছোট বোন দুটীকে ভাত খাওয়ান, ঘুমপাড়ানো আরও কত কিছুই না করিলে চলিত না ; হেমলতা কতটুকু করিবে। ভাতের হাঁড়ি ভাজিয়া যখন গরম ফেনে সে পুড়িয়া গেল, তখন লহরীমোহন ম্রিয়মাণ করিয়াছে। ভগবানকে ধন্যবাদ অতখানি পুড়িয়াও তার অশেষ চেষ্টা আর যত্নে মেয়েটার অঙ্গে সেই দারুণ দগ্ধচিহ্ন চিরস্থায়ী হইয়া থাকিতে পারে নাই। তরুলতার পান বসন্তের সময়টাতেও তার নিতান্ত কম ভয়-ভাবনা ও পরিশ্রম যায় নাই, অথচ আশ্চর্য্য যে সেই সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় পরীক্ষা দিয়া সে সর্ব্বপ্রথম স্থান লইয়া ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য প্রেরিত হইল এবং ম্যাট্রিকেও সে জেলার প্রথম স্থান অধিকার করে।

অথচ এতবড় সৌভাগ্যেও তাকে যথোপযুক্ত আনন্দ প্রদান করিতে পারে নাই। পারে নাই ঐ জন্য যে আই. এস-সি পড়িতে তাকে ঘর ছাড়া হইতে হইবে। স্কলারশিপ ও সোনার মেডেল পাওয়া ছেলে —সে কি তার সমস্ত ভবিষ্যৎ তার বোনদের জন্যই উৎসর্গিত করিবে ? আর এই নিকট ভবিষ্যৎ টুকুর উপরেই সমস্ত নজরটুকু রাখিতে গেলে তাদেরই বা ভবিষ্যতের পক্ষে কোন সুখ সুবিধার বন্দোবস্ত সে করিতে পারিবে ? এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংসারটুকু প্রাণান্ত পরিশ্রমে কোন মতে চালাইয়া যাওয়াতেই কি একমাত্র তাদের জীবনের সার্থকতা এবং তাহাতে সাহায্য করাই কি তার পক্ষে তাদের প্রতি একমাত্র কর্ত্তব্য ? তাহিয়া কূলকিনারা মিলিল না। পিতার কাছে কথা তুলিতেই তিনি চটিয়া উঠিলেন, তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিলেন, "মাথা খারাপ হয়েছে। জীবনের এতবড় সুযোগ তুমি ছেড়ে দেবে ? এখানে বসে করবে কি ? স্কুলের থার্ড টিচার রিটায়ার করেছেন বেশ ত করুন না, লোকাভাব হবে না তার জন্যে। মাইনে কত জানো ? ত্রিশ, এইতেই শেষ ! বাঃ চমৎকার কেরাণীর ছেলেরই যোগ্য ! আমি—উঃ আমি যদি এ সুযোগ পেতুম। আমি যদি এর সিকিটুকু পেতুম, আজ কি এই শীত বর্ষা নির্বিশেষে এমন করে আমায় জীবনপাত করতে হতো, না তোমার গর্ভধারিণী পুণ্যবতী সতীলক্ষ্মীকে একটা জানোয়ারের খাটুনী খেটে খেটে অকালে জীবনপাত করতে হতো ; আর ঐ ডের বছরের মেয়েটা,—" পিতার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, মুখ ফিরাইয়া কিছুক্ষণ বোধ হয় আত্মসম্বরণ করিয়া লইলেন, তারপর সহজভাবেই মুখ ফিরাইয়া আদেশের সুরেই বলিলেন, "যা সব করতে হয় শিগ্‌গির করে ফেল, দেরী হলে আবার ভাল কলেজে সীট পাবে না। আই. এস-সিই নাও আমার ইচ্ছা অবশ্যই যখন অত নম্বর দিয়েছে তখন ইঞ্জিনীয়ারিংটাই আমার পছন্দ। ঐ দেখ না অতুল, আমার সঙ্গেই ত পড়তো, আজকে কত বড় কন্ট্রাক্টর, শিবপুর কলেজে হস্তায় একটা দিন করে পড়াতে যায়, ভাইয়ের বিয়ের সে বছর বলেছিল, কি বাড়ী, কত গাড়ী, কত বড় একটা লোক।

তরুণের চিত্ত সে যে আলোকোজ্জ্বল পটভূমিকায় মোহনস্বপ্নের রচনা করিতেই চায় ; কেমন করিয়া এর ওপরে নিজেকে পরের সুখ সুবিধার জন্য উৎসর্গিত করিয়া আপনাকে সর্ব্বহারা করিয়া রাখিবে ? বিশেষতঃ সেই পরের জন্যই যে তার আরও বেশী করিয়াই আত্মোন্নতির প্রয়োজন রহিয়াছে। তার মানসনেত্রে ফুটিয়া উঠিল, তার অদেখা কলিকাতার না দেখা বালিগঞ্জের এক নামজাদা চওড়া রাস্তার ওপরের এক প্রকাণ্ড প্রাসাদগৃহ। সুরচিত উদ্যানের মধ্যে তাহা যথোচিত প্রহরায় সুরক্ষিত বটে, তার প্রতি গৃহের কর্ম্মভূমি

শ্বেত কৃষ্ণ মার্বেল মণ্ডিত, কক্ষপ্রাচীর তৈলবর্ণে বৈচিত্রপূর্ণ লতার পাতার হংসমুখে সুচিত্রিত, সমুজ্জ্বল বিদ্যুত-আলোকে অপূর্বপূর্ব গৃহসজ্জায় বিভূষিত! না: লহরীমোহনকে মানুষ হইতে হইবে, বাপের গায়ের ছেঁড়া চটি সাত বৎসর আগে কেনা, তার মায়ের আমলের, বোনেরা চুলবাঁধার ফিতার অভাবে ছেঁড়া কাপড়ের পাড়, গায়ে দেবিবে জামা মায়েরও ছিলনা, হেমেরও নয়। ছোট দুটিকে তাদের বাবা কলিকাতা হইতে লতার দুটি ইজের কিনিয়া দিয়াছেন, মধ্যে মধ্যে তাই পরে, অন্য সময় একটু ছেঁড়া ন্যাকড়া জড়াইয়া কাটায়। শীতের জন্য একটি ছেঁড়া বালাপোষকে তিনটি টুকরা করা হইয়াছে। না: এ অসহ্য? লহরীমোহন অতুল চক্রবর্তী হইবে, সংসারের শুধুমাত্র দুঃখ ঘুচাইবেই নয়, তাকে যশের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠ করিবে, করিবেই সে। নিজের জন্য না হোক, তার মাতৃহীনা বোনেদের জন্য তাকে বড় হইতে হইবে। ওদের নিজস্বত্বের অভাব নাই, এত কষ্টে মানুষ হইতে থাকিলেও প্রেমলতা ও লবঙ্গলতার মত সুন্দরী মেয়ে তাদের গ্রামে আর একটিও নাই, সেকথা সে ছেলেমানুষ বিশেষতঃ বোনেদের বড় বেশী ভালবাসে, সেজন্য তার মন্তব্য পক্ষপাত দুষ্ট হওয়া অসম্ভব নয়, সকলেই বলে। তা' হেমই বা কি এমন মন্দ? এই বয়সে হাড় ভাঙ্গিয়া যে মেয়ে এতটা খাটে, বিশেষ ভাল পুষ্টিকর আহার পায় না, তার চেহারা কেমন করিয়া এর চেয়ে ভাল থাকিতে পারে? চুল তার রুক্ষ হইয়াই থাকে, স্নানের সময় তেল সকল দিনত জোটেনা, সাবান তাদের বাড়ী কোনজন্মেই বা আসিয়াছিল? মা থাকতে তাদের সব কটীকেই পূজার ষষ্ঠী ও বাসন্তী পঞ্চমীতে সরিষার তৈল ও তালের বেসন দিয়া গা সাফ করিয়া দিতেন, আমলা মেখি বাটিয়া মাথা ঘষিয়া দিতেন, শীতের বেলায় একটুখানি দুধে মহুয়ার কাঁচা রসুন মিলাইয়া মুখে হাতে মাখাইয়া ময়লা বাহির করিয়া গায়ের চামড়াকে চর্মরোগ হইতে সুরক্ষিত করিতেন, সে সব আজ দু'বৎসরের ওপর বন্ধ হইয়া গিয়াছে। রোগা পাকশিটে, চোখের কোলে কালিপড়া ঐ হেমলতাই যদি আবার অতুল চক্রবর্তীর পুত্রবধূ হইতে পারিত, তো—লহরীমোহন তাড়াতাড়ি ঐ লোভনীয় চিন্তাস্রোত হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছিল। সেকথা তার খুব মনে আছে! সে একি ভাবিতেছে, তাদের ঘরের অর্ধাহারী অশিক্ষিতা রুক্ষ কঠোর অভাব রুক্ষমূর্তি ঐ মেয়ে হইবে বালিগঞ্জের রাজাদের অন্তঃপুরের অলঙ্কার বৌ! পৃথিবীর চলার পথের তাল কাটিয়া যাইবে যে!

অবশেষে লহরীমোহনকে তার অসহায়া ভ্রাতৃগতপ্রাণা অভাগী বোন ক'টাকে ছাড়িয়াই যাইতে হইল। সে কি কান্না তাদের! সে কথা মনে হইলে আজও তার পুরুষের চক্ষু বলিয়াই তা শুষ্ক থাকে না, সেদিন এবং তারপর বহুদিনই সে ও কি তাদের জন্য কম কাঁদিয়াছে! তার বাপ শনিবার শনিবার তার পচাগলির মধ্যের এঁদো মেসে আসিয়া তাকে দেখিয়া ও দেখা দিয়া গিয়াছেন, বোনেদের সে পূজার ছুটির পূর্বে আর দেখিতেই পায় নাই। সেই সকল গভীর দুঃখের এবং তারই পাশাপাশি প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষার তীব্র অনুভূতির দিনগুলি আজ আবার তার মনের মধ্য জীবন্ত হইয়া উঠিল। দিনের বেলায় সুবিধা ছিলনা, রাত্রে বিছানায় পড়িয়া সে কি সোনা কান্নাটাই কাঁদিয়াছে! পাছে তার ঘরের অপর অধিবাসী টের পায়, সেই ভয়ে বড় গোপনে বড় সাবধানেই তার হৃদয়ভারকে অশ্রুধৌত করিয়া লঘু করিতে হইত, নহিলে সে সহিবে কিরূপে? তার মনে পড়িল, কলিকাতার সুসজ্জিত রাজপথের দুটী পাশে কত শাড়ী, কত ব্যাকেট, কত সুন্দর সুন্দর খেলনা কত বিচিত্র প্রসাধন, কতই না সুখাদ্যের রাশি দিনের পর দিন তার মনের বুকে বন্ধ অন্ধকারের জ্বালা জ্বালাইয়া দিয়াছে, প্রলুব্ধ দৃষ্টিকে সে একদিক হইতে ছিনাইয়া লইয়াছে, অন্যদিকেও যে তারও চেয়ে অধিকতর সুমুক্ত প্রলোভনের অজস্র সম্ভার। হায় যদি সে এত সবের মধ্যের দুটো একটাও তার বোন কটিকে দিতে পারিত? সেই সব হতাশময় দিনের নিরাকরণ মর্মব্যথা সেত আজও ভুলিতে পারে নাই।

পূজার ছুটি আসিয়া পড়িল, তার সহপাঠীরা কলিকাতার বাজার চষিয়া ফেলিতেছে, বিশেষতঃ তার মতন যারা বাহিরের ছেলে, তারাই। তার কুড়িটি টাকা স্কলারশিপের মধ্য হইতে এই তিনমাসে সে এক পয়সার জলখাবার না খাইয়া চারিটি টাকা মাত্র জমাইতে পারিয়াছিল। তাই দিয়া একা একা অনেক ঘুরিয়া হেমের জন্য একখানি লালপেড়ের দেশী সাড়ী আড়াই টাকা দিয়া আর দুটি ছোট বোনের দুটি ছিটের ফ্রক এবং চার আনার লাল সবুজ হলদে সাদা নানান রংয়ের লজেন্স কিনিয়া লইল। ফ্রক দুটীর রংয়ের ঝল্লতায় না ছিল শ্রী না ছিল কোনই ছাঁদ। কিন্তু এর বেশী যে কোন মতেই হয়না। একটী টাকা ধার করিয়া তবেই তাকে নিতান্ত সাদাসিধা জাপানী ছিটের ঐ শেষোক্ত দুটী কিনিতে হইয়াছিল অথচ তার সামনে ও আশে পাশে কত রকম ক্যাসানের ও কত না ভাল ভাল বেনারসীর সিল্কের পরদা তদুপরি কারুকার্য শোভিত নানান্ রংয়ের চটকদার বস্ত্রসম্ভার ও ফ্রকের গাদা শোভা বিস্তার করিয়া সহস্র রূপমুগ্ধ ক্রেতাকে সস্মিতমুখে আহ্বান করিতেছে ; লহরীর মনে হইল, ঐসব যারা পরিবে তারা কি তার বোনেদের মত সুন্দর ? অথচ তাদেরই এসব পরিয়া বাহার দিবার অধিকার আছে, আর তার সেই ঢাপা রংয়ের উপর তুলির টানে আঁকা চোখ মুখ নিয়া জন্মান বোন দুটীর নাই ! সেদিনকার সেই মনোবেদনা আবারও যেন সে অনুভব করিল। এই যে সংসারের অসম ব্যবস্থা একি মানুষের তৈরী না গন্তব্যস্থের কর্ণধারের অন্যায়-নীয়তা ? কে জানে ! কিন্তু সে তাহা মানিবে না, কিছুতেই মানিবে না, পৌরাণিক মহারথী কর্ণের মতই সে জোর করিয়া বলিবে "দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মমায়ত্তংহিপৌরুষং। হ্যাঁ সে বলিবে, শুধু মুখে নয়, কাজেও তাই দেখাইবে। তার মা মরা ভ্রাতৃপ্রতিম বোনদের জন্য সে নিজেকে প্রাণপণে খাটাইয়া বড় হইবে। তাদের ভাল খাইতে ভাল পরিতে দিয়া তাদের সুন্দর রূপকে আরও বাড়াইয়া তুলিবে, তাদের লেখাপড়া শিখাইবে এমনকি চাই কি একদিন তাদের তার কলিকাতার বাসায় রাখিয়া নাচগান শিল্পকলা কুশলা করিয়া রাজতুল্য লোকের ঘরে বিবাহ দিবে। যা অন্যের হইতে পারে। কালো কুৎসিত মেয়েদেরও শুধু টাকার জোরে হয়, তাদের তা কেন হইবে না. হইতে হইবে।

লহরীমোহনের মনে পড়িল, সেই তুচ্ছ বস্তু কটা যা তার তাদের হাতে দিতে লজ্জা করিতেছিল তাই পাইয়া তাদের সে কি আনন্দ ; ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম এবং চুম্বনে ছোট দুটি তাকে যেন প্লাবিত করিয়া দিল। শুধু তাকে পাওয়ার আনন্দে উৎফুল্লমুখী হেমলতার আরও দীর্ঘ হওয়া মুখখানি গাম্ভীর্য্য বিরস হইয়া উঠিয়াছিল। মৃদু নিক্ষিপ্ত শ্বাসে ঈষৎ ক্ষীণকণ্ঠে সে শুধু সংক্ষেপে বলিয়াছিল, "কেন দাদা আমার জন্য কাপড় আনলে ?" রহস্য করিয়া লহরী বলে, "ভাল হয়নি তা জানি।" কান্নাভরা ভরকণ্ঠে সে বলিয়া ওঠে, "ভাল, খুব ভাল হয়েছে দাদা, কিন্তু কেন, এর জন্যে তুমি পেটে খাওনি যে, কি চেহারা তোমার হয়ে গ্যাছে।" তার চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া কয়েকবিন্দু জল ঝড়িয়া পড়িল। কাপড়খানি বুকে চাপিয়া সে পালাইয়া গেল।

সে দৃশ্য তার দাদা কি কোনদিন ভুলিতে পারে ?

তারপর, উঃ তারপর দুইটি বৎসর না ফিরিতেই হেমলতার বিবাহ হইয়া গেল। পনের বৎসরের মেয়ে পল্লীগ্রামে সাঙ্ঘাতিক জিনিষ ! তার উপর সে প্রায় অরক্ষিতা। উপদ্রবের সীমা ছিল না। বাপের পাঁচজনের কাছে গঞ্জনা শেষে অশেষ হইয়া উঠিয়াছিল। লহরী হেমের মত মেয়েকে সামান্য কেরানীর সঙ্গে বিবাহ দেওয়াতে ঘোরতর আপত্তি করিয়াছিল, বাপের সঙ্গে পড়শীর সঙ্গে তর্ক করিয়াছিল। কিন্তু বিজয়ী হইতে পারে নাই। তার বড়লোক হওয়ার জন্য তাঁরা কিছুতেই অপেক্ষা করিতে পারেন নাই বরং সবচেয়ে

নিকট প্রতিবেশী মল্লিক মহাশয় তাদের পৈতৃক ভিটা বাঁধা রাখিয়া তার বাপকে আটশত টাকা কর্জ দিয়াছিলেন, সেই টাকাতে পদ ও মেয়ের হাতে পায়ে গহনা ও কানে একটু একটু সোনারূপা ঠেকাইয়া তাকে তাঁর অফিসের সহ-কেরানী শীতল প্রসাদের পুত্র অমল প্রসাদের সঙ্গে এক সূত্র চিরুকযোগে সম্প্রদান করার সুবিধা ঘটিল। নিরুপায় ক্ষোভে লহরীমোহন সেদিন তার প্রাইভেট ট্যুশনির পাঁচটি মাসের পঞ্চাশ টাকা দিয়া একখানি টুকটুকে লাল বস্ত্রের বেনারসী সাড়ী একটি সুইটের জ্যাকেট এক বাক্স সাবান একটী গন্ধ তেল ও কিতা জরি এসেন্স আলতা কিনিয়া লইয়া বিবাহ বাটীতে উপস্থিত হইতে বাধ্য হইল। বর অমল দেখিতে শুনিতে নেহাৎ মন্দ নয়, তবে ম্যালেরিয়া ভোগ অভ্যাস আছে বলিয়া গায়ের ময়লা রং খানিকটা ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে চোখের সাদা অংশটাও ঈষৎ পীতাভ। বাপের অফিসেই সে শিক্ষানবীশরূপে ঢুকিয়াছিল, এখন পঁচিশটি টাকা মাহিনা পায়। বাপের পেন্‌সনের বয়স আগাইয়া আসিতেছে, ঘরে বিধবা ও আইবুড়ো মেয়ে আছে, ছেলেও উচ্চ পক্ষে আরও দুইটি বর্তমান। বরকনে বিদায়ের সময় হেমলতার ভাইকে জড়াইয়া ধরিয়া বুক ফাটানো কান্না প্রেম-সম্বন্ধ যোজনাগন্ধ মুখ সমস্তই লহরীর মনের খাতার পাতায় অলক্ত হইয়া লেখা রহিয়াছে, চোখ ফিরাইয়া রাখার সুযোগ তার কোনদিনই হয় নাই।

বি. এস্-সি পাশ করিল বটে, স্কলারসিপ পাইল না। পাইল না বলিয়া নিজেকে সে নিজের কাছেই লাঞ্ছিত করিল কিন্তু অন্যে তাহাকে তার জন্য একটুও দোষী করে নাই। বিধাতার অভিশাপ, অথবা ভাগ্যের চক্রান্তই বলা উচিৎ। পরীক্ষার একটি মাস পূর্বে তার পিতৃ-বিয়োগ সহসাই ঘটিয়া গেল। হার্ট হয়ত দুর্বল ছিল, কেই বা জানে, জানিলেই বা কি? ডেলি প্যাসেঞ্জার গরীব কেরানী, চল্লিশটি টাকা তো মোটে মাহিনা। ছুটি নাই, সুপথ্য নাই, ঘরে যত্ন করিবার লোকও নাই, দশ বছরের ও এগার বছরের দুটি মেয়ে তারাই সংসারের সর্বময়ী গৃহিণী। একটি পাড়ার গরীব গৃহস্থের মেয়ে দু'বেলা বাসনগুলি মাজিয়া দেয় গরুর কাজ করে একটি করিয়া টাকা তাকে দিতে হয়।

সে দিনের কথা অগ্নিময় অক্ষরে লহরীর বুকের মধ্যে লিখিত রহিয়াছে। মায়ের মৃত্যু তার পক্ষে অসহনীয় হইয়াছিল, মায়ের জন্য সে যথেষ্ট শোক করিয়াছিল, এবার সে নিঃসঙ্গে স্তব্ধ হইয়া গেল, কঠোর ও কঠিন বলিয়া নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া নির্দয় চিত্তে পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইল ও দিল। বায়স্কোপের ছবির মতই একটির পর একটি দৃশ্য আজ লহরীমোহনের চক্ষের সাম্নাতে আসিয়া উঠিয়া মিলাইয়া যাইতে লাগিল। সে সব কি দিন! জীবনের চির-পোষিত সমুদয় উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে এক নিমেষেই তার বাপ শেষ করিয়া দিয়াছেন। বি. এস্-সি পাশ করিয়া একটা বড় রকম স্কলারসিপ পাইয়া কলকি ইঞ্জিনীয়ারিংয়ে যাইতে পারার মত বড় একটা সুযোগ ছিল, কিন্তু অনার্স পাশও সে করিতে পারে নাই।

চাকরীর বিজ্ঞাপন খুঁজিয়া এবং চাকরীর চেষ্টায় ঘুরিয়া হতাশ ও ক্লান্ত লহরীমোহন একদা বিজ্ঞাপন দেখিয়া অতুল ঘোষালের ইঞ্জিনীয়ারিং কার্খে গিয়া তার হস্তগত পেশ করিল। ইচ্ছা করিয়াই সে তার পিতৃ পরিচয় ও দেশের নামটা বিবরণেই দিয়াছিল। অবস্থা বিপর্যয়ে তাকে চাকরীর চেষ্টা করিতে না হইলে সে ইঞ্জিনীয়ারী পড়িত, সে কথাও জানাইয়া ছিল, মুখে অত কথা বলা তার পক্ষে সম্ভব হইবে না জানিয়াই সেই উপায় গ্রহণ করিয়াছিল।

ফলও ফলিল। স্বয়ং অতুলবাবু তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। দেখা করিতে গেলে তার বাপের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন, সাংসারিক অবস্থা ও অন্যান্য কথাও তাঁর কিছুই জানিতে বাকী রহিল না।

বহুদিন পরে একজন মহানুভূতিসম্পন্ন প্রশ্নকর্তা পাইয়া সে তার নিজের অজ্ঞাতেই অবরুদ্ধ চিত্তদ্বার খুলিয়া দিয়াছিল। কথায় কথায় এমন কি এ কথাও বলিয়া ফেলিল, তার বোনটির একটি সন্তান হইয়া সূতিকার রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া কঙ্কালসার হইয়া গিয়াছে, ডাক্তার চেঞ্জের জন্য বলিতেছেন, কিন্তু ত্রিশ টাকা মাহিনার কেরানীর পক্ষে স্ত্রীকে চেঞ্জে পাঠান অসম্ভব, তাছাড়া নিজেও সে ম্যালেরিয়া রোগী, জ্বরটা প্রায়ই হয়, চাকরী থাকে কিনা সন্দেহ। চাকরী পাইলে হেমকে সে চেঞ্জে পাঠাইবে।

অতুলবাবু সমস্ত শুনিয়া বলিলেন "চাকরী তোমায় আমি দোবনা।"

লহরীর মনে পড়ে সেই সংবাদ শোনার পর তার বাহ্যজ্ঞান ছিল না, বড় আশা করিয়াই সে এখানে ছুটিয়াছিল। বাপের বাড়ীতে।

শুধু বন্ধাহত যুবকের মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখের দিকে স্থির চক্ষে চাহিয়া অতুলবাবু বলিলেন, "তোমায় ইঞ্জিনীয়ারী পড়তে হবে।"

শুধু অধর ঈষৎ ভিজাইয়া লইয়া তাড়াতাড়ি শুষ্কস্বরে সে উত্তর দিয়াছিল, "কিন্তু তা যে সম্ভব নয়, সে ত আমি বলেছি।"

উত্তর হইল, "সম্ভব করলেই সম্ভব হবে, আমি সে ব্যবস্থা করে দেবে, তুমি পড়ো। তোমার বাবা কি তোমায় বলে নি, আমাদের মধ্যে কত ভালবাসাই ছিল, বহুকাল কেউ কারু খোঁজ নিই নি বটে, তবু কেউ কাউকে ভুলেছি মনে হয় না, সে যে ছোটবেলার ভালবাসা অঙ্কের কষচ বসে পড়ে না, মনের অঙ্কে আঁকড়ে থাকে। তুমি পড়, আমি দেখবো।"

"আমার ছোট বোন দুটী, বড় বোনের চেঞ্জে পাঠান, শুধু আমি ত একা নই; ওদের জন্য আমি চাকরীই করতে চাই, যা হোক একটা কিছু, তবু প্রথমেই একটি মাসের মাইনে ঐ পঞ্চাশের টাকা —"

অতুলবাবু কর্ণপাত করিলেন না, ঘণ্টা বাজাইয়া কর্মচারীকে আহ্বান করিলেন, একশত টাকার নোট সে আনিয়া দিলে সোজাটা জোর করিয়া তার কুণ্ঠিত হস্তে গুঁজিয়া দিয়া আদেশের সুরে কহিলেন, 'তর্ক করো না, ছেলেপুলের সঙ্গে আমি তর্ক করি না, হুকুম করি। যাও হেমদের কর্মস্থানে পাঠানোর ব্যবস্থা করগে, আমার একটা খালি বাড়ী ওখানে পড়ে আছে, "বিজনালয়" নাম, দরওয়ান খালি আগলে থাকে, ওদের লিখে দোব, গিয়ে পৌঁছালেই সাহায্য পাবে। আর তুমি দেরী করোনা, দরখাস্ত লিখে এনে আমায় দিও পারত আজই দিও, সিট পাবে না একটিমাত্র খালি আছে কাল শুনে এসেছি।"

লহরীর মাথা ঘুরিয়া পা টলিতেছিল, সে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে ভরসা করিল না স্তম্ভিত বিস্ময়ে তন্ময় হইয়াই রহিল। একটু পরে অতুলবাবুই প্রশ্ন করলেন ছোট বোন দুটির কি ব্যবস্থা করেছ?"

সম্বিৎ পাইয়া লহরী চমকিয়া উঠিল, তারপর ভাল করিয়া সামলাইয়া লইতে লইতে উত্তর করিল "পাড়ার একটি মেয়ে দেখছে। সেই জন্যই—"

অসহিষ্ণুভাবে পিতৃবন্ধু বাধা দিলেন, "তা বুঝেছি, তাদের কালই চলেদিয়ে আমার কাছে পৌঁছে দিও, ওরা ততদিন আমার বাড়ীতেই থাকবে। পাড়াপাঁয়ে অরক্ষিতা বাচ্চা মেয়েদের ফেলে রাখা সঙ্গত হবেনা। আচ্ছা এখন এসো, আর দেরী করোনা দরখাস্তটা লিখে এনে আমায় দেখিয়ে নিয়ে চলে যেও, ভর্ত্তি কি প্রভৃতি একেবারে নিয়েই যাবে, চিঠি আমি লিখে দোব।"

লহরীর সর্ব্বশরীরে বিদ্যুৎবহ্নি ছুটিয়াগেল, সেদিনও ঠিক এমনি হইয়াছিল, সে নিজের মত পিতৃবন্ধুর পায়ের ওপর লুটাইয়া পড়িয়াছিল। হয়ত তাঁর পায়ের জুতাটা তার গভীর কৃতজ্ঞতাতেও আর্দ্র হইয়াও থাকিবে।

সংসারে এমনও ঘটে ? গল্প-কাহিনী নয়ত ? কিন্তু তা নয়। তারপর পাঁচ বৎসর চলিয়া গিয়াছে কর্ণাটারে তিনমাস বাস করিয়া হেম ও অমল নূতন স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছে ! হেম যে এতটা কাল তা কোনদিনই বোঝা যায় নাই।

অফিস অমলকে ছুটী দেয় নাই, বরখাস্ত করিয়াছে, অমলের পক্ষে তাহা শাপে বর। সে এখন অতুলবাবুর কন্ট্রাক্টারি বিজনেসে যেন একটু ভদ্রলোকের মতই চাকরী করিতেছে। তার ভবানীপুরের ফ্লাটে হেমলতা তার দেওরের সঙ্গে বাস করে। প্রেমলতা এবার ম্যাট্রিক পাশ করিয়া বেথুন কলেজে ঢুকিয়াছে, নবজয় এবার ক্লাশ টেন। নাচ না শিখুক, গান দুজনেই অতুলবাবুর একমাত্র কন্যা সাধনার ওস্তাদের কাছে শেখে। নবজয় কণ্ঠ-সঙ্গীত অতুলবাবু ও তার স্ত্রী পাঁচজনকে আমন্ত্রণ করিয়া শোনান। সাধনার তাদের যে সব সাধ অপূর্ণ ছিল, এই দুটি পরের মেয়ের মারফৎ তাহা যেন পরিপূর্ণ হইয়াছে। অহঙ্কারী সাধনা তার সুন্দরী প্রতিদ্বন্দ্বিনী দুজনকেই মনে মনে ঈর্ষা করিলেও তাদের একান্ত পরার্থপর আত্মনিবেদনের জন্য ভাল না বাসিয়া পায় নাই। মায়ের প্রতি অনেক সময় খোঁটা দিলেও নিজে কখন মন্দ ব্যবহার করেনা !

ছুটির সময় অনেকবারই লহরীমোহনকে এদের সঙ্গে একত্র যাপন করিতে হইয়াছে, সে এই বাড়ীতে বাড়ীর লোকই হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু বোনেদের মত সে সহজভাবে এদের মধ্যে মিশিয়া যাইতে পারে নাই। অবস্থার তারতম্য যে কোন মতেই ভুলিতে পারেনা। তবু তার আশা স্বজনকে নিজের দ্বারা নাই হোক অপরের হাতে সফল হইতে দেখিয়া যে অপার আনন্দ অনুভব করিয়াছে, তারজন্য এ সঙ্কোচ, এ কুণ্ঠা, এ আত্মাবমাননা সে জন্ম জন্ম ধরিয়াই উপভোগ করিতে প্রস্তুত আছে। যদিও তার একান্ত কুণ্ঠা দেখিয়া অতুলবাবু সেই প্রথম সাক্ষাতের দ্বিতীয় দিনেই তাকে মৃদু হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি মনে করোনা এ তোমায় আমি কৃপা করছি। আমি তোমায় দিচ্ছি কর্জ, একদিন সুদ সমেত ফেরৎ চাইবো, ফেরৎ দিতে সেদিন কুণ্ঠিত হয়োনা।"

লহরীর সর্বাঙ্গ শিহরিয়া মনে পড়িল, কি ব্যাকুল আন্তরিকতার সঙ্গেই সে তার এই অপ্রত্যাশিত করুণাময় বান্ধবের কথার উত্তরে প্রত্যুত্তর দিয়াছিল, "আপনার কথায় আমি প্রাণ দিলেও এর পরিশোধ হবে না, জ্যেঠামশাই।"

অতুলবাবু তার প্রণত শিরে স্নেহের স্পর্শ দিয়া শুধু বলিয়াছিলেন, "সেদিন মনে রেখো।"

তারপর লহরীমোহনের এ কয় বৎসর যেন স্বপ্নাহতের মতই ঝোঁকা দিয়াই যে কাটিয়া গিয়াছে। অর্থচিন্তা নাই, অর্থ চিন্তা নাই, অথচ অবসরকে কাজে লাগাইয়া সে বৎসরের পর বৎসর অশেষ সম্মান সহকারেই শুধু পরীক্ষা পাশ করিয়া গিয়াছে, শেষ বৎসর এখান হইতে রুড়কি প্রেরিত হয়, যুদ্ধের সময় বলিয়াই ইংলাণ্ডে যাওয়া সম্ভব হয়নাই, সেখান হইতে শেষ পরীক্ষায় সর্বপ্রথম হইয়াই সে উত্তীর্ণ হইয়াছে। আজ অনাথ বালক লহরীমোহনের নাম কেইবা না জানে ?

যে দুইগ্রহ প্রথম জীবনকে তার বিপর্যস্ত করিয়াছিল, শুভগ্রহের দীপ্যমান রশ্মিছটায় সে আজ ত্রিদিব পরাভূত। ক্রমাগত তার অভাবগ্রস্ত মা বাপের কথাই মনে পড়ে, আত্মসংবরণ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইহার পর চাকুরীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেই···

লহরীর সমস্ত শরীরের স্নায়ু শিরা যেন শিথিল হইয়া আসিল। লতিকা, তুঃ কে জানিত তার এই পাঁচ বৎসরের সযত্নে পোষিত আশালতিকাটি এক মুহূর্তের জন্য কটিকায় এমন করিয়া ছিন্ন হইয়া

যাইবে! হেমলতারা যখন কার্শাটারে ছিল লতিকার বাবাও তখন তাদের পাশের বাড়ীতে থাকিতেন, পূজার ছুটিতে সেখানে গিয়া পরিচয় ঘটে তাঁরা শিবপুরের অধিবাসী। এই সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসরে সে তাঁদের বাড়ী বহুবার গিয়াছে। মন্মথবাবু ও তাঁর পত্নী তাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিয়াছেন, আর লতিকা! তারা দুজনেই প্রকাশ্যে না হইলেও মনে মনে যে একই কথা ভাবিয়াছে, তাহাতে তাদের দুজনেরই মনে সন্দেহ লেশ ছিলনা। তার পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পরই তিনি লতিকার সঙ্গে তার বিবাহের আর অনর্থক বিলম্ব অধিবেয় বলিয়া পত্রও দিয়াছেন। উত্তর লিখিবার জন্য যখন সে কাগজ কলম লইয়া বসিতেছে, ঠিক সেই সময়ই এই দ্বিতীয় পত্র পাইল। আজই সে তার কাছে যাইবার জন্য তৈরী হইয়াছিল, সে কথা পত্রেও লিখিয়াছে, তথাপি হঠাৎ এ পত্র আসার অর্থ কি? ব্যস্ত হইয়া সে খাম ছিঁড়িয়া পত্র বাহির করিল;—তারপর—তারপর পত্র পড়া হইয়া গেলে সে দুচোখে অন্ধকার লইয়া মূর্চ্ছাবসন্নের মতই ডেস্কটার পিঠে মাথা রাখিয়া পড়িয়াছিল, সে পত্র এই;—

শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন—

একদিন তোমায় বলেছিলাম, তোমার জন্য আমি যাহা কিছু করিতেছি, তোমায় ভিক্ষা দিবার জন্য নয়, কর্জ্জদিয়া রাখিতেছি, সময় আসিলে শোধ করিও। তুমিও তাহাতে স্বীকৃত ছিলে। আজ তুমি কৃত, আমার কাছেই হোক, অন্যত্রই হোক মোটা মাহিনার ভাল চাকরী তোমার পক্ষে অনায়াস লভ্য, ঋণ যদি শোধ করিতে ইচ্ছুক থাক এই তার পক্ষে সুসময়।

আমার কন্যা সাধনা সুন্দরী নয়, বরং সত্যকথা বলিতে গেলে বলিতে হয়, অত্যন্ত সাধারণ, বিদ্যাবুদ্ধিতেও সে তোমার তরিয়ের তুলনায় নিরেস, কিন্তু সে আমার একমাত্র কন্যা সন্তান, তার মঙ্গল প্রচেষ্টা আমার সর্বতোভাবেই করা কর্ত্তব্য। তোমায় প্রথমদিন দেখিয়াই তোমার কমনীয় মূর্ত্তি ও সহজ নম্রতা আমায় মুগ্ধ করে, প্রলুব্ধ করে, তাই আমি তোমার সমস্ত ভার এক মুহূর্ত্তেই গ্রহণ করিয়া তোমার উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া দিই। এ আমার সদাশয়তা নয়, ব্যবসাদারী মাত্র এবং ইহার একটু আভাষও আমি তোমায় জানাইয়াছিলাম, কিন্তু হয়ত তোমার সরল বুদ্ধি আমার জটিল বুদ্ধির প্রকৃত ভাবার্থ গ্রহণ করিতে পারে নাই। আজ তোমায় তাই সুস্পষ্ট জানাইতেছি, আমার মেয়ে সাধনাকে তুমি বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক কিনা, এই কথাটি মুখে না বলিতে পার ত পত্রোত্তরে জানাও।

আর এক কথা তুমি জানো, আমার দুই পুত্র বিজয় ও সঞ্জয় একজন কাইন্যান্স অফিসার ও একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট্ অনেক মত পাত্রীর অভাবে তাদের বিবাহ দিতে পারি নাই, সাধনার সঙ্গে তোমার বিবাহ হইয়াগেলে তোমার বোন দুটিকে প্রেমলতা ও সরসলতাকে আমার পুত্রবধূ করিয়া ঘরেই রাখিবার ইচ্ছুক হইয়াছি। অতঃকুশল। আশীর্ব্বাদ লইবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীমন্মথকৃষ্ণ ঘোষাল

লহরীমোহনের অসাড় মনোবৃত্তি ধীরে ধীরে সাড়া দিয়া জাগিয়া উঠিল। হস্তচ্যুত পত্রখানি আবার সে পাঠ করিল। প্রথমবার হয়ত বা শেষ পর্য্যন্ত পড়াই হয় নাই। অথবা হইয়া থাকিলেও তাহা তার আকস্মিক তীব্র আঘাতপ্রাপ্ত অন্তরে ভালরূপে প্রবেশ পথ পায় নাই। এবার একটি একটি করিয়া সকল কথাগুলি সে যেন সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করিয়াই পড়িতে পারিল। তারপর সহসা তার মুখের সেই মরনাহত

তন্ময়তা এক নিমেষেই বিদূরীত করিয়া জীবনের নবজ্যোতিতে তাহা অবভাষিত হইয়া উঠিল। মার্বেল পাথরের মেঝে, রোলস্‌রয় গাড়ী, অমূল্য সেটিং, হীরকালঙ্কারের বিভূষণ—প্রেমলতা লবঙ্গলতা না খাইয়া খাটিয়া খাটিয়া মরেনাই, সূতিকা রোগের চিকিৎসার জন্য পরের দোরে ভিক্ষা করিতে হইবে না, বালিগঞ্জের রাজতন্ত্রের একজন রাজার বাড়ীর বউ হইবে, রাজকুমারেরাও শিক্ষিত ভদ্র এবং উপার্জ্জক! না না না, মহরীমোহন এ সুযোগ ছাড়িবে না, ছাড়িতে পারিবে না। সাধনা যতই সাধারণ হোক, সতিকা তার পক্ষে যতই লোভনীয় হোক, সে যে মা বাপের একমাত্র কন্যা, তার তো ভাই নাই, বিধান বড় চাকরে ভাই! বি-এ পাশ কল্যাণময়ী রমনীর রূপশ্রী, বাপের টাকা তারও আছে, যা আছে সবইত তার, তার বাপ অতুলবাবুর মত ধনী নাই হোন, অতুলবাবুর কন্যা ত পিতার উত্তরাধিকারিনী নন, নাই হোক, নাই হোক, মহরীমোহন নিজের হৃৎপিণ্ড নিজেই ছিঁড়িয়া ফেলিবে, সে সতিকার পরিবর্ত্তে স্থূলাঙ্গী ও স্থূলবুদ্ধি সাধনাকে বিবাহ করিবে। তার স্বপ্ন সফল হোক।

দু'খানি পত্রেরই সে অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখিল, একজনকে লিখিল, "ক্ষমা করিবেন, আমি নিরুপায়!"

অপরকে লিখিল, "অনুপস্থিত হইলাম, আমি সম্মত।"

• • •

বার্ণার্ড শ "চল্লিশ বছর পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের প্রত্যেক প্রকাশকের দরজায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। অচল ঘনে প্রত্যেক প্রকাশকই তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছে। কোন ভাল কাগজের সম্পাদক পর্য্যন্ত তাঁর লেখা গ্রহণ করেন নি, ছাপান তো দূরের কথা। তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রথম দশ বছরের মধ্যে লিখে তিনি উপার্জন করেছিলেন দশ পাউণ্ড মাত্র।

যাঁর মুখের কথা শোনার জন্য সারা দুনিয়া চেয়ে থেকেছে একদিন, সেই বার্ণার্ড শ যৌবনের প্রথম দিকে সভায় দাঁড়িয়ে কোন কথা বলতে পারতেন না। সেই অক্ষমতা দূর করার উদ্যোগে তিনি প্রতিদিন হাইড পার্কের ধারে দাঁড়িয়ে,একটি নিয়মিত সময়ে চলমান জনতাকে লক্ষ্য করে বক্তৃতা দিতেন। কেউ হাসতো কেউ দাঁড়িয়ে শুনতো, কেউ বা উপেক্ষা করে চলে যেতো। কিন্তু সেদিকে দৃষ্টিপাত না করে 'শ' প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে সেই হাইড পার্কের কোণে দাঁড়িয়ে তাঁর সেই অভ্যাস যোগ সাধনা করতেন। এমনকি ঝড়-বৃষ্টি মুষলধারেও তিনি অনুপস্থিত হতেন না। সামনে কোন শ্রোতা না থাকলেও তার কিছু যেতো আসতোনা। একবার তামাসা মনে করে তাঁকে দেখবার জন্যে বেশ কিছু লোক দাঁড়িয়ে গেল তাঁর চারধারে। পুলিশের লোকেরা ভিড় সরিয়ে দিয়ে তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালো। তিনি পুলিশদের লক্ষ্য করেই বক্তৃতা দিতে লাগলেন।

প্রকাশকদের কাছ থেকে বিতাড়িত হয়ে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন রোজ অন্তত দুপৃষ্ঠের পাঁচ পাতা করে লিখে যাবেন এবং নিষ্ঠা সহকারে সেই অভ্যাস পালন করে চলেছিলেন। তাঁর জগৎ-চমৎকারী প্রতিভার পেছনে আছে প্রাণান্ত অধ্যবসায় আর সাধনা।

বসন্তের আগুন

রবীন্দ্র নারায়ণ দে

মাথার কাছে টেব্‌ল-ল্যাম্পটা জেলে হস্টেল সুপারিন্‌টেনডেন্ট অনিমা চৌধুরী বিছানায় হেলান দিয়ে একখানা অক্সফোর্ড ওয়াইল্ডের বই পড়ছিলেন।

ইশিতা বাইরে থেকে এসে দরজার কাছে একবার দাঁড়ালো। সব মেয়েদের ঘরেই যখন আলো নিভে গেছে তখনই অনিমা চৌধুরীর ঘর থেকে ডাক পড়েছে। একটু ভয়ে ভয়ে দরজাটা একটু ফাঁক করে ইশিতা নীচু স্বরে বললে,

—অনিমাদি, আমাকে ডেকেছিলেন? অনিমা চৌধুরী বিছানায় সেই রকম হেলান দিয়ে বসেই বইখানার পড়া অংশটা চিহ্নিত করার জন্যে ডান হাতের তর্জনীকে যায়গায় রেখে বইখানা বন্ধ করতে করতে বললেন—শোনো ইশিতা,

তোমার সঙ্গে কথা আছে……এক কাজ কর……দরজায় ছিটকিনিটা লাগিয়ে দিয়ে এসো।

সমস্ত ঘরখানায় একটা থমথমে ভাব। টেব্‌ল-ল্যাম্পের সেড্‌ দেওয়া আলোয় অনিমা চৌধুরীর মুখখানা ভাল করে দেখা যায় না। দরজাটা বন্ধ করে ইশিতা আড়ষ্ট হয়ে একপাশে দাঁড়ালো। বুকের ওপর হাতের ম্যাগেটটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে ইশিতা অনিমা চৌধুরীর ফিস্ট ওয়াচে কটা বেজেছে দেখবার চেষ্টা করলে……।

—ও কি! দাঁড়িয়ে রইলে কেন ইশিতা…। অনিমা চৌধুরী টেব্‌ল-ল্যাম্পটা ইশিতার দিকেই ঘুরিয়ে দিলেন।

—আচ্ছা ইশিতা, এত রাত্রে তোমাকে কেন ডেকেছি অনুমান করতে পার?

ইশিতার হাত থেকে ম্যাগেটটা খসে গেল…চুলের বিনুনীটা পিঠের ওপর টেনে নিয়ে তারই শেষ প্রান্তটা বাঁ হাতের মনিবন্ধে আলতো করে জড়াতে জড়াতে ইশিতা আড় চোখে লক্ষ্য করলে আজ অনিমা চৌধুরীর মুখখানা যেন একটু বেশী গম্ভীর।

ইশিতার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে অনিমা দেবী মৃদু স্বরে আবার বললেন,

—ইশিতা, মেয়ে জাতটা বড় স্বার্থপর না?

ইশিতা ভাল করেই জানে অনিমা চৌধুরী এতক্ষণ যে কথাগুলো বলে গেলেন, নিশ্চই তা কোন উত্তরের প্রত্যাশা না করেই…। আর একজনের সামনে এই জাতীয় স্বগতোক্তির মধ্যে কোন ঘোরালির টান থাকলেও যেন বোঝা যায় এটা একটা ঝড়ের পূর্বাভাষ।

দ্বিতীয় কোন ভূমিকা না করেই অনিমা দেবী আরম্ভ করলেন,

—আচ্ছা, সুপ্রকাশ……মানে সুপ্রকাশ ব্যানার্জির সঙ্গে তোমার কত দিনের পরিচয়?

ইশিতা অনিমা দেবীর ঘরে ঢোকবার পর থেকে যতটুকু সময় কেটেছে তাতে মুখে বেশ কয়েক ফোঁটা ঘাম জমে ওঠার কথা। সেই কাল্পনিক ঘাম সাড়ীর আঁচলে মুছতে মুছতে ইশিতা মুখ নীচু করে উত্তর দিলে,

—প্রায় বছর দেড়েক···।

অনিমা দেবী এবার সোজা হয়ে বসে ইশিতার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে বললেন।

—কিন্তু আমার সঙ্গে যে সুপ্রকাশের পরিচয় আছে আগে জানতে কি?

—জানতাম।

—আমার সঙ্গে তার কতদিনের পরিচয়···ঘনিষ্ঠতা কতখানি···সে সব কথা জানতে তোমার কৌতূহল হয়নি?

—শুনেছিলাম আপনার সঙ্গে ওনার বিয়ের কথা হয়েছিল···।

অনিমা দেবীর মুখে জোর করে টেনে আনা মৃদু হাসি টুকু মিলিয়ে গেল। একটু থেমে থেমে বললেন,

—তা সত্ত্বেও ওনার সঙ্গে মিশেছিলে···আর সেটা ছাত্রী এবং শিক্ষকের সম্বন্ধ নিয়ে নিশ্চয়ই নয়···।

এবার ইশিতার চোখ দুটো একটু চকল হয়ে উঠল···অনিমাদি, পুরুষ মানুষ প্রত্যেক মেয়ের জীবনেই আসে · হয়ত অপরিহার্য বলেই·····।

ইশিতা কি একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু সেটা না বলেই কথার মোড় ঘুরিয়ে নিজের কথাগুলো একটু সংক্ষিপ্ত ক'রে বললে।

—কিন্তু আমারও ত কনফিডেন্সিয়েল কিছু থাকতে পারে···।

—আমি জানি, তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে···কিন্তু আজ আমার সঙ্গে তোমার ব্যক্তিগত জীবন জড়িয়ে না পড়লে একজন ছাত্রীর কাছে এত দায়ে হয়ত আমাকে এই অবস্থার সম্মুখিন হতে হত না···। আজ স্বীকার করতে লজ্জা নেই, এর একটা বোঝাপড়া করার সময় এসেছে·· ।

—কিন্তু অনিমাদি, পুরুষ মানুষের স্বাধীন জীবন, স্বাধীন মন কি আপনার আমার বোঝাপড়া আর অনুশাসন মেনে চলবে? তাছাড়া সব পুরুষ সব নারীকে ঠিক একই দৃষ্টি ভঙ্গিতে ত নাও দেখতে পারে···।

—ইশিতা, অনন্তকালের সমস্ত পুরুষ সমস্ত নারীকে একই দৃষ্টি ভঙ্গিতে দেখে এসেছে···থাক, সেটা অনেক বড় কথা · তুমি যেটাকে তফাৎ মনে করে এসেছ ওটা রেশাচার···সংস্কারের মতভেদ···।

—আপনার কি ধারণা, আপনার আমার মধ্যে বোঝাপড়া আর নিষ্পত্তি হয়ে গেলেই এ সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে?

—এখানে সমাধান হবে কি না জানি না, তবে সামান্য ভুল বোঝাবুঝি অনেক দুঃখময় পরিসমাপ্তি থেকে আনে···।

অনিমা দেবীর মুখের ওপর থেকে চোখ নামিয়ে নিয়ে ইশিতা ধীরে ধীরে বললে,

—পৃথিবীতে সব জিনিসের এডজাস্টমেন্ট চলে, কম্প্রোমাইজ্ চলে কিন্তু মানুষের মন নিয়ে কি এই সব সূক্ষ্ম হিসেব চলে···?

টেবিলের ওপর ধূপদানীতে একটা ধূপ ধীরে ধীরে পুড়ে ছাই হচ্ছিল···পুড়ে মিলিয়ে যাওয়া সেই

ধোঁয়ার কীণ রেখার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে অনিমা দেবী বললেন—তোমার বেটা বয়েস···তাতে অবশ্য তাই মনে হতে পারে··· । অনিমা দেবী কি বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু ইশিতা বলে উঠল,

—আপনার বয়েস আমার থেকে অনেক বেশী হতে পারে কিন্তু পুরুষ জাতকে আমি কম চিনেছি তা আমি বিশ্বাস করি না, বোধহয় কিছু বেশীই চিনেছি·· আমার রূপ আছে·· যৌবন আছে···

ইশিতার কথা টেনে নিয়ে অনিমা দেবী বললেন.

—সুতরাং পুরুষ জাতকে স্টাডি করার সুযোগ তোমার বেশী ·· ।

—সুযোগ নয় অধিকার ।

—তুমি মেয়ে জাতকে অত ছোট মনে ক'র না ইশিতা, আমার আজ যৌবন নেই, তোমার মত রূপ নেই বলে পুরুষকে জানবার কোন অধিকার আমার নেই ?

ইশিতা চুলের বিনুনীটাকে মাথার পেছনে ছুঁড়ে দিয়ে বুকের ওপরের শিথিল শাড়ীখানা ভাল করে টেনে দিলে—না নেই । সব মেয়েরই সব অধিকার থাকে না·· তবে আমি আপনার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আসিনি · কিন্তু সুপ্রকাশকে আমি ভালবাসি···আপনি যদি চান ত আমি তাকে ভিক্ষে দিতে পারি··· কিন্তু সে পাওয়া আপনার নিজের অধিকারে পাওয়া নয়··· ।

—ইশিতা, আমিও তাকে ভালবাসি ··আমার জীবনের···

ইশিতা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল,

—না, ভালবাসেন না, তাহলে তার জীবনকে, ভবিষ্যতকে অমন করে ব্যর্থ করে দিতে পারতেন না··· ।

—কি বলছ ইশিতা ! আমি তার জীবন ব্যর্থ করে দোব··· ?

—আমি কি বলতে চাইছি তা আপনি ভাল করেই জানেন । কেবলমাত্র অন্ধ ভালবাসা দিয়েই পুরুষের জীবনকে ভরিয়ে তোলা যায় না অনিমাদি । মানুষ অবলম্বন চায়, সন্তান চায়, ভবিষ্যতের মধ্যে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চায় ·আপনি পারবেন তাকে তাই দিতে ?

অনিমা দেবী শূন্য দৃষ্টিতে ইশিতার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন । ইশিতার শরীরটা তখন উত্তেজনায় ফুলে ফুলে উঠছে—আজ নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করতে পারেন···এই দীর্ঘদিন ধরে আপনারা কিসের প্রতীক্ষা করছিলেন ?

তুমি কি মনে কর সুপ্রকাশ তোমার ওপর আকৃষ্ট হয়েছে তোমার মা হওয়ার সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে ?

—মানুষের বাস্তব জীবনের একটা বিশেষ দিক বড় কদর্য করে দেখছেন ·· ।

—পুরুষের ভেতর লালসাকে জাগিয়ে তোলার জন্যে ভগবান তোমাকে অরূপা হতে দান করেছেন এবং সেই যৌবন নিয়েই তোমার বিশ্বাস, তোমার পায়ে সকলে লুটিয়ে পড়ে···তোমার ভেতর সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখে··· ।

ইশিতার মুখে একটু বাঁকা হাসি খেলে গেল—অনিমাদি, আপনার কোন দুর্বলতার কথাই বার বার চাপা দেবার চেষ্টা করছেন না কি ?

—দেখ ইশিতা, প্রয়োজন হলে আমি সুপ্রকাশকে তোমার কাছে ভিক্ষেই চাইতাম, কিন্তু তুমি যে বিষয়টার সম্বন্ধে ইঙ্গিত করছ সে আত্মপ্রবিতা তোমার আমি ভেঙ্গে দিতে চাই ।···একদিন আমাদের সমাজে একাধিক বিবাহের প্রচলন ছিল । বংশ রক্ষার সৌভাগ্য বিধাতা যেসব হতভাগিনীর কপালে লেখেননি

তাদের কোথায় সংসারে স্থান হ'ত জানি না কিন্তু তাদের দীর্ঘনিঃশ্বাস কি আজ সমাজের ঘরে ঘরে ভাঙন ধরায় নি ?

ইশিতার মুখে একটা বিজয়িনীর হাসি ফুটে উঠলো। অনিমা দেবী তখনও বলে চলেছেন।

…তোমার চোখে এখন উন্মত্ত প্রেমের নেশা, নিজেকে কল্পনায় একজন স্বয়ম্বর সভার নায়িকা মনে করছ…তোমার বয়েসে হয়ত আমিও করতাম…কিন্তু এতে বিভ্রান্ত হয়ে নিজের পথকে পিচ্ছিল কোরো না ·· অপরের জীবনে ভাঙন ধরিও না… ।

—অনিমাদি, আমি ভাঙন ধরাচ্ছি কিনা জানি না, তবে আপনি বোধ হয় ভাঙা জিনিস জোড়া দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন ·· ।

অনিমা দেবীর মুখ থেকে কোন কথা বেরল না খানিকক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে বসে থেকে ধীরে ধীরে বললেন—তোমার অভিভাবক হিসেবেও আমার কথাগুলো একটু ভেবে দেখ… ।

ইশিতার গলায় একটু শ্লেষের আভাস ফুটে উঠলো—আপনি যখন আমার গুরুজন, আমার অভিভাবক তখন নিশ্চয়ই আমার থেকে আপনার সুপ্রকাশের ওপর বেশি দাবী আছে।

এবার অনিমা দেবীর কণ্ঠেও একটু ঊষা প্রকাশ পেল – দেখ ইশিতা, তুমি আমাকে বোঝাবার চেষ্টা কোরো না যে তুমি সুপ্রকাশের প্রেমে পড়েছ… ।

অনিমা দেবী বুকের কাছে ব্লাউজের ভেতর থেকে একটা ভাঁজ করা খাম বারকরে ইশিতার দিকে এগিয়ে ধরলেন।

—পারবে, আমার সামনে এই চিঠিখানা খুলতে ?…ভয় নেই, চিঠিখানা আমি খুলিনি। তোমার এই পুরুষ বন্ধুটি যে সুপ্রকাশ ছাড়াও আর একজন সেটা অস্বীকার করতে পার ?

হঠাৎ পাশের টেবিলে ফোন বেজে উঠল। অনিমা দেবী আধশোয়া অবস্থাতেই হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলে নিলেন।

ইশিতা একটু বিস্মিত হয়ে অনিমা দেবীর হাতের সেই খামখানার দিকে একবার আর ঘড়ির দিকে একবার চেয়ে মনে মনে ভাবলো……রাত পৌণে বারটার সময় ফোন ?

অনিমা দেবী কি শুনছেন ঠিক বোঝা গেল না। কিন্তু কপালে কয়েকটা রেখা ফুটে উঠলো। তিনি বেশ স্পষ্ট করেই বলে গেলেন,

—না, তা হয় না…এটা তোমার দায়িত্ব এড়ানোর একটা কৌশল মাত্র…কি ? ফরেন্ এক্সচেঞ্জ ? কোন প্রয়োজন নেই…এ দেশে অনেক ভাল ভাল স্কুল আছে… । পৃথিবীতে চিরকাল সব কথা গোপন থাকে না। না, না এর প্রকাশ হওয়ার প্রয়োজন আছে…নিশ্চয় ! আচ্ছা বলতে পার…তোমরা কি সবাই এক ছাঁচে গড়া… । আজ ফরেন্ এক্সচেঞ্জের দোহাই দিয়ে তুমি কার সর্বনাশ করতে চাইছ ? রঙের তোয়ারে তোমার এখনও ভাটা পড়েনি দেখছি…আড়ালে ব্যারেন বলে অপবাদ দিতে যে পারে, তার কাছে এটা বোধ হয় একটা অভিনব কৌশল।

ইশিতা এতক্ষণ কান খাড়া করে সব শুনছিল হঠাৎ যেন চমকে উঠলো… । অনিমা দেবী তখনও বলে চলেছেন,

—ভয় নেই…আমাদের কথাবার্তাগুলো আর একজন তৃতীয় ব্যক্তি শুনতে পাচ্ছে…হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার অত্যন্ত ঘনিষ্ট তাকেই চেনা… ।

অনিমা দেবী আর কোন কথা না বলে ফোনের রিসিভারটা ইশিতার দিকে এগিয়ে দিলেন।

মন্ত্র চালিতের মত ইশিতা হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা নিজের কানের ওপর চেপে ধরলো। তারপর দু' একটা কথা বলে রিসিভারের মাউথ পিসটা হাত দিয়ে চেপে ধরে বললে,

—অনিমাদি, একটা কথা বলব?

—বল।

—আচ্ছা, ঐ ছেলেটা কার?

ইশিতার মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে।

অনিমা দেবী একদৃষ্টে খানিকক্ষণ ইশিতার মুখের দিকে চেয়ে থেকে আবার আস্তে ওয়াইল্ডের বইখানা চোখের সামনে মেলে ধরলেন।

বইখানার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে অনিমা দেবী লক্ষ্য করলেন ইশিতা ফোনের রিসিভারটা ক্রাডেলের ওপর নামিয়ে রেখে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে···।

• • • •

মানুষ অতৃপ্ত। তাহার বাসনা মিটেনা—তাহার কামনা চিরদিন অপূর্ণ থাকিয়া যায়। যাহা আছে তাহাতে তাহার সুখ নাই। কি যে সে চায়, সে কথা তাহার কাছে অজ্ঞাত। কাহাকে চায়, তাহাও সে জানে না। এ প্রশ্ন চিরন্তন। তবুও সে খুঁজিয়া মরে যাহাকে ভালবাসিলে জীবন সার্থক হইবে। সে প্রিয় কোথায়? যাহাকে পূজা করিবে সে দেবতা কোথায়? তবু সে খুঁজিয়া মরে। না পাইলে হৃদয় হাহাকারে কাটিয়া পড়ে।

◀এই প্রথম▶

[গল্প-ভারতীতে 'এই প্রথম' পর্যায়ে আমরা সম্ভাবনাপূর্ণ নবাগত লেখক-লেখিকাদের রচনা আজ বহুদিন ধরে ছেপে আসছি। নূতন লেখক সৃষ্টি করা সাহিত্য-পত্রিকার একটি বিশেষ কর্তব্য। এই ভাবে ভাবান্বিত হয়েই আমরা এই অধ্যায়টির সূচনা করি। সত্যই যাঁদের প্রতিভা আছে, সুযোগ সুবিধা পেলে যাঁরা একদিন সুনাম ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবেন তাঁদের রচনা পাঠকদের সামনে তুলে ধরে তাঁদের উৎসাহ দান করাই আমাদের উদ্দেশ্য। পৃথিবীর সর্বত্রই এমনি করে নূতন লেখক তৈরী হয়ে থাকে। একদিন এইসব নূতন লেখক লেখিকা যে প্রথম শ্রেণিতে স্থান পাবেনা তা কে বলতে পারে। লেখকদের কাছে আমাদের অনুরোধ, রচনা পাঠাবার সময় 'এই প্রথম' এই কথাটির যেন উল্লেখ করেন এবং নিজের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি জানিয়ে যেন, কেন না পাঠকদের এইসব জানবার বিশেষ কৌতূহল হয়।]

সম্পাদক—গল্প-ভারতী

রাজা ও রাণী

সুনীল চন্দ্র সেন

পাশের বাড়িতে বর এলো। কপালে ও মুখে চন্দনের ফোঁটা। মাথায় মুকুট। সমস্ত দেহ ঘিরে যেন জ্যোতি বেরুচ্ছে। সুন্দর মোটরগাড়ী। নানারঙের ও বিচিত্র গন্ধের ফুলে সুন্দর মোটরগাড়ীটি সুন্দরতর করে সাজানো হয়েছে। মোটরগাড়ীতে চেপে বিজয়োল্লাসে বিজয় বিয়ে করতে এলো। যেন রাজ্য জয় করতে এসেছে। রাজ্য জয় করুক আর নাই করুক একটি মেয়েকে তো সে জয় করতে এসেছে। বিজয় রাজ্য না পাক পাবে তার রাণী। জীবনে অন্ততঃ এই একদিন প্রত্যেক বর হয় রাজা এবং প্রত্যেক কনে হয় রাণী। বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে মেয়েরা উলু দিল, শাঁখ বাজাল।

ঘরে বসে পরীক্ষার খাতা দেখছিল ফুলরা। শাঁখের শব্দে ও উলুর ধ্বনিতে পরীক্ষার খাতা ফেলে ঘর থেকে বারান্দায় এসে দাঁড়াল ফুলরা। বিজয়ের বিয়ে করতে আসার দৃশ্য দেখে দশবছর আগের একটি দৃশ্য তার চোখের পর্দায় ভেসে উঠল।

নানা ফুলে সজ্জিত সুন্দর মোটরগাড়ীতে চেপে সুদর্শন স্বাস্থ্যবান যুবক অধ্যাপক মহেন্দ্র তাদের বাড়ীর দরজায় নামল। ছেলেমেয়েরা চীৎকার করে উঠল, 'বর এসেছে, বর এসেছে।' কাকীমা, বৌদিরা উলু দিল, শাঁখ বাজাল। কনের সাজে সজ্জিতা ফুলরার বুক আনন্দে কেঁপে উঠল। এক ফাঁকে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে ফুলরা সে দৃশ্য দেখে নিল। বন্ধু উজ্জলা বাইরে থেকে একদৌড়ে ফুলরার ঘরে এসে তার গাল টিপে বলল, 'বর নয়তো যেন রাজা। কি সুন্দর চেহারা! মুখ থেকে চোখ ফেরাতে ইচ্ছা করে না।' সব বন্ধুরা বলে উঠল, 'রূপে আমাদের ফুলরাই বা কম কিসে। যাই বলিস না ভাই দু'জনে মানাবে ভালো। একেবারে রাজা ও রাণী।' ফুলরারা মফঃস্বল সহরে থাকতো। আর মহেন্দ্র ছিল কলকাতার নামজাদা কলেজের অধ্যাপক। ফুলরা শুনেছিল যে পরীক্ষার 'সিজন' বলে টিউশনির চাপে মহেন্দ্র মফস্বল সহরে গিয়ে ফুলরাকে দেখার সময় ও সুযোগ করে উঠতে পারে নি। তাই ফুলরার ও মহেন্দ্রকে দেখার সুযোগ হয় নি।

দেখাদেখিটা উভয়পক্ষের পারিস্থানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বন্ধুদের কথায় উৎফুল্ল হয়ে ফুলরা মনে মনে বাবা মাকাদের প্রণাম জানাল। 'একেবারে রাজা ও রাণী।' বন্ধুদের মন্তব্যে তার বুক গর্বে ফুলে উঠল।

বিয়ের পর কলকাতায় স্বামীর ঘরে পা দিয়ে ফুলরা হোঁচট খেলো।

অল্পদিনের মধ্যেই বুঝতে পারল উৎফুল্ল হবার তার বিশেষ কারণ নেই। মহেন্দ্রের দুই ঘরে যতখানি রূপণ বাইরে ততখানি অকৃপণ। মহেন্দ্র ইংরাজীর অধ্যাপক। কলেজের মাইনের তখন আর টিউশনিতে। অনেক ছাত্রছাত্রী। এবং ছাত্রের চেয়ে ছাত্রীর সংখ্যা অনেকগুণ বেশী। টিউশনি সেরে মহেন্দ্রের বাড়ী ফিরতে প্রায়ই রাত এগারোটা বারোটা হয়। সারাদিনের ক্লান্তির পর খাওয়া দাওয়া সেরে মহেন্দ্র ঘুমিয়ে পড়ে। নতুন বিয়ে করা স্ত্রীর যে স্বামীর কাছে কোন প্রত্যাশা, কোন দাবী থাকতে পারে তা সে বুঝতে চায় না। দৈনন্দিন প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কথা ফুলরার সঙ্গে বলে না মহেন্দ্র। স্বামীর অনাদরে কাব্যে অবহেলিতা ফুলরা মনে মনে ফুঁসতে থাকে। বেশ বুঝতে পারে সংঘাত অনিবার্য। মনমরা হয়ে ফুলরা মাসের পর মাস সংসারের ঘানি টেনে চলে আশা করে স্বামীর ভুল একদিন ভাঙবে। কিন্তু তার আশা শুধু আশেরা।

কিছুদিন পরে চটুলা লাস্যময়ী মণীষা তাদের বাড়ীতে আনাগোনা শুরু করল। মণীষা ও মহেন্দ্রের মুখে হাসি ধরেনা। ওদের মুখের হাসি দেখে ফুলরার মুখ শুকিয়ে যায়। সর্বনাশের ভয়ে তার বুক কাঁপে।

একদিন ফুলরা আর নিজেকে সামলাতে পারেনা। মহেন্দ্রকে প্রশ্ন করে, আমাকে কি তোমার পছন্দ হয়নি? মনে হয় মণীষাকেই তোমার বেশী পছন্দ।

—বি, এ পাশ করেছ আর এ সামান্য কথাটা বুঝতে পারো না।

নির্লিপ্তভাবে জবাব দেয় মহেন্দ্র।

—তাহলে মণীষাকে বিয়ে করলেনা কেন? আমাকে কেন পছন্দ করলে?

একবছরের জমানো রাগ প্রকাশ করে ফুলরা।

—তোমাকে তো আমি পছন্দ করিনি ফুলরা। তোমাকে আমি দেখতেও যাইনি। তোমাকে পছন্দ করেছেন আমার বাবা। এম, এ পাশ করে মণীষা তখন দিল্লী ইউনিভার্সিটিতে রিসার্চ করছিল। মণীষাকে বিয়ে করার আমার বাসনার কথা আমার বাবা জানতেন। কিন্তু তিনি সেটা চাইতেন না। কারণ মণীষারা হ'ল অন্যজাতি। তাই মণীষার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে আমার বাবা জোর করে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দেন।

বরফের মত উত্তাপহীন গলায় জবাব দেয় মহেন্দ্র। তার চোখ বইয়ের পাতায় নিবদ্ধ থাকে।

—মেরুদণ্ডহীন পুরুষ।

অপমানে দু'হাত দিয়ে কান চেপে সেখান থেকে চলে যায় ফুলরা। তার নারীসত্তা ফুলছিল।

ফুলরার একটি ছেলে হয়। তার শেষ আশা ছিল সন্তান স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার দূরত্ব দূর করতে পারবে। সে বানাবে সেতু। কিন্তু কালে সে আশাও নিষ্ফল হয়। মণীষার মিনে করা রূপের আগুনে মহেন্দ্র পতঙ্গের মত পুড়তে থাকে। মাঝে মাঝে মহেন্দ্র রাত্রে বাড়ী ফেরেনা।

—মণীষাকে নিয়ে লোকে তোমার নামে নানা কুৎসা রটাচ্ছে। ছিঃ ছিঃ তুমি না সন্তানের বাপ!

একদিন মহেন্দ্রকে বলে ফুলরা।

মহেন্দ্রের মুখটা ফ্যাকাসে দেখায়।

—তোমার নামে কুৎসা যখন সত্যি তখন আমার ছেলের মঙ্গলের জন্য তো আর তোমার সঙ্গে আমার এক বাসায় থাকা যায় না। তাই আমি রতনকে নিয়ে এখান থেকে চলে যাবো ঠিক করেছি।

ফুলরা তার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে।

—আমার কাছ থেকে মাসোহারা নিয়ো ফুলরা। অপরাধীর সুরে বলে মহেন্দ্র।

—ঘি, এ পাপ করেছি আর দু'টি পেট চালাতে পারবো না। তোমার পয়সাকে আমি ঘৃণা করি।

চোখ দিয়ে ঘৃণা ঢেলে রতনকে কোলে নিয়ে সে ঘর ত্যাগ করে ফুলরা।

বালীগঞ্জ থেকে বালী। বালীগঞ্জের স্বামীর বাসা ত্যাগ করে বালীতে এক আত্মীয়ের বাসায় এসে আশ্রয় নেয় ফুলরা। কিছুদিনের মধ্যে সেই আত্মীয়ের চেষ্টায় একটা স্কুলে কাজ পায়। আজ আটবছরের ওপর সে একমনে তার একমাত্র সন্তান রতনকে মানুষ করে চলেছে। রতন মানুষ হয়ে তার দুঃখ ঘোচাবে এই আশায় বুক বেঁধেছে ফুলরা।

'মা, খিদে পেয়েছে, খেতে দেবে চলো।' সন্ধ্যার সময় খেলার মাঠ থেকে ফিরে বারান্দায় দাঁড়ানো ফুলরার আঁচল ধরে টানাটানি করে রতন। রতনের ডাকে সম্বিৎ ফিরে পায় ফুলরা। 'চল বাবা।' কাপড়ের আঁচল দিয়ে চোখের কোণা মুছে নিয়ে রতনকে সঙ্গে করে ঘরে ঢোকে ফুলরা। টেবিলের ওপর রাখা ইন্দ্রানীদের বাড়ীর নেমন্তন্নের চিঠিটা চোখে পড়ে ফুলরার। কি মনে করে চিঠিটা আর একবার পড়ে। মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে ইন্দ্রাণী যেন রাজরাণী হয়। বিজয় ও ইন্দ্রাণী যেন মাত্র একদিনের রাজা ও রাণী না হয়। ওদের ভালোবাসা যেন শাশ্বত হয়। সারাজীবন ওরা যেন রাজা ও রাণী হয়ে থাকে। ফুলরার দুঃখ যেন আর কোন মেয়েকে স্পর্শ না করে। প্রার্থনায় মনটা ভাসা হয়।

হাসিমুখে রতনকে কোলে নিয়ে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ায় ফুলরা।

অপরাহ্ণবতী

সুবোধ সিংহ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

কখন কখন পরীক্ষিতের মনে হয়েছে সুমিত্রার বিদ্রোহ মন সর্বদাই নিজের সাজগোজ ও প্রসাধন নিয়ে এমন তন্ময় হয়ে আছে যে এ-বাড়ীর অনেক অসুবিধাও সুমিত্রার অভাব জীবনকে তেমনভাবে কষ্টে ফেলতে পারেনি। মনে হয়, সুমিত্রার এই স্বভাবের জন্যেই হয়তো যা শৈবাল সেদিন এত সুযোগ পেয়েও ওকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। ভাবতে ভাল লাগল তবুও,—তার চরিত্রের এই অভাবই তাকে রক্ষা করেছে,—প্রলুব্ধ করতে পারেনি।

যে-কথা সাধারণতঃ একটি অল্পবয়েসী তরুণীকে বলতে নেই—বললে তার কষ্ট হয় সে-কথাও সুমিত্রাকে পরীক্ষিৎ বলতে ছাড়েনি। কিন্তু এ-সবের গোড়ায় যে ব্যাধি মোহগ্রস্ত করে ওকে নষ্ট করতে বসেছে সে-বিষয়ে পরীক্ষিৎ ওকে কোনদিন কিছু বলে নি। একটি সুশ্রী যুবতী মেয়ের পক্ষে মেয়েলি ধর্মের এই অভাব খুব বেশী সুখের কারণ হয় না মোটেই বরং বোধ হয় অপমানকর। তাছাড়া নিজের মত একটা মন-গড়া ধারণা নিয়ে ওকে বিদ্ধ করতে বড় সঙ্কোচ বোধ হত। কারণ এই ধারণাকে অভ্রান্ত সত্য বলে পরীক্ষিৎ নিজে এখনও মেনে নিতে পারছে না। এত লোকের সংসর্গে এসেও যে-মেয়ে এই বয়সেও এ-কথা জানতে পারেনি এবং যে-মেয়েকে এ-পর্যন্ত কেউই জানানো দরকার বোধ করেনি, সে-কথাটি নিঃসন্দেহে মেনে নেওয়া বোধহয় অনুচিত। ভাবপ্রবণ মনের বিলাসিতা একটুতেই বোধহয় পরীক্ষিৎকে ভাবিয়ে তোলে, বোধ হয় একটু সামান্য বিষয়কে অতিরঞ্জিত করে দেখা ওর স্বভাবের অভ্যাস। সভ্যতার যে-ব্যাধি থেকে প্রায় কোন মেয়েরই নিষ্কৃতি নেই, সে-ব্যাধি কারোর হয়ে বসেছে অল্পবিস্তর আধুনিক মেয়ে মাত্রেরই চরিত্রে, যা দেখে পুরুষের চোখও অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তা নিয়ে হৈ চৈ করলে লোকের কাছে হাস্যাস্পদ হতে হবে। সীমারেখা ছাড়িয়ে না গেলে এই ব্যতিক্রমকেই স্বাভাবিক বলে ভাবতে আরম্ভ করেছে আজকের পৃথিবী।

কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন শৈবাল এসে উপস্থিত হল। বাড়ীতে সে ঢোকেনি, এসেছিল একটা স্কুটারে। স্কুটারের পেছনে একটা মেয়েও বসে ছিল। ওকে পিঠে নিয়েই নাকি শৈবাল আজকাল যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। রুক্ষ, লিপষ্টিক আর লিফন-পরা এই মেয়েটিকে দেখেই কেবল নয়, এই মেয়েটির মধ্যে এমন কিছু ছিল,—তার সাজ-সজ্জা, চলন-চরিত্র, হাবভাব—যা আধুনিকতম মেয়ের নির্লজ্জ বেহায়াপনাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ছমাস এভাবে গা ঢাকা দিয়ে অকস্মাৎ একটি সুন্দরী যুবতীকে পিঠে ঝুলিয়ে সুমিত্রার সঙ্গেই বিশেষ করে দেখা করবার গূঢ় উদ্দেশ্যটা পরীক্ষিতের কাছে অন্ততঃ খুবই ছেলেমি বলে মনে হল।

সুমিত্রার ব্যবহারে ও কি হতাশ প্রেমিকের মত আহত হয়ে মুষড়ে পড়েছে? না,—সুমিত্রার উপেক্ষায় অপমানিত হয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে?

আহত লোক নিজের যন্ত্রণা নিয়ে ডুবে থাকে,—তার নিজের মানসিক যন্ত্রণার ছবি ছাড়া সে আর কিছু দেখে

না—আর কিছু দেখতেও পারে না—ভাবতেও পারে না।

ক্রুদ্ধ মানুষের নিয়ম আলাদা।

সে প্রতিপক্ষকে আঘাত করবার জন্যে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, —সে বুদ্ধিও হারিয়ে বসে সে-সময়। শৈবাল বুদ্ধিমান মানুষ হয়েও বুদ্ধির খেলা দেখাতে পারেনি এ-ক্ষেত্রে। কাজেই সে হেরে গেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রেমের ব্যাপারে শৈবাল হতাশ হওয়ার বান্দা নয়। কিন্তু সকলের সামনে সুমিত্রা যেভাবে তাকে অপদস্থ করেছে তা হজম করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছে।

যে-মেয়েকে ও সঙ্গে নিয়ে এসেছে তাকে যে সে কস্মিনকালেও বিয়ে করবে না তা পরীক্ষিৎ হলপ করে বলতে পারে। ও মেয়েটিকে এনেছে অন্যকারণে। সম্ভবতঃ সুমিত্রার মনে ঈর্ষা জাগিয়ে ও দেখতে চায় সুমিত্রার মনে একটুকু দুর্বল মুহূর্ত আসে কিনা,—আঘাতে সে ভেঙে পড়ে কিনা,—অসাবধানতার সুযোগ নিয়ে কোনরকমে খিড়কির দরজা দিয়ে ভেতরের অন্দরমহলে প্রবেশ করা যায় কিনা।

এই উলঙ্গ আগুনের মধ্যে সুমিত্রাকে সে নামতে বাধ্য করবে। আর সে যখন সেই আগুনে পুড়তে থাকবে তখন সকলকে এনে দেখাবে কেমন সুন্দরভাবে একটি সুন্দর মানুষ পুড়তে পারে।

জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখেই পরীক্ষিৎ শৈবালের মানসিক চিত্রটা আগাগোড়া যেন স্পষ্ট দেখতে পেল।

স্পষ্ট বুঝতে পারল না শুধু, সে নিজে এই দৃশ্য দেখে মনে মনে কতখানি কেঁপে উঠেছে।

মনে হল সে যেন বেশ নিশ্চিন্ত হয়েই ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসল।

স্কুটারের শব্দ ওদের বাড়ীর সামনে এসেই থেমেছিল কিন্তু সুমিত্রা জানলার ধারে এগিয়ে গেল না। পরীক্ষিৎকে কেবল জিজ্ঞাসা করল,

"কে?"

"শৈবাল।"

সুমিত্রার দিকে পরীক্ষিৎ তার সজাগ লক্ষ্য শক্ত করে ধরে রাখল। উঠে দেখে আসবার জন্যে সুমিত্রার বাড়তি ইচ্ছেটা হয়তো অতি সংগোপনে ওর শরীরের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে উপচে পড়ছে কিন্তু সুমিত্রা ওর ভাব-ভঙ্গীতে এমন নিস্পৃহতা দেখালো যে তাতেই পরীক্ষিতের সন্দেহ হল যে ওর প্রবলতম ইচ্ছেটা অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠেছে। আবশ্যিকতার সংঘাতে সুমিত্রা যেন বড় বেশী সুন্দর ও সজীব হয়ে উঠেছে। সুমিত্রাকে তবু নিস্পৃহ ভঙ্গী নিয়ে ইজিচেয়ারে এলিয়ে পড়ে থাকতে দেখে পরীক্ষিতের মনটা বিরক্তিতে ভরে উঠল।

"শুয়ে রইলে কেন?—দেখা করতে যাবে না?"

"তুমি! তুমি যাবে না?"

"আমার সঙ্গে শৈবাল দেখা করতে আসেনি। যা কিছু দৃশ্য দেখাবার প্রয়োজন ওর—তা একমাত্র তোমাকে দেখাবার জন্যেই ও এত ঘুরে, এত কষ্ট করে এসেছে।"

"দৃশ্য মানে?"

চাকর এসে খবর দিয়ে গেল যে ওরা সুমিত্রাকেই ডেকে পাঠিয়েছে। সুমিত্রা অবাক হয়ে পরীক্ষিতের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। আশ্চর্য মানুষ এই পরীক্ষিৎ,—আশ্চর্য ওর কথাও।

সুমিত্রা উঠে দাঁড়াল।

"যাব নাকি? যাওয়াটা কি উচিত হবে?"

"নিশ্চয়ই—!"

এত সহজে অনুমতি পেয়ে ওর মনটা শঙ্কিত হয়ে পিছিয়ে গেল।

"আমাকে কেন? আমাকে কেন ডাকছে? আশ্চর্য তো!"

"ও একটা পরমাসুন্দরী সঙ্গিনী জোগাড় করে এনেছে —বোধহয় তোমাকে দেখাবে বলেই এনেছে।"

"তাই নাকি? তবে তো দেখাই উচিত! দেখে আসি তাহলে?—কি বল?"

মিনিট পনেরো মধ্যেই ফিরে এল সুমিত্রা। থমথমে মুখ, ফ্যাকাশে চোখ আর রক্তশূন্য ঠোঁট। পায়চারী করতে করতে আড়চোখে তাকে দেখে পরীক্ষিতের মন

আত্মপ্রসাদের আনন্দে ভরে উঠল। শুকতারাভাবে তখন হয়ে ফিরে এসেছে সুমিত্রা।

"এরই মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হয়ে গেল?"

"বলে বলে এই বাজে লোকটার সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার সময় নেই আমার।"

কল করে সিগারেটটায় আগুন ধরে উঠল, পরীক্ষিতের দৃষ্টিটাও একটু আমুদে হয়ে উঠল সেই মুহূর্তে। একটা ভ্রূ একটু উঁচুতে উঠে যেন পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে বলল, "বটে—?"

মুখে বলল,—"মেয়েটি কেমন লাগল?"

"কচি খুকী নয় মোটেই,—মেয়ে বলা যায় না ওকে। বয়েস ঢের হয়েছে,—শৈবালের চেয়ে বড়।"

"সুন্দর?"

"সুন্দর আছে। খুব সুন্দর।"

রাত্রে শোবার আগে আবার নতুন করে কথাটা পাড়ল।

"শৈবালের ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না মোটেই। কেমন যেন হেঁয়ালি হেঁয়ালি ঠেকছে। কেনই বা সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এল—কেনই বা আমার সঙ্গে না দেখা করে চলে গেল—কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না আমার।"

"আমিই বুঝতে পারিনি, তোমাকে বোঝাব কি করে?"

"তোমাকে বোঝাতে বলছি না আমি—।" একটু থেমে সুমিত্রার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল,—"তোমার পক্ষে অসুবিধেও তো থাকতে পারে—।" এ-কথাতে হঠাৎ সুমিত্রার কানের ডায়গুলো লাল হতে দেখে বলল, —"সব কথা বলাও যায় না স্বামীকে।"

"দেখ। তোমার মত বুদ্ধির বড়াই আমি করি না —কিন্তু মেনে রাখবে,—সব কথা পৃথিবীর কাউকেই বলা চলে না। এই যে শৈবাল একজন প্রেমিকাকে নিয়ে এসেছে এখানে—তাকেও সে সব কথা বলবে না,—বলতে পারা যায় না বলেই বলবে না।"

"তা তো ঠিকই! সে কি তোমাদের নৌ-বিহারের সমস্ত ঘটনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলবে? ওটা শৈবালের চেপেই যেতে হবে—অন্ততঃ তার অনেকখানি।"

"কি ভাবো আমাকে বলতো? তুমি কি সোজ না! কিছুই কি বুঝতে পার না? তোমাকে আমি কত—তোমাকে পেয়ে আমি কত সুখী হয়েছি?"

শিশুর নতুন চোখের মত সুমিত্রার ছাড়া নীলাভ চোখ যেন একটি রূঢ় ও প্রখর আলোর আঘাত সহ্য করতে না পেরে অন্য দিকে ফিরে তাকাল। ওর একদিকের গালিকটা মুখের ভাবের মধ্যে যতখানি দেখা সম্ভব তাতে কোথায় যে রাগের চিহ্ন ফুটে উঠেছে তা বিশেষ করে নির্দেশ না করতে পারলেও সব মিলিয়ে কেমন করে যেন বোঝা যায় সুমিত্রা ভয়ানক রাগ করেছে। সুমিত্রা ছিটকে নেমে পড়ল খাট থেকে আর তখনই পরীক্ষিৎ ওর আঁচলের একটি ধার মুঠো করে ধরে ফেল। শক্ত হাতের মুঠো থেকে আঁচলটা ছাড়াতে না পেরে সুমিত্রা একপাক ঘুরে গিয়ে একটু দূরে সরে পরীক্ষিতের দিকে আড়ভাবে দাঁড়িয়ে টানতে লাগল শাড়ী। একটি নিখুঁত বর্ণালী যেন উজ্জ্বল হয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠল। কদম ফুলের মত হলদে ব্লাউসটা এখন আবরণহীন কোমল স্পর্ধায় উচ্ছ্রিত হয়ে মুগ্ধ চোখের কাছে মোহময় হয়ে উঠেছে। ওর কোমর থেকে শাড়ী খসে গেছে অনেকখানি ওর যাদুকরী সুচক্র নিতম্ব ঘিরে বুকের ছড়ানো সাদা ডানার মত গায়ার অসংখ্য ভাঁজগুলো দিশাহারা হয়ে উঠেছে এইমাত্র। সুমিত্রা যেন ছুটে চলে যাবে, উড়ে পালিয়ে যাবে। ও যেন হলদে-সাদায় মেশানো একটি ছোট্ট পাখী,—একটি নিচ্ছিদ্র সুখের জন্যে ওর ছোট্ট কণ্ঠে পড়া মনটি যেন আহত হয়ে ছটফট করছে।

আঁচলের টানে সুমিত্রা পরীক্ষিতের খুব কাছে এগিয়ে গেল।

"ভেবেছিলাম চিঠিটা তোমাকে দেখাবো। এ-কয় মাসে এই যদি বুঝে থাক আমার সম্বন্ধে তাহলে এ-চিঠি দেখলে আরো ভুল বুঝবে আমাকে।"

"চিঠি? কি চিঠি?"

"শৈবালের চিঠি—।"

"কাকে লিখেছে ?"

"আমাকে।"

"ভুল বুঝবো কেন ?"

"তাইতো মনে হয়।"

"না হলে ভুল বোঝাবুঝির কারণ থাকবে না বুঝি ?"

"আমাকে এভাবে চিঠি লেখার কি মানে হয় ?"

শাড়ীটা ভাল করে পরে নিয়ে সুমিত্রা ড্রয়ার থেকে চিঠিটা বার করে পরীক্ষিতের সামনে রাখল।

"চিঠিতে কি লিখেছে আমাকে বুঝিয়ে দাও তো—আমি তো একটা কথাও বুঝতে পারলাম না।"

চিঠিটা পরীক্ষিৎ পড়তে লাগল,—

সু-মিত্রা,

তবু মিত্র হতে পারলাম না এ জীবনে। আমার সঙ্গে তোমার মিত্রতা সম্ভব হয়নি। এটা আমারই দুর্ভাগ্য, তোমার হয়তো নয়। তোমাকে বিয়ে করে পরীক্ষিৎ যদি সুখী হয়, খুবই খুশি হ'ব কিন্তু ভয় হয় বোধহয় কাউকেই ভালবেসে সুখী করবার সংগতি নেই তোমার স্বভাবের মধ্যে। একজনকে ভালবাসতে হলে নিজে কিছুটা ছাড়তে হয়,—নিজেকে কিছুটা ভুলে থাকতে হয়,—অত্যন্ত আত্মসচেতন হলে ভালবাসার ক্ষেত্রেও অন্যকে সুখী করা যায় না। আরো একটু স্পষ্ট করে বলি,—তুমি নিজের রূপে নিজেই মজে আছ—নিজের রূপের কাছে বিভোর হয়ে গেছ! পরীক্ষিতের জীবনের সঙ্গে জড়িত হয়েছ। তাকে কতখানি সুখী করতে পেরেছ অথবা কতখানি সুখী করতে পারবে তা নিয়ে আমার কোন ব্যক্তিগত উদ্বেগ নেই। তবু একথা জানালে মিথ্যে বলা হবে না যে তোমার চরিত্রের অস্বাভাবিকতা জেনেও তোমার আকর্ষণ থেকে এ-পর্যন্ত আমি মুক্ত হতে পারিনি। আমার জীবনের সব ইতিহাস তুমি জান না,—জানলে বুঝতে পারতে তোমার আকর্ষণ কতখানি শক্তিশালী। হয়তো তুমি বিশ্বাস করবে না, আমার প্রথমা স্ত্রীকে বর্জন করে যে অশান্তি আমি ভোগ করছি তার মূলে আছ তুমি। তোমাকে ভুলতে চেষ্টা করেছি এ-কয়মাস ধরে, নানারকমে, নানাভাবে। ভুলবার চেষ্টা করে কিন্তু দুঃখই পেয়েছি বেশী। যে মেয়েটিকে সঙ্গে করে এনেছি এবং এ-কয়মাস ঘনিষ্টভাবে মেলামেশা করেছি সে এ-সপ্তাহের শেষেই বিলেতে চলে যাবে। যদিও লেখাপড়ার জন্যেই সে লণ্ডন ইউনিভারসিটিতে যাচ্ছে তবু এই যাওয়ার মধ্যে একটি আশাভঙ্গের মনোকষ্ট আছে। তাকে আমি স্ত্রীরূপে গ্রহণ করবার জন্যে এপর্যন্ত কোন আগ্রহ প্রকাশ করিনি। এ-প্রস্তাব করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সম্ভব না হওয়ার আসল কারণ তুমি,—তোমাকে ভুলে যাওয়া আমার পক্ষে কঠিন। যে মহিলাটির জন্যে এই মেয়েটির জীবনে এই দুর্গতি হল, তাকে একবার চোখে দেখবার জন্যে সে ভীষণ অস্থির হয়ে পড়েছিল। তাকে দেখানোর উপলক্ষ্য করে তোমাকে দেখবার ইচ্ছেও ছিল মনে মনে। একটি অসঙ্গত প্রস্তাব করছি—কিছু মনে করো না। তোমার সঙ্গে কি মাঝে মাঝে দেখা হওয়া সম্ভব হবে ? একজন সাধারণ বন্ধুর কাছে যে সৌজন্য ও ভদ্রতা মানুষ আশা করতে পারে ততটুকুও কি তোমার কাছে আশা করতে পারি না ? আমার কথা যে তুমি রাখবে না তা আমি জানি। তাতে তোমার জীবনে একেবারেই কিছু এসে যাবে না তা মনে করোনা। আমার পরিকল্পনার প্রতিক্রিয়া হয়তো তোমার জীবনে কিছু ক্ষতি করতে পারে। ইতি—

শৈবাল।

পরীক্ষিৎ চিঠিটা ফিরিয়ে দিয়ে হেসে উঠল।

"দুশ্চরী স্ত্রীকে ঘরে রাখা বিপদ আছে তাহলে! শৈবাল প্রচ্ছন্নভাবে শাসিয়েছে চিঠির মধ্যে। এবার কি করবে ? —কি উত্তর দেবে ?"

"লোকটার মাথা খারাপ হয়েছে নিশ্চয়—মাথামুণ্ডু কি যে লিখেছে চিঠিতে—কোন অর্থ হয় কিছু ? সবচেয়ে আমি আশ্চর্য হচ্ছি—ওর আস্পর্দ্ধা দেখে। আমাকে এসব চিঠি লেখার সাহস হল কি করে ? কি ভেবেছে আমাকে ?"

"বোধহয় শৈবালের ধারণা হয়েছে কোনরকমে—"

"কি ধারণা হয়েছে ?"

"আমার সঙ্গে মিশে ওরা এখন নিশ্চয় তোমার খুব অনুশোচনা করছে।"

"কি করে বুঝলে?"

"বুঝেছি ওর চিঠি পড়ে—তাছাড়া অনেকজন বন্ধুর কাছেও ওর এই কথারই যেন প্রতিধ্বনি শুনতে পাই।"

পরীক্ষিৎ অনেকক্ষণ দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। তারপর হঠাৎ দেওয়ালকেই যেন বলে উঠল,—

"আমার স্বভাবের মধ্যে এমন কিছু আছে যা কোন মেয়েরই ভাল লাগতে পারে না—সুমিত্রা। আমাকে কেউ ভালবাসতে পারে না—বোধহয় উচিতও নয়।"

সুমিত্রা পরীক্ষিতের দিকে তাকালো। ওর ভাবাচোরা কাৎ হয়ে শোয়া অভিমানের শরীরের দিকে তাকিয়ে সুমিত্রার মনটা যেন কেঁপে উঠল—কেঁদে উঠল ওর ভেতরটা। পরীক্ষিতের দিকে ঘুরে তার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল। দুহাতের বলটা চতুর আঙুল দিয়ে পরীক্ষিতের বিষণ্ণ মুখখানা ধরে বলল,—"এই মানুষ—এই স্বভাব—এই চরিত্র; আর কাউকে নয়, আর কিছু নয়।"

"সুমিত্রার কাছ থেকে সৈবাল সে চিঠির উত্তর পায়নি। দু'একদিন হঠাৎ সৈবালের সঙ্গে সুমিত্রার দেখাও হয়েছে। একদিন রাস্তায় একদিন পার্কে। ও যেন ওরই অপেক্ষায় সুমিত্রার অভ্যস্ত গতিবিধির জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। সৈবাল যেন দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছিল,—বড় বড় ভাসা ভাসা পাগলের মত চোখ, আলুথালু অধর চুল, কাহিল শরীর আর ময়লা জামা কাপড়। একটি তীব্র ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রতিবারই সুমিত্রাকে অনুসরণ করেছে। সুমিত্রা প্রতিবারেই অলিগলির অন্ধকার দিয়ে ছুটে পালিয়ে এসেছে।

একদিন অফিস থেকে ফিরে এসে পরীক্ষিৎ দেখল তার ঘরে সুমিত্রাকে ঘিরে শ্বশুরবাড়ীর কয়েকজন লোক বসে আছে। তাদের কথাবার্তার মধ্যে যেন একটু উত্তেজনার ভাব সে লক্ষ্য করল। অমরেশের ভাবী স্ত্রী প্রতিভার গলার স্বরটাই সবচেয়ে চড়া। অমরেশ আলগা হয়ে একটু দূরে বসে আছে। ওকে কেমন যেন ক্যাবলা ক্যাবলা লাগছে আজ। হাত নেড়ে সাধনা কি যেন বোঝাচ্ছে সকলকে। নিখুঁত ও পরিপাটী হয়ে বেরোয় যেজন্যে এসেছে সে। ওকে দেখেই হঠাৎ পরীক্ষিতের মনে হল, সাধনা যেন নিজের জীবনের বিশেষ ও প্রধান একটি শুভসংবাদ দেওয়ার জন্যেই আজ ছ'মাসের ঘরকট ভেঙে ছুটে এসেছে বোনের বাড়ীতে। বিদ্রোহী, অসংযত ও অসভ্য সুমিত্রার সঙ্গে ও-বাড়ীর কোন সম্পর্ক ছিল না এ-কয়বছর।

পরীক্ষিৎ ঘরে ঢুকে একমুহূর্তের জন্যে থমকে গিয়েছিল শুধু। ঘরের চারিদিকে সে একবার তাকিয়ে দেখল। ওকে দেখে ঘরের সবগুলো মানুষই যেন কেমন কিন্তু কিন্তু হয়ে উঠেছে—ওদের মুখ থেকে একটিও কথা শুনতে পেল না। ওদের উপস্থিতিকে নীরবে অগ্রাহ্য করে পাশ কাটিয়ে রাইটিং টেবিলের ওপর অফিসের ব্যাগটা রেখে সে পাশের ঘরে চলে গেল।

পরীক্ষিৎকে ঘরে ঢুকতে দেখেই ওদের কথাবার্তা হঠাৎ থেমে গিয়েছিল, ওর চলে যাওয়ার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত কেউ কোন কথা বলল না।

অফিসের পোষাক ছেড়ে পরীক্ষিৎ নিজেই এগিয়ে গেল ও-ঘরে।

"কি ব্যাপার? খবর ভাল তো?"

অমরেশ চেয়ার টেনে এগিয়ে এল পরীক্ষিতের পাশে। ফিস্ ফিস্ করে কথা বলতে লাগল একটু অড়োসড়ো আর সলজ্জভাবে। বলল,—

"খবর ভাল নয় পরীক্ষিৎ। সৈবাল আবার বিষ খেয়েছে সুইসাইড করবার জন্যে। অবস্থা আজ দুপুর থেকে খুব খারাপ। খুব খারাপ দেখে এসেছি—এতক্ষণ আছে কিনা জানি না। ডাক্তার কমলেশ দেখছে—খুব গোপনে—জানাজানি হলে ওর চাকরিটি যাবে।"

"যারা যাচ্ছে জেনেও তোমরা সবাই মিলে এখানে রয়েছ রোগীকে ছেড়ে? তিন ঘন্টা নিশ্চয় হবে?"

পরীক্ষিতের কথা শুনে এই প্রথম যেন সহসা তাদের অবিমৃষ্টকারিতার কথা ভেবে তারা বিচলিত হয়ে পড়ল। তারা কেউই কোন জবাব দিল না কিন্তু তারা যে এখন চলে যাওয়ার জন্যে চঞ্চল ও অস্থির হয়ে উঠেছে তা

তাদের মুখ চোখের উৎকণ্ঠাতে স্পষ্ট হয়ে উঠল। বেশ একটু রহস্যময় ঠেকেছিল প্রথমটা। কিন্তু পরে পরীক্ষিৎ যেন ওদের মনের ভাবটা একটু আন্দাজ করতে পেরেছিল। যে মিশনে তারা এখানে একসঙ্গে এসে জমায়েত হয়েছে সে মিশনে একা কাউকে কেউ বিশ্বাস করতে পারেনি। তাছাড়া এর যোধবয় অন্য একটাও কারণ ছিল। যদিও সবলে একজোট হয়ে একটি মাত্র প্রস্তাব নিয়ে সুমিত্রার কাছে এসেছে তবু একটু তলিয়ে দেখে পরীক্ষিতের মনে হল ওদের প্রত্যেকেই যেন আলাদা আলাদা উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছে।

"তা হলে তো একবার দেখে আসা দরকার—!"

এ-কথাতে অমরেশ যেন একটু বিচলিত হয়ে উঠল। প্রতিভার ঠোঁটটা হতাশাসে যেন সহসা মুচড়ে গেল, আর চোখ দুটো যেন সেই মুহূর্তে অমরেশের ঘাড় মটকে দেওয়ার জন্যে লাফিয়ে উঠল।

তখনি হড়মুড় করে অমরেশের জবাব এলো,—

"না—না—ব্যাপারটা তুমি বুঝছো না! সে-কথা নয়। তোমার তো যাওয়ার দরকারই। ও একটু ভাল হয়ে উঠলে তোমার গেলেও চলবে। কিন্তু শৈবাল প্রতিভার কাছে একটা অদ্ভুত প্রস্তাব করেছে—মুস্কিলটা তো সেইখানেই।"

"প্রতিভাকে কি বলেছে?"

প্রথম থেকেই ফিস্ ফিস্ করে সে কথা বলছিল, এবার স্বরটা আরো একটু নামিয়ে বলল,—

"প্রতিভার মনটা বড্ড নরম। ভাইয়ের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে ও যোধহয় বললে সমুদ্রেও ঝাঁপ দিতে পারে। প্রতিভার মত শক্ত মেয়ে—ও পর্যন্ত ছুটে এসেছে সুমিত্রার কাছে ভাইকে এ অবস্থায় ফেলে। পায়ে ধরতে বাকী রেখেছে শুধু—কিছুতেই রাজী করাতে পারছ না সুমিত্রাকে!"

"কি বিষয়ে সুমিত্রাকে রাজী করাতে পারছে না?"

"শেষ দেখা দেখবার জন্যে অনুরোধ করেছে শৈবাল। তার শেষ ইচ্ছে।"

"মৃত্যুকালে বন্ধুর স্ত্রীকে দেখবার এত আগ্রহ? আবদারটা একটু অন্যায় বলে লোকে মনে করবে হয়তো।"

"আস্তে! প্রতিভা শুনতে পাবে পরীক্ষিৎ।" ওর রাগের চোটটা যেন প্রতিভার ওপরে না পড়ে, সে-জন্যে সে ভয়ানক সন্ত্রস্ত। অমরেশ যেন পরীক্ষিতের রাগ সামলাবার জন্যেই এখানে এসেছে—প্রতিভা তো পরীক্ষিতের বংশমর্যাদা সম্বন্ধে ততখানি ওয়াকিবহাল নয়! অমরেশ ভয়ে ভয়ে প্রতিভার মুখের দিকে তাকাল। ওরা সকলেই ওদের কথাবার্তার দিকে কান পেতে আছে। কিন্তু তাদের অস্পষ্ট কথাগুলো খুব সম্ভবতঃ ওদের কানে যায় নি। অন্ততঃ মুখের ভাব দেখে তা মনে হল না।

"হঠাৎ মরবার ইচ্ছে হল কেন?"

প্রতিভা পরীক্ষিতের এ-কথাটা শুনতে পেয়েছে। তার কাছ থেকেই উত্তরটা এল।

"যদিও ভুল। তবু যে কোন মানুষই এ-রকম করতো। আপনি ও হয়তো করতেন। সুমিত্রা ওকে চূড়ান্ত অপমান করেছে—লোকের কাছে মুখ দেখাবার রাস্তা রাখে নি সে—।"

"শেষ দেখা করবার অনুরোধটা? সেটাও কি অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যেই?"

"তা আমি কি করে বলব বলুন? তার মনের কথা আমি কি করে জানবো। হয়তো সে জানতে চায়, কি সে অপরাধ করল যার জন্যে সুমিত্রা তাকে এতবড় অপমান করল সমস্ত লোকের সামনে।"

সুমিত্রা দাঁড়িয়ে উঠে উঁচু গলায় বলল,—

"শৈবাল আমাকে অপদস্থ করতে চায়। সকলের সামনে অপদস্থ করবে।"

সুমিত্রার দিকে পরীক্ষিৎ চোখ ফেরালো।

সুমিত্রা বলতে লাগল,—

"আমি পুতুল নই—"

প্রতিভা বলল,—

"ঘরে বেঁধে তোমাকে কেউ নিয়ে যেতে আসেনি—কেবল অনুরোধ,—যদি সে না বাঁচে—হয়তো মনে হবে তার শেষ—সামান্য অনুরোধটুকুও রক্ষা করতে পারলাম না—।"

সুমিত্রা বলল,—

"আমি যা চাই না তা কখনো করতে পারবো না। তার সুইসাইডের ব্যাপারে আমার কোন দায়িত্ব আছে বলে আমি মনে করি না।"

সাধনা এবার বলে উঠল,—

"তুমি যদি মনে না কর, কেউ মনে করাতে পারবে না। সেখানে গেলে তোমার ভাত যাবে না। বরং—আমার তো মনে হয়,—মানুষের মত কাজ হবে।"

পরীক্ষিৎ লক্ষ্য করল ওর কথাতে সুমিত্রা যেন একটু হকচকিয়ে গেল। তবু সুমিত্রাকে বলতে শুনল,—"না—আমার যাওয়ার দরকার নেই—ভেবে দেখলাম।"

"ঠিকই যাবে—। এখন—আমাদের সঙ্গে যাবে না।"

পরীক্ষিতের দিকে কেমন যেন অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকাল সাধনা। সাধনার কাছ থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে পরীক্ষিৎ সুমিত্রাকে দেখল। সুমিত্রার মনের জোর যেন অকস্মাৎ হারিয়ে গেল। ওর ঢাটো সহায়হীন চোখ কোনখান থেকে একটুখানি সমর্থন পাওয়ার জন্যে নিরর্থক একটি মমতার মানুষকে খুঁজে বেড়ালো। যে এই অপমানকর প্রস্তাবকে দুমড়িয়ে মুচড়িয়ে ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে, যে সাধনার মন্তব্যের বিশ্রী ইঙ্গিতকে নিজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার জোরে বাতিল করে দিতে পারে, সে পায়ের ওপর পা তুলে, বাঁকা একটুখানি হাসির ঠোঁট দিয়ে চেপে আয়াস করে সিগারেট ফুঁকছে। স্ত্রীর এই সঙ্কটকালে সে কেমন করে এমন বিকারহীন হয়ে পড়ল তা সে বলতে পারে না। সে বলতে পারে না সাধনার এই কথাগুলো সে সেদিন কেন উপভোগ করেছিল।

সুমিত্রার কথা শুনল,—

"তোমার মুখ থেকে এ ধরণের কথা যে আমাকে শুনতে হবে তা কোনদিন আশা করিনি, সাধনা।—আজ মনে হচ্ছে মুরলীবাবু যে একটা কথা বলেছিলেন, সে কথা ঠিকই,—তখন বিশ্বাস করিনি।"

"এ-সময় মুরলীবাবুর কথা ওঠে কেন? আমি যে কি, তা যাকে নিয়ে কথা, তিনিও বেশ ভাল করেই জানেন। "তাকে বরং গোপনে তুমি জিজ্ঞাসা করে দেখতে পার।"

দুই বোনই কিন্তু চুপ করে গেল এরপরে।

অডিটরিয়ামে বসে রঙ্গমঞ্চের একটি অভিনয় অভিনয়ের মত উপভোগ্য হয়ে উঠল ক্রমশঃ পরীক্ষিতের কাছে। প্রথমটা অবিশ্যি তাল কেটে গিয়েছিল—ওর মেজাজটাও বিলক্ষণ বিগড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওদের দুজনের কথাবার্তার পর থেকেই নাটকটার মোড় ঘুরে গিয়ে বেশ সরস হয়ে উঠল। অল্প বয়েসের তফাতে পিঠোপিঠি দুবোনের মধ্যে প্রায় সব পোষনীয় ব্যাপারেই জানাজানি হয়ে পড়ে—মেয়েদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সতাশ দৃষ্টি রাখা একটা সহজাত প্রবৃত্তি। তাই দু' বোনই দুজনের সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানে—এবং জানে বলেই ওরা একজন অপরকে খুব বেশী ঘাঁটাতে চায় না। সাধনাকে খুব বেশী না ঘাঁটিয়ে আলগোছে এবং যথাসম্ভব অস্পষ্ট ভাষায় একটি অপ্রকাশিত গোপন ব্যাপারের ইঙ্গিত করে সুমিত্রা তার শুভভাবকে ব্যক্ত করতে চেয়েছে মাত্র। সাধনার উত্তরটাও তেমনভাবে থামা বাঁধতে পারল না,—ওর অপ্রকাশ্য মনের একটি নিভৃত দুর্বলতা যেন নির্লজ্জ আঘাতে হঠাৎ শুব্ধ হয়ে গেল। এদের দু'বোনের প্রতিদ্বন্দ্বী ঈর্ষার মধ্যে পরীক্ষিৎ নিজেকে স্থাপিত করে আশ্চর্য হয়ে গেল। এমন সুসময় যেন আর কারো ক্ষেত্রেই তেমনভাবে আসে না। একটি অভিলাষিত চিন্তা পরীক্ষিতকে যে তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে জানাল তাতে তার পৌরুষ যেন আত্মপ্রসাদের গৌরবে ধন্য হয়ে গেল। এখন সুমিত্রার প্রতি এদের অন্যায় আবদারকেও সে যেন অনেক সহজে মেনে নিতে পারে নিজের স্ত্রীকে টেনে হিঁচড়ে প্রেমিক বাঘের গুহায় ঢুকে যেতে দেখলে মদ্দা-গন্ধী বাঘের অভিনয়ের অংশ খুব বেশী সময়যুক্ত হয় না সত্যি। কিন্তু ওদের দু'বোনের রেষারেষির তিক্ততা যাকে নিয়ে ঘূর্ণিবাত্যা সৃষ্টি করেছে সে যে এখন সম্পূর্ণভাবে রিক্ত ও বঞ্চিত নয়, এজন্য জেগেই যেন তার ভাগ্যবানের আকাশ আর অন্ধকার হয়ে থাকতে পারল না।

তুমি যদি দর্শক হয়ে নিজের জীবন এবং জীবনের চারপাশের চরিত্রগুলো দেখতে শেখো,—যদি সে-ভাবে মনটাকে তৈরী করতে পার, তাহলে দেখবে তোমার মনের গ্লানি কত কমে গিয়েছে, কত সুখী হওয়ার সম্ভাবনার দিকে এগিয়ে আসছে তোমার জীবন। নিজেকে সরিয়ে,—ছাড়িয়ে,—দূর থেকে দেখলে নিজের জীবনকেও যেন উপভোগ করা যায়।

প্রতিভাকে বোঝাই সবচেয়ে কঠিন। মরণোন্মুখ ভাইয়ের বিছানার পাশে বসে না থেকে যে বোন ঘণ্টা তিনেক অন্য বাড়ীতে বসে থাকতে পারে,—উদ্বেগ তার যত বহতই হোক,—সে উদ্বেগ যে খুব খাঁটি নয় তা মনে করলে খুব অন্যায় হবে না।

এ অবস্থায় সাধনার এত সেন্টিমেন্টে আশাটা বড় চোখে লাগল পরীক্ষিতের। তবু টেনেটুনে এরও একটা মানে করা যায় হয়তো। একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা নিয়ে সাধনা অবিশ্যি এখানে আসেনি এবং ইচ্ছের ছকটাও তার কাছে খুব বেশী সুস্পষ্ট নয়,—তবু সে অজানিতভাবে সুমিত্রাকে এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে নিয়ে যেতে চায় যে—পরিস্থিতির দৃঢ় পরীক্ষিতের অনুরক্ত মনকে সুমিত্রার প্রতি বিমুখ করতে সাহায্য করবে।

মোটা বুদ্ধির অমরেশ অতশত ঘোর-প্যাঁচ বোঝে না। ও শুধু এইটুকুই বোঝে যে ও এমন কাজ করবে না বা এমন কথা বলবে না যাতে ওর হাতের মুঠো থেকে প্রতিভা ফসকে যায়। অমরেশ শৈবাল নয়। শৈবালের মত ও একটা প্রণয়ী ছেড়ে আরেকটিকে ধরবার পথ নেই। অমরেশ যাকে উচ্ছিষ্ট করবে তাকে সে গো-গ্রাসে গিলে আত্মসাৎ করবে। ওর হাবভাব দেখে পরীক্ষিতের মনে হয়, ও এই বিশেষ রমনীর এমন রমনীয় স্থানে গিয়ে পৌঁছেছে যে সেখান থেকে তার আর ফেরবার কোন পথ নেই। দেখাপড়া থেকে আরম্ভ করে প্রণয় ব্যাপারেও ওর উগ্র একনিষ্ঠভাব তারিফ করবার বিষয়বস্তু। তবে এ-মেয়েটি প্রতিভা না হয়ে যদি অন্য কোন চলনসই মেয়েও হ'ত তাহলেও তার এই একনিষ্ঠ প্রণয়ের হেরফের বা তারতম্য হ'ত না।

দুই বোনের কাণ্ড দেখে অমরেশের মুখচোখ লাল হয়ে গিয়েছিল। যে জন্যে এত তোড়জোড় করে তারা সকলে মিলে এখানে এসেছিল তা শেষ পর্যন্ত ভেস্তে না যায়। সুমিত্রা একবার বেঁকে বসলে তাকে আর নিয়ে যাওয়া যাবে না। ওকে যদি সে নিয়ে যেতে না পারে তাহলে প্রতিভার কাছে মুখ দেখানো মুস্কিল হয়ে উঠবে। অমরেশ সাধনার অসম্মানজনক কথাবার্তাকে ছেলেমানুষি বলে উড়িয়েও দিল না কিংবা তাকে কোনরকম প্রশ্রয়ও দিল না। কিন্তু সে বিশেষভাবে সুমিত্রার আহত মনের পরিচর্যা করল কিছুক্ষণ।

[ক্রমশঃ

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ইংরাজী ১৮৯৬ থেকে ১৯১৫ পর্যন্ত বাংলা নাট্যশালার উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক, অপ্রতিহত প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী এক নট-নাট্যকার—পরিচালক—স্বত্বাধিকারী—সাহিত্য-সেবীর জীবনের খণ্ডচিত্র।

নাট্যকেশরী অমরেন্দ্রনাথ দত্ত

একটি মানুষ! একাধারে কখনো থিয়েটার-ম্যানেজার কখনো বা স্বত্বাধিকারী, সেই সঙ্গে প্রধান অভিনেতা, পরিচালক, প্রযোজক, নাট্যকার, আবার অপরদিকে সাহিত্যসেবী, প্রবন্ধ-কবিতা-উপন্যাসের লেখক, সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক। এমনি একজন বহুমুখী কর্ম-শক্তিধর মানুষ ছিলেন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। বাংলা রঙ্গমঞ্চের বহু সংস্কার সাধন করেছেন, অভিনয়ে, প্রযোজনায়, ব্যবস্থাপনায় বহু দিক্‌চিহ্ন স্থাপন করেছেন। কিন্তু সেই 'নটকেশরী' অমরেন্দ্রনাথ আজ বিস্মৃতপ্রায়: বাংলা থিয়েটারের আদিযুগ বলতে আমরা যেন শুধু গিরিশচন্দ্রকেই বুঝি। কিন্তু বাংলা নাট্যশালাকে উন্নত করতে, তাকে জাতে তুলতে, তার অভিনেতা-অভিনেত্রী-কলাকুশলীদের প্রাণধারণের উন্নততর ব্যবস্থার প্রচলন করতে অমরেন্দ্রনাথ যে অনন্য সাধারণ কর্মোদ্যমের স্বাক্ষর রেখে গেছেন সে কথা ক'জনই বা জানেন? আর দু'বছর পরে বাংলা নাট্যশালার শতবর্ষ পূর্ণ হবে। এই শত বৎসরের পথ যাত্রায় বিগতযুগের একজন অগ্রণী পথিকের কথা ভুলে গেলে আমাদের গুরুতর অপরাধ হবে।

অমরেন্দ্রনাথ দত্তের জীবন যেন উল্কার মত। যেমন তার দীপ্তি তেমনি তার আত্মবিনাশের প্রবণতা। উল্কার মতোই স্বল্পায়ু ছিল সেই জীবন। জন্ম ১লা এপ্রিল, ১৮৭৮, মৃত্যু ৬ই জানুয়ারী ১৯১৬। মাত্র চল্লিশ বছর বেঁচে ছিলেন তিনি। তার মধ্যে অভিনয়-জীবন মাত্র উনিশ বছর। প্রথম অভিনয় মে-জুন ১৮৯৬। শেষ অভিনয় ১২ই ডিসেম্বর ১৯১৫। এই উনিশ বছরে মঞ্চের প্রয়োজনে তিনি বিয়াল্লিশটি নাটক রচনা করেছেন, শতাধিক নাটকে অভিনয় করেছেন, বহু বাধা বিঘ্ন, মামলা মোকর্দমা, আত্মীয় বিচ্ছেদ, বহু ভণ্ড বন্ধুর শত্রুতা, অর্থের অনটন, এক কথায় দুঃসহতম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও প্রবল প্রতাপে থিয়েটার চালিয়েছেন, নাটক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, নানাভাবে থিয়েটারের অবস্থার ভোল পালটেছেন। দুর্জয় ছিল তাঁর সাহস, তেজ, প্রাণশক্তি আর কর্মক্ষমতা! মানুষটির জীবন-কাহিনী পড়লে সত্যিই অবাক হোতে হয়। আমরা মনে করি আজকের দিনের নাট্যানুরাগীদের তাঁর কথা জানা দরকার। তাই তাঁর জীবনের কিছু কিছু প্রধান

ঘটনা এই বিভাগে পরিবেশন করব। এই সব ঘটনা-কাহিনীর মধ্যে পাঠক সে যুগের নাট্যশালার অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য পাবেন। অমরেন্দ্রনাথের নিকট-আত্মীয় শ্রীরমাপতি দত্ত মহাশয়ের কাছ থেকে আমরা এই প্রামাণ্য উপকরণগুলি পেয়েছি।

নট জীবনের শুরু। বিশ বছর বয়স। হাতে অঢেল টাকা। অমিতব্যয়ী ও অমিতাচারী যুবক অমরেন্দ্রনাথ। মায়ের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটেছে। ভায়েদের সঙ্গেও। বড় ভায়েদের মধ্যে একজন ছিলেন বনামধন্য পণ্ডিত ও দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। বড় বংশের ছেলে। বড় বড় আত্মীয়-কুটুম্ব কিন্তু কারুর কোন নিষেধ মানলেন না তিনি। থিয়েটার করতে নামলেন।

এই সম্পর্কে শ্রীরমাপতি দত্ত লিখেছেন—"নাট্যানুরাগ অতি বাল্যকাল হইতেই অমরেন্দ্রনাথের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বাল্যকালেই 'উষা' ও 'মানভঞ্জন' নামক দুইখানি গীতিনাট্য প্রণয়ন ও প্রকাশিত করিয়া তাঁহার নাট্যপিপাসা তখনকার মত মিটাইতে চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল ততই সে পিপাসা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পিতার অকালমৃত্যুতে অপ্রাপ্ত বয়সে বিপুল পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইয়া তিনি নাট্যসাধনা হইতে কতকাংশে ভ্রষ্ট হইয়া বিলাসব্যসনে সে সম্পত্তির সমুদয় নষ্ট করিলেন। অবশেষে চেতনা জাগিলে নটের বৃত্তি অবলম্বনের উদ্দেশ্যে প্রায় নিঃসম্বল অবস্থায় দ্বিতীয়বার গৃহত্যাগ করিলেন।"

সময়টা ১৮৯৬ সালের গোড়ার দিক। গিরিশচন্দ্র তখন স্টার থিয়েটারে। অমরেন্দ্রনাথ একদিন গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করে তাঁর মনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। গিরিশচন্দ্র তাঁকে নিজের থিয়েটার খুলতে পরামর্শ দিলেন, বললেন, তুমি অভিনেতার কষ্ট সহ্য করতে পারবে না, তুমি বড় ঘরের ছেলে, থিয়েটারের মালিক হওয়াই তোমার মানায়। সাধারণ অভিনেতার কত কষ্ট তা জান? অভিনেতার সময়ে আহার নেই, নিদ্রা নেই, বিশ্রাম নেই—দিনে দিনে তিল তিল করে প্রাণ বার করে দিতে হবে।

অমরেন্দ্রনাথ শুনে বললেন, অভিনেতাদের এত কষ্ট! আমরা বাইরে থেকে মনে করতাম, তারা কত সুখী, কত ভাগ্যবান। আচ্ছা, মশায়, আপনি অভিনেতাদের দুঃখকষ্ট মোচন করবার চেষ্টা করেন না কেন?

গিরিশচন্দ্র উত্তর দিলেন, প্রাণপণ চেষ্টা করি, কিন্তু পারি না। কারণ থিয়েটারের মালিক টাকার দিকে চেয়ে বসে থাকেন। অভিনেতাদের দুঃখ যদি তুমি বোধ করে থাকো, আমার কথামত কাজ কর, নিজে একটা থিয়েটার খোল। তাহলে তুমি তোমার ইচ্ছে মত কাজ করতে পারবে, অভিনেতাদের কষ্টমোচন এবং নাট্যজগতের উন্নতি দুইই করতে পারবে।

গিরিশচন্দ্রের উপদেশ অমরেন্দ্রনাথের মনে লাগল। তিনি থিয়েটার খোলবার জন্যে উদ্যোগী হলেন। তখনকার দিনের অভিনেতাদের জীবন সম্বন্ধে একটি চিত্র তুলে ধরেছেন শ্রীরমাপতি দত্ত—"অমরেন্দ্রনাথ থিয়েটার খুলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অন্য সমস্ত চিন্তা ত্যাগ করিয়া, কিসে নাট্যজগতের প্রাণস্বরূপ, স্বার্থত্যাগী, জীবনে মমতাহীন অভিনেতাগণের উন্নতি বিধান করিতে পারিবেন এই চিন্তায় মগ্ন রহিলেন। বাস্তবিকই তখনকার দিনের অভিনেতাদের আত্মত্যাগের তুলনা নাই। আর্থিক উন্নতির দিকে দৃষ্টি নাই, সংসারের দিকে দৃক্‌পাত নাই, সমাজশাসনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই, নিজেদের প্রাণের প্রতি মমতা নাই, এই রকম মানুষরাই তখনকার দিনে অভিনেতার ব্রত গ্রহণ করিতেন। তখনকার দিনে অভিনেতা হইতে হইলে এক প্রকার সমাজচ্যুত হইতে হইত। অভিনেতাদের নিন্দায় কান পাতা যাইত না। সমাজ অভিনয় দেখিতেন, অভিনয়ের সুখ্যাতি করিতেন, কিন্তু অভিনেতাদের মহা নিন্দা ও ঘৃণা করিতেন।

নাট্যশালার কর্তারা পর্যন্ত অভিনেতার রূপ ও ত্যাগের মূল্য সম্যক বুঝিতেন না। নাট্যশালার অধিকারী রাত্রি জাগরণে পীড়া হইবার ভয়ে মধ্যরাত্রির পূর্বেই থিয়েটারের বিক্রয়লব্ধ অপার্য অর্থ হিসাব মতেত গ্রহণ করিয়া গৃহে যাইয়া তক্তোপোষ শয্যায় শুইয়া নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেন আর যাহাদের দৈহিক সুস্থতা ও প্রাণের বিনিময়ে তিনি এই অপার্য অর্থ ঘরে লইয়া যাইতেন তাহাদের বিষয় আদৌ চিন্তা করিতেন না। তখনকার কালের বড় বড় অভিনেতারাও চল্লিশ হইতে আশী টাকা পর্যন্ত মাসিক বেতন পাইতেন। ছোট ছোট অভিনেতাদের কথা তুলিয়া আর কাজ নাই। বাস্তবিক তখনকার দিনের অভিনেতারা না পাইতেন অর্থ, না কোন মান। পাইতেন শুধু নিন্দা ও অপবাদ। তাঁহারা সমাজে মিশিতেন না। এমনকি তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন পর্যন্ত স্বজনের নিন্দা শ্রবণের ভয়ে সামাজিক সম্মেলনে যাওয়া ত্যাগ করিতেন। এমন অবধি দেখা গিয়াছে, অভিনেতাদের আত্মীয়স্বজন তাঁহাদের সহিত সম্পর্ক তুলিয়া দিয়াছেন। নাট্যজগতের যখন এইরূপ অবস্থা তখন অমরেন্দ্রনাথ থিয়েটার করিবার নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সেই কার্যে ব্রতী হইলেন। আত্মীয়-স্বজন হিতৈষী বন্ধু কাহারো কথায় কর্ণপাত করিলেন না।"

দল তৈরী হল। দলে যোগ দিলেন, ধানিবাবু, চুনিবাবু, খোকন বাবু, প্রবোধ ঘোষ, তারাসুন্দরী প্রভৃতি। কিন্তু থিয়েটার পাওয়া গেল না। ইতিপূর্বে অমরেন্দ্রনাথ ইণ্ডিয়ান ড্রামাটিক ক্লাব নামে একটি নাট্যসংস্থা স্থাপন করেছিলেন। সেই সংস্থার উদ্যোগে মিনার্ভা থিয়েটার ভাড়া নিয়ে তিনি নবীনচন্দ্র সেনের "পলাশীর যুদ্ধ" নাটক নিয়ে সর্বপ্রথম সাধারণ মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করলেন। সময়টা ১৮৯৬ সালের মাঝামাঝি। এই অভিনয় সম্বন্ধে অমরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন—"আমি তখন বিংশ বর্ষীয় যুবক। নাট্য শিল্পের প্রতি আমার অশেষপ অনুরাগ। নটের লাঞ্ছনা আমাদের দেশে চির প্রসিদ্ধ, নাট্য শিল্পের উন্নতিসাধনে সকলেই উদাসীন। গতিপথে অনেক বাধা, অনেক প্রতিবাদ, অনেক গঞ্জনা আমাকে ভোগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু চিরপোষিত কর্তব্য হইতে কিছুতেই বিচ্যুত হই নাই। নাট্য শিল্পের উন্নতি করে লাঞ্ছনার গুরুভার সানন্দে মস্তকে ধারন করিয়াছি। সর্ব প্রথমে আমি মিনার্ভা থিয়েটার ভাড়া লইয়া—গিরিশবাবুর সাহায্যে তাঁহারই দ্বারা নাটকাকারে পরিবর্তিত করিয়া কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' অভিনয় করি। আমি সিরাজের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলাম। ওই চরিত্র লইয়া রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া আমি প্রথম অভিনয় করি। চতুর্থ অঙ্ক অভিনয়ান্তে যখন ঐকতান বাদন হইতেছিল এমন সময় দেখিলাম পুরোপার্শ্ব গিরিশবাবু এক শান্ত সুন্দর সৌম্য পুরুষের হস্ত ধারন করিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সসম্ভ্রমে আমি দাঁড়াইয়া উঠিলাম। অনিমেষে সেই অনিন্দ্যসুন্দর প্রতিভার জীবন্ত মূর্তি আগন্তুকের পানে ক্ষণকাল তাকাইলাম। গিরিশবাবু আমায় ডাকিয়া বলিলেন, "অমর, কে এসেছেন, বল দেখি?" আমি চুপ করিয়া রহিলাম। গিরিশবাবু কহিলেন, "ইনিই কবি নবীনচন্দ্র।" পলাশীর যুদ্ধ প্রণেতা নবীনচন্দ্র আমার সম্মুখে! আনন্দে আপ্লুত হইয়া কবিবরের পদধূলি গ্রহণ করিলাম। নবীনচন্দ্র আমায় উঠাইয়া আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। আমার জীবন সার্থক হইল। তিনি আমার অভিনয় সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। সেসকল কথার উল্লেখ করিলে আত্মপ্রশংসা করা হয়। আত্মপ্রশংসা গুরুতর মহাপাপ।"

পলাশীর যুদ্ধের সঙ্গে অমরেন্দ্রনাথের নট-জীবনে যে যুদ্ধ শুরু হল, বহু উত্থানপতনে, দ্বন্দ্ব সংঘাতে, সাফল্যে-অসাফল্যে তার জের চলল কুড়ি বছর ধরে।

পরবর্তী সংখ্যায় অমরেন্দ্রনাথ দত্তের সাহিত্যসাধনা ও মাসিকপত্র সম্পাদনার কাহিনী লিপিবদ্ধ হবে।

সোভিয়েট থিয়েটার ও লেনিন

সর্বাত্মক বিপ্লবের রূপায়নে অতীত ঐতিহ্যকে অবজ্ঞা করেননি লেনিন।
নবরঙ্গমঞ্চ স্থাপন কালেও তিনি সেই কথাই ঘোষণা করেছিলেন।

"আমি থিয়েটারকে যেভাবে ভালবাসি আপনারা কি সেভাবে ভালবাসেন—অর্থাৎ আত্মার সমস্ত শক্তি দিয়ে, যাত্র যৌবনের সমগ্র উদ্যম ও আনন্দ দিয়ে, সৌন্দর্যানুভূতির আগ্রহ ও ব্যাকুলতা দিয়ে আমার মত আপনারা কি নাট্যশালাকে ভালবাসেন? যত কলা আছে তার মধ্যে প্রাণবন্ত রেখাপাতে আত্মাকে চমৎকৃত করে দেবার ক্ষমতা, চিত্তে এক অপরিসীম আনন্দ হিল্লোল তোলার ক্ষমতা থিয়েটারের মত আর কোন্ কলার আছে? দয়া করে থিয়েটারে যান। পারেন তো মন প্রাণ ঢেলে দিন থিয়েটারে।"

এই উক্তিটি রাশিয়ার প্রখ্যাত নাট্য-সমালোচক বেলিন্স্কির। রুশ জাতি নাট্যশালাকে যে কত ভালবাসে এই উক্তির মধ্যেই তার প্রতিধ্বনি রয়েছে।

ঊনবিংশ শতকের শেষে রুশ থিয়েটারের সংস্কারের প্রয়োজনেই এলেন লেখকরূপে আন্তন চেখভ এবং ম্যাক্সিম গোর্কি।

তারপর এলেন স্তানিস্লাভস্কি এবং নেমিরোভিচ্। এঁদের দু'জনের সম্মিলিত চেষ্টায় আর্ট আণ্ড পপুলার থিয়েটার নামে নাট্যশালা স্থাপিত হয় এবং ১৮৯৮ সালের ১৭ই অক্টোবর সেখানে অভিনয় শুরু হয়। তলস্তয় রচিত 'জার ফিওদোর' নামে নাটকটি দিয়েই এই নতুন থিয়েটার (মস্কো আর্ট থিয়েটার নাম নিয়ে) দর্শকদের অভিবাদন জানান।

অক্টোবর বিপ্লবের পর ১৯১৭ সালের ২রা নভেম্বর বিপ্লবী সরকার পিপলস কমিসার কাউন্সিল থিয়েটারকে রাষ্ট্রীয় শিক্ষা কমিশনের অন্তর্গত করে এক ডিক্রী জারী করেন।

সোভিয়েত শাসনের প্রথম দু'বছর সরকারী থিয়েটারগুলি বেসরকারী ব্যবসায়িক থিয়েটারগুলির সঙ্গে সহ-অবস্থান করে চলে। বেসরকারী থিয়েটারগুলি লোক-শিক্ষায় সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করতে পারে না। থিয়েটার শুধু প্রমোদের মাধ্যম নয়, বৈপ্লবিক ভাবধারা প্রচারের এটি একটি সবল বাহন—এ তাৎপর্য তাঁরা অনুধাবন করতে পারেন না। ১৯১৯ সালে সরকারী আদেশে নাট্যসংস্থাগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করা হয় এবং সকল থিয়েটার সরকারী সম্পত্তিতে পরিণত হয়। নতুন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে থিয়েটার কোন্ নীতি গ্রহণ করবে তাও ঘোষণা করে বলা হয়:

"প্রয়োজন ও শিল্পগত ব্যবসায়ের দিক বিচার করে নাট্যশালাগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হল। রাষ্ট্রকর্তৃক নির্ধারিত হারে কর্মীদের পারিশ্রমিক দিয়ে এবং আসনের মূল্য নির্দিষ্ট রেখে সেগুলি যাতে কাজ চালিয়ে যেতে পারে সেজন্য আনুপাতিক হিসাবে সরকারী সাহায্য মঞ্জুর করা হবে।"

আজো পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই চালু আছে।

নব্য রাশিয়ার শিল্পকলার অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিপ্লবী যুগ অবশ্য একটি চরম মতবাদের উদ্ভব রোধ করতে পারেনি। অতীতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পূর্ণ রূপে বুর্জোয়া, অতএব তা বর্জনীয় এমনি একটা ঝোঁক প্রবল হোতে দেখা দিল। কিন্তু লেনিন তা স্বীকার করেননি। যাঁরা দাবী করেছিলেন, প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁরা নতুন প্রোলেতারীয় সংস্কৃতি সৃষ্টি করতে পারবেন তাঁদের দাবীর বিরুদ্ধে লেনিনই সব আগে প্রচণ্ড প্রতিবাদ জানালেন।

প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধ্বংস করে তার ভগ্নস্তূপ থেকে নয়া সংস্কৃতি গড়ে তোলবার যেসব চেষ্টা হয় লেনিন তুচ্ছতার সঙ্গে তার বিরোধিতা করেন। ১৯২০ সালের ৮ই অক্টোবর প্রোলেতারীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে লেনিন তাঁর একটি প্রস্তাবে লেখেন :

"নতুন প্রোলেতারীয় সংস্কৃতি আবিষ্কারের পরিবর্তে মার্কসীয় বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা চালিত হয়ে এবং সর্বহারা একনায়কত্বের যুগে তাদের জীবনের অবস্থা ও সংগ্রামের প্রতি দৃষ্টি রেখে বিদ্যমান সংস্কৃতির সেরা নিদর্শন সমূহ, ঐতিহ্যাবলী ও ফলাফলগুলিকে আয়ত্তে করতে হবে।"

অন্য একটি প্রস্তাবে তিনি লেখেন :

"মার্কসবাদ ঐতিহাসিক তাৎপর্য অর্জন করেছে এই কারণে যে তা বুর্জোয়া যুগের সবচেয়ে মূল্যবান কীর্তিগুলিকে বর্জন করেনি, বরং, মানবচিন্তা ও সংস্কৃতির বিকাশের প্রক্রিয়ায় দু'হাজার বছরের সঞ্চিত মূল্যবান সব কিছুকে আত্মস্থ ও নব রূপায়িত করেছে। ঐ দিকে যদি আরো কাজ করে যাওয়া যায় তবে একমাত্র তাকেই যথার্থ প্রোলেতারীয় সংস্কৃতির উন্নয়ন রূপে স্বীকার করা যেতে পারবে।"

তাঁর এই আদর্শকে অনুসরণ করবার কাজে এগিয়ে এসেছিলেন, বাগ্মী, লেখক, সমালোচক ও গবেষক কলাবিদ্যায় সুপণ্ডিত আনাতোলি লুনাচারস্কি। তাঁর অসামান্য সংগঠন শক্তি ছিল। শিক্ষা ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে লেনিনীয় নীতি প্রয়োগে যোগ্যতার দিক দিয়ে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠতম কর্মী। তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, শিল্পকলার ভাবী অগ্রগতির পক্ষে অতীত সংস্কৃতির উত্তরাধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলা নাটকের ধারা

আজকের বাংলাদেশে ইনটেলেকচুয়াল শব্দটা বহুল প্রচলিত। তবলহাক চায়ের সঙ্গে চারমিনার সিগারেটের রাসঘোটক হলেই শোনা যায় যে ইনটেলেকচুয়ালরা এমন একটি গোষ্ঠিভুক্ত যারা এক কথায় সাধারণের একটু উপরে (অবশ্য কোন দিক দিয়ে বলা কঠিন)। এ হেন এক শ্রেণীর ইনটেলেকচুয়াল আজকাল কলকাতা শহরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, যাদের অন্যতম প্রধান ক্যাশান হল নাটক করা ও নাটক লেখা। তার মধ্যে নাটক করাটাই বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে—কারণ সেটাই নাকি ইনটেলেকচুয়ালিটির অন্যতম কোয়ালিফিকেশন। কিন্তু বাংলাদেশের এই নাটক করা ও নাটক লেখা ফ্যাশানের গোড়া খুঁজতে গেলে আমাদের চলে যেতে হবে সেই যুগে যখন অধ্যাপক অধ্যাপনা ছেড়ে যোগ দিলেন পেশাদারী মঞ্চে—অর্থাৎ শিশির যুগে।

বাংলাদেশে নবনাট্য আন্দোলনের পুরোধা শিশিরকুমারকেই বলা চলে। কারণ সর্ব প্রথম তিনিই নাট্য প্রযোজনার বিভিন্ন দিক নিয়ে চিন্তা করেন এবং ইউরোপীয় প্রযোজরীতির সঙ্গে নিজের কল্পনাকে কাজে লাগিয়ে দৃশ্যসজ্জা, আলোকনিয়ন্ত্রণ, রূপসজ্জা, যৌথ অভিনয় ইত্যাদির নবতম প্রয়োগে সচেষ্ট হন। কিন্তু নাটক মনোনয়নের দিক থেকে তিনি কিছুটা গতানুগতিক ধারাকেই সমর্থন করেন।

আজকের বাংলাদেশের নবনাট্য প্রযোজকরা দেশী নাটক পছন্দ করেন না। তাঁদের মতে বিদেশী নাটকে রয়েছে আন্তর্জাতিক আবেদন যা ভাষান্তরিত করলে সবদেশের মানুষকে সবদেশের সমাজকে প্রতিবিম্বিত করতে পারে। তবে তার ফল যেন বিকৃত যৌন-আবেদন ও অতিবাস্তব বিদেশীয়ানায় শেষ না হয়। প্রসঙ্গত, সুপার ইনটেলেকচুয়াল প্রযোজনায় এইরূপ পরিণতি লক্ষণীয়। নাট্য আন্দোলনকে যদি সমর্থন করতে হয়

তবে দেশী ও বিদেশী রীতির সমন্বয়ে প্রযোজনা করতে হবে সেই নাটক যা মেকদণ্ডহীন নয়—যা দিগ্‌দিশাহীন নয়—যা চলমান প্রগতিহীন সুস্থ সমাজের স্বচ্ছ প্রতিচ্ছবি প্রতিবিম্বিত করে।

আশিস সান্যাল

শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ

রবীন্দ্র সদনে রবীন্দ্রসঙ্গীতনাট্যের মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান

গত মাসে রবীন্দ্র সদনে উক্ত সংঘের বহু ঈপ্সিত সাংবৎসরিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। অনুষ্ঠান সূচীতে ছিল মায়ার খেলা (দুদিন), ভানুসিংহের পদাবলী, তাসের দেশ, বাল্মিকী প্রতিভা, শ্যামা এবং চিত্রাঙ্গদা।

এবার মায়ার খেলায় প্রমদার ভূমিকায় নেমেছিলেন শ্রীমতী বনানী ঘোষ। সুন্দর অভিনয় করেছেন তিনি। এই প্রসঙ্গে আমাদের একটি ইচ্ছা ব্যক্ত করি। তাহল : শ্রীমতী কনিকা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি কোন নাট্যে মঞ্চে অবতীর্ণ হন তাহলে দর্শকবৃন্দ যে অত্যন্ত খুশী হবেন তাতে সন্দেহ নেই। আমরা শুনেছি একদা তিনি শান্তিনিকেতনে মায়ার খেলায় প্রমদার ভূমিকায় নেমেছিলেন।

গত বছর বাল্মিকী প্রতিভা হয়নি। এবার হল। বাল্মিকীর চরিত্রে রূপদান করলেন অশোক সাউ। অশোক সাউ যে একজন সুদক্ষ শিল্পী তার স্বাক্ষর তিনি রেখেছেন।

সবগুলি পালার মধ্যে নৃত্যে যিনি সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তিনি হলেন শ্রীমতী পূর্ণিমা ঘোষ। নৃত্যশিল্পীরূপে তিনি যে সর্বশ্রেষ্ঠদের মধ্যে অন্যতমা তাতে সন্দেহ নেই। তিনি যে শুধু অসাধারণ পরিশ্রমী তাই নয়, প্রতি পালাতেই তাঁর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা পরিস্ফুট।

মঞ্চশিল্পী শ্রীবর্ধনারায়ণ দাশগুপ্তের রচিত শ্যামা নৃত্যনাট্যের সেটটি অপূর্ব !

নৃত্যে গানে অভিনয়ে মঞ্চ-ব্যবস্থাপনায় যন্ত্রসংগীতে, রূপসজ্জায়, আলোক নিয়ন্ত্রণে, সব মিলিয়ে আশীজনের উপর শিল্পী ও কলাকুশলী এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র, শ্রীমতী কনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী নীলিমা সেন, শ্রীমতী বনানী ঘোষ, শ্রীমতী কমলা বসু, সর্বশ্রী প্রদীপ সেন, গোরা সর্বাধিকারী, অশোক সাউ, মিহির ঘোষ, চন্দ্রোদয় ঘোষ, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, তেজমনি সিং, শ্যামল বসু, প্রমুখ। এই প্রসঙ্গে শ্যামা নৃত্যনাট্যে উপ্তীয়ের গানে তরুণ গায়ক শ্রীগোরা সর্বাধিকারীর নৈপুণ্য বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। তিনি যে-ভাবে উত্তরোত্তর রবীন্দ্রসংগীতে উৎকর্ষের পরিচয় দিচ্ছেন তাতে অদূর ভবিষ্যতে তিনি যে রবীন্দ্রসংগীত-শিল্পীদের মধ্যে প্রথম সারিতে স্থান লাভ করবেন তাতে সন্দেহ নেই।

নান্দীকার

কলকাতার এই জনপ্রিয় ও সুখ্যাত নাট্যসংস্থা গত ২৯শে জুন একাদশ বর্ষে পদার্পণ করল। এই উপলক্ষ্যে তাঁরা একটি বাৎসরিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। সেই সম্মেলনে অনেক নাট্যানুরাগী সুধী নান্দীকারের শিল্পীগোষ্ঠিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। আমরাও তাঁদের সঙ্গে আমাদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা যোগ করছি।

১৯৬০ সালের ২৯শে জুন শ্রীঅজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এই দলটি গঠিত হয়। তাঁদের প্রথম নাটক ইবসেনের গোষ্ট-এর বাংলা রূপান্তর—বিদেহী। তারপর তাঁরা পরপর অভিনয় করলেন, দাও

ফিরে দে অরণ্য, সেতুবন্ধন, চার অধ্যায়, বহুমায়, নীলিমা, শুভবিবাহ, নারায়ণের দিন, রাত্রি, প্রস্তাব, খেয়াঘাট প্রভৃতি নাটক ও নাটিকা। তাঁদের পরের নাটক পিরানদেল্লোর নাটকের রূপান্তর—'নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র' প্রভূত যশ অর্জন করল এবং সংস্থার প্রতিষ্ঠাকে দৃঢ়তর করল। সাম্প্রতিক কালে যখন একা, দের আকাশ, মহুয়া আমের মঞ্জরী নাটক তিনটিও তাঁদের সুনাম বৃদ্ধি করেছে। বর্তমানে তাঁরা অভিনয় করছেন তিন পয়সার পালা। বার্টোল্ট ব্রেখট-এর ত্রি থ্রি পেনী অপেরা নামক স্যাটায়ারটিকে অবলম্বন করে লেখা 'তিন পয়সার পালা' অভিনয় ও প্রযোজনার গুণে বিশেষ জনসমাদর লাভ করেছে।

এই সংস্থার অধিনায়ক শ্রীঅজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু যে একজন নিষ্ঠাবান নাট্যসাধক তাই নয়, নিজেদের সংস্থাটির পরিপুষ্টি সাধনে তিনি দশ বছর ধরে যে নিরলস অনন্যচিত্ত কর্মোদ্যমের পরিচয় দিয়েছেন তাও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবশ্য একটি নাট্যসংস্থা গড়ে তোলা এবং তাকে যশের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করা একার কাজ নয়। এবিষয়ে তিনি অনেকগুলি বিশ্বস্ত ও উদ্যমশীল সহযোগী পেয়েছেন, যাঁদের মধ্যে আছেন, শ্রীঅমিত বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীচন্দ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, শ্রীবাদলায়ন উপাধ্যায়, শ্রীপরিতোষ পাল, শ্রীঅমলেন্দু চক্রবর্তী, শ্রীমতীলীলা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

নাট্য প্রবাহ

বঙ্গীয় সংসদ (জয়নগর)। গত ২৫শে বৈশাখ এই প্রবাসী সংস্থার সভ্যরা কবিগুরুর জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষে দু'দিন ধরে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। প্রথম দিন রক্তকরবী অভিনীত হয়। পরিচালনায় ছিলেন বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়। নাটকোপযোগী রূপসজ্জা ও আলোক নিয়ন্ত্রণ প্রশংসনীয়। দলগত অভিনয় উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছে। পরদিন যে একাংক নাটক প্রতিযোগিতা হয় তাতে মোট আটটি দল যোগ দেন। জয়নগরের মধুর নাট্যদল দলগত অভিনয়ের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার অর্জন করেন। এঁদের নাটক ছিল—'বিষণ্ণ সকাল'। এই নাটকে প্রধানের ভূমিকায় অনিমেষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কবি চরিত্রে সবিতা ঠাকুরতা শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীরূপে বিবেচিত হন। প্রবাসী বঙ্গীয় সংসদ প্রযোজিত 'তাহার নামটি রহনা'-র পরিচালক গোপী বসু শ্রেষ্ঠ পরিচালনার পুরস্কার লাভ করেন। ১৬ই মে অভিনীত হয় আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত যাত্রা নাটক—পরিচয়। পরিচালনা করেন শিশির রায়। সামগ্রিক অভিনয় দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দেয়। ২১শে মে নজরুল জন্ম-জয়ন্তী পালন করা হয়। অনুষ্ঠানটির বৈশিষ্ট্য সকলকে মুগ্ধ করে।

নটলীলা। এই অবক্ষয়ের যুগে এই সংস্থার শিল্পীরা সম্প্রতি হরমহলে 'জননায়ক শিবাজী' নামে নাটকটি অভিনয় করে একটি প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। সমগ্র নাটকটি অত্যন্ত সংযত এবং নিষ্ঠার সঙ্গে রূপায়িত। ঔরংজেব চরিত্রে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় দর্শকদের অভিভূত করে। যমিনা বেগীর জিজাবাঈ উচ্চাঙ্গের নাটকৈপুণ্যের পরিচায়ক। শিবাজী চরিত্রে সমর চট্টোপাধ্যায়, সমর্থ ভূমিকায় কনু বড়াল, মুকুল সরকারের রঘুনাথ, সুনীত মুখোপাধ্যায়ের আফজল খাঁ এবং অন্যান্য ভূমিকায় শিশির মিত্র, অমল বিশ্বাস, অবনী মুখোপাধ্যায়, হিমাংশু রায়, পরিতোষ রায়, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, কবি মিত্র প্রমুখ শিল্পীরা সকলেই সুঅভিনয় করেন।

গ্রাণ্ট অ্যাডভারটাইজিং। সম্প্রতি তাঁর মঞ্চে এই প্রচার-প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা অভিনয় করলেন শৈলেন গুহ নিয়োগীর 'ক্রান্ত রূপকার'। নির্দেশক ছিলেন নাট্যকার স্বয়ং। তাঁর পরিচালনার কাজ সুষ্ঠু। অভিনয়েও সকলেই সুষ্ঠুভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে

দর্শকচিত্তকে নাড়া দেন. চুনী বন্দ্যো., বাসুদেব ভাদুড়ি, দীপংকর দে, কিশলয় বর্ধন, অজয় সরকার, প্রতিমা পাল, শিখা ভট্টাচার্য, মল্লিকা ও রমা মুখোপাধ্যায়। দীনেশ চক্রের আবহসংগীত ও স্বরূপ মুখোপাধ্যায়ের আলোক-সম্পাত প্রশংসার যোগ্য।

শক্তি সাধনা মন্দির (জনা ,)। গত ২৭শে জুন এখানকার কালীবাবুর বাড়িতে মঞ্চস্থ হয় দুটি নাটক, বনজয় বৈরাগীর 'এক পেয়ালা কফি' ও উৎপল দত্তের 'মৃত্যুর অতীত'। প্রথম নাটকে নাট্য দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন নিখিল রায়, গোপী দাস, দেব গাঙুলী, অর্ণব পাল, শিশির সামন্ত, সুদীপ ভট্টা, শিখা ভট্টা, তৃপ্তি দাস। দ্বিতীয় নাটকে দর্শকদের বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেন, সত্যেন চক্রবর্তী, ও দীপক রায়। এ ছাড়া অশোক কোলে, রবি ঘোষ, রাম কর্মকার, অজয় চট্টো সুঅভিনয় করেন। সুহাস ভট্টাচার্যের পরিচালনা প্রশংসনীয়।

নবারুণ। নেতাজী সুভাষ মঞ্চে গত ২০শে জুন এঁরা অভিনয় করলেন শৈলেশ গুহ নিয়োগীর 'ফাঁস'। অভিনয় বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয়। শিল্পীদের মধ্যে কল্যাণ সেন, অশোক পাল, সুভাষ চট্টো, স্বপন চট্টো, বাসু রায় ও মালা দাস দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন। নাটকটির পরিচালনায় অসীম সেন নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখেন।

নাট্য দর্শন

শ্রীমন্মথ রায়ের নতুন নাটক লালন ফকির :
রূপকারের বিশিষ্ট প্রযোজনা।

যেন একটি ছন্দোবদ্ধ গীতিকাব্য। অপরূপ কারুণ্য আর সকরুণ মাধুর্য তার অঙ্গে অঙ্গে। হৃদয়ের প্রসারিত বা অন্তর্মুখী প্রেমের স্বল্প আবেগে স্পন্দিত, মহৎ জীবনবোধের অনুরণনে অনির্বচনীয়। এমনি নাটক লালন ফকির। অনেক সার্থক নাটক লিখেছেন শ্রীমন্মথ রায়। কিন্তু এই নাটকটিতে লালন উপকরণকে অবলম্বন করে তিনি যে নতুনতর রসসৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তা আমাদের মনকে আলোড়িত করেছে।

নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার এক গ্রামে লালন ফকির নামে এক বাউল ছিলেন। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু। দীর্ঘ ১১৬ বছর তিনি বেঁচেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান শুনেছিলেন একথা আমরা জানি। তাঁর উপাধি ছিল কর। অল্প বয়সে বিবাহ করেন। বিধবা মা আর তরুণী পত্নীকে বাড়ীতে রেখে পুরী ধামে তীর্থ করতে গিয়ে পথে তাঁর বসন্ত হয় এবং তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে মৃত মনে করে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেয়। ভাসতে ভাসতে তিনি কূল পান এবং একটি নিঃসন্তান মুসলমান দম্পতির আশ্রয় লাভ করেন। মুসলমান পরিবারে লালিত হয়ে তিনি সিরাজ সাঁই নামে এক মুসলমান ফকিরের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। কিছুদিন বাদে বাড়ী ফেরেন কিন্তু তিনি মুসলমানের ঘরে ছিলেন বলে তাঁর মা ও স্ত্রী তাঁকে গ্রহণ করেন না। লালন ফিরে যান সিরাজ সাঁইএর কাছে এবং গুরুর মৃত্যুর পর নিজে একটি আখড়া স্থাপন করেন। তাঁর বহু শিষ্য হয়। নানা জায়গা ঘুরে তিনি তাঁর সাধন ভজনের প্রচার করেন।

খানিকটা কিংবদন্তী, খানিকটা জনশ্রুতির উপর নির্ভরশীল লালনের যে জীবনকাহিনী পাওয়া গেছে তারই উপর ভিত্তি করে শ্রীমন্মথ রায় এক রসসমৃদ্ধ নাটক সৃষ্টি করেছেন। এবং অনন্য মুনসিয়ানায় তার মধ্যে নাটকীয়তার সঞ্চার করেছেন মতিবিবি নামে একটি মুসলমান বিধবা তরুণীর মাধ্যমে। লালনের

প্রতি এই রমণীর আসক্তি, প্রীতি, স্নেহ আর মমতার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে চিরকালের সেই নাটক, পরকীয়া প্রেমের বিষাদ মধুর আবেদন যার উপজীব্য। লালন ফকিরকে সম্পূর্ণতা দিয়েছে, সার্থক করে তুলেছে সেই রমণী, মতিবিবি, যে না থাকলে নাটক হোতনা। অসামান্য শিল্পবোধের সঙ্গে সেই চরিত্রটিকে রূপায়িত করেছেন শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্র। মৃদু ভাষ, নিরাসক্ত সংযত আচরণ, সূক্ষ্ম হাসি, অতিপরিমিত চলাফেরা—তারই মধ্যে চরিত্রটির অন্তর্বেদনা আর ভাবাবেগের পরিপূর্ণ উদ্ঘাটন। একটা বিষয়ে আমাদের কিছু অভাব বোধ হয়েছে। সে তাঁর অতি মৃদুকণ্ঠে বলা সংলাপ যা অনেক সময়েই শ্রুতি গোচর হয়নি এবং যেজন্যে নাটকটির পূর্ণ রস গ্রহণে বাধা ঘটেছে। রবীন্দ্রসদনে ১৩ই জুলাই আমরা এই নাটকটির অভিনয় দেখে এই আলোচনা করছি। কিন্তু এই অভাবের জন্যে বা দৃশ্য পরিবর্তনে বিলম্বের জন্যে দর্শকবৃন্দ এতটুকুও অধৈর্য প্রকাশ করেননি, সারা প্রেক্ষাগৃহে সমস্তক্ষণ সূচীভেদ্য স্তব্ধতা বিরাজ করেছে।

নাম ভূমিকায় শ্রীবিভাব্রত দত্ত আকুলতার অন্তর্দ্বন্দ্বে আর মানবসমাজের প্রতি চরিত্রটির অসীম প্রীতির প্রকাশে তাঁর অভিনয়ের মধ্যে প্রত্যয় এবং নিষ্ঠার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর বাউলের গানগুলি সুগীত সুখশ্রাব্য। কিন্তু গানে যে উদ্গ্রীবতা তিনি সৃষ্টি করতে পারেন (যার প্রকৃষ্ট পরিচয় তিনি দিয়ে চলেছেন অন্য একটি থিয়েটারে অন্য একটি নাটক) তার সাড়া এ নাটকে পাইনি।

লালনের স্ত্রীর ভূমিকায় শ্রীমতী গীতা দত্ত চরিত্রটির মর্ম বেদনা এমন স্বাভাবিক সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন যে মনে হচ্ছিল না তিনি অভিনয় করছেন। চরিত্রটির সঙ্গে একাত্ম হয়েছিলেন তিনি। লালনের মায়ের চরিত্রে শ্রীমতী রেবা দেবী এবং ফতেমা রূপে শ্রীমতী কমলা বন্দ্যোপাধ্যায় যথাযথ সুষ্ঠুভাবে তাঁদের ভূমিকা দুটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

শ্রীসরাজ চক্রবর্তীর নিরাভ সাঁই, শ্রীসুধাংশু মুখোপাধ্যায়ের রাধাবাদন, শ্রীদেবব্রত দের ভৈরব ভট্টা, শ্রীঅজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহম্মদ শা, শ্রীঅমল হস্তিদারের রহিম, শ্রীদিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভুবন এবং অন্যান্য ভূমিকায় সর্বশ্রী প্রশান্ত বসু, প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়, মধু দত্ত, সলিল চক্রবর্তী, শেখর সেন, শশাংক পাল, হরেন্দ্র বিশ্বাস, প্রাণরঞ্জন ভট্টাচার্য, নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন সাহা, বিমল ঘোষ, সমীর রায় প্রমুখ সকলেই সুঅভিনয় করে সমগ্র নাটকটিকে সুখভোগ্য করে তুলেছেন।

নির্দেশনায় শ্রীদত্ত কয়েকটি উপভোগ্য নাট্য মুহূর্ত সৃষ্টি করে বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। নাটকটির পরিচালনায় তাঁর মননশীলতার ছাপ সুপরিস্ফুট।

শ্রী খালেদ চৌধুরীর মঞ্চ সজ্জা এবং শ্রীতাপস সেনের আলোক সম্পাত নাটকটির সম্পদ। আবহসঙ্গীত সম্পর্কে দুএকটা বলতে পারলে সুখী হতাম।

দৃশ্য পরিবর্তনের বিলম্বের জন্যেই হোক, বা অন্য বিষয়ে প্রস্তুতির অভাবের জন্যেই হোক, সেদিনকার অভিনয়ে নাটকটির গতি ছিল মন্থর। যাকে মাঝে বাধাপ্রাপ্ত। আশা করি পরবর্তী অভিনয়ে নাটকটি সর্বদিক দিয়ে আরও সংবদ্ধ গতিশীল এবং প্রাণবন্ত হয়ে দর্শকদের মন ভোলাবে। আধুনিকের দিনের নাট্য প্রবাহে এমন একটি খাঁটি গ্রাম বাংলার মানুষদের জীবন যাত্রা, দুঃখ-বেদনা, হিংসা-দ্বেষ, প্রেম-প্রীতির রূপায়নের মাধ্যমে একটি শাশ্বত নাট্য কাহিনী পরিবেশন করে রূপকার শিল্পী গোষ্ঠী যে ভিন্ন পথ দেখালেন তা সর্বাংশে অভিনন্দনীয়।

খেলাধূলা

জ্যোতির্ময়

বিলাতে মেয়েদের ফুটবল

সব বিষয়েই যখন মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছেন, তখন খেলাধূলাতেই বা তাঁরা পিছিয়ে থাকবেন কেন। নানা খেলায় তাঁরাও অংশগ্রহণ করছেন।

টেনিসে বরাবরই মেয়েরা খেলেন। এবং তাঁদের জন্যে নির্দিষ্ট বিভাগে তাঁরা সারা পৃথিবীতে স্বীকৃতি লাভ করেন। মেয়েদের হকি আমাদের দেশেও প্রচলিত। ক্রিকেটও তাঁরা খেলেন, তবে অল্পস্বল্প।

এবার তাঁরা ফুটবলেও নেমেছেন। ফুটবল এতকাল ছিল পুরুষদের খেলা। আর শক্ত সমর্থ পুরুষদেরই খেলা, কারণ এ খেলায় দেহের শক্তি এবং সামর্থ্যই সবচেয়ে বড় কথা।

কিন্তু বিলাতের মেয়েরা তাতেও পিছপা নয়। তাঁরা আন্দোলন শুরু করে দিলেন, মেয়েরা ফুটবল খেলবেন। তাঁদের নিজস্ব এসোসিয়েশন চাই, তাঁরা প্রতিযোগিতার প্রচলন করবেন, এক কথায় তাঁরা সংঘবদ্ধভাবে ফুটবল খেলবেন, এবং তাঁদের কর্ম প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দিতে হবে।

আন্দোলনের ফল ফললো। গত ডিসেম্বর মাসে লণ্ডনের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন পঞ্চাশ বছর আগেকার এক আইন সংশোধন করে মেয়েদের ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবার আইন পাশ করলেন।

কিন্তু তখন তাঁরা ঘোরতরি কল্পনা করতে পারেননি যে পুরুষদের বেলায় যেমন মাঝে মাঝেই শৃংখলাভঙ্গের অপরাধের জন্যে অ্যাকশন নিতে হয়, শাস্তি দিতে হয়, মেয়েদের বেলাতেও তা করতে হবে। কিন্তু দেখা গেল, সেদিক দিয়েও মেয়ে খেলোয়াড়রা পিছিয়ে নেই।

মহিলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের পাণ্ডা হচ্ছেন লণ্ডনের এক আসবাব-শিল্পী। নাম আরথার হবস্। তাঁরই চেষ্টায় ঐ সমিতি স্থাপিত হয়েছে এবং নানা প্রতিযোগিতা প্রবর্তিত হয়েছে। তাঁর এই কাজের জন্য হবস বিলক্ষণ গৌরব বোধ করেন এবং বলেন, মেয়েরা খুব ভালই ফুটবল খেলেন, তবে হ্যাঁ, তাঁদের খেলা মেয়েদের মতো। অর্থাৎ অত ধাক্কাধাক্কি লাথালাথি গায়োয়ারি নেই। ফাউল খেলা প্রায় দেখা যায়না, খেলোয়াড়ে খেলোয়াড়ে গালাগাল-মন্দ নেই, মারামারি নেই, রেফারির কাজও খুব হালকা, সহজ।

কিন্তু দিন পাল্টাচ্ছে দ্রুত। আরথার হবস বর্তমানে সচকিত। মেয়েদের ফুটবলেও এসব কী ব্যাপার ঘটছে! তাঁদের বেলাতেও ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশনের দরকার হল?

তা হল। উত্তর লণ্ডনে সম্প্রতি একটি প্রতিযোগিতামূলক খেলায় শৃংখলাভঙ্গের অপরাধ ঘটেছে এবং তার জন্যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হয়েছে।

সুটন এবং টটেনহাম হটস্পার দলের মধ্যে খেলা হচ্ছিল। সুটন ৩—২ গোলে হেরে গেল। তারপর তাঁবুর মধ্যে সাজঘরে সে কি হৈ হৈ, চুলোচুলি কাণ্ড। ঘুসি চলল, সেই সঙ্গে পাছাবাড়া পালাগাল। বেকারির নোটবই ছিন্নভিন্ন হল। একজনের নাক দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। আর একজনের গাল নখঘাঘাতে বিদীর্ণ হল। সে এক বিদঘুটে ব্যাপার!

কিন্তু এরকম অখেলোয়াড়োচিত 'অমরিশোচিত' শৃংখলাভঙ্গের অপরাধ তো বরদাস্ত করা চলে না। অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারী শ্রীমতী প্যাট গ্রেডারি দু'জন পুরুষ সহকর্মী নিয়ে এক শৃংখলাভঙ্গ-তদন্তকারক কমিটি তৈরী করলেন এবং ঘোষণা করলেন; এ বড় গুরুতর ব্যাপার!

তারপর সভা বসল। গুরু গম্ভীর অনেক আলোচনা হল। শেষ পর্যন্ত স্থির হল, যাঁরা অপরাধী বলে প্রমাণিত হবেন তাঁদের অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে। মহিলা ফুটবলের সুনামে তাঁরা কলংকের দাগ কেটেছেন।

সুটন ক্লাবের দু'জন খেলোয়াড় শ্রীমতী ক্রিস ডেবেনহাম (২৯) এবং শ্রীমতী অ্যান বেলি (১৮) তিনমাসের জন্যে আর কোন খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না বলে রায় দেওয়া হল এবং তাঁদের "গুরু অর্থদণ্ডে" দণ্ডিত করা হল। অবশ্য অর্থদণ্ডের পরিমাণ কত তা জানা গেল না। আর একজন হটস্পারের খেলোয়াড় শ্রীমতী জোয়ান উইলিয়ামস (১৭), তিনিও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হলেন এবং তাঁকে "কঠিন তিরস্কার" করা হল।

এই ব্যাপারে উভয় দলের ফুটবল ক্রীড়ামোদিনীদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেছে!

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ হকি খেলোয়াড়

কলকাতার মাঠে হকির যে মরশুম এবছরের মতো শেষ হয়েছে তাতে বাংলাদেশের প্রিয়তম ক্লাব মোহনবাগান এবার অপরাজিত থেকে লীগ জয় করেছে। এইবার নিয়ে তাঁরা এগারো বার (তার মধ্যে আটবার অপরাজিত ভাবে) লীগ জয় করবার কৃতিত্ব অর্জন করলেন। গত বছরও তাঁরা লীগ জয় করেছিলেন এবং শুধু জয়লাভই নয়, উনিশটি খেলার সব ক'টিতেই জয়লাভ করেছিলেন এবং তাঁদের বিপক্ষে উনিশটি খেলাতে একটিও গোল নেই। এ রেকর্ড এ পর্যন্ত আর কোন দলের নেই।

হকির কথায় মনে পড়ছে এই খেলার যাদুকর বিশ্ববিজয়ী খেলোয়াড় ধ্যানচাঁদের কথা। খেলার মাধ্যমে ধ্যানচাঁদ তাঁর দেশকে বিশ্বের কাছে যে মহিমা ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তা আর কেউ করেন নি। তাই ধ্যানচাঁদকে আমরা স্মরণ করি শুধু একজন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় রূপে নয়, বিদেশের কাছে দেশের গৌরববর্ধিকারী প্রতিনিধি রূপে।

এমন আদর্শনিষ্ঠ নিষ্কলুষ চরিত্রের মানুষও খুব কম দেখা যায়। মানুষ হিসেবে, খেলোয়াড় হিসেবে, দু'দিক দিয়েই তাঁর তুলনা নেই।

১৯০৫ সালের ২৯শে আগস্ট তাঁর জন্ম। ১৯২৮ সাল ভারতীয় হকির সঙ্গে জড়িত। এবং তাঁরই সময়ে ভারতের হকি পৃথিবীর শীর্ষস্থানে পৌঁছেছিল, সেই সময়কে বলা হত, ধ্যানচাঁদের যুগ, ভারতীয় হকির স্বর্ণযুগ। আর বলা হত, হকির যাদুকর—ভারতীয় ধ্যানচাঁদ।

তাঁর স্টিক চালনার কৌশলে হতভম্ব হত বিপক্ষ দলের রক্ষণভাগ। বছরের পর বছর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেও তারা তাঁকে আটকাতে পারতো না। যেন কোন যাদুমন্ত্র বলে তিনি বিপক্ষকে হতবুদ্ধি করে দিয়ে গোল করতেন।

পৃথিবীর হকির ইতিহাসে এমন গৌরবের স্বাক্ষর আজ পর্যন্ত আর কেউ রাখতে পারেন নি।

১৯২৮ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত তাঁর খেলা দেখে বিশ্বের হকি খেলার মাঠ বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিল, বিদেশের হকি খেলার মাঠে ধ্যানচাঁদের প্রসঙ্গ উঠলেই লোকে বলত, ও, সেই ভারতীয় যাদুকর, না, তাঁর সঙ্গে কোন প্রকারেই এঁটে ওঠা যাবে না।

১৯৩৬ সালে তাঁর খেলা দেখে হিটলার তাঁর দু'হাত ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বলেছিলেন, তুমি একজন বিশ্ব বিজেতা।

ধ্যানচাঁদ যে কতবড় খেলোয়াড় ছিলেন তার একটি মুখরোচক গল্প আছে।

সে-সময়ে মহম্মদ নিসার ছিলেন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ দুর্ধর্ষ ফাস্ট বোলার।

একদিন কথায় কথায় ধ্যানচাঁদ নিসারকে বললেন, তুমি অবশ্য বেশ জোরেই বল কর। কিন্তু ব্যাটসম্যানের হাতে তো ব্যাট থাকে, তবে বল কখতে পারে না কেন? ব্যাট হাতে রয়েছে অথচ বোল্ড্ আউট হয় কেমন করে?

নিসার হেসে বললেন, তুমি হকি খেলো, ক্রিকেটের মর্ম কি বুঝবে!

ধ্যানচাঁদ বললেন, এই কথা! আচ্ছা, বেশ, তুমি বল কর, আমি খেলি। আমি হকি খেলোয়াড় তাই ব্যাট না নিয়ে হকি স্টিক দিয়েই তোমার বলের মোকাবিলা করব। দেখি, কতবার তুমি আমায় বোলড আউট করতে পারো।

সকলে শুনে খুব হাসাহাসি করতে লাগল। ধ্যানচাঁদ ছাড়বার পাত্র নন। শেষ পর্যন্ত সেই খেলা হল। উইকেটের সামনে ধ্যানচাঁদ দাঁড়ালেন হকি স্টিক হাতে করে আর ওধার থেকে নিসার বল করতে লাগলেন।

প্রত্যেকটা বলই ধ্যানচাঁদ হকি স্টিক দিয়ে ঠেকাচ্ছেন। যেগুলো উইকেটের বাইরে দিয়ে যাচ্ছে, সেগুলো ছেড়ে দিচ্ছেন।

মহম্মদ নিসারের রোখ চেপে গেল। তিনি আরও জোরে আরও উইকেট লক্ষ্য করে বল দিতে লাগলেন। কিন্তু ধ্যানচাঁদ প্রত্যেকটি বল অনায়াস ভঙ্গীতে ঠেকাতে লাগলেন। অদ্ভুত আশ্চর্য ব্যাপার। এক নাগাড়ে এক ঘণ্টা বল করেও নিসার ধ্যানচাঁদকে বোলড আউট করতে পারলেন না।

বিশ্বশ্রেষ্ঠ পোলো খেলোয়াড়

জয়পুরের মহারাজা সওয়াই মান সিং সম্প্রতি বিলাতে পরলোকগমন করেছেন। জয়পুরের মহারাজা হিসাবে তিনি যত না স্মরণীয়, বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম পোলো খেলোয়াড়রূপে তিনি সারা জগতে বরণীয় ছিলেন। পোলো খেলায় ভারতের গৌরব তিনি বৃদ্ধি করেছিলেন। পোলো খেলায় তিনি ছিলেন সত্যিই এক বিস্ময়কর প্রতিভাধর খেলোয়াড়। জীবনে তিনি কখনো পোলো খেলায় হারেননি। তাঁর বল ছিল বিশ্ব-বিজয়ী। আর এই পোলো খেলার মধ্যেই বিলাতের একটি কাউন্টি প্রতিযোগিতায় খেলতে খেলতেই তিনি ঘোড়া থেকে পড়ে যান এবং তার ফলেই তাঁর জীবনান্ত হয়।

১৯৩১ সালে তিনি জয়পুরের শাসনভার গ্রহণ করেন। ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন সুদক্ষ ঘোড়-সওয়ার। মহারাজা হবার পর তিনি তাঁর বিশ্ববিজয়ী দল গঠন করে ব্রিটেন এবং আমেরিকার সমস্ত বড় বড় দলকে হারিয়ে দিয়ে এলেন। পোলো খেলার জন্যে তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন। তিনি যখন ইংলণ্ডে তাঁর দল নিয়ে খেলতে যেতেন তখন তাঁর ও তাঁর দলের খেলা দেখবার জন্যে মাঠে লোক ভেঙে পড়ত। দেশ ও বিদেশ থেকে তাঁর দল কত যে ট্রফি, কত যে স্বর্ণ রৌপ্য পদক পেয়েছে তার সংখ্যা নেই।

১৯৫৭ সালে মহারাজা এক বিমান দুর্ঘটনায় আহত হন এবং তাঁর একটি পা ভেঙে যায়। তিনি যে আর কোনদিন ঘোড়ায় চড়ে পোলো খেলতে পারবেন তা কেউ ভাবতে পারেনি। কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার তাঁকে পোলো খেলার মাঠে দেখা গেল, আগের মতো অতুলনীয় ভঙ্গীতে আর নৈপুণ্যের সঙ্গে খেলছেন।

মহারাজা মানসিং বাংলাদেশের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। কোচবিহারের পরলোকগত মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের কন্যা (সম্প্রতি পরলোকগত মহারাজা জগদীপেন্দ্র নারায়ণের ভগ্নী) শ্রীমতী গায়ত্রী দেবী এম, পি তাঁর সহধর্মিণী। তাই কলকাতার প্রতি মহারাজার একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল এবং প্রতি বছরই শীতকালে তিনি এখানে পোলো খেলতে আসতেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল উনষাট। খুব সুস্থ সবল কর্মঠ প্রাণোচ্ছল পুরুষ ছিলেন তিনি।

পোলো ছিলো তাঁর ধ্যান জ্ঞান মন প্রাণ। তিনি সেই খেলার মাঠেই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ থেকে চিরবিদায় নিলেন।

২৪শে জুন ইংলণ্ডের চৌরেন চেস্টারের পোলো খেলার মাঠে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে তিনি জ্ঞান হারান। সে জ্ঞান আর ফিরে আসেনি।

তাঁর মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করে বিদেশের সব পত্রিকায় তাঁর ক্রীড়াকৃতির বিশদ এবং উচ্ছসিত প্রশংসামুখর আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল।

বিশ্বের ক্রীড়াজগতে জয়পুরের মহারাজা মান সিং চিরকালের জন্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

সাজানো বিচার

ভবানী মুখোপাধ্যায়

॥ এক ॥

৫ই আগস্ট ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ তারিখটি বাঙালীর কাছে স্মরণীয়। এই দিনটিতে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব নাজিমের প্রধান অমাত্য মহারাজ নন্দকুমারকে অন্যায় বিচারে আসামী সাব্যস্ত করে ফাঁসি দেওয়া হয়। নন্দকুমারের ফাঁসীর ঘটনা অনেকেরই হয়ত জানা। কিন্তু নন্দকুমার এমনই একটি বিষয়বস্তু যা কোনোদিন পুরাতন হয় না।

কিছুদিন আগে তর্ক-বিতর্ক চলছিল যে ঠিক কোন জায়গাটিতে ফাঁসী দেওয়া হয়। পাদ্রী লঙ সাহেবের কাছে যাওয়া গেল অনেক দিক থেকে, তিনিই একটি জায়গা চিহ্নিত করেছেন নন্দকুমারের ফাঁসী-ক্ষেত্র বলে। মিদিরপুর ব্রীজ থেকে উত্তর দিকে নেমেই বাঁ হাতে কুলীবাজারের পথের একটি জায়গাকে পি. ডব্লু. ডি. বাগান দিয়ে ঘিরেছেন। এই গোলাকার বাগানের ভিতর আছে একটি বৃহৎ কূপ। তার ভিতর কিছু পরিত্যক্ত যন্ত্রপাতি। মনে হয়, জোয়ার-ভাঁটার সময় ময়দান অঞ্চলে জল ঢোকার জন্য একটা স্লুইস গেট ছিল এটি তার ভগ্নাবশেষ।

এই জায়গাটি অতিক্রম করার সময় অনেক বৃদ্ধ প্রণতি জানান, কার উদ্দেশ্যে কে জানে। যুক্তকরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন কেউ কেউ।

কাপ্তেন কাউয়ে টোচেটস্ কমিটির কাছে সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে বলেন যে তিনি ফোর্ট উইলিয়মের এক প্রাচীর গাত্র থেকে প্রায় মাইল খানেক দূরে প্রায় সাত-আট হাজার মানুষের ভীড় দেখেছিলেন। সহসা নবাবী আতঙ্কে চীৎকার করে উঠে ছুটতে থাকেন এবং কেউ কেউ গঙ্গায় অবগাহন করে পাপমুক্ত হন। প্রকাশ্যভাবে নন্দকুমারকে ফাঁসী দেওয়া হয়, হয়ত সাধারণের মনে আতংক সৃষ্টি করাই ছিল এই বর্বরতার উদ্দেশ্য।

ডাঃ বাসটিভের "একোস ফ্রম ওল্ড ক্যালকাটা" নামক গ্রন্থে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। বেভারিজ সাহেব তাঁর "ট্রায়াল অব নন্দকুমার" নামক গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বলেছেন—

(১) নন্দকুমার যে জাল করেছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

(২) হেষ্টিংস কর্তৃক আনীত এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।

(৩) ইম্পের প্রদত্ত ফাঁসীর আদেশের পিছনে একটা অসৎ উদ্দেশ্য ছিল।

মৃত্যুকালে নন্দকুমার যে দৃঢ়তা এবং তেজস্বীতার পরিচয় দেন তা তুলনাহীন। যে সেকালে বাঙালীর নিন্দায় পঞ্চমুখ তিনিও নন্দকুমারকে গ্রীক বীর মুসিয়স এবং ইংলণ্ডের বিপাব্লিকান পার্টির নেতা আলগারনান সিডনির সমতুল বলে স্বীকার করেছেন।

॥ দুই ॥

বিচারের মাঝে যে তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার কিছু বিবরণ এই কাহিনীর বিষয়বস্তু। যে বছর আগস্ট মাসে নন্দকুমারের ফাঁসী হয় সেই বছর এপ্রিল মাসের উনিশ তারিখে সুপ্রিম কোর্টের চারজন বিচারক ইলাইজা ইম্পে, বগাট চেম্বার্স, এল, পি, লিমেইস্টার ও জন চাইল্ড মহামান্য ওয়ারেন হেস্টিংসকে একটি চিঠি পাঠিয়ে জানালেন যে জোসেফ কাউক, ফ্রান্সিস কাউক, মহারাজ নন্দকুমার এবং রাধাচরণ রায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে যে তাঁরা আপনার এবং আরো অনেকজনের বিরুদ্ধে সড়যন্ত্র করার চেষ্টা করছেন আগামী কাল সকালে হপটায় সার ইলাইজা ইম্পের বাড়ি আসামী হিসাবে তাদের হাজির হতে তলব করা হয়েছে, আপনিও সেইখানে উপস্থিত থাকবেন।

পরদিন ২০শে এপ্রিল ইলাইজা ইম্পের বাড়িতে লোক আর ধরে না। হেস্টিংস এলেন হপটার কিছু আগেই। তাঁর সঙ্গে বারওয়েল, ডামবিটার্ট, রাজা রাজবল্লভ, কান্ত সোনার (মুন্সী) সঙ্গে নিয়ে এলেন দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিং ও কায়ালউদ্দীন আলি খানকে।

বিচারকদের সামনে মহারাজ নন্দকুমার, জোসেফ কাউক, তাঁর পুত্র ফ্রান্সিস ও মহারাজের জামাতা রাধাচরণ রায় বাহাদুরকে আসামীর উর্দি পরিয়ে দাঁড় করান হল।

কায়ালউদ্দীন খানই প্রধান সাক্ষী। সে একেবারে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সবাইকে সেলাম জানিয়ে বিনয়ে বিগলিত হয়ে বলল—হুজুর, আমি হিজলী পরগণার নিমক মহলের সরকারি ইজারাদার। নবাবের আদায় বাকন হিসাবে যে টাকা থেকে আমি যে টাকা দিয়েছি সেই টাকা থেকে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিং ছাব্বিশ হাজার টাকা তছরুপ করেছেন। আমি মহারাজ নন্দকুমারকে এই টাকা আদায় করে দিলে ছ হাজার টাকা বকশিস দেব বলেছিলাম। তাঁর কাছে আমি দরখাস্ত রেখে এলাম। তারপর মুন্সী সদরউদ্দীন আমাকে বললেন—অত হাঙ্গামে কাজ কি। আমি গঙ্গাগোবিন্দের কাছ থেকে আপোষে টাকা আদায় করে দেব।

আমি তখন মহারাজের কাছে গিয়ে বললাম—আর কাজ নেই, দরখাস্ত ফেরৎ দিন।

মহারাজ বললেন—তা আর হয় না। তুমি বরং আমার জামাই রাধাচরণের সঙ্গে কাউক সাহেবের কাছে যাও।

কি আর করি হুজুর, গেলাম কাউকের কাছে। কাউক আমাকে প্রাণের ভয় দেখিয়ে হেস্টিংসের বিরুদ্ধে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ জানিয়ে দরখাস্ত করতে বললেন। তারপর আমি ভয়ে ভয়ে নিজের হাতে হেস্টিংস আর বারওয়েল সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ লিখে, আমার নামের মোহর দিলাম।

ইলাইজা ইম্পে প্রশ্ন করলেন—দরখাস্তটা নিজের হাতে লিখলে কেন?

কায়ালউদ্দীন কাঁদো কাঁদো হয়ে জবাব দেয়—কি করি হুজুর প্রাণের ভয়। তখন আমাকে সাদা কিছুটা লিখতে বললেও লিখে দিই, এমনই মনের অবস্থা।

ইলাইজা ইম্পে—আচ্ছা সে কথা। তোমার যা বলার আছে বলে যাও।

কায়ালউদ্দীন কপট কান্নার ভাব করে বলে—হুজুর আমি দিনের মধ্যে পাঁচবার নামাজ করি, মিছা কথা আমার কাছে হারাম। আমি দরখাস্ত পরদিন ফেরৎ চাইতে কাউক সাহেব আমাকে ডেকে এলেন, তবে তাঁর বাটলার ছোট কাউক বললেন—কাল মহারাজ আসবেন, তুমি বরং কাল এস।

কামালউদ্দীন একটু থেমে আবার বলে—কি আর করি হুজুর চলে এলাম। পরদিন আবার গেলাম। দেখি মহারাজ আর ফাউক দুজনে ফিস-ফিস করে পরামর্শ করছে। আমাকে হেষ্টিংস ও বারওয়েল সাহেবের বিরুদ্ধে আবার দরখাস্ত দিতে বলল। আমি আর কথাটি না বলে পালকীতে ফিরে এসে বললাম—জোরে জোরে পা চালিয়ে চল।

বিচারে রায় বেরোল যে ফাউকের পুত্রের বিরুদ্ধে কোনো মামলা নেই তবে হেষ্টিংস সাহেব নন্দকুমার, রাধাচরণ এবং ফাউকের বিরুদ্ধে মামলা চালাতে হলে তিন দিনের মধ্যে আদালতে তা জানিয়ে যাবেন। সেদিনকার মত আদালত ভেঙে গেল।

হেষ্টিংস চক্রান্ত করার জন্য তাঁর দলবলসহ বেরিয়ে গিয়ে প্রকাণ্ড সরকারি ফুড়িতে গিয়ে উঠলেন আর নন্দকুমার চিন্তাকুল দৃষ্টিতে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। বিচারের এই দৃষ্টান্ত দেখে তিনি স্তম্ভিত।

॥ তিন ॥

হেষ্টিংস, বারওয়েল, ফ্রান্স গোদার এবং গঙ্গাগোবিন্দ পরামর্শ আঁটতে লাগলেন কি করা যায়, ওদিকে নন্দকুমারও হেষ্টিংসের নানাবিধ দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিচার প্রার্থনা করবেন স্থির করলেন।

হঠাৎ ৬ই মে সুপ্রীম কোর্ট থেকে আদেশ দেওয়া হল নন্দকুমারকে গ্রেপ্তার করে জামাকৃদ্ধ করার। নন্দকুমারের শত্রু ছিলেন মোহনপ্রসাদ, এই গ্রেপ্তারের পিছনে ছিল মোহনপ্রসাদের নালিশ। নন্দকুমারকে জামীন দেওয়া হয়নি। তিনি কারাবাসে জলগ্রহণ করেন নি, অবশেষে তাঁকে তাঁবুতে রাখা হয়, তিনি সামান্য মিষ্টান্ন খেয়ে কারাগারে দিন কাটান।

মোহনপ্রসাদের এজেহারটি ভারী চটকদার কিন্তু সুদীর্ঘ। তার সারমর্ম এই যে বোলাকি দাসের বিরুদ্ধে তিনি ৪৮,০২১ টাকার তমসুক জাল করেছেন।

আবার হাজির হলেন সেই কামালউদ্দীন খান, সেই প্রধান সাক্ষী। সে বলে আমার সই জাল করা হয়েছে। তমসুকের সাক্ষীর নাম ছিল আবদু কামালউদ্দীন। কামালউদ্দীন খান বলল—সে এখন একটু লায়েক হয়েছে তাই নামের পিছনে আলি জুড়ে দিয়েছে, নইলে আবদু কামালউদ্দীন তারই নাম।

মহারাজ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ জাল দলিল বানানো। সেই সঙ্গে জাল দলিল আসল হিসাবে ব্যবহার করা, জাল দলিল স্পর্শ করা ইত্যাদি বিশ রকম অভিযোগ।

এইসব অভিযোগ পড়ে শোনানো হলে প্রশ্ন করা হল—তুমি কার কাছে বিচার চাও?

নন্দকুমার বললেন—স্বয়ং ঈশ্বর আমার বিচার করবেন। আমার সমশ্রেণীর মানুষ আমার বিচার করবেন।

দেখা গেল সব ইংরেজ জুরী। নন্দকুমারের পক্ষের নবীন ব্যারিষ্টার মিঃ ফারার আপত্তি করলেন, কিন্তু ইম্পে বললেন—এঁরা সবাই কলকাতাবাসী অর্থাৎ নন্দকুমারের স্বদেশবাসী।

মোহনপ্রসাদ তার এজেহারে যা বলেছিল সেই কথাই আবার বলল। আর প্রধান সাক্ষী কামালউদ্দীন যা বলল তা আরো চমৎকার,—সে বলল—হুজুর আমি মীরজাফরের আমলে মুর্শিদাবাদ জেলে কয়েদ ছিলাম। তখন এই নন্দকুমার ছিলেন তাঁর দেওয়ান। আমি দরখাস্ত পাঠাই, নন্দকুমার বললেন আমার নামের মোহরাঙ্কিত করে দরখাস্ত দিতে। আমি নামের মোহরটা পাঠিয়ে দিলাম। সেই থেকে আজ এই চোদ্দ বছর সেই মোহর নন্দকুমারের কাছেই রয়ে গেছে।

যে জমসুক জাল হয়েছে সেটি দেখালে কামালউদ্দীন বলল—এই জমসুক জাল বটে, তবে এই মোহর আমারই, আমি যে চোদ্দবছর আগে নন্দকুমারকে মোহর দিয়েছিলাম তার সাক্ষী আমার চাকর হুসেন আলি।

ইম্পে—তুমি বলছ এই মোহর তোমার? তা তোমার নাম কামালউদ্দীন আলিখাঁ আর মোহর হচ্ছে আবদু কামালউদ্দীনের নামে কেন?

কামালউদ্দীন—হুজুর! আমি মিথ্যা বলিনা। আমি পাঁচ বার নামাজ পড়ি। আমি আগে ঐ রকমই লিখতাম। এখন আমি বড় লোক হয়েছি, বড়লোক হলে নামের পাছে আমরা মুসলমানরা 'আলি' ও 'খাঁ' এই সব বসিয়ে থাকি। ওতে মর্যাদা বাড়ে।

জজ হাইড—এই জমসুকে যে তোমার নামের মোহর ব্যবহার করা হয়েছে কি করে জানলে? তুমি যে সাক্ষী দিলাবে আছো তাই বা কি করে জানলে?

কামালউদ্দীন—হুজুর আমি পাঁচবার নামাজ পড়ি, মিথ্যা বলব না। মহারাজ নিজেই আমাকে বলেছিলেন যে সাক্ষী দিলাবে আমার নাম দিয়েছেন আরও বলেন এই জমসুক প্রমাণের জন্য তোমাকে সাক্ষ্য দিতে হবে। কিন্তু আমি বললাম ওরে বাপরে! মিথ্যে সাক্ষী আমি দিতে পারব না। গুনাহ হবে।

জেরা সওয়াল—মোহনপ্রসাদ তোমাকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য কত টাকা দিয়েছে?

কামালউদ্দীন—ইয়ে আল্লা। এ কি কথা। আমি কখনও কি ঘুষ নিতে পারি, হুজুর!

তৃতীয় সাক্ষী হুসেন আলি কামালউদ্দীনের চাকর সে বলল যে খলে করে কামালউদ্দীন চোদ্দ বছর পূর্বে মোহর পাঠিয়েছিলেন সেই খলেটি আমিই সেলাই করেছি। তখন আমি জেনেছিলাম এই মোহর নন্দকুমারের কাছে পাঠানো হচ্ছে।

চতুর্থ সাক্ষী একজন আর্মানি সাহেব তার নাম খাজে পোগটেজ। সে শপথ নিয়ে বলল—আমার নাম খাজে পোগটেজ, জাতিতে আর্মেনিয়ান। হিন্দি পারসী দুটি ভাষাই আমি জানি। কামালউদ্দীনকে আমি জানি। চার বছর আগে সে আমাকে বলে যে তার নামের মোহর নন্দকুমারের কাছে আছে।

পাঁচ নম্বর সাক্ষী হল মুনসী সদরউদ্দীন। সে আদালতে নত হয়ে সেলাম জানিয়ে বলল—হুজুর কিছুকালপূর্বে কামালউদ্দীন আমাকে বলে যে মহারাজ নন্দকুমার একটা জাল জমসুকে তার মোহর দিয়েছেন এবং সেই জাল জমসুককে আসল বলে চালানোর উদ্দেশ্যে তাকে সাক্ষী দিতে অনুরোধ করেন। এ সব শুনে আমি জানতে চাইলাম—বেশ ত! তোমার নামের মোহর মহারাজ কি করে পেলেন? সে বলল—চোদ্দ-পনের বছর আগে নবাব মীরজাফরের কাছে একটি দরখাস্ত পাঠাই, সেই দরখাস্তে ছাপ দেওয়ার জন্য মহারাজের কাছে আমি নামের মোহর পাঠাই। সেটি সেই অবধি তাঁর কাছেই ছিল। মহারাজ মোহর ফেরৎ দেননি।

ষষ্ঠ সাক্ষী ছিলেন রাজা নবকৃষ্ণ। জমসুকে যে তিনজন সাক্ষীর নাম ছিল তাদের মধ্যে আবদু কামালউদ্দীন, শীলাবৎ এবং মাধব রায় ঘটনার কিছুকাল আগে মারা যান। রাজা নবকৃষ্ণ, (তখন তিনি নবকৃষ্ণ মুনসী) শীলাবৎ-এর হাতের লেখার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তাই তাঁর সাক্ষ্য প্রয়োজন।

নবকৃষ্ণ বললেন—আমার নাম নবকৃষ্ণ দেব। আমি লর্ড ক্লাইভের মুনসী ছিলাম। এই যে শীলাবৎ সে

ছিল বুলাকীদাসের উকীল, তার হাতের লেখা আমি জানি। শীলাবৎ বুলাকীদাসের তরফে ক্লাইভের কাছে মাঝে মাঝে চিঠিপত্র পাঠাতেন তাই তার হাতের লেখা আমার পরিচিত।

মোহনপ্রসাদের সেই তমস্থকখানি নবকৃষ্ণের হাতে দেওয়া হল তারপর বিচারকগণ প্রশ্ন করলেন—এই যে শীলাবৎ সিং-এর হস্তখত তা ঠিক কি ?

নবকৃষ্ণ বল্‌লেন—আমি কিছু বলতে পারব না। আমি জাতিতে কায়স্থ। আসামী ব্রাহ্মণ। এই তমস্থক জাল প্রমাণিত হলে আসামীর ফাঁসী হবে। আমার পাপ হবে।

ইম্পে বল্‌লেন—তুমি শপথ নিয়েছ। তোমাকে সত্য কথা বলতে হবে। তুমি বল এই সইটা শীলাবৎ সিং-এর হাতের লেখা কিনা।

রাজা নবকৃষ্ণ—এ বড়ই ভীষণ ব্যাপার। ব্রাহ্মণের প্রাণ সংশয়। আমাকে হুজুর মাপ করুন।

ইম্পে—এই হস্তখত শীলাবতের কিনা, ঠিক করে বলো !

নবকৃষ্ণ—না হুজুর, তাঁর হাতের লেখা এতটা পরিষ্কার ছিল না।

আর সব সাক্ষীকে জেরা করা হলেও নবকৃষ্ণকে জেরা করা হল না। ফারার সাহেবকে নন্দকুমারের মোক্তার চৈতন্যনাথ বার বার বলতে লাগ্‌ল—সাহেব প্রশ্ন করুন উনি ক'দিন কায়স্থ হয়েছেন ?

ফারার তা করলেন না। নবকৃষ্ণ এবং নন্দকুমারের মধ্যে শত্রুতা ছিল অনেক দিনের। এই সুবর্ণ সুযোগ নন্দকুমারকে শেষ করার।

সব সাক্ষী নেওয়া শেষ হলে দেখা গেল কিছুতেই অপরাধ প্রমাণিত হয় না। মোহনপ্রসাদকে প্রায় ন' বার সাক্ষীর কাঠ গড়ায় আসতে হল। কিন্তু পদ্মমোহন হাস যে এই তমস্থকখানি আসল বলে গ্রহণ করেছে তা কিছুতেই নস্যাৎ করা গেল না।

বুলাকীদাসের প্রধান আমলা কৃষ্ণজীবন হাসকে বার বার কাঠগড়ায় আনা হল। কিন্তু কৃষ্ণজীবন বলে বসল পদ্মমোহন হাসের হাতের লেখা একরারনামায় বুলাকীদাস নিজের হাতে হস্তখত করে ছিল। সেই একরারনামা মোহনপ্রসাদ মামলার চার বছর আগে দেখেছেন এই একরারনামায় লেখা আছে যে বুলাকিদাস ৬৮,০২১ টাকার দায়ে মহারাজ নন্দকুমারকে ১৭৬৫ সনে এক তমস্থক দিয়েছেন।

কৃষ্ণজীবনের এই সাক্ষ্য শুনে সবাই স্তম্ভিত। ইলাইজা ইম্পে ছাড়বার পাত্র নয়। তিনি বল্‌লেন—কৃষ্ণজীবন আগাগোড়া সত্য সাক্ষ্য দিয়েছে, কিন্তু আজ তাঁর গলার স্বর কেমন যেন স্বাভাবিক নয়, অতএব সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছে।

ফলে আবার নতুন সাক্ষী যোগাড়ের চেষ্টা চল্‌ল। পরবর্তী অধ্যায় আরো চমকপ্রদ, কি ভাবে নতুন চক্রান্ত করে মামলা সাজানো হয়েছিল সেই কাহিনী আগামীবারে পরিবেশিত হবে।

———

আমাদের ঘরের আশে-পাশে এবং দূরে পৃথিবীর নানাস্থানে এমন সব ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছে যা উপন্যাসের বৈচিত্র্যকেও হার মানায়। তাদের মধ্যে আছে, হিংসা, পাশবিকতা, ক্রূরতা, ছলনা, আবার মানবিক আবেদন, জীবনের মহত্তম প্রকাশ। সেই সঙ্গে কৌতুকপ্রদ কাহিনীরও অভাব নেই। খবরের অন্তরালে যে কাহিনী তা আমাদেরই জীবনের প্রতিক্রিয়া, তাই তাদের প্রতি পাঠকদের স্বাভাবিক আকর্ষণ। আমরা এই বিভাগে দেশ-বিদেশের তথ্যনির্ভর সত্যঘটনার বিবরণ তুলে দেব, যা আপাতকরি পাঠকদের আনন্দ দেবে।

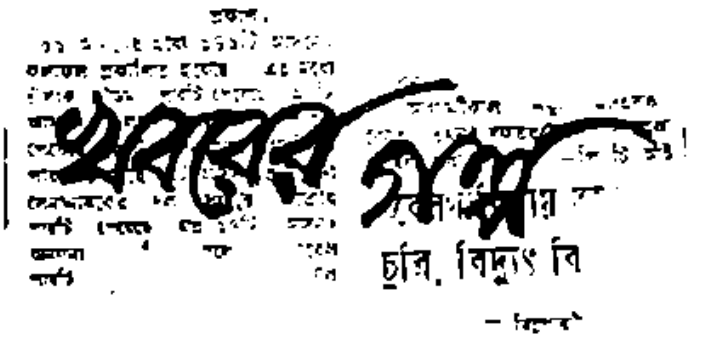

—ডাক হরকরা

"এমন শহর কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
অমানুষের রাজত্ব এই প্রেতের লীলাভূমি।"

এই হল কলকাতার উপর পদ্য লেখা হয়েছে আমেরিকার "শান্" নামক পত্রিকায়। দীর্ঘ কবিতা, তাতে কত খবর, কত ইচ্ছা। তারই দুটি মোক্ষম লাইনের ভাবানুবাদ উপরে দেওয়া হল।

বিদেশের পত্র পত্রিকায় "কলকাতার হালচাল" এখন বড় খবর! মওকা পেলে কেউ কি ছাড়ে। ওরাও তাই মনের আনন্দে লিখছে!

জার্মানীর হামবুর্গ শহর থেকে প্রকাশিত "ভেল্ট অ্যাম সোনটাগ" একটি বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক। তাতে পশ্চিম বাংলা, বিশেষ করে কলকাতা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছে, তার শিরোনামা হচ্ছে—"বাংলায় বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে।" সেই লেখায় কলাও করে যে ছবি আঁকা হয়েছে তার চেহারা সত্য মিথ্যায় জড়িয়ে এই রকম দাঁড়ায়:

১। প্রথমেই লেনিনের এক উদ্ধৃতি—"বিশ্ব-বিপ্লবের পথ কলকাতার উপর দিয়েই রচিত হবে।"

২। পৃথিবীর মধ্যে কলকাতা হচ্ছে ঘন বসতির রেকর্ড-সৃষ্টিকারী শহর।

৩। এই শহরে এখন সেনাবাহিনী অষ্টপ্রহর টহল দিচ্ছে। সন্ধ্যার পর থেকেই শহরের সর্বত্র বোমাবাজী শুরু হয়ে যাচ্ছে। রাত্রে শহরে লোক চলাচল নেই। যেন প্রেতপুরী।

৪। কলকাতায় এখন সন্ত্রাসবাদের রাজত্ব। সন্ধ্যার পর সশস্ত্র পুলিশ পাহারা ছাড়া ট্যাক্সি চলে না। কোন দেশীয় লোককে ড্রাইভাররা ট্যাক্সিতে নেয় না। বিদেশীরা ট্যাক্সি পায় বটে কিন্তু তাদের গলাকাটা ভাড়া দিতে হয়।

৫। সারা শহর যেন বোমাবারুদের কারখানা। শহরের পথে পথে যে সমস্ত হাজার হাজার দোকান সস্তা দামের জিনিষ বিক্রি করত তারা এখন বোমা তৈরীর কাজে লেগেছে। এক একটি বোমার দাম ওজন হিসেবে দু'টাকা থেকে পাঁচ টাকা। অ্যাসিড বারুদ খুব সস্তা।

৬। কংগ্রেস রাজত্বে বাইশ বছরে সরকারী বদান্যতায় খৃষ্টিমের ধনীরা আরও ধনী হয়েছে এবং কোটি কোটি দরিদ্ররা আরও দরিদ্র হয়েছে। কলকাতা উন্নয়নের জন্যে বরাদ্দ অর্থ শিল্পপতিরা আত্মসাৎ করেছে।

৭। কলকাতা শহরে নারীজাতির মর্যাদা নেই। পথে বেরুলেই তাঁদের উপর আক্রমণ হচ্ছে। শহরের পুরুষরা নারীদের মান ইজ্জত রক্ষা করতে পারছে না। তাই আজকাল শহরে নারীদের চলাফেরা নেই বললেই হয়। থিয়েটার সিনেমায় রাত্রের শো-তে লোক হয় না।

৮। শহরের খেলার মাঠে প্রত্যহ হাঙ্গা হচ্ছে। গলি-ঘুপচিতে বিভিন্ন দলের মধ্যে লড়াই নিত্যকার ঘটনা। অনেক মানুষের তাতে প্রত্যহ প্রাণহানি ঘটছে।

৯। শহরের অনেক ট্রাম আর বাস পোড়ানো হয়েছে। ফলে ট্রাম বাসের সংখ্যা কমে গেছে এবং সেজন্যে প্রতি ট্রাম বা বাস-স্টপেজে অসংখ্য লোক ট্রাম-বাসে ওঠবার জন্যে মারামারি করছে।

১০। বিভিন্ন দলের মধ্যে সংঘর্ষে প্রতিদিন শহরে এবং মফঃস্বলের নানা অঞ্চলে বহু মানুষ খুন হচ্ছে। রাজ্যপাল অনেকগুলি পরামর্শদাতা নিয়ে রাষ্ট্রপতির শাসন চালাচ্ছেন। কিন্তু পশ্চিম বাংলায় এখন পূর্ণ অরাজকতা বিরাজ করছে।

বিদেশী সংবাদ-পত্রের এই বর্ণনা পড়ে গল্প-ভারতীর পাঠক-পাঠিকার মনে কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল তা জানতে ইচ্ছে করে।

• • • •

শহরের পুরনো অভিজাত পল্লীতে শিল্পপতি মিঃ বরাটের বাড়ীতে জন্মদিনের উৎসব। এ-উৎসব একটু অন্য ধরণের। অর্থাৎ যে ককটেল-পার্টির আয়োজন হয়েছে তাতে নিমন্ত্রিতের সংখ্যা মাত্র একশো জন। ব্যবসা জগতের একশো জন ডি. আই. পি। একশোটা মোটর এসে লেগেছে মিঃ বরাটের বাড়ীর দরজায়। সেই একশো জনের পানাহারের যে আয়োজন হয়েছে তাতে সাধারণ কোন উচ্চমধ্যবিত্তের বিবাহ-উৎসবে হাজার লোক খাওয়ানো যায়। ফোয়ারায় ফোয়ারায় পানীয় সরবরাহ হচ্ছে। অতিথিরা সকলেই উৎফুল্ল। কিছুক্ষণ পরে অতিথিদের মধ্যে একজন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তাহলে আজ যার জন্যে এখানে সমবেত হয়েছি, যার জন্মদিন, তাকে আনা হোক, তাকে দেখি, অভিনন্দন জানাই। ঘাড় নেড়ে মিঃ বরাট বললেন, নিশ্চয়। এখনি। এই বলে তিনি দরজায় দণ্ডায়মান প্রধান পরিচারককে ইশারা করলেন। পরিচারক চলে গেল। তারপর একজন সুসজ্জিত পরিচারকের সঙ্গে ঘরে ঢুকলো মিঃ বরাটের প্রিয় অ্যালসেসিয়ান লোটন। তারই জন্মদিনের উৎসব। লোটনের বলিষ্ঠ কমনীয় কান্তি দেখে অতিথিরা মোহিত হলেন। করতালি ধ্বনি করে তাকে অভিনন্দন জানালেন। এমন সময় অভিনন্দন লোটনের বোধহয় পছন্দ হল না। সে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘর থেকে চলে যেতে চাইল। তাড়াতাড়ি চিত্তে মিঃ বরাট লোটনের বংশ পরিচয় জানালেন তার পিতামহ পিতামহী বাবা এবং মা, এই বাড়িতেই মানুষ। তার বাবা মা সম্প্রতি গত হয়েছে। লোটন আজ দু'বছরে পড়ল। তাঁর ভাষণ শুনে অতিথিরা আর এক দফা হাততালি দিলেন।

খবরটি পড়ে পাঠক আশ্চর্য হবেন না। আমাদের এই শহরে অতীত যুগে বড়মানুষদের মধ্যে অনেকেরই প্রবল পশুপ্রীতি ছিল। আমাদের এই পল্লীর কাছাকাছি ছিলেন, আইন ব্যবসায়ী বিখ্যাত ঘর

পরিবার! মেয়ের বা ছেলের জন্যে এক কপর্দকও বোধ হয় তাঁরা কোনদিন অপব্যয় করেন নি, কিন্তু তাঁদের পাঁচ ছ'টি কুকুরের জন্যে মাসিক ব্যয় ছিল, হাজার দু'হাজার টাকা! তাদের জন্যে নিযুক্ত ছিল, দু'জন ডুরিয়া, একজন মার্স, একজন মেথর, একজন ভেটারনারী সার্জন। গ্রীষ্মকালে তারা দার্জিলিঙে গিয়ে থাকতো।

মোহনবাগানের স্বনামখ্যাত ধনকুবের কীর্তি মিত্রের ছেলে প্রিয় মিত্তির তাঁর স্ত্রীর পোষা বিড়ালের বিবাহে লাখ টাকা খরচ করেছিলেন। তিন দিন ধরে খানাপিনা চলেছিল। তিনদিন ধরে তাঁর বাড়ির সামনে থেকে ভিখারীদের তাড়াবার জন্যে আর তখন দশটি সেপাই বীরদর্পে তাদের কর্তব্য সমাধা করেছিল। এসব প্রায় একশো বছর আগেকার কথা।

সেই "মহান ঐতিহ্যের" উত্তরসাধকরূপে মিঃ বরাটের মতো মানুষ যে আজো বাঙালী সমাজে আছেন এ আমাদের বহু ভাগ্যের ও গর্বের বিষয়, সন্দেহ নেই।

• • • •

গত সংখ্যায় যে পিশাচ-সিদ্ধ 'গুরু' চার্লস ম্যানসনের কীর্তিকলাপের কথা জানিয়েছিলাম আমেরিকার লস এনজেলস্-এর আদালতে তার বিচার শুরু হয়েছে। দুই মেয়েদের মধ্যে লিনডা কাসাবিয়ান রাষ্ট্রের তরফে সাক্ষ্য দান কালে কাঁদতে কাঁদতে বলছে, সে নিজের চোখে দু'জনকে খুন হোতে দেখেছে, এবং অন্য নিহতদের আর্তনাদ শুনছে। সে তার দুই সঙ্গিনীকে অনুনয় করেছিল, এই রক্তস্নান থামাও। কিন্তু তারা তার কথায় কর্ণপাত করেনি। সাক্ষী বলে যে, গুরু ম্যানসন ওয়াটসন এবং আর দু'জন মেয়েকে শারন টেটকে খুন করবার জন্যে তার বাড়ি পাঠান। শারন টেট সে সময় গর্ভবতী ছিল! তারপর কাসাবিয়ান বলে, সে রাত্রে কয়েকজন ম্যানসনের বাড়ি নিমন্ত্রণে এসেছিল। তাদের মধ্যে ছিল আঠারো বছর বয়সের সিটভেন পেরেন্ট। সে যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল তখন ওয়াটসন তাকে গুলি করে হত্যা করে এবং তারপর বাইত্রিশ বছর বয়স্ক পোলাণ্ডনিবাসী উজেইচ ক্রাইকোসকি নামক অতিথিকে প্রথমে ছুরি মেরে তারপর বারংবার তার মাথায় লোহার রড-এর বাড়ি বসিয়ে তাকে খুন করে।

পৈশাচিকতার দিক থেকে এমন দৃষ্টান্ত সহজে পাওয়া যাবে না। বিচার চলছে।

• • • •

ঐতিহ্যময়ী ইংলণ্ডের রঙ্গমঞ্চেও যৌনবিকৃতির কাণ্ডকারখানা আর যৌনলীলা যে কী অবলীলাভাবে অনুপ্রবেশ করেছে তার এক প্রামাণ্য কাহিনী সম্প্রতি পরিবেশন করেছেন স্টেটসম্যানের 'লণ্ডনের চিঠির' লেখক জেমস কাউলে।

লণ্ডনের রাউণ্ড হাউস থিয়েটারে একটি নাটক অভিনীত হচ্ছে, তার নাম Oh! Calcutta। নাটকটি এমনই জনপ্রিয় হয়েছে যে দু'মাস আগেও তার টিকিট পাওয়া যাচ্ছেনা। এই নাটক দেখে সেখানকার নাট্য-সমালোচকরা বলেছেন যে, হ্যাঁ, এটি রীতিমতো অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ, তবে এই নাটক দেখে কারুর চরিত্র নষ্ট হবার সম্ভাবনা নেই। এর পরিচালক বলেছেন নগ্নতার প্রতি মানুষের সহজাত আনুগত্য আছে এবং যৌনলীলা দেখে মানুষ মজা পায়। তাই তাকে যে চিরকাল শয়ন-কক্ষের মধ্যেই আবদ্ধ রাখতে হবে, তার মানে কি?

তাই তিনি মঞ্চের উপরে প্রকাশ্যভাবেই যৌন-লীলা ও নানা কদর্য কাণ্ড দেখাচ্ছেন। এই নাটকের একটি দৃশ্যে চারজন অভিনেতার মধ্যে হস্তমৈথুন প্রতিযোগিতার যে দৃশ্যটি আছে সেটি দেখে সমালোচকরা বলেছেন, এটা বড্ড বাড়াবাড়ি হয়েছে। তাছাড়া আছে একটি পুরুষের ও একটি নারীর সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায়

জড়াজড়ি করে নাচের দৃশ্য। সেই নাচের প্রতি ভঙ্গীতে যৌনকর্মের বিভিন্ন রূপ প্রতিফলিত হয়েছে। ইভনিং স্ট্যাণ্ডার্ডের সমালোচক বলেছেন: দৃশ্যটি দেখে দর্শকরা খুব হাততালি দিয়েছেন কিন্তু অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা যদি পুরো পোষাকে সজ্জিত থাকতেন তাহলে দর্শকরা এতটা হাততালি দিতেন কি?

নাটকের ভাষাও তেমনি। পোয়াদের ব্যারাকে বা নিষিদ্ধ পল্লীর সস্তা হোটেলে যে ধরনের খিস্তি শোনা যায় সেই ধরনের সব সংলাপ। এবং দর্শক সেই সব সংলাপ শুনে খুশী হয়ে খুব হেসেছেন এবং তারিফ করেছেন।

নাটকের নাম Oh! Calcutta দেওয়া হয়েছে কেন? কলকাতায় এই ধরনের কাণ্ড চলে, প্রচার ইঙ্গিতে তা শোনানোই কী নাট্যকারের মতলব?

লণ্ডনের ভারতীয় দূতাবাস কী নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছেন? তাঁরা ঐ অশ্লীল নাটকের সঙ্গে কলকাতার নাম জুড়ে দেওয়ায় আপত্তি জানাচ্ছেন না কেন? নাকি, তাঁরাও ওই দলে ভিড়ে গেছেন।

• • • •

অমর সুরস্রষ্টা বেটোফেন বহু যুগ আগেই এ-পৃথিবী থেকে চলে গেছেন। কিন্তু তিনি মাঝে মাঝে আজো আসেন আমাদের কাছে। জানিয়ে দিয়ে যান যে তিনি আছেন। এই তো সেদিন তিনি একটি তরুণীকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলেন।

উত্তর লণ্ডনের ক্যামডেন রোডের একটি ফ্ল্যাটের একখানি ঘর নিয়ে থাকে মেরী অ্যান। রূপসী। বাইশ বৎসর বয়স তার ধরস। স্থানীয় ডাকঘরে চাকরি করে। বাপ মা থাকেন গ্রামের বাড়ীতে। তার প্রণয়ী ছিল ফিলিপ। মেরী তাকে মন এবং দেহ দুইই দান করেছিল নিঃশেষে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফিলিপ তার সঙ্গে প্রতারণা করল। জানিয়ে গেল, মেরী ছিল তার কাম-সঙ্গিনী, স্ত্রীর মর্যাদা তাকে দেওয়া যায় না। লজ্জায় ঘৃণায় মাটিতে মিশিয়ে গেল মেরী। সমস্ত মন বিষিয়ে উঠল, জীবনের প্রতি মমতা চলে গেল। মেরী স্থির করল সে আত্মহত্যা করবে—এ জীবনের আর কোন সার্থকতা নেই তার কাছে। দিনটা ছিল বারোই জুন। সেই তার জীবনের শেষ দিন। আপিস থেকে ফেরবার পথে এক শিশি ঘুমের বড়ি কিনে নিয়ে এলো। একটা খেলেই যদি গাঢ় ঘুম হয়, একসঙ্গে সবগুলো খেলে নিশ্চয়ই সে ঘুম আর ভাঙবে না।

দরজা বন্ধ করে দিল মেরী। জানালাটা খোলাই থাক রাতের আকাশের গ্রহতারা তার জীবনের শেষ পরিণতি দেখুক। প্রস্তুত হল মেরী একমুঠো ঘুমের বড়ি তার হাতে নিল। বাঁ হাতে নিল জলের গেলাস।

জানালা দিয়ে সুর ভেসে আসছে। কী মধুর সুর। পাশের বাড়িতে কে যেন গ্রামোফোন খুলে দিয়েছে। বাজছে সেই বিখ্যাত সঙ্গীত—মুনলাইট সোনাটা, বেটোফেনের কালজয়ী সৃষ্টি।

শুনতে শুনতে তন্ময় হোয়ে গেল মেরী। তার মনের মধ্যে এক নতুন অনুভূতি স্পন্দিত হল। মৃত্যুর সহজ পথ তার জন্যে নয়। সংগ্রামের পথেই তো জীবনের সার্থকতা। যে সুরের ঝঙ্কার তার প্রাণে বাজছে তা যেন তার কাছে নবজীবনের সুর বলে মনে হল।

হাতের বড়িগুলো জানলা গলিয়ে ফেলে দিল মেরী অ্যান।

অবিস্মরণীয় মুহূর্ত

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

অনেকদিন আগেকার কথা বলছি।

তখন আমি থাকতাম কলকাতা শহরের শ্যামপুকুর অঞ্চলে একখানি ছোট্ট বাড়ীতে। দু'খানি মাত্র ঘর, পাশে একটুখানি রান্নার জায়গা।

স্বামী আর স্ত্রী—দু'জন মাত্র মানুষ।

একজন চালের দাম ছ' টাকা।

দু' আনায় একজোড়া ডিম।

সকাল বেলা দশ টাকায় আজকাল বাজার-খরচ কুলোয় না।

আর তখন?

ছ'-আনা আট-আনাই ছিল যথেষ্ট।

বেশ সুখেই ছিলাম। আনন্দেই দিন কাটছিল।

হঠাৎ একদিন একটা নিরানন্দের ছায়া পড়লো।

সাদা খাতায় একটি গল্প লিখে রেখেছিলাম। (বলতে ভুলে গেছি আমি গল্প-লেখক)

একদিন দেখি না আমার সেই লেখা কাগজের পাতাগুলি ইঁদুরে কুচি কুচি করে কেটে ফেলেছে।

সর্বনাশ!—গৃহিণী বললে, এবার তো আমার ভাল ভাল শাড়ী-জামা সবই কেটে ফেলবে। তাড়াতাড়ি এর একটা কিছু ব্যবস্থা কর।

এত ইঁদুর তো ছিল না আমার বাড়ীতে। এরা এলো কোত্থেকে?

গৃহিণী বললে, এলো তোমার ওই ছোট লোকের বস্তি থেকে। তখন এত করে বললাম তোমাকে ওই ছোটলোকদের বস্তির পাশে বাড়ী ভাড়া নিয়ো না—নিয়ো না, তুমি শুনলে না কিছুতেই। বললে, ওদের নিয়ে গল্প-উপন্যাস লিখি, ওদের সঙ্গে থাকতে হবে বই-কি! এখন লেখো কত লিখবে! এমনি ছোট ছোট নেংটি ইঁদুরে ঘর একেবারে ভরে গেছে।

বাজার থেকে একদিন একটা ইঁদুর-মারা কল কিনে আনলাম।

সে ভারি মজার কল। খাবার খেতে আসবে, আর চাপা পড়ে মরবে।

কলের ভেতর খাবার দিয়ে রাত্রে রান্নাঘরে পেতে দিয়ে এলাম।

স্ত্রীকে বললাম, একটু কান খাড়া করে রেখো। খুট করে আওয়াজ হলেই উঠো যেন। যেটা মরবে সেটাকে ফেলে দিয়ে এসে আবার পেতে দিয়ে আসতে হবে।

কিন্তু রাত্রি জাগাই সার হলো।

ইঁদুরগুলো বোধকরি মানুষের চেয়েও চালাক।

প্রতিদিন সকালে গিয়ে দেখি, কলটি যেমন পাতা ছিল তেমনি পাতাই আছে, একটা ইঁদুরও সে পাশ মাড়ায়নি। অথচ কাগজপত্র কেটে তছনছ করে দিয়েছে।

স্ত্রী বললে, তোমার ও-কলে কিছু হবে না। শহরে ইঁদুর যে! হ'তো আমাদের মত পাড়া গাঁয়ের বোকা ইঁদুর তো মরতো। তার চেয়ে এক কাজ কর। একটা বেড়ালের বাচ্চা নিয়ে এসো। বাড়ীতে পুষি।

সেই ভাল।

সেই দিন থেকে বেড়ালের সন্ধানে ঘুরে বেড়াই।

বেড়াল দেখি আর তার পিছু পিছু ছুটে গিয়ে ধরতে যাই।

কিন্তু ধাড়ি বেড়াল, ধরতে গেলেই ছুটে পালায়।

একদিন ট্রামে চড়ে কোথায় যেন যাচ্ছি, হঠাৎ আমার নজরে পড়লো সাদা রঙের ছোট্ট একটি বিড়ালের বাচ্চা পথের ধারে কুঁই কুঁই করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ট্রাম থেকে তক্ষুনি নেমে গিয়ে সেই বেওয়ারিশ বেড়ালের বাচ্চাটিকে কোলে তুলে নিয়ে বাড়ী চলে এলাম।

বিড়ালছানাটি আমার বাড়ীতে থেকে মানুষ হতে লাগলো।

দুধ খাওয়াই, মাছ খাওয়াই, মিউ মিউ করে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা করে।

বাঘের মাসি বিড়াল। শিকারীর জাত। উড়ন্ত মাছি ধরবার চেষ্টা করে।

হয়ত কারও সঙ্গে বসে বসে গল্প করছি, বিড়ালছানাটি কোত্থেকে এসে ধীরে ধীরে আমার কোলের ওপর উঠে বসে।

রাত্রে হঠাৎ জেগে উঠে দেখি সে আমার বুকের কাছে শুয়ে আছে।

মন্দ লাগে না। বিড়ালটাকে বোধহয় ভালবেসে ফেললাম।

বাড়ীতে ছেলেপুলে নেই। পাশের বাড়ীর নন্দ-মিত্তির বৌ সেদিন হাসতে হাসতে আমার স্ত্রীকে বললে, ছেলেপুলে হলো না বলে কি শেষে বেড়াল পুষলেন নাকি?

যা বলে বলুক। বেচারা হয়ত খেতে না পেয়ে পথের ওপর মরে পড়ে থাকতো, নয়ত শহরের রাস্তায় কোন্‌দিন গাড়ী চাপা পড়তো, তার চেয়ে ভালই করেছি, তাকে বাড়ীতে নিয়ে এসেছি।

কিন্তু ইঁদুর শিকার করতে তার এখনও অনেক দেরি।

আরশুলা দেখলে এখনও সে ছুটে পালায়। কোথাও কোনও জোর আওয়াজ হলে তো আর কথাই নেই, ছুটে একেবারে আমার পায়ের তলায় এসে ঢোকবার চেষ্টা করে।

আদর করে তার নাম রাখলাম, পুষি।

কিন্তু পুষির ওপর আমার স্ত্রী কিছুতেই খুশী হতে পারলে না।

প্রথম প্রথম নিতান্ত ছোট যখন ছিল, তখন এক-একদিন দেখতাম পুষিকে কোলে তুলে নিয়ে সে আদর করছে। কিন্তু যতই সে বড় হতে লাগলো গৃহিণী ততই তার ওপর বিরূপ হতে লাগলো।

—না বাপু, যাও ওকে যেখান থেকে এনেছ সেইখানে ফেলে দিয়ে এসো। বেড়াল আবার মানুষে পোষে! ছি!

জিজ্ঞাসা করলাম, কেন? ও আবার কি দোষ করলে?

—করলে আমার মাথা! কবে যে উনি ইঁদুর ধরবেন তার জন্যে এখন থেকে রাজকন্যের মতন যাদুষ হচ্ছেন! ওকে নিয়ে আর অত ঘাঁটাঘাঁটি কোরো না। বেড়ালের লোম পেটে গেলে কি হয় জানো? ওদের বৌ বলছিল—যক্ষা হয়।

বললাম, না না কিছু হয় না। ওকে একটু ভালবেসো, দেখবে ও কত ভাল।

—ভালবাসবো কি বলছো? ওবেলা মাছ ভাজছিলাম, চুপিচুপি কোন্ সময় পেছনে এসে বসেছে দেখতে পাইনি। টুক্ করে একখানা মাছ তুলে খেয়ে ফেললে। দুদিন পরে চুরি করে খেতে শিখবে।

বললাম, এক আধখানা খেতে দিও, তাহ'লে আর চুরি করবে না।

স্ত্রী বললে, ঠিক চুরি করবে। ওরা হচ্ছে পিছে চোরের জাত। এর চেয়ে ইঁদুর আমার ছিল ভাল। ও আপদ বিদেয় কর।

কিন্তু বিদেয় তাকে আমি কিছুতেই করতে পারি না। বিদেয় করার কথা ভাবতেও কষ্ট হয়।

ওদিকে স্ত্রী দেখলাম পুষিকে প্রহার করতে সুরু করেছে।

পুষি হয়ত তার পায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, ফুটবলের মত সে তাকে মারলে এমন এক লাথি যে বেচারা ঁ্যাক্ করে অনেক দূরে গিয়ে ছিট্‌কে পড়লো।

লাথি মারে, ঝাঁটা মারে, দিনরাত গালাগালি দেয়। বলে, ওকে তাড়ালে না তো! এবার আমি একদিন ওকে মেরেই ফেলবো।

তাড়াবার চেষ্টা সে অনেক করেছে। শুনলাম, একদিন সে তাকে সদর দরজার বাইরে বের করে দিয়ে খিল্ বন্ধ করে দিয়েছিল। কিকে দিয়ে একদিন সে তাকে তাদের বস্তিতে পাঠিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। পুষি আবার ফিরে এসেছে। রাস্তাই বা চিনলো কেমন করে, বাড়ীই বা চিনলো কেমন করে কে জানে!

একদিন শুনলাম, আলমারির মাথার ওপর পারাটা দিন তুলে রেখেছিল তাকে। কিছু খেতে পর্য্যন্ত দেয়নি।

শুনে বললাম, এ তোমার ভারি অন্যায়! খেতেও দাওনি? না খেয়ে ছিল?

স্ত্রী বললে, কেন তুলে রেখেছিলাম শোনো তাহ'লে! এই এতগুলি মাছ ও চুরি করে খেয়েছিল। পোড়ারমুখী তিনদিনের খাবার একদিনে খেয়েছে।

বড় হতে আর কতদিন!

দেখতে দেখতে পুষি মস্ত বড় হয়ে উঠলো। দেখলে আর সে পুষি বলে চেনাই যায় না। এখনও সে আমার সঙ্গেই খায়, আমার কাছেই থাকে। রাত্রিবেলা তাকে কিন্তু আর দেখা যায় না। বাঘের মাসি। শিকারী জন্তুর জাত। ছুটে ছুটে শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়।

ইঁদুরগুলো ওরে পালিয়েছে।

কিন্তু স্ত্রী তাতেও খুশী নয়। পুষি নাকি তাদের চেয়েও ক্ষতি করে বেশি। ধরা ইঁদুর ঘরের কোণে লুকিয়ে রাখে। পচে দুর্গন্ধ হয়। ঘরে টেঁকা যায় না।

পুষি যদি এখন মরে তো সে নিষ্কৃতি পায়।

বাড়ীতে যে আসে তাকেই জিজ্ঞাসা করে: বেড়াল কতদিন বাঁচে বলতে পারো?

কেউ বলে, এক বছর, কেউ বলে পাঁচ বছর। আবার কেউ বলে, কই মা, বেড়াল তো কখনও মরতে দেখিনি।

পুষিকে এখন আর মারবারও উপায় নেই। মারতে গেলেই ছুটে পালায়।

ধরতে গেলে ফোঁস করে ওঠে। আঁচড়ে দেবার ভয়ে স্ত্রী তার কাছে ঘেঁসে না।

দূরে থেকে গালাগালি দেওয়া ছাড়া আর উপায় নেই।

স্ত্রী বলে, এ আপদ এলো শুধু তোমার জন্যে। হতভাগীর দায়ে আমি জেরবার হলাম।

জবাব দিতে ভয় হয়, তাই চুপ করেই থাকি।

পুষিকে আজ চারদিন হলো দেখতে পাচ্ছি না।

অনেক খোঁজাখুঁজি করলাম, কোথাও নেই।

তবে সে গেল কোথায়?

এ নিশ্চয় আমার স্ত্রীর কাজ!

বিষ দিয়ে নিশ্চয়ই সে কোথাও তাকে পাচার করে দিয়েছে।

স্ত্রীকে সেদিন জিজ্ঞাসা করে বললাম, হ্যাগা, বল না, তুমি কি বিষ দিয়ে সত্যিসত্যিই তাকে কোথাও পাচার করেছ?

স্ত্রী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো। তোমার ভয়ে তা কি আমার করবার জো আছে? আমার মনে হয় পোয়াবতী হয়ত বেরিয়েছিল রাস্তায়—নিশ্চয়ই ট্রামে-বাসে চাপা পড়েছে, আর নয়ত কোনও ছেলের সঙ্গে চলে গেছে।

আমার মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল।

খাবার সময় মনের ভুলে চু চু করে ডাকি।

তারপর নিজের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হই।

স্ত্রী তিরস্কার করতে থাকে। —ও কি তোমার ছেলে ছিল না মেয়ে ছিল? যার জন্য তুমি ওর শোকে একেবারে অধীর হয়ে উঠলে!

রাত্রে ভাল ঘুম হয় না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাই। —পুষিকে ফিরিয়ে দাও ঠাকুর!

আমার প্রার্থনার জোরেই কিনা জানি না, পরের দিন সকালে স্ত্রী ঝাঁটা হাতে নিয়ে ঘর পরিষ্কার করছিল, দেখলাম পুষি টল্‌মল্ করে টলতে টলতে ঘরে ঢুকছে।

শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে পুষি। মনে হলো যেন দু'তিনদিন কিছু খেতে পায়নি।

একটু দুধ দেবার জন্যে রান্না ঘরে ঢুকেছিলাম। ফিরে এসে দেখি, পুষির ওপর ঝুঁকে পড়ে স্ত্রী তার কানে মুখে ফুঁ দিচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলাম, কি হলো

স্ত্রী কথার দিলে না। বুঝলাম তার অভ্যাসমত তাকে সে তার সমার্জনী দিয়ে অভ্যর্থনা করেছে আর তারই জন্যে সে এমন করে লুটিয়ে পড়েছে।

তাড়াতাড়ি জল এনে তার মুখে দিলাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। দেখতে দেখতে সে তার পেছনের পা দুটো বারকতক টান করলো, বারকতক খাপ্‌রি খেলো, তারপর হঠাৎ একসময় চোখ দুটি উল্‌টে দিয়ে ছট্ করে হাত থেকে পড়ে গেল। —হাঃ, সব শেষ!

—এ তুমি কী করলে বল তো?

স্ত্রী বললে, বেশ করলাম!

ঘরের একটা তাই দিনে পুষিকে ফেলে দিতে দিয়েছিলাম, ফিরে এসে দেখি, পুষিকে নিয়ে যেখানে আমার স্ত্রী বসেছিল চুপ করে সেইখানেই সে তখনও বসে আছে আর তার কোলের ওপর পাঁচটি ছোট ছোট বিড়ালের বাচ্চা।

—এ কি! এরা আবার কোত্থেকে এলো?

স্ত্রী বললে, তোমার পুষি এদের দিয়ে গেছে। রান্নাঘরের ওই কোণের দিকে চৌকির তলায় কুঁই কুঁই করছিল।

বুঝতে পারলাম এই জন্যেই তাকে ক'দিন দেখতে পাইনি।

কিন্তু আর না। বেড়াল পোষার সখ আমার চুকে গেছে।

স্ত্রীকে বললাম, ওদের একে ওকে বিলিয়ে দাও আর নয় তো দাও আমাকে—দূরে কোথাও ফেলে দিয়ে আসি।

হেঁট মুখে ঘাড় নেড়ে স্ত্রী বললেন, না।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি চোখ দিয়ে তার টস্ টস্ করে জল পড়ছে।

ভ্রম সংশোধন

গত ১৩৭৪ সালের আশ্বিন সংখ্যার প্রসঙ্গে লেখা হয়েছিল যে, প্রখ্যাত অভিনেতা শৈলেন চৌধুরী অকৃতদার ছিলেন। তথ্যটি ভুল। আমরা কয়েকমাস পূর্বে শরৎভারতীর নাটমঞ্চ পর্যায়ে এই ভুল তথ্যটিই পরিবেশন করেছিলেম। পরে জেনেছি শৈলেনবাবু বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁর ছেলে মেয়ে বর্তমান। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত।

—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

Ananda Math—The Fountain-head of Inspiration
"BANDEMATARAM"

In 1905 Aurobindo wrote "Bhabani Mandir", while at Baroda. It was a political pamphlet with a revolutionary purpose. He got it printed and distributed in Calcutta by his younger brother, Barindra Kumar Ghose. The Rowlatt Committee did not know, even in 1918, that Aurobindo was the author of this pamphlet. In this pamphlet Aurobindo has laboured under direct influence of Bankim's novel. *Anandamath.*

"It will be remembered that in 1905 was published the pamphlet Bhawani Mandir, which set out the aims and objects of the revolutionaries. It was remarkable in more ways than one...The central idea as to a given religious order is taken from the well-known novel "Anandamath" of Bankim Chandra. It is a historical novel, having for its setting the Sanyasi rebellion of 1774, when armed bands of Sanyasis came into conflict with the East India Company and were suppressed after a temporary career of success....

The revolutionary societies in Bengal infected the principles and rules advocated in the "Bhawani Mandir" with the Russian ideas of revolutionary violence. While a great deal is said in the Bhawani Mandir about the religious aspect, the Russian rules are matter of fact. The samitis and associations formed later than 1908 gradually dropped the religious ideas underlying the Bhawani Mandir pamphlet (with the exception of the formalities of oaths and vows) and developed the terroristic side with its necessary accompaniments of dacoity and murder.

Rowlatt Committee Report

In *Bhawani Mandir* (1905) we find Aurobindo under the direct influence of Ananda Math. This influence is not literary so much as political with the "Russian ideas of revolutionary violence". More than one political disciple of Aurobindo, particularly Hem Chandra Kanungo, have already admitted that they wanted to put *Ananda Math* into action in their attempts at secret murders during 1906, '07, '08, under the leadership of Aurobindo.

Aurobindo was not only the leader and prophet of an open national movement but also the demi-god and creator of an underground movement too. It may be a surprise for India to know this startling fact, but it is no news to the Government of India who pursued him at one time relentlessly until Sri Aurobindo had to escape out of British India ...Apart from his annual Puja visits, he came twice to Bengal with special mission which ought to be recorded in history as having deep and revolutionary significance.

—"Dawn of India", 15th, Dec. 1933
Barindra Kumar Ghose.

স্বাধীনতা সংগ্রামের
এক এক দিন

বিপ্লবীদের চলার পথ

বিপ্লবীদের চলার পথ ছিল—নিজের ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণ গোপন করে দুরূহ কণ্টকাকীর্ণ পথে—নিরলস সংগ্রাম করে যাওয়ার পথ। সে পথে না ছিল "ফুলের মালা, দীপমালা সাজিয়ে চন্দন কপালে মাখিয়ে অভ্যর্থনা," না ছিল সংবাদপত্রের মাধ্যমে নিজেদের কাজগুলিকে জাহির করার সুন্দর ব্যবস্থা।

তাঁদের একমাত্র সাধনা ছিল—কিভাবে ইংরেজ সরকারকে ভারতের মাটি থেকে উচ্ছেদ করে মাতৃভূমির পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন এবং দেশের কোটি কোটি জনসাধারণের খাদ্য, বস্ত্র, আবাস, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এই পাঁচটি প্রধান উপাদানের ব্যবস্থা করা যায়। এজন্য তাঁরা দীর্ঘদিন কঠোর কারাবাস—দ্বীপান্তর, দেশান্তর, ফাঁসি, সম্মুখ যুদ্ধে মৃত্যুবরণ প্রভৃতি সবই করেছেন বা সয়েছেন। কিন্তু নিজেদের কাজের কথা নিজেরা দেশবাসীদের কখনই জানতে দেন নাই এমনই আদর্শনিষ্ঠা ও নিঃস্বার্থপরতা ছিল এইসব বিপ্লবীদের মধ্যে। সেই জন্যই সব গোপন পথের পথিকদের প্রতি দেশবাসীর অন্তরে গভীর শ্রদ্ধা থাকলেও তাঁদের ব্যক্তিগত কাজের পরিচয় পাবার সুযোগ তাদের হয়নি এবং দেশ স্বাধীন হবার পর আজও তাঁদের কার্যকলাপের পরিচয় সিকি ভাগও প্রকাশ পায় নি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হতে আরম্ভ করে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষ পর্যন্ত একমাত্র বিপ্লবীদের মাধ্যমে যে সশস্ত্র সংগ্রাম তাই ছিল ভারতের স্বাধীনতার একমাত্র সংগ্রাম। স্বামী বিবেকানন্দ এই শক্তির সন্ধান করে সেই পথে ভারতবাসীকে চালিত করেছিলেন। তমোগুণে আচ্ছন্ন ভারতবাসীদের রজোগুণের পথে নিয়ে পরাধীনতার গ্লানি ও মুমূর্ষু জাতির দেহে শক্তির সঞ্চার করিয়ে দেশের যুবকদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে এগিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর উদাত্ত আহ্বানে সারাভারতে কাজও আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। বাংলা, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব এবং ভারতের অনেক স্থানে গড়ে উঠেছিল বিপ্লবী-বিদ্রোহী ভারতের প্রথম সেনানীবৃন্দ। ইংরেজদের বিরুদ্ধে বোমা-পিস্তলের আওয়াজ ভারতের দিকে দিকে গর্জে উঠেছিল। বিপ্লবীদের হয়ত মৃত্যু হয়েছিল বেশী কিন্তু তারা ইংরেজদের মেরেও ছিল অনেক।

"লাল"—"বাল"—"পাল" অর্থাৎ পাঞ্জাবের 'লালা লাজপত রায়', মহারাষ্ট্রের 'বাল-গঙ্গাধর তিলক' এবং বাংলার 'বিপিন চন্দ্র পাল' ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতের এই তিনজন বিখ্যাত নেতা প্রকাশ্য ভাবে বিপ্লবাত্মক প্রচার চালিয়েছিলেন। শহীদ চাপেকর ভ্রাতৃত্রয়ের শেভাগ দুইটি এবং বিতীয়ের একটি হত্যার সার্থকতা! লোকমান্য তিলক প্রকাশ্যভাবে সংবাদপত্র মারফৎ সমর্থন করেন। পরিণামে তারজন্য তাঁকে দীর্ঘ সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। সেই হিসেবে ভারতে প্রথম শহীদ হচ্ছে চাপেকর তিন ভাই। তাঁরা ১৮৯৭ খৃঃ পুনা শহরে অত্যাচারী শেভাগ অফিসার মিঃ রেন্ড এবং লেপটেনাণ্ট মিঃ এয়র্ষ সাহেব দুটিকে গুলি করে হত্যা করেন।

চাপেকর ভ্রাতাদের প্রতিষ্ঠিত "বান্ধব সমাজ" মহারাষ্ট্র, বাংলাদেশ এবং পাঞ্জাবে শাখা প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তবে বাংলায় তাদের কাজ উল্লেখযোগ্য নয়। এখানে অনুশীলন ও যুগান্তর দলের কাজই বড়। পাঞ্জাবে লালা লাজপত রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এই সংগঠনের কাজ অনেক বেড়ে যায়। ১৯০৭ সালে এই দলের কয়েকজন বিপ্লবী যুদ্ধ বিদ্যা শিখিবার জন্য চীন, জাপান ও আমেরিকা যায়। চীনে ডঃ সনিয়াৎ সেন ও তাঁহার সহকর্মীগণ ভারতীয় বিপ্লবীদের অনেক সাহায্য করেন। সাইগন, সাংহাই, হংকং এবং টোকিওতে ঐসময় বান্ধব

সমাজ নামের পরিবর্তে "আজাদি এ হিন্দুস্থান" দল স্থাপিত হয়। প্রচার কার্য্য চলতে থাকে। পরে ১৯০৭ সালের শেষের দিকে এদের কয়েকজন বিপ্লবী আমেরিকায় উপস্থিত হয়ে মিলিটারী একাডেমীতে অস্ত্রশস্ত্র তৈরী ও চালাবার বিদ্যা শেখবার সুযোগ করে নেয়। ক্যালিফোর্নিয়ায় এদের সংগঠন বেশ বড় হয়ে উঠে এবং দলের নাম পরিবর্তন করে 'গদর পার্টি' নাম রাখা হয়। বৈপ্লবিক ইতিহাসে গদর পার্টির দান অসামান্য। পণ্ডিত কাশীরাম এবং পিংগলে এই দলে ছিলেন, পরে তাঁদের ফাঁসি হয়ে যায়।

লণ্ডনে স্যার কর্জনকে শহীদ মদন লাল ধীংগরাজ কর্তৃক গুলি করে হত্যা থেকে সুরু করে শহীদ ক্ষুদিরাম বসু ও শহীদ প্রফুল্ল চাকীর মজঃফরপুরে বোমা নিক্ষেপ, শহীদ কানাইলাল ও শহীদ সত্যেন বসুর জেলের মধ্যে থেকে রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে গুলী করে হত্যা, দিল্লীতে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমাবর্ষণ প্রভৃতি বৈপ্লবিক কার্য্যকলাপ ও সংগঠন দেশের চারিদিকে ঘটতে থাকে। এই বৈপ্লবিক সশস্ত্র সংগ্রামের ব্যাপক প্রকাশ ঘটে বিশেষভাবে প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের সময়। এই সময়ে ভারতবর্ষের একদল বিপ্লবী ভারতের বাহিরে গিয়ে দেশের সশস্ত্র সংগ্রামে অস্ত্রশস্ত্র সাহায্য পাবার জন্য জার্মান সরকারের নিকট উপস্থিত হয় এবং জার্মান সম্রাট কাইজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে ভারতীয় বিপ্লবীদের বক্তব্য পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দেয়। স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা স্বর্গীয় ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ বসু, রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ প্রভৃতি কয়েকজন বিশিষ্ট বিপ্লবী ছিলেন এই দলে। বয়সে তাঁরা কিশোর হলেও পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত দূতের কাজে দক্ষতার সঙ্গে তাঁরা তাঁদের কাজ সমাধা করেন।

তাঁদের প্রচেষ্টায় জার্মান সরকারের স্বীকৃতিতে বার্লিনে স্বাধীন ভারতের প্রভিসনাল কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির প্রচেষ্টায় ভারতের বিপ্লবী দলকে কার্য্যকরী সাহায্য দেবার জন্যে কয়েকটি জাহাজ জার্মান অস্ত্র ও সরঞ্জাম বোঝাই হয়ে ভারতের উপকূলে বিপ্লবীদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে রওনা হয়ে আসে। অন্যদিকে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা বর্ষণকারী বিপ্লবী মহানায়ক স্বর্গীয় রাস বিহারী বসু ও বাংলার শহীদ বাঘা যতীন এই দুজনের নেতৃত্বে সারা ভারতব্যাপী সশস্ত্র বিদ্রোহের বিরাট আয়োজন করা হয়। বর্মা তখন ছিল ভারতেরই অংশ, ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্তের বেলুচীস্তান থেকে আরম্ভ করে সারা ভারত বর্মাসহ সুদূর সিঙ্গাপুর পর্যন্ত এই বিদ্রোহের পরিধি বিস্তৃত ছিল। বহু সৈন্য নিবাসে বিপ্লবীগণ ভারতীয় সৈন্যদের ব্যবহার্য ভারী টাইপের বোমাসহ বিদ্রোহের জন্যে প্রস্তুত ছিল। এই বোমার এক একটির ক্ষমতা ছিল অর্ধেক রেজিমেন্ট ধ্বংস করবার। কিন্তু ভারতের এক বিভীষণের কাজের ফলে স্বাধীনতার সশস্ত্র অভ্যুত্থান বাধা পেয়ে যায় এবং এর জন্যে অনেকের ফাঁসিও হয়, এই ঘটনা সত্ত্বেও সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ধার দিয়ে বিপ্লবীদের পিতামহ ভীষ্ম পণ্ডিত পরমানন্দ (ঝাঁসী) এবং স্বর্গীয় অবনী মুখার্জীর নেতৃত্বে সিঙ্গাপুরে সশস্ত্র বিদ্রোহ হয়, প্রায় ৫০০-র অধিক ইংরেজ সেনা এই বিদ্রোহে নিহত হয়, ছয় দিন পর্য্যন্ত ঐ সিঙ্গাপুর বিদ্রোহীর কবলে থাকে। ব্রহ্ম ও কয়েকটি সেনা নিবাসে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল। কিন্তু বৃটিশ সৈন্য সেটা দমন করে দেয়। এদিকে জার্মানী থেকে বিপ্লবীদের সাহায্যের জন্যে প্রেরিত অস্ত্র বোঝাই জার্মান জাহাজগুলির উড়িষ্যার বালেশ্বর উপকূলে ও সুন্দর বনের ভিতরে অস্ত্রগুলি নামিয়ে দেবার ব্যবস্থা ছিল। ঐ অস্ত্রগুলি উড়িষ্যার উপকূল থেকে নেবার জন্যে একদল সশস্ত্র বিপ্লবীদের সঙ্গে নিয়ে বিদ্রোহী বীর শহীদ বাঘা যতীন উপস্থিত হলে কোন রকমে ব্রিটিশ সরকার টের পেয়ে যায় এবং তার ফলে বুড়ী বালাম নদী হতে দূরে এক নিবিড় জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে ইংরেজ সৈন্যদলের সঙ্গে এই বিদ্রোহীদের যুদ্ধ হয়। ঐ সম্মুখ সমরে শহীদ যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী প্রাণত্যাগ করেন। রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ কাবুলে অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জার্মানি অষ্ট্রিয়া হাঙ্গেরি ও

তুর্কী গভর্ণমেণ্ট এই সরকারকে মেনে নিয়েছিল। তাছাড়া জার্মানি ও তুর্কীর হাতে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে "বরকতউল্লা" এক ভারত স্বাধীনতার ফৌজ গঠন করে ভারতের দিকে এগিয়ে আসেন। কিছুদিন পরে চট্টগ্রাম আরাকান সীমান্তে শহীদ নির্মল সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের একদল বিপ্লবী ইংরেজ সৈন্যদলের সঙ্গে লড়াই করে। তাঁদের অধিকাংশ সম্মুখ সমরে মৃত্যু বরণ করে এবং নেতাসহ কয়েকজন বিপ্লবী পালাতে সমর্থ হন। পরে উক্ত শহীদ নির্মল সেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সংগ্রামে ধলঘাটে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে ইংরাজদের সঙ্গে লড়তে লড়তে মৃত্যুবরণ করে শহীদ হন। এই রকম আরও কয়েকটি সংগ্রাম ছাড়া ১৯১৬ সালে বেলুচিস্থানের বিরাট লড়াই কলিকাতার নিকটে বজবজে কোমাগাটামারু জাহাজের বিপ্লবী (গদর পার্টি) সদস্যদের সাথে লড়াই, ঢাকার কলতা বাজার, পাবনা, হাওড়ার সালকিয়া, মুরগী প্রভৃতি ভারতের অনেকস্থানে ইংরেজ দলের সঙ্গে বিপ্লবীদলের সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়েছিল, ঐ সমস্ত স্থানের লড়াইতে অনেক সময়ে বিপ্লবীগণ যুদ্ধ করতে করতে ইংরেজদের হটিয়ে দিয়ে নিজেরা নিরাপদ স্থানে পৌঁছে গেছেন বা অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা সংগ্রাম করতে করতে সম্মুখ সমরে শহীদ হয়েছেন। বিপ্লবীগণ ঐ ভাবে দেশের পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত করার জন্য যখন ইংরাজদের সাথে সংগ্রামে রত হয়ে মৃত্যু ও ফাঁসী বরণ এবং দলে দলে আন্দামান দ্বীপান্তর হওয়ার কঠোর শাস্তি হাসিমুখে গ্রহণ করেছে—সেই সময়ে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষাংশেও কংগ্রেস স্বাধীনতার কথা মুখেও আনে নি।

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর ভারতবাসী বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে যুদ্ধে ধন প্রাণ দিয়ে পুরস্কারস্বরূপ পেল "রাউলাট আইন।" রাউলাট সাহেব কৃত এই আইনে বৃটিশ সরকারকে দিল যে কোন ভারতবাসীকে বিনা বিচারে বন্দী করে রাখার অধিকার। জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষাকে ধ্বংস করার জন্য যে এই আইন, তার প্রতিবাদে মুখরিত হয়ে উঠল সারা ভারতবর্ষ। পাঞ্জাবের অমৃতসর সহরের জালিওয়ানওলাবাগে আহূত হয়েছিল এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা। সেদিন আবার সেখানে মেলাও বসেছিল এবং তার জন্য সমবেত হয়েছিল অনেক শিশু ও মহিলা। বৃটিশ সরকার ভারতবাসীদের শায়েস্তা করবার জন্য বেছে নিল এই বাগ। তাদের বৃটিশ সৈন্যদল নিয়ে অকস্মাৎ উপস্থিত হয়ে সেই বাগের উপস্থিত সকল লোকদের কোন রকম সতর্ক না করে এবং বেরিয়ে যাবার পথ বন্ধ করে ঝাঁকে ঝাঁকে নিরস্ত্র জনতার উপর গুলীবর্ষণ করে। এর ফলে শিশু ও নারীসহ শত শত লোক নৃশংসভাবে নিহত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সারা পাঞ্জাবব্যাপি ঘটিত অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দেয়।

সারা ভারত এই নৃশংস অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ভারতের প্রত্যেক লোক এই ব্যাপারে পরাধীনতার জ্বালা মর্মে মর্মে অনুভব করে, যখন সারা ভারতে ইংরাজ আধিপত্যকে ধ্বংস করার জন্য মন প্রাণে প্রস্তুত হচ্ছে ঠিক সেই সময়ে গান্ধীজীর "অহিংসা সংগ্রামে" এক বছরের মধ্যে স্বরাজ এনে দেবার ঘোষণা তাঁকে রাতারাতি সমগ্র ভারতের সর্বোচ্চ নেতার আসনে বসিয়ে দেয়।

গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের মাধ্যমে ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলন এক হিসাবে হচ্ছে সারা ভারতের প্রথম অহিংস গণ-আন্দোলন। বাংলাদেশ অবশ্য এই রকম আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। বঙ্গ বিভাগের বিরুদ্ধে ১৯০৫ সালে 'স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী দ্রব্য বর্জন' নামে সারা বাংলায় যে বিরাট গণ-আন্দোলন হয় তাতে দোর্দণ্ড প্রতাপ বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে বাঙ্গালী জাতি বাধ্য করেছিল বঙ্গ বিভাগ রদ করতে। সেই সময় সরকারের 'ডিভাইড এণ্ড রুল পলিসিকে' তাণ্ডুল করে ছেড়েছিল। গান্ধীজীর এই আন্দোলনে যেহেতু বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে গণ-বিক্ষোভ প্রকাশ করবার বিরাট উপাদান ছিল, সেইজন্য এই আন্দোলনকে জোরদার

করার জন্য শত শত বিপ্লবী যোগও দিয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে 'এক বছরে স্বরাজ' এনে দেবার ঘোষণা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। শেষ পর্যন্ত গান্ধীজী চৌরীচোরা নামক একটি থানাতে হিংসাত্মক ঘটনার অজুহাতে ঐ আন্দোলন বন্ধ করে দেন।

এই আন্দোলনে কিন্তু স্বাধীনতার কথা ছিল না। ছিল স্বরাজ পাবার কথা। যার মানে হচ্ছে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে 'ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থা। (ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস)। গান্ধীজী দেশবাসীদের কাছে ঐ স্বরাজ এনে দেবার মূল্য হিসেবে চেয়েছিলেন বিশ লক্ষ চরকার সূতাকাটা প্রচলন, এক কোটি কংগ্রেস সদস্য সংগ্রহ ও এককোটি টাকা 'তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারে' সংগ্রহ।

বিপ্লবীদের অনেকে কংগ্রেসকে জাতীয় মঞ্চ হিসেবে গ্রহণ করে যোগ দিয়েছিল তা পূর্বেই বলা হয়েছে। এই বিপ্লবীদের মধ্যে অনেকে থানা ও জেলা কমিটিগুলিতে পরে আধিপত্য বিস্তার করে তার মধ্য দিয়ে দেশবাসীদের কাছে বৈপ্লবিক ভাবধারা প্রচার ও সংগঠন আরম্ভ করে দেয়। এই আন্দোলনের শেষভাগে ভারতবাসীর পক্ষে—স্বরাজ পাবার অপূর্ব সুযোগ এসে গিয়েছিল। ইংল্যাণ্ডের সম্রাট পুত্র প্রিন্স অব ওয়েলসের অভ্যর্থনার ব্যাপারে ভারতের বড়লাট লর্ড রিডিং খুবই মুস্কিলে পড়ে গিয়েছিলেন। কলিকাতায় যাতে যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা হয় তার জন্য তিনি ভারতে বিশিষ্ট নেতা স্বর্গীয় মদনমোহন মালবীয়কে বাংলার প্রধান নেতা স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের নিকট জেলে সাক্ষাৎ করবার জন্য পাঠিয়ে গোল টেবিল বৈঠকের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। গান্ধীজী সেই সুযোগ গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করলেন। তখন দেশবন্ধুর পরামর্শ নিলে অবিভক্ত ভারতের পূর্ণ স্বরাজ পাবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু হাতে আসা লক্ষ্মী গান্ধীজী পায়ে ঠেলে দিয়েছিলেন। সেই ঘটনা ভারতের পক্ষে, বিশেষতঃ বাংলাদেশের পক্ষে এক দুর্ভাগ্যের কাহিনী।

দেশে অসহযোগ আন্দোলন যখন বন্ধ হয়ে গেল তখন আবার বিপ্লবীগণ পূর্বোদ্যমে সারা দেশে বৈপ্লবিক সংগঠন গড়ে তুলতে আরম্ভ করেন। চারিদিকে বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা আরম্ভ হয়ে যায়। বিদেশ থেকে কিছু কিছু করে অস্ত্র আসতেও আরম্ভ করে।

চট্টগ্রাম নাগারকানা হিলে বিপ্লবীদের সঙ্গে সশস্ত্র বৃটিশ সৈন্যের লড়াই, কলিকাতা শাঁখারীটোলা পোষ্টাফিস ডাকাতি, শহীদ গোপীনাথ সাহা কর্তৃক ইংরেজ মিঃ ডে-কে হত্যা, উত্তরপ্রদেশে কাকোরী ট্রেন ডাকাতি, আলীপুর জেলের মধ্যে পুলিশ সুপার নারায়ণবাবুর গুপেন চ্যাটার্জীকে হত্যা, পাঞ্জাবে লাহোর সহরে ব্রিটিশ পুলিশ অফিসার মিঃ স্যাণ্ডার্সকে হত্যা, দিল্লীতে এসেম্ব্লীর (আইনসভা) উপর শহীদ ভগৎ সিং ও স্বর্গীয় বটুকেশ্বর দত্ত কর্তৃক বোমা নিক্ষেপ, মৃত্যুঞ্জয়ী বীর শহীদ যতীন্দ্রনাথ দাসের লাহোর জেলের মধ্যে তিলে তিলে অনশনে মৃত্যুবরণ, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ ও সহর দখল, ঐ জেলার জালালাবাদ পাহাড়ে, পাহাড়তলি ও ধলঘাটে বৃটিশ সৈন্যদের সঙ্গে বিপ্লবীদের সশস্ত্র যুদ্ধ, পুলিশ সুপার আনাতুল্লাকে হত্যা এবং ঢাকা সহরে সারা বাংলা পুলিশের বড়সাহেব মিঃ লোম্যানকে হত্যা এবং ঢাকার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হড্‌সন সাহেবকে মারাত্মক ভাবে খায়েল করা, কুমিল্লা সহরে মিঃ ষ্টীভেন্সকে হত্যা, মেদিনীপুর সহরে তিনটি বৃটিশ ম্যাজিষ্ট্রেটকে পরপর হত্যা, কলিকাতার প্রধান সরকারী অফিস রাইটার্স বিল্ডিং-এর মধ্যে ঢুকে কারা বিভাগের ইন্সপেক্টার জেনারেল মিঃ সিমসন সাহেবকে হত্যা; কুমিল্লার রাজপথে পুলিশ সুপার মিঃ এণ্ডারসনকে হত্যা। চট্টগ্রামে ব্রিটিশ ক্যাপ্টেন ক্যামেরণ সাহেবকে হত্যা, বাংলার

গভর্ণর জ্যাকসন এণ্ডারসন ও পাঞ্জাবের গভর্ণর ও. ডুর্ণো, লিউক প্রামবি ক্যাসেল, ডিলিয়ার্ড, ওয়াটসন প্রভৃতি সাহেবদের গুলি করে হত্যা, দিল্লীর নিকট বড়লাট লর্ড আরউইনের স্পেশাল ট্রেন বোমা দিয়ে ধ্বংসের চেষ্টা, এলাহাবাদে শহীদ চন্দ্রশেখরের সাথে লড়াই, লাহোরের শালিমার বাগে শহীদ জগদীশ ও গুরুদেববাবুর সাথে পুলিশের লড়াই প্রভৃতি বহু বিপ্লবিক ঘটনা এই সময়ে সার্থকতার রূপ নেয়। এছাড়া স্যার জন সাইমন, কলিকাতার পুলিশ কমিশনার স্যার চার্লস টেগার্ট প্রভৃতি নামী সাহেবদের উপর আক্রমণ হয়।

১৯২২ থেকে আরম্ভ করে ১৯৩৪ পর্য্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে বিপ্লবীদের এই যে মরণপণ সংগ্রাম তার ফলেই দেশের যুবকগণ দিনে দিনে স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে আকৃষ্ট হয়ে উঠছিল। ভারতের নারী সমাজও এ বিষয়ে পিছিয়ে ছিল না। এই বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতায় তাঁদের অবদানও আছে বিরাট। চট্টগ্রাম পাহাড়তলীর যুদ্ধে, কুমিল্লার ষ্টিভেন্স সাহেবকে হত্যায়, বাংলার গভর্ণরের উপর গুলিচালনায় তাঁদের অবদান ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া বৈপ্লবিক সংগঠনে, অস্ত্র সংগোপনে রাখা এবং বিপ্লবীদের আশ্রয়োপন করে থাকা এদের সাহায্য ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে মোটেই সম্ভব হত না।

এই বৈপ্লবিক সংগ্রামে ছিল কঠোর কারাবাস দ্বীপান্তর, ফাঁসি বা সম্মুখ সমরে মৃত্যুবরণ এবং এইটিই ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে পর্য্যন্ত ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের একমাত্র তৎপরতা। সারাদেশের জনসাধারণ যুব-সমাজ এবং কংগ্রেসের প্রায় অধিকাংশ লোক ক্রমশঃ বিপ্লবীদের পেছনে এসে দাঁড়াতে আরম্ভ করেছিল।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বিপ্লবের পথকে সার্থকরূপ দেবার জন্য দেশ থেকে অন্তর্ধান হবার আগে পর্য্যন্ত, সারা দেশের খোলা ময়দানে তিনি আপোষবিহীন বৈপ্লবিক সংগ্রাম চালাবার আহ্বান জানাচ্ছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সংগঠনের কাজও চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বিহারের রামগড় কংগ্রেসের অধিবেশনের সময়ে সেখানে তিনি যে সারা ভারত আপোষ বিরোধী সম্মেলন আহ্বান করেন তাতে দেশের কয়েক লক্ষ লোক এসে তাঁর পেছনে দাঁড়ালো। এই সময়ে বিপ্লবীবীর শহীদ উধম সিং ইংল্যাণ্ডে উপস্থিত হয়ে জালিয়ানাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রধান নায়ক ব্রিটিশ জেনারেল ও. ডায়ার সাহেবকে গুলী করে হত্যা করলে সারা ভারতে নবজাগরণের সাড়া জাগে।

এরপর কয়েকটি ঘটনার পরে ভারতে বিদ্রোহ সৃষ্টির জন্য নেতাজী সুভাষচন্দ্র দেশ থেকে আশ্চর্যজনক ভাবে অন্তর্ধান হয়ে ভারতের বাহিরে চলে যান এবং কয়েকটি দেশ ঘুরে জার্মানীতে উপস্থিত হয়ে সেখান থেকে ব্রিটিশ সরকারের ভারতের স্বাধীনতার জন্য বিদ্রোহাত্মক কাজ আরম্ভ করেছেন। বেতারযন্ত্রের সাহায্যে প্রচারিত তাঁর উদাত্ত আহ্বানে দেশের জনসাধারণ মনেপ্রাণে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠে।

[১৯৪৮ সালে সারা বাংলা বিপ্লবী সম্মেলন উপলক্ষে বিপ্লবী কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক লিখিত পুস্তিকার সৌজন্যে।]

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয় পতাকা
প্রথম পরিকল্পনা ও ব্যবহার

স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম বার্ষিক উৎসবে বাঙালীর পরিকল্পিত ও বাংলা দেশেই প্রথম ব্যবহৃত ওই জাতীয় পতাকা পরবর্তী বৎসর (১৯০৭) খ্রীষ্টাব্দে খ্যাতনামা বিপ্লবপন্থী ভারতীয় মহিলা মাদাম কামা ইউরোপে প্রকাশ্য সভায় সর্বপ্রথম ব্যবহার করিয়াছিলেন। তৎসম্পর্কিত বিশদ বিবরণ প্রসিদ্ধ বিপ্লবী মেদিনীপুর নিবাসী স্বর্গত হেমচন্দ্র কানুনগো তৎপ্রণীত "বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা" নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র আলিপুর বোমার মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হতে রক্ষিত হইয়াছিলেন। বোমা নির্মাণ শিক্ষার্থে, তিনি নিজ ব্যয়ে ইউরোপে গিয়াছিলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে তিনি বিদেশ যাত্রা করেন এবং প্যারী নগরে বোমা নির্মাণ শিক্ষা করিয়া ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে স্বদেশ যাত্রা করেন। তিনি প্যারী ও লণ্ডন ব্যতীত ইউরোপের আরও কয়েকটি দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। প্যারী নগরে মাদাম কামা মিঃ এস, আর, রাণা এবং অন্যান্য বিপ্লবীর সহিত তাঁর ঘনিষ্ট পরিচয় ও মেলামেশা হয়। সুপ্রসিদ্ধ ভারতীয় বিপ্লবী শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা, শ্রীবিনায়ক দামোদর সাভারকার প্রভৃতির সহিতও লণ্ডনে তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। জাতীয় পতাকা ব্যবহার সম্পর্কে তথ্য হেমবাবুর লিখিত পূর্বোক্ত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি :

"এই সময় জার্মানীর ষ্টুটগার্টে বিশ্ব সোসিয়ালিষ্ট কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে, প্যারিস থেকে ভারতীয় ডেলিগেট রূপে দু'জন প্রেরিত হয়েছিলেন। এঁদের একজন ছিলেন পূর্বোক্ত রাণা সাহেব আর একজন মনাযধন্যা মাদাম কামা। ইনি পার্সী ধর্মাবলম্বী হয়েও নিজেকে হিন্দু মহিলা বলে সেখানে পরিচয় দিতেন। এঁর অর্থ ছিল প্রচুর। দেশের কাজে সর্বস্ব পণ করেছিলেন। আর উনি উক্ত প্যারিস ইণ্ডিয়ান সোসাইটির একজন সংস্থাপয়িত্রী। বহুদিন যাবৎ এঁর সঙ্গে প্রতিদিন মধ্যাহ্নে এক টেবিলে ব'সে খাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ইনি আমাকে চিত্রকলা শিক্ষার্থী ব'লেই জানতেন। বিপ্লববাদী ব'লে তখন বুঝতে পারেন নি। ভারত প্রসঙ্গে, বিশেষতঃ ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে আলাপ করতে করতে আত্মহারা হয়ে যেতেন। দুনিয়ার নানা দেশে ভারতীয় রাজনীতির অবৈধতা দেখিয়ে পরাধীন ভারতবাসীর প্রতি অন্য দেশবাসীর সহানুভূতি উদ্রেক করানই ছিল এঁর প্রধান কাজ।"

"মাদাম কামা উক্ত বিশ্ব মহাসভাতে ভারতবাসীর পক্ষ হ'তে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তা নাকি খুব হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। বক্তৃতাকালে তাঁর হাতে ছিল ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের জন্য নির্মিত এক ত্রিবর্ণ পতাকা। তাতে ছিল লাল, গেরুয়া ও নীল পর পর এই তিনটি রং। ওপরে লাল রং, তাতে আটটি আধ ফোটা পদ্ম, মাঝখানে গেরুয়ার ওপর দেবনাগরী অক্ষরে লেখা ছিল, 'বন্দেমাতরম্', তলায় নীল রংএর ওপর একধারে সূর্য, অন্যধারে অর্ধচন্দ্র ও তারা।

"এহেন পতাকা, তার ওপর পর্দানশীন শাড়ী পরিহিতা হিন্দু মহিলার বিশ্ব সভায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা, ইউরোপের পক্ষে এক অচিন্তনীয় ব্যাপার। তাই সেখানকার অনেক কাগজে, যার পতাকা, তার দুয়েক রকম ফটো এবং বক্তৃতার অনুবাদ বেরোবার পর বেশ হৈ চৈ পড়ে গেছল।"

জাতীয় পতাকা হস্তে মাদাম কামা

স্বদেশী আন্দোলনের যুগের পরে "হোমরুল লীগের" আন্দোলনের কালে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে বিশ্রুত-কীর্তি দেশনেত্রী ডাঃ আনি বেশান্ত একটি জাতীয় পতাকার পরিকল্পনা করেন এবং তদনুসারে পতাকা নির্মাণ করাইয়া প্রকাশ্যে ব্যবহার করেন।

'হোমরুল লীগ্'এর কার্যালয়ে এবং ডাঃ বেশান্তের বাস ভবনে সেই পতাকা উড্ডীন থাকিত। হোমরুল লীগ-এর প্রতিষ্ঠাত্রী সভানেত্রী ছিলেন সেই ভারত-হিতৈষিণী মহীয়সী মহিলা। পূর্বোক্ত জাতীয় পতাকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল :—পতাকার জমির উপর সমান্তরাল ভাবে ছিল পাঁচটি লাল ও চারটি সবুজ লাইন বাম দিকে উপরের কোণে ছিল ইউনিয়ন জ্যাক এবং উহারই নিম্নে ছিল সপ্তর্ষি মণ্ডলের সাতটি তারকা অঙ্কিত।

যখন তাঃ আনি বেসান্তের পরিচালনায় ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন লাভের জন্য ভারতে হোমরুল লীগ-এর আন্দোলন চলিতেছিল, তখন ইউরোপে চলিতেছিল জার্মান যুদ্ধ যাহা পরবর্তীকালে পৃথিবীর প্রথম মহাযুদ্ধ নামে খ্যাত হইয়াছে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় কংগ্রেসের ৩২ তম অধিবেশনে তিনি সভানেত্রীত্ব করেন।

মহাযুদ্ধ চলিতে থাকাকালে ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের বাহিরে, ভারতীয় বিপ্লবপন্থীগণ স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য ব্যাপক সশস্ত্র বিদ্রোহের আয়োজন করিতেছিলেন। এই বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা স্বর্গত রাসবিহারী বসুর অবদান ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তিনি উত্তর ভারতে বিদ্রোহের আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ করিয়া আনিয়াছিলেন, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তাহা পণ্ড হইয়া গেল। ইহা হইতেই উদ্ভব হয় লাহোর ষড়যন্ত্রের মামলা। তৎকালে বিপ্লবীগণ স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকার পরিকল্পনা করেন এবং তদনুসারে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সময় ব্যবহারের জন্য অনেকগুলি পতাকা নির্মাণ করা হয়। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ১২শে ফেব্রুয়ারী রাসবিহারীর অভিযান-ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য স্থানে পুলিশের খানাতল্লাসীকালে তাহা বোমা, অস্ত্রশস্ত্র, কার্তুজ, রেললাইন উড়িবার ডয়নামাইট, বিদেশী ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার প্রচার-পত্রের পাণ্ডুলিপি এবং স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা ইত্যাদি নানা প্রকার বে-আইনী দ্রব্য ও কাগজপত্র পাওয়া যায়। সিডিশন কমিটির রিপোর্টে ও লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বিবরণে ওই সমুদয়ের উল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু বিপ্লবপন্থীগণের পরিকল্পিত ও নির্মিত পতাকার কোন বর্ণনা তাহাতে প্রদত্ত হয় নাই। সিডিশন কমিটির রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃতি দিতেছি :

"Bombs were prepared, arms were ready; flags were made ready; a declaration of war was drawn up; instruments were collected for destroying railways and telegraph wires ··Rash Behari's headquarters were raided on the 19th of February and Seven returned emigrants were found there in possession of a revolver bombs and the component parts of other bombs, as well as four revolutionary flags···National flags too were discovered. It became manifest that the plotters had designed simultaneous outbreaks at Lahore, Ferozpore and Rawalpindi, and later it appeared that their operations were intended to cover a far wider area."

গান্ধিজী দক্ষিণ আফ্রিকার কর্মক্ষেত্র ছাড়িয়া ভারতবর্ষে আসেন প্রথম মহাযুদ্ধ চলিতে থাকা কালে। তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে—দক্ষিণ আফ্রিকায় আর ফিরিয়া যাইবেন না; স্বদেশে থাকিয়াই স্বদেশবাসীর সেবা করিবেন। তিনি ভারতের রাজনীতিক কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করার পর অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার প্রভাব বিস্তার লাভ করিল। তদবধি স্বাধীনতা-সংগ্রামে গান্ধীযুগের আরম্ভ।

বহির্ভারতে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন

প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্বে ১৯০৫ ইং অব্দে আমরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া সহরে স্কুলের ছাত্র ছিলাম। নানাভাবে সমাজ সেবার কার্যে নিত্যই আগ্রহী হইতাম। অকস্মাৎ একদিন "হিতবাদী" সাপ্তাহিক পত্রিকা পাঠে অবগত হইলাম যে লণ্ডনে অধ্যাপক পণ্ডিত শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা, "ভারতীয় হোমরুল লীগ" প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং তিনি নিজেই ইহার সভাপতি হইয়াছেন। সংবাদটিতে আমাদের মধ্যে উৎসাহ অনল প্রজ্বলিত হইল। আমরা যে আয়র্লণ্ডের ন্যায় হোমরুল দাবী করিতে পারি এই ধারণা তৎকালে কাহারও ছিল না।

১৯০৬ অব্দের মে মাসে বাগ্মীবর বিপিন পাল, শ্রীঅরবিন্দও কতিপয় দেশপ্রাণ তরুণসহ স্বদেশী ও জাতীয় শিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রচার কার্য্য চালাইবার জন্য পূর্ব-বাংলার বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় উপনীত হইলেন। তিনি বিরাট জনসমাবেশে শুনাইলেন সম্পূর্ণ নূতন কথা। যাহা কেবল ছুন চিনির স্বদেশী নয়। সমাজে, রাষ্ট্রে সর্বত্র বহিষ্কারনীতি চালিয়ে, জাতীকে আত্মনির্ভরশীল করতে হবে। ভারতের জনমণ্ডলীকে আত্মদানে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। এইরূপ ভাষণ তৎপূর্বে কেহ যেন নাই। তাঁহার সহযাত্রী শ্রী উল্লাস কর দত্ত (পরে যোগী বিশারদ) একদল গায়ক নিয়া শুনাইলেন—

"বাজায়োনা আর মোহন বাঁশী,
রুদ্ররূপে ভীম বেশে প্রকাশ পরাণে আসি।"

শ্রোতৃবর্গের মোহতন্দ্রা কাটিয়া গেল। আমরা কিশোরের দল উদ্‌ভ্রান্ত হইলাম।

পরদিন প্রাতে দাদা শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব (সাংবাদিক) দেখাইলেন শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা সম্পাদিত—"ইণ্ডিয়ান সোসিওলিষ্ট" পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা। দাদা উল্লাস কর ১৯০৫-এর নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত—"স্বাধীন জাতীয়রাষ্ট্র ব্যবস্থা (Independent National Govt. in India) শীর্ষক প্রবন্ধের কতকাংশ পাঠ করিয়া শুনাইলেন। ইহাতে সুপণ্ডিত শ্যামাজী সওয়াল করিয়া বুঝাইয়াছিলেন যে অধিক তিক্ত হওয়ার পূর্বেই ইংলণ্ডের কর্তব্য ভারতকে মুক্তি দেওয়া। বন্ধুর মত এই কার্য্য হইলে বাৎসরিক একটা কর দেওয়া এবং ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ে অনেক সুযোগ-সুবিধা দিবার কথাও তিনি বলেন। প্রবন্ধটি উচ্চাঙ্গের দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক তথ্যে পূর্ণ ছিল। দাদা উল্লাস করের বিশ্লেষণ কর্ণে পৌঁছানমাত্র আমরা স্কুল কলেজ ত্যাগ করিয়া জাতীয় শিক্ষালাভের নামে শক্তি অর্জন, দেশবাসীর সেবা এবং পরে দাদা-দাদামায় নিরস্ত্র পথচারীকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করলাম।

ইউরোপে প্রথম ভারতীয় বিপ্লবী

১৯১০ ইং অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ডে পৌঁছিয়াই বিভিন্ন সূত্রে যে সকল তথ্য লাভ করিলাম এবং পরে জার্মেনী, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশে পর্যটনকালে যতটুকু সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিলাম, তাহাতে নিঃসন্দেহরূপে বলিতে পারি যে, পণ্ডিত-শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মাই ভারতের প্রথম বিপ্লবী যিনি বর্তমান শতাব্দীর আরম্ভ হইতেই লণ্ডন সহরের বুকের উপর বসিয়া ভারতের ইংরাজ শাসনযন্ত্র বিকল করার চেষ্টা করিয়াছেন।

মাদাম কামা ও বীর সাভারকর

শ্যামজী, মাদাম কামা, বীর সাভারকর, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ত্রিমূল আচারিয়া, আবিন, করন্দিকর, বাও প্রভৃতি অগ্নিমন্ত্রের উপাসকগণের সাহচর্যেই ইংলণ্ডবাসীর ত্রাসোৎপাদন করেন। আর একজন সহকর্মী যিনি মরিয়া অমর হইয়াছেন সেই মদন লাল ধিংড়া ছিলেন শ্যামজীর বড় লাফেটেনাট।

১৯০৭ অব্দে লণ্ডনের হাইগেইট অঞ্চলে শ্যামজীর নিজস্ব একটি বাটীতে শ্যামজী এবং সাভারকর ভারতীয় ছাত্র ও যুবকগণের জন্য "ইণ্ডিয়া হাউস" প্রতিষ্ঠা করেন।

বীর সাভারকর ছিলেন বরোদার রাজকে এবং পুণার চাপেকর ভ্রাতাগণের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত। তিনি ১৮৯৯ অব্দে পুণায় সর্বপ্রথম একটী গুপ্ত সমিতি স্থাপন করেন। ইহার নাম ছিল (গুপ্তভাবে) "রাষ্ট্রীয় ভক্ত সমূহ।" তাঁহার সহকর্মী ছিলেন ত্রিম্বকরাম ডাকর ও রাওজী কৃষ্ণ পাণ্ডে (Page) তাঁহারা এবং অন্যান্য অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ প্রকাশ্যে 'মিত্রমেলা' নামে এক প্রতিষ্ঠানে সমবেত হইতেন। ১৯০৪ অব্দে সমিতির নাম হয় "অভিনব ভারত।" এই সাভারকরই ইংলণ্ডে পৌঁছিলেন ভারত মুক্তির উদ্যোগ করার জন্য। মাদাম কামা ছিলেন বোম্বের সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্য বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত কে, আর, কামার পুত্র রোস্তম কামার পত্নী। তাঁহারা জাতীতে পার্শী। মাদাম ভিকাজী কামা স্বাস্থ্যের জন্য ইউরোপ গমন করেন। তথায় বৎসরাধিক কাল চিকিৎসার পর আরোগ্যলাভ করিলেন, এবং রাজনীতি ও বৈপ্লবিক কার্যে আত্ম-নিয়োগ করিলেন। এই মহীয়সী মহিলাকে পাইয়া শ্যামজী এবং তাঁহার সহকর্মীগণ সর্ব বিষয়ে সুসংবদ্ধ এবং শক্তিশালী হইলেন। তাঁহার যশ অল্প ইউরোপেও ছড়াইয়া পড়িল। তিনি ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মেনী ও সুইজারল্যাণ্ডে যাইয়া সমাজতন্ত্রী নায়কগণের সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন।

১৯০৮ অব্দে জার্মেনীর ষ্টুটগার্ট সহরে আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী সম্মেলন হয়। তিনি উক্ত সম্মেলনের প্রেসিডেন্ট প্যারিসের সুবিখ্যাত অধ্যাপক জোরে (Jaures) কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও করন্দিকরসহ তথায় গমন করেন। তাঁহাদের পরিকল্পনা মতে প্রস্তুত ভারতের জাতীয় পতাকাও সঙ্গে লইয়া যান। ১৮ই আগষ্ট প্রেসিডেন্টের আহ্বান পাইয়া তিনি উক্ত পতাকা উত্তোলন করেন।

বাসুদেবের কীর্তি।

১৯০৮ এর শেষ ভাগে কলিকাতাবাসী সংবাদপত্র পাঠে পুলকিত হইল। "রয়টার" সংবাদ দিয়াছে যে ভারত সচিবের সহকারী স্যার লী ওয়ার্নারকে (তিনি লর্ড কার্জনের বন্ধু ছিলেন তাঁহার রচিত "সিটিজেন্স অব ইণ্ডিয়া" নামক পুস্তক তৎকালে ভারতের সর্বত্র এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার্থীগণের অবশ্য পাঠ্য পুস্তক ছিল।" বাসুদেব ভট্টাচার্য্য নামে এক যুবক ইণ্ডিয়া অফিসে চপেটাঘাত করিয়াছে। আমরা উৎফুল্ল হইলাম, ছাত্রদের মেস ও বোর্ডিংগুলিতে এই সাহসী পলাশীর প্রতিশোধের প্রথম ধাপ বলিয়া মোটা রকমের ভোজের ব্যবস্থা

হইল। বাসুদেব ইণ্ডিয়া হাউসের একজন নবাগত বোর্ডার। বিচারে তাঁহার ১০ পাউণ্ড অর্থদণ্ড হইলে শ্যামাজী কৃষ্ণ বর্মাই তাহা দিলেন।

লণ্ডনে হত্যাকাণ্ড

১৯০৯ ইং অব্দের—২রা জুলাই লণ্ডনের সাউথ কেনসিংটন কলেজে এক সান্ধ্য সম্মেলনে ভারত সচিবের অন্যতম সহকারী স্যার কার্জন, ওয়াইলী মদনলাল ধিংড়া কর্তৃক রিভলবারের গুলিতে নিহত হইলেন। মদনলালকে পাকড়াও করার চেষ্টা করায় ডাক্তার লালকাকাও নিহত হইলেন। পরবর্তী গ্রেপ্তার প্রয়াসী ভারতীয় ছাত্র মদনমোহন সিং গুলির অভাবে হত বা আহত হইলেন না। এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ামাত্র সমগ্র ইংলণ্ডে হলস্থুল পড়িয়া গেল। মধ্য ইউরোপের সংবাদ পত্র সমূহেও ইহা বড় করিয়া প্রকাশিত হইল, কারণ ভারতবাসী যে ইংরেজের উপর অসন্তুষ্ট, ইংলণ্ডের দিন যে ঘনাইয়া আসিতেছে ইহা সে সকল দেশের অধিবাসীকে আলোকদান করিল। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের বিপ্লবপ্রয়াসীগণ আনন্দে আত্মহারা হইল। ১৯০৮ ও ১৯০৯ অব্দে শ্যামাজী তাঁহার পত্রিকায় "রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড-(Political Assassination) সমর্থন করিয়া দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কবিতার অধ্যাপক মেধিও আর্নল্ডও হত্যাকাণ্ডের সমর্থনে একটি কবিতা প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি খ্যাতনামা বেলিওল কলেজের কৃতি সন্তান। সুতরাং তাঁহাকে আর নিন্দা করিবে কে? মদনলাল "ফাঁসী মঞ্চেই জীবনের অবসান" পাইয়া গেল। ইংলণ্ডের বিভিন্ন সভাসমিতি ইংলণ্ডে ভারতীয় ছাত্রের আগমন নিয়ন্ত্রণ এবং "ইণ্ডিয়ান সোসিওলিষ্ট" বন্ধ করিয়া দিবার আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। গভর্ণমেণ্ট উক্ত পত্রিকা বন্ধ করিলেন এবং ইণ্ডিয়া হাউসের দ্বারও রুদ্ধ করিলেন।

ইণ্ডিয়া হাউসে বহুবিধ বৈপ্লবিক কার্য্য শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, সঙ্গে সঙ্গে সদস্যগণকে শক্তিশালী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য অস্ত্রাদি চালনা, টাইপ রাইটিং শর্টহ্যাণ্ড, প্রিন্টিং, কম্পোজিং, ঢালাই, লৌহ তাম্র ও অন্যান্য অর্থকরী শিল্প শিক্ষাও দেওয়া হইত। রাইফেল ক্লাবে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া সদস্যগণকে বুরপাল্লার ষ্টুটিং শিক্ষা দেওয়া হইত। ইণ্ডিয়া হাউস বন্ধ হওয়ায় বহু বিষয়ে অসুবিধা হইল। বিপ্লববাদিগণ ছত্র-ভঙ্গ হইলেন।

শ্যামাজীর মতি পরিবর্ত্তন

এই সময়ে সম্ভবতঃ ব্রিটিশ রাজপুরুষগণের প্রীতিলাভ করার জন্যই শ্যামাজী অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক সহস্র ষ্টার্লিং অর্থ দিয়া স্যার হার্বার্ট স্পেনসার লেকচার শীপ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দিলেন। কর্তৃপক্ষ কিছু সময় চিন্তা ভাবনা করিয়া তাঁহার প্রদত্ত অর্থ প্রত্যর্পণ করিয়া জানাইলেন যে তাঁহার মত ভারতে ইংরাজ শাসনের বিরোধী একজন ব্যক্তিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দাতা শ্রেণী ভুক্ত করা যায় না। এই বার্ত্তা প্রকাশিত হওয়ামাত্র তাঁহার সহকর্ম্মিগণ তাঁহার উপর বীতশ্রদ্ধ হইলেন। শ্যামাজী অতঃপর প্যারিসে চলিয়া গেলেন। মাদাম কামা, সাভারকর, চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সকলেই প্যারিসে উপনীত হইলেন।

নাসিকে জ্যাকসন হত্যা

১৯০৯ অব্দের ২১শে ডিসেম্বর নাসিকে ম্যাজিষ্ট্রেট জ্যাকসন নিহত হইলেন এই অপরাধে পুণা, নাসিক ও বোম্বের ৪০ জন ব্যক্তি ধৃত হইলেন এবং দীর্ঘকাল হাজত বাসের পর ৩৭ জনকে মুক্তি দিয়া ৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হইল। মিঃ বেসিলব্লট; চন্দ্রচারকর ও মিঃ বিটন এই ৩ জন জজ নিয়া গঠিত স্পেশল ট্রাইবুনালের বিচারে :

(১) অনন্ত-লক্ষ্মণ কান হোর।
(২) কৃষ্ণজী গোপাল কার্ভে।
(৩) বিনায়ক নারায়ণ দেশপাণ্ডে।

এই তিন জনের ফাঁসী, তিন জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ৭ জনের দুই বৎসর কারাদণ্ড হয়। আসামীগণ সকলেই 'অভিনব ভারতের' সদস্য ছিলেন। অ্যাকসন হত্যা ও বিচারকালে সাভারকর প্যারিসে ছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতে তাহার বিরুদ্ধে কোর্টে বহু তথ্য উৎঘাটিত করা হয় এবং তিনি যে ইউরোপ হইতে অস্ত্র সরবরাহ করিয়া এই হত্যাকাণ্ড করাইয়াছেন তাহাও বুঝিতে কষ্ট হইল না।

প্যারিসে বিপ্লবী দল

প্যারিসে উপনীত হইয়া মাদাম কামা ও তাহার সহকর্মিগণ শ্যামাজীর সঙ্গে বেশ একটা সম্বন্ধ রাখিলেন না। তাঁহারা প্রথমতঃ 'বন্দে মাতরম' পত্রিকা বাহির করিলেন। তারপর সাভারকর সঙ্কলিত "ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, চিত্রাদিসহ প্রকাশ করিলেন। অতঃপর 'ইণ্ডিয়ান ফ্রিডম' নামে দ্বিতীয় পত্রিকা (ইহা ১ম যুদ্ধের পূর্বে পর্যন্ত চলিয়াছিল) এবং তলোয়ার নামে একখানা পত্রিকাও বাহির করেন।

প্যারিসে মুক্তা ব্যবসায়ী ভারতীয়রা বিপ্লবীদলকে অর্থ দ্বারা সাহায্য করিতেন। মিঃ রানা নামাবতী প্রমুখ ব্যবসায়ীগণ মাদাম কামার সবিশেষ অনুরক্ত হইলেন। ভিখিজাই নামে জনৈক পার্সিবংশ ব্যবসায়ী শ্যামাজীর ভক্ত ছিলেন।

প্যারিসে আসিয়া বিপ্লবীগণ আইরীশ, পোলিশ, মিশরীয় ভারতীয়তাবাদী, তরুণ তুর্কী, নায়কগণের সঙ্গে বিশেষভাবে হৃদ্যতা স্থাপন করেন।

সাভারকর বন্দী

বিপুল উৎসাহে বিভিন্নমুখী কর্ম চালনা করার কালেই সহকর্মিগণের বাধা অগ্রাহ্য করিয়া সাভারকর লণ্ডন যাত্রা করেন এবং লণ্ডনে পৌঁছানমাত্রই বন্দী হন। এই অভাবনীয় ব্যাপারে দলের সর্বপ্রকার কার্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। মাদাম কামা তথাপি বুক বাঁধিয়া কার্য চালাইলেন।

সাভারকরকে নিয়া তারপর যে সকল ব্যাপার ঘটিল তাহা এক দীর্ঘ ইতিহাস। তাঁহাকে রাজনৈতিক অপরাধীর ন্যায্য আশ্রয়দানের অধিকার নিয়া সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল।

প্যারিসে মাদাম কামা দর্শন

১৯১২ ইং অব্দে বন্ধুবর জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রীকেদারেশ্বর গুহ, বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী পর পর প্যারিসে যাইয়া মাদাম কামা ও শ্যামাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসার পর আমি এবং ডুকারাম কৃষ্ণ লাড্‌ডু প্যারিস যাইয়া তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম এবং ৩ দিন ব্যাপী আলাপ আলোচনায় বৈপ্লবিক আন্দোলনের ভবিষ্যৎ পন্থা সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞাত হইলাম। মাঝে মাঝে বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শনী ও অন্য প্রকারের বৃহৎ সম্মেলনাদি উপলক্ষে আমাদের এমন কি অন্যান্য দেশের বিপ্লবীগণের সম্মেলনের ব্যবস্থা করাও স্থির হইল। সেই সময় বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ক্রাকোতে (cracow) এক আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়াছেন এই সংবাদও মাদাম কামা আমাদিগকে বলিলেন।

হামবুর্গে ভারত হিতৈষী

১৯১০ অব্দের গ্রীষ্মকালে আমি হামবুর্গে কলোনিয়াল ইন্‌সটিটিউটের ল্যাবরেটরীতে (আড়াই মাস) বিভিন্ন পদার্থ বিশ্লেষণ কার্য করার জন্য উপস্থিত হইলাম। যাত্রাকালে ভারত-হিতৈষী মহিলা বৃদ্ধা

ক্লাউসিমন তাঁহার তন্ত্রীপতি প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী হার নিজেমায়ার এর নিকট একখানা পরিচয় পত্র দিয়াছিলেন। নিজেমায়ার সে সময়ে কলিকাতার অবস্থিত জার্মান ব্যাঙ্ক এবং প্রোভার স্মিত কোংর সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি তাহার বন্ধু জার্মানীর সুবিখ্যাত হামবুর্গ-আমেরিকা-ষ্টীমার কোংর জেনারেল ম্যানেজার, জার্মান লেভী লীগের প্রেসিডেন্ট এবং আরও বহু প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হার আলবার্ট বালিনের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করাইয়া দেন। বালিন সম্রাজ্যবাদী এবং এ জন্যই গ্রেট ব্রিটেনের পৃথিবীব্যাপী আধিপত্যের বিরোধী ছিলেন। তাঁহার গৃহে সিনফাইন্সগণ মিশরের জাতীয়তাবাদী করিদ বে, নব্য তুর্কী দলের এনভার বে, মুক্তী বে, তালাত বে প্রভৃতি সর্বদাই আনাগোনা করিতেন। আলাপ আলোচনার পর তিনি ভারতীয় জাতীয়তা-বাদীগণকে অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এই সংবাদ পাইয়া বন্ধুবর বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র দাশগুপ্ত এবং তাঁহাদের সঙ্গে সুইজার্লণ্ড হইতে আগত পদ্মনাভম পিলাই যাইয়া হামবুর্গে উপস্থিত হইলেন। বালিন ফোনে এই সংবাদ পাইয়া সন্ধ্যাবেলা সুশোভন ডেইমলার গাড়ী পাঠাইয়া আমাদিগকে তাঁহার আলষ্টার নামক হ্রদের তীরবর্তী অলষ্টার ভবন নিবার ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার আশ্বাসপূর্ণ ভাষণ শুনিয়া বন্ধুগণ উৎসাহের আতিশয্যে যেন কাটিয়া পড়েন।

হার বালিন যখন বলিলেন যে তিনি বিনামূল্যে ও বিনাব্যয়ে ভারত উপকূলে রিভলভার, পিস্তল প্রভৃতি পাঠাইবেন, তখন আমি বলিলাম যে ডেলিভারী নিবার ব্যবস্থা করিয়া আমরা তাহাকে সংবাদ দিব। বালিন বন্ধুগণকে তাঁহাদের কোম্পানীর সেই হাউসেই থাকার ব্যবস্থা করিলেন। পরদিনও সন্ধ্যার পুনরায় কথাবার্তা ও খানাপিনার পর রাত্রের গাড়ী ধরিয়া বন্ধুগণ বালিন যাত্রা করেন। অতঃপর কিছু কিছু অস্ত্রশস্ত্র হার বালিন ভারতের বিভিন্ন উপকূলে পৌছাইয়া দিলেন।

ড্রেস ডেন ও লাইপজিকে সম্মেলন

১৯১২ অব্দের আগষ্ট মাসে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর কালে ড্রেস ডেনে এবং ১৯১৩ অব্দের জুলাই মাসে লাইপজিকে আন্তর্জাতিক মুদ্রণ ও সংশিষ্ট শিল্পাদির প্রদর্শনীতে ভারতীয় বিপ্লবীগণের সমাবেশ হয়। প্রথমটিতে ১৫ কি ১৬ জন, দ্বিতীয়টিতে কতিপয় সিনফাইন ও মিশরের করিদ বে সহ ২০ জন উপস্থিত ছিল।

সুইজারল্যাণ্ডে সম্মেলন

১৯১৩ অব্দে বড়দিনের সময়ে সুইজারল্যাণ্ডের বেয়ার্ণে একটি সম্মেলন হইল। পিলাই অভিনব পন্থায় সম্মেলন আহ্বান করেন। সুব্রহ্মণ্য নামক মাদ্রাজী তরুণ বিদ্যার্থী একটি পলিটেকনিকে অধ্যয়নের নামে ঘুরাঘুরি ও নানাপ্রকার ঘটনা করিতেন। তিনি ছিলেন সকলের নিকট অতি প্রিয়। অকস্মাৎ কাল বর্তার দেওয়া এক শোক বিজ্ঞাপন পত্র পাইয়া দেখিলাম তাহার মাতৃবিয়োগ হইয়াছে। এবং বড়দিনের পূর্বে ২৩শে ডিসেম্বর বেয়ার্ণের এক হোটেলে শ্রাদ্ধ এবং বর্ষীয়সভা হইবে। সঙ্গে সঙ্গে একখানা পৃথক কার্ডে পিলাইও যাওয়ার অনুরোধ জানাইয়াছেন। সুতরাং প্যারিসের হইতে সিন্ধিক, বার্লিন হইতে দাশগুপ্ত, চক্রবর্তী বীরেন সরকার, জেনা হইতে শ্রীশচীন্দ্র সেন, শর্মাশিব রাও প্রমুখ বিপ্লববাদীগণ যথাকালে উপস্থিত হইলেন। আমি ও ভূকারাম কৃষ্ণ লাডজু হানে হইতে যাত্রা করিলাম। আমরা ল্যাবোরেটোরীতে শোক বিজ্ঞাপন পত্রের মূল পাতাটী পরীক্ষা করিয়া সম্মেলনের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিয়াছি। ডঃ অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বিপ্লবী বীর চিত্তপ্রিয়

চিত্তপ্রিয়।—পরাধীন ভারতকে স্বাধীন করার জন্য সর্বভারতীয় সশস্ত্র বিপ্লবের একদিনকার বীর বাঙালী-নায়ক যাদা-যতীন (শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-এর "ডান-হাত" শ্রীচিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী। অবিভক্ত বাংলার নদীয়া জেলার কয়া গ্রামে মামার বাড়িতে যতীন্দ্রনাথের জন্ম—১২৮৬ বঙ্গাব্দের, (১৮৮০ খৃঃ) ২১শে অগ্রহায়ণ।

জীবন-যাত্রায় যেমন মিল, তেমনি আশ্চর্য মিল ছিল যতীন-চিত্তর জন্মদিনেরও। চিত্তপ্রিয় জন্ম গ্রহণ করেন ২১শে অগ্রহায়ণ ১৩০১ বঙ্গাব্দে (১৮৯৪ খ্রীঃ)। সব ভারতের কলহিঘাট—বালেশ্বর জেলার বুড়ীবালাম নদীতীরে চাষখণ্ডের যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রায়ই আলোচনা হয়; কিন্তু সেই যুদ্ধের প্রথম শহীদ চিত্তপ্রিয় যেন বিস্মৃতির পথে। আমরা ভুলে যাই, চিত্তপ্রিয়কে যতীন নিজের হাতে গড়ে তুলেছিলেন, নিজের মনোমত করে; চিত্তপ্রিয় ছিলেন যতীনের ডান হাত। তাঁর মৃত্যুই যতীনের জীবনে এক অভাবনীয় ভাবান্তর এনে দিয়েছিল, যার জন্য তাঁর মত সেনাপতি ধরা দিলেন শত্রুর হাতে, যুদ্ধক্ষেত্রে মরণকে আলিঙ্গন না দিয়ে।

চিত্তপ্রিয়র জন্মস্থান, বর্তমান পূর্বপাকিস্তানের অন্তর্গত ফরিদপুর জেলার খালিয়া গ্রামে। জন্ম হয় ১৩০১ বঙ্গাব্দের ২১শে অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার রাত্রি দশ ঘণ্টের সময়। তাঁর বাবা—শ্রীপঞ্চানন রায়চৌধুরী ছিলেন মাদারীপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক; এবং অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট। তাঁর চার ছেলে চার মেয়ে।

ছেলেবেলা থেকেই চিত্তপ্রিয় অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ, শক্তি-উপাসক। প্রথমে তিনি খালিয়ার স্কুলেই পড়তেন। ঐ গ্রামের কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পরম বন্ধু, বয়সে কিছু বড়। কালীপ্রসাদদের একটি শিব মন্দির ছিল। চিত্তপ্রিয় সেই মন্দিরে প্রত্যহ বহুক্ষণ ধরে ধ্যান করতেন। শোনা যায়, প্রাণায়াম করার সময় তিনি নাকি মেঝে ছেড়ে শূন্যে উঠে পড়তেন।

লেখা-পড়া করার চেয়ে ধর্মচর্চাই প্রবল দেখে পঞ্চাননবাবু চিত্তপ্রিয়কে মাদারীপুর নিয়ে যান এবং সেখানের বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন। সেখানেও তাঁর ধর্মভাব মোটেই কমেনি। মাদারীপুর কালী বাড়িতে যেতে থাকেন চিত্তপ্রিয় এবং প্রাণায়ামাদিও করতে থাকেন।

বাঘা যতীন প্রথমে কাজ করতে যান মজঃফরপুরে। সেখানের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ কেনেডীর ষ্টেনোগ্রাফার হলেন তিনি। মাইনে ৮০ টাকা। এই কেনেডীর স্ত্রী-কন্যাই প্রফুল্ল-ক্ষুদিরামের বোমায় মারা যান। সেখানে কিছু দিন কাজ করার পর যতীন ফিরে এলেন কলকাতায় বাংলা সরকারের ষ্টেনোগ্রাফার হয়ে। কিছুকাল পরে তিনি স্যার হেনরী হুইলারের কন্‌ফিডেন্সিয়াল্ ক্লার্ক হন। তখনই তিনি জানতে থাকেন ইংরাজের গুপ্ত শাসন-ব্যবস্থা, তৈরী হতে থাকেন ভারত-মুক্তির কাজে। ১৯১০ সালে 'বিপ্লবপের'র কথামত ইংরেজ সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করলেন হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী হিসাবে। তিনিই নাকি সামসুল আলমকে মারার জন্য বীরেন্দ্র দাসগুপ্তকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর সংগে ধরা পড়েন—নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, (যতীন্দ্র রায়), সুরেশ মজুমদার প্রভৃতি ৫০ জন। এক বছর জেল হাজতে অশেষ দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করার পর ১৯১১র এপ্রিলে তিনি মুক্তি পেলেন। কিন্তু তাঁরই ভালর জন্য স্যার হুইলার তাঁকে চাকুরী ছেড়ে দিতে বলেন; তাই করলেন যতীন। কিন্তু স্ত্রী এবং দুটি ছেলে—ভেকেন্দ্র ও বীরেন্দ্র, মেয়ে আশা (রায় চৌধুরী)-র ভরণ-পোষণ করা তো তাঁরই কর্তব্য। তিনি স্বাধীন ভাবে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের পথ-তৈরী ও মেরামতির কনট্রাক্টরী করতে থাকেন। এ কাজ করেন পেটের জন্য এবং বৃহত্তর স্বার্থের কল্যাণে করে যান দেশ মাতৃকার মুক্তি-সাধনা। যখন যেখানে যান, সেখানেই যুবকদের সংগঠনের ব্যবস্থা করেন। কাজের জন্যই তিনি যান মাদারীপুর এবং দুগাছর গ্রামের বিপ্লবী পূর্ণ দাসকে পেলেন সেখানে। তাঁরই মাধ্যমে চললো ঐ মাদারীপুর কালী বাড়িতে বিপ্লবী তৈরীর কাজ। পূর্ণ দাস যতীনের হাতে তুলে দিলেন চিত্তপ্রিয়কে। যতীন তাঁকে দেখলেন, চিনলেন, ভালবাসলেন এবং মনোমত ক'রে গড়তে লাগলেন। চিত্তপ্রিয় পূর্ণ দাসেরও পরম-প্রিয় সৈনিক ছিলেন। পূর্ণবাবুর আরও দু'জন শিষ্য খৈয়ার ডাঙার ছেলে ও মাদারীপুর স্কুলের ছাত্র মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত এবং নীরেন্দ্র চন্দ্র দাসগুপ্তও চিত্তপ্রিয়র সংগে যতীনের হাতে গিয়ে পড়লেন।

১৯১৩ সালে পুলিস এঁদের প্রকাশ করলো, ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলার আসামীরূপে। চিত্তপ্রিয়, পূর্ণদাস, নীরেন্দ্র, মনোরঞ্জন, কালীপ্রসাদ সহ ২৭ জনকে কতকগুলি স্বদেশী-ডাকাতির জন্যে অভিযুক্ত করা হ'ল। কয়েক মাস পরে পুলিস আর সেই মামলা চালালো না। এবার চিত্তকে সংশোধন করার চেষ্টা চললো তাঁর পরিবারের দিক থেকে। তাঁর ঠিক ওপরের দিদির স্বামী শ্রীমোহিনী মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে নিয়ে গেলেন গোয়ালন্দে, তাঁর দাদাদের কাছে। তাঁর দু'জন দাদা—সত্যপ্রিয় ও নিত্যপ্রিয় তখন আর-এস-এন কোম্পানীতে বড় কাজই করতেন। সংশোধন করার বিশেষ চেষ্টাই করা হ'ল; কিন্তু কাজ কিছু হ'ল না। চিত্তপ্রিয় তাঁর জীবনকে দেশ-মাতৃকার পায়ে পূর্বেই উৎসর্গ ক'রে দিয়েছেন নিষ্ঠার সঙ্গে এবং সে ছিল নিষ্ঠাই—বিলাস নয়।

শ্রীমোহিনী মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খালিয়ার পার্শ্ববর্তী আমগ্রামের অধিবাসী এবং চাষধণ্ডের যুদ্ধের অনেক আগে থেকেই কটকে বাস করছেন। তিনি সেখানের একজন নামী ব্যক্তি। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বালক চিত্তপ্রিয়কে খুবই ভালবাসতেন এবং চিত্তপ্রিয়র মহামরণের পরও তাঁকে ভোলেন নি তিনি। মোহিনী-দাদু যদি কয়েক বছর আগে আমাদের চিত্তপ্রিয়র কথা না জানাতেন, তা, হ'লে, এ সামান্য রচনাটুকু লেখাও আমার পক্ষে সম্ভব হত না। মোহিনীবাবু সম্পর্কে আমার দাদু' হন। আমিও একদিন পেয়েছি তাঁর স্নেহ। চিত্তপ্রিয়র সঠিক বিবরণ জানাবোর আর কেউ নেই। আপন যারা, তাঁরা চলে গেছেন। একজন ছিলেন, যিনি কিছু বলতে পারতেন; কিন্তু তিনিও স্বাস্থ্যে ও বুদ্ধিতে অথর্ব (১৯৫৬-র কথা)।

চিত্তপ্রিয় ও তাঁর বন্ধু দু'জন যাদবপুর স্কুল থেকে বিতাড়িত হলেন। কলকাতায় এলেন তাঁরা এবং অনেক চেষ্টার পর চিত্তপ্রিয় কেশব অ্যাকাডেমিতে ও অন্য দু'জন খ্রীকৃষ্ণ ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হতে পারলেন। ভর্তি হলেন, কিন্তু পুলিস রইলো পিছনে। তাঁরাও ছাত্র জীবনকে সামনে রেখে, বিপ্লবী জীবনকে পূর্ণতায় ভরার সাধনা করে চললেন। বেলেঘাটার ট্যাক্সি থেকে অর্থ-সংগ্রহে (অনেকে বলবেন ডাকাতিতে) নীরেন ও মনোরঞ্জন সক্রিয় ছিলেন।

১৯১৪ সালে ইংরেজের সঙ্গে জার্মানীর যুদ্ধ শুরু। ঐ বছরেই ২৮শে অক্টোবর রডা কোম্পানীর ২০২ বাক্স অস্ত্রশস্ত্র কাস্টমস্-হাউস থেকে কোম্পানীর ঘরে আনার সময়, তাঁদের কর্মচারী অন্যতম বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র সরকার দশটি বাক্স সরিয়ে ফেললেন জেলে পাড়ার কোন বাড়িতে। যতীন, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী, মলঙ্গা লেনের অনুকূল মুখুজ্যে ও বউবাজারের গিরীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সেগুলির ব্যবস্থা করলেন। টাকার সংগ্রহও চলে। অস্ত্রশস্ত্র কিনতে হবে। ২১শে ফেব্রুয়ারী সর্বভারতীয় বিপ্লবকে সার্থক করার জন্য মহানায়ক রাসবিহারীর সঙ্গে যতীনের কথাবার্তা চললো। তখন চিত্ত, নীরেন ও মনোরঞ্জনের খোঁজেও পুলিসের দু'বিভাগই সক্রিয়। যতীন তো আছেনই বড় শিকার। চিত্তপ্রিয় ততদিনে খুনী আসামী। লুকিয়ে কাটছে দিন। আই-বি-ইন্সপেক্টর সুরেশ মুখুজ্যের খোঁজার বিরাম নেই। ওঁরাও তাঁকে বাগে পাচ্ছে না। ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। এক সকালে যতীন প্রতিজ্ঞা করলেন, সূর্যাস্তের আগে সুরেশ মুখুজ্যেকে মারতে না পারলে তিনি আর জলস্পর্শ করবেন না। ভীষণ প্রতিজ্ঞা। এ তো আর প্রতিজ্ঞায়—কল্পতরু'র বিলাস নয়। তাঁর কর্মীরা বেরুলেন। তাঁরা শুনছেন, খড়গপুরের শুভাগমনের সু-ব্যবস্থা ক'রে ঐ দিনই মুখুজ্যে মশাই কর্ণওয়ালিশ-ষ্ট্রীট দিয়ে ফিরছেন। খুনের আসামী চিত্তপ্রিয় গায়ে চাদর জড়িয়ে বসলেন হেদোর পাশে রাস্তার ধারে। যথা সময়ে মুখুজ্যে মশাই এলেন সে-পথে। দৃষ্টি তাঁর চারদিকে। চোখে পড়লেন চিত্তপ্রিয়। ছুটে গেলেন তাঁর কাছে ; কিন্তু ধরার চেষ্টা করতেই চাদর-ঢাকা পিস্তল বেরুলো, গর্জে উঠলো। মুখুজ্যেও তো পাকা লোক। নিজেকে প্রথমটায় বাঁচালেন ; কিন্তু দিন যে তাঁর ফুরিয়েছে—বাগানের ভিতর থেকে গুলি ছুটে এসে তাঁকে ধরাশায়ী করলো। আর চিত্ত উঠে গিয়ে তাঁর জীবন দীপ দিলেন নিবিয়ে।

একটা বাধা সরলো। কিন্তু আবার একটি—গোয়েন্দা নীরদ হালদার পিছু নিলেন। পাথুরে-ঘাটার এক গুপ্ত-আবাসে ২৩শে ফেব্রুয়ারী, চিত্ত, নীরেনকে নিয়ে যতীন আছেন। হঠাৎ সেখানে শ্রীহালদার। যতীন নির্দেশ দিতেই তাঁকে গুলি করা হ'ল। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা উধাও। কিন্তু মরার আগে হালদার পুলিসকে অনেক তথ্য জানিয়ে দিলেন।

বিপ্লবী দল যতীনকে আর কলকাতায় রাখতে চান না। নায়ককে বাইরে সরাতেই হবে। আকাঙ্ক্ষিত দিনও এগিয়ে আসছে—মেভারিক জাহাজ জার্মান দেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসছে। যতীন, নরেন, যাদুগোপাল ও অতুল ঘোষ ঠিক করেছেন, হাতিয়া, কলকাতা ও বালেশ্বরে মাল নামানো হবে ; এবং তিনটি জায়গা থেকে এক সঙ্গে চালানো হবে মুক্তি-সংগ্রাম। বালেশ্বর থেকে যতীন মাদ্রাজ রেলপথ, চক্রধরপুর থেকে ভোলানাথ চাটুজ্জে বি-এন রেলপথ ও সতীশ চক্রবর্তী অজয়-নদীর ওপরকার ই-আই-আর রেলপথ উড়িয়ে দেবেন। বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ও নরেন ভট্টাচার্যের উপর কোর্ট-উইলিয়াম এবং কবি চক্রবর্তী ও নরেন চৌধুরীর উপর পূর্ববঙ্গ রক্ষণের ভার দেওয়া হ'ল।

যতীন তাঁর গন্তব্যস্থলের দিকে যাত্রা করলেন। যান মেদিনীপুরের ওপর দিয়ে। রাতে চলেন, দিনে থাকেন লুকিয়ে। মেদিনীপুরে কয়েকদিন ছিলেন। সঙ্গে—চিত্তপ্রিয়, নীরেন, মনোরঞ্জন ও জ্যোতিষ। জ্যোতিষ পালের বাড়ি ছিল তখনকার নদীয়া জেলার খোকসা গ্রামে।

এই ক'জন যতীনের একান্ত সহচর। এঁদের কোথায় রেখে যাবেন? চিত্তর মাথার উপর তো শত্রুর খাঁড়া ঝুলছে। মা থাকতেন খালিয়ায়। ধূমকেতুর মতই চিত্ত মাঝে মাঝে মাকে দেখতে যেতেন, আবার সরতেন ঐ ভাবেই। একবার বড় ইচ্ছা হ'ল মায়ের রান্না খেতে। খাচ্ছেন—তখনই এলো পুলিসের আগমন বার্তা। খাওয়া হ'ল না। পুলিস বিরক্ত হয়ে, তাঁর বড়দা'র কিশোর পুত্র কান্তিপ্রিয়র কাছে কৌশলে এক রিভলবার রেখে, তাকে গ্রেফতার করে। কান্তির ছয় মাসের জেল হ'ল। এরপর চিত্তপ্রিয় আর খালিয়া যান নি।

যতীন সঙ্গীদের নিয়ে মযূরভঞ্জের কাছে পার্বত্য অরণ্যে আশ্রয় নিলেন। তাঁরা পাঁচজন একসঙ্গে থাকতেন না। তিন জন বহলদীয়ায় ও দুজন সেখান থেকে প্রায় কুড়ি কিলোমিটার দূরে তাল বাঁধে থাকতেন। কথা ছিল মেভারিক খালি বেরিয়ে পথে অ্যানিলাসেন্-জাহাজ থেকে মাল তুলে নেবে এবং রাতে এসে পৌঁছুবে। খাড়া ভাবে সারি সারি আলো দেখে মেভারিককে চেনা যাবে। রায় মঙ্গলের কাছে এক জমিদার লোকজন দিয়ে সাহায্য করবেন। কিন্তু জুন শেষ হ'ল মেভারিক এলো না। আমেরিকার জাহাজ অ্যানিলার্সেন্‌কে ধরে ফেলে মাল বাজেয়াপ্ত করে। নীলসেন নামে এক জার্মানের বাড়িতে থেকে রাসবিহারী বসু ও অবিনাশবাবু যে অস্ত্রশস্ত্র 'হেনরী এণ্ড' নামক জাহাজে পাঠালেন, তাও পথে মারা গেল।

যতীন কলকাতা থেকে পালিয়েছেন, একথা অজানা রইল না কলকাতা পুলিসের। সন্ধান করতে করতে তারা কলকাতার হ্যারি অ্যাণ্ড সন্স-এ হাজির হল ১৯১৫র ৭ই আগষ্ট। সেখান থেকে ৪ঠা সেপ্টেম্বরে গেল ঐ প্রতিষ্ঠানের বালেশ্বর-শাখা ইউনিভার্সাল-এক্সপ্লোরিয়াম-এ। বিপ্লবীদের এক আড্ডা ছিল ঐ হ্যারি-অ্যাণ্ড সন্স। বালেশ্বর শাখার এক বাঙালী-যুবককর্মী অত্যাচারের ভয়ে পুলিসকে জানালো যতীনদের লুকিয়ে থাকবার কথা। মরিয়া হয়ে ওঠে পুলিস বাহিনী। বালেশ্বরের জেলাশাসক মিঃ কিলবী কলকাতার মিঃ টেগার্ট ও মিঃ বার্ডকে পাঠানোর অনুরোধ ভারত-সরকারকে করলো। ৭ই সকালে একত্র হ'ল সবাই।

পুলিসের পক্ষ থেকে চললো স্থানীয় লোকদের তোয়াজ। সবাইকে জানানো হল—একদল ডাকাত বনে এসেছে; ধরিয়ে দিলে পুরস্কার। তারা যতীনদের ঘর ঘেরিয়ে রেখে। সৈন্যবাহিনী গিয়ে শূন্যঘর পেলো। তিনজন সাহেব হাতী করে বনে ঘুরছে এ খবর যতীন আগের রাতেই পান। তাঁরা ঘর ছেড়ে একত্র মিলিত হলেন। ৮ই দিন-রাত্রি পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে থাকলেন তাঁরা। আহার দূরের কথা, পানীয়ও জুটলো না। ৯ই সকালে ক্ষুধা-তৃষ্ণা অসহ্য হ'ল। বনের ধারে এক দোকানে খাবার কিনতে গেলেন। বললেন—তাঁরা শিকারী, পথ হারিয়েছেন, খাবার ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু স্থানীয় লোকেরা তাঁদের সেই ডাকাত সন্দেহ করে এবং পুরস্কারের লোভে ছোটে টেগার্টের দলকে খবর দিতে। যতীন বুঝলেন সেখানে থাকা আর উচিত নয়। চললেন বন-পথে। দোকানের লোকও পিছু নেয়। ওদের ভয় দেখাতে মনোরঞ্জন গুলি ছোড়েন। তাতে একজন আঘাত পাওয়ায় তাদের সন্দেহ আরও বাড়লো। ওদিকে পুলিস বাহিনীর আসার লক্ষণও পাওয়া যাচ্ছে। যতীনরা ছুটলেন বনের মধ্যে হারিয়ে যেতে। পারলেন না। সৈন্যরা এসে গেল আবার জ্যোতিষ হঠাৎ খুবই অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন। তাঁকে তো ফেলে যাওয়া যায় না। নিয়েই চলেন। কিন্তু এভাবে বেশী দূর যাওয়া সম্ভবপর হয়নি। সৈন্যরা এসে পড়েছে। তাঁরা তখন জ্যোতিষকে শুইয়ে একটা তুঙ্গ ঘাস

করে নেন এবং তার আড়াল থেকে চালালেন সংগ্রাম। তুমুল সংগ্রাম। একদিকে চারজন মুক্তি-যোদ্ধা আর অন্যদিকে তিন শতাধিক সশস্ত্র পুলিস। সেই প্রাণ দেওয়া-নেওয়ার সংগ্রাম কিছুক্ষণ চলার পর পুলিসের একটা গুলি যতীনের উরু ভেদ ক'রে যায়। দৃকপাত নেই সেদিকে সেনাপতির। চলছে যুদ্ধ। এক সময় পাশে কী এক পড়ার শব্দ হ'ল। তাকিয়ে দেখেন যতীন—তাঁর চিত্তপ্রিয় পড়ে। প্রাণহীন; ভেঙে গেল তাঁর ডান-হাত। প্রায় ১৫টা বছর যিনি কত কৌশলে ব্রিটিশের সঙ্গে সশস্ত্র বিপ্লবে সৈন্যাপত্য করেছেন, এক মুহূর্তেই তাঁর কি ভাবান্তর হ'য়ে গেল। তিনি উঠে গিয়ে চিত্তপ্রিয়র প্রাণহীন দেহ কোলে তুলে নিলেন, সঙ্গীদের নির্দেশ দিলেন—সাদা রুমাল উড়িয়ে সন্ধির প্রস্তাব করতে। সঙ্গীরা চিত্তপ্রিয়র মতই শহীদ হবার আশা প্রকাশ করেন; কারণ ধরা দিলেই তো ঝুলতে হবে ফাঁসি-কাঠে। কিন্তু আবার নায়কের নির্দেশ। সাদা রুমাল ওড়াতে হল।

ভগিনীপতি মোহিনী মোহন যখন চাষবেডের যুদ্ধের কথা শুনলেন তখনই বুঝলেন যে, চিত্তপ্রিয়ও সেখানে ছিলেন। জানলেন পরে—চিত্তপ্রিয়র জীবনের ইতিহাস লেখা শেষ হয়ে গেছে। তখন তিনি শহীদের মৃতদেহটি পাবার অনেক চেষ্টাই করেন, কিন্তু তা চোখেও দেখতে পান নি। কড়ধার কামরার রেখে, বালেশ্বর থেকে কটক দিয়ে কোন্ সে অজানার কোলে চিত্তপ্রিয়র দেহকে নিক্ষেপ করা হ'ল হয়তো। ভারতের কেউ সে হিসাব রাখতে পারেন নি।

নব-ভারতের হলদীঘাট, বুড়ীবালামের তীরে মুক্তিসংগ্রামের প্রথম শহীদ চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী। প্রণাম তাঁকে।

শ্রীকণা দেবীভারতী

• • • • •

"বঙ্গভঙ্গের তারিখে, ৩০শে আশ্বিন (১৬ই অক্টোবর ১৯০৫) কলিকাতার দোকানপাট সব বন্ধ ছিল। বাঙ্গালীরা গঙ্গাস্নান করিয়া পরস্পরের হাতে রাখী বাঁধিয়া ভ্রাতৃত্বকে দৃঢ় করিলেন ও সমস্ত দিন অনাহারে থাকিয়া ভগবানের নিকট নিজেদের দুঃখ দৈন্য জ্ঞাপন করিলেন। তারপর তাঁহারা একতার ভাবকে রূপ দেওয়ার জন্য এক বিরাট সভায় মিলিত হইলেন। স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয় তখন অত্যন্ত পীড়িত ছিলেন, তথাপি তাঁহাকে বহন করিয়া সভাস্থলে সভাপতিত্ব করার জন্য আনা হইল। ঐক্য স্থাপনের জন্য একটি স্মৃতি মন্দির স্থাপন করার অভিপ্রায়ে সার্কুলার রোডের পূর্বদিকে অনুমান ত্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের উত্তর দিকে এক খণ্ড ভূমি নির্দিষ্ট করা হইল। এই ভূমি খণ্ডে বসু মহাশয় স্মৃতি মন্দিরের (Federation Hall) ভিত্তি স্থাপন করিলেন এবং তাঁহার লিখিত একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠ করিয়া দেশ বাসীর মনে স্বদেশী ও একতার ভাব বদ্ধমূল করার প্রয়াস পাইলেন। সভা বসিবার পূর্বেই বাগবাজারে পণ্ডপতি বসু মহাশয়ের বাড়িতে গিয়া বহু সহস্র লোক জাতীয় ধনভাণ্ডারে এক দিনের সমস্ত আয় দিয়া আসিলেন। এই সভার পর আর এক সভায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত 'সোনার বাংলা' সংগীতটি গীত হইল। এই সংগীত শুনিয়া সমবেত বহু জনতা মুগ্ধ হইলেন ও দেশপ্রীতিতে উদ্বুদ্ধ হইলেন। ৩০শে আশ্বিন দিনটি জাতির নবজন্ম ও স্বাধীনতা লাভের সংকল্প গ্রহণের দিন হইয়া পড়িল।"

নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজ

দূরপ্রাচ্যে সিঙ্গাপুরের তথাকথিত দুর্ভেদ্য যুদ্ধক্ষেত্র বলমল করছে। জাপানের প্রধানমন্ত্রী টজো সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর কুচকাওয়াজ দেখলেন। মিউনিসিপ্যাল অফিসের সর্বোচ্চ তোরণের উপর দাঁড়িয়ে সুভাষচন্দ্র তাঁর পাশে,—দেখলেন দায়িত্বভার—শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে ভারতীয় জাতীয় সংগ্রামের সৈনিকবৃন্দ—সেনাপতি ও সৈন্যাধ্যক্ষগণ—তাদের হৃদয় আজ আনন্দে ও গর্বে উদ্বেলিত—জাপান তার শুভেচ্ছা ও বন্ধুত্বের বাণী প্রেরণ করেছে তার প্রধান মন্ত্রীর মারফতে। এ তাদের বিশেষ সম্মান যে টজো তাদের এই নব-গঠিত সেনাবাহিনীর সামরিক অভিবাদন গ্রহণ করলেন এবং দেখলেন দৃঢ় সংকল্পে কঠিন তাদের মূর্তি ও দেশপ্রীতির অনুভূতি তাদের সারা চোখেমুখে এক অবর্ণনীয় মহিমা প্রকাশ করছে। স্বাধীন ভারতের মুকুটবিহীন রাজা ("The uncrowned king of free India") দাঁড়িয়ে আছেন তাদের সম্মুখে। সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা—অতি আশ্চর্য সে অনুভূতি।

সুভাষচন্দ্র প্রধানমন্ত্রী টজোকে এক অনবদ্য ভাষণে অভিনন্দন জানালেন। অনেক কথার মধ্যে তিনি বললেন—

"আমি নিজেকে মনে করি যে আমার বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ৩৮ কোটি দেশবাসীর আমি সেবক মাত্র। আমি এমনভাবে আমার কর্তব্য করে যেতে চাই যাতে এই ৩৮ কোটি লোকের স্বার্থ আমার হাতে নিরাপদ থাকে, যাতে প্রত্যেক ভারতবাসী আমার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে দ্বিধা না করে। একমাত্র অবিমিশ্র জাতীয়তাবোধ এবং অবিকৃত ন্যায়পরতা ও পক্ষপাত-শূন্যতার ভিত্তিতেই ভারতের মুক্তি ফৌজ গড়ে তোলা যেতে পারে। ... আজাদ হিন্দ ফৌজকে এক মহৎ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। তার জন্য চাই নিজেদের সৈনিক করে গড়ে তোলা। আমাদের একটিমাত্র লক্ষ্য থাকবে—সেটি হচ্ছে—ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য—"করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে"। আমরা যখন দাঁড়াব তখন আজাদ হিন্দ ফৌজকে হতে হবে একটা নিরেট পাথরের দেওয়ালের মত, যখন আমরা চলতে থাকব তখন আজাদ হিন্দ ফৌজকে হতে হবে ষ্টীম-রোলারের মত।"

সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরের সভায় শুধু নয় জাপানের 'ডায়েট' বা পার্লামেন্টেও বলেছিলেন যে—India's freedom has to be achieved by India's blood, sweat and tears,"—তিনি অর্থ চাইলেন, মানুষ চাইলেন জাতীয় বাহিনীতে যোগদানের জন্য। বললেন—আপাতত: ৩ কোটি টাকা চাই ১ লক্ষ সৈন্য চাই পূর্ব-এশিয়ার অধিবাসী ৩০ লক্ষ ভারতীয়দের মধ্য থেকে। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সৈনিকদের মধ্যে ৯১,০০০ সৈন্য আত্মসমর্পণ করে সিঙ্গাপুরে। তাদের মধ্য থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিলে ৩০,০০০ এবং ধীরে ধীরে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্য সংখ্যা দাঁড়িয়ে গেল এক লক্ষ বিশ হাজার আর সমর শিক্ষায় উত্তীর্ণ অসামরিক কর্মচারীর (non-combatant) সংখ্যা দাঁড়াল ৪০,০০০।

ইতিমধ্যে বর্মার পতন হয়েছে জাপানীদের হাতে, এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া দেশগুলিতেও পরাজয় ঘটেছে ব্রিটিশের। ৮ই জুলাই তারিখের মন্ত্রিসভা ও সৈন্যাধ্যক্ষের প্রতিনিধি সভার যৌথ অধিবেশনে সকলে নেতাজীকে যুদ্ধ ঘোষণা করার জন্য অনুরোধ করলেন। আপাতভাবে চারিদিকে সুযোগ থাকলেও তিনি সুষ্ঠুভাবে সৈন্যবাহিনী সংগঠিত হওয়ার পূর্বে সে প্রস্তাবে রাজি হলেন না—বললেন, আমি আপনাদের কাছ থেকে প্রকৃত বিবরণ জানতে চাই তুই সপ্তাহের মধ্যে—কি আমাদের সামরিক শক্তি লোকবল, অর্থবল কত? জয়-পরাজয় বড় কথা নয়—কিন্তু ভবিষ্যৎ ইতিহাসকার বলবে যে প্রকৃত যুদ্ধ প্রস্তুতির পূর্বেই অনভিজ্ঞতার জন্য আমরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে দেশের পরাধীনতার শৃঙ্খল আরো দৃঢ়তর করে দিলাম। ভারতের সম্মানের সঙ্গে জড়িত আজাদ হিন্দ ফৌজের সম্মান—সে সম্মান আমি অবিকৃত ও অক্ষুণ্ণভাবে ফিরিয়ে দিতে চাই দেশকে—তার স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে।

তারপর থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত তিনি প্রায় সকল সৈন্য সমাবেশ ঘাঁটি ও শিক্ষণ কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করলেন এবং বোমাবিধ্বংসী Anti Air Craft Gun কতগুলি কোথায় আছে তার পরিসংখ্যানসহ নিখুঁত রিপোর্ট জমা হল সর্বাধিনায়ক নেতাজীর হস্তে।

১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে—ভারতীয় স্বাধীনতা-সংঘের সভা, মন্ত্রিসভা ও আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারদের নিয়ে আলোচনা করে নেতাজী স্থির করলেন যে যুদ্ধ ঘোষণার পূর্বে গভর্ণমেন্ট বা জাতীয় সরকার স্থাপনের প্রয়োজন আছে—কারণ যুদ্ধ ঘোষণা করার এক্তিয়ার একমাত্র কোনো গভর্ণমেন্টেরই থাকে। তাহলেই যুদ্ধ ঘোষণা আইনসিদ্ধ বলে স্বীকৃত হবে।

২১শে অক্টোবর আজাদ হিন্দ গভর্ণমেন্ট নিম্নলিখিত বিভাগে সংগঠিত হল—(১) শাসন (স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র), (২) সৈন্য সংগ্রহ, (৩) সামরিক শিক্ষা, (৪) অর্থ, (৫) রাজস্ব, (৬) স্বাস্থ্য ও সমাজ-কল্যাণ (৭) মহিলা-বিভাগ, (৮) সরবরাহ, (৯) শিক্ষা ও সংস্কৃতি, (১০) ইনজিনিয়ারিং বিভাগ, (১১) প্রচার বিভাগ, (সংবাদপত্র ও আন্দোলন), (১২) সাধারণ সচিবের দপ্তর ইত্যাদি এই সঙ্গে পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার ভারতবাসীর সংখ্যা যেখানে ন্যূনকল্পে ৫০ জন—সেখানেও শাখা কার্যালয় খোলা হল—সেই শাখা অফিসের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৩৫,০০০। ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের উচ্চ স্তরের মন্ত্রণাসভাকে বলা হত—আঞ্চলিক মন্ত্রণা সভা (Territorial Council)। ঐদিন বেতারযোগে নেতাজী সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ সরকারের পক্ষ থেকে জাতির জনক মহাত্মাজীর নিকট আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন।

২২শে অক্টোবর মধ্যরাত্রি পর্যন্ত মন্ত্রিসভা ও আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারদের সঙ্গে এক বৈঠকে আলোচনা চলতে লাগল—এবং গ্রেট-ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। সুভাষচন্দ্র ৫ লক্ষ লোকের সম্মুখে ২৩শে তারিখে পূর্ণাঙ্গ সামরিক কুচকাওয়াজের পর সর্বসাধারণের সম্মতির জন্য উক্ত সিদ্ধান্ত পেশ করলেন সেদিন সেই জনসভায়। ঐদিন সেই বিরাট জনতাকে লক্ষ্য করে নেতাজী বললেন—

ব্রিটেন আর আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত আজাদ হিন্দ সরকার গ্রহণ করেছে। আমি জানতে চাই—এতে আপনাদের সম্মতি আছে কি না। আমি বিশ্বাস রাখি যে হিন্দুস্থানে যাদের রক্তে ব্রিটেন সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে সেই বীর ভারতবাসী আবার নিজের দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য নিজেদের রক্ত বইয়ে দেবে।

নেতাজী বলেছেন—We have declared war because our strench has increased a hundred fold—আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছি কারণ আমাদের শক্তি শতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সেই ৫০ হাজার সৈনিক ও হাজার হাজার ভারতবাসীর বিরাট জনতা পাঁচ মিনিট কাল নিস্তব্ধ হয়ে রইল—সহসা ঘটিকা বিক্ষুব্ধ সমুদ্র তরঙ্গের মত সকলে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল এবং ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে আসতে লাগল নেতাজীর দিকে। তরঙ্গায়িতে মুখরিত হল সেই বিরাট জনসমাবেশ, সহস্র কণ্ঠে বিপ্লবের আহ্বান ধ্বনি পবন মিলিটারি বাতাস বিদীর্ণ করে দিল—হঠাৎ দেখা গেল ৫০ হাজার বেয়োনেট ঊর্ধ্বে উত্থিত—আজাদ হিন্দ ফৌজের রাইফেল তাদের স্কন্ধদেশে দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টিতে আবদ্ধ—সমাগত জনসাধারণ তাদের পশ্চাতে দাঁড়িয়ে আছে—মুখে তাদের বিপ্লবের ধ্বনি, নরনারী শিশু যুবা তারা দুই হাত তুলে ধরেছে উপরে—দৃঢ়কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে তারা নেতাজীর প্রতি তাদের অকুণ্ঠ আনুগত্যের বাণী প্রকাশ করছে বিপুল উৎসাহে, আর তাদের সম্মুখে ১৫ ফুট উচ্চে মঞ্চের উপরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন নেতাজী পুরুষ-সিংহ—দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, চোখে-মুখে সংকল্প ও উৎসাহের আলোক বিচ্ছুরিত হয়ে পড়েছে—সে এক অপূর্ব দৃশ্য!

রক্ষীদের বন্ধনী ভেদে তারা সকলে উপস্থিত হল নেতাজীর সম্মুখে। মুখে তাদের সেই একই ধ্বনি—"চলো দিল্লী, চলো দিল্লী।" নেতাজী এগিয়ে এলেন মঞ্চের ধারে—হাত তুলে শান্ত হতে বললেন সেই উদ্বেলিত জনসমুদ্রকে। তাঁর মুখের জয়ধ্বনি প্রতিধ্বনি হতে লাগল বারবার জনতার মধ্যে—জনতা "মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গ"-এর মত মুহূর্তে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

গণতান্ত্রিক ধাঁচে গঠিত হয়েছিল আজাদ হিন্দ সরকার। শুধু মন্ত্রিসভা নয়—ফৌজী সেনাপতি বা সৈন্যাধ্যক্ষ নয় জনতার রায় চেয়েছিলেন—'জনগণমন অধিনায়ক'—নেতাজী সুভাষচন্দ্র। সর্বসম্মতিক্রমে ভারতবাসীর সেই রায়ের জোরেই যুদ্ধ ঘোষণা হল ভারতের শত্রুদের বিরুদ্ধে। মধ্য রাত্রে যে যুদ্ধ ঘোষণা করা হল—বেতারযোগে রাত্রি দুই ঘটিকার সময় শত্রুপক্ষের বেতারেও সে সংবাদ পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ল। এই চরম মুহূর্তের জন্যই নেতাজী অপেক্ষা করে ছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণের শক্তি—ধীর চরিত্র ও স্থির বুদ্ধির জন্যই তিনি সেদিন সম্পূর্ণ প্রস্তুতির পূর্বে সহকর্মীদের অনুরোধ সত্ত্বেও যুদ্ধ ঘোষণা করতে স্বীকৃত হননি।

তিনি বলেছিলেন—সৈনিকদের মধ্যে ক'জনের কতখানি পথ এগিয়ে চলে গেল ভারতবর্ষের সীমানার মধ্যে—মাতৃভূমিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করবার জন্য কয়জন প্রাণ বলিদান দিলে, এসবের জন্য কিছুমাত্র যায় আসে না। কিন্তু ঐতিহাসিকগণ বিচার করে দেখবে, স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কি পরিমাণ চেষ্টা আমরা করেছি—আমাদের চিন্তা, আমাদের আদর্শ ও পরিকল্পনাকে কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত করবার জন্য আমাদের শক্তিকে কত ভাবে, কত দিকে নিয়োজিত করেছি আমরা আমাদের এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য—নৈতিক, আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আদর্শের প্রেরণায় আমাদের সংগঠনকে শক্তিশালী করতে পেরেছি কিনা, প্রত্যেক বিষয়ে আমাদের নির্ভুল হিসাব, কষ্টসহ করবার মত মনোবল ও চরিত্র, জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন এবং বস্তু বিষয়ে অবধারণের ক্ষমতা, ভৌগোলিক জ্ঞান এবং মনুষ্য-প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারণতা—এ সকল আমাদের সংগঠনের মধ্যে যথাযোগ্য স্থান পেয়েছে কিনা। এই বিচারই করবে আগামীকালের ঐতিহাসিকরা। সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ সরকার ও আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগঠনের মধ্যে আমরা ঐ সকল বহু মূল্যবান উপাদানের সন্ধান পাই। এ সকলের পরিচয় আমরা অনেক ক্ষেত্রেই পেয়েছি; আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রত্যেক সৈনিকের চরিত্রে আমরা যে সকল

শুধু দেখতে পেয়েছি—জগতের সামরিক ইতিহাসে তা বিরল বললেও অত্যুক্তি হয় না। অন্যান্য দেশে যুদ্ধের পর আমরা দেখেছি অধিকার নারীজাতির উপর পাশবিক অত্যাচার, দেখেছি লুঠতরাজ ও উৎপীড়ন, অগ্নিদাহে সমৃদ্ধ নগরের অধলুপ্তি, মানুষের নৃশংসতা ও লাঞ্ছনা হয়েছে; এ প্রকার কোনো কলঙ্কই আজো পর্যন্ত আজাদ হিন্দ ফৌজের নামে শোনা যায়নি। বর্মায় এ সম্বন্ধে তাদের নামে প্রবাদ বাক্য চলে এসেছে—নেতাজীর উচ্চ আদর্শে তারা অনুপ্রাণিত ছিল বলেই তাদের নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে কেউ কখনও দোষারোপ করতে পারেনি। বর্মায় একথা সকলে বলে থাকে— When Burma Defence Army passed through villages—women fled to jungles, when Japanese Army passed through villages, women fled to jungles with their belongings but when I. N. A. passed through villages, women used to come back safely to their homes with their belongings—এমন কি শত্রুপক্ষও আজাদ হিন্দ ফৌজের বিরুদ্ধে লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ, নারীজাতির উপর অত্যাচারের কোনো অভিযোগ আনতে পারেনি—এটা ভারতবাসীদের পক্ষেও বিশেষ গর্বের কথা। যে সৈন্য সংগঠনের কথার উল্লেখ আমরা পূর্বে করেছি সে সম্পর্কে শুধু একটি মাত্র উদাহরণ এখানে উপস্থিত করব। নেতাজী বলতেন দেবনাথ দাস সম্পর্কে—Das has given us steel out of straw. বালসেনা—শুধু বালকদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল—বয়স্কদের কথা ছেড়েই দিলাম। সেই বালসেনার পরীক্ষা ব্যাপারে কিরূপ কড়াকড়ি ছিল—সে কথাই এখানে বলব।

তাদের শেষ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে হলে তিন ছুট অন্তর তাদের সোজা হয়ে দাঁড়াতে হত। ভীষণ শব্দে গুলি ছোড়া হ'ত—২০ গজ দূর থেকে। সে গুলি ছুটে চলত ৩ ইঞ্চি তফাত তফাত—যদি দেখা যেত কেউ চোখ বুঁজে ফেলেছে সেই ভীষণ শব্দের সময়, তা হলে তার নাম বাতিল করে দেওয়া হত। জেনারেল আই (Ott) ছিলেন টোকিওতে জারমান দূত—তাঁর মত সামরিক প্রতিভা বহু জারমান সেনাপতির ছিল না—তিনি নেতাজীর সঙ্গে তর্ক করে বললেন, বুলেট বিদ্যুৎ বেগে ছুটে যাওয়ার সময় কোনো বালক চোখ বুজে ফেললে—তাতে তাকে অকৃতকার্য বলে বাতিল করা যেতে পারে না। আমি জোর করে বলতে পারি সামরিক ঐতিহ্যে প্রদিপ্ত জারমানীর কোনও বালক—অত কাছ থেকে বুলেটের এই শব্দ কখনই সহ্য করতে পারত না। কিন্তু নেতাজী প্রত্যুত্তরে বললেন—You do not know India. I want not only a full fledged Military man but a determined soul who is very morally and spiritually strong and can stand the strains of this-bullet test. And for that I believe that the eyes give the indication of determination and indomitable courage—it is SADHANA অর্থাৎ আপনি ভারতবর্ষকে জানেন না। আমি শুধু পূর্ণাঙ্গ সৈনিক চাহি না, চাই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষ, যে মানুষ—নৈতিক আধ্যাত্মিক শক্তিতে শক্তিমান এবং যে বুলেট পরীক্ষায় দাঁড়াতে পারে। সেজন্য আমার বিশ্বাস চোখেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অদম্য সাহসের পরিচয় দান করে—এরই নাম সাধনা।

এমনকি জনগণমন গাইবার সময় কেউ সোজা হয়ে না দাঁড়ালে বা চোখ বন্ধ করলে আজাদ বলে বিবেচিত হত।

যখন আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগঠিত হল তখন শত্রুপক্ষ প্রচার করতে লাগল—যে আজাদ হিন্দ ফৌজ শুধু একটা অপপ্রচার—সৈন্য সমাবেশের কথা ভাঁওতা মাত্র। যখন সেই ফৌজ সত্যসত্যই যুদ্ধ করতে

লাগল—ব্রিটিশ প্রচারকেরা তাদের মুখ বন্ধ করে দেবে,—বলতে লাগল আজাদ হিন্দ ফৌজের অস্ত্রশস্ত্র জনবল অতি সামান্য। তার উত্তরে নেতাজী বলেছিলেন—আজাদ হিন্দ ফৌজের সবই আছে—কেবল সেই সৈনিকদের খাওয়ার জন্য ঘাস, বন, বিড়াল ও কুকুর প্রভৃতি নয়, যেগুলি ব্রিটিশ বাহিনীতে প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। তিনি জোর গলায় বললেন যে, তাঁর ফৌজ, ক্ষুধা তৃষ্ণা নিয়েই যুদ্ধ করে যাবে (our army will fight in the face of hunger and thirst)। তিনি বললেন, পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক বিপ্লবের কথাই আছে; কিন্তু এমন উদাহরণ একটিও মিলবে না—যেখানে বিপ্লবী সৈন্যগণ তাদের শত্রু অপেক্ষা এই প্রকার মনোবলে উন্নত চরিত্র। তারা কৃতকার্য হয়েছে তাদের অস্ত্রশস্ত্র বা সৈন্যবলের জোরে নয়—কৃতকার্য হয়েছে তাদের আত্মপ্রত্যয়ের শক্তিতে—তারা যুদ্ধ করছে—এক মহান উদ্দেশ্য নিয়ে। এই ছিল তাদের উৎসাহ ও প্রেরণা। তিনি তাঁর ফৌজকে উদ্বুদ্ধ করে বললেন ৪র আগষ্টের কথা—তার সম্বল ছিল মাত্র ৪০০০ বিপ্লবী, যারা মরণের জন্য আত্মনিয়োগ করেছিল, —তাদের বিদ্রোহ দমন করবার জন্য ব্রিটিশ অস্ত্রশস্ত্রে ৫০,০০০ সৈন্য পাঠালে। কিন্তু তাদের সৈন্যসংখ্যা ও অস্ত্রশস্ত্রের সরঞ্জাম অধিক থাকলেও তাদের শোচনীয় ভাবে পরাজয় ঘটল। আমার শত্রুদের কতখানি শক্তি তা আমি ভালই জানি, এবং আমরা যে কি করতে পারি না পারি তাও আমার অজানা নয়। আমাদের বিরাট ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, ৩৮ কোটি ভারতবাসীর মুক্তির জন্য যদি আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রত্যেক সৈনিক ও সেনাধ্যক্ষকে জীবন বিসর্জন দিতে হয় তার জন্যও আমরা প্রস্তুত থাকব।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের এ আহ্বান ব্যর্থ হয়নি—যে আদর্শে ও নিষ্ঠায়-যে উদ্দীপনা ও উৎসাহে, যে শৃঙ্খলাবোধ ও নিয়মানুবর্তিতার দৃঢ় ভিত্তিতে তিনি ভারতবর্ষের প্রথম বাহিনী সংগঠিত করেছিলেন তার রোমাঞ্চকর ইতিহাস এখনো প্রকাশিত হয়নি—আমরা শুধু অতি সংক্ষেপে ভারতবর্ষের প্রধানতম কর্মবীর, অনন্যসাধারণ সংগঠক, বীরশ্রেষ্ঠ, মনুষ্যত্বের মহিমায় মহিমান্বিত দেশপ্রেমিক সুভাষচন্দ্রকে আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক রূপে এখানে দেখাবার চেষ্টা করেছি। তাঁকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি—স্মরণ করি তাঁর সাবধান বাণী—

"Above all never for a moment falter in your faith in India's destiny—অর্থাৎ সর্বোপরি এই ভারতবর্ষের ভাগ্যের উপর তোমাদের বিশ্বাস যেন এক মুহূর্তের জন্যও ভেঙে না পড়ে। জয় হিন্দ!

—সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

নারী ও হিন্দু ভরণপোষণ আইন

অরুণা মুখোপাধ্যায় (এ্যাডভোকেট হাইকোর্ট)

সেদিন কোর্ট থেকে ফিরে সবেমাত্র বাড়ীতে পা দিয়েছি হঠাৎ এক অপরিচিত মহিলার কণ্ঠে দাঁড়িয়ে গেলাম। আমার একটু বিশেষ প্রয়োজনে আপনার কাছে এসেছি। তা আপনার কখন সময় হবে জানতে পারলে……। সৌজন্যসূচক কথা প্রায় রুদ্ধ হয়ে গেল। ভদ্রমহিলার দিকে এবার ভাল করে তাকালাম বিধবা—৫০ এর উর্দ্ধে বয়স।

সারাদিন পরিশ্রান্ত দেহে ও মনে একটু বিশ্রাম নেবার ইচ্ছা হলেও ভদ্রমহিলাকে দেখে ফেরাতে মন চাইল না। কি তার জিজ্ঞাসা হতে পারে এই চিন্তায় ভদ্রমহিলাকে ডেকে ঘরে বসতে বললাম।

—বলুন কি জানতে চান। সোজাসুজি প্রশ্ন করে বসলাম।

দেখুন দিদি বিধবা হয়েছি অনেক দিন। শ্বশুরের সংসারেই আছি। এতদিন শ্বশুর খুসী মনেই খাওয়া পরা দেখছিলেন। এখন দেখছি একটু ক্ষুণ্ণ। শুনেছি ভরণপোষণ আইনে আমাদের অধিকার আছে। তা কিভাবে পেতে পারি একটু বলবেন।

বিধবার শুষ্কমুখ দেখে তাড়াতাড়ি উত্তর দিয়ে বললাম—দেখুন, আপনার এ প্রশ্নের জবাব দেবার আগে আমার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর

দিন। প্রথমতঃ আপনার নিজের কোন স্বোপার্জিত অর্থ আছে কিনা যা হতে আপনি নিজেকে চালাতে পারেন, অথবা তা যদি না থাকে আপনার স্বামীর অথবা আপনার বাবা মায়ের অথবা আপনার ছেলে মেয়ের বিহহ সম্পত্তি হতে চালাতে পারেন কিনা! আর দ্বিতীয়তঃ এগুলো যদি আপনার না থাকে তবে কোন এজমালি সম্পত্তিতে আপনার কোন অংশ আছে কিনা, যাতে আপনার শ্বশুরের এখনও দখল আছে।

বিধবা চোখের জল মুছে জানাল—না এসবের কোনটাই নেই। শুধু এখন শ্বশুর ভরসা।

ভদ্র মহিলার কাছ হতে এবার ক্ষমা চেয়ে নিয়ে আবার প্রশ্ন করলাম মাপ করবেন: পুনর্বিবাহ করেন নি নিশ্চয়ই। তাহলে ভরণপোষণের অধিকার হতে বঞ্চিত হবেন

দাঁত দিয়ে জিভ কেটে মাথা নিচু করে একটু ধীর স্বরে বললেন ছি-ছি, বিয়ে কি বারে বারে করা যায়। এরপর সতী সাবিত্রীর আদর্শ প্রসঙ্গ তুলতেই আমি ভদ্র মহিলাকে আইনটা এবার বলে দিলাম ১৯৫৬ সালের হিন্দু ভরণপোষণ আইনের ১৯ ধারায় শ্বশুর পুত্রবধূকে ভরণপোষণ দিতে বাধ্য আইনতঃ যা আগের আইনে ছিলনা। তখন শ্বশুরের নিজ সম্পত্তি বা কেবলমাত্র পেনসন্ থাকলে বিধবা পুত্রবধূর ভরণপোষণের কোন অধিকারই আইনতঃ ছিলনা। কেবল মাত্র ধর্মতঃ বাধ্য ছিলেন শ্বশুর।

—আপনাদের আইনে এই ভরণপোষণের পরিমাণ কতটা পেতে পারি। তিনি প্রশ্ন করলেন।—আপনি নিজে যতটুকু চালাতে পারেন না ঠিক ততটুকুই পাবেন। বললাম।

ভদ্রমহিলা খুশী হলেন এবার। আরো দুটি মেয়ের সমস্যা নিয়ে তিনি আবার আসবেন জানালেন।

এরপর ভদ্রমহিলাকে বিদায় জানাতে গিয়ে আরো একটি ঘটনা এ প্রসঙ্গে মনে পড়লো। এটি আমার নিজে ওকালতী জীবনের

অভিজ্ঞতা একবার কোর্টে দেখেছিলাম এক ভদ্র মহিলার স্বামী ট্রেন সংঘর্ষে নিহত হন। তিনি অসহায় অবস্থায় শ্বশুরের কাছে ছুটে যান। শ্বশুর ছিলেন পৈতৃক বিরাট কৃষি জমির মালিক; তিনি পুত্রবধূকে সাহায্য করতে অসমর্থ জানালে নিরুপায় পুত্রবধূ শ্বশুরের বিরুদ্ধে মামলা আনেন ভরণপোষণের জন্য। শ্বশুর জানতে পেরে তাঁর কন্যাকে সমস্ত জমি দান করে যান ভরণপোষণের দায় এড়ানোর জন্য. কিন্তু আদালতে তিনি হেরে যান। এ ধরণের জমি দানকে আদালত বে-আইনী ও অন্যায় মূলক বলে আখ্যা দেন ও কন্যা তার ভ্রাতৃবধূকে ভরণপোষণ দিতে বাধ্য থাকে. অবশ্য ঐ দানকৃত সম্পত্তির আয় হইতে।

এরপর অনেক দিন কেটে যায় ও আগের বিধবাটি আরো দুজন মহিলাকে নিয়ে আবার একদিন এসে উপস্থিত হয়

প্রথম মহিলাটি তার স্বামীর কাছ হতে ভরণপোষণ পেয়ে আসছেন কিন্তু সেটি তার কাছে খুবই কম; তাই আমার কাছে জানতে এসেছেন নতুন ভরণপোষণ আইন। আর দ্বিতীয় মেয়েটির সমস্যা হলো স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের মামলা চলতে থাকাকালীন সময়ে নিজের ভরণপোষণের জন্য দরখাস্ত দাখিল করতে পারে কিনা

এদের মধ্যে প্রথম মহিলাটিকেই আগে ডাকলাম। তিনি স্বামীর দ্বিতীয়া স্ত্রী। করুণ মুখ নিয়ে তিনি বললেন তাঁর স্বামী তাঁর প্রথমা স্ত্রীর সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন এই আশ্বাস তাঁর বাবা মাকে জানিয়ে বর্তমান মহিলাটিকে বিয়ে করেন ও বছর ১৩ বেশ সুখেই কাটে। এরপর স্বামী প্রথমা স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনে ও তার উপর অত্যাচার আরম্ভ করে। এই সময় মহিলাটি বাপের বাড়ী চলে যায়। স্বামী কিন্তু নিজের জবান বন্দীতে জানায় যে সে ইচ্ছা করেই অকারণে স্বামী গৃহ ত্যাগ করেছে। এরপর ভরণপোষণ স্ত্রী দাবী করলে নিম্ন আদালতে যেটুকু পরিমাণ স্থির করে দেয় হাইকোর্টেও তার সমর্থন করে। কেননা মহিলাটি স্বামীর অত্যাচার প্রমাণ করতে পারে নি। বর্তমান মহিলাটি

তার নিজের ভরণপোষণের অধিকার ও পরিমাণের অঙ্ক নতুন ভরণ-পোষণের আইনের মাধ্যমে আমার কাছে জানতে চান।

মহিলার বিপদাপন্ন করুণ মুখ দেখে আইন না বোঝানো ছাড়া উপায় রইল না। তাকে জানালাম ১৯৫৬ সালের নতুন ভরণপোষণ আইনের ১৮ ধারায় বলা আছে এই আইন প্রবর্ত্তিত হওয়ার আগে অথবা পরে বিবাহিতা হিন্দু স্ত্রী তাঁর জীবদ্দশায় স্বামীর কাছ হতে ভরণ-পোষণ দাবী করতে পারেন। তবে ভরণপোষণ ছাড়াও পৃথক বাসস্থানের জন্য হিন্দু স্ত্রী দাবী করতে পারেন যদি (১) স্বামী যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া অথবা স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অথবা বিনা সম্মতিতে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেন (২) যদি স্বামী স্ত্রীর প্রতি এমন নিষ্ঠুর আচরণ করেন যাতে স্বামীর সঙ্গে একত্রে বসবাস করা স্ত্রীর পক্ষে আতঙ্কের অথবা ক্ষতির কারণ হয়, (৩) যদি স্বামী সাংঘাতিক কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হন, (৪) যদি অন্য স্ত্রী জীবিত থাকেন, (৫) যদি স্ত্রীর সঙ্গে বসবাস করার গৃহে কোন উপপত্নী থাকেন অথবা প্রায়ই তার সঙ্গে অন্যত্র বসবাস করেন, (৬) যদি স্বামী হিন্দু ধর্ম্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, (৭) যদি পৃথক বসবাস করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে স্ত্রীর পক্ষে। তবে যদি হিন্দু স্ত্রী অপবিত্র জীবন যাপন করেন অথবা অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, হিন্দু ধর্ম্ম ত্যাগ করেন তাহলে পৃথক বাসস্থান ও ভরণপোষণের অধিকার হতে তিনি বিচ্যুৎ হবেন।

সুতরাং বর্ত্তমান ধারা হতে এটুকু প্রমাণিত হলো যে আমার কাছে যে মহিলাটি এসেছিলেন তিনি ভরণপোষণের দাবী করতে পারেন।

মহিলাটি এবার খুসী মনে ভরণপোষণের পরিমাণ সম্বন্ধীয় আইন জানতে চাইলেন। আমি এই আইনের ২৩ ধারা উল্লেখ করে বললাম—ভরণপোষণ দেওয়া উচিৎ হবে কিনা কোর্ট তার বিবেচনা অনুযায়ী ঠিক করবে আর এর পরিমাণ নির্দ্ধারণ করতে গিয়ে নজর রাখবে পাত্র-পাত্রীর সামাজিক মান (Position & Status) দাবী-

দারের ন্যায়সঙ্গত অভাব, দাবীদারের পৃথক বাসস্থান থাকলে তা ন্যায়-সঙ্গত কিনা, দাবীদারের সম্পত্তির মূল্য ও সেই সম্পত্তি থাকলে তার আয় অথবা দাবীদারের নিজস্ব আয় ও ভরণপোষণের অন্তর্ভুক্ত দাবী-দারের সংখ্যার প্রতি।

এই আইনের ২০ ধারায় বলা আছে যে বৈধ ও অবৈধ সন্তান নাবালক অবস্থায় পিতামাতার কাছ হতে ভরণপোষণ দাবী পাবে। এ ছাড়া বর্তমান আইন অনুযায়ী অসুস্থ অথবা প্রবীন বাবা-মা, নিঃসন্তান বিমাতা ও অবিবাহিতা মেয়েরা ততটুকু ভরণপোষণ দাবী করতে পারে যতটুকু তারা তাদের স্বোপার্জিত অর্থ অথবা অন্য সম্পত্তির আয় হতে নিজেদের চালাতে না পারে।

এতক্ষণ ধরে মহিলা আইন মন দিয়ে শুনছিলেন। এবার খুসী মনে তিনি বিদায় নিলেন।

এরপর আগের মেয়েটিকে ডাকলাম সে তার সমস্যা জানাল। মেয়েটির স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলায় মেয়েটি হেরে গেছে এখন মেয়েটি হাইকোর্টে আপীল করতে চায় ও এই আপীল চলতে থাকাকালীন সময়ে মেয়েটি ভরণপোষণ বাবদ কিছু পেতে পারে কিনা জানাল। আর যদি পায় কতটা কিভাবে পাবে। মেয়েটিকে একটু উৎসাহী দেখলাম। আমি এর উত্তরে জানালাম যে ১৯৫৪ সালের বিশেষ বিবাহ আইন ও ১৯৫৫ সালের হিন্দু বিবাহ আইনেও বলা আছে যে স্ত্রীর নিজের ভরণপোষণের মত তেমন সঙ্গতি না থাকলে কোর্টে দরখাস্ত করে স্বামীর সম্পত্তি হতে ভরণপোষণ আদায় করতে পারবেন। তবে ইচ্ছামত ভরণপোষণের পরিমাণ দাবী করলে কোর্ট তা নাকচ করতে পারে। স্ত্রীর সত্যকারের কোন আয়ের পথ আছে কিনা ও স্বামীর আর্থিক স্বচ্ছলতা, সামাজিক মান প্রতিষ্ঠার দিকেও কোর্ট নজর রাখবে। মেয়েটিকে দেখলাম খুসী হয়ে আমাকে জানাল যে সে তার প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেয়েছে।

সুতরাং এসব আলোচনা হতে ভরণপোষণ আইন সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায়। তবে ১৯৫৬ সালের নতুন ভরণপোষণ আইন হলো

১৯৪৬ সালের হিন্দু বিবাহিতা নারীর পৃথক বাসস্থান ও ভরণপোষণের অধিকারের আইন ও ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের ৩০ ধারার দ্বিতীয় অংশের পরিবর্তিত সংস্করণ।

এখন মা বোনেদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে এইসব আইন ছাড়া আর কোন আইনে ভরণপোষণের অধিকার দাবী করা যায় কিনা।

এর উত্তর সহজ। ফৌজদারী প্রণালী আইন অর্থাৎ Criminal Procedure Code-এর ৪৮৮ধারায় স্ত্রী অথবা সন্তানদের ভরণপোষণ অধিকার দাবী করার কথা আছে। তবে স্ত্রী যদি স্বেচ্ছাচারী হন, সঙ্গত কারণ ছাড়া স্বামীর সঙ্গে বসবাস করতে অসমর্থ হন ও পরস্পর মত নিয়ে পৃথক বসবাস করেন তাহলে স্ত্রী ভরণপোষণের অধিকার হতে বঞ্চিত হবেন। এই আইনে স্ত্রী তার ন্যায়সঙ্গত কারণ প্রমাণে সমর্থ হলে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট, মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ভরণপোষণ করার আদেশ স্বামীর উপর দিতে পারেন। তবে ১৯৫৬ সালের হিন্দু দত্তক ও ভরণপোষণ আইনের ৪ ধারায় যে কথা বলা আছে যে এই আইন প্রবর্তিত হওয়ার আগে যে সব আইন বর্তমান আইনের কোন ধারার সঙ্গে অসামঞ্জস্য সেই আইনগুলির বিলোপ সাধন ঘটবে তার প্রভাব ৪৮৮ ধারাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি।

সুতরাং আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু নিয়ে বলতে গিয়ে শুধু একটি কথা বলেই শেষ করবো যে ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনের উন্নতির জন্যই হয়েছে আইনের প্রবর্তন আর এর সহায়ক যেসব আইন তার মধ্যে প্রধান একটি হলো এই ভরণপোষণ আইন যা নারীজীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। অদূর ভবিষ্যতেও এই আইনের আরো প্রাঞ্জলরূপ দিতে আমরা চেষ্টা করবো যাতে নারীজন্ম হয়ে উঠবে আরো সুন্দর, আরো শান্তিপূর্ণ ও সার্থক।

টুকিটাকি কথা

বেলা দে

ছড়া, গান, রূপকথা, ব্রতকথা প্রভৃতির ভিতর দিয়া অতি প্রাচীন কাল থেকে বাংলার পল্লী জীবনের রূপ ফুটে উঠেছে। পল্লীপ্রাণ বাংলার এ এক রত্ন—জাতীয় সম্পদ। নারী ও পুরুষের হাসি কান্না, সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্খা বুকে ধরে কত ছড়া রচিত হয়েছে এই ধরনের কয়েকটী ছড়ার উল্লেখ করছি।

"দূরের জামাই মধুসূদন
কাছের জামাই মধা,
ভাত খেয়ে যাও মধুসূদন
ভাত খেয়ে যা মধা।"

ঘোড়া চিনবে কানে
ক'ন্যা চিনবে দানে,
বৌ চিনবে হাসিরে
মুক্তা কিনবে ভাসিয়ে।

শাকের মধ্যে পুঁই
মাছের মধ্যে রুই
ফুলের মধ্যে মালা
কুটুমের মধ্যে শালা।

ঠাণ্ডা দুধ, গরম অম্বল
যত জানবে রোগের সম্বল।

কচি পাঠা বৃদ্ধ মেষ
দধির আগা, ঘোলের শেষ।

ধনীর ঝি ধনে মানায়
নির্ধনের ঝি গতরে মানায়।

এক সময় মেয়েদের মধ্যে হাসির গান বা ছড়া খুব চলত। এ গুলির মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত সুর ঝংকৃত হোত। যদিও আজকের দিনে এ গুলির প্রচলন নেই বললেই হয়। দু' একটী প্রাচীন ছড়া বা গানের উল্লেখ করছি। নবাগত তিনটী বৌয়ের রন্ধন কার্য্য নিপুণতার পরিচয় নিচ্ছেন শ্বশুর মশাই।

বড় বৌ বললেন—"শুন শুন ওহে শ্বশুর নিবেদন করি,
ভাগ্য মাপ করে দিলাম এবার দাও পানি।
মা ভাসে বাপ ভাসে আর ভাসে দাদা
নাল্‌তা শাকের কোলে সব মেখে হল কাদা।
সাধ করে রেখেছিলাম মুসুরীর সুপ
বিড়ালে সাঁতুরে বুলে ইঁদুরে মারে ডুব।

মেজ বৌ বললেন—সাধ করে রেঁধেছিলাম মাছকলাইয়ের ডাল্‌না
তেজপাত বলে দিলাম ছেঁড়া তালাই।

ছোট বৌ বললেন—সাধ করে রেঁধেছিলাম মাছ চড়চড়ি
ফোড়ন বলিয়া দিলাম নাকের নথকড়ি।

মুখরোচক কথা

যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকজন বিখ্যাত লোক মেয়েদের সঙ্গে পরিচিত হলে প্রথমে কি লক্ষ্য করেন, তারই কয়েকটি মতামত উদ্ধৃত করছি।

স্যার নরমান এঞ্জেল—"আমি দেখি, মেয়েরা স্বাভাবিক কি না তারা সুস্থভাবে আচরণ করছে কি না। যাদের দেখি নখে রং লাগানোর, ঠোঁটে অতিরিক্ত লিপষ্টিক না দেবার, ককটেল পান করা না করবার সৎ সাহস আছে, তাদের সঙ্গে আলাপ করলে লাভ আছে

রবার্ট টেলর (অভিনেতা) আমি লক্ষ্য করি মেয়েদের হাঁটা। কাউকে দেখি নড়নড়ে জুতোর লেংচে হাঁটছেন, কাউকে দেখি এই লম্বা ফেলে চলেছেন যেন ভ্রমণ প্রতিযোগিতায় প্রথম হতে চান। মেয়েদের মুখের চেয়ে অনেক সময় তাদের হাঁটা, তাদের বিষয়ে জানতে সাহায্য করে।

বিং ক্রস্‌বি (গায়ক)—আমি দেখি মেয়েদের চোখ। যদি দেখি তাদের চোখ হাসছে, তাহলে বুঝতে পারি তারা সহজে বিচলিত হবে না, তাদের ভারসাম্য হারাবে না।

মাইকেল আর্লেন (লেখক)—প্রথমে দেখি, আমি তাদের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছি কি না—তারপর দেখতে চেষ্টা করি যে আমি তাদের আকৃষ্ট করছি কি না!

ডিকটর ম্যাকলেগলেন (অভিনেতা)—আমি লক্ষ্য করি মেয়েদের হাত। শুধু সৌন্দর্যের দিক থেকে নয়, কি ভাবে মেয়েরা তাদের ব্যবহার করে।

মাথা ঠাণ্ডা রাখার কাজে
"মহাভৃঙ্গরাজ" অদ্বিতীয়।

ভৃঙ্গল মহাভৃঙ্গরাজ মাথার তেল
বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদমতে ক্যালকাটা
কেমিক্যালের আধুনিক কারখানায় তৈরি।

ভৃঙ্গল মাথার তেলে আছে
ভৃঙ্গরাজ পাতার রস, তিল তেল
এবং আরো ১২টি গাছগাছড়ার নির্যাস।
এ-সমস্তই মাথা ঠাণ্ডা
রাখে। চুল আরো
সজীব করে।

বিশুদ্ধ
আয়ুর্বেদমতে তৈরি
ভৃঙ্গল
সুগন্ধি
মহাভৃঙ্গরাজ
মাথার তেল

গল্প-ভারতী

GALPA-BHARATI

দীপালী সংখ্যা

কার্তিক ১৩৭৭, NOVEMBER, 1970

ষড়বিংশতি-বর্ষ

সম্পাদক : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

সহঃ সম্পাদক : কল্যাণ রায়

মূল্য : এক টাকা

বার্ষিক : পনের টাকা

শ্রীমোদ বিহারী দত্ত কর্তৃক ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
১৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও কল্পনা প্রেস প্রাঃ লিঃ
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

আসুন বিষ্ণুপুরে পোড়ামাটির অপরূপ ভাস্কর্যের দেশে

বিষ্ণুপুরের পোড়ামাটির সূক্ষ্ম ও নিটোল মূর্তি দেখে আপনি মুগ্ধ হবেন। সকল স্বাচ্ছন্দ্য সমন্বিত একটি ট্যুরিস্ট লজ এখানে খোলা হয়েছে।

এই সপ্তাহশেষেই আসুন না? বিষ্ণুপুর থেকে আপনি জয়রামবাটী আর কামারপুকুর ঘুরে আসতে পারবেন। এখানকার সুমধুর দিনগুলি আর আমাদের পরিচর্যা আপনি ভুলতে পারবেন না।

● বিস্তারিত জানতে লেখে নিন : ট্যুরিস্ট ব্যুরো পশ্চিমবঙ্গ সরকার ●

৩/২ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (ডালহৌসি স্কোয়ার) ইস্ট, কলিকাতা-১ ফোন : ২৩-৮২৭১ গ্রাম : TRAVEL TIPS

TC/TB/88

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়—		৩৮৭
বাংলার প্রতাপাদিত্য		৩৯০
কার্টুন		৩৯৬
কিছু রঙ্ কিছু বেরঙ্ (উপন্যাস)	—বিমল মিত্র	৪০১
ফিরে ফিরে চাই	—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	৪০৭

বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী
সন্দেশ বিক্রেতা

সিমলার বিখ্যাত

বিনোদ বিহারী নাগ
গণেশ চন্দ্র দত্ত

শাখা :
৫/৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন : ১৩-১৮৯৯
১৮, যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ,
কলিকাতা-৬

হেড অফিস : ৫৬ ২, রামদুলাল সরকার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন : ৫৫-১৪৫০

সব মানুষের জন্য
আর
সব কলমের
জন্য

সুলেখা
স্পেশাল
ব্লু-ব্ল্যাক • রয়াল ব্লু
ব্ল্যাক • রয়াল

সুলেখা
এক্সিকিউটিভ
স্পেশালের : ব্লু-ব্ল্যাক, নেভি ব্লু
ও সুপার ব্ল্যাক
এক্সপোর্টের : রয়াল ব্লু, এমারেল্ড
গ্রীন ও ব্ল্যাকার্ড রেড

সুলেখা
এক্সপোর্টের
ব্লু-ব্ল্যাক • ব্ল্যাক
রয়াল ব্লু • রেড
গ্রীন • ব্ল্যাকার্ড

আপনার পছন্দমত
যে-কোনটি
ব্যবহার করুন

সুলেখা
ওয়ার্কস
সুলেখা পার্ক
কলিকাতা-৬২

এই সংখ্যায়

জীবন নাট্যের খণ্ডচিত্র	—অনাথ উপাধ্যায়	৪১৩
যখন ফিরে চাই	—প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত	৪১৮
আবার সেই জেল	—বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়	৪২১
যে কাহিনী চিরকালের	—সুজন রায়	৪৩৩

প্রগতির মূল কথা

শরীর সুস্থ থাকুক, এটা আমরা সকলেই চাই। কিন্তু শারীরিক সুস্থতাই সব নয়। এগিয়ে যাওয়ার কাজে একই সঙ্গে দরকার মনের সুস্থতা আর প্রসার। অসুখ-বিসুখ সারিয়ে নিরোগ জীবন-যাপনের জন্যে আমরা যেমন এগিয়ে চলেছি, তেমনি মনের প্রসার ঘটিয়ে আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের সাহিত্য, আমাদের শিল্প ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার ধারাকে সমৃদ্ধ রাখার কাজেও পিছিয়ে নেই। জীবনচর্যার বিভিন্ন স্তরে এই দুই সুস্থতার ধারা অব্যাহত রাখাই প্রগতির লক্ষণ।

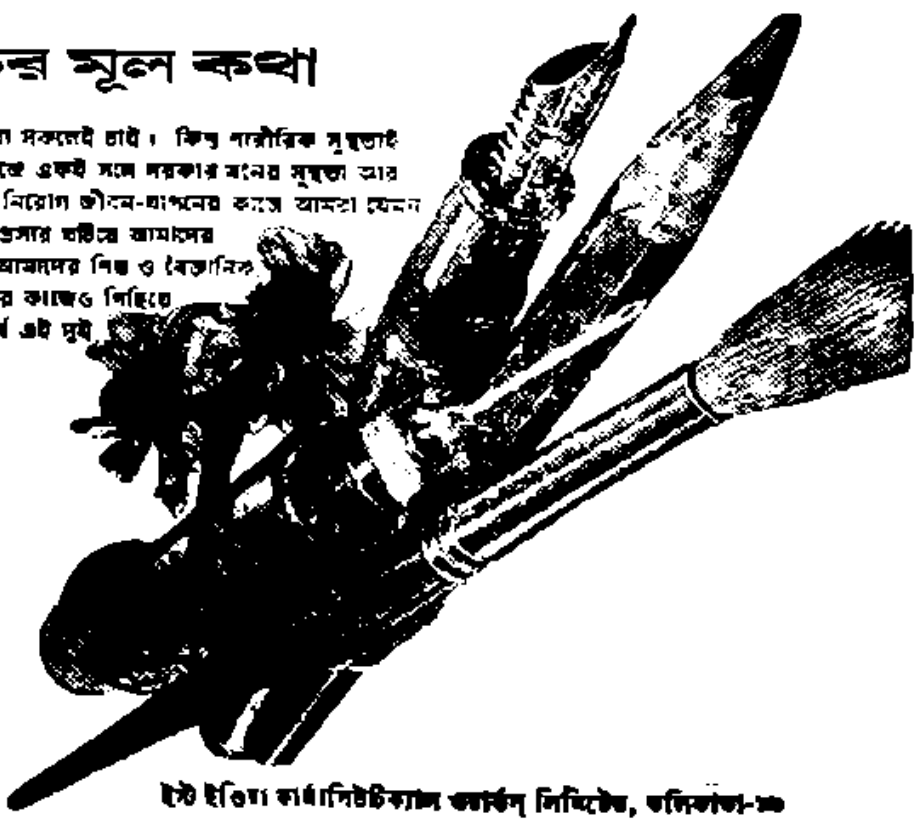

ইস্ট ইণ্ডিয়া কার্বাসিটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড, কলিকাতা-৩৯

HOUSE OF NRM

NATIONAL RUBBER MANUFACTURERS LTD.

THE LARGEST MANUFACTURERS OF INDUSTRIAL RUBBER PRODUCTS

Inchek Tyres Limited

MANUFACTURERS OF TYRES FOR INDIAN ROADS AND CLIMATIC CONDITIONS.

উত্তরের টানটুকু
রুক্ষ বাতাসে
স্বাভাবিক ভাবে মনে পড়ে

সুষমা

পি, লেট এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

এই সংখ্যায়

বৈপ্লবিক	—সময় বসু	৪৪১
রোরুদ্যমানা	—আশীষ গুপ্ত	৪৫৯
অপরাহ্নবর্তী	—সুবোধ সিংহ	৪৮৪

সত্তর বছর আগে ভীমনাগের সন্দেশ যে আনন্দ ও তৃপ্তি দিয়েছে আজও তাই!

ভীমনাগ

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ও আদি মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান

৬-৮, নির্মল চন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ফোন-৩৪-১৪৬৫

ব্রাঞ্চ-৮, বিবেকানন্দ রোড কলিকাতা-৭ ফোন-৩৪-৪৬৩৩

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas

Ex. Judge, Calcutta High Court,
Ex-Law Member, Govt. of India

আমি লক্ষ্মী-ঘিই ব্যবহার করি। অন্য ঘিয়ের তুলনায় এ'ঘি অনেক ভাল ও বিশুদ্ধ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সত্যেন মজুমদার
সম্পাদক—আনন্দবাজার পত্রিকা

লক্ষ্মী ঘি ব্যবহার করে আমার বেশ ভাল লেগেছে। এটা সত্যিই ঘি।

—শিশিরকুমার ভাদুড়ি

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল জিনিষ।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই ভেজালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—দৈনিক বসুমতী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজারে প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

শ্রীসীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখরোচক হয়।

শ্রীশান্তা দেবী

এই সংখ্যায়

●

—সচিত্র সংযোজন—

● দীপান্বিতা ও ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ●

দীপান্বিতা : স্মৃতিকথা	—গিরিবালা দেবী	৪৮০
সর্বভারতীয় দীপাবলী উৎসব	—জ্যোতির্ময়ী দেবী	৪৮৩
দীপাবলীর কাহিনী	—সুনীতি গুপ্ত	৪৮৮

এই সংখ্যায়

বাংলার উৎসব কালীপূজা	—বেলা দে	৪১০
দীপান্বিতা দীপমালা	—বাণী গুহঠাকুরতা	৪১১
লক্ষ্মীব্রতের আলপনা	—কল্যাণী দেবী	৪১৩
দেওয়ালী উৎসবের খাবার	—শকুন্তলা	৪১৫

একটি নির্ভরযোগ্য কেশ তৈল

বেঙ্গল কেমিক্যালের

ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল

কেশতৈল সম্পর্কে ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল ব্যবহারে আপনার হেয়ার-ফোলিকল হবে ভাল চুলের যোগানদার ও মস্তিষ্ক অধিক ঠাণ্ডা রাখবে ও চুল পড়া বন্ধ করতে সাহায্য করবে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই

কানপুর • দিল্লী

এই সংখ্যায়

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বা ভাইফোঁটা	—বেলা দে	৪২৬
যতগুলি নক্ষত্র ততগুলি ভাই	—হাসি ভট্টাচার্য্য	৪২৭
ভাইফোঁটা	—শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায়	৪২৯

—সংযোজন—

সঙ্গীত এনেছে স্বাধ নতা

অতুলনীয় ঐতিহ্যপূর্ণ

বাংলার তাঁতবস্ত্র

উৎসবে এবং নিত্যপ্রয়োজনে ব্যবহার করুন

সমবায় সমিতিতে উৎপাদিত তাঁতবস্ত্রের প্রতিষ্ঠান॥

★ দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট হ্যাণ্ডলুম উইভার্স কো-অপারেটীভ সোসাইটী লিঃ
৬৭, বস্ত্রীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪, ৩

শাখা কেন্দ্রসমূহ :—

★ গভর্ণমেণ্ট সেলস এম্পোরিয়ম : ৭/১, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
১২৮/১, বিধান সরণী, কলিকাতা, ১৫৯/১/এ, রাসবিহারী এভেন্যু, কলিকাতা,
১৮/এ, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড (সাউথ), হাওড়া।

তামাকে
ফিলটারে
মিলেছে চমৎকার-
তাইতো সবার প্রিয়
উইলস ফিলটার
WILLS
NAVY CUT
ধূমপানে আরাম পেতে হলে
চাই বাছাই-করা সেরা তামাক,
সরেস ফিলটার আর এ দুটিতে
নিখুঁত ও নিবিড় মিল। তামাকে
ফিলটারে সেই চমৎকার মিল
পাবেন উইলস ফিলটারে।
সারা দক্ষিণ এশিয়ার
এই ফিলটার সিগারেটের কাটতিই সবচেয়ে বেশী।
প্রতিটি দাম
১ টাকায় ১০টি
২ টাকায় ২০টি
স্থানীয় কর সাপেক্ষ
কলিকাতা ভিক্টোরিয়া মেনোফ্যাকচারিং
WF 3878-J

CALCUTTA

ষড়বিংশতি বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

হিমালয়ে দুর্গোৎসব

বিরজাবাবু অনেকদিন আসেননি।

দুর্গাপুজোর পর সেদিন এলেন তাঁর সেই মোটা লাঠিখানি হাতে নিয়ে।

বিরজাবাবুর বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। অথচ দেখলে মনে হয়—এখনও পঞ্চাশ পেরোয়নি।

জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় ছিলেন এতদিন?

বিরজাবাবু বললেন, গিয়েছিলাম হিমালয় তীর্থে। ইচ্ছে ছিল যাব কেদার-বদরী। কিন্তু এতদূর যাওয়া সম্ভব হলো না। হরিদ্বার থেকে চোদ্দ মাইল পায়ে হেঁটে চলে গেলাম হৃষীকেশ। একা মানুষ। বুঝতেই তো পারছো—হাতের এই লাঠি আর এই কোলাটি সম্বল।

গঙ্গার তীরে হৃষীকেশ ছোট একটি শহর। কী নেই সেখানে? পিচঢালা রাস্তা চলে গিয়েছে শহরের মাঝখান দিয়ে। দোকান-পশার লোকজনের কোলাহল—সবসময়েই সরগরম পথ ও পান্থশালা। কলকাতার শহরতলিও যা, হিমালয়তীর্থ এই হৃষীকেশও তাই। ঘাটা কোম্পানীর জুতোর দোকান থেকে আরম্ভ করে চুলকাটা সেলুন, ছোটবড় হোটেল আর সাড়োয়ালী মুটে মজুরের দল। নোংরা পথঘাট, টাঙ্গা আর লরিতে ঠেলাঠেলি চলছে।

আমার কল্পনার হৃষীকেশ খুঁজে পেলাম না। তাই সেখান থেকে সরে পড়লাম। এগিয়ে গেলাম গঙ্গার তীর ধরে।

একাকী এগিয়ে চলেছি। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অবসন্ন দেহ। যেদিকে তাকাই—হিমালয়ের পর্ব্বতশ্রেণী। পাহাড়ের পর পাহাড়—আবার পাহাড়—তার পেছনে আরও দেখা যায়—আরও কত তুষারধবল গিরিশৃঙ্গ—যেন দিকচক্রবালে টাঙ্গা পড়েছে—হিমতুষারাচ্ছন্ন মহামৌন পর্ব্বতশ্রেণীর অন্তহীন শোভাযাত্রা।

পথেই অন্ধকার নেমে এলো।

এবার একটুখানি আশ্রয় চাই।

কিন্তু কোথায় আশ্রয় ?

আকাশে ছিল কালো মেঘের ঘনঘটা। টিপ টিপ করে বৃষ্টিও পড়ছে মাঝে মাঝে। বেশ কনকনে শীত। পথটা একেবারে নির্জন।

একা একা পথ চলতে ভালও লাগছে আবার ভয়ও করছে।

পথের পাশে একটা প্রকাণ্ড গাছের তলায় বড় একটা চওড়া পাথরের ওপর বসে পড়লাম।

হঠাৎ পেছন থেকে অপরিচিত নারীকণ্ঠ শুনে চমকে উঠলাম।

—অন্ধকার এই দুর্যোগের রাতে কোথায় চলেছো একা একা ?

চেয়ে দেখি—অপূর্ব্ব সুন্দরী এক যুবতী সন্ন্যাসিনী ভৈরবী। পরণে গৈরিক বস্ত্র। দুধে-আলতায় গোলা গায়ের উজ্জ্বল বর্ণ, হরিণীর মত কালো দুটি টানা টানা চোখ। গোলাপের পাপড়ীর মত পাতলা পাতলা দুটি ঠোঁট।

হিমালয়ের এই নিভৃত নির্জন স্থানে একাকিনী এই সুন্দরী যুবতীকে দেখে আমার বিস্ময়ের আর সীমা ছিল না।

কপালে লাল সিঁদুরের টকটকে লাল সোনার মত টিপ। পিঠ বেয়ে নেমে এসেছে কালো চুলের গুচ্ছ। বৃষ্টির জল বিন্দু বিন্দু ঝরে ঝরে পড়ছে চুল বেয়ে বেয়ে। এলোমেলো ছড়িয়ে আছে কাঁধে, পিঠে কপালে। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। হাতে ত্রিশূল আর কমণ্ডলু।

ভৈরবী তার আস্তানায় আমাকে নিয়ে গেল।

আস্তানা বলতে পর্ব্বতের একটি চমৎকার পরিচ্ছন্ন গুহা। গুহার মুখে বড় একটি গাছ। তারই নীচে ধুনির আগুন।

ভেতরে তেলের প্রদীপ জ্বলছে। কাঠের তোরঙ্গ, জলের পাত্র। দড়িতে কয়েকটি শাড়ী ঝুলছে। ছোট পরিবেশে পরিপাটি করে সাজানো সন্ন্যাসিনীর সংসার।

গুহার একদিকে বাঘছাল পাতা, দেয়ালে দেবদেবীর পট, প্রকাণ্ড দুটি তাম্রপাত্রে কিছু ফুল আর নৈবেদ্য।

আমাকে আসন পেতে দিয়ে ভৈরবী বললে, আগে চা খাও। শীত এখুনি চলে যাবে।

কোণে ছোট্ট উনুন, রান্নার সাজ-সরঞ্জাম—থালা, ঘটি, বাটি, হাতা, খুন্তি।

তোলা উনোনে গনগনে আগুনের আভায় লালে লাল হয়ে উঠেছে সন্ন্যাসিনীর মুখ। পেতলের কড়াইয়ে তরকারি চাপিয়েছেন। কাঁচা দুধের ভাল রান্না হয়ে গেছে। বাকি শুধু আতপ চালের ভাতটা। চমৎকার চালের গন্ধে আকুল হয়েছে সেই নির্জন পরিবেশ।

ভৈরবীর সঙ্গে পরিচয় হলো। তাকে আমি দিদি বলে ডাকলাম।

নিজের পূর্ব্ব পরিচয় কিছুই সে বললে না। বললে, নাম্নে বা, আমার কথা শুনতে হবে না। বলতে নেই। মানা আছে। তোর কথা বল্, আমি শুনি।

চা খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা ভৈরবীদিদি, তুমি কতদিন এসেছ এখানে ?

—তা প্রায় বুড়ি বছর হলো। প্রথম যখন এসেছিলাম তখন নিতান্ত ছেলেমানুষ। পনেরো

ষোলোবছর বয়স। সে এক বিশ্রী প্রবঞ্চনার ইতিহাস। যার সঙ্গে এসেছিলাম সে আমাকে এই গহন অরণ্যের মাঝখানে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল।

—একা একা ভয় করতো না?

চোখ বুজে ভৈরবীদিদি কি যেন ভাবলে কিছুক্ষণ। নিজের অতীত জীবনের সেই ভয়াবহ দিনগুলো বোধকরি একবার দেখে নিলে। তারপর বললে, হ্যাঁ ভয় করতো বই-কি! ভয় ছিল মানুষের। এ-সব জায়গা ছিল ঘন অরণ্যে ঢাকা। কাছাকাছি না ছিল লোকজন, না ছিল হাট-বাজার। আমাকেই যেতে হতো ভিক্ষার সন্ধানে। যা পেতাম তাই দিয়ে চাল ডাল তেল নুন কিনে আনতাম।

—বিপদে পড়নি কোনদিন?

দিদি বললে, পড়েছি বৈকি! কিন্তু ছোটবড় সবরকম বিপদ থেকে তিনি আমাকে সব সময় রক্ষা করেছেন। তাঁর আশ্চর্য্য ইতিহাস শুনলে অবাক হয়ে যাবে। সব সময় তিনি আমাকে দুহাত বাড়িয়ে আগলে রেখেছেন। একটি মুহূর্ত্তের জন্যে মনে হয়নি—আমি একা। দিনরাত তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি, এখনও বলি।

দিদিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—এই তিনিটি কে?

এক পেয়ালা চা দিদি নিজেও নিয়েছিল। হাতের পেয়ালাটি নামিয়ে সে আবার চোখ বুজে চুপ করে রইলো। চোখ যখন খুললো, দুচোখভরা জল নিয়ে তার সেই সুন্দর মুখখানি কি এক স্বর্গীয় আনন্দের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো—ভাষা দিয়ে তা বোঝাবার ক্ষমতা আমার নেই।

—তিনি কে তা তুই জানিস না? তিনিই তো সব রে! তাঁকে আমি সব সময় সব-কিছুতে দেখতে পাচ্ছি। তুইও তাক। তুইও দেখতে পাবি।

তাকতে আমিও কসুর করিনি। ঘর সংসার আত্মীয় স্বজন সবকিছু পরিত্যাগ করে এই যে আমি একাকী বেরিয়ে পড়েছি হিমালয়তীর্থে—সেও শুধু তাঁরই সন্ধানে। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি—দু'চোখ ভরে তাঁর সেই অসীম সৌন্দর্য্যই শুধু দেখছি—তার বেশি কিছু নয়। সুতরাং সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করা বৃথা। ভৈরবীদিদিকে বললাম, সময় কি তোমার এমনিভাবেই কাটে?

—না। আয়, দেখবি আয়।

দিদি আমাকে তুলে নিয়ে গেল পাশের একটি প্রশস্ত গুহায়। অন্ধকারে প্রথমে কিছুই দেখতে পাইনি। তারপর আলো জ্বালতেই দেখলাম—ঘর-জোড়া শুকনো পাতা, ইতঃস্তত ছড়ানো নানারকমের রংএর পাত্র, তুলি আর গঙ্গামৃত্তিকা দিয়ে তৈরি-করা মাটির ডাল। সুমুখে উঁচু একটি বেদী, আর সেই বেদীর ওপর ছোট্ট একটি দুর্গা প্রতিমা। মাটির প্রতিমায় সদ্য রং দেওয়া হয়েছে। কলকাতার কারিগরেরা যে রকম প্রতিমা তৈরি করে এ যেন তার চেয়েও সুন্দর।

—এ সব কি তুমি নিজে তৈরি করেছ দিদি?

দিদি বললে, হ্যাঁ ভাই, দিনরাত এই আমার কাজ। যখন যে পুজো হয় তখন সেই প্রতিমা আমি তৈরি করি। দুর্গার পর লক্ষ্মী, তারপর কালী। এই ভাখ্, সব আমার তৈরি হয়ে গেছে।

প্রদীপটি তুলে ধরে সবই আমাকে দেখালে।

—এই যে এত এত রং তুলি—এর তো খরচ অনেক। ভিক্ষাতেই সব চলে?

দিদি বললে, ঠিক সময় সবই জুটে যায়। কাল পুজোর ষষ্ঠী, আমার গুরুদেব আসবেন পুজো

করতে। ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী - এই পাঁচদিন তোমাকে এখানে থাকতে হবে। পুজো দেখবে। তেমন পুজো তুমি কখনও দেখনি।

পুজোর কথায় মনে পড়লো—তখন আমি কলেজের ছাত্র; হোষ্টেলে থাকি, শ্রীরামকৃষ্ণের আর মা কালীর দুখানি বাঁধানো ছবি দেয়ালে টাঙিয়ে রেখে তার সুমুখে বসে চোখ বুজে ধ্যান করি। ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে যাই। সেই সময় আমার এক বন্ধুর মুখে শুনেছিলাম হাওড়ার বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের কথা। তিনিও নাকি পুজো করেন এবং সেও নাকি মুগ্ধ হয়ে দেখবার মত ঘটনা।

একদিন গিয়েছিলাম তাঁর দুর্গাপুজা দেখতে।

বিমুগ্ধ বিস্ময়ে তন্ময় হয়ে দেখেছিলাম তাঁর নবমী পূজা।

তাঁর এক শিষ্যের দেখেছিলাম সরস্বতী পূজা। বরানগরে গিয়েছিলাম পুজো দেখবার নিমন্ত্রণ পেয়ে।

এও হয়ত তেমনিই হবে। ভৈরবীদিদির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।

ষষ্ঠীর দিন ভৈরবীদিদির গুরুদেব এলেন।

সঙ্গে এলো কয়বেহারী দুজন ভক্ত। সঙ্গে দুজন সাঙ্গোপাঙ্গী কুলি। পুজোর ফুল, নৈবেদ্য, অন্যান্য যাবতীয় উপকরণ, চাল, ডাল, কাঁচা আনাজ,—কিছুই বাকি রইলো না। তারপরেও ক্রমাগত আসতে লাগলো—নানান জনের নানারকম উপহার। দেখতে দেখতে ঘর ভরে গেল।

বিরাজবাবু বললেন, God intoxicated man বলতে যা বুঝায় সেরকম মানুষ কমই দেখেছি, ভৈরবীদিদির গুরুদেবকে দেখে মনে হলো—ইনিও God intoxicated man, গৌরবর্ণ, নিটোল স্বাস্থ্য, মাথায় বড় বড় চুল, কপালে চন্দন আর সিঁদুরের ফোঁটা, বড় বড় মণিযুক্ত দুটি উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি যেন কোন্ অপার্থিব জগতের দিকে স্থির নিবদ্ধ।

গুহার ভেতর কনকনে শীত। গরম কম্বল গায়ে দিয়েও শীত ভাঙে না। বাইরে টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি আর বড়ো হাওয়া। কিন্তু এই আচার্যদেবের দেহে মাত্র একটি সুতিবস্ত্র। শরীরটা যেন লোহায় তৈরি।

ইনি কোথায় থাকেন, কোত্থেকে আসছেন কেউ কিছুই জানে না। হিমালয়ের তীর্থে তীর্থে ক্রমাগত পরিক্রমা করাই তাঁর কাজ।

জিজ্ঞাসা করলে বলেন, মায়ের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি ভাই। মা আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছেন।

তারপর হুশাসনে বসলেন তিনি—দেবী প্রতিমার সম্মুখে।

আচমন করলেন, আচমনশুদ্ধির মন্ত্রপাঠ করলেন, দেহশুদ্ধি হলো। তারপর আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে আমাদের সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন: আজ বিশ্বমাতার আবির্ভাব হবে এইখানে। আপনারা দেখুন। প্রাণভরে দেখুন!

আজ দেবীর অধিবাস।

বিল্ববৃক্ষের পূজার পর মায়ের আবির্ভাবের গান আরম্ভ হলো—

মা আসছেন বলে আলোয় আকাশ বাতাস ভরে গেছে। মায়ের পথ আকীর্ণ করে শিউলি ফুল ঝরে ঝরে পড়ছে। আকাশে বাতাসে শিউলি ফুলের গন্ধ।

সত্যি সত্যি শিউলি ফুলের গন্ধ পাচ্ছিলাম আমরা।

গুরুদেব একাগ্র তন্ময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মায়ের মুখের দিকে।

মুখে উচ্চারণ করছেন—মা! মা!

সে কী ব্যাকুল আহ্বান!

মা বলে ডাকতে অনেককে অনেকবার শুনেছি কিন্তু সে রকম ডাক না শুনলে বিশ্বাস করা যায় না।

আমাদের সর্বাঙ্গ শির শির করে উঠলো।

ভৈরবীদিদির মুখের দিকে তাকালাম। তাঁর চোখ দুটি তখন জলে ভরে এসেছে। তিনিও একাগ্র-দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে বসে আছেন।

আচার্যদেব বলে চলেছেন—এতগুলি ভক্ত আজ তোকে দেখবার জন্যে সমবেত হয়েছে। তাদের সম্মুখে তুই একটিবার এসে দাঁড়া। তারা প্রাণ ভরে দেখুক!—মা! মা! এই আমি তোর মৃন্ময়ী মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করছি।

তিনি মন্ত্রোচ্চারণ করে চলেছেন—প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ!

মন্ত্রের মধ্যে কোনও গূঢ় তত্ত্ব বা রহস্য নেই—আছে সরল বিশ্বাসী সন্তানের মায়ের ওপর জোর আবার। এক একটি মন্ত্র তিনি উচ্চারণ করছেন আর আমাদের সমস্ত শরীর মন কেঁপে কেঁপে উঠছে। তিনি যেন মন্ত্রের সঙ্গে উপস্থিত সকলের প্রাণ জোর করে টেনে প্রতিমার প্রাণের সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন।

তারপর কোন্‌দিক দিয়ে কেমন করে যে ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী—এই চারটি দিন এবং রাত্রি পার হয়ে গেল—কিছুই আমরা বুঝতে পারলাম না। মাতৃমন্ত্রে অভিভূত হয়ে আমরা সকলে যেন মা-ময় হয়ে রইলাম।

পূজো অনেক দেখেছি, মন্ত্র অনেক শুনেছি, কিন্তু এমনটি কখনও দেখিনি, কখনও শুনিনি।

আচার্যদেব বললেন—'প্রাণার্ঘ্যং প্রতিগৃহ্যতাম্!' তোমরা সকলে নিজের নিজের প্রাণ অর্ঘ্যস্বরূপ মাকে প্রদান কর! তারপর তিনি বুঝিয়ে বলতে লাগলেন—আমাদের প্রাণার্ঘ্য মায়ের কাছে সমর্পণ করে দাও। নিজে এতদিন চালিয়ে দেখেছ, পেয়েছ ব্যাধি, বেড়েছে দারিদ্র্য—এইবার থেকে মায়ের হাতে তোমাকে চালাবার ভার ছেড়ে দাও! মায়ের কাছ থেকে এ প্রাণ আর ফিরে চেয়ো না। চাইলেই তিনি ফিরিয়ে দেবেন, কিন্তু ফেরত নিয়ে করবে কি?

মাগো! আজ থেকে আমার নিজের বলতে আর কিছু রইলো না। তোর হাতে সবকিছু সমর্পণ করে আমরা চিরদিনের মত নিশ্চিন্ত হলাম।

ভাবাবেগে সবকিছু তখন থম্ থম্ করছে।

মায়ের এমন প্রত্যক্ষ আবির্ভাব কখনও দেখিনি। যা দেখেছি যা অনুভব করেছি তার আনুপূর্বিক বর্ণনা করবার ক্ষমতা আমার নেই। জীবনে এ যেন একটি মুহূর্তের সৌভাগ্য। এর তুলনা নেই।

শেষদিন বিজয়া দশমী। আচার্যদেব বললেন, আজ আর বেশি সময় হাতে নেই। মাকে ছেড়ে দিতে হবে। সপ্তমী থেকে দশমী—মাকে ধরে রাখবো—এই অঙ্গীকারে মাকে এনেছিলাম। আজ বিজয়া দশমী। অল্প যেটুকু সময় হাতে আছে—সেই সময়টুকু মাকে প্রাণ ভরে দেখে নাও, মার সঙ্গে কথা কয়ে নাও! এ সুযোগ হারিয়ো না। একথা ভেবো না—মা চিরকালের জন্য আমাদের কাছে থাকতে চান না—মার দিক থেকে কোনও বাধা নেই, কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু আমরা তাঁকে রাখতে পারবো না। আমাদের সে শক্তি নেই। আমাদের শক্তি সীমাবদ্ধ। আমরাই নিজের দোষে নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছি।

পূজা সাঙ্গ করে আচার্য্যদেব মার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন—মা, মাগো, এরা সব তোমাকে দেখতে চায়, বিভূতি দেখতে চায়, কিন্তু এরা বোঝে না সর্ব্বশক্তি স্বরূপিণী সর্ব্বব্যাপী মা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে দেখা দিয়েছেন, এরচেয়ে পরমাশ্চর্য্য আর কি হতে পারে? আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ শক্তি নিয়ে যাকে এমনি করে ইচ্ছে করলেই দেখতে পাই না, কিন্তু সন্তানস্নেহমুগ্ধা জননীর পক্ষে সকলই সম্ভব। তিনি আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে দেখা দেন।

এই পর্য্যন্ত বলে বিরাজবাবু থামলেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর কি হলো বলুন।

বললেন, তারপর হলো বিসর্জন। কান্নাকাতর কণ্ঠকণ্ঠে আচার্য্যদেব মন্ত্র উচ্চারণ করেন আর চোখের জলে বুক ভাসান। এই ক'টি দিন ধরে হিমালয়ের সেই হিমশীতল পর্ব্বতগুহায় ভৈরবীদিদির কল্যাণে অকল্পপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য যে আনন্দের উপলব্ধি আমাদের হলো তাকে আমাদের জীবনের এক দুর্লভতম সৌভাগ্য ছাড়া কী আর বলতে পারি!

তার কিছুই আমি তোমাকে বুঝাতে পারলাম না।

আজ কোথায় সেই হিমালয়, কোথায় আমার ভৈরবীদিদি, কোথায় সেই আচার্য্যদেব—কত দূরে তাদের ফেলে চলে এসেছি, কিন্তু তার অপূর্ব্ব আবেশ আর অব্যক্ত মাদকতার অবিস্মরণীয় স্মৃতি আমার মনের মণিকোঠায় চিরদিনের জন্য সঞ্চিত হয়ে রইলো।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

• • •

যে আদর্শ লইয়া গল্প-ভারতী বঙ্গভারতীর বেদীমূলে দীপ জ্বালিয়াছে, সেই আদর্শের দীপালোকে বাংলাসাহিত্য ও বাংলার সংস্কৃতি যেন উত্তরোত্তর আরো সমুজ্জ্বলিত ও প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, আজিকার আলোক দীপ্ত এই দীপালী উৎসবে ইহাই আমাদের একান্ত কামনা।

[স্বনামধন্য নাট্যকার ক্ষিরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের অমর সৃষ্টি 'বঙ্গের প্রতাপ আদিত্য' নাটকের অংশ-বিশেষ বিশেষ সময়োপযোগী, তাই পাঠকদের সামনে তুলে ধরা হল।]

সম্পাদক—গল্পভারতী

যশোরেশ্বরীর মন্দির

চণ্ডীবর ও বিজয়া

বিজয়া। চণ্ডীবর! আজ এই ঘোরা দিগন্তব্যাপিনী অমানিশায় এই শার্দ্দূল-রব ঘৃণাবৃত অরণ্য মধ্যে মায়ের আমার কোন্‌রূপ ধ্যানে নিযুক্ত আছ?

চণ্ডীবর। কেন মা। চিরদিন মায়ের যে মুখ দেখে আমি আত্মহারা—কালিন্দীর তরঙ্গসদৃশ শ্যামল সৌন্দর্য্যের যে উচ্ছ্বাসে মা আমার সমস্ত সংসারকে আবৃত ক'রে রেখেছেন, সে রূপ ভিন্ন আবার অন্য কোন্ রূপে মাকে আমার দেখতে আদেশ কর জননী?

বিজয়া। না বাপ্! মায়ের অন্য কোন রূপ ধ্যান কর।

চণ্ডীবর। তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী—

বিজয়া। উঁহুঁ! অন্য রূপ কল্পনা কর।

চণ্ডীবর। যা কুন্দেন্দুতুষারহারধবলা যা শ্বেতপদ্মাসনা
যা বীণাবরদণ্ডমণ্ডিত করা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা।
যা ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্করপ্রভৃতিভির্দেবৈঃ সদা বন্দিতা
সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষজাড্যাপহা।

বিজয়া। বঙ্গে সরস্বতীর কৃপার অভাব নেই। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিগণের বীণার কোমল ঝঙ্কারে বঙ্গ-গগন প্রলয়াবকাল পর্য্যন্ত পূর্ণ থাকবে। চণ্ডীবর! মায়ের অন্য রূপ কল্পনা কর।

চণ্ডীবর। নানারত্ন বিচিত্রভূষণকরী হেমাম্বরাড়ম্বরী
মুক্তাহার বিলম্বমান বিলসদ্বক্ষোজকুম্ভান্তরী।
কৈলাসাচলকন্দরালয়করী গৌরী উমা শঙ্করী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী।

বিজয়া। আর কেন চণ্ডীবর! এখনও দেহি? মা আমার দিতে বাকি রেখেছেন কি! যমুনাজল-সম্পূর্ণা অমৃতভঙ্গিনী ভাগীরথী যাঁর কণ্ঠহার, চিরতুষারধবলিত হিমাচল যাঁর শিরোভূষণ, চিরশ্যামল শস্যসম্পদ যাঁর অঙ্গাবরণ, এই নিবিড় কৃষ্ণকান্তি বনস্থলীতে যিনি কুটিলকুন্তলা, অনন্তপ্রসারী নীলাম্বুরাশির শুভ্র তরঙ্গফেনরেখা যাঁর মেখলা, সে বঙ্গমাতার কিসের অভাব চণ্ডীবর! যাঁর জলে স্বর্গ, ফলে সুধা, শস্যে অনন্তদেবের অনন্তজীবের প্রাণধারিনী শক্তি, যাঁর অঙ্গে শিরীষ কুসুমের কোমলতা, যাঁর ললাট শশী-সূর্য্য-করোজ্জ্বল, যাঁর সমীরণ মধু-গন্ধ-কুসুম-সীকরবাহী, সে বঙ্গের জন্য আর ধনরত্ন ভিক্ষা কেন? চণ্ডীবর! মায়ের অন্তরূপ ধ্যান কর।

চণ্ডীবর। বর্হাপীড়াভিরামাং মৃদুতরতিলকাং চূতলাক্ষাঙ্গরাগাং
কল্পাকীং কম্বুকণ্ঠীং স্মিতসুভগমুখীং শারদে শুভ্রবেশাম্।
শ্যামাং শান্তাং ত্রিনেত্রাং রবিকরবসনাং কৃষিতাং বৈজয়ন্তীং
বন্দে বৃন্দাবনস্থাং যুবতিশতবৃতাং ব্রজগোপালবেশাম্॥

বিজয়া। উঁহুঁ! তবে গোবিন্দদাসের পবিত্র সঙ্গ ত্যাগ করলুম কেন? চণ্ডীবর। মায়ের আর কোন রূপ কল্পনা কর।

চণ্ডীবর। এ কি মা কপালিনী! বিজয়লক্ষ্মী-মূর্ত্তি ধারণ ক'রে কোন মহাপুরুষকে সমর-সজ্জায় সাজিয়ে দিচ্ছ মা। (উঠিয়া)

কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী
বিচিত্রখট্টাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।

বিজয়া। বল চণ্ডীবর! আবার বল—আবার বল।

চণ্ডীবর। দ্বীপিচর্ম্মপরিধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা।
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা॥

বিজয়া। আহা কি সুন্দর! —চণ্ডীবর! মাকে দেখাও—মাকে দেখাও। বঙ্গদেশে অভয়ার নাম প্রচার কর।

চণ্ডীবর। নিশুম্ভ-শুম্ভহননী মহিষাসুরমর্দ্দিনী।
মধুকৈটভহন্ত্রী চ চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী॥
অনেকশস্ত্রহস্তা চ অনেকাস্ত্রস্য ধারিণী।
অপ্রৌঢ়া চৈব প্রৌঢ়া চ বৃদ্ধা মাতা বলপ্রদা।

বিজয়া। চণ্ডীঘর! মায়ের পূজার ব্যবস্থা কর। রক্তনিষিক্ত অগণ্য ছাগের অস্থি দিয়ে কপালিনীর আসাহন কর। ডাক—মুক্ত করে মাকে ডাক। 'মা মা' ব'লে চীৎকার করে যোগমায়ার নিদ্রা ভঙ্গ কর। মা আমার আর-একবার আসুন। আর-একবার তাঁর অভয়বাণী দুর্বল বাঙালী-হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করুক। বল্ মা প্রচণ্ডবলহারিণী! একবার বল্! বহুকাল পূর্বে দানবপদদলিত ধরিত্রীকে রক্ষা করতে, ইন্দ্রাদিদেবগণ-সম্মুখে যে অভয়বাণী উচ্চারণ ক'রেছিলি, সেই বাক্য তোর এই অদৃষ্ট নির্ভর সন্তানগুলোকে শুনিয়ে আর-একবার বল্—

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্।

• • •

বাঙালী চিরদিনই শক্তির সাধনা করে এসেছে এবং সে সাধনা তার কোন দিনই নিষ্ফল হয়নি। বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও বাংলার হাজার হাজার বীর সন্তান যাঁরা সর্বস্ব পণ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মাহুতি দিয়ে গিয়েছেন তাঁরা সবাই ছিলেন শক্তির সাধক। এবং সাধা মনপ্রাণ দিয়ে সেই সাধনায় তাঁরা নিযুক্ত থাকতেন। আজ আমরা সাধনার সেই একাগ্রতা ও শক্তি হারিয়ে ফেলেছি বলেই দুর্বল ও অসহায় হয়েছি এবং তার ফলে আমাদের চরম ব্যর্থতা ও হতাশা দেখা দিয়েছে। কাজেই সে-শক্তি আমাদের ফিরে পেতেই হবে এবং তার জন্য নতুন করে করতে হবে শক্তি সাধনার মন্ত্র উদ্‌যাপন মা-ভবানীর মন্দিরে।

• • •

"You will fear nothing, stop at nothing. You will be like Lions. You must rouse India and the whole world. No Cowardice. Do you understand? Be true unto death!"

—Swami Vivekananda

পূজায় প্রগতি !

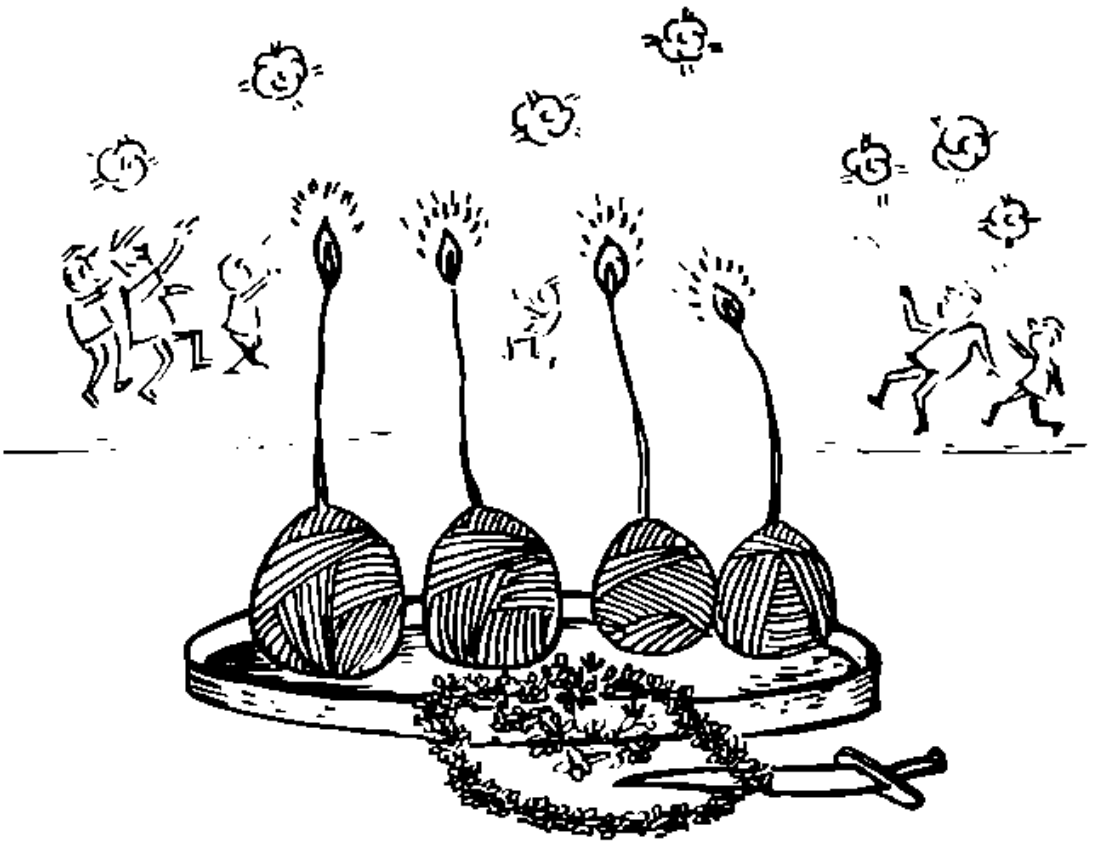

জয় বোমা মাইজিকী জয়।

হেলেন ওয়াস্‌নার · রূপসী বিদুষী জার্মাণ তরুণী। জার্মাণ অভিজাত সমাজের আকর্ষণ-বিন্দু। জার্মাণ প্রতিভাধরদের বাঞ্ছিত বান্ধবী। জনতার চিত্তকে যাঁরা জয় করেন হেলেনের দুরাকাঙ্খা, তাদের জয় করবে সে। চিৎ-বিজয়িনীর শক্তিও সৌন্দর্য্য নিয়েই সে এসেছে পৃথিবীতে।

বিজয়িনীর মুগ্ধ দৃষ্টি গিয়ে পড়ে সেই মৌনমূর্ত্তি ভারতীয় বিপ্লব-নেতার ওপর। সভায়, মিলন-উৎসবে, যেখানে সুভাষচন্দ্র আমন্ত্রিত হন, হেলেন অনুসরণ করে। মুগ্ধ-বিস্ময়ে দেখে সেই পর্বত-গম্ভীর মানুষটির মুখে অগ্নিজ্বালা সৈনিক-নিষ্ঠার। অন্তরে সংগোপনে অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে, সুতীব্র জয়-লিপ্সা: · ভারতবর্ষকে যে এমন করে ভালবাসে, যদি তার ভালবাসা পাওয়া যায়।

আলাপ হয়, পরিচয় হয়। হেলেন বার বার চেষ্টা করে যৌথিক আলাপের বেড়া পেরিয়ে অন্তরঙ্গতার অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে। বার বার ফিরে আসে প্রচণ্ড ব্যর্থতায়। কি এক দুর্ভেদ্য আবরণে ঢাকা এই বিচিত্র মানুষটির মন। বহু বিখ্যাত ব্যক্তিত্বকে হেলেন জীবনে দেখেছে···অন্তরঙ্গভাবেই দেখেছে কিন্তু এই বিচিত্র মানুষটিকে কোন পূর্ব-অভিজ্ঞতা দিয়ে সে পরিমাপ করতে পারে না। এ কেমন সৈনিক যে রূপের আবেদনের অর্থ বোঝে না? এ কোন নিঃসঙ্গ পথিক, সুন্দর তরুণীর সঙ্গ যার মনে কোন সুরই জাগায় না? মুগ্ধ বিজয়িনীর মনে তীব্রতর হয়ে ওঠে জয়-লিপ্সা। এ উপেক্ষা সহ্য করতে পারে না বিজয়িনীর রূপ।

সে জয় করবেই যেমন করেই হোক · শুধু একটা রাত্রি·· একটা মুহূর্ত্ত···একটা স্বীকারোক্তি একটা উদগ্রীব আলিঙ্গন···

অপরাহ্নে নিঃসঙ্গ বিপ্লবী গৃহ-সংলগ্ন উদ্যানে একা ঘুরে বেড়াচ্ছেন·····এমন সময় পুষ্পিতলতাকুঞ্জের আড়াল থেকে অকস্মাৎ আবির্ভাবের মতন দেখা দিল হেলেন ওয়াস্‌নার। সুভাষচন্দ্র বিস্মিত হয়ে যান।

হেলেন অকপটে অন্তরের অর্ঘ্য নিবেদন করে, বলে, আমি এসেছি স্বেচ্ছায় তোমার কাছে ধরা দিতে · শুধু একটি রাত্রির জন্যে···

সুভাষচন্দ্র স্নিগ্ধ গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, হে জার্মাণ দুহিতা, তুমি ভুল করেছ · তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ···তুমি জাননা আমার কি ব্রত!

হেলেন মূর্চ্ছিত হয়ে যায়। মূর্চ্ছিত তরুণীকে সুভাষচন্দ্র গৃহে নিয়ে আসেন। শুশ্রূষা করেন। মূর্চ্ছা ভাঙলে সুভাষচন্দ্র সস্নেহে বলেন, তুমি জান না ভগ্নি, কি কঠোর আমার ব্রত···জগতের সব নারীকে আমি আমার জননীর মত দেখি · সেই আমার শিক্ষা, সেই আমার সাধনা।

ভালবাসি আমি শুধু একজনকে, সে ভালবাসায় আমার দেহ-মন-চৈতন্য এমন আচ্ছন্ন হয়ে আছে যে তার মধ্যে একতিল স্থান নেই অন্য কারুর জন্যে···আমার সে-ভালবাসার ধন হলো, আমার দেশ, আমার ভারতবর্ষ, আমার জন্ম-জন্মান্তরের জননী! এ মুহূর্ত্তের খেলা আমার জন্যে নয় ভগ্নী।

মাথা নত করে অভিবাদন জানিয়ে ফিরে আসে জার্মান দুহিতা সুন্দরী হেলেন।

কিছু রঙ কিছু বেরঙ

ধারাবাহিক উপন্যাস

বিমল মিত্র

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ ৪ ॥

নিবারণ চক্রবর্তী এক অদ্ভুত লোক। এমন কোনও লোক নেই কদমতলীতে যার সঙ্গে ঝগড়া নেই, আবার এমন কোনও লোক নেই যার সঙ্গে তাঁর ভাবও নেই। যেখানে ভালো কাজ কিছু হবার কথা হবে সেখানে গিয়েই বাগড়া দেবে, আবার যেখানে খারাপ কাজ কিছু হবার কথা হচ্ছে দেখতে পাবে তাও ভণ্ডুল করে দেবে।

যেখানে যাবেন হাতে হুঁকো নিয়ে যাবেন। কলকেতে তামাক ফুরিয়ে যায় তো কারো কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে তামাক-টিকে নিয়ে আগুন জ্বালিয়ে নেবেন।

সেদিন দক্ষিণপাড়ার বসন্তর গাছটা নিয়ে যখন তুমুল কাণ্ড হয়ে গেল তখনও নিবারণ চক্রবর্তী গেলেন বসন্তর কাছে। তখন সবাই চলে গেছে। নিবারণ চক্রবর্তী যখন বাইরে থেকে বসন্তর নাম ধরে ডাকলেন তখন বসন্ত দাওয়ার ওপর গুম্ হয়ে বসে ছিল।

খুড়োমশাই-এর ডাক শুনেই বাইরে এল। বললে—আসুন খুড়োমশাই—আসুন, ভেতরে আসুন—

নিবারণ চক্রবর্তী বললেন—আগে একটু আগুন দে বাবা, আমার আগুন নিভে গেছে,—

বসন্ত শুধু আগুন দিলে না, তার আগে তামাক কাঠ কয়লা এনে নতুন করে কলকে ধরিয়ে দিলে। নিবারণ চক্রবর্তী ভালো করে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—বাঃ, এই তো খুব খুব ভালো তামাক ধরাতে পারিস, কী কাঠ রে? কী কাঠের আগুন?

বসন্ত বললে—শুল কাঠ—

—তাই! তাই এত ভালো ধোঁয়া হয়েছে।

বসন্ত জানতো খুড়োমশাই আসলে তামাক খেতে আসেন নি। আসল মতলোবটা আলাদা। খানিক পরে সেই আসল মতলোবটা বেরোল। নিবারণ চক্রবর্তী হুঁকোতে একটা সুখ-টান দিয়ে লম্বা করে ধোঁয়া ছাড়লেন।

বললেন—হ্যাঁ, ভালো কথা, তোর শিমুল গাছটা নিয়ে শুনলুম শশীরা খুব মারামারি করে গেছে নাকি?

বসন্ত বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ খুড়োমশাই, শুধু খুন করতেই যা বাকি রেখেছে। অপমানের একশেষ করেছে।

—তা তুই কী করলি ?

—আজ্ঞে আমি একলা মানুষ, ওদের অতগুলোর সঙ্গে পারবো কেন ? মাষ্টার মশাই-এর দল-বল ছিল সঙ্গে। আর আমার দিকে আমি একলা। আমি তবু বললাম যে মেয়েছেলেরা যারা ঘাটে যাবে তাদের যদি অসুবিধে হয় তো তারা দক্ষিণপাড়া দিয়ে না গিয়ে পুবপাড়া দিয়ে ঘুরে যাক, তা আমার কথা শুনে মারতে এল !

—তা তোকে মারতে এল আর তুই চুপ করে রইলি ?

বসন্ত গলাটা করুণ করে বললে—তা একলা আর কী করবো বলুন, তাদের সঙ্গে লাঠালাঠি করবো ?

—লাঠালাঠি না করতে পারিস তো মামলা করে দে। মামলা করতে তো আপত্তি নেই।

বসন্ত বললে—কিন্তু মামলা করার যে অনেক হাঙ্গামা খুড়োমশাই ? আর টাকা ? আমার অত টাকা কোথায় বলুন না—

নিবারণ চক্রবর্তী বললেন—হাঙ্গামা ? মামলা করতে আবার হাঙ্গামা কী ? উকিল আছে, মুহুরি আছে, পেশকার আছে, হাঙ্গামা সামলাবে তারা। আর টাকা ? আমি থাকতে তুই টাকার কথা কোন্ মুখে বললি ? তোর টাকার কথা বলতে লজ্জা করলো না ? তোর বাবা যে আমার কাছ থেকে চল্লিশ টাকা হাওলাত নিয়েছিল, সে টাকার জন্যে আমি কখনও তোর কাছে পীড়াপীড়ি করেছি ? বল্, তুই বুকে হাত দিয়ে বল সত্যি কিনা—

বসন্ত বললে—আজ্ঞে তা অবিশ্যি করেন নি আপনি, কিন্তু তার সুদ তো আমি বরাবর দিয়েই যাচ্ছি—দু'শো টাকার ওপর সুদ দিয়েছি আপনাকে—

—সুদ তো দিয়েছিস দু'শো টাকা, কিন্তু আসল চল্লিশ টাকা যে এখনও দিতে পারিসনি তার জন্যে আমি তোকে কোনওদিন কিছু বলেছি ?

—না, আজ্ঞে তা বলেন নি !

—তবে ? তবে আমাকে অত কথা বলছিস কেন ? আমি কি তোর টাকার পরোয়া করি, না তোর টাকা না পেলে উপোষ করে মরছি। তাও তো নয়। তবে ?

তারপর হুঁকোয় টান দিয়ে আবার বললেন—তোর ভালোর জন্যেই তোকে বলছি, তোর বাড়িতে এসে তোরই গাছ কেটে আবার তোকেই শাসিয়ে যাবে এ তো ভালো কথা নয়। তাহলে দেশে কোর্ট-কাছারি আছে কী করতে ? আর কোর্ট-কাছারিতে গেলে টাকা-খরচ আছে স্বীকার করি, কিন্তু আমি তো মরে যাই নি। যত টাকা তোর লাগবে, আমি দেব। তুই শশীর নামে আর তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের নামে ফৌজদারি মামলা করেছে সদরের কোর্টে। তোর কিছু ভাবনা নেই, তুই শুধু পেশকার মুহুরি আর উকিলের দিকটা সামলাবি, আর আমি টাকার যোগান দিয়ে যাবো তোকে, আমি কথা দিচ্ছি—

তা যখন প্রায় বসন্ত ঘোষের আড়াই হাজার টাকার মত দেনা হয়ে গেল, তখন নিষ্পত্তি হলো যে আসামীরা সবাই বে-কসুর খালাস হলো। তাতে দু'পক্ষেরই অনেক টাকা জলে চলে গেল। মাঝখান থেকে লাভ হলো শুধু নিবারণ চক্রবর্তীর। দুলে ঘোষের ছেলে বসন্ত ঘোষের কিছু জমি লিখে নিলেন তিনি। আর শশীপদের মামলার খরচের জন্যে যে টাকা ধার দিয়েছিলেন তার জন্যেও তাদের কিছু জমি লিখে নিলেন। দুনো লাভ হলো চক্রবর্তী মশাই-এর।

মামলার নিষ্পত্তির পর বসন্ত এলো নিবারণ চক্রবর্তীর কাছে। এসে কেঁদে ফেললে।

বললে—এখন কী হলো খুড়োমশাই, আমার জমিও গেল, মামলাতেও হেরে গেলাম—

নিবারণ চক্রবর্তী বললেন—কাঁদিসনে বসন্ত কাঁদিসনে, মামলাতে হার-জিত আছেই, তা বলে কান্নাকাটি করলে চলে? আমি কত মামলাতে হেরেছি তা তোর মত কেঁদেছি? এখন সদরের কাছারি হলো, এখানে তুই হারলি, কিন্তু সদর-কাছারির ওপরেও তো একটা বড় কাছারি আছে। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো সব কাছারির মাথার ওপর আছে ভগবানের কাছারি। সেখানে তো অবিচার হবে না—

বসন্ত বড় ধর্মভীরু লোক। বিশেষ করে দেব-দ্বিজে তার বড় ভক্তি। তবু যেন তার সন্দেহ হলো নিবারণ চক্রবর্তীর কথায়।

বললে—কিন্তু এই কদমতলীতে ভগবানের কাছারির কোথায় নাগাল পাবো?

নিবারণ চক্রবর্তী হাসলেন। যেন আধ্যাত্মিক হাসি। হাসতে হাসতেই বললেন—কদমতলীতে আর ভগবানকে কোথায় পাবি? শুধু কদমতলী কেন, সমস্ত পৃথিবী থেকেই ভগবান পালিয়ে গেছে।

বসন্ত অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে—সে কি খুড়োমশাই, কালী দুর্গা শিব ওঁরাও তো ভগবান! ওঁদেরই তো আমরা ভগবান বলে পুজো করি—

—ভুল করিস বসন্ত, ভুল করিস। ওসব হচ্ছে মাটির পুতুল। আসল ভগবান এক কালে পৃথিবীতে ছিল। কিন্তু যেদিন পৃথিবী পাপে ভর্তি হয়ে গেল সেইদিনই তাঁরা পালালেন। এত পাপ সইবে কেন তাঁদের?

—তাহলে তো কোথাও সুবিচার নেই খুড়োমশাই!

নিবারণ চক্রবর্তী বললেন—কেন সুবিচার থাকবে না? তাহলে আমরা আছি কী করতে? এই ব্রাহ্মণরা? কলিযুগে তো বামুনরাই হলো দেবতা, কলিযুগের দেবতাই হলো বামুন। সেই বামুনরা তুষ্ট থাকলেই দেবতারা তুষ্ট থাকেন—

বসন্ত কী বুঝলো আর বুঝলো না তা সেই জানে! নিবারণ চক্রবর্তী দু'পায়ের ধুলো নিয়ে বাড়ি চলে গেল।

★

এরপর কদমতলীতে কত কাণ্ড ঘটে গেছে। বসন্তর বাপের সেই দেনা তখনও শোধ হয়নি। তার ওপর চেপেছে মামলার দেনা। জমি বন্ধক রেখে তা বছরে বছরে কিছু-কিছু শোধ হচ্ছে বটে। কিন্তু তখনও নিজের জমিতে নিজে লাঙল দিতে পারেনি বসন্ত। পরের ক্ষেতে মজুরি খেটে পেট চালাচ্ছিল।

সেই সময়ে হঠাৎ পাকিস্তান হলো। ইছামতীর ওপার থেকে হুড়-হুড় করে উদ্বাস্তুরা আসতে লাগলো কদমতলীতে। সে এক বিপর্যয় কাণ্ড ঘটে গেল দেশে। বসন্ত ঘোষের ভরিপতি কালীঘোষও এল সপরিবারে। বোন ভাইএর কাছে এসে কেঁদে পড়লো।

বললে—দাদা, আমাদের বাঁচাও, আমরা বনে প্রাণে গেছি—

শশী মাষ্টারের তখন আর নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই। একবার দক্ষিণ-পাড়া, আর একবার পুব-পাড়া। গ্রামের ছেলে-ছোকরাদের জোগাড় করে উদ্বাস্তুদের থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করতে লাগলো। সেই বর্ষার কাদার মধ্যে খালি পায়ে একেবারে সকলের দরজায়-দরজায় গিয়ে সে দাঁড়ালো।

বললে—আপনারা সকলে এক-মুঠো এক-মুঠো করে ধান-চাল দা-হয় দিন—

তখনও হরিবিলাস সিং আর তার দল কদমতলীতে এসে পৌঁছোয়নি। তা ছাড়া চৌকিদার পুলিশ পাহারাওয়ালা কিছুই নেই। ফলে দলে লোক ইচ্ছামতী পেরিয়ে কদমতলীতে এসে হাজির হলো।

কদমতলীর মত নির্জন নিরিবিলি গ্রাম একেবারে কলমুখর হয়ে উঠলো মানুষের কলরবে। কদমতলীর বারোয়ারিতলায় হাট বসতো। সেই হাটে হরিসভার একটা ভাঙা আটচালা ছিল। শশীপদরা সেইখানেই এসে তুললে সবাইকে। তারপর সবাই মিলে খিচুড়ি রান্না করে ক'দিন সবাইকে খাওয়াতে লাগলো।

নিবারণ চক্রবর্তী প্রথম দিনেই এলেন। হুঁকো হাতে করে সবাইকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন—তোমাদের কোনও ভাবনা নেই মা-জননীরা, আমি আছি, কোনও ভাবনা নেই—

একে ব্রাহ্মণ মানুষ, তায় বৃদ্ধ, সকলেই ভক্তিভরে তাঁর পায়ের ধুলো নিলে। তিনিও পা বাড়িয়ে দিলেন তাদের দিকে।

কালী ঘোষ একপাশে বসেছিল। নিবারণ চক্রবর্তী তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কোত্থেকে এসেছ বাবাজীবন? কোন্ গাঁ থেকে?

কালী ঘোষ বললে—আজ্ঞে ঠাকুর, ভাজনঘর থেকে—

—ভাজনঘর? ভাজনঘরের জামাপদ সরকারকে চেনো?

কালী ঘোষ বললে—আজ্ঞে খুবই চিনি—তিনি রাজা মানুষ!

—তিনি কি এখনও ভাজনঘরে আছেন?

—আজ্ঞে না, তিনি বোধহয় আগেই খবর পেয়েছিলেন। তিনি তাঁর সমস্ত ক্ষেতি-জমি বসত-বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছেন।

—তাহলে তাঁর বসত-বাড়ি কে দেখাশোনা করবে এখন?

কালী ঘোষ বললে—কে আর দেখাশোনা করবে, তাঁর কেরবাণ মকবুল আছে, মকবুল আর মিয়াজান, দু'জনেই কেরবাণ, তারা দেখবে—

নিবারণ চক্রবর্তী বললেন—কদমতলীতে তোমাদের জানা-শোনা জাতি-গুষ্টি কেউ আছে?

—আজ্ঞে আমার শালা আছে, দক্ষিণপাড়ায় থাকে—

—কী নাম তার?

—বদন্ত ঘোষ। আমার শ্বশুরের নাম দুলাল ঘোষ। এখানকার লোক তাঁকে দুলে ঘোষ বলে জানে।

—আরে তুমি হলে দুলে সরলার জামাই? তাহলে তো আমাদের গাঁয়ের জামাই। তুমি বারোয়ারিতলায় বসে খিচুড়ি খাচ্ছো কেন?

কালী ঘোষ বললে—আজ্ঞে আমার শালার বাড়িতেই গিয়েছিলাম, কিন্তু তারা তো বাড়িতে নেই—

—বাড়িতে নেই তো কোথায় গেল?

—ভাজনঘাটের মেলায়। আজ রাত্তিরটা এখানে কাটিয়ে কালকে আবার একবার দক্ষিণপাড়ায় যাবো—

সেই-ই প্রথম কালী ঘোষ এখানে এসেছিল। সঙ্গে না ছিল একটা কাপড়, না ছিল একটা কিছু। যেমন ভাবে ছিল তেমনি ভাবেই এক-কাপড় সম্বল করে চলে এসেছিল। তারপর কত দিন কেটে গেল, সেই কালী ঘোষ জন-মজুর খেটে এক কালি জমি কিনে বসত-বাড়ি করলে। আস্তে আস্তে দু'চার-পাঁচ

বিয়ে করিও কিনলে। চাষ-আবাদও করতে লাগলো। সেই কালী ঘোষের আবার মেয়ে হলো, শেষে একটা ছেলেও হলো। এই যে-ছেলেটা হরবিলাস সিং-এর গাড়িতে চাপা পড়লো।

কিন্তু এই ছেলেটার কাহিনী বলবার আগে সুখমতীর কাহিনীটাও বলে নিতে হবে!

সুখমতী কে?

শ্যামনগরের শ্যামাপদ সরকার সুখমতীকে বলতো—হারামজাদী!

শ্যামাপদ সরকার বস্তিকু মানুষ ছিল শ্যামনগরে। তখন বেশভাগ হয়নি। শ্যামাপদবাবু ভাবতো এই রকম করেই বুঝি দিন যাবে চিরকাল। এই ধান-চাল-গুড়-সরষে আর পাটের আড়তের গদীর পাহাড়ের ওপর বসেই আরাম করে দিন কাটিয়ে দেবে। দিন গেলে যেখানে তিন-চারশো টাকা বেচাকেনা আমদানি, সেখানে ওই রকম ভাবনা হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু না। ঈশ্বরের পৃথিবীতে অদৃষ্ট বলে একটা কথা আছে যার নিশানা আজ পর্যন্ত কেউ-ই জানতে পারেনি।

সুখমতীও ভাবতো যতদিন বাবু আছে ততদিন আর কীসের ভাবনা? তার ওপর রূপ আছে যৌবন আছে, সিন্দুকে টাকা আছে।

ও-সবই শ্যামাপদবাবুর দেওয়া।

বাবু রাত্রে আসতো। এসে বাইরে থেকে ডাকতো—হারামজাদী আছিস?

সুখমতী একদিন বলেছিল—তুমি আমাকে হারামজাদী বলে ডাকো কেন বল দিকিনি? আমি কি হারামজাদী?

শ্যামাপদবাবু হাসতো। বলতো—তুই রাগ করছিস কেন? তুই আমার মুখের কথাটাই শুনলি, আর মনের কথাটা শুনতে পেলি নে? যে, পান দে—

সুখমতী মরবার মেয়ে। কদমা, বাতাসা, ছানার মুড়কি, রসগোল্লা, সন্দেশ যেমন তৈরি করতে পারতো, তেমনি আবার ভাল পানও সাজতে পারতো। বাবু তার বাড়িতে এলে তাকে পান সেজে দিয়ে আপ্যায়ণ করতে হতো।

সরকার-মশাই শ্যামনগরের মানী লোক। দশজনে মান্য করতো যেমন, তেমনি আবার ভয়ও করতো সরকার মশাই-এর টাকার জন্যে। সরকার পড়লে রাত-বিরেতে কে অত টাকা কাকে দিতে পারবে? একশো চাও একশো, এক হাজার চাও এক হাজার। কিন্তু তার বদলে সরকার-মশাইএর আড়তে ধান-চাল-গুড়-সরষে কি পাট জমা রেখে দিতে হবে।

তখন বড় সুখে দিন কেটেছে সুখমতীর। সরকার-মশাইএর বাড়িতে মাংস রান্না হলে এক বাটি মাংস সুখমতীর বাড়িতেও এসেছে। ন্যাংড়া কি ফজলি আম সরকার-মশাইএর বাড়িতে এলে সুখমতীর বাড়িতে তার মধ্যে দু'চারটে এসে পৌঁছেছে। এ-সব সরকার-মশাইএর কেরবাণদের কাজ। কেরবাণ মানে কৃষাণ। তারা গরু-ছাগল-চাষ-বাসও দেখতো আবার বাড়ির কর্তার ফাই-ফরমাসও খাটতো—

সুখমতী জিজ্ঞেস করতো—এ আম কোত্থেকে এলো গো মকবুল?

মকবুল বলতো—বাবুর বেয়াই-বাড়ি থেকে—

রাত্রে যখন সরকার-মশাই আসতো তখন পান মুখে দিয়ে আরাম করে চিবোতে চিবোতে জিজ্ঞাসা করতো—আম কেমন খেলি রে?

সুখমতী বলতো—বেয়াই-বাড়ির আম কি টক্ হয়?

খুব খুশী হতো সরকার-মশাই সুখমতীর কথা শুনে। সুখমতীর চেহারাটাই ছিল পাকা ল্যাংড়া আমের মত মিটোল-নিভাঁজ। সরকার-মশাইএর কাছে সুখমতী ছিল ল্যাংড়া আমের চেয়েও মিষ্টি। অত মিষ্টি বলেই সরকার মশাই রাতদিন বেলায় সুখমতীর কাছে না এসে পারতো না—

বারোয়ারীতলায় সেই সুখমতীকে দেখে নিবারণ চক্রবর্তী অবাক হয়ে গেলেন। মাথায় ঘোমটা ঢেকে বসে আছে।

নিবারণ চক্রবর্তী কাছে গিয়ে অবাক হয়ে গেলেন।

বললেন—তুমি কে গা?

মেয়েটা কথা বলে না।

—কোথায় যাচ্ছ তোমরা?

মেয়েটা বললে—শ্যামনগরে—

—শ্যামনগরে? কোন্ পাড়ায়?

আর উত্তর নেই। কিন্তু ততক্ষণে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছেন মুখখানা।

বললেন—সুখমতী না?

ঘোমটাটা আরো মুখের ওপর নেমে এল।

নিবারণ চক্রবর্তী জিজ্ঞেস করলেন—তা কাঁদছো কেন? কেঁদে কী লাভ বলো না। ভগবানের ওপরে তো কারো হাত নেই গো। সেই ভগবানকে ডাকো। আহা, এককালে কত ভালো ভালো খেয়েছ তুমি, কত ল্যাংড়া আম, কত মাংস, কত কালিয়া-পোলাও, আজ এই হরিসভার আটচালায় বসে খিচুড়ি-ঘ্যাঁট খেতে হচ্ছে। এর নামই হলো অদৃষ্ট গো, এই জন্যেই তো মানুষ পুজোপোক্ষন-উপোষ করে মরে। নইলে তোমা হেন মেয়েকেও কিনা আজ এখানে দেখতে পেলুম—অদৃষ্ট গো অদৃষ্ট—

সুখমতী তখনও হাত গুটিয়ে বসে আছে—

নিবারণ চক্রবর্তী জিজ্ঞেস করলেন—তা সরকার মশাই কোথায় গেলেন?

সুখমতী বললে—বলে যান নি—

নিবারণ চক্রবর্তী বললেন—তা তিনি চলে গেলেন আর তোমাকে ফেলে রেখে গেলেন, এ কী রকম ধারা আক্কেল সরকার মশাই-এর—

এসব সেই আগেকার ঘটনা। এ-সব কাহিনী বোর্ডার কোর্সের কম্যাণ্ডার হরবিলাস সিং সাহেব সবই জানতো।

নিবারণ চক্রবর্তী মশাই বললেন—এই এদিক দিয়ে মাঠের দিকে একবার যাচ্ছিলাম। ভাবলাম কম্যাণ্ডার সাহেবের সঙ্গে একবার দেখা করে যাই—

কম্যাণ্ডার সাহেব বুঝতে পারলে নিবারণ চক্রবর্তীর আগমনের মতলবটা। বললে—ভালোই করেছেন—

নিবারণ চক্রবর্তী হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন—মাস্টার এসেছিল?

—মাস্টার? কোন্ মাস্টার?

—আমাদের পশী মাস্টার?

(ক্রমশঃ)

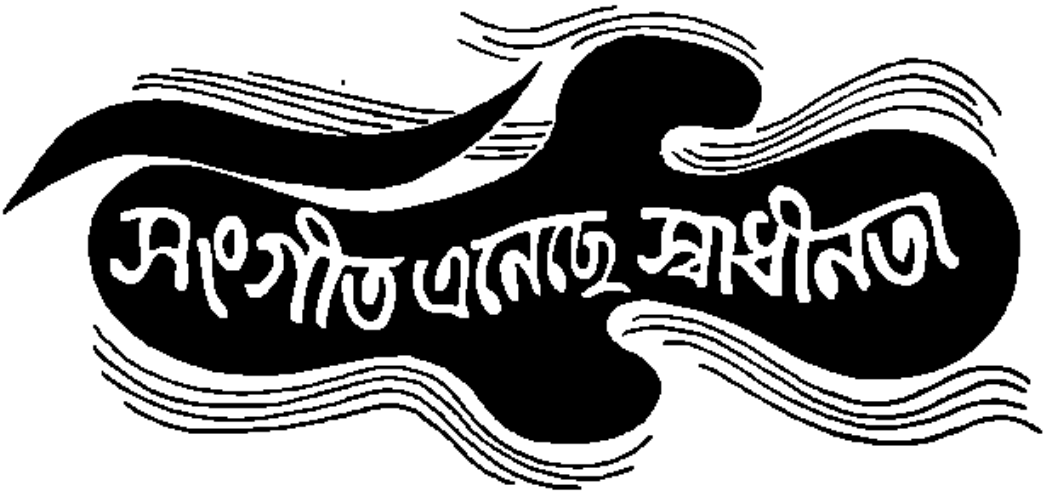

বাংলা দেশে সাহিত্য এবং শিল্পের আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত ধর্ম, কর্ম, সমাজ, প্রকৃতিপ্রেম, দেশপ্রেম, আধ্যাত্মিকতা এবং মর্মবাদ সঙ্গীতের মাধ্যমেই সবচেয়ে বেশি ব্যক্ত হয়েছে এবং তার প্রতিবেদন দেশবাসীর চিত্তকে শুধু শিল্পরসেই আপ্লুত করেছে এমন নয় উপরন্তু জাতিকে ধর্মবোধে, কর্মপ্রেরণায়, সমাজচেতনায় এবং স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছে। পরাধীন দেশে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে-মাতরম্" সংগীত দেশপ্রেমের উদগাতা।

একদিন "বন্দে-মাতরম্" গীতিমন্ত্র কণ্ঠে নিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতার প্রেরণা লাভ করে হাসিমুখে ফাঁসির রজ্জু গলায় দিয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রঙ্গলাল, নবীনচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ গীতি-কবিগণ স্বদেশী-গানের মহিমায় জাতিকে জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তুললেন। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী গানের বন্যা বইয়ে দিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে গানের রাখি-বন্ধনে স্বদেশপ্রেমের রাখি-বন্ধন বাংলার স্বদেশী গানের এক গৌরবময় অধ্যায়। গান্ধীজীর অসহযোগ ও বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে বাংলা গানের অবদানের তুলনা নেই। কান্তকবি রজনীকান্ত, সরলাদেবী, অতুলপ্রসাদ, সত্যেন দত্ত, কাজী নজরুল অশ্বিনী দত্ত, চারণ কবি মুকুন্দদাস প্রমুখ বাংলা দেশের অগণিত গীতি-কবির লেখা গান বাংলার আকাশ, বাতাসকে অনুরণিত করেছে স্বাধীনতালাভের প্রেরনায়। আজাদ-হিন্দ ফৌজের সমর-সঙ্গীত ভারতের বাইরে যে উদ্দীপনা জাগিয়াছিল তার ইতিহাস এখন আর আমাদের অজানা নয়।

স্বদেশী গানে দেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম গরীয়ান হয়ে উঠেছে এবং ইংরেজ-শাসিত দেশ আজ স্বাধীনতালাভে সক্ষম হয়েছে। বাংলা গানের বহু গৌরবময় অধ্যায়টিকে আমরা শক্তি পূজার প্রারম্ভে দেশবাসীর কাছে মেলে ধরলাম - জাতির চরম সঙ্কটের দিনে বাংলার দেশপ্রেম আবার জাগরিত হয়ে উঠুক সঙ্গীতের সুরে সুরে। বন্দেমাতরম্।

স্বদেশী যুগে সহস্র সহস্র লোকের বিরাট সভায় এক-একটি জাতীয় সঙ্গীত কিরূপ উন্মাদনার সৃষ্টি করত, স্বজাতি-প্রীতি ও স্বদেশানুরাগের পূত ধারায় নরনারীর প্রাণকে কি ভাবে আপ্লুত করত সকলেই জানেন। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীতটি একক এই বিশাল দেশের নরনারীর মনের উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা বর্ণনাতীত। প্রাক্-স্বদেশী যুগে এই অতুলনীয় সঙ্গীতটি কংগ্রেসের কোন কোন অধিবেশনে গীত হয়েছিল সত্য, কিন্তু তখনও এর ব্যাপক প্রচার হয়নি এবং লোক-চিত্তে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। স্বদেশী যুগের প্রারম্ভেই সমগ্র বাংলা দেশে এই গান প্রচারিত হয় এবং অল্প কাল মধ্যেই জন-মনে এর প্রভাব অনুভূত হয়। স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হবার বহু পূর্বে বাংলার মনীষীদিগের মধ্যে কেউ কেউ তাঁদের রচনার মধ্য দিয়ে এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়েছিলেন যে, উত্তর কালে একদা "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতটি নিখিল ভারতে প্রচারিত হবে এবং জনগণ-মানসে অপূর্ব প্রভাব বিস্তার করবে। তাঁদের সে ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয়নি। স্বদেশী যুগের পূর্বে রচিত ও বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের কালে ব্যাপক ভাবে গীত, "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতটি আজ স্বাধীন ভারতের অন্যতম জাতীয় সঙ্গীত।

বন্দেমাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্য শ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীম,
ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীম,
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিনীম
সুখদাং বরদাং মাতরম্।

... ...

তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম
ত্বং হি প্রাণা শরীরে।

বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।

যে সকল কবির রচিত জাতীয় সঙ্গীত স্বদেশী যুগে লোকপ্রিয় হইয়াছিল, তন্মধ্যে কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথ, কান্ত-কবি রজনীকান্ত সেন, সন্তোষের জমিদার-কবি প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সত্যেন দত্ত, সরলা দেবী, ত্রিপুরা-ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কামিনীকুমার ভট্টাচার্য, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ৭ই আগষ্ট (১৯০৫ খৃঃ) কলিকাতায় টাউন হলে যে সভা হইয়াছিল, সেই উপলক্ষে শোভাযাত্রায় ও সভা-স্থলে রবীন্দ্রনাথের যে কয়েকটি সঙ্গীত সম্মিলিত কণ্ঠে গীত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ওইটির প্রথম চরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

(১) "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক,
জগত জনের শ্রবণ জুড়াক,
হিমাদ্রি পাষাণ কেঁদে গ'লে যাক্
মুখ তুলে আজি চাহ রে।"

... ...

(২) "তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ,
তোমারি তরে মা সঁপিনু প্রাণ ;
তোমারি শোকে এ আঁখি বরষিবে,
এ বীণা তোমারি গাহিবে গান।"

... ...

টাউন হলের সভা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের তৎকালে রচিত নূতন সঙ্গীত "আমার সোনার বাংলা" বাউল সুরে গীত হইয়াছিল। জাতীয় সঙ্গীতাবলীর মধ্যে এই সঙ্গীতটি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১৯০৫ খৃঃ ৭ই সেপ্টেম্বর (১৩১২ সনের ২২শে ভাদ্র) তারিখের "সঞ্জীবনী" পত্রিকায় ওই গানটি রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরে প্রথম প্রকাশিত হয়। তৎপরে তাঁহার সম্পাদিত "বঙ্গদর্শন" (নব পর্যায়) মাসিক পত্রের আশ্বিন (১৩১২ সন) সংখ্যায়ও উহা প্রকাশিত হইয়াছিল। "সোনার বাংলা" সঙ্গীতের প্রথম দুইটি চরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

"আমার সোনার বাংলা,
আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।
ওমা, ফাগুনে তোর আমের বনে
ঘ্রাণে পাগল করে,
ওমা, অঘ্রানে তোর ভরা খেতে
কী দেখেছি মধুর হাসি।"

... ...

পূর্বোক্ত প্রতিবাদ-সভা উপলক্ষে প্রমথনাথ চৌধুরীর রচিত একটি সঙ্গীতও গীত হইয়াছিল। উহা নিম্নে দেওয়া হইল :—

"সুর—মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালী

"ওভদিনে ওভক্ষণে গাই আজি জয়,
গাই জয়, গাই জয়, মাতৃভূমির জয়!
(একাধিক কণ্ঠে) জয় জয় জয়, মাতৃভূমির জয়!
(বহু কণ্ঠে) জন্মভূমির জয়, স্বর্গভূমির জয়!
পুণ্যভূমির জয়, মাতৃভূমির জয়!
লক্ষ মুখে ঐক্যভাষা রটাও অসংশয়!
সুখ আশা আজ স্বার্থ দিলাম তোমার পায়,
যতদিন মা তোমার বক্ষ জুড়াবে না হায়;
কে সুখে ঘুমায়, কে জাগে বৃথায়?
মায়ের চোখে অশ্রুধারা, সে কি প্রাণে সয়!
নূতন উষার গাহে পাখী নূতন আগমনী সুর,
উঠ রাণী কাঙ্গালিনী দুঃখ হল দূর;
অলস আঁখি মেল, মলিন বসন ফেল,
উঠ মায়ের, জাগো জাগো ডাকে পুত্রচয়।"

পূর্বোক্ত সঙ্গীতটি স্বদেশী যুগের লোকপ্রিয় সঙ্গীতাবলির অন্যতম। প্রমথনাথের রচিত জাতীয় সঙ্গীতসমূহের অধিকাংশই জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। তাঁহার রচিত আর একটি লোকপ্রিয় সঙ্গীত উদ্ধৃত করা হইল। ১৯০৪ খৃঃ ৭ই সেপ্টেম্বরের "সঞ্জীবনী" পত্রিকায় উহা সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

"রামপ্রসাদী সুর"

"তুই মা মোদের জগৎ-আলো!
সুখে দুখে হাসি মুখে
আঁধারে দীপ তুমিই জ্বালো!
মা ব'লে, মা, ডাকলে তোরে
সারাটি প্রাণ ওঠে ভ'রে,
বেসেছি, মা, তোরেই ভালো,
তোরেই যেন বাসি ভালো।
ওই কোলে, মা, পাই যদি ঠাঁই,
জনম জনম কিছুই মা চাই;

থাক্ না ওদের গৌর বরণ
হলেমই বা আমরা কালো !
পরের পোষাক খুলে ফেলে,
ফিরলাম ঘরে ঘরের ছেলে ;
আঁখির নীরে মোদের শিরে
আশিস্‌ঝরা আজি ঢালো !"

স্বদেশী আন্দোলনের প্রারম্ভেই কান্ত-কবি রজনীকান্ত সেনের রচিত দুইটি জাতীয় সঙ্গীত লোকপ্রিয়তা অর্জন করে। ১৯০৫ খৃঃ-৭ই সেপ্টেম্বরের "সঞ্জীবনী" পত্রিকায় "কান্তের নিবেদন" শিরোনামায় সেই দুইটি গান প্রকাশিত হয় ; এবং তৎসঙ্গে এই সংবাদও পরিবেষণ করা হয় যে ২রা সেপ্টেম্বর কলিকাতায় কলেজ স্কোয়ারের বিপুল জনসমাবেশে সঙ্গীত দুইটি সঙ্কীর্ত্তনের সুরে প্রথম গীত হইয়াছিল। নিম্নে দুইটি সঙ্গীতই উদ্ধৃত করা হইল :—

(১) মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তু'লে নে রে ভাই ;
দীন দুঃখিনী মা যে তোদের,
তার বেশী আর সাধ্য নাই।
সেই মোটা সুতার সঙ্গে
মায়ের অপার স্নেহ দেখতে পাই ;
আমরা এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ওই
পরের দোরে ভিক্ষে চাই।
ওই, দুঃখী মায়ের ঘরে,
তোদের সবার প্রচুর অন্ন নাই.
তবু ভাই বেচে কাচ সাবান মোজা
কিনে করি ঘর বোঝাই।
আয়রে আমরা মায়ের নামে
এই প্রতিজ্ঞা করব ভাই !
পরের জিনিস কিনব না,
যদি মায়ের ঘরের জিনিস পাই।

কলিকাতার তৎকালীন বিখ্যাত ছাত্র প্রতিষ্ঠান "ষ্যানডি-সার্কুলার সোসাইটির" কর্মিগণ যখন বিনামূল্যে বিক্রয়ের জন্য দেশী কাপড়ের মোট কাঁধে লইয়া দলে-দলে মহানগরীর পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া ফেরি করিতেন, তখন তাঁহারা পূর্বোক্ত গানটি গাহিতেন। কান্ত-কবির অপর সঙ্গীতটি এইরূপ :—

(২) "ভাই ভাসো, মোদের মায়ের ঘরের শুধু ভাত।
মায়ের ঘরের ঘি সৈন্ধব,
মার বাগানের কলার পাত।
ভিক্ষার চেলে কাজ নাই, সে বড় অপমান;
মোটা হোক্ সে সোনা মোদের
মায়ের ক্ষেতের ধান
সে যে মায়ের ক্ষেতের ধান
মিহি কাপড় পরব না আর
বেচে পরের কাছে;
মায়ের ঘরের মোটা কাপড়
পরলে কেমন সাজে;
দেখতো পরলে কেমন সাজে!
ও ভাই চাষী, ও ভাই তাঁতী
আজকে সুপ্রভাত।
ক'সে লাঙ্গল ধর, ভাই রে,
ক'সে চালাও তাঁত;
ক'সে চালাও ঘরের তাঁত।"

প্রমথনাথ ও রজনীকান্তের রচিত আরও কতগুলি জাতীয় সঙ্গীত স্বদেশী যুগে জনপ্রিয় হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে প্রমথনাথের "মা-ই দেশের রাজা, মা-ই দেশের রাণী" এবং "নম বঙ্গভূমি—শ্যামাঙ্গিনী" সঙ্গীত দুইটিও উল্লেখযোগ্য।

'ভারতী'-সম্পাদিকা সরলা দেবী (চৌধুরাণী) সুলেখিকা ও সুগায়িকা ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁহার অবদান কম নহে। বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের সহিতও বিদুষী বীর নারীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। বাঙালী যুবকগণকে সাহসী, শক্তিশালী ও সংগ্রামী দেশসেবকরূপে গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে তিনি "বীরাষ্টমী" অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেন। তাঁহার রচিত জাতীয় সঙ্গীতগুলিও স্বদেশী যুগে সমাদৃত হইয়াছিল। তাঁহার একটি সঙ্গীতের প্রথম চরণ নিম্নে দেওয়া হইল:—

"অতীত-গৌরব-বাহিনি মম বাণি! গাহ আজি হিন্দুস্থান!
মহাসভ্য-উন্মাদিনি মম বাণি! গাহ আজি হিন্দুস্থান!
কর বিক্রম-বিভব-যশঃ-সৌরভ-পূরিত সেই নামগান!
বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মারাজ, মারাঠ,
গুর্জর, পাঞ্জাব, রাজপুতান!

হিন্দু, পার্সি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান !
গাও, সকল কণ্ঠে সকল তানে "নমো হিন্দুস্থান !"
(হিন্দু গায়কগণ) হর হর হর জয় হিন্দুস্থান !
(পার্সি ঐ) দাদার হোরমজ্দ্ হিন্দুস্থান !
(মুসলমান ঐ) ইলাহি আকবর হিন্দুস্থান !
(সকলে) নমো হিন্দুস্থান ।"

... ...

প্রাক্-স্বদেশী যুগে রচিত ওই গানটি কংগ্রেসের একাধিক অধিবেশনে গীত হইয়াছিল। সরলা দেবীর আর একটি জনপ্রিয় সঙ্গীতের সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হইল :—

"মিশ্র খাম্বাজ—একতালা।

"বন্দি তোমায় ভারত-জননি বিদ্যা-মুকুট ধারিণি !
বর পুত্রের তপ-অর্জ্জিত গৌরব-মণি-মালিনি।
কোটি সন্তান আঁখি তর্পণ ভূমি-আনন্দ-কারিণি !
মরি বিদ্যা-মুকুট-ধারিণি !
দুঃখ দুরান্ত তিমির অন্তে হাস, মা, কমল-বরণি !
আশার আলোকে ভূয় হৃদয়ে আবার শোভিছে ধরণী !
নব জীবনের পসরা বহিয়া
আসিছে কালের তরণী,
হাস, মা, কমল-বরণি।
এসেছে বিদ্যা, আসিবে ঋদ্ধি, শৌর্য্যবীর্য্যশালিনী,
আবার তোমায় দেখিব, জননি, সুখে ধনধান্যশালিনি !
অপমান কত জুড়াইবি মাতঃ
ধর্পর-করধারিণি !
শৌর্য্যবীর্য্যশালিনি !"

এই সূত্রে অতুলপ্রসাদ সেনের একটী জাতীয় সঙ্গীতের উল্লেখ করিতেছি। লক্ষ্ণৌ-প্রবাসী অতুলপ্রসাদ ছিলেন একজন ভারত-বিখ্যাত গায়ক ও কবি। তিনি নানা বিষয়ে অনেক গান রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত সঙ্গীতাবলী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি স্বদেশী যুগে বহু স্থানে গীত হইয়াছে :—

"মিশ্র—কাওয়ালী

"উঠ গো ভারত লক্ষ্মি উঠ আদি-জগতজন-পূজ্যা।
দুঃখ দৈন্য সব নাশি, কর দূরিত ভারত লজ্জা।
ছাড় গো ছাড় শোক শয্যা, কর সজ্জা,
পুন কমল-কনক-ধন-ধান্যে।
জননী গো লহ তুলে বক্ষে,
সান্ত্বন-বাস দেহ তুলে চক্ষে,
কাঁদিছে তব চরণতলে
বিংশতি কোটি নরনারী গো।
কাণ্ডারী নাহিক কমলা দুঃখ-দোলিত ভারতবর্ষে,
শঙ্কিত মোরা সব যাত্রী, কাল সাগর কল্পন হর্ষে।
তোমার অভয় পদ স্পর্শে, নব হর্ষে,
পুন চলিবে তরণী সুখ লক্ষ্যে।
জননী গো লহ তুলে বক্ষে ইত্যাদি।
ভারত শ্মশান কর পূর্ণ, পুন কোকিল কূজিত কুঞ্জে,
দেষ হিংসা করি চূর্ণ, কর পূরিত প্রেম-অমিয়-গুঞ্জে।
পূরিত করি পাপপুঞ্জে, তাপপুঞ্জে
পুন বিমল কর ভারত পুণ্যে।
জননী গো লহ তুলে বক্ষে, ইত্যাদি

কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়ের রচিত একটি জাতীয় সঙ্গীত স্বদেশী যুগে গীত হইত। তৎকালে প্রকাশিত অনেক জাতীয় সঙ্গীতের পুস্তকে ওই গানটি প্রথিত করা হইয়াছিল। গানটি এত বড় যে ১৮৮ ছত্রে উহার সমাপ্তি হইয়াছে। ভারতবাসী পরাধীন হওয়ায় নানা দিক দিয়া জাতীয় চরিত্রের কিরূপ অধঃপতন হইয়াছে তাহারই একটা সঙ্গীত করুণ চিত্র স্বজাতিবৎসল স্বদেশানুরাগী কবির লেখনীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে! 'লক্ষ্ণৌ ঠুংরি' সুরের ওই গানটির প্রথম চরণ এইরূপ :—

"কত কাল পরে, বল ভারত রে।
দুখ-সাগর সাঁতারি পার হবে।
অবসাদ হিমে, ডুবিয়ে ডুবিয়ে
ও কি শেষ নিবেশ রসাতল রে।"

... ...

কবি দেখিতে পাইলেন—তাঁহার স্বদেশবাসী "নিজ বাসভূমে পরবাসী" হইয়াছে এবং "পর দাস খতে সমুদায়" দিয়াছে। তাই তাঁহার বেদনাতুর-কণ্ঠে শুনিতে পাই :—

"পর ভাষণ আসন, আনন রে,
পর পণ্যে ভরা তব আঙ্গন রে।
পর দীপ শিখা, নগরে নগরে
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।"

... ...

স্বদেশবাসীর ঘৃণিত দাস-জীবন কবির প্রাণে কি দারুণ আঘাতই না হানিয়াছে। দরদী কবি কত দুঃখে গাহিয়াছেন :—

"কি ছিলে কি হলে, কি হতে চলিলে,
অবিবেক বশে কিছু না বুঝিলে।
নয়নে কি সহে, এ কলঙ্ক দুখ,
পর রঞ্জন অঞ্জনে কাল মুখ।
নিজ শোণিত শোষি, পরে পুষিলে,
তুষিতে কুল শীল স্বধর্ম্ম দিলে।
পর বেশ নিলে, পর দেশ গেলে,
তবু ঠাঁই মিলে নাহি দাস ব'লে "

পরাধীন ভারতে শিক্ষিত সমাজের অধোগতি দর্শনে কবি ব্যথিত হইয়াছেন! সেই ব্যথাই প্রকাশ পাইয়াছে পূর্বোক্ত সঙ্গীতের নিম্নলিখিত কয়েকটি ছত্রের মধ্য দিয়া :—

"শিখিলে যত জ্ঞান, নিশীথে জেগে,
উপযুক্ত হলো পর-সেবা লেগে।
হলো চাকরি সার, যশায় তথায়,
অপমান সদায় কথায় কথায়।

... ...

"শিখিলে পর শিক্ষিত জ্ঞান-যত,
কিছু না কিছু না শুধু বাক্য-গত।

... ...

"পর হাতে প'ড়ে, উদরায় তরে,
মরিলে শুধু শত মুখর কোরে।"

সমগ্র সঙ্গীতটির মধ্য দিয়া কবি-চিত্তের গভীর স্বদেশপ্রেম ও দাসত্বলাঞ্ছিত স্বদেশবাসীর প্রতি সমবেদনা পরিস্ফুট হইয়াছে।

"শুনিবে বল কে, তব আপন কে,
পরদাস দশায় রহিয় সবে।
অহ! কে কহিবে এ সুদীর্ঘ কথা,
সম সিন্ধু অপার, অগাধ ব্যথা।
কহিতে বুক চায়, দুভাগ হ'তে,
নয়নে উথলে জল স্রোত শতে।
কত নিগ্রহ নিত্য অশেষ মতে,
সহিতেছ নিরন্তর ঘাট পথে"

... ...

প্রাক্-স্বদেশী যুগেও বাঙলা দেশে আমরা দেখিতে পাই এমন কবি ও সাহিত্যিক—যাঁহারা দেশাত্মবোধের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া এবং পরাধীনতার অভিশাপে অধীর হইয়া নির্ভীকভাবে স্ব স্ব মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। বিদেশী রাজার আইনের নাগ-পাশের বিভীষিকা তাঁহাদিগকে কর্তব্য-ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। পূর্বোক্ত জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা গোবিন্দচন্দ্র রায় তাঁহাদের অন্যতম। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে তাওয়ালের দেশভক্ত কবি গোবিন্দ দাসের "স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে এ দেশ তোদের নয়" কবিতাটি। প্রাক্-স্বদেশী যুগের আর একজন স্বদেশ-প্রেমিক কবির একটি জাতীয় সঙ্গীত এই খানে উল্লেখযোগ্য। সম্পূর্ণ সঙ্গীত নিম্নে দেওয়া হইল :—

ভৈরবী—একতালা

"দিনের দিন সবে দীন ভারত হ'য়ে পরাধীন।
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তা-জ্বরে জীর্ণ,
অনশনে শুষ্ক ক্ষীণ।
সে সাহস বীর্য্য নাহি আর্য্যভূমে,
পূর্ব্ব গর্ব্ব সর্ব্ব খর্ব্ব হ'ল ক্রমে,
লজ্জা রাহু মুখে দীন!
অতুলিত ধন রত্ন দেশে ছিল,
যাদুকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল,
কেমনে হরিল কেহ না জানিল,
এরি কৈল দুর্দ্দিন।
তুলবীজ হ'তে পলপাল এসে,
সার শস্য গ্রাসে, যত ছিল দেশে
দেশের লোকের তাদো খোসা ভুসি শেষে,
হায় গো রাজ কি কঠিন!

তাঁতি কর্মকার, করে হাহাকার,-
সুতা জোটা ঠেলে অন্ন মেলা ভার,
দেশী বস্ত্র, অস্ত্র বিকায় না ক আর,
হলো দেশের কি দুর্দিন !
আজ যদি এ রাজা ছাড়ে তুঙরাজ,
কলের বসন বিনা কিসে রবে লাজ,
ধরবে কি লোক তবে দিগম্বরের সাজ,
বাকল টেনা ডোর কপিন্।
ছুঁচ সুতো পর্য্যন্ত আসে তুল হ'তে,
দিয়াশলাই কাটি, তাও আসে পোতে,
প্রদীপটি জ্বালিতে, খেতে শুতে যেতে,
কিছুতে লোক নয় স্বাধীন।"

ওই সঙ্গীতটি স্বদেশী যুগে বেশ সমাদর লাভ করিয়াছিল। সে যুগে বহু স্থলে উহা গীত হইতে শুনিয়াছি। জাতীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন পুস্তকে উহা সসম্মানে আসন পাইয়াছে। ইহার রচয়িতা মনোমোহন বসু একজন কবি ও নাট্যকার।

বঙ্গ-বিভাগের পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইল ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর অর্থাৎ ১৩১২ সনের ৩০শে আশ্বিন। ওই দিবস হইতে বঙ্গভাষাভাষী অখণ্ড বাঙালী জাতিকে খণ্ডিত করা হয় বাঙালা দেশকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ঐক্যের যোগ-সূত্র অবিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য এবং রাজনীতিক কৃত্রিম বিভাগ অস্বীকার করিয়া সমগ্র বাঙালী জাতির সৌভ্রাত্রের বন্ধন অটুট রাখিবার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত হইল রাখি-বন্ধন অনুষ্ঠান। অরন্ধন ও উপবাস এবং কলিকাতায় 'ফেডারেশন হল' বা অখণ্ড বঙ্গভবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠাও ছিল সেই দিবসের কার্য্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। কলিকাতার নেতৃমণ্ডলের এক ঘরোয়া বৈঠকে পূর্বোক্ত কার্যক্রম গৃহীত হয়। রাখি-বন্ধন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথের, আর "ফেডারেশন হল" নির্মাণের পরিকল্পনা রাষ্ট্র-গুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। রাখি-বন্ধন অনুষ্ঠানের জন্য কবি-গুরু রচনা করিলেন এই সঙ্গীতটি :—

"বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল—
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান ॥
বাংলার ঘর, বাংলার হাট, বাংলার বন, বাংলার মাঠ—
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, হে ভগবান ॥

বাঙালির পণ, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা—
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক, হে ভগবান ॥
বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন—
এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান ॥"

পূর্বোক্ত সঙ্গীতটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাকুরে রাখি-বন্ধন অনুষ্ঠানের পূর্ব সপ্তাহে ১২ই অক্টোবরের 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায়। সেই সঙ্গে তাঁহার নবরচিত আরও তিনটি গানও প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই তিনটির প্রথম চরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

(১) "আমাদের যাত্রা হল শুরু এখন, ওগো কর্ণধার,
তোমারে করি নমস্কার ॥
এখন বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক, ফিরস না গো আর,
তোমারে করি নমস্কার ॥"

... ...

(২) "ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে,
মোদের ততই বাঁধন টুটবে।
ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে মোদের আঁখি ফুটবে,
ততই মোদের আঁখি ফুটবে ॥"

... ...

(৩) "বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান—
তুমি কি এমন শক্তিমান।
আমাদের ভাঙাগড়া তোমার হাতে এমন অভিমান—
তোমাদের এমন অভিমান।
চিরদিন টানবে পিছে, চিরদিন রাখবে নিচে—
এত বল নাই রে তোমার, সবে না সেই টান।"

... ...

বাংলা দেশের যে সমুদয় দেশভক্ত কবি পরাধীন স্বদেশবাসীকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রচিত জাতীয় সঙ্গীতের সংখ্যা হইবে সর্বাধিক। ভাব-বৈচিত্র্য ও জনপ্রিয়তার দিক দিয়াও উহাদের আসন অনেক উচ্চে। তাঁহার বেশীর ভাগ জাতীয় সঙ্গীতই রচিত হইয়াছিল স্বদেশী যুগে। প্রত্যেকটি গানে তাঁহার সুর-যোজনার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য

পরিস্ফুট; এবং গানের ভাবের উপযোগী সুর তিনি স্বয়ং যোজনা করিতেন। তাঁহার যোজিত সুরের বিশেষত্ব এই যে উহা যেমন সহজ ও সরল, তেমনই মধুর ও মর্মস্পর্শী। এই সমুদয় কারণে রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সঙ্গীতগুলি অল্প সময়ের মধ্যেই লোক-চিত্ত জয় করিত এবং সমগ্র বাংলা দেশের নগরে-নগরে গ্রামে-গ্রামে সহস্র-সহস্র কণ্ঠে গীত হইত। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী যুগে রচিত আরও কয়েকটি জনপ্রিয় জাতীয় সঙ্গীতের উল্লেখ করা হইল। এইগুলির প্রথম চরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

(১) "ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা॥

... ...

(২) "নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন, হবেই হবে।
যদি পণ করে থাকিস, সে পণ তোমার রবেই রবে॥"
ওরে মন, হবেই হবে॥"

... ...

(৩) "বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি- ধারে বারে ফেলিস নে ভাই।
শুধু তুই ডেবে ডেবেই হাতের লক্ষ্মী ঠেলিস নে ভাই॥"

... ...

(৪) "আমি ভয় করব না, ভয় করব না।
দু বেলা মরার আগে মরব না ভাই, মরব না॥"

... ...

পূর্বোক্ত চারিটি সঙ্গীতের মধ্যে প্রথমটি প্রকাশিত হইয়াছিল "বঙ্গদর্শন"-এর ১৩১২ সনের আশ্বিন (১৯০৫ খৃঃ অক্টোবর) সংখ্যায়, এবং অপর তিনটী পরবর্তী (কার্তিক) সংখ্যায়। রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সঙ্গীতবলী সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিতে হইলে একটি পৃথক প্রবন্ধের আবশ্যক; স্বদেশী যুগে রচিত তাঁহার আরও কয়েকটি সঙ্গীতের উল্লেখ করিয়া তৎসম্পর্কে আলোচনা শেষ করা হইল। কবি-গুরুর আর একটি জনপ্রিয় জাতীয় সঙ্গীতের প্রথম চরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

"তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে,
তা' বলে ভাবনা করা চলবে না।
তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে,
হয়তো রে ফল ফলবে না—
তা বলে ভাবনা করা চলবে না॥

তাঁহার আর একটি জাতীয় সঙ্গীতের সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি দেওয়া হইল। স্বদেশী যুগে রচিত এই সঙ্গীতটী

তৎকালে বিশেষ প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিল। সহস্র সহস্র লোকের বিরাট জনসভায় দেশভক্ত গায়ক গণি কর্তৃক ভাবোদ্বেল-কণ্ঠে গীত হইবার কালে অপূর্ব উদ্দীপনার সৃষ্টি হইত। সঙ্গীতটি এই :—

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।
একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে॥
যদি কেউ কথা না কয়, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে, সবাই করে ভয়—
তবে পরাণ খুলে
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে॥
যদি সবাই ফিরে যায়, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়—
তবে পথের কাঁটা
ও তুই রক্ত মাখা চরণতলে একলা দলো রে॥
যদি আলো না ধরে, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি ঝড়বাদলে আঁধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে—
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা চলো রে॥"

এই অতুলনীয় সঙ্গীতটি মহাত্মা গান্ধীর জীবনের শেষ দিকে তাঁহার অন্যতম প্রিয় সঙ্গীতরূপে সমাদর লাভ করিয়াছিল। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের নোয়াখালীর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার পরে গান্ধীজীর নোয়াখালী পরিক্রমা কালে প্রত্যেক জনসভায় উহা গীত হইত। কবি-গুরুর এই সঙ্গীতটির মধ্য দিয়া যে একটা শাশ্বত ভাবের বিকাশ হইয়াছে, তাহাই উহাকে অক্ষয় করিয়া রাখিবে। বাংলার স্বদেশী যুগের এই অনুপম সঙ্গীতটি শাশ্বতী বাণীর বাহক বলিয়া যুগে-যুগে সর্বত্র সমাদৃত হইবে। রবীন্দ্রনাথের "জনগণমন-অধিনায়ক" সঙ্গীতটি স্বাধীন ভারতের অন্যতম জাতীয় সঙ্গীতরূপে গৃহীত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ সহোদর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেন্দ্রনাথও জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের একটি জাতীয় সঙ্গীতের প্রথম চরণ উদ্ধৃত করা হইল :—

মিলে সবে ভারত সন্তান
একতান মন প্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান।
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন স্থান ?
কোন্ অদ্রি অভ্রভেদী হিমাদ্রি সমান ?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী,
শত-খনি কত মণি রত্নের নিধান !

হোক ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয় !

ওই গানটি রচিত ও গীত হইয়াছিল স্বদেশী যুগের বহু বৎসর পূর্বে। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের কালে উহা পুনরায় গীত হইয়াছে এবং সেই সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন জাতীয় সঙ্গীতের পুস্তকে গ্রথিত হইয়াছে। কংগ্রেসের একাধিক অধিবেশনে উহা গীত হইয়াছিল। ঋষি রাজনারায়ণ বসু ঊনবিংশ শতাব্দির নবম দশকে ভারতীয় হিন্দু জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে "মহাহিন্দু সমিতি" নামে যে প্রতিষ্ঠান গড়িবার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তাহাতে গীত হইবার জন্য পূর্বোক্ত সঙ্গীতও মনোনীত হইয়াছিল। বসু মহাশয়ের "বৃদ্ধ হিন্দুর আশা" নামক পুস্তকে পূর্বোক্ত পরিকল্পনার বিশদ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই পুস্তক হইতে "মহাহিন্দু সমিতি" নামক প্রতিষ্ঠানের জন্য রচিত নবম বিধির কতকাংশ এই স্থলে উদ্ধৃত করা হইল :—

দার্শনিক মনীষী দ্বিজেন্দ্রনাথের রচিত যে গানটি নিম্নে দেওয়া হইল উহা ছোট হইলেও প্রাণস্পর্শী ! এই :—

"নট বেহাগ—ঝাঁপতাল

"মলিন মুখ চন্দ্রমা, ভারত তোমারি,
রাত্রি দিবা ঝরিছে লোচন-বারি।
চন্দ্র জিনি কান্তি নিরখিয়ে, ভাসিতাম আনন্দে,
আজি এ মলিন-মুখ কেমনে নেহারি !
এ দুঃখ তোমার হায় রে সহিতে না পারি !"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচিত একটি জাতীয় সঙ্গীতের প্রথম ও শেষ চরণ উদ্ধৃত করা হইল :—

"চলরে চল সবে ভারত-সন্তান,
মাতৃভূমি করে আহ্বান।
বীর দর্পে গৌরব গর্বে,
সাধ্‌রে সাধ সবে দেশেরি কল্যাণ।
দলাদলি সব ভুলি
হিন্দু মুসলমান !
এক পথে এক সাথে চল,
উড়াইয়ে একতা-নিশান।"

স্বদেশী আন্দোলনের কালে গানটি কলিকাতায় ও মফঃস্বল অঞ্চলে শোভাযাত্রায় সম্মিলিত কণ্ঠে গীত হইতে শুনিয়াছি। সেই সময়ের আর একটি জনপ্রিয় সঙ্গীত নিম্নে দেওয়া হইল :—

"উঠ্‌রে উঠ্‌রে উঠ্‌রে তোরা
হিন্দু মুসলমান সকলে, ভাই!
বাজিছে বিষাণ, উড়িছে নিশান
আয়রে সকলে ছুটে যাই।
হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্ম খৃষ্টিয়ান,
কে আছ কোথায় বঙ্গের সন্তান!
আট কোটি প্রাণ, হ'য়ে আগুয়ান,
জননী তোদের ডাকিছে ভাই!
দেখ্‌রে দেখ্‌রে ঘুমে রসাতল,
জাতীয় উন্নতি বাঙ্গালীর বল;
রাজদ্বারে আর নাহি প্রতিকার,
আপনার পায়ে দাঁড়া রে ভাই!
নগরে নগরে জ্বাল্‌রে আগুন
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা দারুণ;
বিদেশী বাণিজ্যে কর পদাঘাত—
মায়ের দুর্দ্দশা ঘুচা রে ভাই!
আপনি বিধাতা সেনাপতি আজ
ওই ডাকিছেন সাজ্‌রে সাজ;
স্বদেশী সংগ্রামে চাহে আত্মদান—
'বন্দে মাতরম্' গাও রে ভাই।"

এইটিও শোভাযাত্রার সঙ্গীত। সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উহা রচনা করিয়াছেন স্বদেশী যুগের প্রথম পর্বে। বাংলা দেশের নানা স্থানে উহা গীত হইত। গানটির সুর সহজ ও সরল বলিয়া তৎকালে আমাদের মতো অনেক বেসুরো-বেতালা কিশোরে-কণ্ঠও অগ্রগামী গায়কদলের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইতে দ্বিধা করিত না। সে যুগে রাজনীতিক মিছিলে এই রকমের আরও অনেক নবরচিত গান গাওয়া হইত। তন্মধ্যে দুইটির উল্লেখ করা হইল। একটি এইরূপ :—

"চল্‌রে চল্‌রে ও ভাই!
জীবন-আহবে চল্,
বাজবে হেথা রণ-ভেরী
আসবে প্রাণে বল;
চল্ চল্, চল্॥"

... ...

গানটির রচয়িতার নাম তৎকালে জানিতাম ; কিন্তু এখন স্মরণের ভাণ্ডারে আজ আর তাহা মনে পড়িতেছে না। অপর গানটির আরম্ভ এইরূপ :—

"একবার জাগো, জাগো, জাগো
বত ভারত-সন্তান রে !
লোহিত বরণে পূরব গগনে,
উদিল তরুণ তপন রে !
জাগিল চীন, জাগিল জাপান,
নবীন আলোকে রে !
কাল ঘুম-ঘোর ভাঙ্গিল না তোর
অলস ভারত রে !"

এইটি রচনা করিয়াছেন রাইচরণ বিশ্বাস। পূর্বোক্ত গান দুইটি ব্যাণ্ডের সুরে গাওয়া হইত।

'হিতবাদী'-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃমণ্ডলীর অন্যতম। সেকালে তিনি অনেক জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেন এবং তৎসমুদয়ের অধিকাংশই সমাদর লাভ করে। তাঁহার রচিত সর্বাপেক্ষা অধিক জনপ্রিয় সঙ্গীতটির সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি দিতেছি :—

"মাগো যায় যেন জীবন চ'লে,
এই জগৎ মাঝে তোমার কাজে
'বন্দে মাতরম্' ব'লে
আমার যায় যেন জীবন চ'লে।
যখন মুদে নয়ন কঠিন শয়ন
শমনের সেই শেষ আলো,
তখন সবই আমার হবে আঁধার,
স্থান দিও মা ঐ কোলে।
আমার যায় যেন জীবন চ'লে॥
আমার মান অপমান সবই সবার,
মনুক না চাই-তলে ;
যদি সাঁতরে নারি মায়ের পীড়ন
মানুষ হব কোন্ কালে ?
আমার যায় যেন জীবন চ'লে॥
লাল টুপি আর কাল কোর্ত্তা,
ছুঁচোর ভয় কি আর চলে ?
আমি মায়ের সেবায় রইব রত,
পাপব বলে দিক জেলে।

আমার যায় যেন জীবন চ'লে।
আমার বেত মেরে কি মা ভুলাবে,
আমি কি মা'র সেই ছেলে ?
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি,
কে পালাবে মা ফেলে ?
আমার যায় যেন জীবন চ'লে।
আমি বন্ধ হব মায়ের ভক্ত
লাঞ্ছনাদি সহিলে ;
ওদের বেত্রাঘাতে কারাগারে
ফাঁসি কাঠে ঝুলিলে।
আমার যায় যেন জীবন চ'লে।
যে মা'র কোলে নাচি, শস্তে বাঁচি,
তৃষ্ণা জুড়াই যার জলে ;
বল লাঞ্ছনার ভয় কা'র কোথা রয়,
সে মায়ের নাম স্মরিলে ?
আমার যায় যেন জীবন চলে।
বিশারদ কয় বিনা কষ্টে
সুখ হবে না ভূতলে ;
সে তো অধম হয়ে সইতে রাজি
উল্লাসে চাও মুখ তুলে।
আমার যায় যেন জীবন চ'লে।

ওই সঙ্গীতটির সঙ্গে স্বদেশী যুগের সংগ্রামী যুবকগণের বীরত্বের এক গৌরবজ্জ্বল অধ্যায় সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল (১৩১৩ সনের পয়লা বৈশাখ) বরিশাল সহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের (প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্সের) অধিবেশন উপলক্ষে সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি করিতে করিতে সহস্র সহস্র লোকের এক বিরাট শোভাযাত্রা রাজপথে বাহির হইয়াছিল। পুরোভাগে কলিকাতার তৎকালীন বিখ্যাত ছাত্র-প্রতিষ্ঠান "র‍্যাঙ্কিন্সার্কুলার সোসাইটির তরুণ কর্মীদল ও অপরাপর যুবকগণ কাব্যবিশারদের পূর্বোক্ত সঙ্গীতটি গাহিয়া অপূর্ব উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী শোভাযাত্রীগণের উপর নির্মম ভাবে লাঠি চালনা করিয়া রক্তপাত করে। চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতা, ব্রজেন গাঙ্গুলী, "র‍্যাঙ্কিন-সার্কুলার সোসাইটি"র পাবক-কর্মী শ্রীহেমচন্দ্র সেন প্রভৃতি গুরুতর আঘাত পাইলেন। তৎসত্ত্বেও মাতৃভক্ত চারণ দল অধিকতর তেজ এবং উদ্দীপনার সহিত স্বানটি গাহিয়া গাইতে থাকে, এবং শোভাযাত্রীগণ সম্মিলিত কণ্ঠে অবিরাম "বন্দে-মাতরম্" ধ্বনি করিতে থাকে। কাব্যবিশারদ নিজেও আহত হইয়াছিলেন। ওই স্মরণীয় দিবসে বরিশালে

বরিশাই তিনি সেদিনের ঘটনা অবলম্বনে দুইটি সমযোপযোগী সঙ্গীত রচনা করেন। তন্মধ্যে একটী নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"আজ বরিশাল পুণ্যে বরিশাল হলো লাঠির ঘায়ে,
ঐ যে মায়ের জয় গেয়ে যায়। (বন্দে মাতরম্ বলে)
রক্ত বইছে শতধার, নাইকো—শক্তি চলিবার,
এরা, মার খেয়ে কেউ যা ভেগে না সহে অত্যাচার।
এত, পড়ছে লাঠি ঝরছে রুধির,
তবু হাত তোলে না কারো গায়॥
আছে দিব্য চক্ষু যার, খোল ভবিষ্যতের দ্বার,
সমর হলে পশুবলের দেখবে প্রতিকার—
হবে, ম্যাঞ্চেষ্টারে অন্নকষ্ট হাহাকার সার পেটের দায়।
শুনি, য়িহুদীদের দল, যখন ছিল হীনবল,
হেরোদ রাজা বালক বধে গেল রসাতল ;
হ'ল হত শিশুর রক্তপাতে কংসের ধ্বংস মথুরায়।
ও ভাই, বলে বিশারদ এতো দুদিনের বিপদ
হ'লে নিজের শক্তি স্বদেশ ভক্তি আসিবে সম্পদ।
আছেন, দর্পহারী মধুসূদন দুর্বলের বল শেষ ভরসায়।

স্বদেশী যুগের মধ্যপর্বে রচিত কাব্যবিশারদের দ্বিতীয় গান "ভেইয়া দেশকা এ কেয়া হাল" প্রথমে শুনিতে পাই ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের দ্বাবিংশতিতম অধিবেশন। দাদাভাই নৌরজী ছিলেন সভাপতি। তাঁহার অভিভাষণেই 'স্বরাজ' শব্দ প্রথমে ব্যবহৃত হয়। আমরা তখন "য়্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটির কর্মী ; কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীতে কাজ করিতেছিলাম। সোসাইটির উপরই স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠন ও পরিচালনার ভার ন্যস্ত ছিল। ভবানীপুরের "স্বদেশ-সেবক সম্প্রদায়ের" কয়েকজন সুকণ্ঠ গায়ক বিরাট মণ্ডপে প্রায় পনর সহস্র নরনারীর সমাবেশে ওই নব-রচিত সঙ্গীতটি গাহিয়া অপূর্ব ভাবের সঞ্চার করিয়াছিলেন। অধিবেশনের উদ্বোধনে গীত হইয়াছিল "বন্দেমাতরম এবং ওই সঙ্গীতের আরম্ভ হইতে সমাপ্তি পর্যন্ত উপস্থিত নরনারী দণ্ডায়মান থাকিয়া জন্মভূমির বন্দনায় যোগদান করেন। কাব্যবিশারদের পূর্বোক্ত সঙ্গীতের প্রথমাংশ এইরূপ —

"ভেইয়া দেশকা এ কেয়া হাল
থাক মিটি জৌহর হোতি সব, জৌহর হয় জঞ্জাল।

ঘর ছোড়্‌কে সব পর্‌কো সেবে ভাইকো দেস্ত, ভমাই,
সাগর পার সব ধন গধা অর ধরমে লছমী নাই।"

বরিশালের স্বনামখ্যাত স্বদেশী যাত্রার পালা রচয়িতা ও অভিনেতা মুকুন্দ দাসের গানগুলি স্বদেশী যুগে সমাদর লাভ করে এবং বাংলা দেশের সহর ও গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। স্বদেশী যাত্রার পালাগুলির জন্য তিনি রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া আড়াই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। কারাগারে তাঁহাকে সাধারণ কয়েদীর শ্রেণীভুক্ত করিয়া ঘানি টানার কঠোর কাজে নিযুক্ত করা হয়। কারাজীবনে নানা লাঞ্ছনা ভোগ সত্ত্বেও তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হইয়া পড়েন নাই। কারাবাস-কালে তাঁহার সহধর্মিণী একটি বালিকা-কন্যা ও একটি শিশুপুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। নির্ভীক দেশভক্ত মুকুন্দ দাস কারামুক্তির পরে সামাজিক যাত্রার পালা রচনা করিয়া আবার দেশ ও সমাজের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন এই পালাগুলির মধ্য দিয়াও তিনি সেবার আদর্শ এবং স্বজাতির প্রীতির ভাব প্রচার করেন। ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার বানরি গ্রামে ১২৮৪ সালে তাঁহার জন্ম এবং ১৩৪১ সালের ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ তাঁহার মৃত্যু হয়। পিতৃদত্ত নাম যজ্ঞেশ্বর দে, পরে কর্মজীবনে তিনি মুকুন্দ দাস নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার জীবনের বেশীর ভাগই কাটিয়াছে বরিশালে। স্বদেশী যুগে নির্বাসিত জননায়ক অশ্বিনীকুমার দত্তের সঙ্গ লাভে এবং সস্নেহ দৃষ্টিতে মুকুন্দ দাসের জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিল। অশ্বিনীকুমারের উপদেশে ওই সুগায়ক ও সুঅভিনেতা যুবক চারণের ভূমিকায় স্বদেশসেবার ব্রত গ্রহণ করিলেন। 'মাতৃপূজা', 'পথ', 'সাথী', 'পল্লীসেবা', 'ব্রহ্মচারিণী', 'সমাজ', 'ধর্মক্ষেত্র' ইত্যাদি যাত্রার পালাগুলি মুকুন্দ দাসের রচিত। নিম্নে তাহার রচিত একটি গানের সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি দিতেছি :—

"রাম রহিম না জুদা করো
মনটা খাঁটী রাখো জী।
দেশের কথা ভাব ভাইরে,
দেশ আমাদের মাতাজী॥
হিন্দু মুসলমান এক মায়ের ছেলে,
হকাৎ কেন করো জী?
দু' ভায়ের দু' ঘর বেঁধে
আমি একই দেশে বসতি॥
টাকায় ছিল এক মণ চাউল,
ভাই, এখন বিকায় পাথারী,
এর পরেতে হতে হবে ঐ
গাছের তলায় বসতি॥

স্বদেশী আন্দোলনের কালে হিন্দু মুসলমানের ঐক্য সাধন সম্পর্কে দেশনায়ক, কবি, সাহিত্যিক, সংবাদপত্রসেবী, যাত্রার পালা রচয়িতা, নাট্যকার প্রভৃতি সকলেই বিশেষভাবে সজাগ ছিলেন। তৎকালের গান, কবিতা ও অন্যান্য রচনার মধ্যে উহার নিদর্শন মিলিবে। মুকুন্দ দাসের উল্লিখিত গানটিতেও তাহার

পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার রচিত আর একটি জাতীয় সঙ্গীত এখন শুনাইব। পূর্বোক্ত গানটি হইতে এইটির ভাব-দ্যোতনা ভিন্ন প্রকারের। "ভারতের ভাগ্যাকাশে স্বাধীনতা-দিনমণি" উদিত দেখিবার বাসনা নিবেদন করিয়াছেন ভাবুকভক্ত চারণ কবি—তাঁহার আরাধ্যা দেবী মহাকালীর নিকট। ওই প্রাণস্পর্শী সঙ্গীতটি এই :—

"জাগ গো জাগ গো জননি!"
তুই না জাগিলে শ্যামা কেউ ত জাগিবে না মা!
তুই না নাচালে কারো নাচিবে না ধমনী।
ডেকে ডেকে হলাম সারা কেউ সাড়া দিল না মা!
খুঁজে দেখলাম কত প্রাণ কারো প্রাণ কাঁদে না মা;
তুই না কাঁদালে প্রাণ কাঁদিবে না কারো প্রাণ
না কাঁদিলে সবার প্রাণ পোহাবে কি রজনী?
দয়াময়ী নাম ধরিস দয়া কি মা আছে তোর,
দয়া থাকলে মরে কি আজ ত্রিশ কোটি ছেলে তোর?
মরি তাতে ক্ষতি নাই, বাসনা মা দেখে যাই
ভারতের ভাগ্যাকাশে স্বাধীনতা দিনমণি।"

পশ্চিমবঙ্গের যাত্রাওয়ালা ভূষণদাসও স্বদেশীযুগে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার যাত্রার পালার একটি জনপ্রিয় সঙ্গীত শুনাইতেছি :—

"আর আমরা পরের মাকে মা বলিয়ে ডাকব না
আর জননী জন্মভূমি, তোমার চরণ ছাড়ব না।
ফিরব না আর দ্বারে দ্বারে ভাসব না আঁখির ধারে,
কি সুধা তোর হৃদয়-ক্ষীরে, জীবনে তা ভুলব না মা।
কি করুণা কি মহিমা, কিবা অতুল মধুরিমা,
সুজলা সুফলা শ্যামা এমন মা আর পাব না।"

বাংলার যশস্বী কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যে সকল জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে স্বদেশী যুগে রচিত একটি লোকপ্রিয় সঙ্গীত নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"মিশ্র ভৈরবী—একতালা
"কোন্ দেশেতে তরুলতা—
সকল দেশের চাইতে শ্যামল?
কোন্ দেশেতে চল্‌তে গেলেই—
দল্‌তে হয় রে দূর্ব্বা কোমল?
কোথায় ফলে সোণার ফসল,
সোণার কমল ফোটে রে?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরই বাংলা রে!

কোথায় ডাকে দোয়েল শ্যামা—
শিউে নাচে গাছে গাছে ?
কোথায় জলে মরাল চলে—
মরালী তার পাছে পাছে ?
বাবুই কোথা বাসা বোনে—
চাতক বারি যাচে রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরই বাংলা রে।
কোন্ ভাষা মরমে পশি—
আকুল করি তোলে প্রাণ ?
কোথায় গেলে শুনতে পাই—
বাউল সুরের মধুর গান ?
চণ্ডীদাসের রামপ্রসাদের—
কণ্ঠ কোথায় বাজে রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরই বাংলা রে !
কোন্ দেশের দুর্দশায় মোরা—
সবার অধিক পাই রে দুখ ?
কোন্ দেশের গৌরবের কথায়—
বেড়ে উঠে মোদের বুক ?
মোদের পিতৃ পিতামহের—
চরণ-ধূলি কোথা রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরই বাংলা রে !"

ওই গানটির মধ্যে খাঁটি বাঙালী কবির ভাবোচ্ছ্বাসের অতুলনীয় প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কবি তাঁহার জন্মভূমি বাঙলা দেশকে, মাতৃভাষা বাঙলা ভাষাকে এবং বাঙালীকে কত যে ভালোবাসিতেন, সে পরিচয়ও মিলিবে ওই সঙ্গীতে। কলিকাতায় যখন প্রথমে গানটি প্রচারিত হয়, তখন কলেজ স্কোয়ারে এক জন-সভায় স্বদেশী যুগের বিখ্যাত গায়ক রামপুরহাট-নিবাসী রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে উহা গাহিতে শুনিয়াছি। শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো নিঃশব্দে শুনিতে লাগিলেন মধুর কণ্ঠের ওই হৃদয়গ্রাহী সঙ্গীত। কি অপূর্ব ভাবের হিল্লোলই না বহিয়া যাইতেছিল সেই জনসমাবেশের নিস্তব্ধতার মধ্য দিয়া! গান শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই জনতা 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করিতে করিতে অভিনন্দিত করিল গায়ককে

রামকুমারবাবু যে সকল জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে ভালবাসিতেন, তন্মধ্যে আর একটির প্রথম চরণ উদ্ধৃত করিয়াছি :—

"নীতি-বন্ধন করো না লঙ্ঘন
ন্যায়ধর্ম সার প্রজার রঞ্জন ;
হইয়ে রক্ষক হয়ো না ভক্ষক
অবিচারের রাজ্য থাকে না কখন।"

ওই গানটির রচয়িতার নাম মনে পড়িতেছে না।

স্বদেশী যুগের নির্যাসিত জনৈনায়ক অশ্বিনীকুমার দত্তের রচিত একটি গান এখন শুনাইব। গানটি এই :—

"স্বাস্বাজ—পোস্তা "ধীরে ধীরে সবই দুঃখ"—সুর

শ্মশান ও ভালবাসিস মাগো
তবে কেন ছেড়ে গেলি ?
এত বড় বিরাট শ্মশান
এ জগতে কোথায় পেলি ?
দেখ্ সে দেখা কি হয়েছে,
ত্রিশ কোটি শব প'ড়ে আছে,
কত ভূত বেতাল নাচে,
রঙ্গেভঙ্গে করে কলি।
ভূত পিশাচ তাল বেতাল,
নাচে আর বাজায় গাল,
সঙ্গে ধায় ফেরুপাল
এটা ধরি ওটা ফেলি।
আয় না দেখা নাচ্‌বি শ্যামা
শব হব শিব পা ছুঁয়ে মা,
জগৎ জুড়ে বাজ্‌বে দামা
দেখ্‌বে জগৎ নয়ন মেলি।'

বিপিনচন্দ্র পাল ছিলেন ভারত-বিশ্রুত নেতা ও বাগ্মী। নানা বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান ছিল গভীর। বাংলা ও ইংরেজীতে তাঁহার এমনই দখল ছিল যে, উভয় ভাষায় তিনি লিখিতে ও অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারিতেন। বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এবং নানা বিষয়ে বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উচ্চ-শ্রেণীর সংবাদপত্রসেবী বলিয়াও তাঁহার সুখ্যাতি আছে। স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বে বিপিনচন্দ্র কবিতা বা সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন কিনা তাহা অদ্যাবধি প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু স্বদেশী যুগের মধ্যপর্বে যখন বৈদেশিক শাসক-গোষ্ঠী আন্দোলন দমাইবার দুরভিসন্ধিতে নিগ্রহ নীতি অনুসরণ করিতেছিলেন, তখন ওই মনীষীর লেখনী-মুখে নিঃসৃত হইয়াছিল—দুইটি সময়োপযোগী চিত্তাকর্ষক সঙ্গীত। স্বদেশী আন্দোলন বঙ্গভূমিতে যে ভাব-বন্যার প্লাবন আনিয়াছিল, তাহাতে কত নরনারীর মানসিক রূপান্তর ঘটিয়াছে। অকবির মধ্যে দেখিয়াছি কবি-রূপের প্রকাশ, অবক্তাকে দেখিয়াছি বক্তৃতা-মঞ্চে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিতে, অগায়কের কণ্ঠে শুনিয়াছি গান। আরও দেখিলাম —স্বদেশ-বিরাগী পাইয়াছে স্বদেশানুরাগের প্রেরণা, দুর্বলের মধ্যে আসিয়াছে শক্তি, কাপুরুষ পাইয়াছে পৌরুষ। মাত্র দুইটি সঙ্গীতের মধ্যেই আমরা দেখিতে পাইব—দার্শনিক মনীষী ও রাজনীতিক নেতা বিপিনচন্দ্রের কবি-রূপ। দুইটি সঙ্গীতেরই সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি দিতেছি :—

"আর সহে না সহে না জননি !
এ যাতনা আর সহে না,
আর নিশিদিন হয়ে শক্তিহীন
প'ড়ে থাকি প্রাণে চাহে না।

তুমি মা অভয়া জননী যাহার,
কি ভয় কি ভয় এ ভবে তাহার;
দানব-দলনী, ত্রিদিব-পালিনী,
করাল-কৃপাণী তুমি মা।
উর মা আজিকে সেরূপে পরাণে,
ডাকি মা কালিকে ডাকি মা সঘনে,
নয়নে অশনি জাগাও জননি!
নহিলে এ ভয় যাবে না।
উর মা বাহুতে শকতি-রূপিণী,
উর মা হৃদয়ে ও রণরঙ্গিনী
রিপুদল মাঝে সন্তানে লয়ে
দাঁড়া মা হৃদয়-রমা।
প্রলয়-হুঙ্কারে হর-হৃদি হ'তে
উঠিয়ে দাঁড়া মা এ ভারত মাঝে;
শোণিত-তরঙ্গে মাতি রণ-রঙ্গে
মাতৈঃ বাণী আজি শোনা মা।
মুমুণ্ড-মালিনী তুই মা কল্যাণী,
তুই শিবে শিব-মনোমোহিনী,
বিনা তোর কৃপা, বিনা তোর কৃপাণ
ভারত-বন্ধন ঘোচে না।"

দুইটি সঙ্গীতের মধ্যেই আমরা দেখিতে পাইব—ঘৃণিত দাস-জীবনের দুঃসহ বেদনার অভিব্যক্তি, আর সেই দুর্গতি হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য রুদ্র-রুদ্রাণীর আহ্বান। অপর গানটি এই :—

"বাজেরা মা আর মোহন বাঁশী।
আজি রুদ্র-রূপে ভীম-বেশে প্রকাশ পরাণে আসি।
বন্ধ কর সব বুমুর-গন্ধ, রুদ্ধ কর সব মলয় মন্দ,
শুদ্ধ কর যত ললিত ছন্দ, প্রকাশ অট্টহাসি।
জীবন-মায়া করহে ছিন্ন, দয়া-বন্ধন করহে ছিন্ন,
সমর-ভেরী নিনাদ কর্ণালে বাজাও শোণিতরাশি।
দলিত করহে চরণ-তলে সকল ভীরুতা সব দুর্বলে,
ভীম অসি ধরি শ্মশানে মশানে, ভীষণ সাজাও আসি।"

এই সঙ্গীতটির মধ্যে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, কবি তাঁহার আরাধ্য দেবতাকে মোহন বাঁশী বাজাইতে বারণ করিয়া প্রার্থনা নিবেদন করিয়াছেন। স্বাধীনতার অভিযানে তাঁহার সহযাত্রী বাংলার আর এক কবির কণ্ঠে শুনিতে পাইব ইহার ঠিক বিপরীত প্রার্থনা। চারণকবি মুকুন্দ দাসের 'মাতৃপূজা' পালা হইতে উদ্ধৃত করা হইল সেই গানটি :—

"সংস্কারা সুর

"আবার বাজাত মোহন বাঁশরী
যমুনা বুঝি বা বহিত উজান!
আবার তুলিত কুঞ্জ-বিপিনে
বুঝি বা বিহগী মধুর তান।
উঠিত ফলিয়া ভারত-রক্ত,
নাচিত গরবে জননী-ভক্ত,
বাহু প্রসারণে হইত শক্ত,
লইত আপন করম-ভার;
ঢালিত প্রকৃতি প্রাণ-প্রবাহে
শান্তি-সরস অঙ্গের প্রাণ।
হইত মায়ের করুণা-পাত্র,
লভিত আপন করম-ক্ষেত্র।
ধরিত বাহুতে করম-সূত্র,
দিত অনায়াসে আপন প্রাণ।
উঠিত আবার মিলুক-মুখে
জয়-সুখাবহ সুষম গান।
সে নীল গগন সুধা বরষিত,
সে বিধু তারকা গরবে হাসিত,
বিজয়-পতাকা মলয়ে খেলিত,
শিখরী বহিত শোণিত-বাব
খেলিত চপলা কুলিশ বরষি,
রাখিত ভারত-গরব মান।"

একই বিষয়-বস্তুকে অবলম্বন করিয়া দুইটি ভাব-ধারা সাবলীলগতিতে প্রবাহিত হইয়াছে বিভিন্ন প্রণালীর মধ্য দিয়া। ভাব-দ্যোতনায় ছন্দ ও সুর পৃথক। কিন্তু দুইটি গানের কোনটিই বেসুরো শোনায় না।

স্বদেশভক্ত কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় স্বদেশী যুগে ও তৎপূর্বে অনেক জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। পূর্বের রচিত জাতীয় সঙ্গীতাবলীর মধ্যে কতক স্বদেশী আন্দোলনের কালেও গীত হইয়াছে, কিন্তু দেশব্যাপী

প্রচারিত হয় নাই। তাঁহার স্বদেশী যুগে রচিত দুইটি গানই উচ্চাসন পাইয়াছে। একটি হইল—"বঙ্গ আমার জননী আমার" এবং অপরটি "ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা" গান দুইটি প্রকাশের পরে অল্পকাল মধ্যেই সমগ্র দেশে প্রচারিত হয় এবং বিশেষ সমাদর লাভ করে। প্রথমটি "আমার দেশ" এবং দ্বিতীয়টি "আমার জন্মভূমি" নামেও সুবিদিত। "আমার দেশ" গানের যে কলিটি উহাকে অবিস্মরণীয় করিয়া রাখার পক্ষে যথেষ্ট, তাহা এই—"দেবী আমার সাধনা আমার স্বর্গ আমার—আমার দেশ।" দ্বিজেন্দ্রলালের "জননী ভারতবর্ষ" গানটিও সমাদৃত হইয়াছে; কিন্তু ইহা স্বদেশী যুগের পরবর্তী কালের রচনা।

কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাক্ স্বদেশী যুগে রচিত যে প্রসিদ্ধ গানটি স্বদেশী আন্দোলনের কালেও গীত হইয়াছিল, উহার প্রথম চরণ এই :—

"বাজ্‌রে শিঙা বাজ্ এই রবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই লাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।"

স্বদেশী যুগে একজন কলেজের ছাত্রের রচিত একটি জাতীয় সঙ্গীত এখন শুনাইতেছি। তৎকালে কলিকাতায় গানটি সর্বপ্রথম গীত হয় এবং অল্পকাল মধ্যেই সমাদর লাভ করে। সঙ্গীতটি এই :—

"মিশ্র ইমন—একতালা

"শোন রে, শোন রে সবে, শোন রে আজি কে ডাকে।
মাতার কণ্ঠ শুনি থেকো না ভুলিয়া মাকে।
পূর্ব-গগন-ভালে জেগেছে উষার হাসি,
জননীর স্নেহ ফুটে সঘন আঁধার নাশি';
জাগো জাগো ভাই সবে, জাগ রে বঙ্গবাসী!
শুনি আহ্বান যেন কেহ না আলসে থাকে।
বৃথা কাজে দিন যাহি বৃথা যামি দিন-রাত্রি,
এত দূরে আসিয়াছি মিথ্যা পথের যাত্রী;
ফিরে চল ভাই! ঘরে জননীর স্নেহ মাখে—
যেথায় মোদের তার সুখ-সম্মান রাজে;
পর দ্বারে আর ভিক্ষা লব না পরের সাজে,
জননীর গৃহ ছাড়ি পরের দ্বারে কে যাবে।"

সঙ্গীতের রচয়িতা তখন কলেজে পড়িতেন। অধ্যয়নের সঙ্গে সে যুগে বাংলা দেশে বহু ছাত্র স্বদেশের সেবায়ও শক্তি এবং সময় নিয়োগ করিতেন। স্বদেশী আন্দোলনকে সফল করার জন্য এই শ্রেণীর ছাত্রদের দান উল্লেখযোগ্য। গানটির রচয়িতাও ছিলেন ওই ছাত্র-কর্মী দলের একজন। পূর্বোক্ত সঙ্গীত ব্যতীত তিনি তৎকালে আরও কয়েকটি সময়োপযোগী জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। সুর যোজনা তিনি নিজেই করিতেন। বিপ্লবী-

জীবনেই তাঁহার সাহিত্য সাধনা ও সঙ্গীত-সাধনা সমভাবে চলিত। উক্ত কালে তিনি উভয়-ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। পূর্বোক্ত সঙ্গীত-রচয়িতা হইলেন—খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও গীতশিল্পী শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তৎকালে তিনি দক্ষিণ কলিকাতার ভবানীপুর অঞ্চলেই বাস করিতেন। "ভবানীপুর সাহিত্য সমিতি" নামে স্থানীয় ছাত্র ও যুবকগণের একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। উপেনবাবু ছিলেন সেই সমিতির একজন বিশিষ্ট সদস্য। স্বদেশী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বে (১৯০৬ খৃঃ কি ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে) "সাউথ সুবার্বন্ স্কুল" ভবনে সমিতির বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় খ্যাতনামা সাহিত্যিক সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর পৌরহিত্যে। উপেনবাবু এবং তাঁহার পরলোকগত বন্ধু সতীশ ঘটক (যিনি পরবর্তীকালে সাহিত্য-ক্ষেত্রে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন) উভয়ে মিলিয়া গাহিলেন ওই গানটি। তরুণ গায়ক-যুগলের মধুর কণ্ঠে গীত সেই স্বদেশ-সঙ্গীত শাস্ত্রী মহাশয়কে এমনই মুগ্ধ করিল যে, সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার ভাবোদ্বেল কণ্ঠ হইতে নির্দেশ শোনা গেল—"আবার গাও"

অন্ধ কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদার স্বদেশী যুগে অনেক জাতীয় সঙ্গীত ও উদ্দীপনাপূর্ণ কবিতা লিখিয়াছেন। সেই সমুদয় স্বদেশ-সেবকগণকে যথেষ্ট প্রেরণা যোগাইয়াছে। তাঁহার একটি সঙ্গীত নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"বিভাস—কাওয়ালী

"যাব না, আর যাব না ভিক্ষা নিতে পরের দো'রে
আছে যা অশন বসন, তাই খাব তাই থাক্‌বো পো'রে।
স্তন্যদুগ্ধ ধারা তোমার ব্রহ্মপুত্র গঙ্গা নদী
ওরি মিষ্ট রসে পুষ্ট বোদের তনু নিরবধি;
(সেই) সুধা ফেলে সুধার ধরি পড়ে মিছে ধাঁধার ঘোরে।
দাও গো গাছের বাকল তুলে, তাই পরিব হাসিমুখে,
মোরা দুঃখী মোরা সুখী ওমা তোমার দুখে সুখে।
পরের বসন প'রে এখন, লাজ ঢাকিতে লজ্জা করে।
তোমার ভাঁড়ার শূন্য নহে, অন্নপূর্ণা বিশ্বরমা!
(তবু) ঝুলি কাঁধে বেড়াই কেঁদে, তাই গেল—
পেট্ ভরিল না।
মান বাঁচাতে মনের দুখে অপমানে যাচ্ছি ম'রে।"

এই প্রবন্ধে কেবল সংগীতের আলোচনা করিতেছি বলিয়া বিজয়চন্দ্রের "আয়, আজি আয়, মরিবি কে" নামক অপূর্ব কবিতাটি হইতে উদ্ধৃতি দিলাম না।

ত্রিপুরা-ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উকিল কামিনীকুমার ভট্টাচার্য স্বদেশী যুগে জাতীয় সংগীত রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। ভাব, ভাষা, ছন্দ এবং সুর—সমস্ত দিক দিয়া বিচার-বিশ্লেষণ করিলেও তাঁহার গানগুলি উচ্চাসন পাইবার অধিকারী। তাঁহার সঙ্গীতাবলী স্বদেশী যুগে জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং সমগ্র বাংলা দেশে প্রচারিত হয়। তিনি জাতীয় সঙ্গীত ব্যতীতও বিভিন্ন প্রকারের বহু সংগীত রচনা করিয়াছেন। "সুখদা" নামক পুস্তকে

ওই শেষোক্ত শ্রেণীর ৮৫টী গান গ্রথিত হইয়াছে; এবং পুস্তকখানি প্রকাশিত হইয়াছে ১৩২৪ সালে। কামিনীকুমার নিজেই তাঁহার গানগুলিতে সুর যোজনা করিতেন। স্বদেশী যুগের মধ্য পর্বে নবগঠিত "পূর্ববঙ্গ ও আসাম" প্রদেশে স্বৈরাচারী শাসনকর্তা ফ্রেচলাট ব্যামফিল্ড্ ফুলারের শাসনকালে কুমিল্লার ও জামালপুরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধিয়াছিল। সরকারী কর্মচারীগণ ভেদনীতি অনুসরণ করিয়া মুসলমানদিগকে ওই দুষ্কর্মে উসকানি দিয়াছিলেন। তৎকালে দাঙ্গাকারী মুসলমানগণ হিন্দুনারী নিগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিল; এবং কোন কোন স্থান হইতে মুসলমান দুর্বৃত্তের হস্তে হিন্দু-নারী নিগৃহীত হওয়ার সংবাদও পাওয়া গিয়াছিল। বাংলার সেই দুর্দিনে মাতৃভক্ত কবি কামিনীকুমার ব্যাকুল কণ্ঠে আহ্বান করিলেন জননী জাতিকে শক্তি-সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে। সেই প্রাণস্পর্শী আহ্বান-গান :—

"আপনার মান রাখিতে জননী—
আপনি কৃপাণ ধর গো।
পরিহরি চারু কনক ভূষণ—
গৈরিক বসন পর গো॥
আমরা তোদের কোটি কুসন্তান,
গিয়াছি ভুলিয়া আত্ম-অভিমান,
করে মা পিশাচে তোদের অপমান
তাও নেহারি' নীরবে সহি গো।
তবু কি গো তোরা আমাদেরই পানে,
রহিবি চাহিয়া করুণ নয়নে,
আপনি ছিঁড়িয়া আপন আপন বন্ধনে,
আপনার লাজ হর গো॥
এলাইয়া দাও কুটিল কুন্তল,
জ্বাল মা হৃদয়ে প্রতিহিংসানল,
নয়নের কোণে লুকায়ে গরল,
মরণে বরণ করিয়া লও।
ঐ শোন বাজে বিপাতার ভেরী,
বাঁধ কটিতটে সুশাণিত ছুরী,
দানব-দলনী সাজগো জননী—
বাঙ্গালিনী বেশ ছাড় গো॥
তোদের তপ্ত শোণিত পরশে
পিশাচ-পীড়িত ভারতবরষে,
জাগুক আবার যত কুলাঙ্গার,
আজিও সুখে ঘুমায়ে রয়।

শুনিয়ে তোদের ভৈরব হুঙ্কার,
নিখিল চমকি' উঠুক আবার,
বিমথ পুণ্যে মোদের সৈন্যে
কর মা ধৌত কর গো ॥

চারণ-কবি কামিনীকুমারের আর একটি গানের প্রথম চরণ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"অনবত ভারত চাহে তোমারে,
এস সুদর্শনধারী মুরারি !
নবীন তন্ত্রে, নবীন মন্ত্রে,
কর দীক্ষিত ভারত-নরনারী ॥

কবির অপর একটি জনপ্রিয় সঙ্গীতের প্রথম চরণ এই :—

"শাসন-সংযত কণ্ঠ জননি,
গাহিতে পারি না গান।
তাই, মরম-বেদনা লুকাই মরমে,
আঁধারে ঢাকি না প্রাণ ॥"

সমগ্র সঙ্গীতটির মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে পরাধীন জীবনের দুঃসহ ব্যথা। কবি-কণ্ঠ শাসন-সংযত হওয়া সত্ত্বেও কবি-হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন মর্ম-বেদনা প্রতিটি দেশভক্তের প্রাণেই অনুভূতি জাগাইয়াছে। কবি-কামনা প্রকাশ পাইয়াছে গানটির শেষ চরণে—

"না জানি জননি, কত দিন আর
নীরবে সহিব হেন অত্যাচার,
উঠিবে কি কভু বাজিয়ে আবার
স্বাধীন ভারতে বিজয় বিষাণ।"

কবির আরাধ্য দেবতা "ভারত-পাপ-নাশকারী" "সুদর্শনধারী মুরারী" ভক্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন। কবি বাঞ্ছিত "স্বাধীন ভারতে বিজয়-বিষাণ" বাজিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তিনি ইহলোক বাস-কালে তাহা শুনিয়া যাইতে পারেন নাই। সেই মঙ্গল-নিনাদ দেবলোকে নিশ্চয়ই পৌঁছিয়াছে। ভারত স্বাধীন হইবার বৎসর তিনেক পূর্বে কামিনীকুমার স্বর্গ-লাভ করিয়াছেন।

ওই সাধক-কবির আর একটি গান এখন শুনাইব :—

"ভৈরবী—মিশ্র ঠুংরি

"সোনার স্বপন মোহে ভুলিও না ভাই সাধনা,
এ যে আলেয়ার আলো মায়া মরীচিকা
আশ্বাস ঢাকা ছলনা।

ওদের রুদ্ধ দুয়ারে করি করাঘাত,
পেয়েছ কবে বেদনা;
ওরা শুনিল কি তব ধর্মকাহিনী
বুঝিল কি তব বাসনা?
ওরা ঘৃণা করে মোদের বর্ম,
মোদের আহ্বানে বধির কর্ণ;
তুচ্ছ হুংকারে দেয় ভেঙেচুরে
সকল সঙ্কিত কামনা।
ওরা মোদের দৈন্যে করে পরিহাস,
কেড়ে নিতে চায় মুখের গ্রাস;
তবু মুক্ত-করে ওদের দুয়ারে,
কেন নিত্য নিষ্ফল যাতনা?
এখন আপনার পানে ফিরাও নয়ন,
জাগাও আপন শক্তি;
পরের চরণ না করি লেহন,
কর আপনার মায়ে ভক্তি;
তবে জাগিবে নবীন বঙ্গে,
নব জীবন নব রঙ্গে,
বিশ্ব কাঁপায়ে উঠিবে বাজিয়া
রুদ্র বিজয়-বিষাণ।"

এইবার বিপ্লবী দেবব্রত বসুর স্বদেশী যুগে রচিত একটি সঙ্গীত শুনাইতেছি। ইঁহার রাজনীতিক জীবন আরম্ভ হয় প্রাক্ স্বদেশী যুগে। বিপ্লবী মহানায়ক শ্রীঅরবিন্দ বরোদা হইতে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে (পরে স্বামী নিরালম্ব) বাংলাদেশে পাঠাইয়া বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন—স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইবার দুই-তিন বৎসর পূর্বে। যাঁহারা সর্বপ্রথম ভারতের স্বাধীনতার জন্য সেই সমিতিতে বিপ্লব-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, দেবব্রত তাঁহাদেরই একজন। বিপ্লবীদলের বাংলা সাপ্তাহিক "যুগান্তর" পত্রিকায় তিনি ছিলেন অন্যতম লেখক। তিনি আলিপুর বোমার মামলার আসামী ছিলেন। তৎকালে তাঁহার বয়স ছিল সাতাইশ বৎসর। সে মামলায় প্রমাণাভাবে তিনি মুক্তি পান। কিছুকাল পরে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং স্বামী প্রজ্ঞানন্দ নামে পরিচিত হন। দেহত্যাগ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন ছিল। সুলেখক ও সুপণ্ডিত বলিয়া তাঁহার খ্যাতি কম ছিল না। তাঁহার রচিত প্রসিদ্ধ সঙ্গীতটি এই:—

"কে আছ মায়ের মুখপানে চেয়ে
এস কে কেঁদেছ নীরবে।
মার মুখ চেয়ে আত্মবলি দিয়ে
সে মুখ উজ্জ্বল করিবে।
নিজেরে ভাবিয়ে অক্ষম দুর্বল
বাড়ায়েছ মায়ের যাতনা কেবল;
যার মাতৃকণ্ঠে বাজিছে শৃঙ্খল
দুর্বল সবল সে কি ভাবিবে?
জান না রে মূঢ়! জননী তোমার
পুরাকাল হ'তে সে কি শক্তির আধার,
সন্তানের কণ্ঠে শুনিলে হুঙ্কার
নয়নে বিজলী খেলিবে।
ক্ষুদ্র স্বার্থে মজি এখনো কি ভাই
মা হ'তে সুদূরে রবে ঠাঁই ঠাঁই?
হিন্দু মুসলমান এস সবে ধাই
মা যে ঐ ডাকিছেন সবে।
কে আছ আজিও পরপদ-সেবী,
বিদেশী আদেশে সোপনে মাতৃসেবক সন্তানে,
এস উঠে এস মার পুত্র সবই,
একই রক্ত বহে ধমনী ভিতরে
একই মাতৃনামে উন্মত্ত হবে।
কে আছ বিপদে না করি দৃকপাত,
মৃত্যু, নির্য্যাতন, দৈব বজ্রাঘাত,
মার মুখ চেয়ে খণ্ড খণ্ড হয়ে
এস কে সহিতে পারিবে।
এস শীঘ্রগতি বেলা বয়ে যায়,
এনেছে জাপান উষা এসিয়ায়,
মধ্যাহ্ন গরিমা স্বাধীন ভারত
আনিবে, নিশ্চয় আনিবে।"

রচয়িতার স্বদেশের প্রতি মমত্ববোধ যে কত খাঁটি, তাহার নিদর্শন রহিয়াছে সঙ্গীতের প্রতিটি পদে। মুক্তি সাধনার বিপ্লবী সাধক দেশ-মাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের জন্য স্বদেশবাসীকে আকুলকণ্ঠে আহ্বান করিয়াছেন চরম ত্যাগের ব্রত গ্রহণ করিতে। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে আমরা বহু জনসভায় ওই মর্মস্পর্শী গানটি গীত হইবার

কালে সহস্র সহস্র শ্রোতার মধ্যে যে অপূর্ব ভাবের সঞ্চার হইতে দেখিয়াছি, প্রায় অর্ধশতকের ব্যবধানেও স্মৃতি হইতে তাহা মুছিয়া যায় নাই।

প্রবন্ধটি সমাপ্ত করিবার পূর্বে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক মনে করিতেছি। যে সকল জাতীয় সঙ্গীত স্বদেশী যুগের পরে রচিত হইয়াছে, তৎসমুদয় বর্তমান আলোচনার বিষয়-বস্তু নহে। সেইজন্য বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের জাতীয় সঙ্গীতাবলি এই প্রবন্ধ হইতে বাদ পড়িয়াছে।

এইক্ষণ স্বদেশী যুগে রচিত ও গীত আর একটি প্রসিদ্ধ সঙ্গীতের উদ্ধৃতি দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতেছি। এই সঙ্গীতটি পূর্বালোচিত বিপ্লবী দেবব্রত বসুর সঙ্গীতটির সমশ্রেণীর বলা যাইতে পারে। সঙ্গীতটি এই :—

"বেহাগ—ঢিমে তেতালা

"স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি,
রেখো রেখো হৃদে এ ধ্রুব জ্ঞান ;
যাহার সলিলে মন্দাকিনী চলে,
অনিলে মলয় সদা বহমান।
নন্দন-কাননে কিবা শোভা ছার,
বনরাজি কান্তি অতুল তাহার
ফলশস্য তার সুধার আধার,
স্বর্গ হ'তে সে যে মহাগরীয়ান।
এ দেহ তোমার তারি মাটি হ'তে
হয়েছে সঞ্জিত শোণিত তাহাতে,
মাটি হ'য়ে পুনঃ মিশিবে তাহাতে
ভবলীলা যবে হবে অবসান।
পিতামহদের অস্থিমজ্জা যত,
ধূলিরূপে তাহে আছে সে মিশ্রিত,
এই মাটি হ'তে হবে যে উত্থিত
ভাবী কালে তব ভবিষ্য সন্তান।
কংস-কারাগারে দেবকীর মত,
বক্ষেতে পাষাণ লৌহ-শৃঙ্খলিত,
মাতৃভূমি তব রয়েছে পতিত
পরিচয় তুমি তাহারি সন্তান।
প্রকৃত সন্তান জেনো সেই জন
নিজ দেহ-প্রাণ দিয়ে বিসর্জন,
যে করিবে মা'র দুঃখ বিমোচন
হবে তার মাতৃঋণ প্রতিদান।"

জাতীয় সঙ্গীতাবলির বিভিন্ন সঙ্কলন-পুস্তকে ওই মর্মস্পর্শী সঙ্গীতটি সসম্মানে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু রচয়িতার নাম প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। বিখ্যাত বিপ্লবী স্বদেশী যুগে আলিপুর বোমার মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত স্বর্গত হেমচন্দ্র কানুনগোর মতে ওই গানটি কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের রচিত।

ফিরে ফিরে চাই

স্মৃতিচারণ

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ছিরু একটি অবিস্মরণীয় চরিত্র। এতো কাল পরেও তার কথা স্পষ্ট করে মনে আছে। স্কুলের এক পাশে খড়ের একটা ঘর—সেটার একটা তামাকের আড্ডা—এই কাজে ছিরু ছিল পটু। পাশের ঘরে জল খেতে যাবার সময় দেখতাম প্রিয়বাবু ভায়া কঁকো নিয়ে কড়াত কড়াত করছেন—কখনো দেখি সদ্য ব্রাহ্মণ আশু চাটুজ্জে কলার পাতার নল বানিয়ে কঁকো টানছেন—মনমোহনবাবু তামাক টানতে টানতে কাশছেন—ছিরু সকলের সেবায় আছে। জলের ঘরে যখন জল থাকতো না, তখন যেতাম পাশের হোটেলে। একটা চারচালা ঘর—হুমড়ে পড়ছে সামনেটা। জল চাই বলে দাঁড়ালেই একজন ঝি কাঁসার ঘটি করে পিঁড়ে থেকে অঞ্জলিতে জল ঢেলে দিত—জালার ভিতর পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল।

গরমকালে কয়টা মাস মর্ণিং স্কুল বা সকালে স্কুল বসতো। তাড়াতাড়িতে ভাত খাওয়া হতো না—তাই আটটার সময়ে মুটি কি বা কোনো ভৃত্য দুধ ও সন্দেশ নিয়ে টিফিন দিতে যেতো। টিফিনের ঘণ্টা সেকালে ছিল না—ক্লাসে বসে আছি কোন ছাত্রবন্ধু ইঙ্গিতে জানালো বাড়ি থেকে লোক এসেছে খাবার নিয়ে। অনুমতি নিয়ে বাইরে যেতে খুবই লজ্জা করতো—টিফিন খেতেই হবে। নিয়ে চোঁ-চোঁ করে দুধ খেয়ে সন্দেশটা কোনো রকমে গলাধঃকরণ করে ক্লাসে ফিরে আসতাম। ক্লাস শেষ হয়ে গেলেই বাড়ি ফিরে অল্প ছেলেরা নদীতে স্নান করতে যায়—কেউ কেউ 'ডবল' ধুতি পরে আসে। তাদের দেখাদেখি আমিও কাউকে না বলে দু'খানা ধুতি পরে ক্লাসে আসি ও ক্লাস থেকে বের হয়ে একখানা কাপড় ডাঙায় রেখে, আর একটা কাপড় পরে স্নান করলাম। বাড়িতে ফিরে মায়ের কাছে ধরা পড়ে গেলাম—সেদিন থেকে আর নদীতে নামা হয়নি—পনেরো বৎসর নদীতীরে বাস করে না শিখলাম সাঁতার না করলাম নদী স্নান। এটা হচ্ছে সেকালের মেকি আভিজাত্য।

নদীতে যাওয়া বন্ধ হবার কারণও ঘটলো। আমাদের সহপাঠি অবনী চাটুজ্জের ভাই নদীতে স্নান করতে গিয়ে ডুবে মারা যায়। আরও খবর এলো বড় মামার বড় ছেলে গঙ্গায় ডুবে গেছে। এইসব ঘটনার ফলে চিরদিন ভদ্রলোক হয়ে থাকলাম—সাঁতার দেওয়া, ঘোড়ায় চড়া, শিকার করা, কুস্তি করা, এমনকি ফুটবল খেলাও শিখলাম না। জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য পরীক্ষায় পাশ করা। এমনই অদৃষ্টের পরিহাস তাও অদৃষ্টে জুটলো না—মধ্যবিত্ত জীবনের পরম কাম্য বি. এ পাশ করে হয় ওকালতি পড়া, নয় স্কুলমাষ্টারি করা।

একটা দিনের কথা বলি—কী অবান্তরতার উপর শিক্ষাবিধির ভিত্তি উঠতো। কলকাতা থেকে এক বক্তা এসেছেন—ভাষণ দেবেন ছাত্রমহলে। স্কুলের মাঝে একটা হল ছিল সেখানে সভা। বক্তার নাম ললিতবাবু—আজ মনে হয় তিনি ব্রাহ্মসমাজের খ্যাতনামা বাগ্মী পণ্ডিত ললিত মোহন দাস। ভাষণ

ইংরেজিতে প্রবন্ধ হবে তবু শোনাব। স্কুলের পুরাতন কয়জন ছাত্র এখন কলকাতায় পড়েন, তাঁরা এসেছেন—তাঁরা গান করবেন। বক্তৃতার আরম্ভে গান হলো—

'জননীর দ্বারে আজি ওই
শুন গো শঙ্খ বাজে

শুনলাম রবি ঠাকুরের গান। এই পর্যন্ত। কে রবি ঠাকুর কি বৃত্তান্ত কিছুই জানি না। সে সব জানতে আরম্ভ করি স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হলে ১৯০৫ সালে—সে সব কথা যথাস্থানে আসবে। বক্তৃতা শুনলাম, একটা কথাও বুঝি নি কেবল একটা শব্দ কানে মিষ্টি লেগেছিল Jejune। বাড়ি ফিরে এসে বাবাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, শব্দ মনকে যা তৃপ্তি দেয় না। তবে একটা শব্দের নানা অর্থ হয়—বক্তা কোথায় কিভাবে ব্যবহার করেছেন, তা যদি বলতে পারতে, তবে ভালো করে বুঝিয়ে দিতে পারতাম।

স্কুল জীবনের মনে রাখার মতো দিন 'প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন' বা পারিতোষিক বিতরণ উৎসব—বৎসরে একটি দিন ফিরে ফিরে আসতো। কোনোদিন কোনো 'প্রাইজ' পাইনি বলেই দিনটার কথা মনে আছে।

পাল চৌধুরীদের বিরাট প্রাসাদোপম অট্টালিকা—আজ তাকে দেখলে কেউ চিনতে পারবে না। সেই চকমিলানো বাড়ির মাঝে পূজার দালান আজ ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে। পালচৌধুরী স্কুলের সেক্রেটারি হতেন পালচৌধুরী বংশের কোনো ব্যক্তি—আমাদের সময়ে গনেশ পালচৌধুরী ছিলেন সেক্রেটারি। বার্ষিক সভা বসে পূজার দালানের সম্মুখে; মঞ্চে বসেন সভাপতি, সেক্রেটারি, হেড্ মাষ্টার, গণ্যমান্য ব্যক্তিরা;—ছাত্র ও অভিভাবকরা থেকে বসেন উঠোনে। সেক্রেটারি ইংরেজিতে বিদ্যালয়ের বার্ষিক রিপোর্ট পড়লেন; তারপর সুরু হলো 'রেসিটেশন' বা আবৃত্তি আদি ব্যাপার—যার সঠিক নাম হয়েছে 'কাংশন'। কাঁসারী পাড়ার বটকৃষ্ণ দত্ত বিদ্যালয়ের মধ্যে শক্তিমান যুবক—পড়াশুনায় মাঝারি রকমের ছাত্র—তবে সংস্কৃত আবৃত্তি করতেন আশ্চর্যভাবে সুন্দর করে। আবৃত্তি করলেন 'শিবাষ্টকম্'—প্রভুমীশ মনীশ অশেষ গুণং ইত্যাদি। আবৃত্তি শেষে হাততালি দেওয়া রীতি ভাল লেগেছে তার প্রমাণ। হাততালি দেওয়াটা পাশ্চাত্য রীতি—যেমন জয়ধ্বনি দিতাম 'হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে' আনন্দ উচ্ছ্বাস প্রকাশের জন্য। ভগবানের স্তোত্রের পর হাততালি!

এরপর হলো ষ্যুট (Canute) ও তার সভাসদদের সংলাপ। আমরা ষ্যুটকে বলতাম ক্যান্যুট ভুল উচ্চারণ কেউ শুধরে দিতেন না। ষ্যুটের ভূমিকা গ্রহণ করেন দাদা। পারিষদগণ রাজাকে বলছে জলস্থলে তিনি একচ্ছত্র, তুলনাহীন তাঁর শক্তি। ষ্যুট সিংহাসন নিয়ে সমুদ্র তীরে বসে আছেন—সভাসদের প্রশ্ন করলেন, 'সাগরও কি আমার আদেশ মানবে।' 'নিশ্চয়ই' বললেন তোষামোদীদের দল। সমুদ্রের তরঙ্গ আগিয়ে আসছে—রাজা সাগরকে আর অগ্রসর হতে নিষেধ করলেন! সাগর তরঙ্গ আগিয়ে আসতে থাকলো। ষ্যুট তখন পারিষদদের বৃথা তোষামোদ করার জন্য তিরস্কার করে উপদেশ দিলেন।

'প্রাইজ' দেবার পালা সুরু হলো। ভালো ছেলেরা ভালো ভালো ইংরেজি বই পেল পারিতোষিক। দাদা একবার পেয়েছিলেন টমাস ডে (Day) নামে এক লেখকের Sandford and Merton নামে বই, আর পান Good for Nothing নামে গল্প। বাবা সন্ধ্যার পর তাকিয়ায় মাথা রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে ক্ষীণ প্রদীপের আলোকে বইটা পড়ে শোনাতেন, বাংলায় অর্থ করে দিতেন। একবার দাদা স্কটের 'আইভান হো' নভেল প্রাইজ পান—সে বই পড়বার বয়স ও বিদ্যা তখন তাঁর হয়নি।

আমি জনতার মাঝে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতাম। Good conduct, Regularity প্রভৃতির জন্য প্রাইজ ছিল;—পাওনিও ছিলাম না, আর ম্যালেরিয়ায় ভুগতাম বলে কামাইও করতাম,

তাই কোনো প্রাইজই পাইনি। ভালছেলে বলে প্রাইজ পেতো প্রবোধ। অতি নিরীহ, ক্লাসে ঠিক সময়ে আসে, একটি কোণে চুপ করে বসে, পড়াশোনায় আমাদেরই মতো। কিন্তু অত্যন্ত শান্ত। সেই প্রবোধ পেতো শুধু কনডাক্টের প্রাইজ। বহু বৎসর পরে হাজিলিং যাচ্ছি—নেমেছি ষ্টেশনে—দেখি রেলওয়ে উর্দি পরে প্রবোধ। আমায় দেখে কাছে এল, কিন্তু বেশিক্ষণ কথাবার্তা বলতে পারলো না—অদূর থেকে উচ্চপদস্থ কর্মচারী তুড়ি দিয়ে ডাকলেন—হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেল—আর তাকে দেখিনি।

সুবোধ পাকুলি নামে একটি চশমা পরা বছর বারো বয়সের ছেলে এসে ভর্তি হলো স্কুলে। চশমা পরা ছেলে তখন একজন ছিল না স্কুলে—তাই তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার জন্য ছোট বড় সবাই সুযোগ খোঁজে। বেচারা অতি ভালমানুষ, ভয়। কারও সঙ্গে সে কথা বললে সবাই মনে করে কী ভাগ্য ছেলেটার। সেই চশমা, পরা ছেলেকে দেখলাম বহু বছর পরে হ্যারিসন রোডের মোড়ে। নিকেল ফ্রেমের চশমা, তিন-চারদিনের কৌরী না করা মুখ, বেশভূষা অত্যন্ত সাধারণ, কেডসের জুতার আঙুলের কাছটায় ফুটো, হাতে ব্যাগ। দেখা হওয়াতে প্রথম উচ্ছ্বাস, তারপর মধ্যবিত্ত সংসারের সংগ্রামময় জীবনের কাহিনী শ্রবণ। চলে গেলে ভাবলাম কে হরণ করে নিল তার কৈশোরের সেই মুখ, সেই সরল হাসি! মানুষ সংসার পাতে সুখের জন্য। সে কি সত্য সুখ পায়? দুঃখের, দারিদ্র্যের অনেক কথা শুনেছিলাম—কিন্তু তার থেকে মুক্তি কি চায় মানুষ?

স্কুল জীবনে কত বন্ধুই জোটে! কী নিবিড় ভালবাসা। মনে পড়ছে সুধীর ও অমূল্যকে—ভালো ছেলে সত্যিই তারা। সে যুগে সব বিষয় ইংরেজির মাধ্যমে পড়তে ও প্রকাশ করতে হতো। এমনকি সংস্কৃত পড়ে ইংরেজিতে প্রশ্নপত্রের উত্তর লিখতে হতো। থার্ড ক্লাসে পড়ি। ইংরেজি পড়াচ্ছেন আশু চাটুজ্যে—স্কুলের বিভীষিকা তিনি। আমাদের পাড়ার কাছেই বাড়ি—তাঁর দুর্দান্ত ছেলে দাদাদের সহপাঠি। বাপ অটলকে যত মারে, অটল তত বাপকে ফাঁকি দিয়ে দুষ্কর্ম করে বেড়ায়। মনে পড়ছে একদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছে স্কুলের ক্লাসের ছাদের একটা কোণ ভেজা ভেজা। ক্লাসে কেউ নেই তখন—অটল ঢুকে লোহার বাঁটওয়ালা ছাতা কোথা থেকে এনে, টেবিলের উপর টুল তুলে তার উপর দাঁড়িয়ে; ঠুকে ঠুকে ছাদের সেই জায়গা এমন অথম করে দিল, ঘরের মধ্যে ঝরঝরিয়ে জল পড়তে লাগলো। এ অবস্থায় ক্লাস করা সম্ভব নয়—'রেনি ডে' বা বৃষ্টির জন্য ছুটি হয়ে গেল।

আশু চাটুজ্যে টেবিলের উপর পা দুটি তুলে ইংরেজি পাঠের ইংরেজিতে Explanation বলে যাচ্ছেন আর আমরা তাই লিখে নিচ্ছি। ছাইভস্ম কী লিখলাম জানিনে। পরে সুধীর ও অমূল্যর খাতা দেখে নিজের লেখা শুদ্ধ করে নিতাম। তবে আসল নির্ভর অর্থপুস্তকের উপর।

স্কুলের হেড্‌মাষ্টার নারায়ণবাবুকে সমীহ করতাম; দ্বিতীয় শিক্ষক গোষ্ঠবাবু একটু পাগলাটে ছিলেন বলে তাকে ছেলেরা বিরক্ত করতো—কিন্তু পড়াতেন ভালো। তিনি উঁচু ক্লাসে অংক কষাতেন—ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই হাঁকতেন take down, take down অর্থাৎ 'অংক লেখ'। এসেই ব্ল্যাক-বোর্ডের কাছে গিয়ে অংক লিখতে সুরু করে দিতেন। ছেলেরা জুতো ঘষে শব্দ করে তাঁকে উত্যক্ত করে তুলতো। নূতন একটা ছেলে এলো উত্তর প্রদেশ থেকে। বয়সে আমাদের থেকে বড়, মিচ্‌কে:শয়তান; তার প্রেরণায় অন্যেরা এই শব্দ সৃষ্টি করতো। বেশী গোলমাল হলে হেড্‌মাষ্টার এসে দরজার কাছে দাঁড়ালেই সব শান্ত, ভিজে বেড়ালটি হয়ে যেতো। থার্ড মাষ্টার আশুবাবুকে দেখতাম ঘাড় দিয়ে যাচ্ছেন মাথায় রক্তচন্দনের তিলক

—অনভ্যাস তিনি তান্ত্রিক সাধনা করেন, অর্থকরী বুরুতায় না। শিকারী বলেও নামডাক ছিল। সেকালে মেকড়ে বাঘ বা দো-বাঘা শহরের আনাচে-কানাচে দেখা যেতো। আশুবাবুর গাদা বন্দুকের আওয়াজে তারা দূরেই থাকতো। একদিন শুনি তিনি এক বাঘ মেরেছেন। ব্যাপার কি? নাসরা-পাড়ায় অনেক পুরাতন বাড়ি, ম্যালেরিয়ায় উজাড় হয়ে গেছে। একটা ঘরে এক বুড়ি ও তার নাত্‌নী থাকে। বুড়ি গিয়েছে ভোরায় জল আনতে। নাত্‌নী ঘরের কাছে এসে দেখে ঘরের ভিতর বিছানার উপর একটা বাঘ শুয়ে। মেয়েটা চেচামেচি না করে, দরজার শিকলী উঠিয়ে দিয়ে লোকজনের জানালা ঘরে বাঘ ঢুকেছে। আশুবাবু সেই খবর পেয়ে তাঁর গাদা-বন্দুক ভরে এলেন বাঘ মারতে। জানালা দিয়ে তাক্ করে বধ করলেন সেই অবাঞ্ছিত অতিথিকে। তারপর লোকে বাঘটাকে বাঁশে ঝুলিয়ে শহর ঘোরালো। সে কী উৎসাহ আমাদের—আশুবাবু 'হিরো' হয়ে উঠলেন।

চতুর্থ শিক্ষক মনমোহনবাবু, তাঁর পুত্র মুরারী বা মন্ত আমাদের সহপাঠি। মনমোহনবাবুকে সত্যই শ্রদ্ধা করতাম কারণ তিনি আমাদের সঙ্গে মিষ্ট ব্যবহার করতেন, হেসে কথাও বলতেন। এই যে শিক্ষকদের কথা বললাম, এঁদের বাড়িতেও যাওয়া-আসা ছিল, এঁদের স্ত্রীরা ছাত্রদের নিজ পুত্রের মতই দেখতেন, গেলেই ঘরে যা থাকতো তাই বলতেন খেয়ে যেতে। তাঁদের ছেলেদেরও আমাদের ঘরে অবাধ গতি ছিল এমন কি দুর্দান্ত অটল আমাদের বাড়ি এসে অন্যরকম হয়ে থাকতো—কেন জানিনে।

বোধহয় ১৯০২ সাল। ফিফথ্ ক্লাসে উঠলাম—বয়স দশ-এগারোর মধ্যে। স্কুলের নূতন কটিনে ড্রয়িং ও ড্রিল বলে দুটো বিষয় শিক্ষণীয় হয়েছে। বললাম যে নামে শিক্ষক এসেছেন তিনি ড্রয়িং বা ছবি আঁকতে শেখাবেন ও ড্রিল বা শারীরিক ব্যায়াম ও কুচকাওয়াজ করাবেন। আজ মনে হয় অদ্ভুত সংমিশ্রণ: 'একহাতে তার কৃপাণ আছে আর এক হাতে হার।' ছোটবেলা থেকে ছবি আঁকতে ভালো লাগতো। ম্যালেরিয়ায় ভুগি, ক্লাসে যেতে পারিনে—ঘরে বসে ছবি আঁকি। সেকালে আজকার মতো রঙের তুলি বাক্স মফস্বলের দোকানে সুলভ হয়নি। তাই সিউলিফুলের ডাঁটি টিপে রঙ বের করে কাগজে লাগাই; চুন ও হলুদ মিশিয়ে একটা রঙ সৃষ্টি করে কাগজে লেপি। সবুজ পাতা ঘষে সবুজ রঙ সৃষ্টির চেষ্টা ব্যর্থ হলো। স্কুলে ড্রয়িং-এর বই ছিল হোইটহল্ নামে কোন কোম্পানি বা সাহেবের; বইতে বিলাতি চেয়ার টেবিল আসবাবপত্রের ছবি—তাই আঁকা ছিল রীতি। এলো হাতেল সাহেবের 'ড্রয়িং-বুক'—লম্বা লম্বা খাতার মতো বই—ভারতীয় স্থাপত্যের নমুনা স্তম্ভ, খিলান ইত্যাদি আঁকার রীতি। একদিন করে 'মডেল' দেখে আঁকতে হতো। একদিন ড্রয়িং ক্লাসে দেখি বলরাম বাবু টেবিলের উপর সাজিয়ে রেখেছেন কাঠের কোণ চতুষ্কোণ ফুঁজো প্রভৃতি। সে সবের ছবি আঁকতে হবে। মাস্টার মশায় এসে পেন্সিল নিয়ে হাত খানা সোজা করে এক চোখ বুঁজে মডেলের মাপ নিলেন। দুটি বিন্দু দিলেন কাগজে। তারপর মডেলের নানা অংশের মাপ তেমনি করেই এক চোখ বুঁজে। পেন্সিল ঘুরে ঘুরে মাপজোপ করে মডেলের একটা রূপ গড়ে তোলা হলো। আমার হাত ভালই ছিল আঁকা জোকায়, তাই ছোটবেলায় ভাবভাব বড়'হয়ে ছবি-আঁকা শিখবো। বন্ধ বাড়ির ভোত্‌লা বলাইদা কলকাতা আর্ট স্কুলে পড়তেন, মাঝে মাঝে আসতেন আমাদের বাড়িতে, নানা রকম ছবি এঁকে আমাদের আমোদ দিতেন। আমার ছেলেদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ মানুষ দেখে ছবি আঁকার ক্ষমতা পেয়েছিল—পেন্সিল ক্রমে নেয়নি নিজের আনন্দে আঁকে, যিনি যেন যার ছবি তাকে।

ক্লাসে যিনি ড্রয়িং মাস্টার, ক্লাসের বাইরে মাঠে তিনিই বেত হাতে ড্রিল মাস্টার। ঘরের মতো ভরার ছেলেরা বলরাম বে ড্রিল মাস্টারকে। ক্লাসের শেষ পর্বে ড্রিল—খিদের নাড়ি চোঁ চোঁ করছে

মালকোচা মেরে—তখন শর্টস্ বা ভারতীয় ইংরেজিতে যাকে আমরা বলে থাকি হাফ-প্যান্ট সেসব পরার রেওয়াজ হয়নি। তাই লম্বা কোচা ঝুলিয়ে ক্লাসে আসা ছিল নিয়ম—মালকোচা মেরে বা কোমরে ধড়া বেঁধে কেউ আসতো না। যাই হোক মালকোচা মেরে 'লাইন' করে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াই। বলরামবাবু বজ্রকণ্ঠে হাঁকতেন, 'কাউন্ট' অর্থাৎ গুনতি করো। আমরা ইংরেজিতে বলে যাই ওয়ান, টু, থ্রী ইত্যাদি। হুকুম হলো অড্ নাম্বার অর্থাৎ বেজোড় সংখ্যা ১, ৩, ৫, ৭ ইত্যাদি ওয়ান স্টেপ ফরওয়ার্ড; ইভন নাম্বার অর্থাৎ জোড়সংখ্যা ২, ৪, ৬, ৮ ইত্যাদি—ওয়ান স্টেপ্ ব্যাকওয়ার্ড। তারপর হাঁকতেন 'মার্চ' অর্থাৎ এইবার চলো। মোট কথা সমস্ত আদেশ ইংরেজিতেই বলা ছিল রীতি—এখন নাকি সব হুকুম হিন্দীতে পেশ হয়। ড্রিলের সময় কত কী শিখলাম—'অ্যাটেনশন,' 'স্টান্ড্ অ্যাট ইজ'—আরাম করে দাঁড়াও কথাটা বুঝতে অনেক সময় লাগে। 'রাইট্ টার্ন,' 'লেফট্ টার্ন,' বলতে—পা কিভাবে আগে পিছে করে পাশ ফিরতে হবে তা শেখানো হতো। 'রাইট্ অ্যাবাউট্ টার্ন' বলতে বুঝতাম একেবারে বিপরীত দিক ঘুরে দাঁড়াতে হবে। পরে জানি এই কথা কয়টির একটি গূঢ় অর্থ আছে অর্থাৎ পিছু ফিরে পলায়ন। ড্রিলের সঙ্গে ব্যায়ামও ছিল—সংঘবদ্ধ হয়ে, মার্চ' বা চলবার রীতি শিখি আমরা। এতকাল পরেও তার নাম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি—আজও যে কুঁজো হয়ে হাঁটি বোধহয় সেদিনেরই শিক্ষারই ফল।

নার্সি-মাতনীদের দেখি স্কুলে ঢুকেই একগাদা বইতো কিনলোই—তার সঙ্গে কিনলো এক দিস্তা প্রায় খাতা—'একসারসাইজ বুক, বাঁধানো খাতা ও চাই কয়েকখানা। আমাদের পাঠশালায় ও স্কুলের নিচের ক্লাসে বহু বছর ধরে আমরা শ্লেট পেন্সিলে অংক কষতাম। শ্লেট ও পেন্সিল দুটো শব্দই ইংরেজি অর্থাৎ ইংরেজদের এদেশে আসার পর দেশীয় এই দুটো সরঞ্জাম আসে। পেন্, নিব্, কাউনটেন পেন্ স্টাইলো বসবার টেবিল, বেন্চ্ চেয়ার সবই বিদেশ থেকে পেয়েছি। মুসলমানদের আগমনের পর পাই বই, কাগজ, কলম, সিয়াহী, মেজ, কুরশি প্রভৃতি। কেউই কলমের স্থলে সংস্কৃত 'লেখনী' শব্দ কালির বদলে মসী ব্যবহার করিনে।

শ্লেট পাতলা পাথরের তৈরী—অবশ্য এই ধরণের পাতলা পাথর প্রকৃতিই তৈরী করেন—যেমন করেন চুনাপাথর, লোহাপাথর, মার্বেল পাথর। গিরিডিতে একটা নদীর নাম ছিল 'শ্লেট রিভার'। অবশ্য সেখানে লেখবার শ্লেট পাওয়া যেতো না। ঘরের টালির জন্য হয়তো বা ব্যবহৃত হতো। চৌকোণা শ্লেট, কাঠ দিয়ে বাঁধা—তৈরী হতো আরমেনীতে, পেন্সিলও শ্লেট চিরে চিরে তৈরী। পরে বাজারে এলো নরম শ্লেট-পেন্সিল—স্পষ্ট লেখা ওঠে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর নূতন ধরণের শ্লেট এলো শুনলাম ভাঙে না। আমাদের সময় শ্লেট হাতে থেকে পড়ে গেলেই ফেটে যেতো। দোকানে কিনতে গেছি—দোকানী শ্লেটখানা দেখাতে দেখাতে বললে 'ফেলে দিলেও ভাঙবে না।' বলেই মেঝের উপর জোরে ছুড়ে দিল ছুড়ে। ভাবলাম বাহাদুরী দেখতে গিয়ে শ্লেটটা ভাঙলো! তুলে দেখি পাথরের শ্লেট নয়—এ শ্লেট লোহার পাতলা চাদরের উপর রঙ করা! আমাদের সত্যিকারের শ্লেট সপ্তাহান্তে কাঠ কয়লা দিয়ে সাফ করা ছিল এক আমোদের ব্যাপার। কাঠ কয়লা জল দিয়ে ঘষে ঘষে তেল মরলা উঠাতাম। তারপর লিখলে জলজল করতো লেখাগুলো।

কাগজ মুসলমানীদের আমদানী। শব্দটাও আরবী। তার আগে লিখতাম তালপাতা বা তালপত্রে এখনো বলি 'কাগজপত্তর'। বই-এর 'পাতা' যাকে বলে তা তো সত্যিকার 'পাতা' নয় তালপাতার পুঁথির পাতা। আমাদের সময়ে ছেটে-বড়ের 'বালির' কাগজ ব্যবহার করতাম। 'বালির কাগজ' বলা হতো তার কারণ বাংলাদেশে বালি গ্রামে সর্বপ্রথম কাগজ তৈরীর কল বসে। পরে সে কল উঠে যায়। কাগজের

কলম বলে টিটাগড়ে। কিন্তু কাগজের নাম থেকে গেল 'বালির কাগজ'—যেমন বাড়ির উঠানেও 'বিলাতী বেগুন' আজাই। দাদা ডিমাই ও ফুলস্ক্যাপ কাগজ ব্যবহার ছিল বিলাস। একটু বড় হলে কলকাতার 'পাইওনিয়ার কোম্পানি'র এক্সাইজ বুক পেলায় লেখবার জন্ত।

লেখনী ছিল 'খাগের কলম'। খাগ যে কি তা এ কালের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে, শ্লেট পেন্সিলের মতোই অজ্ঞাত। 'খাগ' শরজাতীয় ঘাস, লালচে রঙের—না দেখলে বা না দেখালে বুঝানো কঠিন। এই 'খাগ' কেটে লেখনী বানিয়ে লিখতাম বাংলা 'হাতের লেখা'। মধ্যযুগে তালপাতার উপর এই খাগের কলম দিয়ে লেখা হতো। 'খাগের' পর কুইল (Quill) পেন-এ লেখা হয় সুরু। হাঁস ও ময়ূরের পালকের যে শক্ত অংশ পাখীর চামড়ায় আটকে থাকে—সেটাই কুইল। কত যত্ন করে বড়রা কুইল পেন্ কেটে দিতেন বাংলা লেখার জন্ত লাল কুইল,—ইংরেজি লেখার জন্ত সাদা কুইল। সেজো কাকার টুকিটাকি সংগ্রহের মধ্যে ছিল রজার্সের একটা চাকু বা ছুরি—সেটা দিয়ে অতি যত্নে পেন্সিল, কলম কেটে দিতেন।

কুইল পেন্ থেকে ষ্টীল পেনে একদিন উন্নীত হলাম। ষ্টীল পেন-এর মাথায় 'নিব্' লাগিয়ে লিখতে হয়। সেই নিব্ই কত রকমের—সবই বিলাতী। নিবের মধ্যে 'জি' (G) মার্কা ছিল সব থেকে সস্তা—পয়সায় ছয়টা! 'জে' (J) মার্কা নিব্ কালো কালো—ভোঁতা দেখতে—বাংলা লেখার সময়ে তার ব্যবহার হতো। পরে এলো ওয়েভারলি নিব্, বল্ পয়েন্টেড্ নিব্। আরও পরে 'রেড্ইঙ্ক নিব্'।

পেন্সিলকে বলতাম উড্পেন্সিল, লেড্পেন্সিল। মাঝে কোথা থেকে এলো কাগজ জড়ানো পেন্সিল কাগজ ঘুরিয়ে ছিঁড়লেই শিস্ বের হয়ে পড়তো। সবই বিদেশী। পেন্সিল, কলম, ইরেজার বা 'রবার' তৈরী হতো জারমেনী রাষ্ট্রের ব্যাভেরিয়া রাজ্যে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জার্মান যুদ্ধাপরাধীদের যে-নগরে বিচার হয়েছিল, সেই ন্যুরেন বার্গে পেন্সিল প্রভৃতির কারখানা ছিল। মোট কথা, ইংরেজি শিক্ষা থেকে ইংরেজি বা পাশ্চাত্য ভাবনা যেমন পেলাম, তেমনি পেলাম ব্রিটিশ প্রস্তুত দ্রব্যের প্রতি আকর্ষণ।

বিদেশী বা বিলাতী জিনিসের প্রতি কী আকর্ষণ ছিল, তার কাহিনী বলি। আমার ছোট বোন বীণার জন্ত দিদিমা পাঠিয়ে দিলেন একটা 'ফ্রক'—খুব কারুকার্য করা, অর্থাৎ সেযুগের রুচিসম্মত লেস্, ফ্রিল দেওয়া অত্যন্ত জবড়-জং। মেয়ের পোষাক যখন মাতৃস্থী দিলেন, তখন ছেলেদের পোষাক কিনে দিতে হয় বাধ্যতে। পত্র লিখলেন 'হোয়াইটওয়ে লেড্ল' নামে সাহেবদের দোকানে। সে দোকান উঠে গেছে স্বাধীনতা লাভের পরই। সে বাড়িতে অনেক অফিস—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ইনফরমেশন' কেন্দ্র, লাইব্রেরী প্রভৃতি। কয়েকদিন পরে এলো বিপুল ক্যাটালগ—মোটা বই একখানা। অনন্ত রকম পোষাক টুপি, ফ্রক, নেক-টাই-এর ছবি। ছিটের কাপড়ের নমুনা আঁটা—বেছে নাও পছন্দ মত। বাবা পছন্দ করে দুই ভায়ের জন্ত অর্ডার দিলেন 'সেলর স্যুট' বা নাবিকের পোষাক! কয়েকদিন পরে রেল পার্সেলে এলো একটা টিনের বাক্স। বাক্স কেটে বের হলো নাবিকদের পোষাক—প্যাণ্টালুন, গ্যালিস, কোট, রোজা টুপি। টুপিতে লেখা H. M. S অর্থাৎ হিজম্যাজিস্টেস শিপ্-এর আমরা নাবিক! দুই ভাই হাত ধরাধরি করে বের হই পথে—আমরা স্বতন্ত্র এই বোধ নিশ্চয়ই হয়েছিল সেদিন। কয়েক বৎসরের মধ্যে স্বদেশী আন্দোলনের কালবৈশাখীর হাওয়ায় এ সব উড়ে গেল—হলাম খালি পা, ধুতি পরলাম মালকোচা মেরে,—জনতার সঙ্গে বেল-কুয়ায় তফাত গেল ঘুচে। স্বাধীনতা লাভের পর আজ দেখছি ইংরেজিয়ানা বিদেশীয়ানা সহস্রগুণে ফিরে এসেছে দেশে। কর্তা মরেছে, কিন্তু কর্তার ভূত সে যে ঘাড়ে চেপে বসেছে!

জীবন-নাট্যের খণ্ড চিত্র

হাকিম বঙ্কিমচন্দ্রের একটি বিচার

অনাথ উপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র যে-সময়ে বারাসতে হাকিমী করছিলেন সেই সময় কিছুদিন বারাসতের একটি পল্লীতে ভীষণ চোরের উৎপাত হয়েছিল। প্রায় প্রতি রাত্রেই সেই পল্লীর কোন না কোন বাড়িতে চোর পড়ত, জিনিসপত্র চুরী যেতো। পাড়ার চৌকিদার কেবল লাঠি ঘুরিয়ে খুবই ছোটা ছুটি করত কিন্তু চোর কিছুতেই ধরা পড়ত না। অনেকেই মনে করত দূরের কোন গ্রাম থেকে একাধিক চোর দলবদ্ধ হয়ে এই গ্রামে হানা দিচ্ছে।

এমনি সময় একদিন সন্ধ্যার পর দেখা গেল এক প্রৌঢ় ব্যক্তি সেই পল্লীতে ঘোরাঘুরি করছে। যে তাকে দেখে সেই সন্দেহ করে। প্রৌঢ় ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় এসে দেখল, সামনের বাড়ির ভিতর দাওয়ায় বসে গৃহস্বামী তামাক খাচ্ছেন। প্রৌঢ় ভিতরে ঢুকে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তাকে দেখেই তো গৃহস্বামী রুখে উঠলেন—কে তুমি! কী চাও? হঠাৎ বাড়ির মধ্যে ঢুকলে কেন?

প্রৌঢ় ব্যক্তি তখন অশ্রুসজল কণ্ঠে তার বিপদের কথা জানাল। লোকটি ব্রাহ্মণ। নাম হরিদাস ভট্টাচার্য। নিবাস এখান থেকে প্রায় পাঁচ ক্রোশ দূরে বলভাঙা গাঁয়ে। কলকাতায় তার ছেলের অসুখের চিঠি পেয়ে ব্রাহ্মণ কলকাতার ট্রেন ধরবার জন্য এখানে এসে শুনেছে যে কলকাতার শেষ ট্রেন চলে গেছে। কাল ভোরের আগে আর গাড়ী নেই। ব্রাহ্মণ তাই রাতটুকু এখানেই কাটাতে চায়। ভোরেই সে চলে যাবে।

গৃহস্বামী প্রথমে তাকে খেদিয়েই দিচ্ছিলেন। তারপর তার চেহারা আর কথাবার্তা শুনে তাঁর মনে হল, বোধ হয় লোকটা চোরের দলের নয়। তিনি বললেন, এই পল্লীতে বড় চোরের উৎপাত বেড়েছে, তাই অচেনা লোককে আশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। তবে আপনার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে আপনি সে জাতের লোক নন। আপনি আমার এই বৈঠকখানায় রাত্রে থাকুন। কিছু খাবেন, ব্যবস্থা করব?

ব্রাহ্মণ সকাতরে বললে, আজ্ঞে না। আশ্রয় দিলেন, এতেই আমি কৃতার্থ। খাবার কোন রুচি নেই। ছেলের জন্যে আমার মন বড় ব্যাকুল হয়ে আছে।

গৃহস্বামী বললেন, আচ্ছা, আপনি তাহলে বৈঠকখানায় তক্তাপোষের উপর শুয়ে পড়ুন। দেখছি, আপনি খুব ক্লান্ত। আমি বাড়ীর ভিতর চল্লাম। রাতও বেশ হল।

এই বলে গৃহস্বামী উঠান পেরিয়ে বাড়ির মধ্যে চলে গেলেন। অন্ধকার ঘর। ব্রাহ্মণ কোন রকমে

তক্তাপোষে উঠে শুয়ে পড়ল। কিন্তু তার চোখে ঘুম নেই। ছেলের চিন্তায় তার মন ব্যাকুল করছে। কতক্ষণে সকাল হবে, কতক্ষণে প্রথম ট্রেন ধরে কলকাতায় পৌঁছে ছেলেকে দেখতে পাবে এই চিন্তায় তার মন আচ্ছন্ন।

রাত বাড়ল। ক্রমে রাত দুপুর পেরিয়ে গেল। এমন সময় ব্রাহ্মণ যেন শুনতে পেল উঠানে চুপ্ করে কী শব্দ হল। ব্রাহ্মণ তক্তাপোষের উপর উঠে বসে খোলা জানালা দিয়ে দেখল, উঠানে একটা লোক, বাড়ির অন্দর মহলে ঢোকবার চেষ্টা করছে, বোঝা গেল, বাড়ির একধারের নীচু পাচীল টপ্‌কে লোকটা উঠানে নামতে পেরেছে। তাহলে তো গৃহস্বামীর কথা মিথ্যা নয়! সত্যিই তো চোর।

[redacted]র ঘরে ব্রাহ্মণ তক্তাপোষ থেকে নেমে দাঁড়াল। তারপর কাপড়টা ভাল করে আটসাঁট করে পরে নিল। চোরটাকে ধরতে হবে। বয়স হলেও ব্রাহ্মণের দেহে শক্তি ছিল।

চোরটা ভিতর বাড়ির দরজা খোলবার চেষ্টা করছে এমন সময় ব্রাহ্মণ লাফ দিয়ে গিয়ে পিছন থেকে তাকে জাপটে ধরল এবং সঙ্গে সঙ্গে চোর চোর বলে চীৎকার করতে লাগল।

চোরটা প্রথমটা ভাবাচাকা খেয়ে গেল।

তারপর ফিসফিস করে বললে, এই চেঁচামেনি, ছেড়েদে, তোকেও ভাগ দেব। আমনের ঘরে অনেক বাসন আছে। মোটা টাকা পাওয়া যাবে। আঃ ছাড় বলছি। আচ্ছা, নাহয় দুটো টাকা দিচ্ছি তোকে, ছেড়ে দে, বাইরি, ভাল হবে না বলছি।

ব্রাহ্মণ যখন তার কথায় কর্ণপাত না করে আরও জোরে তাকে চেপে ধরে চেঁচাতে লাগল তখন চোরটাও উলটে দাঁড়িয়ে ব্রাহ্মণকে জড়িয়ে ধরে চোর চোর বলে চীৎকার জুড়ে দিল।

দুজনের মিলিত কণ্ঠের উচ্চ চীৎকারে গৃহস্বামী লাঠি হাতে বেরিয়ে এলেন। পাড়ার দুচারজন দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল। তিনি দরজা খুলে দিলেন। উঠানে লোক জড় হল। দেখা গেল, পাড়ার চৌকিদার কেষ্ট আর সেই ভিনদেশী ব্যক্তি দুজনে দুজনকে জাপটে ধরে চেঁচাচ্ছে।

লোকজন দেখেই দু'জনে দুজনকে ছেড়ে দিল। কেষ্ট তখন মহা আস্ফালন করে বললে—এতদিন বাদে চোরটাকে ধরলুম। ওঃ! ব্যাটা কী পাকা চোর! আমি চক্কোত্তি মশায়ের বাড়ীর পাশ দিয়ে যাচ্ছি এমন সময় ভিতরে শব্দ পেয়ে পাচীলের ওপর উঠে মুখ বাড়িয়ে দেখি এই লোকটা অন্দরের দরজা খোলবার চেষ্টা করছে। আমি তখন পাচীলে উঠে এক লাফে নেমে পড়ে লোকটাকে ধরে ফেললুম!

চৌকিদারের কথা শুনে ব্রাহ্মণ প্রথমটা বিমূঢ় হল তারপর সক্রোধে বললে, লোকটা মিছে কথা বলছে। আমি বৈঠকখানার শুয়ে ছিলুম, উনি আমার দরজা করে রাতটার মত আশ্রয় দিয়েছিলেন। আমি ঘুমুতে পারছিলুম না। জেগেছিলুম। এমন সময় দেখলুম, এই লোকটা পাচীল টপকে উঠোনে নেমে ভিতরে যাবার চেষ্টা করছে। আমি তখন ছুটে এসে লোকটাকে ধরলুম।

কিন্তু তার কথা বিশ্বাস করবে কে? পাড়ার চৌকিদার কেষ্ট! তার কথাই সত্যি। লোকটা পাকা চোর। বামুন সেজে এসেছে। মার বেটাকে!

না, না। মেরে কাজ নেই। থানায় নিয়ে যাও। বললেন গৃহস্বামী।

সেই ভাল। কেষ্ট চৌকিদার খুবই উত্তপ্ত হতে লাগল। তারপর সকলে মিলে ব্রাহ্মণকে থানায় দিয়ে এলো!

পরদিন সকালে বঙ্কিমচন্দ্রের এজলাসে প্রথমেই ব্রাহ্মণের মামলা উঠল। আসামীর কঠগড়ায়

তাকে এনে হাজির করানো হল। সরকারী উকিল মামলার বিবরণ দিলেন। তারপর চৌকিদার কেষ্ট মহা বিক্রমের সঙ্গে তার জবানবন্দী দিলে।

বঙ্কিমচন্দ্র এক দৃষ্টে ব্রাহ্মণকে দেখছিলেন। তাকে উদ্দেশ করে বললেন, তোমার কী বলবার আছে বল!

ব্রাহ্মণের চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সে তার ছেলের অসুখের কথা, তার বারাসতে এসে টীন কেনা করার কথা, চক্কোত্তি মশায়ের বাড়িতে তার আশ্রয় লাভের কথা এবং চোর ধরার কথা বিবৃত করল। তার বক্তব্য শেষ হলে সরকারী উকিল হেসে বললেন, ধর্মাবতার, এ লোকটা একজনের চোর নয়, জনজনান্তরের চোর! কী রকম সাধু সেজে বলছে দেখুন!

বঙ্কিমচন্দ্র কোন কথা বললেন না। কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, আচ্ছা, আজকের মতো আসামী হাজতে থাকুক। কাল আমি রায় দেব।

গোঁফে চাড়া দিয়ে কেষ্ট চৌকিদার বললে, চল্ ব্যাটা, হাজতে চল।

অন্যমনস্ক ভাবে বঙ্কিমচন্দ্র বাড়ি ফিরলেন। আরদালি বিশ্বম্ভর সঙ্গেই ছিল। তাকে বললেন, ফটিক চাঁদকে ডেকে নিয়ে আয়।

বঙ্কিমচন্দ্র এখানে আসবার পর এই পল্লীর বাউণ্ডুলে ছোকরা ফটিক চাঁদ তাঁর বড় ভক্ত হ'য়েছিল। লোকটি খুব গাঁজা খেতো। চেহারাটা ছিল চোয়াড়ে। আর সেই পাড়ায় থিয়েটার হলেই কাটা-সৈন্য সাজতো। বঙ্কিমচন্দ্র দু'একবার দেখেছিলেন, যুদ্ধে হেরে গিয়ে কাটা সৈন্য ফটিকচাঁদ মড়ার মতো: সারাক্ষণ স্টেজে পড়ে থাকতো।

ফটিকচাঁদ এলো, বঙ্কিমচন্দ্র বললেন, বস ফটিকচাঁদ। গুরুতর কথা আছে, বিশ্বম্ভর, তুইও বস।

তখন জেলার হাকিম, তাঁর আরদালি আর পাড়ার এক বাউণ্ডুলে ছোকরার মধ্যে কিছুক্ষণ ধরে কী একটা গলা পরামর্শ চলল।

পরদিন সকালে এজলাস বসল। গম্ভীর মুখে বঙ্কিমচন্দ্র এসে নিজের আসনে বসলেন। আসামীর কাঠগড়ায় ব্রাহ্মণ! ওদিকে সরকারী উকিল, কেষ্ট চৌকিদার এবং অনেক দর্শক।

ব্রাহ্মণের দিকে তাকিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বললেন, তুমি এখনো নিজের অপরাধ স্বীকার করছ না। বলছ, তুমি নির্দোষ? আর, এই চৌকিদার অপরাধী?

ব্রাহ্মণ কাঁদছিল। অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বললে—আমি তো সব কথাই বলেছি হুজুর।

শুধু বললেই তো হবে না! প্রমাণ তো চাই! চৌকিদার অনেকদিনের বিশ্বাসী লোক। তার কথা অবিশ্বাস করি কি করে?

সরকারী উকিল হাস্য করলেন। চৌকিদার কেষ্ট বিজয়ীর মতো গোঁপে চাড়া দিলে।

এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে আরদালি বিশ্বম্ভর এসে দাঁড়াল। তার চোখে মুখে ভয়ার্ত দৃষ্টি। সে ছিল ভোজনা। ভোতলাতে ভোতলাতে বলল—হুজুর! ফটিক বাবু খুন হ'য়েছেন।

তার কথা শুনে সারা আদালত কক্ষ যেন চমকে শিউরে উঠল!

বঙ্কিমচন্দ্র বললেন—সে কী! কোথায়?

বিশ্বম্ভর বললে—নালার ধারে পোলের তলায় তিনি মরে পড়ে আছেন। আমি ওই দিক দিয়ে আসছিলুম। দেখতে পেয়ে ছুটে আসছি।

আদালত কক্ষ বিস্ময়ে স্তম্ভিত। সারা ঘরে সূচীভেদ্য স্তব্ধতা। বঙ্কিমচন্দ্র বললেন—ঘটনাস্থল পরিদর্শন করার আগে, লাশ এখানে আনা হোক। বিশম্ভর, দু'জন তোম ঠিক কর। তাদের একটা খাটিয়া দাও। তারা লাশ আদালতে নিয়ে আসুক!

বিশম্ভর চলে যাচ্ছিল। তাকে ডেকে বঙ্কিমচন্দ্র বললেন, আচ্ছা এক কাজ কর। তোম ডাকবার দরকার নেই। এই আসামী আর চৌকিদার, এরা দু'জনে গিয়ে লাশ নিয়ে আসুক।

বিশম্ভর দুজনকে নিয়ে বেরিয়ে গেল, তাদের একটা খাটিয়া ধরিয়ে দিয়ে বললে, চৌকিদার জায়গাটা চেনে। আমার আর যাবার দরকার নেই। আমি বরং একটা চাদর লাশটার গায়ে ঢাকা দিয়ে আসি।

এই বলে বিশম্ভর ছুটে চলে গেল। খাটিয়া নিয়ে ব্রাহ্মণ আর চৌকিদার দাঁকো অভিমুখে চলল। জায়গাটা আদালত থেকে বেশ খানিকটা দূরে। দুজনে সেখানে গিয়ে দেখল, লাশটার অঙ্গে চাদর ঢাকা। আশে পাশে রক্তের দাগ।

চৌকিদার বললে, নাও হে তোল! হাকিমের হুকুম যখন হয়েছে তখন আর উপায় কি!

দুজনে কটিক চাঁদের মৃতদেহ খাটিয়ায় তুললো। কাঁদতে কাঁদতে ব্রাহ্মণ বললে, হায় ভগবান! শেষে এও অদৃষ্টে ছিল! মড়া বইতে হল।

রাস্তায় জনমানব ছিল না, সেদিকটায় কোন বসতি নেই। পথে যেতে যেতে চৌকিদার কেষ্ট বললে, তখনই বলেছিলুম, ছেড়ে দে, ভাগ পাবি। নাহয় দু'টো টাকা নে! তা আমার কথা শোনা হল না। এখন বোঝ! ঘানি ঠেল গে!

ব্রাহ্মণ নীরবে অশ্রু বিসর্জন করতে করতে চলল। কেষ্ট বললে, আরে বাবা। আমি হুজুর এ গাঁয়ের চৌকিদার। দশ বছর আছি! কত বাড়ির কত জিনিষ সাফ করলুম। শেষকালে তুই বামুন কোথা থেকে এসে আমায় ধরলি। যেমন আমার কথা শুনলি না, তেমনি এখন বোঝ।

মড়া নিয়ে তারা আদালতে এলো। বঙ্কিমচন্দ্র বললেন, খাটিয়া এইখানে আমার সামনে এনে রাখ, তারপর যে যার জায়গায় যাও।

কিছুক্ষণ পরে ব্রাহ্মণের দিকে চেয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বললেন, আসামী, তোমার স্বপক্ষে কোন সাক্ষী আছে?

ব্রাহ্মণ বললে, সাক্ষী কোথায় পাব, হুজুর! সাক্ষী আমার একমাত্র ভগবান।

হাসলেন বঙ্কিমচন্দ্র, তিনি তো আর তোমার হয়ে সাক্ষী দিতে আসবেন না! তাহলে উপায়? তোমার তো সাজা দিতেই হবে! কোন প্রমাণ তো তুমি দিতে পারছো না।

এমন সময় এক আশ্চর্য ভৌতিক কাণ্ড! খাটিয়ার উপর থেকে চাদর মোড়া লাশ বলে উঠল—প্রমাণ আছে হুজুর! বামুনের স্বপক্ষে প্রমাণ আছে।

বলতে বলতে খাটিয়ার উপর উঠে বসল কটিকচাঁদ। তাই না দেখে, লোকজনের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল! ভূত! ভূত!

কটিকচাঁদ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, পালাবেন না কেউ। আমি ভূত নই। মড়া সেজে পড়েছিলাম। ধর্মাবতারের হুকুমেই এই কাজ করেছি। তাহলে বলি হুজুর।

বঙ্কিমচন্দ্র বললেন, বল কটিকচাঁদ। আমাদের কাজ কি সফল হয়েছে?

হয়েছে বৈকি হুজুর! এই বলে কটিকটাহ, তাকে বহন করে আনবার সময় কেই চৌকিদার যা বলেছিল, ব্রাহ্মণ যা বলেছিল, সব কথা হুবহু পুনরাবৃত্তি করল।

প্রচণ্ড বিস্ময়ে আদালত যেন নিস্পন্দ! সরকারী উকিলের মুখ চুন। চৌকিদার কেষ্ট ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। আর ব্রাহ্মণ হাপুস নয়নে কাঁদছে আর বলছে, ভগবান আছেন, স্বয়ং ভগবান আমার সামনে বসে আছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আপনি স্থির হোন! আমি এখনি আপনার কলকাতা যাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আপনাকে দু'দিন হাজতে থেকে কষ্ট পেতে হয়েছে, তাতে আমি অত্যন্ত মর্ম বেদনা বোধ করেছি। যাই হোক, আমি যে মতলব এঁটেছিলাম আপনার নির্দোষিতা প্রমাণ করার জন্যে, তা যে সফল হয়েছে সেজন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ; উকিল মশায়, এইবার কেষ্ট চৌকিদারের বিরুদ্ধে মামলাটা সাজিয়ে ফেলুন। বিশ্বম্ভর, এদিক এসো। ভট্টাচার্য্য মশায়কে সঙ্গে করে কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে এসো। তাঁর ছেলে নিশ্চয়ই ভাল হয়ে উঠেছে। সে খবরটা আমায় এনে দাও।

এই বলে পকেট থেকে পাঁচখানা দশটাকার নোট বার করে বিশ্বম্ভরের হাতে দিয়ে ব্রাহ্মণকে বললেন, আপনার পথ-খরচা স্বরূপ দিলাম। দিতে দ্বিধা করবেন না।

সেদিন সন্ধ্যায় বিশ্বম্ভর কলকাতা থেকে ফিরে এসে বঙ্কিমচন্দ্রকে জানালো, ব্রাহ্মণ ছেলের কাছে পৌঁছেছেন এবং তাঁর ছেলে ভাল আছে!

শুনে বঙ্কিমচন্দ্র বললেন, বিশ্বম্ভর, আমার এতদিনের হাকিমী করা আজ বুঝি সার্থক হল।

• • • •

ইতিহাসের বিচার

যারা মূর্খ, তারা হবে তোমার বিচারক···ঘাড় পেতে নিতে হবে তাদেরই বিচার!
কিন্তু আমি জানি, ওগো মহাসঙ্গীতের অন্তরাত্মা, আমি জানি তোমার বীণায় নিত্য ঝংকৃত হচ্ছে যা সত্য তারই সুর। আজও তুমি বলেছ অপকট এক সত্যই···তবু তোমাকে গ্রহণ করতে হবে, যারা মূর্খ তাদের বিচার, তোমাকে সহ্য করতে হবে জনতার উপহাস। যাদেরই তন্ত্রীতে ধ্বনিত হয়েছে মহাসঙ্গীত, তাদেরই নিতে হয়েছে, হয় মূর্খতার হাতে রাজদণ্ড, না হয় জনতার উপহাস···

যখন ফিরে চাই

প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত

খুলনায় বরিশালগামী স্টেশন ষ্টীমার ছেড়ে যখন পাটগাতি পৌঁছালাম তখন দুপুর বারোটা। ষ্টীমারেই স্নান আহার সেরে নিয়েছি; নৌকোয় উঠে ছোট্ট বিছানাটি পেতে দিব্যি শুয়ে পড়লাম। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল নেই। জেগে হাতঘড়িতে দেখলাম চারটা বেজেছে। শরতের অপরাহ্ণ; পড়ন্ত রোদে বাইরে এসে দেখলাম বিলের ভিতর দিয়ে সারি সারি নৌকো চলছে—এক, দুই, তিন—অন্তত দশবারখানা। আজ ষষ্ঠী, পুজোর ছুটিতে আমার মতো চাকরিজীবীরা দেশে ফিরছেন, কেউ একক, কেউ সপরিবারে। বেশীর ভাগ এসেছেন কলিকাতা থেকে; যাবেন কেউ কোটালিপাড়া ও আশপাশের গ্রামে, কেউ বা সৈলা-ফুরস্ত্রি। পথের ক্লান্তি এঁদের মনের আনন্দ ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি। আমার মতো যাঁরা বাইরে দাঁড়িয়ে সবারই মুখ খুশিতে ভরা। প্রায় নৌকোতেই ছোটদের কলরব; তারই মাঝে শোনা যায় কচি শিশুর কান্না—নৌকোর বন্দীজীবন এদের ভালো লাগছে না। চোখে পড়ল বছর দশের এক ডানপিটে ছেলের কাণ্ড—ছেলেটা বাইরে এসে ঝুঁকে পড়ে জলের ভিতর হাত বাড়িয়ে দিয়েছে—ভয়-ডর নেই, বড়দের নিষেধ শুনছে না।

বিলের ভিতর ফুটে রয়েছে অজস্র শালুক ফুল। কোথাও ছোট ছোট মাছের ঝাঁক। নিঃসঙ্গ একটি গাছ চারিদিকের জলের মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, সব চেয়ে উঁচু ডালে একটি মাত্র বক, যেন ধ্যানমগ্ন ঋষি। দূরে একটা পুলের শুধু মাঝখানটা দেখা যায়, বাকী অংশটা আর দু'ধারের রাস্তা জলের তলে।

ঘড়িতে পাঁচটা। জল-ঘেঁষা এক সেতুর বাড়ীর পাশ দিয়ে নৌকো চলছে। পুলারগুপে প্রতিমা দেখা যায়। ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে নতুন জামা-কাপড় পরে ছুটোছুটি করছে। দুটো ছেলে ঢাকের কাঠি নিয়ে নিজেরাই ঢাক পিটুচ্ছে। এক পাশে একজন প্রৌঢ়া দাঁড়িয়ে, কোলে ছোট্ট শিশু হয়ত নাতি বা নাত্‌নি।

সাড়ে ছয়টা। অদূরে সারি সারি নৌকো বাঁধা। জল-ঘেঁষে সারি সারি ছোট ঘর। কেরোসিনের আলো জ্বলছে। লোকজনের হৈ-চৈ শোনা যায়।

"পয়সায় হাটখোলা, কয়ডা। আইজ হাটবার; আখছেন না মাইনষের ভীড়। পুজার বাজার করতে আইছে।—দুকইর খনে চইর গুডাইছি, নাও ভিড়াইয়া এক ছিলিম তামাক খাইয়া লই।"

মাঝির ঘুড়ি যেন মিলায়। সত্যিই ত, আমি চলেছি মনের আনন্দে প্রিয়জনের দর্শনাকাঙ্ক্ষায়, আর ও চেচোয়া এসেছে পুজার দিনে প্রিয়জনকে ছেড়ে দু'পয়সা রোজগারের প্রত্যাশায়। মাঝি তামাক খেল; আমিও সঙ্গে যা খাবার ছিল নিজে খেলাম, মাঝিকে দিলাম।

একটু ঘুমিয়ে নিয়েছি। জেগে উঠলাম রাত সাড়ে দশটায়। সামনে হস্তাদোটির ঠাকুরবাড়ী। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা বেশী দূরে নয়; রাস্তার পাশে খাল, গিয়েছে সৈলা-ফুরশ্রী ছাড়িয়ে শিকারপুর পর্যন্ত। হিসেব করে দেখলাম বাড়ী পৌঁছাতে একটা দেড়টা বেজে যাবে।

ছেলেমেয়েরা এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। মা ঘুম-কাতর, তিনিও নিশ্চয় ঘুমিয়েছেন। কিন্তু ঘুমোন নি বাবা আর দিদি। ঘুমোন নি আরও একজন যিনি ঘুমের ভাণ করে দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা একটি পরিচিত কণ্ঠস্বরের প্রতীক্ষায় থাকবেন।

দিদির কথা ভাবতেই মনটা কেমন হয়ে যায়। দিদি নিঃসন্তান, বালবিধবা। আমার জন্মের পূর্বেই বিয়ে হয় নয়-দশ বছর বয়সে, আর তার অল্পদিন পরেই শাঁখা-সিঁদুর ঘুচিয়ে ফিরে আসেন মা বাবার কাছে। তাঁর বুকভরা মাতৃত্বের সঞ্চিত ভালোবাসা নিঃশেষে উপভোগ করেছি আমরা ছোট ভাই বোনেরা, আমরা যার চেয়ে দিদিকে বেশী চিনেছি; দিদির কাছেই আমাদের যত কিছু আবদার।

কখন যে রাস্তার পাশে পড়েছি খেয়াল করিনি। হঠাৎ পথচারীর হাসি তামাশার শব্দে চমক ভাঙল! এরা হয়ত কোথাও আড্ডা দিয়ে বা ঠাকুর দেখে বেশী রাত্রে ঘরে ফিরছে। পল্লীবাংলার এরা এক বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রতীক, যারা কাজ করে কম, আড্ডা দেয় বেশী, ঝগড়া দলাদলি করে, আবার পাড়া-পড়শীর আপদে বিপদে এগিয়ে আসে সবার আগে।

নৌকো চলছে রাস্তার খাল বেয়ে। মাঝি মাঝে মাঝেই হাঁকছে, "আপন ভাইন, মিঞা বা মশায়।"

"আর কতদূর, মাঝি ভাই?"

"আগইলবাড়া আইছি কত্তা।"

আগইলবাড়া!' জেগাই হালদারের 'আগইলবাড়া'! জেগাই জাতিতে নমঃশূদ্র, নিরক্ষর। গৌরবর্ণ নিটোল দেহ। ছেলেবেলা দেখেছি জেগাই যখন আদুড়গায়ে কোঁচার কাপড় কষে কোমরে বেঁধে রাস্তায় বেরুত, রাজ্যের ছেলে 'হরিবোল' বলতে বলতে তাঁর পেছু নিত, আর জেগাই দু'কানে আঙুল দিয়ে ছুটতে থাকত। জেগাই যত ছোটে, ছেলেদের আস্কারা তত বাড়ে। ভাবতাম, পাগল। একদিন দেখি আমাদের গরুর বাবা ও আঠারমশাই-এর সামনে একখানা টুলে বসে আছে জেগাই। জেগাই বলছে, "মোরে গ্যাপাইতে যাইয়া পোলাপানেরা যদি হরির নাম লয়, ওরগো ভালই হইবে।" সেদিন জেগাইকে নোতুন চোখে দেখলাম।

কিন্তু তাঁর পূর্ণ পরিচয় পেলাম আরও কিছুদিন পরে। গ্রামের লোক অশিক্ষিত, শিক্ষার সুযোগ নেই। লেখাপড়া করতে হলে ছেলেদের যেতে হয় বেশ কয়েক মাইল ঘুরে সৈলা স্কুলে। জেগাই নিজে নিঃসন্তান, সঙ্কল্প করল গ্রামের ছেলেদের শিক্ষার সুযোগ করে দিতে হবে। বেরুল ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দোরে দোরে। সাড়া পেল আশাতীত। জেগাই-এর নিজের জমিতে গ্রামবাসীদের সাহায্যে স্কুলের জন্য চালাঘর তৈরী হল, কিছু আসবাবপত্রও যোগাড় হল। আশপাশের গ্রাম থেকে জনকতক আদর্শবাদী শিক্ষিত যুবক এগিয়ে এলেন। এঁরা হলেন শিক্ষক; ছাত্রের অভাব হল না। অনাড়ম্বর পরিবেশে জেগাই-এর স্কুল খুলল। ছোট স্কুল আজ বড় হয়েছে, সরকার থেকে সাহায্য পায়।

চাঁদ ডুবেছে, কিন্তু অন্ধকার পাতলা। বাইরে এসে দাঁড়ালাম। ঝির ঝির হাওয়া বইছে। দু'ধারের ঝোপের ভিতর থেকে ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে 'ঝিঁ ঝিঁ'। কোথাও জোপ আলো করে জ্বলছে জোনাকির দল, যেন দীপান্বিতার আলোকসজ্জা। সব মিলে এক মোহময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। মনে মনে প্রণাম জানালাম পল্লীজননীকে।

বাঁ'দিকে সৈলা ফুল ঘর দেখা যাচ্ছে, পাশের লক পাল গিয়েছে বাজার পর্যন্ত।

"ভাইনে, মাঝি ভাই।"

"আজ্ঞা করতা, বল্লীবাড়ী চিনি না! কত চরদার লইয়া লইয়া গেছি। আপনাগো ও উত্তরের আউলি—দিঘির কোণাকুণি নাও ভিড়াম্।"

বাঁকের মুখে পরিচিত কাউগাছটা। ফাল্গুন-চৈতে যখন এর ডালের ভিতর দিয়ে সোঁ সোঁ বাতাস বইত, ছেলেবেলা এর পাশ দিয়ে যেতে গা ছমছম্ করত।

জোড়া পুলের বাঁদিকের পুলের ভিতর দিয়ে নৌকো যখন লক খালে ঢুকল তাড়াতাড়ি বিছানাটা বেঁধে নিলাম। দিঘির ঘাটে নৌকো ভিড়াতেই মাঝির মাথায় মোট তুলে নেমে পড়লাম।

সহরের প্রশস্ত চত্বরের দু'পাশে দু'খানা পূজামণ্ডপ—পূজার কত ধুমধড়াক্কা! কিন্তু আজ যে উৎসবের কোন চিহ্নই নেই। মণ্ডপ জরাজীর্ণ, প্রতিমা নেই, নেই কোন মানুষের সাড়া। কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করলাম।

বাড়ীর ভিতর যাবার রাস্তা জঙ্গলে ভরা, যেন কত যুগ কেউ সে পথ মাড়ায় নি। কোন রকমে ঘরের কাছে পৌঁছে ডাকলাম, "দিদি!" কোন সাড়া পেলাম না। নীরব নিঝুম পুরী। মনে হল সহসা যেন কোন্ এক অভিশপ্ত প্রেতপুরীতে এসে পৌঁছেছি। নিঃশ্বাস আটকে আসছে। চীৎকার করে ডাকতে চেষ্টা করলাম, "দিদি!" কে যেন গলা চেপে ধরল; মুখ থেকে বেরুল একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ।

পিয়া ফেরা দু'বোনের হাসিতে চমকে চোখ মেলে দেখি এক ঝলি প্রভাতী রোদ জানালা গলিয়ে ঘরের ভিতর এসে পড়েছে; কলোনির সার্বজনীন পূজামণ্ডপ থেকে ভেসে আসছে সানাই-এ আগমনীর সুর। পিয়া হেসে বলল, "বাব্বা, জামাতাই-এর কী ঘুম! ঠাকুর দেখতে যাবে চল। কাল কথা দিয়েছ, মনে নেই?"

দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে বললাম, "চল—মুখ হাত ধুয়ে নি।"

কবেকার সে মধুর দিনগুলি,—শরতের পাতলা মেঘের আবরণে ঢাকা।

* * * *

সোলার পুতুল

পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে সোলা ও বাঁশের বাঁখারি সহযোগে এক প্রকার বানর পুতুলের দেখা পাওয়া যায়। এই পুতুলগুলির বৈশিষ্ট্য হ'ল, বাঁশের বাঁখারির সঙ্গে এগুলি এমন ভাবে যুক্ত করা থাকে যে, বাঁখারির একটি বিশেষ অংশে একটু চাপ দিলেই বাঁদরটি লাফাতে থাকে। এ পুতুলগুলি ছোট ছেলেদের খুবই প্রিয়, তাই বহু প্রচলিত। ঢাকা, ময়মনসিং ও পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই সোলার তৈরী গাঁড়ে বসা ময়না ও টিয়া বা কাকাতুয়া জাতীয় সোলার পুতুল প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়।

আবার সেই জেল

দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

[দশ]

খুব ভোরে বন্দীদের ওয়ার্ডগুলির তালা খোলবার সঙ্গে সঙ্গে যেসব সিপাইয়ের ডিউটি সুরু হয়ে যায়, একটানা ডিউটি দিয়ে তারা ছাড়া পায় বেলা বারোটায়। আবার বারোটা থেকে যাদের ডিউটি পড়ে, তারা ছাড়া পায় সূর্যাস্তের এক ঘণ্টার মধ্যে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে বন্দীদের লকআপ করবার পর। এদের সবাইকেই রাত্রে আবার ডিউটি দিতে হয় দু ঘণ্টা করে। বেলা বারোটার ডিউটি শেষ হবার ঘণ্টা বাজানো হয় পনেরো মিনিট আগে। ঘণ্টা শুনেই সিপাইরা যাবে ও কোয়ার্টার্স থেকে এসে ফল্-ইন করে যেন গেটের বাইরে। পরণে পুরো ইউনিফরম, হাতে বেটন। প্রথম করা হয় রোলকল, তারপর করা হয় তাদের দেহতল্লাসী। যাতে নিষিদ্ধ কোন দ্রব্য তারা লুকিয়ে ভেতরে না নিয়ে যেতে পারে। তারপর জমাদারের নেতৃত্বে তারা মার্চ্চ করে জেলের মধ্যে ঢুকে যায় যার ডিউটি পোষ্টে চলে যায়।

সিপাই বদল করবারও নিয়ম আছে। যার ডিউটি শেষ হল, রিলিফ সিপাই না আসা পর্য্যন্ত তাকে ডিউটি পোষ্টে থাকতেই হবে। জমাদার নিয়ে যাবে রিলিফ সিপাইকে, তারই উপস্থিতিতে একজন আরেক জনকে চার্জ বুঝিয়ে দেবে। চার্জ বুঝিয়ে দেবার পরই যে সে গারদে বা কোয়ার্টার্সে চলে যাবে, তা হবে না। সব সিপাইকে এসে গেটে ফল্ইন করতে হবে। আবার হবে দেহতল্লাসী। যাতে কোন নিষিদ্ধ দ্রব্য তারা লুকিয়ে বাইরে না নিয়ে যেতে পারে। তারপর গেট খোলা হবে, জমাদারের নেতৃত্বে তারা বাইরে চলে যাবে।

জেলের মেন গেট পর পর দুটি। দুটি অতিক্রম করে ভেতরে যাওয়া যায়। প্রথম গেটটি লোহার শিকের। ফলে, গেটের দিকে কেউ এলে দেখা যায়। দ্বিতীয় গেটটি মোটা কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরী। ফলে, জেলের অভ্যন্তর দেখা যায় না। এই গেটের তক্তায় মানুষ-সমান উঁচু একটি গোলাকার ফুটো আছে, গেটের ভেতর দিক থেকে চাকনা লাগানো। গেটের সিপাই গেটটি খোলবার আগে দেখে নেয় কে বাইরে আসতে চাইছে।

খবর আগেই পেয়েছিলাম যে, বেলা বারোটার পনেরো মিনিট আগে ঘণ্টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই কোন কোন সিপাই রিলিভড্ হবার আগেই ডিউটি পোষ্ট ছেড়ে কাঠের গেটের বাইরে এসে পড়ে। এটা মারাত্মক কর্ত্তব্যে গাফিলতি। একদিন পৌনে বারোটায় ঘণ্টা বাজবার দু চার মিনিট পর অকস্মাৎ আমি দ্বিতীয় গেটটি খুলিয়ে ফেললাম। ভেতরে ঢুকেই দেখি, অনেকগুলি সিপাই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবার আগ্রহাতিশয্যে

ডিউটি-পোষ্ট ছেড়ে চলে এসেছে। পালে বাঘ পড়ায় রাখাল বালকের মুখের চেহারা যেমন হয়েছিল, দেখলাম, এদের মুখেচোখে তেমনি আতঙ্কের ছাপ!

সবার নামে রিপোর্ট করে দিলাম। সুপারিনটেনডেণ্ট ডাক্তার মজুমদার শাস্তি দিলেন।

নিয়ম হচ্ছে, কাজ চলবার সময় এম ডি-র প্রত্যেকটি চালি তালাবন্ধ করে রাখতে হবে। চাবি থাকবে প্রহরারত সিপাইয়ের কাছে। কর্মরত বন্দীদের সাধারণতঃ বাইরে আসা নিষিদ্ধ, বাইরের কোন বন্দীকেও তখন চালির ভেতর ঢুকতে দেওয়া হয় না। তবুও যদি কোনো বিশেষ কারণে কোন বন্দীর বাইরে যাবার প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে একা ছেড়ে দেয়া হয় না, সঙ্গে যায় বন্দী 'পাহারা।' বন্দীদের মধ্যে যাদের মতিগতি ভাল দেখা গেছে, যারা বুদ্ধিমান ও কর্মদক্ষ এবং সামান্য লেখাপড়া জানে, জেলারের সুপারিশক্রমে তাদের মধ্যে থেকে 'পাহারা' নিয়োগ করেন সুপারিনটেনডেণ্ট। দিনের বেলায় কর্মরত বন্দীদের এবং রাত্রিকালে একই ওয়ার্ডের মধ্যে থেকে নিযুক্ত বন্দীদের পাহারা দিয়ে তারা ডিউটি সিপাইকে সাহায্য করে। বন্দীরা এদের কর্তৃত্ব মানতে বাধ্য, না মানলে সাজা পায়।

আমার প্রতিদিনকার রাউণ্ডের সময় চালির বাইরে প্রহরারত সিপাইকে যদি জিজ্ঞেস করি, তুমারা আসামী সব চালিমে হ্যায়? অমনি সে তাসুট করে জবাব দেয়, ঠিক হ্যায় হুজৌর। প্রত্যেকটি চালির বাইরে একটি ছোট কালো রংয়ের বোর্ড লাগানো আছে। প্রতিদিন সকালবেলা ওভারসিয়ার চক দিয়ে তাতে লিখে রাখেন, কতজন বন্দী ঐ চালিতে কাজ করছে। সব চাইতে বেশী সংখ্যক বন্দী কাজ করে তাঁত চালিতে।

একদিন সহসাবলে তাঁত চালিতে ঢুকেই প্রহরারত সিপাইকে হুকুম দিলাম, দরজা বন্ধ করে দাও, কাউকে যেতে আসতে দেবে না। জমাদারকে হুকুম দিলাম, আসামীদের গুনতি কর।

সব বন্দীকে কাইল করে বসানো হল। তারপর হাজিরা খাতা দেখে নাম ডাকা হল। দেখা গেল পঞ্চান্ন জনের মধ্যে সাতজন কম।

প্রশ্ন করলাম, কোথায় গেছে ওরা?

সাধারণতঃ যা হয়, সিপাই সাফাই গাইবার চেষ্টা করল, অপিসমে গিয়া হুজৌর।

তখন সাফাইতে ভোলবার লোক আমি নই। তাই আমার অডারলি সিপাই লালমণিকে অফিসে পাঠালাম আর আমি ওখানেই অপেক্ষা করতে লাগলাম।

লালমণি খোঁজ নিয়ে এসে জানাল যে, বীরেন দত্ত আর আবদুলকে জেলার বাবুর অফিসে পাওয়া গেছে, তিনি তাদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন, পাহারা পাঁচকড়ি তাদের নিয়ে গেছে।

সিপাইকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি যে বললে সাতজনই অফিসে গেছে, কোথায়, আর চারজন কোথায়?

কি আর জবাব দেবে সে? কি জবাব আছে তার? অপরাধীর মত মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। চালির বাইরে গেলেও জেলের বাইরে যাবার উপায় নেই জানি, কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছে, সিপাই খাতির করে বিনা পাহারায় ওদের ছেড়ে দিয়েছে। একে ডিউটির গাফিলতি ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? সুতরাং সিপাইটির বিরুদ্ধে রিপোর্ট করে দিলাম। ফলে, তার সাজা হয়ে গেল।

সেই সিপাইয়ের একখানা রেজিষ্টারের কথা আগেই বলেছি। কখন কে জেলের মধ্যে গেলেন, কখন কে বেরিয়ে এলেন, এই রেজিষ্টারে সেই সিপাই তাঁর নাম, নাম না জানতে পারলে তাঁর পদবী ও সময় লিখে রাখে। এ ছাড়া আরও একখানা রেজিষ্টার থাকে তার হেফাজতে। ঠিকাদারেরা যে সব দ্রব্য সরবরাহ করে, সরবরাহের সময় ও দ্রব্যের পরিমাণ সে তাতে লিখে রাখে। এম ডি-তে সাধারণের জন্য কোনো

জিনিস এলে, সময় ও তারিখ উল্লেখ করে সেই জিনিসের বিবরণ ওতে লেখা হয়। সারাই হয়ে বেরিয়ে যাবার সময়ও তাই। অর্ডার দেয়া কোনো জিনিস বেরিয়ে যাবার সময়ও ওতে তার পূর্ণ বিবরণ এবং মূল্যাবধ করে নেয়া হল, [redacted] রেজিষ্টারে লেখা হয়। একটি উঁচু ডেস্ক-টেবিল, সিপাই তার ওপর রেজিষ্টার রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লেখে। ডেস্ক-এর নীচের দিকটা কাঠের তক্তা দিয়ে ঢাকা আলমারীর মত, তার দরজাটা দেয়ালের দিকে। দরজায় অবশ্য কোন পাট নেই। সিপাই ওর মধ্যে খাতাপত্র ও টুকিটাকি জিনিস রাখে।

গোপন সূত্রে খবর পাওয়া গেল, মাছ ও মাংসের ঠিকাদাররা গেটে ওগুলো ওজন করে জেলের চাহিদামত সরবরাহ করবার পর কিছু মাছ ও মাংস গেটের সিপাইদের উপঢৌকন দেয় আর তা লুকিয়ে রাখা হয় ঐ ডেস্ক-আলমারীর মধ্যে। বেলা বারোটায় ডিউটি শেষে চলে যাবার সময় সিপাই ওগুলো বাড়ীতে বা কোয়ার্টারে নিয়ে যায়।

মাছ মাংসের ঠিকাদাররা চলে যাবার পর অকস্মাৎ একদিন আমি অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম। গেট সিপাইয়ের কাছে আসতেই সে স্যালুট করল। বললাম, তোমার ডেস্কটা ভাল কাঠ দিয়ে তৈরী করে বানিশ করিয়ে নেবে। বাইরের কত লোক আসে, এসেই দেখে একটা বিশ্রি ভাঙ্গি-মারা প্যাকিং কাঠের ডেস্ক, পলিশ নেই, বানিশ নেই।

উৎসাহিত হয়ে উঠল সিপাই, খুব ভাল হয় হুজৌর—

কিন্তু যা আছে, তারও পাট নেই কেন? বলতে বলতে দেয়ালের দিকে সরে গেলাম, এত সব দরকারী রেজিষ্টার এর মধ্যে থাকে, অথচ তালা দেবার উপায় নেই—বলতে বলতে নীচু হয়ে দেখলাম একটা মোটা কাগজের মোড়ক, লালমণিকে বললাম, দেখত লালমণি, এটা কি?

লালমণি মোড়কটা টেনে বার করল, বেরিয়ে পড়ল খুলট খাসীর একখানা ঠ্যাং! সিপাইয়ের দিকে চাইতেই আবার সেই সাফাই শোনা গেল, হুজৌর, ওটা ঠিকাদার রাখিয়ে গেল, বলল পরে আসিয়ে নিয়ে যাবে।

বাজে কথা। সিপাইয়ের নামে তৎক্ষণাৎ রিপোর্ট করে দিলাম। শাস্তি হয়ে গেল।

হসপিটাল জেলটার পূব দিকের দেয়ালে আছে ইজেকশন ট্রাক বেরিয়ে যাবার পথ। দুর্গের দেয়ালে ক্ষুদ্র গুপ্ত দ্বারের মত। লোহার পাটওয়ালা দরজার মধ্য দিয়ে জেলের ভেতর থেকে বাইরে পাতা সরু লোহার লাইন, ছোট্ট গেজ রেল লাইনের মত। চারখানি চাকাওয়ালা লোহার একটি ফ্ল্যাট প্লাটফরম এই লাইনের ওপর বসানো। প্রতিদিন জেলের অসংখ্য খাটা পায়খানার ময়লা ড্রামে ভর্তি করে ড্রামগুলো ঐ প্লাটফর্মের ওপর বসিয়ে দেওয়া হয়, তারপর ভেতর দিকের মেথর বন্দীরা ট্রাকটিকে লাইনের ওপর দিয়ে ঠেলে দিলে ওটা জেলের বাইরে চলে যায়। সেখানেও সিপাই প্রহরায় অপেক্ষা করে একদল মেথর বন্দী। তারা ড্রামের ময়লা কাছেই প্রকাণ্ড গর্তের মধ্যে ফেলে দিয়ে খালি ড্রামগুলো আবার ট্রাকের ওপর বসিয়ে ট্রাক ঠেলে ভেতরে পাঠিয়ে দেয়। এমনি রোজ চার পাঁচ বার যাতায়াতে তবে রোজকার ময়লা পরিষ্কার করা সম্ভব হয়। ময়লাভর্তি ড্রাম যেন গেট দিয়ে বার করা শোভন নয়, স্বাস্থ্যপ্রদও নয়।

বাংলা দেশের সব জেলেই কিন্তু এমনি ইজেকশন ট্রাকের ব্যবস্থা নেই।

খবর পেলাম, ইজেকশন ট্রাকে ড্রামের সঙ্গে সঙ্গে জেলের ভেতরের অনেক জিনিস বাইরে পাচার হয়ে যায়। লক্ষ্য করলাম যে, ট্রাক প্রতিদিন চালু করা হয় বেলা দুটো থেকে তিনটের মধ্যে, যখন আমরা সবাই সকালের অফিস সেরে বেলা বারোটায় বাড়ী চলে গেছি এবং ফিরে আসব সেই বিকেল চারটেতে। সকালবেলাতেই ড্রামগুলো ভর্তি করা হয়, অথচ এমনি বেয়াড়া সময় বাইরে পাঠানো হয় কেন?

একদিন বেলা ঠিক আড়াইটের সময় গিয়ে হাজির হলাম ইস্টেকশন ট্রাকের কাছে। দেখলাম, ভেতরের একজন সিপাইয়ের অধীনে একদল বেঘর বন্দী কাজ করছে। ট্রাকের ওপর ছাদগুলোর পাশে পোটা দুই বাদভর্ত্তি বস্তা।

বস্তা কেন?

এগিয়ে এল সিপাই। এমনি অনমনে অপ্রত্যাশিতভাবে আমায় দেখতে পেয়ে ঘাবড়ে গেছে মনে হল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তমাত্র! তারপরই সেই দাকাই, হুজুর, আমার দুটো ছাগল আছে, তাদের জন্য ঘাস কেটেছি। এত বড় বস্তা যেন গেট দিয়ে নিয়ে যাওয়া হুজুর খুব কঠকর। আর একবারে এক বস্তার বেশী পারা যাবে না। তাই ভাবলাম এই ট্রাকেই উঠিয়ে দিই –

বাধা দিলাম, তুমি যদি বস্তার মধ্যে করে কিছু নিয়ে যাও? যেন গেট দিয়ে গেলে সেখানে তল্লাসী হবে। আর এখানে?

না হুজুর, ঘাসের মধ্যে আর কি থাকবে হুজুর—

লালমণিকে হুকুম দিলাম, সে বস্তা দুটো নামিয়ে বন্দীদের দিয়ে সমস্ত ঘাস বার করে ফেলতে দেখা গেল, একটাতে থলিভর্ত্তি চাল ও আটা, আরেকটাতে চিনি ও ডাল। থলিগুলোর মুখ শক্ত করে বাঁধা।

সিপাইটির নামে রিপোর্ট করে দিলাম।

একদিন দেখলাম, একজন সিপাই বন্দীদের সঙ্গে বসে তাস খেলছে। হাতেনাতে ধরে ফেললাম এবং রিপোর্ট করে দিলাম।

আর একদিন দেখলাম, ডিউটি পোষ্টের রোদে না থেকে গাছের ছায়ায় এসে একজন সিপাই খেয়াল চেঁস দিয়ে বসে দিব্যি বিশ্রামসুখ। খাকি ক্যাপ ও বেটন পাশেই রয়েছে। লালমণি ও দুটো আগে তুলে নিয়ে এল, তারপর ডেকে তুলল ওকে। সম্মুখে যেন কৃতান্ত দেখতে পেয়েছে, এমনি আতঙ্কের চিহ্ন দেখলাম তার মুখে। কিন্তু সে মুহূর্ত্তমাত্র, পরক্ষণেই সে উঠে বুক টান টান করে দাঁড়াল, খট করে বুটের আওয়াজ তুলে স্যালুট করল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, মাথায় টুপি বা পাগড়ী না থাকলে কি স্যালুট করতে হয়, না শুধু জিনদুটো তুলতে হয়?

খেয়াল হল যে, মাথায় ক্যাপ নেই, সেটা এবং বেটনটা লালমণির হাতে। তৎক্ষণাৎ মুক হল সাকাই গাওয়া, হুজৌর, কাল রাতমে পাঁচবার টাট্টি হইয়েছে, তবিয়ৎ বহুত খারাপ হুজৌর, তাই আরামে চোখ বুজিয়ে বসিয়ে ছিলাম –

বসিয়েছিলে, না শুয়ে ছিলে?

না হুজৌর।

তবে লালমণি যখন টুপি আর বেটন নিয়ে নিল, টের পেলে না কেন? আমি কড়া স্বরে বললাম, তবিয়ৎ খারাপ হয়ে থাকলে সিক রিপোর্ট করনি কেন? একজন আসামী যদি বেটনটা নিয়ে তোমার মাথায় মারত?

আর কসুর হোবে না হুজৌর, এই বখে মাপ করিয়ে দেন—

সে কথা বড় সাহেবকে বলো।

রিপোর্ট করে দিলাম। আমাদের আইনে স্পষ্ট লেখা আছে যে, ডিউটির সময় ঘুমোলে হামেশাই শাস্তি চাকরি থেকে বরখাস্ত। মজুমদার বরখাস্ত করলেন না বটে, কিন্তু পনেরো দিনের মাইনে জরিমানা করে দিলেন।

এমনিভাবে সিপাইদের নামে পর পর রিপোর্ট হতে লাগল আর যারা সুপারিনটেনডেন্ট ডাক্তার মজুমদার এজনকেও রেহাই দিলেন না। সুপারই হচ্ছেন জেলের সর্বময় কর্তা। এইসব গালগল্প সাধারণতঃ তাঁরই শুনবার কথা, তেপুটি সুপার এসব নিয়ে তেতটা মাথা ঘামান না। রজনীবাবু আমায় বলেছিলেন, কি দরকার মশাই, সিপাইদের চটাবার? নিজের চাকরি রক্ষাই আমার একমাত্র কাজ। ওরা যা খুশী করুক গে। যার খুশী ধরুক গে। আমি কিন্তু সে নীতি মেনে নিয়ে নিশ্চেষ্ট থাকতে পারিনি। রজনীবাবু যাই বলুন না কেন, আইনবিগর্হিত কাজ দেখলেই যে কেউ সুপারের কাছে রিপোর্ট করতে পারে। সবাই একজোট সাহায্য না করলে এই বিশাল জেলের কোথায় কে অন্যায় করছে, তা খুঁজে বার করা একা সুপারের পক্ষে কি সম্ভব? সুপারকে সর্বাগ্রে সর্বপ্রকারে সাহায্য করবে তেপুটি সুপার, আমি এই নীতিই মেনে চলি।

কিন্তু সিপাইদের বিরুদ্ধে এমনিভাবে পর পর রিপোর্ট করবার ফলে যা হবার তাই হল, ডাকযোগে একখানা বেনামী পত্র পেলাম। চাকরি জীবনে সেই আমার কাছে প্রথম বেনামী পত্র। বাংলায় লেখা। লেখকের ভাষাজ্ঞান যাই থাক, বানান সম্বন্ধে যে জ্ঞানের দৈন্য আছে, চিঠিতেই তা প্রকট। আমার ভীতি প্রদর্শন করে লেখা হয়েছে, 'আপনাকে সাবধান করিয়া দিতেছি। আমাদের দীর্ঘ চাকুরিতে অনেক ডিপটি সাহেব দেখিয়াছি কিন্তুক আপনার মতন একটিও দেখি নাই। এতটা বারাবারি ভাল না। আপনাকে শাবধান করিয়া দিতেছি। সিপাইদের পিছনে লাগিয়া রিপোর্ট করিলে ভাল হইবে না।'

এমনই আশ্চর্য যে, কোন্ সিপাইয়ের হস্তাক্ষর, গোপনে তদন্ত করে কয়েক দিনের মধ্যেই বার করে ফেললাম এবং তার নামেও রিপোর্ট করে দিলাম।

বন্দীরা ত অপরাধী বলেই চিহ্নিত। জেলে এসে আরও অপরাধীদের সঙ্গে মিশে তারা যে অপরাধপ্রবণতা ত্যাগ করে তুলসী পত্র হয়ে উঠতে পারে না, সে সত্য সর্বজনবিদিত। তারপর তাদের উপরে রাখবার জন্য প্রয়োজনার হস্ত প্রসারিত করে সারাক্ষণ অপেক্ষায় রয়েছে কিছু অপরাধপ্রবণ সিপাই। কিছু অফিসকর্মিও। কারাগারকে সংশোধনাগারে রূপান্তরিত করবার মহান উদ্দেশ্য এরাই ব্যাহত করে দিচ্ছে। আমার স্বল্পমেয়াদী চাকরি জীবনে বার বার মনে হয়েছে যে, অপরাধ করে দণ্ডিত হয়ে যারা জেলে এসেছে, তাদের অধিকাংশ সম্বন্ধেই একেবারে নিরাশ হবার কারণ কিন্তু নেই। দুর্দান্ত দস্যু রত্নাকর যদি বাল্মীকি হতে পেরে থাকে, তাহলে, আমার বিশ্বাস, বিপথগত এই মানুষগুলিকেও ফিরিয়ে আনা অসম্ভব নয়। তার জন্য প্রয়োজন শাসন ও সহানুভূতি। এক চক্ষু যখন প্রশাসনিক ক্রোধে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে, অপর চক্ষে তখন নেমে আসবে সহানুভূতির বাষ্পাকুল গ্লানিমা। এক হাতে খড়্গ, অপর হাতে বরাভয়। আমি দেখেছি পরিবার ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন অপরাধী বলে চিহ্নিত এই মানুষগুলি এক টুকরো মিষ্টি কথা, একটুখানি দরদ ও এক মুঠো স্নেহ মমতার জন্য কতখানি লালায়িত। অপরাধ করার ফলে স্বাধীনতা হারিয়ে ফেললেও এদের অন্তরের মানুষটির মৃত্যু হয়নি। মুহ্যমান সেই মানুষটির চতুর্দিকের ঘনীভূত কুয়াশা অপসারণ করে যদি তাকে নব ভাবনা ও নতুন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে তোলা যায়, আমার বিশ্বাস, তাহলে এরাই একদিন নবজন্ম লাভ করে জেল থেকে আবার সমাজে ফিরে যেতে পারে।

অসুস্থ এই মানুষগুলির চিকিৎসা পদ্ধতি বিচিত্র। প্রথম ধাওয়াই হচ্ছে প্রশাসনিক ক্রোধ। চাকরিতে ঢুকেই আমি সেই ধাওয়াই প্রয়োগ করেছিলাম। যাতে ওদের কাছে আমি আতঙ্কের কারণ

হয়ে উঠতে পারি, যাতে ওরা উপলব্ধি করতে পারে যে, এই নতুন কেপুটি সাহেব শুধু অফিসে বসেই চাকরি করেন না, যখন তখন যেখানে সেখানে হানা দেন এবং অন্যায় করলে ওঁর কাছে কিছুতেই পরিত্রাণ নেই, রিপোর্ট হবেই। প্রথম ধাওয়াই সফল হলে পরে দ্বিতীয় ধাওয়াই, হৃদয় ও সহানুভূতি। ওরা তখন বুঝবে, আমি শুধু রিপোর্টই করি না, ওদের অসুবিধাগুলির প্রতিও আমার তীক্ষ্ণ নজর আছে, ওদের সুখ দুঃখের খবর নিই, ওদের সৎকথা শোনাই, সদুপদেশ দিই।

টেলারিং সেকশনে বারোখানা সেলাই কল চলছে। ওভাে চালিতে যে খান তৈরী হয়, দর্জি চালিতে তাই কেটে বন্দীদের কুর্ত্তা, জাঙ্গিয়া, পায়জামা, টুপি ও চাদর তৈরী করা হয়। শুধু হরদম জেলের জন্য নয়, এই সেনট্রাল জেলের অধীন জেলগুলির বন্দীদের জন্যও তৈরী হয়। একটা প্রকাণ্ড কাঠের বাক্সের মধ্যে খানগুলো থাকে আর থাকে তৈরী জিনিষ, জিনিষগুলো হিসেব করে তারপর গুদামে জমা দিয়ে দেয়া হয়।

সকালবেলাতেই আমি রাউণ্ড দিই, একদিন হঠাৎ বিকেলে দর্জি চালিতে গিয়ে হাজির হলাম। ওভারসিয়ারকে জিজ্ঞেস করলাম, এই বাক্সের চাবি কার জিম্মায় থাকে?

মেটের কাছে স্যার।

মেট কোথায়?

মেট কাছেই গুদামে গিয়েছিল, লোক পাঠিয়ে ডাকানো হল। বললাম, তোমার এই বাক্সটা খোল।

ওভারসিয়ার সুরজিৎবাবু নিজেই চাবিটা নিয়ে বাক্সটা খুলে ফেললেন, এই দেখুন স্যার, এই খানগুলো আজই এসেছে, এখনও কাটা হয়নি। এগুলো স্যার জাঙ্গিয়া আর কুর্ত্তা, পঁচিশটি করে বান্ডিল বাঁধা স্যার—

বললাম, ওগুলো বার করে নীচেটা দেখুন।

খানগুলো আর বান্ডিলগুলো টান মেরে মেরে মেঝেতে ফেললেন সুরজিৎবাবু, নীচে থেকে বেরিয়ে পড়ল কয়েকটা বিভিন্ন রংয়ের ব্লাউজ, সাটের ছিট কাপড়, ডিনটে লুঙ্গি আর আরও নীচে থেকে একটি ব্যবহৃত গাঁজার কলকে।

চীৎকার করে উঠলেন সুরজিৎবাবু, বোধহয় আমি উপস্থিত না থাকলে একটা চড়ই মেরে বসতেন মেটকে। তারপর আমার কাছে রিপোর্ট করে দিতেন রমনীবাবুর সেই বাঁধা গৎ-এ, showing temper to Factory Overseer অর্থাৎ ফ্যাক্টরির ওভারসিয়ারের মত ওপরওয়ালাকে বেয়াদপি দেখিয়েছে।

মেট দাকাই গাইবার চেষ্টা করল যে, অনেক সময় অন্য কাজে ব্যস্ত থাকলে সে অপরের হাতে চাবি দেয় খান রাখতে বা বার করতে।

বললাম, বেশ, যদি কেউ এসে আমার কাছে স্বীকার করে যে, ঐসব ব্লাউজ, লুঙ্গি আর গাঁজার কলকে সে-ই রেখেছে, তাহলে তোমায় ছেড়ে দোব। আর তা নইলে চাবি ছিল তোমার জিম্মায়, সুতরাং তোমার নামে রিপোর্ট হয়ে যাবে।

কেউ এসে স্বীকার করল না। মেটের নামে রিপোর্ট করে দিলাম।

সেনট্রাল জেলের বড় চৌকা, মানে জেনারেল কিচেন, যে না দেখেছে, সে কোনো ধারণাই করতে পারবে না। পাশাপাশি দুটি রান্নাঘরকে দূর থেকে দেখলে মনে হবে উঁচু চিমনি-লাগানো যেন দুটি ছোটখাটো কারখানা। সেই কারখানার কাজ হচ্ছে অন্ততঃ এক হাজার বন্দীর দু বেলার প্রধান খাদ্য ও প্রাতরাশ প্রস্তুত করা। চৌকার উনুনকে বলা হয় কুকিং রেঞ্জ। বিশালকায় রেলওয়ে টীম ইঞ্জিনের সম্মুখ ভাগের বয়লারের অংশটা যেন পিটিয়ে চৌকো করে চৌকার মাঝখানে মেঝেতে শুইয়ে এঁটে দেয়া হয়েছে। ধোঁয়া বেরিয়ে

মাথার চিমনিটা মাঝখান থেকে চাল ফুঁড়ে আকাশের দিকে উঠে গেছে। চিমনির দুপাশে গোল করে কাটা তিনটি করে ঘুল, এগুলোকে বলা হয় ওভেন। বেঞ্চের দুই প্রান্তে দুটি লোহার পাটওয়ালা দরজা, এই দরজা খুলে বেলচায় করে ঠেলে দেয়া হয় কাঁচা কয়লার বড় বড় টুকরো। ভাত রান্না বা ভাল সেদ্ধ করার যে পাত্র, তা আধো ভেকচি বা কড়াই নয়। অনেকটা এ্যালকাতরার পিপের মত দেখতে মোটা লোহার ড্রাম। ড্রামের মাঝামাঝি বাইরের দিকে লোহার শিক তোলা, ওভেনের মধ্যে বসিয়ে দিলে ঐ শিকে আটকে ড্রাম আগুনের ওপর ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। ড্রামের মাথায় দু দিকে দুটো লোহার বালা আঁটা। ঐ বালা দুটোর ভেতর দিয়ে মোটা বাঁশ গলিয়ে দুই প্রান্তে দুজন কাঁধ লাগিয়ে ড্রাম বামায়। তরকারী রান্না বা মাছ ভাজা হয় যে কড়াইতে, তা এত বড় যে, বোধহয় ছোটখাটো একটা আস্ত মানুষকেই তাতে চড়িয়ে দেয়া যেতে পারে।

দুটো রান্নাঘরের একটিতে শুধু রুটি তৈরী হয়। যখন জেলে যে সময় দৈনিক প্রায় হাজার খেড়েক রুটি তৈরী হত। হ্যাঁ, তাওয়ার ওপরই রুটি সেঁকা হয় বটে, তবে সেই তাওয়াখানার তাওয়াটার প্রায় আড়াই হাত হবে। তাওয়াখানা উলটো করে ওভেনের ওপর বসানো। কম্বলের পিঠের মত সেই তাওয়ার ওপর একসঙ্গে দশ বারোখানা রুটি সেঁকা হয়। কাছেই আছে তালাবন্ধ কটি ঘর, খুব ভাল আঁটা। রুটিগুলো সেই ঘরে থাক দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়। ঘরের চাবি থাকে একজন ওয়েটের কাছে। পাহারার কাজ ভালভাবে করতে পারলে বন্দীদের প্রমোশন দিয়ে 'ওয়েট' করা হয়। ওয়েট, মানে 'কনভিক্ট ওভারসিয়ার'। তাদের কোমরে কুর্তার ওপর বেল্ট আঁটা থাকে, তার পেতলের চাকতিতে লেখা আছে, কনভিক্ট ওভারসিয়ার। সাধারণতঃ এরা সর্দারের কাজ করে, বন্দীদের কাজের তত্ত্বাবধান করে প্রশাসনকে সাহায্য করে।

একদিন গোপন খবর পেয়ে অকস্মাৎ রুটির চৌকায় গিয়ে হাজির হলাম। চৌকা পরিদর্শন সাধারণতঃ সুপার করে থাকেন। তাই আমার আগমন ওখানকার বন্দীরা প্রত্যাশা করেনি। রুটি তৈরী তখন শেষ হয়ে গেছে, দেখলাম ঘরের মধ্যে সেগুলো বেশ উঁচু করে দু তিনটে থাকে সাজানোও হয়ে গেছে। আমি যে আগে প্রায় বারো বছর জেলে কাটিয়েছি, এখনও বন্দীরা সবাই সে খবর পায়নি। ওয়েট তাবল এর আগে কোনদিন আমি চৌকা দেখিনি, চৌকা সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই নেই, তাই সে অভিজ্ঞ গাইডের মত আমায় চৌকার কর্মকাণ্ড বোঝাতে লাগল।

আমি বললাম, চল, তোমার রুটি ঘরটা দেখি।

তৎক্ষণাৎ সে চাবি বার করে ঘরখানা খুলে দিল। আমি সদলবলে প্রবেশ করে বলে উঠলাম বাঃ, রুটিগুলো থাকে থাকে ভারী চমৎকার করে সাজিয়েছ ত। কারা সাজায়?

আর কে হুজুর, ওয়েট গর্বের সঙ্গে বলল, এসব কাজ কি অন্যকে দিয়ে হয়? দেখুন না হুজুর, কেমন মানুষের সমান উঁচু থাক তৈরী করেছি, অথচ একখানাও পড়বে না। নিজের হাতে যা না করব—

এ ঘরের চাবি কার কাছে থাকে? আমি প্রশ্ন করলাম।

আমার কাছে হুজুর, তৎক্ষণাৎ জবাব দিল ওয়েট, চাবি দিয়ে কি কাউকে বিশ্বাস করা যায়? নিজের হাতে ঘর খুলি, নিজের হাতে সাজাই, তারপর নিজের হাতে তালাবন্ধ করে চাবিটা কোমরে রেখে দিই। চৌকার আসামীগুলোর মধ্যে হুজুর, ছিঁচকে চোরই বেশী। তাই এই ঘরে আর কাউকে ঢুকতে দিইনে—

ওয়েট যখন গড় গড় করে বক্তৃতা করে নিজের বুদ্ধি ও কর্মকুশলতার জিরিতি দিয়ে যাচ্ছে, আমার দৃষ্টি কিন্তু তখন আটকে রয়েছে একটি উঁচু রুটির থাকের মাঝখানটিতে, দেখতে পাচ্ছি এমনি পরিপাটি করে

সাজানো নিখুঁত থাকের ঐ বিশেষ তাকটিতে খান তিনেক রুটি কেমন এলোমেলো হয়ে বাঁকিয়ে রয়েছে। অন্য কোনো থাকে কিন্তু এমনি খুঁত নেই। সন্দেহ হল। মনে হল, গোপন সূত্রে পাওয়া খবরটিও বোধহয় নিখুঁত। বললাম, মেট, প্রত্যেকটি থাকের প্রতিটি রুটি এমনি সুন্দর করে সাজিয়ে এই থাকটার এইখানটা এমনি খারাপ করে কেলেছ কি করে? এই রুটি ক'খানা যার করে ওপরে সাজিয়ে দাও না, তাহলেই চমৎকার হয়ে যাবে।

মেটের বক্তৃতার ধরাজ কণ্ঠ অকস্মাৎ যেন মিইয়ে গেল, ওটা হজুর, কি করে যে হয়ে গেছে, আগে লক্ষ্য করিনি। এখন আর সেরে কি হবে হজুর? আর একটু পরেই পাঁচটার ঘন্টি বাজবে, সবাই খেতে বসবে আর সব খাক সাফ হয়ে যাবে। কাল সকালে যদি দয়া করে একবার আসেন হজুর, তাহলে দেখবেন কত কষ্ট করে সাজাতে হয়—

না, না, এখনই দেখতে চাই, বাধা দিয়ে বললাম, নামাও না তুমি।

তথাপি মিন মিন করে আপত্তি জানাতে লাগল মেট, ও দুখানা ধরে টানলে ছিঁড়ে যাবে হজুর, আসামীরা আবার ছেঁড়া রুটি খেতে চায় না। তাই বলছিলাম কি—

লালমণি! এবার কড়া হতে হল, এই থাকের রুটিগুলো সব নামিয়ে ফেল ত।

এগিয়ে এল লালমণি, মেটনটা অপর সিপাইয়ের হাতে দিয়ে নামিয়ে ফেলল ওপরকার রুটিগুলো, এলোমেলো ভাঁজের মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়ল একখানা দশ টাকার নোট!

মেটের নামে রিপোর্ট করে দিলাম।

আর একদিন বিকেল ঠিক পাঁচটায় গিয়ে উপস্থিত হলাম একেবারে প্রধান চৌকায় যেখানে ভাত, ডাল, তরকারি, মাছ, মাংস রান্না হয়। সেদিন ছিল মাছের কাইল। বন্দীরা সপ্তাহে একদিন বিকেলে মাছ ও একদিন মাংস পায়। মাছ ঝোলের মধ্যে সেদ্ধ করা হয় না, ওগুলো কড়া করে ভাজা হয় আর ঝোল তৈরী হয় আলাদা করে। ঝোলে মাছ দিলে ভেঙে যেতে পারে বলে এই অভিনব ব্যবস্থা। মাছের বরাদ্দ জনপ্রতি দু ছটাকের একটি টুকরো।

হাসিমুখেই সুরু করলাম, তোমাদের চৌকা দেখতে এলাম মেট।

মেট ও অন্য সবাই সেলাম জানাল। মজিদ পাটি বার করে ফেলল মেট, আর একটু আগে যদি আসতেন হজুর, এখন সব খাবার কাইলে কাইলে চলে গেছে।

ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। ইস, তোমাদের ত খুব গরম লাগে। জানালা দরজার মেটে ভীষণ ময়লা জমেছে, হাওয়া ঢুকতে পারে না। মেটগুলো রোজ পরিষ্কার করা দরকার। হাওয়া না ঢুকতে পারলে তোমাদের যে দম বন্ধ হয়ে যাবে। আমার মন্তব্যের জবাবে কারুর কিছু বলবার নেই, শোনবার জন্য আমি অপেক্ষাও করলাম না, আপন মনে বলতে লাগলাম, তোমাদের এই হাতা খন্তিগুলো—খন্তি নয়, খন্তাই বলা উচিত, এগুলো রোজ ভাল করে মাজা হয়ত? আর তোমাদের জাজিম বুর্তাগুলো—ইস, কি যন্ত্রণা। তোমরা সাবান পাওনা?

মেট এবার বিনয়ে বিগলিত হয়ে বলল, পাই হজুর, নিয়মমত যা পাবার তা পাই। কিন্তু হজুর, যা তেলকালি, অতটুকু সাবানে কিছুই পরিষ্কার হয় না। গুদামবাবু বলেন, আইনে যা আছে, তার বেশী ত আমি দিতে পারব না, তাহলে হিসেব মিলবে কেন? কথাটা ত ঠিকই হজুর, যে-আইনীভাবে আমরাই যা চাই কি করে?

আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি বললাম, সাবান চালির কুণ্ডলবাবুকে আমি বলে রোজই কিছু সাবান তোমার হাতে দেবে। আমার এখানে বসে সাবান তৈরী হয়ে সব জেলে যাচ্ছে, আর আমার জেলের চৌকায় যারা খাটে, তারা মরলা জামা-পরে থাকবে, এ কি একটা কথা হল? আইনের জন্ত গুণাবাবু দিতে পারেন না, আমি তোমাদের জন্ত আইনের বাইরেই ব্যবস্থা করে দোব। মনে মনে বললাম, ব্যাটা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, আইনের বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধে জ্ঞান দান করছে! দাঁড়াও, ভুলে দিচ্ছি তোমার আইন মানার সততার ধুয়োপ!

কথা বলতে বলতে আমি তখন একটা কাঠের বিরাট বারকোসের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি. বারকোসের ওপর স্তূপীকৃত তাজা মাছের টুকরো। এক ঝলক দেখে নিয়েই জেটকে জিজ্ঞেস করলাম, আসামীদের মাছ কাইলে চলে গেছে সব?

জ্যা হজুর। এগুলো চৌকার লোকদের জন্ত।

চৌকায় কতজন কাজ করছে আজ?

জেট জবাব দিল, আজ্ঞে দুই চৌকা মিলিয়ে আজ আটষট্টি জন হাজির হজুর—

বাঃ, মাছের টুকরোগুলো ত বেশ বড় বড়, আমি বলতে লাগলাম, মাথাগুলো দেখে বোঝা যাচ্ছে কাতলা মাছ। আমার পাশেই অর্ডারলি লালমণি আর আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে দশ বারোজন বন্দী, আমি আপন মনেই বলতে লাগলাম, বেশ চমৎকার ভাজা হয়েছে কিন্তু। এমনি করা করে ভাজতে হলে ডুবো তেল না হলে হয় না আর মেখে তোলবার জন্ত চাই ঝাঁঝরি। দু ছটাকের টুকরোগুলো ভাজলে যেন আরও বড় হয়ে যায়—তারপরই চলে এলাম আসল প্রসঙ্গে, জেট মাছগুলো গোন ত?

জেট প্রমাদ গুনল। আমার উদ্দেশ্য বুঝতে দেরী হল না, তাই সাফাই গাইতে লাগল, দু একখানা কাঁটাকুটি বেশী হতে পারে হজুর। কি করা যাবে, আসামীরা কাঁটা খেতে চায় না, বলে, আমরা পাব দু ছটাক মাছ, কাঁটা নয়—

বাবা ছিলাম, বেশ ত, কাঁটাগুলো আরেকটা পাত্রে তুলে রেখে যাও, তারপর মাছগুলো গোন।

অগত্যা কি আর করবে জেট, কাঁটাগুলো একটা গামলাতে তুলে রেখে মাছের টুকরোগুলো গোনা সুরু করল।

ঘড়ি দিলাম, মনে মনে বল, শব করে গোন।

দেখা গেল, টুকরোর সংখ্যা নব্বুইখানা, তার ওপর কাঁটাগুলো শুধুই কাঁটা নয়, তাতেও মাছ লেগে আছে!

বলে উঠলাম, আটষট্টি জনের জন্ত নব্বুইখানা মাছ! কেন, তোমরা কি বেশী মাছ পাও নাকি? আইনে তাই আছে নাকি?

কে এই মারাত্মক প্রশ্নের জবাব দেবে?

জেটের নামে রিপোর্ট করে দিলাম।

রিপোর্ট! রিপোর্ট! রিপোর্ট! খালি রিপোর্ট! সিপাইদের নামে রিপোর্ট! বন্দীদের নামে রিপোর্ট! অফিসবাবুদের নামে এমনও ঠিক রিপোর্ট না হলেও মাঝে মাঝেই আমার কাছে তাদের তিরস্কার শুনতে হয়। ফলে, চাকরির কয়েক মাসের মধ্যেই আমি হয়ে উঠলাম বন্দীদের কাছে রীতিমত ভীতির কারণ, সিপাইদের কাছে ক্রোধ ও আক্রোশের কারণ আর অফিসবাবুদের কাছে সীমাহীন বিরক্তি ও অসন্তুষ্টির কারণ। বেশ চলছিল জেলের দুনিয়া। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি অনুসরণ করে সৎ ও

অকপট বন্ধী ও কয়িরা যেমন চোখে ঠুলি পরে আর কানে তুলো গুঁজে নিজের নিজের কর্তব্য করে যাচ্ছিল, তেমনি আমের গুছিয়ে নিচ্ছিল ফাঁকিবাজ ও দুর্নীতিপরায়ণেরা। সহাবস্থানের সেই কমল বনে আমি যেন ঐরাবতের মত অনুপ্রবেশ করে বসেছি!

নিরবয়ব বৈদ্যি সেক্রেটে অদৃশ্য কালিতে ব্যানার লাইন ছাপা হয়ে গেল, নয়া ডিপটি লাহাব বহুৎ খারাপ আদমি হ্যায়।

[ক্রমশঃ

• • • •

[বিশেষ দ্রষ্টব্য :—অনবধানবশতঃ 'আবার সেই জেল' ধারাবাহিক রচনাটির গত ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত কিস্তিতে কিছু ভুল থেকে গেছে এবং কিছু অংশ বাদ পড়ে গেছে, সেজন্য আমরা দুঃখিত। রচনাটির ধারাবাহিকতা যাতে অব্যাহত থাকে এবং পাঠকগণের পক্ষে তা অনুসরণ করা যাতে সহজ হয়, সেজন্য এই সংখ্যায় আমরা সেই ভুল সংশোধন করছি এবং বাদ পড়ে যাওয়া অংশ উদ্ধৃত করছি।

ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত কিস্তির পরিচ্ছেদ সংখ্যা হবে (আট)।

তারপর ৩১৪ পৃষ্ঠার দাতাশ লাইনের পর নিম্নে প্রকাশিত অংশটুকু পড়তে হবে।

আটাশ লাইনের পূর্বে পরিচ্ছেদ সংখ্যা হবে (নয়)।

—সম্পাদক, গল্প-ভারতী]

তৎক্ষণাৎ অফিসে ফিরে গেলেন তিনি এবং তৎক্ষণাৎ সিপাইটিকে বাসপেণ্ড করে দিলেন।

একদিন হুতোর চালিতে রাউণ্ডে গেলে তখনকার ইন্সিপার অর্থাৎ ইন্সপেক্টার কচি এগিয়ে এল। সাধারণতঃ কোন নালিশ জানাতে হলেই ওরা এগিয়ে আসে, হাতে থাকে ওদের হিসট্রি টিকেট। নালিশের জবাবে যা হুকুম দেবো, ওভারসিয়ার তখনই তা ওতে লিখে নেবেন, আমি সই করে দোব, তারপর হুকুম অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য টিকেটখানা অফিসে পাঠানো হবে। কিন্তু কচির হাতে দেখলাম কোন টিকেট নেই। তথাপি যথারীতি জিজ্ঞেস করলাম, কি তোমার নালিশ?

নালিশ নয় হুজুর, কচি জবাব দিল, যদি অনুমতি দেন, তাহলে একটা কথা বলি।

বল।

কচি সবিনয়ে বলল, আমরা হুজুর, জানতে পেরেছি জেলের চাকরি নেবার আগে কি চাকরি করতেন আপনি।

কি করে জানলে? কে বলল?

কচি হাসিমুখে বলল, আমাদের আর কে বলবে হুজুর, তবে আমরা নিজেরাই সলা করে বার করেছি।

আমরা, মানে কারা?

মানে হুজুর, আমতা আমতা করতে লাগল সে, কাল রাত্রে নম্বরে (অর্থাৎ ওয়ার্ডে) কথাটা উঠেছিল। মহম্মদ আলী আর আমি ছিলাম আর ছিল ভাত চালির মদন মণ্ডল, মক্কি চালির ইন্সিপার সহদেও সিং, ঘড়ি চালির ফেট আকবর খাঁ, আরও অনেকে। আমরা অনেক সলা করলাম হুজুর, তারপর, ঠিক করলাম, নিশ্চয়ই আপনি থানার বড় দারোগা বাবু ছিলেন—

থানার দারোগা! হাসি চেপে জিজ্ঞেস করলাম, কেন তোমাদের তা মনে হল?

যেন একটা গোপন সত্য আবিষ্কার করে ফেলেছে, এমনি ভাব দেখিয়ে বেশ গর্বের সঙ্গে সহাস্যে বলতে লাগল, নইলে হুজুর, যেখানে যে অন্যায় করছে, সবই আপনি কি করে ধরে ফেলেন? সেদিন মহম্মদ আলী ক্ষেত থেকে একমুঠো শাক তুলে এনে সবে আগুন জেলে হাঁড়িতে চড়িয়েছে, সেই শুমটীর কাছ থেকে ঠিক আপনার নজরে পড়ে গেল। যখন তাঁত চালি থেকে খানিকটে চেঁড়া সুতো নিয়ে ঘরে যাচ্ছিল, অমনি কত আনাচীই ভ ৎনি হাতে যাচ্ছিল, ঠিক আপনি ওর থলিটাই তল্লাসী করে ধরে ফেললেন। সহদেও দিং বলল, সেদিন আপনি ওর সেলাই মেসিনের ড্রয়ার খুলে গাঁজার প্যাকেট বার করেছেন। আপনাকে হুজুর ফাঁকি দেবার উপায় নেই। তাই তাঁত চালির দল বাহাদুর বলল, নিশ্চয়ই আপনি থানার বড় দারোগা ছিলেন। তাই না হুজুর?

হেসে বললাম, দারোগারাই বুঝি সব ধরতে পারে? তাহলে ত আর কথাই ছিল না। এই ত, তোমাদের মধ্যে যাকেই জিজ্ঞেস করি, অপরাধ করেছিলে, সে-ই অমনি বলে ওঠে, কিন্তু জানিনা হুজুর, একেবারে নির্দোষ, মিথ্যে মামলা করে দারোগাবাবু ফাঁসিয়ে দিয়েছে। তোমাদের কথাই যদি সত্যি হয়, তাহলেই দেখ, দারোগাবাবু আসল লোককে ধরতে না পেরে তোমাদের মত নির্দোষ লোকদের জেলে পুরে দিয়েছে। তার মানেই হচ্ছে দারোগাবাবুরাও আসল অপরাধীকে ধরতে পারেন না। তারপর হেসে বললাম, তোমরা আবার সলা কর কচি, সলা করে বার কর, এই চাকরির আগে কি চাকরি করতাম আমি। জেনে রাখ, আমি দারোগা-টারোগা ছিলাম না।

বলে আর উত্তরের অপেক্ষা না করে সদলবলে ছড়ি অর্থাৎ সতরঞ্চি চালির দিকে অগ্রসর হলাম মাঠ পেরিয়ে।

কচির মুখে স্বাভাবিক একটা হাসির আভাস সর্বক্ষণই লেগে থাকে। লোকটা কথাবার্তায় ভারী সপ্রতিভ আর বিনয়ী। এত পরিশ্রম করে যে সত্যটা ওরা আবিষ্কার করেছে, সেটা আদৌ সত্য নয় শুনে কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল সে। কি অপরাধ করে এসেছে কে জানে। নিজের কথা, বিশেষ করে নিজের মামলার কথা কখনও তোলে না, আজও কোন নালিশও জানায়নি। নালিশ জানাতে হলেই টিকেট দিতে হত আর টিকেট পেলেই তাতে, ওর কি অপরাধে কত এবং কতদিনের মেয়াদ, লেখা দেখা যেত। কি জানি, হয়ত যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। বৃটিশের যুগে যাদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হত, তাদের সাধারণতঃ আন্দামানে পাঠিয়ে দেয়া হত। অবশ্য রাজনৈতিক কারণে দণ্ডিতদের মধ্যে থেকে কয় মেয়াদীদেরও অনেককে পাঠানো হয়েছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর আর কোনো কয়েদীকে আন্দামানে পাঠানো হয় না। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডকে জেলের ভাষায় বলা হয় হায়মলী সাজা আর দণ্ডিতকে বলা হয়, হায়মলী। বৃটিশের যুগে এদের চেনবার সুবিধে ছিল। মুসলমানরা নমাজ পড়বার সময় যে কিস্তি টুপি পরে, অনেকটা তেমনি ধরণের একটা টুপি সর্বক্ষণ, সব বন্দীকেই বিশেষ করে খোলা থাকার সময় পরে থাকতে হত। যে সব বন্দীর হায়মলী সাজা, তাদের টুপিতে থাকত একটা লাল রংয়ের বর্ডার। এখনও তেমনি টুপি আছে বটে, তবে কেউ বড় একটা পরে না, কর্তৃপক্ষও সেজন্য তেমন জোর করেন না। কচিও কখনও টুপি পরে না, তাই টিকেট না দেখা পর্যন্ত তার কত সাজা, জানবার উপায় নেই।

বৃটিশের যুগে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের অর্থ ছিল বিশ বছর মেয়াদ, আবার তা হলেই পাওয়া যেত ছয় বৎসর 'রুইল পার্ডন'। অর্থাৎ বিশ বছর থেকে ছয় বৎসর মাপ পাওয়া যেত। তারপর জেলে ভালভাবে থাকলে, মতিগতি ভাল দেখালে আড়াই বা তিন বছর পর্যন্ত রেমিশন পাওয়া যেত। ফলে, যাবজ্জীবন

দ্বীপান্তর হতে দণ্ডিত বন্দীদের মধ্যে কেউ কেউ এগারো বারো বছর পরেই ছাড়া পেয়ে যেত। এখন আর 'দ্বীপান্তর' কথাটা নেই, এখনকার মত 'কারাদণ্ড', যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। আর যেহেতু আমাদের 'ফাঁসী' নেই, তাই 'দুইল পার্ডন'ও নেই। এখন যাবজ্জীবন অর্থ বিশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

রাউণ্ড শেষ করে জেনারেল কিচেনের পাশ দিয়ে অফিসে ফিরে আসবার সময় কৌতূহলবশে আমার ভৃত্যের চালির দিকে তাকাই। বেশ বেলা হয়ে গেছে। সূর্য্য প্রায় মাথার ওপর। তাই কিচেনের পেছনে কদম গাছটার ছায়ায় দাঁড়িয়ে আমার কচিকে ডাকলাম। এলেই বললাম, কচি তোমার টিকেটখানা নিয়ে এস ত।

কচি ছুটে গিয়ে টিকেট নিয়ে এসে হাতে দিল।

টিকেট দেখে চমকে উঠলাম। কচির সশ্রম কারাদণ্ডের মেয়াদ পঁচিশ বছর! আর অপরাধ? ডাকাতি, হত্যা, নারী ধর্ষণ! পাঁচ বছর, দশ বছর আর দুশ বছর, মেয়াদ পর পর চলবে। এ যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের চাইতেও বেশী। পাঁচ বছর খাটা হয়ে গেছে। বাকি রয়েছে এখনও বিশ বছর। এখন কত বয়স হবে কচির? তা প্রায় ষাট হবে। যদি মোট পাঁচ বছরও রেমিসন পায়, তবুও ওকে জেলে থাকতে হবে আরও পনেরো বছর। তার মানে যখন ছাড়া পাবে, তখন বয়স হবে পঁচাত্তর। উঃ, ভাবতেও পারি না।

চাইলাম ওর দিকে। মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মুখের সেই স্বাভাবিক হাসি অন্তর্হিত। হাসবে আর কি করে? তিনটি ঘৃণ্যতম অপরাধ একই সঙ্গে করে যে দীর্ঘতম মেয়াদ নিয়ে জেলে এসেছে, তার মুখে কি আর হাসি শোভা পায়? ওর বিনয়নম্র ও সপ্রতিভ ব্যবহারে আমার মনে যেটুকু সহানুভূতির ভাব জমে উঠেছিল, অপরাধের বহর জানবার পর তা যেন মুহূর্ত্তে শূন্যে মিলিয়ে গেল। অথচ আমি জানি এই হত্যাকারী ডাকাত ও নারীধর্ষককে জিজ্ঞেস করলে চটপট জবাব দেবে, কিছুই জানি না হুজুর, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ, মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে দারোগা বাবু—

কৌতূহল হল। স্পষ্ট ভাষায় জিজ্ঞেস করলাম, অপরাধগুলি তুমি করেছিলে কচি?

মুখ নীচু করেই জবাব দিল, নিশ্চয়ই করেছি হুজুর, না করলে জেলে এলাম কেন?

নিশ্চয় করেছি! বলে কি! এতদিন করিনি করিনি শুনে আসছি, মনে হয়েছে জেলের মধ্যে যেন সব সাধু পুরুষের মেলা! কিন্তু এই লোকটা অন্য কথা বলছে কেন? আবার জিজ্ঞেস করলাম, অপরাধগুলো করেছ তাহলে?

কচি এবার মুখ তুলল, ধীরে ধীরে বলল, সাজা যখন হয়ে গেছে হুজুর, তখন কিছু করিনি বললে কে আর বিশ্বাস করবে বলুন। তাই আমি হুজুর কেউ জিজ্ঞেস করলেই বলি, হ্যাঁ, আমি দোষী।

কৌতূহল বেড়ে গেল। জিজ্ঞেস করলাম, তোমার সঙ্গীদের কত কত সাজা হয়েছে?

ম্লান হেসে বলল সে, আমার একারই সাজা হয়েছে হুজুর, সঙ্গী কেউ ছিল না।

একা! বিস্মিত হলাম কচির কথায়। একা কি করে ডাকাতি করতে পারে? ছিনতাই করতে পারে, রাহাজানিও সম্ভব হতে পারে, কিন্তু ডাকাতি একটা লোক কি করে করবে? যে বাড়ীতে ডাকাতি করেছে, সে বাড়ীতে বাধা দেবার কেউ ছিল না? বললাম, তোমার অপরাধের কাহিনী আমি শুনতে চাই কচি। সত্যি কথা বলবে কিন্তু।

আবার সেই স্বাভাবিক হাসি দেখা দিল, বলল, কি হবে হুজুর সে কাহিনী শুনে, সেসব চুকে-বুকে গেছে। এখন পরপারের দিকে তাকিয়ে আছি। ভবের খেলা আমার সাঙ্গ হয়ে গেছে—

বাধা দিয়ে বললাম, না, না কচি, আমি শুনব। বল তুমি।

মুখ নীচু করল সে। কি যেন ভাবল। তারপর মুখ তুলে চাইল ওপরে। বোধহয় অদৃশ্য ভগবানকে স্মরণ করল। তারপর সুরু করল তার অপরাধের কাহিনী।

• • • •

বাইবেল-এর গল্প

সুজন রায়

[জগতের অন্যতম ধর্মগ্রন্থ বাইবেল পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক বিক্রিত বই। দি হোলি বাইবেলের রচয়িতা প্রধানত তিনজন, ম্যাথিউ, মার্ক এবং লিউক। ৫৭ বা ৫৮ খৃষ্টাব্দে এর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। বাইবেলের মধ্যে বহু কাহিনী আছে। তারই একটি কাহিনী পরিবেশিত হ'ল।]

এক

সততা আর অধ্যবসায় থাকলে মানুষ তার কর্মজীবনে সাফল্য লাভ করবে নিশ্চিত। এই গল্পের নায়ক জোসেফ-এর জীবন-কাহিনীতে সেই সত্যই উদ্‌ঘাটিত।

জোসেফরা বারো ভাই। জোসেফই জ্যেষ্ঠ এবং পিতা জেকবের সবচেয়ে প্রিয়। বাপের প্রিয় হবার মতো সব গুণই তার ছিল। অন্য ভাইরা ভিন্ন প্রকৃতির। তাদের স্বভাব হিংসুটে, সর্বক্ষণ নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি লেগেই আছে। বড় ভাইএর প্রতিও তাদের বিদ্বেষের অন্ত ছিল না।

জেকব একদিন জোসেফকে একটি চমৎকার পোষাক কিনে দিলেন। তাই না দেখে অন্য ভায়েদের কী হিংসে!

—এঃ। যেন রাজপুত্র! বাপ তাঁর বড় ছেলেকে রাজপুত্তুর সাজিয়েছেন।

জোসেফ কিন্তু ভায়েদের সঙ্গে কখনো কোন মন্দ ব্যবহার করত না। একদিন সে দুটি স্বপ্ন দেখল এবং ভায়েদের সেই স্বপ্ন দুটির কথা বলল।

প্রথম স্বপ্ন হল--সকল ভাই মিলে এক এক আঁটি শস্য বাঁধল। তাদের মধ্যে জোসেফএর আঁটিটাই দাঁড়িয়ে রইল। অন্য সকলের আঁটি মাটিতে পড়ে গেল। যেন তাঁরা জোসেফের আঁটিকে প্রণাম করছে।

দ্বিতীয় স্বপ্ন হল—জোসেফ যেন একলা আছে। স্বর্গ থেকে সূর্য চন্দ্র আর এগারোটা নক্ষত্র এসে তাকে প্রণাম করছে।

ভায়েরা তাদের বুদ্ধি দিয়ে স্বপ্ন দুটির বিকৃত অর্থ করল। প্রথম স্বপ্নের অর্থ তারা করল, যেন তারা সকলে জোসেফকে মেনে চলে। দ্বিতীয়টির অর্থ করল, তাদের বাপ মা আর এগারো ভাই যেন জোসেফ-এর কর্তৃত্ব মেনে নেয়।

এই রকম অর্থ করে তারা জোসেফের উপর ভয়ানক রেগে গেল। বাপের আদরটা পেয়ে বড় ভায়ের অহংকার যেন আকাশ ছাপিয়ে উঠেছে। যেমন করে হোক তার এই অহংকার চূর্ণ করতে হবে। তারা নানা ষড়যন্ত্র করতে লাগল।

ছোট ভাই বিন্যামিন ছিল একটু ভিন্ন প্রকৃতির। তাছাড়া সে জানতো, ভায়েদের মধ্যে জোসেফ তাকেই সবচেয়ে ভালবাসে। তাই সে সেই সব ষড়যন্ত্রের সামিল হল না। কিন্তু সে একা। অন্য সব ভায়েদের সঙ্গে সে এঁটে উঠতে পারবে কেন?

কয়েক মাস পরে দেশে ভীষণ খাদ্যাভাব দেখা দিল। দারুণ খরায় পুকুরের জল শুকিয়ে গেছে। মাঠে ঘাসের চিহ্ন নেই। পশুপালন করা অসম্ভব হয়ে পড়ল।

তাই বাধ্য হয়ে এসাবোজন তাই পশুপাল নিয়ে জল আর খাদ্যের সন্ধানে রওনা হল। জোসেফ রইল বৃদ্ধ পিতার কাছে।

অনেক দিন কেটে গেল। ছেলেদের কোন খবর না পেয়ে বৃদ্ধ জেকব অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হলেন। তিনি জোসেফকে তাদের সন্ধানে পাঠালেন।

ঘুরতে ঘুরতে জোসেফ ভায়েদের সন্ধান পেল। কিন্তু তাকে দেখে ভায়েরা মোটেই খুশী হল না। বরং তাকে একা পেয়ে কী করে জব্দ করা যায় তার ফন্দী আঁটতে লাগল।

একজন বললে, রাতের বেলা ও যখন ঘুমুবে তখন ওকে কেটে ফেল।

আর একজন বললে, না, না। কেটে কাজ নেই। তার চেয়ে ওকে, ওই যে তাঁবুর পিছনে যত বড় গর্তটা আছে তার মধ্যে ফেলে দেওয়া যাক। তাহলে গর্ত থেকে ও উঠতে পারবে না, আর না খেয়ে মরবে।

সকলেই সেই সিদ্ধান্ত মেনে নিলে এবং রাত্রে ঘুমন্ত জোসেফকে সকলে মিলে জোর করে তুলে নিয়ে সেই গর্তের মধ্যে ফেলে দিলে।

পরদিন সকালে সেখানে উটের পিঠে চড়ে একদল বণিক এলো। তারা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে জিনিষ কেনা-বেচা করতে করতে চলেছে। তারা নানা রকম জিনিষপত্রের সঙ্গে দাস-দাসীও ক্রয় বিক্রয় করে।

জোসেফ-এর এক ভাই ভাবল, জোসেফ যদি গর্তে পড়ে মারা যায় তাতে আমাদের কোন লাভ হবে না। তার চেয়ে ওকে যদি বণিকদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া যায় তাহলে আমাদেরও কিছু টাকা লাভ হবে আর জোসেফও কোন দিন ফিরে আসতে পারবে না।

সে কথা তাদের তার অভিমত জানাল। ভায়েরা তার কথা সমর্থন করল এবং বণিকদের অপেক্ষা করতে বলে তারা সেই গর্তের কাছে গেল।

সারা রাত ধরে জোসেফ মড়ার মতো গর্তে পড়ে আছে। ভায়েরা যখন তাকে টেনে তুলল তখন তার গায়ে আর এতটুকুও শক্তি ছিল না।

ভায়েরা তাকে টেনে নিয়ে গেল বণিকদের কাছে। বললে, একে আমরা বিক্রি করতে চাই।

জোসেফ-এর কাহিল শরীরের অবস্থা দেখে বণিকরা বেশী দাম দিতে চাইল না। মাত্র কুড়িটি মুদ্রা দিয়ে তারা জোসেফকে কিনে নিয়ে চলে গেল।

জোসেফ বিস্তর আপত্তি করেছিল। বলেছিল, তাকে এভাবে বিক্রি করবার কোন অধিকার ভায়েদের নেই। কিন্তু কে শোনে তার কথা। বণিকরা তার দামী পোষাকটা খুলে ফেলে দিয়ে তাকে উটের পিঠে চড়িয়ে হাটের দিকে রওনা হয়ে গেল।

ভাইরা তখন একটা ছাগল কেটে তার রক্ত দিয়ে জোসেফ-এর পোষাকটাকে রাঙাল এবং সেই রক্তমাখা পোষাকটা নিয়ে গিয়ে তাদের বাপকে দেখালো। জেকব ভাবলেন, কোন বন্য জন্তু জোসেফকে খেয়ে ফেলেছে। প্রিয় পুত্রের শোকে তিনি বহুক্ষণ ধরে আর্তনাদ করলেন।

দুই

জোসেফ বণিকদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। পালাবার কোন উপায় নেই, সব সময় তার চারদিকে কড়া পাহারা।

দু'চার দিনের মধ্যেই বণিকরা বুঝেছিল, যুবকটি খুবই বুদ্ধিমান এবং কাজের। তারা ঠিক করল, কোন ছোটখাটো হাটে নয়, একে মিশরের বড় হাটে চড়া দামে বিক্রি করতে হবে।

এই ভেবে সারা পথই তারা জোসেফকে খুব তোয়াজে আর আরামে রাখল। ফলে কয়েক দিনের মধ্যেই জোসেফএর স্বাস্থ্য ফিরে গেল। সে দিন দিন আরও সুন্দর এবং স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠতে লাগল।

অবশেষে তারা মিশরের হাটে পৌছল। সেখানে সেখানকার কারারক্ষী সেনাপতি জোসেফকে দেখে খুব পছন্দ করলেন এবং তাকে কিনে নিলেন।

সেনাপতির অনেক ক্রীতদাস আর ক্রীতদাসীর মধ্যে জোসেফও একজন হয়ে রইল। সে তাদের সঙ্গেই থাকে, কাজকর্ম করে, নিজের কাজে অবহেলা করে না।

কিছুদিন পরে প্রধান ক্রীতদাস বুঝল, জোসেফ যেমন বুদ্ধিমান তেমনি পরিশ্রমী। সে জোসেফকে আরও দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দিতে লাগল। এবং জোসেফও তার কর্তব্য সুচারুরূপে দক্ষতার সঙ্গে পালন করতে লাগল।

প্রধান ক্রীতদাস খুশী হয়ে একদিন সেনাপতির কাছে জোসেফের খুব প্রশংসা করল। শুনে সেনাপতি তাকে নিজের বাড়ির প্রধান পরিচারকের পদে নিযুক্ত করলেন। অল্পদিনের মধ্যেই নিজের কর্মদক্ষতার গুণে জোসেফ সেনাপতির গৃহস্থালীর পর্যবেক্ষক পদে উন্নীত হল। সেনাপতির টাকা পয়সা আর হিসাব পত্র রাখার ভারও তার উপর পড়ল।

জোসেফের কাজে সেনাপতি নিজে খুব খুশী ছিলেন। কিন্তু খুশী ছিলেন না তাঁর স্ত্রী। তিনি কেন জানিনা জোসেফকে দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না। নানা অছিলায় তিনি তার নিন্দা করতেন এবং স্বামীর কাছে তার বিরুদ্ধে নানাকথা বলতেন। শুনে শুনে সেনাপতিও জোসেফের প্রতি বিরূপ হলেন এবং একদিন সামান্য একটা কারণে তিনি তার উপর বিষম রেগে গিয়ে স্ত্রীর কথায় তাকে তাঁর গৃহসংলগ্ন কারাগারে আটকে রাখলেন।

বন্দীশালায় জোসেফের দিন কাটে। হঠাৎ কোথা থেকে একী হল! যাই হোক শান্ত মনে সে কারাগারে দিন যাপন করতে লাগল। ভগবানের উপর সে বিশ্বাস হারালো না। তার মনে এই আশা ছিল যে সে আবার সুদিনের মুখ দেখবে।

সেই কারাগারে তার দু'জন সঙ্গী জুটল। একজন হল, মিশরের রাজার পাচক, অন্যজন পরিবেশক। তাদের রান্না করা আর পরিবেশন করা খাবার খেয়ে রাজার অসুখ করেছিল তাই রাজার ধারণা হয়েছিল যে তাদের মধ্যে কেউ খাবারে বিষ মিশিয়েছে।

সেনাপতি ওই দুজন কয়েদীর দেখা শোনার ভার দিলেন জোসেফের উপর। তাই জোসেফের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতা জন্মালো।

একদিন পাচক এবং পরিবেশক দুজনেই গুম্ হয়ে বসে আছে দেখে জোসেফ বললে—কি হে! আজ তোমাদের কী হল। অমন চুপচাপ কেন?

দুজনেই বললে যে গতরাত্রে তারা দু'জনে স্বপ্ন দেখেছে কিন্তু তার কী অর্থ তা তারা বুঝতে পারছে না।

জোসেফ বললে—তাই নাকি! তা, কি স্বপ্ন দেখলে তুমি।

পরিবেশক বললে—আমি স্বপ্ন দেখেছি তিনটি আঙুরলতা। তাতে ফুল হল, ফল হল এবং ফল পাকলো। তারপর আমি সেই আঙুরের রস নিয়ে দিলাম ফারাওকে।

মিশরের রাজাকে বলা হত—ফারাও।

কিছুক্ষণ ভেবে জোসেফ স্বপ্নের অর্থ বললে—ফারাও তিনদিনের মধ্যে তোমাকে মুক্তি দেবেন এবং তুমি আগের মতোই তাঁর পরিবেশকের কাজ করবে।

তারপর জোসেফ সেই পরিবেশককে অনুরোধ করল, মুক্তি পেয়ে পরিবেশক যেন জোসেফের জন্যে ফারাওকে একটু অনুরোধ করে। পরিবেশক সানন্দে স্বীকার করল। জোসেফের কথা যদি সত্যি হয় তাহলে সে নিশ্চয়ই রাজার কাছে তার মুক্তির জন্যে প্রার্থনা জানাবে।

এবার পাচক বললে তার স্বপ্ন—আমার মাথায় তিনটে ডালায় ফারাওর জন্যে রাখা অনেক খাবার ছিল। পাখীরা আমার ডালার সব খাবার খেয়ে ফেললো।

একটু চিন্তা করে জোসেফ বললে—খুবই দুঃস্বপ্ন। তিনদিনের মধ্যে ফারাও তোমার দেহ থেকে মাথা কেটে নিয়ে গাছে ঝুলিয়ে রাখবেন আর পাখীরা তোমার মাংস খুঁটে খুঁটে খাবে।

তিনদিনের দিনই জোসেফের কথা সত্য হল। ফারাও তাঁর জন্মদিনে পরিবেশককে মুক্তি দিয়ে আবার তাকে কাজে নিযুক্ত করলেন এবং পাচকের ফাঁসীর আদেশ দিলেন।

তিন

কারাগারে বসে জোসেফ ভাবছে, এইবার বুঝি রাজার দূত এসে তাকে মুক্ত করে দেবে।

কিন্তু কোথায় রাজার দূত! দিনের পর দিন, বছরের পর বছর চলে গেল, রাজার দূত এলো না। পরিবেশক জোসেফ এর কথা ভুলে গিয়েছিল।

এক রাত্রে ফারাও দুটি স্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্ন দুটি তাঁর চিন্তাকে আচ্ছন্ন করল। হঠাৎ এমন দুটো অদ্ভুত স্বপ্ন তিনি কেন দেখলেন আর স্বপ্ন দুটোর অর্থই বা কী!

তিনি মন্ত্রীদের ডেকে স্বপ্ন দুটির অর্থ জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু তারা কেউই বলতে পারল না।

স্বপ্নের কথা শুনে হঠাৎ পরিবেশকের মনে পড়ে গেল জোসেফকে। তাই তো, সেই লোকটার কথা সে একেবারেই ভুলে গিয়েছিল।

পরিবেশক ফারাওকে জানালো, রক্ষী সেনাপতির বন্দীশালায় জোসেফ নামে এক ক্রীতদাস আছে, স্বপ্ন সম্বন্ধে তার অদ্ভুত জ্ঞান, সে যে কোন স্বপ্নের অর্থ নির্ভুল বলে দিতে পারে।

এই বলে পরিবেশক তার ও পাচকের স্বপ্নবৃত্তান্ত রাজাকে জানাল।

শুনে রাজা তৎক্ষণাৎ জোসেফকে নিয়ে আসবার জন্যে দূত পাঠালেন। সংবাদ শুনে সেনাপতি তাড়াতাড়ি জোসেফকে মুক্ত করে দিয়ে তাকে ভাল জামাকাপড় পরিয়ে দিলেন। জোসেফ দূতের সঙ্গে রাজভবন অভিমুখে রওনা হল।

যথাসময়ে ফারাওর সামনে তাকে উপস্থিত করা হল।

ফারাও তার সঙ্গে দু'চার কথার পর স্বপ্নের কথা তুললেন, বললেন শুনলাম, তুমি নাকি স্বপ্নের নির্ভুল ব্যাখ্যা করতে পারো। বল দেখি আমার স্বপ্ন দুটোর অর্থ কি ?

এই বলে তিনি তাঁর স্বপ্ন দুটি শোনালেন।

প্রথম স্বপ্ন হল—একদিন ফারাও নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আছেন এমন সময় নদী থেকে সাতটা হৃষ্টপুষ্ট গাভী উঠে এসে মাঠে চরতে লাগল। তারপরই আবার সাতটা রোগা-পটকা গাভী নদী থেকে উঠে আগেকার হৃষ্টপুষ্ট গাভীগুলোকে খেয়ে ফেললো।

দ্বিতীয় স্বপ্ন—একটা বোঁটায় সাতটা মোটা শীষ উঠল। তার পরেই সাতটা সরু শীষ। সরু শীষগুলো মোটা শীষগুলোকে খেয়ে ফেললো।

স্বপ্নের কাহিনী বলে ফারাও জোসেফকে প্রশ্ন করলেন—এর মানে বলতে পারো ?

ঘাড় নেড়ে জোসেফ বললে—পারি সম্রাট ! তবে একটু সময় চাই।

—বেশ, সময় দিলাম।

আধ ঘণ্টা ধরে ভাবল জোসেফ। তারপর বললে—সম্রাট, আপনার দুটি স্বপ্নেরই এক অর্থ ! এখন পর পর সাত বছর খুব ভাল ফসল হবে, তারপর আর সাত বছর হবে ভীষণ অজন্মা, দুর্ভিক্ষ ! আর এটা যে হবে তা বোঝানোর জন্যেই ভগবান দু'বার করে স্বপ্ন দেখিয়েছেন।

ফারাও বললে যদি তোমার কথা সত্যি হয় তাহলে এখন করণীয় কি ?

জোসেফ বললে একজন বুদ্ধিমান সৎ এবং পরিশ্রমী মানুষ খুঁজে বার করুন যিনি প্রথম সাত বছরের বাড়তি ফসল হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে করে রাখবেন, যাতে দুর্ভিক্ষের সাত বছরেও লোকের কোন কষ্ট না হয়।

রাজা তখন মন্ত্রীদের ডেকে জোসেফের কথা বলে অনেকক্ষণ পরামর্শ করলেন তারপর জোসেফকে বললেন—তোমাকেই আমি এই কাজের ভার দিলাম। এখন থেকে তুমিও আমার একজন মন্ত্রী।

এই বলে ফারাও তাকে মন্ত্রীর পোষাক দিলেন এবার তার হাতে নতুন আংটি আর গলায় সোনার হার দিয়ে তাকে সম্মানিত করলেন। তার নতুন নামকরণও হল।

ফারাওর রথে চেপে নতুন মন্ত্রী নগর পরিদর্শনে বেরুলো। রাস্তার লোক তাকে দেখে পাগল হয়ে অভিবাদন জানালো।

সতেরো বছর বয়সে জোসেফ ক্রীতদাস হয়েছিল। ত্রিশ বছর বয়সে মিশর রাজ্যের মন্ত্রী হল। ভাগ্যচক্রের কী অদ্ভুত পরিবর্তন !

পরের বছর প্রচুর ফসল জন্মালো। লোকের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা ফসল উদ্বৃত্ত হল জোসেফ

সতর্ক ব্যবস্থাপনার দ্বারা সেই ফসল গোলায় তুলে রাখল। এই ভাবে পর পর সাত বছর জোসেফ বাড়তি ফসলে গোলার পর গোলা ভর্তি করতে লাগল।

তারপর সত্যিই এলো সেই দুর্দিনের কাল। বোঝা গেল, প্রথম সাত বছরের ভবিষ্যদ্বাণী জোসেফের যখন সফল হয়েছে তখন পরের সাত বছরের ভবিষ্যদ্বাণীও ব্যর্থ হবে না সাত বছর ধরে চলবে অজন্মা।

রাজ্যের লোক কারাওর কাছে এসে খাদ্যের জন্যে প্রার্থনা জানাতে লাগল। তিনি তাদের মন্ত্রী জোসেফের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

দলে দলে প্রজারা জোসেফের কাছে আসতে লাগল। জোসেফ বললে, তোমাদের কোন ভয় নেই। সবাইকার জন্যে খাদ্য মজুত আছে। ন্যায্য দাম দিয়ে নিয়ে যাও।

রাজভাণ্ডার খুলে দিয়ে গোলার পর গোলা থেকে জোসেফ শস্য বিক্রয় করতে লাগল। প্রজারা তার নামে জয়ধ্বনি দিল। দিনের পর দিন বছরের পর বছর প্রজাদের খাদ্যের অভাব ঘটল না। জোসেফের বিচক্ষণতা আর সংগঠন ক্ষমতা দেখে কারাও শুধু নয়, রাজ্যের সমস্ত অমাত্য পরিষদ অবাক হয়ে গেল। সর্বসম্মতিক্রমে ভাবে জোসেফকে কারাও প্রধানমন্ত্রীর পদ দিলেন। যিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এত দিন, তিনি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় সানন্দে জোসেফকে ঐ পদ প্রদান করে রাজকর্ম থেকে অবসর নিলেন।

[চার]

জোসেফের পিতা আরও বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। জোসেফকে হারাবার পর কুড়ি বছর পার হয়ে গেছে। জেকব বা তাঁর অন্য ছেলেরা কেউ ভাবতেও পারে নি যে জোসেফ আজো বেঁচে আছে।

লোক মুখে জেকবের ছেলেরা খবর পেল যে মিশরে প্রচুর শস্য পাওয়া যাচ্ছে। তাদের গ্রামেও খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছিল। তাই তারা দশজনে মিলে ফসল কিনতে মিশরে এলো। ছোট ভাই বিন্যামিন রইল বাপের কাছে।

সেখানে তারা জোসেফকে দেখল কিন্তু চিনতে পারল না। এই কয়েক বছরে জোসেফের চেহারা একদম বদলে গেছে। তার চালচলন পোষাক পরিচ্ছদ সবই অন্য রকম। তাছাড়া ভায়েরা তো স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে জোসেফ মিশরের প্রধানমন্ত্রী হয়েছে।

জোসেফ তার ভায়েদের দেখেই চিনতে পেরেছিল। কিন্তু সে তাদের কাছে নিজের পরিচয় দিলে না। বরং সে তাদের সঙ্গে বিদেশীদের মত ব্যবহার করল। তাদের মতিগতি এতদিনে কেমন হয়েছে তা পরীক্ষা করবার উদ্দেশ্যে জোসেফ তাদের উপর চটে যাওয়ার ভান করে বললে—তোমরা বিদেশী রাজার চর, নিশ্চয়ই আমাদের রাজ্যে শত্রুতা করতে এসেছো।

তারা সকলে কাকুতি মিনতি করে নিজেদের পরিচয় দিলে এবং সব কথা খুলে বললে। জোসেফ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাদের বাড়ির সব খবর নিলে। তবু যেন তাদের কথা বিশ্বাস করলে না—এই ভাব দেখিয়ে তাদের কিছুদিনের জন্যে নিজের প্রাসাদ সংলগ্ন কারাগারে আটকে রেখে দিলে। আসলে জোসেফ বুঝতে চাইছিল, ভায়েরা সেই রকমই রয়ে স্বভাবের আছে না তাদের চরিত্র বদলেছে।

কারাগারে বসে ভায়েরা ভাবতে লাগল, মন্ত্রী নিশ্চয়ই তাদের হত্যা করবে। তারা অত্যন্ত ভীত ব্যাকুল হয়ে পড়ল।

তিন দিন পরে জোসেফ তাদের ডেকে আনল। তারা সামনে এসে দাঁড়ালো।

জোসেফ বললে—তোমরা যদি সৎলোক হও তাহলে তোমাদের একজন জামিনস্বরূপ আমার বন্দীশালায় থাক আর অন্যরা দাম দিয়ে ফসল নিয়ে যাও। তারপর তোমাদের ছোট ভাইকে নিয়ে আসবে। যদি না আন তাহলে তোমাদের বন্দী ভাইকে আমি ছাড়ব না।

নিরুপায় হয়ে তারা জোসেফের কথায় রাজী হল, সিমোয়ান নামে তাদের এক ভাই কারাগারে রইল, অন্য সকলে এক এক থলে ফসল নিয়ে নিজেদের ঘরের দিকে রওনা হল। পথে তারা থলে খুলে দেখল, ফসলের সঙ্গে তাদের দেওয়া ফসলের দামও থলের মধ্যে রয়েছে।

এই দেখে তারা অবাক হয়ে গেল। মনে মনে ভয়ও পেল। কি জানি তারা আবার কোন্ নতুন বিপদে পড়বে।

ঘরে ফিরে গিয়ে তারা তাদের বাবাকে ঘটনা সব বললে। জেকব যখন শুনলেন যে তাঁর ছোট ছেলেটিকে সেখানে যেতে হবে তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন। বললেন—জোসেফ গেছে, সিমোয়ানও গেল, আবার বিন্যামিনকেও হারাবো! না, না, তা হতেই পারে না। আমি ওকে যেতে দেব না।

ছেলেরা চুপ করে রইল। কেটে গেল কিছুদিন। ইতিমধ্যে যে ফসল তারা এনেছিল তা শেষ হয়ে গেল। তখন জেকব শস্য আনতে ছেলেদের আবার মিশরে যেতে বললেন। কিন্তু তারা ছোট ভাইকে সঙ্গে না নিয়ে যেতে সাহস পেল না।

জেকব তখন বাধ্য হয়েই ছোট ছেলেকে অন্য ছেলেদের সঙ্গে পাঠালেন। তারা থলের মধ্যে যে টাকাগুলো পেয়েছিল তাও সঙ্গে নিল।

অন্য দিনের মতো প্রার্থীদের শস্য দিতে এসে জোসেফ দেখল তার ভাইরা এসেছে এবং বিন্যামিনও রয়েছে তাদের মধ্যে। প্রিয় ভাইটিকে দেখে জোসেফ মনে মনে খুব আনন্দিত হল।

ভায়েদের মধ্যে একজন তার কাছে এগিয়ে এসে ভয়ে ভয়ে থলের মধ্যে পাওয়া টাকাগুলি ফেরৎ দিল। তখন জোসেফ আরও খুশী হল। সে বুঝলো, ভায়েরা সত্যিই এখন সৎ হয়েছে!

সে তাদের সকলকে ডেকে ভোজ খাওয়ালো এবং থলে ভর্তি করে শস্য দিয়ে তাদের বিদায় করল।

ভায়েদের আনন্দ আর ধরে না, প্রধানমন্ত্রী তাদের ভাইকে আটক রাখলেন না, সিমোয়ানকেও ছেড়ে দিলেন! কী আনন্দ সকলকার! তার উপর থলে ভর্তি ফসল! মনের আনন্দে তারা বাড়ীমুখো হল।

কিন্তু কিছুদূর যাবার পরই কারাগার সেপাই এসে তাদের পথ রোধ করে দাঁড়াল। প্রধানমন্ত্রীর রূপোর বাটি পাওয়া যাচ্ছে না, তাই সেপাই সকলের থলে তল্লাস করে দেখবে।

একে একে সকলের থলে খুঁজে দেখা হল, কিন্তু রূপোর বাটি পাওয়া গেল না। শেষে যখন বিন্যামিনের থলে খোলা হল তখন দেখা গেল তার মধ্যে রূপোর বাটি রয়েছে।

বিন্যামিন ভয়ে বিস্ময়ে হতবাক! সে যে কিছুই জানে না। কি করে রূপোর বাটি তার থলের মধ্যে এলো? অন্য সব ভাই মনে মনে প্রমাদ গনল। শেষে এই ছিল তাদের ছোট ভায়ের কপালে। চোর অপরাধে তাকে নিশ্চয়ই মৃত্যু বরণ করতে হবে।

কায়াওএর সেপাই দলাইকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে ধরে নিয়ে গেল। প্রধানমন্ত্রী ঘটনা শুনে বললে—চুরির অপরাধে বিন্জামিনকে চিরজীবন এখানে ক্রীতদাসরূপে কাটাতে হবে।

ভায়েদের মধ্যে যে ভাই জোসেফকে বণিকদের কাছে বিক্রি করে দেবার মতলব দিয়েছিল সে তখন এগিয়ে এল বলল—প্রভু! বিন্জামিন আমাদের বড় আব্বার ছোট ভাই। তাছাড়া আমাদের বাবা বড় ভাইকে হারাবার পর এই ছোট ভাইটিকেই সব সময় কাছে রাখেন। ওকে আটকে রাখলে আমাদের বুড়ো বাবা আর বাঁচবেন না। আপনি ওকে দয়া করে ছেড়ে দিন। তার বদলে আমি সারাজীবন আপনার দাস হয়ে কাটাবো।

তার কথা শুনে জোসেফের অন্তর আনন্দে পূর্ণ হল! ঠিক এই কথাই তো সে শুনতে চাইছিল। সে বুঝলো, ভায়েদের চরিত্রে অনেক পরিবর্তন এসেছে। তারা যে শুধু টাকাই ফেরৎ দিয়েছে তাই নয়, তারা বাপের দুঃখ বুঝতে শিখেছে, তারা আত্মত্যাগ করতে শিখেছে।

তখন জোসেফ ভায়েদের কাছে নিজের পরিচয় দিল। জোসেফের কথা শুনে ভায়েরা বিহ্বল হল। একী তারা স্বপ্ন দেখছে? না, স্বপ্ন তো নয়! এই তো সত্যিই তাদের বড় ভাই জোসেফ তাদের সামনে দাঁড়িয়ে। এতদিন তারা তাকে একেবারেই চিনতে পারেনি! আনন্দে ও বিস্ময়ে তাদের মুখে কোন কথা জোগালো না।

ফারাওর কাছে খবর গেল, প্রধানমন্ত্রীর ভায়েরা এসেছে। তিনি তাদের থেকে অনেক আদর আপ্যায়ন করলেন। তাদের বাবার খবর শুনে বললেন—তোমাদের পিতা, দাস দাসী আর পশুপালকে এখানে নিয়ে এসো এবং নিশ্চিন্ত মনে আমার রাজ্যে বাস কর।

ভায়েরা ফিরে গিয়ে জেকবকে সব কথা জানালো। জেকব তো প্রথমে ছেলেদের কথা বিশ্বাস করতে চাইলেন না। তারপর ছেলেদের সঙ্গে এলেন মিশরে।

জোসেফ যখন আত্মপ্রি প্রণত হয়ে পিতাকে অভিবাদন জানাল তখন বৃদ্ধ জেকব ভাবের আবেগে অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর প্রিয়তম পুত্রকে, তাঁর হারানো রতনকে বুকে জড়িয়ে ধরে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন।

খবর পেয়ে ফারাও এসে দাঁড়ালেন। সেই আবেগময় দৃশ্য দেখে তিনিও অভিভূত হলেন। তারপর বৃদ্ধ জেকবকে সসম্মানে নিজের কাছে বসিয়ে বললেন—জোসেফ-এর মতো ছেলের জন্ম দিয়েছেন বলে আপনি গর্ব বোধ করতে পারেন। আজ থেকে আপনি আমার রাজ্যের একজন মাননীয় প্রজা! আপনি এই রাজ্যেই বাস করুন, তাতে আমি কৃতার্থ বোধ করব।

জেকব সানন্দে সম্মত হলেন এবং ছেলেদের নিয়ে নতুন রাজ্যে আনন্দের সঙ্গে বসবাস করতে লাগলেন।

নৈপ্লবিক

(ষড় গল্প)

সমর বসু

বাড়িটা অন্ধকার। ভীষণ অন্ধকার। চারিদিক নিস্তব্ধ। তবুও মনে হচ্ছে বাতাসে যেন কিসের শিরশিরানি। কারা যেন কানাকানি করছে।

সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়ান নীরেন। দরজা বন্ধ। পাশের একটা জানলার জানালা অবশ্য খোলা। কিন্তু বাহির থেকে ভেতরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে বহুযুগ ধরে এই একতলা বাড়িখানা যেন খালি পড়ে আছে। কেউ বাস করে না। বোধকরি বাসের অযোগ্য।

বড়রাস্তা অনেক দূরে। ছোট সংকীর্ণ এক অন্ধ গলির শেষপ্রান্তে এই বাড়িখানা বিকট একটা জিজ্ঞাসা চিহ্নের মত কুব্জ হয়ে দাঁড়িয়ে পথচারীদের দিকে যেন বাঁকাচোখে তাকিয়ে আছে। বাড়িটা নিঃস্পন্দ, নিঃসাড়, তবুও মনে হচ্ছে অন্ধকারের গভীরে কোথাও যেন চলছে প্রাণের লীলা। জীবনের প্রবাহ।

বাড়িটার সামনে এলেই হোঁচট খেতে হয়, থমকে দাঁড়াতে হয়। এগোবার পথ নেই। দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলে মনে হবে বাড়িটা যেন কপাল কুঞ্চনায় কাপালিক,—শুধু গভীর গলায় বলছে—"মামনুসর"।

কিন্তু দরজা বন্ধ তাই কাপালিককে অনুসরণ করা সম্ভব হল না নীরেনের। অথচ কড়া নাড়তেও সাহস হল না। সমস্ত পরিবেশটাই কেমন যেন থমথম করছে। এ-গলিতে একটা ল্যাম্পপোষ্টও নেই। বাড়িগুলোতেও বোধহয় কেউ ইলেকট্রিক নেয়নি। টিমটিমে কেরোসিনের ডিবে জ্বলছে পঞ্চাশ বছর আগে যেমন জ্বলত।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে নীরেন দরজায় কড়া নাড়ল। অনেকক্ষণ ধরে কড়কড় শব্দ করল। সেই শব্দে সমস্ত গলিটাই চমকে উঠল। এধারে ওধারে অনেক বাড়ির জানালা গেল খুলে। অনেক জোড়া কৌতূহলী চোখ উঁকি দিল কিন্তু কেউ কোনও কথা বলল না।

নীরেন জানে না—কড়া নাড়লেই এ বাড়ির দরজা কেউ খুলে দেয় না। জানে না—প্রতিবাসীদের সঙ্গে এ বাড়িটার যোগাযোগ খুব কম। কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা যায়—হ্যাঁ মশাই! এখানে কি কেউ থাকে না? বাড়িটা কি খালি পড়ে আছে?—ভাড়া পাওয়া যাবে?—তখন অত্যন্ত উদাসভাবে তিনি জবাব দেবেন,—অত খবর আমরা রাখিনা মশাই। তবে শুনেছি বাড়িটা সুবিধের নয়।

উত্তর শুনে স্বভাবতঃই মনে হবে—বাড়িটায় যাঁরা বাস করেন তাঁরা নিশ্চয়ই অসাধারণ। তাঁদের জীবন রহস্যময়।

নীরেন আর একবার কড়া নাড়ল। তবুও কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে নীরেন মনে মনে ভাবতে লাগল ফিরে যাবে কিনা!

অনেক খরচাখরচি করে এখানে সে এসেছে। অনেক কষ্ট স্বীকার করে তবে সে বাড়িটার হদিস পেয়েছে, এখন হতাশ হয়ে ফিরে যাওয়া ঠিক হবে না।

অন্ধকার গলির মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একটা লোকের সঙ্গে সামনাসামনি দেখা হয়ে যেতে নীরেন জিজ্ঞেস করেছিল,—

—৩৫নং বাড়ি কোন্‌টা বলতে পারেন স্যার?

মফঃস্বল শহরে বাড়ির নম্বর একটা থাকে, কিন্তু সেটা বিশেষ কারও প্রয়োজনে লাগেনা। ডাকঘর আর পৌরসভার কাজের সুবিধের জন্যে এই ব্যবস্থা। বাসিন্দাদের তাতে কিছু যায় আসে না।

কলকাতার নীরেন এ-সব তথ্য জানতো না। জানতো না যে নম্বরের চেয়ে বাড়ির মালিকরাই এখানে বেশী পরিচিত। তাই সেই ভদ্রলোক যখন জিজ্ঞেস করলেন, কার বাড়ি খুঁজছেন! বাড়িওয়ালার নাম কি?—তখন নীরেন সহসা কোনও জবাব দিতে পারেনি, কেননা যাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে সে এখানে এসেছে তিনি বাড়িওয়ালা নন। তাই কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নীরেন বলল, বাড়িওয়ালার নাম বলতে পারব না। তবে যাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি—

নীরেনকে বাধা দিয়ে ভদ্রলোক একটা দেশলাই কাঠি জেলে বললেন,—দেখুন তো এটা কত নম্বর!

নীরেন দেখল—৩৫। চুণবালি-ওঠা দেওয়ালের গায়ে আলকাতরা দিয়ে লেখা—৩৫। দেশলাইয়ের আলোয় ভদ্রলোকের মুখটা দেখে নীরেন স্তম্ভিত হল। মুখটা যেন খুবই চেনা চেনা। কদিন আগে একেই সে সম্পাদকের ঘরে দেখেছে।

নীরেনকে ভাল করে দেখবার জন্যেই বোধহয় ভদ্রলোক আর একটি দেশলাই জ্বাললেন। জ্বেলে বিড়ি ধরালেন। তারপর মুচকি হেসে বললেন, আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। কোথায় থাকেন?

—কলকাতায়।

—তাতো চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু কলকাতায় কোথায়?

—বালুড়বাগানে। সায়েন্স কলেজের পিছনে।

ও! বুঝেছি! আর বলতে হবে না। কিন্তু এত রাত্রে এখানে কেন?

—বলাই তো এই বাড়িতে মিঃ—

—ও! I see। তাহলে আজরাত্রে এখানে থাকা হবে?

নীরেন বুঝতে পারল,—ভদ্রলোক এ-কথা সেকথা বলে অনেক কিছু জেনে নিতে চায়। কিন্তু কিছু জানানো উচিত হবে না। নীরেন সাবধান হল। তাই ওঁর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে নীরেন একটু ব্যস্ততার সঙ্গে বলল,—আপনাকে বিরক্ত করলাম বলে কিছু মনে করবেন না। আপনার জন্যেই বাড়িটা খুঁজে পেলাম। ধন্যবাদ!—বলেই ভদ্রলোকের সান্নিধ্য থেকে একটু সরে গিয়ে নীরেন জানালার নীচে গিয়ে দাঁড়াল।

আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ভদ্রলোক চলে গেলেন। একটু ঘুরে গিয়ে ডানপাশের একটি বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

অনেকক্ষণ কড়ানাড়ার পরও যখন কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না—তখন নীরেনের সন্দেহ হল,—সত্যি সত্যি এই বাড়িতে কেউ বাস করে তো!—অথচ বাড়িটা সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ লিখে আজই রাত্রে প্লেনে পাঠাতে হবে। নীরেন মরিয়া হয়ে আর একবার দরজার কড়া ধরে নাড়া দিল।

সঙ্গে সঙ্গে,—নীরেন আশ্চর্য হয়ে দেখল,—দরজা খুলল। এবং ভেতর থেকে একজন মহিলা বেরিয়ে এলেন।

নীরেন সরে দাঁড়াল। ভদ্রমহিলা কোনও কথা না বলে নীরেনের পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। আর নীরেন সেখানে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল—বাড়ির ভেতর ঢুকবে; না, ভদ্রমহিলাকে অনুসরণ করবে!

মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করে নিয়ে নীরেন বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল এবং সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে বলল,—গো-গো-ক বাবু! গোলোকবাবু আছেন?

অনেক দূর থেকে একটি মহিলার কণ্ঠস্বর ভেসে এল—অস্পষ্ট এবং কম্পমান—। নীরেন ঠিক বুঝতে পারল না মহিলা কি বললেন। তাই সাহসে ভর করে আরও একটু এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল,—গোলোকবাবু এখানে থাকেন? বাড়িতে আলো জ্বলছে না কেন! অন্ধকারে আপনি কি করছেন!—বাড়িতে কি আর কেউ নেই!

ততক্ষণে একটি দশ পনেরো বছরের ছেলে নীরেনের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। নীরেন তাকে দেখতে পায়নি।

ছেলেটি পিছন থেকে জিজ্ঞেস করল,—কাকে খুঁজছেন?—বলেই টর্চ জ্বালল। সমস্ত বাড়িটা যেন চমকে উঠল—নীরেনও। এবং সেইজন্যই বোধ হয় প্রশ্নের কোনও জবাব দিতে পারল না।

টর্চটা জেলে রেখেই ছেলেটি নীরেনের সামনে এসে বলল,—চলুন, ভেতরে গিয়ে বলবেন চলুন।

নীরেন তখনও কোনও কথা বলল না, অর্থাৎ বলতে পারল না। ছেলেটির অদ্ভুত ব্যবহারে নীরেন যেন কেমন বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। কাকে দরকার, তা না জেনে এবং নীরেনের পরিচয় কি সে বিষয়েও কোন খোঁজ না নিয়ে ছেলেটি তাকে এমন ভাবে স্বাগত জানাচ্ছে কেন! কেনই বা তার এমন অস্বাভাবিক আপ্যায়ন।

ভাবতে ভাবতে ছেলেটিকে অনুসরণ করে নীরেন একটা ঘরে গিয়ে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘরে একটা প্রদীপ জ্বলে উঠল। প্রদীপ হাতে মাথায় আধখানা ঘোমটা-টানা একটি বধূ অত্যন্ত মৃদু গলায় বলল, বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন!—রমা, তুমি ভেতরে গিয়ে বসে এস, বাইরে থেকে একজন ভদ্রলোক এসেছেন, বৌদি তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন।

ছেলেটি চলে যেতে, মাথার ঘোমটা একটু সরিয়ে দিয়ে প্রদীপটা তুলে ধরে—বধূটি একটু এগিয়ে এল।

নীরেন মুহূর্তের জন্য তার দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিয়ে ভাবল—এই অন্ধকার ঘরের মধ্যে, এই রহস্যময় পরিবেশের আড়ালে, কি করে এমন একটা গভীর সুন্দরী মেয়ে বেঁচে আছে!—ভয়ে ভয়ে মরে যায়নি!—মুখে-চোখে, সর্ব অবয়বে যৌবন যেন উপচে পড়ছে। অথচ আশ্চর্য সংযত, আশ্চর্য কমনীয়। ওর ঐ বস্ত্রলতার মত সুপুষ্ট শরীরটাকে বসনের সামনে যেন বাঁধা যায় না, তবুও কোথাও ঔদ্ধত্য প্রকাশ পায়নি; যেমন নম্র, তেমনি সলজ্জ ওর প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গী,—মুখের হাসিটাও যেন আধ ফোটা যুঁই। নীরেনের মনে হল অলৌকিক সুষমা যেন জ্যোতির্মণ্ডলের মত ওর সমস্ত অস্তিত্বটাকে ঘিরে রেখেছে। তাই ওর

দেহটা দেখে পুরুষের চোখে আলা ধরে না, লোভ হয় না—মাথা নত হয়ে আসে! অথচ ওর বয়সই বা কত!—নীরেনের চেয়ে অনেক ছোট। নীরেনের মনে হল—ওর ব্যক্তিত্বই—ওকে রক্ষা করছে। পুরুষ স্পর্শ থেকে—লুব্ধ দৃষ্টির তীব্র লেহন থেকে—ওকে রক্ষা করছে। নীরেন মুগ্ধ হল। আনমিত হল।

—প্রদীপের আলোয় বোধহয় আপনার অসুবিধে হচ্ছে! কিন্তু কি করব! এখানে যে আলোর ব্যবস্থা নেই।

নীরেন আশ্চর্য হয়ে ভাবল,—এখানে সে কেন এসেছে,—এ কথাটা তো কেউ জিজ্ঞেস করল না। এবং তা করল না বলে নীরেনও সে-সম্বন্ধে কিছু বলল না।—আপনাদের কি ছারিকেনও নেই?—মৃদু গলায় শুধু জিজ্ঞেস করল।

—আছে! কিন্তু সেতো এখন জ্বালা যাবে না। কেরাসিন নেই যে!

দারিদ্র্য সম্বন্ধে এতটুকু সংকোচ নেই বধূটির।—নীরেন ভাবল এরা বোধহয় খুব গরীব। কোনো ক্রমে দিন চলে। অন্ধকারে থেকে এরা বোধহয় তেলের পয়সা বাঁচায়, সেই পয়সায় হয়তো চাল কেনে। —ভাবতে ভাবতে একটু যেন লজ্জিত হল নীরেন। বলল থাক, দরকার নেই! এতেই কাজ সারা যাবে। —কিন্তু আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন!—বসুন না।

—বসবো বৈকি! আগে আপনার জন্যে একটু চা করে নিয়ে আসি। তারপর বসে বসে গল্প করব।—বলতে বলতে বধূটি ভেতরের দরজা দিয়ে অন্য ঘরে চলে গেল।

হতবুদ্ধি নীরেনের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা গভীর রহস্যপূর্ণ বলে মনে হল। সম্পূর্ণ অজানা-অচেনা, একটি সুন্দরী বিবাহিতা যুবতী কি করে এমন অসংকোচ ব্যবহার নীরেনের সঙ্গে করতে পারল। একটুও জড়তা নেই, ভয় নেই, সন্দেহ নেই। ছেলেটিকে ভিতরে পাঠিয়ে একলা দাঁড়িয়ে কী সাহসে সে এতক্ষণ ধরে নীরেনের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল। এতখানি বিশ্বাস—ও পেল কোথা থেকে?

বিমূঢ় নীরেন আলোছায়া-ঘেরা রহস্যময় ঘরটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।—আসবাবের মধ্যে শুধু এই তক্তপোষখানা। স্যাঁতসেতে দেওয়ালে কোথাও কোনও ছবি নেই, শুধু দুখানা ক্যালেণ্ডার। একটা ইংরাজী অপরটা বাঙলা। ক্যালেণ্ডারের পাতাগুলো অনেকদিন ছেঁড়া হয়নি। তিন মাসের পুরোন মাসটা এখনও দেওয়ালে শোভা পাচ্ছে। ছবিগুলো প্রাকৃতিক, কোনও মানুষ বা দেবদেবীর নয়।—নীরেন নিজের দিকে তাকাল। ঝকঝকে সাহেবী পোষাক! হাতে ফোলিও ব্যাগ—! নিজেকে কেমন যেন বেমানান বলে মনে হল নীরেনের। তাই অসহায়ের মত একটা ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে রইল।

কিছুক্ষণ পরেই চা নিয়ে এল বধূটি। বলল,—ঘরে কিছু নেই, তাই শুধু চা!

ওর হাত থেকে চায়ের কাপটা নিয়ে নীরেন বলল,—আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন না, এইবার বসুন!

কাপড়টা গায়ে ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে, নীরেনের থেকে একটু দূরে তক্তপোষের এক প্রান্তে জড়োসড়ো হয়ে বধূটি বসল।

নীরেন চা খেতে লাগল।

গভীর নিস্তব্ধতায় ছোট্ট ঘরের আকাশ যেন ভারী হয়ে উঠল। বাড়ির ভিতর থেকেও কোনও সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে সেই ট্রেন কেল-ঘরে-যাওয়া দুটি অপরিচিত তরুণ-তরুণী একটা

ছোট্ট বেল টেপনের ওয়েটিংরুমে বসে যেন প্রভাতের অপেক্ষা করছে। কেউ কাউকে চেনে না, জানে না অথচ মনে হচ্ছে—পরস্পর ওরা কত আপনার।

কি প্রশ্ন করা যায় ভাবতে ভাবতে হঠাৎ এক সময় নীরেন আচমকা জিজ্ঞেস করল—গোলোকবাবু আপনার কে হন?

—গুরু!

—তিনি কি এখন এখানে নেই! কই তাঁকে তো দেখছি না।

—শুধু কি তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে আপনি এখানে এসেছেন?

নীরেন আশ্চর্য হয়ে সেই অল্প আলোয় বধূটির মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর ভূতাবিষ্টের মত প্রশ্ন করল,—আমি এখানে কি উদ্দেশ্যে এসেছি তা আপনি জানেন না কি?

লাজুক হেসে বধূটি বলল,—আমাকে আর আপনি বলবেন না, কেননা আপনি শুধু আমার চেয়ে বয়সে বড় নন। সম্পর্কের দিক থেকেও জ্যেষ্ঠ। সুতরাং আপনি আমাকে চন্দনা বলেই ডাকবেন।

—চন্দনা।

—উঁ, চন্দনা বানারজি!—আমার স্বামী আপনাদের—থাক! সে-কথা পরে হবে।

নীরেন বিহ্বলের মত কম্পমান দীপশিখার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর মুক্ত চালের কাপটা মেঝের উপর রেখে দিয়ে বলল,—তা হলে আপনি;—মানে তুমি সবই জান! অথচ আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

—পারবেন। তবে ঠিক এখুনি না। আরও পঞ্চাশ মিনিট পরে, মানে রাত ৯টার পর।

নীরেন হাতঘড়িটা আলোর দিকে তুলে ধরে দেখল—আটটা দশ!

—চন্দনা তোমার নাম! এর আগে কোথাও তোমায় দেখেছি বলে তো মনে হচ্ছে না। তোমার নামও শুনিনি।

—সেইটাই তো স্বাভাবিক! কেননা বিয়ের পর তো আপনাদের সঙ্গে আমার পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

—তাই নাকি! কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

—পারবেন। ব্যস্ত হতে হবে না। যখন এসেছেন সবই জেনে যেতে পারবেন। এই বাড়িটাকে কেন্দ্র ক'রে যে-রহস্য ঘনীভূত হ'য়ে উঠেছে—যার পূর্ণ বিবরণ আপনাকে আজই রাত্রে দাখিল করতে হবে সে-সবই আপনি জানতে পারবেন। কিন্তু—। হঠাৎ থেমে গেল চন্দনা। অসাবধানে বেরিয়ে আসা কথাগুলোর পথরোধ করে ঠোঁট দুটো সংবদ্ধ করল।

—থামলে কেন?—আগ্রহ ভরে জিজ্ঞেস করল নীরেন।

—কারণ সব কথা বলবার এখনও সময় হয়নি! আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি ভেতর থেকে একটা কাজ সেরেই আসছি। বলতে বলতে চন্দনা চলে গেল।

নীরেন স্থির ভাবে বসে রইল। একটা অজানা আশংকায় নীরেনের সমস্ত চেতনা যেন শির শির করতে লাগল।

সেই নির্জন ঘরে গভীর স্তব্ধতার মধ্যে বসে থাকতে থাকতে নীরেনের মনে হল,—না এলেই বোধহয় ভাল হত। কৌতূহল আর লোভ তাকে এখানে টেনে এনেছে। সে-সময় এই দুটো প্রবৃত্তিকে রোধ করার

মত মানসিক শক্তি ছিল না নীরেনের।—পুরুষকে নিজের ভাগ্য গড়ে তুলতে হবে, বসে বসে স্বপ্ন দেখলে হবে না, স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হবে কর্মের কারখানায়। নীরেন তাই অত সব কাজ ফেলে রেখে এইখানেই ছুটে এসেছে।

বুকপকেটে হাত দিয়ে দেখল নীরেন চিঠিটা খস্ খস্ করছে। পেন্সিলও ব্যাগটা তুলে দেখলে—হ্যাঁ তেমনি ভারী। অনেকবার পড়ে পড়ে চিঠিটা প্রায় মুখস্থ হ'য়ে গেছে। যতবার পড়েছে ততবারই আশা-আশ্বাসে মন ভরে উঠেছে। এমন সুযোগ খুব কম লোকের ভাগ্যেই মেলে। নিজেকে খুব ভাগ্যবান ব'লে মনে হয়েছিল নীরেনের। আর মনে হয়েছিল—তাহলে সত্যি সত্যি তার কলমের জোর আছে। বাঙলা দেশে অন্ততঃ এমন একজন বিরস্ত মানুষ আছেন—যিনি তার লেখা পড়ে মুগ্ধ হয়েছেন, খুশী হয়েছেন। এবং স্বেচ্ছায় বিক্ষিপ্ত রচনাগুলো একত্র সন্নিবেশিত করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। নীরেন ভাবতেই পারেনি এত তাড়াতাড়ি বই আকারে ও-গুলো প্রকাশ করা সম্ভব হবে। অবশ্য ভবিষ্যতে একদিন হলেও হতে পারে—এই ধরণের একটা আশা মনে মনে সে পোষণ করত। তাই চিঠিটা পেয়েই সে বিশেষ উৎসাহ বোধ করেছিল। এখন আর সে-উৎসাহ নেই। সংশয়ের দোলা চলে মনটা অস্থির। তবুও-চিঠিটা বার করল নীরেন। প্রদীপের ক্ষীণ আলোয় আবার সেটা পড়বার চেষ্টা করল।

…আপনার লেখাগুলো আজকের সমাজকে বিশেষভাবে ভাবিত করতে পারে এই আশায় সে গুলোকে আমি বই আকারে প্রকাশ করতে চাই। আপনার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আগামী শনিবার রাত্রি ৯টার পর আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন। নীচে আমার ঠিকানা দিলাম। আপনার কলম আরও বলিষ্ঠ ও নির্ভীক হোক—ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা। শুভেচ্ছা ও প্রীতি সহ—

ভবদীয়

শ্রীগোলকবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়।

চিঠিটা কাওকেই দেখায়নি নীরেন। অফিসের সহকর্মীদেরও না। মনে মনে ঠিক করেছিল বই বেরুলে সকলকে আশ্চর্য করে দিয়ে সব কথা বলবে। দু'দিন গভীর অন্তর আনন্দের আবেগে কোথা দিয়ে যে সময় কেটে গেছল সে-খেয়াল ছিল না নীরেনের। গতকাল সন্ধ্যায় অফিসে News Editor তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। বলেছিলেন,—একটা সংবাদ তোমায় সংগ্রহ করতে হবে। আগামী কাল রাত্রেই Report করতে হবে। খবরটা খুব জরুরী এবং বিশেষ চাঞ্চল্যকর।

নীরেন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিল,—কিন্তু আগামী কাল আমাকে যে একটু বাইরে যেতে হবে।

—কোথায়?

—শ্বশুরঘরে।

তাই নাকি! তাহলে তো ভালই হ'য়েছে। আমিও তো ঐখানেই যেতে বলছিলাম। বলেই News Editor একটা টাইপ করা কাগজ নীরেনের হাতে দিয়ে বললেন,—এতেই সব লেখা আছে। যেমন যেমন নির্দেশ দেওয়া আছে সেই ভাবে কাজ করবে। যদি প্রয়োজন মনে করো তাহলে ওখানে যাবার আগে Identity Card দেখিয়ে Police Station-এ খবর দিয়ে যেও।

নীরেন টাইপ্ করা কাগজটা পড়তে পড়তে চমকে উঠল। অস্ফুট স্বরে কি যেন উচ্চারণ করল।

সম্পাদক মশাই সেটা বুঝতে পারলেন না। বোধ হয় অন্যমনস্ক ছিলেন!

নীরেন কাগজটা মুড়ে পকেটে রাখল। তারপর নিজের আসনে এসে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল।

হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে আপন মনে বলল,—আশ্চর্য! এমন 'Coincidence' ভাবতেও পারা যায় না। বিশেষ চাঞ্চল্যকর সংবাদ সংগ্রহের জন্য সম্পাদক মশাই তাঁকে যে-বাড়ীতে পাঠিয়েছেন—সেই বাড়ীতেই গোলকবাবু থাকেন। বাড়ীটা সম্বন্ধে অনেক Report সরকারী দপ্তরে জমা হয়েছে। তাই সম্পাদক চাইছেন এ-সম্বন্ধে সত্য তথ্য সংগ্রহ ক'রে তাঁদের কাগজে প্রথম প্রকাশ করতে, যাতে সরকার এবং জনসাধারণ,—দু'জনেই খুশী হয়।

অনেকদিন ধরে এই পত্রিকাতে কাজ করছে নীরেন। Reporter হয়ে ঢুকেছিল, আজও সে Reporter. চেষ্টা করলে এতদিনে হয়তো সে Assistant News Editor হতে পারত। কিন্তু সে চেষ্টা সে করেনি। Reporter হয়ে এখানে-ওখানে ঘুরে নিত্য নূতন সংবাদ সংগ্রহের মধ্যে এক রকমের thrill আছে,—রোমাঞ্চকর আনন্দ আছে। শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত ঘেরা ঘরে বসে দেশবিদেশের মুখরোচক সংবাদ পাঠ করে সে-আনন্দ পাওয়া যায় না। তাই নীরেন আজও Reporter. অবশ্য আগের চেয়ে এখন তার মাইনে অনেক বেশী। আর একটা 'নেশা' আছে নীরেনের। নিতান্ত অবহেলিত, অবজ্ঞাত বিষয় নিয়ে রসপূর্ণ অথচ serious নিবন্ধ রচনা করা। রচনাগুলো শুধু যে ওদের পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তা নয়, কলকাতার অন্যান্য নামকরা পত্র-পত্রিকাতেও নীরেন লেখে।

এই লেখা পড়েই গোলকবাবু মুগ্ধ হয়ে তাকে আহ্বান জানিয়েছেন। এবং সেই জন্যেই এত কষ্ট করে নীরেনের এখানে আসা। এবং এতক্ষণ অপেক্ষা করে থাকা। 'Report' হিসাবে যে-তথ্য সে-সংগ্রহ করতে এসেছে সেটা এক্ষেত্রে গৌণ, যদিও বিষয়টা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং সমাজ ও সরকারের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

সরকারের কাছে খবর গেছে—যে, এই বাড়ীটার মধ্যে ছোট ছোট খুপরী-খুপরী অনেক ঘর আছে। সেখানে গভীর রাত্রে মদ চোলাই হয়, জাল নোট ছাপা হয় আর মেয়েদের দিয়ে দেহব্যবসা চালানো হয়।

এখানে এসে নীরেনের মনে হ'ল—সরকারের কাছে যে-খবর গেছে তা নিতান্তই মিথ্যা গুজব। তার মধ্যে সত্যতা এতটুকু নেই। তাই সে-খবর সংগ্রহের ব্যাপারে আপাততঃ নীরেনের বিশেষ আগ্রহ নেই। এখন তার মুখ্য কাজ হল—যথাশীঘ্র গোলকবাবুর সঙ্গে দেখা করে পুস্তকপ্রকাশ সংক্রান্ত কথাবার্তা শেষ করে ফেলা। বাড়ীটা সম্বন্ধেও প্রয়োজনীয় তথ্য সে গোলকবাবুর কাছ থেকেই পেতে পারবে।

কিন্তু গোলকবাবুর তো দেখাই নেই। চন্দনাও চলে গেছে অনেকক্ষণ। যদিও ন'টা বাজতে এখনও দেরী, তবুও নীরেন অস্থির হয়ে উঠল। এই ভাবে একা একা বসে আর কতক্ষণ সে অপেক্ষা করবে! তাছাড়া সরকারের কাছে যে-Report গেছে তা যদি সত্যি হয়, তাহলে স্থানটা তো আদৌ নিরাপদ নয়। কে জানে কার মনে কি আছে।

এতক্ষণে নীরেন স্থান-কাল সম্বন্ধে একটু সচেতন হল। এবং পাত্রেরও যখন কোনও হদিস পাওয়া যাচ্ছে না তখন পাত্র সম্বন্ধেও তার সন্দেহ জাগল। মনে হল গোলকবাবুর চিঠিটার আগাগোড়া সবই মিথ্যা। ওটা একটা প্রলোভনের ফাঁদ। আর সেই ফাঁদে নীরেন নিজের অজান্তে এসে ধরা দিয়েছে। ছিঃ! ছিঃ! নিজেকে বার বার ধিক্কার দিতে লাগল নীরেন। এতদিন ধরে কত রকমের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেও নিজের সম্বন্ধে এতটুকু সতর্ক হতে পারল না। একেবারে ঘরের মধ্যে এসে কথা বলবার কি প্রয়োজন

ছিল তার। গোলকবাবুর জন্যে সে তো বাইরে দাঁড়িয়েই অপেক্ষা করতে পারতো। ঘরের মধ্যে এসে বসবার কোনও দরকার ছিল না। রূপসী নারীর অপর ইশারা তাকেও বিভ্রান্ত করল। নিজের কাছে নির্লজ্জভাবে ধরা পড়ে গেল নীরেন। রাতের কলকাতার নির্জন পার্কে, ময়দানে, গলির মোড়ে এইভাবে কত পথচারী বিভ্রান্ত হয়ে সন্ধান হারায় তার সর্বনাশ হয় এ-তথ্য তো নীরেনের অজানা ছিল না। তাহলে নিজের বেলায় সেই ভুল ও করল কি করে! বুদ্ধিহীন সারল্য! না নারী দেহের হাতছানি!

নীরেন অস্থির হয়ে উঠল। আর নয়! আর এখানে সে একমুহূর্ত অপেক্ষা করবে না। চুপি চুপি এখান থেকে পালিয়ে যেতে হবে। ওরা কেউ আসার আগেই সরে পড়তে হবে। নইলে বিপদ অনিবার্য।

নীরেন নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল। ঘর থেকে বাইরে বেরুতেই শুনতে পেল ও-পাশের একটা ছোট্ট ঘরে কিসের যেন আলোচনা হচ্ছে। বেশীর ভাগই পুরুষ-কণ্ঠ। মেয়েদের গলাও পাওয়া যাচ্ছে, তবে খুব কম!

সাংবাদিক নীরেন আপন কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হল। মুহূর্তে ভুলে গেল স্থান, কাল এবং পাত্রের কথা! অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে একপা একপা করে সেই ঘরটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। কান পেতে শুনতে লাগল ওদের আলোচনা!……

একজন প্রশ্ন করল,—যে-অন্ধশক্তি আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে তাকে আপনি কল্যাণকর বলছেন কেন? আদর্শ জীবনযাপন করেও তো তার হাত থেকে নিস্তার নেই। তাহলে সে শক্তি যে মানুষের কল্যাণ সাধন করবে—একথা কি করে বিশ্বাস করি?

গম্ভীর উদাত্ত গলায় অন্য একজন জবাব দিল,—ভবিষ্যতে মানুষ কি হবে সে-সম্বন্ধে যদি তুমি স্থির নিশ্চয় না হও তাহলে সে শক্তি কল্যাণকর কিনা তা বোঝা তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না। তবে এটুকু জেনে রেখে যাও যে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্জন করার ব্যাপারেও সেই শক্তি ক্রিয়াশীল। তোমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার সেখানে বিন্দুমাত্র কার্য-ক্ষমতা নেই। সেই শক্তির ইচ্ছানুযায়ীই তুমি গড়ে উঠছ!

এবার আর একজন প্রশ্ন করল,—মানুষ নিজের সুবিধার জন্যে ঈশ্বর নামক প্রচণ্ড শক্তি সম্পন্ন একটি অস্তিত্বকে সৃষ্টি করেছে। ঈশ্বর একটা প্রকাণ্ড ধোঁকাবাজি। এই জগতের মধ্যে জগৎ-বহির্ভূত কোনও শক্তিকে আমরা স্বীকার করতে পারি না!

গম্ভীর কণ্ঠ এবারও জবাব দিল,—আমিও তা স্বীকার করতে বলি না। আমি বলি জড়ের মধ্যেই সেই শক্তি—সেই চৈতন্যময় শক্তি নিগূঢ় ছিল। বর্তমানে তোমার, আমার,—সকলকার মধ্যেই সেই শক্তি পরবর্তী উন্নততর চেতনায় আমাদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে সর্বসময়েই ক্রিয়মান। এবং সেই জন্যেই সে শক্তিকে আমি বলেছিলাম কল্যাণকর! সেই শক্তির উপর ভরসা রেখেই আমাদের সবকিছু কাজ সম্পন্ন করতে হবে। সেই শক্তির যোগ থেকে আমরা যখনই বিচ্যুত হ'ব তখনই আমাদের মধ্যে নানা রকমের দুর্বলতা প্রকাশ পাবে। ক্ষমতালিপ্সা, স্বার্থপরতা, আত্মপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদি মোহ আমাদের গ্রাস করবে। আমাদের উদ্দেশ্য হবে ব্যর্থ,—আমাদের পূর্বসূরীদের মত আমরাও হ'ব লক্ষ্যভ্রষ্ট।……

পিছন থেকে হঠাৎ কে যেন নীরেনের আমার হাতা ধরে টান দিল।

নীরেন চমকে পাশ ফিরতেই দেখতে পেল একটি মেয়ে একেবারে তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অন্ধকার হলেও মেয়েটিকে দেখেই চিনতে পারল নীরেন। চন্দনা ব্যানার্জি,—যোড়শীর গোলকবাবুর স্ত্রী! এখন তার মাথায় ঘোমটা নেই। সাজ-পোষাকও আগের চেয়ে অনেক বেশী চটুল।

নীরেনের হাতে চাপ দিয়ে চন্দনা বলল,—এখানে আর একমুহূর্ত নয়। চলুন বাইরে চলে যাই!

—কেন? কি হয়েছে?—ভয় ভয় গলায় জিজ্ঞেস করল নীরেন।

—আর কথা বলবেন না! তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসুন।—আশ্চর্য কঠিন চন্দনার কণ্ঠস্বর। নীরেন বিমূঢ় হয়ে সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে চন্দনাকে ভাল করে দেখবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না।

চন্দনা আবার বলল,—চলে আসুন আসুন আমার পিছু পিছু। আর দেরী করবেন না।

চন্দনার পিছু পিছু একটা সুড়ঙ্গ পথ বেয়ে ভূতাবিষ্টের মত নীরেন একটা রাস্তায় এসে দাঁড়াল। কিছু দূরে একটি বাতিস্তম্ভ। সেখানে গিয়ে হাতঘড়ি দেখল। ঠিক ৯টা। অথচ কাজের কাজ কিছুই হল না। ষ্টেশনের দিকে তখনই যাত্রা সুরু করবে না গোলকবাবুর জন্যে অপেক্ষা করবে! —নীরেন ভাবতে লাগল।

—আবার দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন! —চলুন। —চন্দনা আবার নীরেনের হাত ধরে টানল।

—কিন্তু গোলকবাবুর সঙ্গে তো দেখাই হল না!

—আজ আর হবার আশা নেই। তাছাড়া কি দরকার দেখা করার।

—যাঃ! যে কাজের জন্যে এখানে আসা, সে কাজের তো কিছুই হল না।

—হবে! আমি কথা দিচ্ছি! এখন আমাকে সঙ্গে নিয়ে এখান থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করুন,—নইলে বিপদে পড়বেন।

নীরেন থমকে দাঁড়াল। তারপর দৃঢ়স্বরে বলল,—তোমাকে সঙ্গে নিলেই বরং আমি বিপদে পড়বো। তুমি বাড়ী যাও। আমি একাই কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি।

—না! আমাকে এই হস্তাপুরীতে একা ফেলে রেখে যেতে পারবেন না। আপনাকে কিছুতেই যেতে দেবো না। আপনি আমায় মুক্তি দিতে পারবেন এই বিশ্বাসই আপনাকে আমি এখানে টেনে এনেছি। আপনাকে অবলম্বন করে আমি বাঁচতে চাই, আমি আর কিছু চাই না।

—কিন্তু এ-সব কি বলছেন আপনি! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

—সব কথা না শুনলে বুঝতে পারবেন কি ক'রে? গাড়ীতে যেতে যেতে সব কথা বলব। এখন আর একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকা চলবে না। বলেই একটা রিক্সা ডাকল চন্দনা। —নীরেনকে উঠতে বলল। তারপর নিজে উঠল। —রিক্সাওয়ালাকে বলল—ষ্টেশনে চল। তাড়াতাড়ি চালাও নইলে গাড়ি পাবো না।

নীরেন অভিভূতের মত স্থির হয়ে বসে রইল। কোনও কথা বলতে পারল না।

ষ্টেশনের কাছাকাছি এসে চন্দনা ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞেস করল—কত টাকা আছে সঙ্গে?

—বেশী নেই। কেন?

—যদি দরকার হয়—এই সুটকেশটা রাখুন। প্রায় হাজার দশেক টাকা আছে এর মধ্যে। নীরেন বলল, ওটা তোমার কাছেই থাক।

—ভয় নেই। জাল নোট নয়। বলেই মৃদু হাসল চন্দনা। আপনাদের গোলকবাবুর কারখানাতে আমার প্রবেশ হয়ে আসছিল। উঃ, ছাড়া পেয়ে যেন বাঁচলাম।

[দুই]

শিয়ালদহগামী একটি ষ্টেনের একটি অপেক্ষাকৃত নির্জন কামরায় একটা নিরিবিলি কোন বেছে ওরা দুজনে গিয়ে বসল মুখোমুখি। রাত তখন প্রায় দশটা। গাড়ীতে বিশেষ ভীড় ছিল না। যারা ছিল,

চন্দনা ও নীরেনের সম্বন্ধে তারা কেউ বিশেষ কৌতূহলী নয়। তাই সহজভাবে এবং খুব আন্তরিকতার সঙ্গে চন্দনা তার নাতিদীর্ঘ জীবনের রহস্যঘন যবনিকা একটু একটু করে উন্মোচন করতে প্রয়াসী হল।

প্রথমেই নীরেনের সমস্ত সংশয় অপসারিত করবার উদ্দেশ্যে বলল—আপনাকে গোলোকবাবু যে চিঠিটা লিখেছিলেন,—গোড়াতেই বলে রাখি গোলকবাবুর জবানীতে সেটা আমরাই লেখা তবে ওর মধ্যে যে-তথ্য আছে তাতে কোনও মিথ্যা নেই। অর্থাৎ গোলকবাবুতো বটেই, আমিও আপনার কয়েকটি রচনা পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। তাই গোলকবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে আপনার আফিসের ঠিকানায় চিঠি ছেড়েছিলাম। জানতাম আপনি আসবেনই। লেখকদের নিশ্চিত প্রলুব্ধ করতে পারে যে-প্রস্তাব, আমি সেই প্রস্তাবই আপনার সামনে তুলে ধরেছিলাম।

—কিন্তু কেন? নীরেন মৃদু বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন। নীরেন বুঝতে পারল চন্দনা ঠিক সাধারণ মেয়ে নয়। ঐ বয়সের যে কোনো মেয়ের তুলনায় বুদ্ধি ওর অনেক বেশী তীক্ষ্ণ। জ্ঞানের গভীরতাও কম নয়।

—তবুও,—আগের কথার জের টেনে চন্দনা বলল, আমরা আশস্ত হতে পারিনি, কেননা অন্য কোনও প্রকাশকের সঙ্গে এ-ব্যাপারে আপনার কোনও কথাবার্তা হয়েছে কিনা তা আমরা জানতাম না। তাই এখান থেকে মৃদু পাঠিয়েছিলাম যাতে সাংবাদিক হিসাবে এখানে আসতে আপনি বাধ্য হন। মোট কথা আপনার আন্তরিক সহযোগিতা আমাদের বিশেষ প্রয়োজন।

—কিন্তু কেন?—নীরেন আবার প্রশ্ন করল।

নীরেনের প্রশ্ন শুনে মৃদু হাসল চন্দনা। হাসির আভাসটুকু ঠোঁটের কোনে ফুটিয়ে রেখেই বলল,—রবীন্দ্রনাথের পরিশোধ পড়েছেন? 'রাজকোষ হতে চুরি, ধরে আন চোর, নহিলে নগরপাল রক্ষা নাহি তোর, মৃত্যু রহিবেনা দেহে।' —মানে 'শ্যামা নৃত্যনাট্য' দেখেছেন?—বজ্রসেন যখন শ্যামাকে জিজ্ঞেস করল,—'আমারে করেছ মুক্ত কি সম্পদ দিয়ে?'—তখন শ্যামা কি বলেছিল মনে আছে।

নীরেন চন্দনার চোখের উপর দৃষ্টি রাখল। অবাক বিস্ময়ে দেখল, চোখের আলোয় কৌতুকের দ্যুতি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নীরেন বলল,—জানি, শ্যামা বজ্রসেনকে বলেছিল, সেকথা এখন নয়।

—আমারও সেই কথা! আপনার প্রশ্নের উত্তর এখন দেব না। অর্থাৎ আপনাকে কেন আমি আমরণ জানিয়েছিলাম, সেকথা এখন নয়।

—বেশ! ও প্রশ্নের উত্তর না হয় নাই পেলাম। কিন্তু গোলকবাবুর সঙ্গে আপনার ভাগ্যটা কেমন করে জড়িয়ে পড়ল সে-কথা তো জানতে পারি! সেই সঙ্গে গোলকবাবুর পরিচয়ও জানতে ইচ্ছে হয়।

দেখলে হয়তো তাকে চিনতে পারতেন। কেননা, আজ থেকে প্রায় বছর আঠারো আগে আপনি যখন মহেশগঞ্জের শিক্ষানিকেতনের আট্‌ম ক্লেশীর ছাত্র তখন ঐ গোলকবাবুই আপনাদের পড়াতেন। মনে পড়ছে!

চোখবুজে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে কি ভাবল নীরেন। ভ্রূ কুঁচকে বাইরের অন্ধকারের দিকে আরও কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বলল,—আজ থেকে আঠারোবছর আগে মহেশগঞ্জের শিক্ষানিকেতনে আমি পড়তাম একথা ঠিক। কিন্তু সে সময় গোলকবাবু নামে কোনও শিক্ষকের সংস্পর্শে আমি আসিনি।

সামান্য শব্দ করে হেসে উঠল চন্দনা।—'সরি'। আমারই ভুল হয়েছে। এখন যাঁর নাম গোলকবিহারী ব্যানার্জি একসময় তাঁরই নাম ছিল 'বৈকুণ্ঠপতি,' বয়সে অনেক বড় হলেও ছাত্রসম্পর্কে তিনি বোধহয় আপনার ভাগনে হতেন। মনে পড়ছে?

নীরেন হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল,—ও তাই নাকি! বৈকুণ্ঠমামা তো আমাদের বাংলা পড়াতেন আর পণ্ডিতমশায়ের অবর্তমানে সংস্কৃত। তাছাড়া তাঁর Private coaching class-এ আমরা যেতাম। সেখানে সব Subject-ই তিনি পড়াতেন। তিনিই এখনকার গোলকবাবু। ইস্! এ-কথা যদি আগে জানতে পারতাম তা হলে তাঁর সঙ্গে দেখা না করে কিছুতেই আমি চলে আসতাম না। আমাদের পারিবারিক সম্পর্কটা শুধু সম্বোধনের মধ্যেই বেঁচেছিল। ভাগনে হলেও বয়সে বড় বলে তাঁকে আমি মামা বলতাম। কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন আমাদের অত্যন্ত প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় শিক্ষক। এতদিন পরে এতকাছে এলাম শুধু প্রণাম করার সুযোগ পেলাম না! ছিঃ ছিঃ!—আপনমনে নিজেকেই ধিক্কার দিতে লাগল নীরেন।

চন্দনা আর চুপ করে থাকতে পারল না। খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতেই বলল,—প্রণাম!—আপনি সত্যিই হাসালেন। অমন মানুষকে কেউ আবার প্রণাম করে, বিশেষ করে আপনার মত একজন শিক্ষিত সাংবাদিক সাহিত্যিক। আপনিই বরং তাঁর প্রণম্য!

—ছিঃ, ছিঃ! অমন কথা বলো না। অমন কথা মনে আনাও উচিত নয়। তিনি আমার গুরু—।

—অতীতে ছিলেন। বর্তমানেও কি তাঁকে গুরু বলে স্বীকার করবেন!

নীরেন সহসা কোনও জবাব দিল না। দিতে পারল না।

চন্দনা বলল,—গোলকবিহারীর যে পরিচয় আপনি গোপনসূত্রে সংগ্রহ করেছেন, এবং যে-সংবাদের সত্যাসত্য নিরূপনের উদ্দেশ্যে আপনি এখানে এসেছিলেন, সে সংবাদ পেয়েও কি আপনি বলবেন, গোলকবিহারী এখনও আপনার গুরু। তা যদি বলেন তাহলে আমিও বলতে বাধ্য হ'ব—যে, আপনার গুরুভক্তি সত্যই প্রশংসনীয়।

—না, না, তা কেন হবে!—একটু যেন উত্তেজিত হয়েই কথাগুলো বলল নীরেন। বর্তমানে বৈকুণ্ঠবাবুর কি অধোগতি হয়েছে তাতো আমার জানা নেই। নাম পরিবর্তনের দিক থেকে সেটা অনুমানও করা যায় না,—কেননা দুটো নামেরই অর্থ প্রায় এক। বৈকুণ্ঠপতি ছাড়া কেইবা গোলকে বিহার করবেন। আমার উচিত ছিল সর্বাগ্রে তাঁর সঙ্গে দেখা করা। তা যখন হয়নি, তখন এ প্রসঙ্গ থাক।

চন্দনা নীরেনের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল,—আপনার চাকরি বজায় থাকবে কিসে? আজ রাত্রেইতো Report পেশ করার কথা।

—হ্যাঁ। কিন্তু সেকথা তুমি জানলে কি করে!

—সেকথা এখন নয়।

—আশ্চর্য! আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

—বোঝবার দরকার নেই! আপনারাই তো বলে থাকেন Ignorance is bliss. তবে আপনার দুশ্চিন্তা দূর করার উদ্দেশ্যে একটা কথা এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রেখে দিই, আগামীকাল প্রভাতী কাগজে গোলকবাবু সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রকাশিত হবে, তা এমন রহস্যপূর্ণ এবং চাঞ্চল্যকর হবে যে, আপনি যদি এ-সম্বন্ধে কোনও সংবাদ দিতেন তাহলে লোক জানত সেটা অনেক পুরোনো। সুতরাং কোনও সংবাদ না দেওয়াই হবে এখানে বুদ্ধিবেচনার কাজ।

ঘরাট্ট বন্ধুদের নির্দেশে এতক্ষণ ৩৫ নম্বর বাড়ীতে যোরহর তল্লাসী চলছে। সেইজন্যেই তো ধনপ্রাণ নিয়ে আপনার সঙ্গে পালিয়ে এলাম।

নীরেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে কিছুক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। হু হু করে গাড়ী ছুটছে। ঘোর

অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তবুও এই মুহূর্তে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতেই ভাল লাগছে নীরেনের। মনে হচ্ছে বাইরের সূচীভেদ্য অন্ধকার যেমন রহস্যপূর্ণ, কামরার আলোকোজ্জ্বল অভ্যন্তরস্থ পরিবেশও ঠিক তেমনি ঘন রহস্যের অন্ধ আবরণে আবৃত। চন্দনা কে?—কি তার পরিচয়?—কেনই বা সে এমনি করে তার সঙ্গে বেরিয়ে এল! কোথায় চলেছে সে?—কি তার উদ্দেশ্য!—নীরেন কিছুই জানে না; জিজ্ঞেস করলে চন্দনা আরও রহস্যময়ী হ'য়ে ওঠে। কপট অনুনয়ের ভঙ্গীতে বলে, সে কথা এখন নয়ে!—জোর করে কোনও উত্তর আদায় করতে পারে না নীরেন। করার উপায় নেই। সহযাত্রীরা তাতে সন্দেহ করতে পারে, এবং তার ফল আরও খারাপ হওয়াই স্বাভাবিক। তাই নীরেন আর কোনও কথা জিজ্ঞেস করল না। বাইরের দিকে তাকিয়ে কী করে এই রহস্যময়ীর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় সেই কথাই ভাবতে লাগল।

—কী ঘুম পাচ্ছে বুঝি!—হঠাৎ জিজ্ঞেস করল চন্দনা।—তা' পাবে বৈ কি।—সকাল থেকে কত উত্তেজনা! কত উদ্বেগ, কত পরিশ্রম!—কিন্তু কতক্ষণই বা ঘুমোবেন!—শিয়ালদা তো এসে গেল। তার চেয়ে বরং ছোট্ট একটা গল্প বলি শুনুন। তাতে সময়ও কাটবে। মনও হাল্কা হবে।

চন্দনার দিকে চেয়ে নীরেন একটু হাসল। বলল,—সেই ভাল!

চন্দনা বেঞ্চির উপর পা তুলে বেশ আরাম ক'রে বসল। তারপর হাতব্যাগ থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছতে মুছতে বলল,—গল্পকে কিন্তু গল্প বলেই নেবেন, সত্যি ভাববেন না যেন!……আমাদের অত্যন্ত পরিচিত এক ভদ্রলোক,—মনে করুন তার নাম অমিতাভ সেন। পেশা অধ্যাপনা এবং অবসর সময় সাহিত্যচর্চা। প্রগতিবাদী, চিন্তাশীল। এই অমিতাভ সেন এক সময় কয়েকটি নাটক রচনা করেন। দেশের মহাপুরুষদের জীবনের যে-দিকটা জনসাধারণের চোখের সামনে তুলে ধরতে বিশেষ কেউ তেমন প্রয়াসী হননি, সেই দিকটা নিয়েই তিনি নাটক রচনা করতেন এবং স্বয়ং নায়কভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। এইভাবে মহাপুরুষদের চরিত্র অভিনয় করতে করতে তাঁর মধ্যে এক নূতন চেতনা একটু একটু করে জাগতে লাগল। কথায়-বার্তায় আলাপে-আচরণে এবং জীবনচর্যার অন্যান্য বিভিন্ন দিক থেকেই মানুষটা ক্রমশঃ বদলে যেতে লাগল। সকলেই সেটা বুঝতে পারত, কিন্তু মুখ ফুটে কেউ কাউকে কিছু বলত না। বরং এর জন্যে মনে মনে সকলেই একটু গর্ব বোধ করত।

এইভাবে অমিতাভ সেন শেষ যে-নাটকটি রচনা করেন—তাঁর নাম বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ। সেই নাটকে নরেন্দ্রনাথের ভূমিকায় তিনিই অবতীর্ণ হয়েছিলেন।—নাম শুনে প্রথমে আমরা নাটকটি বুঝি M. N. Roy-এর জীবনী নিয়ে লেখা। কিন্তু পরে দেখলাম না, বিবেকানন্দের বৈপ্লবিক চিন্তাধারাকে অবলম্বন করে নাটকটি রচিত হয়েছে। ঐ নাটকে একটি মাত্র নারী চরিত্র ছিল। সেটি মার্গারেট নোবেলের। এবং সেই চরিত্রটি অভিনয়ের জন্য অমিতবাবু আমন্ত্রণ করে নিয়ে এলেন অপেশাদারী একটি ঘরোয়া মেয়েকে, মনে করুন, নাম তার অনন্তা। বাড়ীর সকলের অনুমতি নিয়ে নাট্যমঞ্চে অনন্তা একদিন অবতীর্ণ হল। সেই তার প্রথম অভিনয়, এবং বোধহয় শেষ। কিন্তু আসলে সেটা তার অভিনয় ছিল না, তার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার পরম সুযোগ হিসাবে অভিনয়কে সে স্বীকার করে নিয়েছিল।

অনন্তার কথা থাক! অর্থাৎ আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে নিবেদিতার কি ভূমিকা ছিল সে-কথা এখন থাক। এখন নরেন্দ্রনাথের কথাই বলি, অর্থাৎ অধ্যাপক অমিতাভ সেনের কথা।

আমি আগেই বলেছি,—মহাপুরুষদের চরিত্র অভিনয় করতে করতে অমিতবাবুর চেতনার রূপান্তর

ঘটতে লাগল। সেবে বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথের ভূমিকায় অভিনয় করবার সময় অমিতবাবু চাকরি-বাকরি ছেড়ে দিয়ে অভিনেতাদের নিয়ে একটি দল গড়ে তুললেন। বিপ্লবীর দল! তাঁর ব্যক্তিত্বে এমন যাদু ছিল যে, সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করত, তাঁর প্রতি একটা তীব্র আকর্ষণ বোধ করত। সুতরাং তাঁর আহ্বানে সকলেই সাড়া দিলেন। যাঁরা জীবনে কোনও দিন অভিনয় করেননি তাঁরাও একে একে এসে বিপ্লবী দলে নাম লেখালেন।

নীরেন অস্ফুট স্বরে প্রশ্ন করল,—বিপ্লব।

—হ্যাঁ বিপ্লব!—অর্থাৎ সমাজব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তন সাধন।—দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল চন্দনা।

—তা না হয় বুঝলাম! কিন্তু বিবেকানন্দের পথ অনুসরণ ক'রে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন কি সম্ভব। এযুগের তরুণেরা তো অন্য কথা বলেন। তাঁরা কেউ এতে অংশ নেবেন বলে তো মনে হয় না। সুতরাং অমিতবাবুর বিপ্লব কি করে যে সফল হবে তা তো ভেবেই পাচ্ছি না। তাই মনে হচ্ছে,—আসলে যাঁরা প্রকৃত বিপ্লব ঘটাতে চাইছেন, তাঁদেরকে বিভ্রান্ত করবার জন্য, সাধারণ মানুষের মনে নানা রকম সংশয় জাগিয়ে তোলবার জন্যে,—অমিতবাবু বোধহয় প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তের শিকার হয়েছেন।

চন্দনা মৃদু হেসে গম্ভীর হয়ে গেল। বলল,—বিদেশী দার্শনিক তত্ত্বে আকৃষ্ট হয়ে যাঁরা তাঁদের প্রদর্শিত পথে চলতে চান তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই অমিতবাবুর। তিনি শুধু জানাতে চান,—আমাদের দেশের ইতিহাস, দর্শন, সমাজতত্ত্বও ভাল করে জানা দরকার। বিপ্লব কি এবং কেন, সে-কথা বিশদভাবে ব্যাখ্যাত করেছেন এদেশের মনীষীরা। আমরা যে তাকে গ্রহণ করতে পারি না, যুগের প্রয়োজনে তাকে প্রয়োগ করতে পারি না, সে-অপরাধ আমাদের। আমাদের অধঃপতির একমাত্র কারণ, আমরা চিন্তা করতে পারিনা, চিন্তা করতে ভুলে গেছি।

অমিতবাবু এবং তাঁর দল চায় আমাদের মধ্যে,—অর্থাৎ আজকের তরুণদের মধ্যে যে-বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে—তা অপসারিত ক'রে তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে। দেশের নিম্নস্তর, দরিদ্র, অজ্ঞাত, অবহেলিত মানুষের মুক্তির জন্য বিবেকানন্দ একদিন সর্বস্ব পণ করতে আহ্বান জানিয়ে ছিলেন দেশের সর্বস্তরের মানুষদের।

—কিন্তু দুঃখের বিষয় সে-আহ্বান কেউ শোনেননি।

—তা জানি; —তখন শোনেনি—কেননা, তখন দেশ প্রস্তুত হয়ে ওঠেনি। তখন আমরা ভেবেছিলাম—ইংরাজকে হটাতে পারলেই দেশের মানুষ সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। তাই সেই দিকেই আমাদের ঝোঁকটা ছিল,—দেশ গঠনের দিকে তেমন কোনও উৎসাহ ছিল না।

—অমিতাভ সেন ও তাঁর দলকে কি জাতীয় সরকার প্রশ্রয় দেন?—একটা বেয়াড়া ধরণের প্রশ্ন ক'রে বসল নীরেন।

মৃদু হেসে চন্দনা বলল,—ঠিক তার উল্টো, ভীষণ ভয় করে।

—ভয় করে?—কেন?

উত্তরটা ভাষার দিক থেকে খুব সহজ। কিন্তু ভাবের দিক থেকে ভারী গভীর। জাতীয় সরকার এঁদের ভয় করে কেন না এঁরা সবাই কর্মযোগী। গীতা এঁদের আত্মিক শক্তি, আত্মবিশ্বাস এঁদের সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র। অবশ্য প্রয়োজন হলে আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রও এঁরা নির্দ্বিধায় ব্যবহার করবেন। সেদিক থেকেও এঁরা সুশিক্ষিত এবং যথেষ্ট দক্ষ।

—বিপ্লবী অথচ কর্মযোগী! —কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।—অনিচ্ছাসত্ত্বেও নীরেনের কণ্ঠস্বরে একটু শ্লেষ প্রকাশ পেল।

চন্দনা বলল,—গীতা পড়েছেন নিশ্চয়ই। তাহলে কর্মযোগীর সংজ্ঞা বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিতে হবে না। শুধু এই কথা বললেই বোধ হয় চলবে—যে, কর্মের ফল আশা না করে,—কর্মের জন্যেই যাঁরা কর্মসাধন করেন, তাঁরাই হলেন কর্মযোগী। এই শতাব্দীর প্রথম দশকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যাঁরা যোগ দিয়াছিলেন, তাঁরা ছিলেন এই জাতের,—তাই মুষ্টিমেয় অপরিণত বয়স্ক কয়েকটি তরুণের ভয়ে সে-সময় ব্রিটিশ সিংহ অস্থির হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ অধ্যায়ে যাঁরা নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউই ছিলেন না কর্মযোগী। গীতা থেকে অনেক দূরে তাঁরা সরে গিয়েছিলেন,—তাই কর্মের ফলভোগের আশায় বেশ-ভাল করে তাঁরা স্বাধীনতাকে বরণ করে নিয়েছিলেন। ঐ ভোগের লালসাটুকু যদি সে-সময় তাঁরা জয় করতে পারতেন, তা হলে ভারতবর্ষের ভূগোল এবং ইতিহাস সম্পূর্ণ অন্যধরণের হত। তা ছাড়া মৃন্ময়ী ভারতবর্ষকে কেউ তাঁরা আন্তরিকভাবে চিন্ময়ী মা বলে ভাবতে পারেননি। বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষের যে-ভাবমূর্তি বিপ্লবীদের মনের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন, স্বাধীনতা-আন্দোলনের শেষ অধ্যায়ে যাঁরা পুরোধা ছিলেন, বঙ্কিমের সেই ভাবমূর্তি তাঁদের মন থেকে বোধ হয় মুছে গিয়েছিল,—নইলে—। যাক্, অত বাগ্‌বিস্তারে প্রয়োজন নেই। এ-সব তথ্য নিশ্চয়ই আপনার অজানা নয়। আপনি এ-কথাও নিশ্চয়ই জানেন—যে, ত্যাগ ও তিতিক্ষা যে-পথের পাথেয়,—তীব্র অহমিকাবোধ ও নিদারুণ অসহিষ্ণুতাকে অবলম্বন ক'রে সে পথ দিয়ে বেশী দূর হাঁটা যায় না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে নীরেন বলল,—তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু এর প্রতিকার কি?

—বিপ্লব!—নূতন সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন। সাম্য প্রতিষ্ঠা। সাম্য—অর্থাৎ আপনারা যাকে বলেন—'Communism'। তবে পশ্চিমের প্রদর্শিত পথে নয়। বেদান্ত-প্রদর্শিত পথে।

—পশ্চিমের প্রদর্শিত পথে নয় কেন?—ভুরু কুঁচকে নীরেন প্রশ্ন করল।

ধীর অথচ দৃঢ় কণ্ঠে চন্দনা বলল,—অমিতবাবুর বিশ্বাস,—পশ্চিমী জড়বাদী দর্শন মানুষের অন্তর্জীবনের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ রূপে নীরব। ঐ জড়বাদী চিন্তাধারার সঙ্গে আমাদের ঔপনিষদিক চিন্তাধারার কিছু প্রভেদ আছে। যেমন ধরুন,—আমরা বিশ্বাস করি,—আন্তরিক অনুপ্রেরণায় উদ্বোধিত হ'য়ে বাইরের জীবনে সমতা, সমন্বয় ও সাম্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা যদি আমরা করি, তবেই আমাদের সে-চেষ্টা সার্থক হবে। জড়বাদীরা কিন্তু অন্য কথা বলেন; তাঁরা বাইরের থেকে বিধি-বিধান নিরূপণ করে মানুষকে তা অনুসরণ করতে বলেন। তাঁদের বিশ্বাস বাইরের চাপেই অন্তরের পরিবর্তন সম্ভব। আমাদের সব চেষ্টা ভিতর থেকে বাইরের দিকে, ওঁদের বাইরের থেকে ভিতরে। এই হল প্রথম প্রভেদ। দ্বিতীয়তঃ ওঁদের বিশ্বাস,—সমাজগত মানুষের সমস্ত ব্যানধারণা, গতিপ্রকৃতি, কর্মপ্রবণতা নিয়ন্ত্রিত হয়—উৎপাদন ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে অর্থনীতির কাঠামো গড়ে উঠেছে, তার দ্বারা। সংস্কৃতি বা ঐতিহ্যকে ওঁরা বলেন 'Super-structure' তার উপর মানুষের অগ্রগতি নির্ভরশীল নয়। আমাদের চিন্তাধারা কিন্তু অন্যরকম—আমরা বিশ্বাস করি,—মানুষের বহির্জীবনের—অর্থাৎ যাকে বলা যেতে পারে Surface life, তার গতি-প্রকৃতি দিয়ে সমগ্র মানুষকে বিচার করা যায় না। মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিই তার সমস্ত কর্মপ্রবণতাকে নিয়ন্ত্রিত করে, পরিচালিত করে। তাই এই অন্তঃপ্রকৃতির রহস্য যদি আমরা উদ্‌ঘাটন না করে সমাজগত মানুষের

গতিপ্রকৃতি কিংবা কর্মধারাকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে যাই, তাহলে, সে বিচার হবে আংশিক। সুতরাং তার থেকে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া যুক্তিসঙ্গত হবে না।

তৃতীয়তঃ আমরা জানি—মনোজীবনের পরে উত্তরতর অধ্যাত্মজীবনে মানুষ [একদিন পৌঁছোবে। অর্থাৎ উত্তরতর চেতনা এখনও মানুষের মধ্যে উন্মীলনের অপেক্ষায় রয়েছে। সেই উত্তরতর চেতনায় প্রতিষ্ঠিত হতে হলে যে সাধনার দরকার—গীতাতে সেই সাধনার পথই প্রদর্শিত হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমের অস্তিবাদী দর্শন, মানুষের মনের ওপারে অন্যকোনও শক্তি আছে বলে বর্তমানে স্বীকার করে না। মনোগত মানুষকে নিয়েই তাদের কারবার। মানুষ ভবিষ্যতে কি হবে তা নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। এবং তা নেই বলেই তাঁদের দর্শন একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত হয়তো কার্যকর, কিন্তু শেষ লক্ষ্যে পৌঁছুতে গেলে ঐ তত্ত্বকে পাথেয় করে অগ্রসর হওয়া যাবে না। দোতালার ভিতের উপর দশতালা বাড়ি গাঁথার প্রয়াসের মত সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে।

নীরেন এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। চন্দনাকে থামতে দেখে মৃদু হেসে বলল,—বৈষয়িক চিন্তার দ্বারা পরিচালিত হয়ে যে-বিপ্লবের পথে তোমাদের অস্তিবাবুরা এগিয়ে চলেছেন সেইটাই যে ঠিক পথ তা যতদিন না প্রমাণিত হবে, ততদিন, আমার মনে হয়, অস্তিবাবুর দল বিশেষ প্রশংসার দাবি করবে না। সুতরাং আপনার কথাতেই ফিরে গিয়ে—আমি মন্তব্য করতে বাধ্য হচ্ছি—যে, আপনার এই গল্পকে আমি নিছক গল্প বলেই মেনে নিলাম। তবে অনন্তা সম্বন্ধে কিছু জানাতে ইচ্ছা করে।—বলতে বলতে নীরেন জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল ট্রেণটি ষ্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকারে ষ্টেশনের নামটা ঠিক দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। পরিবেশ থেকে অনুমান করে নীরেন বলল,—আমরা বোধহয় সোদপুরে এলাম। এখনও আধঘন্টা সময় আছে,—সুতরাং যদি আপত্তি না থাকে তো অনন্তা সম্বন্ধে কিছু বল।

চন্দনা ঈষৎ হেসে বলল,—অনন্তা একটি মেয়ের নাম। অতি সাধারণ একটি মেয়ে। উপন্যাসের নায়িকা হবার মত তার কোনও যোগ্যতা নেই। সুতরাং তার সম্বন্ধে আপনার অহেতুক কৌতূহলকে সংবরণ করাই বরং ভাল।

—'সাধারণ মেয়েকে' নিয়েও রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখেছেন। যে-কোনও মেয়েই উপন্যাসের নায়িকা হতে পারে—অনন্তা তো পারেই। তবে ভয় নেই আমি ঔপন্যাসিক নই,—নেহাত সাংবাদিক।

—সাংবাদিকদেরই বেশী ভয়। তাদের কলমকে তাদের শত্রুমিত্র সকলেই ভয় করে। সমীহ করে। অনন্তা নামেই অনন্তা, 'সংবাদ' হবার মত এমন কিছু কাজ সে করেনি। শুধু জীবনে একবার সে অভিনয় করেছে। কিন্তু যাঁর চরিত্রটি সে অভিনয় করেছিল তিনি ছিলেন অসাধারণ মহিলা। প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন অনন্তা। বিদেশিনী, কিন্তু ভারতমাতার অতি প্রিয় সন্তান। তাঁর জন্মগতবর্ষতেও আমরা তাঁর পূর্ণ পরিচয় পাইনি। বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর আন্তরিক সম্বন্ধ যে কত নিগূঢ় ছিল সে-কাহিনী বেশীর ভাগ লোকের কাছে অজ্ঞাত থেকে গিয়েছে। যুক্তিবাদী পণ্ডিতেরা তাঁর চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন,—তাঁর জন্ম যেহেতু আয়র্লাণ্ডে সেই হেতু রক্তের দিক থেকে তিনি চিরকালই ইংরেজ-বিদ্বেষী। ভারতবর্ষের বিপ্লবীরা যখন ইংরাজদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করতে সচেষ্ট হল, তখন স্বাভাবিক কারণেই ঐ বিদেশী মহিলা বিপ্লবীদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। —এ বিচার যথার্থ নয় এ-কথা বলব না, বলব—এ-বিচার পুরোপুরি সত্য নয়। কেননা যে-চিন্ময়ী ভারতকে তিনি 'মা' বলে স্বীকার করেছিলেন, যাঁর বন্দনগান গেয়ে অন্য যে-কোনও ভারতীয় অপেক্ষা তিনি অনেক বেশী মনোকষ্ট পেতেন,—

এ-বিচারে সে-কথার কোনও উল্লেখ নেই। যাক্ ও-সব কথা! —অনন্তা এই চরিত্রটিকে কিন্তু যথাযথভাবে রূপায়িত করতে পেরেছিল। এবং সেইজন্যে অমিতবাবু তাকে একদিন ডেকে পাঠিয়েছিলেন। অমিতবাবুর সঙ্গে যেদিন তার একান্তে সাক্ষাৎ হল সেদিন অমিতবাবুকে এক আশ্চর্য প্রশ্ন করেছিল অনন্তা। জিজ্ঞেস করেছিল,—স্যার, আপনি বলতে পারেন—আমরা যে-স্বাধীনতা পেয়েছি সেটা অর্জন করেছি না ক্রয় করেছি? ইংরাজেরা একদিন বণিকের বেশে এদেশে এসেছিল; প্রায় দুশো বছর পরে যেদিন বিদায় নিল —শুনেছি তখনও তাদের ছিল সেই বণিকের বেশ। —এটা কি সত্যি?

—অমিতবাবু কি বললেন? —নীরেন যেন অত্যধিক উচ্ছ্বাস প্রকাশ ক'রে ফেলল।

চন্দনা হাসতে গিয়ে গম্ভীর হ'য়ে গেল। বলল,—অমিতবাবু বললেন,—যাবার প্রাক্কালে আমাদের জাতীয় নেতাদের সঙ্গে ইংরাজ যাদুকরদের যে-সব বৈঠক হয়েছিল সেখানে 'bargaining'এর চূড়ান্ত হয়েছে, —সুতরাং ক্রয় করেছি বললে বোধহয় ভুল হবে না। ১৯০৫-৮ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও ১৯১৯ সালের জালিয়ানোলাবাগের রক্তাক্ত দিনগুলির কথা সে-সময় কারও স্মরণে আসেনি। বীরের সেই রক্তস্রোত, মাতা-ভগ্নীদের সেই অশ্রুধারা বিস্মরণের উষর ধূলিকণায় সত্যি সত্যি বোধহয় শুকিয়ে গিয়েছিল,—নইলে দেশবিভাগ সম্ভব হল কি করে। পাঞ্জাব আর বাঙলা—সেই দুটি শক্তিকেই বেওয়া হল বলি। একজন অগ্নিতে যেমন দগ্ধ, অন্যজন বন্যাতে। মানুষের অগ্রগতির জন্যে এই দুটো শক্তির প্রয়োজন এখনও ফুরোয়নি। অথচ এই শক্তিকেই খর্ব করা হল। হয় কথাকথিতে শেষ পর্যন্ত জয়ী হল ইংরাজ। তুমি ঠিকই বলেছ অনন্তা,—We did not win freedom rather we purchased it.

চন্দনা হয়তো আরও কিছু বলত, কিন্তু নীরেন বাধা দিল। বলল, আমার অনুমান যদি সত্যি হয় তাহলে তোমাদের ঐ অমিতাভ সেনের সঙ্গে আমার একদিন সাক্ষাৎ হবেই। তখন তাঁর তত্ত্বকথা আরও শুনবো। আজ শুধু একটা প্রশ্ন করব,—অর্জন করেই হোক কিংবা ক্রয় করেই হোক,—যে-স্বাধীনতা পাওয়া গেছে তাকে তো আর অস্বীকার করার উপায় নেই। সুতরাং তাকেই কাজে লাগাতে হবে। এ-বিষয়ে তোমার অমিতবাবু কি বলেন তা কি তুমি জান?

চন্দনা যেন ঠিক এই ধরনের প্রশ্নই আশা করছিল। তাই সঙ্গে সঙ্গে বলল,—স্বাধীনতার তাৎপর্য আমরা বুঝি না। স্বাধীনতার অর্থ Liberty-নয়, Freedom ও নয় এমন কি Independence-ও নয়। স্বাধীনতার অর্থ Self-dependence। সুতরাং সর্বপ্রথম বুঝতে হবে 'self'কে অর্থাৎ 'আত্মন্' কে। স্বাধীনতাকে উপলব্ধি করতে গেলে একদিকে যেমন চাই গভীর আত্মসম্মানবোধ, অন্যদিকে ঠিক তেমনি চাই সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস। বিবেকানন্দ বলেছেন,—যে আত্মবিশ্বাসী নয় সেই নাস্তিক। এই তত্ত্বটাকে ভারতের আপামর জনসাধারণের কাছে তুলে ধরাই হবে বিপ্লবীদের প্রথম কাজ। আর দ্বিতীয় কাজ হবে,—আগামী দিনে চেতনার যে-প্রসার ঘটবে, অর্থাৎ মানুষ যে-বিশ্ববোধে উদ্বোধিত হবে, আপন জাতিগত সীমায় আবদ্ধ না থেকে বিশ্বগত মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ-যুক্ত হয়ে সাম্য ও মৈত্রীর প্রতিষ্ঠা সম্ভব ক'রে তুলবে,—তার জন্যে বিপ্লবীরা গ্রামে গঞ্জে নগরে বন্দরে সর্বশ্রেণীর মানুষদের প্রস্তুত করে তুলবে। ভারতবাসীদের মধ্যে এখনও জাতীয়তাবোধই জাগেনি, যতদিন না তারা পরিপূর্ণভাবে ভারতীয় হয়ে উঠছে ততদিন Internationalism-এর তত্ত্ব তারা সঠিক ভাবে গ্রহণ করতে পারবেন। সুতরাং বিপ্লবীদের কাজ হল পরিপূর্ণ ভারতবোধে এদেশের মানুষকে জাগ্রত করা। তারপর বিশ্ববোধে তাদের উদ্বোধিত করা। দুঃখের বিষয় পশ্চিমের জড়বাদী দর্শনে বিশ্বাসী এদেশের বিপ্লবীরা

এই তত্ত্বটিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করছেন। পরিবার কুল বংশ এবং আঞ্চলিক জীবনের সীমাবদ্ধতা থেকে মানুষকে মুক্ত করে জাতীয় জীবনের ঔদার্যে তাকে প্রতিষ্ঠিত না করে একেবারে বিশ্বজীবনের মঞ্চে তাকে নিক্ষেপ করলে সে-তো দিশেহারা হয়ে যাবেই। এ-ক্ষেত্রে অগ্রগতির প্রতিটি পর্যায়কে স্বীকার করে নিতেই হবে। double বা treble promotion এখানে চলবে না, ভারতবর্ষে,—যেখানে রাজ্যে-রাজ্যে, অঞ্চলে অঞ্চলে নানা সমস্যা নিয়ে পারস্পরিক বিরোধ লেগেই রয়েছে, সেখানে Nationalism-এর ভাবনায় মানুষকে আপ্লুত না করে Internationalism এর তত্ত্ব শোনাতে গেলে তা' ব্যানা বনে মুক্তো ছড়ানোই হবে। তাই জড়বাদীদের 'আন্তর্জাতিক' slogan এখানে তেমন হানা দিচ্ছে না। দিবেও না। তবে এ-কথা ঠিক ভবিষ্যতে মানুষকে বিশ্বসাম্য ও বিশ্বমৈত্রীর মন্ত্রে দীক্ষিত করে তুলতেই হবে। পরিপূর্ণ জাতীয়তাবোধ যখন প্রতিষ্ঠিত হবে তখনই প্রয়োজন হবে জাতির সীমা ছাড়িয়ে মানুষকে বিশ্বসীমায় তুলে ধরার। সে-সময় যদি কেউ জাতির মধ্যেই বেঁধে রাখতে চায় তাহলে প্রকৃতির প্রভাবেই তাদের সরে যেতে হবে। অতীতে যেমন ভীষ্ম-দ্রোণ-প্রভৃতি বীর আচার্যেরা কুলের সীমাকে প্রসারিত করে প্রতিবেশী ভিন্ন কুলের মানুষকে-নিয়ে নূতনজাতি গড়ে তোলার প্রচেষ্টার আনুকূল্য করেননি বলে যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁদের প্রাণ হারাতে হল—ঠিক তেমনি এ-কালেও অনেক মনীষী পণ্ডিত জ্ঞানী গুণীজন অতিমাত্রায় 'Nationalist'-ধর্মাবলম্বীই তাঁদের প্রভাব মানুষের মন থেকে অপসারিত হয়ে যাবে। নূতন ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠাই ছিল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মৌল উদ্দেশ্য। আধুনিক পৃথিবীতে পোপতন্ত্রের সঙ্গে সোবিয়তদের, ধনিকের সঙ্গে শ্রমিকের যে-সংগ্রাম সুরু হয়েছে বিশ্বসাম্য প্রতিষ্ঠাই সে-সংগ্রামের মৌল লক্ষ্য। সুতরাং সে-সংগ্রামে আমাদেরও শামিল হতে হবে। কেননা বিধাতার তাই অভিপ্রায়।

নীরেন একমনে মুগ্ধ হয়ে চন্দনার বক্তৃতা শুনছিল। আর ভাবছিল এ-সব কথাই বৈকুণ্ঠমামার অর্থাৎ গোলকবাবুর। চন্দনা শুধু তোতাপাখী কিংবা এ-সবই চন্দনার নিজস্ব চিন্তা!—তা যদি হয়,—তাহলে মানতেই হয়,—গোলকবাবুদের বিরুদ্ধে যে সংবাদ ছড়ানো হয়েছে—তাও ইচ্ছাকৃত; এবং তা বিপ্লবীদের কর্মধারার অন্তর্গত। কিন্তু এবিষয়ে নীরেন আর কিছু জিজ্ঞেস করবার সময় পেল না। ট্রেন শিয়ালদা ষ্টেশনে ঢুকল। রাত তখন সাড়ে এগারোটা।

এতক্ষণে নীরেনের খেয়াল হল চন্দনা নামক মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে এখন সে কোথায় উঠবে! সম্পূর্ণ অপরিচিতা বা অল্পপরিচিতা একটি সুন্দরী যুবতীকে নিয়ে এতরাত্রে নিজের বাড়ীতে যাওয়া বোধহয় ঠিক হবে না। তাছাড়া মেয়েটির সঙ্গে আছে অনেক টাকা। তাকাতী যাল কিনা কে জানে! সেটাও কম বিপদের কথা হয়। অথচ এই পরিস্থিতি সম্বন্ধে এতক্ষণ সে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। গাড়ীর মধ্যে বসে বসে academic আলোচনাগুলো মন্দ লাগছিল না। হুহু করে সময় কেটে গেল। এতটুকু ভাববারও অবকাশ পাওয়া গেল না। হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে নীরেন জিজ্ঞেস করল,—কোথায় যাবে এখন?

—বেশীদূর নয়—সার্পেন্টাইন্ লেনে আমার পৌঁছে দিলেই আপনার ছুটি।

—ছুটি নেওয়ার আগে আমারও কিছু করণীয় আছে,—মানে চাকরির খাতিরে।

চন্দনা চমকে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল,—এখনও চাকরির কথা মনে আছে আপনার? এতক্ষণ lecture দেওয়া বৃথাই গেল।

ষ্টেশনের চত্বর পেরিয়ে এসে নীরেন জিজ্ঞেস করল—'Taxi' তে যাবেন নাকি!

—কি দরকার, এইতো এইটুকু রাস্তা। গল্প করতে করতে চলে যাবো। সুটকেশটা আপনি দিন। ভ্যানিটি ব্যাগটা আমার কাছে থাক।

চন্দনার হাত থেকে সুটকেশটা নিয়ে নীরেন জিজ্ঞেস করল—ওয়ারের সামনে মুক্তো ছড়িয়ে খুব আফশোষ হচ্ছে, না। তা' আমার কাছ থেকে কি প্রত্যাশা করেছিলে তুমি?

—প্রত্যাশা আমার নয়, আপনার গোলকবাবুর, মানে বৈকুণ্ঠ মাষ্টারের।—ছাত্রের কাছ থেকে শিক্ষকের যা প্রত্যাশা তাই!

—কিন্তু তাঁর সঙ্গে তো দেখাই হল না।

—সময় হলেই আপনাকে খবর দেওয়া হবে। এতক্ষণে বোধহয় অমিতাভ ও অনঙ্গাকে চিনতে পেরেছেন।

—ঠিক পারিনি। কিছুটা বাকী আছে। আজরাত্রে গোলকবাবু জাহাজের ছেড়ে কোথায় যাবেন?

—এ-ছাড়া আর কোনও প্রশ্ন আছে?

—গোলকবাবু কি সত্যিই বিবাহিত?

মৃদু হেসে চন্দনা বলল,—প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় এখনও হয়নি। দ্বিতীয় প্রশ্নটা গোলকবাবুকেই জিজ্ঞেস করবেন—ভবিষ্যতে যেদিন দেখা হবে।

—আরও একটা প্রশ্ন আছে।—রাস্তা ফুরিয়ে আসছে দেখে নীরেন খুব তাড়াতাড়ি বলল কথাগুলো।—লেখা প্রকাশ করবার লোভ দেখিয়ে আমাকে তুমি ডেকেছিলে কেন?

হো: হো: করে হেসে উঠল চন্দনা। বলল,—তা বুঝি এতক্ষণেও বুঝতে পারেননি! এই বুদ্ধি নিয়ে সাংবাদিকতা করেন?—আপনার লেখা আমরা পড়েছি। গোলকবাবুর কাছ থেকে জেনেছি একদা আপনি তাঁর ছাত্র ছিলেন। আপনি কি ধরণের মানুষ তারও একটা মোটামুটি পরিচয় আমি পেয়েছি; তাই দুটি কারণে আপনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম,—প্রথম,—আপনাকে দেহরক্ষী করে নিরাপদে এখানে পৌঁছবো এই উদ্দেশ্যে,—একার পক্ষে বিপদের সম্ভাবনা ছিল বেশী। বিশেষ করে এতরাত্রের গাড়ীতে। বিপদ হলে নিজেকে যে রক্ষা করতে পারতাম না তা নয়, তবে তাতে অনেক ঝামেলা হত। তাই অপরের চোখে নেহাত স্বামী স্ত্রী হয়ে নিরাপদে আমরা চলে এলাম। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল—শিক্ষকের সাধনায় ছাত্রকে অনুপ্রাণিত করা। আশা করি এ-উদ্দেশ্যও সফল হয়েছে। আপনার কলমে বেশ ধার। তাই আপনাকে আমরা সঙ্গে পেতে চাই। পেলে বই আমরা অবশ্যই ছাপবো। কেননা আমাদের অনেক টাকার দরকার।—বলতে বলতে হাতঘড়িটা দেখল চন্দনা। তারপর বলল,—এবার সুটকেশটা আমার হাতে দিন। আপনি অনেকক্ষণ বয়েছেন।

একরকম জোর করেই সুটকেশটা কেড়ে নিল চন্দনা। আর ঠিক সেই সময়েই কোথা থেকে একটা মস্ত বড় মটোর তীব্র আলো জেলে পাশে এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেল 'হেডলাইট'। সন্ত্রস্ত হয়ে নীরেন চন্দনাকে হাত ধরে সরিয়ে আনতে গিয়ে দেখল,—দরজা খুলে গাড়ীর মধ্যে ঢোকবার চেষ্টা করছে চন্দনা।

নীরেন একটু এগিয়ে আসতেই গাড়ীটা ষ্টার্ট দিল। চন্দনা তখন ভেতরে। বলল,—আবার দেখা হবে। নমস্কার!

শেষের কথাগুলো বোধহয় শুনতে পেল না নীরেন। তাই কিছু বলতে পারল না। বিহ্বল হয়ে অন্ধকারের মধ্যে ক্রমশঃ ডুবে যাওয়া গাড়ীটার দিকে তাকিয়ে রইল।

শ্লোকস্তবমালা

আশীষ গুপ্ত

বীণাপাণির চোখে জল। শুকিয়ে এসেছে। কিন্তু কপোলতলে যে'কটি সূক্ষ্ম রেখা এখনও দেখা যাচ্ছে তা থেকে উপলব্ধি করা শক্ত নয় যে এর আগে তিনি অঝোর ধারায় কেঁদেছেন : অর্থাৎ আমাদের চলতি বাংলায় যাকে বলে "হাপুসনয়নে কাঁদা" তেমনি করে।

মুখ হতে, শিহরিত কণ্ঠে স্তব করলেন তিনি চতুরাননের। ব্যাকুলভাবে বললেন, ভগবন্, বিপন্না আমি, আমাকে রক্ষা করুন।

মহাদেবতার বন্দনায় প্রীত, কিন্তু তাঁর বিপদে অনুদ্বিগ্নচিত্ত হিরণ্যগর্ভ, প্রশ্ন করলেন কৌতূহলিত মুখে, কি ব্যাপার?

এবার আর অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না বাগ্‌দেবী, কাঁদলেন। যেমন করে আত্ত সন্তান অসঙ্কোচে পিতামাতার কাছে কাঁদে তেমনি করে। বললেন রোদনসিক্ত কণ্ঠে, হে বিধাতা এ কী নিষ্ঠুর কৌতুক। আপনি জগৎস্রষ্টা আপনি ত্রিকালজ্ঞ। সর্ব বিষয় পরিজ্ঞাত থেকেও আপনার এ কিরূপ জিজ্ঞাসা! কিন্তু তথাপি যখন নূতন অবগতি চাইছেন, তাহলে সব কথা খুলেই বলি।

বললেন। খুব মনোযোগের সঙ্গে শুনলেন বিধাতৃ। একান্ত দৃঢ়তায় ঘাড় নাড়লেন, হবে না।

কি হবে না? বাগ্‌দেবী স্তম্ভিত।

তোমার কামনা পূর্ণ হবে না।

সেকি! আমার আশীর্বাদ, আমার প্রতিশ্রুতি বিফলে যাবে?

হাঁ যাবে। ত্রিবিজয়ী বীরেরও পলিত শঙ্কুকে পা কাটে।

এবার আর আত্মসংবরণ করতে পারলেন না দেবী বীণাপাণি। বিধাতার পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়লেন,—দেবাদিদেব, রক্ষা করুন। আমার এতবড় অসম্মানের হাত থেকে, মর্ত্যের মানুষের নিকট আমার এ মহাকলঙ্ক হতে আমাকে রক্ষা করুন।

স্বয়ং বিধাতা পুরুষও দুশ্চিন্তিত। কিছুক্ষণ ভাবলেন, —এমনিতে তো কোন উপায় দেখছি না। ওই নারী তোমার অতি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। তোমার সবকিছু প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেবার আন্তরিক ক্ষমতা ওর মধ্যে।

একটু ইতস্তত করে বললেন, বরং এক কাজ করি, ওকে বিবাহিতা স্ত্রীতে রূপান্তরিত করি।

দেবী সরস্বতী বিস্মিত। কিন্তু আমার প্রতিশ্রুতি, আমার আশীর্বাদ?

সেটা সফল করার চেষ্টা করা যাবে ওর বিবাহোত্তর কালে। পাত্রও ওরই উপযুক্ত হওয়া চাই। দুই গুণাত্মক রাশির গুণফলে যদি ঋণাত্মক রাশির সৃষ্টি হয়, এই আশা।

শুধু আশা? অবশ্যম্ভাবী কিছু নয়?

বিরক্ত হলেন দেবাদিদেব প্রজাপতি। এরকম কঠিন সমস্যায় আর কখনও পড়েননি তিনি। একটা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার নিয়ে এসেছেন দেবী সরস্বতী তাঁর কাছে। চতুর্দিকে চতুর্মুখ বিঘূর্ণিত করে রোষ কঠোর কণ্ঠে তিনি বললেন, ওর বিবাহোত্তরকালে যাহোক কিছু

একটা করে দেব। অবশ্য তোমার সক্রিয় সহযোগিতা তো থাকবেই। কিন্তু অতঃপর আশীর্বাদ-টাশীর্বাদগুলো একটু জায়গা বুঝে কোরো।

একটু থেমে বললেন, এখন যাও তোমার ভক্তবৃন্দকে স্বপ্ন দর্শনে সংবাদ প্রদান কর গিয়ে। আমার মধ্যাহ্ন নিদ্রার আর ব্যাঘাত কোরো না।

প্রণাম করে অর্ধপ্রসন্ন সরস্বতী বিদায় নিলেন।

স্বর্গলোকের কথা কিছু বলেছি, এবার আমাদের মাটির পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করি। অর্থাৎ একটুখানি পশ্চাদপসরণ করে কাহিনীটা গোড়া থেকে বলি।

তিন বছর ধরে বাকলি ক্লাস সিক্স-এ পড়ছে। কিন্তু আগে ওর চেহারার বর্ণনা দরকার।

বাকলি খুব কর্সা, নাকটা একটু চাপটা, মুখের তুলনায় একটু বেশী জায়গা দখল করে আছে নাকটা। কান দুটো বড় বড় এবং তা বজরার খোলের মত একটু অধিক পরিমাণে ভাঁজ হয়ে আছে। এটুকু বাদ দিলে বাকলির মুখশ্রী ভালো। এই কথাই তো তার বাবার অফিসের লোকজন বলতে শুনেছি।

কিন্তু বাকলির গুরুত্ব আছে, তার মানে আছে ওজন। স্কুলের গেটে বৃষ্টির জল জমে কাদা হচ্ছিল। বড় বড় ঝামার খোয়া ফেলা হয়েছে সেখানে। ক্লাসের মেয়েরা বলল, তাই মহাভারত ওখানটায় বারকয়েক দুর্মুষ করে দেনা ভাই, তুই কয়েকবার হাঁটাহাঁটি করলেই লেভেল হয়ে যাবে। নইলে আমাদের গেট পার হতে অসুবিধে হচ্ছে।

বাকলির বাসনায় হল সীতা। কিন্তু মেয়েরা বলে মহাভারত। কখন কখনও দুর্মুষ। সেট থেকে মাঝে মাঝে শিক্ষিকারাও তাকে "মহাভারত" অথবা "দুর্মুষ" বলে ফেলেন। অবশ্য মুচকি হেসে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সংশোধন করেন পোষাকী "সীতা"তে। এ সবই হল অবশ্য বাকলির গুরুত্বের পরিমাপক।

২ রা বছর বয়সেই বাকলির চেহারা বেঢপ হয়ে উঠল পেটে ভাঁজ, গলায় খাঁজ। চিবুক ঠেকল এসে বুকে। হাত পা হয়ে দাঁড়াল বুক্তিস্টীয়ের মত। সে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি।

মেয়ে নিয়ে বাপ মার আর চিন্তার অবধি নেই। ডাক্তার দেখায়। খাওয়া কমায়। কিন্তু মেয়ে যে সেই লম্বায়-চওড়ায় হুড়হুড় করে বাড়ে, তা আর থামে না।

তবে টাকা আছে। বাকলির নয়, তার বাবার। রেলের ক্লেম্‌স্ বিভাগের বড়বাবু। তা বাবু যে বড় তাতে সন্দেহ নেই।

দু'ফুট দীর্ঘ, দু ফুটেরও বেশী প্রস্থ। কেউ বলে পাঞ্জাবী, কেউ বলে কাবুলী। কিন্তু ঠিক সত্যি কথা কেউ বলে না যে দৈত্যবিশেষ। কারণ বড়বাবুর হাত খুব দরাজ, দু'হাতে টাকা লোটেন, কিন্তু স্বার্থপর নন্। সবাইকে দিয়ে খুয়ে খান।

বড়বাবুর আয়ের রাস্তা তাঁর বিশাল দেহের মতই প্রশস্ত। মাল খোয়া গিয়েছে। রেল কোম্পানীর বিরুদ্ধে দাবী। ঠিক আছে, এক হয় হারানো মাল খুঁজে দেব নয়তো তার জন্যে কোম্পানীর কাছ থেকে খেসারত আদায় করে দেব,—টাকা ছাড়। দাবীদারেরা রাজী। রেলওয়ে ক্ষতিপূরণ দেয়। একটা মোটা খবরা আসে বড়বাবুর জামার ভেতরকার পকেটে। অতএব বেনামী গাড়ীবাড়ী নিয়ে প্রায় উচ্চমধ্যবিত্ত অবস্থা।

শনিবার দিন বাকলিকে ক্লাস সিক্স-এ ভর্তি করে দেওয়া হল। বিকেল বেলাতেই তার গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হলেন দু'জন, সকালে একজন, সন্ধ্যায় একজন। সোমবার থেকে পড়াবেন। বাবা নিশ্চিন্ত। মা খুশী। বাকলির জন্যে নিযুক্ত বন্দোবস্ত করা গিয়েছে। এবার একেবারে হুড়হাড় করে মেয়ের লেখাপড়া হবে।

রবিবার দিন সকালবেলা। বাবা তাঁর এক বন্ধু পার্টির বাড়ীতে যাবেন, ধরকষাকষির জন্যে। বড় মনোজ। কিন্তু কঠিন চিজ, ধরে বসছে না। একটু

pressurize করা, অর্থাৎ বিশেষভাবে প্যাচকষা দরকার। তাই নিজেই যাচ্ছেন তার বাড়ী।

সকাল সাতটা। বেরোবার পথে বাকলির পড়ার ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলেন বিশাল চেয়ার জুড়ে বাকলি পড়ছে D, R, U, M, ড্রাম। ড্রাম মানে ঢাক। D, R, U, M, ড্রাম। ড্রাম মানে ঢাক।

বাবা মহা খুশী। একদিনও কাটেনি। স্কুলে ভর্তি হবার সঙ্গে সঙ্গেই বাকলির পড়াশুনায় কী মনোযোগ!

প্রসন্ন মুখে ঘাড় নাড়তে নাড়তে গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন, পড়ু মা, ভালো করে পড়ু। খুব ভালো করে পড়ু। পড়ু বাবা ভালো করে।

দু'ঘণ্টা পরে ফিরলেন বড়বাবু বীরেশচন্দ্র। বাকলির পড়ার ঘর থেকে উচ্চ চীৎকার শোনা যাচ্ছিল। বাকলি পড়ছে। বীরেশচন্দ্র উদ্ভাসিত মেয়ের লেখাপড়ায় এমনতর নিষ্ঠা রেখে।

পর্দা সরিয়ে মুখ বাড়িয়ে হাসিমুখে বললেন, পড়ু বাবা ভালো করে।

কিন্তু বাকলি তখন চীৎকার করছে D, R, U, M, ড্রাম। ড্রাম মানে ঢাক। D, R, U, M, ড্রাম। ড্রাম মানে ঢাক।

শুনে চোখ কপালে উঠল বীরেশচন্দ্রের। সে কি রে। এখনও তোর ঢাক শেষ হয়নি?

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বাকলি বলল খানিকটা যেন জোরের সঙ্গে, নাঃ। কী যে বিপদ হয়েছে, Drum মনে থাকে তো "ঢাক" মনে থাকে না। আর "ঢাক" মনে থাকে তো Drum মনে থাকে না। কত যে চেষ্টা করছি।

বিষণ্ণমুখে বীরেশচন্দ্র বাড়ীর ভেতরে চলে গেলেন। যাবার সময়ে শুধু বলে গেলেন, হবে। ক্রমে ক্রমে হবে। পড়ু বাবা ভালো করে।

মেয়ে বাপাপাপির সঙ্গে সম্বন্ধের সূত্রপাত সেইদিন সেই "ঢাকের বাড়ি" থেকে।

অথচ বাকলি প্রভূত চেষ্টা করে। কিন্তু মনে হয় ওর কাঁধের ওপর থেকে ব্রহ্মতালু অবধি গ্রানিটে তৈরী। বিশাল হাতুর দিয়ে ঠুকলেও সেখানে কোন মশলা অনুপ্রবেশ করবে না। তাছাড়া গৃহশিক্ষক সংখ্যায় দু'জন হলেও বিদ্যার ওজনে তাঁরা সংযুক্তভাবে এক মিলিগ্রাম।

মেয়ালের গায়ে ক্যালেণ্ডার ঝুলছে। সিমেন্ট কোম্পানীর ক্যালেণ্ডার। সেতু তৈরী হচ্ছে, শ্রমিকেরা কাজ করছে। গাঁথা হচ্ছে কংক্রিটের ভিত্তি। বড় করে ওপরে লেখা আছে, fortification। সেই দিকে তাকিয়ে বাকলি হঠাৎ প্রশ্ন করল, কথাটার মানে কি মাস্টার মশাই?

নরেন মাস্টার বাকলিকে বাংলা ইতিহাস আর ভূগোল পড়ান। তিনি নিজে চীনেবাজারের এক ছিপ-বঁড়শীর দোকানে হিসেবের খাতালেখার কাজ করেন। তাছাড়া সন্ধ্যাবেলায় আশপাশের দু'একটা ছোটখাট দোকানেও কিছু কিছু হিসেব লেখেন। বঁড়শীর দোকানের মালিক বীরেশচন্দ্রের পরিচিত। তাঁরই সুপারিশে নরেন মাস্টারের চাকরি। আরও দুটো টিউশন আছে। রাত্রিতে একটা এবং খুব ভোরে একটা।

বাকলির প্রশ্নে নরেন মাস্টার চমকে উঠলেন, fortification দেখছি যে। এ আবার শক্ত কি? দুটো twentification হলেই একটা fortification হবে।

বাকলি ছাড়বার পাত্রী নয়। গোঁয়ার-গোবিন্দ নির্বোধের একেবারে সামনাসামনি পড়ে গেলে সজ্ঞান ব্যক্তির অনেক সময় নিদারুণ অসুবিধা হয়। নরেন মাস্টারের হল সেই অবস্থা।

বাকলি প্রশ্ন করল twentification মানে কি?

নরেন মাস্টারের উপস্থিতবুদ্ধি প্রচুর, নইলে বঁড়শীর হিসেব ও বাকলির মাস্টারী একসঙ্গে করতে পারতেন না।

সামান্য একটু থতমত খেয়ে বললেন, fication মানে হল গল্প, উপন্যাস। Twentification মানে হল এককুড়ি উপন্যাস fortification মানে চল্লিশটা।

বাকলি আবার জিজ্ঞেস করল, পোল তৈরী হচ্ছে, তাহলে ওপরে কেন লেখা থাকবে চল্লিশটা গল্প?

হাঁ, হাঁ, বুদ্ধিমতী মেয়ে কিনা, ঠিকই প্রশ্ন করেছে। আমাদের দেশে পোল প্রায় তৈরী হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভাঙে। কিছু কিছু লোক মরে,—তারপরে আবার তৈরী হয়। আবার ভাঙে, আবার লোক মরে, আবার মেরামত হয়। এমনি করে কয়েকবারের পর শেষ অবধি টিকে যায় কিছুকালের জন্যে। এটা আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব কিনা! তাই ওপরে লেখা আছে চল্লিশবারের গল্প!

এতক্ষণে বাকলি খুশী। নরেন মাস্টারের ঘাড় ছিড়ে জল ছাড়ল। এখান থেকে বেরিয়েই কারও থেকে জেনে নিতে হবে fortification মানে কি।

পড়া সেদিনকার মত সাঙ্গ হল।

অথচ মজা এই যে বাকলির সাধারণ বুদ্ধির অভাব নেই, তাছাড়া অঙ্কেও তার মাথা বেশ পরিষ্কার। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে তার মস্তিষ্ক একেবারে পাথর কুঁচি-সিমেন্টের কংক্রীট। কোন কিছুই তার মনে থাকে না, নাম না, ধাম না, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ না, কিছু না। কিন্তু তার বেকায়দা প্রশ্নে তারা মাস্টার ও নরেন মাস্টারের মত এক মিলিগ্রাম ওজনের শিক্ষকরা রীতিমত সন্ত্রস্ত। নরেন মাস্টার তো ছিপখড়দীর দোকানে খাতা লেখে, আর তারা মাস্টার ধূপকাঠি বিক্রী করে দুপুরবেলা বড় বড় অফিসের বাবুদের কাছে ঘুরে ঘুরে। মাদ্রাজ না মহীশূরের ওদিককার কোন্ এক কোম্পানীর এজেন্সি আছে তারা মাস্টারের। কাঠিগুলো ভালো, গন্ধেও মন্দা। তা মন্দ আয় হয় না তারা মাস্টারের। দুপুরবেলা ধূপকাঠি আর সকাল বিকেল এমনিতর ছেলেমেয়ে পড়ানো।

ধূপকাঠি কোম্পানীর হয়তো উপকার হচ্ছে তারা মাস্টারের দ্বারা, কিন্তু তার ছাত্রছাত্রীদের—এবং অভিভাবকদেরও—বারোটা নয়, চল্লিশটা বাজিয়ে দিল তারা মাস্টার!

তারা মাস্টার বই দেখে দেখে পড়াচ্ছিল, পদার্থ তিন প্রকার, কঠিন, তরল, বায়বীয়, পদার্থের একটা নির্দিষ্ট হল যে সে জায়গা দখল করে থাকবে। পদার্থ থাকলে জায়গা শূন্য থাকতে পারে না।

বাকলি মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। হঠাৎ প্রশ্ন করল, তাহলে অপদার্থ মানে কি মাস্টারমশাই?

যা পদার্থ নয়।

কিন্তু আমি তো, ধরুন, একটু মোটা-সোটাই আছি। কতটা জায়গা জুড়ে থাকি,—কতবড় স্পেশাল চেয়ার আমার! তবুও মা কেন আমাকে বলে 'অপদার্থ'?

তারা মাস্টার থতমত খেয়ে গেল। ওটা তোমাকে আদর করে বলেন!

বাকলি গম্ভীর হয়ে রইল। বাজে উত্তর। সে মোটেই খুশী হয়নি!

পরক্ষণেই তার মনে হল যাহ'ক মাস্টার তো বেশ খানিকটা জব্দ হয়েছে! এবার প্রসন্ন হয়ে উঠল তার মুখ।

জানেন মাস্টার মশাই আজ ইস্কুলে একটা কাণ্ড হয়েছে।

"অপদার্থ" সম্পর্কে নূতন কোন প্রশ্নের হাত থেকে রেহাই পেয়ে তারা মাস্টার নিশ্চিন্ত প্রস্তুতির জন্যে বাকলির দিকে তাকিয়ে রইল।

আজ আমাদের ইন্‌স্‌পেক্টর্‌স আসবার কথা ছিল। কাল আমাকে আমাদের ক্লাস টীচার শুভাদি ডেকে বললেন, লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি কাল ইস্কুলে এসো না। ইন্‌স্‌পেক্টর্‌স্ আসবেন, তোমাকে যদি কোন কিছু প্রশ্ন করেন তাহলে তো উল্টোপাল্টা যা তা বলবে। তাতে তোমারও বিপদ, আমাদেরও বদনাম। দরকার কি তার? কাল বরং তুমি এসো না, আমি তোমাকে এমনিতেই "present" করে দেব। কেমন?

ঘাড় নেড়ে দিলুম। কিন্তু মনে মনে ভীষণ রাগ হয়ে গেল। কেন ইস্কুলে যাব না? যাইনে দিইনে আমি? পড়াশুনার চেষ্টা করিনে আমি? আমার মাথায় কিছু না ঢুকলে, শত চেষ্টাতেও কিছু মনে না রাখতে পারলে আমার কি দোষ? ঠিক করলুম যা খুশী বলুনগে শুভাদি, আমি আজ ইস্কুলে যাবই।

সামনের চা-সিঙ্গাড়া ঠাণ্ডা হবার উপক্রম, মুখের ভেতরকার বালসো'র রস ভালো করে চেটেপুটে খেওয়া হয়নি। তারা মাস্টার হাঁ করে বাকুলির গল্প শুনতে লাগল।

—আর একেবারে আগেভাগে গিয়ে প্রথম বেঞ্চির প্রথমেই বেয়ারার গা ঘেঁসে বসে রইলুম। ঘণ্টা বাজল। একটু পরেই ইন্‌স্‌পেক্ট্রেস্‌কে নিয়ে হেডমিস্ট্রেস সুপর্ণাদি ও শুভাদি আমাদের ক্লাসে ঢুকলেন। আমাকে কার্স্ট বেঞ্চেতেই বসে থাকতে দেখে শুভাদির সে কী দুখের অবস্থা।

বাকুলি হাসল, হি, হি, হি।

বালসোর রস আর চেটে খাওয়া হল না, মিলতে হল তারা মাস্টারের গল্পশোনার কৌতূহল বেড়ে গিয়েছে।

জিগ্যেস করলেন ইন্‌স্‌পেক্ট্রেস প্রথমে অনেকটা হাবিজাবি প্রশ্ন বিভিন্ন বিষয়ে। কেউ কেউ জবাব দিল ঠিকঠাক, অনেকেই পারল না। শুভাদি আমাকে এক রকম আড়াল করেই রইলেন, যাতে ইন্‌স্‌পেক্ট্রেস্‌ কিছু না প্রশ্ন করেন। আমিও বাঁচলুম।—এমনি সময় হঠাৎ—বলতে বলতে বাকুলির আবার হি হি হি হাসি।

তারা মাস্টার এবার তালমুট চিবোতে ভুলে গিয়ে বাকুলির দিকে তাকিয়ে রইল।

হি হি হি। বাকুলির হাসি আর থামে না। অবশেষে বলল যে, হঠাৎ উনি বলে উঠলেন, এবার তোমাদের একটা বুদ্ধির অঙ্ক দিই?

মেয়েরা সবাই একসুরে বলল, দিন দিদিমণি, দিন।

—আচ্ছা ধর বাজারে আজ আলু বিক্রী হচ্ছে আধ পয়সা কিলো। তাহলে আমার বয়স কত?

সুপর্ণাদি, শুভাদি তো অবাক। ক্লাসসুদ্ধ মেয়ে তো একেবারে থ। এ আবার কি অঙ্ক রে বাবা?—আমি কিন্তু ঘাবড়াইনি একটুও। হাত তুলে হাসফাস করে কেবলই বলতে লাগলুম, বলুন দিদিমণি? বলুন দিদিমণি? বলুন?

সুপর্ণাদি, শুভাদি সবাই যেন ভয়ে কাঠ হয়ে গেলেন। আমি আবার এই বিদঘুটে প্রশ্নের কি যা জানি বোকা উত্তর দেব।

অবাক হলেন ইন্‌স্‌পেক্ট্রেস্‌ও। তিনি তো কোন উত্তর আশা করে আর এমনতর বিদঘুটে প্রশ্ন করেননি।

চমকে উঠে আমার দিকে সোজা তাকিয়ে বললেন, বলবে তুমি? তা বল—

আমি একটুও ভয় পাইনি। চট করে উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, চল্লিশ।

কি চল্লিশ? অবাক হয়ে গিয়েছেন তিনি!

চল্লিশ বছর।

সে কি? কি করে হল?

গল্পটা একটু কেঁচে যাচ্ছিল। অনেক করে তা ঠিক করে নিয়ে বললুম, আমার একটা মামাতো দিদি আছে। সে আর আমরা, তার বয়স কুড়ি। কিন্তু আপনি পুরো আপনার চল্লিশ।

ক্লাস একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। কারও মুখে কোন কথা নেই। মেয়েরা তো বটেই, সুপর্ণাদি, শুভাদি, ইন্‌স্‌পেক্ট্রেস্‌, সবারই চোখ ছানাবড়া। মিনিটখানেক থেমে একটু হেসে ইন্‌স্‌পেক্ট্রেস্‌ বললেন। চল্লিশ নয়, আর একটু বেশী। তবে আসল কথাটা ঠিকই বলেছ।

সুপর্ণাদি ও শুভাদি মুচকি হেসে আমার যেন প্রশংসা করলেন, আমার ইস্কুল জীবনের প্রথম প্রশংসা।

ওঁরা তিনজনে ক্লাস থেকে বেরিয়ে যেতেই মেয়েরা তো আমাকে ছেঁকে ধরল, খুব বলেছিস কিন্তু তাই হি, হি, হি, হি।—বাকুলির হাসি আর থামে না।

তারা মাস্টার এবার তালমুট ও গিলে ফেলল।

বাকুলি অঙ্ক কষছিল। এ বিষয়টা ও মোটামুটি কিছুটা বোঝে। তারজন্যে তারা মাস্টারের দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না! বাকুলি যদি অঙ্কেও অন্য বিষয়ের মতনই বরেণ হত তাহলে তারা মাস্টার বেশ ওপরচাল মেরে তাইরে-না-রে-না করে কাটিয়ে দিতে পারত। বেচারা এক ক্লাস, দু'ক্লাসের দু'একটি ছেলেমেয়ের পড়ায়, দুপকাঠির রোজগারটাই হল আসল। উপরি আর হিসেবে টিউশনিতে গোটা পঁচিশ টাকা পাওয়া যেত। কিন্তু একেবারে ষাট টাকার লোভে বাকুলিকে পড়াতে এসে

ছ' ক্লাসের হাদাযার মধ্যে পড়ে গিয়ে হার্ট-ট্রাব্‌ল্‌ হবার উপক্রম তাদের মাস্টারের। অঙ্ক বিষয় নিয়ে চিন্তার কারণ ছিল না, কারণ ইংরেজী, বিজ্ঞান, হিন্দী ইত্যাদি সম্পর্কে সে এবং বাকলি প্রায় সমান সমান, যদিও অঙ্কেতে বাকলি তার চেয়ে অনেক ভালো। কিন্তু বাকলির মধ্যে একটা শয়তানী রসিকতার প্রবৃত্তি আছে, এবং তারা মাস্টার সম্পর্কে তার সে-রসিকতা হল অসহ্য। কাজেই তারাচরণের আর অশান্তির শেষ নেই।

বাকলি বলল, মাস্টার মশাই, অঙ্ক পারছিনে, দেখিয়ে দিন।

তারা মাস্টারের হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হল। মনের মধ্যে যে কথাটা তার মুহুর্মুহু উঁকি দিল, সোজা বাংলায় তার মর্মার্থ দাঁড়ায়, এই মেরেছে। অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল বাকলির ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি। শুকনো গলায় বলল তারাচরণ দেখি কি অঙ্ক।

বাকলি পণিত-সঙ্গী বাড়িয়ে দিল, আঙুল দিয়ে অঙ্ক নির্দেশ করল। "কল্পবঙ্গে, নব নেত্রপাতে" পড়ল তারা মাস্টার।

"বয়স্ক লোক ও বালক সমেত একটি ক্লাবের মোট সভ্যসংখ্যা ৭৯। ক্লাবের সাম্বাসরিক অনুষ্ঠানে প্রতি বয়স্কলোক পিছু ২ টাকা ও প্রতি বালক পিছু ১ টাকা করিয়া চাঁদা ধার্য হইল। সকলের চাঁদা মিলাইয়া মোট ১৩০ টাকা উঠিল। ক্লাবে কতজন বয়স্ক লোক ও কতজন বালক ছিল?"

অসম্ভব! এই নিদারুণ ভীষণ-ভয়ঙ্কর অঙ্ক কষার চেয়ে সারারাত ধরে নিদ্রিত পুরীর কড়া নেড়ে নেড়ে ধূপকাঠি বিক্রী করা অনেক সোজা! ২ টাকা আর ১ টাকা যোগ দিয়ে কেলল তারা মাস্টার। তিন দিয়ে ভাগ দিল ১৩০কে! মেলে না। শেষকালে মানুষগুলো ভগ্নাংশ হবে নাকি!

—পৌষমাস, অথচ তারা মাস্টার ঘেমে আকুল।

ঘেমানের গায়ে টিকটিকি যেরকম ওৎ পেতে শোকা-যাকড় ধরে, তেমনিভর ধরে অপেক্ষা করছিল বাকলি ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য। তারা মাস্টারের প্রাণঘাতী প্রয়াস দেখে সে একেবারে হুঙ্কার দিয়ে উঠল।

আপনাকে আর করতে হবে না। আমি নিজেই একটু ভেবে মনে মনে করে ফেলেছি অঙ্কটা। আর আপনি বসে বসে তিন দিয়ে ভাগ দিচ্ছেন টাকাটাকে! কী কাণ্ড! উত্তর হবে ৫১ আর ২৮ মিলিয়ে নিন্।

বাকলির কণ্ঠস্বর ক্রোধে উত্তপ্ত, বাষ্পে বহ্নিময়।

পৌষমাসের গল্পের মত অসহায় দৃষ্টি তারা মাস্টারের চোখে।

কি? বোঝেন নি বুঝি এখনও কি করে হল? ঝাঁঝিয়ে উঠল বাকলি।

প্রত্যেকে এক টাকা করে দিলে সবসুদ্ধু পাওয়া যাবে ৭৯ টাকা কিন্তু পাওয়া গেছে ১৩০ টাকা। তাহলে বাকি থাকছে ৫১ টাকা। সুতরাং বয়স্ক লোকের সংখ্যা ৫১ কারণ তারা প্রত্যেকে ১ টাকা দেবে এই ৫১ টাকা থেকে। আর আগে দেওয়া ৭৯ টাকার মধ্যে তাদের আছে ১ টাকা করে। সুতরাং তাদের সংখ্যা হবে ৫১, এবং ৭৯ থেকে ৫১ বাদ দিয়ে বালকের সংখ্যা দাঁড়াবে ২৮। হয়েছে?

এবার প্রায় চীৎকার করে বলল সে, মাথায় ঢুকেছে?

তারা মাস্টার বিহ্বলভাবে নিরুত্তর।

তিক্ত সুরে মন্তব্য প্রকাশ করল বাকলি, আমার চাইতেও সরেশ!

পরদিন থেকে তারা মাস্টার সন্ধ্যেবেলা দোকানে দোকানে ঘুরে ধূপকাঠি বিক্রী করতে লাগল, বাকলিকে আর পড়াতে এল না।

কিন্তু তারা মাস্টার তো সংসারে একা নয়, তার তাই 'বেরাদার', জ্ঞাতি-গোত্রের তো আর তাই বলে অভাব নেই। কাজেই বাকলির শিক্ষক আসতে লাগল দল বেঁধে। এরই মধ্যে সকালবেলাকার নরেন মাস্টারও একদিন গেল ব্যাঘাচির ন্যাজের মতন খসে। সাম্প্রতিক জুটি হল বিমুখচন্দ্র ও অবৈতকুমার।

বিমুখচন্দ্র এল সকালে, বাংলা পড়াতে। প্রাথমিক

বিদ্যালয়ের শিক্ষক, অদ্বৈতও তাই। একই স্কুলের মাস্টার দুজনে, গলাগলি ভাব। দু'জনে একসঙ্গেই এল। নিমন্ত্রণ হল সকালের জন্যে বিবুধচন্দ্র, বিকেলের জন্যে অদ্বৈতকুমার।

অদ্বৈতকে ঘিরেছে কালিদাস পাচাল। আর বিবুধকে ঘিরেছে অদ্বৈত।

—কালিদাস হচ্ছে বীরেশ পরিবারের বাঁধা স্বর্ণকার। গহনা গড়ানোর কর্ম নিতে এসেছিল বীরেশগৃহে। এসে শুনল মাস্টার সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে কর্তা গিন্নীতে। কালিদাস বলল তাদের কথার মাঝখানে আমার ছেলে চার ক্লাসে পড়ে। তাকে পড়ায় অদ্বৈত মণ্ডল। আমাদের পাড়ায় প্রাইমারী স্কুলের মাস্টার। খুব ভালো পড়ায়। অদ্বৈতবাবুকে বলতে পারি খুকীর জন্যে, যদি বলেন।

একটু মুরুব্বিয়ানার সুরে বলল কালিদাস, নিচু ক্লাসের জন্যে এধরণের মাস্টারই ভালো। মন দিয়ে পড়ায় এরা। বেশী বিদ্বান মাস্টাররা শুধু বড় বড় কথা বলে।

একমত হলেন বীরেশচন্দ্র। নিযুক্ত করলেন অদ্বৈত মণ্ডলকে। অদ্বৈত মণ্ডল আবার দু'ঘর মাস্টার হিসেবে সুপারিশ করল বিবুধ নন্দনকে। তাই এবারকার ছুটি দাঁড়াল বিবুধ-অদ্বৈত।

দু'জনে মহা খুশী। কালিদাস পাচালের কাছে তাদের কৃতজ্ঞতা অপরিমিত। বেশী মন্দন স্ট্রীটের লাগাও তাদের স্কুল। একটা ভাঙা একতলা পোড়ো বাড়ীতে তিনখানা ঘর। এক-এক ঘরে দুটো করে ক্লাস। মাদুর পেতে ছাত্রদের বসবার ব্যবস্থা মাস্টারদের জন্যে জলচৌকী।

তিন ক্লাস, চার ক্লাস এক ঘরেই হয়। অদ্বৈত পড়ায় বেশীর ভাগ তিন ক্লাসে, বিবুধের দায়িত্ব অধিকাংশ সময় চারের। পরস্পরের দিকে পিছন ফিরে ঘরে দেয়ালের দিকে মুখ করে তারা নিজ নিজ অংশের ছাত্র পড়ায়।

বিবুধ-অদ্বৈত তো পুলকে দিশেহারা। জলচৌকী থেকে বিনাদাপে সোফা-কৌচে উঠেছে, কালীঘাট অঞ্চলের বস্তিবাড়ী থেকে রিচি রোডের বাগানঘেরা অট্টালিকায় পৌঁছেছে, নিজের পয়সায় মুড়ি ছোলা-তাজার পরিবর্তে এখন চা কটি-মাখন, অমলেট, সন্দেশ ইত্যাদি জুটছে, কাজেই তাদের কাছে কালিদাস পাচাল আর এখন কেবলমাত্র সোনা-গহনার কারবারী নয়, সোনার মানুষ।

—বিবুধচন্দ্র বাংলা পড়াতে পড়াতে বলল, "বিনাশ" তার মানে বি-পূর্বক নাশ, অর্থাৎ বিশেষ রকমে নাশ, তার মানেই হল ধ্বংস।

বাকুলির ধারণা হয়েছিল বিবুধের নাম বুঝি বিকৃত। তাই সে বলল, আপনার নাম তো বিকৃত। তাহলে তার মানে কি আপনি বিশেষ রকমের ভূত। কী ভয়ানক নাম রে বাবা!

চা জলখাবার এসে গিয়েছিল। সন্দেশ খেতে খেতে বিবুধচন্দ্র প্রতিবাদ করল, আমার নাম বিকৃত নয়, বিবুধ। বিবুধ মানে হল পণ্ডিত। বি পূর্বক বুধ।

বলে সে গোমড়া মুখ করে রইল।

ওঃ। বাকুলি একটু অপ্রস্তুত।

অদ্বৈতের নাম নিয়েও এমনিতর বিভ্রাট বাধাল বাকুলি। প্রশ্ন করল তাকে, আপনার নামের মানে কি মাস্টারমশাই? অদ্বৈত মানে তো যে দ্বৈত নয়, যা বলছিল।

না, না,—আমি অদ্বৈত নই, আমি হলাম অদ্বৈত। মাঝে যোগো। প্রবল প্রতিবাদ মাস্টারের।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল বাকুলি। তাহলে মানে কি হ'ল?

ভারী গোলমেলে মানে মস্ত বড়। সে তুমি বুঝবে না।

ভারী গলায় বলল অদ্বৈত।

তবু বলুন না মাস্টারমশাই আমি মাকে বুঝিয়ে বলব।

অদ্বৈত কিছুতেই রাজী নয়। কেবলই বলে, কাল বলব।

বস্তুত ও বেচারা নিজেই জানে না। অথচ উত্তরটা কর্ত্রীঠাকরুণের কান পর্যন্ত পৌঁছোবে খবর পেয়ে সে আর কোন হাবিজাবি উত্তর দিয়ে বিপদে পড়তে চায় না। কাজেই অন্য কারও কাছ থেকে জেনে নেবার জন্যে অন্তত একটা দিন হাতে রাখা দরকার!

কিন্তু বিবুর অদ্বৈতও বেশীদিন টেঁকে না। অবশ্য তারা তাদের বিদ্যা এবং সাধ্য অনুযায়ী প্রাণ সংশয় চেষ্টা করে। বাকুলির তরফেও আগ্রহের কমতি নেই। কিন্তু এই দুই প্রয়াস চলে সমান্তরাল রেখায়, বিবুর অদ্বৈতের স্বল্পশিক্ষায় অশিক্ষিত পটুত্ব এবং বাকুলির বিচিত্র স্মরণশক্তি যে কোথাও গিয়ে মিলবে এমনতর কোন বিন্দুও খুঁজে পাওয়া যায় না।

বিবুধ প্রশ্ন করল, "তনুর স্ত্রীলিঙ্গ কি হবে?

চটপট উত্তর দিল বাকুলি, Easy! স্ত্রীতনু।

সেকি। কাল তোমাকে যে এত করে বা, ভাতৃর, ভ্রাতা, ভগিনী,—বেহান, বেহাই,—ভ্রূ, ভ্রূী, এসব পড়ালাম তার কি হল?

মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছে বিবুধের। গলার সুর তার বেশ চড়া।

ওঃ, একদম মনে ছিল না! এইবার সব বলতে পারব মাষ্টার মশাই।

বাকুলি ভীষণ লজ্জিত।

মনে মনে বুঝল বিবুধ চাকরিটা কিছুতেই থাকবে না।

অদ্বৈতের অভিজ্ঞতাও কম মারাত্মক নয়।

বাকুলি বলল, কাল বাবার এক বন্ধুর বাড়ীতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলুম মাষ্টারমশাই। ওদের বাবার ঘরটা মস্তবড়। রাত্রিতে তো আলোয় আলোময় করে রেখেছিল। দিনের বেলায় বোধ হয় একটু darky।

কিন্তু একটা না বললে নয় তাই অদ্বৈত জিজ্ঞাসা করল, কোথায় বাড়ী?

কাছেই, এই পালিত ষ্ট্রীটে। একজন সাহেব এসেছিল। বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন বাবার বন্ধু। আমি বাবার পাশে দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখেই আমার hand second করে দিলেন। আমার এমন মজা লাগল!—বাড়ীর মেয়েগুলো ভীষণ proudy। কথাই কইতে চায় না!

কিন্তু অদ্বৈতের যে বিশেষ কৌতূহল আছে তা মনে হলনা।—বাকুলি এবার অন্য রাস্তা ধরল, অদ্বৈতের উৎসাহের সঞ্চার হয় এমনতর রাস্তা।

কী pathetic যে রান্না করেছিল তা কি বলব। সব রান্না বাড়ীর মেয়েরা নিজেরা করেছিল, ঠাকুর চাকর নয়। আমাদের বাড়ীতেও recently ওইরকম খাবার বন্দোবস্ত হবে। মা বলছে আমাদের রান্নাও যাতে অমনিতর চমৎকার হয় তার ব্যবস্থা করবে। আপনাদের সব মেমসাহেব!

ইংরেজী পড়াতে এসে বাকুলির বাগ্‌বিন্যাসে ক্ষুব্ধ হচ্ছিল অদ্বৈত। কিন্তু তার উক্তির শেষাংশে তাকে প্রসন্ন করে তুলল। মনে মনে সে প্রার্থনা করল, হে ভগবান, চাকরিটা যেন আরও কিছুকাল বজায় থাকে!

কিন্তু শেষরক্ষা হল না। মাসের শেষে বিবুধ অদ্বৈত দুজনকেই জবাব দিলেন বীরেশচন্দ্র। বললেন, বাকুলির কিছু হয়নি।

আবার নূতন শিক্ষক এলেন, জোড়ায় জোড়ায়, কাতারে কাতারে। মূর্খ, অর্ধমূর্খ, অর্ধপণ্ডিত, মহাপণ্ডিত কোন শিক্ষকই বাকুলির জন্যে কিছু করতে পারলেন না। ফলে বৎসরান্তে বাকুলি। এক অঙ্ক বাদ দিয়ে সর্ববিষয়ে, অকৃতকার্য হল। অঙ্কে পেল সে ঘাট, আর ইংরেজী, বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি মিলিয়ে সাঁইত্রিশ,—সর্বসাকুল্যে সাতানব্বই! হেড মিষ্ট্রেস বললেন, ষ্ট্রাংকার দিন। বীরেশচন্দ্র প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাজী।

—বাকুলি ফুল বদলাল।

নূতন স্কুলের আকাশে বাতাসে খবর রটে গেল

বকুলবাগান থেকে "মহাভারত" আসছে! বেতারে বললেই হয়!

ছাসে ঢুকতেই একটি ভালো কোলো মোটাসোটা মেয়ে আহ্লাদে গলে বলল, ভাই ঝুমুর এলি! আয় আমার কাছে বোস।

বাকলি তো অবাক খোঁপাহাসি হেসে প্রশ্ন করল। এত খবর জানলি কি করে?

আছে, আছে। জানবার অনেক উপায় আছে।

বাকলির মেজাজটা এমনিতে খুব ঠাণ্ডা। মেয়েদের সঙ্গে ভাব জমতে দেরী হলনা।

কিন্তু লেখাপড়া? হায় ভগবান! সে-প্রসঙ্গ না তোলাই ভালো। মেয়েদের হাস্যকৌতুকের একটা মস্ত খোরাক হয়ে রইল বাকলি।

এইবার বীরেশচন্দ্র উপলব্ধি করলেন আধিভৌতিকে ভুলোবে না, বাকলির জন্যে আধিদৈবিক প্রসন্নতা প্রয়োজন। বাকলির বর্তমান ও ভূতপূর্ব শিক্ষকদের একত্র করলেন তিনি। সর্বসমেত চব্বিশ জন হল। তিন বছরে চব্বিশজন, বছরে আটজন গড়ে। তরাংশ হবার ভয় নেই। বাকলি অঙ্কে ভালো। তরাংশ হলে চট্টত নিশ্চয়ই।

বললেন বীরেশচন্দ্র, আপনারা ঘটা করে সরস্বতী পুজো করুন। ভালো করে বলুন যাকে বাকলির কথা। তিনি প্রসন্ন হলে মেয়েটার পড়াশুনা অবশ্যই ভালো হবে। আপনারা ওর হিতৈষী আপনাদের সম্মিলিত প্রার্থনা নিশ্চয় ব্যর্থ হবে না।

ঠাকুর তৈরী হল কুমোরটুলীতে, দশ হাত উঁচু ঠাকুর। পুজোর সাজ-সরঞ্জাম হল বিশ বছর ধরে লোককে ধরে বেড়ানোর মত। নেমন্তন্ন হল পাঁচশ লোকের।—সকালবেলায় অঞ্জলির, সন্ধ্যাবেলায় ভূরিভোজনের।

শিক্ষকদের দেওয়া হল নিজের খুশি চাদর।—রেশমশোভিত হয়ে তাঁরা চব্বিশজন বসলেন বাকলিকে বামধারে রেখে পুষ্পাঞ্জলি দিতে।

তাঁদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বাকলি উচ্চারণ করল, ঐ তত্ত্বকারো নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ।—বলে গেল সবকথা যথাসাধ্য শিক্ষক মশাইদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। কিন্তু তাল বেতাল কিনা তাও তো ঠিক বোঝা গেল না। হয়তো বা তালে তালে ঠোঁট নেড়েই কাজ সারল।

অবশেষে বীণাপাণির নমস্কার শেষ করলেন শিক্ষক সমিতি—

ঐ সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে,
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তুতে।

এবারও বাকলি কি বলল বোঝা গেল না, সম্ভবতঃ পরিশ্রম বাঁচিয়ে পুনরায় ঠোঁটই নাড়ল শুধু।

কিন্তু পুজোর ফল হাতে হাতেই ফলল। সেই রাত্রিতেই দেবী বীণাপাণি বাকলির শিক্ষকদের মধ্যে যিনি বিদ্বান জ্ঞেষ্ঠ সেই ভট্টর অনন্ত মিত্রকে স্বপ্নে দেখা দিলেন।

বললেন বাগ্‌দেবী; বৎস তোমাদের সকলের প্রীত হয়েছি। কি তোমাদের প্রার্থনা?

সভাতলে অনন্ত মিত্র চিঁ চিঁ করে বললেন, মা, আমরা বাকলিকে নিয়ে পেরে উঠছি না। তুমি নিজে একটু ওকে দেখ।

প্রসন্ন হাতে বরাভয়ের ভঙ্গীতে দেবী বললেন, দেখব। চিন্তা কোরো না, ও এইবার থেকে পরীক্ষায় সফল হবে।

ভট্টর অনন্ত মিত্রের ঘুম ভেঙে গেল। অপেক্ষা করে রইলেন সকালবেলার জন্যে, স্বপ্নটা যথোচিত রটনা করবার প্রতীক্ষায় তিনি উতলা হয়ে উঠলেন।

সকাল হলে জানা গেল ভট্টর সনৎ ঘোষালও নাকি ঐ একই স্বপ্ন দেখেছেন।

সংবাদ ছড়িয়ে সকল ছোলসহস্র এর মতো। চেনা অচেনা কারও আর জানতে বাকী রইল না।

দ্বিগুণ উৎসাহে পড়তে লাগল বাকলি। ভট্টর অনন্ত মিত্র এবং ভট্টর সনৎ ঘোষাল ভার নিলেন তাকে পড়াবার।

কয়েকদিন পরে মনে হল বাকলির পড়াশুনা এবার যেন একটু এগোচ্ছে। স্মরণ শক্তিরও কিছুটা প্রাখর্য দেখা গেল এতদিনে।

ভরত সম্পর্কে ইংরেজী রচনায় সে লিখল Bharatha says to Rama, the throne of Ajodhya will be vacuum to our people.

মাথায় হাত দিয়ে বসলেন সনৎ ঘোষাল। কিন্তু তবুও তাঁর মনে হল আগের চেয়ে অনেক ভালো, শব্দগুলোর বানান তো যাহক একরকম ঠিক আছে। ভরতের বানানটা অবশ্য দক্ষিণ ভারতীয় হয়েছে। তা হক, আজকাল তো ওদেরই দিন।

প্রশ্ন দিলেন অনন্ত মিত্র, ক+ব দিয়ে শব্দ গঠন কর। তারপর সেই শব্দের সাহায্যে বাক্য রচনা কর।

এক মুহূর্ত ভাবল বাকলি। তারপরই দ্রুতহস্তে লিখল। ছাত্রদের নিকট পরীক্ষা এক বিপদ আছে।

অনন্ত মিত্র উল্লসিত বাকলির মনোভাবের সুষ্ঠু প্রকাশ ঘটেছে।

মিত্র ঘোষালের যুগ্ম প্রচেষ্টার শেষ অবধি বাকলির উন্নতি অবশ্য কিছুটা হল, কিন্তু তবুও তাতে সত্যিকার প্রসন্ন হবার মত কিছু রইল না। ত্রৈমাসিক পরীক্ষার ফল বেরোলে দেখা গেল বাকলি পেয়েছে সর্বসমেত একশ' বাষট্টি। অঙ্কে সত্তর, আর অন্যসব বিষয় মিলিয়ে বিয়ানব্বুই।

এবার অনন্ত মিত্র আর সনৎ ঘোষাল দু'জন মুখোমুখি বসে পরস্পরের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। মিনিট পনেরো ধরে তাঁদের সে সর্বহারার দৃষ্টিতে কোন ভাবান্তর ঘটল না। অবশেষে ফিসফিস করে পরামর্শ করলেন তাঁরা, কলকাতা থেকে অবিলম্বে বাইরে সরে পড়বেন অনির্দিষ্ট কালের জন্যে। কিন্তু তার আগে বাকলির পরীক্ষার খাতাগুলো একবার দেখা দরকার।

পরদিন দু'জনে গেলেন স্কুলে। বাকলির খাতা নিয়ে বসলেন অফিস ঘরে বিশ্লেষণের জন্যে।

প্রথমেই বাংলার খাতা। খাতা ওল্টাতেই "সীতা" সম্পর্কে বাকলির প্রবন্ধ চোখে পড়ল। রুদ্ধনিশ্বাসে দু'জনে পড়তে লাগলেন—

"সীতার জন্ম হইল অদ্ভুত রূপে। রাজা জনক তাঁহার পিতা অবশ্য কিন্তু তাঁহার জনক নাই। কারণ সীতার জন্ম পৃথ্বীর গর্ভে হইল। একদা জনক রাজা লাঙ্গল লইয়া মাঠে কাজ করিতেছিল, অকস্মাৎ তাহার লাঙ্গল কোন জিনিষতে ঠোকাঠোকি লাগিল। সে জিনিষ ছিল একটি কুম্ভ ও ঐ কুম্ভে থাকিলেন সীতা।"

আর পড়বার সাহস হল না, দু'জনে ভীত সন্ত্রস্ত ভাবে উঠে পড়লেন। তারপর সদর রাস্তায় নেমে দ্রুতগতিতে কোথায় যে গাড়াকা দিলেন কেউ জানে না।

এক সপ্তাহ খবর পৌঁছোল স্বর্গলোকে। কেঁদে ফেললেন দেবী ভারতী। স্বয়ং কালিদাসও তাঁকে এমন করে পরাজয়ের পঙ্কে নিমজ্জিত করতে পারেননি! ছোকড়মানা বাগদেবী ছোটলেন পিতামহ ব্রহ্মার কাছে। বললেন চতুরানন, ওর বিয়ে দিয়ে দিচ্ছি, তবে যদি কিছু হয়।

ছোকড়মাটা আধা ভিখ্রী, আধা ভিলমিস হল। তবু ঘেটুকু পেলেন তাইতেই এক চোখে হাসি, আর এক চোখ দিয়ে নিজ প্রত্যাবৃত্ত হলেন বীণাপানী। সেসব কথা তো শুরুতেই বলেছি।

এদিকে বেদনাবিবশ বীরেশচন্দ্র বাকলির জন্যে পাত্র খুঁজতে লাগলেন। ডঃ অনন্ত মিত্র ও ডঃ সনৎ ঘোষালের কিন্তু বহু চেষ্টাতেও কোন সন্ধান পাওয়া গেলনা।

অপরাহ্নবতী

সুবোধ সিংহ

পূর্ব প্রকাশিতের পর

যা কিছু পেলে মানুষ সুখী হয়, তার সবগুলো না পেলেও অনেকখানি পরীক্ষিৎ পেয়েছিল তার পরবর্তী জীবনের কয়েক বছরে। এত স্বচ্ছন্দ ও নিরুদ্বিগ্ন সংসার দেখে সে দৈব চরিত্রের আকস্মিকতার কথা ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু দৈব কাউকেই ভুলে থাকতে দেয় না,—পরীক্ষিতকেও ভুলে থাকতে দেয়নি।

ন' বছরের মেয়ে তপতীকে দেখেই কেবল মনে হবে সুমিত্রার বয়েস বেড়েছে—তাছাড়া নয়। দীপকও সবে পাঁচ বছরে পড়েছে। চার বছরের তফাতে দুটি সন্তান হওয়াতে আরো যেন ঘুচে গেছে ওর প্রথম যৌবনের সময়ে। সন্তানবতীর স্বাভাবিক নিয়মে ওর দিওয়ানির বৈশোরত্ব চলে গিয়ে তা প্রশস্ত ও পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। মেদের বাহুল্য নেই বলে সুমিত্রার শরীরে তারিকি চাল এখনও আসেনি। ওর শরীরের অনেক পরিবর্তন হয়েছে বটে—কিন্তু ওর মুখের আদলে, চোখের দৃষ্টিতে, কণ্ঠস্বরের ধ্বনিতে, দেহের গতিভঙ্গীতে নতুনের তাজা ভাব নষ্ট হয়নি।

কেন যেন সুমিত্রার উদাম জীবনী শক্তির বাড়াবাড়িকে সে ভয়ের চোখেই দেখেছে। তার বিশ্বাস এবং কিছুটা হয়তো সত্যিও যে সব পুরুষ মানুষেরই এমন অবস্থাতে ঠিক এমনি দশাই হয়। বোধ হয় সেইজন্যেই স্ত্রীর উদাম যৌবনে কাহিল অবস্থা দেখলে অথবা স্ত্রীর ধার্মিক ভাব ও ঈশ্বরনিষ্ঠা হতে দেখলে স্বামীর মনের দুর্ভাবনা অনেকটা কাটে। দুর্ভাবনা অনেকটা কাটে বটে, কিন্তু নির্ভাবনা পুরোপুরি হয় কি কখনও? অনেকের কাছে হয়, কিন্তু সকলের কাছে নয়,—অন্তত পরীক্ষিতের কাছে নয়। তার ধারণা, মানুষের ধর্মভাব ও ব্যক্তি-চারিত্র্য একসঙ্গে মিতালি পাতিয়ে চমৎকার নিরঙ্কুশ ও নিরাঘাটে সংসার বজায় রেখে চলতে পারে।

সুখের উপকরণ আরো এসে জুটেছিল—বোধ হয় বিপত্তিও সেই উপকরণ থেকেই জন্মেছিল।

একটি বাসা, নিজের একটি বাসা—অবাধ, সুন্দর ও স্বাধীনভাবে জীবনকে ভোগ করবার একটি নিজস্ব স্থান।

হিন্দুস্থান রোডে এই বাড়ী তখন নতুন ছিল। পরীক্ষিতের দাদা বড় চাকরি পেয়ে চলে গেলেন দিল্লীতে আর পরীক্ষিৎ নিজে বাড়ী করে উঠে এল হিন্দুস্থান রোডে। কেবলমাত্র ঝোঁকের মাথায় বাড়ী করেনি সে। ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের নতুন কিস্তির মধ্যে পড়ে গেল ওদের প্রকাণ্ড বড় পৈত্রিক বাড়ীখানি আর আড়াই বিঘে জমি। ভেতরে ভেতরে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল দুই ভাইয়েরই মন। মোটা টাকা পেয়ে উৎসাহিত হল এই দুই পরিবার কিন্তু ভাবাবেগ নষ্ট হল না। বাপের অবর্তমানে সংসারের স্বাভাবিক গতির পুনরাবৃত্তি ঘটে গেল আকস্মিক,—যার সম্বন্ধে তাদের হাত ছিল না মোটেই।

পার্ক সার্কাস থেকে মৌলালি পর্যন্ত একটি সুন্দর, চওড়া, মেটেলড্ রোড দুই মহল্লাকে যুক্ত করে গড়ে উঠল এবার। এই সি. আই. টি রোডের দুপাশে মশলচের মত গজিয়ে উঠল নানা ধরণের বাড়ী। এখন ওদের পৈত্রিক বাড়ী আর জমির কোন চিহ্ন আর খোঁজা যায় না,—কেবল যায় একটি নারকেল গাছ ছাড়া।

সেটা পরীক্ষিতের পুরোনো বাড়ীর শোবার ঘরের পাশেই ছিল কোনদিন। কত রাত্রি গেছে,—নিঝুম ও নিঃশব্দ; কত জ্যোৎস্নাভরা রাত; কত না বিনিদ্র রজনী—কখনো সে দেখেছে নারকেল গাছের স্থির ছবি, কখনো বা অধীর উথলপাথল। কান পেতে শুনেছে সে এই নারকেল পাতার অবিশ্রান্ত করকরানি শব্দ—জীবহীন রাত্রিতে একটি বিশাল নদীতে পাড়ি দিয়ে যেন চলেছে একটা অজানা যাত্রীর নৌকো। তারই বৈঠার আঘাত, নদীর শব্দময় কলধ্বনি, নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের অসহায়তা, আর হাওয়ার মাতামাতি এই নারকেল গাছের পাতাগুলোর মাতামাতির মধ্যে অপূর্ব একটি কাহিনী হয়ে চিরদিনের জন্যে যেন আবদ্ধ হয়ে আছে।

বোধহয় এই শব্দের মোহ সে ভুলতে পারেনি বলেই এই নতুন বাড়ীতে ঠিক তার শোবার ঘরের পাশে নিতান্ত খাপছাড়া ভাবেই পরীক্ষিৎ একটা নারকেল গাছের চারা লাগিয়েছিল।

বছর অনেক বেড়ে গিয়েছে পরীক্ষিতের—সেই সঙ্গে নারকেল গাছটিরও। দোতালা ছাড়িয়ে উঠে গেছে ওর মাথা অনেক দূরে। সন্ন্যাসীর মাথার জটার মত ওর ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া পাতার ডালগুলো বৃদ্ধ উদাসীনে কোন তপস্যায় যেন মগ্ন হয়ে আছে।

শেষ রাতে একবার ছাদে পায়চারী করে,—দেখবে ও ছবির মত স্তব্ধ হয়ে কিসের স্বপ্নে যেন বিভোর হয়ে আছে। গভীর রাতে কিন্তু খাটে শুয়ে থেকেও শুনতে পাবে ওর খেপাটে কথা,—ওর বিচিত্র শব্দের কোলাহল। বিশাল ও বিক্ষুব্ধ নদীর জল-স্রোত কেটে ছপ্ ছপ্ করে বৈঠার একটানা শব্দ অন্ধকারময় রাত্রে পাড়ি জমিয়ে চলেছে যেন।

ওর বৈশবেও শুনেছে যাত্রার রাত-দুপুরে এলোমেলো হয়ে উঠত কিন্তু ওর খেপাটে কথা শোনা যেত না তখন। তখন এত চাঙ্গা হয়ে ওঠেনি গাছটা, বোধহয় ওর মুখে তখন কথা ফোটেনি। কিন্তু এখন আর ওর খেপাটে কথাগুলো অবোধ্য নয় পরীক্ষিতের কাছে। কান পেতে শুনতে হয় ওর কথা কারণ তা ওর নিজের কথা নয়, পরীক্ষিতের জীবনের এমন কয়েকটি ঘটনা যা এখন পরীক্ষিতের কাছে বিকারের কথার মত অসংলগ্ন ও অসংবদ্ধ বলে লাগছে। ওর শৈশবের গুছিত জীবনে যা কিছু ঘটেছে, ও যা কিছু দেখেছে, ওর মনে যে-সব কথা দাগ কেটে গিয়েছে, অবোধ্য ছাপাপাত করে গেছে,—আজ সে-সব কথা ও কাহিনীর অস্পষ্ট রায়গাগুলো অদ্ভুত উপায়ে স্পষ্ট ও নির্ভুল হয়ে দেখা দিয়েছে। সেই সব কথা শুনিয়ে যাচ্ছে সে, শুনতে হচ্ছে পরীক্ষিতকে।

তখন ছিল সাদা রঙের ঝকঝকে বাড়ী। দালান কোন থেকে দেখতে ইচ্ছে হত বার বার। নেড়া জমির মাঝখানে বাড়ীটা যেন একটু স্বতন্ত্র হয়ে গা বাঁচিয়ে চলছে অন্য সকলের কাছ থেকে,—কিছুটা শুচিবায়ুগ্রস্ত যুবতী বিধবার মত। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই সে চেহারা পাল্টে গেল একেবারে। বিঘাখানেকের জমিতে সুন্দর নক্সায় বাগান অনেক সবুজের সজীবতা আর নানা রঙের প্রফুল্লতা নিয়ে অকস্মাৎ মেতে উঠল যেন। ছেঁড়া-পাড় আর নয়, রঙীন সিঁথির সিঁদুরের মত সার্থকতায় নিবিড় ও সুন্দর।

পাড়াটা নতুন গড়ে উঠছে তখন। ঘুরে ঘুরে, খাপছাড়া ভাবে এদিকে ওদিকে গোটা দশ পনেরোটা বাড়ীতে লোক এসে গেছে। এখানে-ওখানে আরো নতুন নতুন বাড়ী তৈরী হচ্ছে। তারা যাঁরা আছে অনেকগুলো বাড়ীতে, খুটখাট শব্দ উঠছে চারধার থেকে। এখনও এত বড় পাড়া হয়ে ওঠেনি যেখানে স্বতন্ত্র, নিঃস্পৃহ ও অপরিচিতের মত থাকা চলে। নতুন ছোট পাড়াতে এক পরিবারের মত পরোয়া আত্মীয়তা করবার জন্যে অসীম আগ্রহ জন্মে,—সেই জন্যেই বোধহয় পাড়ার নতুন নতুন বাসিন্দার সঙ্গে সুমিত্রার এত বেশী আলাপ পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। পরীক্ষিৎ কিন্তু এত বেশী ঘেঁষাঘেঁষি আর মেশামেশি তেমন বরদাস্ত করতে পারে না, বরং পাড়ার মানুষের আলাপি হওয়ার চেষ্টা পরীক্ষিতের কাছে উৎপাত ও উপদ্রব বলে মনে হত।

একটা মাসিং ঘোরে দিন সাতেকের জন্যে সুমিত্রাকে যেতে হয়েছিল। ব্যাপারটা বিশেষ কিছুই গুরুতর নয়,

কিন্তু গুরুতর হয়ে উঠল সুমিত্রার কাছে। পরিবারের সংখ্যা বাড়ানোকে পরীক্ষিৎ যে চোখে দেখেছিল সুমিত্রা কিন্তু সে-চোখে দেখতে পারেনি কোনদিন। একটি অনাগতের প্রতি মন পড়ে রইল সেই দিন থেকে,—যে পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ নয়, যাকে সে চোখেও দেখেনি, তার প্রতি অহেতুক মমতায় সুমিত্রা যেন ক্রমশঃ পরীক্ষিতকে ভীষণ একটি নিষ্ঠুর মানুষ বলে মনে করতে লাগল। ও বোধহয় ভাবছে হলো বেড়ালের মত পরীক্ষিৎ যদি বেড়ালের কচি কচি বাচ্চাগুলোকে কচমচ করে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবার জন্যে সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছে। নিশ্চয়ই এই ধরণেরই কিছু ওর মাথায় ঘুরছে নইলে ছেলেমেয়েকে তার কাছ থেকে এমন করে সামলে সামলে রাখত না। অথবা,—কে বলতে পারে তার সঠিক মনোভাব! এই ভাবান্তর হয়তো বা একটি সুচতুর স্ত্রীলোকের সুন্দর কারসাজি। সুমিত্রা হয়তো এমন একটি অজুহাতের চাপ রাখতে চায় সর্বক্ষণের জন্যে যার কাছ থেকে পরীক্ষিতের দৃষ্টি অন্য দিকে যাবে না। সুমিত্রার এই দাম্পত্যিক দুঃখের অজুহাতকে পরীক্ষিৎ আমল দেয়নি সেইজন্যে। বরং এই সুন্দর কোমল কষ্টকে সে আবরণহীন করে অন্য কোন দুই-ক্ষতের সন্ধান করতে চেয়েছিল।

যাকে আড়ালে অদৃশ্য করে রাখবার জন্যে সুমিত্রাকে একটা সুন্দর বিশ্বাসযোগ্য আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে হয়েছিল, একদিন অকস্মাৎ তাকে পাওয়া গেল বলে পরীক্ষিতের ধারণা হল।

অসিতের বাড়ীতে বরুণাকে দেখতে গিয়ে বরুণার ঘরে সুমিত্রা ও একটি অপরিচিত যুবক ছোকরাকে দেখে সে বেশ অবাক হয়ে গেল। পরীক্ষিতের মনোভাব সুমিত্রার অজানা নেই। পরীক্ষিতের অজানা কোন যুবককে সুমিত্রার বন্ধু হয়ে চলাফেরা ও আড্ডা দেওয়াকে সে অত্যন্ত অপছন্দ করে। যদিও পরীক্ষিৎ সুমিত্রার ভাবান্তরের অন্য কারণের কথা ভেবেছে কিন্তু সে যে তার মনদিনে পুরুষ বন্ধুও এসে জোটাবে তা পরীক্ষিৎ একদিনের জন্যেও ভাবেনি। যদিও বরুণা এবং আরো দু একটি মহিলা সেখানে ছিল তবু তার মতামতকে এমনভাবে অগ্রাহ্য করতে দেখে পরীক্ষিতের মনের স্বাভাবিক অবস্থাটা হঠাৎ নষ্ট হয়ে গেল। সব চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার সে লক্ষ্য করল, বরুণার প্রশ্রয়ের চোখে কেন জানি উল্লাসের একটা ভাব চিক চিক করে উঠল।

বরুণা চোখের হাসি গোপন না করে পরীক্ষিতকে বলল,—

"আপনার অনুমতি না নিয়েই অজিতবাবুর সঙ্গে আপনার স্ত্রীর আলাপ করে দিয়েছি। আট ফুল থেকে এবার উনি প্রথম হয়েছেন! শোভনাদির ছোট ভাই। শোভনাদিকে চেনেন তো?"

পরীক্ষিতের কোন উত্তর দেওয়ার আগেই সুমিত্রা বলে উঠল,—

"উনি এ-পাড়ার কাউকেই চেনে না,—কেবল আপনাকে ছাড়া।"

পরীক্ষিৎ সোজা সুমিত্রার দিকে তাকাল,—সুমিত্রার দুচোখও পরীক্ষিতের দিকে তাকিয়ে আছে। সুমিত্রার সে-দৃষ্টি সরে এসে বরুণার চোখের দিকে পড়ল।

অসিতের ভাগ্যহীন স্ত্রী বলে বরুণা যেন হঠাৎ নিজের সম্বন্ধে কাছে নিতান্ত অসহায় হয়ে উঠল।

তবু বরুণার স্পষ্ট কথা কিন্তু শোনা গেল,—

"আমার অনেক দুর্ভাগ্য—। এই সৌভাগ্যকে তুমি হিংসে করো না,—সুমিত্রা!"

সুমিত্রাও ঠিক এইভাবে কথাটা বলতে চায়নি হয়তো তবু কখনো কখনো অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মেয়ের কথাবার্তাতেও এমনি অনর্থ ঘটে যায়।

অজিত একটা চেয়ার টেনে এনে পরীক্ষিতকে বলল,—

"আপনি বসুন।"

অজিতের এই অভদ্রতার কোন প্রত্যুত্তর দেওয়ার দরকার মনে করল না পরীক্ষিৎ। চেয়ারে বসে বলল,—

"আমি বেশীক্ষণ বসতে পারব না।"

সিগারেট কেসটা পকেট থেকে বার করতে যাচ্ছিল, হঠাৎ নজরে পড়ল আরো দুজন অপরিচিত ভদ্রমহিলা এঘরে আছেন, সিগারেট কেসটা ধীরে ধীরে পকেটেই রেখে দিল।

করুণাকে বলল,—

"তোমার ভাড়াটে ভাড়ার টাকা দেবে না—কেস করতে হবে।"

"কেস করব কি করে? আমার কি টাকা আছে!"

"আমিই চালাবো। পরে শোধ করে দিলেই হবে। আপত্তি আছে?"

"না! না! আপত্তি কি! তবে আমি কেস করবো না। —অজিতবাবু! আপনার সঙ্গে তো ওদের চেনা আছে—আপনি একবার বলে দেখতে পারেন না?"

অজিত নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসল।

"আমি? আমার সঙ্গে তো সে-রকম চেনা নেই—। বরং সুমিত্রাদি বললে কাজ হবে। নার্সিং হোমে যেতেন প্রায়ই—সেখানেই আমার চেনা। আমার সঙ্গে জানাশোনা খুব সামান্যই।"

"বলনি তো আমার কাছে এসব কথা? আর সে কে যেতেন?' এমনি চোখের ভাব নিয়ে পরীক্ষিৎ সুমিত্রার চোখের দিকে তাকাল। সুমিত্রার চোখের দৃষ্টি যেন বলতে গেল সেই মুহূর্তে, কিন্তু পরক্ষণেই ঝাঁঝালো হয়ে উঠল। সে দৃষ্টিপাত যেন বলতে চায়, 'তাতে হয়েছে কি? তোমার চেয়ে ঢের ঘরানাওয়ালা লোক যেতেন সেখানে।'

পরীক্ষিৎ বলে উঠল,—"তাই নাকি! জানতাম না তো!"

এ কথাতে অজিতের মুখটা কেমন যেন কাঁচুমাচু হয়ে উঠল।

অজিত কাকুতি মিনতি করে যেন পরীক্ষিতের কাছে নিজের সত্যবাদিতা প্রমাণ করতে চাইল,—

"বিশ্বাস করুন! সত্যিই আমি ওদেরকে জানি না! মানে—"

খস্ খস্ করে একটা চেকে নাম সই করে করুণার হাতে দিয়ে সেই লম্বা মানুষটি নিঃশব্দে অজিতের অর্ধসমাপ্ত কথাকে তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

একটা ছায়া কাঁপলো বার দুই। করুণা তার হতবুদ্ধি চোখ দুটো দিয়ে দেখতে লাগল তার নিজের একটা হাত —যে-হাত তখনও পরীক্ষিতের দেওয়া চেকখানা ধরে আছে। অনুগ্রহ যেন স্পষ্ট হতে গিয়ে অথবা নির্লজ্জ হয়ে গেছে। আর সেই নির্লজ্জ স্পষ্টতার একটি নিষ্ঠুর ছায়া রাঙা হয়ে ছড়িয়ে গিয়েছে করুণার সারা মুখে।

সুমিত্রা কিন্তু তার চেহারাটাকে প্রশান্ত ও উদার করে তুলল। কণ্ঠের পাক থেকে একটি স্বল্পায়ু উদারতা যেন এইমাত্র গৌরবের দীপ্তিতে মহিমান্বিত হয়ে উঠল।

দীর্ঘ সুন্দর নাবালক যুবক ছোকরাটির মুখের রক্তঝকে আলো কিন্তু একেবারে নিভে গেছে। ভয়ের তাড়না খেয়ে একটি বিশীর্ণ যৌবনের অবয়ব যেন নিতান্ত অসময়ে কুঁকড়ে গেল।

গেটের কাছে এসে পরীক্ষিৎ দেখল সুমিত্রাও তার পেছনে পেছনে ছুটে এসেছে।

পরীক্ষিৎ ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করল,—

"চলে এলে যে—?"

গেটের থামের কাছে এসে দাঁড়াল দুজনে। সুমিত্রা প্রশ্ন করল,—

"তুমি এ-ভাবে চলে এলে যে?"

"কি ভাবে?"

"কি মনে করলেন সকলে! কি মনে করবে ভদ্রলোকটি!"

"অভদ্র মনে করবে সকলে। তোমার মত ভদ্রতা করতে শিখিনি এখনও। এমন ভদ্রতার জ্ঞান তোমার, —করুণাকে সাহায্য করবার কথাও তোমার মুখ দিয়ে বেরুলো না।"

"আমি সাহায্য না করলেও চলবে! তোমার হাসহাত এগিয়ে যাবে তার উপকারের জন্যে—।" একটু থামল সুমিত্রা, তারপর কি যেন অনেক কষ্টে চোক গিলে একটু একটু কাঁপা কাঁপা গলায় বলল,—"যেমন হাসছিল একটি হাতে কি সুন্দরই না নাম লিখেছ এই বাড়ীটার—।"

সুমিত্রা আঙুল বাড়িয়ে গেটের ফলকের দিকে পরীক্ষিতের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

একটা সাদা পাথরে লেখা রয়েছে 'অসিত-বরণা।' কিছুক্ষণ সুমিত্রার মুখের দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে পরীক্ষিৎ বলল,—

"কই বলছে? নতুন নামকরণটা ভাল লাগছে না বুঝি এখন।"

"সুন্দর কবিত্ব করেছ কিন্তু তুমি। ভাল লাগবে না কেন? না লেগে উপায় আছে? 'অসিত-বরণা'—। মিলিয়েছ কিন্তু মন্দ না! আমার মাথা থেকে বেরুতোই না!"

"এই প্রথম দেখলে?"

"তোমার কবিত্ব? যাঃ। তা কেন হবে!"

"না—না, সে প্রশ্ন করিনি। তুমি কি অসিতের বাড়ীর নামটা আজই প্রথম দেখলে?"

"দেখলাম প্রথমই। শুনেছি ঢের আগে। অসিতবাবুর মারা যাওয়ার পরে লিখেছ।"

"সে-খবরও পেয়ে গেছ?"

"অনেকের মুখেই শুনেছি। অনেক খবরই সকলে রাখে—কেবল আমি ছাড়া।"

"তাই তো হয়! আমি ছাড়া তোমার সব খবরই যেমন আর সকলে জানে, তুমি ছাড়া আমার সব খবরই তেমনি আর সকলেই জানে!—এই তো নিয়ম।"

বাড়ীর দিকে হাঁটতে লাগল ওরা দুজন।

পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করল,—

"বাঁ দিকের লাল একতলা বাড়ীটা তোমার শোভনাদির না?"

"মাষ্টারি করে এই বাড়ীটা করেছেন। আমি ওকে শ্রদ্ধা না করে পারি না।"

"শ্রদ্ধা করাই উচিত। তিনি তোমার অনেক উপকার করেছেন।"

"উপকার! —মানে?"

"আমার অনেক খবর তিনি তোমার কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন। তার কাছ থেকে আর কি কি খবর শুনেছ? শোননি বরুণাকে পরীক্ষিতবাবু সাহায্য করেন?"

"তা তো চোখেই দেখলাম।"

"অন্যায়—?"

"হ্যাঁ অন্যায় বুঝি না। কিন্তু ওর কি টাকার এতই অভাব? পাঁচ মাস ভাড়া পাননি বলে ওর কি সংসার চলছে না?"

"এ তো ঠিক তোমার গলার আওয়াজ নয় সুমিত্রা! তোমার শোভনাদিরই গলা পাচ্ছি তোমার কথার মধ্যে। দেখ! তোমার সেই দিদিটি আমার মুখে ছোবাতের সবখানি কালি উল্টে দিলেও দুর্নামের ভয়ে আমি পিছপা হবো না কখনও। এ-কথাটা সর্বদা তুমি মনে রেখো।"

"সমাজে বাস করতে হলে, দুর্নামের ভয় না করলে চলে না। তোমার হয়তো কিছু এসে যায় না, আমার ভাল লাগে না।"

"মিথ্যে দুর্নামকেও সহ্য করতে পার না?"

"অত শক্তি আমার নেই। আমার মনটা বড় দুর্বল।"

"কিন্তু আমার সে-শক্তি আছে। অত দুর্বল নয় আমার মন।"

"তার পরীক্ষা হয়নি। এখনও—।"

বাড়ীতে পৌঁছে গেল পরীক্ষিৎ ও সুমিত্রা। বাড়ীতে পা দিয়েই সুমিত্রা আবার সিঁড়ি দিয়ে নামতে গেল।

"কোথায় চল্লে আবার।"

"একটু—এখনি আসছি—তপতী দীপককে রেখে এসেছি—আনতে যাচ্ছি।"

"রেখে এসেছ? কোথায় রাখলে? কার কাছে।"

"শোভনাদির কাছে।"

"শোভনাদি!—"

"সঙ্গে নিয়েই বেরিয়েছিলাম। কিছুতেই ছাড়তে চাইলে না ওরা। সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল সুমিত্রা।

"আজ কি ওদের ছুটি?"

"তা জানিনা। —বাড়ীতে আছেন, স্কুলে যাননি।"

"সঙ্গে করে নিয়ে এলেই পারতে—রাস্তাতেই তো ওদের বাড়ী।"

এর একটা মানানসই উত্তরও সে দিয়ে দিয়েছিল

'এসে বলব কেন তখন সঙ্গে করে আনিনি।' বাড়ীতে এসে অবিশ্যি কারণটা তখন বলেনি, কিছুদিন পরে বলেছিল। 'বাপমায়ের ঝগড়াঝাঁটি ছেলেমেয়েদের সামনে যত কম হয় ততই তাদের মঙ্গল। বরুণার বাড়ী থেকে আসবার সময় তোমার মেজাজটা খুব সুবিধের ছিল না।' সেদিন তার এ-কথা সে বিশ্বাস করেনি। যদিও ছেলেমেয়েকে নিয়ে সুমিত্রার ফিরে আসতে খুব দেরী হয়নি তবু সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পরীক্ষিতের মনে হল এর চেয়ে ঢের আগে সে বাড়ীতে ফিরে আসতে পারে। পরীক্ষিৎ যে তখন থেকে সিঁড়ির কাছেই দাঁড়িয়ে থাকবে সুমিত্রা তা একেবারেই ভাবতে পারেনি। তপতী দীপককে ঠেলে দিয়ে সুমিত্রা ওর ক্রোধের আগুনের সামনে ছাইয়ের মত সাদা হয়ে দাঁড়াল। পরীক্ষিৎ প্রথমটা কোন কথা বলল না। ওকে দেখতে লাগল। ওকে যেন সেই মুহূর্তে সুরবতিনী ও ভিন্ন একটি স্ত্রীলোক বলে মনে হল। ওর সাহসী রূপের মূলে যে রক্তবিন্দুগুলো বালুকণার মত তপ্ত হয়ে গিয়েছিল এখন তা মরার মত ঠাণ্ডা হতে দেখে পরীক্ষিতের কোন দয়া হল না। পরীক্ষিতকে কেটে ছেঁটে বাদ দিয়ে সে যেন ছেলে-মেয়েকে নিয়ে সম্পূর্ণভাবে আলাদা হয়ে চলতে চায়,—এ-কথাটা বুঝতে তার একটুকুও সময় লাগল না।

"তোমার শোভনাদিকে ছাড়তে হবে তোমায়।"

"কেন?"

"হয়,—ওকে ছাড়তে হবে,—নয়,—আমাকে!"

"বেশ!"

"'বেশ' কথাটার অর্থ বুঝলাম না। —আমাকেই বোধহয়? আমি ঠিকই আন্দাজ করেছিলাম। ঠিকই বুঝেছি।"

"কি বুঝেছ?"

"তাই বুঝি তোমরা নার্সিং হোমে অকাল শিশু বোধনের জন্যে লুকিয়ে লুকিয়ে অশ্রুপাত করেছ?"

"সে তুমি বুঝবে না,—তোমার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়, তুমি তো কোনদিন মা হওনি—।" একটু থেমে সে কি যেন ভাবল। হঠাৎ সচেতন হল সুমিত্রা। পরীক্ষিতের একটা শব্দ হঠাৎ ফিরে এসে ওর কানের কাছে নিষ্ঠুর টিটকারি করে উঠল। আর সেই মর্মঘাতী টিটকারি সহ্য করতে না পেরে সুমিত্রা বলে উঠল,

"কি বল্লে—? তোমরা! তোমরা কারা?"

"যে আমার মত ক্রুট নয়,—বিষ্টু নয়,—যার শরীরে দয়ামায়া আছে, পুরুষ হয়েও যে শান্তশিষ্ট,—আরো —আরো, অনেক বিশেষণে যে অলঙ্কৃত—"

"তুমি কি তা আমি জানি।" সুমিত্রা খুব জোরে চিৎকার করে উঠল। তবু সে চিৎকার ওর গলায় বসে যাওয়া কান্নাকে অবিকৃত রাখতে পারল না।

"তুমি কি বলতে চাও—তাই বল। তোমার মুখ থেকেই শুনতে চাই তার নাম।"

"চোরের মত লুকিয়ে লুকিয়ে যায়নি এক ব্যক্তি হাসপাতালে? —যার নাম অজিত! যে খুব ভাল ছবি আঁকে—যে তোমার রূপ রূপ বুকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে একদিন পৃথিবীর মধ্যে একটা শ্রেষ্ঠ ছবি আঁকবে বলে?"

"লুকিয়ে লুকিয়ে?"

"ছটার পরেও যেতো না? ভিজিটিং আওয়ারের পরে? পাছে আমার সঙ্গে ওর দেখা হয়ে যায়—এই ভয়ে।"

"শোভনাদিকে আসতে বলেছিলাম। ছটার পর ছাড়া তার আসবার উপায় ছিল না। স্কুলের টিচার তিনি। ছুটি না হলে আসতে পারেন না। ওর সঙ্গে অজিতবাবুও আসতেন।"

"জীবনের সুখদুঃখ বলবার জন্যে এমন সুহৃদবর্গকে কিন্তু ছেড়ো না—বড্ড কষ্ট হবে।"

সুমিত্রা তার দুটি হাত দিয়ে শুধু তার মুখ ঢাকতে পারে কিন্তু কান্না রোধ করতে পারে না।

ও যেন একটি বিরল ঘরে আবদ্ধ হয়ে গেছে—একটুখানি নির্মল বাতাসের জন্যে ওর প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছে।

পরীক্ষিৎ সুমিত্রার এই ভাবান্তর উপেক্ষা করে বলল,—

"আমি আশ্চর্য হচ্ছি—তুমি তোমার শোক প্রকাশ করবার আর লোক পেলে না ?"

মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিল সে। তখনই দেখা গেল ওর চোখদুটো যেন একটা মারাত্মক ঝাপটা খেয়ে আহত হয়ে গেছে।

সুমিত্রা বলল,—

"তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। তুমি যা বলেছো তাই করেছি—কাউকে সে-কথা বলিনি। তোমার পাশবিক—পা-শ-বি-ক কীর্তির কথা কাউকে জানাইনি।"

সুমিত্রা সেই মনের কষ্ট রেখে গেছে ঝড়ো বাতাসের মধ্যে। সুমিত্রার যাওয়ার অনেক বছর পরে সেদিন সে রাত্রির একটা ডাক শুনে বিছানা ছেড়ে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। চোখ তুলে দেখল রাত দুপুরের আকাশ জুড়ে একটি বিস্তীর্ণ অস্পষ্টতা তারই নারকেল গাছের পাতার ঝড়ো হাপাহাপির মধ্যে স্পষ্টতর হয়ে নেমে আসবার জন্যে বার বার চেষ্টা করছে। একদিকের বাতাসের টানে গাছের সবগুলো পাতাই পূবদিকে ঝাড়া হয়ে অস্থির হয়ে উঠেছে। বহু দূরের আকাশ থেকে যে শব্দের স্রোত এর কাছে এসেছে তা যেন সংযোগ স্থাপন করতে না পেরে ঘরের তারের মত ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে। পরীক্ষিৎ তার ইজিচেয়ারে এসে বসল—আর ঘুম আসবে না চোখে সারারাত। পরীক্ষিৎ জানে ও তখনি বুঝতে পারবে এই ঝড়ো বাতাসের ভাষা যখন ওর সমস্ত ভাবনা জুড়ে একটি তীব্র বেদনা টন টন করে উঠবে। সুমিত্রা! তখন তোমাকে বুঝিনি,—তাই কত অবিচার করেছি!

অবিচার নয়? অবিচারই তো!

স্পষ্ট হয়ে গেল সমস্ত দুঃখের ভাষা।

কোথা থেকে একটি মেয়ে উড়ে এসে মিলিত হল একটি অপরিচিতের সঙ্গে আর তখনি ক্রিয়াশীল হয়ে উঠল অজানা একটি ঘনীভূত রহস্য—যে অনেক শতাব্দী ধরে এর শাখা প্রশাখায় শ্রবণ করে একটি মাত্র সম্ভাবনার দিকে অগ্রসর হয়ে এসেছে। একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন সত্তা হয়ে একদিন তা একটি জীবদেহে আশ্রয় গ্রহণ করল কিন্তু তখনও সে নির্ভরশীল পরজীবী মাত্র। নিজেকে রক্ষা করবার শক্তি নেই নিজের অথচ নিজেকে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে বাড়িয়ে বাঁচিয়ে রাখবার একটি অচেতন প্রেরণার স্পন্দন আছে। এমনি একটি ভবিষ্যৎ অস্তিত্বকে যেদিন অবাঞ্ছিতের মত সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেদিন সে কিন্তু অস্তিত্বের অভাবে পাগল হয়ে হাহাকার করে ওঠেনি; সে ধীরে ধীরে নিভে গিয়েছিল কোন প্রতিবাদ না করে। প্রতিবাদ সে করেনি সত্যি, কিন্তু বড় অদ্ভুত রহস্যময় কৌশলে সে এই প্রতিবাদের ধ্বনি জাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিল আশ্রয়দাতার প্রাণে।

সেই আশ্রয়দাতার চিত্ত,—তার কষ্ট আর কান্না তুমি বোধ করতে পার না। তুমি সেই অসহায় জীবনকোষের বীজকে অবহেলায় নিক্ষেপ করেছ কাল-স্রোতের অন্ধকারে। বোধহয় সহস্র সহস্র বছর পেরিয়ে একটি অজানা মায়ের কোলে এসে সে জাগবে কিন্তু তোমার কাছে ও আর ফিরে আসবে না। হয়তো সেই তোমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হতে পারত—তোমার পাশে এসে দাঁড়াত, ভালবাসত, কাছে থাকত। কে বলতে পারে একটি দুর্লভ প্রতিভা মৃত্যুর শীতল অঙ্কে চিরনিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে রই হয়ে গেল না?

না, ও কেবল নিজেই নষ্ট হয়নি, সুমিত্রারও অনেক ক্ষতি করে গেছে।

তখন থেকেই একটি অপূরণীয় ক্ষতির ইতিহাসের সূচনা হল। একটি বিকালের ঘটনা মনে পড়ে পরীক্ষিতের। বেশ একটু ভাবিয়ে তুলেছিল সুমিত্রা কিন্তু ভাবনাটা ঘুরিয়ে যাওয়ার আগেই সুমিত্রা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। ছেলেমেয়েকে আগলে আগলে এমনভাবে চলার মধ্যে কোথায় যেন একটা অস্পষ্ট অপ্রকৃতস্থ ভাব ছিল তার। ঠিক এরকম প্রকৃতির মানুষ নয় সুমিত্রা, সে যেন হঠাৎ নতুন আলাদা মানুষ হয়ে গেল। ঘরকন্নার দিকেও তার তেমন উৎসাহ নেই, পরীক্ষিতের সঙ্গেও যেন ওর সম্পর্ক চের কমে এসেছে। যা সুমিত্রার স্বভাবে ছিল না তা এখন হয়েছে।

সাধারণতঃ স্বভাবের আকস্মিক পরিবর্ত্তনটাই অস্বাভাবিক। যার যা চরিত্রের বৈশিষ্ট তার প্রকাশে আমরা বিচলিত হইনা এবং অস্বাভাবিক বলেও মনে করি না। কিন্তু শান্ত মানুষ রাগি হয়ে উঠলে, কোমল মন কঠিন হলে, দুনো মানুষ ঘরছাড়া হয়ে সময়ে অসময়ে দিন কাটালে, মজলিসি মিশুক মানুষ গুম হয়ে থাকলে, অনুরক্ত মনে অবিশ্বাস, সন্দেহ ও ভয় ঢুকলে, সে মানুষের সম্বন্ধে আশঙ্কার কথা মনে হতে পারে।

নতুন একটা এয়ারগান কিনেছিল ছেলেমেয়েরের জন্যে। তাই দিয়ে তাক করে ওদেরকে গুলি ছোঁড়া শেখাচ্ছিল পরীক্ষিৎ। শেখাতে গিয়ে ওর নিজেরই মজা লেগে গেল, নেশা ধরে গেল। হাতে বন্দুক না ধরে এবং গুলি নিজেরা না ছুঁড়েও ওরা মহা উৎসাহিত, খুসী এবং দক্ষই।

এমন সময় সুমিত্রা ছাদে ছুটে এল।

থমকে দাঁড়িয়ে চারিদিক দেখতে লাগল। দেখল দীপক, তপতী ও অবশেষে পরীক্ষিতকে।

"এত ডাকাডাকি করছি—শুনতে পাওনি?"

"শুনতে পাওয়ার মত হাঁকডাক করোনি হয়তো!"

"এরা কি করছে এখানে? এদের ছাদে নিয়ে এসে কি করবে বলতো? মানে তো কিছুই বুঝতে পারছি না। এরা কেন?—ওকি! তোমার হাতে ওটা কি?"

"এয়ারগান—। গুলি ছোঁড়া শেখাচ্ছি ওদের।"

"এসব নিয়ে কেন খেলা কর বলতো? বেকায়দায় লেগে গেলে মানুষ মরে যেতে পারে,—জানো?"

"জানি হয়, মানুষ মরে না।"

"জানি হোক কি না হোক—তা আমি জানিনা। তুমি কখনো ওদের সঙ্গে গুলি ছোঁড়াছুঁড়ি খেলবে না—।"

ওর কথা শুনে হেসে ফেলল পরীক্ষিৎ। ওর বিশ্বাস জন্মানোর জন্যে সে ছররা ভরে বন্দুক উঁচিয়ে একটা কাকাতুয়াকে লক্ষ্য করে বলল,—

"মানুষ তো দূরস্থান, একটা কাক-চিলও মরে না। দাঁড়াও। এখনি তার প্রমাণ পাবে।"

কাকটা আলসের ওপরে বসে খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে গলা বাড়িয়ে কা কা করে ছটফট করছিল। একটা আক্রমণাত্মক ক্রুদ্ধ ভাব নিয়ে মাঝে মাঝে ওটা পাখার ঝাপটা মারছিল। হয়তো কাছে-ভিতে কোথাও ওর বাসা আছে এবং সেখানে তার সদ্য ডিম-ভাঙা বাচ্চাগুলোকে সে আর এদের কাছে নিরাপদ বলে মনে করতে পারছে না। এক মুহূর্ত্তের জন্যেও সে স্থির হয়ে বসতে পারছে না। বন্দুকের নল দেখে ও আরো জোরে কা কা করে উঠল আর ঠিক সেই সময়ে বন্দুকের ছুঁড়বার হালকা ছেড়ছেড়ে আওয়াজ হল। শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল সকলের বিস্মিত চোখের সামনে কাকটা আলসে থেকে টুপ করে ছাদে পড়ে ছটফট করতে করতে স্থির হয়ে গেল। পরীক্ষিৎ দেখল ওটার এক চোখ বেয়ে একটি তাজা রক্তের ধারা ছাদের মধ্যে গড়িয়ে গেল। সেই মুহূর্ত্তে পরীক্ষিতের শরীরটা যেন কাঠ হয়ে উঠল।

ঘৃণার চোখ যে এত ভীষণ হতে পারে সুমিত্রাকে তখন না দেখলে বোঝা যায় না। ছুটে গিয়ে সুমিত্রা ওর হাত থেকে মোচড় দিয়ে বন্দুকটা কেড়ে নিয়ে বলল,—

"তোমাকে বুঝতে আর বাকী নেই আমার! তুমি যে কি চাও,—তা আমি আগেই বুঝেছিলাম।"

পরীক্ষিৎ জোরে সুমিত্রার কব্জি ধরে ঝাঁকিয়ে বলল,—

"কি বুঝেছ—কি তুমি বুঝেছ—।"

"চিৎকার করো না! তোমার চিৎকারকে আমি ভয় করি না আর। তুমি কি চাও তা তুমিও জান আমিও জানি—আর তুমি তারই সুযোগ খুঁজছো। আমি সে সুযোগ দেবো না—কিছুতেই না!—হাত ছাড়ো!"

সুমিত্রা ছেলেমেয়ের হাত ধরে নীচে নেমে গেল। পরীক্ষিতের প্রভুত্বকে এ-ভাবে উড়িয়ে দেওয়াতেও কিন্তু তার মনের কঠোরতা কঠিন হয়ে উঠল না। বরং সুমিত্রার সাময়িক অসুস্থ মনের জন্যে ওর উদ্বেগ হল। ছাদের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল সে। সন্ধ্যা গড়িয়ে গিয়ে রাত হল। অনেকগুলো তারা উঠেছে আকাশে,—চাঁদও। ওদের নিয়ে অন্ধকার নীল আকাশে ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে চাঁদ। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এই চাঁদ এক সময়ে অস্ত যাবে,—বোধ হয় ভোর রাত্রে। তারপর

চোখ মেলে তাকিয়ে আছে সে। স্থির চোখকে বিদ্বেষ আর সন্দেহের মত মেঘ এসে বার বার ঘোলাটে আর কাপসা করে দিচ্ছে। অন্ধকারের মধ্যে থেকে একটা কাক ডেকে উঠল অসময়ে এবং অকস্মাৎ। কাছের কোন গাছে একটা অস্বিরতা অনুভব করল সে। অন্ধকার থেকে সেই মুহূর্তে যেন একটা মায়ার অনুভূতি ওর মনের কাছে নেমে এলো। স্পষ্টতর হল সুমিত্রা,—আরো স্পষ্টতর হল ওর দুঃখ ও আতঙ্ক। অন্য স্ত্রীলোকের এ-রকম ভাব-চরিত্র দেখলে সে যা ভাবত নিজের স্ত্রীর সম্বন্ধে সে রকম কথা অত সহজে ভাবা চলে না। ভাবতে বেশ কষ্ট হয় যে সুমিত্রার মাথার কোন দোষ হয়েছে—বরং এ-কথা ভাবতে সহজ হল পরীক্ষিতের যে তার প্রতি সুমিত্রার বিশ্বাস এবং নিষ্ঠা নষ্ট হয়েছে। এ-বিশ্বাসকে তার মনে ফিরিয়ে আনতে হবে।

নীচে নেমে গেল সে। এ-ঘর ও-ঘর খুঁজে ঘুরের একটি ছোট ঘরে সুমিত্রাকে পাওয়া গেল। অন্ধকার ঘরে জানালার ধারে বসে কাকে যেন খস খস করে চিঠি লিখছে সে। ভেবেছিল ছেলেমেয়েকে নজরবন্দী করে সুমিত্রা হয়তো হিংস্র বাঘিনীর মত কোন ঘরে ওদেরকে আগলে বসে আছে কিন্তু তা নয়—ছেলেমেয়েরা ওর কাছে নেই।

যা দেখবার জন্যে পরীক্ষিৎ তার মনটাকে প্রস্তুত করেছিল তা দেখতে না পেয়ে সে যেন ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করল।

সুমিত্রার নামের প্যাডে কালো কালো অক্ষরের ওপর চাঁদের আলো এসে পড়েছে। চিঠি লেখাতে সে এতই মগ্ন যে পরীক্ষিতের উপস্থিতি সে টের পেল না।

সুমিত্রা ঠিক যেন এখন একা নয়। অন্ধকারের ভ্রূণ টানা টানা অক্ষরগুলো ওর অপর একটি বন্ধনের সঙ্গীর মত নিরালায় সুমিত্রার কালো কাজলের চোখের জলে-ওঠা নরম একজোড়া মনির দিকে চেয়ে বিশ্বাসে মুগ্ধ হয়ে আছে।

পরীক্ষিতের বিস্ময়ও যেন সঙ্কোচ বোধ করল, তবু একটু এগিয়ে গেল সে।

"চিঠি—?"

সুমিত্রা ওকে দেখে চিৎকার করে ওঠেনি, তবু হঠাৎ ক্ষিপ্রগতিতে ওর দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে, 'চিঠিটাকে দুহাতের দলটা আঙুলে দুমড়িয়ে ধরার মধ্যে, ওর মনের ভীষণ চিৎকারের ধ্বনি যেন প্রচ্ছন্ন ছিল।

"আলো না জেলে চিঠি লিখছো? খুব দরকারি? তাড়া আছে বুঝি?"

পরীক্ষিৎ একটু এগিয়ে গেল।

"আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে—তুমি সরে যাও, এখান থেকে সরে যাও তুমি। যা লিখবার এখনই লিখতে হবে আমাকে।"

"খুব জরুরী তাহলে! কাকে লিখছো জানতে পারি?"

"তোমাকে নয়—!"

"আমাকে নয় তা বুঝতে পেরেছি। বাপমাকে যে লিখছো না তাও বুঝেছি—অম্বরেশ কিংবা সাধনাকেও নয়। কিন্তু কে? কি লিখছো? এসব তো আমার জানা দরকার।"

"কেন?"

"জানা দরকার এই জন্যে যে আমার ছাদের নীচে বসে পরম আয়াসে নিশ্চিন্ত মনে অনাচার করছ কি না তা আমার দেখতে হবে।"

"অনাচার? তুমি আর কথা বলো না। তোমার অনাচারের পাপে আমার এই দুঃখ। সে দুঃখ,—সেকথা একজন মানুষকে অন্ততঃ বলে যাব। তাই লিখে যাচ্ছি। বাইরের লোকের কাছে তুমি মহাপুরুষ জ্ঞানী-গুণী, মহৎ, উচ্চ আর স্নেহপ্রবণ বাপ, অনুরক্ত স্বামী—সেসব কথা আসুক সকলে আমার আপত্তি নেই কিন্তু একটি—কেবলমাত্র পৃথিবীর মধ্যে একটি প্রাণী যেন তোমার ভেতরের মানুষটির সঠিক পরিচয় পায়—তাই লিখছি—"

"কোন মানুষটি তোমার মনে এতখানি বিশ্বাস জন্মিয়েছে?"

"সে তোমার মত নয়। সে আমাকে শ্রদ্ধা করে—আমি তাকে অত্যন্ত স্নেহ করি—"

"আর স্নেহের সম্পর্ক? নিশ্চয়ই সে-ব্যক্তিটি পুরুষ মানুষ!"

"তোমার কাছে তার নাম বলতে ইচ্ছে হয় না। তুমি সে নামের অর্থ করবে—মর্যাদা দিতে পারবে না!"

"তা ঠিক! মর্যাদা দিতে পারবো না হয়তো। আমাকে নিয়েই যখন লিখেছ তখন চিঠিটা আমাকে পড়তেই হবে। আমার সঠিক পরিচয় আমিই জানি না—আমার তা জানা দরকার।"

দুমড়ানো চিঠি কেড়ে নিয়ে পড়তে লাগল পরীক্ষিৎ। পরীক্ষিতের মুখ থেকে সুমিত্রা চোখ ফেরাতে পারল না। কি একটা ভয়ের টানে এগিয়ে গেল পরীক্ষিতের কাছে। কিছুক্ষণ ঠাওা অবশ চোখে তাকিয়ে রইল ওর হাতের চিঠির দিকে।

হঠাৎ ছিটকে গেল পরীক্ষিতের কাছে। দুই হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে বলল,—

"তুমি আমাকে মেরে ফেলতে চাও। বল, সত্যি কিনা! কেবল আমাকেই না, ছেলেমেয়েকেও—। আমাদের মেরে ফেলে তুমি যা চাও তা আমি কিছুতেই হতে দেবো না।—সেই জন্যেই চিঠি লিখে যাচ্ছি—"

"ভয়ানক সাংঘাতিক সাংঘাতিক কথা তোমার মাথায় ঢুকিয়েছে তো!—অজিত?—কম বজ্জাত তো নয়!"

ওকে ছেড়ে দিয়ে সুমিত্রা সরে দাঁড়াল।

আমাদের জীবনহানি করবার চেষ্টা চলছে—অনেকদিন ধরেই এই চেষ্টা চলছে তোমার। আজ না হোক,—কাল,—কাল না হোক,—পরশু,—এটা ঘটবেই। তাই চিঠি লিখে যাচ্ছি।"

চিঠিটা পড়তে পড়তে পরীক্ষিৎ একবার সুমিত্রার মুখের দিকে তাকাল। ওর চোখটা জ্বলে যাচ্ছিল, ওর গলাটা শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে যাচ্ছে। তবু একটি প্রচণ্ড আঘাতের বেদনাকে খুব জোর করে সরিয়ে দিয়ে সে বলল,—

"আমার ভয়ে তুমি অন্য ঘরে শোবার ব্যবস্থা করেছ? আমার ভয়ে তুমি ছেলেমেয়েকে তোমার কাছে নিয়ে শোও?—পরীক্ষিতেরও ভুল হয় তাহলে।—আমি ভেবেছিলাম,—আমার ঘুমের ব্যাঘাত হয় বলে তুমি ছেলেমেয়েকে নিয়ে অন্য ঘরে গিয়েছ!"

"ওকি! তোমার ঠোঁটটা কাঁপছে কেন এত? চিঠি পড়ে?—রাগ তোমার হবে, তা আমি জানি—।"

"সুমিত্রা!" চিৎকার করে উঠল পরীক্ষিৎ। দুমড়ানো কুঁচকানো চিঠিটাও যেন ছুটে ছিটকে কাঁদিয়ে চিৎকার করে মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল। [ক্রমশঃ

• • •

শুধু একটা গাছ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জীবনের শেষ দিকে একবার তাঁর জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামে বেড়াতে গিয়েছিলেন। তাঁদের বাড়ীর কাছে একটা বৃহৎ গাছ ছিল। তাঁর ঠাকুরদা সেই গাছটী রোপন করেছিলেন। তখন সেই গাছ বৃহৎ মহীরুহে পরিণত হয়েছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় অন্তর থেকে সেই গাছটিকে ভালবাসতেন।

সেবার গ্রামে এসে সকালবেলা বেড়াতে বেরিয়ে সর্বপ্রথম তাঁর নিঃসঙ্গ বন্ধুটির খোঁজে বেরুলেন। স্তম্ভিত বিস্ময় দেখলেন সে গাছটিকে কে কেটে ফেলেছে।

রাগে, শোকে সেই রুদ্র-ব্রাহ্মণের সর্বশরীর কেঁপে উঠলো। তিনি তৎক্ষণাৎ খোঁজ করলেন কে এই সর্বনাশ করেছে।

জানতে পারলেন, তাঁর এক আত্মীয়েরই এই কাজ। আত্মীয়টি তাঁর সামনে এসে বলে, এতে এত রাগ করবার কি আছে? সামান্য একটা গাছতো!

বিদ্যাসাগর মশাই রেগে জ্বলে উঠলেন, তুমি মূর্খ, কি করে বুঝবে এই গাছটির কি মূল্য। তুমি তো এই গাছটিকে শুধু নষ্ট করনি, তুমি আমার বংশের ইতিহাসকে নষ্ট করেছ।

সচিত্র সংযোজন

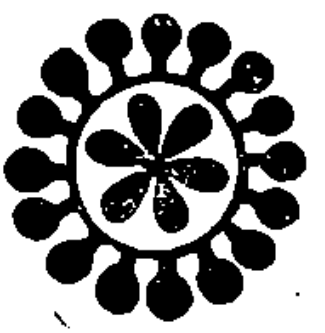

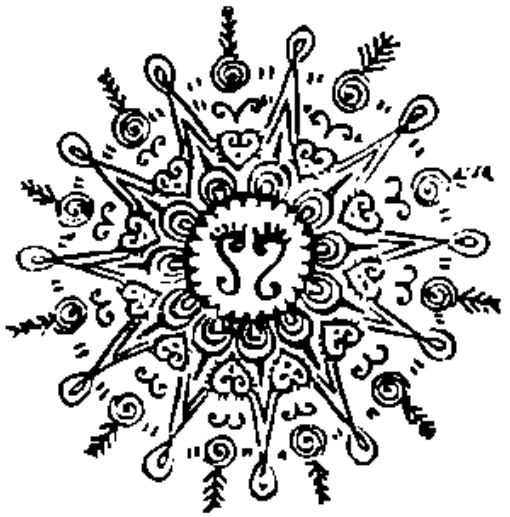

দীপান্বিতা স্মৃতিকথা

গিরিবালা দেবী

তোমরা শুনতে চেয়েছ সেকালের কথা। আমার স্মৃতির ভাণ্ডারে পূর্ণ হয়ে রয়েছে কত কথা, কত কাহিনী।

দীপান্বিতা সমাগত, তাই বলি একটুখানি। আমাদের পল্লীগ্রামখানা ছিল যেমন ছোট, তেমনি তার পরিবেশ বড় নয়। এখনকার বড় জগতের সঙ্গে সে পল্লীবাসীদের কোনই যোগাযোগ ঘটেনি। তাদের গতি ছিল ক্ষুদ্র, তাদের পাপপুণ্য, ধর্মকর্ম, আচার অনুষ্ঠান, বিচারবোধ নিয়ে।

গ্রাম ছোট হলেও সেখানে দুর্গোৎসব হতো অনেকগুলো। যাঁরা দুর্গোৎসব করতেন, তাঁদের গৃহে কালীপূজা ছিল অবশ্য করণীয়। তাছাড়া অনেকেই শ্যামাপূজা করতেন। এক রাতের অনুষ্ঠান। তেমন আয়োজনের প্রয়োজন হতো না, তেমন ব্যয়বাহুল্যের ভয় ছিল না। বিশেষতঃ তখনকার কালে যাঁরা ও প্রবীণ ব্যক্তিদের অধিকাংশই ছিলেন শক্তির সাধক। তাঁদের হৃদয়-মনে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল,—

"শ্মশানে কেন মা গিরিকুমারী,
কেন মা, তোমারি এমন বেশ?
হরহৃদিপরে দিয়েছ চরণ,
নাহি কি মা তোমার লাজের লেশ?"

তখনকার দিনে শক্তির সাধনায় গৃহে গৃহে অনুষ্ঠিত হোত জগৎজননী দেবী কালিকার আরাধনা।

দীপান্বিতা পুজোর আয়োজনের সময় শুনেছি গৃহের বৃদ্ধা গৃহিণী, ঠাকুমা, পিসিমাদের কত সাবধানতা, সতর্কবাণী। ঢেঁকিশালায় ভোগের চালভাজুনীদের প্রতি কত উপদেশ,—

"ভোগের চালে যেন অনাচার না হয়, উনি কাঁচাখেকো দেবী, সাবধান।"

শ্যামা-মা 'কাঁচাখেকো' হলেন কিসে তখনো বুঝি নাই, আজও বুঝতে পারিনি। অথচ দুর্গোৎসবের কয়েকদিন ধরে কত সমারোহ, বিপুল আয়োজন, তার ভেতরে শুচিতা থাকলেও এত সতর্কতা থাকতো না।

দুর্গাপূজায় যা প্রকাণ্ড আয়োজন, একটি রন্ধনীর কালিপুজোয় সেই উপকরণ অল্প পরিমাণে। সেই কাটা কলমূল, সেই নানাবিধ মিষ্টান্ন, থালা থালা নৈবেদ্য। সেই বলিদান, ভোগরাগ, সেই ঢাক ঢোল কাঁসি, শঙ্খঘণ্টা, ধূপদীপ, সবই আবশ্যক।

দুর্গার উদ্দেশে ছাগবলিদানের ফলে পূজামণ্ডপের আঙিনা রক্তে লাল হয়ে যায়, তিনিও কি কাঁচাখেকো দেবী নন? শুধু কি কনকচাঁপা বর্ণের জন্য? রূপভেদে সেই একই জননীকে এত ভয় কিসের? যাঁর কালোরূপে জগৎ আলো, তাঁকে 'কাঁচাখেকো' বলা? এমনি প্রশ্নের পর কত প্রশ্ন মনে উদয় হয়ে মিলিয়ে যেত নৈঃশব্দে।

ওঁর প্রসন্ন ত্রিনয়ন হতে কত করুণা কত মমতা ঝরে পড়ছে দিখে।

শ্মশানকালীর পূজার ভীষণতা আমার শিশুচোখে ধরা পড়েনি সেদিন। বৈশোরে, যৌবনে যে পূজায় অংশ নিয়েছি, যে পূজায় ভোগ প্রস্তুতের অধিকার পেয়েছি, সে পূজা বধূজীবনে আমার শ্বশুরবাড়ীর।

পিতৃগৃহের সুমধুর স্নেহময় পরিমণ্ডলে আমার কোনও কর্তব্যবন্ধন ছিল না, শুধু পূজা দেখে, প্রসাদ খেয়ে আনন্দ করে বেড়িয়েছি। কিন্তু শ্বশুরালয়ে হাতেখড়ি হল কালীমায়ের সেবায়, ভোগরাগে।

কোজাগরী পূর্ণিমার পরেই আবার বেউড়ী বা মৃৎশিল্পী মালমশলা নিয়ে এসে যেত, সঙ্গে এবার মাত্র দু'একজন লোক। দুর্গাপূজায় অনেক আয়োজন, তিনদিনের পূজায় আড়ম্বরও বেশী। কিন্তু ওজনে ছোট না হলেও ভাষা যা হয়তো একা আসেন বলে আয় লাঘব হয় পদে পদে পূজার্থীদের।

মণ্ডপের পাশের চালায় খড় দিয়ে কাঠামো করে মাটী লাগায় বেউড়ীরা। তারপরে কিছুদিন শুকিয়ে নিতে হয়। তখন রং পড়ে, ছাঁচ দিয়ে মুখ গড়ানো হয়।

আমাদের বাড়ীর প্রতিমার রং কিন্তু হত কালো নয় নীল, গাঢ় সুনীলবর্ণা। দেবীর মুখে থাকত অপরূপ লাবণ্য ও শ্রী। কলিকাতায় অমন প্রতিমা দেখি না আর।

বেউড়ীরা অন্দরে রান্নাঘরের উঁচু দাওয়ায় খেতে বসত। সকালে বাসি ভরে জলপান যেত ওদের। ঘন-ঘন তামাক-টীকের যোগান মিলত জনখাটা মুসলমান চাকর জুম্মানের কাছে। আমরা হিন্দুমুসলমানকে একত্রে পূজার কাজ করতে দেখেছি।

পূজার দিন সকাল থেকে আমরা বৌঝিরা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়তাম।

দুর্গাপূজায় ভোগ তিন-চারদিন ব্যাপি হলেও ভোগরাঁধুনির উপবাস ছিল বেলা দ্বিপ্রহর মাত্র। ভোগ সরে গেলে বড়জোর বেলা দুটো-তিনটে, তখন ভোগরাঁধুনী জলযোগে বসে যেতেন। কিন্তু একরাত্রির কালিপূজায় ভোগ রাঁধার জন্যে সকাল থেকে তিনি অনুযায়ী রাত্রি দুটো-তিনটে পর্যন্ত ভোগ রন্ধনকারিণীর অনাহার। গভীর রাত্রে দেবীর ভোগ সরে গেলে প্রাঙ্গন ভরে নিমন্ত্রিত জনের পরিতৃপ্তি সহকারে ভূরিভোজন ভোলার নয়। তখন ভোরের আকাশে রং লাগত, কাকচিল ডেকে উঠত গাছে গাছে।

নববস্ত্র পরে ভোগ রাঁধতে যেতে হ'ত খালি গায়ে। বিরাট ভোগের ঘর পুকুরের ধার ঘেঁষে, সদ্যে ভোগরান্নার জল পুকুর থেকে ওঠানো যেত। অন্দরের দিকে মণ্ডপের দরজার মুখোমুখি ভোগঘর। মধ্যে বিস্তৃত উঠোনে মাছ কোটা হ'ত। মণ মণ মাছ পড়ত। পাঁচ ছজন বি, অথবা 'কামকরনী' বটি পেতে মাছের সংহারে বসে যেত।

বাইরের লোকের ভোগ রান্নার অধিকার ছিল না। বাড়ীর বৌ বা বিবাহিতা মেয়েরাই রাঁধতে যেত। কুমারী মেয়ের হাত শুদ্ধ নয় বলা হত। পাচকের যোগাড় দেবারও উপায় নেই। বাড়ীর ছেলেরা

বা সমগোত্রীয় আত্মীয় ছেলেরা বড় বড় ঘড়া টেনে জল এনে দিত। ঘরের মধ্যে বিরাট দুটো উনুনে রান্না হত। ছেলেরা ঝাঁকাভরা তরকারী পুকুরের জলে ধুয়ে আনত, পিতলের গামলায় আলোচাল ধুয়ে রাখত। তাছাড়া, বারান্দায় সারি-সারি তোলা উনুনে কাঠিতে গেঁথে ঘি করিয়ে ঝাঁকা ঝাঁকা লুচি, জিলিপি ভাজত তারা। প্রকাণ্ড পরাত, গামলা, কাঁসি দুতিনজনে ধরে মণ্ডপে নিয়ে যেত, দেবীর সম্মুখে ভোগ সাজিয়ে দিত।

তিথি অনুযায়ী পূজোয় বসতেন পুরোহিত।

মণ্ডপে পূজোর কত উপকরণ থরে থরে সজ্জিত হতো। প্রতিমার দুই পাশে পিতলের পিলসুজের ওপরে মাটির প্রদীপ জালিয়ে দেওয়া হতো মোটা সলতের ঘি দিয়ে। গোটা বাড়ী আলোকিত হয়ে যেতো তেলের প্রদীপে। আঙিনার স্থানে স্থানে মশাল জালিয়ে দেওয়া হতো।

ভোগশালায় চলতো সে এক কঠোর তপস্যা। ভোগ রন্ধনকারিণীরা রাতপোহে ভোগ না সরা পর্যন্ত উপবাসী থাকতেন। পরিবারের বয়স্কা মহিলারাই কালীপূজার অধিকার পেতেন। অন্য কেউ হলে তাদের আবার সগোত্রীয় হতে হতো। কেবল সগোত্র লোকেরাই বলি দেখে, ভোগ স্পর্শ করবে।

মণ্ডপ ও ভোগশালা থাকতো মুখোমুখি। ভোগ রান্না হয়ে গেলে উপবীতধারী বাড়ীর বা জ্ঞাতিগুষ্টির ছেলেরা সোবর জলে শুদ্ধকরা পরটুকু বেয়ে ভোগ নিয়ে যেতো মণ্ডপে। সে কি একটু আধটু ভোগ? বহুতরা। নানাপ্রকারের মাছ, তরকারী, ডাল। ঝাঁকা ঝাঁকা মাছ এনে চালা হতো গাছের তলায়। দরজার ওপরে দাসীর হল; আত্মীয়া কুটুম্বিনীদের নিয়ে বসে যেতো বঁটি নিয়ে। সেইসব মাছ রান্না হতো বড় বড় পরাত ভরে। নানারকমের পিঠে, কলার ঘড়া, পায়েস কোনটাই বাদ যেতো না।

ছেলের দল ভোগশালায় রান্নাঘরে মণে মণে ময়দা মেখে লুচি ভেজে দিতো। জিলাপি ভেজে দিতো। ভোগের কলসী কলসী জল এনে দিতো, ঝাঁকা ঝাঁকা কোটা তরকারী ধুয়ে এনে দিতো পুকুরের জল থেকে। ভোগের ডাল ধোয়া হতো ঘামা ভরে পুকুরের জলে। একাজে কারোর বিরক্তি ছিল না; সকলেই আনন্দে উৎসাহে মুখর।

ভোগ রাঁধুনীরা স্নানান্তে লালপেড়ে নূতন শাড়ী পরিধান করতেন, সিঁদুর পরতেন। চণ্ডীমণ্ডপে প্রণাম করে গুরুজনদের পায়ের ধুলো নিয়ে তবে ঢুকতেন ভোগশালায়। মেয়েমহলে সর্বাপেক্ষা গৌরবের বিষয় ছিল কালীপূজার ভোগ রন্ধন। এটা অল্প বয়স্কা বধূ বা মেয়েদের দিয়ে চলতো না। এর শুচিতা ও দায়িত্ব ছিল গুরু।

গভীর রাত হলেও প্রসাদপ্রার্থী হতো বহুলোক। তখন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণসমাজে কেউ বৃথা মাংস ভক্ষণ করতেন না। বলির মাংস 'মহা প্রসাদ' হয়ে যায়, তারই লোভে আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে ব্রাহ্মণেরা আসতেন প্রসাদ খেতে।

ছোট ছেলেমেয়ে ও মেয়েরা সেইরাতে আসতে পারতেন না। তাঁরা আসতেন পরেরদিন প্রভাতে। তাঁদের জন্যে ভোগের প্রসাদ সযত্নে কলারপাতা দিয়ে ঢেকে রাখা হতো।

ভোগের প্রধান উপাদান বলির মাংস প্রস্তুত হতে রাত গভীর হতে গভীরতর হয়ে যেতো। তারপরে ভোগ, ভোগের পরে মায়ের বিসর্জন। রজনীর প্রথম যামে তাঁকে আবাহন করে আনা হতো, রজনীর শেষ যামে তাঁকে বিসর্জন দিয়ে পুরোহিত মায়ের চরণামৃত পান করে জলযোগে বসতেন। সেই সঙ্গে ভোগ রাঁধুনী জলপানে পরিতৃপ্ত হতেন।

এর পরে ব্রাহ্মণ ভোজনপর্ব ও সাধারণের ভোজনপর্ব। দাস-দাসীরা উঠোনে পত্রমণ্ডের নিয়ে আহার সমাধা করতো।

পরিশেষে বাঁধুনীরা ও বাড়ীর মেয়েরা যখন প্রসাদ নিয়ে বসতেন, তখন পূবের আকাশ ফরসা হয়ে যেতো। ঘন গাছের শাখায় লুকিয়ে কাক ডাকতো প্রভাত ঘোষণা করে।

হেমন্তের শিশির ঝরে পড়তো পত্রে পল্লবে টুপ টুপ করে।

নদীর মৃদুকলতানের সঙ্গে কালীভক্ত পাগল তারাদাসের ভজন গান ভেসে আসতো স্নিগ্ধ প্রভাত পবনে—"মা আমায় ঘুরাবি কত, চোখ বাঁধা বলদের মতো।"

আমার সেই হারানো দিনের স্মৃতি জীবনকে সরস করে রেখেছে আজও।

———

সর্বভারতীয় দীপাবলী উৎসব

জ্যোতির্ময়ী দেবী

দীপাবলী বা দেওয়ালি—'দিওয়ালী'।

কয়েকটী উৎসবকে ধর্মীয় এবং জাতীয় দুই বলা যায়। সেগুলি হল সর্বভারতীয়। যা হ'ল পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সব প্রান্তের সব প্রদেশেরই সমান আনন্দময় মহোৎসব। তার প্রধান একটি হল হোলী বা দোল, অন্যটি হল দীপাবলী বা দেওয়ালি। এই দুটি উৎসবই আবালবৃদ্ধবনিতা ও আপামর জনের সার্বজনীন মহোৎসব। বনচর আদিবাসী কোল ভীল মুণ্ডা সাঁওতাল মীনা বলাই রাজস্থানের মরুবাসী সেদিনের বিহার প্রদেশের যে দেশ ছিল বাংলাদেশ সেই মানভূম ধলভূম সিংভূম হাজারিবাগের আদিবাসী প্রত্যন্তবাসী সকলেরই সমান মহোৎসব; এই'টি উৎসবই সর্বভারতীয় বলা যায় তাই। দোল বা হোলীর কথা সবাই জানেন। আজকে বলছি আমরা আমাদের দেওয়ালীর কথা।

সামাজিকভাবে বেশ একটু ভাববার মত দিকও এতে দেখতে পাওয়া যাবে প্রথম হল দিওয়ালিকা সাফাই এবং 'সফেদী'।

অর্থাৎ দেয়ালিতে গৃহের ঝাড়া মোড়া পরিচ্ছন্নতা আর চুনকাম করা। বৎসরান্তে উত্তর পশ্চিমে অতিদীনহীন দরিদ্র গৃহস্থ এমন কি কুটিরবাসী ভিখারী নরনারীও তার বাড়ীর বা ঘরের ঝুল ঝাড়বে, ভাঙা কালো হাড়িকুড়ি বদলাবে, ফেলে দেবে। মরলা কাঁথা নেকড়া সাবান কাচে কাচবে। গুছিয়ে সাজিয়ে ঘরে রাখবে। এবং যদি মজুর দিয়ে করানোর সঙ্গতি না থাকে গায়লা বা বালতী করে চুন গুলে গৃহস্থ মানুষ নিজেই ঘরের দেওয়ালে চুনকাম করবে।

'দিওয়ালী কী সাফাই' যেন পুজার আগে পুজার বাসন মাজা। যেন মন্দির চত্বরগুলি পরিষ্কার করা এমনি এক খুঁতখুঁতে আনুষ্ঠানিক ব্যাপার। ভাঙাচোরা শিতল কাঁসা তামার বাসন বদল করা, বাড়ী ঘরের সংৎসরের জমা জঞ্জাল, সব আনাচ কানাচ সিঁড়ির তলা ভাঁড়ারের কোণ রান্না ঘরের ঝুল ঝেড়ে নিয়ে সর্বত্র 'সাফাই' পরিচ্ছন্ন করা হবে। না করা অলক্ষণ। অলক্ষ্মী পোষণ। লক্ষ্মীহীনতার লক্ষ্মী ছাড়ার দশা।

বিহার উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, পাঞ্জাব, সর্বত্রই গৃহিণীদের এই পরিচ্ছন্নতা দিওয়ালীর সাফাই করানোর আনুষ্ঠানিক ও গৃহশুচিতা রক্ষার জন্য বেশ উদ্বেগ থাকে। মিস্ত্রী মজুর অবাধার, কলি ফেরানোর কারিগর আসা-যাওয়া করছে। পারলে সব ঘরই কলি ফেরানো হবে। না পারলে বাহিরের দেওয়ালগুলিই শুধু সাদা করা হবে। বাড়ীতে এবং বাড়ীর দেওয়ালের গায়ে লালনীল রংএ রাম রাবণের যুদ্ধচিত্র, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, বৃন্দাবনের রাসলীলা, রাধলীলার নানা পুরাণচিত্র আঁকা হবে গৃহস্থের রুচি অনুযায়ী। তাছাড়া আঁকা হয় নানা ধরণে শ্লীল অশ্লীল রসের চিত্রাবলী। কৌতুক রসের চিত্র। হাতি ঘোড়া উটের শোভাযাত্রা। রাজারাণীর চিত্র। ভাকিনী ডাইনীর কাহিনী। রাজপুত্র রাজকন্যা সখি সঙ্গিনী সহ ফুল পাতা গাছ। অর্থাৎ কি নয়? মানে সাধারণ মানুষের সার্বজনীন চিত্রকলায় শিক্ষিত অশিক্ষিত শতুষের লীলাচিত্র।

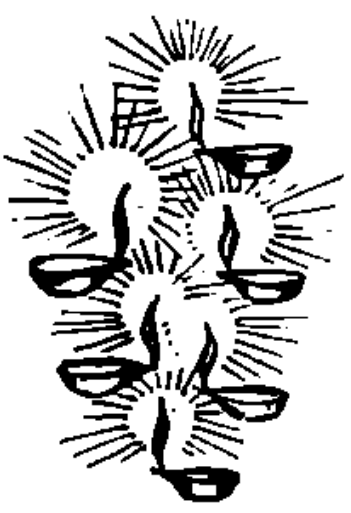

এতো গেল দেওয়ালীর প্রাথমিক পর্ব।

তারপর আসে, দীপাবলীর তেল সলতে মাটীর প্রদীপ যোগাড়ের আয়োজন। মাটীর প্রদীপ কেনা। সলিতা পাকানো। তেলের যোগাড়। কেউবা মাটী ছেনে কয়েকটী মাটীর প্রদীপও গড়িয়ে নেয়। বাংলাদেশের মত ধুতি শাড়ী সবাই সে সব দেশে পরে না কাজেই 'সলতে' হত হয়, মোটা সুক্ষ্ম পাগড়ীর কাপড় বা গায়ের চাদরে নয়তো পুরুষদের ধুতি, মেয়েদের মলমলের ওড়নার চাদরের। তৈল ওদেশে সেকালে সরিষার খুব কম পাওয়া যেত। নেড়ীর তেলও কখনো দেখিনি। তিলের তেলেই সব কাজে ব্যবহার হত। রান্না ভাজাভুজিতে এবং প্রদীপেও। দেবালয়ে পঞ্চপ্রদীপ ও মঙ্গল দীপাধারে মানসিক মাটীর প্রদীপে ঘিয়ের ব্যবস্থা হয়।

এই তেল সলিতা মাটীর প্রদীপ নিয়ে শিশু বালকবালিকা মহলে কর্বের মহোৎসব, অর্থাৎ সলিতা পাকানো, প্রদীপ যোয়া। ওদেশে প্রদীপ বড় আকারের প্রদীপ হত না, ছোটবড় খুরিতেই আমরা প্রদীপ দিয়েছি। তাদার প্রদীপ হলে দু'হাজার সলতে চাই! কম কাজ নয়। জলের বাটী, ছেঁড়া নেকড়া এবং হাঁটু

ছড়িয়ে বসে গলতে পাকানো। সলতে পাকানো প্রদীপে, দীপাবলী সাজানো ঘরে অঙ্গনে, আলিসা বেওয়ালে, পাচিলে যত্রতত্র। সাজানো সন্ধ্যার আগে হলে কাকে তেল খেতে আসবে। কাক তাড়ানোও মহা কাজ।

এখন প্রায় সর্বত্রই মোমবাতির চলন হয়ে তেল গলতে মাটীর প্রদীপের পাট উঠে যাচ্ছে, এমনকি দেবালয়েও।

রাজস্থানে জয়পুরে এবং বিহারের যেখানে যেখানে পাহাড়-পর্বত আছে সেখানে দীপাবলীর শোভা অপূর্ব হত। ঘর ছাড়া পাহাড়ের গায়ে পাথরের খোদাইয়ে বড়বড় লেখা হত "ওয়েলকাম"। তারি ওপর প্রকাণ্ড সরায় দীপ জেলে দিত। প্রায় অর্ধরাত্রি অবধি সে দীপ জলত। দীপালি "স্বাগত" জানানো —'আলোকিত স্বাগত।'

যেখানে নদীতীর সেখানে যেমন উত্তর প্রদেশ, বিহার প্রভৃতি প্রদেশে গঙ্গা যমুনার কূলে কূলে সন্ধ্যের তীরে দীপদান করেন লোকে। দীপ জলে ভাসানও হয় পাতা নৌকা করে। প্রতিটি গৃহে—দীন হীন থেকে লক্ষপতি-সব গৃহেই দীপাবলীর দীপ জ্বালা নিয়ম। ধর্ম সংস্কার আনন্দ উৎসব। অপদেবতার ভীতি নিবারণ এবং ভূতচতুর্দশীর প্রথানুসারে পিতৃলোককৃত্য প্রেতকৃত্যও। সব প্রথা মিলিয়ে দীপ জেলে দেওয়ালি সর্বভারতীয় মহোৎসব। যেখানটি অন্ধকার থাকবে সেখানে অপদেবতার বাসা হবে এই একটা সংস্কার।

এর সঙ্গে আরো আনুষ্ঠানিক প্রথা কৃত্য আছে। তা হচ্ছে একটা ছুটি পিতল কাঁসা কিছু নতুন বাসন কেনা। কিনতেই হবে। তা বড় গামলা, বড় বড় হাড়ী থালা বাটী গেলাসই হোক, আর ছোট একখানা চামচ বা খুন্তি হাতাই হোক। একটা কিছু কিনতেই হবে। এখনো ভাটিয়া গুজরাটি মাড়োয়ারী জৈন বৈশ্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র ধনী দরিদ্র সবাই ওদেশে কিছু না কিছু বাসন কেনেন। ধনীরা রূপার বাসনও কেনেন।

এই উপলক্ষে দোকানে দোকানে কত রকম যে বাসনের আবির্ভাব হয়, দেখবার মত। এবং নতুন নতুন পালিস নতুন ডিজাইনের নমুনার আকার নিয়ে এবং সাজানো নিয়ে দোকানী দোকানীতে প্রতিযোগিতার শেষ থাকে না। দেশবিদেশের বাসনও এসে পড়ে—মাদ্রাজী পাঞ্জাবী বিহারী রাজস্থানী; তবে বাংলা উড়িষ্যা আসামের বিশেষ ধরনের বাসন বড় একটা দেখিনি ওসব দেশে।

এই বাসন কেনার প্রথা আমাদের বাঙালী—প্রবাসী বাঙালীর বাড়ীতেও সংক্রামিত হয়েছিল। দেওয়ালীর রাত্রিতে আলোকিত নগর বা সহরের শোভা দেখার জন্য গাড়ী (বড় গাড়ী তখন) করে বেরুনো হ'ত। একবার পিতামহীর সঙ্গে বেরুনো হয়েছে। কি কেনা হবে? ঠাকুমা ভেবেচিন্তে ছুটি ছোট ছোট ওদেশী পিলসুজ বা দীপাধার কিনলেন। আমরা একগাড়ী বালক বালিকা। বললেন, এই তোমাদের জন্য ঠাকুরের পিলসুজ কিনলাম। আমাদের 'মানে' কেনা! আমাদের কি আনন্দ! সেই পিলসুজ ছুটীর একটি সেদিনও ছিল, বাড়ীতে দেখেছি।

নিয়মটি সুন্দর! নতুন বাসন কেনা—পুরাতন বদল—আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রথায় দাঁড়িয়ে যাওয়ায় প্রতি বছরই কিছু না কিছু পারিবারিক বাসন বদল হ'ত। নতুন করে জমত।

এইতো গেল লৌকিক প্রথা, কেনাকাটা। তারপর ঘরবাড়ী ঝাড়া, চুনকাম করা, পরিষ্কার করা, দীপদান।

এরসঙ্গে আছে গৃহদেবতা লক্ষ্মীমাতা গজলক্ষ্মীরূপিণী কমলার পূজার একটি আয়োজন। এটিও একটি অনুষ্ঠান। ঘরে ঘরে কেনা হয় হাতী। দুপাশে মাটীর দুটি শ্বেত হস্তী। তাদের উঁচুকরা শুঁড়ের মাঝে ধরা দুটি ঘট। মাঝখানে একটি পদ্মের বা সিংহাসনের উপর শ্যামমূর্ত্তি নারায়ণ বা বিষ্ণু।—কোলে পদ্মাসনা পদ্মধরণী কমলা লক্ষ্মী। ইনি হলেন গজলক্ষ্মী দেবী।

দীপাবলীর এই পূজার অনুষ্ঠান রাত্রে। উপকরণ ধানের খই, মুড়ীর খই, ছোলা কড়াই ক'রকমের ভাজা। চিনির মঠ, চিনির রঙীন নানারকমের পুতুল খেলনা। রথ, দেবতা, হাতী, পাখী, গরু, ঘোড়া, জীবজন্তু মন্দির ঘর বাড়ী। যে যত খুশী কেনেন। শিশুদের চোখে একে চিনির মঠ তাতে খেলনা! এবং নানা রং! মহোৎসব বিশেষ, মুখেমুখিয়ে রং হচ্ছে খেতে খেতে। ফলমূল চালকলার নৈবেদ্য ওদেশের প্রথা নেই মনে হয়। (কখনো দেখিনি) পূজায় এর সঙ্গে থাকে থালায় থালায় ওদেশী মিষ্টি মতিচুর লাড্ডু, বেশমের লাড্ডু, অমৃতি, জিলাপী, কলাকন্দ, বরফি, ক্ষীরের গজা অন্যান্য খোয়া ক্ষীরের মিষ্টান্নসমূহের সমাবেশ। ঐ গজলক্ষ্মী প্রতিমার হাতীও নানা আকারের হত। খুব বড়গুলির গায়ে হাওদা বা তোলা শুঁড়ে ছোট্ট ছোট্ট চামর বা পলার মত প্রদীপ করে দিত। সেগুলিও ঘিয়ে পলিতা করে জেলে দেওয়া হত। উঁচু গাছের মত লক্ষ্মী নারায়ণের দুপাশে মৃদুভাবে জলত। এ পূজা প্রায়ই পুরোহিতহীন ঘরোয়া পূজা। ওঁদের পূজার ব্যাপারটা বড় চোখে পড়েনি। উৎসবটাই বাইরের থেকে দেখা হয়েছে। মাটির হাতী গজলক্ষ্মী ছাড়া ঐ মূর্ত্তির ছবিও বিক্রী হত। অনেকে ছবিই পূজা করতেন।

এদিনে লক্ষ্মীর কৌটাতে লোকেরা সোনার মোহর, গিনি, নতুন টাকা, গহনা নিবেদন করে রাখেন। আমাদের কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার মত। ওদেশে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার চলন নেই।

বাঙালী বাড়ীর এ পূজায় অলক্ষ্মী বিদায় হয়। অলক্ষ্মীর পুতুল কুলোয় গোবরের পুতুল গড়ে পূজা করে বাইরের প্রাঙ্গনে রেখে আসা হয়।

ওদেশীদের সে প্রথা নেই।

এই সর্ব্বভারতীয় উৎসব এই দেওয়ালীর দীপাবিতা মহোৎসবের অঙ্গ বিশেষত্বগুলি আরো একটু বলি।

(১) প্রথমটি হল, সম্বৎসরের গৃহ সংস্কার। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা। উত্তর পশ্চিম ভারতীয়েরা অবশ্যই করবেন। এ প্রথাটি বাংলা আসাম উড়িষ্যায় নেই। 'এই দিওয়ালি কি সাফাই' দেওয়ালির আগে অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম।

(২) দ্বিতীয় উৎসবাঙ্গ প্রথা হ'ল, দীপাবলি দান। গৃহপ্রাঙ্গণে দেবালয়ে। বাগানে জলের ধারে আনাচে কানাচে বনে জঙ্গলেও একটি প্রদীপ জেলে দিতে হয়।

(৩) তৃতীয় বিশেষত্ব হল (ওদেশে বছরে তিনবার লক্ষ্মীপূজার প্রথা নেই) লক্ষ্মী পূজা। লক্ষ্মী নারায়ণ পূজা। ধনাধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীসম্পদ ঐশ্বর্য্যদাত্রী কমলার পূজা। কিন্তু আমি ওদেশের বাড়ীর পূজা দেখিনি বিশেষভাবে।

(৪) চতুর্থ প্রথাটি হ'ল খানিকটা আমাদের দুর্গোৎসবের প্রথার মত। নব বস্ত্র পরিধান, কেনা, বিতরণ, স্বজন আত্মীয়কে মিষ্টান্ন পাঠিয়ে তত্ত্ব পাঠানো। পূজার সময়ের মত নতুন কাপড় কেনাও হ'ত।

(৫) পঞ্চম বিশেষ প্রথা হল, দেওয়ালির মিষ্টিমুখ করানো—বাড়ী গিয়ে প্রণাম নমস্কার। ঠিক আমাদের বিজয়া দশমীর ধরণের নয়। ওদেশে দুর্গোৎসব নেই। নবরাত্রির শক্তি ও চণ্ডীপূজা আছে দেবালয়ে মন্দিরে। সেই বিজয়াদশমীর মিষ্টিমুখই সমস্ত দেশজুড়ে একটি চমৎকার প্রথার আকার ধরে আছে।

এদের প্রথা হল ঘরে ঘরে স্বজন বন্ধু আত্মীয় অনাত্মীয় পরিচিতদের ঘরে থালা ভরে মিষ্টি পাঠানো। দেখা করতে যাওয়া বা আশীর্বাদ প্রণাম জানাতে যাওয়ার প্রথা ওদেশে নেই। কিন্তু মিষ্টিটি পাঠানো চাই। জানা, অজানা, কম জানা বাড়ী থেকে ছোট বড় দেবালয় থেকে প্রসাদ হিসাবে এবং বন্ধু স্বজনের বাড়ী থেকে লোকের বাড়ীতে মিষ্টিমুখের জন্য থালাভরা মিষ্টি দশ পনের দিন ধরে আসবেই।

আমাদের ঘরে এত মিষ্টি জমে যেত (তখন তো সব মিষ্টিই সুলভ সস্তা ছিল)—দোকজন চাকর দাসীদেরও মিষ্টিমুখের মহোৎসব হ'ত। লোকের বাড়ীতেও পাঠিয়ে দেওয়া হ'ত! সোনালী রুপালি ওরক ঘোড়া ওরক-ঢাকা কলাকন্দ, ক্ষীরের খাবার লাড্ডু মেঠাই। পান এলাচ লবঙ্গও।

আর একরকম মিষ্টি ছিল 'দুধের ফটী' নাম। খানায় জমানো সুজী চিনি ক্ষীর ঘৃত মেওয়ার 'ভক্তি'র মত। এও দেওয়ালির মিষ্টি বিশেষ। নান খাতাইয়ের মত।

(৬) ষষ্ঠ বিশেষত্ব হ'ল আনুষ্ঠানিক নিয়মে নতুন বাসন কেনা। ব্রাহ্মণ বৈশ্য ক্ষত্রিয় অন্তবর্ণ সকলেরই কিছু না কিছু কিনতেই হবে। মূলধন বিশেষ।

(৭) সপ্তম। ওদেশে তিনদিন দেওয়ালির উৎসব মানা হয়। বাংলাদেশে ভূতচতুর্দশী ও দেওয়ালী দু'দিন। ওদের 'চোদ্দপিদিম' 'চোদ্দশাকের' দিনটি হল ছোট দেওয়ালি। পরদিন আসল দেওয়ালী সেদিনকে বলা হয় বাসি দেওয়ালী। তিনদিনই কিছু প্রদীপ বাড়ীতে জ্বালতেই হবে। দেবালয়ে মঙ্গল দীপ জ্বলবে। নানারঙের বসনে দেবতাকে সাজানো হবে। বাড়ী বাড়ীর মেয়েরাও নানারঙের বসন-ভূষণে সাজবেন। মঙ্গল গান গাইবেন তারস্বরে হাততালি দিয়ে বা ঢোল বাজিয়ে। অবশ্য-আবশ্য ঘোষটা দিয়ে সে সলজ্জ সঙ্গীত হবে।

ওখানে যাদের ঘরে লক্ষ্মীপূজা হয় না তাদেরও দীপদান, বাসন কেনা, মিষ্টান্ন পাঠানো ও কেনা করতেই হয়।

কলিকাতায় ও বড়বাজারের উত্তরপ্রদেশীয় পাঞ্জাবী অধিবাসী অঞ্চলে মিষ্টান্নের দোকান আর বাসনের দোকানের সাজানোর মহাসমারোহের ব্যাপার সকলেই দেখেছেন। চমৎকার দেখতে লাগে আলোয় ঝকঝকে বাসন এবং রঙীন মিষ্টির সমারোহ।

দীপাবলীর কাহিনী

(পৌরাণিক)

সুনীতি গুপ্ত

বেদে ঋষি প্রার্থনা করেছেন—"তমসো মা জ্যোতির্গময়" 'অন্ধকার থেকে আমাকে আলোয় নিয়ে যাও' অর্থাৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন জ্ঞানের অজ্ঞতাকে দূর করে জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত করে হৃদয়কে আলোকিত কর।

হেমন্তের দীপাবলীটীও যেন ঋষি বাক্যের প্রতীক। অমাবস্যার রাত্রিতে ঘুটঘুটে অন্ধকার দূর উদ্দেশ্যে ঘরে ঘরে দীপ প্রজ্বলিত করে বেদের ঋষির এই প্রার্থনাকে রূপ দিয়ে দীপাবলী উৎসব পালন করে যেন আমরা সেই প্রার্থনারই প্রতিধ্বনি করি। এ যেন ঋষি বাক্যেরই বিশেষ প্রকাশ।

দীপাবলী বা দেওয়ালী হিন্দুদের ধর্মীয়, সামাজিক, লৌকিক প্রধান অন্যতম উৎসব। প্রায় প্রত্যেক উৎসবের পেছনে এক একটী পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত আছে, সেইরকম এই উৎসবের উৎপত্তি সম্বন্ধেও কতকগুলি কাহিনী প্রচলিত আছে। কাহিনীগুলি পড়লে মনে হয় ভগবান বিষ্ণুই এই উৎসবের সূচনা করেছেন।

কথিত আছে ভগবান চার বর্ণের জন্য চারটী উৎসবের ব্যবস্থা করেছিলেন। ব্রাহ্মণের জন্য রাখী, ক্ষত্রিয়দের জন্য দশেরা, বৈশ্যদের দীপাবলী ও শূদ্রদের জন্য হোলি।

বর্তমানে ভারতবর্ষে অবশ্য এইসব উৎসব বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই পালন করেন।

দীপাবলী সম্বন্ধে আর একটী কাহিনী প্রচলিত আছে। দ্বাপরযুগে নরকাসুর নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর রাজধানীর নাম ছিল প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর (আসাম)। নরকাসুর ছিলেন প্রবল পরাক্রান্ত অত্যাচারী রাজা। তার ওপর তিনি কঠিন তপস্যা করে শিবকে সন্তুষ্ট করে মহাস্ত্র লাভ করেন। তিনি যথেচ্ছাচার অত্যাচার আরম্ভ করলে দেবতারাও তা থেকে বাদ পড়লেন না। একদিন তিনি যখন দেবমাতা অদিতির কর্ণকুণ্ডল চুরি করলেন, তখন দেবতারা দেবমাতাকে এই অবমাননা করার স্পর্ধা সহ্য করতে পারলেন না—তাঁরা চিন্তা করতে লাগলেন কি করে নরকাসুরের অত্যাচার বন্ধ করা যায়। দেবতারা তখন ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন।

জগতের মঙ্গল সাধনে বিষ্ণু যখন শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তখন তিনি নরকাসুরকে বধ করেন। ভগবানের দর্শন পেয়ে নরকাসুরের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন হোল, শেষ সময় তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন তার মৃত্যু দিনে জগতের মঙ্গলের সূচনায় যেন আনন্দোৎসব করা হয়।

স্বয়ং ভগবানের হাতে পুত্রের মৃত্যু হওয়ায় নরকাসুরের মা বিন্দুমাত্র শোকার্ত হলেন না।

তিনি বললেন, "তাঁর পুত্রের পরম ভাগ্য তাই মৃত্যু সময় সে স্বয়ং ভগবানের দর্শন লাভ করেছে। —তবে পৃথিবী থেকে এক বিরাট অমঙ্গলও অপসারিত হল। সেইজন্য তিনি চাইলেন সেই দিনটি প্রতিটী ঘরে মঙ্গলের প্রতীক হিসেবে একটী বিশেষ আনোৎসবের দিন বলে যেন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়ে অন্ধকার দূর করা হয় ও প্রতিটি লোক যেন নানারকম আনন্দে মেতে ওঠে।"

যেদিন শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুর বধ করেছিলেন সেদিন ছিল হেমন্তের কৃষ্ণাচতুর্দশী। সেইজন্য অনেক জায়গায় বলা হয় সেই দিনকে নরক চতুর্দশী।

বাংলাদেশে দেওয়ালীতে অমাবস্যার রাত্রিতে শ্রীশ্রীকালীমাতার পূজা হয় ও সেই সঙ্গে সেই দিনই লক্ষ্মীপূজাও হয়। সেদিন লক্ষ্মী অলক্ষ্মীর পূজা হয় প্রায় প্রতি ঘরে। আগে অলক্ষ্মী পূজা করে তাকে বিদায় দিয়ে পূজা করা হয়। তারও কাহিনী আছে।

দেওয়ালীর লক্ষ্মীপূজা সকল দেশেই হয়ে থাকে। যাবতীয় মঙ্গলের দেবী লক্ষ্মী, শান্তি, সুখ, ঐশ্বর্য সকলই প্রদান করেন তিনি। সেইহেতু বলা যেতে পারে সেইদিন যা' কিছু মন্দ তাই বিতাড়ন করা হয়, যা কিছু ভাল যা কিছু সুন্দর তাকেই স্বাগত জানানো হয়। সেদিন গৃহের অঙ্গন প্রাঙ্গন পরিষ্কার করে আল্পনায় রেখায় গৃহের শোভা বর্ধন করে প্রদীপ জ্বালিয়ে গৃহকে আলোকজ্জ্বল করে দীপাবলী উৎসবকে আনন্দময় করে তোলা হয়।

বাংলা দেশে দেওয়ালী উৎসব যথেষ্ট আনন্দের মধ্যে পালিত হলেও, অন্যান্য কতকগুলি দেশে এই উৎসবের অনুষ্ঠান আরও বেশী এবং এর সাজসজ্জাও অনেক বেশী। সে সকল দেশেও লক্ষ্মী পূজা হয় ও নতুন খাতা অনুষ্ঠিত হয়। এই দিনে বাংলার বিধবা রমণীর মতো নতুন কাপড় পরে, ঘরভর্তি নানারকমের ফল ও মিষ্টান্ন বিতরন করে লোকেরা উৎসব পালন করেন।

পশ্চিম ভারতে বিক্রম সংবত প্রচলিত আছে খৃষ্টপূর্ব সাতান্ন অব্দে মহারাজা বিক্রমাদিত্য তাঁর সিংহাসন আরোহণের দিন দীপাবলীর পুণ্যতিথিতে এই অব্দের সূচনা করেন, সুতরাং দীপাবলীর দিন বহু অঞ্চলে বিশেষ করে ব্যবসায়ী মহলে নববর্ষ পালন করা হয়।

এই পুণ্য দিনে মহাবীরের নির্বাণ তিথি উপলক্ষে জৈনগণ উৎসব পালন করেন।

দীপাবলী ভারতের সকল সমাজেরই আনন্দের উৎসব!

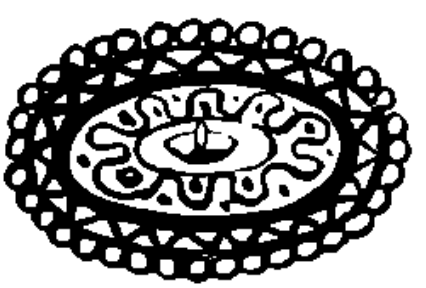

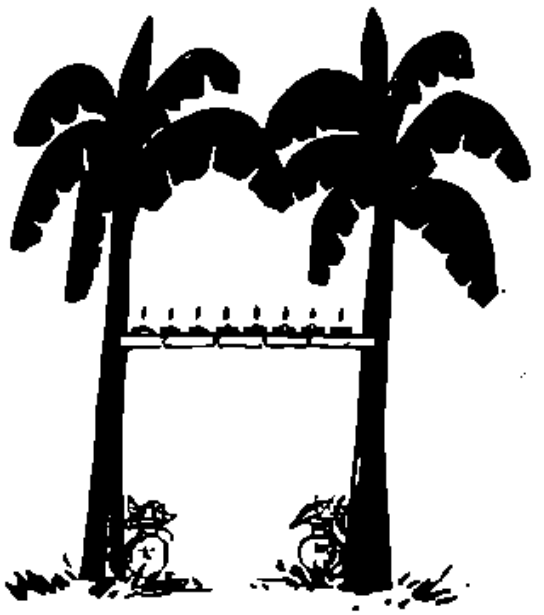

বাংলার উৎসব ! কালীপূজা

ঝোলা দে

আমাদের বাংলাদেশে বারো মাসের তেরো পার্বণ উৎসব আছে বলে আমরা সবাই জানি। তবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় উৎসবগুলির মধ্যে অধিকাংশই দেশের অংশ বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সর্বদেশ প্রচলিত উৎসবের মধ্যেও স্থান ও কালভেদে নানারূপ বৈচিত্র্যের সমাবেশ হয়েছে। যদিও কোন্ উৎসব কোন্ সময় থেকে চলে আসছে তা নির্ণয় করা কঠিন।

যুগে যুগে প্রাচীন উৎসবের সঙ্গে নতুন উৎসব এসে জুটেছে। প্রাচীন উপাদানের সঙ্গে নতুন উপাদান মিলিত হয়ে অনেক উৎসব নতুনরূপ ধারণ করেছে। তাই বাংলার অনেকগুলি উৎসবে বৈদেশিক ও প্রাদেশিক প্রভাব সুপরিস্ফুট। এতে মনে হয় বিদেশের মানুষের সঙ্গে আদান প্রদানের জন্য এই ভাবটি ফুটে উঠেছে।

বাংলাদেশে প্রচলিত পৌরাণিক ও তান্ত্রিক উৎসবকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। বৈষ্ণব শাক্ত ও শৈব। শাক্তগণ শিবের পত্নী বলে পরিচিত দুর্গা কালী প্রভৃতি দেবতাকে বিভিন্ন নামে বিভিন্নরূপে তন্ত্রোক্ত নিয়ম অনুসারে পূজা করে থাকেন। শাক্ত উৎসব সম্পর্কে আমরা এই সমস্ত দেবতার বিশেষ পূজার আয়োজন করে থাকি। বাংলা শাক্তপ্রধান দেশ তাই মনে হয় উৎসবের তুলনায় শাক্ত উৎসবের সংখ্যাই এখানে বেশি। বাংলাদেশে গ্রীষ্ম, হেমন্ত ও শীত ঋতুতে তিনটি নির্দিষ্ট দিনে কালীর বিশেষ পূজার প্রচলন বর্তমানে বাংলাদেশে দেখতে পাওয়া যায়। গ্রীষ্ম জ্যৈষ্ঠমাসের অমাবস্যায় ফলহারিণী কালীপূজা, হেমন্তে কার্তিকমাসের অমাবস্যায় দীপান্বিতা কালীপূজা, এবং শীতে মাঘের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে রটন্তী কালীপূজা।

তবে দীপান্বিতা কালীপূজাই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়। কিন্তু এই পূজার খুব প্রাচীন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিভিন্ন জনের শিল্পসাধনায় রচিত হয় দেবতার প্রতিমা, প্রসাদ নিতে মিলিত হয় পাড়াপ্রতিবেশী সবাই। অবশ্য কালের পরিবর্তনে বাংলাদেশে সকল উৎসবেরই রূপান্তর ঘটেছে। তবুও বাঙালীর নৈসর্গ প্রকৃতি তার সকল অনুষ্ঠানেই একটি মধুময় পরিবেশ সৃষ্টি করে থাকে। এ মাধুর্য অবশ্য বাঙালীর একার সম্পদ নয় এ ভারতভূমির সনাতন মধুর স্রোত।

মানুষের একদিকে জীবন অন্যদিকে মৃত্যু, একদিকে সৃষ্টি অন্যদিকে সংহারের লীলা চলেছে। সর্বভূতে যে শক্তিরূপা চেতনা রয়েছে তার উপলব্ধির সাধনাই মহাকালীর পূজা। এই আদ্যাশক্তিকে আমরা খণ্ডিত ভাবে অনুভব করি বিস্তাররূপে, বিস্তাররূপে, শক্তিরূপে এবং বিচিত্ররূপে বিচিত্র প্রকাশে। অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে চলে অনন্তরূপিণী শক্তির উদ্বোধন। সহস্র দীপাবলীর আলোয় আমরা যেন অন্ধকারকে অপসারিত করে দিয়ে তামাবাবের আরাধনা করতে পারি।

দীপান্বিতা দীপমালা

বাণী ঠাকুরতা

দুর্গাপূজাকে বাঙালী হিন্দুদের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মীয় উৎসব হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে এবং অন্যান্য যে কোনও পূজাপার্বণের চেয়ে এর স্থায়িত্বও অনেক বেশী! তিনদিন তো বটেই, বলতে গেলে চারদিন পর্যন্তই মাতৃদুর্গার অবস্থিতি। সেই উৎসবের রেশ মিটতে না মিটতেই আসে কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমা ঘরে ঘরে, বিশেষতঃ অধুনালুপ্ত পূর্ববঙ্গের প্রায় প্রতিটি গৃহস্থের বাড়ীতেই সাধ্যানুসারে সেদিন লক্ষ্মীদেবীর আবাহন ও অর্চনা হয়ে থাকে। তারপরেই আসে দীপান্বিতা বা দেওয়ালী উৎসব, বাংলাদেশে প্রধানতঃ কালীপূজার মাধ্যমেই দীপান্বিতা পালন করা হয় সাড়ম্বরে। কিন্তু দীপাবলী বা দেওয়ালী দুর্গাপূজার মত শুধু বাঙালী সমাজেই গণ্ডীবদ্ধ নয়; এটি একটি সর্বভারতীয় উৎসব। আশ্বিনী অমাবস্যার গভীর রাত্রিতে মাকালীর পূজা করাই বাঙালী হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান। সেই উপলক্ষ্যে সন্ধ্যা থেকেই ঘরে ঘরে প্রদীপের মালা জ্বালিয়ে দীপান্বিতা পালন করা হয়। অমাবস্যার আগের দিন ক্ষুদ্রচতুর্দশীর রাত্রি থেকেই তার সূচনা। চৌদ্দশাক খাওয়া, চৌদ্দটি প্রদীপ জ্বালানো ইত্যাদি ক্ষুদ্রচতুর্দশীর প্রচলিত আচার অনুষ্ঠান। যত আড়ম্বর ও আয়োজন দিয়ে মাতৃদুর্গাকে অর্চনা করা হোক না কেন মাকালী হিন্দু বাঙালীদের মাতৃদেবতাদের মধ্যে সর্বপ্রধান। ইনি একাধারে মঙ্গলময়ী ও প্রচণ্ডা। একদিকে ইনি যেমন বিনাশে উদ্যতা অপরদিকে ইনিই শরণাগত ভক্তদের আশ্রয়স্থল। নানা নামে নানারূপে মাকালী বাঙালীদের সবচেয়ে মহামূতা দেবী; তার প্রমাণ বাংলাদেশের অসংখ্য কালীমন্দির। এমনকি বাংলার বাইরেও যেখানে বাঙালী বেশী সেখানেই কালীমন্দির গড়ে উঠেছে। অতি প্রাচীনকাল থেকে এই বিশেষ তিথিটিকে স্মরণীয় ও অবশ্য পালনীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উজ্জ্বল করে রাখবার জন্যই দীপদান বা দীপালি বা দেওয়ালী উৎসবের অবতারণা।

কথিত আছে, শ্রীরামচন্দ্র চৌদ্দবৎসর বনবাসের পর যখন রাবণকে বধ করে অযোধ্যায় ফিরে আসেন, তারপরই এই তিথিতে তাঁর রাজ্যাভিষেক হয়। সেই উপলক্ষ্যে দিনে প্রজাদের নানাবিধ আনন্দানুষ্ঠান ও রাত্রিতে তাদের আনন্দোচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তি হিসেবে রাজ্যের প্রতিটি গৃহ আলোক মালায় সাজানো হয়েছিল। সেই থেকেই ভারতবর্ষে দেওয়ালী উৎসবের সূচনা। এই দীপ জ্বালানোর উৎসব সেই অতীত ঐতিহ্যের স্মৃতিপূজা। আবার দাক্ষিণাত্যে আর একটি বিশ্বাস প্রবল। সেখানে দীপান্বিতার আগের দিনকে নরক-চতুর্দশী বলা হয় কারণ সেদিন নাকি ভগবান্ বিষ্ণু নরকাসুরকে বধ করে রাজধানীতে ফিরে এসেছিলেন। সেই বিজয়ী শ্রীবিষ্ণুর সম্বর্ধনার জন্যই ঘরে ঘরে আলোর সজ্জা ও বাজি পোড়ানোর আয়োজন করা হয়েছিল এই তিথিতে। আবার ভারতীয় শাস্ত্রকারেরা এই দিনটিতে দীপদানের আরও একটি কারণ নির্দেশ করে গিয়েছেন। সে কারণটি কোনও বিজয়ীবীরের জয়ের উৎসব নয়, ভারতীয় হিন্দুদের

ধারণাহুযায়ী তাঁদের যে সব পিতৃপুরুষ কর্মফলের জন্ত যমলোকে থাকতে বাধ্য হয়েছেন এই অমাবস্যার দীপ জ্বালানো ও বাজি পোড়ানো সেই আলোতে তাঁরা বিষ্ণুলোকে প্রয়াণের পথ দেখতে পান ও ফলে তাঁদের বিষ্ণুলোকে যাত্রা সুগম হয়। কাজেই দেখা যায় যে এর মধ্যে যে কোনও কারণেই হোক্ না কেন, দেওয়ালী উৎসব ভারতের সব প্রদেশেই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সব শেষে নিতান্তই বস্তুতান্ত্রিক একটি কারণকেও আমরা উপেক্ষা করতে পারিনা। ভারতবর্ষে, আশ্বিনকার্ত্তিক মাসে এক রকমের ছোট ছোট পোকার প্রাদুর্ভাব এত বেশী হয় যে সন্ধ্যার পর এদের উপদ্রবে কোনও রকম কাজকর্ম করা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। কিন্তু এই পোকার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হোলো যে কোনও ধরণের আগুন দেখলেই এরা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সেই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দীপান্বিতার রাত্রিতে অজস্র প্রদীপ ও বাজির আগুনে এই অসংখ্য পোকার আত্মাহুতির ফলে এই উপদ্রবের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। হয়তো প্রধানতঃ এই কারণটির জন্ত আমাদের জ্ঞানী শাস্ত্রকারেরা দীপান্বিতা উৎসবকে ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত করেছেন।

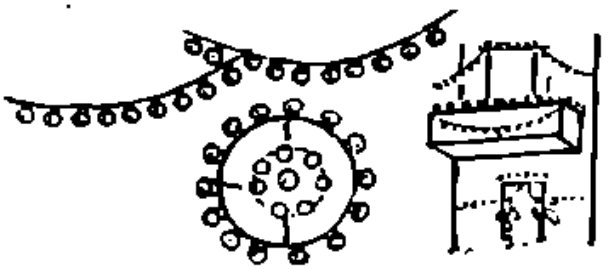

উত্তর ও পশ্চিমভারতের এবং নেপালের দেওয়ালী উৎসব প্রধানতঃ লক্ষ্মীপূজা। বাংলাদেশে লক্ষ্মী পূজা করেন মেয়েরা বা গৃহিনীরা কিন্তু উত্তর ভারতে গৃহকর্তা ও কর্ত্রী উভয়েই শুচিস্নাত হয়ে একইসঙ্গে পূজায় বসেন। শুধু লক্ষ্মীর মূর্তিই নয়, কুবের গণেশ, শিব, পার্বতী, রাম সীতা ইত্যাদি বহু দেবদেবীর মূর্তি সম্মুখে স্থাপন করে সকলের আরাধনা করেন। দেবতাদের সামনে ভোগ নৈবেদ্য ছাড়াও খাতাপত্র, দোয়াত কলম, কিছু ধনরত্ন খাতপত্র ইত্যাদি নিবেদন করা হয়। লক্ষ্মীর প্রতীকরূপে একটি ঘিয়ের প্রদীপ সন্ধ্যে থেকেই জ্বালিয়ে রাখা হয় ও পূজার উপাচার দিয়ে ঐ প্রদীপটিকেও অর্চনা করা হয়। তাঁদের বিশ্বাস এই যে দেওয়ালীর রাত্রিতে সূর্যাস্তের পর থেকে সুরু করে পরদিন সূর্যোদয় পর্যন্ত যাঁদের বাড়ীতে প্রদীপ অনির্বাণ থাকে, মা লক্ষ্মী সেই গৃহে অচলা থাকেন। ব্যবসায়ীরা অনেকেই বিশেষ করে মাড়োয়ারী, গুজরাটিরা দেওয়ালীর পরদিন থেকে তাঁদের নূতন বৎসর ধরেন এবং হালখাতা উৎসব পালন করেন। অবাঙালীদের মধ্যে বিশেষ করে হিন্দুস্থানীদের দেওয়ালীউৎসবের আর একটি অঙ্গ হোলো জুয়াখেলা। প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, লক্ষ্মীদেবী এই অমাবস্যার রাত্রিতে ঘরে ঘরে এসে উঁকি দিয়ে দেখে যান কেউ ঘুমিয়ে আছে কিনা। অতএব সারারাত্রি জেগে থাকবার জন্ত উদ্দীপনার জুয়াখেলা এই রাত্রির একটি ধর্মানুমোদিত অনুষ্ঠান। দুর্গাপূজার সময়ে যেমন ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে বাঙালীর ঘরে ঘরে নূতন জামাকাপড় পরা ও নিরিষুখ করানোর রেওয়াজ তেমনই দেওয়ালী উৎসবেও অবাঙালীরা এই সব রীতি পালন করেন। দক্ষিণ ভারতের দেওয়ালী আরম্ভ হয় ত্রয়োদশী থেকে এবং অমাবস্যা পর্যন্ত তিনদিন নানা পূজার্চনা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দেওয়ালী উৎসব পালিত হয়।

মূলকথা হোলো এই যে দেওয়ালী একটি সর্বভারতীয় সর্বজনীন উৎসব। বিভিন্ন প্রদেশের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে যতই প্রভেদ থাক না কেন, এই উৎসবের মূল অঙ্গ দীপদান ও বাজি পোড়ানো সব প্রদেশেই অতি আদৃত, অবশ্য পালনীয় রীতি। মন্দিরে, বাড়ীতে, নদীতীরে, পথের ধারে, গাছের তলায় সর্বত্র প্রদীপ জ্বালিয়ে বাইরের অন্ধকার তথা মনের অন্ধকার দূর করাতেই এর সার্থকতা।

লক্ষ্মীব্রতের আলপনা

কল্যাণী দেবী

পল্লীবাংলার একখানি মাটীর ঘর। গোবর দিয়ে নিকানো পরিষ্কার মেঝে। সেই মেঝেতে লক্ষ্মী পূজা হবে। বাড়ীর বৌ মেয়েরা নিজেরাও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে আলপনা দিতে বসলেন। কি অপূর্ব সে আলপনা! 'গোলা' প্রস্তুত হল, তাতে চালুনবাটা, শিমপাতার রস, আর আলতার সাহায্যে একখণ্ড তুলো দিয়ে আলপনা দেওয়া হল। লক্ষ্মীপূজার আলপনায় বিচিত্র পদ্ম, লতাপাতা লক্ষ্মীর পদচিহ্ন, লক্ষ্মীপেঁচা এবং ধানছড়া এই হল আলপনার প্রধান অঙ্গ। এছাড়া আলপনায় নানারকম অলঙ্কার এবং চৌকিতে লক্ষ্মীর সম্পূর্ণ মূর্তি না এঁকে কেবল মুকুট আর দু'খানি পা কিম্বা পদ্মের উপরে পা এমনি নানা রকম চিত্র আঁকা হয়। যে চৌকিতে লক্ষ্মী পাতা হয় সেই চৌকির খুঁটির গায়ে লক্ষ্মী নারায়ণ আর লক্ষ্মীপেঁচা বা পদ্ম, ধানছড়া, কলমীলতা, ঝোপাটিলতা, লক্ষ্মীর পদচিহ্ন আঁকা হয়।

কোনো কোনো জায়গায় লক্ষ্মীর সরাও ব্যবহার হয়। পূর্ববঙ্গে এর প্রচলন বেশী দেখা যায়। সরার পিঠে লাল নীল সবুজ হলদে কালো এই কয়টি রং দিয়ে লক্ষ্মীনারায়ণ লক্ষ্মী পেঁচা ইত্যাদির আলপনা থাকে। লক্ষ্মীর কাপড়ে সবুজ রং, গায়ে হলুদ রং, অধর ও পায়ের এবং করতলের জন্য লাল রং—নীলবর্ণ পটভূমিকায় কারুকার্যে দেওয়া হয়। লক্ষ্মীসরার উপরের দিকে আধখানা নারকেলের মালাই। মেয়েরা এই মালাইকে কুবেরের মাথা বা খুলি বলে।

হগলীর অঞ্চলে সরার পশ্চাতে একটি শীষ সমেত আস্ত ডাব সেটিকে ঘোমটা দিয়ে, গয়না ইত্যাদি দিয়ে অনেকটা একটি ছোটমেয়ের মতো সাজানো হয়। এছাড়া কলার খালুই দিয়ে ধানের গোলার মতো কতকগুলো ডোলা সাজিয়ে তাতে নানারকম শস্য ভরে আর একটী কাঠের খেলার নৌকায় প্রত্যেক পলুয়ে ধান তিল, মুগ, মুসুরী, মটর ইত্যাদি দিয়ে লক্ষ্মীর চৌকির সামনে রাখা হয়। পূজা শেষ হওয়া পর্যন্ত ব্রতিনীরা উপবাস থাকেন। দেশভেদে কোনো কোনো গ্রামে লক্ষ্মী, নারায়ণ ও কুবের এই তিনটিকে তিন রংয়ের পিটুলীর পুতুলের আকারে গড়ে নেওয়া হয়।

আলপনা গৃহসজ্জনের একটি প্রধান উপকরণ। তবে বাংলা দেশে বিভিন্ন পূজাপার্বণ উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে মেয়েরা মাঙ্গলিক হিসাবেই পূজার বেদী, গৃহাঙ্গন, গৃহের প্রবেশ পথ প্রভৃতি আলপনা দিয়ে চিত্রিত করে থাকেন। অনেকে শুকনো আলপনা দিয়ে মেঝে প্রভৃতি অঙ্কিত করেন যেমন শুকনো চালের গুঁড়ো ছড়িয়ে লতাপাতা আঁকা হয়। তবে আমাদের দেশে পূজাপার্বণে পিটুলির আলপনাই প্রশস্ত। দেখতে গেলে, আলপনা কিছুটা গতানুগতিকভাবে লোকপরম্পরায় চলে আসছে। এবং বিভিন্ন পূজাপার্বণে, মেয়েদের ব্রতানুষ্ঠান থেকেই এই আলপনার সৃষ্টি।

সবচেয়ে গর্বের কথা আগেকারদিনের মেয়েরা যাঁরা এইভাবে আলপনা দিতেন তাঁরা কারুর কাছে আজকের দিনের মতো শিল্পশিক্ষা করেন নি। তাই মনে হয় অন্ততঃ একশ বছর আগেকার বাংলার কুটীর প্রাঙ্গণে যদি আমাদের মনের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি তা হলে সেখানে দেখবো সুন্দর সবলা, পূর্ণযুবা মা বোনেরা ছোট ছোট শান্তির নীড়গুলিকে কেমন লক্ষ্মীশ্রীতে ভরিয়ে তুলেছেন। গৃহই ছিল তাঁদের স্বর্গ, তাই সেই গৃহকে তাঁরা সাজিয়ে রাখতেন নানারকম শিল্পের মাধ্যমে। আমরা লক্ষ্মীর ব্রতকথায় পড়েছিলাম পল্লীগ্রামের বধূটী তার মাটীর ঘরখানিকে গুছিয়ে পরিষ্কার করে আলপনা চিহ্নিত করে সারারাত ব্যাপী জেগে লক্ষ্মীর আরাধনা করেছিলেন। তাঁর ঘরে লক্ষ্মীর আবির্ভাব হয়েছিল নিশ্চয়ই কারণ পরিচ্ছন্নতার অপর নাম শ্রী—তাই শ্রী ও সৌন্দর্য্যই লক্ষ্মী—আমরা যেন যুগে যুগে সেই লক্ষ্মীদেবীর আরাধনা করতে পারি।

দেওয়ালী উৎসবের খাবার

শকুন্তলা

দেওয়ালী উৎসবটী যেমন সর্বজনবিদিত তেমনি আমার এই দিনটীতে আত্মীয় পরিজন সকলকে নানারকমের খাবার খাওয়ানোর রীতিও প্রচলিত আছে। তবে বাংলাদেশ ছাড়াও উত্তর ভারতে এই দীপান্বিতা উৎসবে রং বেরংয়ের খাবার প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। তাছাড়া মঠ, বাতাসা, চিঁড়ে মুড়কি ইত্যাদি ঐসব দেশে বেশী ব্যবহৃত হয়।

বাংলাদেশে শ্যামাপূজার দিন বিয়ের নানারকম খাবার মেঠাই হরষেশ, জিলিপী, ক্ষুরিভাজা, গজা, কচুরী, সিঙ্গারা এইগুলিই সকলে ঘরে তৈরী করেন অথবা বাজার থেকে কিনে আনেন।

আগেকার দিনে ঠাকুমা দিদিমারা অফুরন্ত সময় পেতেন এবং অফুরন্ত জিনিসপত্তর পেতেন তাই দিয়েই তাঁরা সকল উৎসবে বসে যেতেন ঠাকুরের ভোগ তৈরী করতে। আজকের দিনে সে গোলাভরা ধানও নেই আর গোয়াল ভরা গরুও নেই কাজেই সব উৎসবই এখন সংক্ষেপ করতে হয়েছে। অর্থনৈতিক সমস্যার চাপে মানুষ আজ ভুলে গেছে আত্ম-পরিজনকে মিষ্টিমুখ করাতে। অবশ্য গ্রামবাংলার আজো যা সামান্য কিছু আছে তাঁরা তাই দিয়ে পাড়াপ্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজনকে মিষ্টিমুখ করিয়ে থাকেন। অন্ততঃ তিলের বা নারকেলের নাড়ু খইচুর, মোয়া এই দিয়েই তাঁরা তৃপ্তি পান।

কালীপূজার রাত্রে কোনো কোন জায়গায় এখনো পাঁঠাবলি হয়ে থাকে। এই বলির মাংস রান্না হলে সবাই খান এবং মায়ের প্রসাদ বলে সকলকে বিলি করা হয়। আজকাল অবশ্য পাঁঠা বলি প্রায় উঠে গেছে যদিও কালীপূজায় পাঁঠা বলি একটী প্রথা হিসেবেই চলে আসছে।

দেওয়ালীর আগে থেকে কলকাতায় খাবারের দোকানগুলি লক্ষ্য করলেই দেখবেন কত বাহারী করে খাবার সাজানো হয়ে থাকে। তাছাড়া রংবেরংয়ের কাগজের ফুল পেকল লতাপাতা তৈরী করে এসব দোকানের কতই না বাহার দেখানো হয়। অবশ্য এখন নানাকারণে ঠিক আগের মতো আর উল্লেখযোগ্য কোনো পূজাতেই সে রকম আন্তরিকতা নেই, তাই দেওয়ালীর খাবার বলে ও আগের মতো রকমারি খাবার বিশেষ কেউ করতে রাজি নয়। তবুও পূজাপার্বণের দিনগুলোতে আমরা চেষ্টা করবো আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবকে নতুন নতুন খাবার খাইয়ে তৃপ্তিদান করতে।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বা ভাইফোঁটা

বেলা দে

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছেন—

'ভায়ের মায়ের এমন স্নেহ
কোথায় গেলে পাবে কেহ
ওমা তোমার চরণ দুটী
বক্ষে আমার ধরি
এই দেশেতে জন্ম আমার
যেন এই দেশেতেই মরি।'

সত্যি বাংলা দেশ ছাড়া এত আন্তরিকতা আর কোনো দেশে নেই। ভাইফোঁটার দিনটী এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এটি একটি ভাইবোনদের প্রীতি মিলনের উৎসব। কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়াকে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বা যমদ্বিতীয়া বলে। গার্হস্থ্য জীবনে এ এক পবিত্র উৎসব।—

এই দিনটিতে যমের বোন যমুনা চিত্রগুপ্ত ও ভ্রাতা যমকে নিজের বাড়ীতে পূজা করে তাদের নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছিলেন বলে শাস্ত্রে এই দ্বিতীয়াকে যমদ্বিতীয়া বলে। এইদিনে ভাইদের বোনেরা খাইয়ে থাকেন তাই দিনটি বিশেষ মঙ্গলজনক। সেই কোন প্রত্যুষে গ্রামের পথে পথে মেয়েরা গাছের পাতায় পড়া সদ্যপাত শিশিরবিন্দু তুলে আনেন তাই দিয়ে চুয়া চন্দন মিশিয়ে ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দেওয়া হবে।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে লেখা আছে যে নারী ঐ তিথিতে তাম্বুলাদি দ্বারা ভাইয়ের পূজা করেন। এই পূজার ফলে তাঁকে কখনো বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় না। এবং উক্ত বিধিপালনে ভাইয়ের কখনো অমঙ্গল হয় না। যমদ্বিতীয়ার দিন শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে স্নান সেরে শালগ্রাম ইত্যাদি পূজা করার পর চিত্রগুপ্ত বা যমকে পূজা করে যমুনাকেও অর্চনা ও নমস্কার করার নির্দেশ পাওয়া যায়।

এমনি করে যমরাজ ও তার ভগ্নী যমুনাকে স্মরণ করে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন ভাইয়ের আয়ুবৃদ্ধির শুভকামনায় ভাইকে বোনেরা নতুন কাপড় উপহার দেয় এবং নিমন্ত্রণ করে খাওয়ায়। কপালে শ্বেত ও চুয়াচন্দনের মঙ্গলটীকা পরিয়ে দেয়।

বাংলাদেশে দেশাচার ভেদে ভাইকে ফোঁটা দেবার সময় যমকে উদ্দেশ করে নানাপ্রকার ছড়া বলা হয়—

'প্রতিপদে দিলাম ফোঁটা
দ্বিতীয়াতে নিতে,
যমের দোরে যেও নারে ভাই
নিমের অধিক তিতে।
ঢাক বাজে, ঢোল বাজে
আরো বাজে কাড়া
প্রতিপদে দিলাম ফোঁটা
না যেওরে ভাই যমপাড়া।'

যতগুলি নক্ষত্র ততগুলি ভাই

রাসি ভট্টাচার্য

আশ্বিন শেষে কার্তিকের সোনালি রোদে পল্লীবাংলার ঘরে ঘরে উৎসবের আয়োজন। আর এ উৎসব ঘরোয়া-উৎসব, পারিবারিক উৎসব।

শারদীয় আগমনী থেকে বিজয়া পর্যন্ত ছিল কন্যা অভ্যর্থনার সুর। বাংলাদেশের আকাশে বাতাসে তখন উমাময় গানের সুরঝঙ্কার। তারপর লক্ষ্মীর আসন পাতা হয় ধানের ছড়ায়—চালের আর রংয়ের আলপনায়! কোজাগরী পূর্ণিমার জোৎস্নায় বন্যার ঘরে ঘরে উৎসবের যে প্লাবন তা কৃষিজীবি বাংলার সমৃদ্ধি কামনার সুর।

লক্ষ্মী পূর্ণিমার পর দীপান্বিতা উৎসব।

অমাবস্যার কালো অন্ধকারকে দূরীভূত করতে ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়ে আলোর ভুবনকে আহ্বান করা হয়। মহাশক্তির আরাধনায় মৃত্যু থেকে জীবনকে সংহার থেকে সৃষ্টিকে, অজ্ঞানতা থেকে জ্ঞান উপলব্ধিকে, অন্ধকার থেকে আলোককে সংসারে এবং সমাজে পরিব্যাপ্ত করার প্রার্থনা জানানো হয়। তারপর বাংলার ঘরে ঘরে যে পারিবারিক উৎসব সে উৎসব ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

'গঙ্গা যমুনা জোড় হই, দাও ভাইয়ের কোল হই!'

বাংলার মেয়েদের এই ব্রত কামনার মধ্যদিয়ে অনুভব করা যায় ভাই-বোনের সম্পর্কের মাধুর্যকে।

দরিদ্রতম পল্লী-কুটীর থেকেও আদরের ভাইকে আপ্যায়িত করতে বোনের কত না প্রয়াস! এ সম্পর্কে কত গান, কত কথা, কত ছড়া।

বারিপান সংগ্রহ করে পানের বাটা সাজানো হচ্ছে—ভাই আসবে বোনের ঘরে।

'আশ্বিন যায় কার্ত্তিক আইতে গো
ভাই-ধনেরে দুতীয়া দিব রঙ্গে।
পারারি ভাকাইয়া বইনে বন্দী ওয়া পাড়িল গো,
ভাই-ধনেরে দুতীয়া দিব রঙ্গে।
বাকইয়া ভাকাইয়া বইনে বারিপান কিনিল গো।
ভাই-ধনেরে দুতীয়া দিব রঙ্গে।'

পূর্ববাংলার অখ্যাত গ্রাম, যেখানে বিলাসের কোন দ্রব্য সামগ্রী নেই—সেখানে বোনের বাড়ি যে ভাই আসে তাকে আপ্যায়িত করবার জন্যে বোনের কী আন্তরিক অনুরাগ! গরিবের ঘরে বিলাস বহুল আহার্যের আয়োজন নেই, কিন্তু তবু তো কিছু চাই,—সেই চাহিদায় বোনের বাড়ির লোক শহরে ছোটে—

'আশ্বিন যায়, কার্ত্তিক আইয়ে গো,
দ্বিতীয়ার চান্দে দিল দেখা।
ভাই দ্বিতীয়ারে দিলাম কৌটা।
ওরে ওরে, ফকরাল তুই সহরে যাইতে,
ভাই-কৌটার কথা শুনতাম, মেথী আইন্যা দিতে।'

বোনের কাছে ভাইয়ের কদর কত! ভাইয়ের গৌরবে বোন গৌরবান্বিতা। ভাইয়ের গৌরব বাড়াবার জন্যে কার্ত্তিকের ব্রতে বোন সুপারি গাছ এবং কাঁকুনী গাছে ফুল দিয়ে কামনা করে—

(সুপারি) গুয়োগাছ কাঁকুনীগাছ, মুঠে ধরি যাত্রা।
আমার ভাই হয়েছে রাজা।'

এই রাজা-ভাইয়ের সম্বর্ধনায় আম কাঁঠালের পি ড়িতে ফুল ছুঁইয়ে ব্রতীরা বলে,—

'আম কাঁঠালের পিঁড়িখানি তেল-কুচ্‌কুচ্‌ করে।
আমার ভাই যে, সেই বসতে পারে।'

বাংলাদেশের বোনের কাছে এই হচ্ছে ভাইয়ের কদর। চাঁদের কোণা ভাই কখনো দানে যায়, কখনো দরবারে যায়—তখন তার ওষ্ঠদুটি গুয়ো কুচ্‌কুচ্‌ পানে রঞ্জিত, দর্পণে মুখ দেখলে সে ভাইয়ের মুখের শোভা রাজার মুখের শোভার মতন। গ্রামের মধ্যে সে-ভাই যখন আসে বোন তখন সগর্বে বলে,

'নয়, নয়, নয়!
আমার ভাই গাঁয়ের নয়।'

বাংলার মেয়েলি ছড়ায়, গানে ব্রতে কথায় উপকথায় এই ভ্রাতৃগৌরব নক্ষত্রের দীপ্তিতে উজ্জ্বল। 'যতগুলি নক্ষত্র, ততগুলি ভাই'—এ শুধু বাংলাদেশের বোনেরাই সগর্বে বলতে পারে।

ভাইফোঁটা

শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায়

আজকের সমাজজীবন গ্লানিময়, হতাশায় ও ব্যর্থতায় জর্জরিত। তবু আমরা বাঙালী। চিরাচরিত পূজা পার্বণের সঙ্গে চিরদিনই অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বর্তমান সমাজে নানারকম পরিস্থিতির জন্য অনুষ্ঠানাদি হয়তো অনেক কমে গেছে। বিগত বৎসরের মত এ বৎসরেও দুর্গাপূজা ও কালীপূজা ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে চারিদিকে শেষ হয়েছে। বেওয়ালীর দীপে যেমন উল্লসপুরী হাসে তেমনি ঐ দিন আতসবাজীর কোলাহলে চতুর্দিক যেমন ভয়াল রূপ ধারণ করে তারি মধ্যে শক্তিরূপিণী মাকালীর আবির্ভাব হয়। দীপালী উৎসবের বিরামের শেষ রজনীর প্রথম রবিতে নিয়ে আসে মেয়েলী ব্রত ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। এই উৎসব প্রীতির সম্পর্কের অনুষ্ঠান। তাই ও ভগ্নির মনে একটি মিলনের ইচ্ছা সেদিন খুব নিবিড় হয়ে উঠে। ঐ দিন দূর-দূরান্ত থেকে ভাই বোন দেখা সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে। কালীপূজার পর প্রতিপদ, তারপর দ্বিতীয়ায় হয় ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার অনুষ্ঠান। গ্রাম্যজীবনে ও নগরজীবনে এই উৎসবের একটু পার্থক্য আছে। গ্রামে যেসব বোনেরা থাকেন রাত্রি প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ছোটেন শিশির সংগ্রহের জন্য। ঐ দিন বোনেরা সকাল থেকে উপবাস করেন। কিন্তু নগরে সর্বত্র শিশির জোগাড় করা সম্ভবপর হয় না। একমাত্র যাঁদের বাগান আছে তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর হয়। কিন্তু শুধু স্বচ্ছ শিশির ও চন্দনে ভাই-এর কপালে বোন তিলক দেন। চন্দনে ঘৃত মধু ও চুঁয়া দেওয়া নিয়ম। চোখে অনেক সময় বোন ছোটদের কাজলের রেখা টেনে দেয়।

কথিত আছে যমের বোন নাকি চিত্রগুপ্ত ও ভাইকে ফোঁটা দিয়েছিলেন এবং নানারকম খাবার খাইয়েছিলেন। তিলক দেবার আগে চিত্রগুপ্ত, গণেশের পূজা করা নিয়ম। ভাইকে তিলক দেবার সময় নতুন কাপড় পরিয়ে, আসন পেতে বসিয়ে নানারকম খাওয়ানোর রীতি নীতি আছে।

একদিন ছিল যখন এই খাওয়ানোর ব্যাপারটা ছিল বেশ ভারি রকমের। যাঁদের অবস্থা ভাল তাঁদের তো কথাই নেই। এমন কি যাঁরা গরীব তাঁরাও চেষ্টা করতেন ভাইদের খাইয়ে কি করে পরিপূর্ণ তৃপ্তি দেবেন। কিন্তু আজকার অভাব ও সমস্যা জর্জরিত বাঙালীর জীবনে তার কতটুকু বা সম্ভব হয়। তাতির সে মানুষও নেই আর মনও নেই। তাছাড়া আজকের দিনে মনোমত খাওয়ানও অসম্ভব হয়ে পড়েছে। অবশ্য অনেকে অনেক রকম রান্না করে খাওয়ান। যে যেমন ভাবে পারেন ভাইকে আনন্দ দান করে থাকেন এবং নিজেও আনন্দ ও তৃপ্তি পেয়ে থাকেন। ভাইকে তিলক দেবার সময় যম ও ভগ্নি যমুনাকে স্মরণ করতে হয়। ছোট ভাইকে বোন ঐ দিন প্রাণভরা ভালবাসা ও আশীর্বাদ করেন দান দুর্বা ও টাকা দিয়ে। টাকা দিয়ে যার যা ইচ্ছে উপহার সামগ্রী কিনে দিয়ে আশীর্বাদ করে থাকেন। ফোঁটা দেবার সময় উলুধ্বনি দেয় ও শঙ্খ ধ্বনি বেজে উঠে।

অনেকে ঘরে খাবার করেন। দোকানের কেনা খাবার থেকে ঘরের খাবার চমৎকার ও

সুস্বাদু হয়। তাছাড়া নিজের হাতে তৈরী খাবার খাইয়ে মেয়েরা প্রচুর আনন্দ পায়। ঐ দিন বোনেরা মঙ্গলটিকা ভাই-এর কপালে দিয়ে বলেন—

"ভাই-এর কপালে দিলাম ফোঁটা
যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা।
আমি দি ভাইকে ফোঁটা
যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা।
ভাই-এর কপালে ফোঁটা সাজে
স্বর্গেতে ঐ দুগ দুগি বাজে।

অবশ্য পরিবর্তনে ও দেশাচারের ছড়ায় অনেক পরিবর্তন হতে পারে। আজকের দিনে ক্রমে ক্রমে সর্বক্ষেত্রে ও অনুষ্ঠানে উৎসব ও পূজাপার্বণের চিরাচরিত প্রথা বিলুপ্ত হচ্ছে দিকে দিকে। নামমাত্র নিয়ম রক্ষায় এসে দাঁড়িয়েছে। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া যে একমাত্র বাঙালার উৎসব তা নয়, সর্বস্তরের মানুষের নিকট এর পরিচয় খুব নিকট ও গভীর। পাঞ্জাবী, মাড়োয়ারী ও হিন্দুস্থানী ওদের ভেইয়াকো, ভাইজীকে টাকা দেবার ব্যাপারও উল্লেখযোগ্য। থালাভর্তি খাবার লাড়ু, নানা রকমের ক্ষীরের খাবার ও চাঁদির টাকা ইত্যাদিতে সাজান থাকে। লাল সালু ঢাকা দিয়ে বোন ভাই-এর বাড়ীতে আসে। মথায় প্রকাণ্ড ঘোমটা। বর্তমানে ওরাও আধুনিকা, আধুনিক জগতের আবহাওয়ার মধ্যে থেকে থেকে ওরাও আজ নতুন ভাবধারার কাজেই অনেকেই ওড়না ব্যবহার ছেড়ে দিয়েছেন। মাথা হাত ঘোমটা নেই। তবে গলার বিকট চিৎকারে গান এখনও বিলুপ্ত হয়নি।

দেওয়ালীও ওদের একটা বড় ধর্মানুষ্ঠান। সারা বাড়ী ঘর দরজা রং করা হয়। নতুন কাপড় জামা পরে। একমাত্রী বেলনা পুতুল সাজায়। দেওয়ালে নাটির ঠাকুর তৈরী করে। পাশে ধূপ দীপ জেলে দেয়। বাঙলার নববর্ষ হয় বৈশাখ। কিন্তু ওদের দেওয়ালী উৎসবে নতুনখাতা হয়। বাড়ীতে বাড়ীতে মিঠাই পাঠায়। বন্ধু ও আত্মীয়স্বজনের মধ্যে ঐ দিন কোলাকুলি করে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলে। পুরুষেরা ধুতি কোট ও মাথায় পাগড়ী দেয়, ওদের এই প্রথা। তবে বাঙালীর সঙ্গে কিছুটা এক থাকলেও আসলে পার্থক্য আছে অনেক।

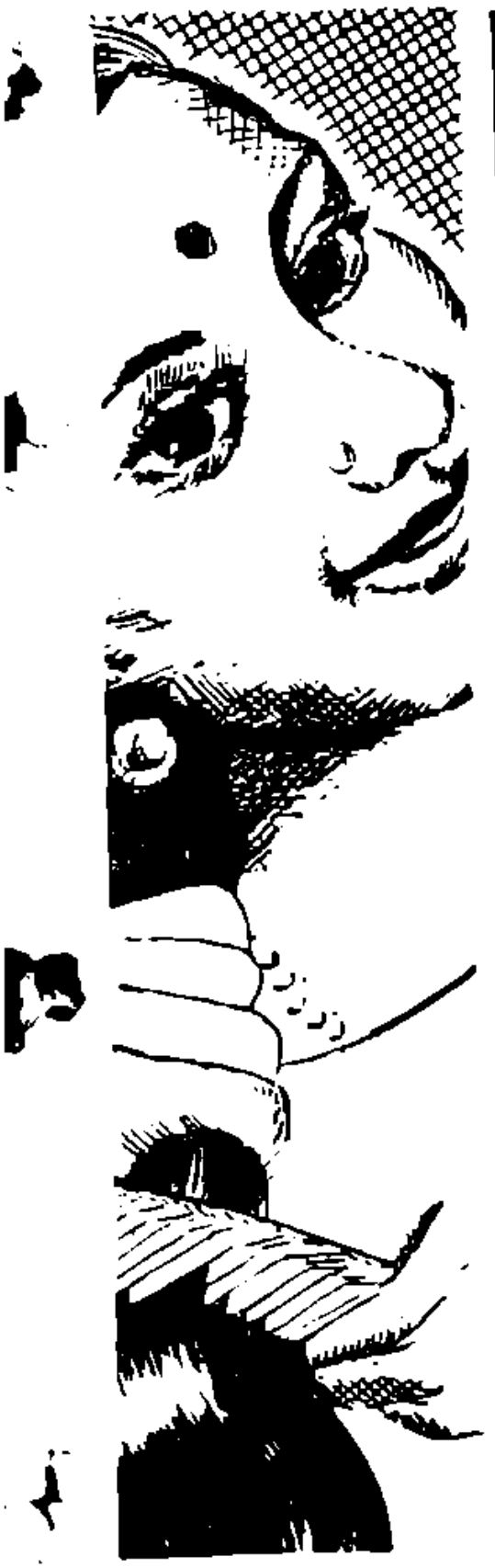

শুধুই কেশ তৈল নয় একটি কেশ রসায়ন

সাধনা আমলা

সুবাসিত আয়ুর্বেদীয় কেশ তৈল

অতুলনীয় গুণাবলীর জন্য যুগ যুগ ধরে সুবিদিত

আমলকীই ইহার প্রধান উপকরণ

কেশের পুষ্টিসাধন ও কেশমূল সুদৃঢ় করে। কেশের সজীবতা ও স্বাভাবিক বর্ণ ফিরিয়ে আনে। কেশপতন ও অকালপক্বতা রোধ ক'রে ঘনকৃষ্ণ সুন্দর কেশোদ্গমে সহায়তা করে। মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ ও কর্মক্ষম রাখে।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা
কলিকাতা

SA-2/69

Regd. No. C3643

মন খুশীতে ভরে যায়

লক্ষ্মী ঘিয়ে তৈরী
খাবার খেলে
মন খুশীতে
ভরে যায়

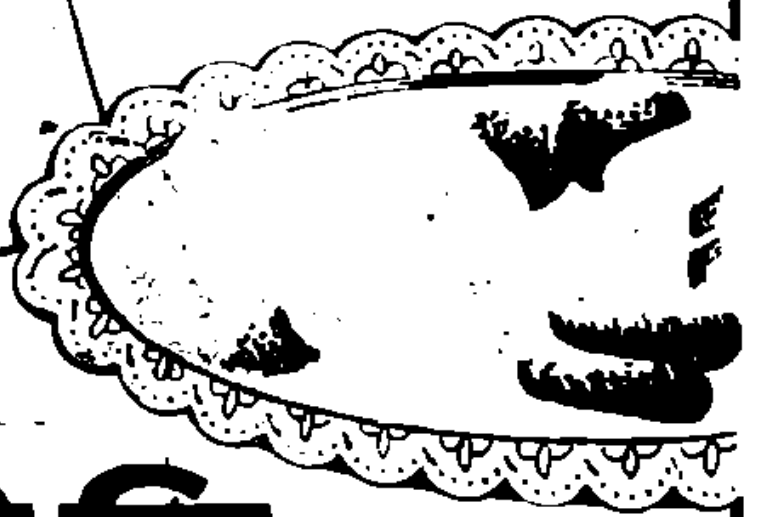

লক্ষ্মী ঘি

খাদ্যদ্রব্য
সুস্বাদু
ও
প্রীতিকর
করে

শুধু উৎকর্ষ নয় সুরুচির পরিচায়ক

সদ্য বিকশিত গোলাপের মত সুন্দর আনন ও
কুসুম কোমল
পাপড়ি পেলব তনু

সাধনা বিউটি ক্রীম-এর
এইতো সবচেয়ে বড় অবদান।
নিজেদের সৌন্দর্য্য সম্পর্কে
সচেতন আধুনিকারা তাই
এর প্রশংসায় মুখর।

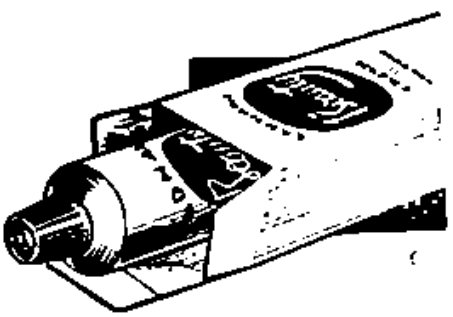

সাধনা
বিউটি
ক্রীম

ত্বকসাধনার অপরিহার্য্য
অতি আধুনিক অবদান

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮।

অস্বাস্থ্যকর মাড়ীই
দাঁতের ক্ষয় ও মুখের দুর্গন্ধের কারণ

মাড়ীর সুস্থতার জন্য
নিমের উপকারিতা
হাজার হাজার বছরের পরীক্ষিত

নিম টুথ পেস্ট-এ
নিমের সমস্ত গুণই রয়েছে

ক্যালকাটা কেমিক্যাল-এর তৈরী

CNF-15-69 BJ

গল্প-ভারতী

GALPA-BHARATI

অগ্রহায়ণ ১৩৭৭, DECEMBER, 1970

সপ্তবিংশতি-বর্ষ

সম্পাদক : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

সহঃ সম্পাদক : কল্যাণ রায়

মূল্য : এক টাকা

বার্ষিক : পনের টাকা

শ্রীগোপাল বিহারী দত্ত কর্তৃক ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
৫৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও কল্পনা প্রেস প্রাঃ লিঃ
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

সব মানুষের জন্য
আর
সব কলমের
জন্য

সুলেখা
স্পেশাল
ব্লু-ব্ল্যাক • ব্লু
ব্ল্যাক • রয়াল

সুলেখা
এক্‌জিকিউটিভ
ব্লু-ব্ল্যাক, ব্লু
ও সুপার ব্ল্যাক
রয়াল ব্লু, এমারল্ড
গ্রীন ও ভায়োলেট ব্লু

সুলেখা
ডেলাক্সেস
ব্লু-ব্ল্যাক • ব্ল্যাক
রয়াল ব্লু • রেড
গ্রীন • ভায়োলেট

আপনার পছন্দমত
যে-কোনটি
ব্যবহার করুন

সুলেখা
ওয়ার্কস
সুলেখা পার্ক
কলিকাতা-৩৫

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas

Ex. Judge, Calcutta High Court,
Ex-Law Member, Govt. of India

আমি লক্ষ্মী-ঘিই ব্যবহার করি। অন্য ঘিয়ের তুলনায় এ'ঘি অনেক ভাল ও বিশুদ্ধ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সত্যেন মজুমদার
সম্পাদক—আনন্দবাজার পত্রিকা

লক্ষ্মী ঘি ব্যবহার করে আমার বেশ ভাল লেগেছে। এটা সত্যিই ঘি।

—শিশিরকুমার ভাদুড়ি

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল ঘিনিষ।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই ভেজালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—দৈনিক বসুমতী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজারে প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

শ্রীসীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখরোচক হয়।

শ্রীশান্তা দেবী

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

পশ্চিমবঙ্গ

বিজ্ঞাপন প্রচারের উপযুক্ত মাধ্যম

বিজ্ঞাপনের হার	
তৃতীয় প্রচ্ছদ	২০০ টাকা
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১২৫ ,,
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	৭৫ ,,

বিজ্ঞাপন প্রচারের শর্তাবলী সম্পর্কে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

বিজনেস্ ম্যানেজার, তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ:

পশ্চিমবঙ্গ সরকার, রাইটার্স বিল্ডিংস্, কলিকাতা-১

প: ব: (তথ্য ও জনসংযোগ) বি: ৩৪২৪।৭০

HOUSE OF NRM

NATIONAL RUBBER MANUFACTURERS LTD.

THE LARGEST MANUFACTURERS OF INDUSTRIAL RUBBER PRODUCTS

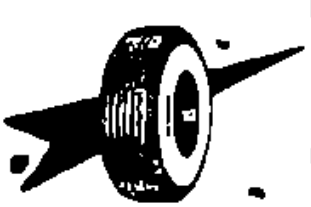

Inchek Tyres Limited

MANUFACTURERS OF TYRES FOR INDIAN ROADS AND CLIMATIC CONDITIONS.

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়—		৪৮৯
আমাদের ভারতবর্ষ	—সমানন্দ	৪৯১
কার্টুন		৪৯৪
বন্যা কন্যা (উপন্যাস)	—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৪৯৬
গল্প ভারতীর পাতা থেকে		
দাদুর রোমান্স	—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৫০৭
কিছু রঙ্ কিছু বেরঙ্ (উপন্যাস)	—বিমল মিত্র	৫১৭
ফিরে ফিরে চাই	—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	৫২৫
পুরাতন পাতা		৫৩১
জীবন নাট্যের খণ্ডচিত্র :		
রামমোহনের গৃহত্যাগ	—অনাথ উপাধ্যায়	৫৩৩

বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী
সন্দেশ বিক্রেতা

সিমলার বিখ্যাত

বিনোদ বিহারী নাগ

গণেশ চন্দ্র দত্ত

শাখা :
৫/৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন : ১৩ ১৮৯৯
১৮, মতীন্দ্রমোহন এভিনিউ,
কলিকাতা ৬

হেড অফিস ঃ ৫৬ ২, রামদুলাল সরকার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন ঃ ৫৫-১৪৫০

পরিবার কল্যাণই পরিবার পরিকল্পনা

এখনই আর সন্তান নয়

তিনটির পর একদম নয়

যে কোন নিকটবর্ত্তী পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে বিনামূল্যে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

পঃ বঃ রাজ্য পরিবার পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত

Advt. No. 221/70

বাড়িতেই টাকা জমিয়ে রাখবেন কেন ? তার চাইতে ইউকোব্যাঙ্কে আপনার টাকাকড়ি জমা রাখা ঢের বেশী নিরাপদ ও লাভজনক

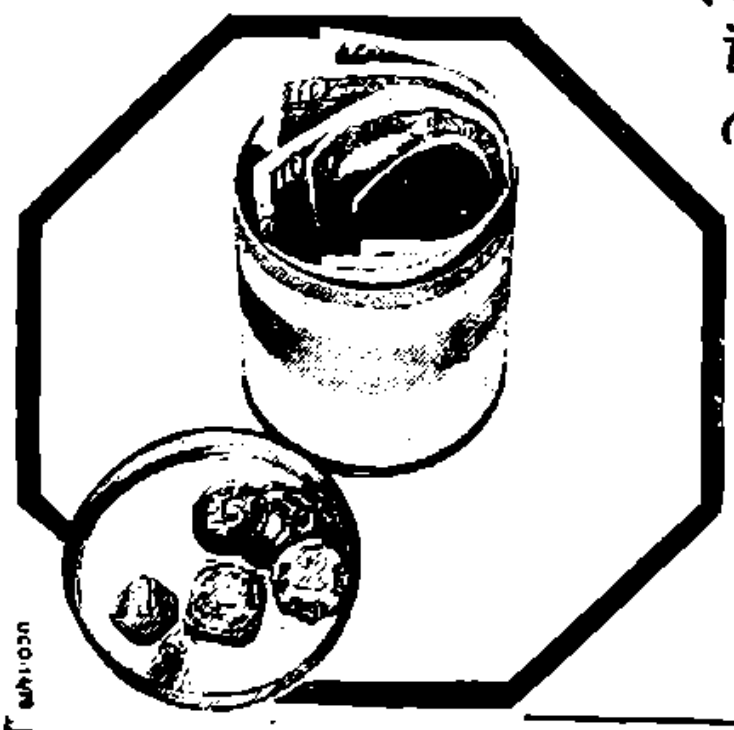

ইউকোব্যাঙ্কে একটি সিপারিট অ্যাকাউন্ট খুলে আপনার টাকা জমা রাখলে তা যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি দেশের কৃষিবাণিজ্য, ক্ষুদ্র শিল্প ও রপ্তানী বাণিজ্যের উন্নয়নেও তাতে সাহায্য হবে, কেননা ভারতের অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান সম্প্রসারণে প্রত্যেকটিরই যে আজ্ঞাবহতা অপরিহার্য।

দেশে সমৃদ্ধি আনতে, দেশকে প্রাচুর্যে ভরিয়ে তুলতে, আপনার টাকাকড়ির সেবাদেন ইউকো-ব্যাঙ্কের মাধ্যমেই করুন।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

হেড অফিস : কলিকাতা

এই সংখ্যায়

আবার সেই জেল	—বিমল গঙ্গোপাধ্যায়	৫৩৬
যে কাহিনী চিরকালের প্রফুল্ল : গিরিশচন্দ্র	—সুজন রায়	৫৪৪
নটরাজ	—সুবোধ বসু	৫৫০
নির্ঝর	—অমরেন্দ্র সরকার	৫৫৬
সম্মিলন	—শিউলি সেনগুপ্ত	৫৬১
এই প্রথম ঐকতান	—অশোক মুখোপাধ্যায়	৫৬৮
অপরাহ্নবতী (উপন্যাস)	—সুবোধ সিংহ	৫৭১
খবরের গল্প	—ডাকহরকরা	৫৭৭
নাটমঞ্চ	—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৫৮১

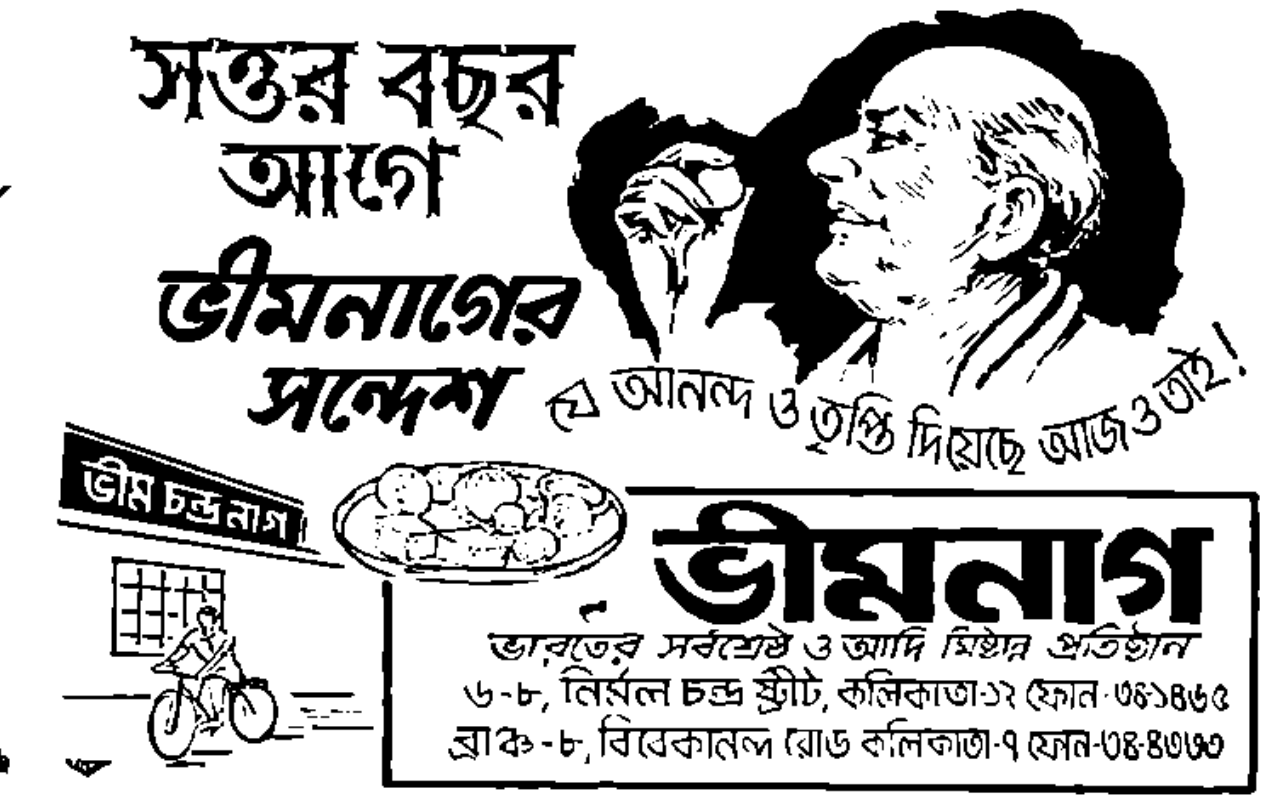

উৎসবের দিনগুলিকে মুখর করে তুলতে

বাংলার তাঁতবস্ত্র

উৎসবে এবং নিত্যপ্রয়োজনে ব্যবহার করুন

সমবায় সমিতিতে উৎপাদিত তাঁতবস্ত্রের প্রাপ্তিস্থান ॥

★ দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল স্টেট হ্যাণ্ডলুম উইভার্স কো-অপারেটীভ সোসাইটী লিমিটেড
৬৭, বস্ত্রীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪, ও

শাখা কেন্দ্রসমূহ

★ গভর্ণমেণ্ট সেলস এম্পোরিয়ম ঃ ৭।১, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
১২৮।১, বিধান সরণী, কলিকাতা ; ১৫৯/১/এ, রাসবিহারী এভেন্যু, কলিকাতা,
১৮/এ, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, (সাউথ), হাওড়া ।

তন্বী, তব
তরুণ তনু ঘিরে
বসন্তের সুরভি যত
উচ্ছ্বসিয়া ফিরে !

প্রিয়া সুরভি মেখে যেখানেই যাবেন সেখানেই আপনার জয়-জয়কার ! আপনার সান্নিধ্য মধুর হবে সবার কাছে ।

প্রিয়া পারফিউম

কসমেটিক ডিভিসন
সেনকল কেমিক্যাল

কলিকাতা বোম্বাই কানপুর দিল্লী মাদ্রাজ

ষড়বিংশতি বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

অনেকে বলে থাকেন মানুষ অত্যন্ত স্বার্থপর জীব। তার একমাত্র লক্ষ্য নিজের স্বার্থসিদ্ধি।

কিন্তু আমার মনে হয় কথাটা সত্য নয়। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দ্বৈতসত্তা বর্তমান। একই চরিত্রের দুটি দিক আছে একই সঙ্গে। একটি হলো স্বার্থপরতা, আর একটি পরার্থপরতা।

অন্যান্য জীবের মত শুধু বেঁচে থাকবার তাগিদে মানুষকে তার নিজের ভাল দেখতেই হয়।

নিজের ভাল কেমন করে হয়—সেদিকে যেমন তার দৃষ্টি থাকে সজাগ, পরের ভাল করবার ইচ্ছাটাও তেমনি তার সহজাত।

নিতান্ত আপনজন না হলে মানুষের বেলা সেটা তেমন প্রকট না হতে পারে কিন্তু বনে-জঙ্গলে দেখতে পাই—বহুক্ষেত্রে জীবজন্তুর মধ্যে আপনার দলভুক্ত জন্তুগুলিকে রক্ষা করবার প্রবৃত্তি তাদের অত্যন্ত প্রবল। এমনকি তার জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় না—এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়।

মানুষ বুদ্ধিমান জীব। কে আপন আর কে পর—সে বিচার করবার ক্ষমতা তার আছে। সেইখানেই বেধেছে যত কিছু গোলমাল।

কিন্তু মানুষের মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি যাদের নেই—বনের পশু যারা—দলবদ্ধ হয়ে বনে-জঙ্গলে ইতঃস্তত বিচরণ করে, যেমন ধরুন বেবুন বা শিম্পাঞ্জি—তাদের দলের মধ্যে কেউ যদি কখনও বিপদে পড়ে তাহলে তাকে বাঁচাবার জন্যে দলের যে যেখানে থাকে ছুটে এসে একজায়গায় জড়ো হয়। বনের নেকড়ে বাঘগুলোই তাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। চুপি চুপি পেছন থেকে এসে তারা আক্রমণ করে। হয় সে নেকড়েটাকে ঘেরে সে আক্রমণ তারা প্রতিরোধ করে, নয়তো নিজে মরে।

লালমুখ কালোমুখ বাঁদরের সংখ্যা আমাদের দেশে কম নয়। তাদেরও স্বভাব দেখেছি ঠিক একই রকম। গাছে গাছে লাফিয়ে লাফিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ একটা ছোট্ট বাচ্চা হুপ্‌ত মাটিতে পড়ে গেল। অমনি চারিদিক থেকে কিচির মিচির করে সমস্ত বাঁদরগুলো গাছ থেকে মাটিতে নামলো। যতক্ষণ না অসহায় সেই ছোট্ট বাচ্চাটিকে আবার তারা গাছে তুলে তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেবে ততক্ষণ তাদের নিস্তার নেই।

এইবার মানুষের কথা বলি—

মানুষ যখন নিজের ভাল করে, আপনজনের উপকার যখন করে তখন কিছু বলবার থাকে না, কিন্তু তার অনাত্মীয় কোনও ব্যক্তির দুঃখ-দারিদ্র্যের এবং অভাব-অনটনের কথা শুনে বিচলিত হয়ে গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে কিছু অর্থসাহায্য করলে, তখনই প্রশ্ন ওঠে—যা সে না করলেও পারতো তা সে করলো কেন?

কারণ মানুষের হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্মই হলো—আর একটি হৃদয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতিয়ে নিজেকে অনুভব করা। এতে তার আনন্দ আছে। এবং এই আনন্দের যোগে মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ সৌন্দর্যকে সে অনুভব করতে পারে। আত্মার স্বাভাবিক গতিস্রোত ব্যাহত হয় না। যে ছিল অনাত্মীয় সে হয় আত্মীয়। এমনি করে যে মানুষ যত বেশি মানুষের মধ্যে আপনার আত্মাকে মিলিয়ে নিজেকে পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারে—সে তত বেশি মহত্ত্ব অর্জন করে।

এক-একজন মানুষ থাকে যারা স্বভাব কৃপণ। তাদের স্বার্থপরতা এত বেশি প্রবল যে তারা এই পরোপকারকে বৃথা অপব্যয় মনে করে।

অনেকে বলে থাকেন—নিজের স্বার্থরক্ষাও মানবাত্মার একটি স্বাভাবিক ধর্ম। কিন্তু স্বার্থপরতা স্বভাবধর্ম হলেও মানুষের হৃদয় সেখানে সঙ্কীর্ণ।

সে তার আত্মার গভীর সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ।

আর যে লোক পরোপকারব্রতী, সেই সঙ্কীর্ণ গণ্ডী যে অতিক্রম করে, তার চেতনা হৃদয়-মনের বাঁধা স্তরে ব্যাপ্ত হতে থাকে, এমনি করে তার বিকাশ যতই বড় হয় ততই সে বড় রকম করে আপনার সত্যকে অনুভব করতে পারে।

একটি ইংরাজি মাসিকপত্রে পড়েছিলাম—People want to give. People instinctively want to serve their fellowmen. And if we deny that instinct, we risk emotional death, just as a man who denies his hunger instinct, risks physical death.

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

আমাদের ভারতবর্ষ

—সদানন্দ

"যেদিন সুনীল জলধি হইতে
উঠিলে জননী ভারতবর্ষ,
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব,
সে কি মা ভক্তি সে কি মা হর্ষ।
সেদিন তোমার প্রভায় ধরার
প্রভাত হইল গভীর রাত্রি।
বন্দিল সবে জয় মা জননী,
জগত্তারিণী জগদ্ধাত্রী।"

—দ্বিজেন্দ্রলাল

হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে
জাগরে ধীরে,
এই ভারতের মহামানবের
সাগর তীরে।

—রবীন্দ্রনাথ

কত মানুষের সাধনা, কত ধ্যান ধারণা, কত ত্যাগ-নীতি-ধর্ম, কত আত্মার অমের আকুল আকুতি ভারতের তীর্থ মন্দিরে মন্দিরে মূর্তি হয়ে রয়েছে আজও···

কত তীর্থের কত মাহাত্ম্য···

কোথাও ঈশ্বর এসেছিলেন, এসেছিলেন অবতার, কোথাও দেব-হবির যজ্ঞ হয়েছে,
সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন কোথাও কপদর্দ্দা মহাত্মা···

ভারতীয় জীবনযাত্রার মূলে তাই বুঝি রয়েছে ধর্ম, ত্যাগ ও তিতিক্ষা!

এই আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষ!

—কিন্তু আজ কোথায় তার অতিথি চেতনা!

আজ মনে পড়ে এক ভারতীয়ের কথা···

স্বামী বিবেকানন্দ·····

যখন বিদেশভূমিতে গিয়েছেন তিনি, সঙ্গে নিয়েছেন গীতা ও মহাভারত···ভারতের দুই তীর্থ আদর্শ—দুই শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বহু সভ্যতার প্রসক্ত লীলাবিলাসক্ষেত্রে বিচরণ করেছেন তিনি, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও দেশ মাতৃকাকে ভোলেননি। সকল সময়ই হৃদয় তাঁর থেকেছে দেশের মাটিতে। তাঁর ব্রত ছিল যেখাই যান কোন পার্থিব বৈভবেই বিচলিত হবেন না। আর সবার উপর মনে রাখবেন তাঁর স্বদেশভূমিকে।

সুদূর মার্কিন দেশে রাজপ্রাসাদে বাস করেও তিনি গভীর রাত্রে কেঁদে আকুল হয়েছেন, দারুণ শীতে তার গরীব স্বদেশ ভাইদের কি অবস্থা হচ্ছে সেই কথা স্মরণ করে। এত বড় দেশপ্রেমিক পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। তিনি মনেপ্রাণে জানতেন জন্মভূমি তাঁর জগজ্জননী। বিবেকানন্দের ধ্যান-কল্পনা ভারতবর্ষ—তার মহা অর্থ হারিয়ে ফেলেছি আমরা। তাই আজকের ভারতবর্ষ বিভেদময়, দ্বন্দ্ব ও বিধা বিদীর্ণ, একান্ত আত্মস্বার্থময়। এক ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষ গঠনের স্বপ্ন বুঝি আজ ভেঙ্গে যায়। কি করে রক্ষা হবে ঐক্য, কোথায় রয়েছে জাতির প্রাণময়। মনে পড়ে যায় ঐতিহ্য পরম্পরা আর সুগভীর ধর্মবিশ্বাসের কথা, তার সকল প্রেরণার মূল, তার সকল কর্মের উৎসতল। যার ফলে সংশয় বিক্ষুব্ধ পৃথিবীর বুকেও একদিন অম্লান জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়েছিল ভারতের গৌরব মহিমা!

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরীয়সী—এই ছিল একদিন ভারতবাসীর জীবনের মূলমন্ত্র। আজকের ভারতবাসী বিস্মৃত হয়েছে সেকথা। তাই আজ বলবো, শুধু বিশ্বাস করুন এবং এই বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যান, যে দেশই আমাদের মা, আমরা সকলে একই মায়ের সন্তান—একদিন এই দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মুক্ত করার জন্য হাজার হাজার সন্তান নিজের মায়ের কান্না কাকুতি ভ্রুক্ষেপ না করে, জীবনের সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গিয়েছিল জীবনের জয়গান। তাঁদের সেই আত্মাহুতি, তাঁদের সেই জীবনপণ সংগ্রাম বিফল হয়নি। তাঁরা মায়ের শৃঙ্খল মুক্ত করেছিলেন, পরাধীন ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছিল।

কিন্তু আজ আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষের কি অবস্থা!

তাই আবার আমাদের প্রতিষ্ঠিত হতে হবে অবিচল দেশপ্রেমে। দেশকে শুধু মাটি জল ও আকাশ ভাবলে চলবে না। দেশ আমাদের জীবধাত্রী জগজ্জননী এই বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। দেশের মানুষকে ভালবাসতে হবে—একই মায়ের সন্তান এই জ্ঞানে। তবেই আমাদের সকল দুঃখের অবসান হবে, আমরা পাবো সুখ-শান্তি স্বচ্ছলতা। ঐক্য ও আনন্দ ফিরে আসবে। দেশ হবে গৌরবোজ্জ্বল। আমাদের ভারত আবার সোনার ভারত হবে।

"Let our object be our country, our whole country, and nothing but our country. And by the blessing of God, may that Country itself become a vast and splendid monument, not of oppression and terror, but of wisdom, of peace, and of liberty, upon which the world may gaze with admiration forever."

—Deniel Webster

ফিরে পেতে হবে দেশপ্রেম—জলন্ত দেশপ্রেম, যার মৃত্যুঞ্জয়ী মন্ত্রের স্পর্শে মৃতপ্রায় ভারতবর্ষ আবার প্রাণময়ী হয়ে উঠবে, দুঃখের আঁধার দূর হয়ে আনন্দোজ্জ্বল প্রভাত দেখা দেবে।

• • •

নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে,
তীব্র আবেগ কাটো দুঃখঠোর মাতে—
বন্ধন হোক্ ক্ষয়
তোমারি হউক জয়।"

... ...

প্রভাত সূর্য, এসেছে রুদ্রসাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে,
অরুণবহ্নি জ্বালাও চিত্ত-মাঝে
মৃত্যুর হোক লয়
তোমারি হউক জয়।"

—রবীন্দ্রনাথ

আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য

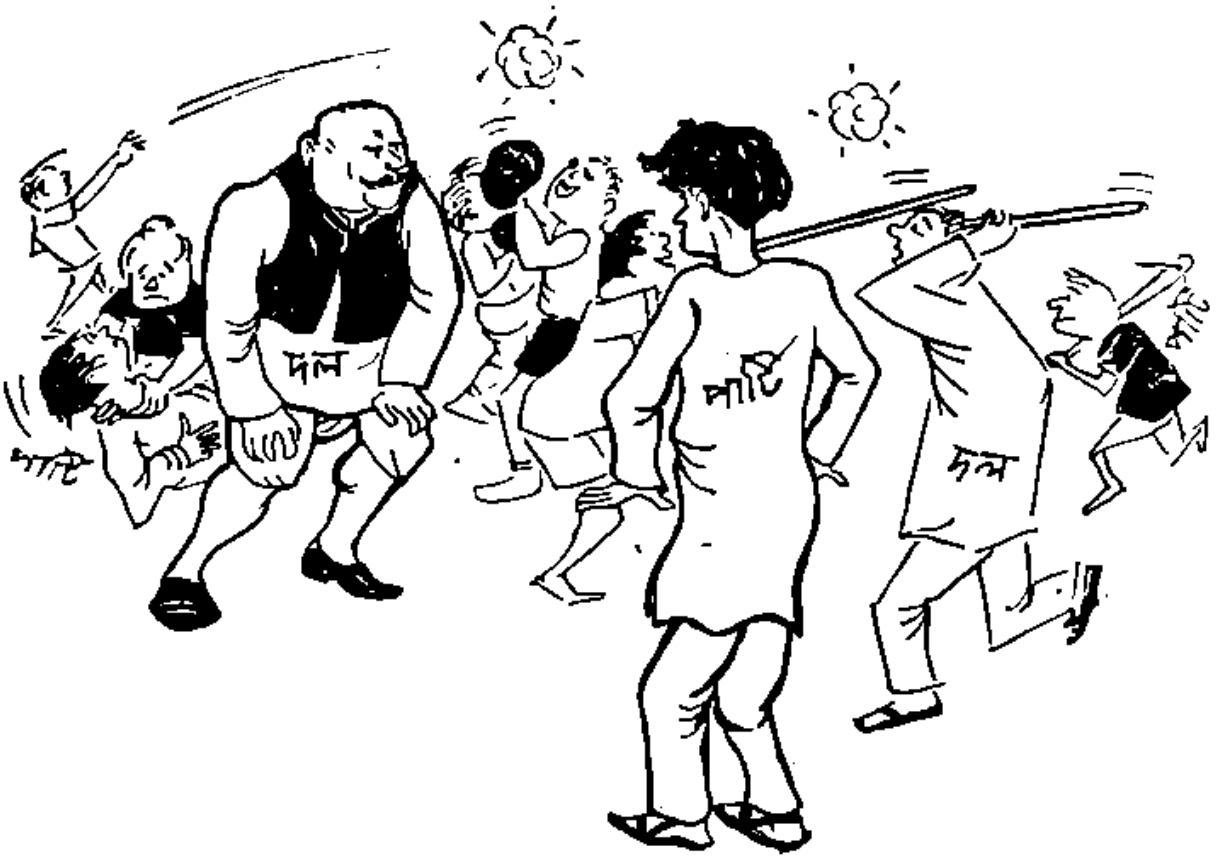

মানুষ আমরা নহি তো মেষ……

বনছায়া কন্যা

উপন্যাস

অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত

[পূর্বকথা : সরসিজ মজুমদারের মেয়ে বনছায়া। বাপ বড়লোক হওয়া সত্ত্বেও বনছায়া চাকরি করে, গল্প উপন্যাস লেখে। বড় সাহিত্যিক হবার স্বপ্ন দেখে। কখনও বা ভাবে জার্নালিস্ট হই যেহেতু আজকাল সাহিত্যের চেয়ে জার্নালিজমেই বেশি গ্ল্যামার। সম্পাদক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক অনেকের সঙ্গেই দহরম-মহরম করে। সুবীর নামে এক আধুনিক কবিকে ভালোবাসে। যে কিনা বড়লোকের মেয়ে গরিবকে ভালোবাসতে পারে, ভালোবাসতে পারলেও বিয়ে করতে পারে, এমন প্রবাদে বিশ্বাস করে না। বনছায়া যেমন কবিকে ভালোবাসে তেমনি এক ঔপন্যাসিককেও ভালোবাসে। তার নাম সন্দীপ সেন। কিন্তু সুবীর যদি সমুদ্রের মত উত্তাল, সন্দীপ পাহাড়ের মতই ধীরস্থির। সন্দীপও দুঃস্থ কিন্তু আদর্শনিষ্ঠ। দারিদ্র্য যেন তার আদর্শকে ম্লান করতে না পারে সে সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ। সরসিজ মেয়ের জন্যে হিমাংশু ঘোষ নামে এক কৃতী এঞ্জিনিয়র ঠিক করেছে, কিন্তু বনছায়া তাকে বিয়ে করতে রাজি নয়। তাকে রক্ষা করতে কে এগিয়ে আসবে? সন্দীপ না সুবীর? না, বনছায়া শেষ পর্যন্ত হিমাংশুকেই বরণ করবে? হিমাংশুর বন্ধু আর মুরুব্বি দেবজ্যোতি ভৌমিক, যে অফিসে বনছায়ার বস্, তার দৃষ্টিও না কোন বনছায়ার দিকে। বনছায়া প্রেমের জন্যে কেরিয়ার মাটি করবে, না কেরিয়রের জন্যে প্রেম?

অতঃপর সরসিজের বাড়িতে টি-পার্টিতে নিমন্ত্রিত হল হিমাংশু। বনছায়াকে পাত্রী হিসাবে মনোনীত করল। তার ফার্মে অনেক চাকরি আছে—বনছায়া চাইল সুবীরকে সুপারিশ করতে। সে সুপারিশ গ্রহণ করল হিমাংশু, সুবীরকে চাকরি দিল। সুবীর ভাবতেই পারেনি এমন অঘটন ঘটতে পারে। আর সুবীরের চাকরি হবার পর তার সঙ্গে বিয়ের নোটিশ দিল বনছায়া। এ ব্যাপারে হিমাংশু অন্ধকারে। হিমাংশুর সঙ্গে বিয়ের তারিখটা পিছিয়ে দিতে পারলেই নোটিশের মেয়াদ অন্তে সুবীরের সঙ্গে বিয়েটা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হতে পারে। সেই মতলবে হিমাংশুর কাছ থেকে মিথ্যা ওজুহাতে বিয়ের তারিখটা পিছিয়ে নিল বনছায়া। সরসিজবাবু জানলেন হিমাংশুর নিজের সুবিধের জন্যেই তারিখটা লম্বা করছে। এখন বনছায়ার ভয় তার আগেই সুবীরের সঙ্গে তার বিয়ের দলিলটা পাকা করতে পারবে কিনা।

সুবীরের সঙ্গে বনছায়ার বিয়ে নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হল। কিন্তু প্রথম মিলনক্ষণেই মনে হল যেমনটি চেয়েছিল তার চেয়ে কিছু কম পড়ল। আরো কম পড়ল যখন সরসিজবাবু এ ব্যাপারে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেলেন। বনছায়া বুঝল পিতৃস্নেহ ত্যাগ না করলে বাবা শান্ত হবেন না। একটা সুটকেস আর বিছানা নিয়ে বনছায়া বাপের বাড়ি ছেড়ে সুবীরের ঘরে গিয়ে উঠল।

যাবার আগে ছোটবৌদি শাশুড়ীর সিঁদুর কৌটো থেকে সিঁদুর নিয়ে সিঁথিতে ঘন করে রেখা টানল—ভগবানকে জানাবার জন্যে যে সে জয়ী, সে সুখী।

সুবীরের কবি-বন্ধুরা ঠিক করল এ বিয়ে-উপলক্ষে সম্পাদক শীযুষ দত্তের বাড়ির ছাদে একটা পার্টি হবে। স্বামীর ঘরে নির্জনে বসে বনছায়া যখন সাজছে তখন দরজায় হিমাংশুর টোকা পড়ল। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল বনছায়া, দরজা খোলে কি না খোলে। কিন্তু স্পষ্ট করে কিছু স্থির করবার আগেই দরজা খুলে দিল।

হিমাংশু ঘরে ঢুকে দেখল এক-ঘরের ফ্ল্যাটে ঘর্ষিতা মেয়েটা সুখে সৌভাগ্যে একেশ্বরীর মত বিরাজ করছে। ভাবছে তার এই অহঙ্কারটা চূর্ণ করা যায় কী করে? সে গেল বনছায়ার বন্ধু দেবজ্যোতি ভৌমিকের কাছে নালিশ করতে। দেবজ্যোতি বললে, সুবীরকে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিন। আর হিমাংশু বললে, বনছায়ার কাপড়েরও পাদম ওওয়া উচিত। দেবজ্যোতি দায় দিল। বললে, দেখি, ভাবি, কী করা যায়।

আসলে দেবজ্যোতি বনছায়ার মাইনে পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দিল। বনছায়া যে প্রেমের মুখে জয়ী হয়েছে, কৃতী ও বড়লোক বলে হিমাংশুতে আকৃষ্ট হয়নি, এ যেন তারই পুরস্কার। কিন্তু সুবীরের মুখে এ মাইনে-বাড়ার খবর পেয়ে হিমাংশু ক্রুদ্ধ হল। সুবীর ভেবে পেল না এ প্রতিক্রিয়ার অর্থ কী।

হিমাংশু নানা প্রশ্নে জেনে নিল একটা ছোট ঘরে সুবীর আর বনছায়া কেমন সুখে দিন কাটাচ্ছে। সঙ্গে সান্নিধ্যে তাদের সন্ধ্যাগুলি কী রমণীয়। স্বামীর মাইনে কম স্ত্রীর মাইনে বেশি এ তাদের কাছে কোনো সমস্যা নয়। হিমাংশু চাইল তাদের মধ্যে বিরোধের ছুরি চালাতে। শত্রুতাতেই এখন তার শান্তি। আর শত্রুতার মহত্ত্ব সূক্ষ্মতম কারুকার্যে —অশ্বত্থামা হত ইতি গজে।

হিমাংশু সুবীরের জন্যে অফিসে ওভারটাইমের ব্যবস্থা করলে। টাকা রোজগার বেশি হবে বুঝে সুবীর তাতে আনন্দিত হল। আর এদিকে বনছায়ার সন্ধ্যাগুলি নিঃসঙ্গ হয়ে উঠল। হিমাংশুই তার রঙিন মদির সুন্দর সন্ধ্যাগুলি নিল হরণ করে। আবার দেবজ্যোতি বনছায়ার জন্যে একটা বাড়ি দেখে দিল বলে হিমাংশুও সুবীরের জন্যে আরেকটা দেখে দিল। সেটা তুলনায় খারাপ হলেও সুবীর দাবি করল সেটাই তার কোয়ার্টার, সেখানেই বনছায়াকে যেতে হবে। সুবীর যেমন তার বস্-এর হুকুম মানে, বনছায়ারও তেমনি সুবীরের কথা মানা উচিত।

বনছায়া সুবীরের কথা মেনে সুবীরের মনোনীত বাড়িতেই সংসার পাতল। সুবীরের অফিস থেকে অভিরামকে পাঠানো হল কাজ করার জন্য। কিন্তু নিঃসঙ্গতার নির্যাতন থেকে রেহাই পেল না বনছায়া। ভাবল কোথাও গিয়ে ছদণ্ড জুড়াই। সন্দীপের কথা মনে পড়ল। সন্দীপের কাছে গিয়ে বসল বনছায়া। সে উপন্যাস রচনায় রত। মনে হল বনছায়ার উপস্থিতি থেকেও সাহিত্যই বুঝি তার প্রিয়তর—তাতে না থাক টাকা না থাক নাম-যশ। বনছায়ার যে বিয়ে হয়ে গেছে এতেও যেন তার ভালোবাসার কোনো ক্ষতি নেই। বাড়ি ফিরে এসে দেখল সুবীর লিখছে। কিন্তু কবিতা নয়, অফিসের রিপোর্টের বাংলা

অনুযায়ী। তারপর থেকে রোজ সন্ধ্যারই বনছায়া বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় একা একা। এভারটাইম করে সুবীর কতক্ষণে ফিরবে তার প্রতীক্ষা করে না।

বনছায়াকে বাইরে বেরুনো থেকে নিরস্ত করবার অভিসন্ধিতে সুবীর তার সঙ্গ নিতে চাইল, নিতে চাইল হিমাংশুর বাড়ি। বনছায়া গেল না। একদিন হিমাংশুই সুবীরের ফ্ল্যাটে এসে হাজির। বনছায়া ঘরে নেই, সুবীর গেল চা দিতে। হিমাংশু নিল না, বললে, বনছায়া নিজে যেদিন চা করে দেবে সেদিন খাবে। বনছায়া ফিরে এলে সুবীর তাকে শাসন করতে চাইল আর বনছায়ার মধ্যে ভয় ঢুকল একা বাড়িতে হিমাংশুই না একদিন আক্রমণে উদ্যত হয়ে আবির্ভূত হয়। তাই কদিন পর সুবীর যখন বনছায়াকে ঘুমের মধ্যে আবদ্ধ করতে চাইল তখন দুঃস্বপ্নের মধ্য থেকে ভূত করে বনছায়া চেঁচিয়ে উঠল এ কী অন্যায়! ছি ছি ছাড়ুন ছাড়ুন—

অফিসের পার্টিতে বস-এর পাল্লায় পড়ে সুবীর মদ খেল। সেই থেকে সে নেশা তাকে পেয়ে বসল। বনছায়াকেও সে শেখাল মদ খেতে। একটা কুৎসিত সন্দেহ থেকে মুক্ত হবার জন্যেই বনছায়া স্বামীর প্রস্তাবে সম্মত হল। কিন্তু সুবীর আর নিজের সর্ত পালন করল না। বিরোধ ঘুমায়িত হল।

তারপর বিরোধের মধ্যে বনছায়া আবিষ্কার করল সে মা হতে চলেছে। তার পেটে সুবীরের সন্তান।

বনছায়া অনুভব করল এ সন্তান আনন্দের অভিজ্ঞান নয়, শুধু যাতনাময় পরিণতি। পরাভবের অপমানের প্রতীক। বনছায়া ডাক্তার অরবিন্দের কাছে গেল, পেটের সন্তানকে নষ্ট করবে। অরবিন্দ যখন জানল এ সন্তান বৈধ, তখন প্রস্তাবে রাজি হল না। তখন কুমারী সেজে সন্তানকে অবৈধ বলে বুঝিয়ে বনছায়া গেল আরেক ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার কমলেশ তার কি যাবৎ এমন এক জিনিস দাবি করল যাতে সে রাজি হতে পারল না।

সেবারের পার্টিতে হিমাংশু বেশি করে মদ খাইয়ে সুবীরকে মাতাল করে দিল। বাড়িতে পৌঁছে দেবার ছলে গাড়ি ও তাতে একটি নারীর ব্যবস্থা করলে। নারীর নাম লাবণি, তাকে বলে দিল যেন সুবীরকে একেবারে তারস্ত্রীর কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। যাতে বনছায়া বুঝতে পারে সুবীর কতদূর নেমে গিয়েছে। যখন সুবীর বাড়ি ফেরে, দেখতে পায় সন্দীপ সেন এসেছে আর বনছায়া তাকে তার উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পড়ে শোনাচ্ছে। নিজে ধরা পড়ে যাবার ভয়ে চটে গিয়ে সুবীর সন্দীপের উপর প্রতিশোধ নেয়, তাকে গালাগাল দিয়ে তাড়িয়ে দেয় বাড়ি থেকে।

সুবীর বনছায়ার কাছে ক্ষমা প্রকাশ করে বিরোধ মিটিয়ে নিল। সন্দীপের কাছে ক্ষমা চাইতে রাজি হল, বললে, তাকে একদিন বাড়িতে ডেকে নিয়ে এস। বনছায়াকে অনুরোধ করল হিমাংশুকে ঘরে তাকে যথেষ্ট উচ্চতর পদে বদলি করিয়ে দিতে। বনছায়া রাজি হল না। অথচ সন্দীপকে নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে তার আলিঙ্গনে ধরা দিল।

সন্দীপের অন্তরলোকে দ্বন্দ্ব সুরু হল—শিল্পীর পক্ষে এমন কোনো আকর্ষণে লিপ্ত হওয়া

উচিত নয় যাতে তার সৃষ্টির শান্তি নষ্ট হতে পারে। কিন্তু কার্যতঃ সে উদাসীন থাকতে পারল না। বনছায়ার বাড়ি গেল তার উপন্যাসের বাকি অংশ শুনে আসতে। ঈর্ষায় দগ্ধ হয়ে সুধীর সে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল আর সেই টুকরোগুলি কুড়িয়ে নিয়ে চলে গেল সন্দীপ।

ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঘরের পাঁচিলটা হয়ে গেল— এক ঘরে সুধীর, অন্য ঘরে বনছায়া। সুধীর তার ঘরে একটা তালা লাগাল যাতে বনছায়ার সাহিত্য-সাধনা বিপর্যস্ত হয়ে যায়। লেখার কলমে নিরিবিলি জায়গা খুঁজতে বনছায়া সন্দীপেরই দ্বারস্থ হল। দেখল সন্দীপ সযত্নে তার পাণ্ডুলিপির ছেঁড়া টুকরোগুলি একটা খাতার পৃষ্ঠায় সেঁটে সেঁটে উপন্যাসের পুনরুদ্ধার ঘটিয়েছে। বনছায়া ঠিক করল সন্দীপের বাড়িতে বসে বইটার একটা নকল তৈরি করবে।

সন্দীপের বাড়িতে বসে উপন্যাস নকল করল বনছায়া। প্রবাহের সম্পাদক পীযূষ দত্তের সঙ্গে হোটেলে দেখা করবে বলে টেলিফোনে নিমন্ত্রণ করে পাঠাল। তুমি মদ খাবে? জিজ্ঞেস করল পীযূষ। বনছায়া বললে, আমি খেতে শিখে গিয়েছি।

বনছায়া পীযূষের সঙ্গে হোটেলে মদ খেল, এক ট্যাক্সিতে বেড়াল। তার উপন্যাস 'অবগুণ্ঠন' 'প্রবাহ' পত্রিকার জন্যে মনোনীত হল। তারপর মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরলে সুধীর গর্জে উঠল: তুমি মদ খেয়েছ? বনছায়া বললে, তুমিই তো শিখিয়েছ মদ খেতে।

বনছায়ার উপন্যাসের প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হতেই পাঠকমহলে সাড়া পড়ল। কিন্তু সুধীর খুশি হতে পারল না। জানতে চাইল কোথায় বসে সে নতুন করে লিখেছে এবং কী উপায়ে ঘাপিয়েছে পীযূষ দত্তকে। বনছায়া বললে, অফিসে বসেই লিখেছে, আর যেহেতু পীযূষ দত্তের রুচি কিছু মোটা, তদবিরটা সে মোটা করেই করেছে। রাগে 'প্রবাহে'র কপি ছিঁড়ে ফেলল সুধীর আর তার অক্ষম ঈর্ষাকে ব্যঙ্গ করল বনছায়া। লেখাটা পড়ে হিমাংশু খুব উত্তেজিত হল। সুধীরকে ডাকিয়ে বলল, এ অশ্লীল লেখা বন্ধ করে দিন। শেষকালে আপনার নামের সঙ্গে জড়িয়ে আমার কার্মের না বদনাম হয়।

অফিসে বনছায়া অসুস্থ হয়ে পড়লে দেবজ্যোতি তাকে নিউটন নার্সিং হোমে পাঠিয়ে দিলে। দেবজ্যোতি বনছায়ার বাপের বাড়িতে খবর দিলে, খবর দিলে হিমাংশুকে। হিমাংশু সুধীরকে খবর দিল। সুধীর উদাসীন রইল। তার বিতৃষ্ণার কারণ পীযূষ দত্তের কাছে গিয়েছিল 'অবগুণ্ঠন'র প্রকাশ বন্ধ করে দিতে আর পীযূষ তাতে রাজি হয়নি যেহেতু বনছায়ার মতে স্বামী ও সংসারের চেয়েও তার আর্ট বড়। এই নিয়ে সুধীরের সঙ্গে বনছায়ার আবার ঝগড়া হয় আর সুধীর তাকে তার আর্টের গুরু সন্দীপ সেনের কাছে চলে যেতে বলে। নার্সিং হোমে হিমাংশু গিয়ে শোনে বনছায়ার অপারেশন হয়েছে কিন্তু গর্ভের সন্তান বেঁচে নেই।

নার্সিং হোমে অপারেশনের আগে ডাক্তারকে বনছায়া অনুরোধ করল যেন তাকে আর সন্তানধারণ করতে না হয়। ডাক্তার সেই রকম ছুরি চালাল। নার্সিং হোমে যতদিন ছিল বনছায়ার কোনো খোঁজ নেয়নি সুধীর। সন্দীপই সব দেখাশোনা করেছে। তারপর যখন ছুটি পেল বনছায়া সন্দীপের সঙ্গে সন্দীপের বাড়িতেই গিয়ে উঠল।

বনছায়া সন্দীপ সেনের বাড়িতে গিয়ে উঠেছে এ খবর পেয়ে হিমাংশু দারুণ ক্রুদ্ধ হল। প্রতিশোধ নেবার জন্যে সুবীরকে উত্তেজিত করতে লাগল। বলল আপাতত ডিভোর্সের মামলা করতে। ওদিকে সাবণি সুবীরের প্রতি প্রেমমুগ্ধ হল, চাইল গৃহিণী হতে। সেই স্বার্থেও তো বনছায়ার সঙ্গে বিবাহের বিচ্ছেদ দরকার। সুবীর গেল উকিলের পরামর্শ নিতে।

সুবীর বিচ্ছেদেরই মামলা করবে ঠিক হল। হিমাংশু অভিরামকে ডাকল সেই মামলায় বনছায়ার বিরুদ্ধে ব্যভিচারের সাক্ষী হতে। অভিরাম রাজি হল না। মামলার কথা সন্দীপ বনছায়াকে জানাল। এ মামলায় সুবীর ডিক্রি পেলেই তো সন্দীপের সঙ্গে বনছায়ার মিলন সুগম হবে। কিন্তু বনছায়া বলল, মামলা সে কনটেস্ট করবে।

সুবীরের মামলায় অভিরাম সাক্ষ্য দিতে রাজি হল না বলে অভিরামের চাকরি গেল। অভিরাম বনছায়ার কাছে কেঁদে পড়ল, বনছায়া যদি বোস সাহেবকে তার জন্যে একটু সুপারিশ করে ত তার চাকরিটা সে আবার ফিরে পায়। বনছায়া হিমাংশুকে ফোন করল। বনছায়ার অনুরোধে হিমাংশু অভিরামকে ফের চাকরি দিতে রাজি হল। হিমাংশু ভেবেছিল ধন্যবাদ জানিয়ে বনছায়া বুঝি আবার খোঁজ করবে, কিংবা জানাবে তার বর্তমান সমস্যার কথা। বনছায়া স্তব্ধ হয়ে রইল—একা ঘরে বসল মদ খেতে। আর তাই দেখে সন্দীপ তার কাছে বসল না, চলে গেল উপরে।]

দরকার নেই! নিজের মনেই নীরবে হাসল বনছায়া। স্বাদ জানা নেই, তাই দরকার নেই। সাধ্যের মধ্যে নেই, তাই দরকার নেই। কিংবা সাধ্যে কুলোয় না, তাই সাধু সাজা। বনছায়া গ্লাসে আবার চুমুক দিল। আনন্দ আবার কার অদরকার? কে বলবে আমার মুক্তভা ভয়ানক দরকার নেই?

একটানা লিখতে বা পড়তে কাঁহাতক ভালো লাগে? একটা সঙ্গী নেই—অন্তত মানুষ নেই। যে একজন আছে সে যেন আধখানা মানুষ। তার ভাবখানা যেন এই, আমি বদান্য হই তুমি কৃতজ্ঞ থাকো, আমি সম্রান্ত হই তুমি একটু সরে বসো। ভালোবাসার মধ্যে পূজার ভাব থাকবে এ বেশ বুঝি কিন্তু শ্রদ্ধেয়কে কেউ করতে পারব না সে তবে কেমন ভালোবাসা? যদি করজোড় করেই থাকতে হয় তা হলে আলিঙ্গন করি কী করে? তা হলে তো প্রতি মিলনের শেষে স্ত্রীকে স্বামীর পায়ের ধুলো নিতে হয়। সবসময়ে শুধু আইন আর শৃঙ্খলা, নিয়ম আর সংযমের সঙ্গে আপোস করে থাকা চলে? শুধু শ্রম, শুধু অধ্যবসায়, শুধু উচ্চাভিলাষই কি কারু সঙ্গী হবার যোগ্য? না হয় আরো একটু বাড়িয়েই বলি—শুধু দয়া, শুধু উদারতা, শুধু পরোপকার?

নইলে সন্দীপ যদি কাছে এসে বসত, একটু টেস্ট করে দেখত—বনছায়াও প্রথমে অমনি নিরীহ আস্বাদ নিতেই গিয়েছিল—তারপর বিন্দুতে-বিন্দুতে তপ্ত হয়ে উঠত—উন্মন-উদ্বেল—তাহলে দুজনে মিলে কত প্রাণময় সাহিত্যপাঠ করত, কত গভীর মদির কবিতা, কে জানে কোন না গান গেয়ে নেচে উঠত বনছায়া, তারপর সন্দীপ তাকে পাঁজাকোলে করে নিয়ে যেত উপরে। বুকটা আঁচ করতেই বনছায়ার হাসি পেল—তার সম্পূর্ণ ভার কি দু হাতে বইতে পারত সন্দীপ? বনছায়া আগের চেয়ে কত হালকা হয়ে গিয়েছে, তারপর মাতাল হয়ে গেলে সে তো আরো দুর্বল, আরো নিখিল—আর সন্দীপ তো যেমন পাহাড়

তেমনি পাহাড়। বেশ তো, একেবারে কোলে করে না হোক, বুকে করেই না হয় নিয়ে যেত হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে। নিয়ে গিয়ে তার শয্যায় আশ্রয় দিত, সন্দীপেরও তো তখন ঘুম চাই, আর অন্ধকারে ঘরদোর নীরন্ধ্র না হলে সেলে নিশ্চিন্ত-নিটোল ঘুম কোথায়?

হ্যাঁ, এও একটা সাধনা বৈকি। আর সিদ্ধির জন্যেই তো সাধনা। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে বনছায়ার পা টলবে নিশ্চয়ই কিন্তু সন্দীপকেও যে সে টলিয়ে দিতে পেরেছে এতেই তো সে চরিতার্থ।

উপরে না হয় নাই যেত সিঁড়ি ভেঙে। এখানেই না হয় ঘর অন্ধকার করে দিত। বনছায়ার বিছানাটা এমন কিছু বিস্তীর্ণ নয়। সেদিন তো প্রতিশ্রুতিতে স্ফীত হয়ে খুব দরাজ গলায় বলেছিল, তুমি আসবে কেন, আমিই তোমার ঘরে যাব, আমিই দরজায় খিল দেব। সামান্য একটু বসল না, দরজায় খিল দেবে! ভাগ্যিস সুধীর মদ খাওয়াটা শিখিয়ে দিয়েছিল, নইলে এই অপমানিত নিঃসঙ্গতা সে বইত কী করে?

অপমান ছাড়া আর কী! প্রথম দিন ফিরিয়ে দিল বিছানা থেকে, আর আজ এই ঘৃণা। এই প্রত্যাখ্যান!

রাগে আবার মদ ঢালল বনছায়া। এছাড়া তার আর আজ গতি কী, সাথি কে!

না, মদের দরকার হত না, বিন্দু-বিসর্গও না, যদি সন্দীপ তাকে তার সর্বব্যাপী অস্তিত্ব দিয়ে আচ্ছাদন করতে পারত। যদি পারত সে শুধু পুরুষ হতে। স্বশক্তিতে প্রকাশমান পরিপূর্ণ পুরুষ। তা নয়, সে চায় স্বামী হতে। নিয়মমাফিক মামুলি স্বামী। তার জন্যে এখন তাকে সাধছে বাদিনী হয়ে আদালতে যেতে, বিয়ে-ভাঙার নালিশ করতে। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলতে, আমার আগের স্বামীটা নষ্ট হয়ে গেছে, আমি এখন তার কবল থেকে ছাড়ান চাই যাতে আরেকটি হৃষ্টপুষ্ট স্বামীর আশ্রয়ে চলে যেতে পারি। ছি ছি, এর চেয়ে বড় কলঙ্ক আর কী হতে পারে? কোর্ট যখন জিজ্ঞেস করবে, আগের প্রেমের যে এত বড়াই করেছিলে সে বড়াইয়ের কী হল? আবার যখন নতুন বাঁধনে বাঁধা পড়তে যাচ্ছ সেটাই বা কদিনের মেয়াদ? এক স্বামী থেকে আরেক স্বামী ও এক বাবু থেকে আরেক বাবু—এদের মধ্যে তফাৎটা কোনখানে?

ছি ছি ছি, এর চেয়ে স্লিপিং পিল খেয়ে মরে যাওয়া ভালো।

তাই বলো, এখন সে কী করে? সংসার বলে কিছু একটা থাকলে টুকিটাকি না হয় তার পরিচর্যা করত। কিংবা শিশুটা থাকলে তাকে নিয়েই ভরে থাকত। তখন আর আবার কিসের প্রতীক্ষা! সিঁড়ি দিয়ে নিঃশব্দে নেমে কে এসে দরজায় খিল চাপায় তার জন্যে নয়, শিশুকণ্ঠে কখন মা-ডাক ফুটে ওঠে তার জন্যে।

তবে কি বলতে চাও বনছায়া এখন তার সেই অতীতের জন্য, তার মৃত শিশুর জন্যে শোক করবে? হাউ-হাউ করে কাঁদবে ছাতালের মত? বুক চাপড়াবে?

নিজের মনেই হেসে উঠল বনছায়া।

সে একা—একেবারে একা। আর এই তার একমাত্র পরিচয়। সে স্বয়ংপূর্ণা। সে শুধু লেখিকা—সে স্রষ্টা। তার স্বামীতে দরকার নেই সন্তানে দরকার নেই সংসারে দরকার নেই। সে আর বিয়ের কারাগারের মধ্যে প্রবেশ করতে প্রস্তুত নয়, বিয়ের বাইরে প্রেমের মুক্ত অঙ্গনই রৌদ্রস্নাত, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত। আর যার কিনা এত মাহাত্ম্য সে বিশ্ববিখ্যাত বিয়েও তো এখন মরণোন্মুখ। কেবল ভাঙচুর আর ভাঙচুর; কেবল রদবদল, কেবল বিপর্যাস। বড় জোর এই বিশে শতাব্দী পর্যন্ত আছে, কে জানে হয়তো তার আগেই এ প্রতিষ্ঠান উৎখাত হয়ে যাবে। যেমন জমিদারি গিয়েছে, মনসবদারি গিয়েছে, ধনতন্ত্র যাচ্ছে, তেমনি বিয়েও চলে যাবে।

এবার বেশি বনছায়া শব্দ করে হেসে উঠল।

ছি, পরিচারিকারা কী ভাববে! তার চেয়েও বড় কথা সন্দীপ না শুনতে পায়। মনের এই তো দোষ, মাত্রার মধ্যে নিজেও থাকতে চায় না, যে থাকে তাকেও রাখতে চায় না।

বিয়ে থাক বা না থাক, মাত্রা থাক বা না থাক, বনছায়ার সমস্যা কী। সে তো আর মা হচ্ছে না। তার তো অপারেশান হয়েছে। তাই তো তার আর মা হবার ভয় নেই। হ্যাঁ, ভয়—ভয় বৈকি, সেই ভয়েতে সে আর জন্ম হবার নয়। তাই তার পক্ষে স্বামী একান্ত অবান্তর। আর সংসার? সংসারের চেয়ে তার কেরিয়ার বড়, বড় তার বিত্তমত্তা।

যদি আমাকে কেউ ভালোবাসো নিশ্চয় আমাকেই ভালোবাসো। আমি কারু স্ত্রী নই, কারু মা নই, কোনো সম্পর্কের অনুগত নই। আমি শুধু বনছায়া। রাজাহীন রাজপুত্রহীন এক একাকিনী রাণী।

একটা ট্যাক্সি ডেকে এনে বেরিয়ে পড়লে কেমন হয়? কোথায় যাবে? কিসের অন্বেষণে? তারপর কোথায় ফিরবে, কোন ঠিকানায়?

উঠতে চেষ্টা করেও উঠল না বনছায়া। অপেক্ষা করতে লাগল।

পঁয়ত্রিশ

ডিনেই লাইনের জন্যে আরো কত দিন অপেক্ষা করল হিমাংশু, ক্রিং-ক্রিং সুরের কথা, সূচনার সেই টুং শব্দটুকু পর্যন্ত হল না। তখন সে লাবণিকে ডেকে পাঠাল।

দুদিন পরে টাকার জন্যে এমনিতেই তো লাবণি যেত, এত তড়িঘড়ি তলব হল কেন?

হিমাংশুর ফ্ল্যাটে এসে পৌঁছতে লাবণির গা কেমন ছমছম করে উঠল। আর-আর দিন তো বারান্দাতেই হিমাংশু তুলিয়ে থাকে, আজ দেখি বসবার ঘরটাও ফাঁকা। তবে কি সরাসরি বেডরুমেই ঢুকতে হবে? মিস্টার বোস কি অসুস্থ?

দ্বিধা করছে লাবণি, পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল হিমাংশু।

লাবণিকে দেখে খুশির তার দেখানো সুরের কথা, একটু বসতেও বললে না। ভঙ্গির রুক্ষতা দেখে মনে হল অসুস্থ নিশ্চয়ই।

'তোমার সুবীর শুভর খবর কী?'

কী রকম হকচকিয়ে গেল লাবণি। বললে, 'ভালোই তো আছেন—অফিস-টফিস করছেন।'

'সে আমি জানি। সে কথা জিজ্ঞেস করছি না। বলি তার সঙ্গে মেলামেশা করছ?

'আপনি যেমন বলেছেন, করছি।' চোখে কাজলের মত লজ্জার রেখা টানল লাবণি।

'কদ্দূর এগিয়েছ?'

'যদ্দূর সম্ভব।' নিজেই উদ্যোগ করে চেয়ার টেনে বসল লাবণি।

'অসম্ভব পর্যন্ত এগোলেই বা আপত্তি কী? বলি, ওর মধ্যে তোমাকে বিয়ে করবার আকাঙ্ক্ষাটা জাগাতে পেরেছ?'

'তাই তো মনে হয়।'

'মনে হয়? মিথ্যে কথা।' হিমাংশু প্রায় ফেটে পড়ল।

'মিথ্যে কথা?'

'মানে বাজে কথা। আকাঙ্ক্ষা যদি জেগেছে তো ডিভোর্স সুটটা ফাইল করে না কেন? আগের বিয়েটা না ভাঙলে তো তোমাকে বিয়ে করতে পারে না।'

'সে তো সবাই জানে। তবে—'

'তবে—তবে আবার কী।' হিমাংশু প্রায় মুখিয়ে উঠল।

'তবে শুনতে পাচ্ছি ওর স্ত্রী নাকি মামলা করছে।'

'ওর স্ত্রী মামলা করছে। তার মানে?' একমুহূর্ত বিমূঢ় হয়ে রইল হিমাংশু।

'তাই তো শুনছি।'

'স্ত্রী মামলা করছে সুবীরের বিরুদ্ধে, সুবীর তোমার পক্ষে লিখে বলে?'

'বিচ্ছেদ একপক্ষ নিলেই হল।'

'নিলেই হল! তাই বলে সুবীর অমর থাকবে? তার স্ত্রীকে তার এক লেখকবন্ধু লোপাট করে নিয়ে গেল সে স্বামী হয়ে তার প্রতিবিধান করবে না? উল্টে তার নিজের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের চার্জে ডিক্রি হতে দেবে? সে কি একটা নপুংসক? বিচ্ছেদের পর তুমি এই ক্লীবটাকে বিয়ে করবে?'

অল্প হেসে সাবণি বললে, 'আপনি জানেন আমি ওকে বিয়ে করব না—আমার শুধু অভিনয়।'

'কিন্তু সেই অভিনয় তুমি মোটেই জমাতে পারোনি।' হিমাংশুর চোখে-মুখে এখনো ঘোর বিরক্তি: 'তোমার পার্ট ছিল তুমি তাকে এমনভাবে লুব্ধ করবে যে তোমাকে বিয়ে করবার জন্যে সে ক্ষেপে উঠবে। এমনিতে না হোক, শুধু তোমাকে পাবার আশায়ই সে ডিভোর্সের মামলা করবে। কিন্তু তোমার অভিনয় মোটেই জোরদার হচ্ছে না, একেবারেই না। অথচ আমি কিনা সমীর সাহার নতুন ছবিতে তোমাকে দ্বিতীয় নায়িকার পার্ট দিতে সুপারিশ করলাম।'

'সত্যি?' আনন্দের প্রাবল্যে সব অস্বস্তি ভুলে গেল সাবণি। জিজ্ঞেস করলে: 'কী বই? নাম কী?'

'কী জানি কী এক 'অবচেতনা'। আমি এখনো পড়িনি। সমীর সাহার খুব ঝোঁক।'

'হ্যাঁ, শুনেছি বইটার নাম। দারুণ বই। কে এক মেয়ের লেখা।'

'হতে পারে।' হিমাংশুর কণ্ঠস্বর এখনো নির্মম: 'আমি লেখিকায় ইন্টারেস্টেড নই, আমার আগ্রহ অভিনেত্রীতে। কিন্তু তোমাকে তো ঐ পার্টটা দেওয়া যায় না—অভিনেত্রী হিসেবে তুমি দাঁড়িয়ে গেছ। সুন্দর মুখ আর সুন্দর শরীর হলেই চলে না, সিনেমায় চাই আবার একটু অভিনয়ের ক্ষমতা। সে ক্ষমতায় তুমি যে এত নিঃস্ব তা আগে বুঝি নি। নইলে একটা ফাঁকা বাড়ি আর আলো কর্তৃত্ব পেয়েও তুমি ঐ হতচ্ছাড়াটাকে বাগেন করতে পারলে না? বিয়ে তো পরের কথা, সামান্য মামলাটা ফাইল করাতেই বারোটা বাজালে? তোমার তো প্রেমিকার পার্ট। তুমি তো কাঁদবে-কাটবে, কাকুতি-মিনতি করবে, বলবে তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারছি না, আমাকে শিগ্‌গির স্ত্রীত্বে নিয়ে চলো।'

'আমি এখনো চেষ্টা করছি। বারোটা বাজেনি এখনো।' মুখ ম্লান করে বললে সাবণি।

'কিন্তু এখনো তার গড়িমসি কেন? তোমার অভিনয়ে যদি পদার্থ থাকত তাহলে এতদিনে সে আদালত থেকে ডিক্রি নিয়ে আসত। তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে স্ত্রীর মামলার জন্যে অপেক্ষা করত না। সে মামলা কি সে লড়বে না ছেড়ে দেবে?'

'জানি না।'

'জানো না, কিন্তু নিজে সে মামলা করছে না কেন সেটা জানো?'

'বলে, ডিক্রি হয়ে গেলেই ধনছায়া ঐ লেখককে বিয়ে করবে। ওদের বিয়ে যাতে না হয় তারই জন্যে ওর চুপচাপ থাকা।'

'বা, চমৎকার। তেমনি—কী নাম বললে—মনছায়াও ভাবতে পারে মাসলায় ভিজি হয়ে গেলেই সুবীর ঐ কিন্তী—বা, ইংরেজিতে বললে, 'ক্রিবজি' মেয়েটাকে বিয়ে করবে—কী দরকার ওদের সুখ বাড়িয়ে? খাসা! কোনো পক্ষেই ডিভোর্স নেই, বিয়েও নেই—এর নাক কেটে ওর যাত্রা ভাঙানো, ওর নাক কেটে এর যাত্রা ভাঙানো। ফালাও ব্যবস্থা—দুদিকেই সখের প্রাণ গড়ের মাঠ।' তিরস্কারে ঝাঁজিয়ে উঠল হিমাংশু: 'ওরা ওদের নাক কাটতে চায় কাটুক, তোমার কেন কান কাটা যায়? বলি টাকা-পয়সা দেয় কিছু?'

'দেয়।' চোখ নামাল সাবিত্রি।

'কত?'

'সামান্য।'

'কি, দশ-বিশ?'

'না, না, তার চেয়ে বেশি।' কষ্টে একটু হাসল সাবিত্রি: 'আর তো বেশি নয়, কোত্থেকে দেবে?'

'ও:! ওর জন্যে এত মায়া—কোত্থেকে দেবে! বেশ—' হিমাংশু নিমেষে কঠিন হয়ে গেল: 'এবার থেকে তোমার মাসোয়ারাটা ওর কাছ থেকেই নিয়ো, আমি আর দিতে পারব না।'

সাবিত্রির পায়ের তলা থেকে মেঝেটা হঠাৎ সরে গেল, চারদিক অন্ধকার দেখলে। বিবর্ণ মুখে বললে, 'আপনি—আমি—ও—' কথাটা কী ভাবে আরম্ভ করবে সূত্র খুঁজে পেল না।

'তুমি যখন ওকে দিয়ে ওর প্রাক্তন বিয়েটাই ভাঙাতে পারলে না অথচ ওর সঙ্গে লেগে রইলে, তার মানে তুমি ওর রিসট্রেন হয়েই থাকতে চাও। সে ক্ষেত্রে আমি আর টাকা দেব কেন? সব টাকা ও দেবে।'

সাবিত্রির কণ্ঠস্বর আর্দ্র হয়ে এল: 'যদি বলেন তো আমি ওকে ছেড়ে দিই।'

'সে তুমি জানো। আমি বলতে পারি আজ থেকে আমি তোমাকে ছেড়ে দিলাম। তুমি যে অভিনেত্রী হিসেবে এত ওয়ার্থলেস তা জানতাম না। আমি আমার মাড়োয়ারী পার্টনার কেশোপ্রসাদের সঙ্গে সিনেমা প্রডিউস করব বলে ঠিক করলাম, সবচেয়ে নির্ভীক ডিরেক্টর সমীর সাহাকে এনগেজ করলাম, সমীর সাহা দিট-বই 'অবন্ধনা' সিলেক্ট করল, আর আমি কিনা সেকেণ্ড হিরোয়িন হিসেবে তোমাকে রেকমেণ্ড করলাম। তোমার কিনা এই নমুনা!' হিমাংশুর মুখ থেকে ধিক্কার বর্ষণ লাগল: 'তুমি আবার সিনেমায় নামবে!'

দু হাতে মাথার দু পাশ চেপে ধরল সাবিত্রি। বললে, 'আমাকে আর কটা দিন চান্স দিন। টাকাটা এখুনি বন্ধ করবেন না। আপনি জানেন তো আমাদের পরিবারের কী অবস্থা।'

'আমিই বা তোমাকে কত দিতাম। আগে দুশো, ইদানীং তিনশো। কিন্তু সিনেমায় একটা হিরোয়িন হয়ে উতরোতে পারলে তোমার কত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। তারকার মত উজ্জ্বল! তা নয়—শেষে কিনা একটা কেরানির জন্যে দুর্বলতা! কোত্থেকে দেবে! আচ্ছা, কী দরদ! দেখ না কোত্থেকে দেয়!' বলে উঠে পড়ল হিমাংশু।

এবার বুঝি সাবিত্রিকেও উঠে পড়তে হয়। কিন্তু ওঠবার মত যেন শক্তি নেই শরীরে। পা দুটো মনে হচ্ছে যেন খুঁজে পাচ্ছে না। স্বরে এখন তাই আর মিনতি ছাড়া কিছু ফোটাতে পাচ্ছে না।

বললে, 'আমাকে আপনি ছেড়ে দেবেন না। সমীরবাবুকে বলবেন আমাকে শিখিয়ে নিলে আমি পার্ট ঠিক করে দিতে পারব।'

'শত শেখালেও তুমি পারবে না। তোমার মধ্য থেকে ঠিক এক দুঃস্থ গৃহস্থ মেয়ে বেরিয়ে পড়বে। পারলে তো এখানে সুবীরের বেলায়ও পারতে।'

'দেখুন এবার পারি কিনা।' মুহূর্তে সাবিত্রির পায়ে জোর এসে গেল, উঠে পড়ল ঝটকা মেরে:

'সমীরবাবুকে কিন্তু বলবেন আমার কথা। তারপর তো স্বপ্নের কথা ছোট্ট একটা ঝোনাকি হতে পারলেও অনেকখানি।'

'তারকাই বলো বা ঝোনাকিই বলো সবই বহ্নিকণা। এ আগুন ঘর পোড়াবে, পর্দা পোড়াবে, জীবন পোড়াবে। কেরানি বা তার রস কাউকেই রেয়াত করবে না। বললে কিনা, কোত্থেকে যেবে। যেবে কেন, আদায় করে নেবে। কানে ধরে ওঠ-বোস করাবে। কানে ধরতে আবার মায়া কিসের!'

'ঠিক আছে।' সুস্থির দন্তপংক্তিতে হাসল লাবণি।

মুহূর্তে হিমাংশু নরম হয়ে গেল। লাবণির চিবুক ধরে একটু আদর করে বললে, 'লক্ষ্মী মেয়ে। এমন ভাজা ঝোরালো মুখ পর্দায় কটা এসেছে? এই নাও, ড্রয়ার খুলে টাকার প্যাকেটটা বের করল হিমাংশু 'তোমার প্যাকেটটা নিয়ে যাও।'

'দুদিন পর দিনের দিন এসে নিয়ে যাব।'

'আজ তো নাও, দুদিন পরে আবার এস।'

কত দুদিন গেল—লাবণি তো ডাকলেও আসে না-ডাকলেও আসে, কিন্তু ডিরেক্ট লাইনে সে কণ্ঠস্বর আর ভেসে এল কই?

অভিরামকে ডাকল হিমাংশু। তাকে চাকরিতে বহাল করবার পর অভিরাম নিজে গিয়ে বনছায়াকে প্রণাম করে এসেছে, কিন্তু বনছায়া হিমাংশুকে একটা খবরও পাঠায়নি। তবু অভিরামের মতে বনছায়া নাকি 'এমন ভালোটি আর হতে নেই।'

বনছায়ার কাছে সেই থেকে অভিরাম মাঝে-মাঝে যায় আসে, খবরাখবর করে। অনেক বাইরের কাজ অনায়াস হাসিমুখে সম্পন্ন করে দেয়। আর বোস-সাহেব জানতে চাইলে যেটুকু সম্ভব খবর শোনায়।

'তোমার মা-র খবর কী?' হালকা চালেই জিজ্ঞেস করল হিমাংশু।

'খবর ভালো নয়।'

'ভালো নয়?' আয়ুল চমকে উঠল হিমাংশু: 'কেন, কী হয়েছে?'

'কিছু হয়নি। সেদিন সন্ধের সময় গিয়ে দেখলাম মা একা বেজার মুখে বসে আছেন। আমাকে দেখে বললেন, তুমি আজ এস অভিরাম। কোনো কাজ নেই।'

'এতে খবর ভালো না হবার কারণ কী?' হতাশ হল হিমাংশু: 'শুধু-শুধু একটা ধারণা করে নিলেই হল!'

'ধারণা নয়, দেখলাম, মা গ্লাসে করে কী খাচ্ছেন—'

'খাচ্ছেন—কী খাচ্ছেন?'

'অপরাধ নেবেন না, সন্ধ্যেবেলা আপনি যা খান—'

'কী, মদ?' হিমাংশুর চোখ দুটো জ্বলে উঠল।

'হ্যাঁ, তাই তো মনে হল। গ্লাসে রঙিন জল, পাশে সেই রকম বোতল—'

'তোমার মা মদ ধরেছেন?'

'কী জানি কী, বুঝতে পাচ্ছি না।' অভিরাম কপাল চুলকোল।

'সঙ্গে উপরের সেই ভদ্রলোক নেই?'

'কই তাঁকে তো দেখলাম না।'

'নেশাটা একটু জমুক, পরে তিনি আসবেন। তাই তো তোমাকে তাড়াতাড়ি ভাগিয়ে দিলেন।'

'কী জানি কী, বুঝতে পাচ্ছি না।' অভিরাম কান চুলকোল।

'তোমার মা তো সমস্ত ভালোর ভাণ্ডার—এই মদটা এল কোত্থেকে? যোগান কে?'

'আর বলবেন না। ঐ সুবীরবাবুই ধরিয়েছেন।'

খুব ভালো করেছেন। মনে মনে পরম তৃপ্তিতে হাসল হিমাংশু। সে সুবীরকে ধরিয়েছে, সুবীর আবার তার স্ত্রীকে ধরিয়েছে। এই তো চাই। এবার তবে আস্তে-আস্তে রাস্তায় এসে দাঁড়াক। দেবজ্যোতি ভৌমিক, তার বল, তাকে দেখুক।

তার চাকরিটা কবে যাবে?

হিমাংশু সমীর সাহাকে খবর দিল। এবার একদিন ফোন করে গিয়ে হাজির হোন। প্রস্তাবটা পেশ করুন।

'আপনিও চলুন।' সমীর পিড়াপিড়ি করতে লাগল।

'আমি প্রডিউসার, আমার নেপথ্যে থাকাই ভালো।' হিমাংশু আত্মগোপন করতে চাইল।

সমীর বনছায়ার অফিসে টেলিফোন করল। প্রস্তাব শুনে তো বনছায়া আটখানা। হ্যাঁ, আসবেন একদিন।

একদিন নয়, আজই সন্ধ্যায় যাব। এ সব ব্যাপারে সময়কে ঘুমুতে দেওয়া ঘুরের কথা, ঝিমুতে দেওয়াও ঠিক হবে না।

বাড়ি ফিরেই বনছায়া সন্দীপকে বললে উচ্ছ্বসিত হয়ে। এ সমস্তই তোমার কৃতিত্ব। তোমার পুরস্কার। কথাবার্তার সময় তুমি উপস্থিত থাকবে। তুমি ছাড়া আমার হিতৈষী আর কে আছে?

'নিশ্চয়ই থাকব। দেখব যেন না ঠকো।'

সমীর সাহা বনছায়ার নামে একটা এক হাজার টাকার চেক এনেছে। এটা এমনি একটা ভূমিকা। চূড়ান্ত কন্ট্র্যাক্ট পরে হবে। আংশিক টাকা পাচ্ছেন আপনি একটা কাঁচা রসিদ দিন।

সন্দীপ খোকাল, এতে আপত্তির কিছু নেই। বনছায়া রসিদ দিল।

'আসল আপত্তি হবে আপনারা যখন বইয়ের অদল-বদল করবেন।' সন্দীপ বললে, 'যখন শিব গড়তে বাঁদর গড়বেন।'

'আমরা কখনো কখনো বাঁদরকেও শিব বানাই।' সমীর বললে হাসতে-হাসতে।

'দেখুন এ-সব ব্যাপারে আমার কোনো প্রেজুডিস নেই।' বনছায়া বললে তৃপ্ত স্বরে, 'আমি নতুন লেখক, আমার প্রথম বই। আমি সিনেমার বুঝি কী। আমি মনের চোখে দেখি, আপনারা ছবির চোখে দেখেন। তাই আপনারা ছবির খাতিরে ইচ্ছেমত রদবদল করবেন—কিন্তু দেখবেন যা আমি বলতে চেয়েছি তা যেন ঠিক ফুটে ওঠে।'

রদবদলের বিষয়ে এই শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, বনছায়াকে জানিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করে সিনারিয়ো লেখা হবে।

'খুব ভালো।' আপোষের ভঙ্গিতে সন্দীপ রায় দিল।

'কিন্তু আলোচনাটা হবে কার সঙ্গে?'

'আমি তো থাকবই কিন্তু যাঁরা টাকা দিচ্ছেন তাঁদেরকেও বাদ দেওয়া যাবে না।'

'তাঁরা কে?'

'একজন মাড়োয়ারী ব্যবসাদার, তিনি এসবে নাক গলাবেন না। আসল কর্তা দ্বিতীয় পার্টনার।'

'তাঁর নাম কী?'

'মিস্টার হিমাংশু বোস।'

[ক্রমশঃ

গল্প ভারতীর পাতা থেকে

দাদুর রোমান্স

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে ১৩৫২ সালে 'দাদুর রোমান্স' নামে একটি গল্প গল্প ভারতীতে প্রকাশিত হয়েছিল। লিখেছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত লেখকদের অন্যতম নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তখনো তাঁর খ্যাতির শীর্ষস্থান অধিকার করেন নি। তিনি বিগত পঁচিশ বছর ধরে বহু গল্প ও বেশ কয়েকখানি উপন্যাস গল্প-ভারতীতে লিখেছেন সাহিত্য মূল্যায়নে সেগুলিকে নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর লেখা বলা যায়।

১৩৫২ সালের বৈশাখ মাসে গল্প-ভারতীতে লেখা গল্প 'দাদুর রোমান্স' একালের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে সম্পূর্ণ নূতনতর। তাই সেই গল্পটি গল্প-ভারতীর পুরাতন পাতা থেকে সংগ্রহ করে পাঠকদের সামনে তুলে ধরে আমরা আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু স্বর্গত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতির প্রতি আমাদের গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করলেম।

—সম্পাদক গল্প ভারতী

দীনবন্ধু দাদামশাই বললেন, কি ভায়া আজকাল যে দেশের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই রাখতে চাও না। বলি, সাহেব হয়ে গেলে নাকি?

আমি বললাম, ভুল করলেন দাদু। সাহেবরা বরং দেশকে অনেক বেশী ভালবাসে। হোম রুইট হোমের কথা মনে পড়লে তাদের আর মাথা ঠিক থাকে না।

গড়গড়ায় একটা হালকা টান দিয়ে দাদামশাই মিষ্টি তামাকের গন্ধ ঘরময় ছড়িয়ে দিলেন। সাদা কালোয় মেশানো ভ্রু জোড়ার নীচে দুটি প্রখর চোখ স্নিগ্ধ কৌতুকে জল জল করতে লাগল। বললেন, তা হলে ব্যাপারটা কি? 'বিশ্বজগৎ আমারে মারিলে যে মোর আত্মপর?' শুনলাম নাকি আজকাল তুমি মাঝে মাঝে গল্পটল্প লেখো?

বললাম তা লিখি। সম্পাদকেরা পাতা ভরাবার জন্যে ছাপে। কিন্তু কেউ পড়ে না দাদু। কেউ যদি হঠাৎ ভুল করে পড়ে ফেলে তা হলে সে অনুতাপ করে।

গড়গড়ার নল নামিয়ে দাদামশাই হেসে উঠলেন। বললেন করে নাকি? তা হলে তো ঠিকই করে। তোমরা কি আজকাল গল্প লিখতে পারো ভায়া? তোমাদের পৃথিবী থেকে গল্প ফুরিয়ে গেছে। শুধু রয়েছে ফুটবল, কিউ আর কালো-বাজার। মানুষের জীবনের দুঃখ তো আছেই, প্রত্যেক দিনই তা ভোগ করতে হচ্ছে। কিন্তু সেটাকে ফলাও করবার কি দরকার? লোকে সাহিত্য পড়ে আনন্দ পাওয়ার জন্যে নিজেকে ভোলবার জন্যে, কেবল খোঁচা খাওয়ার জন্যে তো নয়।

বললাম, হঠাৎ অনেক কথা এসে ফেলেছেন দাদামশাই। এটা যে যুগের দাবী। সাহিত্যের সংজ্ঞা যে কি—

দাদামশাই বাধা দিলেন, থামো রঞ্জন, থামো। তোমরা আজকালকার ছেলে, চার চাপটে পাশ দিয়েছ, তার ওপরে কলেজের মাষ্টার। তোমাদের সঙ্গে তর্ক করে আমরা পারবো কেন। শুধু একটা কথা জিজ্ঞাসা করব দাদা। তোমার গল্প সম্বন্ধে আমার দিদিমণি কি বলে?

—আপনার দিদিমণি? তার কথা আর বলবেন না। আমি গল্প লেখাতে বসলেই যাই ভেঙে, তারপর—

তারপর দুহাতে তোমার গলা জড়িয়ে ধরে মুখের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলে, ওসব ছাই পাঁশ থাক এখন, তার চাইতে আমাকে একটা—কেমন এই তো?

—আপনার চিত্রনিগুলি কিন্তু আপত্তিকর দাদু। দাদামশাই উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠলেন—না, তোমাদের কালের সঙ্গে আমাদের কালের আর মিল ঘটল না রঞ্জন। আমাদের বয়স যত বাড়ে, মনে তত বেশী করে রং লাগে। আর কুড়িতে পা দিতে না দিতেই তোমরা হয়ে ওঠো টাক-মাথা মাষ্টার, একটু খানি চটুলতা বরদাস্ত করতে পারো না। আচ্ছা ভায়া?

—বলুন।

—মনে কর পূর্ণিমার রাত। পৃথিবী ধুয়ে গেছে শরতের জ্যোৎস্নায়। বাইরে থেকে ফুলের গন্ধ আসছে। তুমি আর দিদিমণি আছো ছাদের ওপরে। ঠিক সেই মুহূর্তটায় একটা Programme দাও দিকি।

—আপনিই বলুন।

—আচ্ছা শোনো! তুমি দিদিমণিকে বলবে, ওই যে চাঁদটা দেখা যাচ্ছে, ওর মধ্যে রোমান্টিক কিছুই নেই। ওটা হচ্ছে, স্রেফ বিশুদ্ধ পাথর আর মরুভূমি। ওর আলোটা ধার করা। ও হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের প্রতীক। বাইরে থেকে ছিমলাভ করে মনেহয় আর কাছে এসে দেখা যায় খালি দারিদ্র্য আর রিক্ততা। অতএব ওই চাঁদকে দেখে একটা শিক্ষালাভ করা গেল। সেটা হচ্ছে এই যে জীবনটা নিছক deceptive—তাতে আশা নেই, আনন্দ নেই, ভালবাসা নেই। সুতরাং এসো কমরেড, দুজনে মিলে একটা দুরন্ত কাজে লেগে যাই। কেমন এই তো?

আমি হাসলাম, অতটা গম্ভীর এখনো হয়ে উঠতে পারিনি। তবে এটা ঠিক যে চাঁদের আলোয় এখন আর উহু উহু করে বুক চেপে ধরতে হয় না, কিংবা গায়ে ফোসকাও পড়ে না। কিন্তু আপনাদের কালের কথাই বলুন।

—আমাদের কাল? সেকি ব্যাখ্যা করবার দরকার আছে? তোমার দিদিমা আর আমি হয়তো সমস্বরে গান জুড়ে দিতাম। অবশ্য চাপা গলাতেই—বাড়ীর কেউ শুনতে না পায়। সে গান শুনলে তোমরা এখন কানে হাত দেবে হয়তো, নিতান্তই নিধুবাবুর টপ্পা।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম আপনাদের কালটাই ভাল ছিল বলে মনে হচ্ছে।

—বোধহয়। তোমাকে আমার সেই প্রেমের কাহিনী বলেছিলাম মনে পড়ে। তোমাদের যা কিছু রোমান্স বিয়ের আগে, তিনদিন পরেই ফিকে মেরে যায়। কিন্তু আমাদের সময় সর্দা আইন পাশ হয় নি তো, পাঁচ বছরের কমে বউ ঘরে নিয়ে আসতাম। তারপরে বয়েস বাড়ত আর আস্তে আস্তে চোখে রঙ ধরত। আজকালকার ছিপিছিপে বড্ড হিসেবী, ঘরে ঢুকতেই মোজা খোলার পর্ব সুরু হয়, নয়তো দুধের দাম নিয়ে গয়লার সঙ্গে ধাপে মল্লযুদ্ধ। কিন্তু—দাদামশাই থামলেন। তারপর একবার তাকালেন দেওয়ালের দিকে। বড় অয়েল পেন্টিংটার গায়ে ছিপিমার শান্ত সুন্দর মুখখানা হাসছে—আজ বারো বছর হ'ল পৃথিবীর মায়া কাটিয়েছেন তিনি। পলকের জন্ত মনে হ'ল দাদামশাইয়ের চোখের কোণ দুটো যেন চক্‌চক্ করে উঠছে।

বহুদিন পরে বেড়ে ফিরেছি। এমন রামজাদা গাঙুলি বাড়ী আমাদের, অথচ এখন শ্মশানের মত খাঁ খাঁ করছে। কেউ থাকে না বাড়ীতে! চাকরী বাকরীর খাতিরে বাংলা বিহার আসামের নানা জায়গাতে ছড়িয়ে পড়েছে। অপরিসীম একটা শূন্যতার মধ্যে মনটা হু হু করে ওঠে। যতক্ষণ বৈর্ষে কুলোয় পুকুরে মাছ ধরি আর বাকী সময়টা এসে আড্ডা দিই দীনবন্ধু দাদামশাইয়ের খানে। গ্রামের মধ্যে এই একটা মানুষ সরলতায় আর সজীবতায় যে টল টল করছে, আর একমাত্র যার সাথে আমার মন মেলে।

গড়গড়ায় কয়েকটা সুদুমন্দ টান দিয়ে দাদামশাই বললেন গল্পের কথা বলছিলে। আচ্ছা দাদা এমন গল্প কেন লেখো না যাতে মিষ্টি হাসি হালকা আনন্দ? যার ভেতরে জীবনটা শুধু সাপের মত হিংস্রই নয়?

বললাম, আপনি জমিদার, মন্বন্তরের দিনেও সুখেই আছেন। কিন্তু আমাদের মত রেশনকার্ড নিয়ে কন্ট্রোলের দোকানে ছুটতে হলে বুঝতে পারতেন। মিষ্টি করে লিখতেই তো চাই, কিন্তু একখানা কাপড়ের জন্তে যখন আট ঘণ্টা ধরে কিউ করতে হয়—

দাদামশাই বললেন তাই হয়তো হবে। তোমাদের জীবন থেকে গল্প বোধহয় ফুরিয়েই গেছে। হয়তো পুনিমা রাতে ছিপিমণি তোমার বুকে মাথা রেখে আবেগ বিহ্বল স্বরে বলে না—না। অগ্নিমূর্তি হয়ে গর্জন করে, রেশন কার্ডের কোটায় যে চিনি ছিল, তা দুদিনের মধ্যেই ফুরিয়েছে, অতএব সপ্তাহের বাকী পাঁচ দিন চা বন্ধ।

—সত্যি দুঃসময় যাচ্ছে তাহলে। যুদ্ধের আগুনে এবারে যখন পর্যন্ত ভস্ম হয়ে গেছে কি বলো? 'কর্পূরঃ ইব দগ্ধোঽপি শক্তিমান্তো জনে জনে' নয় নিজেই কর্পূরের মত দগ্ধ হয়ে গেছে।

—সেজন্তেই তো আধুনিক লেখায় 'রতি-বিলাপ' শুনতে পাচ্ছেন দাদু।

—রতি বিলাপ? না শৃগাল-বিলাপ?

আমি হেসে ফেললাম—আপনি আধুনিক সাহিত্যের নিন্দে করছেন?

—নিন্দে? সর্বনাশ। দাদামশাই তাকিয়া ছেড়ে সোজা হয়ে উঠে বসলেন—'তোমাদের যৌবন জল-তরঙ্গ রোধিবে কে' ভাই? তোমরা প্রাণ খুলে যা খুশি লেখ। কিন্তু একটা কথা আমি বলবই। তোমাদের যুগে গল্প নেই, তোমাদের যুগে প্রেমও নেই। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে তা শেষ হয়ে গেছে। আজ বঙ্কিমের বই পড়ে তোমরা বলো রোমান্স, তোমরা বল এমন হতে পারে না। হতে যে পারে না কি করে জানলে? বঙ্কিম যে যুগের কথা লিখেছেন সে যুগে তোমরা তো জন্মাও নি।

—কিন্তু আপনার দিদিমণি অপেক্ষা করছিল। সে সারাক্ষণ সূর্যমুখী আর ভ্রমরের মতো উৎসুক হয়ে আছে যখন কুন্দনন্দিনী কিংবা রোহিণী এসে দেখা দেয়।

দাদামশাই বললেন, দিদিমণিকে ভাল মানুষ পেয়েছ কি না, তাই তার নামে যা নয় তাই বলে বেড়াও। কিন্তু চাঁদ, তুমিই বা এমন কোন্ নগেন্দ্র দত্ত কিংবা গোবিন্দলাল শুনি?

বললাম, থাক দাদু থাক। আপনার দিদিমণির শ্রীকৃষ্ণ আর আপনাকে নিতে হবে না। তার একার পরাক্রমেই আমি হিমসিম্ খেয়ে যাই, তার সঙ্গে আপনি জুটলে তো।

অপরিমিত খুশি হয়ে উঠলেন দাদামশাই—কেমন তারা এইবারে পথে এলো। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অবধি চোখের জলে বুক ভাসিয়ে কূল পেলেন না তো রজন শর্মা কোন ছার! ওদের টুকটুকে রাঙা পা ছাড়া তোমাদের আর গতি আছে নাকি!

—শেষ কথাটা কিন্তু বঙ্কিম থেকে চুরি করলেন দাদু।

—করলাম নাকি? উপায় কি বলো। তোমাদের যেমন রবিঠাকুর ছাড়া গতি নেই, আমাদেরও তেমনি বঙ্কিমই সম্বল ছিল! তাছাড়া বঙ্কিমের গল্প আমাদের জীবনে একেবারে মিথ্যাও ছিল না তাই। আমি নিজেই তার প্রমাণ পেয়েছিলুম।

গল্পের গন্ধে আমি নড়েচড়ে বসলুম: বলুন দাদু, বলুন। চাকর এসে গড়গড়ার কলকেটা বদলে দিয়ে গিয়েছিল। অম্বুরী তামাকের মাদক গন্ধে ঘরটা আকুল হয়ে উঠেছে, আর বাইরে দেখতে পাচ্ছি সিঁড়ির নীচেই একটা সোনাপঞ্চার গাছ ফুলে ফুলে একেবারে বিশেহারা হয়ে গেছে। একটা রক্ত ভোমরা তার নীল রঙের পাখা আমার কানের কাছে বার কয়েক কাঁপিয়ে উড়ে গেল। খালের দিক থেকে ভিজে ঠাণ্ডা বাতাস এসে দুলিয়ে দিচ্ছে দাদামশায়ের শুভ্র চুলগুলোকে। সুন্দর শান্ত পৃথিবীতে যেন অপরিসীম ভালবাসা আর স্নিগ্ধতা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

দিদিমার ছবিখানার দিকে একবার তাকালেন দাদামশাই।

—আমার শ্বশুরমশাইয়ের নাম বলেছি তোমাকে? কালীকান্ত সেন শর্মা। যেমন নাম, তেমন শক্তিমান পুরুষ। বাঘ আর ছাগলকে একঘাটে জল খাওয়াতেন। তোমার দিদিমার নাম দিয়েছিলেন বন্ধুতারা, তোমাদের এখনকার আইডি রায় আর সুলতা সেন যা উচ্চারণ করতে কিট হয়ে পড়বে।

—অতিশয়োক্তি হ'ল দাদু।

—গল্পে একটু বলান দিতে হয় ভায়া, উকিলের মত অমন জেরা কোরো না।

—আচ্ছা বলে যান।

—সেই বাপেরই তো মেয়ে। যেমন জেদী, তেমনি একরোখা। যা ধরবে তা করে ছাড়বে। কতবার আমাকে আঁচড়ে কামড়ে যে বিব্রত করে তুলেছে ঠিক নেই।

—আপনি সয়ে যেতেন?

—পাগল? দাদু হাসলেন: তোমাদের মতো ধোপদুরস্ত ফিনফিনে ছুপে তো জন্মাই নি। চুল ধরে ধমাধম শব্দে কিলিয়ে দিতুম। আজকাল হলে হয়তো নারী নিগ্রহের রোমাঞ্চকর খবর হিসাবে বড় বড় হরফে কাগজে বেরিয়ে যেত। চাই কি তোমাদের মতো পরহিতব্রতীর দল আমার নামে এক নম্বর মামলাই রুজু করে বসতে।

আমি বললাম, সেটা আশ্চর্য নয়।

কিন্তু কাল আলাদা ছিল তাই। তুতবক্ষেই এক আধটু ধারবল প্রয়োগ না করলে কাব্য জমত না। গোঁফ-কামানো পুরুষ আর লতিয়ে পড়া মেয়েদের নিয়ে মেটো বায়োস্কোপে চকোলেট চিবোনোর কথা আমরা ভাবতেও পারতাম না।

—দাদু গল্পের চাইতে পরচর্চাটাই বেশী হয়ে যাচ্ছে।

—নাঃ তারা তোমার ওপরে ভরসা হারিয়ে ফেলছি। কালিদাসের মালিনীর মতো তুমি কখনো স্বর্গে যেতে পারবে না। পুর্বমেঘেই রয়ে যাচ্ছ, উত্তরমেঘে রসলোকে পৌঁছুবার জন্যে একটু পরিশ্রম করবে না?

—আচ্ছা বলুন?

তোমার সেই দিদিমা তো? বজ্রতারা তার নাম, একেবারে 'ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন'-এর অনন্যসাধু প্রতিবাদ। সেদিন জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছে, ঘরের মধ্যে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে, এমন সময় তোমার দিদিমা, অর্থাৎ সংক্ষেপে তারা হঠাৎ বিছানায় উঠে বসল। তারপর আবেগবিহ্বল কণ্ঠে বললে, গন্ধ পাচ্ছ?

—নাঃ বেশ ঘুমেছে দাদামশাই।—

দাঁড়াও তারা, একটু দাঁড়াও। তোমার মতো আমারও মনটা তখন বেশ কাব্য রসে থই থই করে উঠেছে। আমি বললাম, কিসের গন্ধ প্রিয়তমে?

—প্রিয়তমে!

—আলবাৎ প্রিয়তমে। কেন নয়? তোমাদের যাবনিক 'ডার্লিং' আর 'মন-আমি'র চাইতে প্রিয়তমা শুনতে খারাপ নাকি?

—অস্বীকার করছি না দাদু।

—আমি তোমার দিদিমাকে বললাম, কিসের গন্ধ তোমাকে ব্যাকুল করেছে প্রাণেশ্বরী? রজনী-গন্ধার!' তারা বললে, 'না, পাকা কাঁটালের!'

—পাকা কাঁটাল!

—হাঁ পাকা কাঁটাল। রজনীগন্ধা নয়, হাসনুহানা নয়, নিদেনপক্ষে কাঁটালি-চাঁপাও নয়, একেবারে বিশুদ্ধ পাকা কাঁটাল। শুনে আমি বললাম, প্রাণেশ্বরি, কাঁটাল খেয়েছে তাতে তোমার কি? এমন প্রাণ কাড়া জ্যোছনায় এসো আমরা দুজনে বরং চাঁদের গন্ধ শুঁকতে থাকি। তারা বললে, তোমার চাঁদ টাঁদ আমি বুঝি না। আমি কাঁটাল খাবো। তারি মিষ্টি গন্ধ, নিশ্চয় খাজা কাঁটাল।

আমি বললাম, দাদামশাই, আপনার এ গল্প এযুগে অচল।

—থামো যখন। শুনে যাও, বাধা দিয়ো না। আমি বিব্রত হয়ে বললাম, এই যাব যাস্তিরে তুমি কাঁটাল খাবে কি রকম? তা ছাড়া এখন বাগানেই বা যাবে কে।

তোমার দিদিমা বললে, কেন তুমি?

আমি খুশ হয়ে বললাম, হৃদয়েশ্বরি, তোমার জন্য সব করতে পারি, দরকার হলে প্রাণও দিতে পারি কিন্তু কাঁটাল আনতে পারব না। সকালে বরং যত খুশি—

তারা মাথা নেড়ে বললে, সকালে আমার কিছু চাইনে। আর প্রাণও তোমাকে দিতে হবে না, তা হলে আমি বিধবা হবো। কথা হচ্ছে এখুনি আমাকে কাঁটাল এনে দাও, নইলে কাল আমি বাপের বাড়ী যাবো।

ভেবে দেখো তারা আমার অবস্থাটা। এক কথাতেই চরম পত্র। অথচ কলটা হচ্ছে দুনিয়ার সব চাইতে কুৎসিত দর্শন—ভাবাচ্যাকা মোছের কাঁটা-ওয়ালা একটা বিকট ব্যাপার। কাব্যের নায়িকারা কখনো

কিন্তু খায় কিনা জানি না। যদি খায় তাহলে হয়তো একটি হাড়িচ-গীজ একটু আঙুর অথবা একটা মহুয়া কলা দাঁতে কাটে। আর আমার নায়িকা কিনা সেই চমৎকার মধু যামিনীতে কাঁটাল খাওয়ার বায়না ধরে বসল। রাত্রির কাব্যে দিঙ নাগের ঘুস হুতাবলেপ যাকে বলে।

—দিলেন কাঁটাল এনে?

—শোনই না। আমি বললুম, একা নয়, তাহলে দুজনেই বাগানে যাই চলো। দু-একবার আপত্তি করে অ্যাড্‌ভেঞ্চারের বেলায় তারাও শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে গেল। চোরের মতো পা টিপে টিপে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে দুজনে নেমে এলুম বাগানে। পাতায় পাতায় জ্যোৎস্নার ছবি আঁকা আমাদের এতবড় বাড়ীটা ঘুমে নিস্তব্ধ। শুধু বাবার ঘরে আলো জ্বলছে। রাত জেগে বোধহয় জমিদারী কাগজপত্র দেখছিলেন তিনি।

কোন্ গাছে কাঁটাল পেকেছে বুঝতে দেরী হ'ল না! মালকোঁচা মেরে গাছে উঠে পড়লাম। তারপর খুঁজতে খুঁজতে সেই গন্ধেশ্বরীর সন্ধান মিলল। বিরাট ওজনের কাঁটাল, অন্ততঃ সের পনেরো যে হবেই তাতে কোন সন্দেহ নেই।

অতবড় কাঁটাল নিয়ে গাছ থেকে নামি কি করে? ভাবতে ভাবতে বেই বোঁটা ধরে টান দিয়েছি অমনি সে এক কেলেঙ্কারী কাণ্ড। কাঁটালটা একটু বেশি মাত্রায় পেকেছিল, ফলের টানের সঙ্গে সঙ্গে বোঁটার মাথার শুধু মুখটা রইল ঝুলে, আর বাকীটা বিকট শব্দে আছড়ে পড়ল ঠিক তারার মাথাতেই। তারা তো এক প্রকাণ্ড চীৎকার করে কুপোকাৎ আর হৈ হৈ করে জেগে গেল সমস্ত বাড়ি। বাবা তাঁর ঘর থেকে হুঙ্কার দিলেন, আর আমি তৎক্ষণাৎ একলম্ফে পগার পার। বাড়ীর লোকজন এসে দেখে সারা গায়ে কাঁটালের রস আর আঠা মেখে তারা বোকার মত বসে আছে।

আমি বলেছিলাম, দাদামণাই, আপনি কাপুরুষ। অবলাকে ওভাবে ফেলে পালালেন?

—পালাব না? বাবার হাতে খালি খালি খড়মপেটা খাই আর কি! আর তা ছাড়া সত্যি বলতে কি ভাই, মনে মনে খুশিই হয়েছিলুম। যেমন মারমুখীকে যেখানা বায়নাক্কা, তেমনি বোকো তার ঠ্যালাটা।

কেলেঙ্কারী যা হওয়ার তা তো হ'ল। বাবা বললেন, 'বৌমা, কাঁটাল খাওয়ার এত ইচ্ছে হয়েছিল তো আমাকে বললেই পারতে। যাও এখন স্নান করে শুয়ে পড়ো গে। কাল সকালে কটা কাঁটাল তুমি খেতে পার দেখব।

প্রকাণ্ড একটা পাকা বিলিতী বেগুনের মতো মুখ করে তারা ঘরে এল। 'দেহি পদপল্লব' করেও সুবিধে করতে পারলাম না। পাশ-বালিশ আঁকড়ে সেই যে মুখ ফিরিয়ে রইল তো রইলই। আর তার সঙ্গে ফোঁস ফোঁস করে কান্না। একেবারে পুরোপুরি মন-কো-অপারেশন—পরেরদিন থেকে কথাই বন্ধ।

কিন্তু তারাও প্রতিশোধ নিলে। লুকিয়ে লুকিয়ে তখন তামাক টানা শিখছি, আমাদের বাড়ির মাঝি নাজির ছিল আমার দীক্ষাগুরু। ঢিলেকোঠার ছাতেসন্ধ্যার অন্ধকারে নাজির হুঁকো নিয়ে বসে থাকত আর আমি যথাসময়ে গিয়ে তার সঙ্গে যোগাযোগ করে তার ওয়াণ্টায় ম্যানের গুণকীর্তন করতুম। অর্থাদিষ্ট হিসাবে কথাটা তারাকে বলেছিলুম।

সেদিন সন্ধ্যার সময় যথানিয়মে তারাকের হুঙ্কার গলা শুকিয়ে উঠল। চুপি চুপি গেলাম ছাতের ওপরে। দেখি, নাজির বসে বসে নিজেই হুঁকো টানছে। আমি চটে বললাম 'হতভাগা, আমার আগেই হুঁকোটাও টো করে দিলি?

আর যাবে কোথায়! নাজির উঠে দাঁড়ালো। পা থেকে খড়ম খুলে নিয়ে ধাঁই ধাঁই করে বসাল আমার পিঠে। বললে, 'হারামজাদা, লুকিয়ে লুকিয়ে তামাক টানা শিখছ।' আমি শুধু খড়মাহত নয়, মন্ত্রাহত হয়ে মাটিতে বসে পড়লাম।

—নাজির মামলে খড়ম দিয়ে?

—আরে নাজির কোথায়? সাক্ষাৎ বাবা। ব্যাপারটা বিশুদ্ধ চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এর মূলে হচ্ছেন তোমার দিদিমা।

—যাক tit for tat! মন্দ হয়নি দাদামশাই।

দাদামশাই গড়গড়ার ধোঁয়া ছাড়লেন: তুমিও এই কথা বললে। কিন্তু আমার দোষটা কী, বলো। আমি তো আর মাঝরাতে কাঁটাল খেতে চাইনি, কিংবা তারার মাথায় যে কাঁটাল পড়েছিল, তার জন্যেও দায়ী নই। তবু কেন এই বিশ্বাসঘাতকতা!

বললাম, তা বটে। কিন্তু ঝগড়াটা মিটে গেল তো?

—মিটবে? কেন মিটবে? একি তোমার আধুনিক যুগ যে একটুখানি কৌল-কৌসানি আর দিদিমণিকে একটি চুমু দিলেই শেষ হয়ে গেল। আমরা সে যাতেই তৈরী হয়নি। খড়ম পেটা খেয়ে আমার সুপ্ত পৌরুষ সিংহের মতো গর্জন করে উঠল। বললে, প্রতিশোধ চাই, এর নির্মম প্রতিশোধ! এ অপমান নিয়ে বেঁচে থাকার চাইতে গাঙে ডুবে মরা অনেক ভালো।

—প্রতিশোধ নিলেন তা হলে।

—চেষ্টা করেছিলাম বইকি। কিন্তু 'বিধি যখন যায় কী করবেন বল রায়' জানো তো? যাক শোনো।

পরের দিন থেকে তেমনি অসহযোগ চলতে লাগলো। আগে ছিল এক তরফা, এখন দুপক্ষেই। এতদিন যে পাশবালিশ দুটো পায়ের কাছে পড়ে থাকত কিংবা থাকত খাটের নীচেই, তারাই এবার পরস্পরের বিরহ জ্বালা দূর করতে লাগল। যেন আমাদের কেউ কাউকে চেনেই না। তারা যেন একটা কলাগাছ আর আমি একটা নৌকোর বাদাম সারারাত জগদ্দল পাথরের মত চুপ মেরে পড়ে থাকি দুপাশে। তারা বোধহয় ছায়পোকার কামড়ে ঘুমুতে পারে না। আর আমি প্রাণপণে মশারির ভেতরে কল্পিত মশা মারবার চেষ্টা করি।

এ অবস্থা কতকাল চলত জানিনা, কিন্তু 'হেনকালে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশিলা পিতা।' বললেন, জানো, আমি বুঁচিকে (আমার শিসীমা) আর বৌমাকে নিয়ে কয়েকদিনের জন্যে রসুলগঞ্জের কাছারীতে যাচ্ছি। বৌমা কাঁঠাল খেতে ভালবাসে ওখানে অঢেল কাঁঠাল। তুইও একটু বেড়িয়ে আসবি নাকি? কোনদিন তো যাসনি।

আমি সোজা বললাম, না। তারপর ভীমরুল চাকের মত মুখ করে চলে এলাম।

রসুলগঞ্জে একটা নূতন জমিদারী কেনা হয়েছে কয়েকমাস আগে। শুনেছি মস্ত ফলের বাগান আছে—চমৎকার আয়গা। যাওয়ার লোভ আমার অনেকদিন থেকেই ছিল, কিন্তু বৌমার সঙ্গে কাঁঠালের যোগাযোগের কথা ভাবতে গিয়েই বেজায় খিঁচড়ে গেল। দুম দুম করে পা ফেলে শোবার ঘরে চলে এলাম।

তিনদিন পরে তারা এসে প্রথম সম্ভাষণ করলে:

কাল রসুলগঞ্জে যাচ্ছি।

আমি বললাম বেশ।

তুমিও চল না আমাদের সঙ্গে।

আমি স্বেচ্ছাস্বরে বললাম, না!

না কেন? রাগ হয়েছে! তুমি আমার মাথায় কাঁটাল ফেললে কেন?

আমি আরো চটে গেলাম। বললাম বেশ করেছি। তাই বলে তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করবে। তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই—যেখানে খুশি যাও।

এবার তারাও ক্ষেপে গেল; বটে, এত অহঙ্কার। যেদী চৌধুরাণীর সাগর-বৌ ব্রজেশ্বরকে দিয়ে পা টিপিয়ে ছিল, জানো?

আগুন হয়ে বললাম, আমি ব্রজেশ্বর নই।

ব্রজেশ্বর নও। আচ্ছা দেখা যাবে। যদি তোমার ঘাড় ধরে আমার কাছে টেনে নিয়ে যেতে না পারি তা হলে আমিও কালীকান্ত সেন শর্মার মেয়ে নই।

আমি বললাম, এ কাঠামো নয়। তারপর জুতোর শব্দে সিঁড়ি কাঁপিয়ে ছাতে চলে এলাম।

—বা হারামশাই, এযে রীতিমত নাটক জমে উঠেছে।

দীনবন্ধু হারামশাই একবার স্বপ্নাতুর চোখ মেলে তাকালেন বাইরের দিকে। গোলাপজামের মুকুলগুলো মধু আর গন্ধে যেন আকাশ পাতালকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। একটি প্রজাপতি উড়ে এসে দিদিমার অয়েল পেন্টিংটার উপরে বসল।

—তারা তো রসুলগঞ্জে চলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গেই দেখলাম আমার সব উৎসাহে মন্দা পড়ে গেছে। যতক্ষণ সামনে ছিল, ততক্ষণ ঝগড়া করেও একটা আনন্দ বোধ করতে পারতাম। কিন্তু কাছ থেকে যখন চলে গেল তখন মনে হ'ল আমি হেরে গেছি। একটা হিংস্র বিদ্বেষ আমাকে পীড়া দিতে লাগল। মনে হ'ল ও ইচ্ছে করে এই যন্ত্রণা আমাকে দিচ্ছে, যেমন করে হোক এর প্রতিশোধ নিতে হবে।

এক বাড়ীতে মনমরার মত ঘুরে বেড়াই। প্রতিশোধ নিতেই হবে। কিন্তু কেমন করে? রাত্রে ঘুমের মধ্যে অভ্যাসবশে বিছানা হাতড়াই পরক্ষণেই লজ্জায় অপমানে ভরে যায় মনটা। সে আমাকে এমন করে ছেড়ে গেল তার জন্য কিসের দুর্বলতা?

তবু কি মনকে মানাতে পারি তারা? বুকের ভিতর খাঁ খাঁ করে কান্না পায়। ভাবি ছুটে যাই রসুলগঞ্জেই। হাসছ! তা তো হাসবেই দিদিমণি যদি কখন এমন রাগ দিয়ে চলে যেত তা হলে টের পেতে।

—ছুটেই গেলেন শেষপর্যন্ত?

—উঁহু! ধিক্কার দিলাম নিজের দুর্বল মনকে। তারপর একটা মারাত্মক প্ল্যান নিয়ে খেললাম। মোহ-মুদ্গর তো পড়াই ছিল—'মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা'—স্মরণ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করলাম।

—সন্ন্যাস?

—যেক সন্ন্যাস। ঠাকুরঘর থেকে হাত সাফাই করলাম পিসীমার পেস্তা খান খানা। তারপর রাতের বেলায় সাংসারিক বেশ-বাস ত্যাগ করে পরলাম সেই কাপড়। একখানা কাগজে লিখলাম: গৃহাশ্রমে অরুচি ধরিয়াছে। এ সংসার শুধু আমড়ার ন্যায় আঁটি ও চামড়াসার, তাহাতে সারবস্তু কিছুই নাই। অতএব ব্রহ্মজ্ঞান লাভের নিমিত্ত আমি সন্ন্যাসী হইলাম। ইতি—শ্রী ১০৮ ব্রহ্মানন্দ স্বামী।

—একেবারে ব্রহ্মানন্দ?

—নিশ্চয়। জ্ঞানানন্দ, প্রেমানন্দ, ভজনানন্দ, ভোজনানন্দ এসব ছোটখাটো আনন্দ হয়ে আর লাভ কী। সন্ন্যাসী হলে একদম চূড়ান্ত করেই হওয়াই ভালো। 'ব্রহ্মকর্মসমাধীনঃ'।

—তারপর ব্রহ্মলাভ হ'ল নিশ্চয় ?

—হ'ল বই কি। বাড়ী থেকে রাত্রে 'তাতঃসৈকতে বারিবিন্দুসম' গাইতে গাইতে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে কিছু নেই ; শুধু সেই হুঁকোটা। শুনেছি সাধু-সন্তদের গাঁজা ছাড়া মনটা আকৃষ্ট হয় না। তা আমার তো আর নওগাঁ-ব্রাণ্ড্ অভ্যেস নেই, কাজেই বিকল্পে দা-কাটা।

ভেবেছিলাম নাজিরকেই সঙ্গে নিই, আমার হুঁকোর কাজ করবে। কিন্তু তামাক ট্রাডেডীর ব্যাপারে ও ব্যাটাও ছিল বড়যন্ত্রের মধ্যে। সুতরাং 'একলা-চল্‌রে'। সোজা ঘাটে চলে গেলাম, ছিলাম এক মাল্লাই নৌকা খুলে।

—কোথায় চললেন !

—তাকি আমিই জানি ভায়া ! সন্ন্যাসীর তো 'বসুধৈব' কাজেই যেখানেই যাইনা, মাধুকরী জুটবেই। বোটে বসে রইলাম ভাঁটার টানে নৌকো চলল। তারপর তরতর করে এসে নামল আড়িয়াল খাঁর জলে।

মস্ত নদী—অন্ধকার আর তারার আলোয় একটা বিশ্বয় বিচিত্ররূপ নিয়ে। নাচতে নাচতে ডিঙি চলে এল মাঝ গাঙে। একটা নৌকা নেই, কোথাও জনপ্রাণীর সাড়া নেই। শুধু কলকল করে জলের শব্দ আর ক্ষেপা বাতাস। এতক্ষণে ভয় করতে লাগল। মনে হ'ল সন্ন্যাসের চাইতে তারার কাছে গিয়ে মান-ভঞ্জনের ব্যাপারটাই বোধহয় ছিল ভালো।

কিন্তু আর তো উপায় নেই। ভুললে চলবে না আমি ব্রহ্মানন্দ। সংসারে কে কার। সবই তো মায়া প্রপঞ্চ। নশ্বর দেহ ধুলোতেই মিলিয়ে যাবে।

নেশাখোরের মতো নৌকাবেয়ে চলেছিতো চলেইছি। নদীর বাতাসে শীত ধরে গেল। এতক্ষণে আর একটা সত্যও বুঝতে পারলাম—খালি পেটেরাতেই কুলোয় না, সন্ন্যাসীর একটা কম্বলও সঙ্গে করা দরকার। তা পরের ভাবনা পরে হবে আপাতত এই রাতটা তো কাটুক।

কোথায় চলেছি জানি না। নৌকো নিজের খেয়ালে ভেসে চলেছে চোখ যখন ঘুমে জড়িয়ে এসেছে, হাত দুটো টনটন করছে ব্যাথায়, তখন আকাশে ভোরের আলো সোজা ছড়িয়ে ফুটে উঠল।

পাঞ্চ-ভৌতিক দেহ ধারণের বিড়ম্বনা যে অনেক তাতে আর সন্দেহ কি ? খিদের পেট চৌ-চৌ করছে। কিন্তু কোথায় খাবার মিলবে ? নদীর জলে তো কচুরিপানা ছাড়া আর কিছুই নেই। ভাবলাম কাছাকাছি একটা গ্রাম পেলেই বম্ বম্ শব্দে গালবাদ্য করে গোটা কয়েক শাঁসালো শিষ্য ছুটিয়ে ফেলব। তারপর একটা ব্যবস্থা হতে আর কতক্ষণ।

দুর্বলতা অস্বীকার করব না ভায়া, তারার জন্যে বুকের ভেতরটা কাঁদছিল। যে আমাকে সংসারে বিতরাগ করে দিয়েছে তাকে যে এতখানি ভালবাসি, একি আগে বুঝতে পেরেছিলাম তাহলে রসুলপুরেই চলে যেতাম। দূরছাই, সন্ন্যাস নেবার পর কেন এমন মোহ ? মনকে কষে ধমকে দিলাম। বুদ্ধদেব পেরেছেন, আমি পারব না ? নূতন উৎসাহে বুক ভরে গেল। জোরে জোরে বোটেতে টান দিলাম আর তার সুরে আবৃত্তি করতে লাগলাম : কপদিহসজ্জন সঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা—'

কিন্তু খিদের কষ্ট তো আর সয় না। পেটের মধ্যে যেন তিন তিনটে উনুন জ্বলছে। খাঁ খাঁ খাই খাই। সামনেই নাম না জানা গ্রাম। নৌকা ঘাটে ভিড়িয়ে ফেললাম, রওনা দিলাম গ্রামের উদ্দেশ্যেই।

কয়েক পা এগোতেই বড় একটা বাগান। আম আর কাঁটালের গাছ। হঠাৎ একটা মিষ্টি গন্ধে পেটটা চমকে উঠল। পাকা কাঁটালের গন্ধ।

কাঁটাল! তারার সেই কাঁটাল! মুহূর্তের জন্ত আনমনা হয়ে গেলাম, কিন্তু পেটের মধ্যে ব্রহ্মা তখন নাচতে সুরু করে দিয়েছেন। ভারতীয় পদ্ধতিতে নয়—একেবারে উদ্দাম হলাহলা ছন্দে। আর থাকা গেল না। কাঁটাল কাঁটালই সই। গাছে উঠে পড়লাম।

সবে পাকা কাঁটালটি খুঁজে বের করেছি—এমন সময় সেই দুবিষা জমি'! সুমিষ্ট স্বালক সম্বোধনে আত্মীয়তার আমন্ত্রণ জানিয়ে দুটি দাড়িওয়ালা মূর্তির প্রবেশ। হিড়-হিড় করে গাছ থেকে টেনে নামাল।

হাত জোড় করে বললাম, বাবা সকল, আমি সন্ন্যাসী—কিন্তু যবনে কি করে জানবে সন্ন্যাসীর মাহাত্ম্য! আমি যে এক নয় দুই নয়, একেবারে শ্রীশ্রীযুৎ ১০৮ ব্রহ্মানন্দ স্বামী সে কথা ওদের বোঝাবেই বা কে। কপালে চোরের মার ছিল খেতে হ'ল।

চোখের জলে বুক ভাসিয়ে ভাবলাম, সাধনার পথ বড় কঠিন—দুস্তর কণ্টকাকীর্ণ।

তবু কি রক্ষা আছে। যমদূত দুজন আমাকে বাবুর কাছে টেনে নিয়ে চলল। আমি সরোদনে দুর্গানাম জপতে লাগলাম। সন্ন্যাসের আরম্ভেই বুঝি জেল খাটতে হয়।

বললাম, কেন এত জুলুম! মাত্র একটা কাঁটালের জন্তে—

ওরা বললে একটাই তো। কেন তোমার বাবার গাছ নাকি?

কথাটার মধ্যে যে কি পরিমাণ irony আছে তাকি ওরাই জানত না আমিই কল্পনা করতে পেরেছিলুম।

দারোগাসাই থামলেন, গড়গড়ায় একটা টান দিয়ে বললেন, কেমন লাগল গল্পটা বলুন?

আমি ব্যাকুল হয়ে বললাম—বাঃ শেষ করলেন না তো?—

এখন বুঝতে পারনি? তাহলে বৃথাই সাহিত্যিক তুমি। টানতে টানতে একেবারে বাবুর কাছারীতে নিয়ে হাজির করল। বললে, হুজুর, এই চোর কাঁটাল চুরির জন্ত গাছে উঠেছিল—

বাবু আমার দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলেন: অ্যাঁ! এ কাকে ধরে নিয়ে এলি! এযে তোদের ছোটবাবু, আমার ছেলে!

হায়রে দুর্ভাগ্য, সন্ন্যাস নিয়ে শেষকালে রঘুলগঞ্জের ঘাটেই এসে ভিড়লাম। তাকিয়ে দেখি আলোর ফাঁকে তারার মুখ দেখা যাচ্ছে। আর তার চোখের দৃষ্টি! ভাষায় কি তার ব্যাখ্যা সম্ভব! আমি শুধু সীতার ভাষায় দেবী ধরিত্রীর কাছে সকাতরে প্রার্থনা জানাতে লাগলাম।

বাবা আর কি বললেন আমি শুনতেও পেলাম না। সেই লোক দুটি যে আমার দুপা জড়িয়ে ধরেছে সে খেয়ালও রইল না। আমার কানের মধ্যে তখন ঝিঁ ঝিঁ করে একটানা একটা তীব্র স্বর বাজছে।

আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠলাম: তারপরে দাদু তারপরে?

দাদু একবার ঘিঘিমার অয়েল-পেন্টিংটার দিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন। বললেন, প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হ'ল। পেটভরে কাঁটাল খেলাম। তারও পরে? সে তো রাত্রির কাব্য বুকে বুকে মুখে মুখে সন্ধিস্থাপন। সে গল্প না বললেও বুঝতে পারবে ভাই।

দেওয়ালের গায়ে ঘিঘিমার ছবিটা হাসছে। সুন্দর প্রসন্ন চোখ দুটি যেন জীবন্ত।

কিছু রঙ কিছু বেরঙ

ধারাবাহিক উপন্যাস

বিমল মিত্র

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ ৫ ॥

কম্যাণ্ডার হরবিলাস সিং ভালো করে চেয়ে দেখলে নিবারণ চক্রবর্তীর দিকে। বড় কদর্য্য বড় কুৎসিৎ মনে হলো লোকটাকে। এতদিন কম্যাণ্ডার হয়ে এই কদমতলীতে আছে, এখানকার অনেক লোকদেই সে দেখেছে, কিন্তু এই বুড়ো মানুষটার শয়তানির যেন তুলনা নেই।

নিবারণ চক্রবর্তী হুঁকোটায় আর একবার টান দিলেন। তারপর মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে হাসতে লাগলেন।

বললেন—টাকা ওমনি দিলেই হলো কম্যাণ্ডার সাহেব! মুখে অমন সবাই বলতে পারে! আমি ঠিক জানতুম মাস্টার আসবে না! আরে বাবা, অমন সবাই হ্যান্-করেঙ্গা-ত্যান-করেঙ্গা বলে বাজার মাৎ করতে পারে। ট্যাঁক থেকে টাকা বার করতে গেলেই লোক চেনা যায়—

বলে চক্রবর্তী মশাই আবার হুঁকোর টান দিলেন।

তারপর বললেন—আপনি তো সবে এখানে এসেছেন। আরো কিছুদিন থাকুন, তখন এখানকার সব ঘাটাকে চিনতে পারবেন। তখন বুঝবেন কদমতলীর একটা লোকও ভালো নয়—এই আপনাকে বলে রাখলাম। ওর বাপ সদাধর যে আমার বন্ধু ছিল। ওদের ঝাড়ে বংশে আমি চিনি। জানেন কম্যাণ্ডার সাহেব, মাষ্টার নিজের বৌটাকে পর্য্যন্ত ঠ্যাঙায়। এক একদিন আমি গিয়ে তবে মেয়েটাকে বাঁচাই। এদিকে বাইরের লোকের কাছে তো দেশ-সেবক হয়ে বসে আছে—

তারপরে একটু থেমে গলার স্বরটা নামিয়ে বললেন—তাহলে একটা কথা আপনাকে চুপি চুপি বলি, আপনি আর একটু কাছে সরে আসুন, কেউ শুনতে পাবে—

—বলুন—বলে কম্যাণ্ডার হরবিলাস সিং আরো কাছে সরে এল।

নিবারণ চক্রবর্তী যেন একটা খুব গোপনীয় খবর বলছেন এমনি গাম্ভীর্য্য নিয়ে বললেন—আপনি শুনে অবাক হবেন কম্যাণ্ডার সাহেব, ওই শশী মাস্টার এদিকে নিজের বউটাকে ঠ্যাঙায়, কিন্তু যত আদর সব সুখময়ীর বেলায়—

—সুখময়ী?

—আরে হ্যাঁ কম্যাণ্ডার সাহেব, তবে আর বলছি কী? সুখময়ীকে চিনলেন তো? তামাদপরের

সরকার মশাইএর মেয়েমানুষ! ওই যে ভাজনঘাটে এখন মিষ্টির দোকান করেছে। মুড়কি বাতাসা কদমার দোকান করে বেশ পয়সা জমিয়েছে—চিনলেন তো?

হরবিলাস সিং জিজ্ঞেস করলে—তা মাস্টারের সঙ্গে সুখময়ীর অত দোস্তি কেন?

—আবার কেন? বেওয়ারিশ মেয়েমানুষের সঙ্গে দোস্তি হবে না? নইলে ঘরের বিয়ে করা বাদ্‌কে কোনও লেখাপড়া জানা লোক ঠ্যাঙায়? আর তা ছাড়া, চোরা চালানির কারবারে মেয়েমানুষের সঙ্গে পুরুষ-মানুষ না থাকলে চলে? আপনি তো সবই জানেন কম্যাণ্ডার-সাহেব, আপনি হলেন বর্ডার কোর্সের খোদ কম্যাণ্ডার সাহেব, আপনার কি আর কিছু অজানা আছে? শুধু-মুধু আমার মুখ দিয়ে আপনি পাপ-কথাগুলো বলিয়ে নিলেন।

বলে একটা পৈশাচিক হাসি হাসলেন নিবারণ চক্রবর্তী।

তারপর বললেন—আসল জিনিসটা কি জানেন, এ-গাঁয়ে একটা ভালো লোক বলতে কেউ নেই। নইলে দেখুন না, পশী মাস্টার সকলের সামনে বড় গলা করে বলে গেল আপনার জামার দাম দিয়ে যাবে, তা অতই যদি অহঙ্কার তো আপনার কাছে সে এলেই পারতো! দেখুন তো, কথা দিয়ে কেমন কথা রাখার নমুনা?

হরবিলাস সিং বললে—কিন্তু মাস্টার সাহেব তো কথা রেখেছে—

—কথা রেখেছে মানে? আপনার কাছে এসেছিল সে?

হরবিলাস সিং বললে—হ্যাঁ, এসেছিল!

নিবারণ চক্রবর্তী যেন হকচকিয়ে গেল। কি উত্তর দেবে বুঝতে পারলে না। তারপর বললে—আর টাকা? টাকা দিয়ে গেল?

হরবিলাস বললে—টাকা দিতে এসেছিল কিন্তু আমি নিইনি। কুড়ি টাকা নিয়ে এসেছিল—

কথাটা বলে কম্যাণ্ডার সাহেব নিবারণ চক্রবর্তীর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

নিবারণ চক্রবর্তী বললেন—টাকা দিতে এল আর আপনি নিলেন না? আপনি তো কাজটা ভালো করলেন না কম্যাণ্ডার সাহেব—

—কেন?

—আরে, ও তো সব চোরাকারবারের টাকা, নিলেন না কেন?

হরবিলাস সিং বললে—চোরা-কারবার মানে? মাস্টার কি আবার চোরা-কারবার করে নাকি?

নিবারণ চক্রবর্তী হুঁকোটা মুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে বললেন—দেখুন কম্যাণ্ডার সাহেব, আমি পরনিন্দা করতে ভালোবাসিনে, আমার কথা আপনার যদি বিশ্বাস না হয় আপনি কদমতলীর আর পাঁচ জনকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। এ গাঁয়ের সবাই জানে ওসব কথা। সুখময়ীর দোকানে যে ওদের আড্ডা—

তারপর একটু থেমে বললেন—পাকিস্তান যখন হলো, তখন তো আপনারা জানেন নি, ওই সুখময়ী, ওই সুখময়ীই ছিল মাস্টারদের গুরু, ওর দোকানে আড্ডা বসতো। আর ওরা সবাই মিলে হাজার-হাজার টাকা কামাতো।

—কী করে কামাতো?

নিবারণ চক্রবর্তী বললেন—কামাতো বলছেন কেন কম্যাণ্ডার সাহেব? এখনও হাজার হাজার টাকা কামায়। ওপার থেকে গরু আসে, পাট আসে, সুপুরি আসে, আর এপার থেকে যায় মেওয়া,

কেরোসিন তেল—সব কিছু! আপনার কোর্ট তো এত পাহারা দেয়, কোনওদিন কাউকে ধরতে পেরেছে? বলুন, ধরতে পেরেছে?

হরবিলাস সিং বললে—না তো, ধরতে পারেনি। কদমতলীর কেউই কখনও ধরা পড়েনি—

—তাহলে বুঝুন, ওরা কত ন্যায়না! আপনারা তো নদীর ধারে পাহারা দিচ্ছেন, কোনও দিন ওদের ধরতে পেরেছেন?

হরবিলাস সিং সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললে—কিন্তু ঠাকুরমশাই ওরা যদি চোরা-কারবার করেই থাকে তো আপনার এত রাগ কীসের?

নিবারণ চক্রবর্তী বললেন—তা রাগ হবে না? কতকগুলো লোক বে-আইনি কাজ করবে আর আমি গাঁয়ের মাথা হয়ে চুপ করে বসে থাকবো?

কথার কথা যাতে। হরবিলাস সিং বুঝতে পারলে এই যাদুন মানুষটি বড় বে-সে লোক নয়। নিজের বাড়ি থেকে এতদূর হেঁটে এসেছে শুধু পরের সর্বনাশ করবার জন্যে।

লোকটাকে পরীক্ষা করবার জন্যে হরবিলাস সিং বললে—তাহলে একটা কাজ করবেন ঠাকুর মশাই, আপনি তো সব খবরই রাখেন, আপনি একটু আমাদের খবর দিতে পারেন কখন ওরা চোরা চালান করে? আপনি যদি ঠিক সময়ে খবরটা দিতে পারেন তো আমরাও গিয়ে ওদের হাতে হাতে ধরে ফেলতে পারি—

—কেন দেব না, নিশ্চয়ই খবর দেব। আপনাদের উপকার করবার জন্যে আমি সব সময়েই তৈরি—

হর বিলাস সিং বললে—তা হলে সেই কথাই রইল ঠাকুরমশাই, আমার এখন একটু কাজ আছে, আমি চলি—

বলে ক্যাম্পের ভেতরে ঢুকে পড়লো।

★

প্রথমে যখন পাকিস্তান তৈরি হলো তখন কদমতলীতে হর্ডার ফোর্স এসে পৌঁছোয়নি। কদমতলীতে হট করে আসাও বড় ঝক্‌মারির কাজ। আসবো বললেই আসা যায় না।

তখন ওই ওপার থেকে যারোয়ারি তলাতেই এসে জড়ো হয়েছিল সবাই। তারপর যে যেমন পারলে সেখানেই নিজের আস্তানার ব্যবস্থা করে নিলে। প্রথম প্রথম ক'দিন কালি ঘোষ নিজের শালার বাড়িতেই ছিল। বউ আর ছেলে মেয়ে নিয়ে উঠোনের একপাশে একটা চালা-ঘর বানিয়ে নিলে। মেয়েটা বড়, ছেলে ছোট। কালী ঘোষ শ্যামনগরে অত সম্পত্তি ফেলে রেখে চলে এসেছিল। কদমতলীতে এসে তার মনটা মাঝে মাঝে হু-হু করে উঠতো। বিছানায় শুয়ে মাঝে মাঝে সেই ক্ষেত-খামারের কথা মনে পড়তো। চোখের ওপর ভেসে উঠতো সেই বাড়ির উঠোনের পেঁপে গাছটার কথা। পাকল একটা নেবু গাছের চারা লাগিয়েছিল ভিটের পশ্চিম দিকে। সে-গাছে যোবহয় এতদিনে নেবুও হয়েছে। ভিটের মাটি গোবর বৃষ্টির জল পড়ে পড়ে সারা উঠোনে ছড়িয়ে যেত। তাতে গাছের বাড়-বাড়ন্ত হতো। আহা, শ্যামনগরের মাটি নয় তো যেন সোনা। যা কিছু পোঁতো তাতেই বাড়-বাড়ন্ত। ভগবান যে কী দিয়ে গড়েছিল শ্যামনগর কে জানে! কদমতলীতে পরের ক্ষেতে মজুরের কাজ করতে করতে একান্তে কালী ঘোষ চোখের জল মুছতো।

নিবারণ চক্রবর্তী মশাই ওদের ঘোষের মাচার ওপর বসে তামাক খেতেন আর কাউকে খেতে-আসতে দেখলে ডাকতেন।

—কে যায় ?

কালী ঘোষ বলতো—আজ্ঞে আমি,—

—আমি কে ?

—আজ্ঞে আমি কালী ঘোষ !

নিবারণ চক্রবর্তী বলতেন—ও, হুলে ঘোষের জামাই তুমি ? তা কী করছো এখন ?

—আজ্ঞে জন-মজুর খাটছি।

—কত করে রোজ পাচ্ছো ?

—আজ্ঞে দেড় টাকা !

নিবারণ চক্রবর্তী বলতেন—তা অনেক তো পাচ্ছো। এখন একটা বাড়ি-টাড়ি করো। আর কতদিন শালার বাড়িতে গলগ্রহ হয়ে থাকবে, আমার একটা ভিটে জমি আছে, কিনবে ?

কালী ঘোষ বলতো -আজ্ঞে কেনবার তো ইচ্ছে আছে ঠাকুরমশাই। তেমন যদি সস্তা-গণ্ডায় পাই তো আর শালার বাড়িতে থাকতে হয় না—

—কেন বলত কি তোমার আর নিজের বাড়িতে থাকতে দিচ্ছে না নাকি ?

কালী ঘোষ বলতো—আজ্ঞে কতদিন আর পরের বাড়িতে থাকবো।

নিবারণ চক্রবর্তী বলতেন—তাই হয় গো, তাই-ই হয়। বয়েস হলে বিয়ে-থা করলে মায়ের পেটের ভাই-বোনও পর হয়ে যায়। তা মনদ-ভাতে ঝগড়া সুরু হয়ে গেছে নাকি ?

কালী ঘোষ বলতো—ছিঃ ছিঃ ঠাকুরমশাই, তা কেন হবে। তবু ছেলে-মেয়ে তো বড় হচ্ছে, তাদেরও তো ব্যবস্থা করে রেখে যেতে হবে ! আমি আর ক'দিন—

বলে কালী ঘোষ যাবার সময় প্রণাম করে চলে গেল।

গুরুদেবের দোকানের মাচায় তখন বেশ আড্ডা চলছিল। কালী ঘোষ চলে যেতেই কেদার বললে—জানেন ঠাকুরমশাই, কালী ঘোষ এখন বেশ দুপয়সা জমিয়েছে—

নিবারণ চক্রবর্তী বললেন—তাই নাকি ? কীসে বুঝলি ?

—আজ্ঞে সেদিন দেখলুম গুরুদেবের কাছ থেকে দালদা কিনে নিয়ে গেল এক টিন।

নিবারণ চক্রবর্তী গুরুদেবের দিকে চাইলেন। গুরুদেব বললে—হ্যাঁ ঠাকুর মশাই, কেদার সত্যি কথাই বলেছে। একেবারে আস্ত একটা টিন কিনে নিয়ে গেল সেদিন—

নিবারণ চক্রবর্তী অবাক হয়ে গেলেন। সাধারণ গরীব লোক উদ্বাস্তু হয়ে এসে অবস্থা ফিরিয়ে ফেলবে এটা যেন তাঁর ভালো লাগলো না। এটা খারাপ লক্ষণ ! কদমতলীর সমস্ত লোক তাঁর কাছে এসে টাকা ধার করবে, সুদ দেবে, এইটেই তো স্বাভাবিক। যারা তা না করে তাদের ওপরেই সন্দেহ হয় নিবারণ চক্রবর্তীর। তবে কি চোরা-কারবার করছে নাকি কালী ঘোষ ! চোরা কারবার আর মহাজনি না করে পয়সা কামানো কি করে সম্ভব হয়—সেটা বুঝতে পারেন না নিবারণ চক্রবর্তী।

মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল নিবারণ চক্রবর্তীর।

বললেন - উঠি রে গুরুদেব, বেলা হয়ে গেল—

বলে উঠলেন বটে কিন্তু বাড়ির দিকে যেতে পারলেন না। যে কালী ঘোষ একদিন বাস্ত-ভিটে ছেড়ে সর্বস্বান্ত হয়ে কদমতলীতে এসে উঠেছিল, সে কিনা গুরুদেবের দোকান থেকে আস্ত একটা দালদার টিন কিনে নিয়ে গেল ? এটার একটা বিহিত করতে হয়।

লোক একেবারে দক্ষিণ-পাড়ায় গিয়ে হাজির হলেন নিবারণ চক্রবর্তী। বসন্তর বাড়ির সামনে গিয়ে ডাকলেন—বসন্ত আছিস রে, বসন্ত—

বসন্ত বাড়িতে ছিল না।

বসন্তর বউ মাথায় ঘোমটা টানতে টানতে মুখ চেকে সামনে এসে দাঁড়ালো, বললে—উনি বাড়ি নেই—

নিবারণ চক্রবর্তী বললেন—তাহলে বলে দিও, ঠাকুর-মশাই এসেছিলেন, বুঝলে ? আমি এখন চলনুম—

বলে নিবারণ চক্রবর্তী আবার বাড়ির দিকে চলতে লাগলেন।

★

ভাজনঘাটের মোড়েই সুখমতীর দোকান। এককালে শ্যামলদয়েও সুখমতী এমনি করে পসরা সাজিয়ে বসেছিল। তখন সুখমতীর বয়েস কম। মুখের হাসি আর হাতের কাজ ছিল আরো মিষ্টি। মাথার ওপরে তখন শ্যামাপদবাবু ছিলেন মুরুব্বি। বর্তমান নিয়েও ভাবনা ছিল না, আর ভবিষ্যতের কথা তো বুড়ো-বুড়িরা ভাববে। আমরা সুখের পায়রা, যখন তোমার সুসময় তখন তোমার। তারপর যখন তোমার দুঃসময় আসবে তখন আবার অন্য নাগর খুঁজিয়ে নেব!

কিন্তু কে জানতো একদিন এমন করে শ্যামাপদবাবু তাকে ফেলে চলে যাবে। আর হঠাৎ এমন করে যে শ্যামনগরটা পাকিস্তান হয়ে যাবে তা-ই বা কে কল্পনা করতে পেরেছিল ?

তখনও কিছু খুচরো খদ্দের ছিল সুখমতীর। তারা দোকানে আসতো-যেতো ঠাট্টা-মস্করা করতো। একদিন তারাও আর এলো না।

শেষ যেদিন শ্যামাপদবাবু রাত্রে এলো সেদিনও বাইরে থেকে ডাকলে—হারামজাদী, আছিস নাকি ?

সুখমতী পান সেজে তৈরি হয়েই বসেছিল। দরজার খড়কোটা খুলে দিয়ে বাবুর মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। মুখটা যেন কেমন গম্ভীর-গম্ভীর। পান মুখে দিয়েও বাবুর মুখে হাসি বেরোল না।

অন্যদিন কত মিষ্টি কথা বলে কত আদর করে কত রঙ-রস করে। সে-সব কিছুই করলে না সেদিন।

খানিক পরে শুধু বললে—উঠি রে—

সুখমতীও অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে—কেন ? এর মধ্যেই আজ উঠবে কেন ?

বাবু বললে—শরীরটা ভালো নেই—

শ্যামাপদবাবুর শরীর এমনিতে বড় খারাপ হতো না।

সুখমতী বললে—তার চেয়ে তুমি বিছানায় একটু শুয়ে থাকো না, আমি তোমার পা টিপে দিচ্ছি—

বাবু বললে—না রে, এ রোগ পা টিপলেও সারবে না, মাথা টিপলেও না।

সুখমতী হাসতে হাসতে বললে—তাহলে মনের রোগ বুঝি ? তা মনের রোগ সারাবারও ওষুধ আছে আমার কাছে! দেখবে ?

কিন্তু বাবুর তখন রঙ-রসিকতা ভালো লাগছিল না। একেবারে উঠে দাঁড়ালো। আর উঠে দাঁড়িয়েই সদর-দরজার দিকে চলতে লাগলো।

—সত্যিই চললে ?

সুখমতী পেছন-পেছন দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো।

বাবু তখনও এগিয়ে যাচ্ছে। সুখমতী তাড়াতাড়ি বলে উঠলো—তাহলে একটা কাজ করো, কিছু টাকা আছে নিয়ে যাও—

বলে ঘরের ভেতরে গিয়ে বাক্সর তালা খুলে একটা পুঁটলি বার করলে। তারপর সেটা এগিয়ে দিলে বাবুর হাতে।

বাবু পুঁটলিটা নিয়ে জিজ্ঞেস করলে—কত ?

—পাঁচশো টাকার মতন—

—ঠিক আছে—বলে বাবু অন্ধকারে রাস্তার দিকে পা বাড়ালো।

পেছন থেকে সুখমতী জিজ্ঞেস করলে—কাল আবার আসছো তো ?

—হাঁ।

এই শেষ আসা। শ্যামাপদবাবু এরপর আর সুখমতীর বাড়িতে আসেনি। শ্যামনগরের কেউই আর শ্যামাপদবাবুকে তারপর দেখতে পায়নি। অত বড় পাটের আড়ত, অতবড় মহাজনি কারবার, সব ফেলে রেখে যে শ্যামাপদবাবু পরিবার ছেলে-মেয়ে নিয়ে কোথায় চলে গেল কেউ তা জানতে পারেনি।

খবরটা সুখমতীর কাছেও এল। সাথ সঙ্গে আরো একটা খবর এল যে শ্যামনগর পাকিস্তান হয়ে গেছে। সবাই নাকি শ্যামনগর ছেড়ে ইছামতী পেরিয়ে কদমতলীতে চলে যাচ্ছে! সঙ্গে সঙ্গে যেন বজ্রাঘাত হলো সুখমতীর মাথায়! সেদিনই দৌড়লো বাবুর বাড়িতে। বাবুর বাড়ি তখন ফাঁকা। কিন্তু চণ্ডীমণ্ডপের ওপর তখন কয়েকজন বসে তামাক খাচ্ছিল। সুখমতীকে দেখে মকবুল এগিয়ে এল।

বললে—বড়বাবু তো চলে গেছে দিদিমণি—

—চলে গেছে ? কোথায় চলে গেছে ?

মকবুল বললে—কদমতলী—

—আবার কবে আসবে ?

—বাবু বলে গেছে আর আসবে না।

—আর আসবে না ?

মকবুলের মুখটা করুণ হয়ে উঠলো। যেন কাঁদো-কাঁদো ভাব। বললে—আমি কত করে বললাম—বাবু আপনি থাকুন, আমরা আছি, কোনও ভয় নেই আপনার। তা কিছুতেই বাবু শুনলেন না।

বললেন—টাকাকড়ি সম্পত্তি-টম্পত্তি সব কিছু রইল, যদি বেঁচে থাকি তো আবার আসবো।

—আমার কথা কিছু বলে যায় নি বাবু ?

মকবুল গলাটা খাটো করে বললে তোমার টাকাও আমার কাছে রাখা আছে মরহা দিদিমণি। বাবু তোমার টাকা তোমাকে দিতে বলে গেছেন। তোমার কত টাকা ?

কত টাকা সুখমতী বাবুকে দিয়েছে তার কি হিসেব আছে তার ? যখনই বাড়তি কিছু টাকা হাতে জমেছে কখনই তা সুদে খাটাবার জন্যে বাবুর হাতে তুলে দিয়েছে। ভেবেছে বাক্সর মধ্যে জমিয়ে রেখে কী লাভ। বাবু তো মহাজনি কারবার করেই। তার কাছে রাখলে তবু টাকা বাড়তে পারবে—

মকবুল সেই কথাই সবিস্তারে বলতে লাগলো। যাবার সময় কেউ-ই জানতে পারেনি এক মকবুল ছাড়া। গরুর গাড়িতে গেলে কেউ জানতে পারবে বলে একেবারে হাঁটা পথ ধরে বেড়াচাঁপার কাছে গিয়ে নৌকো ধরেছিল শ্যামাপদ সরকার। তা মকবুলের মত মানুষ ছিল বলেই অমন করে যেতে পেরেছিল।

নৌকোয় উঠে যখন বললে। শ্যামাপদবাবু তখন বলেছিল—তাহলে যাই মকবুল, সব জিনিসপত্তোর দেখা-শোনা করিস।

নৌকো ছেড়েই দিচ্ছিল, কিন্তু তখনই বোধহয় হঠাৎ সুখমতীর কথাটা মনে পড়ে গিয়েছিল।

বললে—আর একটা কথা মকবুল—

বলে মকবুলের কানে-কানে বলে দিয়েছিল—আর শোন, আমার আড়তের জিনিষ-পত্তোর যেচে যা পাবি তাই থেকে ময়রা দিদিমণিকে হাজার দশেক টাকার মতন দিস, আমার কাছে তার টাকাটা জমা ছিল—

সুখমতী শুনছিল সব।

বললে—তা টাকাটা আমাকে তুমি দেবে না মকবুল?

—কেন দেব না ময়রা দিদিমণি? পাটগুলো বেচে তোমাকে দিয়ে দেব। এ তো তোমারই টাকা। আমি তোমার টাকা নিয়ে কী করবো?

সুখমতীর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। মনে হলো চোখের সামনে যেন সব অন্ধকার হয়ে গেছে। এক মুহূর্তে তার নিজের সমস্ত অতীত জীবনটার কথা মনে পড়ে গেল! যেন পায়ের তলা থেকে মাটিটুকু পর্যন্ত সরে গেল তার।

—তাহলে আমি কী করবো মকবুল?

মকবুল বললে—তোমার কিচ্ছু ভয় নেই ময়রা দিদিমণি, পাকিস্তান হোক আর যাই হোক, আমি তো রইলাম, আমি পালিয়ে যাচ্ছি না। আমি রইলাম, ইব্রাহিম রইলো। আমরা থাকতে কে তোমার গায়ে হাত দেবে শুনি?

—কিন্তু আমার টাকাটা? আমার কাছে তো আর কিছু নেই মকবুল! আমার যে যথা-সর্বস্ব ওই টাকাগুলো। ওই টাকা না পেলে যে আমি পথের ভিখিরি হয়ে যাবো মকবুল!

মকবুল বললে—আমি তো বলছি টাকা তোমার মারা যাবে না, আমার কথা তুমি বিশ্বাস করছো না?

সুখমতীর মনে আছে সেদিন সেই সামান্য কৃষাণ মকবুলের সামনেই সে কেঁদে ফেলেছিল। এমন করে যে তার সারা জীবনের জমানো টাকা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, এ কি সে ভাবতে পেরেছিল!

কিন্তু কোথায় গেল সেই টাকা, কোথায় গেল সেই মকবুল! একদিন যে-বাড়ি বাবু নিজের মিস্ত্রী দিয়ে তৈরি করিয়ে দিয়েছিল, একদিন যে-বাড়িতে বহু রাত আরাম করে কাটিয়েছে, সেই বাড়ি ছেড়েই একদিন রাতের অন্ধকারে অনিশ্চিতের বুকে সুখমতীকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হলো। একেবারে এক কাপড়ে বাস্তহারা হয়ে এসে ওই কলমতলীর বারোয়ারিতলার আটচালার তলায় বসে অন্য অনেকের সঙ্গে খিচুড়ি খেতে হলো। লজ্জায় সেদিন তার মাথা কাটা গিয়েছিল। কিন্তু পেটের দায়, বড় দায়। বুড়ো নিবারণ চক্রবর্তীর কথায় তার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চাইছিল। কিন্তু তাকে রুখে করলো শশী মাস্টার!

শশী মাস্টার এসে জিজ্ঞেস করলে—এখানে তোমার কোনও থাকবার জায়গা আছে দিদি?

সুখমতী মুখ তুলে শশীর দিকে চেয়ে দেখলে।

শশী বললে—তোমার কিছু ভয় নেই দিদি, আমি তোমার ছোট ভাইএর মত। তোমার যদি কোনও আত্মীয় স্বজন থাকে, কোথাও যাবার জায়গা থাকে, তাও বলো, আমরা তোমাকে সেখানে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসতে পারি। আমরা সকলকেই যার যার আত্মীয় স্বজনের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি—

তখনও সুখমতী মুখ ফুটে কথা বলতে ভরসা পাচ্ছিল না।

অনেক অনুনয় বিনয় করবার পর বললে—আমার কেউ নেই ভাই, আমার আপনার বলতে কোথাও কেউ নেই—

শশীপদ জিজ্ঞেস করলে—তাহলে তুমি থাকবে কোথায়? এই আটচালায় তো বেশী দিন থাকতে পারবে না—।

তারপর নিজেই একটু ভেবে বললে—তুমি আমাদের বাড়ি থাকতে পারবে দিদি?

সুখমতীর চোখ দিয়ে আবার জল গড়িয়ে পড়লো। বললে আমাকে তোমার বাড়িতে থাকতে দেবে?

শশীপদ বললে—আমার আর থাকতে দিতে আপত্তি কী? তোমার ইচ্ছে হলেই হলো—

সুখমতী বললে—আমার কেন অনিচ্ছে হবে, থাকতে দিলে তো আমি বেঁচে যাই। আমি সর্বস্ব খুইয়ে শ্যামনগর থেকে প্রাণ নিয়ে চলে এসেছি, এই পরনের কাপড়খানা ছাড়া আর কিছু আমি সঙ্গে করে আনতে পারিনি—

—তাহলে তাই-ই চলো। আমার বাড়িতেই চলো—

বলে শশীপদ সুখমতীকে নিজের বাড়িতে নিয়ে তুললো।

লক্ষ্মী তো অবাক। লক্ষ্মী তখন একগাদা শাড়ি-ধুতি-পাঞ্জাবী নদী থেকে কেচে এনে বাড়ির উঠোনের দড়িতে শুকোতে দিচ্ছে। পরনের ভিজে কাপড় তখনও ছাড়া হয়নি। এমন সময় স্বামীর সঙ্গে এক অচেনা মেয়েমানুষকে দেখে চমকে উঠে মাথায় ঘোমটা টেনে দিলে।

শশী বললে—এই দেখ গো, কাকে এনেছি সঙ্গে করে—

তারপরে লক্ষ্মীর বিস্মিত দৃষ্টির সামনে সুখমতীর পুরো পরিচয়টা দিয়ে নিশ্চিন্ত হবার একটা ক্ষীণ চেষ্টা করে বললে—এই হলো শ্যামনগরের সুখমতী, আমার দিদি, আমাদের এখানেই থাকবে, হাঁড়িতে এরও চাল নাও আজকে। দিদি এবার থেকে এ-বাড়িতেই থাকবে—

লক্ষ্মী এ-কথার কী উত্তর দেবে হঠাৎ বুঝে উঠতে পারলে না। তারপর সামনে নিয়ে বললে—আসুন দিদি, আসুন—

শশীর তখন অনেক কাজ বাকি পড়ে রয়েছে বাইরে। সুখমতীকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েই আবার সদর হওয়া দিয়ে বাইরে বেরোতে যাচ্ছিল। পেছন থেকে লক্ষ্মী ডাকলে—ওগো, শুনছো—

শশী পেছন ফিরে বললে—কী?

লক্ষ্মী বললে—তুমি যে তোমার দিদিকে বাড়িতে এনে তুললে তো অত চাল কোথায় পাবো যে ভাত খেতে দেব?

শশীপদ অবাক হয়ে গেল।

বললে—কেন, বাড়িতে চাল নেই?

লক্ষ্মী বললে—তা চাল নেই কি না তুমি জানো না? ক'দিন থেকেই তো তোমাকে চালের কথা বলছি—

শশী যেন বিরক্ত হলো বউএর কথা শুনে। বললে—আমি আজকে খাবো না, আমার চালটা দিদিকে দিও। যেমন করে হোক তুমি একটা ব্যবস্থা কোর, আমি এখন চলি, আমার অনেক কাজ পড়ে আছে—

বলে আর দাঁড়ালো না শশীপদ। যেমন পা বাড়িয়ে ছিল তেমনি আবার চলতে লাগলো।

[ক্রমশঃ]

ফিরে ফিরে চাই

স্মৃতিচারণ

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

গ্রামের বাড়িতে আছি, আমাদের 'বৈতা' হবে—মনে আছে চৈত্রমাসের ১৯ তারিখ। হঠাৎ একদিন বিকালের দিকে কাকা এলেন অসুস্থ হয়ে। মাকে বললেন, 'বৌদি, তোমার কাছে মরতে এলাম, আমায় কে দেখবে এ অবস্থায়।' মা বললেন, 'ঠাকুরপো, কি অলুক্ষণে কথা এই বাধবেলায় বলছো? কতবার তো অসুখ করেছে, সারিয়ে তুলি নি? চলো উপরে।' আমরা কাকাকে ধরে উপরে নিয়ে যাই। সিঁড়ির পাশের বড় ঘরটায় মেঝেতে বিছানা করে দেওয়া হলো।

কাকা বাবার সহোদর ভাই। বাল্যকাল থেকে মেলেরিয়ায় ভুগতেন, তাই স্কুল কলেজে পড়বার সুযোগ সুবিধা পান নি। তবে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ছিল। কাকা 'প্রবাসী' নামে মাসিকের গ্রাহক ছিলেন—বাঙলাভাষায় সচিত্র ও বহুবর্ণ রঞ্জিত চিত্র এই পত্রিকায় প্রথম বের হয়। তখন আমার বয়স কত হবে, ছয় কি সাত বৎসর—তবুও মনে আছে কাশবনীর রাজসভা—শুক-সারীর ছবি, মনে পড়ছে মন্দির পথে এক নারীমূর্তি।

বাবার মাতুল-বাড়ির কিছু সম্পত্তি ছিল, সেটা তিনি কাকাকে দান করেন। সেই গ্রামে বসে তিনি চাষবাস দেখতেন, মাঝে মাঝে শহরে আসতেন তাঁর এক শাদা-পাটকিলে রঙের ঘোড়ার চড়ে। কাকা আদর করে আমাদের ঘোড়ায় বসাতেন কিন্তু ঘোড়ার গায় চামড়ার জিনের সঙ্গে মিশে যে উৎকট গন্ধ সৃষ্টি করতো, তা সহ্য করতে পারতাম না—একটু বসেই কাকাকে বলতাম নামিয়ে দাও।

গ্রামের শ্যামার বাড়িতে অসুখ হলেই কাকা শহরে আসতেন—সেবা করবে কে মা ছাড়া? একবার খুব বাড়াবাড়ি অসুখ। মহেন্দ্র ডাক্তার দেখছেন। শহরের একমাত্র এল-বি ডাক্তার। বয়স, মিট্‌মিটে ছাপোষা চেহারা—তবুও হাতযশ ছিল। কতরকম চিকিৎসা চলছে—আমাদেরই তাঁর মলমূত্র সাফ করতে হয় মাঝে মাঝে। কে পরামর্শ দিল মেহে ভোম ঢুকেছে, শনির ভোগ—স্বস্ত্যয়ন করালে ভাল হয়। বাবা এসব বিশ্বাস করতেন কিনা জানি না, তবে না বিশ্বাস করবার মতো মনোবল ছিল না। কাকার ঘরে শুরু হলো হোম, যাগ-যজ্ঞের তাণ্ডব। ব্রাহ্মণ পুরোহিত এলেন, সঙ্গে তার চেলারা। পূজা শেষ হলেই শনির ভোগ কেটে যাবে। ঘরে যজ্ঞের ধোঁয়ায় সবার দম বন্ধ হয়ে আসছে, এমন সময়ে পুরোহিত নাড়ি থেকে কি একটা বের করে ঘোষণা করলেন সব ঠিক হয়ে গেছে, বিষ বের করে দিলাম। বুজরুকি ধরার বুদ্ধির অভাব ছিল আমাদের।

আদিমকালের বিশ্বাস বহন করে চলেছি আমরা কিন্তু পাশ্চাত্য এলোপ্যাথি চিকিৎসা চালাই। প্রাচ্য আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় শ্রদ্ধা হারিয়েছি। আমরা এদুল-ওদুল দুদুল রুজা করতে গিয়ে মাঝ-দরিয়ায় ডুবে মরছি। না আছে ঈশ্বরে বিশ্বাস—সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা, না আছে বিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা। তাই আজও দেখছি তোষিনী তারা-মার কালিতলায় অজ-শিশু বলি দিয়ে রুগ্ন সন্তানের কপালে রক্ত তিলক দিচ্ছে ভক্তেরা এবং সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার সিংহ, ডাক্তার চৌধুরীর দাওয়াখানায় গিয়ে শিশুর দেহে ইন্‌জেকশন দেওয়াচ্ছে। যদি শিশু সেরে ওঠে মা'র কৃপায়, যদি মরে যায় পূর্বজন্মের পাপের ফল! এ ধরণের ভাবনা থেকে সে-কালের শিক্ষিতেরা মুক্ত ছিলেন না। প্রশ্ন: একালের শিক্ষিতরাই কি মুক্ত হয়েছেন?

এই রুগ্ন, ব্যাধিজর্জর দেহেও কাকারও বিবাহ হলো। হবেই না কেন? গুড়ি-পিসিমার বিবাহ হয়নি? বিকলাঙ্গ বিরল-কেশী অল্পাই-ভাষী, তাঁরও স্বামী জোটে—কালা, স্বল্পবুদ্ধি গল্পবিত্ত এক ঘংশজ ব্রাহ্মণ। তব মূলীন ঘরের বিকলাঙ্গীকে বিবাহ করে সমাজে এক ধাপ উঠলেন তিনি! মনে পড়ছে পিসেমশায় হাইচরণ ভট্টাচার্য আসতেন,—গুড়ি পিসিমার সেই বিকলাঙ্গ দেহে মনে কী উল্লাস! মা তাঁর বিরলকেশ সযত্নে বেঁধে দিতেন, ভালো একটা শাড়ি পরিয়ে দিতেন। আমাদের এখানকার গ্রামে এক বুড়ি বা বোবা-কালা মেয়ে ছিল, গ্রামের লোকে কোথা থেকে বোবা-কালা এক ছেলে এনে বিবাহ দিয়ে ছিল। শুনেছি তাদের ছেলেপুলেরা সবল সুস্থ হয়েছে, বোবা-কালা কেউই হয়নি।

কাকার বিবাহের সম্বন্ধ এলো উলো গ্রাম থেকে। তখন উলো বীরনগর যাবার রেলপথ নির্মিত হয়নি, নদীপথেই যেতে হয়। আমি কাকার সঙ্গে যাই 'মিত-বর' বা 'কোল-বর' হয়ে। বরের সঙ্গে ছোট কেউ যাওয়া ছিল রীতি। নৌকা করে সবাই চলি। বাবা বরকর্তা। নদীর ঘাট থেকে পালকি চড়ে কাকার সঙ্গে 'সর্বস্বী' পাড়ায়। কনের বাপ নেই। মা ও এক বিধবা দিদি। কাকিমার নাম গোপাল রাণী, দিদির নাম রামরাণী। যে বাড়িতে পৌঁছলাম, তা ভগ্নদশা প্রাপ্ত। মনে হলো ঘরটা বহুকাল বন্ধ ছিল—কী রকম একটা মিয়মান আবহাওয়া ও ইঁদুরের। কাকা শোভনায় গেলেন। আমিও সঙ্গে যাই। অভ্যর্থনার বিপুল ব্যবস্থা—প্রথমেই চোখে পড়লো রূপোর আলবোলায় তামাক দেওয়া হয়েছে। রাতে কখন বিবাহ হয় মনে নেই। পরদিন নূতন বৌদিদিকে দেখলাম—ছোট মেয়ে, খাড়া নাক, প্রশস্ত এলোড়া চোখ।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর নিচের তলার সেই দালান ঘরের লম্বা চৌকিতে শুলাম, আরও অনেকের সঙ্গে। মনে আছে ছোট একটি মেয়ে, পরণে রঙীন ডুরে, মাকে মলফ কানে মাকড়ি হাতে কাচের চুড়ি মাথায় একটি বেনী, আমার পাশে শুয়ে কত গল্পই করলো। নিঃসম্পর্কীয় মেয়ের পাশে শুয়ে এই প্রথম গল্প করার আবেশ। সে মেয়ে হয়তো কবে মারা গিয়েছে, হয়তো-বা অতি বৃদ্ধা হয়ে কোথাও বেঁচে আছে কিন্তু আমার মনে সেই সাত বছরের মেয়েটির অম্লান ছবিটি রয়ে গেছে।

বিবাহের পরদিন সবাই ফিরে এলাম। বৌদিদির সঙ্গে এলেন তাঁর দিদি রামরাণী। রামরাণী যেন গ্রামের সমস্ত যুবতী বিধবার প্রতিবাদ স্বরূপ অগ্নিশিখা। উত্তর-ভারতে তাঁরা থাকতেন সেইজন্য একবস্ত্রী হয়ে ঘুরে বেড়াতেন না, সেমিজ পরতেন। সরু কালো-পাড়ের সাড়ি পরতেন, হাতে ছিল সরু দু'গাছি সোনার চুড়ি। বাড়িতে কানাঘুসো যা শুনতাম, তার অর্থ তখন বুঝতাম না—এইটুকু শুনতাম বিধবা তার আবার অত সাজ কেন—সেমিজ কাদির কি ভদ্রঘরের মেয়েরা পরে? ছ্যাঃ।

লিখতে লিখতে ১৯১৭ সালের একটি ঘটনা মনে পড়ছে। আমরা থাকি তখন সিরিডির ক্যাপানেরুল্ কোয়ার্টার বারণ্ডায়। ছুটিতে বাড়ি এসেছি, দাদা বিয়ে করে এই বাড়িতে আছেন। বাইরের বারান্দায়

আমাদের আচ্ছা অবে। দেখা গেল সামনের বাড়িতে কলকাতা থেকে কারা 'চেন্জে' এসেছেন। সে বাড়ির বাইরে ইদারা—এটাই ও-অঞ্চলের রীতি, বাগানে জল দেবার সুবিধা হয়। প্রায়ই দেখি বাড়ির অল্প-বয়স্কা গৃহিণী একখানি বড় গোছের গামছা পরে এবং উপরাঙ্গে আর একটি গামছা জড়িয়ে সুরোতলায় স্নান করেন। আমরা লজ্জায় ঘরে ঢুকি—বাংলার প্রবাদ আছে 'বেশক্তির লাজ নেই, বেশক্তির লাজ' কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য। একদিন দাদা মাকে বললেন, 'মা, তুমি ওদের বাড়ি গিয়ে একটু বুঝিয়ে বলে এসো, এটা ভালো দেখায় না। মা গেলেন তাঁদের বাড়ি, বললেন সবকথা বুঝিয়ে। কলকাতার গৃহিণী বললেন, 'মা, সেমিজ কামিজ পরতে আমাদের লজ্জা করে। তবে আজকাল মেয়ে-বউরা লুকিয়ে লুকিয়ে পরে দেখি।' এই ঘটনার পর অর্ধশতাব্দী অতে দেখছি লজ্জা সরম প্রভৃতি সব আর সমাজে চলিত নেই। মিনিস্কার্ট মিনি শাড়ি, বিকিনী বেশ—নিরোধ সিনেমার পাতাভরা বিজ্ঞাপন।

বিবাহের পর 'অইমঙ্গলা' করতে কাকা গেলেন শ্বশুরবাড়ি—কাকীমা ও রামদাসীও ফিরলেন। সেই গেলেন তো গেলেন এরপর খুব কম দেখাশোনা হয়। কাকার সঙ্গে কোথায় কাকীমার একটা চাপা বিরোধ ছিল। আজ মনে হয় কাকার স্বাস্থ্য ভাল না থাকাই হয়তো কাকীমার ঔদাসীন্যের কারণ, নারী যা চায়, তা সে পুরোমাত্রায় পেতে চায়, না পেলে তার দেহ-মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তাই দেখতাম কাকা কচিৎ শ্বশুরবাড়ি যেতেন, বা কাকীমা তাঁর শ্বশুরবাড়ি অর্থাৎ আমাদের বাড়ি আসতেন। মেজো কাকীমার সঙ্গে যে শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল নিজের কাকীমাকে সেভাবে কোনোদিন পাইনি।

কাকা এবার দেশের বাড়িতে এলেন সভাই বৌদির কাছে মরবার জন্য। বাড়িতে আমরা দুই ভাই বড়দের মধ্যে মা ও দুটি। পাশের বাড়িতে কাকাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন কিন্তু তাঁদের সঙ্গে মুখ দেখাদেখি নেই, তাই কেউ এবাড়ি যাড়ান নি। মৃত্যু যে কী ভীষণ, তা এই প্রথম দেখতে হলো কাকার কাছে বসে বসে। কী সংগ্রাম! অন্তদেহের সঙ্গে অন্তদেহ উদ্ভূত শক্তির সংগ্রাম। কী প্রলাপ কী উন্মত্ততা। ওঠবার কী ব্যর্থ প্রয়াস। নিত্য সেবক দাদা ও আমি—মলমূত্রাদি পরিষ্কারে আছেন মা ও দুটি। ঘাম উঠলো, দেহের উষ্ণতা আস্ফালন স্তিমিত হয়ে এলো, সংগ্রাম চললো প্রাণ ও অপান বায়ুর। শেষমুহূর্তে গঙ্গাজল দিলাম। পালের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়লো। লোকবিশ্বাস মতে ঘরের থেকে বাইরের বারান্দায় এনে শোয়ালাম আমরা চারজনে ধরাধরি করে। সন্ধ্যার মুখে মৃত্যু হলো, সব সংগ্রাম শেষ হলো। সারা রাত দুই মড়া আগলে বারান্দায় বসে—মৃতের বিছানা জীবিতকে ছুঁয়ে থাকতে হয়। কী সব ঘোর হয় আলগা পড়ে থাকলে। মৃতের সৎকারের প্রশ্ন এবন। জনশূন্য গ্রাম শ্রাদ্ধের অর্থাৎ ব্রাহ্মণের শব ব্রাহ্মণ দিয়ে দাহ করাই রীতি। কিন্তু গ্রামে ব্রাহ্মণ কোথায়? পাঁচটা গ্রামে কে খবর পাঠাবে? বাবাকে পর্যন্ত খবর পাঠানো হয়নি। সৎকারের জন্য এলো চুহড়ী পাড়ার লোকেরা—পদা, পক্কা, অটল প্রভৃতি অজাত. অস্পৃশ্যের দল। খিড়কির পুকুরে দক্ষিণে কাঠাল গাছ তলায় কাকার মুখাগ্নি হলো। দাদা জ্যেষ্ঠ ছেলে বাড়ির, তাঁরই অগ্রাধিকার শাস্ত্রমতে। বারান্দা থেকে দেখলাম দাদা সবাধার ঘুরে পিছন দিয়ে খড়ের মুড়িতে আগুন ধরিয়ে মুখে সেই জলন্ত আগুন ছোয়াল। তারপর হরিধ্বনি করে চুনারীরা বাসুনের শব নিয়ে চলে গেল গঙ্গার ঘাটে।

বাবা আদালতের বারান্দা-উকিলীতে কাকার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে চলে আসেন গ্রামের বাড়িতে। মনে পড়ছে বাবা নিজের বারান্দায় একটা চৌকীতে কাঁদছেন, মা তাঁর হাটু ধরে ঝুলিয়ে কাঁদছেন, বলছেন, 'কতবার অসুখ নিয়ে এসেছিল, সারিয়ে তুলেছিলাম, এবার পারলাম না'।

পনেরদিনে ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধ। উনায় খবর গেল, কাকীমা ও রাধারানী এলেন। খুব যে কান্নাকাটি হলো তা তো মনে পড়ছে না। গ্রামের মেয়েরা আসা-যাওয়া করে, কী নিয়ে কানাকানি করে, কাকীমার ছেলেপুলে হবে কিনা তা নিয়ে আলোচনা হয়, তখনকার 'কল হয়েছে' ভাবলাম ছেলেপুলে হবে বুঝি। পরে তার মানে জানি—রজঃস্বলা হলে আর সন্তান সম্ভাবনা হয় না।

শ্রাদ্ধে গ্রামে চুহুরা ঘুষোরদের খাওয়ানো হয়—আর খাওয়ানো হয় এক অগ্রদানী ব্রাহ্মণকে। শ্রাদ্ধে দানের নিয়ম আছে সর্ববর্ণেই। হিন্দু সমাজে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণরা শ্রাদ্ধের দান গ্রহণ করেন না। শ্রাদ্ধে প্রেতের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত শ্রাদ্ধের দ্রব্য, প্রায়শ্চিত্তের দান, ভিলদান, বর্ষদান, সোনান প্রভৃতি গ্রহণ করেন এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণ হয়ে দান গ্রহণের অপরাধে তাঁরা সমাজে পতিত, অনাচার তাঁদের না হলেও শ্রাদ্ধ সম্পূর্ণ হয় না। অগ্রদানী ব্রাহ্মণ এলেন। দেখলাম তিনি প্রায় অস্পৃশ্য—রান্নাঘাটেও নয়, রান্নাঘরের নিচে উঠোনের একপাশে তাঁকে চর্ব্যচোষ্য খাওয়ানো হলো। শ্রাদ্ধের যোড়শ দেখেছি ধনীগৃহে পালঙ্ক বালিশ বিছানা বাসিন পিতলের তৈজসপত্র কত কী। কিন্তু হীন ব্রাহ্মণের ঘরে সেসব রাখবার স্থান কোথায়? তাই তিনি সেগুলি বাজারে বিক্রী করে দেন এবং হয়তো সেগুলি আবার নূতন সাজে অন্য শ্রাদ্ধোৎসবে দানসামগ্রী রূপে হয়।

সত্যমিথ্যা জানিনে নেপালের রাজার পিতার মৃত্যু হলে যে-ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধের দান গ্রহণ করেছিলেন, তাকে দেশাচার অনুসারে রাজ্য থেকে বের করে দেওয়া হয়। কারণ সে ব্রাহ্মণ হয়ে শ্রাদ্ধের দান গ্রহণ করেছে! তবে রাজকোষ থেকে যে ধনরৌপ্য, তৈজসপত্র সে পায় তাতে তার কেন তার তিন পুরুষের বংশধরদের পায়ের উপর পা তুলে চলে যাবে।

মেসের বাড়িতে বৌদা মারা গেছে, তারপর সেলেন কাকা। মেলেরিয়ায় ভুগে ভুগে সবাই আধমরা। একাদশীতে সন্ধ্যার ম্যালম্যাল্ অবস্থা পুরিমার স্বপ্ন দিয়ে ঘর। দু তিন খানা লেপ কম্বল চাপাদিয়ে শুয়ে থাকা। আর কয়লেই যথারীতি পথ্য, অপথ্য, কুপথ্য ভোজন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে জীবনী শক্তি হ্রাস পাচ্ছে তা বুঝতে পারছি সবাই।

একদিন সকালে উঠে দেখি গোয়াল-ঘরের ছ্যাচা-বেড়া ভেঙে বাঘে আমাদের সকল বড় বাছুরটাকে নিয়ে গেছে, তার আধ-খাওয়া দেহটা পড়ে আছে পুকুরপাড়ে। বাঘের ডাক প্রায়ই শুনি। 'কেউ'-এর ডাক শুনলেই কান পেতে থাকতাম দক্ষিণের জঙ্গলের মধ্যে আঁড়া-পেশার শব্দ খড়্‌খড়্‌ খড়্! হোতলায় সবাই শুই বলে আমাদের ঘর কয়। গ্রামের এক চৌকিদার কবে কোন্ কালে কনৌজ কিংবা বালিয়াবাসী ছিল। এখন সে ঘোর বাঙালী—বঙ্গালিনী বিয়ে সংসার পেতেছে। মেলেরিয়ায় ভুগে ভুগে অস্থিচর্মসার উদরটি স্ফীত তরমুজের মতো। একদিন মার কাছে এসে বলে, মা, রাতের বেলায় আমি বাড়ি পাহারা দেবো, বাবু বলেছেন। মা বললেন 'বেশ, তুমি পাহারা দেবে তো খুব ভাল কথা!' চৌকিদার বলে, 'মাইজী, তবে ছাদের উপরে উঠে হাঁক দেবো'। তাই ঠিক হলো। বীরপুরুষ তেতলার ছাদে উঠে তার চৌকিদারী আওয়াজ দিত। জনমানববিরল পল্লীর কারো নিদ্রাভঙ্গ হতো না, কেবল তার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি বন থেকে বনান্তরে চলে বিলীন হয়ে যেতো।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীতে তাঁর দিদিমার 'গঙ্গাযাত্রা'র বিস্তারিত বর্ণনা পড়েছি।

একদিন স্কুল থেকে বেরিয়ে নদীতীরে গেছি, দেখি একটি নৌকা ধীরবেগে চলেছে, হরিসংকীর্তন হচ্ছে নৌকার উপর। ছেলেরা বললে, ওই কার গঙ্গাযাত্রা হচ্ছে। তাঁটার টানে নৌকা ধীরবেগে চলেছে। কীর্তনের গান ও বাজনা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এলো। আর-একদিন দেখি খাঁড়ীচায় আশু চাটুজ্জের শিতার গঙ্গাযাত্রা। তাঁদের বাড়িতে দেখতাম বুড়িকে, ধপাসই চেহারা। তাঁর অন্তিমকাল ঘনিয়ে আসাতে গঙ্গাযাত্রা করা হয়েছে। ঘাটের উপর শুইয়ে হরিসংকীর্তন করতে করতে লোকে চলেছে, খই ছড়ানো হচ্ছে পথে পথে, বারান্দা থেকে দেখছি। মনে হলো বুড়ির ঠোঁট নড়ছে ; চোখ খোলা, দেহার্ধ খোলা, চন্দন চর্চিত, শুভ্র উপবীত যথাযথভাবে অঙ্গে রয়েছে। জানি না—মৃত্যুপথ যাত্রীর বাক্‌শক্তিরোধ হয়ে গেছে, তবুও কি কিছু বলবার ছিল ? চোখ খোলা—পৃথিবীকে কি শেষবারের মতো দেখে নিচ্ছিল ? কে জানে।

নদীর ঘাটে কয়েকটা খোলা (ছই-হীন) পানসি থাকতো, সেগুলো 'মড়ার নৌকা' অর্থাৎ ঐ নৌকায় করে মৃতদেহ শেষকৃত্য শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হতো। চুর্ণী পড়েছে গঙ্গায়, এখানে পবিত্র মহাস্নান, উদ্ধারণপুর ঘাটের মতো। ঘাটে প্রায়ই দেখতাম লোকে 'হরি, হরি' বলে কাকে তুলছে। সেদিন ঘাটে গিয়ে দেখি আমাদের ক্লাসের ছাত্র অশ্বিনী একটা নৌকায় শুয়ে। ক্লাসের মধ্যে শান্ত ভদ্র ফুটফুটে ছেলে। হাসির ফোয়ারা ছুটতো যখন সবার মুখে—অশ্বিনীর মুখে স্মিতহাস্য লেগে থাকতো। শুনেছিলাম তার অসুখ, তাই ক্লাসে আসছে না। তারপর শুনি সে মারা গেছে। তাই ছুটেছিলাম নদীঘাটে তাকে শেষবারের মতো দেখতে। কতকালের কথা। তবু আজও অশ্বিনীর সেই ফুটফুটে সুন্দর মুখটি চোখে ভাসছে।

প্রায়ই দেখতাম 'মড়া' নিয়ে যেতে। বাঁশের সঙ্গে মড়া ও তারপরে মানুষ দড়িতে দড়ি দিয়ে বেঁধে দুইজন লোক নিয়ে যেতো, অন্য সঙ্গে আরও লোক থাকতো কারও হাতে খড়ের মুড়ো মুখাগ্নি করার জন্য কারও হাতে কলসী চিতায় জল ঢেলে অন্ত্যেষ্টি করবার জন্য। বাংলায় সেইজন্য প্রবাদ বাক্যে হয়েছে 'মুখে আগুন আর কি'। কাটোয়ার পথে মোটর করে যেতে যেতে উদ্ধারণপুরের শ্মশান-যাত্রীদের দেখেছি আমবাগানের মধ্যে অপেক্ষা করতে, সারি সারি মানুষ শুইয়ানো মড়া—স্বর্গে যাবার অপেক্ষায় রয়েছে।

নদী বাংলাদেশের মহাপথ ছিল একদিন। এইপথ দিয়ে যাতায়াত করেছি নৌকাযোগে সে কথা পরে বলবো। আমাদের ঘাটে কয়েকটা নৌকায় দেখতাম বড় বড় মাটির জালা দড়ি দিয়ে বাঁধা, ওরা থাকে গঙ্গা জলে। সোনতার ঘাট থেকে গঙ্গার পবিত্র জল আনা আছে। পশ্চিমা ভায়ীরা বাঁকে করে কলসী ভরে গঙ্গাজল বাড়ি বাড়ি বিক্রী করে আসে। আমাদের বাড়িতে একটা কলসীতে গঙ্গাজল রাখা থাকতো, ছোট একটা তামার ঘটিতে নিত্যব্যবহারের জন্য গঙ্গাজল থাকতো কুলুঙ্গীতে। সেই তামার ঘটি থেকে একটু জল কোষায় ঢেলে বাবা দেখতাম ডুবি করে সামান্য জল তুলে হাতের অঞ্জলিতে রেখে একবার মাথুলি ও তাগাতে ছোঁয়াচ্ছেন, একবার মাথায় ছিটুচ্ছেন ও মুদস্বরে কী মন্ত্র সব বিড় বিড় করছেন।

দেখতাম মাত্র। ওসবের প্রতি কোনো আকর্ষণ বোধ করতাম না।

আমাদের ধারণা ছিল গঙ্গা জল সর্ব পাপনাশক। পাঁজিতে মকরবাহিনী গঙ্গায় ডুবি দেখে ভাবতাম সত্যই কি জলে ওরকম হাঙরের পিঠে দেবী বসে থাকেন ? দুটি যাত্রে মাত্রে বিশেষ তিথি পার্বণের দিন গঙ্গাস্নানে যেতো। আমাদের বাড়ির বা কাকাদের বাড়ির কাউকে কখনো যেতে দেখিনি। একবার অসহায় ঘাটে স্নানে যাই। গঙ্গার জলের রঙ, ঘাটের হাঁটু-জল কাদা, লোকের ভিড় দেখে জলে নামবার ইচ্ছাটা উবে গেল।

গঙ্গাজলে সব পাপ ধুয়ে হয়—সবচেয়ে বড় পাপ অজাত অস্পৃশ্যকে ছোঁয়া। নিধু নিকীরি রোজই আসে দরজায় দাঁড়িয়ে মায়ের সঙ্গে গল্প করে। ঘরে ঢুকবার সময়ে যদি তাকে ছুঁয়ে ফেলি, তবেই তো সর্বনাশ। মা তখনি ঘুলুচি থেকে তামার ঘটি থেকে খড়্‌কে করে গঙ্গাজল তুলে গায়ে ছিটিয়ে তিনবার গঙ্গা গঙ্গা বলতেন। সব শুদ্ধ হয়ে গেল। একটা রক্তমাংসের মানুষের সামনে সে অস্পৃশ্য, তাকে ছুঁলে অপবিত্র হতে হয়—এটা স্পষ্ট করে জানান দিতে আমাদের মত হিন্দুদের মনে ভদ্রতার রুচিতে বাধতো না। এইসব যে নিষ্ঠার সঙ্গে মানে, সেই আদর্শ হিন্দু।

একদিনের ঘটনা। রবিবার। ছুটি। দাদা ও আমি একটা বল্‌বেল পেয়ে 'ফুটবল' খেলছি বাইরের উঠোনে। বাড়ির পাশে অপরীর একটা বাঁধানো ড্রেন। সেই অপবিত্র নরদমায় আমাদের বল্‌বেল গেল পড়ে। নর্দমায় পড়েছে। কী করে ছুঁই। ড্রেনে হাত দিলেই তো মা বলবেন স্নান কর। নয় বলবেন মাথায় গঙ্গাজল ছিটাও। রান্নাঘরে বলেছিলেন বাড়ির পাচক ঠাকুর, বাঁকুড়ার বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ। তাঁকেই শুধোই বলটা ড্রেন থেকে তুললে কি পাপ হবে? ঠাকুরমশায় তাঁর ব্রাহ্মণ্য গর্বে বললেন—'মা বলেন্ কলাচন'। ওটা তো বল্‌বেল-কল তো। শাস্ত্রে বলে 'কলে দোষ নেই।' এমন শাস্ত্রবাক্য শুনে দ্বিধাহীন চিত্তে ড্রেন থেকে বল্‌বেল তুলে ফুটবল খেলা আরম্ভ করলাম। পরে মা যখন সব শুনলেন, বললেন, 'যাও কাপড় ছাড়—আর গঙ্গাজল মাথায় ছিটাও—নইলে ঘরে ঢুকতে পাবে না।'

[ক্রমশঃ

• • • •

ফরাসী দেশের বিখ্যাত অভিনেতা মরিস শেভালিয়র প্রথম জীবনে জীবিকা সংগ্রহের জন্যে কি পরিশ্রমই না করেছেন। কিন্তু কোন কিছুতেই ফল পেলেন না।

শেষে একদিন ঠিক করলেন নদীর জলে পুলের ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়বেন,—ঘোর আত্মহত্যা, কিন্তু আর যে সহ্য হয় না।

পুলের ওপর গিয়ে দেখেন তত ভোরেও দুই ছেলের দল সেখানে ভিড় করতে গেছে। মরিস্ ঘাবড়ে গেলেন, ওদের সামনে ত আত্মহত্যা করা চলে না!

শেষে তিনি তাদের চোখে ধুলো দেবার জন্যে এক নূতন ফন্দি করলেন, বললেন: ওহে ছোকরারা, আমি কেমন নাচতে পারি জান?

—যেমন না আপনার নাচ,—ছেলেরদল ত মজা পেয়ে তাঁর চারদিকে ঘিরে দাঁড়াল। মরিসের ইচ্ছা পুলের উপর নাচতে নাচতে তিনি নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

কিন্তু আর একজন লোক মরিসকে লক্ষ্য করছিলেন, তিনি হাসিমুখে এগিয়ে এসে বললেন: তুমি সিনেমায় নামতে চাও?—তোমাকে আমি পেয়েছি ঠিক সময়ে। বুঝেছি তোমার প্রতিভা অসাধারণ।

পুরাতন পাতা

সেকালের গৃহ ও সমাজচিত্র।

জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীতে ছেলেদের জন্য একটি বর্ণ পাঠশালাও খোলা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ পড়াইতেন। উপনিষদের শ্লোকগুলি দুরূহ বলিয়া বিশুদ্ধ উচ্চারণ সহকারে সমস্বরে পাঠ করান হইত। যেখানে এক সময় শুক্ল মহাশয়ের পাঠশালা বসিত, দুর্গাপূজা হইত, সেই পূজার দালানই বেলঘর পাঠে মুখরিত হইয়া উঠিল। এই পাঠশালায় কতকগুলি বাহিরের ছেলেও পড়িতে আসিত। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী একজন। তখন হইতেই অক্ষয়চন্দ্রের সঙ্গে জ্যোতিবাবুর বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহা গাঢ়তর হইয়া উঠে এবং তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত এ বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ ও অক্ষুণ্ণ ছিল।

ছেলেবেলায় অক্ষয়চন্দ্রকে জ্যোতিবাবুদের বাড়ীর সকলেই "Poet" "Poet" বলিয়া ডাকিতেন। তখন হইতেই তিনি ছোট ছোট কবিতা লিখিতেন এবং জ্যোতিবাবুকে শুনাইতেন। একটু ফাঁক পাইলেই তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে দেখিতে আসিতেন। তাঁহার সঙ্গে দেখা হইলে জ্যোতিবাবুও আহার নিদ্রা ভুলিয়া যাইতেন।

শীতকালে এক একদিন রাত্রি ৩।৪ টার সময় আসিয়া, জ্যোতিবাবুকে শয্যা হইতে উঠাইয়া লইয়া, অক্ষয়চন্দ্র প্রত্যূষ সময়ে বহির্গত হইতেন। তখনকার কালে শীতকালেই সকলে প্রাতর্ভ্রমণ (morning walk) করিত বেশ করিয়া শীতবস্ত্র চাপাইয়া ও গলায় কম্ফর্টার (comforter) জড়াইয়া ৩।৪টা রাত্রে তাঁহারা দুইজনে বেড়াইতে বাহির হইতেন; এবং ঘোড়দৌড়ের মাঠ প্রভৃতি ঘুরিয়া ফিরিয়া বেলা প্রায় দশটার সময়ে বাড়ী ফিরিতেন। একদিন ইঁহারা ফিরিতেছিলেন, কেশববাবু গাড়ী করিয়া যাইতেছিলেন, মুখ বাড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কিহে, তোমাদের এখনও morning walk হচ্ছে নাকি?" এক-একদিন Eden's Park-এ যখন পৌঁছিতেন, তখনও রাত্রি থাকিত। চৌকিদার হাঁক দিয়া (challenge করিয়া) বলিত—'হুকুম্-সরদার" (Who comes there ?)

জ্যোতিবাবু বলিলেন "ধনী ও গরীব লোকদের মধ্যে গরম কাপড়ের তখন তেমন বিশেষ কিছু তফাৎ ছিল বলিয়া মনে হয় না। অল্প-পয়সার লোকেরা শীতকালে রোদাই ব্যবহার করিত। এখন যেমন সস্তা বিলাতী শাল প্রভৃতি পাওয়া যায়, তখন তাহা ছিল না। ধনীরা শীতকালে শাল দোশালা আলিয়ার বেনাই প্রভৃতি ব্যবহার করিত। এখন যেমন রেশমী চাদরের ফ্যাশান হইয়াছে (বোধহয় সস্তা বলিয়া) তখন তাহা ছিল না।"

পথে বাহির হইয়া যে কি করিতেন তাহার বর্ণনায় জ্যোতিবাবু বলিলেন—"বাড়ী হইতে বাহির হইয়াই পথে আমরা নানারূপ ছেলেমানুষী বাক্যালাপ ও হাস্যকৌতুক সুরু করিয়া দিতাম। তাহাতে পথের শ্রান্তি আদৌ অনুভব করিতাম না। একদিন যাইতে যাইতে আমাদের এই এক খেলা হইল—যে, কে আগে কয়টা গ্যাস্-লাইটের খুঁটি দেখিতে পায়। খুব জোর চলিতে চলিতে আমি বলিলাম, "ঐ একটা"। অক্ষয় বলিল, "ঐ একটা"। এই রকম যার নজরে যত বেশী পড়িত, সেদিন তাহারই জিত হইত।

"তখন শীতকালেই morning walk হইত এবং শীতকালেই আমাদের চায়ের বরাদ্দ ছিল। এ চা চীনদেশের চা—তখনও আমাদের চা আমাদের দেশে প্রচলিত হয়নি। সে চায়ের কি সুগন্ধ! আমাদের অন্তঃপুরের রক্ষক একজন বাঙ্গালী বৃদ্ধ দারিয়ান সর্দ্দার ছিল। সকলের চায়ের পেয়ালায় যে চা-টুকু পড়িয়া থাকিত, তাহাই জমা করিয়া, চক্ষু বুজিয়া, খুব আরাম করিয়া সে প্রতিদিনই সেটুকু খাইত। তখন বাহির মহলে হিন্দুস্থানী হারোয়ান্ ও অন্দরে বাঙ্গালী সর্দ্দার দিবারাত্র পাহারা দিত। সর্দ্দার রাত্রে তাকাতি হাঁকের মত যখন হাঁক দিত, তখন আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত, এবং অন্দর মুক বরাবর্ করিয়া উঠিত।

"তখন জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে দুইজন করিয়া ডাক্তার বাৎসরিক বেতনে নিযুক্ত থাকিতেন—একজন ইংরাজ ও একজন বাঙ্গালী। গুরুতর রোগ না হইলে সাহেব-ডাক্তারকে কখনও ডাকা হইত না। সাহেব ডাক্তারের উপর তখন সকলেরই অসীম বিশ্বাস ছিল। সৌভাগ্য ক্রমে এখন সে বিশ্বাস অনেকটা চলিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী বড় ডাক্তারের অধীনে একজন অল্পবেতনের ডাক্তারও থাকিতেন। তিনি বাড়ীতে অষ্টপ্রহর হাজির থাকিতেন এবং বড় বড় ডাক্তারেরা যে সব ব্যবস্থা করিয়া যাইতেন, এই হাতুড়ে ডাক্তারটি সেই অনুসারে নিজের হাতে ঔষধ পত্রাদি দিতেন এবং ঠিক ঠিক সময়ে সেবন করাইতেন। ইনি অনেকটা শুশ্রূষাকারিণী নার্সের মত। আমাদের আমলে শীতলার নামে একজন বৃদ্ধ—এই শেষোক্ত পর্য্যায়ভুক্ত ডাক্তার ছিলেন। ছেলেরা তাঁহাকে খুব ভালবাসিত, তাঁহার নিকট সকলে গল্প শুনিত। তাঁহার বগলে নিয়তই কাপড়ে মোড়া খোপকাটা একটা টিনের বাক্স থাকিত তাহার খোপে খোপে নানারঙের মলম থাকিত। ছেলেদের ফোড়া পাঁচড়া হইলে এই সব মলম লাগান হইত। ছেলেদের ভুলাইবার জন্যই বোধহয় তিনি এইরূপ নানা রঙ বেরঙের মলম রাখিতেন।" জ্যোতিবাবুদের বাড়ীতে এ সময়ে বাঙ্গালী ডাক্তার ছিলেন শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ গুপ্ত এবং সাহেব ডাক্তার ছিলেন বেলি। ডাক্তারদের সম্বন্ধে জ্যোতিবাবুর স্মৃতি এইরূপ :—আমাদের জ্বর হইলে দ্বারিবাবু প্রথমদিন আসিয়াই গম্ভীরস্বরে বলিতেন ক্যে-ল্'-অর্থাৎ Castor oil। এই ক্যেলের নাম শুনিলেই আমাদের আতঙ্ক উপস্থিত হইত। তাঁহার চিকিৎসায় একটা ধরা-বাঁধা নিয়ম ছিল; ফলে এইরূপ চিকিৎসায় নিয়মেই তিনদিন বড় জোর সাতদিনের মধ্যেই আমরা খাড়া হইয়া উঠিতাম। চিকিৎসায় ঔষধ যেমন তিক্ত, পথ্যও ছিল তেমনি অরুচিকর—"জল সাবু", "চিনির মুক্‌কি,", "এলাচ দানা" ইত্যাদি। তখন ব্রাহ্মদের দোকানে বটুখটে একরকম বিস্কুট হইত, জ্বর কখন সেই বিস্কুট, আর তৃষ্ণা পাইলেই গরম জল। দ্বারিকানাথ গুপ্তের সর্ব্বজনবিদিত ঔষধই এখন "ডি-গুপ্তের বিক্‌স্চার"—চলিত কথায় "ডি-গুপ্ত" ঔষধ নামে বিখ্যাত। শুনিতে পাই, বেলি সাহেবের ব্যবস্থা গল্প অনুসারেই দ্বারিবাবু নাকি জগতের এই ঔষধটি প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

"ডাক্তার বেলি অতি সদাশয় লোক ছিলেন। যাহা কেহ তাঁহাকে ডাকিতে গেলে, তাঁহার স্ত্রী তাহার উপর খড়্গহস্ত হইতেন। তবে আমাদের বাড়ী হইতে কেহ গেলে, তাঁর স্ত্রী তেমন নিষেধ করিতে পারিতেন না, করিলেও তিনি তাহা শুনিতেন না, বলিতেন, "Governor তাঁর হাতে বাড়ীর স্বাস্থ্যরক্ষার ভার দিয়া সিমলা পাহাড়ে চলিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি কখনই কর্ত্তব্যে অবহেলা করিতে পারিবেন না। বেলিসাহেব বালক রবীন্দ্রনাথকে বড় ভালবাসিতেন, দেখা হইলেই রবিকে "Robin Robin" করিয়া আদর করিতেন।

———

জীবন নাট্যের খণ্ডচিত্র

রামমোহনের গৃহত্যাগ

অনাথ উপাধ্যায়

রেগে আগুন হয়ে বাপ বললেন, আমার বাড়িতে তোমার স্থান নেই। তুমি শুধু অবাধ্য নও, তুমি বিপথগামী! আমার বংশে এমন ছেলে কখনো জন্মায়নি। তুমি দূর হও!

ষোল বছর বয়সে রামমোহনের জীবনে যে সংঘাতপূর্ণ নাটকের উদ্ভব হয়েছিল তা যদি না ঘটত তাহলে বোধ করি তিনি আর রাজা রামমোহন রূপে প্রাতঃস্মরণীয় হতেন না!

হুগলীর রাধানগরের বাঁড়ুজ্যে পরিবারের মেধাবিতে ভক্তিমান নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ রামকান্ত রায়ের পুত্র রামমোহন। অসম্ভব মেধাবী ছেলে। অল্প বয়সেই ফারসী আরবী ভাষা শিখে ফেলেছেন।

শুধু তাই নয়, গোঁড়া বৈষ্ণবের ঘরের ছেলে হয়েও বাইবেল পড়েছেন এবং আয়ত্ত করেছেন মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ কোরান।

তারপর কাশীতে গিয়ে সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়ে দেশে ফিরেছেন।

কিন্তু অস্থির তাঁর মন। মনে শান্তি নেই। নিজের ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর মনে নানা প্রশ্নের উদয় হয়েছে। বেদ উপনিষদ পড়ে পড়ে তাঁর মনে হয়েছে হিন্দু ধর্মে যেন অনেক ফাঁক, অনেক ফাঁকী!

ঈশ্বর অজের, অচিন্ত্য, অরূপ! তাই যদি হয় তাহলে তাঁকে তেত্রিশ কোটি রূপ দিয়ে পুতুল পূজোর এত মাতামাতি কেন?

রামমোহন ভাবলেন, এর অবাব চাই! সত্যকে প্রকাশ করা চাই। একটি ছোট বই লিখলেন—"হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্মপ্রণালী"।

প্রতিমা পূজা যে ভুল, অজ্ঞতার পরিচায়ক, এই তথ্যই তিনি প্রকাশ করলেন সেই বই-এ। কী তার অকাট্য যুক্তি! কী তার পাণ্ডিত্য!

কিন্তু সেই বই লেখার ফল কি হল?

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের দল ক্ষেপে গেল। এ যে ঘোর নাস্তিকতা! ধর্ম বিরোধিতা! হিন্দু ধর্মকে হেয় করা। বলে কিনা—এ তো পুতুল পূজো!

আর, বলেছে কে? না, রাধানগরের বাঁড়ুজ্যে বাড়ির বোষ্টম বংশের ছেলে!

তারা সবাই মিলে জোট বেঁধে রামকান্ত রায়ের কাছে ধরণা করতে ছুটলো!

হৈ হৈ ব্যাপার!

রামকান্ত বললেন, আপনারা সবাই এত উত্তেজিত কেন? হয়েছে কি?

আর কি হয়েছে। সর্বনাশ হয়েছে। আমাদের সবাইকার, আমাদের সমাজের সর্বনাশ!

খুলে বলুন আপনারা।

তারা বললে, আপনার ছেলেকে সামলান, নইলে হিন্দুধর্ম গেল!

রামকান্ত সব শুনলেন! ছেলেকে ডাকলেন।

রামমোহন এসে দাঁড়ালেন।

রামকান্ত বললেন, এসব কি করছ তুমি! বেশী পড়াশুনো করে তোমার মাথা বিগড়েছে!

নম্রকণ্ঠে উত্তর দিলেন রামমোহন, পড়াশুনো করলে মাথা বিগড়োয় না বাবা, বরং মাথা পরিষ্কার হয়। চোখ খুলে যায়, মন বড় হয়, বুদ্ধি মার্জিত হয়।

ছোট মুখে বড় বড় কথা!

ভীষণ চটে গেলেন রামকান্ত, ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, বাপের মুখের ওপর লম্বা লম্বা কথা বুঝি পড়াশুনো করার পরিচয়! আর এই বইটাই বুঝি তার প্রমাণ!

ছেলের লেখা বইটা ছিল হাতের কাছে। সেটা ছুঁড়ে দিলেন ছেলের গায়ে!

অত্যন্ত বেদনা বোধ করলেন রামমোহন, ধীর স্থির কণ্ঠে বললেন, কেন, অন্যায় তো কিছু করিনি।

অন্যায় করনি?

আজ্ঞে না, অন্যায় করিনি! মানুষের ভুল ভেঙে দেওয়া কি অন্যায়?

চুপ কর তুমি!

রাগে ফেটে পড়লেন রামকান্ত, উদাস কণ্ঠে বললেন, ভুল! তোমার বাপঠাকুর্দা তোমার চৌদ্দপুরুষ যা মেনে এসেছেন, তা ভুল!

রামমোহন সবিনয়ে বললেন, এটা তো যুক্তির কথা নয় বাবা, এটা ভাবের আবেগ।

ভাবের আবেগ?

আজ্ঞে হ্যাঁ! আর এই আবেগই আমাদের সর্বনাশ করে! চোখকে অন্ধ করে দেয়, মনকে অন্ধ পথে নিয়ে যায়। ভালমন্দ বিচারের শক্তি লোপ পায়! বেশ তো, পণ্ডিত মশায়রা দেখিয়ে দিন বুঝিয়ে দিন আমার বইএ ভুল কোথায় আছে!

একজন পণ্ডিত বললে, দেখাবার বা বোঝাবার আবশ্যক নেই। হিন্দুর ছেলে দেবতা মানবে না, এর পিছনে কোন যুক্তি নেই!

রামমোহন উত্তর দিলেন, কে বললে আমি দেবতা মানি না! ব্রহ্মকে মানি না, এমন কথা তো আমি বলিনি। বলেছি, পুতুল পুজো করা ভুল। এই পুতুলকে ঘিরে কত রক্তপাত হয়েছে, শাস্ত্রের কত অপব্যাখ্যা হয়েছে, আপনারাই তা বলুন!

কথায় কথায় ব্রাহ্মণদের রাগ উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। অবশেষে সমস্বরে তারা বললে, এ তো আমাদের ঘোর অপমান!

তারপর তারা শেষ কথা বললে রামকান্তকে, এমন ছেলেকে যদি ঘরে রাখেন তাহলে আমরা আপনাকে একঘরে করব।

রামকান্তও ক্রোধে ক্ষোভে যেন দিশাহারা হয়েছিলেন। ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার বাড়িতে তোমার স্থান নেই। তুমি দূর হও!

এই কি আপনার শেষ কথা?

নিষ্কম্পকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন রামমোহন।

হ্যাঁ, এই আমার শেষ কথা। চলে যাও। এবং আর কোনদিন এ বাড়িতে পা দিও না!

বেশ তাই যাচ্ছি। বললেন রামমোহন, তারপর করুণ মধুর হেসে বললেন, আমার দুঃখ শুধু এই যে আপনারা কেবল রাগই দেখালেন, যুক্তি দেখাতে পারলেন না। আর তা কোন দিন পারবেনও না। কারণ দেখাবার মতো যুক্তি আপনাদের কিছু নেই।

চলে গেলেন রামমোহন!

সামনে অনন্ত পথ। কত পথ পার হলেন, কত নগর, কত জনপদ!

হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলেন তিব্বতে। সেখান থেকে ফিরে এসে আরও কত দেশ এবং বিদেশ ঘুরলেন!

পরিব্রাজক রামমোহন, ধর্মতত্ত্বান্বেষী রামমোহন, বিপ্লবী চিন্তানায়ক রামমোহন, অবশেষে সর্বলোকমান্য দেশপূজ্য রাজা রামমোহন।

• • •

১৮২১ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম আডাম নামে একজন খৃষ্টান মিশনারী খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদ পরিত্যাগ করে রামমোহন প্রবর্তিত একেশ্বরবাদ গ্রহণ করেন। এই ব্যাপার নিয়ে মিশনারী মহলে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে মার্শম্যান, কেরী প্রভৃতি শ্রীরামপুরের মিশনারীরা বেদান্তদর্শনকে আক্রমণ করলেন। রামমোহন দৃঢ়চিত্তে তাঁদের অযৌক্তিক মতামতগুলো একে একে খণ্ডন করতে লাগলেন। এই বিখ্যাত বেদান্ত-যুদ্ধ একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। একদিকে হিন্দুদের শতাব্দী সঞ্চিত কুসংস্কার, আর একদিকে মিশনারীদের আক্রমণ, দু'য়েরই বিরুদ্ধে রামমোহনকে একাই দৃঢ়চিত্তে এবং বীরভাবে সংগ্রাম করতে হয়েছে।

আবার সেই জেল

বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

এগারো

সেদিন রবিবার। অফিস নেই। অফিস না থাকলেও টেন অর্থাৎ হয়হয় ছেড়ে কোথাও যে বেড়িয়ে আসব, তা হবে না, কারণ জেলখানার চাকরি অত্যাবশ্যকীয়, ইংরেজীতে যাকে বলে, এসেনসিয়াল।

রবিবার হলেও রোজকার মত ভোরেই উঠে পড়েছি। এটা আমার অনেক কালের অভ্যাস। ভোরে ওঠা এবং বাসিমুখে শুধু এক কাপ চা খাওয়া। কেউ তখন উঠে যদি তৈরী করে দেয়, খুশী হই, আর না দিলেও ক্ষতি নেই, নিজেই তৈরী করি। ওরা কেউ ওঠেনি, আজ রবিবার, সাতটার আগে উঠবে না।

চা শেষ করে দক্ষিণের জানলার সামনে এসে দাঁড়ালাম।

রাস্তার ওপারেই জেলের নিজস্ব ফুটবল খেলার মাঠ। বাইরের দলও আমাদের পারমিশন নিয়ে খেলে থাকে। এখন চলছে হেয়ার মেমোরিয়েল কাপের খেলা। গ্যালারীতে বসে খেলা দেখবার মত আমরা সবাই এই দোতলায় বসেই খেলা দেখি।

মনে পড়ে, সেই ছোটবেলায় আমিও অনেক ফুটবল খেলেছি। আমাদের দেশে বিক্রমপুরে মাত্র চোদ্দ বৎসর বয়সে নিজেদের গ্রামের পক্ষে ত বটেই, হায়ার্ড হয়েও যে কত গ্রামের পক্ষে খেলতাম, তার ইয়ত্তা নেই। বিকেলে এক গ্রামে খেলার পর হয়ত সাত আট মাইল হেঁটে আরেক গ্রামে গিয়ে পৌঁছতাম মধ্যরাত্রে, কারণ সেখানকার খেলা পরদিন সকালে। যাদবপুর বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউটে পড়বার সময় মাত্র আঠারো বৎসর বয়সে কলকাতা ময়দানের অনেকগুলো প্রতিযোগিতায় খেলেছিলাম। তারপর একুশ বৎসর বয়সে 'স্বদেশী' করবার 'অপরাধে' রাজবন্দী হয়ে যখন দীর্ঘকালের জন্য জেলখানায় ঢুকলাম, তখন নিয়মিত খেলার ছেদ পড়ল।

চমৎকার হাওয়া আসছে মাঠের ওপর দিয়ে। ভোরের ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়া।

পশ্চিম দিকের ঢাকা বারান্দায় এলাম।

প্রসূতি-সদনের দোতলায় ধাই ও নার্সদের তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। পেছন দিকে দেবার ঘর।

হয়ত সেখানে কোন প্রস্তুতির সঙ্কট দেখা দিয়েছে, তাই দেখতে পাচ্ছি, এই ভোরবেলাতেই হেঁথেলকোপ গলায় ঝুলিয়ে ডাক্তার লীলা গাঙ্গুলী এলেন, বিকৃসা থেকে নেমে সোজা লেবার রুমের দিকে চলে গেলেন।

দূরে অবলাকান্ত সাহার-দেয়াল-ঘেরা মাঠে গরু ও মহিষের বিরাট খাটাল দেখা যাচ্ছে। দেয়ালের পাশ দিয়ে রাস্তা চলে গেছে গোরা-বাজারে। পাশেই ঘাটলা বাঁধানো বিরাট দীঘি। ভোরের আলো ফুট ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই দু একজন করে পুরুষ ও মেয়ে নাইতে আসছে। শুনছি, ঐ দীঘিতেই নাকি এ অঞ্চলের যাবতীয় দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন দেয়া হয়। ভালই হল, এবার এই বারান্দার বসে বসেই প্রতিমা দেখতে পাওয়া যাবে।

আজ আটচল্লিশ বৎসর বয়সে বাড়ীতে বসে বসে প্রতিমা বিসর্জন দেখতে পাবার সম্ভাবনায় পুলক অনুভব করছি, অথচ মনে পড়ে, ছোটবেলায় গ্রামের স্কুলে পড়বার সময় এই বিসর্জন দেখতে যেতাম কতদূরের গ্রামে, মোহনগঞ্জে বা বোলঘরে অথবা আরও দূরে সেই শ্রীনগর গ্রামে।

আমাদের বাড়ীর প্রতিমা দিনের বেলাতেই বিসর্জন দেওয়া হত আমাদের পুকুরে এবং তারপরই চলত আমাদের বিসর্জন দেখতে যাবার উদ্যোগ আয়োজন। তখন বর্ষাকাল। মানে, বর্ষার নদীর যে জল ফুলে সারা বিক্রমপুর জলে জলাকার করে দেয়, আশ্বিনে কার্তিকেও সে জল পুরোপুরি নেমে যায় না। তাই প্রতিমা আসে নৌকোতে, আমরা বিসর্জন দেখতে যাই নৌকোতে। সবার আগে কোন্ নৌকোখানা যাবে অথচ ফিরে আসবে সবার শেষে, অত্যন্ত দামী বিলাসকাকা যে নৌকোতে যাবেন, সেখানা কিভাবে এড়ানো যায়, কোন্ নৌকোর ছই বেশ শক্ত, যার ওপর দিব্যি বসা যাবে, মনে পড়ে, সারাদিন এই সব গুরুতর ব্যাপার নিয়ে আমরা, ছোটরা, ভীষণ ব্যস্ত হয়ে থাকতাম। খালের ধারে লগিতে নৌকো বেঁধে রাখা হত, আমরা ছইয়ের ওপর বসে বসে আখ খেতাম আর ছিবড়েগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে জলে ফেলতাম। নৌকোয় বিলাস কাকা না থাকলে কি হবে, আমাদের সোনাদা আছেন, তিনিই মাঝে মাঝে ধমক দিতেন, এই, ছইয়ের ওপর অত নড়াচড়া করিস নে তোরা, পড়ে যাবি।

ধমক খেয়ে আমরা স্থির হয়ে চুপটি করে বসতাম। কিন্তু কতক্ষণ? আবার ভুলে গিয়ে হুড়োহুড়ি করতাম, উত্তেজনায় কখনও কখনও উঠেও দাঁড়াতাম। পড়ে গেলে কি আর হবে? জামা কাপড় ভিজে যাবে। সাঁতরে নৌকোয় উঠে আসব আবার।

অনেক দূর দূর গ্রাম থেকে কত যে প্রতিমা আসত। আমরা শুনতাম, শুনতে শুনতে গুণিয়ে ফেলতাম। বিরাট আকার পেটমোটা নৌকো, তার মাঝখানে প্রতিমা বসানো। নৌকোর পেছন দিকে ছোট্ট একখানা ছই, সেই ছইয়ের ওপর মাঝি হাল ধরে বসে রয়েছে। হাতে ছোট্ট হুকো, মাঝে মাঝে টানছে। আর সামনের দিকে দুজন লগি মেরে মেরে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাদের দিকে কে নজর দিচ্ছে? সবাই দেখতাম প্রতিমা। বাঁশের মাথায় হালাক জ্বলছে আর ময়ূরের পালক-আঁটা জরচাক বাজাচ্ছে ঢাকী, সঙ্গে বাজছে কাঁসি। কোন নৌকোতে অবিরাম আরতি চলছে। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় প্রতিমার মুখ ভাল করে দেখাই যায় না। কিন্তু আমরা কি শুধু প্রতিমাই দেখতাম? বরং সবার আগে আমাদের দৃষ্টি পড়ত অসুর আর সিংহের ওপর। কোন্ অসুরটা বড়, কার গায়ে বেশী জোর, কার রাগ সবার চাইতে বেশী ফুটছে, কোন সিংহটা বেশী ভীষণ, এ নিয়ে আমাদের মধ্যে তর্ক বেধে যেত। মা দুর্গার মুখখানি যেন হত বড় করুণ। আমাদের ছেড়ে চলে যেতে হবে বলেই কিনা কে জানে। মনে হত, ছলছল চোখদুটি থেকে বুঝি জল গড়িয়ে পড়বে।

বার বার চোখ মুছতাম আমরা কোঁচার খুঁটে।

কোন কোন নৌকো থেকে বাঈ পোড়ানো হত। উৎসাহবলে আমরা উঠে দাঁড়াতাম আর বড়রা বকুনি দিয়ে বসিয়ে দিতেন। সব নৌকোতেই যেন একজন করে বিলাসবালা থাকতেন আমাদের সামলাবার জন্য।

অনেক পেছনে ফেলে-আসা সেইসব দিনের মধুর স্মৃতি আজও মনকে চঞ্চল করে তোলে।

বারান্দার উত্তর দিকে এলাম।

সামনে ছোট মাঠ, মাঠের ওপারে অনেকগুলো আমগাছ। গাছের আড়ালে সেই এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান অফিসারের দোতলা বাড়ী। নোরাদের বাড়ী। যে নোরাকে ভালবেসে অবশেষে আত্মহত্যা করেছে ওয়ার্ডার চুনীলাল। ভালবাসা এমনি অন্ধ যে, কাকে কখন কোন্ দুর্বল মুহূর্তে আঁকড়ে ধরে তার বুদ্ধি ও বিবেচনা আচ্ছন্ন করে রেখে তাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে, তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। তা না হলে ইঙ্গ-বঙ্গ সম্প্রদায়ের অভিজাত ঘরের মেয়ে কি করে একজন সামান্য সিপাইকে ভালবেসে ফেলল আর ভালই যদি বাসল, তাহলে আবার সুবোধ বালিকার মত কি করে বাবার পছন্দ-করা বরের ঘরে চলে গেল? চুনীলালই বা জেলের সিপাই হয়ে কি আশায় প্রাসাদবাসিনী রাজনন্দিনীর দিকে হাত বাড়াতে সাহস করল, এসব প্রশ্নের কোন জবাব নেই। ভালবাসা কি যুক্তি-হীন, আবেগ সর্বস্ব? না কি এ ভালবাসা নয়, মোহ?

বাথরুমে জলের শব্দ পাওয়া গেল।

তারা উঠেছে এবার।

নীচের তলায় দাদেবি টাইলে তৈরী বাবুর্চিখানা পরিষ্কার করে আমরা পশ্চিমের এই বিরাট বারান্দাই এক কোণে রান্নাঘর পেতে নিয়েছি। আত্রেয়ী চোতে চা চড়িয়ে দিল।

চা তৈরী হলেই আমরা সবাই ডাইনিং রুমে এসে বসলাম।

নানা গল্পে চায়ের আসর জমে উঠল।

সাতটা বেজে গেছে। বাড়ীতে কাজ করবার জন্য সিপাই এহয়ার পাঁচজন বন্দী এসে কাজ সুরু করে দিল। একজন জেটও আছে এই দলে। যে সব বন্দীর মেয়াদ এক বৎসরের কম অথবা যার মুক্তি পেতে এক বৎসরের কম সময় বাকি আছে, তাদের মধ্যে যাদের মতিগতি ভাল মনে হয়, সুপার তাদের বাইরের কাজে নিয়োগ করতে পারেন। এই কর্মিদলকে বলা হয় এক্সট্রামুর‍্যাল গ্যাং। তবে কতকগুলি বিশেষ কয়েকটি ধারা আছে, যে ধারায় দণ্ডিত বন্দীদের কখনও বাইরের কাজে নিয়োগ করা যাবে না।

চা পর্ব শেষ হবার পর টেবিলে বসে একটুখানি সাহিত্য চর্চা করছিলাম, এমন সময় দেবুল এসে বলল, বাবা, একজন ভদ্রলোক এসেছেন।

কোথা থেকে এসেছেন, জিজ্ঞেস করেছিস?

দেবুল ওসব জিজ্ঞেস করেনি। বলল, সেজি গায়ে দেখে মনে হল, পাড়ারই কেউ হবেন।

জিজ্ঞেস করলাম, গেটের বাইরে আছেন, না নীচে এসেছেন?

নীচে কোথায়, দেবুল জবাব দিল, উনি সিঁড়ির আধখানা উঠে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

তৎক্ষণাৎ উঠে পড়লাম। সাহিত্য আপাততঃ চাপা দিয়ে পায়জামা ও সেজি পরতে পরতে আত্রেয়ীকে অনুরোধ জানালাম, এক কাপ চা পাঠিও। তারপর বেরিয়ে এলাম বারান্দায়।

সিঁড়ির মুখে এসেই একেবারে চমকিয়ে।

কে? কে! কে!!

চমকে উঠলাম। তারপরই থামতে হলাম। সীমাহীন বিস্ময়ে দুই চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল। পরক্ষণেই আবার স্বাভাবিক সহজতায় পলক পড়ল। কপালের কয়েকটি বিরক্তির রেখাকে মিলিয়ে দিলাম। সামলে নিলাম।

আমায় দেখতে পেয়েই আগন্তুক ভদ্রলোক দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে কলরব করে উঠলেন, নমস্কার! নমস্কার! চিনতে পারছেন কি?

বলে উঠলাম, সে কি, আ—পনি-ই! আসুন, আসুন, ওপরে আসুন।

দোতলার বারান্দার সিঁড়ির দিকটাতে টেবিল চেয়ার পাতা, ঐ স্থানটিই আমাদের ভুবিংরুম। সমাদর করে তাঁকে এনে বসালাম, তিনি আর কেউ নন, ঢাকা সেনট্রাল জেলের অতীত কালের স্বনামধন্য জেলার শ্রীসুধীর মুখার্জী। অবসর গ্রহণ করবার সময় ছিলেন এই রকম সেনট্রাল জেলেরই রোর্ডওপ্রতাপ সুপারিনটেনডেন্ট। এখন আর তিনি শ্রীসুধীর মুখার্জী নন, এখন তিনি রায় শ্রীযুক্ত সুধীর চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহাদুর। ইংরেজ গভর্নমেন্টের প্রতি অবিচল প্রভুভক্তির স্বীকৃতিস্বরূপ এই মহা সম্মানের শিরোপা!

কিন্তু চেহারা! এখন বয়স নিশ্চয়ই সত্তরের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, অথচ মাথাভরা কোঁকড়ানো চুল একটিও পাকেনি আর কিছুক্ষণ কথা বলার পর বেশ বুঝতে পারলাম একটি দাঁতও নেই নড়ে। সেই মোটা ভ্রু, তার নীচে সেই ক্ষুদে চোখ। সেই কালো গোঁফ, তার নীচে সেই পুরু ঠোঁট। আঠারো শো ছেয়াশী সালে যা ছিল, এখনও তাই!! তবে হাঁ, চামড়ায় কুঞ্চন দৃশ্যমান।

জিজ্ঞেস করলাম, আপনার বাড়ী এখানেই নাকি?

দেশ ত আমার এখানে নয়, জবাব দিলেন সুধীর মুখার্জী, দেশ ছিল খুলনায়। যখন এই জেল থেকে রিটায়ার করি, তখন দেশ বিভাগ হয়ে গেছে, পরিবারের সবাই সব ফেলে চলে এসেছে, তাই ভাবলাম, কোথায় আর যাব, এখানেই একটা ডেরা করে ফেলি। ঐ ত, মাঠের ওপারে। যাবে একদিন সবাইকে নিয়ে।

নিশ্চয়ই যাব। তৎক্ষণাৎ আমন্ত্রণ গ্রহণ করে ফেললাম। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, আপনি আমার সন্ধান পেলেন কি করে? নাম না হয় শুনেছিলেন যে, জিজেন গাঙ্গুলী নামে একজন নতুন ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট এসেছে, কিন্তু আমিই যে সেই ঢাকা জেলের এককালের প্রিজনার, তা বুঝলেন কি করে?

দেখুন মিঃ গাঙ্গুলী, বলেই মুখার্জী চোখ বুঁজলেন কয়েক সেকেণ্ডের জন্য যেন পরিদৃশ্যমান বহির্জগৎ থেকে ঘুরিয়ে তাঁর দৃষ্টির ক্যামেরা ফোকাস করলেন অদৃশ্য অন্তরের গভীরতম প্রদেশে, তারপর ডুবুরি যেমন করে সমুদ্রের তলদেশ থেকে মুক্তা তুলে আনে, তেমনি করে কয়েকটি তত্ত্বকথার রত্নকণিকা তুলে এনে আমায় পরিবেশন করলেন, দেখুন মিঃ গাঙ্গুলী, জীবনে কত লোকের সঙ্গেই ত পরিচয় হয়, ঘুরে চলে যেতে আবার তাদের কথা ভুলেও যাই। কিন্তু কখনও কখনও এমন দুটি একটি লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে যায়, সারা জীবনে যাদের ভোলা যায় না। আপনি সেই দু একটি লোকের একটি। প্রায় দুই যুগ আগেকার কথা হলে কি হবে, আপনার নাম, চেহারা ও আপনার কথা সব আমার মনে আছে। শুনলাম, ডেপুটি সুপার পোস্টে নতুন এ্যাপয়েন্টেড হয়ে যিনি এসেছেন, তাঁর নাম জিজেন গাঙ্গুলী। স্বাধীন দেশ, জাতীয় গভর্নমেন্ট, সুতরাং দেশের জন্য যাঁরা একদা জেল খেটেছেন, তাঁরাই যে এখন দেশ শাসনের অংশীদার হবেন, এ ত জানা কথা। তাই বুঝতে একটুও ভুল হল না যে, আপনিই সেই ব্যক্তি। তাই কনগ্রাচুলেশন জানাতে এলাম।

বেয়ারা চা ও বিস্কুট দিয়ে গেল। মিঃ মুখার্জী কাপ তুলে নিলেন।

কি বিনয়! ছেলে-খাটা স্বদেশীদের জন্ত এখন কি সীমাহীন শ্রদ্ধা! অথচ মনে পড়ে বাইশ বছর আগেকার কথা। ঢাকা জেলে ছিলাম রাজবন্দী হয়ে। হঠাৎ বিক্রমপুর ষড়যন্ত্র মামলায় সাত বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন মুন্সীগঞ্জের স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট। ১৯৩৬ সালের জানুয়ারী মাসে মুন্সীগঞ্জ থেকে একেবারে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীরূপে ফিরে এলাম ঢাকা সেনট্রাল জেলে। জেলার তখন এই সুধীর মুখার্জী। তখন দেখেছি এঁর দাপট! অবশ্য আলো হাঁক ডাক বা সোরগোল করে নয়। জলের নীচে ফিরে হাঙর এলে যেমন নিঃশব্দে পা ফেটে যেয়, ঠিক তেমনি নিঃশব্দ অথচ নিখুঁত ক্রিয়াকাণ্ড ছিল এঁর। আমাদের অকাট্য ও জোরালো যুক্তির জবাবে কোন প্রতি-যুক্তি প্রদর্শন হয়ে থাক, কোন মন্তব্যই করতেন না জেলার বাবু। শুধু মুখে চোখদুটিতে ও পুরু ঠোঁটদুটিতে মৃদু হাসির একটা ঝিলিক মাঝে মাঝে খেলে যেত। আত্মপ্রসাদ অনুভব করতাম যে, মামলায় জিতে গেছি। ওয়ার্ডে ফিরে এসে সহবন্দীদের সোল্লাসে বলতাম, কেয়া বাত। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ফলাফল টের পাওয়া যেত। হয়ত বদলি হয়েছিলাম চল্লিশ নম্বর ওয়ার্ডে রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে থাকবার জন্ত, নিয়ে যাওয়া হল ছয় নম্বরে ঘৃণ্য অপরাধে দণ্ডিত সাধারণ কয়েদীদের মধ্যে। এমনিই ছিল সুধীর মুখার্জীর প্রতাপ। সুপার লিওনার্ড সাহেব চোখ বুঁজে ওঁর সব কার্যে জিটো মেরে যেতেন।

সেই স্বল্পভাষী সুধীর মুখার্জী আজ বাড়ী বয়ে এসেছেন অনেক ছেলে-খাটা কয়েদীকে কনগ্রাচুলেশন জানাতে! মনে মনে হাসলাম।

সুধীর মুখার্জী বলতে লাগলেন, যোগ্য ব্যক্তির হাতে যোগ্য কাজের ভার দিয়ে আমাদের গভর্নমেণ্ট যে সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন, তা বলাই বাহুল্য। আপনারাই ত দেশের রত্ন।

মনে মনে বললাম, নিশ্চয়। একেবারে কৌস্তভ-মণি কিংবা কোহিনুর আর কি। অথচ এই রত্নটিকে এতদিন কি ভয়েই না আগলে রেখেছিলেন নিজের অগ্নিশকুট ছায়ায়, নাগপাশের রেশমী সুতোয় আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে কি যত্নেই না একেবারে দম বন্ধ করে দেবার আয়োজন করেছিলেন, এতকাল পরে ঢাকা সেনট্রাল জেলের সেই বিস্মৃতপ্রায় স্মৃতি মনের মধ্যে যেন নতুন করে আগুন ছড়াতে লাগল। কিন্তু বাইরে কিছু প্রকাশ না করে নীরবে ওঁর চাটুবাণী শুনতে লাগলাম. আমি কিন্তু তখনই বুঝতে পেরেছিলাম মিঃ গাঙ্গুলী যে, আপনাকে আটকে রাখা যাবে না, আপনি উঠবেন, সবাইকে ছাড়িয়ে উঠবেন। আপনার মধ্যে যা পাটস দেখেছিলাম, সচরাচর তা দেখা যায়না, তাই এলাম কনগ্রাচুলেশন জানাতে।

সেজন্ত আমি কৃতজ্ঞ, তৎক্ষণাৎ বললাম, কিন্তু কনগ্রাচুলেশন জানাবার মত কি আর করতে পেরেছি বলুন।

গোঁফের নীচে পুরু ঠোঁটে অবিশ্বাসী হাসির ঝিলিক দেখা গেল, সুরে চোখদুটি যেন আরও ফুরে হয়ে প্রায় বুঁজে এল, কণ্ঠে হেঁ-হেঁ ধরণের একটা মৃদু মোসাহেবী আওয়াজ তুলে বললেন, আপনি ত তা বলবেন মিঃ গাঙ্গুলী। অতখানি বিনয়ী বলেই ত আপনি সরাসরি আজ এত বড় পোষ্টে চলে এসেছেন। যোগ্য ব্যক্তি চিনতে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ভুল হয়নি। পাবলিকের কল্যাণ করবার জন্ত একদিন কাজ করতে গিয়ে যাঁরা নানা বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন, দেশ স্বাধীন হবার: পরও তাঁদেরই যে সবার আগে সুযোগ দিতে হবে এবং সেই মহান কাজে তাঁরাই যে যোগ্যতম ব্যক্তি, দেখা যাচ্ছে, জাতীয় গভর্নমেণ্ট সেই সত্য উপলব্ধি করেছেন। আপনি বলছেন মিঃ গাঙ্গুলী, কি আর এমন করেছেন। আরও একটুখানি

শব্দহীন হাস্য করলেন সুধীর মুখার্জী, বললেন, এই জেলের সিপাইদের অনেকের সঙ্গেই আমার চেনা পরিচয় আছে, তারা সবাই আপনার প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ। এ যে হতেই হবে মিঃ গাঙ্গুলী, আপনি ত আর দশ জনের মত চাকরি করেন না, চাকরির মধ্য দিয়ে করেন দেশসেবা, সমাজসেবা। আপনি যে প্রকৃত দেশপ্রেমিক। তাই যেখানেই যাবেন, সেখানেই আলো জ্বলে উঠবে।

মনে পড়ল, বৃটিশের যুগে একদা যিনি অকথ্য অবিচারে ও অত্যাচারে রাজনৈতিক বন্দীদের জর্জরিত করে তুলেছিলেন, একদা যিনি সাধ্যায়ত্ত হলে আমাদের হাড়মাস খেয়ে চামড়া দিয়ে ডুগডুগি তৈরী করে ফেলতেন, আজ তাঁরই শ্রীমুখে এই সার্টিফিকেট অনেকটা ভূতের মুখে রাম নামের মত শোনাচ্ছে না কি? চাকা ঘোরবার সঙ্গে সঙ্গে কেমন চোখের পলকে রং বদলে ফেলেছেন, পালটে ফেলেছেন কণ্ঠ ও ভাষা।

এমনভাবে আরও অনেকক্ষণ বক বক করলেন সুধীর মুখার্জী। আরও অনেক তৈল সিঞ্চন করলেন। অবশেষে যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর সুললিত ভাষায় যে ক্ষুদ্র আবেদনটি পেশ করলেন, তা হচ্ছে এই যে, প্রতি মাসে তাঁর পেনসন তোলার আবেদন-পত্রে গেজেটেড অফিসারের যে সনাক্ত স্বাক্ষরটি অনিবার্যভাবে প্রয়োজন, আমার কর্মব্যস্ততার মাঝখানে মহামূল্য একটি মিনিট নষ্ট করে যদি আমি অনুগ্রহ করে—

বিলক্ষণ! তৎক্ষণাৎ বাধা দিলাম, অনুগ্রহ কি বলছেন মিঃ মুখার্জী, নিয়ে আসবেন, সই করে দোব। বেশ খানিকক্ষণ গল্পও করা যাবে।

কার্যোদ্ধার হয়েছে, সুতরাং সুধীর মুখার্জী গাত্রোত্থান করলেন এবং দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে নেবে যাবার আগে আমায় তাঁর বাড়ীতে পদধূলি দেবার আমন্ত্রণ জানাতে ভুললেন না।

একাই বসে বসে হাসতে লাগলাম।

সরকারী চাকরি জীবনে এই আমার প্রথম প্যারাডক্স। যাকে বলে অবিশ্বাস্য সত্য। একদা ওঁর চেম্বারে গিয়ে টেবিলের উলটো দিকে আমায় দাঁড়াতে হত আর উনি সোজা দিকে চেয়ার অলঙ্কৃত করে বসে থাকতেন। কচিৎ কানে ঢুকত আমার কথা, সংক্ষেপে দু এক কথায় জবাব দিয়ে যেন কৃতার্থ করতেন আমায়, আর আজ? আমার বাড়ী বয়ে আসতে হয়েছে, বসতে হয়েছে আমার টেবিলের উলটো দিকে, আমার একটি স্বাক্ষরের প্রত্যাশায় অনেক আবেদনের ও চাটুকারের ভাষা ব্যয় করতে হয়েছে।

এক প্যারাডক্স ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে?

আমার বাকো বছরের চাকরি জীবনে আরও প্যারাডক্স-এর সাক্ষাৎ মিলবে।

আত্রেয়ী মাঝে মাঝেই বলে, তোমার মাথায় একটা পোকা আছে। সে পোকা তোমায় কিছুতেই শান্তভাবে চাকরি করতে দেয় না। চাকরি করা মানেই যে চাকরি রক্ষা করা আর মাসের শেষে মাইনের টাকাটি গুনে পকেটে তোলা মাঝে মাঝেই এ সত্য কথাটা ভুলে যাও। চাকরি রক্ষা করার জন্য যা দরকার যতটুকু দরকার, তুমি তার পরেও অনেক কিছু অনেকখানি কর। না করলে ক্ষতিটা কি হয়?

নিজের মন্তব্যের সমর্থনে গোটাকতক উদাহরণ দেয় আত্রেয়ী।

যখন প্রবেশন অফিসারের চাকরি করতাম, আই জি ডাক্তার বিশ্বাস বলেছিলেন যে, নতুন আইনে বিচার করতে ম্যাজিস্ট্রেটরা বাধ্য নন, ইচ্ছে করলে তাঁরা ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী বিচার করতে পারেন। নতুন আইনে বিচার না করা পর্যন্ত প্রবেশন অফিসারের কোন কাজ নেই। সুতরাং আপনি যদি ওদের সঙ্গে মিশতে পারেন, ওঁদের সঙ্গে সমাজ কল্যাণমূলক এই আইন সম্বন্ধে আলোচনা করে এর সার্থকতা

বোঝাতে পারেন, এক কথায় ওঁদের মধ্যে ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেন, তবেই ওঁরা এই আইন প্রয়োগে আকৃষ্ট হবেন।—ব্যস, আমি এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম এবং মেলামেশার মধ্য দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটদের সঙ্গে আমার সখ্য এত বেড়ে গেল যে, আমাদের আটজন অফিসারের মধ্যে একা আমারই প্রবেশনারের সংখ্যা প্রায় একশো হ'য়ে গেল। আলিপুরে পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে আরও একজন প্রবেশন অফিসার পোষ্ট করতে হয়েছিল।

আত্রেয়ীর প্রশ্ন, কি হত এতখানি না করলে? যে সব অফিসার করেননি, তাঁদের চাকরির কি কোন ক্ষতি হয়েছে? তুমি করেছিলে বলে তুমি কি মাইনের স্পেশাল ইনক্রিমেণ্ট কিছু পেয়েছিলে?

হয়তো জেলে ডেপুটি সুপারের চাকরিতে যোগ দিয়েই বন্দীদের ছুমি, সিপাইদের কর্তব্যে গাফিলতি আর অফিসবাবুদের নানারকম ত্রুটি ধরে ওদের মধ্যে বেশ অ-জনপ্রিয় হয়ে উঠেছি। আত্রেয়ীর প্রশ্ন, কি দরকার এসবের, এত উৎসাহ দেখাবার? যা চলে আসছে এতকাল ধরে, তুমি কেন তাতে বাদ সাধতে যাও? রজনীবাবু ত এতসব করতে যাননি, কি ক্ষতি হয়েছে তাঁর? তারপরই আবার তার সেই উপসংহার, তোমার মাথায় একটা পোকা আছে। সেই পোকাটি শান্ত হয়ে থাকতে দেয় না তোমায়, মাঝে মাঝেই কটকট করে কামড়ায় আর তুমি ছুটে ওঠ, ছুটে ওঠ।

এই ক'মাস চাকরি করবার পর আমিও প্রায় বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছি যে, সত্যিই আমার মাথায় একটা পোকা আছে। আমার চাকরি জীবনের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করলে দেখতে পাই যে, এই পোকার কামড়ে অসংখ্যবার এমন কাজ করেছি, সরকারী চাকরি যা আমার কাছে কোনদিন আশাও করেনি। যা না করলে চাকরির কোন ক্ষতি হত না, পক্ষান্তরে, যা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেও কোনদিন ওপরওয়ালার এক লাইনও লিখিত প্রশংসা পাইনি। সরকারী ভাষ্য হচ্ছে, যত বেশীই কর না কেন, ওটা তোমার ডিউটি, আর যদি তা করতে গিয়ে সামান্যতম ও উপেক্ষণীয় কোন ত্রুটি করে ফেল, তাহলে সেটা হবে তোমার কর্তব্যচ্যুতি।

একদিন কম্বল ফ্যাক্টরীর পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলাম।

জালের মধ্য দিয়ে তাকালাম। সবগুলো মেসিনই ফিট করা হয়ে গেছে। রোলিং মেসিন, ওয়াশিং মেসিন, ক্লেটিং মেসিন, বীলিং মেসিন, আর সারি সারি পাঁচখানা পাওয়ারলুমও বসানো হয়ে গেছে। দেখা গেল ইলেকট্রিক মোটরগুলোও নির্দিষ্ট স্থানে বসানো হয়ে গেছে। ইলেকট্রিক ওয়ারিং-এর পাইপও দেখতে পেলাম, এমনকি, মীটার বোর্ড, মীটার সুইচ বোর্ডও সুইচও দেখতে পেলাম। ইলেকট্রিক্যাল ডিভিশনকে লিখলেই তাঁরা ইলেকট্রিক কানেকশনটা করে দিয়ে যাবেন। তাহলে হচ্ছে না কেন?

অথচ পরিকল্পনাটি খুব ভাল। বাংলা বিভাগের আগে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে বাংলা দেশের সবগুলো জেলের প্রয়োজনীয় কম্বল তৈরীর চেষ্টা করা হয়েছিল, সে পরিকল্পনা পুরোপুরি করবার আগেই দেশটা স্বাধীন হয়ে গেল অর্থাৎ ঢাকা জেল পড়ে গেল পাকিস্তানে। কম্বল তৈরী হল না। স্বাধীনতার পর হয়তো জেলে কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের বাদ্যযন্ত্রটি ছোট বড় জেলের হাজার হাজার বন্দী ও জেল হাসপাতালগুলির জন্য প্রতি বৎসর অসংখ্য কম্বল কিনতে হয়। ঠিকাদারের মারফৎ কিনতে অনেক বেশী টাকা যায় হয়। জেলের প্রয়োজন যদি জেলেই তৈরী কম্বল দিয়ে মেটানো যায়, তাহলে পাবলিক মানি প্রচুর পরিমাণে বেঁচে যায়।

কিন্তু সেই চমৎকার পরিকল্পনাটি আধখানা হয়ে ঠেকে রয়েছে গত কয়েক বছর ধরে। কেন আর কাজ এগোচ্ছে না? এখন প্রয়োজন বয়লারের। বয়লার স্টীম তৈরী করবে আর সেই স্টীমে রোলিং ও ওয়াশিং চলবে। সরকারী অর্থ এমনিভাবে আটকে রাখা হয়েছে বলে, জানতে পারলাম, এ্যাকাউনটেন্ট জেনারেলের অডিট পার্টি প্রতি বছর কড়া কড়া মন্তব্য লিখে যাচ্ছেন, অথচ কাজ এগোচ্ছে না কিছুই। রজনীবাবু ত বলেই গেছেন, ওসব নিয়ে, মিঃ গাঙ্গুলী, আমি আদৌ মাথা ঘামাইনে, ফাইল ছুঁয়েও দেখিনে। গভর্ণমেন্টের কাছে অডিট রিপোর্ট পাঠিয়ে দিই, ব্যস, আমার কাজ শেষ। কর্তারা তারপর কি করলেন বা কি করবেন, ওসব নিয়ে কি হয়রান গায়ে পড়ে আমার লেখালেখি করবার? আপনিও তাই করবেন মিঃ গাঙ্গুলী!

কিন্তু রজনীবাবুর জানা ছিল না যে, মিঃ গাঙ্গুলীর মাথায় একটা পোকা আছে।

সেই পোকাটা মাথার মধ্যে নড়ে উঠল। স্থির করলাম, এ নিয়েই কলম ধরতে হবে। ফাইলের কর্মালিটির বন্ধুর পথে কোন্ পার্টিমেন্ট পয়েন্টের গর্ত্তে পড়ে গিয়ে কমল ক্যাস্টরীর নাভিশ্বাস উঠছে, খুঁজে বার করে ব্রেক লাগাতে হবে। কোন্ প্রপার চ্যানেলের আইসবার্গে ধা খেয়ে ক্যাস্টরীর টাইটানিক অর্ণবপোত নিমজ্জমান, দেখতে হবে। সবার আগে চাই বয়লার, চাই স্টীম।

অফিসে এসেই এ্যাকাউনটেন্ট কিরণবাবুকে বললাম সব, আর বললাম কমল ক্যাস্টরীর ফাইলটা আমায় দিতে।

ফুলোবালি ঝেড়ে ফাইলগুলো টেবিলে নামিয়ে রাখতে রাখতে কিরণবাবু বললেন, এ স্যার, অনেক ঝামেলার ব্যাপার। বয়লার সাপ্লায়ার ঠিক হয়ে গিয়েছিল, তাদের কাছে অর্ডারও প্লেস করা হয়েছিল। তারা তখন বলল, আমেরিকার যে কোম্পানীর সঙ্গে ব্যবস্থা করে ওরা যে রকম বয়লারের কোটেশন দিয়েছিল, সেই কোম্পানী লিখে পাঠিয়েছে যে, তারা ওরকম বয়লার তৈরী বন্ধ করে দিয়েছে তাদের স্টকেও ওরকম বয়লার নেই। সুতরাং বয়লারের কন্ট্রাক্টার লিখে পাঠিয়েছে যে, কিছু কম দামে তারা প্রায় একই কোয়ালিটির বয়লার সাপ্লাই করতে পারে। ব্যস, সেইখানে এসেই কাজ বন্ধ হয়ে আছে। টেণ্ডার অনুযায়ী যে জিনিষ ও যে রেট এ্যাকসেপ্ট করা হয়েছে, সেই জিনিষও পাওয়া যাচ্ছে না এবং সেই রেটেও নয়। সুতরাং নতুন করে টেণ্ডার ডাকা হবে, না গভর্ণমেন্টের বিশেষ অনুমোদন নিয়ে সামান্য দাম কমিয়ে কেনা হবে, সেই প্রশ্নটারই মীমাংসা হচ্ছে না।

বললাম, দেখা যাক আমি সেই প্রশ্নটার মীমাংসা করাতে পারি কি না।

অবিশ্বাসের মৃদু হাসি কিরণবাবুর মুখে দেখা গেল, মৃদুস্বরে বললেন, আগেকার সাহেবরা, স্যার অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কিছুই করতে পারেননি। ভীষণ ঝামেলা—

আর ঝামেলা! মাথার পোকাটা বুঝি ততক্ষণে লাফালাফি সুরু করে দিয়েছে। হয়নি, হবে না, পারেনি, পারবেন না, এসব কথা তখন কি আর শুনতে চাই? সীমাহীন ঝামেলা আর সংখ্যাহীন জট থাকলেও মাথায় আমার যখন একবার ঢুকেছে যে, এই মৃত ক্যাস্টরীর প্রাণ সঞ্চার করতে হবে, একে পুরো দমে চালু করতে হবে, তখন কোনো হতাশার নজিরই আমায় আর নিবৃত্ত করতে পারবে না।

সুতরাং ফাইলগুলো টেনে নিয়ে বললাম।

[ক্রমশঃ

প্রফুল্ল : গিরিশচন্দ্র

সুজন রায়

[মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ বহু নাটক লিখেছেন। তার মধ্যে যে কয়টি নাটক কালজয়ী সৃষ্টি রূপে সমাদৃত, প্রফুল্ল তার অন্যতম। এই সামাজিক নাটকে নাট্যকার তৎকালীন এক বাঙালী গৃহস্থ ঘরের যে চিত্র অংকিত করেছেন তা আজো মনকে আলোড়িত করে। সেই নাটকের কাহিনীটি পরিবেশিত হল।]

এক

একটানা ত্রিশ বছর পরিশ্রম করে দরিদ্র অবস্থা থেকে যোগেশ ঘোষ সততা ও কর্মোদ্দীপনার ফলে আপন সৌভাগ্য সৃষ্টি করে নিয়েছেন, বর্তমানে প্রৌঢ় বয়সে তিনি প্রভূত সম্পত্তির মালিক। সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর সুনাম সর্বত্র। জননী উমাসুন্দরী, স্ত্রী জ্ঞানদা, শিশুপুত্র যাদব, মেজ ভাই রমেশ, ছোট ভাই সুরেশ এবং মেজ ভ্রাতৃবধূ প্রফুল্ল—এই নিয়ে তাঁর সুখের সংসার—তাঁর সাজানো বাগান।

মার বৃন্দাবন যাবার ইচ্ছা, যোগেশ তার ব্যবস্থা করেছেন এবং নিজেও কিছুদিন তীর্থভ্রমণ করে আসবেন পরিকল্পনা করেছেন। কিন্তু তার আগে সম্পত্তি ভাগের দলিল করে যাবেন, এই তাঁর ইচ্ছা। সেই উদ্দেশ্যে একটা লেখাপড়া করার জন্য তিনি মেজভাই রমেশকে ডেকে যথাযথ নির্দেশ দিলেন। এমন সময় এক আকস্মিক দৈব বিপৎপাত উপস্থিত হল। বিশ্বস্ত পুরাতন কর্মচারী পীতাম্বর এসে জানাল, বি-ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ফেল হয়েছে। সেই ব্যাঙ্কেই যোগেশের যথাসর্বস্ব ছিল। এই আচমকা আঘাত তিনি সামলাতে পারলেন না। ক্লান্তি দূর করবার জন্য তিনি সামান্য পরিমাণে মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিলেন এখন "আবার ফকির হলুম" বলে মনের জ্বালা জুড়োতে সেই মদই অপরিমিত ভাবে পান করতে লাগলেন।

রমেশ ছিল যেমন কুচক্রী তেমনি স্বার্থপর। সে যখন শুনল যে দাদা বিষয় তিন ভাগ করেছেন, তার এক ভাগ পাবে ছোট ভাই সুরেশ, তখন সে ছোট ভাইকে ঠকিয়ে তার বিষয় বাগাবার মতলব করল। সুরেশ লেখাপড়া শেখেনি, আড্ডা দিয়ে বয় সঙ্গে মিশে বেড়াতো। রমেশ জানতো, কাঙালীচরণ এবং জগমনি নামে এক ধুরন্ধর মহাজনের কাছে সুরেশ হাণ্ডনোটে টাকা ধার করে। তাই রমেশ সোজা কাঙালীচরণের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। কাঙালীকে বশ করবার সপক্ষে রমেশের হাতে একটি অমোঘ অস্ত্র ছিল। কাঙালী ছিল জেলারী আসামী। বর্তমানে হরিহর ভাক্তার নাম নিয়ে কলকাতায় ডিসপেনসারি

খুলে বলেছে। রানাঘাটে যে স্ত্রীলোকটির সঙ্গে সে ফেরার হয়েছিল তার ভাইপো কাগজপত্র নিয়ে কাঙালী-চরণের বিরুদ্ধে মামলা করবার উদ্দেশ্যে রমেশেরই শরণাপন্ন হয়েছিল। ঐ কাগজপত্রই রমেশের হাতিয়ার। কাজেই রমেশের কথায় রাজি না করে কাঙালীচরণের উপায় ছিল না। কাঙালীর দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে রমেশও তাকে নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে বিলম্ব করল না। সে কাঙালীকে বলল, যেভাবেই হোক, কোম্পানির কাগজে তারা যেন সুরেশের একটা স্বাক্ষর জোগাড় করে, অর্থাৎ তার বিষয়ের খবরটা রমেশ কিনে নিতে চায়। কিন্তু সুরেশকে প্রতারিত করা সম্ভব হল না। নিজে বিপথগামী হলেও সুরেশের মনটা ছিল খাঁটি। আর সৎ ও মহৎ দাদার প্রতি তার ছিল অসীম শ্রদ্ধা। তাই সে কাঙালী ও রমেশের প্রস্তাবে রাজী হল না।

কিন্তু তার তো ফুর্তি করবার জন্য টাকা চাই। কাঙালী তাকে টাকা দিল না। তখন সুরেশ প্রফুল্লর কাছে এলো এবং দাদাকে ভাল করবার জন্য মাদুলী এনে দেবে বলে প্রফুল্লর কাছ থেকে মাকড়ি চেয়ে নিয়ে গেল—উদ্দেশ্য, সেটা বন্ধক দিয়ে কিছু অর্থ সংগ্রহ করা। কিন্তু মাকড়ি তো ফেরৎ পাওয়া চাই। তাই সে রমেশের নামে একখানা কাগজে লিখে রেখে গেল "বেজদাদা, বেজবৌদির মাকড়ি নিয়ে অমরা পোদ্দারের দোকানে দশ টাকায় বাঁধা দিয়েছি।" তার বিশ্বাস ছিল, সেই চিরকুট পড়ে রমেশ নিশ্চয়ই মাকড়ি ছাড়িয়ে আনবে। কিন্তু ঐ মাকড়িকে সূত্র করেই রমেশ এক ভীষণ ষড়যন্ত্র করল।

পরদিন যোগেশ মদের নেশা কেটে যাবার পর অনুতপ্তচিত্তে স্থির করলেন, সম্পত্তি বিক্রি করে পাওনাদারদের টাকা শোধ করবেন। রমেশ সম্পত্তি জানবার নামে বেনামী করার প্রস্তাব করতে যোগেশ বললেন, "লোকের কাছে জোচ্চোর হব! আমার সর্বনাশ হয়েছে বটে, কিন্তু বড়দলা করে বলতে পারি কখনো প্রবঞ্চনার দিক দিয়ে চলি নি।" এই সময়ে রমেশ মরণাপন্ন ছেলেকে ত্রাণ দেবার অছিলায় মদের বোতলটি যোগেশের সামনে রেখে গেল। তার উদ্দেশ্য স্পষ্ট: "বিষয়গুলো যে ব্যাপারি ব্যাটারা বেচে নেবে, তা প্রাণে সইছে না। দাদা যখন মদ ধরেছে সই করে নেবার কথা ভাবি না। আজই হোক, কালই হোক, মর্টগেজ সই করিয়ে নিচ্ছি। ভাবনা রেজেষ্ট্রির, তা তখন দেখা যাবে। মদ আমার সহায়, ছুঁতে দেওয়া হবে না, দাদাকে আজই মদ খাওয়াতে হবে। দাদাকেও ফাঁকী দেওয়া চাই, ব্যাপারি গুলোকেও ঠকানো চাই।"

রমেশের উদ্দেশ্য সফলও হল। সে চলে যাবার পর যাদব এসে খবর দিল, "বাবা, ছোট কাকাবাবু চোর হয়েছে, কাকীমার মাকড়ি নিয়ে গেছে।" বলা বাহুল্য এই ঘটনার মধ্যে রমেশের কারসাজি ছিল।

এই ভয়ংকর সংবাদ শুনে যোগেশ আবার ভেঙে পড়লেন। সামনেই ছিল মদের বোতল। হতাশায় বেদনায় তিনি আবার মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান সুরু করলেন। এই সুযোগে রমেশ সাদা কাগজে যোগেশকে দিয়ে সই করিয়ে নিল। এমনি ভাবে মানী যোগেশের মৃত্যু হল, সৃষ্টি হল মাতাল যোগেশের।

দুই

দিন দুই পরে রি-ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের দেওয়ান একটি শুভসংবাদ নিয়ে যোগেশের সঙ্গে দেখা করতে এল। ব্যাঙ্ক সামলে উঠেছে এবং শিগগিরই মজেলদের টাকা দিতে আরম্ভ করবে। কিন্তু রমেশ দাদার অসুখ বলে তাকে কৌশলে ফিরিয়ে দিল এবং খবরটা চেপে গেল। তারপর মাকড়ি চুরীর দায়ে সুরেশকে পুলিশে ধরিয়ে দেবার ভয় দেখিয়ে তার পেয়ারটা লিখিয়ে নেবার জন্য সে কাঙালীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করল।

আরও ষড়যন্ত্র করল যে যোগেশ-কর্তৃক আগেকার সইকরা মর্টগেজ সে কাউকে মুহুরি চাঁদ ধুরুরিয়া নামে জাল মাক্তোয়ারী সাজিয়ে তার নামে রেজেস্ট্রী করে নেবে। এ বিষয়ে পীতাম্বরকে হাত করতে পারলে সুবিধা হতে পারে ভেবে সে পীতাম্বরকে ডেকে তাকে ভোলাবার প্রয়াস পেল। রমেশের কপট বাক্য বিন্যাসে সে চেষ্টা কার্যতঃ সফলও হল। তারপর রমেশ কৌশলে জানদাকেও নিজের দলে ভেড়াবার চেষ্টা করল। যোগেশকে দলিল রেজেস্ট্রি করে দিতে রাজী করাবার জন্য সে জানদাকে অনুরোধ করল। এই রকম না করলে নাকি বিষয় রক্ষা করা যাবে না, সকলকে পথের ভিখারী হোতে হবে—রমেশ জানদাকে বোঝালো।

তারপর ইন্সপেক্টার হাবুল এসে জানালো, যাকড়ি চুরীর তদন্ত করতে গিয়ে সে জেনেছে, সুরেশ সেটা চুরী করেছে। তবে কিছু খরচপত্র করলে সে অন্যভাবে মামলা সাজিয়ে সুরেশকে চুরীর দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়াতে পারে। কিন্তু রমেশ তাতে রাজী হোতে পারে না, কারণ তাহলে তো তার আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। তাই কপট সাধু সেজে বললে, "আমি একজন নির্দোষীকে সাজা দেওয়াবো? আমার প্রাণ থাকতে হবে না। লেট জাস্টিস্ টেক ইটস্ কোর্স।"

হাবুল রমেশের কপটতা বুঝতে পারলো। সে চলে গেল।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় বিয়ে-পাগলা বুড়ো মদন ঘোষকে নিয়ে বন্ধু শিবনাথের সঙ্গে সুরেশ কাঙালীচরণের বাড়ি এলো। তার সঙ্গে কয়েকজন খেমটাওয়ালীও এসেছে। মদন ঘোষের সঙ্গে কৌতুক করে তার বিয়ের আয়োজন করেছে সুরেশ। একজন খেমটাওয়ালীর সঙ্গে মদনের বিয়ে দেবে স্থির করেছে।

নানা কৌতুক কাণ্ড চলেছে এমন সময়ে পুলিশ এসে সুরেশ ও শিবনাথকে ধরল। সুরেশ ইচ্ছা করলেই সত্য ঘটনা বলে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারতো, অর্থাৎ সে বলতে পারতো, যাকড়ি সে চুরি করেনি, তার বেজবৌদি তাকে স্বেচ্ছায় দিয়েছে। কিন্তু তাতে কুলবধূর অপমান হবে, প্রফুল্লকে কোর্টে গিয়ে সাক্ষ্য দিতে হবে, সেকথা ভেবে সে দোষ কবুল করল। কেবল তাই নয় কাঙালী যখন মিথ্যা করে নোটচুরীর অজুহাতে শিবনাথকেও ধরিয়ে দিতে চাইল তখন সুরেশ সেই মিথ্যা চুরীর দায়িত্বও নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়ে বন্ধুকে বাঁচালো।

বিচারে সুরেশের পনর দিন সশ্রম কারাদণ্ড হল।

তিন

সুরেশকে জেলে পাঠাবার পর রমেশ সম্পত্তির দখল নেবার জন্য উদ্যোগ করল। পীতাম্বর সেই পথের অন্তরায় বলে তাকে ঘুষ দিয়ে বশীভূত করবার জন্য কাঙালীকে সে পীতাম্বরের কাছে পাঠাল। কিন্তু রমেশের উদ্দেশ্য সফল হল না।

তারপর জানা গেল, রমেশ তার মক্কেলের পক্ষে যোগেশের বাড়ি দখল করেছে এবং যোগেশকে বাড়িতে ঢুকতে দেয় নি।

এরপর রমেশ জেলে গিয়ে সুরেশের সঙ্গে দেখা করল। আপীল করে সুরেশকে জেল থেকে খালাস করে নিয়ে যাবে রমেশ, সেজন্য টাকার প্রয়োজন, কিন্তু সুরেশ সই না করলে তার বখরা বাঁধা রেখে টাকা তোলা যাবে না।

এই মিথ্যা কথায় ভুলিয়ে সুরেশকে দিয়ে একটা দলিলে সই করিয়ে নেবার জন্য রমেশ

কাঙালীচরণকে নিয়ে জেলে সুরেশের সঙ্গে দেখা করল। সাক্ষী হিসাবে কাঙালীচরণকে দেখে সুরেশের মনে সন্দেহ জাগল, সে সই করতে চাইল না। কাগজ ছিঁড়ে ফেললো।

দিন পাঁচেক পরে। যোগেশ উমাসুন্দরীকে নিয়ে সপরিবারে জানদার বাড়ি উঠে এসেছেন। সুরেশের যে জেল হয়েছে তা উমাসুন্দরী জানতেন না। সেদিন পীতাম্বরের কাছে জানা গেল, সম্ভবতঃ ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ফিরে পাওয়া যাবে।

পীতাম্বর যোগেশকে নিয়ে ব্যাঙ্কে যাবার জন্য বেরুলো, কারণ, একখানা চেকবই আনতে হবে। যোগেশ রমেশের নামে যে টাকা জমা দেবার অ্যাডভাইস ব্যাঙ্কে দিয়েছিলেন সেটা খারিজ করতে হবে এবং সুরেশকে ছাড়িয়ে আনবার জন্য টাকা তুলতে হবে। রাস্তায় গরাণহাটায় মোড়ে পড়ল শুঁড়ীর দোকান। কাছাকাছি ব্যাপারিদের দেখে যোগেশ পীতাম্বরকে গাড়ী আনবার জন্য পাঠালেন, কারণ তাদের সামনে দিয়ে পায়ে হেঁটে তিনি যাবেন না। পীতাম্বর চলে যাবার পর যোগেশ ব্যাপারিদের সামনে পড়ে গেলেন। তারা যোগেশকে জোচ্চোর বলে গালাগাল দিলে। ক্ষোভে দুঃখে যোগেশ ভাবলেন ফিরে যাবেন। ইতিমধ্যে একজন নীচজাতীয় স্ত্রীলোক এসে নেশার ঘোরে যোগেশকে জোচ্চোর বলল। এরপর যোগেশ যেন আত্মবিস্মৃত হলেন, সবাই তাঁকে জোচ্চোর বলছে। তবে আর কিসের লজ্জা! এইরূপ মন নিয়ে তিনি শুঁড়ীর দোকানে ঢুকে আকণ্ঠ মদ্যপান করলেন এবং রাস্তায় এসে মাতালদের সঙ্গে নৃত্য করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত পীতাম্বর তাঁকে ধরাধরি করে বাড়ি নিয়ে গেল।

পরদিন কৌশল করে জগমনি এসে উমাসুন্দরীকে জানিয়ে গেল যে সুরেশের জেল হয়েছে। এই মর্মান্তিক খবর শুনে উমাসুন্দরী পাগল হয়ে গেলেন।

যোগেশ বদ্ধ মাতালে পরিণত হলেন। মত্ততার ঘোরে তিনি ইট ছুঁড়ে পীতাম্বরের মাথা কাটিয়ে দিলেন।

চার

তিন মাস পরের ঘটনা।

সুরেশ জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে এবং শিবনাথের বাড়িতে আছে। জেলে মেটের প্রহারের ফলে সুরেশ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল এবং তার মুখ দিয়ে রক্ত উঠেছিল। অতঃপর তাকে জেল হাসপাতালে পাঠানো হয়। তারপর খালাসের দিন শিবনাথ গিয়ে তাকে মৃতপ্রায় অবস্থায় নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছে এবং সেবা শুশ্রূষা করে তাকে ভাল করে তুলেছে।

শিবনাথের কথায় জানা গেল, জানদা বাড়ি বিক্রি করে কোথায় চলে গিয়েছে, বহু অনুসন্ধানেও তা জানা যায়নি। যোগেশ এখন বদ্ধ মাতাল অবস্থায় পথে পথে মাতালদের সঙ্গে মদ খেয়ে বেড়াচ্ছেন। পীতাম্বর অসুস্থ অবস্থায় বেশে আছে, তবে পত্র দিয়েছে একটু সুস্থ হলেই সে আসবে।

সুরেশকে দেখতে যে ডাক্তার এলো, সে জানালো যে সে রমেশ ও কাঙালী দু'জনকেই মিথ্যা সংবাদ দিয়েছে যে সুরেশের মৃত্যু হয়েছে।

দিন দুই পরেই জানা গেল, পীতাম্বরকে কৌশলে কৌজদারী মামলায় গ্রেপ্তার করানো হয়েছে এবং সেই বিয়ে-পাগলা বুড়ো মদন ঘোষ কাঙালীর কথায় বশীভূত হয়ে জানদাকে ফাঁকী দিয়ে তার নিষ্কর ভেঙে বাড়ির দলিল চুরী করে এনেছে।

মুহূর্তটায় বুঝিয়া পাইবে কে? কাঙালী বলিল, ভজহরি নামে তার এক বখাটে ভাগনে আছে সে এ কাজের খুব উপযুক্ত। কাঙালীর বাড়িতে রমেশ ভজহরিকে ডেকে তার করণীয় কি তা বুঝিয়ে দিলে।

ইতিমধ্যে জানদা এক বস্তী বাড়িতে উঠে এসেছে। যোগেশ সেখানে গিয়েও মদ খাবার জন্য জানদার কাছে পয়সা চাইলেন। যোগেশের এখন আর কোন লজ্জা সরম নেই। ভিক্ষা করেও তিনি মদ খান। কয়েকদিন আগে তিনি জানদার বাড়িথেকে তিনশো টাকা চুরি করে মদ খেয়ে উড়িয়ে দিয়েছেন।

এবার জানদা যখন টাকা দিতে রাজী হল না তখন যোগেশ জানদাকে লাথি মেরে টাকার বাক্স নিয়ে চলে গেলেন। সামান্য টাকা—মাত্র তিনটি—তাও বাসন বাঁধা দিয়ে জানদা যোগাড় করেছিল।

যোগেশ চলে যাবার পর বাড়ীওয়ালা এসে জানদাকে দশ কথা শুনিয়ে দিল। "ভাড়া যদি দিতে না পারো এখনি বাড়ি ছেড়ে চলে যাও।" অগত্যা জানদা যাদবের হাত ধরে বস্তীবাড়ি ছেড়ে পথে দাঁড়ালো।

এ দিকে প্রফুল্ল জানতে পারলো যে রমেশ ও জগমণি যাদবকে ধরে এনে তাকে মেরে ফেলবার ষড়যন্ত্র করছে।

যোগেশকে দেখা গেল রাস্তায় ঘুরছেন। তারপর শিবনাথের সঙ্গে ভজহরির দেখা হল। ভজহরি তাকে রমেশের ষড়যন্ত্রের কথা জানালো।

সেই দিনই রাস্তায় জানদার মৃত্যু হল। যোগেশ সেখানে উপস্থিত হয়ে জানদার মৃত্যু দেখলেন, তারপর বুকফাটা হাহাকার করে উঠলেন—"আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল।"

পাঁচ

রমেশ মনে মনে খুব উৎফুল্ল: "বৌ মারা গিয়েছে, সুরেশও মারা গিয়েছে, আমি আজ ডাক্তারকে ভাল করে জিজ্ঞাসা করলেম। এখন ছেলেটা কোথায় গেল। সেটাকে ধরতে পারলেই যে আপদ চোকে।"

তারপর জগমণির প্ররোচনায় মদন ঘোষ যাদবকে ধরে নিয়ে এলো। এবং রমেশেরই বাড়ির একটা গোপন মহলে তাকে বন্ধ করে রাখা হল। উদ্দেশ্য—ঔষধ প্রয়োগ করে তাকে হত্যা করা হবে।

সেইদিন সন্ধ্যায় জানদার মৃতদেহ সৎকার করবার জন্য সুরেশ শ্মশান ঘাটে এসেছে। সঙ্গে শিবনাথ ও ভজহরি।

যাদবকে খুঁজে বার করবার জন্য সুরেশ লোক লাগিয়েছিল। সে এসে খবর দিলে, একজন মহিলা বলেছে, একটি ছেলে খাবার কিনতে এসেছিল, এক বুড়ো এসে তাকে ডেকে নিয়ে গেছে।

এ থেকে ভজহরি আন্দাজ করল, সেই বুড়ো আর কেউ নয়, মদন ঘোষ, তার মামীর অনুচর।

ইতিমধ্যে রমেশ সেখানে এসে উপস্থিত হল। তার সঙ্গে আলাপ করে ভজহরি বুঝলো, যাদব রমেশের বাড়িতেই আছে। সুরেশ বেঁচে আছে জেনে হতাশাক্ষুব্ধ রমেশ সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচলো। ভজহরি শিবনাথ ও সুরেশকে নিয়ে রমেশের বাড়ির দিকে রওনা হল।

সকলে চলে যাবার পর শ্মশান ঘাটে এলেন যোগেশ। তাঁর মুখে সেই হাহাকার—আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল।

এদিকে প্রফুল্লর কথায় মদন ঘোষের মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিল, তার শুভবুদ্ধির উদয় হল। সে যাদবকে বাঁচাবার জন্য প্রফুল্লকে সর্বপ্রকার সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিল।

সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় যাদবকে মেরে ফেলবার জন্ত আয়োজন করল রমেশ কাঙালী ও জগবন্ধি।

যাদবকে বিষ খাওয়ানো হল।

যাদব বুঝতে পেরেছে যে তার মৃত্যু আসন্ন। সে জল খেতে চাইল। কিন্তু জগবন্ধি তাকে জল দিল না।

এমন সময় প্রফুল্ল এসে যাদবকে জল দিল এবং তাকে কোলে করে বসল। মদন ঘোষও এসে পড়ল, বললে, আমি আর কাউকে ভয় করি না। ধর্মরাজ রক্ষা কর। আমি এই ওষুধ এনেছি, খাইয়ে দাও। যাদব ভাল হয়ে উঠবে।

রমেশ প্রফুল্লকে চলে যেতে বললে। কিন্তু প্রফুল্ল কিছুতেই যাদবকে ছেড়ে চলে গেল না। তখন হিংস্র কিন্তু হিতাহিতজ্ঞানশূন্য রমেশ প্রফুল্লর গলা টিপে ধরে তাকে হত্যা করল।

এমন সময় সুরেশ, শিবনাথ ও ডাক্তারি পুলিশ সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হল এবং রমেশ, কাঙালী ও জগবন্ধিকে গ্রেপ্তার করা হল।

উমাসুন্দরী এলেন। তিনি বদ্ধ উন্মাদ। বিলাপ করতে করতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।

সর্বশেষে এলেন যোগেশ, অর্ধউন্মাদ, চোখের দৃষ্টিতে বিহ্বলতা। চারিদিকে তাকিয়ে বললেন, "এই যে আমার বাড়ীই ঘটনা, যত্তা পুড়িয়ে সব এইখানে এনেছে। এই যে মেয়ে, এই যে মা, এই যে রমেশ। দেখছো, দেখ, মরবার সময়ও দেখবে। দেখ, দেখ। আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল। আহা হা! আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল।"

• • • •

১৯৪২ সালের এপ্রিল……ভয়াবহ মহাযুদ্ধ চলেছে পৃথিবীতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডেলানো রুজভেল্ট শত কার্যের মধ্যেও বিস্মৃত হলেন না একটি কর্তব্য পালন করতে। আমেরিকার পুস্তক বিক্রেতাদের কাছে এক বাণী পাঠালেন তিনি। বললেন বই অগ্নিতে দগ্ধ হবার নয়। মানুষ মরে যায় কিন্তু বই মরে না। কোন শক্তি বা মানুষ স্মৃতিকে বিনষ্ট করতে পারে না। আমরা জানি, এইযুদ্ধে বই হল একটি অমর অস্ত্র।

প্রতিটি সংস্কৃতি-প্রেমিকের মনে সেদিন নতুন আশার আলো জ্বলে উঠেছিল এই কথায়।

নটরাজ

সুবোধ বসু

নিরুপায় হয়েই দেবরাজকে ছুটে যেতে হলো। যেতে হলো বিষ্ণুলোকে। এসব কি অরাজকতা শুরু হয়েছে স্বর্গলোকে! এখানে ওখানে সর্বত্র বিক্ষোভ। জ্বালাময়ী বক্তৃতা। এমন কি এপারথেত্তের নিয়ম পর্যন্ত মানছে না। নরকের লোকেরা পর্যন্ত স্বর্গে হাজির হয়ে আন্দোলনকারীদের সমর্থন করছে।

এ রকম তো আগে কখনও দেখেন নি। এ রকম স্লোগানও শোনেন নি। চরম গীর্ভিসন তো বটেই। এমন কি 'ব্লোশকেমি'! 'চলবে না, চলবে না জুলুমবাজী চলবে না।' 'কালিজয় নিপাত যাও।' 'সাম্রাজ্যবাদ, নিপাত যাও।' 'ঈশ্বরের ডিক্টেটরশিপ রুখতে হবে।' 'গুড গবর্নমেন্ট ইজ নো সাবস্টিটিউট ফর্ সেলফ্ গবর্নমেন্ট।' স্বর্গলোকে আইন ও শৃঙ্খলার এমন বিপর্যয় করে কে শুনেছে? স্বর্গ-পুলিসের ধমক ও চোখ রাঙানিকে পরোয়াই করছে না। আর মারেরও কোনও ভয় নেই। পিটলেও দেহহীন আত্মার গায়ে ব্যথা লাগে না। এ এক মহাসমস্যা! কি করে এই অবস্থা আয়ত্তে আনা যায়? নিরুপায় হয়ে ইন্দ্র বিষ্ণুলোকে বিষ্ণুর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

'কি খবর তোমার দেবরাজ? বহুদিন দেখা নেই।' প্রায় আধঘণ্টার পর বিষ্ণু বৈঠকখানায় পান চিবুতে চিবুতে হাজির হয়ে বললেন, 'সকালে উঠতে দেরি হয়েছে, তাই ব্রেকফাস্টটাও দেরিতে। বলো। কি খাবে বলো? ঠাণ্ডা না গরম?'

ইন্দ্র তাড়াতাড়ি আসন ত্যাগ করে পদস্পর্শ করে বিষ্ণুকে প্রণাম করার পর দাঁড়িয়েই ছিলেন, প্রভুর আদেশে তাঁর খুব কাছেই একটি আসন টেনে নিয়ে বসলেন।

'মহা বিপদে পড়ে আপনার কাছে হাজির হয়েছি প্রভু। আগে সব কথা নিবেদন করি...'

'আবার কোনও বাঁদরামি করতে যাওনি তো?' মুচকি হেসে বিষ্ণু বললেন।

'বাঁদরামির কথাই জানাতে এসেছি। তবে আমার নয়। স্বর্গে এবং নরকে নতুন আসা কতগুলি ভ্যাগাবোন্ড কীবাত্মার। স্বর্গের সকল শান্তি এরা নষ্ট করেছে। রাস্তাগুলি বিক্ষোভের জায়গা হয়েছে। সারাক্ষণ শুধু 'চলবে না' 'চলবে না' ধ্বনি। স্বর্গে নরকে তফাৎ করা চলবে না। পাপ-পুণ্যে তফাৎ করা চলবে না। ঈশ্বরের ডিক্টেটরশিপ রুখতে হবে। জনগণের শাসন চাই। স্বর্গের কোনও নিয়ম মানছে না। নরক থেকে পাদা পাদা লোক চলে আসছে স্বর্গের রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষোভ করার জন্য। আর এসবের উস্কানি দিচ্ছে মাত্র সামান্য কয়জন ব্যক্তি...'

'ওদের দিয়ে দাওনা স্বর্গ চালাবার ভার।' বিষ্ণু মৃদু হেসে বললেন।

'তা হলেই হয়েছে!' ইন্দ্র বললেন। 'মৃত্যুর আগে এরাই একদল নিজেদের এলাকায় গবর্ণমেণ্ট করায়ত্ত করে' নতুন স্বর্গ সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন। ফলে, সর্বত্র খাদ্যাভাব, গুণ্ডামি, ছেনতাই, খুন-জখম, খাওয়া-খাওয়ি, দাঙ্গাবাজী অশৃঙ্খলার চূড়ান্ত। কিন্তু ওদের শখ মেটেনি। ভাবছে স্বর্গেও নিজেদের কারদানি দেখাই। কিন্তু একা ভরসা হচ্ছে না। পাঁচটা দল আগে নিজেদের মধ্যে খাওয়া-খাওয়ি করত। এখন এদের সর্দারেরা নিজেদের ঝগড়া মুলতুবি রেখে একজোট হয়েছে। উদ্দেশ্য প্রবল মিলিত বিক্ষোভের মোগানের হুমকি দেখিয়ে স্বর্গের শাসন-ক্ষমতা হাত করবে…'

'কোন অঞ্চল থেকে এসেছে ওরা?' নারায়ণ প্রশ্ন করলেন।

'সব পৃথিবীর লোক। প্রধানত পূব-পাড়ার থাকত।'

'কিছু বস্তু আছে এদের মধ্যে? মানে প্রকৃত শক্তি?'

'আত্মম্ভরিতা প্রত্যেকের মধ্যেই প্রচুর। প্রকৃত শক্তি একটা কলেজের অধ্যাপকের মধ্যে যতটা, ততটাও নেই।'

'তবে সর্দার হলো কি করে?'

'আস্ফালন করতে পারে, অজস্র কথা বলতে পারে। ধোঁকা দিতে পারে। দল জোটাতে আর চাই কি?' দেবরাজ তিক্ততার সঙ্গে বললেন।

'বড্ড চটে আছ দেবরাজ।' বিষ্ণু মৃদু হেসে বললেন। 'এত লোক যাদের কথায় ওঠে বসে তারা নেহাৎ তুচ্ছ নয়। ডাকোনা একদিন আমার কাছে। একটু বাজিয়ে নিই…'

'অসম্ভব, প্রভু। এদের ভদ্রলোকের কাছে আনা যায় না।' ইন্দ্র উদ্বেগের সঙ্গে বললেন, 'আপনাকে অপমান করতেও ওরা কসুর করবে না। গালাগালিতে এরা আশ্চর্য রকম পারদর্শী। পৃথিবীতে পরস্পরকে গালাগালি দেওয়াটাই এদের মুখ্য কাজ ছিল…'

'কিন্তু স্বর্গে এসে তারাও যখন মিলতে পেরেছে…'

'ঘোড়ার ডিম মিলতে পেরেছে।' বলেই ইন্দ্র সভয়ে নিজের জিব কাটালেন। সভয়ে বললেন, 'ক্ষমা করুন প্রভু, এদের বদমাসি দেখে ভাষার সংযম পর্যন্ত রক্ষা করতে পারছিনে। মিলেছে ক্ষমতালাভের লোভে। যেই উদ্দেশ্য সাধন হলে লুটের মালের ভাগাভাগি নিয়ে আবার খাওয়া-খাওয়ি শুরু হয়ে যাবে। এই করেই তো পৃথিবীটাকে ওরা রসাতলে পাঠাবার অবস্থা করেছে—'

'তা হোক, একদিন ডাকো ওদের।' নারায়ণ সিদ্ধান্তের কণ্ঠে বললেন।

'তথাস্তু প্রভু।' ইন্দ্র দাঁড়ালেন, 'তাহলে স্বরাষ্ট্রদপ্তরটা হয়ে যাই।'

'আর শোনো, দুপুরের লাঞ্চ আমাদের সঙ্গেই করো! এই দুপুরে না-খেয়ে ইন্দ্রলোকে ফিরে গিয়েছে শুনলে লক্ষ্মী আমার ওপর খাপ্পা হবেন।'

বিশ্ব-গবর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্রদপ্তর বিষ্ণুলোকে। ইন্দ্র সেখানে হোমসেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করে' নারায়ণ-আদিষ্ট কনফারেন্সের ব্যবস্থা করবার জন্য গেলেন।

নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে বিষ্ণুলোকের নীলকান্তমণি হলে ভগবানের সঙ্গে বিক্ষোভকারী পৃথিবী-আগত

আকাশের মাতব্বরদের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বসল। ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ প্রভৃতি নিমন্ত্রিত হয়েছেন দেবতাদের প্রতিনিধি হিসেবে। বিশেষ অতিথি হিসেবে ব্রহ্মা বিষ্ণুর পাশেই উপবিষ্ট।

শিব আসেন নি। ইন্দ্র নিমন্ত্রণ করতে গেলে তাঁকে বলেছেন, 'আমার না যাওয়াই ভালো। যেমন বলছ, তাতে কখন রেগে গিয়ে তাণ্ডব শুরু করব, ঠিক নেই। বিষ্ণুই সাধুখান। তিনিই স্থিতির অধিকর্তা।'

ইতিমধ্যেই কনফারেন্সের বিধি-পদ্ধতি সম্বন্ধে ইন্দ্র চন্দ্র বরুণের সঙ্গে পৃথিবী-আগত নেতা-আত্মাদের বহু বচসা হয়ে গেছে। বিষ্ণু উভয় দলকেই শান্ত করেছেন। মতামত গ্রহণের কাজও অগ্রসর হয়েছে। এক দলের নেতাকে ডাকা হয়। তাঁর বক্তব্য শ্রবণ ও জেরা-আদির পর অপর দলের নেতা তাঁর অভিযোগ, যুক্তিতর্ক, এমন কি হুমকি নিয়ে এগিয়ে আসেন।

'বলুন, চন্দ্রবিন্দু-মশায়, আপনাদের বক্তব্যটা কি?' এইবার ভগবান নতুন বিরোধী-নেতাকে সম্বোধন করে বললেন।

'সাদা কথায় বক্তব্যটা এই যে, আপনার গবর্ণমেন্ট অত্যাচারী ও অপটু গবর্ণমেন্ট। পৃথিবীতে আমরা এই শাসনের কি দেখেছি? রোগ-যন্ত্রণা, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ভূমিকম্প, যুদ্ধ। লোক মারবার জন্য এত কষ্ট দেওয়ার কি দরকার? অতি সহজেই মানুষকে পরলোকে নিয়ে আসা চলে। অথচ ব্যথা দেওয়া আপনার সরকারের একটা অপরিহার্য্য পলিসি। নির্ঘাতনে যেন একটা 'স্যাডিষ্টিক' আনন্দ পান...মার কোল থেকে তার রোগ-জর্জরিত সন্তানকে কেড়ে নেন, যুবতীর প্রেম-বন্ধন থেকে তার স্বামীকে ছিনিয়ে নিয়ে আসে আপনার অনুচরেরা। ক্ষুধার যন্ত্রণায় পুড়িয়ে পুড়িয়ে অসহায় দরিদ্রকে তবে মারেন।...'

'তারা নিজ নিজ কর্মফলে শাস্তি পায় মাত্র।' ইন্দ্র ক্রুদ্ধ স্বরে প্রতিবাদ করলেন।

'চুপ করুন। মোক্তারি করতে আসবেন না,' চন্দ্রবিন্দু জোর ধমক দিয়ে বললেন। 'আমি বিষ্ণুর কাছে আমার বক্তব্য জানাচ্ছি...'

বিষ্ণু মৃদুপৎ বাঁ হাতের তর্জনী তুলে ইন্দ্রকে নিষেধ এবং ঘাড় নেড়ে চন্দ্রবিন্দুর প্রতিবাদ সমর্থন ক'রে বললেন, 'আপনি বলুন।'

'এই সেদিন ভূমিকম্পে বাড়ী চাপা পড়ে, চিড়খাওয়া মাটির ফাটল দিয়ে বেরুলো ফুটন্ত জল ও বালুতে ডুবে যন্ত্রণায় হাহাকার করতে করতে কয়েক হাজার লোক পঞ্চত্ব পেল। এত কষ্ট দিয়ে ওদের ধ্বংস করার কি দরকার ছিল। মারবার তো আরও অনেক সহজ প্রক্রিয়া আছে। রোগ বা ভূমিকম্প হয়তো পৃথিবীর ভুল প্ল্যানিং-এর জন্য হয়, কিন্তু তারও দায়িত্ব আপনার। তারপর যুদ্ধ। কী ভয়ংকর তার তাণ্ডব! কি সর্বনাশ, কি দুর্ভোগই টেনে আনে এই দানব। এই দানব কখন কোথায় ছাড়া পাবে এই আশঙ্কায় পৃথিবীর মানুষের মনে শান্তি নেই...'

'যুদ্ধ মানুষেরই সৃষ্টি। আপনাদের কবিই বলেছেন, হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি...' বরুণ শান্তভাবেই বললেন।

'কিন্তু এই হিংসেটা কোথা থেকে এসেছে মশায় শুনি।' চন্দ্রবিন্দু না দমে পাল্টা জবাব দিলেন। 'মানুষের প্রকৃতির মধ্যে আপনারাই তো এই বৃত্তি পুঁতে দিয়েছিলেন। এ দেবার কি দরকার ছিল?...এই জন্যই আমাকে বলতে হয়েছে, আপনারা ঠিকমত গবর্ণমেন্ট চালাতে পারছেন না। এরচেয়ে অনেক সুষ্ঠুভাবে সভ্যভাবে, সহজ ভাবে গবর্ণমেন্ট চালানো যায়, যদি আপনাদের মত সনাতনপন্থীরা মাঝে মাঝে সরে পড়েন...'

এরপর নেতা বিসর্গের পালা। তিনি এলেই শুরু করলেন, 'আমাদের আপত্তি অন্ বিশিপল্!

রাজ্য ভালোই চালাচ্ছি আর মন্দই চালাই, ডিক্টেটরশিপ চলবে না। যাদের শাসন করা হচ্ছে তাদের মতামত অনুসারে শাসন করতে হবে। এরজন্য চাই ডেমোক্রেসি, সর্বসাধারণের প্রতিনিধিমূলক গবর্ণমেণ্ট। যদি একনায়কত্ব ছাড়তে রাজি থাকেন, প্রকৃত ক্ষমতা ভোটের দ্বারা নির্বাচিত আপামর সাধারণের প্রকৃত প্রতিনিধিদের হাতে সমর্পণ করতে রাজি থাকেন, তবে আমরা নতুন কন্‌স্টিটিউশন গঠনে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত ..'

'আপনি এক সময় আপনার নিজের দেশে মন্ত্রী ছিলেন না?' ইন্দ্র অসহিষ্ণু প্রশ্ন করলেন।

'ছিলাম।'

'সেটাও তো ডেমোক্রেসি ছিল। নিজের ছাড়া আর কতটা হিত করতে পেরেছিলেন?'

'নিশ্চয়ই করেছি। অনেক করেছি। আরও করতে পারতাম। কিন্তু পরের ইলেকশনে আপনারাই আমাকে হারিয়েছেন। নইলে ভোট কাউন্টিং-এর শেষ দিনের সকাল পর্যন্ত আমি লীড্ করছিলাম; তারপর হেরে গেলাম কি করে?..'

'মিনিষ্টার হওয়ার পক্ষে আপনার বিশেষ কোয়ালিফিকেশনটা কি?' বরুণদেব ধীরকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

'কোয়ালিফিকেশন?' কটমট করে তাকিয়ে বললেন বিসর্গ, 'আমি দু'বার জেলে গিয়েছি স্বাধীনতা সংগ্রামে। পাঁচটা ট্রেডইউনিয়নের আমি প্রেসিডেণ্ট। দু'জন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক। কোয়ালিফিকেশন আমার নেই তো কার আছে?'

'এধরণের কোয়ালিফিকেশন আরও অনেকের আছে। মন্ত্রীত্ব আপনার একচেটিয়া হবে কেন? অন্যদেরও চান্স দিতে হয়...'

'তবে ভগবানই বা চিরকাল গদি আঁকড়ে থাকবেন কেন? অন্যদেরও সৃষ্টির ওপর কর্তৃত্ব করবার চান্স দিতে হবে। আর সেটাই আমাদের পার্টির দাবি।' ভারিক্কী চালে বললেন বিসর্গ।

এরপর সিগ্রেট ফুঁকতে ফুঁকতে দাঁড়ালেন খণ্ড-ত নিজ দলের দাবি জানাবার জন্য। 'এটা আবেদন নয়। এটা দাবি, এই কিন্তুভাল ব্যবস্থা আমরা বরদাস্ত করব না। এক সময় ব্রহ্মাণ্ডের উপর জমিদারি ফেঁদেছিলেন। এখন পর্যন্ত সেই জমিদারি চালিয়ে যাচ্ছেন। যত সুবিধে নিজে ভোগ করছেন আর পা-চাটা মোসাহেবদের মধ্যে অনুগ্রহ হিসাবে বিতরণ করে একটা বুর্জোয়া শ্রেণীর সৃষ্টি করেছেন। এই বুর্জোয়াদের পুরোভাগে দেবতারা। তা ছাড়া ব্রহ্মাণ্ডের নানা জায়গায় নানা স্তরের বুর্জোয়া খাড়া করা আছে। তারা শিপলদের দাবিয়ে রাখছে সর্বপ্রকারে। চারদিকে অসাম্য, ইন্‌ইকোয়ালিটি। ধনী-দরিদ্র, শ্রমী-বিশ্রামী, সুন্দর-কুৎসিত, পাপ-পুণ্য, দেবতা-রাক্ষস। নরকের লোকদের স্বর্গের সীমানা থেকে দূরে থাকতে বাধ্য করে ঘৃণা-এপারথেড্ পর্যন্ত চলছে। ভগবানের এই একচোখোমি ঢাকবার জন্য ধর্মালের অভাব নেই। ধর্মগুরুরা প্রচার করেছেন নারায়ণ দরিদ্র-নারায়ণ। তিনি নাকি দরিদ্রদের বিশেষ পক্ষপাত আর সাহায্য করেন। এই সাহায্যের ফল আমরা পৃথিবীতে বহুত দেখেছি। পুঁজিপতির নিষ্পেষণে শ্রমিক আর কিষাণ জর্জরিত। গরিব দু'বেলা খেতে পায় না। মাথার ওপর ছাদ নেই। রোগ হলে বিনা চিকিৎসায় মরে।...কিন্তু আর তারা সহ্য করবে না। এইবার শুরু হবে শ্রেণী-যুদ্ধ। চুরমার করে দেবে প্রিভিলেজ্‌ড ক্লাস। পুরো সাম্য ও স্বাধীনতা প্রবর্তনের জন্য ব্রহ্মাণ্ডের বঞ্চিত ও সর্বহারারা সর্বস্বপণ করবে। ভগবান মশায়, এইবার মানে মানে গদি ছেড়ে সরে পড়ুন। নইলে শিপলদের সঞ্চিত ক্রোধ একদিন আপনাকে ছিঁড়ে ফেলতেও দ্বিধা...'

'মুখ সামলে কথা বলো।' দেবরাজ ইন্দ্র অলন্ত চোখে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন। 'স্বয়ং ভগবানকে শাসাচ্ছ? বজ্র মেরে তোমাকে চুরমার করে দেব…'

'চেষ্টা করে' দেখ। খণ্ড-ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন। 'বাইরে পিপলিকা দাঁড়িয়ে আছে। তারাই তোমার উপযুক্ত ব্যবস্থা করবে। আর চুরমার! অনেকবার সময়ই একবার চুরমার হয়েছি। কিন্তু আত্মাকে শেষ করতে পারনি। বড়জোর এবার নরকে পাঠাতে পার। সেখানে এমনি লোক ক্যাপাব যে, ইন্দ্রত্ব আর বেশিদিন করতে হবে না…'

'আহা ওঁকে ডিস্টার্ব করছ কেন, দেবরাজ। ওঁরা আমার সম্মানিত অতিথি। ওঁদের ভয় দেখাবারও কারু অধিকার নেই।' ভগবান বললেন। 'ওঁর বক্তব্য ওঁকে বলতে দাও।…আচ্ছা বলুন, ব্রহ্মাও চালাবার ভার যদি আপনাদের ওপর ছেড়ে দিই, তবে কি আপনারা সকল দল মিলিত হয়ে কোয়ালিশন গবর্ণমেণ্ট গঠন করতে রাজি আছেন? আমিও ক্লান্ত। বিশ্রাম নিতে পারলে বাঁচি…'

'সেটা সরাসরি বলা যাবে না। আগে আমাদের সেণ্ট্রাল ব্যুরোকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। রি-অ্যাকশনারিদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করা আমাদের বারণ। সে যাইহোক, কোয়ালিশন গবর্ণমেণ্টে আমাদের প্রধান মন্ত্রীর আসন আগে প্রমিস্ করতে হবে…'

'অসম্ভব। ওটা আমাদের চাই-ই', বিসর্গ উঠে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন। 'দেশ-শাসনের ওদের কি অভিজ্ঞতা আছে? ক্ষমতা হাতে পেলেই সব কিছু ওচনচ করে দেবে। সব ব্যক্তি-স্বাধীনতা কেড়ে নেবে। ওরা শান্তি চায়না, বিপ্লব চায়…'

'আর ওরা', খণ্ড-ত তর্জনী বিসর্গের দিকে দেখিয়ে তিক্তকণ্ঠে বললেন, 'ওরা পুঁজিপতির দালাল, কায়েমি স্বার্থের দালাল। ওদের বিরুদ্ধে পৃথিবীতে আমরা নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে এসেছি…'

'গোটা দুনিয়াকে নিজেদের ক'জনের গোলাম বানাবার ফন্দিতে…' জুড়ে দিলেন বিসর্গ।

'চুপ কর পুঁজিবাদীর কুকুর। ঘুষি মেরে দাঁত উড়িয়ে দেব।' খণ্ড-ত আস্তিন গুটিয়ে বলল।

সঙ্গে-সঙ্গেই বিভিন্ন দলের নেতারাও লাফিয়ে উঠলেন নিজ নিজ আসন থেকে। নিজের নিজের পছন্দসই দল বেছে নিয়ে গর্জন শুরু করলেন। প্রস্তাবিত মন্ত্রীসভার কার ক'টা আসন হবে, তারও দাবি উঠল। গালাগালি শুরু হলো। হাতাহাতি শুরু হলো। হলের পেছন থেকে পর পর দু'বার বোমা-ফাটার আওয়াজ শোনা গেল।

ভগবান অন্তর্ধান হলেন। দেবতারা অন্তর্ধান হলেন। হলের বাইরেও বিভিন্ন দলের আত্মাদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হলো। ইট-পাটকেল, বোমা, লোহালক্কর বোতল সবই কাজে লাগানো হলো প্রহরণ হিসেবে। স্বর্গের পুলিশবাহিনী শান্তিরক্ষা করতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে গেল।

এই জরুরী অবস্থার মোকাবিলা করবার জন্ত অলকাপুরীতে মধ্যরাত্রেই বিষ্ণুকে জরুরি পরামর্শ-সভা ডাকতে হলো।

'দেখলেন তো এদের ধৃষ্টতা প্রভু? আপনাকে পর্য্যন্ত পরোয়া করে না!' দেবরাজ ইন্দ্র গভীর ক্ষোভের সঙ্গে নিবেদন করলেন।

কয়েক মুহূর্ত কেউ কিছু বললেন না। তারপর ব্রহ্মা স্বয়ং বললেন, 'এ আমারই দোষ। আমার

সৃষ্টিতেই গলদ। এত বিভিন্ন মত, এত আলাদা স্বার্থ, এত হিংসা, এত লোভ, এত ঈর্ষা, এত জীবের মনে কর্তৃত্ব করার ইচ্ছা বৈচিত্র হিসাবেই সৃষ্টি করা হয়েছিল, কিন্তু কি করে এত পরস্পরবিরোধী ইচ্ছার সমন্বয় করা যায়, তার প্রতি যথেষ্ট নজর দেওয়া হয়নি…'

'আমার মতে,' দেবরাজ আবার দাঁড়িয়ে বললেন, 'এ অসন্তোষের মূলে মুষ্টিমেয় সংখ্যক জীবমাত্র। আর সবই পৃথিবীর জীব। মাঝে মাঝে গ্রহে গ্রহে কলিশন লাগলেও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বড় রকম কিছু গলদ দেখা দেয় নি। পৃথিবীর এই দুষ্টে জীবাণুগুলিকে শায়েস্তা করলেই দ্যুলোকে ও ভূলোকে শান্তি ফিরে আসতে পারে…'

'ব্রহ্মাণ্ডের গবর্ণমেণ্ট পরিচালনার ভার একবার এঁদের হাতে ছেড়ে দিলে কেমন হয় ভাবছি। বিষ্ণু মৃদু হেসে বললেন। 'দেখা যাক না, ধাক্কিয় ঘাড়ে পড়লে ওরা কি করে…'

'পৃথিবীর টুকরো অংশের পরিচালনা করতে গিয়েই এই নেতা-মশায়রা যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন', বরুণ মন্তব্য করলেন, 'ব্রহ্মাণ্ড পরিচালনার ভার পেলে তার কি ফলাফল হবে, তা সহজেই অনুমান করা যায়। সব তালগোল পাকিয়ে তারপর অন্যদের ওপর দোষ চাপাবে। পৃথিবীতেও এই করেছে। আপনি বরঞ্চ এঁদের আবার পৃথিবীতেই ফেরৎ পাঠিয়ে দিন। গোলমাল পৃথিবীতেই সীমাবদ্ধ রাখা যাক।"

'পৃথিবীর রাস্তায় গাধাদের জন্য দিয়ে ফেরৎ পাঠালে তবেই ঠিক হয়।' ইন্দ্র সাক্রোধে বললেন। 'পরস্পর কামড়া-কামড়ি করে, চিৎকার করে নিজেদের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ করতে পারবে…'

'ওতে হবে না! ব্রহ্মা বললেন।' 'ক'জনকে শাস্তি দিলেই সমস্যার সমাধান হবে না। মানুষ জাতটার প্যানিংয়েই গলদ রয়ে গেছে। তাই সর্বত্র হলাহল। একদেশের মানুষ অন্য দেশের মানুষের উপর আধিপত্য স্থাপন করতে চায়। নইলেই যুদ্ধ। এক মতের বিশ্বাসীরা অন্য মতের বিশ্বাসীদের ওপর নিজেদের মত চাপাতে চায়, বাধা পেলেই কাটাকাটি। কৃতিত্বশালীরা যে পুরস্কার অর্জন করেছে, কৃতিত্বহীন বংশধরেরা তা নিজস্ব পাওনা বলে আঁকড়ে রাখতে চায়। অন্যের দুঃখ দিয়ে নিজেদের সুখ বাড়াতে একদল বদ্ধপরিকর; আবার অন্যদল কৃতিত্বকে উড়িয়ে দিয়ে গায়ের জোরে আর সংখ্যার জোরে সব সুবিধা দখল করতে উৎসুক। এক দিকে নির্লজ্জ স্বার্থপরতা, অন্যদিকে অধৈর্য অন্ধ ক্রোধ। আর সর্বত্রই লোভ। বেশি নেবার লোভ, বেশি খাবার লোভ, ক্ষমতার লোভ। এই পরস্পরবিরোধী ভাবের সমন্বয়ের সুব্যবস্থা আমি আগে থাকতে করিনি। এই ত্রুটি আমার। হে ভগবান বিষ্ণু, চলুন, আমরা সবাই আশুতোষের কাছে যাই। ওঁর কাছে অকপটে আমার এই ত্রুটি স্বীকার করি। তিনি যদি আরেকবার প্রলয়-নৃত্য করতে রাজি হন, তবেই বোধহয় এর প্রতিকার হতে পারে। অবশিষ্ট সৃষ্টি হয়তো পেতে পারে…নইলে আর উপায় নেই।'

আবেগ-উচ্ছল মুখে ব্রহ্মা নিজ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

* * * *

ভারতকে বেঁচে উঠতে হবে। কারণ ভারত নিজেকে বাঁচিয়ে পৃথিবীকে বাঁচাবে। মুক্ত ভারত পৃথিবীর সংস্কৃতি ও সভ্যতায় অনেক কিছু দেবে—দর্শনে সাহিত্যে, শিল্পে বিজ্ঞানে অনেক নবনব উদ্ভাবনের জন্য পৃথিবী সাগ্রহে চেয়ে আছে ভারতের দিকে।

—সুভাষচন্দ্র

নির্ঝর

অমরেন্দ্র সরকার

মনে হল, কে যেন নিরেধে স্মৃতির দুয়ার খুলে দিয়ে গেল।

অনিন্দ্য আর একবার ফিরে চাইলো। তারপর বহুদূরের মেঘ ও কুয়াশায় ঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে চেয়ে রইলো। বৃষ্টিটা তখন আরো জোরে শুরু হয়েছে। অনিন্দ্য একবার ভাবলো—সে চলে যাবে কিনা! কিন্তু কাছাকাছি আর কোন আশ্রয় নেই। যেতে হলে, সম্পূর্ণ ভিজে যাবে। পাশের মানুষ দুটোর কণ্ঠস্বর সে শুনতে পাচ্ছে। প্রায় অনুচ্চস্বরে কথা বললেও অনিন্দ্যর কানে আসছিলো কথাগুলো।

—তোমাকে তখনই বললাম, বর্ষাতিটা নিয়ে বেরোও। কথা শুনলে না তো?

—আহা, আমি কি করে জানবো, এই সুন্দর বিকেলটা এমন মুখ গোমড়া করে বৃষ্টি নিয়ে আসবে।

—ঠিক! তুমি তো আবার এই প্রথম দার্জিলিং এলে। একজনের কণ্ঠে কৌতুকের সুর।

—সে কথা না বললেও চলবে। তাতে তোমার গর্ব বাড়বে না। তা ছাড়া যারা বহুবার এসেছে, তারাও নিশ্চয় আমার মত ভুল করেছে। পলকে অনিন্দ্য ফিরে চাইলো। ভাবলো—তাকে উদ্দেশ্য করে বলছে কি না! কিন্তু তা কেন বলতে যাবে।

অনিন্দ্য সিগারেট ধরালো। অন্যমনস্ক হতে চাইলো। হঠাৎ নিজেকে অপরাধী মনে হতে লাগলো। সে কি চলে যাবে? কে জানতো—দার্জিলিং-এর এই স্টেপ্ এসাইডের রাস্তায় এই সুন্দর বিকেল বেলায় হঠাৎ এমন বৃষ্টি আসবে। কে জানতো—পথ-চলতি এই বিশ্রাম বেঞ্চে আরো দু'জন এসে তার মত আশ্রয় নেবে। আর তার মধ্যে একজন; হ্যাঁ, সেই একজনের জন্যে এখন অনিন্দ্য কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছে।

এক পলকেই তার মনের স্মৃতির দুয়ার খুলে গিয়েছিল। সেই মুখ, চিবুকের সেই নিটোল ভৌলটুকু অনেকদিন হয়ে গেলেও অনিন্দ্য ভুল করেনি। তার চোখ ভুল দেখেনি। কজ্জলিত চোখের কৃষ্ণ তারকা এখনও চঞ্চল। বঙ্কিম ভ্রূযুগলে এখনো মায়াময় ধনুঃশর। কিন্তু ও কি চিনতে পেরেছে? ওর চোখের তারায় কি অনেকদিন আগের একটা দিনের ছায়া পড়েছে?

অনিন্দ্য অনেকটা পিছনের দিকে ফিরে গেল। অনেকগুলো দিন। এক বছর। দু'বছর। প্রায় দু'বছর আগের একটা দিনে। ছবি দেখেছিল আগে। বাড়ির সবাই পছন্দ করে ছবি নিয়ে এসেছিল ওর পছন্দের জন্যে। অনিন্দ্যর কাছে ছবিটা ছিল কয়েকটা দিন। দেখেছিল ক'একশ'বার।

তারপর খামে ভরে আবার যথাস্থানে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তারপর একদিন নিজে দেখতে গিয়েছিল। ওর এক অন্তরঙ্গ বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে। ট্রেন, টাঙ্গার, আবার ট্রেন, তারপর ওদের বাড়ি। সেই গোধূলিবেলায় দেখা। সামান্য কয়েকটা প্রশ্ন। সেদিনই রাতের ট্রেনে ফেরা। জ্যোৎস্নারাতে টাঙ্গায়ে গঙ্গা পার হওয়া। আকাশের চাঁদ নিয়ে বন্ধুর রসিকতা। আশ্চর্য! সেদিন মনে হয়। অথচ প্রায় দু'বছর হয়ে গেল।

—আপনারও বুঝি আমাদের মত অবস্থা? পাশের ভদ্রলোক নিজে থেকেই জিগগেস্ করলো অনিন্দ্যকে।

অল্প হাসলো ও। বললে—হাঁ, অসময়ে বৃষ্টিটা এল। অবশ্য এখানের বৃষ্টি এমন হঠাৎই আসে। এই মেঘটা সরে গেলেই ছেড়ে যাবে। এখনও তো 'মনসুন' শুরু হয়নি। এ বৃষ্টি ক্ষণিকের।

—আপনি এখানে থাকেন? না বেড়াতে?

—না। আমি এখানে থাকি না। বেড়াতে। আপনারা?

—আমরাও আপনার মত। উনি আমার সদ্যবিবাহিতা স্ত্রী। সদ্য মানে প্রায় একবছর হয়ে গেল আর কি। বলেই ভদ্রলোক কৌতুকে উচ্চৈস্বরে হেসে উঠলো।

অনিন্দ্যও হাসলো। ভদ্রমহিলার মুখখানায় সহসা অরুণ আভা পড়লো। প্রতি নমস্কারে ওদের দু'জনের চোখের তারা মিলিত হল।

—আমি মলয় ব্যানার্জী। শ্রীমতী শ্রাবনী ব্যানার্জী।

—অনিন্দ্য –

—যাক্, যথেষ্ট। আপনি অনিন্দ্যবাবু। বোঝা গেল আপনি মর্ত্তলোকের লোক নন। আর দার্জিলিং থেকে নন্দনলোক বোধহয় বেশী দূর নয়। আপনার সঙ্গ ন্যাই ছাড়ছি না।

ভদ্রলোকের কথায় ওরা সবাই একসংগে হেসে উঠলো। অনিন্দ্যর মনে হল সে যেন অনেকটা হাল্কা হয়ে গেছে। মনে মনে অবাক হল ভদ্রলোকের দ্রুত সখ্যতার ব্যবহারে।

—আপনি এখানে ক'দিন এসেছেন অনিন্দ্যবাবু?

—দিন সাতেক।

—কোথায় উঠেছেন?

—'মো-ভিউ' হোটেলে। —আপনারা?

—আমরা গতকাল এসেছি। উঠেছি, দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাড়ি।

—থাকবেন তো কিছুদিন?

—বেশীদিন আর থাকতে পারব কই। মাত্র দশদিনের ছুটি। এরমধ্যে সব শেষ করতে হবে। যাওয়া-আসা পর্যন্ত। আপনার সব দেখা শেষ হয়ে গেছে?

—আমার সব দেখা মানে, যা দেখব তা পুনর্বার দেখা। আমি প্রতিবারেই এই সময়ের সময়টা এখানে কয়েকটা দিন কাটিয়ে যাই।

—ঠিক ধরেছি। আপনি ন্যাই নন্দনলোকের কাছাকাছি যাবার চেষ্টা করছেন। আপনাকে আমি ছাড়ছি না। মলয় আলাপে উচ্ছল হ'ল।

—নিন্ ধূমপান করুন। বৃষ্টিটা বোধহয় ছেড়ে এল। এ কি! তুমি তো কথাই বলছো না?

শ্রাবনী মিষ্ট হাসলো। আর সেই হাসির রেশটুকু ঠোঁটের কোনে রেখে বললে—তুমি তো একাই একশ। তা ছাড়া জানো তো, দুজনের মাঝে তৃতীয় বেমানান। তোমরা গল্প করো। আমি এখন একমাত্র শ্রোতা।

—বাঃ চমৎকার। প্রশংসা উপদেশ আত্মসমর্পণ, একসংগে। বিশ্বের সমস্ত মহিলাদের ওর হোক।

—হয়েছে, হয়েছে। কথার সাগর, এবার চুপ করবে।

—কিন্তু একটি সর্তে। তুমিও অনিন্দ্যবাবুর সংগে গল্প করবে।

ভদ্রলোকের কথায় অনিন্দ্য আবার হাসলো। বললে—চলুন, এবার হাঁটতে হাঁটতে গল্প করা যাবে।

ওরা তিনজনে ওপরের দিকে চলতে শুরু করলো।

—আমরা কিন্তু ফিরে চলেছি ম্যালের দিকে। আপনাদের আর বেড়াবার ইচ্ছে আছে নাকি? আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। আর বোধহয় বৃষ্টি আসবে না! এখনও বেলা আছে। ইচ্ছে করলে আপনারা লেবঙ এর দিকটা ঘুরে আসতে পারেন।

—না, আর নিচে নামছি না। চলুন, ম্যালে বসে কিছুক্ষণ গল্প করা যাবে। তুমি কি বল?

—হ্যাঁ, সেই ভাল। নিচে নামার সংগী অনেক মেলে। ওপরে ওঠার সংগীই দুর্লভ।

—যাঃ···

—আবার তুমি।

—কি ব্যাপার বলুন তো? আপনারা হঠাৎ আমাকে দুর্লভের পর্যায়ে ফেলছেন কেন? আমি তো সাধারণ একজন···।

—সাধারণ বলেই তো আপনি এমন সাবধানী। বৃষ্টি আসার আগেই নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেন। বিকেল শেষ হবার আগেই নিচে থেকে ওপরে উঠতে চান।

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে গেল শ্রাবনী।

অনিন্দ্য ওর চোখে চোখ রেখে বললে—জিনিসগুলো এত স্বাভাবিক যে এর আগে পরের কোন ভাবনাই আমি করিনি। কি বলেন মলয়বাবু, এর জন্যে কি পূর্বচিন্তার দরকার হয়?

—আমি অত বুঝি না অনিন্দ্যবাবু। শুধু এটুকু বুঝতে পারছি আমার স্ত্রীমতী এবার গল্প করতে শুরু করছেন।

বলার ভংগীতে ওরা তিনজন'ই উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলো।

এমনি ছোটো ছোটো কথার আড়াল দিয়ে ওরা 'ম্যালে' পৌঁছে গেল। তখন সন্ধ্যার ছায়া পড়েছে ম্যালে। সান্ধ্য ভ্রমণার্থীর দল ছড়িয়ে আছে এখানে সেখানে।

কিছুক্ষণ গল্প করার পর ওরা দু'জন চলে গেল। অনিন্দ্য তখনো বসে রইলো একটা বেঞ্চিতে। বৃষ্টি হওয়াতে বেশ শীত শীত লাগছিল। মৃদু মৃদু ঠাণ্ডা হাওয়ায় তখনও গাছ থেকে দু' এক ফোঁটা জল ঝরে পড়ছিল। অনেকদিন পরে অনিন্দ্য একটা অলস চিন্তায় বিভোর হয়ে যাচ্ছিল। ওর চিন্তাটা ছিল শ্রাবনীকে ঘিরে! উচিত-অনুচিতের বেড়া ডিঙিয়ে ভাবনাটা ঘুরপাক খাচ্ছিল ওর মনে। ফটো এবং মানুষটাকে দেখে সেদিন অনিন্দ্য মুগ্ধ হয়েছিল সত্যি। কিন্তু হঠাৎ ওদের পারিবারিক বিয়োগান্ত ঘটনাগুলোর জন্যে বিয়ের তারিখ পিছিয়ে গিয়েছিল অনেকদিন। অতদিনের দেরি বোধহয় পাত্রীপক্ষের সহ্য ছিল না। আর কোন কারণ ছিল কিনা অনিন্দ্য জানে না।

শুধু পরে শুনেছিল—মেয়েটির অন্য জায়গায় বিয়ের সম্বন্ধ হয়ে গেছে। তারপর, এতদিন পরে, অকস্মাৎ এখানে দেখা। অনিন্দ্য নিঝুম হয়ে সেদিনের গোধূলি আলোয় দেখা মেয়েটির কথাগুলো মনে করবার চেষ্টা করলো। ছবিটা আঁকতে চেষ্টা করলো শ্রাবনীর পাশে সে। আর মনস্থ তার মত পথচারী।

এ রকম একটা অস্বাভাবিক চিন্তার জন্যে তার নিজের মনেই হাসি পেল। অর্ধদগ্ধ সিগরেটের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে, ও ফিরে চললো হোটেলের পথে।

পরদিন বিকেলে বেড়াতে বেরোবার আগে অনিন্দ্য ভেবেছিল আর যেন দেখা না হয়। সে জন্যে চুপচাপ গিয়ে বসেছিল মহাকাল মন্দিরের সামনের ইউক্যালিপটাস্ গাছটার নিচে। নিশ্চুপে দেখছিল, অদূরে উড়ে যাওয়া কুয়াশা। শেষ সূর্যাস্তের আলোয় নানা রঙের মেঘ। শুনছিলো পার্কে শিশুদের কলরোল। কিন্তু দার্জিলিংটা এমন কিছু বিশাল এলাকা নয়, যে একপ্রান্তের মানুষের সংগে অন্যপ্রান্তের মানুষের দেখা হবে না। বেড়াবার জায়গাগুলো সীমিত। যা কিছু ঘোরাফেরা ঐ 'ম্যাল'কে কেন্দ্র করে। তাই আবার ওদের দেখা হয়ে গেল।

—এই যে অনিন্দ্যবাবু, আপনি এখানে? আর আমরা আপনাকে খুঁজছি। কাল কথা হল না, যে আজ একসংগে জলাপাহাড় দেখতে যাব। না ঘনাই, আপনি নন্দনলোকে পৌঁছুতে পারবেন না। বড় জোর অমরাবতীর দেউড়ী পর্যন্ত যেতে পারেন। তার বেশী নয়।

অনিন্দ্য ছোট্ট একটি মিথ্যে বললো।—না, মানে আমার বেরোতে একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল। ভাবলাম অতক্ষণ কি আর আপনারা অপেক্ষা করবেন। তাই সোজা এখানে চলে এসেছি। তা এতক্ষণ কোথায় ঘুরলেন?

—কোথায় আবার! মানুষ আশাভংগ হলে কি করে? প্রথমে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। এই আসে, এই আসে। তারপর বিরাশী হলাম। যাব উত্তরে। গেলাম পুবে। মিউজিয়াম দেখে বোটানিকস্। ভেবেছিলাম বার্চহিল্‌টা ঘুরে আসবো। কিন্তু সেখানেও ওপরে ওঠার পালা। শ্রীমতীর শ্রীমুখপদ্মের বাণী আপনার মনে আছে? উপরে ওঠার সংগীই দুর্লভ। অতএব ফিরে এলাম। চলুন ঘুরি।

—তোমরা ঘুরে এস। আমি একটু বসি। অনেক হেঁটেছি। আর পারছি না।

ওরা দুজনে মহাকাল পাহাড়টার চারপাশে ঘুরতে গেল।

অনিন্দ্যর ফেলে যাওয়া সিগরেটটা থেকে তখনও ধোঁয়া উঠছে। ওদের চলে যাওয়া পথের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে শ্রাবনী পোড়া সিগরেটের নীল ধোঁয়াটার পানে চাইলো। তারপর আবার ওদের চলে যাওয়ার দিকে। দুটি মানুষ পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছে। প্রায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। দুটি মানুষের মধ্যে একটি মানুষ ওর। আর একজন! কার, কে জানে। অথচ ঐ মানুষটাই হতে পারতো··।

শ্রাবনী ভাবলো—আমাকে নিশ্চয় চিনতে পেরেছে। গতকাল সন্ধ্যায় ওর চোখের আলোয় দেখেছি আমাকে। আশ্চর্য, মানুষটা সেই একই রকম আছে। সেই আমাকে সেদিন দেখতে গিয়েছিল। সেদিন কত কথা মিগ্‌গেস করেছিল। সেদিন ওরা চলে যাবার পরে রাতে একা আমি ভেবেছিলাম—এত কথা

বলার সোধ আমি একদিন নেব। নিশ্চয় খুব চালাক! হয়তো বলবে—তোমার কথা শোনবার জন্যে অত কথা বলেছিলাম। সেই মুহূর্তে আমি ওর ঠোঁটদুটো বন্ধ করে দেব ··।

সেই কাল্পনিক ঘটনাটায় শ্রাবনী নিজের কাছে সঙ্কুচিত হয়ে গেল। এ কি ভাবছে সে। আজ, এতদিন পরে।

—আপনাকে, মলয়বাবু যেতে বললেন। উনি মন্দিরে বসে আছেন। টায়ার্ড। তাই আমাকেই আসতে হল। বললেন, আজকেই মন্দিরটা দেখে নিতে।

শ্রাবনী নিঃশব্দে অনিন্দ্যর কথাগুলো শুনলো। তারপর বললো—চলুন। অনিন্দ্য হঠাৎ ফিরে এসে কথাগুলো বলাতে শ্রাবনী আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারছিল না। ওর মনে হচ্ছিল—অনিন্দ্য বুঝি একটা স্বচ্ছ কাচের মধ্যে দিয়ে সব কিছু দেখতে পাচ্ছে। ওরা চুপচাপ পথ চলছিল। একটু থেমে শ্রাবনী হঠাৎ প্রশ্ন করলো—আপনি এখনও কাটিহারেই থাকেন?

—হ্যাঁ, কিন্তু আপনি··।

—কেন লুকোচ্ছেন? দু বছর আগের একটা দিন··।

—হ্যাঁ, মনে আছে।

—কিন্তু একা যে, সঙ্গে আনেননি বুঝি?

অনিন্দ্য এবার মৃদু হাসলো। তারপর বললে—একাই তো। তাইত একা এসেছি।

নিমেষে তাকালো শ্রাবনী অনিন্দ্যর চোখে চোখ রেখে।

—ওঃ, চলুন। এই বুঝি মহাকালের মন্দির?

• • • •

প্রেম শুধু বাস্তব নহে, তাহাতে কল্পনা আছে। তাই তা অধিকতর সত্য। প্রেম নারীকে অপরূপ করে। অক্ষয়কুমার প্রেমের কবি, প্রেমকে তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন মিলনে বিরহে, নিকটে দূরে, বাস্তবে কল্পনায়, আহ্বানে আকুতিতে তিনি নানাভাবে প্রেমকে দেখিয়াছেন। প্রেম তাঁর প্রথম কাব্য থেকে শেষ কাব্য পর্য্যন্ত প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে।

সম্মিলন

শিউলি সেনগুপ্ত

টুনিপিসী বলত,—মুনীল, মানুষকে ওভাবে বিচার করিসনা!

আমি গম্ভীর হতাম, কেন বল তো?

টুনিপিসী হাসতে হাসতে গম্ভীর হয়ে যেত। বলত, এক পলক দেখায় তুই মানুষের কতটুকু বুঝতে পারবি, জানতে পারবি?

—যেটুকু পারি।

—কিন্তু তার মধ্যে মিথ্যে থাকে। ফাঁকি থাকে। খাদ থাকে।

আমি সহজ হতে চাইতাম; হাসতাম,—পৃথিবীর কোন জিনিষটায় খাদ নেই তুমি আমায় বলতে পার?

টুনিপিসী উত্তর দিত না। বাপোর কৌটো থেকে পান বের করে গম্ভীর হয়ে পান চিবুতো। ঠোঁট দুটো লাল হয়ে উঠত। তারপর ঝনাৎ করে চাবির গোছাটা পিঠের উপর ফেলে চলে যেত। আমি বরাবর এটাই দেখে এসেছি। কোন সমস্যার সমাধান করতে না পারলে, কোন প্রশ্নের উত্তরটা খুঁজে না পেলে এমনই চুপচাপ হয়ে যেত টুনিপিসী। একটা পান গালে পুরে গম্ভীর হয়ে চিবুতো। আমার মনে হত ওই পান চিবুলেই টুনিপিসী সব কিছুর মীমাংসা করতে পারবে। কিন্তু কার্যকালে সেটা হয়ে উঠত না। টুনিপিসী তখন আরো রাগ করে উঠে চলে যেত। আজও চলে গেল। আর একটু পরেই আমি টুনি পিসীর গলা পেলাম। মার সঙ্গে কথা বলছে।

—এ কালটা কি হল বৌদি?

মার গলা শুনলাম,—কেন যে, কি হল?

—এই আজকালকার ছেলেরা কিছু মানতে চায় না।

মার হাসির আওয়াজ পেলাম। —ওরা যুক্তি চায়। প্রমাণ চায়।

. কিন্তু সব জিনিষ কি যুক্তি দিয়ে বোঝানো যায়?

—যায় না বলেই তো ওরা মানতে চায় না রে টুনি। তাছাড়া ওদের মধ্যে স্নেহ, প্রেম, ভালোবাসার মাত্রাটা অনেক কম।

টুনিপিসী বলে, ছেলে-মেয়েগুলোই বেহায়া। লাজ লজ্জা নেই। লঘুগুরু জ্ঞান নেই।

মা আমায় বললেন,—মুখটাই বেহায়া টুনি।

টুনিপিসী চুপ করে যেত। আমি বুঝতে পারতাম বেহায়া মুখটার কথা ভাবতে গিয়ে এখন টুনিপিসীকে পান খেতে হচ্ছে। একমি হয়তো চাবির গোছাটা কাঁধের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে

যাবে টুনিপিসী। যেতও তাই। কারণ টুনিপিসী আবার বলত,—ভালবাটাটা কোন বাটিতে রেখেছ বৌদি?—তারপর টুনি পিসীর পায়ের আওয়াজ পেতাম। বুঝতাম, সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল টুনিপিসী। ছাদেই গেল।

শীতকালে রদ্দুরটা আরামের। ছোটবেলা দেখতাম ঠাকমা হা পিত্যেস করে বসে থাকত এই রদ্দুরটুকুর জন্য। রদ্দুর এলেই খুটিখুটি দিয়ে বসত গাঁদা ফোপটার পাশে।

আমায় ডাকত,—ও সুনীল, এসে বোস একটু রদ্দুরে। গায়ে লাগা না একটু রদ্দুর। সুষ্যির তেজ, এ কি কম কথা!—বলে আকাশের দিকে তাকিয়ে জোড়হাত কপালে ঠেকাত ঠাকমা। আমার তখন বয়েই গেছে সুষ্যির তেজে পুড়তে। এক ছুটে নীচে পালিয়ে যেতাম। আজ ঠাকমা বেঁচে থাকলে শুনতাম ঠাকমার কথা। বয়েস হয়েছে, রদ্দুরটা এখন ভালোই লাগে। আজ ঠাকমা নেই। কিন্তু রদ্দুরটুকু আছে। আর আছে টুনিপিসী। ঠাকমার ছোট মেয়ে। কোলের মেয়ে।

সেই টুনিপিসী রদ্দুরে পিঠ দিয়ে কুলোর ওপর নিবিষ্ট চিত্তে বড়ি দিয়ে চলেছে। আমি টুনি পিসীর একদম পাশে গিয়ে বসি। টুনিপিসী চমকে ওঠে,—ও তুই!

আমি বলি,—বাপের বাড়ী এসেছ। একটু আরাম খাবে, তা নয়, বড়ি দিচ্ছ··রান্না করছ·· চাল বাছছ···এসব করার দরকার আছে কী?

টুনিপিসী ধমক দিয়ে ওঠে,—তা খাকৃবটা কি নিয়ে?

—এখন একটু বিশ্রাম নাও। এক মাস একটু হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারনা।

টুনিপিসীর হাত আরো জোরে চলল। বড়ি দেওয়ার মাত্রা গেল বেড়ে। বলল,—না পারিনা। মেয়েমানুষ চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারেনা।

আমি আবার বলি,—তুমি এখানে এত খাটা খাটুনি করছ, শরীর ভেঙে গেলে?

—ওঃ কি আমার খাটুনী!—টুনিপিসী ঠোঁট উল্টোতো।

আমি টুনিপিসীকে ক্ষেপানোর লোভটা সংবরণ করতে পারতাম না।—এখন আমার কথাটা উড়িয়ে দিচ্ছ, কিন্তু যখন শংকরদা বলবে,—মা, তোমার এ কি চেহারা হয়েছে তখন বলবে কী?

টুনিপিসী বলত,—বাজে বকিস নে সুনীল। আর কদিনই বা আছি?

—সে কি?—আমি অবাক হই। তোমার তো আরো দিন দশেক বাদে যাবার কথা।

—নারে,—টুনিপিসী নিঃশ্বাস ফেলে।—তোর পিসের শরীরটা একদম ভালো নেই। খুবই অসুখ হয়ে পড়েছিলেন আমি চলে আসার পর। তারপর এখন একটু সামলেছেন। ওরা আমায় ইচ্ছে করেই খবর দেয়নি। কারণ ডাক্তারবাবু বলেছিলেন ভয়ের কিছু নেই। এতদিন খবরটা পাইনি। মনের শান্তিও নষ্ট হয়নি। খবরটা পেয়ে চিঠি লিখে দিয়েছি। কাল শংকর এসে নিয়ে যাবে।

—তাই তোমায় এ'কদিন চুপচাপ দেখছি।

—কাজের মধ্যে মনটাকে যে ডুবিয়ে রেখেছি।

—তুমি তাহলে কালই চলে যাবে?

—হ্যাঁ রে।—টুনিপিসীর বড়ি দেওয়া শেষ হয়। কুলোর ওপর জালের ঢাকাটা ঢাপা দিয়ে উঠে দাঁড়ায় টুনিপিসী। হঠাৎ টুনিপিসীর পায়ের পাতা দুটোর ওপর চোখ পড়ে আমার। আশ্চর্য সুন্দর পাতাদুটো। ছোট ছোট, তুলো, তুলো। আর রঙটাও অপূর্ব। যা দুর্গার গায়ের তেল রঙের মতো।

পরের দিন সকালবেলা সেই সুন্দর পাতা দুটো মা আমতায় বাড়িয়ে দিলেন। মনে হল সত্যি যেন ওপর যেন ফুটে উঠল দুটো পদ্মফুল। টুনিপিসীর চুল মা বেঁধে দিলেন। টুনিপিসী একটু আপত্তি করল,—আমি কি সেই ছোট্টটি আছি বৌদি?

মা হাসেন। চোখে আজকাল কম দেখেন। তবু হাতড়ে হাতড়ে চোখ দুটো কুঁচকে মাথা নীচু করে বাঁধেন টুনিপিসীর চুলের খোঁপা। বলেন,—তুই কবে আমার বড় হয়ে গেলি টুনি? তোর ছেলে হল। চুল পাকল। ছেলের বিয়ে দিলি। বৌ এল। তুইও আস্তে আস্তে বুড়ী হয়ে গেলি, সে তো আমার হিসেবের খাতায় লেখা নেই।

টুনিপিসীর চোখের কোল দুটো জলে ভরে এল।

মা বললেন,—বিয়ের পর যখন বৌ হয়ে এলাম তখন তুই এতটুকুন। কর্সা রঙ, কাঁকড়া চুলে ভরা মাথা। ফুটফুটে মুখখানি। আমার লাল বেনারসীর আঁচল চেপে ধরে প্রথম কথা বলেছিলি, হ্যাঁ গো তোমার বেনারসীটা দেবে? আমি বিয়ে করব।—আমি তোর কর্সা গাল টিপে লাল করে দিয়েছিলাম, বলেছিলাম, দেব। তুই বলেছিলি—দেখো কেউ যেন জানতে না পারে। আমি মনে মনে হেসেছিলাম। নতুন বউ। খিলখিল করে তোর হাসতে বাধা ছিল। তারপর তোকে কতদিন এক-আধটা বেনারসী আর গয়নাতে সাজিয়েছি। হেসেছিও খুব। আর একদিন তুই বেনারসী পরে, কত গয়না পরে রাজরাণীর মত সত্যি সত্যি চলে গেলি। তুই কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছিলি। আমিও কেঁদেছিলাম। রাত্তিরে শুয়ে তোর চন্দন-আঁকা মুখটা যত মনে পড়তে লাগল তত কাঁদতে লাগলাম। তোর দাদা বকলেন। উঠে পালিয়ে গেলাম ছাদে। দেখলাম ছাদটা চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে। আর তোর হাতে পোঁতা বেলফুলের গাছগুলিতে কুঁড়ি এসেছে। কিন্তু ফোটার আগেই তুই চলে গেলি। আর ক্রমে আমি বুড়ী হলাম। বয়স হতে লাগল। তবু বুদ্ধি আমার পালটালো না। আমার চোখে তুই সেই কুঁড়ি থেকে গেলি। ফুটলি না। একটা পাপড়িও ঝরল না তোর।

টুনিপিসী দেখি এর মধ্যে কেঁদে কেঁদে চোখ রাঙা করে তুলেছে। পংকজদা তাড়া দিল,—মা চল। ট্রেন ধরতে দেরী হয়ে যাবে।

টুনিপিসী উঠল। মাকে বাবাকে প্রণাম করল। আমি টুনিপিসীর ছোট লাল সুটকেসটা তুলে দিলাম ট্যাক্সিতে। টুনীপিসী গাড়িতে উঠল, আর আমি প্রণাম করতেই সকলের অলক্ষ্যে একটা দশ টাকার নোট আমার হাতে গুঁজে দিল। আমি রাগ করলাম,—আগে দিতে দিতে। এখন আবার কী? বড় হয়ে গেছি।

টুনিপিসী হেসে ফেলল। সিঁদুরের টিপটা টুনিপিসীর মুখে অদ্ভুত মানিয়েছিল। বলল,—তুই ছোটই আছিস আমার কাছে। টাকাটা দিয়ে চপ কাটলেট খাস, সিনেমা দেখিস। আজকালকার ছেলে তোরা। এ দুটো তোদের ভালোই লাগবে। তারপর হঠাৎ টুনিপিসী চেঁচিয়ে ওঠে,—সুনীল, ছুটে গিয়ে আমার পানের কৌটোটা নিয়ে আয়। ভুল করে ফেলে এসেছি।

ছুটে গিয়েই এনে দিই কৌটোটা। ট্যাক্সিটা ছেড়ে দেয়। টুনিপিসীর ছলোছলো চোখ দুটো জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকে। আর আমার হঠাৎ মনে হয় বয়েস বাড়ছে ভাবলে স্নেহ মমতা ভালোবাসাটা কমে যায়। আমি ছোট আছি, তাই টুনিপিসী আমায় ভালোবাসে। টুনিপিসী তিন ছেলের বৌয়ের শাশুড়ী। তবু ছোট। আর সেই ছোট বলেই মা আজও ভালোবাসে টুনিপিসীকে।

টুনিপিসী চলে যাবার পর দশটা দিনও কাটেনি। চিঠিটা এল দুপুরে। আর পড়ল আমার হাতেই। চিঠিটা খুলে অবাক হয়ে গেলাম। নিঃশব্দে চিঠিটা হাতে নিয়ে বসে রইলাম। পিসেমশাই মারা গেছেন। টুনিপিসী পৌঁছবার দুদিন পরে ভীষণ জ্বর। তারপর জ্বরের ঘোরে অচৈতন্য অবস্থায় মারা গেছেন। লক্ষ্মণদা লিখেছে, মাকে দেখবার জন্যই যেন বাবা বেঁচেছিলেন। দেখাটুকু হয়ে গেল। আর চলেও গেলেন। চিঠিটা বাবার হাতে পৌঁছে দিয়ে আমি পালিয়ে গেলাম। মা কাঁদলেন, সে কি কান্না। বুকটা ভেঙে যেতে লাগল। টুনিপিসী ছিল মার বোনের মতই। মা কি কম ভালোবাসতেন; মার সেই ভালোবাসার সাগর শোকের ঢেউয়ে তোলপাড় করে উঠল। তিনদিন চলল সেই উথাল পাতাল ঢেউয়ের নৃত্য। তারপর আস্তে আস্তে এক সময় সমুদ্র শান্ত হল।

এরপর একমাস কেটেছে কি কাটেনি। সবে সন্ধ্যের শাঁখ বাজিয়েছেন মা। ঠাকুরঘরে প্রদীপ জেলে গভীর মনে প্রণাম করছেন রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তিটিকে। ধূপদানীতে জ্বলছে দুটি ধূপ। একটা মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে। এমন সময় গাড়ী থামার আওয়াজ পেলাম। তাড়াতাড়ি দেখতে গেলাম। ওপর থেকে দেখলাম আবো অন্ধকারে একটি নারীমূর্তি গাড়ী থেকে নেমে আমাদের বাড়ীর দিকেই আসছে। মা বললেন,-কে এল সুনীল?

—কি জানি মা বুঝতে পারলাম না। কারুর আসার কথা ছিল?

—না তো।—মাও আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন।

আমি বললাম,—তুমি দাঁড়াও এখানে। আমি দেখে আসি।

সিঁড়িগুলো টপকে টপকে নীচে নেমে গেলাম। দরজা খুলতেই আমার সামনের সারা দুনিয়াটা টলমল করে কেঁপে উঠল। কিন্তু সে কতক্ষণ? আমার চোখ খুললাম। আমার নিঃশ্বাস নিলাম। টুনিপিসীর কথায় আমার যেন পরিষ্কার করে দেখলাম সব কিছু।

টুনিপিসী নিঃশব্দে হাসল। —চিনতে পারিস নি সুনীল?

আমার মুখ দিয়ে কোন কথা সরল না। বললাম—এস।

টুনিপিসী ভেতরে এল। এতক্ষণে আমার টুনিপিসীর হাতের সেই ছোট লাল সুটকেসটার দিকে নজর পড়ল। বললাম,—ওটা দাও।

সিঁড়ি দিয়ে আমার সামনে সামনে উঠতে লাগল টুনিপিসী! বলল —বৌদি কই?

—ওপরে আছেন।

—আর দাদা?

—দাদা ফেরেন নি। তুমি ওপরে যাও।

ইচ্ছে করেই টুনিপিসীকে একলা ছেড়ে দিলাম ওপরে। কেউ কাঁদলে আমার বড় খারাপ লাগে। টুনিপিসী আজ কাঁদবে জানতাম। খুব কাঁদবে। তাই সময় দিলাম। সুযোগ দিলাম। নিজেকে পরিষ্কার নিলাম। খানিকক্ষণ পরে ওপরে গিয়ে দেখি মার চোখ দুটো লাল আর টুনিপিসীর চোখ দুটো খটখটে মরুভূমির মত। তবে কি কাঁদে নি টুনিপিসী? আমারই ধারণা ভুল? টুনিপিসীকে দেখতে লাগলাম। চেহারাটা একদম বদলে গেছে টুনিপিসীর। বয়সের ভারে। তবু এ যেন কেমন অন্যরকম বদলানো। মুখটাতে কি যেন নেই টুনিপিসীর। কি নেই? খুঁজতে লাগলাম। আর এবার দেখলাম টুনিপিসীর পানে রাঙানো ঠোঁট দুটো সাদা। একদম ফ্যাকাসে। তবে কি পান খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে টুনিপিসী? কিন্তু তাই বা

কেমন করে হয়? পান খাওয়া ছাড়ার সঙ্গে ভাবনা চিন্তাগুলোও কি ছেড়ে দিতে পেরেছে টুনিপিসী। কিন্তু না—এখন তো বেশী ভাববার কথা। বলেই ফেলি,—টুনিপিসী, পান খাও না?

—নারে। টুনি পিসী চেয়ারটার ওপর সোজা হয়ে বসল। বলল,—উনিও চলে গেছেন, আমার জীবনেরও তো সব শেষ হয়ে গেছে সুনীল। আর তো ভাববার কিছু নেই। পান আর খাব কি করতে?

অভিভূত হলাম। চুপ করে রইলাম। একটা মানুষ চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে টুনিপিসীর জীবনের সব কিছু শেষ হয়ে গেল। হ্যাঁ—মাও তাই বলেন। মেয়েদের জীবনের সুখ বল, শান্তি বল, সম্পদ বল সে ওই স্বামীকে কেন্দ্র করে। সেখানে যার কপাল ভাঙে, তার তো সব কিছু ভাঙা। সব কিছু শেষ। সেই শেষের পর তো আর ভাববার কিছু নেই।

টুনিপিসী আবার কথা বলে উঠল,—নেহাৎ টিকতে পারছিলাম না, তাই চলে এলাম। প্রথম যখন খবর বলল, বাবা আর নেই মা, বলেছিলাম, মিথ্যে কথা। ছুটে গিয়েছিলাম। কিন্তু কি করব? নিজেই মিথ্যে মনে গেলাম। কিন্তু বিশ্বাস কর বৌদি এতটুকু কাঁদি নি। কাঁদতে পারিনি। কেমন একটা ঘোরের মধ্যে কেটে গিছল দিনগুলো। কিন্তু সেই ঘোর আমার কেটে গেল। শূন্য খাটটার কাছে গিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললাম। আর মনে হল আমি বুঝি এখানে টিকতে পারব না। ঘর আমার আটকে আসতে লাগল। একটু হাওয়ার জন্য প্রাণটা আকুলি বিকুলি করতে লাগল। সেই হাওয়া তো সেখানে নেই বৌদি। তাই বেরিয়ে পড়লাম। তীর্থে যাবার আগে তোমার কাছেই এলাম প্রথম। হয় তো বা এটাই শেষ আসা। কাল ভোরেই চলে যাব।—শেষের দিকে গলাটা কেঁপে উঠল টুনিপিসীর। তারপর মাকে আঁকড়ে ধরে হাউহাউ করে কেঁদে উঠল। এই দৃশ্যটাই আমি দেখতে চাই নি। অথচ এটাই আমায় দেখতে হল। ভাবলাম পালিয়ে যাব। কিন্তু পালিয়ে যাব কোথায়? পালিয়ে গেলেও এই দৃশ্যটুকু তো আর মন থেকে মুছে ফেলতে পারব না। তাই অবাক হয়ে মার কোলে ভেঙে পড়া টুনিপিসীর সেই দেহটার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

খাবার সময় টুনিপিসী বলল,—না বৌদি। আমাকে আবার কেন? সকালে দুটো ফুটিয়ে খাই। রান্নিরে ওর মধ্যে আর থাকি না।

মা বললেন,—কিছু না খেলে শরীরটা ভেঙে যাবে যে ঠুনি।

টুনি পিসী বলল,—ভেঙে গেলেই তো বাঁচি বৌদি। সেই ভাঙাটার জন্যে তো এখন দিন গুণতে হবে। কিন্তু একটা কথা বৌদি, কাল যখন যাব তখন তোমাদের ওঠার দরকার নেই। আমায় বলল,—সুনীল, তুই শুধু উঠে একবার দরজাটা বন্ধ করে দিস আমি চলে গেলে। তারপর শুয়ে পড়িস।

আমি বললাম,—তুমি কটায় যাবে?

—পাঁচটার কাছাকাছি। শীতকাল তো। তখন আলোই ফুটবেনা। অন্ধকার থাকবে। তা হোক্। ওই অন্ধকারই আমার ভালো। অন্ধকারের মাঝে একটু আড়াল পাওয়া যায়। নইলে সব কিছু বড্ড স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পরের দিন টুনিপিসী চলে যাবার আগে আমি উঠে পড়লাম। মা-বাবাও উঠে ছিলেন। টুনিপিসী শব্দ করে নি। শুধু আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। নিঃশব্দে টুনিপিসী তার সুটকেসটায় কি সব গোছগাছ করে রাখছিল, আমায় দেখে বলল,—ওমা তুইও উঠলি। কি কাণ্ড বল তো? আমি যে চুপিচুপি অন্ধকারে পালাতে চাইলাম।

অন্ধকারই বটে! বাইরেটা একদম কালো। আকাশটা কালো। আমাদের বাড়ীর সামনের কৃষ্ণচূড়া গাছটায় এপাশ ওপাশ চাপ-চাপ অন্ধকার ধানা বেঁধে রয়েছে। একটু পরেই গাড়ি এসে গেল। টুনিপিসীর শেছন শেছন আমরা নামলাম। আমার মনে পড়ল আর একটি দিনের কথা। সেদিনও টুনিপিসী আমাদের বাড়ী থেকে চলে গিয়েছিল। সেই চলে যাওয়াটা ছিল অন্য রকমের। তাতে আনন্দ ছিল। আবেগ ছিল। মাধুর্য্য ছিল। টুনিপিসীর টুকটুকে ঠোঁট আর কপালের জলজলে সিঁদুরের টিপ পরা মুখটা ভেসে উঠল। সেদিনও টুনিপিসীকে প্রণাম করেছিলাম। আজও করলাম। আর আশ্চর্য, আজো আমার হাতে দশটা টাকা গুঁজে দিল টুনিপিসী। আমি টুনিপিসীর সেই অতল কালো চোখের সাগরে তাকিয়ে রইলাম। বুঝলাম টুনিপিসীর কাছে আজও বয়স বাড়ে নি আমার।

টুনিপিসী গাড়ীর জানালা থেকে ঝুঁকে পড়ে বলল,—আর তো দেখা হবে না সুনীল। এই শেষবারটি নে।—তারপর আমার মাথায় হাতটা রেখে বলল,—বেঁচে থাক, বড় হয়ে ওঠ। আর সত্যিকারের মানুষকে যেন চিনতে পারিস।

হুশ করে গাড়ীটা ছেড়ে দিল। গাড়িটা এগিয়ে গিয়ে আবার পিছিয়ে এল। টুনি পিসী ডাকল, —বৌদি, কাছে এস তো একবার।

—কি রে?—মা নেমে এলেন।

—পরে এস। তোমার মুখটা একটু দেখব। কাছে এস। মুখটাকে একেবারে মনের মধ্যে গেঁথে রাখি। আর তো পাবনা দেখতে।

টুনিপিসী অপলক দৃষ্টিতে মার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কি দেখল, কেমন করেই বা মার মুখখানা মনের আয়নাতে আটকে রাখল তা টের পেলাম না। তখন সবে আলো ফুটছে একটু একটু। সেই আবো আলোয় দেখলাম টুনিপিসীর চোখের কোল বেয়ে ঝর ঝর করে জল পড়ছে।

মা বললেন,—আমি মরে যাচ্ছি, মৃত্যুশয্যায়, এ খবরটা পেলেও আসবি না টুনি?

টুনিপিসী মার হাতটা আঁকড়ে ধরে বলে,—আসব বই কি বৌদি। আসতে আমায় হবেই। তুমি যে আমার মায়ের বাড়া। তুমি ডাকলে অগ্রাহ্য করতে পারি কখন?

ছেড়ে দিল গাড়ীটা। এক ঝলক গরম ধোঁয়া ছেড়ে নিস্তব্ধতাকে খান-খান করে দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল গাড়ীটা। মা বাবা ফিরে চললেন। আমায় ডাকলেন, আয়!

—তোমরা যাও, আমি যাব না।

মা বললেন,—এই ঠাণ্ডায় কি করবি? কোথায় যাবি?

—একটু বেড়িয়ে আসি লেক থেকে। উঠেই যখন পড়েছি।

গায়টা গায়ে বেশ ভালো করে জড়িয়ে এগোলাম রাস্তার দিকে। রাস্তার বাতিগুলো তখনও জ্বলছে। অন্ধকার আর আলোর মাঝে দুলছে পৃথিবীটা। আমি এসে দাঁড়ালাম গোল পার্কের সামনে। বেশ শীত-শীত করছিল। ঠাণ্ডায় একটু একটু কাঁপছিলাম। বুঝতে পারছিলাম হাঁটলেই আবার গরম হয়ে যাব। কিন্তু হঠাৎ আমার পা জোড়া আটকে গেল। দেখলাম একটা ঠ্যালা-গাড়ী আসছে। আর ময়লা পোষাক পরা একটা বুড়ো লোক ছুটে ছুটে গিয়ে ঠ্যালার লোকগুলোকে কি বলছে। ঠ্যালাটা চলে গেল। আমি বেশ অবাক হলাম। কি বলতে পারে ওই জীর্ণ-শীর্ণ বুড়োটা? হয়তো বলল ওদের ঠ্যালায় ওকে তুলে নিতে। যদি ওরা ওকে একটু ঠাঁই দেয়। কিংবা হয়তো কিছু ভিক্ষে চাইল। কিন্তু আমি নড়তে

পারলাম না। পর পর গোটা সাতেক ঠ্যালা গেল। সবগুলোতেই সেই একই ব্যাপার। বুড়োটা ঠ্যালাগুলোর কাছে গেল তারপর আবার ফিরে গিয়ে নিজের জায়গাটায় দাঁড়িয়ে রইল। কৌতূহল হল। ব্যাপার কি? এগিয়ে গেলাম বুড়োটার কাছে। বললাম,—কি কর্তা, কোন ঠ্যালাগাড়ীতে বুঝি ঠাঁই মিলছে না।

লোকটা বলল,—আজ্ঞে না।

—কোথায় যাবে শুনি?

—কোথায় আর যাব?—লোকটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল,—ওই যে যাদবপুরের ওখানে যে ব্রীজটা আছে, এই সব ঠ্যালাগুলো ওইখানে দিয়ে যায়। ব্রীজ তো একটু উঁচু সেই সময় ঠ্যালাটাকে ঠেলে তুলতে লোক লাগে। তাই ঠ্যালাওলাকে বলছিলাম যদি ওদের আমার দরকার হয়।

—কিন্তু এত দূরে কেন দাঁড়িয়ে আছ? ওই ব্রীজের কাছে গেলেই পার।

লোকটা হাসল। এক মুখ দাড়ি। কপালে অসংখ্য খাঁজ সার সার পড়েছে মাথা কাপল ঝুড়ে। বলল,—আজ্ঞে বাবু কি যে বলেন। ওখানে বহুত লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাই এখান থেকে ঠ্যালাগুলোকে ধরি।

—কত পাও?

—ঠিক নেই। কোনদিন কিছু না। বরাতগুণে এক আধদিন দু চার আনা পয়সা ছুটে যায়।

একটা ঠ্যালা দেখতে পেয়ে আবার ছুটল লোকটা।

আমিও হাঁটতে লাগলাম। আর ভাবতে লাগলাম, জীবন ধারণের জন্ত মানুষের কি অসীম চেষ্টা। নইলে এই শীতের ভোরে অমন একটা বুড়ো লোক মাত্র ক-আনা পয়সার জন্ত এমন হা-পিত্যেশ করে দাঁড়িয়ে থাকে? কিন্তু লোকটাকে দূর থেকে এক পলক দেখে বুঝতে পারিনি। জীবন-যুদ্ধের জন্ত এই যে ঠাণ্ডার মধ্যে তাকে দুনিয়াটার মুখোমুখি হতে হয়েছে তা কল্পনাও করতে পারিনি। সত্যি মানুষকে এক পলক দেখে বোঝা যায় না। বিচার করা যায় না।

টুনিপিসীই তো বলত, সুনীল, মানুষকে ওভাবে বিচার করিস না। এক পলক দেখায় তুই মানুষের কতটুকু বুঝতে পারবি? জানতে পারবি? যেটুকু পারবি তার মধ্যে মিথ্যে থাকবে। ফাঁকি থাকবে। খাদ থাকবে।

পৃথিবীর সব জিনিষেই কি মিথ্যে, খাদ লুকিয়ে আছে? কোন জিনিষই কি খাঁটি নেই? বুঝতে পারিনে। টুনিপিসীকেও একদিন এ প্রশ্ন করেছিলাম। টুনিপিসী উত্তর দিতে পারে নি। পান চিবুতে চিবুতে চাবির গোছা ঝনাৎ করে পিঠের ওপর ফেলে গম্ভীর হয়ে চলে গিয়েছিল, হয় তো খুঁজে পায়নি উত্তরটা।

কিন্তু আজ আমি উত্তরটা খুঁজে পেয়েছি। ওই যে লোকটা, যে একটু দূরে দাঁড়িয়ে ঠ্যালাওয়ালার সঙ্গে কথা বলছে, ওই আমায় দিয়েছে উত্তর।

আর অন্ধকার নেই। আলো ফুটে গেছে। সেই আলোতে আমি এগোতে লাগলাম। একটু দূরে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তিটা এবার স্পষ্ট হয়ে আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল।

এই প্রথম

[গল্প-ভারতীতে 'এই প্রথম' পর্যায়ে আমরা সম্ভাবনাপূর্ণ নবাগত লেখক-লেখিকাদের রচনা আজ বহুদিন ধরে ছেপে আসছি। নূতন লেখক সৃষ্টি করা সাহিত্য-পত্রিকার একটি বিশেষ কর্তব্য। এই ভাবে ভাবান্বিত হয়েই আমরা এই অধ্যায়টির সূচনা করি। সত্যই যাদের প্রতিভা আছে, সুযোগ সুবিধা পেলে যাঁরা একদিন সুনাম ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবেন তাঁদের রচনা পাঠকদের সামনে তুলে ধরে তাঁদের উৎসাহ দান করাই আমাদের উদ্দেশ্য। পৃথিবীর সর্বত্রই এমনি করে নূতন লেখক তৈরী হয়ে থাকে। একদিন এইসব নূতন লেখক লেখিকা যে প্রথম সারিতে স্থান পাবেনা তা কে বলতে পারে। লেখকদের কাছে আমাদের অনুরোধ, রচনা পাঠাবার সময় 'এই প্রথম' এই কথাটির যেন উল্লেখ করেন এবং নিজের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি জানিয়ে দেন, কেন না পাঠকদের এইসব জানবার বিশেষ কৌতূহল হয়]

সম্পাদক—গল্প-ভারতী

একতান

অশোক মুখোপাধ্যায়

আজ আমার জন্মদিন। তপন, বিমল, জয়ন্ত এবং আমার জন্মদিন। এ জন্মদিনটা কেউ জানে না। এর কোন উৎসব বা অনুষ্ঠান হয় না। শুধু আমরা মনে রাখি। নির্দিষ্ট দিনে মিলিত হই কোন একটা স্থানে, হয়ত সেখানে কেউ কোনদিন কোন আনন্দ উৎসবে যায় না। ওদের জন্মদিনের সঙ্গে আমারও জন্মদিন। এটা খুবই আশ্চর্য্য, হাঁা, আশ্চর্য্য বইকি।

জন্মদিন লাভা দিয়ে আসে না, নাড়া দিয়ে আসে। দিনটা কেউ ভুলি না বা ভোলবার ভান করি না। সময় মত চলে আসি হঠাৎ ঠিক করা স্থানটায়, উৎসব পালন করি নিভৃতে একান্তে। একান্তে বইকি—চারজনেই একান্তে। যেমন আজকে বসেছি কালিঘাটের এই অখ্যাত দোকানটায় যেখানে দোকানের মধ্যে কেউ না বসে বাইরে দাঁড়িয়ে চা খায়, সিগারেট কেনে আবার ধরিয়ে চলে যায়। ভেতরে কেউ তাকায় না। ভেতর বলে একটা জিনিষ আছে তা সবাই অস্বীকার করে।

প্রথমে আমি, তারপর তপন, বিমল, জয়ন্ত চারজনেই লক্ষ্য করলাম একজন এসে পেছনে দেওয়ালে লাগান বেঞ্চটায় বসল। খুব আশ্চর্য্য বোধ করলাম, না, সঙ্গে কেউ নেই, একাই আছে। ধীরে ধীরে দেওয়ালে ঠেস্ দিয়ে বসল। কোন ব্যস্ততা নেই, নাড়াচাড়া করার জন্যেও টাইম্ নিচ্ছেন ভদ্রলোক। এতক্ষণে ভদ্রলোক বলে মনে করবার মত অবকাশ হল। সত্যিই আমাদের ধারণা ছিল না এখানে কোন ভদ্রলোক আসে। কিন্তু···আশ্চর্য্য আমরাও ত ভদ্রলোক, নাকি নিজের অজান্তেই মনের কোনও এক গোপন কথা বলে ফেললাম,

হয়ত সত্যিই আমরা ভদ্রলোক নই, শুধু ভদ্রলোকের মুখোশ পরে সমাজের বুকে ঘুরে বেড়াই মাত্র। আসলে আমরা নিজেরাই জানি না আমরা কি।

ভদ্রলোক যেন তাকালেন আমাদের দিকে, ওরাই বলল প্রথম কথাটা—তাকানোর মধ্যে যেন কোন ইঙ্গিত আছে। তাকালো ত তাকালো, আমরা এসেছি ওদিন পালন করতে—নিভৃত উৎসব। আন্তরিকতা যা কিছু তা শুধু নিজেদের মধ্যে, বড়টা সম্ভব চাপা আর গোপন ভাবে। যেন কোন একটা সঙ্কটের সম্মুখীন আমরা। ভদ্রলোকের চকিত ক্ষণিকের চাউনিটা আমাদের কারুরই পছন্দ হয়নি। অসম্ভব রকম অস্বস্তি হচ্ছে আমাদের।

তপন একটা সিগারেট বার করল পকেট থেকে, তপন ছাড়া আমরা আর কেউই সিগারেট খাই না। সিগারেট জিনিষটা যে কি রকম খেতে সেটার উত্তর এক তরফা হবে বলেই আমরা কোনদিন তপনকে জিজ্ঞেস করিনি, চাতে ধরে বসে থাকতে দেখে আমরা তিনজনেই ধরে নিলাম হয় ওর দেশলাই নেই অথবা সিগারেট খাবার মত অবস্থা তৈরী করছে।

ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম একে একে আমরা চারজনেই, না সেইভাবেই বসে আছেন। জীবনের লক্ষণ আছে কি নেই সেটা অবশ্য ওঁর সহযোগিতার ওপর নির্ভর করছে।

তপন বলল লোকটার নাম—বিমল বসুর পরিমল, আমি বললাম পরিতোষ, তরফ মুখ ঘুরিয়ে কি একটা দেখছিল আমাদের কথা কানেই তুলল না। এই নাম করণের মধ্যে কোন যুক্তিই নেই, শুধু কেন যে আমরা অথথা ভাবছি কে জানে। তপন সিগারেটটা নিয়ে আবার পকেটে পুরল। কিরে, পকেটে পুরলি যে?—তরফর প্রশ্ন। তপন উত্তর না দিয়ে বলল, পরিমলই বরং পরিতোষ নয়। পরিতোষ হলে অন্ততঃ আমাদের সঙ্গে আলাপ করত। তপনের এই রকম আচমকা উল্টো পাল্টা কথায় তরফ কপাল কুঁচকে বিরক্তি প্রকাশ করল, দোকানের বাইরের দিকে একটা ভাঙা রেডিওর কি একটা হিন্দি গান হচ্ছিল, তরফ সেটায় তাল দিতে দিতে বলল, কি রে উঠবি না? প্রশ্নটা যে কাকে করল তা বোঝবার উপায় নেই। যদি ধরি আমাকে প্রশ্নটা করেছে, তা হলে বলব ভুল করেছে, কারণ আমার এখন মোটেই ওঠবার ইচ্ছে নেই। দোকানদার ওঠবার তাগাদা দেবে না, বয় এসে বারবার 'কি চাই' বলে বিরক্ত করবে না যা কিছু না চাইলে বিল এনে হাজির করবে না। এটা একটা কালিঘাটের নাম না জানা অখ্যাত দোকান, অন্যদিন যদি আমরা এইরকম একটা দোকানে বসতাম হয়ত রাজনীতি খেলাধুলা অথবা সিনেমা নিয়ে আলোচনা চলত, বড় হলেই প্রত্যেকের আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকত দোকান ছেড়ে চলে যাবার অথবা আরও কিছু খাবারের অর্ডার দিয়ে আলোচনার মোড় ঘোরানোর।

ভদ্রলোক উঠেছেন। বোধহয় এবার দোকানের প্রাপ্য মিটিয়ে বেরিয়ে যাবেন। কি খেলেন কে জানে, ওঁর টেবিলের সামনে কিছু নেই যা হয়ত ছিল উঠিয়ে নিয়ে গেছে। বেরিয়ে সোজা রাস্তায় হাঁটতে লাগলেন ভদ্রলোক। আমরা চারজনেই দেখলাম, আবার নিজেদের পরস্পরের দিকে তাকালাম। আবার দেখলাম আবার তাকালাম, এইভাবে বেশ কয়েকবার। আস্তে আস্তে ভদ্রলোক চলে গেলেন, এই আস্তে আস্তে সরে যাওয়ার মধ্যে কি কোন রহস্য আছে? না খুব সাধারণ ভাবে আমাদেরই মত তিনি কোন উৎসব পালন করতে এসেছিলেন। হয়ত তাঁর কোন দোসর নেই, সেই বলেই বোধহয় অচঞ্চল, স্থির।

আবার আমাদের অস্বস্তি শুরু হল। ভদ্রলোককে দেখেও যা না দেখেও তাই, ভদ্রলোককে আমরা প্রত্যেকেই মনে মনে ভাবতে শুরু করলাম, বেশ গভীর ভাবে। একবার ভাবলাম দোকানদারকে ডেকে

জিজ্ঞেস করি ভদ্রলোককে সে আর কোনদিন দেখেছে কি না, নাঃ, থাক, কি হবে জিজ্ঞেস করে। ভদ্রলোক যে সাধারণ নন্ তা আমরা বুঝতে পেরেছি।

বিমল তাড়া দিল ওঠবার। খুব আশ্চর্য বোধ করলাম। আপোষ আমাদের হচ্ছেনা। কি হল আজ! তবে কি নিজেদের আন্তরিকতায় ফাটল ধরল? আমরা জন্মদিন পালন করতে এসেছি, তা কি ভুলে গেলাম? মনে হচ্ছে কোন এক অদৃশ্য শক্তি আমাদের পরিচালিত করছে। আমরা আমাদের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারছি না। আলাদা আলাদা করে বেঁচিবার চেষ্টা করছি নিজেদের, যৌথ প্রচেষ্টা নয়। প্রথমে জয়ন্ত তারপর বিমল যে উপলব্ধি করেছে আমাদের ওঠা দরকার, তা বোধহয় আমাদের যৌথ উপলব্ধিতে সফ কাটল। তপনও হয়ত মনে মনে ভাবছে তার বাড়ীর কথা, তার আত্মীয়-স্বজনের কথা। ট্যাংরার মেসোমশায়ের কাছে আজ তার যাবার কথা অথবা চেতলার দাদুর সঙ্গে একবার দেখা হওয়া দরকার। আর আমি বসে বসে ভাবতে লাগলাম আমাদের নিভৃত মিলনে পঞ্চম ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটায় হয়ত এই অঘটন। সম্ভব হলে এক্ষুনি ভদ্রলোককে ধরে নিয়ে আমাদের সামনে বসিয়ে তাঁর কাছে কৈফিয়ৎ দাবী করব। হয়ত বলব, কেন আপনি আমাদের মধ্যে এইরকম অঘটন ঘটালেন? কি লাভ হল আপনার?

আজ আমাদের জন্মদিন। নতুন করে মনে পড়ছে, আজ আমাদের সেইদিন, যেদিনে আমরা আগামী দিনের পথ চলার খসড়া রচনা করি। হয়ত বা পূর্বদিনের ঘটনার কথা মনে না রেখে শুধু আজকের ঘটনা নিয়ে আলোচনা করি। অর্থাৎ পুরোন বছরকে বাঁ দিকে, আগামী দিনকে ডান দিকে রেখে আমরা আজকের দিনকে 'জিরো আওয়ারের' মত 'জিরো দিন' করে অকুণ্ঠিত ভাবে একে অপরের কাছে পরিচিত হই। কিন্তু অঘটন ঘটিয়ে গেল সামান্য একজনের উপস্থিতি। যার কোন প্রয়োজন ছিলনা বা হয়ত ছিল আমাদের নিজেদের আলাদা করে ভাববার, জীবনের এক একটা দিক আছে যা জানা যায় হয়ত একটা সামান্য ঘটনার পর। তবে কি আমাদের জীবন দর্শন হল? কতকটা তাই বইকি। আমরা, অন্ততঃ আমি বুঝলাম, আমরা একে অপরের সঙ্গে পথ চলতে এখনও শিখিনি। একে অপরের দুঃখের ভাগ নিতে এখনও শিখিনি। নিজেদের মধ্যে সহজতা সৃষ্টি করতে এখনও শিখিনি। আমরা সিগারেট খেতে ভালবাসি, হিন্দী গান শুনতে ভালবাসি, ট্যাংরার মেসমশাই বা চেতলার দাদুর কাছে যেতে ভালবাসি। সেখানে অপরের উপস্থিতি সহ্য হবেনা বা সহ্য হলেও চেপে মনে মনে কষ্ট পেতে হবে। জীবনের এই ধারটা উদ্‌ঘাটন হয়ে ভালই হল। নিজের সম্বন্ধে নিজেকেই জানতে হবে। নিজের জন্মদিন নিজেকেই পালন করতে হবে। আর যখন সময় আসবে, সেই সময়, যেদিন আমরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে, পায়ে পায়ে তাল রেখে চলতে শিখব, সেদিন আমরা প্রত্যেকেই উপলব্ধি করতে পারব আমার এবং আমাদের চারজনেরই জন্মদিন। সে দিনের অপেক্ষায় রইলাম, কণ্ঠে সুর ফুটিয়ে ঐকতান সৃষ্টির অপেক্ষায়।

• • • •

[লেখকের পরিচয়: বিজ্ঞানের ছাত্র, বাংলা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ খুব ছোটবেলা থেকেই। ছাত্রজীবন থেকে সময় ও সুবিধা মত প্রচুর লিখেছেন, কিন্তু কোন পত্রপত্রিকায় আজ পর্যন্ত কোন লেখা পাঠাননি। বয়স পঁচিশ, তাই অভিজ্ঞতাও অল্প। গ্রাম সম্বন্ধীয় কয়েকটি রচনা নিয়েই তাঁর লেখক জীবন সুরু। মানুষের জীবনের প্রাত্যহিক ঘটনা, যা চোখের সামনে অহরহ ঘটছে তাই তাঁর লেখার সম্পদ। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি ল্যাবরেটারিতে চাকুরীরত]

অপরাহ্নবতী

সুবোধ সিংহ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

"সুমিত্রা! কি বলছ তুমি? এসব কথা কি লিখেছ তুমি? কেন তুমি এমন হয়ে গেলে?"

"একজনকে জানিয়ে রাখা ভাল। অজিতবাবুকে সেইজন্যেই জানাতে চেয়েছি। আমি না থাকলে তুমি নতুন করে সংসার কর, কি না কর, তাতে আমার কিছু এসে যাবে না। কিন্তু তোমার সে সংসারও পুড়ে যাবে—শান্তি পাবে না,—সে ব্যবস্থাই করে যাচ্ছি।"

"সুমিত্রা! তোমার ও-সব পাগলামো ছাড়ো!—কি ভেবেছ বলতো? রক্তপায় সম্বন্ধে দুর্নামের কথা উঠেছে বলে ভয় হয়েছে তোমার? আমাকে সেইজন্যেই ভয় করতে আরম্ভ করেছ?"

"তোমার যা ভাল লাগছে,—করছ,—করবেও,—আমি যা বুঝেছি, করছি। আমাকে ভাল লাগবে না,—জানি,—আমাকে আর আমার ছেলেমেয়েকে।"

যবনিকার অন্তরাল থেকে কয়েকটি প্রশ্ন ও উত্তর যেন পরীক্ষিৎ শুনতে পেল।

প্রশ্ন হ'ল,—"তাই তুমি জানিয়ে রাখতে চাও অজিতকে?"

"আমাকে মেরে অবাধ মিলনের সুযোগ পাবে না তুমি।"

"কেন?"

"কারণ,—অজিতবাবু রক্তপাতকে ভালবাসে। আমার চিঠি পড়ে ও সজাগ হবে—বিঘ্ন ঘটাবে—তোমার ইচ্ছে সহজে পূর্ণ হবে না।

"এ-চিঠি হলিনের মত কাজ করবে বটে কিন্তু এ-প্রমাণে খুব বেশী সুবিধে হবে মনে হয় না। ফাঁসী-কাঠে ঝুলবার ব্যবস্থাটা আদালতে না টিকতেও পারে।"

"না—না—ও কখনো তোমার প্রাণহানি করবে না। এ-বিশ্বাস আছে বলেই ওকে আমি জানাতে চেয়েছিলাম।"

এইমাত্র তার ভাবনার মধ্যে যে কথোপকথনের জন্ম হল এবং পরক্ষণেই যা মৃত্যুর মত ঘুচে গেল সে-সবকে সে খুব বেশী অবাস্তব বা অলীক বলে কিছুতেই মনে করতে পারল না।

"তাহলে আমি তো খুব সাংঘাতিক মানুষ! তোমার পক্ষে তো নয়ই—ছেলেমেয়ের কাছেও নিশ্চয়ই নিরাপদ নই।"

দূরে সরে গেল সুমিত্রা।

ওর কোন জবাব না পেয়ে পরীক্ষিৎ আবার বলল,—

"বোধ হয় আমার চেয়েও অজিত বেশী নিরাপদ?"

সুমিত্রা সুইচ টিপে আলো জ্বালল।

"উত্তর দিতে লজ্জা হচ্ছে? জবাব না দিয়েই তো উত্তরটা জানিয়ে দিচ্ছ। ···বিপদ তোমার এসে গেছে। সে বিপদ থেকে কেউ তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না·····!"

গলায় হাত দিয়ে চেপে ধরে সুমিত্রা বলে উঠল,—

"তুমি কি আমাকে মেরে ফেলতে চাও?"

পরীক্ষিৎ সুমিত্রাকে ধমক দিয়ে উঠল,—

"চুপ করো! বাজে কথা বলো না!"

একটু থেমে পরীক্ষিৎ বলতে লাগল,—

"জেনে রাখবে—অজিত খুব বেশী নিরাপদ নয়। যত বাচ্চা ছেলেই হোক সে—ছোট ভাইয়ের মত দেখতে আরম্ভ করেছ বোধ হয় এতদিনে—তবু নয়। ওভাবেই আরম্ভ হয়—ও তোমাকে শেখাচ্ছে—যন্ত্রণা দিচ্ছে—ওর বুঝি ভাল লাগছে তোমার কাছে—কেন লাগছে জান? ও তোমার মনে ঘৃণা আর ভয় ঢুকিয়ে দিয়ে তোমাকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর যত সরে যাচ্ছ এখান থেকে, যত জেদে যাচ্ছে তোমার টুনকো মন ততই তুমি ওর গহ্বরে গিয়ে পড়ছো। বরুণাকে ও ভালবাসে না—ওটা মিথ্যে কথা,—বানানো—। তোমার মনে ঈর্ষা জাগিয়ে উস্কে দেবার অস্ত্র—তুমি ওর কথার ফাঁদে আটকে গেছ।"

সুমিত্রা দুহাত ওপরের দিকে উঠিয়ে এক পা এক পা করে পিছু হটতে লাগল,—পরীক্ষিতের চোখের আগুন থেকে যেন এখনই একটা বুলেট ছুটে আসবে ওর দিকে। পরীক্ষিতের মুখের চেহারা হিংস্র হতে হতে যেন এখনই পশু হয়ে উঠবে আর তার দুই হাতের শক্তি দিয়ে সুমিত্রার মাংসকে টেনে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে যে কোন সময়ে।

তবু সুমিত্রার শঙ্কিত কণ্ঠস্বর আত্মরক্ষার সহজাত সংস্কারের বশে কতকগুলো অক্ষরের অস্পষ্ট ধ্বনি করে উঠল,—

"কি বলছ তুমি?"

"ঠিকই বলছি। ও পাতানো ভাই-ই হোক কিংবা বাচ্চা ছেলেই হোক—মানুষটি পুরুষমানুষ—আর পুরুষ মানুষ মাত্রই যে কোন বয়েসে, যেকোন সময়েই নিরাপদ নয়। আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না সুমিত্রা—সে চেষ্টা করো না। আমি তোমার রক্তে মৃদুমন্দ উত্তেজনা দেখেছি।"

"যত শক্ত শক্ত কথা! তোমার কপালে ঢের দুর্ভিক্ষ আছে দেখতে পাচ্ছি। ও নিরাপদ কিনা জানি না—কিন্তু তুমি—তুমি আমার জীবনে সবচেয়ে কঠিন বিপদ।"

সুমিত্রার এমন বন্য আক্রোশের উদ্দামতা পরীক্ষিৎ আর কখনো চোখে দেখেনি। বিবাহের পরে যে আত্মীক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, সেদিন মনে হল তা অকস্মাৎ লক্ষ ছিঁড়ে চোখের সামনে ভেঙে চলে গেল। অনেক দূরে চলে গিয়েছে। সেখান থেকে আর বোধহয় ওকে ফিরিয়ে আনা যাবে না। পরীক্ষিতের অহমিকা ও অহঙ্কার নির্জন দ্বীপবাসীর মত নিষ্প্রভ হয়ে রইল। পরীক্ষিতের উদ্ধত জীবনের শিলাপাথরের গায়ে মনের প্রতিঘাতের তীব্র চিৎকারের ঢেউ আছাড় খেয়ে পড়েই যেন বোবা হয়ে গেল।

বোবা হয়ে গেল সমস্ত বাড়ীটাই। সুমিত্রা তার বাচ্চাগুলোকে নিয়ে আগেই অন্য ঘরে চলে গিয়েছিল, এখন তাদের সাড়াশব্দ আর কানে আসে না, ওরা বাড়ীতে আছে কি নেই তা-ও বোঝা যায় না। ডপতী কিংবা দীপক কখনো ভুল করেও পরীক্ষিতের সামনে আসে না। বাবার সামনে ওরা বোধহয় এই দশা দোহারা গড়নের মানুষটিকে ভয় করতে শিখছে। ওদের ছাড়াও দিনগুলো তার ভালই কেটে যাচ্ছে। চারিদিকের চুপচাপের মধ্যে সে কোন অভাব বোধের অনুযোগ পাচ্ছে না মনে। খাবার টেবিলে ও দুবেলা একাই খেতে বসে। টেবিলের পাশে খালি চেয়ারগুলো তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বটে কিন্তু ওতে ওর মনের ইস্পাত মোম হয়ে ওঠে না। পরীক্ষিৎ যে নিঃসঙ্গ হয়ে নিষ্ঠুর বাড়ীতে বাস করছে এ-কথা মনে হওয়ার অবসর দিচ্ছে না সে একমুহূর্তের জন্যেও। খাটছে প্রচণ্ড, বিশ্রাম নিচ্ছে পুরো, আর খাচ্ছে যথেষ্ট প্রোটিন। বিকেলের পরে গায়ে চোলা-হাতা শাদা কেড্রিকের পাঞ্জাবী আর বাঁ-হাতে বাহার টিকি লম্বা কাইন ধুতির কোচা ধরে সে যখন বড় বড় পা ফেলে বেড়াতে যায় তখনও তার মনে হয় না তার কোনদিন স্ত্রী-পুত্র ছিল,—যাদের অভাবে তার মনোবেদনার কারণ ঘটতে পারে। তবু আয়নাতে নিজের মুখের ছায়া দেখে পরীক্ষিতের একটা আশঙ্কা আর সন্দেহ হয়—ওর উঁচু মজবুত নাকের দুপাশের ছুটো চোখের মধ্যে নীল আকাশের মেঘচ্ছায়ার মত একটা বিষণ্ণতা কেন গাঢ় হয়ে নেমে এসেছে? সে কি কোন দুঃখের সঙ্গে বোঝা-পড়া করছে রাতদিন?

ঠিক দশবছরের মাথায় এসে ছেদ পড়ল। ওদের

বিবাহিত জীবনের দশবছর। সঙ্গতি নষ্ট হতে হলে এর বেশী সময় লাগে না। সে-সময়টা পেরিয়ে টিকে থাকতে পারলে অন্ততঃ পৌঁয়ত্রিশ দিয়েও মানিয়ে থাকা চলে বাকী জীবনটা। প্রথম কয়েকদিন অথবা নিদেন পক্ষে কয়েক বছরের মধ্যে যদি গাঁথুনি পাকাপোক্ত না হয়, তাহলে ঘরে রাখবার, মান-মর্যাদাটা খুব কমজোরিই হয়ে গিয়েছে সন্দেহ নেই। পরীক্ষিতের এই ভাবনাগুলো ওকে ভাবিত করে রাখল বটে কিন্তু ওর দার্ঢ্যিকতা সুমিত্রার একগুয়েমির কাছে নতি স্বীকার করতে পারল না।

একেবারেই যে তাদের দেখতে পেত না তা নয়। খবরও পেত, খোঁজও নিত অত্যন্ত গোপনে।

বকুল গাছটির ধারে উত্তর-পশ্চিমের ঘরে সুমিত্রা তার বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে আস্তানা গেড়েছিল। গাড়ী বারান্দার লাগোয়া সদর সিঁড়ি দিয়ে ওরা কেউই যাতায়াত করত না। পেছনের উঠোন আর সব্জীর বাগানে যাওয়ার জন্যে আর একটা সিঁড়ি ছিল—ওরা সেইটাই ব্যবহার করত। ছাদে উঠলে কখন কখন দেখা যেত ওদেরকে। পেছনের সব্জীর বাগানের একপাশে একখণ্ড পরিষ্কার জমিতে ওরা দু'জন খেলা করছে আর ওদের মা কাছেই বকুল গাছের ছায়ায় চেয়ার পেতে বসে উরসি দিয়ে বোনার কাজ করতে করতে পাহারা দিচ্ছে। বাপের সঙ্গে কোন সংস্রব নেই বলে ওদের মনে বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই—বরং লেখাপড়া নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ থেকে বেঁচে গিয়েছে বলে ওরা খুশীই হয়ে উঠেছে। হঠাৎ পরীক্ষিতের সঙ্গে এদের দেখা হয়ে গেলে ওরা ওদের মুখভঙ্গীতে এবং শরীরকে একে বেঁকে মুচড়িয়ে মুখ নীচু করে এমন ভদ্র ও বিনয়ের ভাব প্রকাশ করে যে যে-কোন মানুষ ওদের সৌজন্য দেখে অবাক হয়ে যাবে। কিন্তু ওদের নিঃশব্দ ভদ্রতার মুখোশের নীচে বাপের সম্বন্ধে যে সতর্ক ও সঙ্কুচিত ভাব রয়েছে তা পরীক্ষিতের মনকে সরস করে তোলেনি। বাপের প্রতি যে একটা ভীষণ অবিচার হয়ে গিয়েছে তা ওদের চোখের ভাষাতে স্পষ্ট বোঝা যায়। বিকেলের দিকে পরীক্ষিৎ প্রায়ই দেখতে পায় একটি সুন্দর কর্মা মহিলা দুটো কর্মা কর্মা মোটাসোটা বাচ্চাপুষ্ট ছেলেমেয়ের হাত ধরে গেট পার হয়ে বেড়াতে যায়। রাস্তায় পড়েই বাচ্চাদের স্ফূর্তির চোটে বাতাস কেঁপে ওঠে। ওদের জমানো দম-বন্ধ করা আনন্দ স্বাধীন রাজ্যে গিয়ে হুটোপুটি করবার জন্যে যেন এতক্ষণ পাগল হয়েছিল।

কিন্তু পর পর দুদিন অনেক রাত পর্যন্ত ওদের ঘরে আলো জলতে দেখে পরীক্ষিতের বেশ ভয় হয়েছিল। আশঙ্কা হল ছেলেমেয়ের মধ্যে কেউ নিশ্চয়ই অসুখে পড়েছে। সেদিন এক ফাঁকে গোপনে দেখে গেল পরীক্ষিৎ। সুমিত্রাকে দেখে কিন্তু ভারি আশ্চর্য বোধ হল।

সুমিত্রা চেয়ারে ঝুঁকে হয়ে বসে কি যেন ভাবছে ইলেক্ট্রিকের জোরালো আলোতে সুমিত্রার মুখটা বড্ড বেশী কর্মা আর ফেকাসে লাগছে। চোখের মধ্যে সেদিনের উদ্দাম উন্মাদনার চিহ্নমাত্র নেই, শুধু উপেক্ষা অপমানিত একজোড়া সূর্যটানা চোখ। একটা ঠোঁটে ছায়া পড়েছে আর একটা ঠোঁটে তার, তাইতেই কালো হয়ে গিয়েছে নীচের ঠোঁটটা। লক্ষ্য করলে যেন বোঝা যায় সেই কালো অঙ্গারের মত ঠোঁটটা যেন সময় সময় অল্প অল্প কাঁপছে। পরীক্ষিৎ সরে এসেছিল তখনই—ও অঙ্গারের মত ঠোঁটের কাঁপুনিতে কি দেখতে পেয়েছিল সে তা জানে না কিন্তু পরীক্ষিতের মনটা খাবাখা কেঁদে উঠল একটা অজানিত দুঃখে। ও বারান্দা দিয়ে নিজে ঘরের দিকে পালিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল বাইরে কালো অন্ধকার আকাশের মধ্যে একটি প্রার্থনা শুনতে পেল সে। অনাদৃত ভালবাসা যেন করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। বারান্দার সোজা যোয়াড়ে সাদা মোজাইকের থামে সরু নরম আলো লতালতি ভাবে এসে পড়ল। লক্ষ্য করত না যদি তখনি সেই কচি ফুলের মত নরম রসা আলো মসৃণ থামের গা বেয়ে অদৃশ্য হয়ে না যেত।

পরীক্ষিতের পেছন দিক থেকে কে যেন ডাকল,—

"দেখো! তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে—।"

ফিরলো। কিন্তু অবাক হল না। শুধু শুকে যে ওর মন শিথিল ও স্নিগ্ধ হয়ে উঠল।

"তুমি—?"

সুমিত্রা পরীক্ষিতকে ওর ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ল পরীক্ষিতের বুকে। সুমিত্রার মনের বেদনার উত্তাপ যেন পরীক্ষিতের সারা বুক জুড়ে কাঁপতে লাগল। সুমিত্রার মনের অপরাধী আত্মা ত্রাস্ত স্বপ্নকে ভোগের দ্বারা ক্ষয় করে যেন নতুন মনোভাবের আলোকে আবার জেগে উঠেছে।

"আমাকে কি আর কোনরকমেই ক্ষমা করা যায় না?" ওর কথাটা যেন ছুটে এসেছে বহুযোজনের পথ অতিক্রম করে নীল কান্নায় স্রাবিত একটি মহাদেশ থেকে। বাঁচবার তৃষ্ণা যেন আলুথালু হয়ে গিয়েছে ছোট্ট একটা পাখীর মত। ওর জন্যে অপত্য স্নেহের মত একটা অদ্ভুত মায়া হয়েছিল সেদিন! একটা রহস্যময় ও অজ্ঞাত অনুভূতি পরীক্ষিতের দুই চোখের দৃষ্টিকে অসঙ্গ করে তুলেছিল সেই মুহূর্তে। সুমিত্রার কটীদেশ জড়িয়ে ধরে ওর হাত দুটিই যেন বিস্মিত হয়ে গেল।

"তোমাকে তো ক্ষমা করেই আছি।"

অবসন্নভাবে চেয়ারে বসে সুমিত্রা বলল,—

"আমাদের দুঃসংবাদের কথা শুনেছ বোধহয়?"

চেয়ারে বসতে যাচ্ছিল পরীক্ষিৎ। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল।

"দুঃসংবাদ মানে?"

"মা মারা গিয়েছেন।"

"মারা গিয়েছেন! কবে মারা গেলেন? কবে হল? গিয়েছিলে—? আমাকে তো কিছুই জানাও নি।"

"পুরীতে মারা গিয়েছেন। একাই গিয়েছিলেন আমাদের পুরীর বাড়ীতে হঠাৎ এই কাণ্ড! মঙ্গলবার মারা গেছেন, বুধবারে খবর এসেছে। হার্টফেল-টেল করেছেন হয়তো।"

"কে খবর দিল?"

"বাবা দুপুরে এসেছিলেন এখানে।"

"তোমার বাবা ফিরে এসেছেন?"

"না, বাবা যান নি—।"

ব্যাপারটা বোঝা গেল ক্রমশঃ। বেশ রহস্যজনক মৃত্যুই বটে। সুমিত্রার মা,—যাঁর যশ-বিখ্যাত নাম ছিল বুরোক্রেটিক অফিসার মহলে,—যিনি একদা জিমখানা ক্লাবে গ্রিফিথ সাহেবের সঙ্গে নেচেছিলেন, এবং নানারকম খানাপিনা করেছিলেন এবং সেই সূত্র থেকে সাহেবের সঙ্গে এই পরিবারের ঘনিষ্টতা ও সৌহার্দ্য যিনি চিরকাল বজায় রেখে গেছেন,—সেই কর্মিষ্ঠকর্মা সুমিত্রার মা হঠাৎ ওদের পুরীর বাড়ীতে, কমিশনার সাহেবের প্রিয়পাত্রী একটি মহিলার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে কেনই বা ছুটে সেখানে গেলেন আর কেনই বা প্রাণটা দিলেন তা একেবারেই স্পষ্ট নয়। কেবল এইটুকুই স্পষ্ট যে সুমিত্রার বাবা তার স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সেখানে ছুটে যান নি এবং তদ্বির-তদারক করে মৃত্যুর বিষয় নিয়েও ঘাঁটাঘাঁটি করতে যান নি।

সুমিত্রার স্বভাবের মধ্যেও বেশ খানিকটা ওলট-পালট লক্ষ্য করল সে। সুমিত্রার সংসর্গ একেবারে বর্জন করে পরীক্ষিৎ তার যে উপকার করতে পারেনি সেটাই যেন সম্ভব হয়ে গেল একটা শোকের ধাক্কা খেয়ে। দুঃসহ দুর্ঘটনার চোট খেয়ে ওর মনোবিকারের জটিল ব্যাধি সেরে যাবার উপক্রম করল অকস্মাৎ। একটি বিপদ আর একটি বিপদকে কখন কখন কাটায় এবং তা দেখে পরীক্ষিৎ সুমিত্রার সম্বন্ধে আশান্বিত হ'ল,—কেবল আশান্বিতই নয়, মনে মনে যথেষ্ট খুসী হয়ে উঠল এই মৃত্যুর খবরে। মনে হল ও যদি কিছুকাল এই শোকের আবহাওয়ার মধ্যে থেকে যায় তা হলে হয়তো বা সুমিত্রা সম্পূর্ণভাবে সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠবে।

সেইজন্যেই সুমিত্রা যখন ছেলেমেয়েকে নিয়ে তার বাবার কাছে যেতে চাইল সে একেবারেই আপত্তি করে নি। বরং খুসীই হল। এই শোকের ঘটনা একটি সুখের ঘটনার মত তার মনের মধ্যে আবর্তিত হতে লাগল।

কিন্তু সুখের মধ্যেও একটি স্বেচ্ছাচারিতা তার আছে—যা কিছু পেয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী পাওয়ার জন্যে অধৈর্য হয়ে পড়ে। নইলে কয়দিন হলই বা সুমিত্রা বাপের বাড়ীতে গিয়েছে—এরই মধ্যে পরীক্ষিৎ এত অধৈর্য

হয়ে উঠবে কেন? স্বাভাবিক, সুন্দর ও শান্তির সংসারকে পুনরুদ্ধার করবার জন্যে সুমিত্রার মন এ-সময়ের মধ্যে ছটফট করে ওঠবার কথা—কিন্তু সে তো যথেষ্ট পরিমাণে সাড়া দিচ্ছে না। একদিন দুদিন একটু আধটু কথাবার্তা হয়েছে কোনো। সেই সামান্য কথাবার্তার মধ্যে সুমিত্রা যেন আরো অবোধ্য হয়ে গিয়েছে। ফিরে আসবার আগ্রহ সেই কণ্ঠস্বরের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং সুমিত্রা যেন খুব ব্যস্ত, প্রকাণ্ড বড় আনন্দের অজানা সুরের ঢেউ লেগে যেন সে প্রতিমুহূর্তে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে। ওর নিভৃত ও গোপন ভাবনাটা কি কোন এক উৎসবের আনন্দে ক্ষেপে গিয়ে অবৈধ বাধা দিয়ে ছুটে চলেছে না কি?

আরো একটু এগিয়ে গেল সে।—না, ওদের বাড়ীর দিকে নয়,—ওর নিজেরই মনের দিকে।

স্ত্রী সাধারণতঃ স্বামীর চোখকে অতি সহজেই ফাঁকি দিতে পারে। তাদের সজাগ লক্ষ্যকে বিভ্রান্ত করবার জন্যে স্ত্রীদের খুব বেশী পরিশ্রমও করতে হয় না। ওরা জানে ওদের অন্ধ চোখের পাতায় সামান্য একটুখানি চুমু দিলেই ওরা বিশ্বাসে বেকুব হয়ে পড়বে।

সুমিত্রার বাপের বাড়ী যাওয়ার দিনটির কথাই মনে হল তার। মান-অভিমান ও রাগারাগির অবসানও সে ঘটালো যেন তিথি নক্ষত্র দেখে। ক্ষণিক মোহের রাত্রির সুযোগ নিয়ে একটি যুবতী স্ত্রী কত সহজে কাজ হাসিল করে চলে যেতে পারে পরীক্ষিতই তার দৃষ্টান্তস্বরূপ। ওর শোকদুঃখের পেছনে অদৃশ্যভাবেও আড়ালে যে একটি নিখুঁত পরিকল্পনা সাজানো রয়েছে, সুমিত্রার যাওয়ার সময় পরীক্ষিতের মত মানুষেরও মাথায় আসেনি। ওদের সহজাত বুদ্ধির মাঝে মাঝে এমন কৌশলি হয়ে ওঠে যে খুব ধারালো বুদ্ধির মানুষের চোখকেও ধাঁধিয়ে দেয় এক এক সময়।

কেমন সহজ ও সুন্দর কায়দা করে সুমিত্রা যে ওকে খুব দিয়ে নিজের কার্যসিদ্ধি করে গেছে, এ-কথা এখন এখানে বসে বসে ভেবে খুব আশ্চর্য হয়ে গেল পরীক্ষিৎ। ভাবতে গেলে ব্যাপার হয়তো তেমন কিছু নয়,—বরং নিতান্ত সামান্যই একটি প্রাত্যহিক ব্যাপার তবু পুরুষমানুষ ও-ভাবে মন খুলিয়ে নিজের কাজ গুছাতে পারে না,—এ-কেবল মেয়েরাই পারে।

পরীক্ষিৎ বিছানাতে আজ শুয়েছিল। সুমিত্রা সাধারণতঃ যেরকম থেকেই অন্য শাড়ী, ধরিবাস ও অন্তর্বাস পরে ঘরে এসে ঢোকে। কিন্তু সেদিন সে যেরকমের করল যেন উল্টে করেই। ধরণটা ভেজিয়ে শাড়ী, ব্লাউস পেটিকোট বদলাতে শুরু করল পরীক্ষিতের চোখের সামনেই পরীক্ষিতের অস্তিত্বকে একেবারে গ্রাহ্য না করে পুরুষমানুষের সবযোধের ওপর এ-ভাবে সুড়সুড়ি দেওয়াটা নতুন নয় কিন্তু ঠিক স্থানে, ঠিক সময়ে, ঠিক মানুষটি হলে তা প্রলয়কাণ্ডের মত বিপর্যয় ঘটাবার শক্তি রাখে। সুমিত্রার নির্ভিক নিঃসঙ্কোচ ভাব যেন শুধু একটি পুরুষ মানুষের একটি অনুভূতিকে তৃপ্ত করে সফল হয়ে উঠতে চায়।

"দৈবাৎ যদি ফিরে আসতে দেরী হয়ে যায়,—তাহলে তুমি যেন কিছু ভেবে বসোনা।"

সুমিত্রা শাড়ীটা টেনে খুলে ফেলল বিনা দ্বিধায়,—একটুকুও সঙ্কোচ কিংবা জড়তা এল না, যে ঘরের মধ্যে দ্বিতীয় কোন মানুষ নেই।

"কি? ভাববো নাকি?"

খুলে ফেলতে লাগল একটি একটি করে ব্লাউসের বোতাম। ও ঘাড় নীচু করে বোতামের ঘর দেখছে, না আর কিছু তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, কেবল বোঝা যাচ্ছে ওর কাজলহীন দুটি আয়ত চোখের একটি অধীর বিড়ম্বিত সুখ। পরীক্ষিতের চোখের সামনে দ্রুত দৃশ্য-পট পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ নিখোঁজ একটি ম প্রেয়সীর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল স্তম্ভিত পরীক্ষিতের চোখের সামনে। সুমিত্রার চোখের দৃষ্টিপাতও যেন অকস্মাৎ একটি সুস্পষ্ট গর্বের ঘোরে আবিষ্ট হয়ে গেল চোখের ভাষা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল ক্রমশঃ আর যেন বলতে লাগল পরীক্ষিতকে,—'তোমারই সন্তানের জননী আমি!'

পরীক্ষিৎ তার একটা হাত বাড়িয়ে দিল সুমিত্রার

দিকে আর তখনি ওর কটিদেশ তার সেই হাতের বন্ধনের মধ্যে জড়িয়ে পড়ল। চোখ তুলে সুমিত্রার দিকে তাকিয়ে পরীক্ষিৎ তার আর একটি পরিবর্ত্তনের রূপ দেখে অবাক হয়ে গেল। মুহূর্ত্তপূর্ব্বের জননীসত্তা যেন মহিমাময় সূর্য্যের মত দিগন্তে অন্তর্হিত হয়ে গেল। দাদা দাদা ভাঁজেভাঁজে ওর সুগঠিত শ্রোণীদেশ জুড়ে আলোছায়ার আসক্তির আকর্ষণে একটি নিমূর্ত আকারের সীমানায় এসে চটকট করছে। অন্তর্বাসের পূর্ব স্মৃতি ছিঁড়ে গেছে—ছিঁড়ে গেছে আর ভেঙে পড়েছে ওর মাতৃত্বের। চিরপরিচিত এখন ফিরে এসেছে দুটি হৃদয়ের তরঙ্গে,—দুই তরঙ্গের একখানি কবিতার মধ্যে। পরীক্ষিতের হাতটা শিথিল হয়ে গেল ওর কোমর থেকে—সুমিত্রার শরীরটাও লঘু একটি দীর্ঘনিশ্বাসের মত আলগা হয়ে আলগোছে সরে গেল বহুদূরে।

কথা বলতে বলতে ও শাড়ী পরে ফেলল, ব্লাউস পরল, হাতের চুড়ি বদলে নতুন, আর একটা সেট পরে নিল, রিষ্টওয়াচ বাঁধল হাতে, চিরুণী লাগালো চুলে, পাউডার ঘষে নিল মুখে, একটু আধটু প্রসাধন করল ভ্রু চোখ ঠোঁট আর গালে। তারপর লাল মখমলের ওপর জরির কাজ করা জুতোতে সুন্দর পা দুখানা ঢুকিয়ে দিয়ে পরীক্ষিতের সামনে এসে দাঁড়াল। সাজের মধ্যে যাহার কিছুই করেনি সুমিত্রা বরং ওর পক্ষে বেজায় সাদাসিধে এবং আটপৌরে। তবু ওর শরীরের গঠনে, ওর চেহারার রূপে এবং হয়ে এই সামান্য সাজগোজ আর এই হেলাফেলার প্রসাধন সামান্য আর সাধারণ হয়ে থাকে না। তোমার মনে হবে, মেয়েটা সেজেছে অবশ্য, সাজতে জানেও।

অভ্যস্ত যাবের মত এবার বাপের বাড়ীতে গিয়ে সুমিত্রা কিন্তু তেমনভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে চলল না। এমন ছাড়া-ছাড়া ভাব, এমন চুপচাপ সে দেখেওনি, অভ্যেসও নেই। চোখের আড়ালে গিয়ে ও এত সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে যে ওর সাম্প্রতিক ব্যবহারের অনেক হারানো সূত্রকে জেগে দাঁড়িয়ে পূরণ করে দিতে হয়।

খুব কঠিন কঠিন ভাবনার কথা দিয়ে পূরণ করতে হল এই সব হারানো সূত্রকে।

এইসব কঠিন কঠিন কথা অমনি অমনি হয়নি। একটা গুজব কানে এসেছে,—অধিকন্তু খুবই ঠারে ঠমকে।

পরীক্ষিতের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে ও চলে যেতে পেরেছিল ঠিকই কিন্তু ধাঁধিয়ে দিতে পারেনি পাড়ার মানুষগুলোকে।

ছেলেমেয়ের হাত ধরে বেড়ানোর অছিলায় যদি কোন তরুণী একটি বিশেষ সময়ে একটি বিশেষ যুবকের সঙ্গে অনবরত আড্ডা আর হৈচৈ করতে থাকে তাহলে পাড়াটা তাকে ছেড়ে কথা বলবে না নিশ্চয়ই। স্বামীর কানে অধিকন্তু সে-সব কথা এসে পৌঁছবে সবচেয়ে দেরীতে কিন্তু শান্ত, শিষ্ট, ভাল মানুষের মত আভাস ইঙ্গিত বেশ ভালই পাওয়া যায় কান খাড়া করে থাকলে।

এমনি ছিটেফোঁটা কথা পরীক্ষিতের কানেও এসেছে; ওর সঙ্গে আলাপ করবার আগ্রহটাই যেন বেড়ে গেছে সকলের। যারা সবচেয়ে স্পষ্টবাদী তাদের আলাপ-আপ্যায়নের মধ্যে ওরকম ভাব যদিও এ-পর্যন্ত নষ্ট হয়নি, যদিও মুখ ফুটে কেউ কিছু বলতে ওকে সাহস পায়নি, তবু বোঝা যায় কোন দিক থেকে হাওয়া আসছে, কোথায় এবং কোন লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে একটা প্রাণান্ত চেষ্টা চলছে।

আরো কিছুদিন দেখে পরীক্ষিৎ হঠাৎ ওদের বাড়ীতে ফোন করে বসল নিতান্ত অসময়ে,—এ-সময়ে পরীক্ষিৎ ওকে কখনো ফোন করে না।

সুমিত্রা নয়,—ফোন ধরল সাধনা।

"কবে এসে দেরাদুন থেকে? প্রবোধদা ভাল আছে? ও-ও এসেছে না কি?"

"না, আমি একলাই এসেছি।"

"তোমার দিদিকে একটু ডেকে দাও তো!"

ফোন ধরে রইল পরীক্ষিৎ অনেকক্ষণ। অফিস থেকে বেলা দুটো আড়াইটার সময় যে পরীক্ষিৎ সুমিত্রাকে ফোন করতে পারে তা বোধহয় ও ভাবতেই পারেনি। কাজেই কোনের লাগোয়া যে-ঘরটাতে সুমিত্রার আস্তানা, সেখান থেকে ও বোধহয় নিশ্চিন্ত হয়ে একটু ঘুরেই গেছে। [ক্রমশঃ

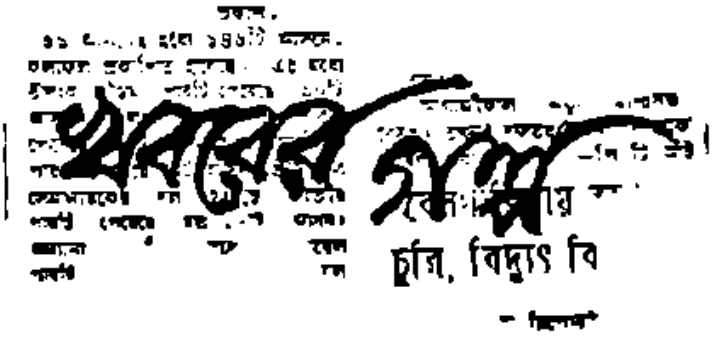

ডাক হরকরা

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়)

বর্তমানে ভারতের সবচেয়ে বড় খবর কি ? কেরলের নতুন মন্ত্রীসভা, বাংলার বন্যা, বা খুনোখুনি, উত্তরপ্রদেশের ক্ষমতার লড়াই—এসব কিছু না—তুচ্ছ !

সবচেয়ে বড় সংবাদ হল—ফোয়ারা !! কিছুদিন আগে রাজধানী দিল্লীর কনট প্লেসের পার্কে একটি রঙীন ফোয়ারা বসানো হল। সেই ফোয়ারার উদ্বোধন করলেন স্বয়ং রাষ্ট্রপতি শ্রীভিভি গিরি ! সে এক মহা আড়ম্বরপূর্ণ ব্যাপার ! অনেক টাকা সেই উদ্বোধন বাবদ খরচ হল। তা তো হবেই। রাষ্ট্রপতি উদ্বোধন করছেন, মন্ত্রীরা এসেছেন, ভি আই পিরা সব হাজির। এ কী আর যা তা ঘটনা। সেই উদ্বোধন দেখবার জন্যে স্বভাবতই অনেক ইতর সাধারণ জড়ো হয়েছিল। তারা যাতে কাছে যেতে না পারে সেজন্যে প্রায় দু'হাজার সি. আর, পি লাঠি বন্দুক উঁচিয়ে ছিল। ফোয়ারাটি তৈরী করতে বেশী আর কি, মাত্র সাতাশ লাখ টাকা খরচ হয়েছে। দেশের লোক দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় না ! তাতে কী ! তাই বলে রাজধানীর বিত্তশালী বিলাসী ইউন নরনারীদের জন্যে কিছু চোখ জুড়ানো রঙীন ব্যবস্থা করতে হবে না ? আলবৎ হবে ! "এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম ফোয়ারা"—এ কী আমাদের পক্ষে কম গর্বের কথা ! রাষ্ট্রপতি অবশ্য তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে দেশের সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশার জন্যে অনেক দরদ প্রকাশ করেছেন। সেইটাই বা কম কথা কী। তাইতেই তো আমাদের খুশী হওয়া উচিৎ। তা নয়, কোন কোন অবুঝ লোক মন্তব্য করেছেন, যে দেশে অধিকাংশ লোকের একবেলা পেট ভরা খাবার জোটে না, সে দেশের রাজধানীতে মুষ্টিমেয় ধনী অলস ও পরগাছা শ্রেণীর লোকের মনোরঞ্জনের জন্যে ২৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক রঙীন ফোয়ারা নির্মাণ দৃষ্টিকটু ব্যাপার ! তার উপর আবার সেই ফোয়ারা উদ্বোধন উপলক্ষ্যে যখন দেশের গরীব মানুষদের উদ্দেশ্যে উপদেশ বিতরণ করা হয় তখন সেটা সভ্য মানুষের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না করে পারে না।

এ-সব অতি অন্যায় মন্তব্য ! হলই বা বিদেশের কাছে আমাদের পর্বত প্রমাণ ঋণের বোঝা, অথবা তেইশ বছরে দেশের জনসাধারণের হাড়ির হাল, তা বলে আমরা একটু আমোদ-আহ্লাদ করব না ?

• • • •

একে কী বলা যাবে? অবদমিত হিংসার প্রকাশ? যৌন মনস্তত্ত্বের বিকৃত প্রতিফলন? অথবা স্রেফ অবশ্য সমাজবিরোধী আচরণ?

শুনছি এ বিষয়ে পুলিশের কর্তারা মাথা ঘামাচ্ছেন এবং বড় বড় মনস্তত্ত্ববিদরা গবেষণা করছেন।

ব্যাপারটা হচ্ছে: সান্ধ্যভ্রমিত কালে রাস্তায় ঘাটে মেয়েদের, বিশেষ করে কম-বয়সী মেয়েদের প্রতি এক শ্রেণীর ছেলেদের উপদ্রব। এই উপদ্রবের রূপ বড় বিচিত্র! ছেলেগুলো নিঃশব্দে নিঃশাড়ে মেয়েদের অনাবৃত হাতের উপর দিকে, অন্যান্য অংশে এবং সময় সময় পিঠেও ব্লেড চালিয়ে দিচ্ছে! ভীড়ের মধ্যে বাসের ভিতরেই বিশেষ করে এই কাণ্ড ঘটছে!

ঘটনাগুলো যে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং পরিকল্পিত এবং সুকৌশলে সম্পাদিত তার প্রমাণ পেয়ে কলকাতার পুলিশ কমিশনার বলেছেন, গড়িয়াহাট অঞ্চল থেকে হাজরা রোড চৌমাথার মধ্যে চলন্ত ট্রামে বাসে অল্প বয়সী মেয়েদের যা কোন লোক ব্লেড দিয়ে নিঃশব্দে কেটে দিয়েই ভীড়ের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। লোকটি একাও হতে পারে অথবা তার সাথীও থাকতে পারে। কে বা কারা এই কাজ করছে, কী বা উদ্দেশ্য, তা নির্ণয় করবার জন্যে পুলিশ নেমেছে হয়েছে।

কিন্তু পরবর্তী খবরে প্রকাশ, ব্লেড চালানোর ব্যাপারটা আর গড়িয়াহাট অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ নেই। উত্তরদিকেও ছড়িয়ে পড়েছে। কিছুদিন আগে শেয়ালদা এলাকায় বৃদ্ধি থেকে পাঁচিশ বছর বয়সের তিনটি মেয়ের উন্মুক্ত বাহুতে ব্লেড চালানো হয়। শেয়ালদা অঞ্চলে এ-ধরণের ঘটনা এই প্রথম। আঘাত অবশ্য গুরুতর নয়। নীলরতন সরকার হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তরুণীদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

মেয়েদের উপর এই বিচিত্র ধরণের উৎপাতের পিছনে কী মনস্তত্ত্ব ক্রিয়া করছে তা গবেষণার বিষয়। তবে একটা কথা স্বীকার করতেই হবে যে, পথে ঘাটে অনেক মেয়েকে দেখেছি যাদের বেশভূষা এবং আচার আচরণ রীতিমতো প্ররোচনামূলক। দেখেছি, ঠাসাঠাসি ভীড়ে চলন্ত বাসে আমরা যখন হিমসিম খাচ্ছি তখন সেই বাসে মেয়েরা ঠেলে উঠেছে এবং সেই ভীড়ের মধ্যে চিঁড়ে চ্যাপটা হয়ে বস্ত্র বরং দাঁড়িয়ে অলিত বসনা হোয়েও তাদের কী প্রগলভতা আর বেহায়াপনা। তাদের দেখে যদি মনে হয় ঐসব মেয়েরা যৌনবিকারে ভুগছে এবং তারা ঐভাবে পুরুষের ভীড়ের মধ্যে পুরুষ কর্তৃক স্পৃষ্ট বা পিষ্ট হতে আনন্দ পায় তাহলে কী অন্যায় বলা হবে?

অতএব শুধু একদিক দেখলেই হবে না, অন্যদিকটাও দেখতে হবে।

• • •

আমরা বাঙালীরা যে আজো সবংশে সবাই মরে লোপাট হয়ে যাই নি, এটাই আশ্চর্য। "মরমরে যদি নি কো মোরা, মারী নিয়ে ঘর করি"—কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ কী জানতেন যে আজ এই ১৯৭০ সালে কী ভয়ংকর বিষ প্রতিদিন খেয়ে আমাদের জীবনধারণ করতে হচ্ছে? না, এতটা নিশ্চয়ই তিনি কল্পনা করতে পারেন নি।

বড়বাজারের গুদাম ঘাঁটি থেকে যে মাল বাজারে ছাড়া হচ্ছে এবং আমাদের খেতে হচ্ছে তা যদি আর কয়েক বছর চলে তাহলেই কাজ শুরু হয় অর্থাৎ তাবার বাংলা আস্তটা ঘরে বেঁধে নির্বংশ হয়।

সম্প্রতি কর্পোরেশনের ল্যাবরেটারিতে পরীক্ষায় জানা গেছে যে সরষের তেল আমরা প্রত্যহ কিনছি এবং খাচ্ছি তাতে যে-সব ভেজাল দেওয়া হচ্ছে খাদ্যের পক্ষে তা অত্যন্ত মারাত্মক। ১৬ কেজির মধ্যে মাত্র ১ কেজি খাঁটি, বাকি ১৫ কেজিতে ওই ভেজাল। আর সেকি যে সে ভেজাল, বীজিবজে বিষের

তেজাল। এক রকম জংলী বীজ থেকে খুব সস্তায় একরকম তেল বেরোয় তার নাম স্নিনতল অয়েল। এ খেলে নাকি সাপ মরে যায়। সেই বিষ নষ্ট করবের তেলে মেশানো হচ্ছে। সেটা নাকি সরষের তেলের সঙ্গে মেশে ভাল। তাছাড়া তিসির তেলও আছে। সুতরাং আজ বাংলার সহরে ও গ্রামের ঘরে ঘরে যে পেটের ব্যামো, তার কারণ খুঁজতে আর অন্যত্র যাবার প্রয়োজন নেই।

বাঙালী সাধারণ সেরস্ত নারকেল তেল মাখায় মাখে। তাতে কি ভেজাল দেওয়া হচ্ছে জানেন? ব্যাচিং অয়েল (পাট ধোলাইএ লাগে), ট্রানসফরমার অয়েল (চামড়া ধোয়ায় লাগে), হোয়াইট ও মিনারেল অয়েল (লোমনাশক বলতে পারেন)। এই নারকেল তেল আমরা পরমানন্দে মাখায় মাখছি এবং মাথার চুলের রক্ষা রক্ষা করছি। বাঙালী মেয়েদের অন্যতম আকর্ষণ ছিল তাদের কেশপাশ। সেই কেশ-পাশ নাশের পালা চলেছে বাংলায়। এবং তারও মূলে ওই বড়বাজারের ব্যবসায়ীরা।

তাই তো বলছি, বাঙালী জাতটাকে মারবার জন্যে কত দিকে কত রকম! রাজনৈতিক দলের ছেলেগুলো দুধাই নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মরছে, তার চেয়ে এসব দিকে ঘুরি দিলে দেশের উপকার হ'ত।

• • •

মেয়েদের মধ্যেও যৌনবিকার ও মরণকামিতা যে কী ভয়ংকর উগ্র আকার ধারণ করতে পারে, ইতালীর এক নগরের পুলিশ দপ্তরে তার এক কাহিনী পাওয়া গেছে।

সেখানকার কলেজের একটি ছেলে একা একটি ফ্লাটে থাকতো। ফ্লাটে অবশ্য অন্য বাসিন্দারাও ছিল। তবে ছেলেটি তাদের কারুর সঙ্গেই মিশতো না। নিজের পড়াশুনা নিয়ে নিয়ত থাকতো। ছেলেটি ছিল খুব সুন্দর দেখতে। যেমন স্বাস্থ্য তেমনি শ্রীশ্রি। দুটো মেয়ের (তারাও কলেজের পড়ুয়া) নজর পড়ল ছেলেটির প্রতি। ছেলেটিকে তারা শিকার করতে চাইল। বেচে বেচে তার সঙ্গে আলাপ করল। তারপর একদিন ফ্লাটের অন্য বাসিন্দারা যখন যে যার কর্মস্থলে চলে গেছে তখন মেয়েদুটো এলো ছেলেটির ঘরে। ছেলেটি তো অপ্রস্তুত ও অবাক। কিন্তু মেয়ে দুটোর ভেবা করবার সময় নেই। তারা সোজাসুজি ছেলেটির কাছে তাদের প্রস্তাব রাখলো। একজনের পর একজন। একজন ছেলেটির বিছানায় শোবে, অন্যজন তখন ঘরের বাইরে পাহারায় থাকবে। তারা আরও জানাল, উত্তেজক বস্তু তারা সঙ্গে এনেছে। কিন্তু লজ্জার ভয়ে ছেলেটির অবস্থা নিমেষে শোচনীয় হয়ে উঠল, সে তাদের কথায় রাজী হল না। বারবার বলবার পরেও ছেলেটি যখন রাজী হল না, তখন মেয়ে দুটো কী করল জানেন? দু'জনে একযোগে ছেলেটিকে আক্রমণ করল এবং হাতের কাছে যা পেল, যথা জলের গেলাস, ঝুঁজো, ফুলদানি, ইত্যি প্রভৃতি ছুঁড়ে ছুঁড়ে মেরে ছেলেটিকে কাবু করে ফেললো। তারপর তার গলা টিপে ধরে শ্বাসরুদ্ধ করে তাকে মেরে ফেললো।

• • •

পুণা সহরের এক প্রান্তে ডাক্তার ভার্গবের চেম্বার, বড় বড় মেঘ প্লেট। অনেকগুলো বিলাতী ডিগ্রি। দেশ-বিদেশ ঘুরে তিনি সম্প্রতি এই সহরে এসেছেন। স্ত্রী-চিকিৎসায় তাঁর সমকক্ষ নাকি এদেশে আর কেউ নেই। সহরের অভিজাত সমাজে বহু মানুষের মুখেই তাঁর কথা শোনা যায়। দেখতে দেখতে পশার জমিয়ে ফেলেছেন। সমাজের বহু স্তরের মহিলা ও তরুণী তাঁর কাছে চিকিৎসার জন্যে আসেন তিনি রোগের চিকিৎসার চেয়ে রোগীর মানসিক অবস্থার চিকিৎসাই করেন বেশী।

শহরের আর এক প্রান্তে এক জ্যোতিষী এসে সম্প্রতি আসর জমিয়েছেন। তিনিও বিশেষ করে স্ত্রীলোকদেরই হাত দেখেন, তাদের মনস্তত্ত্ব বিচার করেন এবং যথাবিহিত নির্দেশ দেন। তিনি প্রায়শই বলেন, আপনার মানসিক অবস্থা জটিল, অতএব আপনার উচিৎ হবে কোন ভাল ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া, কিন্তু যে-সে ডাক্তার নয়, মনস্তত্ত্বে অভিজ্ঞ ডাক্তার চাই। তিনি অবশ্য কোন ডাক্তারের নাম বলেন না, কিন্তু রোগিনীরা সহজেই সেরকম একজন ডাক্তারের খোঁজ পায়—তিনি ডাক্তার ভার্গব।

এইভাবে ডাক্তার ভার্গবের পশার হু-হু করে বেড়ে চলেছিল। সম্প্রতি এক সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা ডাক্তারের অমন জুয়াচুরী ও বাজিচারিতা ফাঁস করে দিয়েছেন। তিনি পুলিশে নালিশ করেছেন যে ডাক্তার ভার্গব তাঁকে চিকিৎসা করবার অছিলাতে উত্তেজক ওষুধ খাইয়ে তাঁর সঙ্গে যৌনসংগম করবার উদ্যোগ করেছিলেন।

পুলিশ ডাক্তার ভার্গবকে গ্রেপ্তার করে তাঁর সম্বন্ধে তদন্ত করে যে চমকপ্রদ খবর পেয়েছে তা হল এই: ডাক্তার ভার্গব পাশ করা ডাক্তার নন। তাঁর ডিগ্রিগুলো সবই জুয়ো, মাঝামে তিনি অন্য নামে ওষুধ বিক্রির কাজ করতেন এবং সে কাজেও বহু লোককে ঠকিয়েছেন। শুধু তাই নয়, ডাক্তারি ব্যবসা ফলাও করবার জন্যে তিনি অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত বেশধারী দালাল নিযুক্ত করেছিলেন পুণায় এসে, যারা সমাজের নানা লোকের সঙ্গে, নানা ক্লাবে মজলিসে মিশে তাঁর নাম প্রচার করত। এবং এও জানা গেছে শহরের আর এক প্রান্তের জ্যোতিষীও তাঁরই নিযুক্ত লোক।

বেশ বড় রকমেরই কারবার ফেঁদেছিলেন মহাপুরুষটি। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না।

• • • •

রাত বারোটা বেজে গেছে।

নাইট ক্লাব থেকে ফেরবার পথে কাউন্ট ব্রিয়স্ মেটারলিঙ্ক একটু বিপদে পড়লেন, পথে দারুণ তুষারপাত হচ্ছে।

গাড়ী ঠিকমত যেতে পারছে না, প্রতি মিনিটে বাধা পাচ্ছে। তিনি গাড়ীর মধ্যে বসে ভাবছিলেন তাঁর নূতন লেখা বইটার কি নাম দেওয়া যায়।

হঠাৎ পথের একপাশে নারীকণ্ঠের আবেদন তাঁর কানে এল—"মহাশয়, কি আমাকে একটু পৌঁছে দেবেন?"

সুন্দরী তরুণীর সর্বাঙ্গে নীলরঙের পোষাক। জিজ্ঞাসা করে জানলেন মেটারলিঙ্ক তরুণী নাইটক্লাবেরই একজন নর্তকী।

"তোমার গাড়ী নেই?"

"আমি প্রতিরাত্রে পরের গাড়ীতেই বাড়ী ফিরি।"

"তাই নাকি?" —হেসে বললেন মেটারলিঙ্ক—"বেশ, তোমার নামটি কি?"

"মু বার্ড"।

শুনে চমকে উঠলেন মেটারলিঙ্ক।

বইটার নাম পাওয়া গেল।

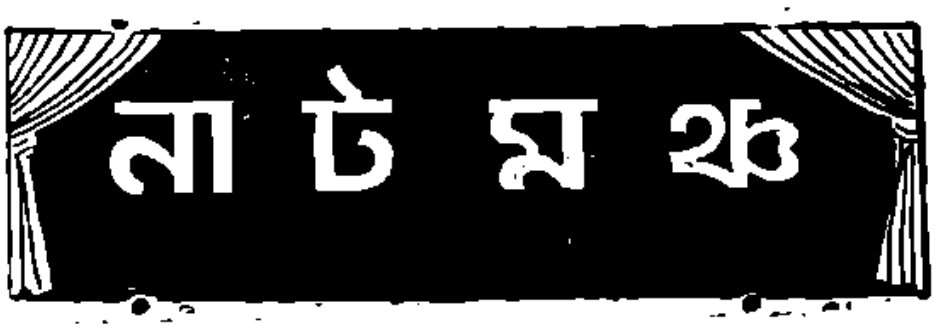

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বাংলার নাট্যসাহিত্য

দেবনারায়ণ গুপ্ত

বাংলার নাট্যশালার সঙ্গে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলা নাটকের জন্ম ও বৃদ্ধিকল্পে নাট্যশালার দান অপরিমেয় ও অনস্বীকার্য। বাংলার সাধারণ রঙ্গালয় অসংখ্য নাট্যকার ও নাটকের জন্ম দিয়েছে।

কেউ কেউ অনুযোগ করে বলেন, সাহিত্য-বৃক্ষের অন্যান্য শাখার তুলনায় নাট্য-সাহিত্য নাকি অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু প্রকৃত অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, বিভিন্নকালে বিভিন্ন বিষয়বস্তুর উপর অথবা একই বিষয়বস্তুর উপর বিভিন্ন নাট্যকার একাধিক নাটক রচনা করেছেন।

সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত নাটকগুলি মুখ্যত লোকশিক্ষা ও লোকরঞ্জনের জন্যেই রচিত। ১৪০৭ সালে শ্রীমন্মহাপ্রভু নবদ্বীপে চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে যে উদ্দেশ্যে আসর-অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন, সেই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে, বাংলার নাট্যকারেরা নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু তাই বলে যুগের সঙ্গে তাল খাইয়ে তাঁরা নাট্যকর্মের রীতিনীতির যে পরিবর্তন করেননি তা নয়।

অথচ সেদিন যাঁরা নাটকের প্রযোজনকর্মে লিপ্ত হয়েছিলেন তাঁদের আমরা 'নোটো' আখ্যা দিয়ে সমাজের এক পাশে ঠেলে রেখেছিলাম। তাঁদের আমরা সামাজিক মর্যাদা দিতেও কুণ্ঠা বোধ করেছি। অথচ নাটক ও নাট্য-সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারের ব্যাপারে এঁরাই ছিলেন নাট্য-সাহিত্যের ধারক ও বাহক।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় ১৮৮৪ সালে নাট্যগুরু 'নোটো গিরিশ' শিক্ষিত সমাজে একটু স্থান করে নেবার সুযোগ লাভ করলেন। গিরিশচন্দ্র তখন ঠাকুরের অনুগ্রহে অভিভূত। বললেন, "আমি আপনাকে পেয়েছি, আবার কি আমায় ওখানে (থিয়েটারে) যেতে হবে?" ঠাকুর বললেন, "হ্যাঁ, যেতে হবে বৈকি। তুমি যা করছ, তাই করবে। ওতে লোকশিক্ষে হয়।...আমি ভালভাবে পাট করলে তাতে যা হইবে তাই বলবে।"

সেদিনের উদারনৈতিক এক শ্রেণীর শিক্ষিত সম্প্রদায় অনেকেই ঠাকুরের এই কথায় উপলব্ধি করলেন যে নাটকই হচ্ছে মানুষের মনের জমি পাট করবার একমাত্র মাধ্যম। আর সেদিনকার সেই ইয়ং বেঙ্গলের যুগে নাটক ও নাট্যাভিনয় দেশের সামাজিক পরিবেশের সংস্কার সাধনে যে বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল, নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই তা জানেন।

১৯২২ সাল পর্যন্ত নাট্য রচনা যে খাতে প্রবাহিত হচ্ছিল, ১৯২৩ সাল থেকে তার কিছু পরিবর্তন দেখা গেল। এই সময় এক তরুণ নাট্যকারের আবির্ভাব হল। তিনি বাংলা নাট্য-সাহিত্যে একাংকিকার প্রবর্তন করলেন। নাটকটি আর্ট থিয়েটার পরিচালিত স্টার রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ হল। নাটকটির নাম "মুক্তির ডাক"। নাট্য সাহিত্যে এ এক নতুন সংযোজন। ১৯২৩ সালের সেই তরুণ নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়। সেদিন স্বর্গত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় এই তরুণ নাট্যকারকে স্বাগত জানালেন। এঁর নাটকে দুটি নতুন জিনিষ পাওয়া গেল। প্রথমত দীর্ঘায়ত কাহিনীকে নাটকীয় সংঘাত ও সংলাপের মাধ্যমে ছোট করা, দ্বিতীয়ত সংলাপ রচনায় ইনি এক নতুন নজীর সৃষ্টি করলেন।

এরপর নাট্যকার স্বর্গত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের আবির্ভাব ঘটে। শক্তিশালী নাট্যকার হিসাবে বাংলার নাট্য জগতে তিনি স্বীকৃতি লাভ করেন। নাটকের পুরাতন রচনা পদ্ধতির সঙ্গে নতুনের সংমিশ্রণে শচীন্দ্রনাথ এক বিস্ময়কর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

১৯২৩-৪২ পর্যন্ত মন্মথ রায় ও শচীন্দ্রনাথ ছাড়া আরও বহু নাট্যকার বাংলার নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। এই সময় অসংখ্য নাটক যেমন রচিত হয়েছে তেমনি নাট্যশালার প্রয়োজনে শরৎচন্দ্র এবং আরো কয়েকজন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিকের রচনা নাট্যরূপ পরিগ্রহ করেছে।

আজ অসংখ্য গ্রুপ থিয়েটার বা নাট্যসংস্থা নাট্যানুশীলনে নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রকে বিস্তৃততর করে তুলেছেন। এঁদের কল্যাণে বহু সম্ভাবনাময় নাট্যকারের সৃষ্টি হয়েছে। পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে এঁদের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। তথাপি নাট্যসাহিত্যের একটি বড় অংশ, সাধারণ রঙ্গালয় বা গ্রুপ থিয়েটারগুলি কর্তৃক উপেক্ষিত। গীতিনাট্য, রূপকনাট্য বা কাব্যনাট্য রচনার কোন চেষ্টা আজ আর আমরা দেখতে পাই না। সঙ্গীতাংশও প্রায় নাটক থেকে অন্তর্হিত হতে বসেছে। তবে এগুলি যেমন বাংলা নাট্যসাহিত্য থেকে উঠে যেতে বসেছে ওপরদিকে তেমনি উদ্ভট নাটকের আবির্ভাব ঘটেছে। আমরা সেকালে উদ্ভট কাব্য পড়েছি স্বর্গত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভট সাগর মহাশয়ের কল্যাণে। এ যুগে উদ্ভট নাট্যসৃষ্টিতে অনেক নবীন নাট্যকার উৎসাহিত। মনস্তত্ত্বমূলক এই নাটকগুলি উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আনন্দদানে সক্ষম হলেও, যে দেশে শতকরা সত্তেরো জন মানুষের মাত্র আক্ষরিক পরিচয় আছে সে দেশের পক্ষে এও এক উদ্ভট ব্যাপার। বৈষ্ণবেরা বলেন, "অন্তরঙ্গ সঙ্গে করে রস আস্বাদন, বহিরঙ্গ সঙ্গে করে নাম সংকীর্তন।" উদ্ভট নাটক কি কেবলমাত্র অন্তরঙ্গের জন্য? বহিরঙ্গের জন্য নয়? তাই যদি উদ্ভট নাটকের উদ্দেশ্য হয় তাহলে এদেশে সে নাটকের জনপ্রিয়তা অর্জন ও সার্বজনীন স্বকৃতি লাভ করতে এখনো অনেক দেরী।

বাংলার নাট্যশালা

বাংলার নাট্যজগতে আজ পাশাপাশি দুটি প্রবল স্রোত। একদিকে প্রয়োগনৈপুণ্য এবং অভিনয়ের দিক থেকে সাধারণ ব্যবসায়িক রঙ্গালয়ের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি, অন্যদিকে বহুসংখ্যক নবনাট্য সম্প্রদায়ের নতুনতর নাটক নিয়ে পরীক্ষার মাধ্যমে নানা দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। একদিকে যেমন সাধারণ নাট্যশালায় একটি নাটক বছরের পর বছর ধরে পূর্ণ প্রেক্ষাগারে অভিনীত হয়ে চলেছে, অন্যদিকে তেমনি তিন চারটি প্রধান গ্রুপ থিয়েটার তাঁদের নাট্য উপস্থাপনায় বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে এবং উচ্চাঙ্গের অভিনয়ে

প্রচুর দর্শক আকর্ষণ করছেন। তাঁদের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ও সেই চিন্তার অনুসরণে তাঁদের নতুনতর নাট্যপ্রয়াস যে বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু অনেক সময়েই দেখা যাচ্ছে, তাঁদের কর্মকৃতির প্রশংসামুখর আলোচনায় কিছু কিছু আধুনিক নবীন সমালোচক সাধারণ নাট্যশালার দুই-কম-শতবর্ষের অক্লান্ত প্রয়াস ও অবদানকে স্বীকৃতি দিতে পরাঙ্মুখ, জনসাধারণের মধ্যে নাট্য-প্রীতিকে জাগরূক রাখবার জন্যে অশেষ দুর্দিনের মধ্যেও নাট্যমঞ্চের প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখে সাধারণ নাট্যশালা এগিয়ে যেতে পেরেছিল বলেই যে আজ নাট্যাভিনয়ের এই বিপুল জনপ্রিয়তা, এ সত্য তাঁরা ভুলে যান।

নাট্যাচার্য শিশির কুমারের আবির্ভাবের পর বাংলা নাট্যশালায় যে নবযুগ এলো, তারই ফলশ্রুতি আজকের নাট্যপ্রবাহ। তিনিই পথ দেখিয়ে গিয়েছিলেন, জমি প্রস্তুত করেছিলেন, বাংলার নাট্যানুরাগী জনসাধারণের মধ্যে নতুন নাট্য-চেতনা জাগিয়েছিলেন।

ইদানিং অতি-আধুনিক কয়েকজন নাট্য-সমালোচকের আলোচনা পড়ে মনে হয়েছে, বিগতযুগের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বা নাট্যাভিনয়ের নৈপুণ্য সম্বন্ধে তাঁদের কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকায়, তাঁরা যেন মনে করেন, অতীতে যা হয়েছে, তা তেমন কিছু নয়, এখন যা হচ্ছে সেটাই সবকিছু। পূর্বসূরীদের অবদানের যে অসীম গুরুত্ব আছে তা তাঁরা বোধ করেন না।

সম্প্রতি নবীন সমালোচকদের এই ধরণের কিছু আলোচনা পড়ে সেই সব বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ নাট্যশালার কর্মোদ্যম সম্পর্কে এই সূত্রে কিছু আলোচনা করা অপ্রাসংগিক হবে না। তাঁদের বক্তব্যের সারমর্ম এই রকম :

(১) সাধারণ নাট্যশালায় তেমন কোন উল্লেখযোগ্য নাট্যপ্রয়াস কোনদিন দেখা যায়নি। (২) আজকের ব্যবসায়িক থিয়েটারগুলি এমনভাবে ব্যক্তির বা গোষ্ঠির কুক্ষিগত যে সেখানে অন্য কারুর নাক গলানো অসম্ভব। (৩) সাধারণ নাট্যশালা পুরণো সাফল্যের গণ্ডীর বাইরে যেতে সাহস করেন না, তাঁরা শুধু বক্স অফিসের দিকে চেয়ে থাকেন। (৪) শিশিরচন্দ্রের আমলে যে ধারা চলে আসছিল তা আজ অক্ষুণ্ণ নেই। ভাল নাটক দু'একটা হয়েছে এবং কখনো কখনো বিতর্ক বা আলোচনার ব্যবস্থাও হয়েছে কিন্তু গোটা পৃথিবীতে আজ নাট্যচিন্তার যে অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটেছে তার ছাপ বাংলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে পড়েনি। (৫) অফিস অটিস জীবনযাত্রার ভিতরে ও বাইরে যে টানা পোড়েন তার শিল্প-প্রতিফলন বাংলা রঙ্গমঞ্চে দেখা যাচ্ছে না।

এই ধরণের মন্তব্যগুলির উত্তরে বলা যেতে পারে, সাধারণ নাট্যশালার মালিকরা কোন ভাবে কোন সরকারী বা বেসরকারী সাহায্য না পেয়ে প্রকাণ্ড মাসিক খরচের দায়িত্ব নিয়ে বহু অর্থব্যয়ে এক একটি নাটক খুলছেন, সব নাটকই যে আর্থিক সাফল্য অর্জন করছে তা নয়, তবুও তাঁরা নিরুদ্যম হচ্ছেন না, দর্শকদের আনন্দ দেবার জন্যে নতুন নাটক মঞ্চস্থ করছেন। বিরাট ঝুঁকি নিয়ে তাঁরা একক চেষ্টায় তাঁদের থিয়েটার চালাচ্ছেন। এমত অবস্থায় অন্য কেউ সেখানে নাক গলাতে আসবেন কোন্ সুবাদে? তাছাড়া তাঁরা তো নিজেদের থিয়েটারের দরজা বন্ধ করে রাখেন নি, সকল শ্রেণীর নাট্যসম্প্রদায়কে তাঁদের মঞ্চ ব্যবহার করতে দিচ্ছেন। তা যদি তাঁরা না দিতেন তাহলে আজকের দিনের অনেক নাট্যসংস্থাই নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারতেন কি না সন্দেহ।

সাধারণ নাট্যশালা তাদের পুরনো সাফল্যের গণ্ডীর বাইরে যেতে সাহসী হয়নি—এই অভিযোগ

শুনলে মনে হয় সাধারণ নাট্যশালার ক্রমানুগতিক কর্মধারা সম্বন্ধে তাঁরা অবহিত নন। গিরিশচন্দ্র কি তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলির অসাধারণ সাফল্য সত্ত্বেও মাকবেথ বা মায়াবসানের মতো নাটক নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন নি? অমরেন্দ্রনাথ দত্ত কি সে যুগে রবীন্দ্রনাথের রাজা ও রাণী, চোখের বালির নাট্যরূপ অথবা হ্যামলেট ও মাইন অফ দি ক্রস-এর মতো দুরূহ নাটকাবলী অভিনয় করবার সাহস দেখান নি? সিসির কুমার কি পুণ্যলীক, পাষাণী, তপতী প্রভৃতি কঠিন নাটক মঞ্চস্থ করে পুরনো সাফল্যের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে আসেননি?

আধুনিক কালেও সাধারণ নাট্যশালায় এই পুরনো সাফল্যের গণ্ডীর বাইরে আসার একাধিক দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। মনে পড়ছে, স্টার থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথের গৃহপ্রবেশ, মন্মথ রায়ের মুক্তির ডাক, নাট্য-নিকেতনে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ঝড়ে রাতে, প্রবোধ বসুমল্লিকের শুভযাত্রা প্রভৃতি নাটকগুলির কথা। হাল আমলে, বিশ্বরূপা নাট্যশালা পুরনো সাফল্যের গণ্ডীর বাইরে এসেই সম্পূর্ণ নতুন পরিকল্পনায় নতুনতর আংগিকে পরিবেশন করেছিলেন পরীক্ষামূলক একাধিক নাটক যাদের মধ্যে বাংলার নাট্যরসিকদের পরিচয় ঘটেছিল থিয়েটার-ভোগ পদ্ধতির সঙ্গে।

সাধারণ নাট্যশালায় ভাল নাটক মাত্র দু'একটা হয়েছে এবং কখনো কখনো বিতর্ক বা আলোচনার ব্যবস্থা হয়েছে বলে একজন সমালোচক যে মন্তব্য রেখেছেন তার উত্তরে বলা যেতে পারে, দু'একটা নয়, তিনি খবর রাখলে জানতে পারতেন, বহু অসাধারণ নাটক ইতিমধ্যে সেখানে অভিনীত হয়েছে এবং নিয়মিত নাট্য-আলোচনার ব্যবস্থা হয়েছে এবং হচ্ছে, গত বারো বছর ধরে নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ নামে প্রতিষ্ঠানটি বঙ্গনাট্য সাহিত্য সম্মেলনের যে আয়োজন করে আসছেন, তার প্রতি বছরের তিন চার দিনের অধিবেশনে বহু নাট্যবিদ, গুণীজানী মনীষী নাটক নিয়ে আলোচনা করেছেন, প্রবন্ধ পড়েছেন, ভাষণ দিয়েছেন। শুধু আলোচনা ও অধিবেশন নয়, ঐ পরিষদ গিরিশ গ্রন্থাগার নামে একটি নাট্যপাঠাগার স্থাপন করেছেন, প্রতি বছর নাট্যপ্রতিযোগিতার আয়োজন করে এবং প্রতি শনিবার ম্যাটিনিতে নাট্য সম্প্রদায়ের অভিনয় করবার বিশেষ সুবিধাজনক সুযোগ দিয়ে তাঁরা এই রাজ্যের নাট্যপ্রবাহকে আরও জোরদার ও জনপ্রিয় করে তুলতে সহায়তা করছেন। এইসব কর্মোদ্যম কি সাধারণ নাট্যশালার পক্ষে সমিষ্ট নাট্যচিন্তার পরিচায়ক নয়?

অস্থির জটিল জীবনযাত্রার প্রতিফলন সাধারণ নাট্যশালার অনেক নাটকেই দেখা গেছে, আর নাটক কি শুধু জটিল জীবনের প্রতিফলনেই সীমাবদ্ধ থাকবে? জীবনের আদর্শ, মূল্যবোধ, আশা, আকাঙ্খা, আনন্দ, সরলতা—এসবের প্রতিফলন কি নিষিদ্ধ কর্ম বলে গণ্য হবে? ক্ষণকালের কথার মধ্য দিয়ে নাটক কি চিরকালের কথা বলবে না, দেখাবে না বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন অবস্থায় জীবনের মহৎ প্রকাশ?

এই সূত্রে, সিসির পরবর্তী যুগে সাধারণ নাট্যশালা দুদিন কাটিয়ে ওঠবার পর ১৯৫০-এর পর থেকে যেসব নাটক মঞ্চস্থ করেছে তার একটি তালিকা দিলে নাট্যানুরাগী পাঠকের মনে পড়বে এই যুগে সাধারণ নাট্যশালাগুলিতে কী ধরণের সব নাটক অভিনীত হয়েছে।

১৯৫০ সালে স্টার থিয়েটার তাঁদের সুসংস্কৃত মঞ্চে খুললেন—ভাবনী (নিরুপমা দেবীর কাহিনীর নাট্যরূপ)। নাটকটি প্রভূত জনসমাদর পেলো। অতঃপর যেখানে অভিনীত হল, পরিণীতা, শ্রীকান্ত, রাজলক্ষ্মী, তাকবাংলো, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রেয়সী, সেবায়ি, তাপসী, এক দশক শতক, দাবী। বর্তমানে চলছে শর্মিলা।

ছত্রবহলে ১৯৫৩ সালে মঞ্চস্থ হল, নরেন্দ্র মিত্রের যুবভাবিণী উপন্যাসের নাট্যরূপ। তারপর একের পর এক অভিনীত হল, উল্কা, শেষ লগ্ন, সাহেব বিবি গোলাম, কবি, চক্র, প্রতিমা, অনর্ঘ, স্বীকৃতি, মায়াযুগ,

এক মুঠো আকাশ, এক পেয়ালা কফি, কথা কও, ছায়া নায়িকা, নায় বিভাট, টাকার রঙ কালো, অতএব, নবেম্বর, সেমসাইড। বর্তমানে অভিনীত হচ্ছে আমি মন্ত্রী হব।

১৯৫৯ সালে মিনার্ভা মঞ্চে লিটল থিয়েটার গ্রুপের নাট্যারম্ভ বাংলা রঙ্গমঞ্চের একটি বিশেষ ঘটনা। তাঁদের নাট্য পরিবেশনে ও নাটক নির্বাচনে নতুন রীতি ও দৃষ্টিভঙ্গী দেখা গেল। ঐ থিয়েটারে তাঁদের প্রথম নাটক ছায়ানট, সেই সঙ্গে তখেলো। তারপর সেখানে একে একে মঞ্চস্থ হয়েছে, অলীকবাবু, অঙ্গার, ফেরারী ফৌজ, তিতাস একটি নদীর নাম, তীর, মানুষের অধিকারে, বুদ্ধং শরণং এবং মেনিনের ডাক।

১৯৫৯ সালে বিশ্বরূপা থিয়েটারের দ্বারোদ্ঘাটন হয় একটি আদর্শমূলক উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরোগ্য নিকেতন। তারপর মঞ্চস্থ হয়েছে সুধা, সেতু, নয়, মায়া, হাসি, জাগো, ঘর। বর্তমানে অভিনীত হচ্ছে একটি ঐতিহাসিক নাটক—বেগম মেরী বিশ্বাস।

মধ্যে বিশ্বরূপায় এবং কালীবিশ্বনাথ মঞ্চে অল্প দুটী পেশাদারী দল যে নাটকগুলির অভিনয় করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রঙ্গিনী, আগন্তুক, এন্টনি কবিয়াল ও নটী বিনোদিনী।

ব্যবসায়িক মঞ্চে এযুগে যেসব নাটক অভিনীত হয়েছে, তার মধ্যে আছে নানা রসের ও নানা বিষয়বস্তুর আলেখ্য—বৈচিত্র্যে, বর্ণসুষমায়, প্রয়োগ নৈপুণ্যে ও অভিনয়ে যাদের মধ্যে একাধিক নাটক অভাবনীয় উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছে। আধুনিককালের বাংলার পাবলিক থিয়েটারের নাট্যাভিনয় উৎকর্ষে ও প্রয়োগনৈপুণ্যে সারা ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী তো বটেই পৃথিবীর অন্য যে কোন দেশের সমকক্ষ—সম্প্রতি এই মত ব্যক্ত করেছেন সহর কলকাতার এমন একজন রসজ্ঞ নাট্যানুরাগী শিল্পপতি যিনি প্রতি বছর ইউরোপ, আমেরিকা, ইংলণ্ড, জাপান প্রভৃতি দেশে গিয়ে থাকেন, এবং সেখানকার প্রত্যেকটি ভাল নাটকের অভিনয় দেখেন, যিনি বাংলা থিয়েটারের এমন কোন নাটক নেই যার অভিনয় একাধিকবার দেখেন নি এবং যিনি তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়ে মনে করেন, শিশির কুমার জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের মধ্যে অন্যতম।

নটকেশরী অমরেন্দ্রনাথ দত্ত

ক্লাসিক থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা

আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের বাধা নিষেধ অগ্রাহ্য করে পেশাদার মঞ্চে যোগ দিয়ে একটা দল তৈরী ক'রে মাঝে মাঝে স্টেজ ভাড়া নিয়ে অভিনয় করছেন অমরেন্দ্রনাথ, কিন্তু তাতে মন ভরছে না। নিজের থিয়েটার, নিয়মিত অভিনয়—তা না হলে তাঁর স্বপ্ন সার্থক হবে কেমন করে?

অনেক বাধা বিপত্তির পর গোপাললাল শীলের সঙ্গে দেখা করলেন। গোপাললাল শীলের এমারেলড থিয়েটার তখন বন্ধ হয়ে পড়েছিল। অমরেন্দ্রনাথ সেই রঙ্গগৃহ ভাড়া নিতে চাইলেন। গোপাললাল শীল প্রথমে তাঁকে ভাড়া দিতে চাইলেন না। অবশেষে দু'একজন বন্ধুর অনুরোধে তিনি সম্মত হলেন।

তখন অমরেন্দ্রনাথ শিশিরচন্দ্রের কাছে গেলেন, বললেন, আপনার উপদেশমত আমি নতুন থিয়েটার খুলতে উদ্যত হয়েছি! এখন আপনি আসুন, আমার দলে যোগ দিয়ে থিয়েটারের ম্যানেজারি করুন।

কিন্তু গিরিশচন্দ্র রাজী হলেন না। অমরেন্দ্রনাথের সেই সময়কার টাকার অত্যন্ত অনটনের কথা তিনি শুনেছিলেন, বললেন, এখন নয়, তোমার থিয়েটার আরম্ভ হোক, তখন এসো আমার কাছে।

নতুন কাজে নেমে অমরেন্দ্রনাথ খুবই বিব্রত হয়ে পড়লেন। যাঁরা তাঁকে আশা ভরসা দিয়েছিলেন, কার্যকালে দেখা গেল তাঁরা, সব মিপাত্তা।

যাই হোক অসমসাহসী অমরেন্দ্রনাথ দমলেন না, দু'মাস অক্লান্ত চেষ্টা করে নতুন দল গঠন করলেন এবং ১৬ই এপ্রিল ১৮৯৭ শুভফ্রাইডের দিন রাত সাতটার সময় নতুন থিয়েটারের উদ্বোধন করলেন। সেই উপলক্ষে যে হ্যাণ্ডবিল বিলি হয়েছিল তার হুবহু নকল নীচে তুলে দিলাম। পাঠকরা লক্ষ্য করবেন, হ্যাণ্ডবিলে ইংরাজীর বাহুল্য। সে সময় ইংরাজী ভাষার দাপট ছিল খুবই। তাই হ্যাণ্ডবিলে বিজ্ঞাপনে প্রচুর ইংরাজী ব্যবহৃত হত। থিয়েটারের তরফ থেকে কোন নিবেদন বা বিজ্ঞপ্তি বাংলায় না হয়ে ইংরেজিতেই লেখা হত। এরকম একাধিক দৃষ্টান্ত পাঠকরা পাবেন।

1897

Opening Night

EMERALD THEATRE

by

The Classic Theatrical Co.

মহাসমারোহে প্রথমাভিনয় !!

ক্ল্যাসিক থিয়েট্রিক্যাল কোং

Good Friday, the 16th April 1897 at 7 P.M. Sharp

শুক্রবার শুভফ্রাইডে ৪ঠা বৈশাখ, সন ১৩০৪ সাল, সন্ধ্যা ৭টা।

Under the distinguished patronage
and in the immediate presence of
Rajah Boykuntha Nath De Bahadur of Balasore

বালেশ্বরাধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দে বাহাদুরের সম্মুখে

A medley of the Cream of the Staff of some of our Public Theatres, supplemented by infusion of new blood of actors and actresses of established reputation.

1. Mohendro Lal Bose—The Tragedian
2. Aghore Nath Pattack—Musical director and actor.
3. Amorendra Nath Dutt
4. Gobordhone Banerjee—Late dancing master, Minerva Theatre
5. Promatho Nath Dass—Proprietor and actor, Minerva Theatre.
6. Dharma Dass Sur—Renowned Stage Manager

7. Tara Sundary—The Star of the Star Theatre
8. Kusum Kumary—The Jewel of the Minerva Theatre

etc. etc. etc.

Babu Girish Chandra Ghose's Musical Comedy

NALA DAMAYANTI

শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত মিলনান্ত নাটক

নল-দময়ন্তী

Splendid Lotus Scene

একটি ক্ষুদ্র কমল কোরক হইতে ধীরে ধীরে অপ্সরাগণ বহির্গত হইয়া পদ্মে পদ্মে দাঁড়াইয়া নৃত্যগীত করিবে।

নল—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত

দময়ন্তী—শ্রীমতী তারাসুন্দরী দাসী।

কলি—শ্রীঅঘোরনাথ পাঠক!

Followed by

Babu G. C. Ghose's Evergreen Oriental Pantomime

BELLICK BAZAR

তৎপরে

শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত নিত্য নূতন পঞ্চরং

বেল্লিক বাজার

সাধারণের চিরপ্রিয় অভিনেতা ও অভিনেত্রীবর্গ কর্তৃক অতি সমারোহে বেল্লিক বাজার অভিনীত হইবে।

Note :—Owing to the shortness of time, I have not been able to appear before the public with a new drama, as I fully intended to do. I shall however do so soon. All that I now aspire to is to merit the sympathy of the public for appearing before them without waiting to be fully prepared for the honour.

Amorendra Nath Dutt
Lessee and Manager

পরবর্তী সংখ্যায় অমরেন্দ্রনাথের নাট্যজীবনের ও সেই সময়কার নাট্যজগতের আরও তথ্য ও প্রসঙ্গ।

নাট্যপ্রবাহ

পূর্ণাঙ্গ নাটকের সঙ্গে আজ একাংক নাটকের জনপ্রিয়তাও কম নয়। সার্থক একাংক নাটকও যে দর্শক মনে গভীর রেখাপাত করতে পারে তা প্রমাণিত করলেন সুখ্যাত নাট্যসংস্থা অভিযাত্রিক। কিছুদিন আগে কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে তাঁরা এক সঙ্গে দুটি একাংকিকার অভিনয় করলেন, সুবন্ধু ভট্টাচার্যের কন্যা এবং অরুণ দাশগুপ্তের কস্তুরি অবতার। প্রথমটি গভীর রসের। দ্বিতীয়টি ব্যঙ্গাত্মক। ভিন্ন রসের দুটি নাটকের পরিচালনায় অরুণ দাশগুপ্ত বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। অভিনয়ে প্রত্যেকটি চরিত্রই যথাযথভাবে রূপায়িত। বিভিন্ন অংশে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, দীনেন ঘোষ, অরুণ দাশগুপ্ত, রবিন দাস, সন্তোষ দে, হীরালাল মুখোপাধ্যায়, প্রদ্যোৎ দত্ত, কল্যাণ ঘোষ, বিভাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রেণু দাশগুপ্ত, শিখা ভট্টাচার্য, দোলা দাশগুপ্ত, লক্ষ্মী দাশগুপ্ত।

রঙ্গনা : উত্তর কলকাতায় একটি নতুন নাট্যশালা

শহর কলকাতায় নাট্যদর্শকের সংখ্যা ইদানিংকালে বিপুলভাবে বর্ধিত হয়েছে। কিন্তু শহরে স্থায়ী সাধারণ নাট্যশালা মাত্র চার পাঁচটি। আজ শহরের চতুর্দিকে যেসব নাট্যসংস্থা (তাদের সংখ্যা অগণিত বলা চলে) অভিনয় করতে চান তাঁরা মঞ্চ পান না বা কোন মঞ্চে একটি তারিখ পাবার জন্যে তাঁদের বহুদিন অপেক্ষা করতে হয়। তাই শহরে নাট্যশালার অভাব আজ বিশেষ ভাবেই অনুভূত হচ্ছে। এমতাবস্থায় উত্তর কলকাতায় আর একটি নতুন রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হল—নাট্যানুরাগীদের কাছে এ সংবাদ নিশ্চয়ই আনন্দের। রাজকিষণ স্ট্রীট ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডের সংযোগস্থলে স্থাপিত 'রঙ্গনা' আধুনিক কায়দায় আরামপ্রদ ব্যবস্থার সমাবেশে নির্মিত। এর প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালকদ্বয় শ্রীরমেশ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশম্ভু পাল জানিয়েছেন যে দর্শকদের তৃপ্তি বিধানের জন্যে তাঁরা সর্ব সময় চেষ্টিত থাকবেন, এবং নতুন নাট্যসংস্থাকেও এখানে অভিনয় করবার সর্বরকম সুবিধা পাবেন। বর্তমানে এই নাট্যশালায় সুখ্যাত নাট্যসংস্থা 'নান্দীকার' নিয়মিতভাবে প্রতি বৃহস্পতি, শনি ও রবিবার তাঁদের সকলকল নাটকগুলি অভিনয় করছেন।

মঞ্চলেখার একক সঙ্গীতানুষ্ঠান

ছেলে-ভুলানো ছড়া-গানও যে দুই পরিবেশে সুরেলা ও ধ্বনীকণ্ঠে পরিবেশিত হলে শুধু ছোটদের নয় বড়দেরও উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারে তা সম্প্রতি উপলব্ধি করেছি 'মঞ্চলেখার' কার্যালয়ে এক মনোজ অনুষ্ঠানে। এইদিন একক শিল্পী ছিলেন শ্রীমতী অপরাজিতা ঘোষ। বহু বিস্মৃতপ্রায় ছেলে ভুলানো ছড়াগুলিকে বিচিত্র সুর তাল লয় মানের সহায়তায় তিনি এমন বৈচিত্র্যময় করে তুলেছিলেন যার রেশ উপস্থিত শ্রোতাদের মনে বহুদিন অম্লান হয়ে থাকবে।

তাঁর পরিবেশিত গানগুলির মধ্যে 'আয় আয় চাঁদা মামা টী দিয়ে যা', 'খোকা ঘুমুলো পাড়া জুড়ুলো বর্গী এল দেশে', 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর,' 'ইকড়ি মিকড়ি চাম চিকড়ি,' 'কি কথা ব্যাঙ-এর মাথা' 'আম পাতা জোড়া জোড়া,' 'মাকের বদলে নরুণ পেলাম,' 'ধাঁই কুড় কুড় ধাঁই নানা,' 'আয় অজগর আসছে তেড়ে,' কাজী নজরুলের 'এক এক্কে এক,' 'প্রজাপতি-প্রজাপতি,' 'তোর হোলো ঘোর ঘোলো,' 'বাবুদের তালপুকুরে' (নিছুচোর) উল্লেখযোগ্য। শিশু-সাহিত্যিক শ্রীঅখিল নিয়োগী ছড়াগুলির বিশ্লেষণ ক'রে শ্রীমতী ঘোষের ছড়া গানের প্রতি নিষ্ঠার কথা উল্লেখ করেন।

চোখের আলোয়

ভবানী মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে জন হাওয়ার্ড গ্রিফিন ছিলেন বোমারু বিমানের চালক। একটি বোমা বিস্ফোরণের ফলে গ্রিফিন দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যান। দশটি বছর অন্ধকারে চক্ষুহীন অবস্থায় থাকার পর ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের আটই জানুয়ারী তারিখে দৃষ্টিশক্তি যেমন আকস্মিকভাবে হারিয়েছিলেন আবার সেই ভাবেই ফিরে পেলেন। এ যেন পুনর্জন্ম। গ্রিফিনের বয়স তখন মাত্র ছত্রিশ বছর। এই আটই জানুয়ারী তারিখে তিনি সর্বপ্রথম নিজের স্ত্রীকে দেখলেন আর দেখলেন তাঁর দুটি শিশুসন্তানদের। গ্রিফিন দৃষ্টিহীন অবস্থায় ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর স্ত্রীকে বিবাহ করেছিলেন। কাজেই স্ত্রী এই মুহূর্তে তাঁর কাছে এক পরম বিস্ময়।

মাউন্ট কারমেল সেমিনারিতে বিশ্রামরত অবস্থায় গ্রিফিন কিছু কিছু আত্মকথা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। গ্রিফিনের এই আত্মকথনের ভিতর এক হতাশা-জর্জর মানুষের অসহায় জীবনে কিভাবে আশার আলো জ্বলে উঠল তার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রিফিন লিখছেন তাঁর দিনলিপিতে—

রবিবার, ৩রা জানুয়ারী, ১৯৫৭।

আমি এই সব নোট লিখে রাখছি। কারণ আমার স্মৃতির ধারাবাহিকত্ব নেই। এ শুধু স্মৃতির টুকরো কথা।

আমি লিখে যাচ্ছি। আমার পড়ার শক্তি নেই—এই লেখাগুলি অস্পষ্ট এবং লাইনগুলি উঁচু-নিচু হয়ে যাচ্ছে।

আজ থেকে চারদিন আগে, বুধবার আমি কারখানায় যাচ্ছিলাম। কোনো রকম ধাক্কা খাইনি, শরীরে কোনো দোলা লাগেনি, তবু যেন মনে হল সহসা আমার চোখের সামনে সবকিছু লাল হয়ে গেল, যেন অনন্ত লাল বালুকণা দেখতে পাচ্ছি। তারপর মনে হল যেন দরজা দেখতে পেলাম, দরজাটা ভাগ ভাগ করা, আমার চোখের ওপর যেন নৃত্যরত। আমি হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। আমার মাথায় এবং চোখে অসহ্য বেদনা অনুভব করি। আমি হোঁচট খেয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ি, সামনেই দেখি টেলিফোন। আমি সঙ্গে সঙ্গে তাড়াতাড়ি করে আমার স্ত্রীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম: আমি বললাম—আমার মনে হয়—

তারপর আমি কান্নায় ভেঙে পড়লাম।

আমার স্ত্রী আতংকিত কণ্ঠে বলে ওঠে—কি হল ? কি হয়েছে গো ?

আমি বললাম—আমার মনে হয় আমি দেখতে পাচ্ছি। ডাক্তারকে ডেকে পাঠাও। তাড়াতাড়ি ডাকো।

আমার স্ত্রীর কণ্ঠস্বর শান্ত। সে বেশ ভয় পেয়েছে, সে আতংকিত। সে বলল—তুমি শুয়ে পড়ো। আমি এক মিনিটেই ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আসছি।

আমি চেয়ারে বসে পড়লাম। বহুবর্ষের ত্রিভুজ যেন মিলিয়ে যাচ্ছে—যেন ঘূর্ণমান। একটি চিন্তা আমাকে গ্রাস করল। আমার পরিবারবর্গের আশা কি শুধু ভেঙে চূর্ণ হওয়ার জন্যই গড়ে উঠবে। কারণ এই অলৌকিক অবস্থার অবসান ঘটলে তাদের মনে হতাশা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।

ডাঃ ক্লেটন এসে গেলেন। আমার চোখে যন্ত্রণা হচ্ছিল। ভালো করে দেখার চেষ্টায় চোখের এই যন্ত্রণা। আমি আর চোখ চেয়ে থাকতে পারছিলাম না—চোখের ওপর আলো পড়ছে, নানা রকমের রঙ। এইসব রঙ আবার নিরন্তর পরিবর্তনশীল। আমি ভীষণভাবে কাঁপতে থাকি। আমি বলি—আমাকে কিছু একটা দাও, আমি আর সইতে পারছি না।

ডাক্তার আমাকে মৃদু ক্লোরোফর্ম ইনজেকশন দিয়ে বললেন—আমি চাই যে আপনি সবকিছুই সচেতন হয়ে দেখুন। এ এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা, খুব কম মানুষের অদৃষ্টেই এই অভিজ্ঞতা দেখার সুযোগ ঘটে।

বাইরে একটি গাড়ি এসে থামল। আমার চারদিকে অনেক পদশব্দ। অনেকেই ঘোরা-ফেরা করছে, আমার মুখের কাছে অনেক মুখ।

আমার মা উৎকণ্ঠ আগ্রহে প্রশ্ন করেন—সত্যি দেখতে পাচ্ছ বাবা ? সত্যি ?

—হ্যাঁ, আমি দেখছি তোমার পরণে একটি নীল পোষাক।

আমি আমার বাবা-মার মুখ দেখতে পাচ্ছি না। আমি শুধু তাঁদের মুখের একটা অংশ দেখছি, সেই সঙ্গে ঘরের ছাদের কিছু অংশ, পাশের দেওয়াল, সবকিছু অস্পষ্ট ঝাপসা মত দেখতে পাই।

আরেকটি গাড়ি এসে দাঁড়াল। আমি আমার স্ত্রী এবং সন্তানদের কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। প্রথমেই এল সুসান। আমার দু বছরের মেয়ে সুসান। আমি আমার সাধ্যাতীত শক্তির সবটুকু প্রয়োগ করে সেই দু বছরের মেয়ের মুখখানি দেখার চেষ্টা করি। ও আমার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, তারপর আর কিছুই নয়।

আমার স্ত্রী আমার বাহুপাশে, তার মুখখানি আমার মুখের পাশে। আমি তার কালো কেশরাশি দেখতে পাই। আমার ছেলে জনি আমার হাঁটুজোড়ের পা ধরে টানছে। আমি ওর কদম-ছাঁট চুলগুলি অনুভব করি। তারপর আর কিছুই দেখতে পাই না। ওকে দেখতে পাই না।

আমার কন্যাকে স্পষ্ট করে দেখা যেন সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকা। আর সব কিছুই যেন ঝাপসা হয়ে গেছে। এই আবছা অস্পষ্টতা পরবর্তী ম্লান আলোয় আমার মুখের ওপর ভাসে।

সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হলে আমি চক্ষু-বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে গেলাম। তিনি সব দেখে বললেন—চোখ দুটি বেশ ভালোই দেখছি। এখন রক্ত সঞ্চালনের ব্যবস্থা করতে হবে : এই রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা দরকার।

স্থির হল ডাঃ ক্লেটনের সহকারীর বাড়িতে আমি সেই রাতে থাকব—সেখানে ওরা আমার ওপর নজর রাখবে এবং অবস্থা পরিবর্তিত হলে প্রয়োজনবোধে ইনজেকশন দেবে। আমার তখন ঘুমিয়ে পড়তেও ভয় হচ্ছে। যদি ঘুমিয়ে পড়ি তাহলে ঘুম ভাঙলে আমি কি আবার দৃষ্টিহীন অন্ধ হয়ে থাকব।

পরদিনের কোনো কিছু আমার স্মরণে নেই। আমি চলাফেরা করেছি, কথা বলেছি, কাজকর্ম করেছি তবু কিছু যেমন মনে নেই। রিপোর্টার আর ক্যামেরাম্যানের দল দারাদিন পিছনে ঘুরেছে! তাঁরা যা কিছু চেয়েছেন সব তাতেই আমি 'হাঁ' বলেছি। রিপোর্টারদের সঙ্গে কথা বলেছেন ডাক্তার ক্লেটন। তিনি বলেন—এই লোকটি এখনও একটি নিদারুণ শকের ঘোরে আছে, আপনাদের আরো দুটি-চারটি দিন অপেক্ষা করতে হবে।

আরেকটি দিন। আমার অন্তরে গাঁথা হয়ে আছে। 'এক' আর হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ আমাকে সচেতন রেখেছে। আমার মনে আছে আমাকে ঠেলা দিয়ে ঘুম ভাঙানো হল। কে যেন বলল—ডাক্তার, এই অবস্থাতেই রয়েছে কয়েক ঘণ্টা ধরে। একটু বসে থাকলেই ঘুমিয়ে পড়ে।

ডাক্তার পরীক্ষা করছিলেন, তিনি বললেন—

—তোমাকে ক'দিন হাসপাতাল কি অন্য কোথাও গিয়ে থাকতে হবে। এমন জায়গায় থাকা চাই যেখানে কেউ তোমাকে বিরক্ত করতে পারবে না।

আমি জানতে চাইলাম যে কারমেলাইট ফাদারদের সঙ্গে থাকা যায় কিনা! ডাক্তার বললেন—সে হবে ভালোই হয়, হাসপাতালের চেয়ে ভালো হবে।

মাদার ফউনডেশন স্যর মি ব্লাইও আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে টেলিফোন করলেন। নিউইয়র্কের একটি সংবাদপত্রের সাক্ষাৎকার পাঠ করে তাঁরা বিশেষ আনন্দিত হয়েছেন। আশ্চর্য! এই সাক্ষাৎকারের কোনো কিছুই আমার স্মরণে নেই। এমন কোনো কিছু ঘটেছে তা মনে পড়ল না।

পরে শুনতে পেলাম ডাক্তার মাউন্ট কারমেল সেমিনারির প্রধানকে আমার বিষয়ে কিছু নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি বলছেন—

—কেউ জানবেনা কোথায় উনি আছেন। যদি দেখেন কোমার সম্ভাবনা হচ্ছে তাহলে ওর পেশীতে ১০০ মিলিগ্রাম এই ওষুধ ইনজেকসন দেবেন।

সোমবার রাত···

মাথা কুঞ্চিত হয়ে যাচ্ছে। কেমন যেন ঝুঁকে যাচ্ছে। বেশ যন্ত্রণা আছে। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে, কষ্ট করে কথা বলছি। আমি ফাদার প্যাট্রিককে জিজ্ঞাসা করলাম—আমি যেমন করছি এমনই কোনো একটা অন্ধ আছে না, যারা শুধু খায় আর ঘুমোয়, কোনো কিছু কাজকর্ম করে না। মনে পড়েছে, এই অন্ধর নাম শ্রথ না?

ফাদার একটু হেসে বললেন—আমার মনে হয় শ্রথ একটু আধটু ঘুরে বেড়ায়। তোমার চেয়ে একটু বেশী ঘোরাফেরা করে।

ওঁর হাসির ফলে আমার মনের ওষোট কেটে যায়।

আশ্চর্য! আশ্চর্য মনে হয়। আলো দেখে ক্লান্তি আসে মনে। ফাদার প্যাট্রিক চলে যাওয়ার সময় বললেন, তোমার নিশ্চয়ই আলোর দরকার নেই। কেমন আলোর প্রয়োজন আছে?

উনি আলো নিভিয়ে দিতে মনে হল বুক থেকে একটা ভারী বোঝা নেমে গেল। আমি যেন এই অন্ধকারে অনেক বেশী নিরাপদ—অনেক শান্তিতে নিজের আশ্রয়ে আছি।

মঙ্গলবার অপরাহ্ণ···

আজ আমি আরো কিছু দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এক সঙ্গে অতি সামান্যই গ্রহণ করতে পারি,

তারপর আমার বোধের অন্তরাল থেকেই কে যেন ধরজা বন্ধ করে দেয়, সব আবার আবছা হয়ে আসে। সব মুছে যায়।

কাহার প্যাট্রিক আজ সকালে আমাকে একটি ছবির বই এনে দিলেন, ভেরমীরের অঙ্কিত "ওম্যান ওয়েইং গোল্ড"—দেখতে দিলেন, আমি দেখলাম, যেন অনেক দূরের বন্ধু—বেশ রমনীয়। এক অপূর্ব জ্যোতি ক্যানভাসকে উদ্ভাসিত করে রেখেছে।

কাহার প্যাট্রিক বাথের সঙ্গীত বাজিয়ে ঘরটির নৈঃশব্দ দূর করলেন। আমার অন্তরে যেন সে আনন্দ আর ধরে রাখতে পারছি না।

আমার চোখের সামনে ভেরমীরের আজ অপরাহ্নে যে মায়াজাল রচনা করেছেন বাখের সুর যাদুর এখন আমার অন্তরে সেইরকম আলোড়ন আনিয়ে তুলল।

এখন এই রাত্রের অন্ধকারে বসে অবাক হয়ে ভাবছি, আমি আমার টাইপরাইটারের চারপাশ দেখতে পাচ্ছি। সেই সঙ্গে ভেনকৃটাও।

আচ্ছা ভেরমীরের ছবির রঙ কি কোনদিন ভুলে যাব?

প্রার্থনা করি তা যেন না হয়। প্রার্থনা জানাই আমার চোখের দৃষ্টি ফিরে আমার সায়ক হয়ে এই রঙ আমার চোখে উজ্জ্বল হয়ে থাকুক।

প্রথম যা দেখেছি সেইসব স্মরণ করে রাখার বাসনা হয়। আমার মেয়ের মুখ, আমার স্ত্রীর এবং বাবা-মার মুখ আমার মনে ভেসে উঠছে।

প্রত্যুষের ঠিক পূর্বে উষালয়ে চ্যাপেলের কথা মনে জাগে, বাতিগুলি জ্বলছে, সোনালি পাত্রে তার প্রতিবিম্ব চিক চিক করছে। তারপর সেই ভেরমীরের আঁকা ছবিখানি।

বৃহস্পতিবার···

গতকাল একটি সপ্তাহ কেটে গেল।

কায়রোলাইটের নৈঃশব্দ পান করে আছি। এই অখণ্ড নৈঃশব্দ মাঝে মাঝে কিস্ কিস্ কথাবার্তা আর প্রার্থনা সঙ্গীতের সুরে ভেঙে যায়। আমার স্নায়ুগুলিতে আমার শক্তি সঞ্চারিত হচ্ছে। তবে আমি ভীষণ ক্লান্ত, দেখতে পাওয়ার ভারে—আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

আমি ছবির দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে দেখেছি যে এখন যখন যা কিছু দেখি তাকেই পেনটিং বলে ভ্রম হয়। প্রকৃত কিন্তু একথা মনে হয় না।

শুক্রবার সন্ধ্যা

অন্ধত্বের চাইতে আমার এই অবস্থা অনেক দুঃসহ। আমি যে দেখতে পাচ্ছি একথা আমার স্মরণে নেই।

আমি যখন আওয়াজ শুনে বা দ্রব্যাদি স্পর্শ করে চলাফেরা করতাম, প্রতিধ্বনির পিছনে ধাওয়া করতাম তখন যেন আরো অনেক বেশী স্বচ্ছন্দে ছিলাম। তখন সকল প্রকার উত্তেজনা বিষয়ে আমি সচেতন ছিলাম। এখন আমার কাছে সবকিছু ঘুচে গেছে, আছে দৃষ্টি।

দৃষ্টি আমাকে যেন অভিভূত করে তুলেছে। নতুন চোখে জগতকে দেখছি।

দৃষ্টি শক্তি এখন আমার কাছে পীড়াদায়ক! আমি চোখ টিপে থাকি, সমস্ত দৃষ্টিটা সংহত রাখার চেষ্টা করি। আমি প্রাসাদের দিকে বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে থাকি।

গোধূলির অবসানে পথঘাট যেন নীতের ঘাসের বুকে কলালি রেখার মত পড়ে থাকে। আমি বলে উঠি—এযে অতি চমৎকার ! সত্যি অপরূপ।

দিনের আলো রাতের আধিপত্যে কেমন ম্লান হয়ে যায় তখন আমি তার দিকে তাকিয়ে থাকি, আলো জ্বালার সময় কেমন মনে হয়।

তারপর সহসা সব কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে দেখি, দূর কন্ধাবে উদারা মুদারা তারার মত স্বরগ্রামের সর্বশেষ স্তর। সুর কন্ধারের চড়া ও খাদের মত সমগ্র ব্যাপারটিকে একটি আশ্চর্য ঘটনা মনে হয়।

দেখতে পাওয়া তাহলে এই রকম কি ? এই ভাবেই কি সবাই দেখে থাকে ? যদি না দেখে তাহলে নিশ্চয়ই এভাবেই দেখাটাই রীতি।

সোমবার ২১শে জানুয়ারী—

অনেকবার ডাক্তারদের কাছে যেতে চল।

আমার নতুন চশমা হয়েছে, এই চশমায় আমি বেশ ভালো দেখতে পাচ্ছি। তবে সব কিছুতেই বেশ কষ্ট হচ্ছে।

আজ দুদিন বাড়িতে এসেছি। যখন আমি বাড়িতে হেঁটে এলাম একটা ছোট্ট ছেলে, তার মাথায় একরাশ সুন্দর চুল, আমার পিছে পিছে এল, আমি যখন জুতোটা খুলে ফেলার জন্য নিচু হলাম তখন ও আমার গলাটা জড়িয়ে ধরল।

কি সুন্দর ছেলেটা !

সমস্ত বিকাল ধরে আমি আমার ছেলেদের সুখের অভিব্যক্তি দেখলাম, আর বুঝলাম যে ওদের আকৃতি সম্পর্কে আমার কত হীন অস্পষ্ট ধারণা ছিল।

সেইদিনকার সন্ধ্যাটা আমার কাছে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ মুহূর্ত।

ক্রমে সবাই জানল যে আমি বাড়ি ফিরে এসেছি। বাড়িতে চুপচাপ থাকার অসুবিধা বুঝে ডাক্তাররা আবার নির্দেশ দিলেন সেমিনারিতে ফিরে আসার জন্য। আমার কাছে ফোন থাকবে না, দিনরাত টেলিফোন বাজবে সেটা ভালো নয়, এমন কি যে সব অজস্র চিঠিপত্র আসছিল তাও আমাকে দিতে নিষেধ করা হল।

শনিবার

আজ গির্জামন্দিরে একা একা অনেকখানি সময় কাটালাম। এই সময়টা কিন্তু অনুভব করিনি, আমি শান্তিতে ছিলাম।

আমি রিক্রিয়েশন রুমের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, চোখে পড়ল পিং-পং টেবিল। বুঝলাম এখন আমি এইসব খেলার অংশ নিতে পারব।

আজ ক'দিন ত' এই ঘরটির সামনে দিয়ে যাতায়াত করেছি, কই একথা ত' মনে জাগেনি। তার কারণ আমি সব কাজেই অক্ষম এই চিন্তাটা আমার অন্তরে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল।

ফাদার আগস্টিন আমার সঙ্গে খেলায় যোগ দিলেন। গোড়ার দিকে বলটা যেন একটি বিন্দুমাত্র ছিল কিন্তু অচিরেই আমি তা স্পষ্ট দেখতে পেলাম, সাদা সুন্দর বল। আমি বল মারতে পারলাম।

একটা জটিলতা, রক্তিমের আজন্ম ভারটুকু ধীরে ধীরে কেটে গেল। এইসব প্রথম আমার অন্তরে প্রকৃত হাসির হিল্লোল জেগে উঠ্‌ল।

রবিবার

সবাই আমাকে চোখ থাকার যে সব আনন্দের কথা বলে এসেছে আমি সেইসব আনন্দ উপভোগ করছি। আমি যেমনটি প্রত্যাশা করেছিলাম তার চেয়ে অবশ্য এই আবেগের তীব্রতা অনেক কম।

কিন্তু আজই সকালে সে আনন্দে ফিরে এলাম, আমি মার্টিন, লভ্‌ প্রভৃতির বাণী পাঠ করতে লাগলাম। আমার সেলে বসে উচ্চকণ্ঠে পাঠ করছি, বৃষ্টির জল পাম্পিতে জলতরঙ্গ বাজাচ্ছে, আর কাঁচে কুয়াশা সৃষ্টি করছে। ঘরের ওপর থেকে চমৎকার আলো এসে পড়ছে, এই প্রত্যুষের আলো আমার কাছে আজ পরম রমনীয়।

আমার এই আবৃত্তির মধ্যে আনন্দের এক অপরূপ অভিব্যক্তি, দৃষ্টিশক্তি এই আনন্দের একটা উল্লেখনীয় বস্তুবিশেষ। আমি সেই প্রত্যুষে উচ্চকণ্ঠে পাঠ করে চলেছি—

"The Lord's perfect law, how it brings the Soul back to life; the Lords unchallengeable decrees, how they make the simple learned."

ঈশ্বরের কি অপার করুণা···

আত্মার পরিপুষ্টির ফলে সকল কাঠিন্য গলে যায়। সহসা যেন সহস্রদল পদ্ম ফুটে উঠেছে!

এই উপাসনার বাণীর মধ্যে আমি যেন আমার এই দৃষ্টিশক্তি আবার ফিরে পাওয়ার একটা পরিপূর্ণ মুক্তি পেলাম।

আকাশভরা সূর্য তারার মধ্যে, বিশ্বভরা প্রাণের পারাবারে আবার আমি ঠাঁই পেলাম।

• • •

একটা কথা আছে, যেমন গাছ তেমনি ফল : কিন্তু তারও আগের কথা, যেমন মাটি তেমনি গাছ। মাটি ভাল না হলে গাছ যেমন করে ভাল হয়, আর গাছ ভাল না হলে ফলই বা কি করে হয় ভাল? একই পেঁপে গাছে একজায়গায় মাটির গুণে ফল হয় আমের আকারে আর একজায়গায় মাটিতে ফলে তালের আকারে। মাটি গাছ আর ফলের মধ্যে যা হিসেব, চরিত্র জীবন ও কর্মের মধ্যেও ঠিক তাই। যেমন চরিত্র তেমনি জীবন আর যেমন জীবন তেমনি কর্ম। এই চরিত্রই সর্ব্বদা রক্ষণীয়। ব্যক্তিগত চরিত্রের দৈন্যে মানুষের অধোগতি হয়। আর মানুষের অধোগতি হলেই অধঃপতন হয় জাতির। ব্যক্তির চরিত্র সমষ্টিতে প্রকাশ পায়। চরিত্রহীনেরা জাতিকে করে তুলেছে পশু, আর অপচরিত্রেরা করে তুলেছে ক্রীতদাস। আমাদের নৈতিক আদর্শকে জাগিয়ে তুলে চারিত্রিক স্খলনকে বলিষ্ঠ করে তুলতে না পারলে কি হবে জাতীয় অখণ্ডতার স্বপ্ন দেখে, আর কিই বা হবে 'যেখানে বাঙালী সেখানে বাঙলার' মন্ত্র পাঠ করে? ভিত্তি না থাকলে তার ওপর উঠবে ইমারত? চরিত্রই মানুষের জীবনের প্রধান ভিত্তি। সুতরাং ফিরে পেতেই হবে সেই হারানো চরিত্রকে।

—উপেন্দ্রনাথ

খেলাধূলা

জ্যোতির্ময়

ক্রিকেটের এক অসামান্য প্রতিভা

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের মরশুম শুরু হয়েছে। টেস্ট-ক্রিকেটের দুই আদি প্রতিদ্বন্দ্বী ইংলণ্ড এবং অস্ট্রেলিয়া আসরে নেমেছে। ইংলণ্ড অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে গিয়ে তার সঙ্গে লড়ছে। সে বিবরণ পাঠকরা সংবাদপত্রে পাচ্ছেন। আমরা এই সূত্রে এই খেলার একজন স্মরণীয় ও বরণীয় শিল্পীর কথা মনে করছি। মনে করছি এই জন্যে যে শুধু খেলার মাঠেই নয়, মাঠের বাইরেও ক্রিকেটারের যে পরিচয় আছে সে পরিচয় তাঁর ব্যক্তিত্বে তাঁর চরিত্রে, তাঁর আচার আচরণে, কথায় বার্তায়, অভিমত জ্ঞাপনে উদ্ঘাটিত। সোবার্স থেকে ইংলণ্ডের গ্রাহাম গুচ ছিলেন যেমন এক অসাধারণ খেলোয়াড় তেমনি ছিলেন অসাধারণ ভদ্রলোক। ক্রিকেট জগতের শীর্ষস্থানে যখন তিনি তখনো তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটি নিরহংকার দীপ্তি, সুকোমল মাধুর্য পরিলক্ষিত হ'ত। তাই শত্রুমিত্র সকলকার প্রিয়ভাজন ছিলেন তিনি।

১৯০৩ সালে তাঁর জন্ম, ১৯৬৩ সালে মৃত্যু। বহুদিন ধরে ক্রিকেট খেলেছেন এবং এমন অনেক মহীয় রেখেছেন যার আজও তুলনা নেই। তাঁর সেই ক্রিকেট জীবনের কয়েকটি অসামান্য কীর্তির কথা ক্রিকেট রসিকদের মনে করিয়ে দিচ্ছি! ১৯২০ সালে গ্লসটার শায়ারের তরফে তাঁর ক্রিকেট জীবন শুরু। শেষ খেলা ১৯৫১ সালে সমারসেটের বিপক্ষে। ১০০২টি প্রথম শ্রেণীর ইনিংস খেলেছেন। ১৯২৫ সালে ইংলণ্ড দলের অধিনায়কত্ব করেন। তিনিই প্রথম পেশাদার ক্রিকেটার যাকে এই গৌরব দেওয়া হয়। তাঁর আগে দলের অধিনায়ক নির্বাচন করা হত অপেশাদারদের মধ্য থেকে। শুধু ব্যাটসম্যান হিসাবেই দক্ষ ছিলেন না। নিপুণ বোলার ও উঁচুদরের ফিল্ডার রূপেও তাঁর খ্যাতি ছিল সারা ক্রিকেট জগতে। স্লিপ-ফিলডিং-এ ছিলেন অদ্বিতীয়। এই স্লিপে দাঁড়িয়ে তিনি একটি খেলায় ১০টি ক্যাচ ধরেন এবং এক মরশুমে ধরেন ৭৮টি ক্যাচ—এটি বিশ্বরেকর্ড! টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন ৮০টি এবং রেকর্ড সংখ্যার রান করেছেন—মোট ৭২৩২। সেঞ্চুরি করেছেন ১২টি! দ্রুততম ট্রিপল সেঞ্চুরির রেকর্ডও করেছেন তিনি। একটি টেস্ট ইনিংস-এ ১০টি ওভার বাউণ্ডারি মারার যে রেকর্ড করেছেন তা আজো অটুট। তাঁর অধিনায়কত্বেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের সবচেয়ে বড় জয়—সেই সিরিজের একটি খেলায় ইংলণ্ডের ৭ উইকেটের বিনিময়ে ৯০৩ রান (রেকর্ড) হয় এবং ইংলণ্ড জেতে এক ইনিংস এবং ৫৭৯ রানে (রেকর্ড)। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় একটি ম্যাচের উভয় ইনিংসএ সেঞ্চুরি করেছেন ৭ বার (রেকর্ড)। মরশুমে হাজার

রান পূর্ণ করেছেন ২১ বার, দু'হাজার রান সংগ্রহ করেছেন ১০ বার, তিন হাজার রান করেছেন [তিন] বার। তবল সেঞ্চুরি করেছেন ৩৬ বার।

ক্রিকেটের এত বড় অলরাউণ্ডার আর কাউকেই দেখা যায় নি তাঁর সময় কালে। ইদানিংকালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের গ্যারি সোবার্স অবশ্য অলরাউণ্ডার হিসাবে বর্তমানের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়রূপে চিহ্নিত হয়েছেন।

কিন্তু প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে ব্যাটসম্যান রূপে ওয়ালি হ্যামণ্ড যে কীর্তি রেখে গেছেন তা আজো কেউ অতিক্রম করতে পারেনি—১০০২টি ইনিংসএ মোট রান ৫০৪৯০, তার মধ্যে ১৩৬টি সেঞ্চুরি।

সুন্দরকান্তি এই ক্রিকেটার তাঁর সময়কালে খেলোয়াড় হিসাবে এবং মানুষ হিসাবে সারা ক্রিকেট জগতের সবচেয়ে প্রিয়জনরূপে পরিগণিত হয়েছিলেন!

বিশ্ব ক্রিকেটে ওয়ালটার হ্যামণ্ড একটি সর্বজনশ্রদ্ধেয় নাম যার মহিমা কোনদিন ম্লান হবে না।

* * *

ইংলণ্ডের তবলু. জি. গ্রেস-কে বলা হয়—ক্রিকেটের জনক। ক্রিকেটের প্রবর্তন কালে তিনি ছিলেন এক বিরাট পুরুষ, যেমন দুর্ধর্ষ ব্যাটসম্যান, তেমনি শক্ত বিরতিত প্রখর ব্যক্তিত্ব। কিন্তু মাঝে মাঝে তিনি বড় বিচিত্র মেজাজের পরিচয় দিতেন। তার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। একবার এক কাউন্টি ম্যাচে তিনি ব্যাট করতে নেমে দুচারটে বল খেলার পরেই একটা বল পা দিয়ে ঠিকালেন আর সঙ্গে সঙ্গে বোলার হাঁকলেন—'হাউ ইজ দ্যাট।' এক মুহূর্ত দ্বিধা করে আম্পায়ার হাত তুঠালেন—অর্থাৎ এল. বি. ডবলু—আউট। কিন্তু গ্রেস ক্রিজ থেকে নড়লেন না, মাথা নেড়ে বললেন, 'আউট নয়। বল দাও।' বোলার তো অবাক। তিনি আম্পায়ারের দিকে তাকালেন। আম্পায়ার আর কি করবেন, বললেন, 'আউট নয়। বল দাও।' খেলা চলল। দর্শনীয় খেলা খেলে গ্রেস সেঞ্চুরি করলেন। তাঁর সেই চমকপ্রদ শত রান দেখে অগণিত দর্শক আনন্দে যেন ফেটে পড়ল। খেলার পর গ্রেস সেই আম্পায়ারকে ডেকে বললেন, 'দেখ, তোমার আম্পায়ারিং দেখার চেয়ে এত লোক আমার খেলা দেখার জন্যেই এসেছিল। তাদের নিরাশ করা কি উচিৎ হত। তুমি ক্ষোভ করো না। আউট হয়ত আমি ঠিকই হয়েছিলাম।' আম্পায়ারটির রসবোধ ছিল, বললেন, 'আজ্ঞে না। ক্ষোভ করছিনা। ক্ষোভ করতাম, যদি আপনি তারপর সেঞ্চুরি না করতে পারতেন।'

শীতে
দেহশ্রী
ও
দেহাবরণ

কাঁথা শিল্প

বেলা দে।

কুটীর শিল্পে বাঙালী মেয়েদের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। বাংলার মেয়ের সীবন শিল্পের কথা আজো নানা দেশ-বিদেশের মানুষ গর্ব ও আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করে থাকে। সূচীশিল্পের মধ্যে কারুকার্যময় কাঁথার জনপ্রিয়তা তাই আজো লুপ্ত হয় নি। এই কাঁথা এক সময় ধনী, দরিদ্র, গৃহী, সন্ন্যাসী সকলেরই ছিল আদরের বস্তু। বাংলার মেয়েরা আজো তার নিদর্শন রেখে চলেছেন। কাঁথা তৈরী হোত তুচ্ছ উপকরণে, কিন্তু শিল্পকলা লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভ করে ধন্য হয়েছেন বাংলার মেয়েরা। এই কৃতিত্বের পিছনে ছিল তাদের জীবনব্যাপী গভীর সাধনা, অটল ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়। এই শিল্পটী যে কতকাল ধরে চলে আসছে তা বলা শক্ত, সম্ভবতঃ হাজার বছরেরও পূর্বে কাঁথার প্রচলন ছিল।

বাংলার কাঁথা-শিল্পে নারীমনের যে গভীর রূপ-বোধ, চিরাচরিত সংস্কৃতির সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং কল্পনা বিলাসের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার তুলনা অন্য কোন সমাজের নারীদের মধ্যে আজও অজ্ঞাত। দৈনন্দিন জীবনের নানা প্রয়োজনে টুকরো ছোট কাপড়ের ব্যবহার সকল জাতির মানুষের মধ্যেই অল্পবিস্তর দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু কাঁথার উপকরণ পরিত্যক্ত পুরানো ছেঁড়া কাপড়; সেলাইয়ের জন্য যে সুতোর ব্যবহার করা হয় তাও সংগ্রহ করা হয় পুরানো কাপড়ের পাড় থেকে। সুইয়ের ফোঁড়ে নক্সা রচনার রেওয়াজ সর্বত্র বর্তমান থাকলেও পৃথিবীর অন্য কোন জাতের মধ্যেই পুরানো ছেঁড়া নেকড়া এই ধরণের নিতান্ত অবহেলার সামগ্রী কাঁথার মত উল্লেখযোগ্য শিল্পে ব্যবহৃত হতে দেখা যায় না। বাংলা দেশের কাঁথার সুতোর রঙ নির্বাচনেও বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। মোটামুটি কালো, লাল আর হলদে এই তিন রঙের সুতোর ব্যবহারই বেশী এছাড়া সবুজ খয়েরী ও সোনালী এই ধরণের আরো কয়েকটি রঙের সুতোরেও ব্যবহার হয়।

সেকালে এই কাঁথা শিল্পের খ্যাতি ছিল জগৎজোড়া। তখনকার দিনে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এই শিল্পটির সমাদর করতেন বলেই হয়তো এর দ্রুত উন্নতিও সম্ভবপর হয়েছিল। এক একখানি কাঁথা সর্বাঙ্গসুন্দর করতে গিয়ে কোন মহিলা হয়তো একা শেষ করে যেতে পারলেন না উত্তরাধিকারী সূত্রে কন্যা পুত্রবধূ বা পৌত্রীর উপর সে ভার পড়লো। সাদা জমির উপর চারধারে ঢাকাই শাড়ীর পাড়ের মতো হাতে তৈরী পাড়, চার কোণায় বড় বড় কলকা, মাঝখানে পদ্ম, ইত্যাদি দিয়ে সাধারণতঃ বড় বড় কাঁথা সেলাই হোত।—কতই না অভিনব কলকা প্রকৃতির কত না বিচিত্র লতাপাতা ধানের শীষ, কত না বর্ণের পাখী, পদ্মফুল ইত্যাদি—এ ছাড়া কাঁথায় রামায়ণ, মহাভারত, ভাসবতের চিত্র প্রভৃতি এমন সুন্দরভাবে ভিন্ন ভিন্ন রংয়ের সুতো দিয়ে সেলাই করতেন দেখলে মনে হোত যে তুলি দিয়ে আঁকা একখানি চিত্র। কিন্তু এ সবের জন্য কোন পয়সা খরচ হোত না। পুরনো শাড়ীর পাড়ের সুতোর সাহায্যেই তার সমাধান হোত। এর মাধ্যমে ছেলেমেয়েরা শিশুকাল থেকে কাপড় ভাঁজ করা, রঙ করে সুতো তোলা, সুতো পাকানো, সুতো জড়িয়ে রাখা এগুলোও অভ্যাস করতো। পাড়ের সুতো তোলাতে যে কতটা সূক্ষ্ম মনোযোগ, নিপুণতা ও অভিনিবেশের প্রয়োজন তা অনেকেই জানেন। একটি বড় কাঁথা তৈরী করবার আগে প্রথমে কাপড় ভাঁজ করে নেতে নিতে হয়। হাতে করেই এগুলো সমান করতে হয় কাজেই এজন্য চাই বেশ ধৈর্য্য। তারপর খুব ছোট ছোট করে একটানা সেলাই করতে হয় তবে রং মিলিয়ে। সেলাই এমন মজবুত হয় যে একখানি কাঁথা যদি যত্নভাবে পরিষ্কার ব্যবহার করা যায় তাহলে উনিশ কুড়ি বছর অনায়াসে টিকে যাবে। তা ছাড়া যাঁরা ব্যবহার করবেন, তারাই জানেন এ কাঁথা ব্যবহারে কত আরাম পাওয়া যায়।

শীতে ত্বকঃ হাত ও পা

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

সুন্দরী হতে কে না চায় বিশেষ করে মেয়েরা। কিন্তু চাইলেই তো হওয়া যায় না তার জন্য চাই সতিকারের সাধনা। বছরের ৩৬৫ দিনই এর জন্য যত্ন ও চেষ্টা করতে হয়। ঋতুভেদে চেষ্টার প্রকারভেদও হয়ে থাকে। শীতকাল সেই সৌন্দর্য সাধনার প্রকৃষ্ট সময়। শীত এল। অর্থাৎ আদরে নামল ঠাণ্ডা উত্তুরে হাওয়া। গায়ে গায়ে শিরশিরানি। উঃহু, কী শীত! হাত পা গুটিয়ে কোলের মধ্যে নিয়ে বসে থাকতে পারলেই যেন ভাল হয়। যদি যত্ন নেওয়া না হয় বা মনোযোগ দেওয়া না হয়, ত্বক শুকিয়ে ওঠে, খসখসে দেখায়, মোলায়েম ভাব অদৃশ্য হয়ে যায়। শুধু খসখসে দেখানোই না, দেহত্বক ক্রমে চর্মটা উঠে যায়, মাছের আঁশ ছাড়ানোর মতন টুকরো টুকরো ছাল ত্বক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেরিয়ে আসে। ফলে চেহারা রুক্ষ, বিবর্ণ ও বিশ্রী হয়।

এধরনের চেহারার আকর্ষণ যেমন পুরুষের কাছে কমে যায়, তার চাইতে কিন্তু কম অপ্রীতিকর হয় না এই শ্রীহীনতা মেয়েদের নিজেদের কাছেই। কোন মেয়ে নিজেকে বিশ্রী করে রাখতে ভালবাসে? নিশ্চয় করে বলা যায়—কেউই না, অথচ শীত এলে দেহের চামড়া রুক্ষ হবেই, যদিনা সে মেয়ের ত্বক অস্বাভাবিক রকমের তৈলাক্ত হয়। সেটা অবশ্য রোগ বিশেষ তার জন্য চিকিৎসকের বিশেষ পরামর্শ নেওয়া দরকার। এখনিতে শীতের ধর্মই হচ্ছে দেহত্বক চটিয়ে ফাটিয়ে দেওয়া। বিশেষ করে শরীরের যেসব অংশগুলো বেশী খোলা থাকে—যেমন হাত ও পা। হাতের মধ্যে বিশেষ করে হচ্ছে, আঙুল থেকে কব্জই আর পা বলতে পায়ের গোছ আর পাতা। আমাদের দেশের মেয়েদের (নেহাৎ বালিকা ছাড়া) শাড়ী পরার রীতিটাই চলিত, কাজেই কোমর থেকে পায়ের গোছ অবধি তো সব সময়েই ঢাকা।

কাজেই হাত আর পায়ের ঐ অংশটুকুই এখানে আমাদের আলোচনার বস্তু। কাজকর্ম আমাদের সকলেরই থাকে, আর এই দুটি অঙ্গ সেই কাজকর্মের জন্য সর্বদা অপরিহার্য। অর্থাৎ হাত আর পা সচল আর উন্মুক্ত না রেখে উপায় নেই। (বাড়িতে ঢাকা চটি, মোজা পরে থাকার রেওয়াজ আর কটা বাড়িতে?) তার মানে, শীতের হাওয়ার নাচন লাগছে সব সময়েই এই দুটি অংশে। তার ওপর আছে জলের ব্যবহার শীতের হাওয়ার সঙ্গে জল যেন সোনার সঙ্গে সোহাগা। মেয়েদের লাবণ্যের জোড়া শত্রু।

এই জোড়া শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে চাইবেন না এমন মেয়ে আছেন কি? কিন্তু কেবল চাইলেই তো হয় না প্রতিকারের ব্যবস্থাও করতে হয় নিজেকে। বাইরে থেকে কিছু নৈবেদ্য দিতে হয় আর দেবতাকে ভজেই তিনি তুষ্ট থাকেন। বরং নৈবেদ্যটা বেশি করে দেবার দরকার হয় উন্মুক্ত অঙ্গ (যেমন হাত পা) গুলির জন্যে।

হাত আর পা যার সুন্দর নয়, সে মেয়ে মেয়েই নয়। পুরুষের মত শক্ত আর কর্কশ পা আর হাত নজরে পড়লে কার তৃপ্তি হতে পারে,—মুখখানি তার যতই পেলব হোকনা কেন। বরং কোমল মুখমণ্ডলে

সঙ্গে রুক্ষ হাত পা একদমই বেমানান। তেমন 'কম্বিনেশান' দেখলে যে-কেউই বলবে, এ মেয়ের কেবল ওপর চেকনাই, এর সৌন্দর্যবোধ নেই মোটে। তাছাড়া শুধু সৌন্দর্যের কথা কেন, স্বাস্থ্যের অর্থাৎ ত্বকের স্বাস্থ্যের প্রশ্নও জড়িত আছে বৈকি এর সঙ্গে।

ত্বকের কতকগুলি অংশ আছে, স্তর আছে। আর ত্বক হল দেহের সবচেয়ে বাইরের অংশ—বাইরের নানা শত্রু, যেমন, চড়া রোদ, জল, নোংরা রোগজীবাণু, ইত্যাদি প্রথমেই এবং সহজেই আক্রমণ করতে পারে আমাদের ত্বককে। সেই ত্বক যদি রক্ষা করা না হয়, তবে তা আস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়বে না কেন? শুধু চর্মরোগ নয়, শুরুতর কোন অসুখ-বিসুখও ছাড়পত্র পেয়ে যেতে পারে এই পথে।

স্বাস্থ্যের কথা তুলে ভয় দেখাচ্ছি না কাউকে। কিন্তু কথাটা কি অযৌক্তিক?

যাই হোক, অসুখ পা এবং হাত থেকে সৌন্দর্যের ক্ষতি হয় এতে দ্বিমত নেই। প্রত্যেক নারীরই কর্তব্য হাত ও পায়ের স্বাস্থ্য সৌন্দর্যবর্দ্ধক কিছু কিছু প্রণালী জেনে থাকা ও সেইমত কাজকরা।

বিশেষত এই শীতের সময়ে। অতীতকালের নারী সমাজ শীতকালের সূত্রপাতেই মনোযোগ দিতেন তৈলমর্দন অর্থাৎ তেলমাখার দিকে। বলাবাহুল্য, এই কাজে ব্যবহার করা হত সর্ষের তেল। আর তখনকার তেলই ছিল খাঁটি। ধীরে ধীরে জলে জলে সারা দেহে তাঁরা তেল খাইয়ে দিতেন। এতে হাত ও পায়ের পাতা বাদ যেত না। সর্ষের তেলের বদলে নারকোল তেলেরও ব্যবহার ছিল। তাছাড়া দুধের সর আর মরদার (দুটো জিনিষ একসঙ্গে মিশিয়ে বা আলাদাভাবে) ব্যবহার। হাতের আঙুলের ডগাগুলি, হাতের পাতার উল্টোদিক, গোড়ালি, পায়ের পাতা, পায়ের আঙুলগুলি, এইসব জায়গা মসৃণ তেল তেলা থাকত তার ফলে। এটা এযুগেও সম্ভব। দুধের সরের অবশ্য অভাব আজকাল। তবে বাকি জিনিষগুলো তো আছে!

তা ছাড়া আজকাল অনেকরকম ক্রীম ও তেলজাতীয় পদার্থে হাত মাঝে মাঝে ভিজিয়ে নিলে আঙুলগুলি সুন্দর থাকে।

কাজ করতে করতে আঙুলের ডগা খরখরে হয়ে যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়। মেয়েদের পক্ষে শীতের জল আরো বেশী খরখরে করে দেয়। সেক্ষেত্রে দিনে-রাতে ২।৩ বার কোন অমসৃণ জায়গায় আঙুলের ডগাগুলি ঘসে নিলে চামড়ার খরখরানি ভাব দূর হবে। তারপর শুকনো কাপড়ে হাত মুছে নিয়ে তেলালো কিছু মাখিয়ে নিন।

করতলের সৌন্দর্য নির্ভর করে নখের ওপরেও। শীতের বাতাসে জলে নখও বিবর্ণ হয়, ফেটে চটে যায়। হাতের নখ ভালভাবে ছাঁট করে কাটা দরকার। নখের ডগাগুলো কোন কিছু অস্ত্রের (যেমন, 'নেলকাটার' এর সঙ্গে খুব ছোট মিহি উঁকো থাকে) সাহায্যে, অন্ততপক্ষে ব্লেড বা নরুণের দ্বারা, সমতল 'প্লেন" রাখা দরকার। তারপরে নেল-পালিশ ব্যবহার করা যেতে পারে পরিমিত মাত্রায়। যদি রুচিতে না বাধে, তবে আলতা বা মেহেদী ব্যবহার করতেও আপত্তি নেই।

এ ছাড়া দেহের অন্যান্য অংশে যেমন সর্ষের ঘোল, ব্যাসন, হলুদ (তেলের সঙ্গে) প্রয়োগ করা হয়, হাতের পাতা ও আঙুলের বেলায়ও তা করতে কোন বাধা নেই।

শীতে অল্পবিস্তর গোড়ালি ফাটে অনেকেরই। যাদের মোটে ফাটে না তারা সৌভাগ্যবতী। অতীতকালের নারীরা পায়ের ফাটা কমাতে পা নরম করতে পায়ে বামা ঘষতেন। সেই সঙ্গে অবশ্য তৈলাক্ত

জিনিসও ব্যবহার করতেন। এতে খুব উপকার হতো। একালেও সেটা সম্ভব। বেশি পা ফাটায় 'ভেজলীন' জাতীয় জিনিস বেশি করে লাগানো ভাল। জল পায়ের চামড়া বেশি করে কাটিয়ে দেয়—একটু নজর রাখা দরকার যাতে যতটা সম্ভব কম জল পায়ে লাগে। গ্লিসারিণও পায়ের মোটা চামড়া নরম রাখতে সাহায্য করে, গ্লিসারিণের সঙ্গে সামান্য একটু জল মিশিয়ে নিতে হয়।

গোড়ালি এবং আঙুলের মাথা বাদে পায়ের বাকি পাতারও যত্ন নেওয়া দরকার। এখানেও সেই-তেল ক্রীম ও ভেজলীনের বিধান। দায়া দিনের মধ্যে অন্তত একবার সাবান ধুঁধুলের ছাল দিয়ে রগড়ে রগড়ে পায়ের পাতার ময়লা ও ছোপ তুলে ফেলা দরকার। পায়ের নখগুলিও সমান ছাদে কাটা দরকার। নখও তেলালো জিনিস চায়, তাতে খরখরে ভাব কম থাকে। ভালো আলতা পরলে পা দুখানি বেশ টুকটুকেও থাকবে পায়ের চামড়াও সুস্থ থাকবে। পায়ের নখে আলতা দেন কেউ কেউ। অনেকের আবার নেল-পালিশ পছন্দ।

গোড় থেকে আরম্ভ করে পায়ের সমস্ত পাতাটা নিয়মিত ভাবে মালিশ করা উচিত। সেই একই কথা হাতের বেলাতেও। এতে রক্তসঞ্চালন অব্যাহত থাকে ও পদদ্বয়ের স্বাস্থ্যেরও উপকার হয়। সাবান (বেশি ব্যবহার না করলে) ময়লা তুলে হাতের ও পায়ের শ্রী বাড়ায়—অন্তত স্বাভাবিক শ্রীটিকে প্রকাশিত করে। তেল ক্রীম বাড়ায় উজ্জ্বলতা। আর ঘামা ধুঁধুলের ছাল, বাথ্ সল্ট আলতা ইত্যাদি বাড়তি সৌন্দর্যের সহায়ক। সব মিলে নারীর হাত ও পা তকতকে টুসটুসে করে তোলে।

কারো হাতের ও পায়ের পাতাকে কোথাও পল্লব কোথাও কলিকার সঙ্গে প্রায়ই তুলনা করা হয়ে থাকে। সুন্দর সুস্থ পা ও হাত যার নারীদেহের সম্পদ। হাত যার বিশ্রী কিংবা পা যার অসুন্দর, সেই নারী নিজেও সুন্দরী বলে স্বীকৃত হবেন না। অতএব এই দুটি প্রত্যঙ্গ সতেজ, নীরোগ, মোলায়েম ও মনোহর রাখা সব মেয়েরই কর্তব্য—বিশেষত এই শীতের দিনগুলিতে।

কাঁথা শিল্প

শিবানী ঘোষাল

ভারতবর্ষ একদিন কুটির শিল্পে সারা বিশ্বে একটি স্থান অধিকার করেছিল। সেসব কথা কেনা জানে। ঢাকার ঢাকাই মসলিন, মুর্শিদাবাদের রেশম বস্ত্র, খাগরাই কাঁসার বাসন, কাশ্মীরী কাঠের কাজ, শালের কথা সবাই জানে। যুগের পরিবর্তন সঙ্গে অনেক কিছুই যেমন বিলুপ্ত হয়ে গেছে তেমনি ভারতবর্ষের কুটির শিল্প অনেকটাই বিলুপ্তপ্রায়। আমরা তেমনিই একটি বিলুপ্তপ্রায় কুটির শিল্পের কথা বলব। বাংলা দেশের ছেলেরা পাট শিল্প, মৃত্তিক শিল্প ও আরও ছোট ছোট কুটির শিল্পের মাধ্যমে শিল্পবোধের পরিচয় দিয়ে গেছেন। কিন্তু সে যুগের মেয়েদের মধ্যেও যে শিল্প ও রুচি বোধের পরিচয় পাই তারই মধ্যে একটি 'কাঁথা শিল্প'। সেই যুগের মেয়েরা অবসর সময়টুকুও যে কি ভাবে কাজে লাগাতেন আজও তার নিদর্শন আছে পুরানো কাঁথার মধ্যে। ছোট ছোট টানা সেলাই দিয়ে নানা রংয়ের পাড়ের সুতো তুলে আল্পনার অনুকরণে নকসা করে যে সমস্ত পাতা বা গায়ে দিবার চাদরের আকারে তৈয়ারী করিতেন তাকেই বলা হয় কাঁথা। এই কাঁথা সদ্যজাত শিশুর জন্য সুন্দর ব্যবহার উপযোগী। টানা সেলাই এর মাধ্যমে যেমন পুরানো কাপড় মজবুত হয় তেমনি আবার শরীরের মত নরমও হয়, যেটা শিশুদের পক্ষে আরামদায়কও বটে। এমনিই একটি কুটির শিল্পের পুনরুদ্ধারের দায়িত্ব আমরা নিয়েছি। এই দায়িত্ব পালনে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদ। তাঁরা এককালীন দশহাজার টাকা দিয়েছেন এই শিল্পের পুনরুদ্ধারের জন্যে। এই কাঁথাশিল্পকে ঠিক ভাবে বাঁচিয়ে তুলতে যথেষ্ট সময় লেগেছে। পুরানো কাঁথার নমুনা নিয়ে আমরা বর্ত্তমান যুগের ব্যবহার উপযোগী জিনিষ তৈরী করছি। এর ফলে গ্রামের মেয়েরাও ঘরে বসে কিছু উপায় করতে সক্ষম হচ্ছে এবং এই শিল্পের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের মেয়েদের বিশেষ করে গ্রামের মেয়েদের যে কতখানি শিল্পবোধ ছিল তারও পরিচয় দেওয়া হয়েছে। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে মেয়েরা দৈনন্দিন কাজ ছাড়া যেটুকুই কাজ বেশী করেন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তার বিনিময়ে তাঁরা কিছু উপার্জন করতে চান। আমরা দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে এই কাজ শুরু করেছি। প্রথমটি এই কাঁথাশিল্পের পুনরুদ্ধার, দ্বিতীয়টি আংশিকভাবে মেয়েদের উপার্জনে সাহায্য করা। এতে প্রথমটিতে আমরা সফলতা লাভ করেছি আমাদের কাঁথা কার্ড দেশে ও বিদেশে যথেষ্ট সমাদর পেয়েছে, আধুনিক সমাজেও এর চাহিদা ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে; আগে যেটা সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল সেটা আজ আবার ধীরে ধীরে সবাইয়ের মাঝে পরিচিত হয়ে উঠেছে। বর্ত্তমান মেয়েরা এগুলি ব্যবহার করে যেমন আনন্দও পাচ্ছেন তেমনি প্রিয় গর্ববোধও করছেন এই ভেবে যে এটি মেয়েদের সৃষ্ট শিল্প।

এই শিল্পের প্রচার যথেষ্ট নেই। এটি যদি জনসাধারণের মধ্যে আমরা ব্যাপক ভাবে প্রচার করতে পারি তাহলে আমাদের দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটিও সফল হবে। চাহিদা বাড়ানোর সংগে সংগে গ্রামের মেয়েরাও ঘরে বসে উপার্জন বাড়াতে পারবেন।

শীতের চাদর ঃ বালাপোশ

হেমপ্রভা মল্লিক

বর্ষা গেল এলো শরৎ। মিষ্টি শীতের আমেজ দেহমনকে পরিতৃপ্তিতে যেন ভরিয়ে দিল। মাঠের আগমনী সুর স্থলে, জলে, আকাশে, বাতাসে ধীরে ধীরে ফুটে উঠল শরৎরাণী। যেতে না যেতেই দেখা দিলেন শীতরাণী। এই সময়ে অনেকেই বিশেষ কোরে মা, ঠাকুমারা গায়ে দেবার জন্য একটু হালকা ধরণের চাদর তৈরী করার দিকে একটু ঝোঁক দেন। কাঁথা তো তৈরী করেনই, উপরন্তু আরো কিছু তৈরী করা যায় কি-না সেটাও চিন্তা করেন।

মনে হয় একটু চেষ্টা কোরতে পারলে এবং একটু সুযোগ সুবিধা কোরতে পারলে মায়েরা ও বোনেরা বেশ ভাল ও সুন্দর কোরে বালাপোশ তৈরী কোরতে পারেন। বালাপোশের চল কিন্তু বহুযুগ আগে থেকেই। বালাপোশ শব্দটি কিন্তু ফার্সী শব্দ থেকে উৎপত্তি। সাধারণতঃ ফার্সীভাষার প্রচলন জানা যায় ভারতের উত্তর অংশেই বেশী। এথেকে মনে হয় দীর্ঘদিন ধরে উত্তর ভারতের একটি বহু-ব্যবহৃত সামগ্রী। শীতবস্ত্র সাধারণতঃ পশমেই তৈরী হয়। পশমের পোষাক বা পশমের গাত্রাবরণ প্রস্তুত করা যেমন শ্রমসাধ্য এবং ব্যয়বহুল তেমনি অপ্রতুল. এক্ষেত্রে বিকল্পরূপে তুলো পাতলা কোরে নিয়ে তুলোর দুপাশে কাপড়ের পুরু পলেস্তরা লাগিয়ে বেশ ভাল রকমের শীতের গাত্রাবরণ প্রস্তুত করা চলে। অত্যাধিক শীতে তুলোর তৈরী গায়ের চাদর শীত নিবারক এবং আরামদায়ক এই বালাপোশ শীতের সময় জামা কাপড় পরে তার উপর চাদরের মত ব্যবহার কোরতে অনেক বৃদ্ধবৃদ্ধাদের দেখা যায়। শাল বা উলের গরম গায়ের চাদর কোরতে খরচ খুবই। সাধারণ মধ্যবিত্তেরা কিন্তু বালাপোষ গায়ে দিয়ে কম বা বেশী শীতের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য বেশ সুন্দর রঙিন অথবা ফুলদার কাপড় দিয়ে বালাপোশ তৈরী কোরতেন। বালাপোশ যেমন সাধারণ লোক শীতের সময় ব্যবহার কোরতেন তেমনি বাংলা দেশের বহু অভিজাত পুরুষকেও এক সময়ে গাঢ়রংএর কাপড়মোড়া বালাপোশ গায়ে দিতে দেখা গিয়াছে। ঐসব বালাপোশের দুদিকে দুরংএর কাপড় দেওয়া থাকতো এবং চারপাশের পাড়ও ভিন্ন ভিন্ন রংএর হ'ত। একই বালাপোশকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গায়ে দিলে দুরকমের গাত্রাবরণ ব্যবহারের কাজে লাগতো। আবার অল্প শীতের সময় যখন লেপ গায়ে দেওয়া চলে না তখন শোবার সময় বালাপোশ গায়ে চাপা দিয়ে বেশ আরাম পাওয়া যায়।

এই বালাপোশ সাধারণতঃ একরঙা কাপড় দিয়েই করা হয়। কিন্তু এই কাপড়ের উপর হাতের কাজ করে যদি করা হয় তাহলে শিল্প বস্তুটি অন্যরূপে আর একটি বিশেষ সমাদর পেতে পারে। এবং আধুনিক রুচির মানুষও বেশ সমাদরের সঙ্গে একে গ্রহণ কোরতে পারবে বোলেই মনে হয়। বিশেষ কোরে শীতের সময় বাচ্চা-ছেলেমেয়েদের ছোট ছোট বালাপোশ দিয়ে জড়িয়ে নেওয়া যায় তাহলে শীত ও ঠাণ্ডা থেকে তারা দূরে থাকতে পারে। বড়কোরে তৈরী করলে অল্পশীতে এবং গুপুরের দিকে গায়ে দিয়ে শোওয়া চলে। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারাও শাল আলোয়ানের বিকল্পরূপে গায়ে দিয়ে আরাম পেতে পারেন। ছোট বাচ্চাদের যে মাপের কাঁথা করা হয় গায়ে দেবার জন্য সেই মাপের একটি ফুলদার কাপড় এবং ঘোররংএর একরঙা কাপড় অর্থাৎ সবুজ নক্সাযুক্ত একটি ছিটের কাপড়, আর সবুজ একরংএর একটি কাপড়, তার চারপাশে ঘুরিয়ে দেবার মত ঐ দুটি কাপড় বাড়তি কোরে একটু রাখা। সবুজ রংএর মজবুত সুতো, (নাকামারি সরু মোটা) ৪০০ গ্রাম আন্দাজ তুলো, বড় লম্বা দুটি সুচ, যে সুচে কাঁথা সেলাই হয়। তুলো ঘরে যে তুলো দিয়ে তোষক তৈরী হয়। তুলো ভাল কোরে বেছে, এক একপরতা তুলো আলাদা রাখতে হবে। এইবার যে মাপের কাপড়টি দিয়ে বালাপোশ তৈরী হবে

সেই কাপড়টিকে অর্থাৎ ফুলদার কাপড়টিকে মেঝেতে পরিষ্কারকোরে সোজাভাবে পেতে দেখতে হবে কাপড়টি যেন মুচকে না থাকে, তার উপর পাতলা তুলোর একটা পরতা দিয়ে সমস্ত কাপড়টিকে ঢেকে ফেলতে হবে। তুলোটা যাতে সমানভাবে চারিদিকে পড়ে সেইদিকে একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখা। এক পরতা তুলো দিলে একটু পাতলা হবে সেইজন্য দুই তিন পরতা তুলো দিয়ে কাপড়টিকে ঢেকে ফেলতে হবে। ধারের দিকে সেলাইএর জন্য একটু ছেড়ে তুলো দেওয়া দরকার। এইবার তুলো দেওয়া হয়ে গেলে সাদা সুতো দিয়ে বড় বড় কোরে ঐ তুলোকে কাপড়ের সঙ্গে টাঁক সেলাই দিয়ে সেঁটে দিন। পরে ঐ টাঁক সেলাইগুলি খুলে ফেলতে হবে যখন শেষ হয়ে যাবে। টাঁক সেলাই দেওয়ার প্রয়োজন হল তুলো ঐ ফুলদার কাপড় থেকে উঠে আসবে না। এরপর একরংএর সবুজ কাপড়টি নিয়ে ফুলদার তুলো দেওয়া কাপড়টির উপর রেখে উল্টোদিকে সমস্ত পাশটিতে ছোট ছোট বখেয়া দিয়ে সবুজ সুতো দিয়ে সেলাই কোরে দিন। কেবল চারদিকের মধ্যে এক দিকটা বাদ রেখে সেলাই দিন। কারণ উল্টে দিতে হবে তো? এইবার আস্তে আস্তে তুলোশুদ্ধ ছিট কাপড়টিকে উল্টে দিন। তুলো যাতে এদিক ওদিক হয়ে না যায়। আস্তে আস্তে কোণগুলিকে ঠিক কোরে দিন। তারপর সমস্ত তুলো দেওয়া কাপড়টির উপর ছোট ছোট রান সেলাই দিয়ে চৌকো বরফি কোরে তুলোকে বসিয়ে দিতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দুইতন বরফি আকারে সমস্ত বালাপোশটি সেলাই হয়ে থাকে। মেসিনের সেলাই দিয়েও বালাপোশ করা যেতে পারে। সমস্ত বালাপোশটির উপর এবং পাশের সেলাই মেসিন দিয়েও করা যায়। বালাপোশের সমস্ত উপরের দিক সেলাই হয়ে গেলে এইবার চারদিকে এক ইঞ্চি চওড়া মাপের সবুজ কাপড়ের দুটো নিয়ে লম্বাপটি তৈরী কোরে যতখানি দরকার ততখানি লম্বাভাবে তৈরীকোরে সবুজ রং এর সুতো দিয়ে খুব ছোট ছোট হেম-সেলাই দিয়ে জুড়ে দিন। ঐপটি আবার একদিকে ফুলদার এবং আর একদিকে এক রং এর কাপড় দিয়েও তৈরী কোরে লাগানো যায়। কেবলমাত্র ফুলদার অথবা এক রং এর সবুজ কাপড় দুফেরতা নিয়ে ফিতের মত লম্বা তৈরী কোরে বসালেও ভাল হয়। মোট কথা এগুলি একটু হেরফের কোরে নিজের মনমত কোরে তৈরী কোরতে হয়। কারুর কাছে থাকলে বালাপোশ দেখে নিলে ভাল হয়।

এই বালাপোশ আবার নক্সাদিয়ে আধুনিক রুচি সম্মতভাবে করা যায়। এবং দুদিকে দুরকমের সেলাই এর নক্সা দিয়ে দুরোকা এমব্রয়ডারী দিয়ে ভরিয়ে তোলা যায়। যে কোন রং এর এক রঙ কাপড় নিয়ে যেমন একপিঠে কিংকাপী সোনালী অন্য পিঠে ঘোর সোনালি দিয়ে ছোট একটি বালাপোশ তৈরী করা হল। তারপর তার উপর রান দিয়ে দুইতন বরফি সেলাই দিয়ে দিন। ঐ দুইতন বরফির ভিতরে ভিতরে ছোট ছোট ফুল রং মিলিয়ে একপরতা কাপড়ের উপর এমব্রয়ডারী অথবা অন্যকোন ষ্টিচ্ দিয়ে নক্সা করা হোক। আবার আর একপিঠে অন্যধরনের নক্সার এমব্রয়ডারী করা হোক। দুপিঠে আলাদা আলাদা কাপড় এবং দুরকমের নক্সার সুতোর কাজ থাকলে বালাপোশটি দেখতে ভারী সুন্দর হবে। পাশে দুআঙুল চওড়া দুরকম অথবা একরকম কাপড়ের দুপরতা কাপড়ে ফিতের মত তৈরী কোরে বসিয়ে দিলে ভালই হবে জিনিসটি।

কম শীতে বালাপোশ ছোটদের বেশ আরাম দেবে। উপরন্তু কোরতে পারলে খুবই সৌখিন এবং একটি প্রাচীন শিল্পের প্রসার হবে। বড়দেরও তৈরী কোরে ব্যবহারের পক্ষে বেশ উপযোগী তবে বড়দের জন্য কোরতে হলে কাপড়ের রং নক্সা ইত্যাদির হেরফের করা দরকার।

বালাপোশ তৈরীর কাপড় হবে বেশ মজবুত ও নরম। সুতোর রং হবে পাকা। এবং সুতো হবে বেশী মোটাও নয় বেশী সরুও নয়। মাঝামাঝি ধরণের সুতো হবে ছোটদের উপযোগী হবে নক্সা। নক্সা কোরতে হলে বাজারে নক্সা করার জন্য যে সুতো পাওয়া যায় সেই সুতো অথবা পাড়ের সুতো দিয়েও ভাল হবে। ফুল, পাতা, লতা ছাড়া ছোট বিড়াল, কুকুর, পাখী, মাছ, পুতুল, হাতী ঘোড়া ইত্যাদির নক্সা উহার উপর কোরলে বালাপোশ দেখতে হবে যেমন নতুনত্বে ভরপুর তেমনি হবে আধুনিক রুচিসম্মত।

ত্বক শুধু দেহের আবরণ নয়

পুতুল রায়

হেমন্তের সুরুতেই বায়ু সদাই উতলা, আর সেই সঙ্গে দিন হৃহেলীবিলীন, ছায়াবিহীন। তারপর শীতের সুরুতেই পাতাগুলি শিরশিরিয়ে ঝরিয়ে দিল তালে তালে। উত্তরের বাতাসে শুষ্কতার টান, আর তারই স্পর্শে প্রকৃতি রাজ্যে যেমন শিরশিরানির ভাব মানুষের দেহ-মনেও ঠিক তারই আভাস।

শরীরটা শুকনো চড়চড় করে-ত্বকের মসৃণতা কমে যায়। গা, হাত, পা, মুখ ফাটে। এই সময় তাই শুষ্ক ত্বকের পরিচর্যা বিশেষ দরকার। বিশেষ করে মেয়েদের পক্ষে। কেননা ত্বকেই মেয়েদের দেহের সৌন্দর্যের পটভূমিকা।

ত্বক সাধারণত তিন প্রকারের। শুষ্ক ত্বক, সাধারণ ত্বক ও তৈলাক্ত ত্বক। আর দুই তিনরকমের ত্বকের পরিচর্যার পদ্ধতিও ভিন্ন ধরণের। শীতের হাওয়ায় তিন রকমের ত্বকেই টান ধরে। শুষ্ক ত্বকই সবচেয়ে কষ্টদায়ক। ত্বককে পরিচ্ছন্ন রাখতে সাধারণত আমরা সাবান ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু শুষ্ক ত্বকে সাবান ব্যবহার যতটা কম করা যায় ততই ভালো। শুষ্ক ত্বক পরিচর্যার স্নানের আগে অলিভ অয়েল মাখা সবচেয়ে ভালো। তা ভিন্ন বিশুদ্ধ পরিষার তেল। আর সাবানের পরিবর্তে যেমন ব্যবহার শুষ্ক ত্বকের পক্ষে খুবই উপকারী।

এখনকার দিনে আমরা ত্বকের জন্যে নানারকমের কসমেটিক্সের ব্যবহার করি। সেগুলি দামে ভারি তবুও রূপচর্চায় আজকের মেয়েদের কাছে তা অপরিহার্য। ত্বককে সুন্দর, সুস্থ, মসৃণ ও উজ্জ্বল রাখতে মেয়েরা চিরকালই আগ্রহী। রূপচর্চায় আজ আমরা অগ্রণী হলেও সেকালের মেয়েদেরও সে বিষয়ে চেষ্টা এবং আগ্রহ বড় কম ছিল না। সেকালের মেয়েরা আধুনিক ক্রীম, সাবান পাউডার এ সবের ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন না। এ সব প্রসাধনের রীতি নীতি এবং কায়দা-কানুনও তাঁরা জানতেন না, কিন্তু তাঁরা ত্বক পরিচর্যা এবং প্রসাধনে গৃহস্থালী যে সব দ্রব্য ব্যবহার করতেন সে সব জিনিসের প্রসাধন স্বভাব-স্নিগ্ধতায় যে অনেকবেশি উজ্জ্বল তা তর্কাতীত।

মুখে ক্রীম ব্যবহারের পরিবর্তে তখনকার দিনের মেয়েরা দুধের সর মাখতেন। সরবাটা এবং তার সঙ্গে একটু ময়দা মিশিয়ে স্নানের আগে মুখে, গলায়, হাতে বেশ করে লাগিয়ে নিয়ে সেটা শুকিয়ে গেলে তাঁরা আস্তে আস্তে তা ঘষে ফেলে দিতেন। এতে শরীরের ময়লা খুব তাড়াতাড়ি উঠে আসে। এ-রীতি এখনো আমরা অনুসরণ করতে পারি। আর এই সরবাটার সঙ্গে যদি একটু কাঁচা হলুদবাটা ব্যবহার করা যায় তবে ত্বক উজ্জ্বল এবং পরিচ্ছন্ন হয়। দুধের মধ্যে যেমন বেসন গুলে তার প্রলেপ দিলে হাত, পা, মুখ মসৃণ হয়। মসুর ডালবাটা ত্বকের পক্ষে খুবই উপকারী মুখকেও খুব মসৃণ এবং উজ্জ্বল রাখে।

আধুনিক মেয়েরা ক্লিনসিং মিল্ক দিয়ে মুখ পরিষ্কার করেন। আগেকার দিনের মেয়েরা এর পরিবর্তে একটু দুধ নিয়ে তুলোয় ভিজিয়ে ভিজিয়ে মুখ পরিষ্কার করতেন। তিন প্রকারের ত্বক : পরিচর্যায় যে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত, এবারে সে প্রসঙ্গে দুটার কথা বলি।

তৈলাক্ত ত্বকের পক্ষে উষ্ণজলে মুখ ধুলে খুব উপকার পাওয়া যায়। দিনে কয়েকবার উষ্ণজলে মুখ ধুয়ে নরম তোয়ালে দিয়ে আস্তে আস্তে মুখ মুছে ফেলা উচিত। উষ্ণজলে মুখ ধোয়ার পর চন্দনের প্রলেপ ব্যবহার খুবই ফলপ্রসূ। চন্দনের প্রলেপ দিয়ে তা শুকিয়ে নিতে হবে; তারপর সেগুলি ঝেড়ে ফেলে দিলে মুখের কমনীয়তা বাড়বে। তৈলাক্তকে সপ্তাহে দু'তিন দিন লেবুর রসের প্রলেপ লাগানোও ভাল।

সাধারণ ত্বকের পরিচর্যায় বিশেষ কোন সমস্যা নেই। তবু তাকে বজায় রাখতে যত্ন নেওয়া দরকার।

সাধারণ ত্বকের বেলায় প্রত্যহ সাবান দিয়ে মুখ ধোওয়া এবং পরিষ্কার করা উচিত। আর প্রতিদিন অন্তত একবার উষ্ণজল ব্যবহার করা প্রয়োজন। সাধারণ ত্বকে ক্রীম ব্যবহার করা ক্ষতিকর নয়। তবে মুখে যখনই ক্রীম ব্যবহার করা হবে তখন হাতের সঞ্চালন নিচের দিকে ওপরের দিকে যেন হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। পেশীর সঞ্চালনই এর মূল উদ্দেশ্য।

ত্বক নিছক দেহের অস্থিমজ্জার উপরকার একটি আবরণমাত্র নয়। শরীরের উপরিভাগের এই আবরণের পরিচর্যায় তাই বিশেষ যত্ন নেওয়া উচিত। আর পরিচর্যায় এবং রূপ প্রসাধনে সর্বাঙ্গে স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখতে হবে। তখনকার দিনের মেয়েদের বাইরের জীবন ছিল না; কিন্তু শারীরিক পরিশ্রম ছিল আর ছিল অন্দর মহলেও রোদ-বাতাসের প্রাচুর্য, অবস্থানের উপযোগী প্রশস্ত ঘর-দালান, অঙ্গন। তাই অঙ্গনবাসিনীদের দেহ মনে প্রকৃতির পর্যাপ্ত স্পর্শ থাকত। সবচেয়ে বড় কথা, তখনকার দিনের মেয়েরা গৃহজাত স্বাস্থ্যকর পুষ্টিকর আহার পেতেন প্রয়োজন-মাফিক। স্নান করতেন নদীতে, বড় পুষ্করিণীতে, দীঘিতে—সেখানকার জলে অবরুদ্ধতা নেই,—রোদ—বাতাসের পর্যাপ্ততা আছে, সেই অবগাহন স্নানের যে স্বাস্থ্য সে স্বাস্থ্য আজকের মেয়েরা বাথরুমের বদ্ধ জলে কী ভাবে পেতে পারেন? অথচ শরীরের পক্ষে ঠাণ্ডা এবং গরম জলের দুইয়েরই প্রয়োজন। প্রাকৃতিক রূপচর্যা, আজকের দিনের মেয়েদের পক্ষে পুরোপুরি সম্ভবপর নয়; কিন্তু তবুও যতটা পারা যায় সেদিকে মন আমরা দিই না। তাই অল্প বয়সেই দেহের কান্তি হারিয়ে আমরা প্রাকৃতিক রূপের পরিবর্তে কসমেটিক রূপকে মেলে ধরার প্রয়াসী হয়েছি। আর যখন অপরের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে নিজের দৃষ্টি দিয়ে নিজের রূপ প্রত্যক্ষ করি—তখনই অবসাদ আর যৌবনহীনতার গ্লানিতে নিজেই অন্তর্বেদনায় গুমরে মরি।

হেমন্তশেষে পৌষের বাতাসে প্রকৃতি রাজ্যে যে রিক্ততা, শুষ্কতা—মানুষের দেহ-মনেও তার স্পর্শ আসে। এই শুষ্কতাকে অবরোধ করার জন্যেই আমাদের সুস্বাস্থ্যের প্রয়োজন আর সেই স্বাস্থ্যই হচ্ছে সৌন্দর্য—তাই 'Health is beauty'

রূপ-প্রসাধনের গোড়ার কথাই হচ্ছে স্বাস্থ্য সম্পদ। রাত্রে সুনিদ্রা, পরিশ্রমের ক্লান্তি অপনোদনের জন্যে বিশ্রাম এবং শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মনের প্রসন্নতার জন্যে প্রসাধন মেয়েদের পক্ষে নিতান্তই প্রয়োজন। তার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে সৌন্দর্য। সৌন্দর্যকে স্বভাব সুন্দর ভাবে গড়ে তোলার মধ্যে কৃত্রিমতা থাকাও দরকার।

একই সাধনা মেয়েরা বৈদিক যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত করে আসছেন। বিভিন্ন সময়ের প্রয়োজন অনুসারে রূপ পরিচর্যায় বিভিন্ন রীতি-নীতি পরিলক্ষিত হলেও মূলে কিন্তু একই কথা—'Beauty is Joy for ever!' নারীর সৌন্দর্য রক্ষায় ত্বক পরিচর্যা শুধু দেহকে ঘিরেই নয়—তার সঙ্গে মনেরও সংযোগ।

বৃদ্ধ বয়সেও
স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তি অটুট থাকে

সাধনা
চ্যবনপ্রাশ

বহুমূল্য আয়ুর্ব্বেদীয় রসায়ন

সকল বয়সেই সমান উপকারী

বৃদ্ধ বয়সে সাধারণতঃ মানুষ জরাগ্রস্ত হয়ে দুর্ব্বল ও অক্ষম হয়ে পড়ে। সাধনা চ্যবনপ্রাশ নিয়মিত ব্যবহারে জরার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

সাধনা চ্যবনপ্রাশ শক্তিবর্দ্ধক একটি বহুমূল্য রসায়ন। ইহা ব্যবহারে বৃদ্ধ বয়সেও স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তি অটুট থাকে।

প্রচুর ভিটামিন ও
ক্যালসিয়াম ইহাতে আছে

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

কলিকাতায়

অধ্যক্ষ ডাঃ নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এম.ডি,
আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রী, এফ.সি.এস. (লন্ডন)
এফ.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর
কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র : ডাঃ নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, এম.ডি.(বি.এ.এস.(কলি)
আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য

গল্প-ভারতী

GALPA-BHARATI

পৌষ ১৩৭৭, JANUARY, 1971

ষড়বিংশতি-বর্ষ

সম্পাদক : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

সহঃ সম্পাদক : কল্যাণ রায়

মূল্য : এক টাকা

বার্ষিক : পনের টাকা

শ্রীদোল বিহারী দত্ত কর্তৃক ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও কল্পনা প্রেস প্রাঃ লিঃ
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

সব মানুষের জন্য
আর
সব কলমের
জন্য

সুলেখা

সুলেখা

সুলেখা
এক্‌জিকিউটিভ

আপনার পছন্দমত
যে-কোনটি
ব্যবহার করুন

সুলেখা
ওয়ার্কস

এই সংখ্যায়

উদাত্ত আহ্বান ৬০৫
কার্টুন ৬০৬
খণ্ড খণ্ড চিত্র ৬০৭
ভারত চিন্তার বৈদেশিক প্রচারে
স্বামী অভেদানন্দের অবিস্মরণীয় অবদান ৬১১

বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী
সন্দেশ বিক্রেতা
সিমলার বিখ্যাত
বিনোদ বিহারী নাগ
গণেশ চন্দ্র দত্ত

শাখা :
৫/৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন : ২৩-১৮৯৯
১৮, মতীন্দ্রমোহন এভিনিউ,
কলিকাতা-৬

হেড অফিস : ৫৬ ২, রামদুলাল সরকার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-
ফোন : ৫৫-১৪৫০

এই সংখ্যায়

৭ই পৌষের মেলা	—ডঃ কালিদাস নাগ	৬১
বন্যা কন্যা (উপন্যাস)	—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৬১
ফিরে ফিরে চাই	- প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	৬২
জীবন নাট্যের খণ্ডচিত্র :		
ভূদেব মুখোপাধ্যায়	—অনাথ উপাধ্যায়	৬৩

তন্বী, তব
তরুণ তনু ঘিরে
বসন্তের সুরভি যত
উচ্ছ্বসিয়া ফিরে !

প্রিয়া সুরভি মেখে যেখানেই যাবেন সেখানেই আপনার জয়-জয়কার। আপনার সান্নিধ্য মধুর হয়ে সবার কাছে।

প্রিয়া পারফিউম

কসমেটিক ডিভিসন
বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা বোম্বাই কানপুর দিল্লী মাদ্রাজ

এই সংখ্যায়

আবার সেই জেল	—বিভেন গঙ্গোপাধ্যায়	৬৫০
একটি জ্যোৎস্না রাতে	—সুকুমার রায়	৬৬৮
নাটমঞ্চ	—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৬৫৩
আমার দেখা সাঁওতাল	—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	৬৬১
অভিসার	—শক্তিপদ রাজগুরু	৬৭৮

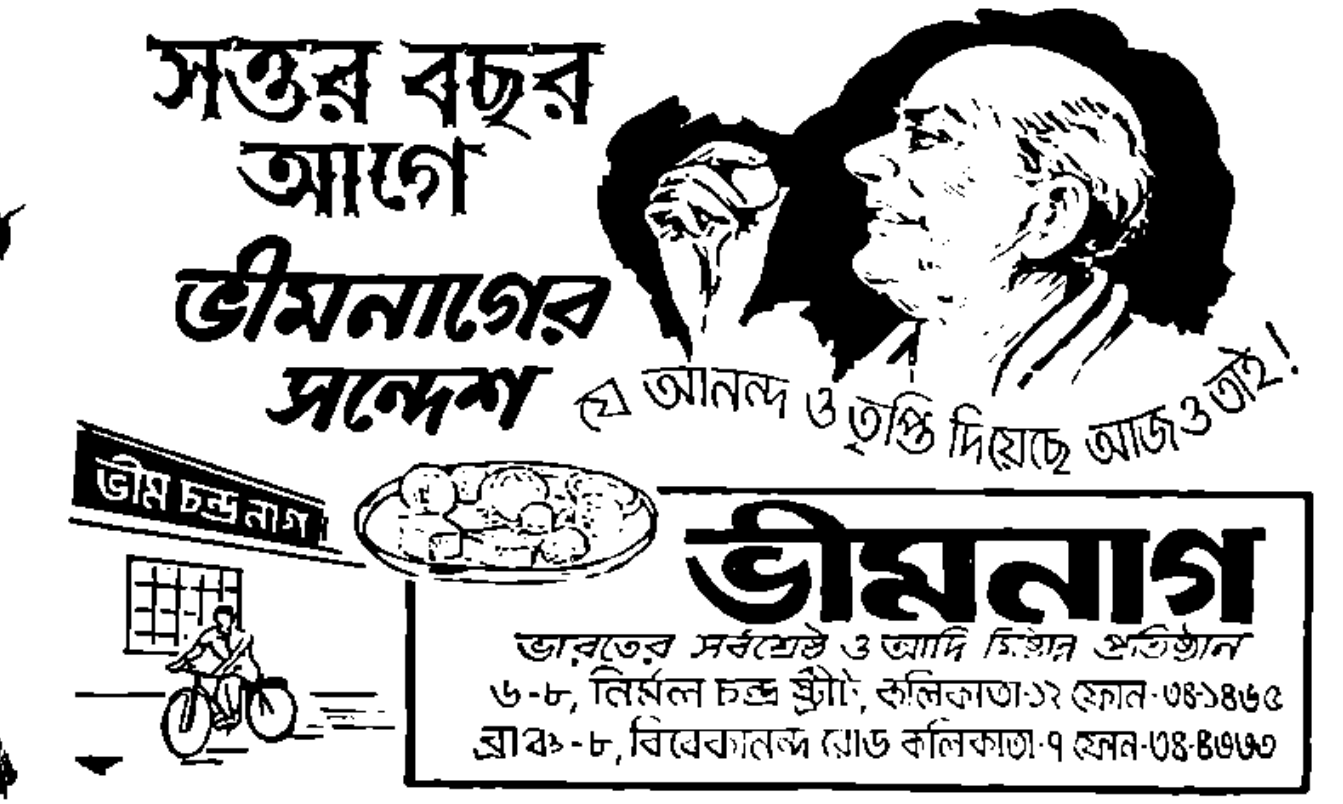

এই সংখ্যায়

গল্প ভারতীর পাতা থেকে

কাশীনাথের পুনর্জন্ম — পরশুরাম ৬৮০

খেলাধূলা — জ্যোতির্ময় ৬৮৮

যে কাহিনী চিরকালের

কিং লিয়ার : শেক্‌সপিয়ার — সুজন রায় ৬৯১

এই সংখ্যায়

জীবন যেমন		
বিচিত্র ভবঘুরে	—ভবানী মুখোপাধ্যায়	৬৯৯
এই প্রথম		
বাস্তব কল্পনা	—শুভ্রা ঘোষ	৭০৪
অপরাহ্নবর্তী (উপন্যাস)	—সুবোধ সিংহ	৭০৫

HOUSE OF NRM

NATIONAL RUBBER MANUFACTURERS LTD.

THE LARGEST MANUFACTURERS OF INDUSTRIAL RUBBER PRODUCTS

Inchek Tyres Limited

MANUFACTURERS OF TYRES FOR INDIAN ROADS AND CLIMATIC CONDITIONS.

এই সংখ্যায়

●

● মেয়েদের মজলিস ●

পৌষ পার্বণ	—গিরিবালা দেবী	৭১১
শ্রীপ ও স্বাস্থ্য	—বেলা দে	৭১৬
শীতের জলখাবার	—শকুন্তলা	৭১৭
পৌষ পার্বণ	—শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায়	৭১৯

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas

Ex. Judge, Calcutta High Court.
Ex-Law Member, Govt. of India

আমি লক্ষ্মী-ঘিই ব্যবহার করি। অন্য ঘিয়ের তুলনায় এঁটি অনেক ভাল ও বিশুদ্ধ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সত্যেন মজুমদার
সম্পাদক—আনন্দবাজার-পত্রিকা

লক্ষ্মী ঘি ব্যবহার করে আমার বেশ ভাল লেগেছে। এটা সত্যিই ঘি।

—শিশিরকুমার ভাদুড়ি

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল ঘিনিষ।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই ভেজালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—দৈনিক বসুমতী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজারে প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

শ্রীসীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখরোচক হয়।

শ্রীশান্তা দেবী

ভাঙা আকুল

"আমাদের দেশ তো একদিন ধনকে তুচ্ছ করিতে জানিত, একদিন দারিদ্রকেও সোভন ও মহামান্বিত করিতে শিখিয়াছিল—আজ আমরা কি টাকার কাছে সাষ্টাঙ্গে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া আমাদের সনাতন স্বধর্মকে অপমানিত করিব। আজ আবার আমরা সেই শুচিশুদ্ধ, সেই মিতসংযত, সেই স্বল্পীকরণ জীবনযাত্রা গ্রহণ করিয়া আমাদের তপস্বিনী জননীর সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিব না? আমাদের দেশে কলার পাতায় খাওয়া তো কোনদিন লজ্জাকর ছিল না, একলা খাওয়াই লজ্জাকর, সেই লজ্জা কি আমরা আর ফিরিয়া পাইব না। আমরা কি আজ সমস্ত দেশকে পরিবেশন করিতে প্রস্তুত হইবার জন্য নিজের কোনো আরাম কোনো আড়ম্বর পরিত্যাগ করিতে পারিব না। একদিন যাহা আমাদের পক্ষে নিতান্তই সহজ ছিল তাহা কি আমাদের পক্ষে আজ একেবারেই অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। কখনোই নহে। নিরতিশয় দুঃসময়েও ভারতবর্ষের নিঃশব্দ প্রকাণ্ড প্রভাব ধীরভাবে নিগূঢ়ভাবে আপনাকে জয়ী করিয়া তুলিয়াছে। আমি নিশ্চয় জানি, আমাদের দুই চারিদিনের এই ইস্কুলের মুখস্থ বিদ্যা সেই চিরন্তন প্রভাবকে লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। আমি নিশ্চয় জানি, ভারতবর্ষের সুগম্ভীর আহ্বান প্রতি মুহূর্তে আমাদের বক্ষ কুহরে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। এবং আমরা নিজের অলক্ষ্যে শনৈঃ শনৈ সেই ভারতবর্ষের দিকেই চলিয়াছি। আজ যেখানে পথটি আমাদের মঙ্গল দীপোজ্জ্বল গৃহের দিকে চলিয়া গেছে সেইখানে আমাদের গৃহযাত্রারম্ভের অতিমুখে দাঁড়াইয়া "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্।" একবার স্বীকার করো যে, দেশের উদ্দেশে প্রত্যহ আমরা পূজার নৈবেদ্য উৎসর্গ করিব; একবার প্রতিজ্ঞা করো, জন্মভূমির সমস্ত মঙ্গল আমরা পরের কাছে নিঃশেষে বিকাইয়া দিয়া নিজেরা অত্যন্ত নিশ্চিন্তচিত্তে পদাহত অকালকুষ্মাণ্ডের ন্যায় অধঃপাতের সোপান হইতে সোপানান্তরে গড়াইতে গড়াইতে চরম লাঞ্ছনার তলদেশে আসিয়া উত্তীর্ণ হইব না।"

———

এই কি আমার দেশ।

প্রান্ত পুণ্ড্র চিত্র

রবীন্দ্রনাথ এ কথা কখনো স্বীকার করতে পারেননি যে, দেশের পলিটিক্স আগে, দেশের মানুষ পরে। এইজন্য তাঁকে অনেকে ভুল বুঝেছেন। তিনি দেখেছিলেন যে, দেশের পলিটিশিয়ান আর দেশের সর্বসাধারণ, উভয়ের মধ্যে অসীম দূরত্ব। আমরা পলিটিক্স করি ইংরেজের পলিটিক্স নকল করে। আমরা বিদেশীয় রাজনীতির পুতুল খেলায় উন্মত্ত। রবীন্দ্রনাথের প্রথম কথা হল, সমাজকে বাদ দিয়ে ভারতবর্ষে স্বায়ত্তশাসন চেষ্টা ফলবতী হবেনা। দ্বিতীয় কথা, জবরদস্তি দ্বারা মনের পাপকে দূর করা যায়না। পাপকে ভিতর থেকে মারতে হবে। তৃতীয় কথা, গোঁয়ারতুমির দ্বারা উপর ও নীচের অসামঞ্জস্য ঘোচেনা। কারণ, অসামঞ্জস্যের কারণ মানুষের চিত্তবৃত্তির মধ্যে। চতুর্থ কথা, যে-মানুষ নিজেকে বাঁচাতে জানেনা, কোনো আইন তাকে বাঁচাতে পারেনা। এই যে বাঁচবার শক্তি, জীবনযাত্রার সমগ্রতার মধ্যে খুঁজে নিতে হবে। পঞ্চম কথা, লাঠি দিয়ে, হিংসা দিয়ে, বিদ্বেষ দিয়ে মানুষকে সংস্কার করা যায়না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "যেন যৌবের দল বলছে শাশুড়িগুলোকে গুণ্ডা লাগিয়ে গঙ্গাযাত্রা করাও, তাহলেই বধূরা নিরাপদ হবে। ভুলে যায় যে মরা শাশুড়ির ভূত ঘাড়ে চেপে তাদের শাশুড়িতর শাশুড়িতম করে তুলতে দেরী করেনা।" ষষ্ঠ কথা, রক্তপিপাসার বড়-জোঁকের চেয়ে ছিনে-জোঁকের প্রবৃত্তির কোনো পার্থক্য নেই।

রবীন্দ্রনাথের স্বরাজ-কল্পনা ও স্বরাজ-সাধনা বুঝতে হলে এই সত্যটি জানতে হবে যে, তার যথার্থ ভিত্তি আমাদের মনের উপর, এবং সেই মন তার বহুধাশক্তির দ্বারা এবং আত্মশক্তির উপর আস্থা দ্বারা স্বরাজ সৃষ্টি করতে থাকে। এই স্বরাজ-সৃষ্টি কোনো দেশেই শেষ হয়নি—লোভ বা মোহের প্রয়োচনায় বন্ধনদশা থেকে গেছে। সেই বন্ধনদশার কারণ মানুষের চিত্ত। তাই চিত্তবিকাশের উপরই স্বরাজ দাঁড়াতে পারবে। এই চিত্তবিকাশকে বন্ধ করে স্বরাজ-সৃষ্টি সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের স্বরাজ-সৃষ্টিতে ভেদবুদ্ধি বা স্বার্থবুদ্ধির স্থান নেই।

তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"যে-বুদ্ধি সকলকে সংযুক্ত করে সেই হচ্ছে তত্ত্ববুদ্ধি। আজ এই বিশ্বচিত্ত উদ্বোধনের প্রভাতে আমাদের দেশে জাতীয় কোন প্রচেষ্টার মধ্যে যদি সর্বজনীন কোন বাণী না থাকে তা হলে তাতে আমাদের হীনতা প্রকাশ করবে। ···আজ সর্বমানবের চিত্ত আমাদের চিত্তে তার ডাক পাঠিয়েছে; আমাদের চিত্ত ভাষায় তার সাড়া দিক, কেননা ডাকের যোগ্য সাড়া দেওয়ার ক্ষমতাই হচ্ছে প্রাণশক্তির লক্ষণ। একদা পরমুখাপেক্ষী পলিটিক্সে সংযুক্ত ছিলুম তখন আমরা কেবলি পরের অপরাধের তালিকা আউড়ে পরকে তার কর্তব্যত্রুটি স্মরণ করিয়েছি—আজ যখন আমরা পর-পরায়ণতা থেকে আমাদের পলিটিক্সকে ছিন্ন করতে চাই, আজও সেই পরের অপরাধের জপের দ্বারাই আমাদের বর্জননীতির সাধন করতে চাচ্ছি।··· সমস্ত বিশ্বের যোগযুক্ত ভারতের বিরাটরূপ চোখে না পড়াতে আমাদের কর্মে ও চিন্তায় ভারতের যে-পরিচয়

আমরা দিতে প্রস্তুত হয়েছি সে অতি ছোটো, তার দীপ্তি নেই, সে আমাদের ব্যবসাবুদ্ধিকেই প্রধান করে তুলেছে।"

দেশের মুক্তি কাজটা খুব বড়, তাই তার উপায়টা ছোট হলে চলবেনা, কাঁকি দিয়ে দেশকে পাওয়া যায় না, নিজের শক্তির 'পরে বিশ্বাস রেখে দেশকে বড় করতে হবে। বুদ্ধিবিচারে দায়িত্ব পরের হাতে সমর্পণ করে চিত্তকে আগ্রহ হীন রাখা যায় না; অথচ নিজেকে সজাগ ও সচেষ্ট না রাখতে পারলে দেশসেবা অসার্থক হতে বাধ্য। আমাদের লড়াই ভূতের সঙ্গে, অবুদ্ধির সঙ্গে, মনের জড়তার সঙ্গে। আমাদের পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হতে হবে চিত্ত দিয়ে, কর্ম দিয়ে, শ্রদ্ধা দিয়ে। আগুনের আলানি-কাঠ হচ্ছে আত্মশক্তির উপর অবিশ্বাস। তাই রবীন্দ্রনাথ দেশসেবার কাজে 'বৃহৎ-আমি'র প্রকাশ চেয়েছেন।

শচীশ সেন লিখিত রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তাধারা থেকে সংকলিত।

১৯০৫ সালের বাংলার স্বদেশী আন্দোলন, ১৯২০ সালের অসহযোগ আন্দোলন ও ১৯২৯ সালের আইন-অমান্য আন্দোলন—এই তিনটার মধ্যে কোন্‌টা বড়ো ছিল? তিনটার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকায় নিঃসংকোচে বলতে পারি, ভারতের স্বাধীনতালাভের প্রচেষ্টায় সিপাহীযুদ্ধের পরে আসে বাংলাদেশের এই স্বদেশী আন্দোলন।

এই স্বদেশী আন্দোলনের পরিকল্পনায় ও পরিচালনায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কোনো হাত যে ছিল না—শুধু তাই নয়, জাতীয় কংগ্রেসে এর বিরোধিতাও করেছে। সেই কথাটা আগে বলে নি'।

১৯০৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন হল এই কলকাতা শহরে, সভাপতি—দাদাভাই নৌরজি। তখন সমগ্র বাংলাদেশ পরিব্যাপ্ত হয়ে এক বিরাট আন্দোলন চলেছে। বাংলার শক্তি হ্রাস করবার জন্য ব্রিটিশ সরকার বাংলাকে দু'খণ্ডে বিভক্ত করেছে; বাঙালি প্রতিবাদ জানিয়েছে, কোনো ফল হয়নি; বাঙালি পণ করেছে এ বিভাগ সে কখনো মেনে নেবে না। আগুন জ্বলে উঠেছে; বাঙালির কর্মপদ্ধতির মধ্যে এক হল ছিল ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্য বর্জন। এর আগের বছর বারাণসীতে গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাতে সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ বাঙালি প্রতিনিধিরা চেষ্টা করেছিলেন বাংলার এই আন্দোলনকে সর্বভারতীয় ব্যাপার ব'লে স্বীকৃতি দেওয়ানো। তাঁদের সে চেষ্টা ফলবতী হয়নি। এবার অধিবেশন কলকাতায়। সংবাদ এল বালগঙ্গাধর টিলক প্রমুখ মহারাষ্ট্রের দল ও পাঞ্জাব-প্রতিনিধিদের এক অংশ বাঙালির হাতে হাত মেলাবে। শেষ একটা আপোস-প্রস্তাবে দু'দল সম্মত হল, স্থির হল প্রস্তাবটা আনবেন গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে আর তা সমর্থন করবেন বিপিনচন্দ্র পাল।

প্রকাণ্ড প্যাণ্ডেল বাঁধা হয়েছে; খুব সকাল সকাল গেলে তি হবে, টিকিট তো কম দামের, পিছনের এক আসনে গিয়ে বসেছি। ভারতের বিভিন্ন স্থান হতে সমাগত বিশিষ্ট মনীষীরা এক মঞ্চে আসীন, এ দৃশ্য মনকে অভিভূত করে দিয়েছে। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি রাসবিহারী ঘোষ, মূল সভাপতি দাদাভাই নৌরজি তাঁদের অভিভাষণ পাঠ করলেন। কয়েকটি মামুলি প্রস্তাব গৃহীত হল, তারপর এগিয়ে এলেন মহামতি গোখ্‌লে ওই আপোস প্রস্তাব নিয়ে। প্রস্তাবটি ছিল এই—

That having regard to the fact that the people of this country have little or no voice in its administration and their representations to the Government do not receive due consideration, this Congress is of opinion that the Boycott Movement inaugurated in Bengal by way of protest against the partition of that Province was and is legitimate.

প্রস্তাবটি সমর্থন করতে এসে বিপিনচন্দ্র পাল বললেন,—আপনারা দেখছেন, প্রস্তাবে বয়কট-এর সঙ্গে যুক্ত আছে movement শব্দটা। যেহেতু এটা movement, অতএব এই বয়কট-কর্মপদ্ধতি স্থান হতে স্থানান্তরে এক সময় হতে অন্য সময়ে, এক প্রদেশ হতে অন্য প্রদেশে প্রসারিত হোক। আর বয়কট শব্দের কোনো বিশেষণ না থাকায়, ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্যের উল্লেখ না থাকায়, এইটেই বলা হচ্ছে যে সরকারের সঙ্গে সকলপ্রকার সংস্রব আমরা ত্যাগ করব।

ভিন্ন প্রদেশের নেতারা ভীষণ চটে গেলেন। মদনমোহন মালবীয় উঠে এসে বললেন,—অন্য প্রদেশ বয়কট কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করবে না। আর সোখ্‌সে বললেন,—ইংরেজি ভাষায় যে অর্থ আমরা তাই গ্রহণ করব, বিপিনচন্দ্র পাল যে অর্থ করেছেন আমরা তাতে বাধ্য নই।

এ কথা তো তাঁরা বলবেনই, কারণ তখন কংগ্রেসের যে নীতি ছিল তাকে লক্ষ্য ক'রে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

মিছে কথার বাঁধুনি কাঁদুনি পালা
　　চোখে নাই কার (ও) নীর,
নিবেদন আর আবেদনের থালা
　　ব'হে ব'হে নত শির।

কিন্তু বাংলা দ্রুত এগিয়ে চলেছে। বরিশালে বাংলার প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হবে; সভাপতির আসন গ্রহণ করবেন ব্যারিস্টার আবদুল রসুল। অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি হলেন অশ্বিনীকুমার দত্ত। সভাপতি রসুল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি প্রতিনিধিদের নিয়ে স্টীমার বরিশালের ঘাটে এসে উপস্থিত হল। একই সময় ঢাকার স্টীমার এসে লাগল, তাতে আছেন আনন্দচন্দ্র রায় প্রভৃতি প্রতিনিধিবর্গ। অশ্বিনীকুমার দত্ত জেটি হতে তাড়াতাড়ি স্টীমারে এসে বললেন,—জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট এমারসন সাহেব হুকুম দিয়েছেন, কেউ 'বন্দে মাতরম্' বলতে পারবে না; আমি কথা দিয়েছি, আপাতত আমরা ওই আদেশ পালন করব, তারপর নেতারা উপস্থিত হয়ে যা স্থির করবেন সেইমতো কাজ হবে। সকলেই এ ব্যবস্থা মেনে নিয়ে নামতে গেলেন, বিশেষত অশ্বিনীবাবু যখন কথা দিয়েছেন। কিন্তু কৃষ্ণকুমার মিত্র কিছুতেই নামবেন না,—যেখানে 'বন্দে মাতরম্' বলতে পারব না সে-জায়গায় পদার্পণ করব না, এই স্টীমারেই কলকাতায় ফিরে যাবে। শেষে সুরেন্দ্রনাথ বহু চেষ্টায় একরকম জোর ক'রে তাঁকে নামিয়ে নিয়ে গেলেন। এর পর পর ঘটনাগুলি স্মরণ করলে আজও বাঙালির দেহের রক্ত দ্রুত চলতে থাকে। নেতারা সর্বসম্মতিক্রমে স্থির করলেন যে ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ অমান্য করা হবে। অধিবেশন আরম্ভ হবার দু'ঘণ্টা আগে এক মাইল দীর্ঘ এক শোভাযাত্রা চলতে আরম্ভ করল। এক এক সারিতে দুজন করে আছেন, প্রথম সারিতে রসুল ও সুরেন্দ্রনাথ। একটিমাত্র ইঙ্গিতে বিরাট জনসমুদ্র হতে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উত্থিত হল। ভারতের স্বাধীনতালাভের ইতিহাস যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হলে দেখা যাবে যে, সমবেতভাবে রাজনীতিক্ষেত্রে এই প্রথম আইন অমান্য করা হল। কিন্তু

যথাযথভাবে ইতিহাস তো রচিত হবে না। কর্তার ইচ্ছায় শুধু কর্ম হবে না, ইতিহাসও গড়া হবে। থাক, সেদিনের কথাটা সেরে নি'।

'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি হথা যায় পুলিশ-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কেম্প সাহেব সুরেন্দ্রনাথের কাছে এসে বললে, —You are under arrest। তারা তো সুরেন্দ্রনাথকে নিয়ে গেল, এদিকে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনির বিরাম নেই, কেম্প সাহেবের অনুচরবর্গ এলোপাতাড়ি লাঠি চালাচ্ছে। মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা ষোলোবছরের ছেলে লাঠির আঘাতে মাথা ফেটেছে, দরদর ক'রে রক্ত ঝরছে, কিন্তু 'বন্দে মাতরম্' বলা সে ছাড়বে না; শেষে পুলিশ মারতে মারতে তাকে পুকুরে নিয়ে ফেলল। প্যাণ্ডালে সকলে উপস্থিত হলেন, সুরেন্দ্রনাথ তখনও ফেরেননি, এমন সময় কেম্প সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটের পরোয়ানা নিয়ে হাজির। মুকুন্দদাস স্বেচ্ছাসেবকদের অধিনায়ক, কেম্পকে প্যাণ্ডালে ঢুকতে দেবেন না, বলে—চার-পাঁচ স্বেচ্ছাসেবকের মৃতদেহের উপর দিয়ে প্রবেশ করতে হবে। শেষে সভাপতির কাছ থেকে নির্দেশ আসায় মুকুন্দদাস দরজা ছেড়ে দিল। কেম্প সভাপতি রসুলকে ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ দেখাল, কন্‌ফারেন্স বন্ধ করতে হবে, না করলে, জোর ক'রে কন্‌ফারেন্স ভেঙে দেওয়া হবে। কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রমুখ কয়েকজন জোর ক'রে সভা করার পক্ষপাতী, কিন্তু বহু মহিলা উপস্থিত, অনেক প্রাণহানি হবে, তাই অধিকাংশ নেতার পরামর্শে রসুল কন্‌ফারেন্স বন্ধ করলেন। ভূপেন্দ্রনাথ বসু উঠে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে বললেন,—আজ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের পতনের বীজ উপ্ত হল।

এ সময় ভারতের জাতীয় কংগ্রেস কি করছিলেন দেখা যাক। তার মধ্যে দুটো দল হয়ে গেছে, চরমপন্থী ও নরমপন্থী। বিভেদ দিন দিন বেড়ে যেতে থাকল, চরমে উঠল সুরাট কংগ্রেসে। রাসবিহারী ঘোষ সভাপতি হয়ে গেলেন। প্রারম্ভেই জুতা-ছোড়াছুড়ি মারামারি। জাতীয় যজ্ঞ নরমেধযজ্ঞে পরিণত হল। এর পর চরমপন্থীরা আর এতে স্থান পেলেন না। নরমপন্থীরা টিম্‌টিম্ ক'রে এর বাৎসরিক কৃত্য করে যেতে থাকলেন।

কংগ্রেসের যা যাই হোক, বাংলা দ্রুত এগিয়ে চলল। রবীন্দ্রনাথের গান, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের একপয়সার দৈনিক কাগজ 'সন্ধ্যা', শিবাজী-উৎসব বাংলাকে মাতিয়ে দিল। অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকারের দমননীতি উত্তরোত্তর বেড়ে চলল, আর শেষ অবধি তা বাধ্য করল বাংলার একদল যুবককে বাঁকা পথের আশ্রয় নিতে। মজঃফরপুরে বোমা পড়ল। কিন্তু অচিরেই মানিকতলায় বোমার কারখানাটি আবিষ্কৃত হল, সমগ্র দলবল ধরা পড়ল।

সেদিন দেখলুম ওই দলের একজন, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্যকে। যুবক, ভরাযাস্থ্য, অভাব অনটন যথেষ্ট, সরকার বৃত্তি দিতে চেয়েছিলেন, গ্রহণ করেননি। ওই দলের মুখপত্র 'যুগান্তর' পরিচালনার ভার এঁর উপর ন্যস্ত ছিল। দলটি যেদিন ধরা পড়ল, মনে পড়ে যাচ্ছে—তার পরদিন 'যুগান্তর'এর শেষ সংখ্যা এই কবিতাটি নিয়ে বেরল—

যা হইতে মা যোগেন তোমায়
ভাঙিল রাক্ষস মহল ঘট,
জাগো রণচণ্ডী জাগো মা আমার
আবার পুজিব চরণতট।

একপয়সার কাগজ আটা আনা দিয়ে কিনেছিলুম।

সেই সময় এক ব্যক্তি এক রাত্রে সর্বজনপূজিত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। কথাপ্রসঙ্গে আচার্যদেব অতি কাতর ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন,—হ্যাঁ রে, সব ক'জনই কি ধরা পড়েছে, দু'একজনও কি বাইরে নেই?

একদিকে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে, পথেঘাটে ছেলেমেয়েরা গান ধরেছে—

উদিল যেখানে পঞ্চীরনাথে মাতৃনামের মধুর তান,
বোমার বিধান দিল যাদুযন্ত্র, প্রফুল্ল চাকী তাজিল প্রাণ,
ক্ষুদিরাম কানাই হাসিতে হাসিতে ফাঁসিতে করিল জীবন শেষ,
তুই তো মা মা তাদের জননী, তুই তো মা মা তাদের দেশ।

অন্যদিকে ব্রিটিশ-রাজের জেলখানা কয়েদীতে ভরে গেল। এদেরই উদ্দেশ ক'রে 'পথের দাবী'ও অপূর্ব তো বলেছিল—

তুমি তো আমাদের মতো সোজা মানুষ নও,- তুমি দেশের জন্য সমস্ত দিয়েছ, তাইতো দেশের যোগ্যতমা তোমাকে বইতে পারে না, সীতার দিয়ে তোমাকে পন্থা পার হতে হয়; তাই তো দেশের রাজপথ তোমার কাছে রুদ্ধ, দুর্গম পাহাড়-পর্বত তোমাকে ডিঙিয়ে চলতে হয়। কোন্ বিস্মৃত অতীতে তোমারই জন্য তো প্রথম শৃঙ্খল রচিত হয়েছিল, কারাগার তো শুধু তোমাকে মনে করেই প্রথম নির্মিত হয়েছিল—সেই তো তোমার গৌরব! দুঃখের দুঃসহ গুরুভার বইতে তুমি পারো বলেই তো ভগবান এত বড়ো বোঝা তোমারই স্কন্ধে অর্পণ করেছেন! মুক্তিপথের অগ্রদূত! পরাধীন দেশের হে রাজদ্রোহী! তোমাকে শত কোটী নমস্কার!

আমরাও আজ তোমাকে কোটী কোটী নমস্কার জানাই।

আর একটা মোক্ষম কথা ব'লে নি'। ইংরেজ-রাজকে যে আমরা তাড়াতে পেরেছি তার মূলে কি ছিল জানেন? ইংরেজি ভাষা। ওদেরই মোড়া দিয়ে ওদের দাঁত ভেঙেছি। যা-এর যে ভাকে পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ মিলেছিল সে—ভাক ছিল হিন্দীতে নয়, ইংরেজিতে। স্বাধীনতা লাভ ক'রে সেই আমরা ইংরেজিকে বরবাদ করতে উদ্যত হলুম অমনি ভারত চলল আবার টুকরো টুকরো হয়ে যাবার পথে; পশুস্রোত বেরাদিন্ বোম্বাইতে, বেরা দিল পঞ্জাবে; আর আসামে যা ঘটল তা বাধা-চাপা দিতে পারলে স্বাধীন ভারতের মান কিছুটা বজায় থাকত। দোহাই দিল্লীর হুজুরেরা।

যা দেবী সর্বভূতেষু prestige রূপেণ সংস্থিতা—সেই prestige-টা অন্তত এই একটা ব্যাপারে ঠেলে রেখে, দোহাই আপনাদের, আবার ইংরেজিকে ফিরিয়ে আনুন। অন্য যে ব্যবস্থাই গ্রহণ করুন, তা হবে শুধু বিষ্ণুকর্ম, তা কৈসে হেতে বিলম্ব হবে না।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের লেখা থেকে সংকলিত।

ভারতচিন্তায় বৈদেশিক প্রচারে

স্বামী অভেদানন্দের অবিস্মরণীয় অবদান

পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে ভারতের ব্যয়বহুল বৈদেশিক দপ্তর আছে যার অন্যতম প্রধান কর্তব্য হল, এদেশের বাণী ওদেশের প্রচার করা, এদেশের উজ্জ্বল চিত্র ওদেশের লোকের কাছে তুলে ধরা, এক কথায়, বিদেশে ভারতের ইমেজ যাতে কোনক্রমে নষ্ট না হয়, সেবিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা ও ব্যবস্থা অবলম্বন করা। কিন্তু তাঁরা যে কী করেন তা আমাদের জানা নেই। আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিদেশে, বিশেষ করে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় ভারতের বিরুদ্ধে অপপ্রচার অব্যাহত গতিতে চলেছে। বই, সংবাদপত্রে প্রবন্ধ এসব তো আছেই, তার উপর আজকাল টেলিভিশনের মাধ্যমেও এই অপপ্রচারকে কাজে লাগানো হচ্ছে। শুধু তাই নয় ওদেশের চলচ্চিত্রকার এদেশে এসে এমন সব ছবি তুলে নিয়ে গিয়ে চলচ্চিত্র তৈরী করছেন যা দেখলে যে কোন দর্শকই এদেশ সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হবে।

স্বামী অভেদানন্দ

এই অপপ্রচারকে প্রতিরোধ করবার জন্যে আমরা কি করেছি! আমাদের দেশ থেকে সেখানে গিয়ে কেউ কি বলেছেন যে, তোমাদের রটনা মিথ্যা, তোমাদের বক্তব্য বিকৃত, তোমরা জেনে রাখো, বিদ্যায় বুদ্ধিতে শৌর্যে বীর্যে তোমাদের চেয়ে আমরা কম নই। বোধ হচ্ছে, সেরকম শক্তিমান মানুষ বর্তমানে এদেশে নেই।

কিন্তু একদা ছিলেন। ভাবতে অবাক লাগে, সুদূর অতীতে কোনরকম সরকারী সাহায্য ছাড়াই অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থায় ভারতের দুই সহায়সম্বলহীন সন্ন্যাসী বাক্‌যের মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়ে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় ভারতের মর্মবাণীকে এমনই সার্থকতার সঙ্গে প্রচার করেছিলেন যে পাশ্চাত্যের মানুষ বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিল, ভারতের প্রতি শ্রদ্ধায় তাঁদের মাথা নিচু হয়েছিল।

ইওরোপ ও আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের প্রচারকার্য সম্পর্কে অভেদানন্দ বলেছেন—"বিবেকানন্দ যে আন্দোলন আরম্ভ করেন তা সাম্প্রদায়িক আন্দোলন নয়। আমি বলছি এই আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হতে চলেছে।"

'স্বদেশসেবক সন্ন্যাসী' স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভাই অভেদানন্দও বিশ্বাস করতেন, ভারতের জাতীয় আন্দোলনের দুটি প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, প্রথমত দেশের অভ্যন্তরে জাতীয় ঐক্য, দ্বিতীয়ত, বহির্বিশ্বে ভারতচিন্তার

প্রচার। ১৮৯৪ সালে তিনি একটি প্রবন্ধে বলেন, "একদিকে আমাদের সামাজিক দুর্নীতি এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে, অন্যদিকে পৃথিবীর কাছে ভারতের বাণী পৌঁছে দিতে হবে।" ১৮৯৬ থেকে ১৯০৬ পর্যন্ত অভেদানন্দ আমেরিকায় ও ইউরোপে যে প্রচারকার্য পরিচালনা করেন তা যে ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের সমসোত্রীয় তাতে সন্দেহ নেই। ভারতবর্ষের ধর্ম, সভ্যতা এবং বিশেষ করে পরাধীন ভারতের দুর্বার স্বাধীনতা-স্পৃহার কথা তিনি অকুণ্ঠোচ্চারে বজ্রকণ্ঠে প্রচার করে সেদেশের জনসাধারণ থেকে আরম্ভ করে পণ্ডিতমণ্ডলীকে পর্যন্ত প্রভাবিত করে ভারতের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন করে তোলেন। ১৮৯৮ সালে আমেরিকার তদানিন্তন প্রেসিডেন্ট ম্যাক্‌কাইনলি তাঁকে হোয়াইট হাউসে আহ্বান করে আপ্যায়িত করেন। শুধু তাই নয়, তিনি অভেদানন্দের কাছে ইংরাজ-শাসিত ভারতের অবস্থার কথা মন দিয়ে শোনেন এবং ভারতের প্রতি অনুরাগ ও সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

১৯০৫ সালে ভারতবর্ষে যে ঐতিহাসিক বিপ্লবের সূত্রপাত হয় অভেদানন্দের মনে বহুদিন আগেই তার স্বপ্ন জেগেছিল। সেই বিপ্লবের বাণীকে জগতের দিকে দিকে ঘোষণা ও প্রচার করবার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন তিনি, এবং সেই উদ্দেশ্যে পৃথিবীর চারিদিকে ছুটে বেড়িয়েছেন, সাগর পাড়ি দিয়েছেন সন্তোষোধায়।

১৯০৫ সালের শেষদিকে এক প্রবন্ধে সুভাষচন্দ্র বলেন, ভারতের স্বাধীনতাকে স্বরান্বিত করার জন্যে বৈদেশিক প্রচার অপরিহার্য। ভারতের দুই ভবিষ্যদ্রষ্টা সন্ন্যাসী সেকথা বুঝেছিলেন বহুদিন আগেই।

১৯০২ সালে বিবেকানন্দের তিরোধানের পর স্বামী অভেদানন্দ শ্রান্তিক্লান্তিহীন উদ্যমের সঙ্গে স্বদেশের বাণী প্রচার করে বহির্বিশ্বে ভারতের অনুকূলে জনমত জাগিয়ে তোলেন। সেই প্রচার কার্যের দ্বারা তিনি ভারতের যে 'ইমেজ' সৃষ্টি করেছিলেন তা ভাঙিয়েই তো এতদিন আমাদের চলল।

একথা আজ নিঃসংশয়ে জানা গেছে যে অভেদানন্দের সেই বৈদেশিক প্রচার বিদেশের নানা প্রান্তে অবস্থিত ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রভূত সহায়তা করেছিল। সেদিন থেকে বিচার করে বলা যেতে পারে স্বামী অভেদানন্দ ছিলেন ভারতবিপ্লবের অন্যতম অগ্রনায়ক।

১৯০৫ সালে ভারতে বেজে উঠল স্বদেশী আন্দোলনের দুন্দুভি আর বিদেশে ক্রকলিন ইনস্টিটিউটে শোনা গেল স্বামী অভেদানন্দের বজ্রনির্ঘোষ "টুডে দি কোয়েশ্চান ফর ইণ্ডিয়া ইজ হাউ টু লিভ! বৈদেশিক শাসনে ভারতবর্ষ আজ হৃতসর্বস্ব, তার কাছে আজ খাওয়াপরার বাড়া আর কোন প্রশ্ন নেই, সহানুভূতিহীন স্বার্থান্ধ লোভী আর অত্যাচারী বিদেশী রাজশক্তির কবলে পড়ে ভারতবর্ষ আজ মুমূর্ষু। কিন্তু ভারতের সন্তান অমৃতের সন্তান, তার মৃত্যু নেই, সে আবার জেগে উঠবে।"

প্রমাণের পর প্রমাণ উপস্থাপিত করে অভেদানন্দ ইওরোপ ও আমেরিকাবাসিদের জানিয়ে দেন যে ভারতবর্ষ সম্পর্কে ব্রিটিশের অপপ্রচার সমস্ত মিথ্যা, ব্রিটিশ শাসনে ভারতের কোটী কোটী নরনারী আজ শোষিত সর্বহারা।

অভেদানন্দের সেই জ্বালাময়ী বক্তৃতাগুলি একত্র করে বই বেরুলো—ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড হার পিপল (১৯০৬)। সেই বই পড়ে পাশ্চাত্যদেশের নরনারীরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সত্যকার তথ্য লাভ করে ভারতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হল, ভারত-বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতি দেখালো। ওয়াশিংটন ইভনিং স্টার সেই বই সম্বন্ধে মন্তব্য করল—"আমেরিকাবাসিরা মহান দেশ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যা জানতে চায় সেই সব কথাই এই গ্রন্থে বলা হয়েছে, বইটি সেদিক থেকে বিশেষ মূল্যবান।"

৩.

বইটি সত্যিই ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। ইংরাজ সরকার বইটির ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেয়। এই থেকেই বোঝা যায় বইটি সাগরপারে কতখানি চাঞ্চল্য জাগিয়েছিল।

স্বামী অভেদানন্দের ভারতচিন্তা ধর্মের উপর ভিত্তি করে প্রসারিত হলেও, সমাজকে, জনজীবনকে এবং তাদের আশা-আকাংখাকে তিনি কোনদিন ভোলেন নি। তাঁর ভারতচিন্তার মধ্যে ওতপ্রোত ছিল ভারতের স্বাধীনতা, ভারতীয় সমাজ-জীবনের উন্নতি, ভারতীয় নারীর আত্মবিকাশ, ভারতের যুবশক্তির নব জাগরণ, ভারতের শিক্ষাসংস্কার এবং সর্বোপরি ভারতের ঐক্যসাধনা—এক কথায় তাঁর ভারতচিন্তা ছিল সর্বব্যাপী। ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাঁর শেষ কথা, "জগতের অন্যান্য জাতির আদর্শ হইতে আমাদের আদর্শ উচ্চতর, সুতরাং স্বাধীনতা বলিতে প্রকৃতপক্ষে যাহা বুঝায় আমরা সেই স্বাধীনতা চাই। যাহাকে মোক্ষ বা আধ্যাত্মিক মুক্তি বলে বেদে তাহাই স্বাধীনতার আদর্শ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। জগতে স্বাধীনতার যে সকল স্বরূপ বা আদর্শ বিদ্যমান, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাই তৎসমুদয়ের মূলভিত্তি। উহা লাভ করিবার জন্য আমাদের প্রাণপনে চেষ্টা করা কর্তব্য। কারণ সর্বপ্রকার স্বাধীনতার মধ্যে উহাই শ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ। মহাত্মা গান্ধী ইহাকেই 'স্বরাজ' নামে প্রচার করেন।" (আত্মশক্তি, ১৩২৪)

ভারতবর্ষের মর্মকথাকে, ভারতবর্ষের চক্ষু বেদনার ভাষাকে, ভারতের আত্মবিস্মৃতদের বিক্ষোভকে বিদেশের দ্বারে দ্বারে প্রচার করে এক নিঃসঙ্গ নিঃসম্বল সন্ন্যাসী সেদিন তাঁর মাতৃভূমির যে মহিমান্বিত "ইমেজ" বিদেশের কাছে তুলে ধরেছিলেন তার সামনে দাঁড়িয়ে সেই বিদেশের নাগরিকরা নতমস্তকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছিল।

• • • •

নেতাজীর চিন্তাধারা

'স্কুলে, কলেজে, ঘরে, বাহিরে, পথে, ঘাটে, মঠে যেখানে অত্যাচার অবিচার বা অনাচার দেখিবে সেখানে বীরের মত গিয়ে বাধা দাও। মুহূর্তের মধ্যে বীরত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবে—চিরকালের জন্য জীবনের স্রোত সত্যের দিকে ফিরিয়া যাইবে। সমস্ত জীবনটাই রূপান্তরিত হইবে। আমি আমার ক্ষুদ্র জীবনে শক্তি কিছু যদি সঞ্চয় করিয়া থাকি, তাহা শুধু এই উপায়েই করিয়াছি।'

'অত্যাচার দেখিয়াও যে ব্যক্তি তাহা নিবারণ করিবার চেষ্টা করে না, সে নিজের মনুষ্যত্বের অপমান করে এবং অত্যাচারিত ব্যক্তির মনুষ্যত্বেরও অপমান করে। যে ব্যক্তি অত্যাচার নিবারণের প্রচেষ্টায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বিপন্ন হয়, কারারুদ্ধ হয় অথবা লাঞ্ছিত হয় সে এই ত্যাগ ও সাধনার ভিতর দিয়া মনুষ্যত্বের গৌরবের আসন প্রাপ্ত হয়।'

শান্তিনিকেতনের "৭ই পৌষের মেলা" সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কিছু জানেন। তা' হলেও কিছু কথা অজানিত থেকে গেছে। সেই অজানিত কথা—যা পুরণো হলেও চির নূতন, তাই আমরা আবার পাঠকদের সামনে তুলে ধরলেম।

—সম্পাদক

"৭ই পৌষের মেলা"

ডক্টর কালিদাস নাগ

পূর্ণ-ভারতীয় পৌষসংখ্যায় জনসাধারণকে জানানো দরকার কেন তীড় করে এত লোক পৌষ মেলায় বোলপুর যায়। ১৮৪৩ সনের ২১।২৩ ডিসেম্বর পড়ে ৭ই পৌষ; সেই পুণ্যদিনে রবীন্দ্র নাথের পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৮১৭—১৯০৬] রামমোহন—প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন; তারপর পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাতে শেষ-যাত্রা করেন; তারপর লণ্ডনে ১৮৪৬ সনে হঠাৎ মারা যান। ১৮৪৩ থেকে ১৮৪৮ পর্যন্ত অর্থাৎ পুরো পাঁচবছর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহন সম্পাদিত [১৮৪৮] উপনিষদগুলি পাঠ করে, শেষে ১৮৫৪ সনে ব্রাহ্মধর্ম নামক অপূর্ব গ্রন্থ সংকলন শেষ করে ছেপেছেন। তারমধ্যে মূল বৈদিক মন্ত্রগুলি লাল অক্ষরে এবং তার বঙ্গানুবাদ কালো কালিতে ছাপা। সেই অধুনা দুষ্প্রাপ্য সংস্করণ আমার কাছেই ছিল [খোয়া গেছে] এবং রবীন্দ্রনাথের কাছেও দেখেছি যখন ১৯১১ সনে তার ৫০তম জন্মোৎসবে প্রথম শান্তিনিকেতনে যাই। পঞ্চাশ বছর হয়ে গেল ভেবেই মনে পড়ল তারও দশ বছর আগে [১৯০১] মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় বা ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর সঙ্গে কোটেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় [১৮৬১—১৯০৬] যিনি রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকবি সম্বোধন প্রথম করে ছিলেন। ঠাকুর জমিদারীর জ্ঞানানন্দ রায় ও পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে ছিলেন। তাঁদের ১৯১১ সনের উৎসবে দেখেছি; কিন্তু অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেনকে [কাব্য-গ্রন্থের সম্পাদক] দেখিনি; তাঁর আত্মীয় অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেনকে দেখেছি ও Presidency College-এ তাঁর সহকর্মী অধ্যাপক পদার্থবিদ্ কবি সুরেন মৈত্রকেও গল্প করতে দেখেছি কত কঠিন সমস্যার [অর্থ-সমস্যা কম নয়]। সেই প্রথম দশকে [১৯০১ থেকে ১৯১১] রবীন্দ্রনাথ স্কুল চালিয়ে গেছেন। সেই সংগ্রামের মধ্যে গড়ে ওঠা শান্তিনিকেতন যেন আমরা ভুলে না যাই। পিতার সঙ্গে প্রথম হিমালয় যাত্রার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ, ১৮৭৩ সনে নগণ্য গ্রাম বোলপুরে হাজির হন। তাদের মাহিতে যেরা "ভুবন ডাঙার" বাঁধ পেরিয়ে ১১ বছরের কবি 'বৈশব সঙ্গীত'-এর সূচনা এখানেই করেন।

সে যুগের রচনা অচলিত সংগ্রহে ছাপা হলেও অনেকে জানেন না যে স্বেচ্ছায় তাঁর কোনও বাধা আদি ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় [১৮৪৩—১৯২৩] রবীন্দ্রনাথের নাম না দিয়ে—" "বাদশ বৎসর বয়স্ক এক বালকের রচনা" বলে 'অভিলাষ' ও 'প্রকৃতির খেদ' ছাপেন [এ বিষয়ে প্রবাসীতে আমি লিখেছি]। বোলপুর স্টেশন থেকে দেড় মাইল দূরে ২০ বিঘা মাত্র জমি কিনে দেবেন্দ্রনাথ একখানি বাড়ি করে নাম দেন "শান্তিনিকেতন"। ১৮৭৭ সনে তাঁর ৭০ বৎসরে পীড়িত হয়ে তিনি উদ্বেগের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ [১৮৪০—১৯২৬] ও কনিষ্ঠপুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথাদির নাম দিয়ে পাকা দলিল "ট্রাস্ট পত্র" সই করে যান [৮ মার্চ, ১৮৮৮]।

সেই তেপান্তরের মাঠে শুধু একটি পাকা বাড়ি তথা অতিথিশালা [বিনা খরচে তিনদিন থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থাও হয়েছিল] গড়ে ওঠে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথই সেই বাড়ীর কাছে ব্রহ্মমন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেন; তাঁর শিল্পী-নাতি অবনীন্দ্রনাথকে পরিকল্পনার কাজে বোলপুর পাঠান। ১৮৯৭ সালে তাঁর ৮০ বর্ষ পূর্তির আগে বহু সাধক সেই অতিথিশালার থেকে ছাতিমতলার বেদীর কাছে বসে 'প্রাণের আরাম' পেয়েছিলেন—যেমন গান মহর্ষি নিজেও এই উদার প্রান্তরে।

১৯০১ সনে ৪০ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে শিলাইদা ছেড়ে শান্তিনিকেতনে বাস শুরু করলেন। 'নৈবেদ্য' 'খেয়া' ও গীতাঞ্জলির অধিকাংশ রচনা এই শান্তিনিকেতনে। ৭ই পৌষ দীক্ষা দিনের উপাসনার মাঝে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে জনসাধারণের মেলাটি ক্রমশ: বড় হয়ে উঠলো। যাত্রা, কীর্তন, বাউল গান থেকে শুরু করে গ্রামের ছেলেদের খেলা কুচকাওয়াজ এমনকি সাঁওতাল গ্রামবাসী সর্দারদের তীর সন্ধান ও পুরস্কার বিতরণ সব আমরাও ৪০ বছর আগে দেখেছি। আমরা এখানে থেকে সেখানে শুরু কবি জয়দেবের সাধনাপীঠ কেন্দুলীর মেলা দেখেছি। সেখানে শিল্পাচার্য নন্দলাল ও তাঁর দলে শুধু ছবেন কর নন, প্রতিমা দেবীও ছাত্রীদের নিয়ে কেন্দুলী মেলা দেখে এসেছেন। বীরভূমের জয়দেব কবিকে কতকাল স্মরণ করে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ। আর তাঁর ছন্দ-সাহিত্যে কতই না মুগ্ধ ছিলেন তিনি। তাই আশা রাখি যে জয়দেব-মেলার মত রবীন্দ্র-মেলাও সহস্রাধিক বৎসর ধরে জাতির প্রাণে প্রেরণা দেবে। রবীন্দ্র-সঙ্গীত যেমন শান্তিনিকেতন থেকে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে, তেমনি রবীন্দ্র-সাহিত্য ও তার ভাবধারা প্রবাহিত হবে—শুধু শহরে ও বৈঠকে নয়—গ্রামে গ্রামান্তরে। সেই আশা করেছিলেন মহাত্মাজীও; তাই ১৯১৫ সনে প্রথম বোলপুরে পদার্পণ করার পর ১৯৪০ পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে কতবার গান্ধীজী এসেছেন ও তার ভবিষ্যৎ দায়িত্ব নিয়ে ভেবেছেন। গ্রামছাড়া ওই রাঙামাটির পথ বাউলের সুরে মুগ্ধ করেছে দেশ-বিদেশের মানুষকে।

আউল-বাউলদের গান ও সাধন-ধারা অনুসরণ করে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বসেই 'মানুষের ধর্ম' [Religion of man] প্রভৃতি অমূল্য রচনা লিখে, শুধু বাংলা নয়, বিশ্বসাহিত্যকেও পরিপুষ্ট করেছেন। প্রথম শতাব্দী উৎসবের হিড়িকে এসব ভাববার সময় মেলেনি; দ্বিতীয় শতকে মহামানব রবীন্দ্রনাথকে হয়তো চিনতে পারা যাবে। 'গানের বনে ক্যাপা হাওয়া' আমাদের মনকে যেমন মাতিয়েছিল তেমনি অন্যান্য নরনারীদেরও ভবিষ্যতে মাতাবে, যদি ইট-কাঠের ইমারত ছাড়িয়ে কবিগুরুর মতো 'বনবাণী' শুনতে না ভুলি এবং কঠিন মাটির তলার জীবও শিকড় ও প্রাণের বীজকেই যদি আমরা ভালবাসি। রবীন্দ্রনাথ শাশ্বত জীবন-যাত্রার কবি, তাই তাঁর গ্রামের বাউলেরই মতো চিরন্তন মানবে অতি সরল কথায় তিনি বলে গেছেন হয়তো কোনও বৈরাগীর গান শুনে, পৌষ মেলায় কবিগুরু গেয়ে গেছেন—

"ও আমার মন যখন জাগলি নারে
তোর মনের মানুষ এল দ্বারে।
তার চলে যাবার শব্দ শুনে
তাঙ্গল রে ঘুম
ও তোর ভাঙ্গল রে ঘুম অন্ধকারে"।

বনমালকন্যা

উপন্যাস

অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত

[পূর্বকথা : সরসিজ মজুমদারের মেয়ে বনছায়া। বাপ বড়লোক হওয়া সত্ত্বেও বনছায়া চাকরি করে, গল্প উপন্যাস লেখে। বড় সাহিত্যিক হবার স্বপ্ন দেখে। কখনও বা ভাবে জার্নালিস্ট হই যেহেতু আজকাল সাহিত্যের চেয়ে জার্নালিজমেই বেশি গ্ল্যামার। সম্পাদক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক অনেকের সঙ্গেই দহরম-মহরম করে। সুবীর নামে এক আধুনিক কবিকে ভালোবাসে। যে কিনা বড়লোকের মেয়ে সরিৎকে ভালোবাসতে পারে, ভালোবাসতে পারলেও বিয়ে করতে পারে, এমন প্রবাদে বিশ্বাস করে না। বনছায়া যেমন কবিকে ভালোবাসে তেমনি এক ঔপন্যাসিককেও ভালোবাসে। তার নাম সন্দীপ সেন। কিন্তু সুবীর যদি সমুদ্রের মত উত্তাল, সন্দীপ পাহাড়ের মতই ধীরস্থির। সন্দীপও দুঃস্থ কিন্তু আদর্শনিষ্ঠ। দারিদ্র্য যেন তার আদর্শকে ম্লান করতে না পারে সে সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ। সরসিজ মেয়ের জন্যে হিমাংশু ঘোষ নামে এক কৃতী এঞ্জিনিয়র ঠিক করেছে, কিন্তু বনছায়া তাকে বিয়ে করতে রাজি নয়। তাকে রক্ষা করতে কে এগিয়ে আসবে? সন্দীপ না সুবীর? না, বনছায়া শেষ পর্যন্ত হিমাংশুকেই বরণ করবে? হিমাংশুর বন্ধু আর মুরুব্বি দেবজ্যোতি ভৌমিক, যে অফিসে বনছায়ার বস্, তার দৃষ্টিও না কোন বনছায়ার দিকে। বনছায়া প্রেমের জন্যে কেরিয়র মাটি করবে, না কেরিয়রের জন্যে প্রেম?

অতঃপর সরসিজের বাড়িতে টি-পার্টিতে নিমন্ত্রিত হল হিমাংশু। বনছায়াকে পাত্রী হিসাবে মনোনীত করল। তার ফার্মে অনেক চাকরি আছে—বনছায়া চাইল সুবীরকে সুপারিশ করতে। সে সুপারিশ গ্রহণ করল হিমাংশু, সুবীরকে চাকরি দিল। সুবীর ভাবতেই পারেনি এমন অঘটন ঘটতে পারে। আর সুবীরের চাকরি হবার পর তার সঙ্গে বিয়ের নোটিশ দিল বনছায়া। এ ব্যাপারে হিমাংশু অন্ধকারে। হিমাংশুর সঙ্গে বিয়ের তারিখটা পিছিয়ে দিতে পারলেই নোটিশের মেয়াদ অন্তে সুবীরের সঙ্গে বিয়েটা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হতে পারে। সেই মতলবে হিমাংশুর কাছ থেকে মিথ্যা ওজুহাতে বিয়ের তারিখটা পিছিয়ে নিল বনছায়া। সরসিজবাবু জানলেন হিমাংশুর নিজের সুবিধের জন্যেই তারিখটা লম্বা করছে। এখন বনছায়ার ভয় তার আগেই সুবীরের সঙ্গে তার বিয়ের দলিলটা পাকা করতে পারবে কিনা।

সুবীরের সঙ্গে বনছায়ার বিয়ে নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হল। কিন্তু প্রথম মিলনক্ষণেই মনে হল যেমনটি চেয়েছিল তার চেয়ে কিছু কম পড়ল। আরো কম পড়ল যখন সরসিজবাবু এ ব্যাপারে উদ্ভ্রান্ত হয়ে গেলেন। বনছায়া বুঝল পিতৃগৃহ ত্যাগ না করলে বাবা শান্ত হবেন না। একটা সুটকেস আর বিছানা নিয়ে বনছায়া বাপের বাড়ি ছেড়ে সুবীরের ঘরে গিয়ে উঠল।

যাবার আগে ছোটবৌদি শাশুড়ীর সিঁদুর কৌটো থেকে সিঁদুর নিয়ে সিঁথিতে ঘন করে রেখা টানল—সকলকে জানাবার জন্যে যে সে জয়ী, সে সুখী।

সুবীরের কবি-বন্ধুরা ঠিক করল এ বিয়ে-উপলক্ষে সম্পাদক শ্রীযুত হস্তের বাড়ির ছাদে একটা পার্টি হবে। স্বামীর ঘরে নির্জনে বসে বনছায়া যখন সাজছে তখন দরজায় হিমাংশুর টোকা পড়ল। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল বনছায়া, দরজা খোলে কি না খোলে। কিন্তু স্পষ্ট করে কিছু স্থির করবার আগেই দরজা খুলে দিল।

হিমাংশু ঘরে ঢুকে দেখল এক-ঘরের ফ্ল্যাটে রূপিতা মেয়েটা সুখে সৌভাগ্যে একেশ্বরীর মত বিরাজ করছে। ভাবছে তার এই অহঙ্কারটা চূর্ণ করা যায় কী করে? সে গেল বনছায়ার বস্ দেবজ্যোতি ভৌমিকের কাছে নালিশ করতে। দেবজ্যোতি বললে, সুবীরকে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিন। আর হিমাংশু বললে, বনছায়ার কাপটোরও শাসন হওয়া উচিত। দেবজ্যোতি দায় দিল। বললে, দেখি, ভাবি, কী করা যায়।

আসলে দেবজ্যোতি বনছায়ার মাইনে পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দিল। বনছায়া যে প্রেমের যুদ্ধে জয়ী হয়েছে, কৃতী ও বড়লোক বলে হিমাংশুতে আটকে হয়নি, এ যেন তারই পুরস্কার। কিন্তু সুবীরের মুখে এ মাইনে-বাড়ার খবর পেয়ে হিমাংশু ক্রুদ্ধ হল। সুবীর ভেবে পেল না এ প্রতিক্রিয়ার অর্থ কী।

হিমাংশু নানা প্রশ্নে জেনে নিল একটা ছোট ঘরে সুবীর আর বনছায়া কেমন সুখে দিন কাটাচ্ছে। সঙ্গে সান্নিধ্যে তাদের সন্ধ্যাগুলি কী রমণীয়। স্বামীর মাইনে কম স্ত্রীর মাইনে বেশি এ তাদের কাছে কোনো সমস্যা নয়। হিমাংশু চাইল তাদের মধ্যে বিরোধের ছুরি চালাতে। শত্রুতাতেই এখন তার শান্তি। আর শত্রুতার মহত্ত্ব সূক্ষ্মতম কারুকার্যে —অশ্বত্থামা হত ইতি গজে।

হিমাংশু সুবীরের জন্যে অফিসে ওভারটাইমের ব্যবস্থা করলে। টাকা রোজগার বেশি হবে বুঝে সুবীর তাতে আনন্দিত হল। আর এদিকে বনছায়ার সন্ধ্যাগুলি নিঃসঙ্গ হয়ে উঠল। হিমাংশুই তার রঙিন মদির সুন্দর সন্ধ্যাগুলি নিল হরণ করে। আবার দেবজ্যোতি বনছায়ার জন্যে একটা বাড়ি দেখে দিল বলে হিমাংশুও সুবীরের জন্যে আরেকটা দেখে দিল। সেটা তুলনায় খারাপ হলেও সুবীর রাজি হল সেটাই তার কোয়ার্টার, সেখানেই বনছায়াকে যেতে হবে। সুবীর যেমন তার বস্-এর হুকুম মানে, বনছায়াও তেমনি সুবীরের কথা মানা উচিত।

বনছায়া সুবীরের কথা মেনে সুবীরের মনোনীত বাড়িতেই সংসার পাতল। সুবীরের অফিস থেকে অভিরামকে পাঠানো হল কাজ করার জন্য। কিন্তু নিঃসঙ্গতার নির্যাতন থেকে রেহাই পেল না বনছায়া। ভাবল কোথাও গিয়ে ছদিন ঘুরে আসে। সন্দীপের কথা মনে পড়ল। সন্দীপের কাছে গিয়ে বসল বনছায়া। সে উপন্যাস রচনায় রত। মনে হল বনছায়ার উপস্থিতি থেকেও সাহিত্যই বুঝি তার প্রিয়তর—তাতে না থাক টাকা না থাক নাম-যশ বনছায়ার যে বিয়ে হয়ে গেছে এতেও যেন তার ভালোবাসার কোনো ক্ষতি নেই। বাড়ি ফিরে এসে দেখল সুবীর লিখছে। কিন্তু কবিতা নয়, অফিসের রিপোর্টের খসড়া

অনুবাদ। তারপর থেকে রোজ সন্ধ্যায়ই বনছায়া বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় একা একা। ওভারটাইম করে সুবীর কতক্ষণে ফিরবে তার প্রতীক্ষা করে না।

বনছায়াকে বাইরে বেরনো থেকে নিরস্ত করবার অভিসন্ধিতে সুবীর তার সঙ্গ নিতে চাইল, নিতে চাইল হিমাংশুর বাড়ি। বনছায়া গেল না। একদিন হিমাংশুই সুবীরের ফ্ল্যাটে এসে হাজির। বনছায়া ঘরে নেই, সুবীর গেল চা দিতে। হিমাংশু নিল না, বললে, বনছায়া নিজে যেদিন চা করে দেবে সেদিন যাবে। বনছায়া ফিরে এলে সুবীর তাকে শাসন করতে চাইল আর বনছায়ার মধ্যে ভয় ঢুকল একা বাড়িতে হিমাংশুই না একদিন আক্রমণে উদ্যত হয়ে আবির্ভূত হয়। তাই কদিন পর সুবীর যখন বনছায়াকে ঘুমের মধ্যে আবদ্ধ করতে চাইল তখন দুঃস্বপ্নের মধ্য থেকে ভুল করে বনছায়া চেঁচিয়ে উঠল এ কী অন্যায়! ছি ছি ছাড়ুন ছাড়ুন—

অফিসের পার্টিতে বস-এর পাল্লায় পড়ে সুবীর মদ খেল। সেই থেকে সে নেশা তাকে পেয়ে বসল। বনছায়াকেও সে শেখাল মদ খেতে। একটা কুৎসিত সন্দেহ থেকে মুক্ত হবার জন্যেই বনছায়া স্বামীর প্রস্তাবে সম্মত হল। কিন্তু সুবীর আর নিজের সর্ত পালন করল না। বিরোধ ঘুণায়িত হল।

তারপর বিরোধের মধ্যে বনছায়া আবিষ্কার করল সে মা হতে চলেছে। তার পেটে সুবীরের সন্তান।

বনছায়া অনুভব করল এ সন্তান আনন্দের অভিজ্ঞান নয়, শুধু যাতনার পরিণতি। পরাভবের অপমানের প্রতীক। বনছায়া ডাক্তার অরবিন্দের কাছে গেল, পেটের সন্তানকে নষ্ট করবে। অরবিন্দ যখন জানল এ সন্তান বৈধ, তখন প্রস্তাবে রাজি হল না। তখন কুমারী সেজে সন্তানকে অবৈধ বলে বুঝিয়ে বনছায়া গেল আরেক ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার কমলেশ তার কি বাবদ এমন এক জিনিস দাবি করল যাতে সে রাজি হতে পারল না।

দেবাংশুর পার্টিতে হিমাংশু বেশি করে মদ খাইয়ে সুবীরকে মাতাল করে দিল। বাড়িতে পৌঁছে দেবার জন্যে গাড়ি ও তাতে একটি নারীর ব্যবস্থা করলে। নারীর নাম লাবণি, তাকে বলে দিল যেন সুবীরকে একেবারে তারস্বীর কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। যাতে বনছায়া বুঝতে পারে সুবীর কতদূর নেমে গিয়েছে। যখন সুবীর বাড়ি ফেরে, দেখতে পায় সন্দীপ সেন এসেছে আর বনছায়া তাকে তার উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পড়ে শোনাচ্ছে। নিজে ধরা পড়ে যাবার ভয়ে চটে গিয়ে সুবীর সন্দীপের উপর প্রতিশোধ নেয়, তাকে গালাগাল দিয়ে তাড়িয়ে দেয় বাড়ি থেকে।

সুবীর বনছায়ার কাছে দুঃখ প্রকাশ করে বিরোধ মিটিয়ে নিল। সন্দীপের কাছে ক্ষমা চাইতে রাজি হল, বললে, তাকে একদিন বাড়িতে ডেকে নিয়ে এস। বনছায়াকে অনুরোধ করল হিমাংশুকে ধরে তাকে বম্বেতে উচ্চতর পদে বদলি করিয়ে দিতে। বনছায়া রাজি হল না। অথচ সন্দীপকে নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে তার আলিঙ্গনে ধরা দিল।

সন্দীপের অন্তর্লোকে দ্বন্দ্ব শুরু হল—শিল্পীর পক্ষে এমন কোনো আকর্ষণে লিপ্ত হওয়া

উচিত নয় যাতে তার সৃষ্টির শান্তি নষ্ট হতে পারে। কিন্তু কার্যতঃ সে উদাসীন থাকতে পারল না। বনছায়ার বাড়ি গেল তার উপন্যাসের বাকি অংশ শুনে আসতে। ঈর্ষায় রুদ্ধ হয়ে সুবীর সে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল আর সেই টুকরোগুলি কুড়িয়ে নিয়ে চলে গেল সন্দীপ।

ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঘরের বাঁটোয়ারা হয়ে গেল—এক ঘরে সুবীর, অন্য ঘরে বনছায়া। সুবীর তার ঘরে একটা ল্যাব বসাল যাতে বনছায়ার সাহিত্য-সাধনা বিপর্যস্ত হয়ে যায়। লেখার জন্যে নিরিবিলি জায়গা খুঁজতে বনছায়া সন্দীপেরই দ্বারস্থ হল। দেখল সন্দীপ যত্নে তার পাণ্ডুলিপির ছেঁড়া টুকরোগুলি একটা খাতার পৃষ্ঠায় সেঁটে সেঁটে উপন্যাসের পুনরুদ্ধার ঘটিয়েছে। বনছায়া ঠিক করল সন্দীপের বাড়িতে বসে বইটার একটা নকল তৈরি করবে।

সন্দীপের বাড়িতে বসে উপন্যাস নকল করল বনছায়া। প্রবাহের সম্পাদক পীযূষ দত্তের সঙ্গে হোটেলে দেখা করবে বলে টেলিফোনে নিমন্ত্রণ করে পাঠাল। তুমি মদ খাবে? জিজ্ঞেস করল পীযূষ। বনছায়া বললে, আমি খেতে শিখে গিয়েছি।

বনছায়া পীযূষের সঙ্গে হোটেলে মদ খেল, এক ট্যাক্সিতে বেড়াল। তার উপন্যাস 'অবন্ধনা' 'প্রবাহ' পত্রিকার জন্যে মনোনীত হল। তারপর মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরলে সুবীর গর্জে উঠল: তুমি মদ খেয়েছ? বনছায়া বললে, তুমিই তো শিখিয়েছ মদ খেতে।

বনছায়ার উপন্যাসের প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হতেই পাঠকমহলে সাড়া পড়ল। কিন্তু সুবীর খুশি হতে পারল না। জানতে চাইল কোথায় বসে সে নতুন করে লিখেছে এবং কী উপায়ে বাগিয়েছে পীযূষ দত্তকে। বনছায়া বললে, অফিসে বসেই লিখেছে, আর যেহেতু পীযূষ দত্তের রুচি কিছু মোটা, তদবিরটা সে মোটা করেই করেছে। রাগে 'প্রবাহে'র কপি ছিঁড়ে ফেলল সুবীর আর তার অক্ষম ঈর্ষাকে ব্যঙ্গ করল বনছায়া। লেখাটা পড়ে হিমাংশু খুব উত্তেজিত হল। সুবীরকে ডাকিয়ে বলল, এ অশ্লীল লেখা বন্ধ করে দিন। শেষকালে আপনার নামের সঙ্গে জড়িয়ে আমার কার্মের না বদনাম হয়।

অফিসে বনছায়া অসুস্থ হয়ে পড়লে জ্যোতি তাকে নিউডন নার্সিং হোমে পাঠিয়ে দিলে। জ্যোতি বনছায়ার বাপের বাড়িতে খবর দিলে, খবর দিলে হিমাংশুকে। হিমাংশু সুবীরকে খবর দিল। সুবীর উদাসীন রইল। তার বিতৃষ্ণার কারণ পীযূষ দত্তের কাছে গিয়েছিল 'অবন্ধনা'র প্রকাশ বন্ধ করে দিতে, আর পীযূষ তাতে রাজি হয়নি যেহেতু বনছায়ার মতে স্বামী ও সংসারের চেয়েও তার আর্ট বড়। এই নিয়ে সুবীরের সঙ্গে বনছায়ার আবার ঝগড়া হয় আর সুবীর তাকে তার আর্টের গুরু সন্দীপ সেনের কাছে চলে যেতে বলে। নার্সিং হোমে হিমাংশু গিয়ে শোনে বনছায়ার অপারেশন হয়েছে কিন্তু গর্ভের সন্তান বেঁচে নেই।

নার্সিং হোমে অপারেশনের আগে ডাক্তারকে বনছায়া অনুরোধ করল যেন তাকে আর সন্তানধারণ করতে না হয়। ডাক্তার সেই রকম ছুরি চালাল। নার্সিং হোমে যতদিন ছিল বনছায়ার কোনো খোঁজ নেয়নি সুবীর। সন্দীপই সব দেখাশোনা করেছে। তারপর যখন ছুটি পেল বনছায়া সন্দীপের সঙ্গে সন্দীপের বাড়িতে গিয়েই উঠল।

বনছায়া সন্দীপ সেনের বাড়িতে গিয়ে উঠেছে এ খবর পেয়ে হিমাংশু দারুণ ক্রুদ্ধ হল। প্রতিশোধ নেবার জন্যে সুবীরকে উত্তেজিত করতে লাগল। বললে আপাতত ডিভোর্সের মামলা করতে। ওদিকে লাবণি সুবীরের প্রতি প্রেমমুগ্ধ হল, চাইল গৃহিণী হতে। সেই স্বার্থেও তো বনছায়ার সঙ্গে বিবাহের বিচ্ছেদ দরকার। সুবীর গেল উকিলের পরামর্শ নিতে।

সুবীর বিচ্ছেদেরই মামলা করবে ঠিক হল। হিমাংশু অভিরামকে ডাকল সেই মামলায় বনছায়ার বিরুদ্ধে ব্যভিচারের সাক্ষী হতে। অভিরাম রাজি হল না। মামলার কথা সন্দীপ বনছায়াকে জানাল। এ মামলায় সুবীর ডিক্রি পেলেই তো সন্দীপের সঙ্গে বনছায়ার মিলন সুগম হবে। কিন্তু বনছায়া বললে, মামলা সে কনটেস্ট করবে।

সুবীরের মামলায় অভিরাম সাক্ষ্য দিতে রাজি হল না বলে অভিরামের চাকরি গেল। অভিরাম বনছায়ার কাছে কেঁদে পড়ল, বনছায়া যদি বোস সাহেবকে তার জন্যে একটু সুপারিশ করে ও তার চাকরিটা সে আবার ফিরে পায়। বনছায়া হিমাংশুকে ফোন করল। বনছায়ার অনুরোধে হিমাংশু অভিরামকে ফের চাকরি দিতে রাজি হল। হিমাংশু ভেবেছিল ধন্যবাদ জানিয়ে বনছায়া বুঝি আবার খোঁজ করবে, কিংবা জানাবে তার বর্তমান সমস্যার কথা। বনছায়া স্তব্ধ হয়ে রইল—একা ঘরে বসল মদ খেতে। আর তাই দেখে সন্দীপ তার কাছে বসল না, চলে গেল উপরে।

লাবণিকে হিমাংশু প্ররোচিত করল সুবীরকে দিয়ে ডিভোর্সের মামলা করতে। এদিকে ঠিক করল বনছায়ার বই 'অবন্ধনা' সে ফিল্ম করবে। ডিরেক্টর সবীর সাহাকে পাঠাল চুক্তি করতে। ঠিক হল বনছায়ার সঙ্গে পরামর্শ করে সিনারিয়ো লিখতে হবে। পরামর্শ করবে কে? পরামর্শ করবে প্রডিউসার হিমাংশু বোস।]

ছত্রিশ

'এমনি ভাবে আর চলতে পারে না।' ঘুলো-ওড়ানো এক ঝলক তপ্ত হাওয়ার মত ঘরে ঢুকল লাবণি।

অফিস-ফেরত চা-পর্ব সেরে ঘরে বসে মুক্ত মনে সিগারেট টানছিল সুবীর, হকচকিয়ে উঠল। জিজ্ঞেস করল, 'কেন, কী হল?'

'কী আবার হবে! কিছুই হল না।' চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসল লাবণি।

'কিছুই হল না বোলো না।' ছ চোখে মণিময়ূর ইঙ্গিত পুরে তাকাল সুবীর। বললে, 'কিছু-কিছু হয়েছে।'

'না, কিছুই হয়নি। যত সব বাজে কথা।' লাবণি ঝলক দিয়ে উঠল।

'অন্তত ভালোবাসা তো হয়েছে।' এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল সুবীর।

'কিন্তু আসল জিনিস কই?'

'আসল জিনিস? ভালোবাসার চেয়েও আসল কিছু আছে নাকি?'

'নিশ্চয়ই আছে। সে হচ্ছে বিয়ে।' লাবণির স্বরে ধার ফুটল : 'তুমি তার কী ব্যবস্থা করছ?'

'ব্যবস্থা!' আবার ঠোঁটের কুণ্ডলী পাকাল সুবীর। গলায় আদর ঢেলে বললে, 'এই তো সুন্দর ব্যবস্থা! আমি ও অরুমিত।'

'তার মানে?' লাবণি প্রায় আর্তনাদ করে উঠল : 'আমাদের বিয়ে হবে না।'

'হবেনা কী! আমাদের বিয়ে তো হয়ে গিয়েছে।' লাবণিকে কাছে টানবার জন্যে হাত বাড়াল সুবীর।

সুবীরের হাত ঠেলে দিয়ে লাবণি বললে, 'বিয়ে হয়ে গিয়েছে তো ডকুমেন্ট কই?'

'ডকুমেন্ট? ডকুমেন্ট দিয়ে কী হবে?'

'ডকুমেন্ট সকলকে দেখাব, নতুন করে পরিচিত হব, সম্মানিত হব।' একটু বুঝি বা গর্বের চেউ তুলল লাবণি : 'ডকুমেন্টই তো আমার দাঁড়াবার গ্রাউণ্ড, আমার আনন্দবাজের ছাড়পত্র।'

'কিন্তু দেখাবে—কাকে দেখাবে?'

'প্রথমত বাড়িতে দেখাব, বাবা-মাকে দেখাব। দেখাব আমার ছুটি মিলে গিয়েছে আমি এখন অন্য ঘরের ঘরনী, আমার আর তোমাদের ভরণপোষণ করার দায় নেই। নইলে, ভাবো, দাদা বিয়ে করতে পারবে, আমি পারব না! কী বিচার! দাদা অন্যত্র ফ্ল্যাট নিয়ে বাসা বাঁধতে পারবে, আমিই আমার নিজের ঘর খুঁজে নিতে পারব না! একটা ডকুমেন্ট পেলে আমি এক্ষুনি বাড়ির সম্পর্ক ছিন্ন করে বেরিয়ে আসি এখানে, আমার নিজের সংসারে। দাদার সংসারকে কলা দেখাই।'

সুবীর বুঝল দাদার সঙ্গে কোনো সংঘর্ষে ছোট বোন লাবণির অভিমান হয়েছে, তারই জন্যে এই বিক্ষোভ। সেই সব ঘরোয়া বিষয়ে সুবীরের কোনো কৌতূহল নেই। ডকুমেন্ট বলতে যে বিয়ে রেজেস্ট্রীর দলিল ইঙ্গিত করছে এ বুঝতে তার অসুবিধে হচ্ছে না, কিন্তু দেখাবার এই আশু প্রয়োজনটা আসে কোত্থেকে?

'দ্বিতীয়ত, আর কাকে দেখাবে?' সুবীর তাকাল স্থির চোখে।

'তোমার বন্ধু হিমাংশু বোসকে দেখাব।'

'মিস্টার বোসকে?' খাড়া হয়ে উঠে বসল সুবীর।

'হ্যাঁ, হিমাংশু বোসকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। ও ভেবেছে আমি চিরদিন কেবল পথেই তাকব, কোথাও স্থিতি পাব না, সংসার পাব না। আমি যে ভালোবাসতে পারি, ভালোবাসা পেতে পারি এ ওর ধারণার বাইরে।' আবেগে উজ্জ্বল হয়ে উঠল লাবণি : 'আমি ওকে দেখাব, আমি শুধু ভালোবাসতেই পারি না, ভালোবেসে একেবারে নতুন হয়ে যেতে পারি।'

লাবণির মুখের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল সুবীর। লাবণি এত কথা শিখল কোত্থেকে? না কি ভালোবাসা আসলে সে-ই সব কথা শিখিয়ে দেয়?

'নিশ্চয়, ভালোবাসাই অসাধ্যসাধক। কিন্তু আমি ভাবছি,' সুবীর ঈষৎ করে একটু হাসল : 'তোমাকে বিয়ে করলে মিস্টার বোস না ক্ষুণ্ণ হন?'

'কেন, সে ক্ষুণ্ণ হবে কেন?' বলসে উঠল লাবণি।

'শত হলেও তার মনোনীতাকে কেড়ে নিলাম।'

'খবরদার, অমন কথা বোলো না। মনোনীতা না হাতি! তার যদি মনোনীতাই হতাম তবে সে আমাকে বিয়ে করলনা কেন?'

'তাহলে আমি কি মিস্টার বোস-এর পরিত্যাক্তাকে বিয়ে করছি?'

বিদ্রূপে কোথায় ঝিলকিয়ে উঠবে, তা নয়, ঘন অভিমানে লাবণির মুখ কালো হয়ে উঠল: 'ছি, তোমার কাছে আমার এই মূল্য! তবে তুমি কি আমার কাছে বনছায়ার পরিত্যক্ত পুরুষ ছাড়া আর কিছু নও?'

সুবীর বুঝল লাবণিকে সে প্রত্যক্ষে আঘাত দিয়ে বসেছে। এখন তার উপশম দরকার। তাই কণ্ঠস্বরে স্নেহ ঢেলে বললে, 'না, না, আমরা নিজের-নিজের ব্যক্তিত্বে স্বতন্ত্র। নিজের-নিজের ভালোবাসায়। আমি লাবণির প্রেমিক, তুমি সুবীরের প্রেয়সী। মিস্টার বোস যে তোমাকে বিয়ে করতে চায়নি তার কারণ, ঘৃণা—স্রেফ ঘৃণা—'

'তুমি ঠিক বলেছ। আমি গরিব, আমি উদ্বাস্তু, আমার কোনো বনেদ নেই চালচুলো নেই, তাই আমাকে সে কোনো মূল্য দিল না। কিন্তু আমি তোমাকে পেয়েছি.' লাবণি অভিমান ভুলে সুবীরের গায়ের কাছে উথলে উঠল: 'তোমার ভালবাসা পেয়েছি, তাই এবার আমি তার অপমানের প্রতিশোধ নেব। তোমার পাশে সিংহাসনে বসে একে দেখাব আমি রাণীর মত মূল্যবান।'

'তাই আমাদের বিয়েতে ও ক্ষুব্ধ হোক কি ক্রুদ্ধ হোক, আমাদের কিছু যায় আসে না।' লাবণির মুখটা নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে সুবীর গদ্‌গদভাবে বললে, 'আমরা আমার আমাদের ভালোবাসাকে আবিষ্কার করতে পেরেছি, এতেই আমরা পরিপূর্ণ।'

'যে ভালোবাসা পায় না, নিজেও পারে না ভালোবাসতে, দুনিয়ার সেই গরিব, সেই উদ্বাস্তু—' লাবণিও তার কণ্ঠস্বরে গভীরতা আনল।

'চলো একটু ঘুরে আসি।'

'চলো।' কিন্তু পথের উদ্বাসতায় এই গভীর সুরটা পাছে উড়ে যায় তাই লাবণি সেটাকে স্পষ্ট কথায় বেঁধে রাখতে চাইল। জিজ্ঞেস করল: 'তা হলে মামলাটা কবে ফাইল করছ?'

'মামলা? কিসের মামলা?' যেন প্রায় চমকে উঠল সুবীর।

'বোকার মত মুখ করছ কী! বিচ্ছেদের মামলা। বিচ্ছেদ না পেলে আমাদের বিয়েটা বৈধ হবে কী করে?'

মামলা করা—বিচ্ছেদের ডিক্রি পাওয়া—তারপর বিয়ে করা—লাবণিকে বিয়ে করা—সব যেন এক নিশ্বাসের ব্যাপার—তেমনি সহজ আনন্দে হো-হো করে হেসে উঠল সুবীর। বললে, 'তাই বলো। আমি ভাবছিলাম তোমার-আমার মধ্যে বুঝি একটা মামলা হঠাৎ গজিয়ে উঠল। বিচ্ছেদের ব্যাপারটা তো একটা মামুলি পিটিশন মাত্র। কোর্টে গিয়ে দাঁড়াব আর দেখতে দেখতে ডিক্রি হয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ, সেই পিটিশনই ফাইল করছ কবে?'

'আমি কালই উকিলের কাছে যাব আর ধরো দিন সাতেকের মধ্যেই পিটিশন ফাইল হবে।'

'কথা দিচ্ছ?'

'নিশ্চয়ই কথা দিচ্ছি। শত্রুপক্ষের সুবিধে হবে তাই বিচ্ছেদ চাই না এই যুক্তি আর আমার নেই। ওদিকে শত্রুপক্ষকে জব্দ করতে গিয়ে নিজেই যে এদিকে ধরাশায়ী হচ্ছি, আমার রমণীকে রাণী করতে পারছি না এই যন্ত্রণা ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছে। তাই আমিই এখন তাড়াতাড়ির পক্ষে।'

'উঃ, কী আনন্দ যে হচ্ছে—দেখ না কী ভাবে রেসপণ্ড করি।' বলেই খাটো করে হাত বাড়াল লাবণি: 'আমাকে একশোটা টাকা দাও।'

'একশো?' যেন ধাক্কা খেল সুবীর। মনিব্যাগের গহ্বরটা দেখল খতিয়ে।

'একশো না পারো পঞ্চাশ দাও।' লাবণি ব্যাখ্যা করতে চাইল: 'কী করি বলো, তোমার বোস সাহেবের টাকাটা বন্ধ হয়ে গেছে বলেই বিপদ হয়েছে—'

'না, না, বিপদ কী, আমিই তো আছি। যদিও বোস-সাহেবের তুলনায় আমি চুনোপুঁটি, তবু ভালোবাসায় ঘাটতিটুকু আমার বেলায় তোমাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।' বলে ব্যাগের থেকে তিনখানা দশটাকার নোট বের করল সুবীর: 'এখন ত্রিশ টাকা নাও, বাকি কাল অফিস থেকে এনে দেব। আমার টাকা অফিসেই থাকে।'

'উঃ, তুমি কী ভালো!' হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিল লাবণি। বললে, 'নিশ্চয়ই পরস্পর পরস্পরের জন্যে ত্যাগ স্বীকার করব। দুজনে মিলিত হয়ে হিমাংশু বোসের ঔদ্ধত্যকে শায়েস্তা করব। প্রমাণ করে দেখাব টাকার চেয়ে ঢের বেশি দামী, 'পাওয়ার' আর 'পজিশনের' চেয়ে বড় হচ্ছে ভালোবাসা। তারপর হাতে পাওয়া টাকাটার দিকে ইঙ্গিত করল: 'এ বাবদটা অল্প ক'দিনের জন্যে যদিন না তোমার বাড়িতে স্ত্রী হয়ে বহাল হচ্ছি। স্ত্রী হয়ে এলে আর তখন বেচাকেনার কথা নেই, তখন তো আমি তোমার বিনি মাইনের চাকরানি।'

'আর আমি তোমার বিনি-মাইনের দারোয়ান।' হাসতে হাসতে বললে সুবীর। 'লোকে বলবে কি আর দারোয়ানের প্রেম।'

'বলুক। মানুষের অবস্থা দরিদ্র হতে পারে কিন্তু তার ভালোবাসা কখনো দরিদ্র নয়।'

লাবণির মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকাল সুবীর। এসব কি লাবণির অন্তরের কথা, না, কি কোনো নাটকের সস্তা পার্টের কথা মুখস্ত বলছে? প্রশংসা ভরা চোখে সুবীর বললে, 'কী সুন্দর তুমি কথা বলছ—ঠিক যেন সাহিত্যের কথা।'

'আমি লেখিকা নই বলে কি ভালো কথা বলতেও পারব না?'

কথার সুরে লাবণি যেটুকু সূক্ষ্ম অভিমান ফুটিয়েছিল তা নিমেষে উড়িয়ে দিল সুবীর। বললে, 'তুমি লেখিকার চেয়ে বড়—তুমি অভিনেত্রী। তোমার শুধু কথায় নয়, তোমার হাবভাব ছলাকলা লীলালাস্য সবকিছুতে অধিকার।'

'সত্যি বলছ? লেখিকার চেয়ে অভিনেত্রী বড়?' চোখে ঝিলিক তুলল লাবণি।

'নিশ্চয়ই। অন্তত তার স্বামীর কাছে। লেখিকার স্বামী বলতে কী রকম যেন বিদ্যেবুদ্ধিহীন গোবেচারা মাঠো লোক বোঝায়, তার তুলনায় অভিনেত্রীর স্বামী ঢের বেশি গ্ল্যামারাস।'

'জানো, আমি বোধহয় একটা সিনেমার পার্ট পাব—দ্বিতীয় নায়িকার পার্ট।' চোখে আবার মদিরার তুলি টানল লাবণি: 'বিয়ের পর স্টেজে বা সিনেমায় কাজ পেলে করতে দেবে তো?'

'পার্টের কাজ? নিশ্চয়ই করতে দেব। সংসার চালানোতে তোমারও তো তখন পার্ট থাকবে।'

'নিশ্চয়ই থাকবে। আমার তো আর নিশ্চিত কোনো অফিসের চাকরি নেই, আমার যদি কালে-ভদ্রে এক-আধটা পার্ট জুটে যায়। তা আমি যাই পাই তোমার আয়ের সঙ্গে আমার আয় মেলাব। কিন্তু যদি কিছুই না পাই—'

'ব্যয়ের সঙ্গে ব্যয় মিলিয়ে দিব্যি ব্যয় হয়ে যাবে।' সশব্দে হেসে উঠল সুবীর: 'কে জানে সেটাই হয়তো তখন আমার জীবনে এক আয় হয়ে উঠবে।'

'কখনো না। আমি কিছুতেই নড়ব না। আমি তোমার বনছায়া নই। শত ঝড়েও আমি অব্যয় হয়ে থাকব।'

'এখন তো মজো, প্রিয়।' লাবণিকে বাহুবলে আকর্ষণ করল সুবীর: 'চলো সেই মিরিবিলি হোটেলের কোণের ঘরটাতে গিয়ে বসি।'

'চলো।' বাধা দিলনা লাবণি।

তারপর নিরালা হোটেলের সেই নিভৃত ঘরে যখন মুখ এল, লাবণি বাধা দিলনা, সেদিনের মত বললে না, মন ছেড়ে দিয়েছি। বরং বললে, 'তুমি যে সাত দিনের মধ্যেই ডিভোর্সের মামলা রুজু করবে তোমার সেই লক্ষ্যটাকে অভিনন্দিত করবার জন্যে খাই একটু। কিন্তু সাবধান, ঐ একটুখানি। দেখো আমাকে দেওয়া ত্রিশ টাকার উপর যেন খাবা বসিয়ো না।'

'না। আমার যাদের সঙ্গে তোমার ব্যয় মেলাতে ভাববনা, ভয় নেই।' সুবীর লাবণিকে আশ্বস্ত করল: 'এখনো টেকনিক্যালি তুমি আমার স্ত্রী নও।'

'তুমি যাতে নতুন স্ত্রী পাও, শুনেছি তারি জন্যে তোমার বস তোমার মাইনে দুশো টাকা বাড়িয়ে দিয়েছেন!'

'তাই নাকি? ওটা আমার নতুন বিয়ের পুরস্কার?' সুবীর অবাক হবার ভাব করল: 'আমার নতুন বিয়েতে বোস-সাহেবের কেন এত উৎসাহ বুঝতে পারিনা।'

'কেন, তোমার দুশো টাকার ইনক্রিমেন্ট হয়নি?' গালে ছোট্ট করে চুমুক দিল লাবণি।

'তা হয়েছে।'

'অন্যত্রে আকস্মিক এই ইনক্রিমেন্ট কেন, এটা কিসের প্রাইজ আন্দাজ করতে পারোনি?'

'আমি ভেবেছি বনছায়ার আয়টা চলে গেল, বোস সাহেব দয়া করে আমার কিছুটা ক্ষতি পূরণ করে দিলেন।'

'বয়ে গেছে!' লাবণি ঝঙ্কার দিয়ে উঠল: 'যেমন বনছায়ার আয় গেল তেমনি স্বয়ং বনছায়াই তো চলে গেল। তবে কিসের কী ক্ষতি পূরণ! আমি যতদূর শুনেছি ও টাকাটা দিয়েছে তোমাকে তোমার ডিভোর্স মামলার খরচ চালাবার জন্যে। তারপর ডিভোর্স পাবার পরে তুমি যখন দ্বিতীয়বার বিয়ে করবে, শুনেছি তোমাকে বম্বেতে ট্রান্সফার করবে।'

'বম্বে!' সুবীর লাফিয়ে উঠল: 'সে তো প্রমোশন!'

'প্রমোশনই তো। তোমার প্রথম বিয়ের পর দ্বিতীয় বিয়েটা বেশি দামী নয়? সেখিকার পর অভিনেত্রীকে ইমপ্রুভমেন্ট বলবে না?'

'কিন্তু এই যে বলছ তোমার প্রতি সে বিমুখ।'

'আমি বিমুখ। তুমি কি চাও তোমাকে বিয়ে করার পরেও আমি ওর জন্যে মরি?'

'না না, তা বলছিনা, তবে বম্বে—' কী যে বলছে, বলতে চাইছে, সুবীর বুঝে উঠতে পারছেনা।

'আগে ডিভোর্সটা তো হোক, পুরোপুরি মুক্ত হয়ে যাও, তারপর বিয়েটা করো—তারপর বম্বের প্রমোশন দেখা যাবে।' লাবণি মুখে চোখে অনুরাগের রক্তিমা নিয়ে বললে, 'তোমার প্রতি তোমার বস-এর অপার দয়া, অপার ভালোবাসা। যিনি অহেতুক দয়ার তোমার মাইনে দুশো টাকা বাড়িয়ে দিতে পারেন তিনি শুধু তোমার মুখের দিকে চেয়েই তোমাকে প্রমোশন দিয়ে বম্বে পাঠাবেন এ আর আশ্চর্য কী।

আমার প্রতি তিনি যতই বিরূপ হোন তোমার প্রতি ভালোবাসার দরুণ আমার পাশকে কথা কয়তে পারবেন। সুতরাং সর্বাগ্রে ডিভোর্স—'

তারপর যখন দুজনে ফিরছে ট্যাক্সিতে তখনো আরেকবার সাবধি মনে করিয়ে দিল: 'কালই কিন্তু উকিল বাড়িতে যাচ্ছ আর সাতদিনের মধ্যেই ডিভোর্সের মামলা। কথা দিয়েছ, মনে থাকে যেন।'

'ঠিক মনে থাকবে।' সাবধিকে বাহুর মেরে গায়ের উপর টেনে এনে সুবীর বললে, 'কোর্ট, মামলা, ডিভোর্স সমস্তই অবান্তর। আসল, ধবি, আসল হচ্ছে আজকের এই রাত আর তোমাতে-আমাতে মিলন।'

ধবি! সাবধির এখনই একটা নাম হয়েছে যে ধারে ধারে পুরোনো ডাক-নামটাই মুখে এসে পড়ে। আগে আগে অনেক সাধলেছে সুবীর, দু-অক্ষরের কোনো আদুরে নামেই তাকে ডাকেনি—এখন মনে মনার ঈষৎ শিথিল হয়েছে বলেই মুখ দিয়ে সাবধি-নামের শেষের দু অক্ষরই চলে এসেছে। বিবেক ছোট্ট করে একটু জিভ কাটল। দৌবলা কেড়ে ফেলে সুবীর নির্বাপ্ত গলায় বললে, 'তোমাকে আমি যদি বা মন বলে ডাকবনা, না, বস্তু বস্তু বলেও ডাকবনা, ডাকব, লাভ্—লাভ্, কী বলো, খুব ভালো হবে না?'

'খুব ভালো হবে।' সায় দিয়েই সাবধি পা-হাত-পা শক্ত করে কের চিৎকার করে উঠল: 'মিলন-ফিলন কী বলছ? বলো বিয়ে। এক রাত্রি কী বলছ, বলো পৃথিবীর সব ক'টি বাকি রাত্রি। বলো উকিল, পিটিশন, মামলা বিচ্ছেদের ডিক্রি।'

'তুমি মামলাটা তো ফাইল করো। নোটিশ তো যেরোক।'

হিমাংশু তো সাবধির কাছে এমনই প্রথমত দাবি করেছিল যে সে সুবীরকে মামলা করতে অন্তত প্রবৃত্ত করবে। তাই সুবীর মামলা রুজু করলেই নাটকে সাবধির প্রথম দৃশ্যের পাটটা নিখুঁত করেই করা হয়। সে তার শ্রীত্ব আকর্ষণীয় করে তুলেছিল বলেই না সুবীর মামলায় প্ররোচিত হয়েছে। মামলা ফাইল হবার পর ও-পক্ষ কী জবাব দেয়, সংঘর্ষ কী রকম চেহারা নেয়, আইনের পাল্লায় কার দিক ভারী হয়, হাকিম কারদিকে কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এসব নিয়ে সাবধির এখন কোনো মাথাব্যথা নেই। মামলাটা রুজু হলেই সে হিমাংশুকে গিয়ে বলতে পারবে এই দেখুন, মামলা শুরু করিয়ে দিয়েছি, এবার তবে আপনার ছিন্নে আমাকে দ্বিতীয় নায়িকার পার্ট দিন। কথা রাখুন।

'মামলা ফাইল করি বা নোটিশই ইস্যু করাই আসল উদ্দেশ্য তো তোমাকে পাওয়া—'

সাবধি আবার মুচ্ছ হল। বললে, 'না, কেন বকাচ্ছ, আসল উদ্দেশ্য বিয়ে।'

'তা এই গাড়িতে আকাশের চাঁদ সাক্ষী করেই আমাদের বিয়ে হয়ে যাক। আকাশে চাঁদ দেখতে পাচ্ছ?'

'না।'

'তবে চলো নদীর ধারে, গঙ্গাকে সাক্ষী রেখে বিয়ে হবে। কিংবা চলো কালীঘাটে—'

'কিন্তু চাঁদ বা নদী বা মাকালী ডকুমেন্ট দিতে পারবে? আমার যে ডকুমেন্ট চাই—আদালতের সিলমোহর মারা পাকা ডকুমেন্ট। নইলে সকলকে দেখাব কী! দাঁড়াব কোথায়?'

'সে তো ঠিক আছে তার জন্যে ভাবনা কেন?' আদরে আদর হয়ে সুবীর বললে, 'এবার তবে আমার ঘরে চলো। লক্ষ্মীটি লাভ্, প্রিয়—'

'না, এখন থেকে আমি আর তোমার ঘরে যাব না, তোমার বাড়ি যাব।' আনন্দে কলরব করে উঠল সাবধি। 'আমি আর বন্ধনে থাকব না, আমি এবার অবাধ মুক্ত অগাধ হব।'

'প্রিজ, লাভ্, চলো—'

'আগে উঠে প্রমোশন পাই।' ট্যাক্সিকে লাবণি নিজের রাস্তার দিকে ঘুরিয়ে দিল : 'ধীরে ধীরে উঠি সিঁড়ি বেয়ে—'

'আইনমত চলতে গেলে তো অনেক ধীরে-ধীরে—'

'তুমি আগে মামলাটা তো ফাইল করো।' আবার মনে করিয়ে দিল লাবণি। নেমে যাবার সময় বললে, 'আমি আইনেও আছি যে-আইনেও আছি। কিন্তু যে-আইনের চেয়ে আইনেই বেশি শান্তি বেশি সুখ—'

কিন্তু সুধীরের জন্যে শান্তি কোথায়, সুখ কোথায়? আইন কোথায়?

তবু আরো একটা কিছু বলতে হয় তারই জন্যে পিছন ফিরে তাকিয়ে আবার বললে লাবণি, 'আমি দুদিন পরেই ঠিক যাচ্ছি।'

রাত্রির নিঃসঙ্গতায় ফিরে যেতে-যেতে সুধীরের মনে হল এত বড় বাড়ি এত বড় শূন্যতা সে ভরবে কী দিয়ে?

বাড়ি ফিরে এসে অনেকদিন পর সুধীর তার কবিতার খাতা ও কলম নিয়ে বসল। সে তার শূন্যতা ভরবে এবার কবিতা দিয়ে শ্লোক দিয়ে ব্যর্থতা দিয়ে।

দুদিন পরে লাবণি গেল হিমাংশুর ফ্ল্যাটে।

লাবণির হাসিখুশি মাখা হালকা ভাব দেখে হিমাংশু উৎসাহিত হল : 'কি, সাকসেসফুল?'

সাহসে ভর রেখে মুক্ত গলায় লাবণি বললে, 'হ্যাঁ, সাকসেসফুল। ডিভোর্সের মামলা করতে রাজি করিয়েছি।'

'সত্যি?'

'আমাকে বিয়ে করতে যখন ওকে প্রপুজ করতে পেরেছি, তখন ওর ডিভোর্স না চেয়ে আর উপায় নেই।'

'খুব ভালো। কদিনের মধ্যে মামলা ফাইল করছে?'

'সাত দিনের মধ্যে। তার আগে হওয়াও বিচিত্র নয়। সময় এখন আমার আয়ত্তের মধ্যে।' লাবণি আশ্বাস দেওয়ার মত করে বললে, 'আপনি কিছু ভাববেন না, আমি সমস্ত ওয়াচ করছি।'

লাবণির মুগ্ধ ভঙ্গি দেখে আরাম পেল হিমাংশু। বললে 'ভেরি গুড। ঐ মামলার নথিটা আমাকে দিও, আমিও ওয়াচ করব। বুঝলে না, শুধু একটু অতিরিক্ত যোগ করে দেওয়া, বাকিটা মামলাই সমাধা করতে পারবে। মামলা মানেই হাঙ্গামা অর্থনাশ—শত্রুতা, চতুরতা, বলতে পারো জঘন্যতা—শেষে একেবারে নিঃস্বতার প্রান্তে এসে দাঁড়ানো। আমাদের কী! আমরা শুধু ওয়াচ করার দলে। অভিজ্ঞতা দেখাও তো আনন্দের কী বলো?' তারপর যেন আত্মভোলার মত নিজের মনে বলতে লাগল অস্ফুটে : 'আশা গেছে, রূপ গেছে, তারপর মদ ধরেছে, তার মানে চরিত্র গেছে,—আর তবে থাকল কী, চরিত্রের ফাঁক দিয়ে চাকরিটারও যা চলে যেতে কতক্ষণ—তারপর মামলার জেরে শত্রুতার মেতে গিয়ে আরো কে কার সর্বনাশ ডেকে আনে তার ঠিক কী। যাকগে,' হিমাংশু আবার পুরোনো ভঙ্গিতে লাবণির প্রতি মনোযোগী হল : 'বলো কী খাবে? নতুন কিছু?'

'যা খাওয়াবেন তাই খাব।' চটুল দৃষ্টির সঙ্গে স্বরের মিষ্টি মেশাল লাবণি।

'এই বোসো, আমি আসছি।' ভিতরে কক্ষান্তরে চলে গেল হিমাংশু।

খানিকক্ষণ বসে রইল লাবণি, খানিকটা বা বিমূঢ় হয়ে। হিমাংশুর এই স্বগতোক্তির অর্থ কী? ভাষ্য কারণেই সুধীর তার স্ত্রীর থেকে বিচ্ছেদ চাইতে পারে এবং যেহেতু সেই ন্যায়-প্রতিষ্ঠায় সুধীর বিশেষ তৎপর নয় সেই হেতু তাকে মামলায় প্ররোচিত করতে লাবণিকে ব্যবহার করা হচ্ছে—এটুকুও লাবণি সহজ যুক্তিতে অনায়াসে বুঝতে পারে, কিন্তু বনছায়া সম্পর্কে হিমাংশুর এই জ্বালা কেন? স্বাস্থ্য গেছে রূপ গেছে চরিত্র গেছে—এসব বলার অর্থ কী? তবে কি মেয়েটার প্রতি হিমাংশুর কোনো দুর্বলতা আছে? যে মেয়ে স্বাস্থ্যহীন রূপহীন এমনকি চরিত্রহীন, তার প্রতি হিমাংশুর মত অভিজাত শিল্পমতির কোনো আকর্ষণ থাকতে পারে না। সে একরাত্রির ভোজন নয়, নয় বা তার চিরজীবনের ভোজ। যে প্রেমিকের সঙ্গে সে গৃহত্যাগ করেছে সেই সন্দীপই তো তার পরিপূর্ণ আধার, সেখানে তার তিথারি চোখ উঁকি মারে কোন সাহসে? না, না, তা নয়—তবু কেন এই ঘৃণা এই প্রতিহিংসা? এই ঘৃণা তো শুধু বনছায়ার প্রতিই নয়, লাবণি অনুভব করল এই ঘৃণা সুধীরকেও স্পর্শ করছে। মামলার জেরে শত্রুতায় মেতে গিয়ে আরো কে কার সর্বনাশ ডেকে আনে—তার মানে, সুধীরের সর্বনাশও হিমাংশুর অসাধ্য নয়। বুকের মধ্যে কীরকম যেন আরেক রকম করে উঠল লাবণির। ভাবল বনছায়াকে রক্ষা করতে তো সন্দীপ আছে, সুধীরকে রক্ষা করতে কি কেউ নেই?

কি জানি কি, কিছু ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারছে না লাবণি। সে কি শুধুই অভিনেত্রী? তার কি তার বাইরে আর কোনো অধিকার নেই? রঙমহলে শেষ যবনিকা পড়ে যাবার পরেও কি তার পার্ট শেষ হবে না? মুখের মেক-আপ মুছে ফেলার পরেও কি তা রক্তে লেগে থাকবে?

'তোমার পার্ট তা হলে ভালো করে করেছ দেখছি।' হিমাংশু বেরিয়ে এসে ঘরের গলায় লাবণিকে আবার আদর জানাল।

'তবে আপনার নতুন ছবিতে পার্ট পাচ্ছি?' লাবণি আনন্দের চেউ তুলল।

'নিশ্চয়ই পাচ্ছ। আমার ডিরেক্টর সমীর সা আসবে এখুনি। তার হাতে তোমাকে আমি সমর্পণ করে যাব।'

কতক্ষণ পরেই সমীর তার কোলিও ব্যাগ নিয়ে হাজির। চোখে-মুখে জয়ের উজ্জ্বল্য।

'এই যে আসুন।' সমীরকে অভ্যর্থনা করল হিমাংশু 'এই সুন্দরীই আমাদের দ্বিতীয় নায়িকা।'

সমীরকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে স্মিতমুখে নমস্কার করল লাবণি। সমীর বললে, 'আজ্ঞা—খুব আনন্দের কথা।'

'কিন্তু এদিককার কথা কী?' হিমাংশু অসহিষ্ণু হয়ে প্রশ্ন করল।

'তাও আনন্দের।'

'তার মানে?'

'অথর সিনারিয়ো লেখবার সমস্ত অধিকার আমাদের দিয়ে দিয়েছে।' প্রায় জয়ীর ভঙ্গীতে সমীর বললে, 'নির্মুক্ত অধিকার।'

'এই না বলেছিল তার সঙ্গে আলোচনা করে সিনারিয়ো ঠিক হবে।'

'না, পরে জানিয়েছে, সে কোনো আলোচনায় বসবে না বা আসবেনা। যাঁচা গেল, আমরা নির্ভাটে কাজ করতে পারব।'

'হ্যাঁ, তাই ভালো, নির্ভাটে এগুনো যাবে।' উঠে পড়ল হিমাংশু: 'এখন দেখুন লাবণিকে একটা পার্ট দিতে পারেন কিনা—'

হিমাংশু দেখল বনছায়ার অহঙ্কার এখনো যায়নি। (ক্রমশঃ)

ফিরে ফিরে চাই

স্মৃতিচারণ

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

১৯০১ সালে ভারত সম্রাজ্ঞী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র সপ্তম এডোয়ার্ড রাজা হন ; কিন্তু রাজ-অভিষেক হয় ১৯০২ সালের আগষ্ট মাসে। তখন স্বদেশী আন্দোলন সুরু হয় নি—তাই দেশ মধ্যে রাজভক্তি যথেষ্ট ছিল। আমরাও কলকাতায় গেলাম সেখানকার সমারোহ দেখবার জন্য।

আমার বয়স তখন বছর দশ, দাদার সাড়ে বারো। কলকাতায় উঠেছি হরগোপাল সরকারদের বাসায়। এঁদের কথা পূর্বে বলেছি। বাবা বাল্যকাল থেকে ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে আসেন, কিন্তু যৌবনে ব্রাহ্মধর্মে আস্থাবান হন নি। তবে এই পরিবারের সঙ্গে সম্বন্ধটা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অটুট ছিল। বাড়িটা ছিল হরিতকী বাগান লেনে—বলা বাহুল্য হরিতকী বাগান কেন, একটা সবুজ ঘাসের ডগাও দেখা যেতো না। একটা সর্ষের তেলের কল ছিল। এ বাড়ির কনিষ্ঠ ছেলে দুটি, দাদা ও আমার সমবয়সী। তারা দশটি ভাই বোন, আজ কেউ নেই তাদের, আমরাও পাঁচ ভাই বোন আজ আমি ছাড়া সবাই চলে গেছে পরপারে। এ বাড়িতে প্রথম ব্রহ্মোপাসনা দেখি। ঈশ্বরের নাম গান শান্তভাবে বসে করতে হয় ও শুনতে হয় এ বোধ ছিল না। বাড়িতে দেখেছি পূজা হতে সত্যনারায়ণের পূজা, লক্ষ্মীপূজা। কীর্তনের আসর দেখেছি খোল-করতালের শব্দ-মুখর সংগীত। কিন্তু শান্ত হয়ে বসে ভগবানের নাম করতে ও শুনতে হয় এই প্রথম দেখলাম এই বাড়িতে। বোধহয় ছেলে-মেয়েদের যা কারও জন্মদিন হবে ; হরগোপাল বাবুর স্ত্রী, যাকে আমরা ঠাকমা ঠাকমা বলতাম—তিনি একটা বই থেকে কিছু কিছু পড়লেন। আজ মনে হয় বোধহয় কেশবচন্দ্র সেনের 'সেবকের নিবেদন' থেকে পড়েছিলেন। এই পরিবার নববিধান সমাজ ভুক্ত ছিলেন। উপাসনা এই প্রথম দেখলেও ব্রহ্মসঙ্গীত ইতিপূর্বে শুনি আমাদের শহরের বাসায়। আমাদের গ্রামের মিত্র পরিবারের একটি শাখা 'ব্রাহ্ম' চলতি ভাষায় 'বেহ্মো' হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা একবার আসেন দেখে। আমাদের শহরের বাসায় আসেন দেখা করতে। বয়স্কা অবিবাহিতা শেমিজ-কামিজ পরা, পায়ে জুতা দুই বোন, সঙ্গে তাদের মা। মায়ের অনুরোধে মেয়ে দুইটি ব্রহ্মসংগীত গেয়েছিল। ব্রাহ্মদের সম্বন্ধে এই বোধহয় প্রথম পরিচয়। বাবা রোজ ভোরে উঠে তাঁর মোটা গলায় গাইতেন ভজন—

জয় ভব-কারণ, জগত জীবন, জগদীশ জগতাধার হে।
অরুণ উদিল ভুবন ভাসিল, তোমার অতুল প্রেমে হে।"

গানটি কার লেখা জানতাম না—বয়স হলে ব্রহ্মসংগীত বেশে সমস্ত গানটা পেলাম। কলকাতায় হরিতকী বাগানের বাসায় একটা নিয়ম শৃঙ্খলা দেখতাম : বাড়ির জ্যেষ্ঠপুত্র ও মধ্যম চাকুরী করতেন, দুই মেয়ের বিবাহ হয়ে গেছে—আর সবাই বাসায় থাকেন। সবাই ছাত্র-ছাত্রী। সেজো ছেলে মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়েন ; তাঁর সঙ্গে যাই একদিন তাঁর সহপাঠি ডাক্তারের বাড়ি। সুশীল নাগ জ্যেষ্ঠপুত্রের বন্ধুবর।

তাদের বাসা তখন ছিল সার্কুলার রোডে যার নাম আজ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। বাড়ির সামনে রাস্তার ওপারে ছিল মরলা ফেলার ট্রেনের লাইন। সেখানে একটা স্টেশন, অর্থাৎ প্লাটফর্মে কলকাতার এক অংশের আবর্জনা এসে পৌঁছত। এক-ঘোড়ায় টানা আবর্জনা বোঝাই গাড়ি উঠতো প্লাটফর্মের একদিকে ঢালু পথ দিয়ে। খোলা আবর্জনা নেবার 'মালগাড়ি'—মেথরে ঝাঁড়ে কোদাল ও রেক্ দিয়ে টেনে টেনে ফেলছে মালগাড়ির ভিতর। প্লাটফর্মেও আবর্জনা কিছু কম পড়ছে না। একটু পরে হুইসিল্ দিতে দিতে একটা ইন্‌জিন এসে মালগাড়িগুলোকে বেঁধে নিয়ে চললো। গুনলাম বাপার মাঠে যাচ্ছে। প্লাটফর্মের উপর কাক, চিল উড়ছে, পরিত্যক্ত আবর্জনা থেকে নিজ নিজ খাদ্যের সন্ধানে ব্যস্ত। মরা ইঁদুর, পচা বাঁড় যার কপালে যা জোটে। রাস্তায় কুকুরের মধ্যে মারামারি, কামড়া-কামড়ি চলছে এক একটুকরো হাড় নিয়ে। বারান্দা থেকে দেখছি মহানগরীর আবর্জনা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা:—ভেসে আসছে একটা পচা দুর্গন্ধ। ঘোড়ার গাড়ীর লোকদের সয়ে গেছে—নইলে কেমন করে থাকে তারা!

ঘরের মধ্যে ঘোতা কাকা গল্প করছেন সহপাঠি সুশীল নাগের সঙ্গে; সেখানে দেখি টাঙানো আছে একটা নরকঙ্কাল। আজ ভাবি কার সে কঙ্কাল! কোন্ হতভাগ্য জীবনভর কষ্ট পেয়ে মরেও কোনো ধর্মের সদ্গতি পেলো না। শুনেছি হাসপাতালে কেউ মরলে, তার দাবীদার না থাকলে, মুরগোফরাসরা সেই শবের সদ্গতি করতো কঙ্কাল বের করে নিয়ে। আজকাল সে-রকম মূর্গী পাওয়া কঠিন। মুসলমানের শব তো যে-ওয়ারিশ হতেই পারে না। নগরে নগরে মুসলমানদের সমিতি হয়েছে তারা খবর পেলেই কবর দেবার ব্যবস্থা করে।

১৯০১ সালে শীতকালে কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পক্ষকাল থাকি: তখন অনেক গল্প শুনি। একবার ভুল করে এক মুসলমানকে হিন্দু ভেবে পুড়িয়ে ফেলা হয়। সংবাদটা কলকাতায় রাষ্ট্র হয়ে পড়ে। মুসলমান সমাজ খুব উত্তেজিত হয়ে ওঠে। কলেজের অধ্যক্ষ বিখ্যাত চিকিৎসক ফেদার হাস তৎকালীন গবর্ণর লর্ড কারমাইকেলকে ভালো করে জানতেন বলে কোনো রকমে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছিল।

তবে হাসপাতালের কর্তৃপক্ষকে খুব দোষ দিতে পারেনি। কলকাতা মেডিকেল কলেজে রোগী হয়ে আছি সাধারণ ওয়ার্ডে। যশোহর থেকে আগত রাখাল মণ্ডল নামে এক রোগী মারা পড়লে তাকে হিন্দুভেবে কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা করছিলেন। আমি শুনতে পাচ্ছি সব। ডাক্তারকে ডেকে বললাম, লোকটি মুসলমান। তিনি বললেন, সে কী করে হবে। টিকিটে নাম রয়েছে রাখাল মণ্ডল। আমি বললাম, আপনার অফিসে খোঁজ করুন। আমি শুনেছি লোকটি আদ্‌লা আদ্‌লা করছিল মরবার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

কঙ্কাল দেখা থেকে কত কথাই মনের উপর দিয়ে চলে গেল। আজও মনে হয় হিন্দুর মরা ছি কেউ উপযাচক হয়ে সৎকার করে? মুসলমানের দেশে মেডিক্যাল কলেজে শবব্যবচ্ছেদের জন্য ছাত্ররা মুসলমানের মূর্দা কি পায়?

কলকাতায় এসেছি, সেকথা বলেই তো প্রসঙ্গ সুরু করছিলাম। সপ্তম এডোয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষ্যে গড়ের মাঠে বাজিপোড়ানো হবে। কালীপুজোর সময়ে রঙীন হেসনাই আলানো, মশাল, ছুঁচো বাজি, পট্‌কা—প্রভৃতি নিয়ে খেলা করেছি। কিন্তু এবার নাকি বিরাট আয়োজন হয়েছে। ঠিক

হলো সন্ধ্যার মুখে সবাই যাবেন। ভাড়াগাটা ছ্যাকরা গাড়ি চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকতে দেবেনা—তাই খোকা কাকা কোথা থেকে 'প্রাইভেট' ঘোড়ার গাড়ি জোগাড় করলেন—গোপনে ভাড়া দিতে হবে ছে-চল্লিশ টাকা। আজও গোপনে ভাড়াখাটে বড়লোকের মোটর গাড়ি। স্টেশনে নেমে দেখেছি দামী দামী গাড়ি—ক্যাভিলাক দাঁড়িয়ে ট্যাক্সি স্ট্যানডের বাইরে। পাশদিয়ে যেতেই শুনি প্রাইভেট ট্যাক্সি, চাই। পাঞ্জাবী ড্রাইভাররা জানতে বা বুঝতে পারলে অনর্থ সৃষ্টি করবে, তাই ফিস ফিসিয়ে শুধোয় প্রাইভেট ট্যাক্সি চাই। বাজিপোড়ানো দেখবার যাত্রীরা প্রাইভেট ঘোড়ার গাড়ি করে তো গেলেন। আমার শরীরটা সকাল থেকে খারাপ, যেতে পেলামনা—কিন্তু অতবড় বাড়িতে একা থাকবো কি করে! দাদা বললেন তিনি থাকবেন। সেটা যে কতবড় ত্যাগ তা আজ বুঝতে পারি।

ফিরে আসবার পর শুনি আরোহীদের দুর্গতি। পথে, সৌধে হোটেলে আলোকসজ্জা তো দেখলেন। কিন্তু বাজি-পোড়ানো সুরু হলে আগুনের ঝলকানি দেখে ও ঘোড়া কাটার শব্দ শুনে একটা গাড়ির ঘোড়া গেল ক্ষেপে। ভাবলে বোধহয় আগুনে পোড়াবে। তাই গাড়ির বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্য চেষ্টা সুরু চিঁহি চিঁহি শব্দ ও লাথি মারা ছাড়া—আর কী ভাবে মনের ভয় প্রকাশ করবে বেচারা। গাড়ি জখম হলো। তখন একটা গাড়ির মধ্যে মেয়েরা কোনো রকমে উঠলেন, পুরুষরা হাঁটলেন। এই কাহিনী রসিয়ে গল্প করেন ঘোতা কাকা—তাঁর অসামান্য ক্ষমতা ছিল হাসাবার।

আমাদের এ অঞ্চলে হিন্দুরা মুসলমানদের কাছে 'বাঙালী' বলে পরিচিত, আর হিন্দুরা মুসলমানদের বলে 'ভাইসাহেব।' অর্থাৎ দ্বিজাতিক তত্ত্ব—বাঙালীরা হিন্দু, মুসলমানরা মুসলমান—জাতিতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্ব পৃথক করে রেখেছে একই দেশের অধিবাসীদের।

আমার ছোটবেলায় যে-অঞ্চলে কাটে সেখানে মুসলমানদের মধ্যে 'নিকীরি' নামে একটি জাত ছিল। এরা এককালে 'মাল'দের মতই মুসলমানদের কাছেও 'অজাত' ছিল। মুসলমানের মেয়েরা পর্দানশীন আর নিকীরির মেয়েরা হাট বাজার করে। এক নিকীরি বুড়ি, আমাদের হাট বাজার এনে দিত; আজিজ মিঞা আমায় বলতে, মাষ্টার মশায়, নিকীরিরা ছোট জাত, দেখেন না, হাট বাজার যায়। বুঝলাম সাধারণ গ্রাম্য মুসলমানদের ইসলাম সম্বন্ধে যেরূপ গভীর জ্ঞান—সাধারণ হিন্দুদেরও শাস্ত্র সম্বন্ধেও জ্ঞান তদ্রূপ।

আমাদের গোয়ালাপাড়ার পিছনে নিকীরিপাড়া। নিধু নিকীরির বাড়ি সেখানে: ছোট বাজারে মাছ বিক্রী করে সংসার চালাতো। বাড়িতে ছিল এক ভাইপো। নিধু বিধবা—নিকে করেনি আর। বাঙালী মেয়েদের মতই একযন্ত্রে ঘুরে বেড়ায়, নদীতে জেলেরা মাছ ধরে আনলে কিনে নেয়—নিত্য বাজারে গিয়ে বসে মাছের চুপড়ি নিয়ে। বিকালে বা সন্ধ্যার মুখে আমাদের বাড়ি আসে রোজই। আমি তখন বাড়িতে খোকা; তাই আমার মা হলেন 'খোকার মা।' এই মিষ্টি নাম ধরে ডাকা আজকাল শুনতে পাইনে। নিধু নিকীরি মুসলমান—ঘরে ঢুকতে পায়না। আমরা হিন্দু, বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ—আমাদের ঘরে ঢুকতে পারে কি সে? কিন্তু এই মুসলমান নিকীরির মেয়ে ও সদ্গোপের মেয়ে দুটি ছিল সংসারের সবরকম সুখ দুঃখের সহায়। নিকীরি, মাল, জোলা এরা এককালে ছিল হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্য। কবে কোথা থেকে কোন্ সুফী মত এসে এদের কানে হজরত মহম্মদের সাম্যের বাণী শোনালো—যারা ছিল অচ্ছুৎ, তারা আশ্রয় পেলো ইসলামের কোলে। আমাদের গ্রামের কাছে যোগীন্দর মাল বলেছিল "বাবু, আমরা ছোট লোক; কেউ আমাদের দেখেনা। ঐ মৌলবী সাহেবই সুখেদুঃখে বুকে টেনে নেন।" মৌলবী অবিরুল

হক গরীব, সামান্য তামাকের দোকান তার। সে দোকানও উঠে যায়, বিড়ি সিগারেটের চল্ বাড়লে। মুষ্টিমেয় মুসলমানের ঘরগাড়িতে মসজিদের কাজ চলে। কায়ক্লেশে দিন গুজরান করেও তিনি ভোলেননি যে তিনি খোদাতলার খিদমদ্গার। প্রতিদিন প্রাতে লম্বা আচকান্ গায়ে দিয়ে, মাথায় পাগড়ি জড়িয়ে কাঁধে চাদর ফেলে লাঠি হাতে ঘুরতে বের হতেন—এই মালপাড়ায় এসে প্রত্যেকের খোঁজ খবর নিতেন—পয়সা কড়ি দিয়ে সাহায্য করবার শক্তি তাঁর ছিলনা—তবু যেতেন সবার ঘরে। এতেই লোকে কৃতজ্ঞ হয়। অথচ মালদের মুরুব্বি হয়না বলে তাদের মৃদা মুসলমানী কবর-খানায় স্থান পায় না। তবুও বলতেই হবে ইসলাম অজাতকে জাতে তুলে নিয়েছে, জাত মেরে খজাতি করেছে। আজ মালরা নিজেদের মুসলমান বলে গর্ব করছে—হীনমন্যতা তাদের আর নেই।

বিধু নিকীরি, মুসলমান—তাই ঘরে ঢুকতো না; মার সঙ্গে গল্প করতো দরজার ফাঁকে দাঁড়িয়ে, ঘরে ঢোকবার সময়ে আমরাও না ছুঁয়ে আসতাম—সে-ও সসংকোচে পথ করে দিত। দৈবাৎ ছুঁয়ে ফেললে—ঘরে ঢোকামাত্র মা গঙ্গাজল খড়কে করে ছিটিয়ে দিতেন—মুসলমানীর স্পর্শদোষ দূর হয়ে যেতো, বিধুও এসব মেনে নিতো খুব স্বাভাবিক ভাবেই—কারণ তখনও তাদের মন জাগেনি।

একদিনের ঘটনা মনে পড়ছে। বাবার জ্বর—তুষানক বমি করছেন—মা বোধ হয় স্নানের ঘরে—কাছে কেউ নেই—আমরা সামলাতে পারছিনে। বিধু দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, ভুলে গেল সে অস্পৃশ্য,—বিছানায় উঠে এসে বাবার মাথা চেপে ধরে বমির বেগ শমিত করলে। মা ফিরে এসে দৃশ্য দেখে সাময়িকভাবে ভুলে গেলেন বিধু নিকীরি মুসলমান।

বিধুর দূর সম্পর্কীয় দুই ভাইপো ছিল—যমজ তারা—নাম লব ও কুশ। তারা বাসন-ব্যবসায়ী। একটা বেতো ঘোড়ার পিঠে দুদিকে ঝুটো বস্তাভরা কাঁসা-পিতলের বাসন চাপিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরতো তারা। পুরনো কাঁসা পিতল তামার ঝুটো ভাঙা বাসনপত্রের বিনিময়ে নূতন মাল দিত। আমাদের চোখ পড়ে থাকতো লবকুশের বেতো ঘোড়াটার দিকে। বেচারা কত মোটই বইতো—নড়ে চড়ে ঘাস খেতে গেলেই পিঠের বোঝার বাজনা বেজে উঠতো।

আমাদের ছোটবেলায় মুসলমান সমাজ সংঘবদ্ধ হয়ে ওঠেনি,—হিন্দুদের সঙ্গে আপাত দৃষ্টিতে পার্থক্য ছিল সামান্যই। তখন মুসলমানরা লুংগি পরতো না। মাথায় 'ফেজ' টুপি তখনো ওঠেনি—উৎসবাদির দিন মাথায় শাদা গোল টুপি পরতো। আমাদের গ্রামের কাছে কাজিপাড়ার কাজি-সাহেবরা টুপি পরেই আসতেন শহরে আসবার সময়ে। বোধহয় মোসলেম লীগ গঠিত হবার পর থেকে শহরে—গ্রামে মুসলমানদের প্রতীক 'ফেজ' টুপির চল দেখা দেয়। কিন্তু গত শতাব্দীর মাঝে থেকে এই টিকিওয়ালা টুপির চল হয় ভূমধ্য সাগরের তীরে আফ্রিকার ও য়ুরোপের কয়েকটা রাজ্যে—যেমন তুর্কি গ্রীস ইতালিতে বেগুনী রঙের ফেজ টুপির চল হয় এক বিজ্ঞানীর খেয়াল থেকে। কে নাকি আবিষ্কার করে ঘোষণা করেন, টুপির রঙ যদি 'বেগুনী' হয়, তবে সূর্যের তাপ কম লাগে; সেই হতে নাকি এই টুপির ঐ রঙ হয়। এ সবই শোনা কথা—

মহরম ছিল মুসলমানদের জাতীয় উৎসব। মজার কথা সুন্নী মুসলমানদের পক্ষে এতাবে মহরম পালন করা 'শোনা' বা পাপ। এটা শিয়াদের দুঃখের উৎসব! কিন্তু কালে ধর্মের বিকৃতি এসে যায়। ইসলামে—মহরমের তাজিয়া বা 'পোয়ারা' নিয়ে মিছিলে সবাই যোগ দেয়—কেবল দেয়না নামাজী-সুন্নীরা সেকালে হিন্দুরাও যোগ দিত মিছিলে। আমাদের বাড়ির সামনে প্রতিবৎসর তাজিয়া নিয়ে মুসলমানরা

আসতো। জোয়ানরা লাঠি, তরোয়ারি নিয়ে খেলা দেখায়—লাঠির দুই মাথায় মশালের মতো আগুন জ্বালিয়ে ঘোরায়। সে খেলায় হিন্দুরাও যোগ দেয়। খেলা শেষে বাজনদাররা বকশিস পেয়ে বিগুণ উৎসাহে ঢোল কাঁসি বাজাতে বাজাতে যায়। জোয়ানের দল 'গোঁয়ারা' কাঁধে তুলে চলে যায়—কল্পিত কারবালার দিকে।

হিন্দুদের বারোমাসে তেরো পার্বণ, কালী, জগদ্ধাত্রী—এদের প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হতো নদীতে। সেকালে ট্রাক ছিলনা, লোকেই কাঁধে করে নদীতে নিয়ে যেতো। সন্ধ্যার পর গেছি নদীতীরে 'ভাসান' দেখবার জন্য। দুখানা নৌকো জোড়া দিয়ে বাঁধা হয়েছে—তার উপর প্রতিমা তোলা হচ্ছে—লোকে বাঁটুইর কাদায় নেমে ঠেলেঠুলে প্রতিমা তুলছে। নৌকোর উপর লণ্ঠন টাঙানো। দেখতে দেখতে জোড়া নৌকা মাঝ দরিয়ায় নিয়ে যায় মাঝিরা লম্বা লগি দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে। সেখানে জোড়া নৌকোর বাঁধন খুলে প্রতিমা নামিয়ে দেয় জলের মধ্যে—খুব হুঁশিয়ারী থাকতে হয় মাঝিদের এই সময়ে। বিসর্জনের সময়ে পাড়ের লোকেরা নানারকমের ধ্বনি করে—শাঁখ বাজায় মেয়েরা।

প্রতিমা ভাসান দিতে নিয়ে যায় অন্ত্যজ পল্লীর লোকে—ডুলে বাগ্‌দী কেওটরা। যাঁরা পূজা করেন, তাঁরা পয়সাওয়ালা মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত লোক—তাঁদের দায় নেই ঠাকুর কাঁধে তুলে নিয়ে যাবেন।

তাই ভাক পড়ে হিন্দুসমাজের অন্ত্যজদের। প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর প্রতিমাতে হাত দেবার অধিকার থাকতো না অন্যদের। পূজা শেষে বেদী থেকে ধরাধরি করে নামিয়ে দিলে প্রতিমার প্রাণ আর থাকতো না যেহেতু—তখন সেই মরা ঠাকুর ছোঁবার অধিকার পেতো অন্ত্যজরা। তখন তাদের শক্ত কাঁধে চড়ে মরা ঠাকুর যেতেন নদীতে ডুবতে। কয়েক বৎসর পূর্বে ময়মনসিংহের এক ব্রাহ্মণ জমিদার বাড়িতে দুর্গাপূজায় পর স্থানীয় 'অচ্ছুতে'র দল জানিয়ে দিল যে 'জ্যান্ত ঠাকুরের ঘরে তাদের ঢোকার অধিকার নেই, মরা ঠাকুর ফেলবার জন্য তাদের ডাক! তারা মুরদাফরাস নয়।' অবস্থা এমন হলো যে, শহর থেকে ট্রাক এনে ঠাকুর বিসর্জনের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত সমস্ত অচল হয়ে থাকে। আজকাল রাজধানীর কথা বাদ দিলাম—মফঃস্বল শহরে সার্বজনীন ঠাকুরদের সদ্গতি হয় না মোটর ট্রাক না আসা পর্যন্ত। মোটর চালক মুসলমান হলেও সবাই ও কথাটা চেপে যান; তবে এখনও জানি মুসলমান মালিক বিসর্জনের জন্য ট্রাক দেয় না।

ছোটবেলায় নদীর ঘাটে দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জন করে খেলা দেখতে যেমন আমোদ লাগতো, মহরমের হৈচৈ,—'হাসান হোসেন কারবালা' বলে বুক চাপড়ে হল্লা করতে যেতে দেখলেও মজা লাগতো।

দোল-উৎসবের কথা মনে আছে। তখন 'হোলি' কথাটা চালু হয়নি এবং হোলির সঙ্গে যেসব unholy বিভীষিকা আজ সকলকে আতঙ্কিত করে তুলেছে সেকালে তা আমাদের শহরে দেখেছিলাম বলে তো মনে পড়ছে না। হরি মুদির দোকান থেকে আবীর কিনতাম। ভৃত্যদের সাহায্যে বাঁশের পিচকিরী তৈরী হতো। টিনের পিচকিরী এলো পরে দোকানে। আবীর জলে গুলে পিচকিরী করে দিতাম জানা-শোনাদের মধ্যে—শুকনো আবীরই বেশি চলতো। রাধাবল্লভ তলায় বা ছোট বাজার অঞ্চলে উৎসব জাঁকিয়ে জমে উঠতো। তবে খোল করতাল নিয়ে বৈষ্ণবী কীর্তনও বের হতো।

ঝুলন ছিল আমাদের পাড়ার ছোট ছেলেদের উৎসব। উঠোনের একধারে কাঠ-বাখারি, কঞ্চি, কাপড় দিয়ে ছোটঘর বানিয়ে, তার মধ্যে দোলা বানিয়ে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি রাখতাম—বাজারে রঙচঙ করা যুগলমূর্তি বিক্রী হতো। সেটাতে পাড়ার ছেলের সঙ্গে খুব মাতামাতি হতো। আনন্দ পেতাম এর কারণ

একটা কিছু গড়ে তুলছি, সৃষ্টির আনন্দ। ধূলমূর্তির অর্থ কিছুই বুঝতাম না আজ বুঝি ; কিন্তু রঙ লাইনে এইসব কোলাহল মুখরিত প্রতীক প্রতিমা পূজায়।

আজ বুঝি এসব উৎসবের মূলে ছিল শুধু উৎসব—বর্ষাকালে ঝুলন, বসন্তকালে দোল, হেমন্তকালে দীপান্বিতা বা আলোর উৎসব ও শরৎকালে দুর্গোৎসব।

বাবা আইন পড়তেন কলকাতায়—বেনিয়াটোলা লেনে বাসা, মা আছেন বাবাকে নিয়ে আমি জন্মাইনি। মা'র কাছে শোনা হ্যারিসন রোড তখন তৈরী হচ্ছে ঘরবাড়ি ভেঙে রাস্তা চওড়া করা চলেছে। ১৮৯১ জুলাই মাসে বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর যে মিছিল বের হয়, তার কথা মা'র মনে ছিল। মা ছোটবেলায় এক সময়ে কলকাতায় বর্তমান বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীট অঞ্চলে কোথায় থাকতেন ; তখন দাদামশায় বোধহয় সেক্রেটারিয়েটে কোনো কাজে নিযুক্ত ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ি ছিল কাছেই ; মাকে জানতেন পাড়ার এক ভেপুটির মেয়ে বলে। অপরূপ সুন্দরী ছটফটে ছোট মেয়েটিকে মাঝে-মাঝে ডেকে কয়টা টাকা হাতে দিয়ে বলতেন পাড়ায় কোথায় কাকে দিয়ে আসতে হবে। এসব কথা মায়ের মুখে শোনা।

বাবা আইন পড়তেন—তখন ইউনিভার্সিটি 'ল কলেজ' ছিল না—বীপন কলেজেই পড়ানো হতো। আইন পড়েন ও যেখুন স্কুলে শিক্ষকতা করেন যুগপৎ। সেকালে শিক্ষিত শিক্ষিকা এতো সুলভ হয়নি। ছাত্রীর সংখ্যা আঙুলে গোণা যেতো। শিক্ষিকার সংখ্যাও তদ্রূপ। বহুকাল পরে বাবার এক ছাত্রীর সঙ্গে আমাদের সহরে দেখা। তিনি তখন সদ্য বিলাত ফেরত সিবিলিয়ান যে-সাহেবের পত্নী। এই সূত্রে পরিচয়টা ঘনিষ্ট হয়ে ওঠে। বাবা ফৌজদারী আদালতে মামলা কখনও নিতেন না, মোক্তারদের সঙ্গে একাসনে বসে কাজ করতে একদল উকীলের আভিজাত্যে বাধতো! মহকুমা হাকিমের বাড়ি দাদা ও আমি যেতাম মাঝে মাঝে। একবার কালীপূজার সময়ে সাহেবের বাড়ি বাজি পোড়ানো হচ্ছে। বেয়ারারা আমাদের হাতে নানা রকম আতস বাজি দেয়, ভারি মজা লাগে। মনে আছে হাকিমের বাড়ি এ-ঘর ও-ঘর করছি অস্পষ্ট আলোকে। পরে সে বাড়ি গেছি—আরও পরে গেছি সম্মানই অতিথিরূপে আর সেদিন আর্দালিদের কাছে বাজি পেয়ে কী খুসিই হয়েছিলাম।

ছিপ্ ছিপে সাহেব তখ্-কাট বা দু'চাকার হাল্কা ঘোড়ার গাড়ি হাঁকিয়ে পথ দিয়ে যেতেন—সেকালে মোটরগাড়ি অজ্ঞাত—অশ্বযানই একমাত্র যান—গ্রামাঞ্চলে গো-যান। বারান্দায় রেলিং-এর বাইরে একটা উঁচু জায়গায় বসে আছি—যেখান থেকে পড়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল—এমন সময় দেখি সাহেব যাচ্ছেন সে পথে। ঐভাবে বসে থাকতে দেখে ঘোড়ার চাবুকটা তুলে হুঁশিয়ার করে গেলেন। বহু বৎসর পরে বোলপুর স্টেশনে সাহেবকে দেখলাম। যৌবনে ছিলেন ছিপ্ছিপে সুপুরুষ। ট্রেনের কামরার মধ্যে দেখলাম বৃহৎ বপু খাঁটি বাঙালীর রূপ। প্রণাম ক'রে পরিচয় দিলাম—চিনতে পারলেন না অথবা কমিশনর সাহেবকে ঘিরে যেসব রায়-সাহেব, খান-সাহেব ও অফিসাররা আছেন, তাদের সম্মুখে সভ্যেন্দ্রের দ্বারা নিন্দিত, পুলিশের দ্বারা চিহ্নিত ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ শান্তিনিকেতনের বিশ টাকা বেতনের 'জনৈক শিক্ষককে' চিনতে পারা আত্মমর্যাদা হানিকর বলে চিনতে পারলেন না।

বহুকাল পরে এঁদের এক কন্যার কাছ থেকে যে অযাচিত সহায়তা পেয়েছিলাম তার কথা ভুলতে পারি নি। যথাস্থানে বলবো সে কাহিনী।

আইন পাশ করে বাবা ১৮৯১ সালের শেষদিকে সহরে এসে ওকালতী সুরু করেন। তখন সেখানে

কয়জন উকিল আর কতই বা মামলা—একজন মুন্সেফই সব কাজ সামলাতেন। সেকালের উকিলরা ঘোড়ার গাড়ি করে আদালতে যেতেন। হেঁটে যাওয়া! অসম্ভব। হেঁটে যায় মোক্তাররা, প্লীডারশীপ পাশকরা উকিলরা। সেকালে এফ-এ পাশ করে আইন পড়া যেতো, পাশ করলে তাঁরা ওকালতী করতে পারতেন —তবে সরকারী উকিল বা মুন্সেফী করতে যেতেন না। পরে আমার সেজো কাকা বি. এল ও মেজো কাকা পি. এল হন। বাঁধা ঘোড়ার গাড়ি তিনজন উকিলবাবুকে নিয়ে এসে দাঁড়ায় আমাদের বাড়ির সম্মুখে। বাবা চতুর্থ সোয়ারী, বাবা ঠিকভাবে গাড়িতে উঠলেন কিনা যা প্রতিদিন জানালা ফাঁক করে দেখতেন—বাবুর গাড়ি ছেড়ে দিলে জানালা থেকে সরে আসতেন। তখন বুঝতাম না এ উৎকণ্ঠার অর্থ কি।

সে কালের উকীলবাবুরা চোগা-চাপকান চাদর, শামলা পরে আদালতে যেতেন। পোষাক ঘরের মেঝেতেই খাওয়ার জায়গা হতো। 'ডাইনিং রুম' তখনো হয়নি। বাবা যথাসময়ে পেয়ে ধড়াচূড়া পরতেন—পরতেন বললে ভুল হবে, পরানো হতো। ভৃত্য পায়ে, মোজা পরায় পেন্টালুন ঠিক করে ধরে, বাবা পা দুটো গলিয়ে দিয়ে দাঁড়ান—ভৃত্য বেল্ট বা সালিস প্রভৃতি ঠিক করে দেয়। গায়ে চোগা, তার উপর চাপকান। একটা চাদর পাকিয়ে ক্রস্ করে পরেন। মাথায় দেন শামলা। বলা বাহুল্য, মোজা, চোগা চাপকান চাদর, শাম্‌লা—সবই মুসলমানী যুগের পোষাক—ব্রিটিশযুগের উনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত সেই বেশ ভূষা ছিল ভদ্র সমাজের সরকারী পোষাক। কাল পরিবর্তন আমরাই দেখলাম, নবীন সরকার নবীন উকিল—প্যান্ট, কোট, নেকটাই পরে গাউন হাতে সাইকেলে চড়ে আদালতে এলেন। বুদ্ধিজীবী আমলের উকিলরা সেদিন বুঝলেন নূতন শতাব্দীর সূচনা হলো। আজ আদালতে প্রাঙ্গনে কে উকিল, কে কেরাণী, কে মক্কেল তা সনাক্ত করা যায়না পোষাক-পরিচ্ছদ দেখে।

হিন্দু তার 'জাত' ও মুসলমান তার 'ধর্ম' বিশুদ্ধ রাখবার জন্য মহাব্যস্ত। জাত-ধর্ম নিয়ে বাছাবাছি বা বাড়াবাড়ি ছিল সমাজ জীবনে বৈশিষ্ট্য। বাবার কাছে মুসলমান মক্কেলও আসে। মুসলমানদের জন্য সব পৃথক ব্যবস্থা। বসবার স্থান আলাদা, হুকো-কলকে আলাদা। তবে চাকদহের কাজী-সাহেব সম্ভ্রান্ত বংশীয় মক্কেল—তাঁর জন্য পৃথক ব্যবস্থা। তিনি তামাক খেতেন না, চা খেতেন। তাঁর জন্য এনামেলের কাপ সসার, ও জলখাবার জন্য কাঁচের গেলাস থাকতো আলাদা। সংসারে থালন-পত্রের সঙ্গে মেশানো হতোনা, 'মোসলমানে'র এঁটো বাসন কিরা ছোঁবেনা, মাজবে না—জাত যাবে! আমরা চা এনে দিতাম, খাওয়া হয়ে গেলে কাপ-সসার নিয়ে গিয়ে ধুয়ে রাখতাম—রাখারও একটা বিশেষ স্থান ছিল।

আজকাল ভদ্রলোকের বাড়ি হুঁকো কলকের বালাই নেই। বন্ধুজন এলে সিগারেট বের করে দেন, —অপরিচিতের সঙ্গে সামান্য পরিচয়কে প্রগাঢ় করবার জন্য সিগারেট 'অফার' (offer) করা রীতি। এমনকি দামী লাইটার জেলে সিগারেট ধরিয়ে দেওয়া ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা। আমাদের বাসার বারান্দায় মক্কেলদের ভিড় জমতো সকালে। একটা দিকে থাকতো অনেকগুলো 'খেলো হুকো', কলকে, টিকে, তামাক। খেলো হুঁকোর গলায় কড়িবাঁধা—এক কড়ি বা দু'কড়ি বাঁধা। ব্রাহ্মণ, শূদ্রের জন্য পৃথক হুঁকো বোঝা যেতো কড়ি গুণে! বাবা তামাক খেতেন—রূপোর বাঁধানো হুঁকো। থাকতো সিভলের-তৈরী পরীর হাতে—আমাদের শহরের কাঁসারী শিল্পীদের হাতে গড়া। খুব সম্ভ্রান্ত মক্কেল আসলে বাবা হুঁকো দিতেন তাঁর হাতে—তিনি পকেট থেকে নল বের করে অথবা কলার পাতা ভৃত্যদের দিয়ে আনিয়ে হুঁকো টানতেন।

তামাকেরই ব্যবস্থা কত রকম ছিল। মধ্যবিত্তরা খেতেন মিঠে তামাক, উচ্চবিত্ত বা অতি ভক্তের দল টানতেন অম্বুরী তামাক। সে তামাকের সুগন্ধে ঘর ভরে উঠতো। সে তামাক আসতো বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর থেকে—বোধহয় বিষ্ণুপুরের হিন্দু রাজাদের উৎসাহে ও অনুগ্রহে এই শিল্পটির জন্ম হয়। এখন শুনি বিষ্ণুপুরের এই শিল্প উঠে গেছে। নিম্নবিত্তদের জন্য কড়া তামাক তৈরী হতো মোটাপাতা কুটে চিটেগুড় মেখে মশলাপাতি সুগন্ধাদি দিয়ে। মিঠে করলে ওদের ভাল লাগতো না।

গ্রাম্য অর্থনীতির আভাস একটু দিই। কলকে থেকে পোড়া তামাকের 'গুল' ফেলে দেওয়া হতোনা। সেগুলি গুড়ো করে দাঁতের মিশি বা মাজন তৈরী হতো। আজ দেখছি পাঁচবছরের শিশুর হাতে পেস্ট ও বুরুশ। সকলের সামনে বুরুশ দিয়ে দাঁত মাজা এখন প্রায় ফ্যাসান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সেকালে সিগারেটের চল্ শুরু হয়েছে—বিলাত থেকে আমদানী নূতন ধূমপান অভ্যাস। বিড়ির নামও শুনিনি সেকালে। সাধারণ লোকের মুখেও সিগারেট দেখিনি কখনো। শুনতাম স্কুলের কোনো কোনো ছেলে 'বার্ডসাই' খেতো। Bird's Eye বা পাখীর চোখ ছিল সিগারেট কোম্পানির পেটেন্টের প্রতীক। সেই পদার্থটা লোকমুখে 'বার্ডসাই' নামে চালু হয়। এছাড়া Ogden কোম্পানীর সিগারেট সেকালে নামডাক ছিল—এখন তার নামও শুনিনে। সব সিগারেট বিলাত থেকে আসতো প্রত্যেকটি প্যাকেটে একটি করে রঙীন ছবি থাকতো। বাক্সের মাপে—বিদেশী নর্তকী, ব্রিটিশ সেনাপতি, অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষ, রাজপুরুষ ও মন্ত্রীদের ছবি। আমার সেজোকাকার সখ ছিল ছবি জমানো। বড় একটা বাঁধানো খাতায় সেগুলি সযত্নে আঠা দিয়ে এঁটে রাখতেন—আমাদের হাতে দিতেন না—পাছে নষ্ট করি। আজকাল মন ভোলাবার জন্য সিগারেট কোম্পানিকে সুন্দরীদের ছবি বিলি করে প্রলুব্ধ করতে হয় না—গত পাঁচ দশকের মধ্যে তামাকের নেশা বিশ্বব্যাপী হয়েছে। এখন আবার সুর বদলাচ্ছে—ডাক্তারদের মধ্যে একদল বলছেন ক্যানসার রোগের কারণ নাকি সিগারেট ধূমপান। আজকাল নূতন নেশা বা খেয়াল দেখা দিয়েছে ডাকটিকিট সংগ্রহের। থাক সে আলোচনা আপাত।

সহরে যান ছিল গোযান, অশ্বযান, আর বাহন ছিল পালকি ও ডুলি। আর দ্বিচক্র যান সবেমাত্র দেখা দিচ্ছে দুই একটা করে। স্টেশনে ঘোড়ার গাড়ি ছাড়া আর কোন যান বাহন ছিল না। পালকি ছিল ডাক্তারদের বিশেষ বাহন,—তবে অন্তঃপুর বাসিনীরাও পালকি চেপে বিয়ে বাড়ি যেতেন। মনে পড়ছে আমার ছোটবোনের কল্যাণে ষষ্ঠীতলায় পূজা হবে—মা উঠলেন বুকিকে নিয়ে পালকিতে। বড়লোকের বাড়িতে আজকাল যেমন মোটর কারের জন্য গ্যারাজ থাকে। সেকালে ছিল পালকী রাখার ছাউনি—আমাদের দেশের বাড়িতে ভগ্নশ্রী অবস্থায় তাঙা পালকি দেখেছিলাম—তার স্মৃতিচিত্র পূর্বেই এঁকেছি।

চারবেহারা সদলবলে প্রায় আড়াইমাইল দিয়ে ডাক্তারকে বয়ে আনে পালকি করে। অসুখ বিসুখ লেগেই আছে সংসারে—ডাক্তারের ভিজিট দু'টাকা। ঔষধের প্রেসক্রপশন ডাক্তারের নিজস্ব ডাক্তারখানা থেকে আনাই ছিল রেওয়াজ। দিনু ডাক্তারের প্রেসক্রপশন তাঁর কম্পাউণ্ডার ছাড়া বোধহয় কেউ পড়তে পারতো না—এমন লেখার শ্রী! এই দিনু ডাক্তারের জামাইকে ইংরেজ গোরারা বারাকপুরে ট্রেনে হত্যা করে—তাঁর অপরাধ তিনি ফার্স্টক্লাসে চড়ে আসছিলেন। কাগজে লেখালেখি ও ঘরে বসে উত্তেজনা প্রকাশ করা ছাড়া আর কোনো প্রতীকারের ক্ষমতা তখন জনতা আবিষ্কার করতে পারেনি। ট্রেনের মধ্যে আজকাল রাহাজানী ডাকাতি, ছিনতাই তো নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে উঠেছে। সেকালে এ

বয়নের দেশীয়দের 'বীরত্ব' কাহিনী শোনা যেতোনা। সেকালে শ্বেতাঙ্গদের কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি অত্যাচার অবিচার অপমান প্রায়ই ঘটতো। দুই একটা কাহিনী মনে পড়ছে লিখতে লিখতে! ব্রাহ্ম সমাজের এক অতি ভদ্র ধার্মিক অথচ প্রকৃত বলশালী ব্যক্তি ট্রেনে যাচ্ছেন প্রথম শ্রেণীতে। এক সাহেব উঠে দেখেন বাঙালী বসে। অসহ্য হলো সাহেবের। বেঞ্চে বসে প্রথমে পা তুলে দিলেন ভদ্রলোকের দিকে। ভদ্রলোক সরে বসলেন আর মনে মনে বলছেন, ব্রহ্মের সন্তান ব্রহ্মের সন্তান। একটু পরে পা সরতে সরতে গায়ে ঠেকলো। ভদ্রলোক সরে বসলেন—মনে মনে ব্রহ্মনাম করছেন. ও ভগবানের সন্তান। যখন ট্রেনে প্রায় কোনঠাসা হয়েছেন, তখন মনকে বললেন আমিও তো ব্রহ্মের সন্তান। বিরাশী ওজনের এক চপেটাঘাতে সাহেব-পুঙ্গব ছিটকে পড়লেন। শান্তভাবে ভদ্রলোক নিজের জায়গায় ফিরে ব্রহ্মনাম জপ করতে লাগলেন। সাহেব ধুলো ঝেড়ে ক্ষমা চেয়ে অন্য কোনে চুপচাপ বসে থাকলো।

সেকালের আর-একটি কাহিনী। রামহরি শর্মা সাহেবী পোষাকে পরে রেলওয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠেছেন—স্ত্রীকেও গাউন পরিয়ে যেম সাজিয়েছেন। মাঝ স্টেশনে তিনজন গোরা সৈন্য উঠলো। রামহরি শর্মা সাহেব নন, কালো বাঙালী, সাহেব-কয়টা রামহরির স্ত্রীর সহিত হাস্য পরিহাস করে রামহরিকে আক্রমণ করে। বেচারা প্রাণপণে চীৎকার করে—সাহেবরা হাসে। এমন সময়ে ট্রেন একটা স্টেশনে থামলে চীৎকার শুনে ডেভিড হেয়ার সাহেব গাড়িতে উঠে এলেন ও রামহরির অবস্থা দেখে সাহেবদের মিষ্টি কথায় শান্ত করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাতে ফল হলনা দেখে হেয়ার সাহেব খুসি ধরলেন। গোরা সাহেবরা বুঝল সুবিধা হবেনা। পরবর্তী স্টেশন আসলে হেয়ার সাহেব, রামহরি শর্মা ও তার স্ত্রীকে নামিয়ে দিলেন। হেয়ার রামহরির কানটি ধরে বললেন, When you will be as strong as we are, then imitate—অর্থাৎ গায়ের জোরে আমাদের সমকক্ষ হও, তখন অনুকরণ করো। ইংরেজিতে প্রবন্ধ আছে Imitation is the worst form of flattery.

যাক সেযুগের সাহেবদের উপদ্রবের অনেক কাহিনী শুনতাম।

(ক্রমশঃ

* * *

দেশে জন্মালেই দেশ আপন হয় না। যতক্ষণ দেশকে না জানি, যতক্ষণ তাকে নিজের শক্তিতে জয় না করি, ততক্ষণ সে-দেশ আপনার নয়। আমার দেশ আর কেউ আমাকে দিতে পারবে না। নিজের সমস্ত মন-মন-প্রাণ দিয়ে দেশকে যখনি আপনার বলে জানতে পারব, তখনি দেশ আমার স্বদেশ হবে। পরবাসী স্বদেশে যে ফিরেছি তার লক্ষণ এই যে, দেশের প্রাণকে নিজের প্রাণ বলেই জানি। পাশেই প্রত্যহ মরছে দেশের লোক রোগে উপবাসে, আর আমি পরের উপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে, মরের উপর চড়ে দেশাত্মবোধের ঘাস্ বিক্রয় করছি, এত বড়ো অবাস্তব অপদার্থতা, আর কিছু হতেই পারে না।

—রবীন্দ্রনাথ

জীবন নাট্যের খণ্ডচিত্র

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

অনাথ উপাধ্যায়

হিন্দু কলেজের জুনিয়র ক্লাসে পড়ছেন ভূদেব। বয়স তখন চৌদ্দ পনর। কলেজের মাইনে মাসে পাঁচ টাকা। কিন্তু ভূদেবের বাবা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ এতই দরিদ্র ছিলেন যে ঐ সামান্য টাকা জোগাতে তাঁকে হিমসিম খেতে হত। নিয়মিত মাইনে দিতে পারতেন না। মাইনে যদিও বা জোগাড় হয়, বই কালি কলম কাগজের পয়সা আর জোটে না।

সেই ছোট বেলাতেই ভূদেব নিজের মাইনের টাকা সংগ্রহ নিজেই করতেন। যতটা পিতার কষ্ট আর চিন্তা লাঘব করা যায়। লোকের বাড়িতে পূজা-অর্চনা করতেন। কিছু কিছু দক্ষিণা মিলত। তাই দিয়ে বই খাতা কেনার খরচটা কোন রকমে কুলিয়ে যেতো।

একবার একটি ইংরাজী অভিধান কেনবার প্রয়োজন হল।

ভূদেব তাঁর জমানো টাকা বার করে গুনে দেখলেন আছে মাত্র দু'টাকা দশ আনা।

তাই নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন চীনে বাজারে বেনীমাধব দের দোকানের দিকে।

দোকানে ঢুকে তিন-চারখানা অভিধান নেড়ে চেড়ে দেখলেন। তার মধ্যে যেটি পছন্দ হল সেটির দাম চার টাকা।

কিন্তু পকেটে আছে মাত্র দু'টাকা দশ আনা।

মনটা ছটফট করতে লাগল। চমৎকার অভিধান। এটি তাঁর চাই। অন্য অভিধানগুলি তেমন ভাল নয়। এটিই সর্বোৎকৃষ্ট।

কিছুক্ষণ দ্বিধা করে মালিকের কাছে গিয়ে বললেন, দেখুন, এই অভিধানটি আমার খুব পছন্দ।

দোকানের মালিক বললেন, বেশ তো! এটাই নাও। দাম চার টাকা।

ভূদেব বললেন, কিন্তু আমার কাছে আছে মাত্র দু'টাকা দশ আনা।

দোকানের মালিক বারেক ভূদেবের দিকে তাকালেন, তারপর বললেন, বেশ তো, বাকি এক টাকা দু'আনা পরে দিয়ে যেও।

ভূদেব বললেন, আপনি যদি দু'টাকা দশ আনায় বইটি দেন তো আমার বড় উপকার হয়। এর বেশী দেবার ক্ষমতা নেই আমার। পরে যদি দিয়ে যেতে না পারি।

ভারী করুণ শোনালো তাঁর কণ্ঠস্বর!

মালিক বললেন, তাই তো! তা কী করে দি! কম-দামী অভিধান তো রয়েছে, তারই একটা দেখে শুনে নাও না কেন।

ভূদেব বললেন, সব অভিধানগুলিই আমি দেখেছি। কিন্তু এটির মতো কোনটা নয়। পড়তে হলে ভাল বই-ই কিনবো, তাতে পেশার দিক থেকে অনেকখানি লাভ হবে। এই অভিধানটি আমার পছন্দ।

পছন্দ তো বুঝলাম। কিন্তু কম দামে দেবার যে উপায় নেই।

ভূদেবের মুখ ম্লান হয়ে গেল। হয়ত একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসও পড়ল। ব্যথিত হৃদয়ে সে দোকান থেকে বেরিয়ে অন্ত দু'চারটি দোকান ঘুরলেন, অনেকগুলি অভিধান দেখলেন, কিন্তু কোনটিই পছন্দ হল না।

খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে আবার তিনি ফিরে গেলেন বেনী মাধবের দোকানে। অভিধানটি চেয়ে নিয়ে নিবিষ্ট মনে পাতা উল্টে দেখতে লাগলেন।

দশ মিনিট। পনের মিনিট। আধঘণ্টা।

দেখা যেন আর শেষ হয় না! দেখে দেখে আশ মেটে না। কিন্তু এমনি ভাবে কতক্ষণ যাবে?

দোকানের মালিক ভূদেবকে লক্ষ্য করছিলেন, তিনি বুঝতে পারলেন, জ্ঞানসাগরের প্রতি ছেলেটির দুর্বার আকর্ষণ, অথচ তার চার টাকা দেবার সত্যিই ক্ষমতা নেই! ক্ষমতা থাকলে হয় সে পুরো দাম বাড়ি থেকে নিয়ে আসতো, না হয় পরে দিয়ে যেতো! তাছাড়া, ছেলেটি কী সৎ! দাম দিতে পারুক আর নাই পারুক, এমন সুযোগ কোন অসৎ ছেলেই ছাড়ত না। দু'টাকা দশ আনা দিয়ে বইটা নিয়ে যেতো, তারপর আর এমুখো হ'ত না।

দোকানের মালিক ডাকলেন ভূদেবকে। বললেন, অনেকক্ষণ ধরে বইটা দেখছো! খুব ভাল লাগছে বুঝি?

আজ্ঞে হ্যাঁ! বইটা খুব ভাল।

সবিনয়ে বললেন ভূদেব।

মালিক বললেন, বইটা তোমায় চাই-ই চাই, কী বল!

ভূদেব বললেন, কিন্তু···

বুঝেছি। আমি তোমাকে বইটি দুটাকা দশ আনাতেই দিলাম!

সত্যিই দুটাকা দশ আনায় দিলেন?

হ্যাঁ। পরে আর তোমাকে কিছু এনে দিতে হবে না।

কৃতার্থ চিত্তে ভূদেব পকেট থেকে দাম বার করে দিলেন।

বইটি প্যাক করে ভূদেবের হাতে দিয়ে মালিক বললেন, যখন ইচ্ছে আমার দোকানে এসো। যে বই পছন্দ নিয়ে যেও। দাম তোমাকে দিতে হবে না। শুধু বইটি যত্ন করে ব্যবহার করো আর বইটা পড়া শেষ হলে ফিরিয়ে দিয়ে যেও।

দোকানের মালিকের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন ভূদেব।

খাঁটি সোনা—ঠিকই চিনেছিলেন সেই বই-এর দোকানের মালিক বেনীমাধব দে। উত্তরকালে সেই গরীব ছাত্রটী হয়েছিলেন বাংলার শিক্ষাধিকর্তা, সর্বোচ্চ বেতন পেয়েছেন মাসে দেড় হাজার টাকা। বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষীরূপে গণ্য হয়েছিলেন তিনি। শেষ বয়সে দেশবাসীর শিক্ষা আর চিকিৎসার জন্ত দান করেছিলেন এক লাখ আট হাজার টাকা।

প্রাতঃস্মরণীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়। তাঁর উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কময় জীবননাট্যে সেই বই-এর দোকানের মালিক বেনীমাধব দের ভূমিকাটিও স্মরণীয়।

আবার সেই জেল

দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বারো

এই ১৯৪৮ সালেই, যতদূর মনে পড়ে, দুর্গাপূজার অব্যবহিত পূর্বে আমাদের টনসপেটার জেনারেল অব প্রিজন্স ডা: পি. কে. বিশ্বাস অবসর গ্রহণ করলেন। কিন্তু তিনি চাকরি ছাড়লেও চাকরি তাঁকে ছাড়ল না। তিনি পুনরায় হোম (জেলস) ডিপার্টমেন্টেই স্পেশাল অফিসার এ্যাণ্ড ডেপুটি সেক্রেটারী নিযুক্ত হলেন।

এমন দিলখোলা ও সজ্জন ব্যক্তি আমি খুব বেশী দেখিনি। মুখে তাঁর সর্বদাই মিষ্টি হাসিটি লেগেই আছে। শুধু অফিসার কেন, কেরাণী বাবুরা, এমন কি পিওন বেয়ারাদের সঙ্গেও কি সীমাহীন সৌহার্দ্য ও মিষ্টি ব্যবহার! এমনি ওপরওয়ালা পাওয়া ভাগ্যের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা।

যতবারই রাইটার্স বিল্ডিংস-এ গিয়েছি, ততবারই কোন কাজ না থাকলেও বিশ্বাসের ঘরে কয়েক মিনিটের জন্য হলেও না গিয়ে পারিনি। কিন্তু কোন বারই কয়েক মিনিটের মধ্যে ছাড়া পাইনি। অফিসের কাজকর্ম নিয়ে আলাপ সুরু হত, তারপর এসে পড়ত নানা সরকারী পরিকল্পনার কথা, নানা সুবিধা অসুবিধার কথা, হয়ত এরই মধ্যে এসে গেল আজকের সমাজ ব্যবস্থার কথা, মানুষের চিন্তাধারা বৈপ্লবিক রূপান্তর, নতুন আদর্শে নতুন সমাজ গঠনের কথা, এরই মধ্যে হয়ত দুটো হাসির কথাই বললেন এবং আমায় হাসিয়ে দিয়ে নিজেও হাসতে লাগলেন। পদাধিকারের সুযোগ নিয়ে তিনিই যে শুধু বক্তৃতা দেবেন আর অধীনস্থ কর্মচারী আমি শুধু কান পেতে শুনে যাব, তা নয়। তিনি যেমন নিজের কথা জোরের সঙ্গে বলছেন, তেমনি আমাকেও বলবার সুযোগ দিচ্ছেন, আগ্রহভরে শুনছেন আমার বক্তব্য, ঘন ঘন সিগারেট খাচ্ছেন, আধখানা খাওয়া সিগারেটটাই এ্যাস ট্রেতে চেপে দিচ্ছেন, ট্রে উপচে ছাই পড়ছে টেবিলে, খোলা ফাইলের যে পৃষ্ঠায় এসেছিলেন, সেখানে একটা পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে রেখেছেন, পিওন এসে ভিজিটিং কার্ড দিলে, না দেখেই চাপা দিয়ে রাখছেন, কোন কেরানী ফাইল সই করাতে এসে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে ফাইল রেখেই চলে যাচ্ছেন, টেবিলে ফাইলের স্তূপ বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই তাঁর —এমনিভাবে হয়ত ঘন্টাখানেক কেটে যেত। তখন আমিই উঠে পড়তাম, নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে আসতাম।

অত্যন্ত ভদ্র ব্যক্তি। যাঁরাই ওঁর সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁরাই মুগ্ধ হয়েছেন ওঁর অমায়িক ব্যবহারে সহাস্য আলাপে আলোচনায় ও বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্যে।

তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাবার জন্য বিরাট সভার অনুষ্ঠান হল আলীপুর ও প্রেসিডেন্সী জেলের মাঝখানে ফুটবল খেলার যে মাঠ আছে, সেই মাঠ সংলগ্ন প্যাভিলিয়নে। বক্তৃতা দিলেন আলীপুর জেলের সুপারিনটেনডেন্ট চারুচন্দ্র চক্রবর্তী, অধুনা সাহিত্যজগতে যিনি 'জরাসন্ধ' ছদ্মনামে সুখ্যাত, আর প্রেসিডেন্সী জেলের সুপারিটেনডেন্ট ডাক্তার সুপেন মুখোপাধ্যায়। ওবাবে কি বলেছিলেন ডাক্তার বিশ্বাস, আজ আর তা মনে নেই। তবে মনে আছে উপসংহারে বলেছিলেন যে, তিনি ত একেবারে বিদায় নিচ্ছেন না, কারা বিভাগেই উচ্চতর পদে পুনরায় নিযুক্ত হচ্ছেন, সুতরাং ওঁর দরজা এখনকার মতই সর্বদাই সবার জন্য খোলা থাকবে।

আর মনে আছে, প্যাভেলিয়নে লোক ধরছিল না, বহু লোক বাইরে ভিড় করে দাঁড়িয়ে নীরবে এই জনপ্রিয় আই জি-র আবেগময় ভাষণ শুনছিল। তারা সবাই জেল বিভাগের কর্মী।

এ হেন আই জি-র শূন্য সিংহাসনে যিনি এসে উপবেশন করলেন, তিনি বিশ্বাসের মত এম-বি বি-এস ডাক্তার নন, তিনি ডক্টরেট ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ-ডি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা গুলির কোনটাতেই নাকি দ্বিতীয় হননি তিনি। জেল বিভাগের পূর্বে তিনি ছিলেন গৌহাটি কলেজের অধ্যাপক, জেল বিভাগের পর তিনি চলে এলেন কলকাতায়, সহজেই একটি প্রাইভেট কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে গেলেন। কিছুদিন পর কলেজ বদলালেন, কিছুদিন পর আবার। বিভিন্ন কলেজে অধ্যক্ষতা করবার পর সর্বশেষে যখন একটি গভর্নমেন্ট কলেজে চাকরি করছিলেন, তখন অকস্মাৎ এই বিদ্যার জাহাজটি অনুভব করলেন যে, মূর্খ শিক্ষক ও ছাত্র একজনও তাঁর বিদ্যাবত্তা অনুধাবন করবার যোগ্য নয় এবং তাঁর কর্মক্ষেত্র পড়ে আছে 'হেথা নয়, অন্য কোনোখানে'। কে না জানে যে, পরীক্ষা না দিয়েও আই-এ-এস হওয়া যায় সরকারী মনোনয়নে। মনোনয়ন সংগ্রহের ব্যাপারে যে খুঁটির জোরের প্রয়োজন, তা ওঁর ছিল। সুতরাং অচিরাৎ তিনি হয়ে গেলেন আই-এ-এস। নামের শেষে ডিগ্রির লাঙুল আরও বর্ধিত হল। শিক্ষা জগতের অন্ধকার দূরীকরণে অসমর্থ হয়ে অধ্যক্ষকুলশিরোমণি এবার এলেন সরকারী প্রশাসনের বৃহৎ সিংহাসনে ক্লেদ ও কালিমা দাক্ষ করবার মহান উদ্দেশ্য ঘোষণা করে।

কিন্তু হায়, এখানেও বিধি বাম! পাঠানো হয় তাঁকে মাদ্রাজে একটি মহকুমার হাকিম করে। নিজ গুণে তিনি হলেন অস্থায়ীভাবে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। কিন্তু মাদ্রাজের ইডলি ও ঢোসা পরিপাক করা এমনই কঠিন হয়ে উঠল যে, তিনি বদলি প্রার্থনা করলেন এই পশ্চিম বঙ্গে।

অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পদে উন্নীত আই-এ-এস-কে এখানে এসে আবার মহকুমা হাকিম হতে হল। মহকুমা থেকে আবার ওঁকে নিয়ে আসা হল রাইটার্সে। প্রথমেই অর্থ বিভাগ, তারপর শিক্ষা বিভাগ, সমবায় বিভাগ, কুটির শিল্প বিভাগ, তারপর স্বাস্থ্য বিভাগ, পশু পালন বিভাগ, সেচ বিভাগ, শ্রম বিভাগ প্রভৃতি মোট বারোটি বিভাগে রোলিং স্টোনের মত ঘোরাঘুরির পর অবশেষে উনি হলেন প্রথমে হাওড়া, তারপর হুগলী, তারপর বীরভূম এবং সর্বশেষে মেদিনীপুরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। ঘেঁষে ঘেঁষে তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে, চাকরির শেষ ঘাম সমুপস্থিত প্রায়!

এমন সময় রিটায়ার করলেন ডাক্তার পি. কে. বিশ্বাস।

তাঁর শূন্য আসনে গভর্নমেন্ট আবার ওঁকেই বসিয়ে দিলেন। আমাদের দারা ইনসপেক্টার জেনারেল অব

প্রিজন। এতকালে এই পদে ডাক্তাররা নিযুক্ত হয়ে আসছেন, এই প্রথম এলেন একজন পি-এইচ-ডি ও সিনিয়র আই-এ-এস।

আমাদের নতুন ওপরওয়ালা!

সুপারিনটেনডেণ্ট ডাক্তার মজুমদার একদিন ডেকে পাঠালেন।

অফিসে তিনি সর্বদাই ভীষণ গম্ভীর থাকেন। আজ কিন্তু হাসলেন, হেসে বললেন, মিঃ সাহুলী, তিনি এসে গেছেন।

বিস্মিত কণ্ঠে বললাম, কার কথা বলছেন, ঠিক বুঝতে পারছিনা—

পারবেন, পারবেন, মজুমদার তখনও হাসছেন, কিছুদিন যাক না, তারপর মর্মে মর্মে টের পাবেন, কে এসেছেন। তারপর খুলে বললেন, কাল হেল্‌থ ডিপার্টমেণ্টে গিয়েছিলাম, ডিরেক্টার বললেন—যাকগে, কি বললেন, সে কথাটা আর নাই-বা শুনলেন। তবে আমায় পরামর্শ দিলেন, সুধীর, এবার নিজের ডিপার্টমেণ্টে ফিরে আসার ফিকির দেখ।

এবার আর বুঝতে অসুবিধা হল না: জিজ্ঞেস করলাম, আমাদের নতুন আই-জি-র কথা বলছেন?

মজুমদার জবাব দিলেন, মাদ্রাজ জালিয়ে এসেছে, থাকতে না পেরে ফিরে আসতে চাইলেন এখানে, এখানে ডিমোশন করে ওকে আবার এস-ডি-ও করে দেয়া হল, যদি শুধরে যায়। কিছু হল না, হাবাতে ডিপার্টমেণ্টে দেয়া হল, সর্বত্রই গোলমাল করল, রাখা গেল না, গভর্ণমেণ্ট ওকে নিয়ে কি করবে স্থির করতে না পেরে শেষটায় ঠেলে দিয়েছে জেল-ডিপার্টমেণ্টে। এবার টের পাবেন আপনারা!

হেসে বললাম, আপনিও বাদ যাবেন না।

হ্যাঁ—যে কদিন আছি।

মানে?

মানে, সত্যিই হেল্‌থ ডিপার্টমেণ্টে ফিরে যাবার দরখাস্ত দিয়ে এসেছি।

মজুমদার তখনও হাসছেন, কখন্ নইতে না পেরে ঝগড়া হয়ে যাবে, কি দরকার, তার চাইতে আমাদের ডিপার্টমেণ্টেই চলে যাই!

আমার ত আর ফিরে যাবার ডিপার্টমেণ্ট নেই। তাই বুঝতে পারলাম, আমার চাকরি জীবনে দুগ্রহের প্রাদুর্ভাব ঘটল। হয়ত প্রতিনিয়ত ঠোকাঠুকি করেই চলতে হবে।

কিছুদিন যেতে না যেতেই রৈমি-গেজেট মারফৎ সংবাদ পেলাম যে, আলীপুরের সুপার চারু বাবুর সঙ্গে এক হাত হয়ে গেছে তাঁর।

আই-জি-র গদীতে বসাবার আগে এই বিভাগটিকে গভর্ণমেণ্ট পাঠিয়েছিলেন আলীপুর সেনট্রাল জেলে ছয় মাস ট্রেনিং নেবার জন্য।

আত্ম-সম্মানে প্রচণ্ড আঘাত লাগল আই জি ডেজিগনেটের। যিনি গোটা-কয়েক কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ, যিনি সরকারী এক ডজন বিভাগের কোথাও প্রাক্তন সেক্রেটারী, কোথাও ডিরেক্টার, কোথাও স্পেশাল অফিসার; যিনি মেদিনীপুরের মত পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম জেলার প্রাক্তন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, যিনি ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পি এইচ ডি, তাঁকে বিনা শিক্ষানবিশী করতে হবে একজন লাবাস্ত এর

এ পাশ সুপারের কাছে। তাও পুরো ছয় মাস? একজন সিনিয়র আর আই. এ. এস-এর পক্ষে এ যে কত অবমাননাকর, আশ্চর্য্য যে, গভর্ণমেণ্ট একটিবার ভেবেও দেখলেন না তা!

রসমহাবিদ্যার মত বিভিন্নরূপে যিনি সারাজীবন শিক্ষা দানই করে আসছেন, তিনি আবার কি শিক্ষা গ্রহণ করবেন? সুতরাং চারুবাবু কিছু বোঝাতে গেলেই উল্টে তিনিই চারুবাবুকে ভাল করে সমঝে দিতে লাগলেন। পঞ্চান্ন বৎসর বয়েসের চারুবাবু যেন বিশ বছরের কলেজের ছোকরা, আর পাঠ নিচ্ছেন একজন প্রখ্যাত অধ্যক্ষের কাছে! লেকচার শোনাই তাঁর কাজ হবে, ইচ্ছে করলে নোটও নিতে পারেন। বাট নেভার টু কোশ্চেন।

এই বেয়াড়া ছাত্রটিকে ভাল লাগেনি অধ্যক্ষ-মহাশয়ের। কারণ ছাত্রটি তাঁর লেকচার কখনও বেমালুম হজম করত না, জবাব দিত, প্রশ্ন করত, প্রতি-যুক্তি দেখাত।

তাই ট্রেনিং-এর শেষে যদিও, ইনস্পেকশনের শেষে অফিসার যেমন ভাল লাগলে ভাল বলেই আসেন, তেমনিভাবে চারুবাবুকে বলে এলেন, আপনার জেলের কাজকর্ম ভালই দেখলাম, তথাপি গদিতে বসেই তাঁর সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান লক্ষ্য হল এই ট্রেনারকে খায়েস্ত করা।

তাই অকস্মাৎ একদিন চারুবাবুর সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে তিনি আলীপুর জেলে সোজা পাঠিয়ে দিলেন এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল অব প্রিজন্স এন. সি. সেনগুপ্তকে। চারুবাবু তখন অফিসে কাজ করছিলেন, কিন্তু আই-জি-র নির্দেশমত এ-আই-জি চারুবাবুকে কিছুই না জানিয়ে, এমন কি, জেলের যিনি সর্বাধিনায়ক, তাঁর জেলের অভ্যন্তরে প্রবেশের প্রাক্কালে তাঁর সঙ্গে ভদ্রতাসূচক দেখাটি পর্য্যন্ত না করে সোজা গিয়ে হানা দিলেন স্টোরে, রেজিষ্টারে মালপত্রের যে ব্যালান্স-ইন-হাণ্ড লেখা আছে, তার সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে প্রত্যেকটি দ্রব্যের পরিমাণ চেক করতে লাগলেন।

চারুবাবু এই অপ্রত্যাশিত হামলার খবর পেলেও কিছুই বললেন না সেনগুপ্তকে, কারণ তিনি ত এসেছেন হুকুম তামিল করতে। বরং স্টোর ক্লার্ক নীরেন দাশগুপ্তকে বলে পাঠালেন যে, সেনগুপ্ত যা যা দেখতে চান, সবই যেন দেখানো হয়।

তারপর ফোন করলেন আই জি-কে।

এ-আই-জি আর সেনট্রাল জেলের সুপার একই র‍্যাঙ্কের, তাঁদের একই মাইনের গ্রেড। সুপার বদলি হয়ে এ-আই-জি হতে পারেন, আবার এ-আই-জি-ও সেনট্রাল জেলের সুপার হয়ে আসতে পারেন। সুতরাং একই পদমর্য্যাদার একজন অফিসারকে পাঠিয়ে অন্য অফিসারের অধীনস্থ স্টোর ভেরিফিকেশন ও খাতাপত্র পরীক্ষা করানোটা নীতি ও রীতিবহির্ভূত কিনা, চারুবাবু আই জি-র কাছে জানতে চাইলেন। শুধু তাই নয়। সুপারিণ্টেনডেণ্ট অফিসে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাঁকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে জেলারকে নিয়ে জেলে প্রবেশ করাটা অশোভন ও সাধারণ ভদ্রতাবিরুদ্ধ কাজ হয়েছে কিনা, প্রশ্ন করলেন।

টেলি-গেজেটে আরও জানা গেল যে, ডক্টর আই-জি প্রথমে চারুবাবুকে প্রায় ধমক দিয়েই চুপ করিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলেন, বলেছিলেন, আমি যাকে খুশী, তাকে ডেপুট করতে পারি, আপনাকে জিজ্ঞেস করতে যাব না। চারুবাবু বিনীতভাবে জবাবে বলেছিলেন, তা তাঁর পারেন। কিন্তু আমার র‍্যাঙ্কের বা আমার নীচের র‍্যাঙ্কের কেউ যদি এমনিভাবে সারপ্রাইজ চেক করতে আসেন, তাহলে জানবেন, এবার থেকে তাঁকে আমার জেলে ঢুকতেই দেয়া হবে না। সে ক্ষমতা আমার আছে।

সামান্য সুপারের এই ঔদ্ধত্যে আই জি নাকি তাজ্জব বনে গিয়েছিলেন।

আমার সঙ্গে আই জি-র প্রথম সাক্ষাৎ আমার বেতার ভাষণ প্রসঙ্গে।

কলকাতার বেতার কেন্দ্র থেকে 'সাময়িকী' পর্যায়ে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে প্রতিপক্ষে বাংলায় ভাষণ দিতেন সুখ্যাত সাংবাদিক ও সম্পাদক। আমিও কয়েক বছর ধরে কোন কোন পক্ষে ভাষণ দেবার জন্য আমন্ত্রিত হতাম।

ভালই চলছিল এতদিন। আই-জি ডাক্তার বিশ্বাস আমার মুখে আমার ভাষণের পাণ্ডুলিপি শুনতেন, তারপর মার্জিনেই লিখে দিতেন, সেন্সর ও পাস করা হল ইন এ্যাকর্ডিলেন্স উইথ স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার্স অব গভর্নমেণ্ট।

নতুন আই-জি লিখে পাঠালেন, না, তা হবেনা। প্রপার চ্যানেলে ভাষণটি কয়েকদিন আগে তাঁকে পাঠাতে হবে, তিনি সেন্সর করে পাঠাবেন গভর্নমেণ্টকে, গভর্নমেণ্ট সেন্সর করে ফেরৎ দেবেন তাঁকে, তিনি ফেরৎ দেবেন আমাকে। এই প্রপার চ্যানেল ছাড়া ওসব শর্টকাট ওয়েতে চলবে না।

আর লেখালেখি না করে গেলাম রাইটার্সে ১৯৪৮ সালে পুজোর পরই।

বিশ্বাসের আমলে ঘরে অন্য কেউ না থাকলে সোজাই ঢুকে যেতাম আর বিশ্বাস সহাস্য অভ্যর্থনা জানাতেন, আসুন, আসুন। তারপর বলতেন, বসুন।

সেদিন প্রথম বাধা পেলাম। চেনা সুধীরবাবু মুচকি হেসে বললেন, ঘরে অন্য কেউ নেই বটে, কিন্তু ভিজিটরস স্লিপ পাঠাতে হবে।

পাঠালাম।

ডাক এল মিনিট পনেরো পর। হ্যাঁ, পনেরো মিনিট।

প্রবেশ করলাম। কিন্তু কৈ, বিশ্বাসের সমরকার সেই 'আসুন'। তারপর 'বসুন' শব্দদুটি নিষ্কচারিত কেন? আই-জি মুখ তুলে এক বলক আমায় দেখলেন শুধু, তারপর ফাইলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। আমি দাঁড়িয়েই রইলাম।

হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, আপনি যে ডেপুটেশন লীড করে এসেছেন, পারমিশন নিয়েছেন সুপারিনটেনডেণ্টের?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি জবাবে বললাম, লিখিতভাবে জানিয়ে এসেছি—

শুধু জানিয়ে এসেছেন? উনি পারমিশন দিলেন কিনা, তা না জেনেই চলে এলেন?

ধীর কণ্ঠে বললাম, ডাক্তার মজুমদার বলে দিয়েছেন, জানালেই চলবে।

হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, মজুমদার ত ডাক্তার, জেলের কাজের কি বোঝে? কাজ করতে পারে?

মৃদুতার সঙ্গে উত্তর দিলাম, বেশ ভালভাবে করতে পারেন—

ওসব আমার বিশ্বাস হয়না, বাধা দিয়ে বললেন, ডাক্তাররা ঢুকেই জেল ডিপার্টমেণ্টটাকে ডুবিয়েছে। যেমন ছিল আপনাদের ডাক্তার আই সি।

মনে মনে বললাম, না, না, ডাক্তাররা জেল ডিপার্টমেণ্ট চালাতে পারবেন কেন, পারলেন ডক্টর পি এইচ ডি! তোরা ডিপার্টমেণ্টকে সপ্তডিঙা মধুকরের মত আবার ভাসিয়ে তোলবার জন্যই এসেছেন সেক্রিফাইস!

একটু পরে জিজ্ঞেস করলেন, কি চাই আপনার?

ব্যাখ্যা করে বললাম সব।

মাথা নাড়লেন বার-কয়েক, নো, নো, নো, তা হতে পারে না। আপনি প্রপার চ্যানেলে লেখা

পাঠাবেন, গভর্ণমেণ্ট অর্ডার আপনাকেও প্রপার চ্যানেলে জানানো হবে। ওয়েল, তবে লেখাটা অন্ততঃ দশ দিন আগে দেবেন। রিজনেবল টাইম চাইছ কাইল দ্যাভাম্যাতের জন্ত।

কিন্তু এতকাল—

এতকাল কি হত, না হত উগ্রস্বরে বললেন আই জি, তা আমার জানবার দরকার নেই। আমি ত মনে করি, এতকাল এখানে ডিসঅনেষ্টি চলত, এখনও তাই বলে চলবে নাকি?

কিন্তু স্যার, তবু বোঝাতে চেষ্টা করলাম, এত ঘুর পথে গেলে কোনোবার হয়ত ভাষণের তারিখ পার হয়ে যাবার পর অনুমোদিত পাণ্ডুলিপিখানা আমার হাতে এসে পৌছবে। তখন তা দিয়ে আর কি করব?

কি আর করবেন, আপনার দেবার আর ভাষণ দেয়া হবে না, স্পষ্ট কথা বলে দিলেন, ওয়েল্, তাই বলে আপনি যাতে ভাষণ দিতে পারেন, ভাষণ দিয়ে কিছু পয়সা রোজগার করতে পারেন, তার ব্যবস্থা করে দিতে হবে? আপনার রোজগারের পথ খোলা রাখবার জন্ত এ চেয়ারে বসিনি, বুঝলেন? জেল ডিপার্টমেণ্টে ডিসঅনেষ্টি দারুণভাবে চলছে বলেই আমায় এখানে আনা হয়েছে।

তারপরই লেকচার সুরু করলেন প্রাক্তন কলেজ-অধ্যক্ষ, আমি যখন মেদিনীপুরের ডিসট্রিক্ট-ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে গেলাম, গিয়ে দেখলাম, ওখানে সব চোরের রাজত্ব চলছে। সার্কেল অফিসাররা টুর না করেই টি-এ বিল দেয়, একখানা রেশন দোকানের পারমিট বার করতে হলে সাব ডিভিশনাল সুদ্ধ কনট্রোলারকে ঘুষ দিতে হয় হাজার টাকা, এস ডি ও-রা গ্রামে তদন্তে গিয়ে তরিতরকারী ঘুষ নিয়ে আসামীকে ছেড়ে দেয়, অস্তিত্বহীন সব লোকের নামে রিলিফের টাকা ব্যয় দেখানো হয়, যাকে বলে লুটের রাজত্ব। But when I took over charge, আই জি-র কণ্ঠে এবার গর্ব্ব ও পুলক ঝঙ্কারিয়ে উঠল, ওয়েল, সব ঠাণ্ডা করে দিলাম। একদিকে anticorruption case, অন্ত দিকে departmental proceedings! আমার ধারণা, জেলেও কোন অফিসার চাল, ডাল, তেল, নুন, চিনি, আটা কিছুই কেনেন না, সবই জেল থেকে যায়। আপনিত শুনছি স্বদেশী করে জেলও খেটেছিলেন, আপনার কি ধারণা?

এবার জবাব না দিয়ে পারলাম না, বললাম, এ কয়মাসে আমার যা ধারণা হয়েছে, তা কিন্তু স্যার, আপনার সঙ্গে মিলছে না। জেলে যে দুর্নীতি একেবারে নেই, তা বলছি না, তবে অনেক কর্মী ও অফিসারই বেশী—

Oh! you are optimist, আশাবাদী, আই জি বলে উঠলেন, স্বদেশীওয়ালারা যেমন হয়ে থাকে। শুধু সেণ্টিমেণ্টাল।

চট্ করে এক ঝলক রক্ত মাথায় যা মারল। সবাইকেই ওঁর অবজ্ঞা! সবাই চোর? বিপ্লবীদের অবজ্ঞাভরে বলছেন, স্বদেশীওয়ালা, বলছেন, ওরা শুধু সেণ্টিমেণ্টাল?

কিন্তু সামলে নিলাম। ভবিষ্যতে সংঘর্ষ এড়াতে পারব না জানি, তবে প্রথম সাক্ষাতেই আর তিক্ততা সৃষ্টি করলাম না। বললাম, আমি তাহলে এখন স্যার, যেতে পারি?

বিশ্বাসের সেই 'আচ্ছা আসুন' শুনতে পেলাম না, উনি বললেন, যান।

সোজা গেলাম তাক্তার বিশ্বাসের চেম্বারে।

চা খাচ্ছিলেন। সমাদর করে বসিয়ে আর-এক কাপ চায়ের অর্ডার দিলেন, তারপর হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলেন, কি খবর মিঃ গাঙ্গুলী, নতুন আইজির কাছে এসেছিলেন নাকি?

বললাম সব। আই জি-র অভদ্র আচরণের কথাও বাদ দিলাম না। চারিদিকে যে দুষ্কৃতকারীদের বিভীষিকা দেখছেন এবং তারস্বরে ঘোষণা করলেন যে তাদের বিনাশের জন্যই উনি জেল ডিপার্টমেন্টে আবির্ভূত হয়েছেন, তাও বললাম। পরিশেষে জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে কি স্যার, আমার বেতার ভাষণ ছেড়ে দিতে হবে?

কেন ছেড়ে দেবেন? বিশ্বাস তৎক্ষণাৎ বাধা দিলেন। তারপর মৃদু মৃদু হেসে বললেন, শুনুন মিঃ গাঙ্গুলী, ডাইরেকটরেটের ওপরে সেক্রেটারীয়েট, আমি সেই সেক্রেটারীয়েটের ডেপুটি সেক্রেটারী আর সেক্রেটারীয়েট মানেই কার্যতঃ গভর্ণমেণ্ট। সুতরাং আমি আপনার ভাষণ পাশ করে দিলেই সেটা গভর্ণমেণ্টের পাশ করা হয়ে গেল। ডাইরেকটরেটের কর্ত্তা আই-জি কখনও গভর্ণমেণ্টের কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। আপনি যেমন আমার পাণ্ডুলিপি দেখিয়ে নিচ্ছিলেন, তাই নিয়ে যাবেন। ওকে আপনার কিছুই জানাবার দরকার নেই। আমরা বরং আপনাকে পারমিশন দেওয়া চিঠির একটা কপি করে ইনফরমেশন আই জি-কে পাঠিয়ে দোব।—ব্যস, মামলা মিটে গেল।

খুশীতরা মন নিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে এলাম।

মজুমদার মন দিয়ে শুনলেন প্রথম মোলাকাতের বিবরণ।

তারপর হেসে ফেললেন। বললেন, আমি আপনাকে বলেছিলাম না, এবার মিলিয়ে নিন।

বললাম, শুধু একটুখানি সান্ত্বনা এই যে, ওঁর রিটায়ারের খুব বেশী দেরী নেই, বড় জোর এক বছর।

মজুমদার আবার হাসলেন, নৌকোর তলা ফাঁসিয়ে দিলে ডুবতে এক বছর সময় লাগে না মিঃ গাঙ্গুলী।

তারিখটা আজও মনে আছে, মনে থাকবেও চিরকাল ১৯৫৯ সালের ৪ ফেব্রুয়ারী।

ভোরে উঠেই দেখি, টেবিলে আমার হাতঘড়িটি নেই।

হয়ত আজোরী নিয়ে শুয়েছে। আলগোছে ওর খাটের মশারী তুলে দেখলাম, না, নেয়নি ত।

নিশ্চয়ই তাহলে ছেলে মেয়েরা কেউ নিয়েছে। বিরক্ত হয়ে ধমকই দিলাম বুবুলকে, কিন্তু বুবুল ঘুমের চোখে জানাল, ওরা নেয়নি।

সে কি, ঘড়ি কোথায় গেল তাহলে? কাল বিকেলে অফিসে ফেলে এসেছি? কিন্তু হাতঘড়ি খুলব কেন হাত থেকে?

ভাবতে ভাবতে বাথরুমে ঢুকতে যেতেই দেখি, নীচে যাবার ছোট সিঁড়িটার দরজা ভেজানো। কে খুলল? এখনও ত আর কেউ ওঠেনি। আবার দেখছি, উলটো দিকে বাচ্চাগুলো যে ঘরে থাকে, সেই ঘরের দরজাটাও ভেজানো। সে কি। এ দরজার সামনে ত আলমা। কে খুলেছে এ দরজা আলমা সরিয়ে?

তাড়াতাড়ি ঢুকলাম সে ঘরে।

ঢুকেই চক্ষুস্থির!

ট্রাঙ্ক দুটোর তালা খোলা সুটকেস ও এ্যাটাচি কেসের ঢাকনি কাটা, আলমাটা একেবারে খালি। ছুটে গেলাম বারান্দায় রান্নাঘরে। কি এঁটো, কি না-এঁটো, একটিও বাসন-কোসন দেখলাম না।

ছুটে ফিরে এলাম ঘরে। সবাইকে ডেকে তুললাম। চুরি হয়ে গেছে। চুরি। চুরি।

মুহূর্তে হল্লা পড়ে গেল। নীচে থেকে লালমণি, তার বাবা, তার আরও কজন আত্মীয়, যারা ওদের ওখানে বেড়াতে এসেছে, সবাই ছুটে এল।

কি চুরি গেছে খোঁজ করতে গিয়ে দেখা গেল কি চুরি যায়নি, সেটা বলাই সহজ। আমার ঘড়ি গেছে। জানুয়ারীর মাইনে পুরোটাই ছিল আমার স্যুটকেসে, গেছে। আত্রেয়ী ও বুবুলের বাক্সে যত গয়না ছিল, সব গেছে। বাক্সের সব সাড়ী গেছে, আলনার সব সাড়ী, ধুতি, প্যাণ্ট, সার্ট, যা কিছু ছিল সব। দড়ির ওপরকার তোয়ালে, গামছা, লাঙ্গা, ব্লাউজ, একটা নতুন বাড়তি তোষক ও বিছানা, রান্নাঘরের সব বাসন, টেবিল ক্লথ, চেয়ার ঢাকনি, কাপ ডিস, ফুলদানী, সব—সব গেছে।

অর্থাৎ একেবারে সর্বস্বান্ত করে দিয়ে গেছে বলা যায়।

খবর পেয়ে সবাই এসে পড়লেন। জেলার, ডেপুটি জেলাররা, অফিস বাবুরা, সিপাইদের মধ্যে অনেকেই এবং সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ডাক্তার মজুমদার। থানায় খবর দেয়া হল। লালবাজারে ফোন করে ফিঙ্গার প্রিণ্ট ফটোগ্রাফারকে পাঠাতে বলা হল। আই জি-কে জানানো হল।

দারোগা ছুটে এলেন, ফটোগ্রাফার এসে অনেকগুলো ফটো নিলেন, তৎক্ষণাৎ সারা বাড়ীটা তাল করে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করা হল, অনেককে প্রশ্ন করা হল, অনেক রিপোর্ট লেখা হল, তারপর থেকে অনেক দিন পর্যন্ত তদন্তকারী দারোগা অনেকবার আমার অফিসে এসে আশ্বাস দিয়ে গেলেন।

কিন্তু কিছুই হল না।

চোর ধরা ত দূরের কথা, সন্দেহক্রমেও কেউ গ্রেপ্তার হল না।

চাকরির এক বছরের মধ্যেই জেল প্রাঙ্গনের ভেতর সরকারী কোয়ার্টার্স থেকে এক ভয়ানক রকমের চুরিতে আমাদের টাকা পয়সা, গয়নাগাটি, কাপড়চোপড় সব খোয়া গেল।

[ক্রমশঃ

একটি জ্যোৎস্না রাতে

সুকুমার রায়

কটক শহর। পূর্ণিমা রাত্রি।

মঙ্গলাবাগের একটি হোটেলের পুরোনো ভাড়াটে। রাত্রিতে ঘরে ফিরে শুনতে পেলাম, মালিক নেই। পূর্ণিমার জন্যে সব বন্ধ—আহারও।

খাদ্যহীন রাত্রি, বেকার যেন। বুঝতে পারছি, কয়েক মিনিট পরেই পেট চন্‌চন্ করতে থাকবে। রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। পথে সামান্য কয়েকটি দোকান ছাড়া সব বন্ধ। রাস্তার কালো ষাঁড় দুটোও বেকার, হয়ত খাদ্য কোথাও জুটেছে।

কিন্তু আমার কি হবে? মাথার ওপর জ্যোৎস্না সেও কানে কানে বললে 'এমন চাঁদের আলো যদি সেও ভালো।' কিন্তু আমি মরতে পারব না। অতএব নিজেই জিজ্ঞেস করি, আমার মন থেকে চাঁদ তুমিই মরতে বসেছো কি?

যেতে হবে অনেকটা পথ। বস্ত্রীবাজারে রেস্তোরাঁ আছে, কখনো বন্ধ থাকে না, ওরা আধুনিক ধরনের। ওরা পূর্ণিমা মানে না। হ্যাঁ, গত দুবছর কটকে এমন ঘটনা আরো ঘটেছে। বিশ্বাস করতে সুরু করেছি উড়িষ্যা পূর্ণিমার দেশ। পূর্ণিমার সঙ্গে এখানে যেন জীবনের যোগ স্থাপন করবার একটা চেষ্টা হয়েছিল কোন এক যুগে। আমি ক্ষুদ্র চাকুরে। দেশ দেখিনি বেশি। তাই যা দেখেছি তাতে উড়িষ্যার পূর্ণিমা আমাকে মুগ্ধ করেছে!

এখনো ভুলতে পারিনে পূর্ণিমার সেই উৎসব। সেবার প্রথম এখানে পৌঁছে আশ্বিনের রাত্রিতে মেয়েদের ওড়িশী নৃত্যের অভিনয়। কাঠজুড়ি নদীর বাঁধে হেঁটে হাইকোর্ট বাঁয়ে রেখে এগিয়ে একটি ইস্কুলের প্রাঙ্গণে। সেখানে স্টেজ বেঁধে হয়েছিল এই কুমারী মেয়েদের উৎসব। প্রতিবছর বাংলায় যখন চলে কোজাগরী পূর্ণিমা, ওড়িয়াদের মধ্যে তখন 'কুমার পূর্ণিমা'র মূর্ছনা নতুন করে চিরতরুণতার কৌম-স্পন্দন প্রতীক হয়ে ওঠে নৃত্যের উৎসবে। বাংলা যখন শুভ্র নীরবতায় রূপসী পূর্ণিমাতে লক্ষ্মীর ধ্যানে মগ্ন, উড়িষ্যায় তখন যৌবনমুখর রাত্রিতে কুমারীরা চঞ্চলা, তাদের আঙুল, করপল্লব, বাহুলতা, কীণতনু কটির বক্রতায় আর ধ্বনিত পদস্থাপনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে চারদিক। কলরবমুখর কুমার-কুমারীর চিরন্তন স্বপ্নের অভীপ্সা নৃত্যে ও গানের মহিমায় ফুটে ওঠে। হিমশুভ্র আলোর স্পন্দনে স্পন্দিত জ্যোৎস্নার নতুন অর্থ প্রতিভাসিত হয় প্রত্যেকটি মনে। কুমারী মেয়ে বন্ধুকে ডেকে বলে "ওলো আমার চুল-বউল-বেণী। একি আশ্চর্য জীবনে আমরা পৌঁছে গেছি। এই পূর্ণিমা রাত্রিতে এখন কি খেলা খেলবে?

"আমরা পুচি খেলব, 'ও আমার চুল-বউল বেণী।"
কুঁয়ার পুণেই জন গো
চুল-বউল বেণী।
কুমারী মানে যে পুচি খেলুছন্তি
গোঁটিয়া নক্ষ শুন গো
চুল বউল বেণী।

পুচি খেলার অভ্যাসতো গ্রামে গ্রামে মেয়েদের প্রধান আনন্দ আর অঙ্গ সৌষ্ঠব জোগাবার অবলম্বন ছিল। আজকের শহর তাকে ভুলেছে। আশ্বিনের "কুমার পুর্ণিমা" রাত্রিতে তারও প্রতীক জেগে ওঠে নৃত্যে গানে যৌবনের নবজাগরণে। উড়িষ্যার সহরে সহরে চলে এ উৎসব। ওড়িশী নৃত্যের প্রতিষ্ঠাপনা হয়। প্রাচীন হেহলীর গায়ে আঁকা নটীদের হাতে ভঙ্গি ও মুদ্রাগুলো নৃত্যশিল্পীর হাতে পায়ে দেহের বাঁকা গতিতে কথা কয়। প্রতি আশ্বিনের জ্যোৎস্নায় এ উৎসব চলে। কটক সহরে আজকাল বারবাটী ক্রীড়া প্রাঙ্গনে জাতীয় উৎসবের মতো জমে যায় 'কুমার-পুর্ণিমা।'

এখন থাক সেই কথা। পুর্ণিমা রাত্রিতে আমার সুধা আমাকে ভুলিয়ে দিতে চায়। চাঁদটা কি সরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে? জ্যোৎস্নার সামান্ত রেখাও কি মনে আসছে?

ছয়া-পাটনার একটি চালাঘরের তলায় এসে দেওয়ালে হাত রেখে অন্ত হাতে শিকল ঠুকলাম দরজায়। —সনাতন অছন্তি কি? সনাতন আছেন কি?

দরজা খুললে সনাতনের বোন সবিতা, নমস্কার, আইজ্ঞা।

নমস্কার। যাচ্ছিলাম এই পথে তোমাদের খোঁজ করে গেলাম। কি করছ?

সবিতা যা বলল, সংক্ষেপে: সনাতন সন্ধ্যা থেকেই ঘুমুচ্ছে। কাল অনেক রাত্রি জেগেছে। যাত্রা দেখেছিল। আজ পুর্ণিমা, বাড়িতে হাঁড়ি বন্ধ, উনুন জ্বলেনি। তাই, সবিতা একলাটি বসে কবিতা পড়ছে। সাধারণত পড়ে না ওসব। কাল ইস্কুলের ছাত্রীদের টিউটোরিয়াল ক্লাস নিতে হবে—কাজে লাগানো যাবে।

জিজ্ঞেস করলুম, কার কবিতা?

ডক্টর মায়াধর মানসিং। উড়িষ্যার প্রবীন কবি সমালোচক। ইনি মহানদীর কথা সুন্দর করে বলেছেন—

আমি যোগ দিলুম। বাঙালী কবি যেমন পদ্মার কথা বলেন। বললুম, শোনাবে কি কবিতা পড়ছ। কিন্তু শুধু শুধু বসে কবিতা শোনা যায় না, চায়ের সঙ্গে কবিতার একটা সম্পর্ক আছে।

সবিতা হকচকিয়ে দাঁড়ালে,—ষ্টোভ জ্বালিয়ে চা করব। ঘরে মায়ের পাঠানো "পোড়পিঠা" আছে, তাই খেয়ে নেবেন।

মনে হল মহানদীতে জ্যোৎস্নার চেয়েও একটা স্বচ্ছ আলোকের সন্ধান পাচ্ছি। পোড়পিঠা নামে জিভে জল আসে। এখানকার একটি মেয়ে খাবার পোড়পিঠা—চালার পুডিং। সেই সঙ্গে কবিতা অথবা গল্প—যাই হোক, শুনতে আপত্তি কি? ভালই লাগবে। তারপর ধীরে ধীরে হোটেলমুখো হওয়া যাবে। সবিতা চায়ের সন্ধানে গেল।

এখন চাঁদের আলো ভাল লাগবে। চাঁদের আলোর দেশেই যে বসে। উড়িষ্যা-যে চাঁদের আলোর

দেশ! কথাটি আমারই মনে হয়েছে বারবার, যেমন ভাবি বর্ষার দেশ বাংলা। তা বলে কি জ্যোৎস্না বাংলার চমৎকার নয়? এখনি মনে পড়ছে দুটো জ্যোৎস্না রাত্রির কথা!

ছেলেবেলায় একবার টিমার থেকে নেমে নৌকো করে ফরিদপুরের একটি গ্রামে যাচ্ছিলুম কোন একটি বিয়ে উপলক্ষে। পদ্মানদীতে দেখেছিলাম অপরূপ সে দিগন্ত-বিস্তৃত চাঁদোয়া-বিছানো পৃথিবী। নৌকোর ছইএর ওপর বসে রাত কাটিয়েছিলাম। আরো একটি সজল জ্যোৎস্না-ভরা বর্ষার শ্রাবণের পূর্ণিমা রাত্রিতে দেখেছিলাম ধলেশ্বরী নদীতে। বিক্রমপুর থেকে ঢাকায় ফিরছিলাম গহনার নৌকোতে। নৌকোর পেছনে গলুইএর একপাশে বসে দেখেছিলাম নিস্তরঙ্গ জলরাশি কেটে, হীরের হাসি চারদিকে কেটে কেটে লাইন করে অনেকগুলো গহনার নৌকো পাড়ি জমিয়েছে। এমন শ্রাবণ জ্যোৎস্নায় গহনার সন্ধান কোথায় পাওয়া যাবে? কিন্তু স্নিগ্ধ চোখের কানায় কানায় ভরা হাসি বোধহয় আর কোথাও মেলে না।

এরপর জীবনে আরো কত শত পূর্ণিমা চলে গেছে। এখন মনে পড়ছে একটি শুধু। এক পূর্ণিমার রাত-জ্যোৎস্নায় শান্তিনিকেতনে ঘুরে বেড়াচ্ছি। মাঘমাস। বিশ্বাস হচ্ছিল না শুভ্র কাঁচের আলোয় নিস্তব্ধতাকে: কবি আম্রকুঞ্জের চক্রবর্তী জ্যোৎস্নার মোহে গাছের কখনো শুকনো ঘাস মাড়িয়ে মাড়িয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমাকে চেনেন না। কাজেই সুবিধে হল—শোনা নিখুঁত। কয়েকদিন আগেই বোধহয় পৌষমেলা হয়ে গেছে. ঘুরে ঘুরে চিহ্ন পড়ে আছে। লালমাটির কাঁকড়পথে এগিয়ে গেলাম কতকটা। এ জ্যোৎস্না নিশিথে কুঞ্জকাননে যাওয়া চলেনা; রাত্রিচর হয়ে হেঁটে চলা যায় উদ্বেল হয়ে, যেমন উদ্বেলতা লক্ষ্য করেছিলুম কবির চলাফেরাতে। তা হলে জ্যোৎস্না কি উদ্বেলতা সৃষ্টির কারণ? হতে পারে। না হলে, কাদম্বরী নামে এতবড় গদ্য কাব্যের সৃষ্টি আদৌ হত কিনা সন্দেহ।

হ্যাঁ, আরো একটি জ্যোৎস্না মনে পড়ে যায়। মনে পড়ার যে কোনো আইন নেই। এই জ্যোৎস্না পেয়েছি বইএর পাতায় বিভূতিভূষণের "আরণ্যক" উপন্যাসে। বনজ্যোৎস্নার এমন রূপ আর কোথাও সৃষ্টি হয়নি আজ পর্যন্ত যতদূর জানি। এই জ্যোৎস্না রূপে-বাতাস মানুষের কৃতি। আমরা এমন হতে পারিনে তাই জ্যোৎস্নার কথা ভাবি প্রয়োজনের পরিবেশে পড়ে।

সবিতা চা তৈরি করে নিয়ে এলো। একটি ছোট কাঠের আলমারী থেকে খুলে 'পোড়পিঠা' ছোট একটি ঝকঝকে রেকাবীতে করে আমাকে বাড়িয়ে দিলে। চা-এর পেয়ালা টেনে নিয়ে চুমুক দিচ্ছি, সবিতা বললে, কবিতা শুনিবাবু চাউছন্তি? টিকে বড় হব (একটু বড় হবে)। ভটির মায়াধর মানসিংহের কবিতা "মহানদীরে জ্যোৎস্নাবিহার।" কবিতার মর্মার্থ মহানদীর জ্যোৎস্না এত প্রখর যে, কবি বলেন—

চক্ষু মোর অন্ধ হয়ে জ্যোৎস্না পরাগে

আমি ভাবছিলুম কবি ঠিকই বলেছেন। সম্ভবতঃ প্রাচীন গ্রীস দেশের একটা কুসংস্কার ছিল যে চাঁদের আলোতে ঘুমুলে চোখ নষ্ট হয়। সবিতা পড়ে চলেছে—

এ বিরাট চিত্র গৃহে (গ্রহে) অতিথি মু হীন
মুগ্ধ মন রহে চাহি মহা মহিমারে
তাহাই ছোই এহি জ্যোৎস্নারে বিলীন
ভোগন্তি যে সুধা করে আজি এতে ধীরে।

মহানদীর চিত্রগৃহে আমিও অতিথি হয়েছিলাম কয়েকবার, কিন্তু আজ, সেই চিত্রে বিলীন হবার

কথা ভাবতে পারছি না। বারবাটীর পাষাণ রচিত ঘাটের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন কবি। এখন লোকে এ ঘাটটাকে বলে গড়গড়িয়া ঘাট। এখানে চৈতন্যদেব এসে একবার নেমেছিলেন। বহুযুগের পূর্বে বালি দ্বীপে এখান থেকেই নাকি নৌযাত্রা সুরু হত। আজও কার্তিক পূর্ণিমায় সে মেলা জাঁকিয়ে বসে। নদীতে তরণী যাতায়াতের পন্থা চুকে গেছে, স্মৃতি মাত্র আছে। এখানে রূপসী রাজকুমারীদের ঘাট ছিল বাঁধা। কোথায় গেল তারা?

চন্দ্রমা উঠিছি ঊর্ধ্বে, বিরাট ধরণী
নীরব নিস্তব্ধ শান্ত মহানদী জল
ক্লান্ত শিশুসম শান্ত। উজ্জ্বল রজনী
বক্ষপাতি আবরিছে নভনীলতল
হে বন্ধু পাইছি আজি এ আকাশ তলে
মো জাতি অতীত সাক্ষী এ নদী পুলিনে
জ্যোৎস্নার এ মহাভোজ্য, এ তরণী পরে
আছ পাতি বন্ধু, তারে যেন এ জীবনে।

জ্যোৎস্না বিস্তারের মহাভোজ্য পেয়ে ইনি আনন্দিত, আকাশতলে অতীতে মহাজীবনকে পেয়েছেন। তাইত! এ জ্যোৎস্না আর কতোরকমে পাওয়া যায়? কি তার মূল্য? জীবনের সঙ্গে যোগ করেই তো তার মূল্যায়ন! আজ বিদেশ জানায় বুঝতে পেরেছি, চাঁদও মরে, জ্যোৎস্নাও মন থেকে মুছে যায়। আমার এই চিন্তাটি প্রকাশ করে ফেললাম সবিতার কাছে—তোমার কবিতা পাঠ শুনে ভাবছিলাম সত্যি চাঁদটা কি বেঁচে আছে?

সবিতা বলল, জানেন তো, চাঁদের মরণ নেই। যক্ষ্মারোগে ক্ষয় পেয়েও মরে না।

জানি অত্রি মুনির ছেলে চন্দ্র, দুই চাকার রথে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে থাকেন। বিয়ে করেন দক্ষের অনেকগুলো মেয়েকে। কিন্তু "রোহিণী" হল চাঁদের অন্তরঙ্গ প্রিয়তমা। অন্য মেয়েরা ক্ষেপে গেল। দক্ষ রাজার কাছে জানালে নালিশ। দক্ষ অভিশাপ দিলেন "ক্ষয় রোগে ভুগবে!" সেই থেকে তো জ্যোৎস্না ক্ষয় হয়ে যায়! কিন্তু চাঁদ মরে না। বর্তমান বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার সুবিধে ছিলনা সেকালে। কিন্তু ক্ষয়রোগের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে চাঁদ সতেজ হয়ে ওঠে আজও।

আরো গল্প আছে। সমুদ্র মন্থন চলেছে। দেবতারা অমৃত পান করতে ব্যস্ত। এক অসুর নাম তার রাহু—চুপটি মেরে এক কোণে বসে সুযোগ খুঁজছে। চন্দ্র লক্ষ করছে ডিটেক্‌টিভের মতো, চুপি চুপি রাহুর কথা জানিয়ে দিলে সকল দেবতাদের। ব্যস! রাহু ক্ষেপে গিয়ে তাড়া করে চন্দ্রকে গ্রাস করে ফেললে। হায়, হায়, করে উঠল দেবতারা। বিষ্ণু দিলেন রাহুর গলা কেটে। চাঁদ বেরিয়ে এল। ম'লো না।

আর এক কীর্তি আছে চাঁদের। দেবগুরু বৃহস্পতির স্ত্রী তারাকে নিয়ে উধাও। শেক অ্যাব্‌ডাকশন্ কেস। দেবাসুরের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা গেল। কিন্তু চাঁদ ছেড়ে দিলেও তারাই গর্ভে চন্দ্রের ছেলে জন্মাল—বুধ। বৃহস্পতির অভিশাপে এবারেও চন্দ্রকে যক্ষ্মারোগে ধরেছিল। কিন্তু কোন প্রকারে বেঁচে গেল।

যাক। এসব পুরোণো কথা ঘেঁটে লাভ নেই। কটকে যে চাঁদের আলো দেখেছি মহানদীর মুক্ত অঙ্গনে এমনটা কখনো দেখিনি। তবু আজ মনটা খারাপ হয়ে গেছে কেন? সবিতাকে সেকথা বললুম। সবিতা আমার ক্ষুণ্ণ প্রশান্তিতে একটু সাহায্য করেছে, ধন্যবাদ দিলুম। কিন্তু প্রশ্নটার সমাধান হল কি সত্যি? চাঁদটা কি মরতে বসেছে? সেদিন জুলাই মাসে চাঁদের বালি মাটি মাড়িয়ে মাড়িয়ে আমেরিকান দুজন চাঁদের বুকে হেঁটে এল। দেখে এল ও যে এক মরা রাজ্য! ও শুধু সূর্যের আয়না মাত্র।

সবিতা বললে, তবুতো ওর আলো আছে। এখনো নদী, পাহাড়, সমুদ্রকে সুন্দর করে। এখনো আমরা উড়িষ্যার কুমার পুর্ণিমা উৎসব পালন করব, রাস পুর্ণিমা দেখব আর বালিযাত্রার আয়োজনে মেতে উঠব।

এবার খোলা কথা বললুম, এখন রাত্রির খাবার যোগাড় করতে হবে, সবিতা। চাঁদের মহিমা সম্বন্ধে এখনো নিশ্চিন্ত নই।

সবিতা এতক্ষণে বুঝতে পারল, বললে, পূর্ণশী পাই আপাতত হোটেল কোন বন্ধ রহিছি?

বললুম, হ্যাঁ তাই। যাচ্ছি বক্সী বাজারে একটা রেস্তোরাঁতে খাবারের চেষ্টায়। চাঁদ আর ক্ষিধে, জোৎস্না আর খাদ্য কোন বড়ো?—তাই ভাবছি।

* * *

যাহার বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ বিদেশ ভ্রমণ সাঙ্গ করে ফিরে এলেন বাংলাদেশে রচনা করলেন এক অপূর্ব সঙ্গীত :

যদি প্রেম না দিলে প্রাণে
কেন ভোরের আকাশ ভরে দিলে
এমন গানে গানে?

সিন্ধু রাগের সঙ্গে কাফি মিশিয়ে এক মিশ্র রাগিনীর সৃষ্টি করলেন তিনি। মাঘোৎসবে এই গানটি গীত হল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক দীনেশচন্দ্র সেন ও শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ। এস্রাজে ছড় টানতে টানতে অবনীন্দ্রনাথ বললেন দীনেশবাবু,—আপনি আমি তো অনেকদিন থেকেই লিখি কিন্তু এমন সহজ কথায় তখন বুক-ভরানো সুর শুনেছেন নাকি?—

"যদি প্রেম না দিলে প্রাণে,
কেন আকাশ তবে এমন চাওয়া চায় এ মুখের পানে?"

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শিশিরকুমার প্রসঙ্গে

শম্ভু মিত্র

শিশিরকুমার বাংলাদেশের, আমার অনুমানে, সমগ্র ভারতবর্ষের, প্রথম নির্দেশক যিনি মঞ্চের ছবি কল্পনা করেছেন। যিনি আলো, দৃশ্যপট ও অভিনয় দিয়ে থিয়েটারের একটা সামগ্রিক রূপ প্রথম এদেশে এনেছিলেন।

আমি, আন্দাজ পনর ষোলো বছর বয়সে, প্রথম ভাদুড়ি মশায়ের অভিনয় দেখি। সে নাট্যাভিনয়ের নাম 'দিগ্বিজয়ী'। এই নাটকের বক্তব্য মনে হল যেন ভিন্ন। অনেক গভীর, অনেক important। এ যেন 'সাজাহান', 'নূরজাহান' থেকে আরম্ভ করে 'কর্ণার্জুন', 'ইরাণের রাণী' ইত্যাদি সকলের থেকে ভিন্ন জাতের। সে অভিনয়ের রসিকতাও যেন অন্য জাতের। অপূর্ব অভিনয় হত, যোগেশচন্দ্র ও অমরেন্দু লাহিড়ীর মধ্যে চতুর্থ অঙ্কে। Co-acting কাকে বলে তার প্রথম হদিস আমি পাই তাঁদের অভিনয়ে।

তখন আমার যে বয়স তাতে মনে হত যেটা অভিনয় হয় সেটা সবই লেখা থাকে নাটকে। কিন্তু সেই প্রথম 'দিগ্বিজয়ী' নাটক নিয়ে পড়তে গিয়ে দেখলুম যে, যেটুকু লেখা থাকে সেটুকু অতি সামান্য। পুরো নাটকটাই প্রায় শর্টহ্যাণ্ড নোটস-এর মতো সংক্ষিপ্ত। আর যেটা চোখে দেখা যায় এবং কানে শোনা যায় তার প্রাচুর্য অসামান্য। এবং সেটা যখন চোখ, কান, বুদ্ধি ও হৃদয়কে, কখনো একটার পর একটাকে, কখনো বা একসঙ্গে সবগুলোকে তৃপ্ত করে তখন অনুভবে যে ঘটনাটা ঘটে তার তুলনা নেই।

এই নাট্যাভিনয় যদি না দেখতুম তাহলে 'নবান্ন'-র প্রথম দৃশ্যের কল্পনা করা যে সম্ভব হত না একথা অনস্বীকার্য।

আর একটা জিনিষ শিশিরবাবুর থেকে শিখেছি, সেটা হল, নাটক কি ভাবে কাটতে হয় বা গাঁথতে হয়। তার প্রমান আছে 'আলমগীর' নাটক ও নাট্যের প্রভেদে। লিখিত নাটকের মত করে নাট্যাভিনয় আদৌ হত না। অর্থাৎ নাটককে, দৃশ্যপটকে, অভিনয়কে, শব্দকে সব কি করে একসঙ্গে নাট্যের মধ্যে ব্যবহার করতে হয় তার শিক্ষা আমরা শিশিরবাবুর কাছ থেকেই পেয়েছি। তিনিই আমাদের প্রথম নির্দেশক। কিন্তু প্রথম বলেই বোধ হয়, তাঁর অনেক সূক্ষ্ম কাজ তেমন করে লক্ষ্যে পড়েনি লোকের, তেমন করে আদর পায়নি। কারণ, তেমন করে নাটক দেখবার অভ্যাস তৈরী হয়নি মানুষের। তার ওপর দর্শকদের খুশিয়ে রাখার জন্য অন্য ধরণের থিয়েটারও তো ছিল। তাই হয়ত আমরা এই নির্দেশক শিশিরকুমারকে হারিয়েছি। তাতে তাঁর নিজের যাই কিছু ক্ষতি হয়ে থাকুক না কেন তার চেয়ে ঢের বেশীগুণ ক্ষতি হয়েছে আমাদের দেশের।

বাংলা নাটক, নাট্যাভিনয় ও নাট্যমঞ্চ নিয়ে আলোচনা

আজকাল অনেক পত্র পত্রিকায় নানা মতামত লিপিবদ্ধ হয়। একটি প্রখ্যাত দৈনিকের এক ফীচার-লেখক সম্প্রতি উক্ত বিষয়ে এমন কতকগুলি মন্তব্য করেছেন যা আমাদের মনে হয়েছে যথার্থ নয়। সে সম্বন্ধে আমাদের অভিমত জ্ঞাপন করা প্রয়োজন মনে করি।

উক্ত লেখকের যে-কয়টি সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য, সেগুলি হল পরপর এই রকম :

১। "ব্যবসায়িক রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং তাঁর পিছু পিছু আসেন অমৃতলাল বসু, অমরেন্দ্র নাথ দত্ত যাঁরা প্রত্যেকেই নাট্যকার, নট ও নাট্যাচার্য।"

—তথ্যের মধ্যে ভুল আছে। অর্ধেন্দু শেখর মুস্তফি প্রমুখ অভিনেতারা যখন পেশাদার মঞ্চ স্থাপনে উদ্যোগী হলেন তখন গিরিশচন্দ্র তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতে সম্মত হলেন না। তিনি বললেন, পেশাদার রূপে অভিনয় করবার মত সময় তখনো আসেনি তাই যখন ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর দীনবন্ধুর নীলদর্পণ নাটক নিয়ে জোড়াসাঁকোর মধুসূদন সান্যালের বাড়ীতে পেশাদারী মঞ্চ ন্যাশন্যাল থিয়েটারের পত্তন হল তখন গিরিশচন্দ্র তার মধ্যে ছিলেন না। অনেক দিন পরে তিনি পেশাদার মঞ্চে যোগ দেন।

২। "রাজা ও রাণী, বিসর্জন, শেষরক্ষা, চিরকুমার সভা বাঙালী মঞ্চে অভিনীত হয়েছে অবশ্য, কিন্তু কোনদিন জমেনি।"

—চিরকুমার সভা জমেনি? কেমন করে বললেন তিনি? চিরকুমার সভার মত জমাট, উপভোগ্য সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষ-সম্পন্ন দর্শনরঞ্জনকারী নাট্যাভিনয় বাংলা মঞ্চে বোধ করি আর দ্বিতীয় হয়নি। যাঁরা সেই অভিনয় দেখেছেন তাঁরা বোধ করি বিনা দ্বিধায় আমাদের কথা সমর্থন করবেন।

৩। "রবীন্দ্রনাথ স্বকীয় প্রযোজনায় ডাকঘর, মুক্তধারা, রক্তকরবী ও রাজা উপস্থাপিত করে দেশকে বারবার তাক লাগিয়েছেন সন্দেহ নেই।"

—আমরা যতদূর জানি, রবীন্দ্রনাথ রক্তকরবী নাটকের অভিনয় করেননি। তাছাড়া যে নাটক উপস্থাপনার দ্বারা তিনি সবচেয়ে বেশী তাক লাগিয়েছিলেন তার উল্লেখ করতে লেখক ভুলে গিয়েছেন। তা হল কবির সত্তর বছর বয়সে তপতী নাটকের অভিনয়—পরমাশ্চর্য সে অভিনয় এবং নাট্য-উপস্থাপনা।

৪। "পেশাদারী মঞ্চ হয় বাজারের জনপ্রিয় উপন্যাসগুলি নাটকায়িত করে মঞ্চস্থ করেন, নয় পুরনো পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের ছাঁচে নতুন নাটক লিখিয়ে তাই দেখান। আর যাঁরা খুব বেশী প্রগতিশীল তাঁরা আভিজেঞ্জ, বৈধব্য, বাস্তুতা অসময়ে, অপত্য বিরোধ ইত্যাদি বকেয়া সমাজ সমস্যার ওপর নাটক বানান। কাজেই তাঁদের কাছ থেকে বেশী আশা করার কিছু নেই।"

—সমাজ সমস্যা মূলক নাটক যে পেশাদারী মঞ্চে অভিনীত হচ্ছে তা সমালোচক কতকটা স্বীকার করেছেন। সর্বজনগ্রাহ্য বিখ্যাত উপন্যাসগুলির নাট্যরূপ তো সেই আদিকাল থেকেই আমাদের মঞ্চে পরিবেশিত হচ্ছে। তাতে দোষের কি আছে? বরং আমারা মনে করি, বাংলা কথাশিল্পের মহৎ সৃষ্টিগুলিকে নাটকে রূপান্তরিত ও মঞ্চস্থ করে সাধারণ রঙ্গালয় আমাদের সাহিত্যের উৎকৃষ্ট শিল্পকৃতির সঙ্গে আরও অনেক বেশী মানুষের পরিচয় করিয়ে দিয়ে সামগ্রিকভাবে তার মর্মবৈশিষ্ট্য ও মহিমাকে জাতির মর্মে আরও গভীর ও ব্যাপকভাবে সঞ্চারিত করে দিচ্ছে। তাছাড়া ঐ সকল নাট্যরূপান্তরিত কথাশিল্পসৃষ্টিগুলির মধ্যে সমসাময়িক জীবনের সমস্যা ও দর্শনও তো প্রতিফলিত।

৫। "শিশিরকুমার ভাদুড়ি কোন নতুন নাটকের ঐতিহ্য পত্তন করতে পারলেন না। তিনি নটাচার্যই থেকে গেলেন নাট্যাচার্য হতে পারলেন না।"

—বিচিত্র বক্তব্য! বাংলার নাট্য-বিবর্তনে শিশিরকুমারের অবদান সম্পর্কে নিজেদের কথা না বলে আমরা এই সঙ্গে প্রকাশিত শ্রীশম্ভু মিত্রের রচনাটির প্রতি উক্ত লেখকের মনোযোগ আকর্ষণ করছি। তা থেকে লেখক বোধ করি বুঝতে পারবেন যে শিশিরকুমার 'নটাচার্য' ছিলেন না, তিনি ছিলেন বাংলার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যাচার্য।

৬। "আধা সেপাহার, আধা সৌখীন অথবা পুরো সৌখীন মকগুলো দেখান সরাসরি বিদেশী নাটকের অনুবাদ, নয় বিদেশী নাটকের খোল নলচে বদলে ভারই গায়ে ঈষৎ ভারতীয় পলেস্তারা ঘষিয়ে তাকে দেশী নাটক রূপে দেখান।"

৭। "সত্যিকথা বলতে হলে না বলে উপায় নেই যে বাংলা নাটকে আজ চলছে দারুণ একটি অবক্ষয়ের পালা।"

—অবক্ষয়ের পালা চলছে, আমরা তা মনে করি না। বরং আমাদের ধারণায় বাংলা নাট্যাভিনয়ে আজ এসেছে দু-কূলপ্লাবী প্রাণবন্যা। একদিকে যেমন সাধারণ মঞ্চ সর্বশ্রেষ্ঠীর জন্য (শুধু কতিপয় উন্নাসিক ও তথাকথিত ইনটেলেকচুয়ালদের জন্য নয়, greatest good for the greatest number—এই আদর্শে) নানাধরনের নাটক (তাদের মধ্যে পরীক্ষা নিরীক্ষার অভাব নেই) পরিবেশিত হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি নবনাট্য আন্দোলনের অগ্রণী সংস্থারা অভিনয় করছেন বিশ্বনাট্য সাহিত্যের শাশ্বত রসবিশিষ্ট বিখ্যাত নাটকগুলি কখনো বা রূপান্তরণ কখনো বা সরাসরি অনুবাদের মাধ্যমে। এই সকল নাটকে দর্শক যে শুধু অনাস্বাদিতপূর্ব রসবৈচিত্র্যের সন্ধান পাচ্ছেন, তাই নয়, তাদের মধ্যে আমাদের জীবনোপলব্ধির প্রতিফলনও প্রত্যক্ষ করছেন। আজকের মানুষের ভাবনা বা জীবনবোধ কোন বিশেষ সমাজ বা বিশেষ দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, পৃথিবীর এক প্রান্তের মানুষের কাজের ও চিন্তার ধারা সারা বিশ্বে তার প্রতিক্রিয়ার ছায়া ফেলছে, পৃথিবীর অন্য প্রান্তের মানুষকে প্রভাবান্বিত করছে, তার চিন্তায় নতুন দ্যোতনার সৃষ্টি করছে। তাই অগ্রণী নবনাট্য সংস্থারা বিশ্বাস করেন, বিশ্বের নাট্য সাহিত্যের কর্মকৃতির সঙ্গে এদেশের মানুষের পরিচয় করানোর সময় এসেছে এবং এদেশের নাট্যদর্শক যে সে পরিচয় পাবার জন্য আগ্রহী তার প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে। সেই সঙ্গে নতুন নাট্য সম্প্রদায়দের মধ্যে অনেকেই মৌলিক নাটকও পরিবেশন করছেন।

"অবক্ষয়ের পালা" নয়, আমরা মনে করি, বাংলার নাট্যজগতে বর্তমানে চলছে বিবর্তনের পালা। এই তো সবে শুরু, তাই হয়ত সকল যুগের ক্রান্তিলগ্নের মতো এই বিবর্তন কালের মধ্যেও প্রথম দিকে কিছু আগাছার দেখা পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু কালক্রমে তারা লুপ্ত হবে এবং এই বিবর্তনের পথ ধরেই আসবেন জাতির ও যুগের বহু নাট্যকার। হেয়জ্ঞান করে নয়, গুণবিচারের হৃদয়বত্তা প্রকাশ করে, নস্যাৎ করে নয়, আশা উৎসাহ ব্যক্ত করে তাঁর আসার পথকে সুগম ও তরান্বিত করতে হবে।

নটকেশরী অমরেন্দ্রনাথ দত্ত

নানা নাটকের অভিনয়

ক্লাসিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে অমরেন্দ্রনাথ যেন অভিনয় জগৎকে জয় করে নিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি যে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তার লাভ করলেন তা বোধ করি আর কেউ পারেন নি সে যুগে।

নতুন উদ্যমে অদম্য শক্তি নিয়ে তিনি থিয়েটার চালাতে লাগলেন। তখনকার দিনে এক একটি নাটকের আয়ু ছিল অতি অল্প, পাঁচ রাত্রি, সাত রাত্রি, দশ রাত্রি।

পরপর নাটক মঞ্চস্থ করতে লাগলেন, পলাশীর যুদ্ধ, দক্ষযজ্ঞ, হারানিধি, তরুবালা, বিবাহ বিভ্রাট, হীরার ফুল, বিল্বমঙ্গল। অমরেন্দ্রনাথ সমস্ত বাংলার নাট্যোৎসাহী সুধীবৃন্দের চিত্তজয় করলেন।

নতুন নতুন নাটক চাই। এবং চাই নতুন ধরণের নাটক। গতানুগতিকতাকে অমরেন্দ্রনাথ বরদাস্ত করতে পারতেন না। তাঁর যুগের চেয়ে তাঁর চিন্তা ছিল অনেক আধুনিক, তাই তিনি যে যুগে এমন সব নাটক মঞ্চস্থ করেছেন যা অন্য কেউ করতে সাহস পেতেন না।

১৮৯৭ সালের ২৯শে মে দেবী চৌধুরানী মঞ্চস্থ করলেন। নাট্যরূপ দিলেন নিজেই। নাটকোপযোগী এগারোটি গানও রচনা করলেন। প্রধান ভূমিকায় ছিলেন, ব্রজেশ্বর—অমরেন্দ্রনাথ, হরবল্লভ—চণ্ডীচরণ দে, ভবানী পাঠক—হরিভূষণ ভট্টাচার্য, রঙ্গরাজ—অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রফুল্ল—তারাসুন্দরী, নিশি—কুসুমকুমারী।

নতুন পরিকল্পিত দৃশ্যপটে রঙ্গমঞ্চের ভোল বদলে গেল।

"নদীবক্ষে বৃহৎ বজরা, বজরাতে ভীষণ ডাকাতি"—দেখে দর্শক বিস্ময়াভিভূত হলেন। সাজ-পোষাক, দৃশ্যপট, সবদিক দিয়েই দেবী চৌধুরানী রঙ্গমঞ্চে নতুনত্ব আনল। সেদিন থেকে অমরেন্দ্রনাথ বাংলা নাট্যশালায় নতুন যুগের প্রবর্তন করলেন এই নাটকে।

অভিনয়ও হয়েছিল সর্বাঙ্গ সুন্দর।

তারপর অমরেন্দ্রনাথ মঞ্চস্থ করলেন শেক্সপীয়রের হ্যামলেট নাটকের বাংলা রূপান্তর হরিরাজ। ১৮৯৭ সালের ২১শে জুন এই নাটক খোলা হয়।

হরিরাজের ভূমিকায় অমরেন্দ্রনাথের চরিত্রচিত্রণ বহু রঙ্গমঞ্চের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনয়রূপে স্বীকৃত। এ সম্বন্ধে তাঁর জীবনীকার লিখছেন—"হরিরাজের ভূমিকাভিনয় অমরেন্দ্রনাথের এক বিজয় বৈজয়ন্তী। ইহাতে তিনি যে অভিনয় চাতুর্যের পরিচয় দেন তাহা বর্ণনা করিতে লেখনী মূক। যদি অমরেন্দ্রনাথ শুধু এই ভূমিকায় অভিনয় করিয়াই নটজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিতেন তাহা হইলেও তাঁহার নাম বঙ্গ রঙ্গালয়ের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিত। তিনি হরিরাজের অংশ এমনভাবে জমাইয়া গেন যে, অদ্যাবধি কোন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা কখনো ঐ ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতে সাহসী হন নাই। উত্তরকালে মনমোহন থিয়েটারে যখন এই নাটকের পুনরাভিনয় হয় তখন স্বয়ং দানীবাবু এ ভূমিকা গ্রহণে সাহসী না হইয়া হীরালাল চট্টোপাধ্যায়কে হরিরাজের অংশে নামান।"

কিন্তু দর্শক সংখ্যা তবুও আশানুরূপ নয়। অনেক খরচ করতেন অমরেন্দ্রনাথ। সেই অনুপাতে লাভ তো দূরের কথা, সেই খরচও উঠত না।

উপর্যুপরি পাঁচ সপ্তাহ হরিরাজ অভিনয় করবার পর সে নাটককে রবিবারের আসরে ঠেলে দিয়ে ২৪শে জুলাই শনিবার রবীন্দ্রনাথের রাজা ও রাণীর অভিনয়ের ব্যবস্থা করলেন। দুরূহ নাটক রাজা ও রাণী—আগাগোড়া ছন্দে লেখা। কিন্তু অভিনয়ে কেউ অসার্থক হলেন না। বিক্রমদেবের ভূমিকায় অমরেন্দ্রনাথ অপূর্ব অভিনয় করলেন। এই নাটকের অভিনয়ের সুখ্যাতি চারিদিকে এত ছড়িয়ে পড়েছিল যে তা শুনে নাটোরাধিপতি মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায়কে সঙ্গে নিয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ১১ই সেপ্টেম্বর ক্লাসিক থিয়েটারে এসে অভিনয় দেখেন।

কিন্তু প্রত্যেক নাটক এত সুচারু রূপে অভিনীত হওয়া সত্ত্বেও কোনটাতেই আশানুরূপ অর্থাগম হচ্ছিল না। মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে ক্লাসিকে মঞ্চস্থ হল, নল দময়ন্তী, হরিরাজ, দেবী চৌধুরানী, রাজা ও রাণী, পলাশীর যুদ্ধ, দক্ষযজ্ঞ, হারানিধি, তরুবালা, বিল্বমঙ্গল, বুদ্ধদেব চরিত।

অমরেন্দ্রনাথ তখন ভাবলেন, নানা রসের এতগুলো নাটক খুলেও তো তেমন অর্থাগম হল না, গীতিনাট্য মঞ্চস্থ করলে কেমন হয়? চিরদিনই নতুনত্বের প্রয়াসী ছিলেন তিনি। যেমন চিন্তা তেমনি কাজ। খোঁজ পেলেন পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ 'আলিবাবা' নামে এক গীতিনাট্য লিখেছেন। তিনি সেটি স্টার থিয়েটারে অভিনয়ের জন্যে দিয়েও ছিলেন, কিন্তু স্টারের তৎকালীন ম্যানেজার অমৃতলাল বসু নাটকটি অভিনয়ের অযোগ্য বিবেচনা করেন। অমরেন্দ্রনাথ সেই নাটক সংগ্রহ করলেন, অভিনয়োপযোগী করবার জন্যে নাটকটিকে যথেষ্ট পরিমার্জনা করলেন তারপর ১৮৯৭, ২০শে ডিসেম্বর সেই নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন। প্রথম অভিনয় রজনীর-শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন: কাসিম—হরিভূষণ ভট্টাচার্য, আলিবাবা—পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, হুসেন—অমরেন্দ্রনাথ, আবদালা—নৃপেন্দ্র চন্দ্র বসু, মুস্তাফা—অক্ষয় কুমার চক্রবর্তী, দস্যু সর্দার—অতীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য, মার্জিনা—ভূষণ কুমারী। ফতিমা—রাণী সুন্দরী। মর্জিনা—কুসুম কুমারী।

অমরেন্দ্রনাথের আলিবাবা বাংলার রঙ্গজগতকে মাতিয়ে দিলে। দর্শকও তেমনি প্রচুর সংখ্যায় ভীড় করতে লাগলেন প্রতি অভিনয়ে। বিক্রি বাড়তে বাড়তে শেষে বাইশ শ' টাকা পর্যন্ত দাঁড়াল। তখনকার দিনে বাইশ শ টাকা বিক্রি কম কথা নয়। তখন টিকিটের হার ছিল, আট আনা, এক টাকা, দু'টাকা। তিনটাকার বোধ হয় একটা বো থাকতো।

আলিবাবা অভিনয় সম্পর্কে তাঁর জীবনীকার লিখছেন—"আলিবাবার সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ক্লাসিকের সুনাম ছড়াইয়া পড়িল। সকলের মুখে এক কথা—অমর দত্ত ও ক্লাসিক থিয়েটার। অমর দত্তের অভিনয় দেখিবার জন্য জনসাধারণ পাগল হইয়া উঠিল। নাট্য জগতে হুলুস্থুল কাণ্ড পড়িয়া গেল। অমরেন্দ্রনাথ থিয়েটার রাজ্যে যুগান্তর আনয়ন করিলেন—রঙ্গমঞ্চের তদানীন্তন সমস্ত প্রথার আমূল পরিবর্তন করিয়া দিয়া তিনি নূতন প্রথা প্রচলিত করিলেন। বিজ্ঞাপনী-পত্র, হ্যাণ্ডবিল, প্ল্যাকার্ড হইতে আরম্ভ করিয়া দৃশ্যপট, পোষাক পরিচ্ছদ, নৃত্যগীত, অভিনয় ভঙ্গী প্রভৃতি সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় পরিবর্তন করিয়া—নূতনত্বে পূর্ণ করিলেন এবং সম্পূর্ণ নূতন নিয়মে, নূতন ভাবে, নূতন ছাঁচে থিয়েটার সংক্রান্ত সমস্ত কার্য চালাইতে লাগিলেন। ক্লাসিক থিয়েটার কলিকাতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ থিয়েটার বলিয়া পরিগণিত হইল।"

অমরেন্দ্রনাথের নাট্য উপস্থাপনা ও থিয়েটার পরিচালনা সম্পর্কে অপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের রচনার অংশ বিশেষও এই সম্পর্কে স্মরণ করা যেতে পারে!—

"তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অসাধারণ অধ্যবসায়, লোক চরিত্রে অভিজ্ঞতা এবং দুর্জয় সাহস—উন্নতি করিবার এই সকল সম্বল তাঁহার যথেষ্ট ছিল। তিনি থিয়েটার করিতে নামিয়া পুরাতন প্রচলিত পন্থার অনুসরণ সর্বথা

করেন নাই। তখনকার থিয়েটারী ব্যবসার যে ধারা তাহা তিনি বহলাইয়া দিয়াছিলেন। বাংলা নাট্যশালা বাহ্যিক ও আধিক সৌষ্ঠব ও উন্নতির জন্য অমরেন্দ্রনাথের নিকট বহু পরিমাণে ঋণী। তিনি তাঁহার সময়ের নাট্যশালায় নূতন জীবন দিয়াছিলেন। অভিনেতা অভিনেত্রীর বেতন বৃদ্ধি, গুণের আদর, দর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধি, বিজ্ঞাপনে আড়ম্বর—এসবই তাঁর কীর্তি। তাঁর নীতিই ছিল—অগ্রসর হও, অগ্রসর হও। যেমন করিয়া হোক, বিক্রয় বাড়ানো চাই,—তা কে জানে চার প্রহর ব্যাপী অভিনয় অনুষ্ঠান, কে জানে উপহার বিতরণ। মুদীর হিসাব নিকাশী বুদ্ধি লইয়া তিনি থিয়েটার করেন নাই। তিনি মেজাজী বড়লোকের মতো থিয়েটার করিয়াছেন। নিজের শক্তির উপর তাঁহার বিশ্বাস ছিল অপরিসীম। তাঁহার থিয়েটারে তিনি যে নিয়ম চালাইয়াছেন তাহাই চলিয়াছে। বেলা দুইটায় থিয়েটার—তাহাতেও ক্লাসিকে অসম্ভব ভীড়। বেলা বারোটায় থিয়েটার—তাহাতেও অসংখ্য দর্শক। একবার অতি বর্ষায় কলিকাতা ভাসিয়া গিয়াছিল। হাট বাজার, অফিস সব থিয়েটার বন্ধ। কিন্তু ক্লাসিকের দর্শক ছাতা মাথায় দিয়া বেঞ্চ ও চেয়ারে পা তুলিয়া বসিয়া থিয়েটার দেখিতেছে। সে সময়ে দর্শক যেন অমরেন্দ্রনাথের নামে মাতিয়া উঠিতেন।"

অপরেশচন্দ্রের এই প্রামাণ্য রেখাচিত্রটি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, সে সময় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত কী বিপুল জনপ্রিয়তাই না অর্জন করেছিলেন।

আগামী সংখ্যায় অমরেন্দ্রনাথের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের যে দ্বন্দ্ব ঘটেছিল তারই চিত্তাকর্ষক কাহিনী পরিবেশন করা হবে।

নাট্যরঙ্গ

থিয়েটারে, যাত্রায়, মাঝে মাঝে নানা হাস্যোদ্দীপক ঘটনার অবতারণা হয়। কখনো কোন অভিনেতা সেই ঘটনার নায়ক, কখনো বা দর্শক, কখনো বা উভয়েই। নাট্যরঙ্গে মাঝে মাঝে সেই ধরনের ঘটনা পরিবেশন করা হবে।

অনেককাল আগেকার কথা। তখন যাত্রায় জুড়ীর খুব প্রচলন ছিল। সাদা চাপকান পরা দুজন ওস্তাদ গাইয়ে আসরে বসে থাকতেন এবং সময় মতো সেই অসময় নেই দাঁড়িয়ে উঠে গান ধরতেন, আরম্ভ করলে আর যেন শেষ করতে চাইতেন না। এবং সেসব গান রীতিমতো উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। তাদের সঙ্গে আবার দোয়ারকিরাও থাকতেন।

রাণবাজারে সাবিত্রী সত্যবান পালার অভিনয় হচ্ছে। প্রচুর দর্শক। নাটক খুব জমেছে, কিন্তু ওই জুড়ী! থেকে থেকেই তাঁরা বাজখাঁই গলায় গান ধরছেন। তাঁদের সঙ্গে দোয়ারকিরাও কম যাচ্ছেন না।

সত্যবান মারা গেছে। যমরাজ আসরে প্রবেশ করে তার প্রাণ নিয়ে নিজের রাজ্যে চলেছে। পিছনে সাবিত্রী। সাবিত্রীর বর চাওয়ার সেই সর্বজনপরিচিত সংলাপ চলতে লাগল। সাবিত্রী এক একটি একটি বর চাইছে আর যম বলছে, তথাস্তু। সাবিত্রী বর চাইল, আমি যেন শতপুত্রের জননী হই। সঙ্গে সঙ্গে যম বললে, তথাস্তু। ব্যস! আর যায় কোথায়। যম নিজের ফাঁদে পড়ল। স্বামী না থাকলে

সন্তান আসবে কোথা থেকে ? অতঃপর সত্যবানকে বাঁচিয়ে দেওয়া ছাড়া যমের আর গত্যন্তর রইল না। সত্যবান বেঁচে উঠল। জুড়ীরা গান ধরল। তখনো নাটক শেষ হয়নি। আরো আছে। সত্যবানকে বাঁচিয়ে নিয়ে যম আসর থেকে চলে যাচ্ছে এমন সময় শ্রোতাদের ভিতর থেকে একজন মাতাল টলতে টলতে এগিয়ে গিয়ে যমের পথ আগলে দাঁড়াল, তারপর হাত জোড় করলে বললে, ধর্মরাজ, আমার একটি প্রার্থনা আছে. আমায় একটি বর দিন।

যম তো হতভম্ব। এ আবার কী ফ্যাসাদ। মাতাল বললে, আপনি এ-ভাবে চেয়ে গেলেন দেখে বড্ড কষ্ট হচ্ছে। এত চেষ্টা করেও সত্যবানকে নিয়ে যেতে পারলেন না। তা না পারুন, তাতে আমাদের দুঃখ নেই। আপনি এক কাজ করুন, সত্যবানের বদলা হিসেবে ওই জুড়ী দু'ব্যাটাকে নিয়ে যান। ওরা বড্ড জ্বালাতন করছে। যাত্রা শুনতে দিচ্ছে না। যখন তখন ভ্যা ভ্যা করে চেঁচিয়ে কানের পোকা বার করে ফেলছে। ধর্মরাজ, আপনি ওদের নিয়ে যান। তাহলে সত্যিই একটা কাজের মত কাজ হয়।

উপস্থিত বুদ্ধিতে যম কম যান না। হুঙ্কার দিয়ে বললে, তার চেয়ে বরং তোমাকে নিয়ে যাই, তাহলেই কাজের মতো কাজ হবে। এসো, আমার সঙ্গে।

এই বলে যম তার বলিষ্ঠ হাত দিয়ে মাতালের রোগা হাতটা চেপে ধরে তাকে টানতে টানতে ভিতরে নিয়ে গেল।

এই নাটক বহির্ভূত অভিনয় দেখে সভাস্থল প্রবল হাসিতে ফেটে পড়ল।

নাট্যপ্রবাহ :

ফেব্রুয়ারী মাসে একটি মাত্র নাটক। সম্প্রতি দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের গার্ডেনরীচ শাখার স্টোর্স রিক্রিয়েশান ক্লাবের সভ্যরা এই নাটকটিকে রবীন্দ্রসদনে সার্থকতার সঙ্গে মঞ্চস্থ করলেন। অভিনয়ে বিভিন্ন চরিত্রে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, দিলীপ রায়, চন্ডী পাল, গৌরীশংকর চৌধুরী, সুনীত মুখোপাধ্যায়, চিত্ত চক্রবর্তী, অরুণ মুখোপাধ্যায়, সবিতা চট্টোপাধ্যায় ও বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়।

ঐ রেলওয়েরই ইন্‌জিনীয়ারিং ড্রামাটিক ক্লাব গত মাসে বিশ্বরূপা মঞ্চে অভিনয় করলেন বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ অবলম্বনে বাণীকুমারের নাটক—সন্তান। পরিচালনায় ছিলেন সুললিত গোস্বামী। অভিনয়ে পুরুষ ও স্ত্রী ভূমিকায় প্রায় সকলেই দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেন।

বৈষ্ণবক নাট্যসংস্থা সম্প্রতি সৌরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মহিষাসুর পালাটি যাত্রার আসরে পরিবেশন করলেন। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নাট্যের যে বিশেষ একটি ভূমিকা আছে তা প্রমাণিত করবার জন্যেই বৈষ্ণবক সংস্থা শুরু থেকেই পুরানো কালের পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নাটক অভিনয় করছেন। বৈষ্ণবকের মহিষাসুর দর্শকদের প্রকৃত আনন্দ দিয়েছে। বিভিন্ন ভূমিকায় রূপদান করেন বিহির লাল গাঙুলী, গীতশ্রী দেবী, শিবানী ভট্টাচার্য, শিখা ভট্টাচার্য, অংশু চৌধুরী, সব্যসাচী হাজরা, অপেন দেব, শিশির সাউ। পালাটির পরিচালক ছিলেন বিহির লাল গাঙুলী। সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন নির্মল ভট্টাচার্য।

এ বছর এই প্রথম বেলডেভিয়ার-এ স্টেট পূজা সমিতির উদ্যোগে সেখানকার আবাসিকরা নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এই অনুষ্ঠানে দ্বিজেন্দ্রলালের চন্দ্রগুপ্ত নাটকটি অভিনীত হয়। নাটকটির সর্বাঙ্গীন সাফল্যের মূলে যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন সঞ্জীব সেনগুপ্ত (পরিচালনা), ডাঃ বি. সান্যাল (চাণক্য), নচিকেতা ভরদ্বাজ (নন্দ), সুকান্ত চক্রবর্তী (চন্দ্রগুপ্ত), বি. লাহিড়ী (কাত্যায়ন), সুবীর সরকার (চন্দ্রকেতু), বিনায়ক ভট্টাচার্য (আলেকজাণ্ডার), বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় (সেলুকাস), বিশ্বু সেন (আন্টিগোনস), শংকর চক্রবর্তী (বাচাল), রমা চৌধুরী (হেলেন), সুনন্দা ঘোষ (মুরা) এবং সান্ত্বনা বন্দ্যোপাধ্যায় (ছায়া)।

গত ২৭শে কার্তিক হেদুয়ার লাহা ভবনে বাণীবিতান দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অষ্ট শতবার্ষিকী পালন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ। দেশবন্ধু রচিত গান, কবিতা, প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলীর বিশেষ বিশেষ অংশ গীত ও পঠিত হবার পর দেশবন্ধুর জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেন ডঃ উমা রায়, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, বীণা দাস (ভৌমিক), মনমোহন ঘোষ, ডাঃ সুধাময় আচার্য প্রমুখ। গানে ও কবিতা প্রবন্ধাদি পাঠে ছিলেন, চিত্রিতা মণ্ডল, তুর্লভ মুখোপাধ্যায়, অলিতা দত্ত, ঝনিকা বসু, ধীরেন চক্রবর্তী, পিনাকী চক্রবর্তী, সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়, ভারতী ব্রহ্ম, কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়, খাতা ঘোষ, শিবানী বসু, কৃষ্ণা ঘোষ, গীতা মুখোপাধ্যায়, অনীতা চট্টোপাধ্যায়, দীপালী বসাক এবং আরও অনেকে। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংস্থার কর্মাধ্যক্ষ নির্মলেন্দু বসু। তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেন বিভূতি মুখোপাধ্যায়, শম্ভু অধিকারী ও সৌরেন দে।

• • • •

"যে শান্তি অন্তরাত্মার, যে সম্পদ নিত্যকালের, তারই প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা হচ্ছে ভারতবর্ষের দান। সেই শ্রদ্ধাকে আবার পরিপূর্ণরূপে জাগিয়ে তোলবার দিন এসেছে। পশ্চিম ভূ-ভাগ কামান বন্দুকের আয়োজন করুক—যে শক্তিতে সেই সমস্ত আয়োজনকে তুচ্ছ করতে পারি, আত্মার সেই পরম শক্তিকে প্রকাশ করার জন্যে আমাদের সাধনা। সেই জন্যে আমাদের নিস্পৃহ হতে হবে, নির্ভয় হতে হবে এবং বলতে হবে "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম"—আমাদের জন্য একটি মাত্র দেশ আছে—সে হচ্ছে বসুন্ধরা, একটিমাত্র নেশন আছে—সে হচ্ছে মানুষ।"

আমার দেখা সাঁওতাল

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

বীরভূম জেলার ছোট্ট একটি গ্রামে কিছুদিন আমাকে থাকতে হয়েছিল।

সেই গ্রামের দক্ষিণপ্রান্তে ছিল দিগন্তবিস্তৃত একটি গভীর জঙ্গল। জঙ্গলে ছিল শাল, তাল, তমাল, হরীতকী আর মহুয়ার বড় বড় গাছ।

সেই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পায়ে চলা পথ ধরে প্রতিদিন আমাকে যেতে হতো একটি ইস্কুলে। সেই পথের ধারে ছিল সাঁওতালদের একটি গ্রাম। গ্রাম না বলে তাকে বস্তি বলাই ভাল। মাত্র কুড়ি পঁচিশ ঘর সাঁওতালের বাস। খড় দিয়ে ছাওয়া ছোট ছোট মাটির ঘর। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছবির মত দেখতে। সেখানকার মানুষগুলিও তেমনি। ছেলেমেয়ে যার দিকে তাকাই, দেখি—কালো গায়ের রং, মাথায় এক মাথা কালো চুল, চওড়া বুকের ছাতি, স্বাস্থ্য-সুন্দর দেহ আর মুখে প্রসন্ন হাসি। মেয়েদের দেখলে মনে হয় কালো মার্বেল পাথরের স্ট্যাচু।

কাঁকর-পাথরের ডাঙা জমি গায়ের জোরে কেটে কেটে তারা ফসলের ক্ষেত তৈরি করেছে, পুকুর তৈরি করেছে। গাই আছে, বাছুর আছে, চাষের বলদ আছে, ছাগলের পাল আছে, হাঁস আছে আর আছে মুরগী। বড় বড় কুকুর আছে পাহারা দেবার জন্তে।

এদেরই দেখেছি কয়লাখাদে কয়লা কাটতে।

কিন্তু তারা যেন এদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

বাদুর সঙ্গে হয়েছিল আমার পরিচয়।

এগুণ-বাইশ বছরের যুবক বাদু। যে গ্রামে থাকতাম সেই গ্রামের যোগীন ময়রার বাড়ীতে বাদু মুনিষের কাজ করতো।

আমি একদিন ইস্কুল থেকে আসছি, শীতকালের বেলা তাড়াতাড়ি সন্ধ্যে হয়ে যাবে—জঙ্গলের ভেতর দিয়ে জোরে জোরে হাঁটছি। দুপাশে বড় বড় গাছ। ভয়ে গা ছমছম্ করছে। এমন সময় পাতার খস্‌খস্ আওয়াজ হতেই তাকিয়ে দেখি—তীর ধনুক নিয়ে বাদু বেরুচ্ছে জঙ্গলের ভেতর থেকে।

বাদু আমাকে দেখতে পেয়েছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি রে, কোথায় গিয়েছিলি?

হাতে দুটো মরা ঘুঘু পাখী। হাতটা তুলে পাখীদুটো দেখালে।

—তীর দিয়ে শিকার করলি?

—হ।

—কোথায় শিকার করিস?

বাবু বললে, না। যেদিন খুশী সেইদিন যাই। বুলি যেদিন বলে মাংস খাব, সেইদিন তাকে এনে দিই।

—পাখী মারিস আর কিছু মারিস না?

বাবু বললে, বুনো হাঁস, খরগোস, আর ঘুঘু। আর তো কিছু পাওয়া যায় না।

শুনেছিলাম খরগোসের মাংস নাকি খেতে খুব ভাল। বাবুকে বললাম, আমাকে একদিন একটা খরগোস দিবি?

বাবু জিজ্ঞাসা করলে, কি করবি? রান্না করে খাবি।

বললাম, হ্যাঁ।

রবিবার আসিস। তুকে খরগোস দেবো।

রবিবার বিকেলবেলা গিয়েছিলাম বাবুর কাছে খরগোস আনতে। বাবুদের বাড়ীটা আমি চিনি। বাঁশের বেড়া দেওয়া ছোট খান তিনেক ঘর। একটা ঘরে থাকে বাবুর মা আর বোন বুলি। আর একটা ঘরে বাবু।

বাবু বাড়ীতে ছিল না। উঠোনে বসে বাবুর মা বাঁশ দিয়ে ঝুড়ি তৈরি করছে। আর বুলি আনছে পুকুর থেকে মাটির কলসিতে জল নিয়ে।

ষোলো-সতেরো বছরের মেয়ে বুলি পাটো একখানি পরিষ্কার শাড়ী পরেছে। মাথার চুলে বাঁকা খোঁপা বেঁধেছে আর সেই খোঁপায় যেন গুঁজেছে কি একটা লাল রঙের ফুল। তারি সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে।

আমি তাদের বেড়ার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

আমাকে দেখে বুলি থমকে থামলো। জিজ্ঞাসা করলে, কাকে চাইছিস তুই?

বললাম, বাবু কোথায়?

বুলি বললে, এখনও আসে নাই। দাঁড়া আমি জলের কলসিটা রেখে আসি।

ঘরের ভেতর জলের কলসী রেখে বুলি একটা বাঁশের তৈরি মোড়া হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলো। মোড়াটা উঠোনে পেতে দিয়ে বললে, বোস্, এখুনি আসবেক। তুর জন্তে খরগোস মারতে গেইছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, তুই জানলি কেমন করে?

বুলি হাসলো। মুক্তোর মত ঝক্ ঝক্ করছে সাদা দাঁত। হাসলে তার গালে টোল্ পড়ে। বললো দাদা আমাকে বলেছে।—ওই তো দাদা আসছে।

দেখলাম, জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছে বাবু। হাতের ডাঁকে পাশ করে ধনুকটা পিঠের দিকে রেখেছে। দুহাতে অনেকগুলো পাখী আর একটা ধূসর রঙের খরগোস। নীচের দিকে তার মুখটা ঝুলছে। মুখ দিয়ে টস্ টস্ করে রক্ত পড়ছে। চোখদুটো চেয়ে রয়েছে। মনে হচ্ছে যেন তখনও মরেনি।

ছটা পাখী মেরেছে সে। নানারকমের পাখী। উঠোনের ওপর বুলির পায়ের কাছে পাখীগুলো ফেলে দিয়ে বাবু বললে, খরগোসটা হায়রান করে দিয়েছে আমাকে। ওরা যত ছুটে আমিও তত ছুটি। আমারও জিদ চেপে বসলো—তুকে দিব যখন বলেছি তখন দিবই।

বাবু সত্যিই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। দুটো পা তার ধুলোয় ভর্তি।

ধনুকটা তার হাত থেকে টেনে বের করে নিলে বুলি।

কুকুরটা ছুটে এসেছে মরা পাখীগুলোকে দেখে। বুলি তাকে তাড়িয়ে দিয়ে দড়ির খাটিয়াটা টেনে আনলে তার দাদার কাছে। বললে, বোস দাদা, জল খাবি?

বাকু বললে, না। আগে আমি গা ধুয়ে আসি।

বাকু চলেগেল পুকুরের দিকে।

তাদের মা এতক্ষণ মাথা হেঁট করে একমনে সুড়ি বুনছিল। একবার মুখ তুলে তাকিয়েও দেখেনি। এবার সে সাঁওতালী ভাষায় কি যেন বললে তার মেয়েকে।

মেয়েও কি যেন জবাব দিলে।

কি তাদের কথা হলো কিছুই বুঝলাম না। বুলির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কি বলছে তোর মা?

—কিছু না। বলে কথাটাকে চাপা দিয়ে বুলি তার বাবার তীর ধনুকটা ঘরের ভেতর রাখতে গেল।

বুলির মা কিন্তু চুপ করে রইলো না। এগিয়ে এসে বললো আমার কাছে। বললে, শুন্ বাবু, আমরা সাঁওতাল। আমাদের মিছে কথা বলতে নাই। কুছু খারাপ কাজ করতে নাই। তুদের গাঁয়ের যুগীন ময়রাকে চিনিস্ তো?

বললাম, হ্যাঁ চিনি।

মা বললে, সেই যুগীন ময়রার ঘরে আমাদের বাকু কাজ করে।

বললাম, তাও জানি।

মা বললে, কাল সেই যোগীন বাবুর মাইনের হকুম হিসেব করে ধান দিয়েছে। আমার মনে হয় উ ভুল করে ধান কিছু বেশি দিয়ে ফেলেছে। সেই ধান যোগীনকে ফিরাঁই দিতে হবেক কিনা তুই বল্ আমাকে।

কথাটা বুঝলাম এতক্ষণে। বললাম, যোগীন কিছু ধান বেশি দিয়েছে বাকুকে। তা ঠিক না। যোগীন ময়রা বড়লোক। ওর ধানের অভাব নেই। বাকুকে যদি কিছু বেশী ধান দিয়েই থাকে তো সেই ধান তাকে ফিরিয়ে দেবার জন্যে এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন?

বুলি বললে, মাকে তুই বুঝোই বল্ তো বাবু। কাল থেকে মা সেই এক কথা নিয়ে দিনরাত গজ্ গজ্ করছে।

তার মা যেন ফস্ করে জ্বলে উঠলো।

—তুইও এই কথা বলছিস হতভাগী? বাকু ধান ফিরে দিবেক নাই? বেশ, বাকু না দেয়, আমি নিজে যাব।

বাকু স্নান করে ফিরে এলো পুকুর থেকে। মার কথাটা সে শুনতে পেয়েছে। বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ যোগীন ময়রার ধান আমি দিয়ে আসবো। ওর বেশি ধান আমি নিবো কেনে?

এই বলে ভিজে কাপড়টা ছেড়ে শুকনো কাপড় পরে বাকু এসে বসলো ঘাটের ওপর। বললে, ধানের হিসেব আমি করেছি। যোগীন ময়রা দশ সের বেশি ধান আমাকে দিয়েছে। ধান ফিরে দিয়ে ওর কাজ আমি ছেড়ে দেবো।

মা বললে কেনে, কাজ ছেড়ে দিবি কেনে? দিব্যি কাজ করছিস, কাজ করছিস বলে আমাদের কুছু দুঃখু নাই। কাজ ছেড়ে দেবো বলিস না। ছিঃ!

বাকু বললে, শুনবি তবে কেনে বলছি—

—হ শুনবো। বল্।

বাকু বললে, ঘোষীন ময়রা বলছে—গুপী কায়েতের যে তিন বিঘে জমি আছে শ্মশানের ধারে, সেই জমির সব ধান রাতারাতি কেটে ওর খামারে তুলে দিতে হবেক। ইয়ার জন্যে ও আমাকে দশটা টাকা দিবেক্।

মা বললে, এই কথা বলেছে? চুরি করে ধান কেটে নিতে হবেক্?

বাকু বললে, হঁ। চুরি করে রাতারাতি কেটে নিতে হবেক্ গুপী কায়েতের সব ধান। বলছে—তুই আমার চাকর। আমার কথা তোকে শুনতে হবেক্। না শুনলে জুতো মারবো।

মা বুঝলো কথাটা। বললে, না, চুরি করে তুই কখনও ধান কাটবি না। দশ টাকা দিলেও না। আমরা সাঁওতাল, উপোস করে থাকবো, তবু তোকে চুরি করতে কখনও বলবো না। তোর বাপের রক্ত আছে তুর গায়ে। খারাপ কাজ করবি না কিছুতেই।

বাকু বললে, ঘোষীন ময়রার ধান আমি কেরৎ দিব নাই—সেকথা তো আমি বলিনাই মা, বুলি বলছে—তারি তো দশ সের ধান, ও আর তোকে কেরৎ দিতে হবেক নাই দাদা।

বুলি কাছেই দাঁড়িয়েছিল। আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম, ঠিক বলেছে বুলি।

বাকু বললে, না না ঠিক বলে নাই।

মা বললে, শোন তবে—বাকুর বাবা কি করেছিল শোন্!

এই বলে বাকুর মা একটি গল্প বললে আমাকে। বাকুর বাবার গল্প।

—বাকুর বাবা তোদের গাঁয়ে বামুন বাড়ীতে মুনিষের কাজ করতো। সেই বামুনের একটা গরু চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল বুনো বাগ্দি। বাকুর বাবা তাকে ধরেছিল রাস্তায়। মনিব তখন বাকুর বাবাকে বলেছিল—মার তুই ওই ব্যাটা বুনো বাগ্দিকে। বাকুর বাবা তাকে এমন মার মেরেছিল যে তার একটা হাত গিয়েছিল ভেঙ্গে। এই নিয়ে থানা-পুলিশ হলো। বাকুর বাবার মনিব শুনলে থানা থেকে দারোগা আসবে এন্‌কোয়েরি করতে। গরু চুরিটা প্রমাণ করা যাবে না, কিন্তু মনিবের হুকুমে বাকুর বাবা মেরে তার হাত ভেঙ্গে দিয়েছে—সেটা প্রমাণ হয়েগেলে মনিব পড়বে বিপদে। মনিব তখন বাকুর বাবাকে বললে, দারোগার কাছে তুই সব সোপন করে যা। বলবি মনিব আমাকে মারতে বলেনি। আমিও মারিনি। বুনো বাগ্দি গাছ থেকে পড়ে গিয়ে হাত ভাঙিয়েছে।

বাকুর বাবা কিন্তু মিছে কথা বলবে না কিছুতেই। মনিব তাকে টাকা-পয়সার লোভ দেখালে। বাকুর বাবা একটি পয়সাও নিলে না।

মনিব তখন রেগে গিয়ে বাকুর বাবাকে খুব মারলে। বললে, বল ব্যাটা তুই মারিসনি বুনো বাগ্দিকে।

বাকুর বাবা বললে, আমি বলবো—আমি মেরেছি।

—বললে তোর জরিমানা হয়ে যাবে। চাই-কি জেলও হতে পারে।

বাকুর বাবা বললে, হোক্।

মনিব বললে, বেশ তবে আমি বলবো দারোগার কাছে—আমি হুকুম দিইনি। তোর রাগ ছিল বুনো বাগ্দির ওপর। তাই ওকে মেরেছিস।

বাকুর বাবা বলেছিল, তোর ধর্ম তোর কাছে। আমার ধর্ম আমার কাছে।

এই গল্পটি বলে বাদুর মা বাদুকে বললে, সেই বাঘের ব্যাটা তুই। এই কথাটি তোর যেন মনে থাকে।

থাকবে। বলে বাদু উঠলো।

মরা খরগোসটির পেছনের দুটি পায়ে একটা দড়ি বেঁধে দিয়ে বাদু আমাকে বললে, এমনি করে হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে যা। চল্ আমি তোর সঙ্গে যাই।

এই খরগোসটির জন্যে চার আনা পয়সা আমি তাকে দিতে গেলাম। কিন্তু পয়সা সে কিছুতেই নিলে না।

নিতান্ত গরীব তারা। চার আনা পয়সার দাম ওদের কাছে অনেক। কিন্তু বাদু, বাদুর মা আর তার মেয়ে বুলি—তিনজনেই একসঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করলে।

বাদু আমার সঙ্গে এলো।

তার কাঁধে একটা বস্তায় নিলে ধান সেদ্ধ করার ধান। যোগীন ময়রাকে সে কেবল দেবে।

—ওর ঘরে মুনিষের কাজটাও কি তুই ছেড়ে দিবি?

বাদু বললে, তবে কি বলতে চান দশটা টাকার লোভে গুপী কায়েতের জমির পাকা ধান রাতারাতি চুরি করে কেটে নিয়ে যোগীন ময়রার খামারে তুলে দেবো?

সে কথাটার জবাব দিতে পারিনি আমি।

সেই জঙ্গলের ভেতরের দিকে সাঁওতালদের আরও অনেক বস্তি আছে শুনেছিলাম।

একদিন গিয়ে দেখি বেশ বড় একটি সাঁওতাল-পল্লীর একটা গাছের তলায় অনেক লোক জড়ো হয়েছে। অনেক ছেলে, অনেক মেয়ে।

ব্যাপারটা কি জানবার জন্যে কাছে এগিয়ে যেতেই দেখলাম, কলিয়ারী থেকে একজন 'রিক্রুটার' এসেছে। 'রিক্রুটার'কে সোজা বাংলায় বলে 'আড়কাঠি। এখানকার এই সব জোয়ান জোয়ান সাঁওতাল ছেলেমেয়েদের ফুসলিয়ে ভালিয়ে কয়লাখুটিতে নিয়ে যায় কয়লা কাটতে।

সেই রিক্রুটারের হাতের কাছে বড় একটি মদের বোতল, অনেকগুলি কাঁচের গ্লাস, আর তারই একদিকে স্তূপীকৃত কয়লা।

যে আসছে তাকেই প্রথমে এক গ্লাস মদ খাইয়ে দেওয়া হচ্ছে, একটা সিগ্রেট তার মুখে দিয়ে রিক্রুটার বলছে, এইখানে বসে বসে সিগ্রেট খাও।

সিগারেট টানতে টানতে মদের নেশা যখন বেশ জমে উঠছে তখন একজন সাঁওতাল উঠে দাঁড়াচ্ছে। সাঁওতালের পরণে হাফ প্যান্ট, গায়ে গরম কোট, পায়ে মোজা আর বুটজুতো। সেও এসেছে কলিয়ারী থেকে এই রিক্রুটারের সঙ্গে। সাঁওতালী ভাষায় বক্তৃতা করে সে তাদের বুঝিয়ে দিচ্ছে—চল্ তোরা আমাদের সঙ্গে কলিয়ারীতে কাজ করবি। এই রকম মদ আর এইরকম সাদা চুরুট সেখানে যত খুশী খেতে পাবি। থাকবার জন্যে ভাল ঘর পাবি। রোজগারের টাকা পাবি। কোনও অভাব থাকবে না, কোনো দুঃখু থাকবে না। তবে কেন মিছে এই জঙ্গলের মাঝখানে পড়ে আছিস? এখানে দুবেলা পেট ভরে খেতে পাচ্ছিস না, গায়ে একখানা কাপড় নেই, শীতের দিনে আগুনের ধারে বসে বসে হিম্

হিস্ করে কাঁপছিস, আয় এই ভাখ্ আমার এই জামাটার গায়ে একবার হাত বুলিয়ে ভাখ। আমিও ছিলাম এমনি তোদের মত জঙ্গলে বস্তিতে, কষ্টের সীমা ছিল না। এখন আমার কোনও কষ্ট নেই।

একজন বলে উঠলো—আমি যাব।

তার দেখাদেখি আরও অনেকেই এগিয়ে এলো।

রিক্রুটার বললে, এইবার এই পাকা খাতায় নাম লেখাও।

একজন বললে, আমি যাব কেমন করে তাই ভাবছি। আমার বুড়ী মা আছে, ছোট ভাই আছে, বোন আছে—

—থাক্ না। আমরা সবাইকে নিয়ে যাব। সবাই থাকবি একসঙ্গে।

নাম যারা লেখালে তাদের প্রত্যেককে একখানা করে কম্বল দেওয়া হলো।

পোষা হাতী দিয়ে যেমন করে বুনো হাতী ধরা হয় তেমনি করে একজন সাঁওতাল দিয়ে সব কিছু বলিয়ে নেওয়া হলো।

সরল বিশ্বাসী সাঁওতালের দল তার সব কথাই বিশ্বাস করে বসলো। এবং তার পরের দিন দেখাগেল, সাঁওতাল পল্লী ফাঁকা করে দিয়ে সবাই চলেগেছে কলিয়ারীতে।

বাকুরা শেষ পর্য্যন্ত ছিল।

আমি যখন সেখান থেকে কলকাতায় আসি তখনও বাকুদের দেখে এসেছি সেই জঙ্গলের ভেতর।

এতদিনে কোনও রিক্রুটারের কৃপায় তারাও আমাদের কয়লাকুঠির দেশে চলে এসেছে কিনা কে জানে।

অসভ্যতা এবং অশিক্ষার ঘোর অন্ধকার থেকে সভ্যতার আলোকে আসবে—তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

অভাব তাদের ছিল অনেক। বিলিতি যন্ত্র ছিল না, সিগারেট ছিলনা, শীতের বস্ত্র ছিল না। কিন্তু সে অভাবের বোধও ছিল না।

সে বোধটুকু জাগিয়ে দিতেই বা কতক্ষণ?

কয়লাকুঠির দেশে এসে পাবে তারা অনেককিছু!

কিন্তু হারাবে যা—তা তারা বুঝতেও পারবে না।

কয়লাকুঠির দেশে আমি বাকুর মত অনেক ছেলেকে দেখেছি যারা অবলীলাক্রমে মিথ্যা কথা বলে। চুরি করে। মদ খায়। মানুষকে প্রতারণা করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না।

বুলির মত উদ্দাম যৌবনা মেয়েকে দেখেছি—কয়লাকুঠির সাহেবদের অঙ্কশায়িনী হতে।

বাকুর বাবার যে অপরাজেয় মল্লযুদ্ধের গল্প বাকুর মা আমাকে শুনিয়েছিল, সে গল্প আর শুনতে পাব না।

এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এই বর্ব্বরদের কেন আমি টেনে এনেছিলাম শুচিশুভ্র পবিত্র সাহিত্যের প্রাঙ্গনে।

শারদোৎসব-মন্দিরে এই সব অদৃশ্য মানুষগুলিকে টেনে এনে আমি অন্যায় করেছি কিনা সেকথা একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম রবীন্দ্রনাথকে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, কিছু অন্যায় করনি। আমিও এইরকম সাঁওতালকে দেখেছি শান্তিনিকেতনে। আমারও একবার ইচ্ছে করেছিল—ওদের নিয়ে গল্প লিখবার। কিন্তু লিখিনি। লিখতে পারিনি। কারণ ওরা যেরকম ভাবে কথা বলে ঠিক সে রকম ভাবে বাংলা বলতে আমি পারিনি।

বলেছিলাম, আমি কিন্তু ওদের মুখে হুবহু সেই ভাষাই দিয়েছি। আমার মনে ভয় হয়েছিল—ভেবেছিলাম এই আঞ্চলিক ভাষা পাঠকদের পড়তে কষ্ট হবে।

শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন—অধিকাংশ পাঠক-পাঠিকা তোমার ও ভাষা পড়তে গিয়ে হোঁচট খাবে। তখন আর পড়তে চাইবে না। তাই আমি সাঁওতালী গল্প লেখা ছেড়ে দিয়েছি।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বলেছিলেন—না, ছেড়ো না। কথাশিল্পে সব আঞ্চলিক কথারই প্রবেশ করবার অধিকার আছে। তাছাড়া আমি ওদের দেখেছি দোতলার জানলা থেকে। আর তুমি দেখেছো ওদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। কাজেই তোমার দেখার আর আমার দেখার তফাৎ অনেক। তুমি ওদের সম্বন্ধে লেখবার অধিকারী। লেখা তুমি বন্ধ কোরো না।

অভিসার

—শক্তিপদ রাজগুরু

জিপ থেকে হ্যাণ্ডলাইটের আলো ঘনের নিবিড় অন্ধকারে যেন তুফান তুলেছে। ধারালো আলোর তীক্ষ্ণ রেখাটা পাহাড়ের গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল লাল অরণ্যের কুমারী অন্ধকারের সব আবরণটুকু খসিয়ে নিয়েছে। তাই বোধহয় কোন অশরীরীর দল শিউরে ওঠে ভয়ে আর লজ্জায়। পাতায় পাতায় বাতাসের ছোঁয়া লেগে সিসিরগুলো বাজছে। শুধু ঘুমন্ত কুমারী দেহে কোন লোভী একটা মানুষের ঘাণ পেয়েছে, হঠাৎ ঘুমভাঙা চোখে সে চেয়ে আছে - ভয়ে কাঁপছে থরথরিয়ে। আলো পড়তেই নীলাভ চোখগুলো জ্বলে ওঠে—কারা বনের ঝোপ গাছ ভেঙে ছোটল। অন্ধগুলো ভাবতে পারেনি এমনি রাতনিঝুমে তাদের বেলায় কেউ হানা দেবে।

ওরা বের হয়ে এসেছিল পাহাড়ের গা বেয়ে—ঘরম ঘাস চিবুচ্ছিল। কোন এক সম্বর হস্পতি কাঁকড়া সিং দিয়ে সাবাঘাটির ডোবাটাকে আঁচড়ে নূন নূন সাবাঘাটি চাটছিল নিশ্চিন্তে—দুএকটা বাইসন দলছুট হয়ে এসেছিল এদিকে। ওরা সকলেই উৎকর্ণ সচকিত হয়ে ওঠে পাহাড়ের উপরের রাস্তায় নীরব মৃদু একটা গুরু গুরু শব্দ শুনে। কান খাড়া করে ছিল আর নাক ফিরিয়ে বাতাসে ঘ্রাণ নিচ্ছিল। এমনি সময় উলসে ওঠে ওই আলোর ঝলক।

—সাব্!

নিশীথের পাশে বসেছিল বাবুকা। আদিবাসী হো—কঠিন শক্ত চেহারা মুখখানা গোল মত, ওর দুটো তীক্ষ্ণ চোখ যেন অন্ধকারে জ্বলছে। নাক তুলে কোন বন্যজন্তুর মত বারকয়েক শোঁক শোঁক করে, গভীর ভাবে। ঘ্রাণ নিয়ে ফিসফিসিয়ে ওঠে—স্-স্-স। নিশীথ জানে ওই ইঙ্গিত। আদিম অরণ্যচারী ওই লোকটার চোখেমুখে ফুটে উঠেছে কাঠিণ্য। রাতের রহস্যময় এই বনপর্বতরাজ্যের মতই গম্ভীর মারমুখী হয়ে উঠেছে সে।

নিশীথও তৈরী হয়েছে। যার জন্য চলেছে এই অরণ্যে—যার সন্ধানে কিছুদিন ঘুরছে সে, সেই হানবটাই বোধহয় এসে গেছে সামনে। কোলের উপর রাখা ফোর্ সেভেন ফাইভ ডেডি রাইফেলটা ঠাণ্ডায় ঝনঝনে হয়ে উঠেছে। ওর দুটো ব্যারেলেই পোরা আছে দুটো লেথাল, চকিতের মধ্যে ঝলসে উঠবে নলে ফ্ল্যাশ দিয়ে আটকানো পাঁচসেলের বিলেতী টর্চের আলো—প্রচণ্ড বিস্ফোরণের উত্তাপে ঠাণ্ডা কালো নলটা তেতে উঠবে, পাহাড়ে পাহাড়ে আদিম অরণ্যে ধ্বনিপ্রতিধ্বনি তুলবে রাইফেলের গুলির আওয়াজ, বনভূমির স্তব্ধতা খান্-খান হয়ে যাবে।

একটি মুহূর্ত। কালো ধোঁয়ার মত প্রচণ্ড গতিবেগ নিয়ে পঁয়ত্রিশ চল্লিশ মণ ওজনের কালো সাবার যেখানে ছিল ধাইসনটা এসে তার ধারালো শিঙের গুতোয় নাচয় পায়ের লাথি দিয়ে ছিন্নটাকে পাহাড়ের

গায়ে গড়িয়ে দেখে খেলবার মত! খুন্তে ছিটকে ফেলে দেবে তাদের, বারালো খুরের আঘাতে মাথার খুলি ভাঁড়ো হয়ে যাবে।

আলোটা পড়তেই নিশীথ রাইফেল হাতে হুড়খোলা জিপে উঠে দাঁড়িয়েছে—আলোর মত সন্ধানী অভ্যস্ত দৃষ্টি মেলে।

কোথাও সেই কালো কিম্ভূত দৈত্যটার চিহ্নমাত্র নেই। আলোর ঝলকে দেখা যায় শাল গাছের গুঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে আছে দুটো হরিণ; আলোর ওদের হলুদকালো ছোপ লাগানো গা ঝক ঝক করছে—ভাগর কালো চোখে কি গভীর মায়া।

নিশীথ দীর্ঘদিন বনে বনে ঘুরছে, এটা তার জীবনের একটা বিচিত্র দিক। এমনি গহন অরণ্যের সঙ্গে তার প্রকৃতির একটি নিবিড় সাযুজ্য আছে। তাই এই বনরাজ্যে পাহাড়ে পর্বতে এসেই আশ্রয় গড়েছিল বহুদিন আগে। পৈত্রিক ঠাট একটা এখানে ছিল, কিন্তু নিশীথ সহর ছেড়ে এখানে চলে এসেছিল, স্বাধীনভাবে বাস করে তুলেছে এই বনপাহাড়ের সীমান্তে।

হরিণ বিশেষ করে মাদী হরিণ সে মারে না। বনে বনে ঘোরে—শিকারে তার সুনামও খুব। আদিবাসীরা জানে এই বন পর্বতের মাঝে মানুষখেকো বাঘ—ক্ষ্যাপা হাতি—বাইসনের হাত থেকে তাদের প্রাণ বাঁচায় ওই লোকটিই। বার বার এমনি বিপদ এসেছে তাদের জীবনে, সরকার থেকেও অনেকে এসেছেন, কিন্তু সেই সাজা শিকারীর দল সাতশো পাহাড়ের এই বনরাজ্যে পাত্তাই করতে পারেন নি। আদিবাসীর দল ভয়ে ভয়ে রাত কাটায়, ঝুপড়িতে আগুন জ্বালে কানেস্তারা পিটোয়, ওরই মাঝে কোন ফাঁকে মানুষখেকো বাঘ এসে ঠিক মানুষকে তুলে নিয়ে যায়, পাগলা হাতীর পায়ের চাপে মানুষকে কাঁই বানিয়ে দেয়—দল-ছুট বাইসন এর শিং কার কলিজা এঁকোড় ওঁকোড় করে দেয়। বনের মানুষ—বন্য জানোয়ারের শিকারেই পরিণত হয়।

এদের থেকে বাঁচাতে পারে তাদের ওই মানুষটি। দিন রাত নেই নিশীথ বনে বনে ঘোরে—হাতে তার হেভি রাইফেল। অতন্দ্র প্রহরী সে, বর্ষার জল খেয়ে শুকনো রুটি চিবিয়ে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে সে বনের সেই আতঙ্ককে হত্যা করে। আদিবাসীদের মুখে হাসি ফোটে—তাদের ঘর ক্ষেতি-বলদ বাঁচলো। এমন অনেকবার ঘটেছে, বাঘ-হাতি-বাইসন ওর কাছে খেলার বস্তু। আদিবাসীরা তাই ওকে বলে—কলির অর্জুন। ওর নাকি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় না; আদর করে বলে 'হারাং শিকারী।' ওর নামে তারা মাথা নোয়ায়। বন্য দুর্ধর্ষ লোকগুলো কাউকে মানে না, বনের কর্তাদের তারা দূর থেকে দেখে সরে যায়। ওদের তীর-ধনুকের থেকে ওই বন্দুকের জোর বেশী। তাই ওদের বীরত্ব হাঁক দেখে ওরা আড়ালে হাসে। নিশীথকে তারা দেবতা বলেই ভাবে। ওই কালো ইস্পাতের মত ছিপছিপে পেটা লোকটা তার দুচোখের তীব্র সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে সমস্ত বনজগৎকে দেখে, ভালোবাসে।

বনবিভাগের নোতুন কর্তা এখানে বছরখানেক এসেই সেই খবরটা শুনেছেন। গভীর গহন বন-পর্বতের গা জুড়ে শাল, আসান, মুর্গা-ধ' গাছের গভীর জঙ্গল। নীচেকার উর্বর লালমাটিতে গজিয়ে ওঠে ঘন সবুজ জংলী ঘাস-এর বন। শাল গাছগুলো বিশাল আর তীরের মত সোজা উঠে গেছে আকাশে এতটুকু কৃপণ আলোর সন্ধানে। নোতুন এই রিজার্ভ ফরেষ্টের চার্জ নিয়ে এসেছেন। সুবীর বসু পুরোনো আমলের লোক—সামান্য অবস্থা থেকে নিজের কাজ দেখিয়ে একটা পুরো ডিভিসনের চার্জ পেতে বেশ বেলা হয়ে গেছে। বনে পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে আর অনিয়মে তাই শরীরটা একটু কমজোরী হয়ে এসেছে, মাথার চুলগুলোয় সাদাটে ছোপও লেগেছে।

বনের গভীরে পুরু বাকলের নীচেও ওই বলিষ্ঠ গাছগাছড়াগুলোর অন্তরে বর্ষপুর্তির ছাপ আঁকা হয়ে যায়, কালের প্রহরা ওরা এড়াতে পারে না, তেমনি বনের গভীরে বাস করেও সুবীর বসুর চোখমুখে বয়সের ছাপটা প্রকট হয়ে উঠেছে। দেহটাকে তবু মজবুত কর্মক্ষম করে রেখেছেন তিনি।

হেডকোয়ার্টার বনসীমার বাইরে একটু দূরের কোন সহরে, সুবীর বসু সস্ত্রীক সেখানের সাজানো বাংলোয় থাকেন। ঘর পাতার সময় আগে হয়নি, প্রমোশন হবার পর বন থেকে সহরমুখো হতে বিয়ে করেন। কর্মচারীরা আড়ালে বলে—বিয়ে করার পর সাহেবের মেজাজ নাকি আরও চড়ে গেছে। আগে তবু হেসে কথা বলতেন।

সুবীর বসুর নাম আছে কড়া অফিসার বলেই। তবু ওরা জানে বিয়ে-থা করার পর সাহেব যেন কোথায় একটা ঘা খেয়েছেন। আর সেই আঘাতটার বেদনাকে চাপা দেবার জন্যই একে ওকে হাবড়ে মারে বেশ অফিসার, চিট অফিসারদের হুমকি দিয়ে নিজের প্রাধান্য অটুট রাখতে চান।

কর্মচারীরাও দেখেছে মেমসাহেবকে, বয়সের পার্থক্যটা চোখে পড়ে। আর ওরাই বলে সাহেবের পাশে রূপবতী আধুনিকা মেমসাহেবকে নাকি একেবারেই বেমানান ঠেকে।

এটা সুবীর বসুও জানেন তাই মনে মনে নীরব একটা ক্ষোভ রয়ে গেছে। সুবীর বসু হেডকোয়ার্টারে থাকলেও দেখেন সন্ধ্যার দিকে মৌসুমী নিজেই স্নান প্রসাধন সেরে হালকা রং সিল্কের শাড়ি পরে বের হয়। ওর প্রসাধনের উৎকটতা নেই তবু সামান্য সেই প্রসাধন শাড়ি পরার ষ্টাইলটুকু ওর রূপকে আরও প্রকট করে তোলে।

—চলে কোথায় ?

মৌসুমী নরম ঠোঁটে লিপষ্টিকের একটু ঈষৎ গোলাপী আভাকে মাখাতে মাখাতে শোনায়—এমনই। একটু ঘুরে আসি সহর থেকে।

সুবীর বসু বেশ বোঝেন মৌসুমী তাকে নিয়ে একদণ্ডে বেরুতে বড় একটা খুশী নয়। অফিসারস্ ক্লাবেও যায় না। সহরের দুএকটা আড্ডায় না হয় দুচারজন গুণমুগ্ধ স্তাবকদের ওখানে গানের আসরে যায় একাই। একা থাকতে সে ভালোবাসে-নিজেকে নাকি সেই নিঃসঙ্গতার মধ্যে মেলে ধরা যায়।

সুবীর বসুর কোনো ঠাঁই নেই সেই জগতে। মনে হয় মৌসুমীকে তখন বিয়ে করে ভুলই করেছিলেন তিনি। ওর বাবার অবস্থা তখন পড়ে গেছে ভালো পাত্রে বিয়ে দেবার সঙ্গতিও নেই। ছিল না। সেই সময় একজন ডেজেটেড অফিসারেরর সঙ্গে বিয়ের কথা বলতে পেয়ে তিনি খুশী হয়েছিলেন। একরকম মৌসুমীর অমতেই এ বিয়ে হয়েছিল।

সুবীর বসুর দৃঢ় আত্ম-প্রত্যয় ছিল। বনের গভীরে ঘুরে ঘুরে তিনি ভেবেছিলেন অরণ্যকে—তার বিভীষিকাকে তিনি জয় করেছেন, তাঁর পক্ষে একটি মেয়েকে জয় করাটা এমন কোনো কঠিন কাজই নয়। হয়তো তাঁর দীর্ঘদিনের নিঃসঙ্গ মনে মৌসুমীকে দেখার পর থেকেই এতটুকু কি বিচিত্র সুরও উঠেছিল। নোতুন একটি সুর—কিছু আলো কিছু মাধুর্যে ভরা সেই সুর।

কিন্তু সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল। সুবীর বসুর মনে হয় তিনি হেরে গেছেন ওই মেয়েটির কাছে। অরণ্যের রহস্যের চেয়েও নারীর রহস্য অনেক আদিম তমসায় ঢাকা—দুর্জ্ঞেয়। আকাশচুম্বী আদিম অরণ্যঢাকা পর্বতের মত সে দুরধিগম্য ; সেখানে জয় করা যায় না, ফিরে আসতে হয়। তাই সুবীরের মন নীরব পরাজয়ের বেদনায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে ওঠে তত্তই সে কঠিনতর হয়, মারমুখী আর জেদী হয়ে ওঠে।

…কিন্তু মৌসুমী তাকে কোন সুযোগই দেয়নি কোনরকম ঝগড়া করার, নীরব কাঠিন্য দিয়ে মৌসুমী নিজের সব পরাজয় আর হতাশাকে ঢেকে রেখেছে। কৌশলে সরিয়ে নিয়েছে নিজেকে।

সুবীর বসু বললেন—সন্ধ্যায় নাইবা বেরুলে। যে কদিন এখানে আছি তুমিও থাকো। মাসের ক'টা দিনই বা থাকতে পাই? বনে বনেই পড়ে থাকি।

হাসল মৌসুমী। লোকটাকে বড্ড করুণ দেখাচ্ছে। ওর মুখেচোখে বয়সের ছাপটা কেমন প্রকট আর স্থায়ী হয়ে উঠেছে। তার তুলনায় মৌসুমী অনেক উজ্জ্বল, যেন ঝরা পাতার বুকে ও তুলেছে মর্মর, তাতে বেদনাই ফুটে ওঠে। ও জানে সুবীর বসু হিংসা করে তাকে, সহরের তরুণ ইঞ্জিনিয়ার দত্তকে, ডাক্তার মিত্রকে, নোতুন ডি-এম-পি প্রদীপকে। যৌবনকে ওর ভয়, যে যৌবন ওর হারিয়ে গেছে।

কিন্তু সুবীর বসু সেই কথাটা মানতে রাজী নয়। ও দেখাতে চায় তার নিজের প্রাধান্য আর প্রতিষ্ঠা। ওর নিজের জগতে যে তার অনেকখানি মূল্য আছে সেইটা বেমিয়ে স্ত্রীর কাছে সে নিজের প্রতিষ্ঠা স্বামীত্বের দাবী কায়েম করতে চায়।

আর সেই সুযোগই মিলে গেছে তার।

সুবীর বসু ইচ্ছে করেই এনেছে মৌসুমীকে এই করেই বাংলোয়। মৌসুমীরও একঘেঁয়ে লাগছিল তাই দিন কয়েকের জন্য বাইরে এই আরণ্যক পরিবেশে আসতে পেরে ভালোই লেগেছিল তার।

সুবীর বসু বলে, কিন্তু এ তোমার সহর নয়, ভাজিন ফরেষ্ট। হাতীর পাল আছে, বাইসনএর দল; চাই কি রয়েল বেঙ্গল টাইগারও দেখতে পাবে। মুখোমুখী হয়ে পড়তে পারো!

মৌসুমী জিপে চুপ করে বসে বসে ওর কথা শুনছে। লোকালয় ছাড়িয়ে ওরা বনের সীমানায় ঢুকেছে। মাত্র কয়েকটা পথ পাহাড়ের গা বেয়ে এই অরণ্যে এসেছে সেগুলোর মুখে মুখে বাঁশের গেট বাঁধা, চৌকিদাররা দূরকে সেলাম দিয়ে গেট তুলে ধরলো, ওরা পাহাড়ের গা কেটে এতটুকু চওড়া জিপ এর রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে।

এই অরণ্য পাহাড় সবই যেন সুবীর বসুর চেনা; তারই করদ রাজ্য। কিছুদিন ধরে একটা বাইসন ক্ষেপে উঠেছে. বনের মধ্যে ঠাঁই ঠাঁই দুচার ঘর আদিবাসী বস্তিতে হানা দিচ্ছে, দুএকজনকে এর মধ্যে শেষ করেছে। সুবীর বসু বলেন।

দলের মধ্যে এমন মারামারি বাধে বুল বাইসনদের মধ্যে, ওরাই একটা ক্ষেপে উঠেছে। একটাকে শেষ করতে হবে।

কাজটা যেন তিনিই করবার জন্য এসেছেন। মৌসুমী তাই অরণ্য পর্বতের মাঝে এসে কি এক বিভিষিকার রাজ্যে হারিয়ে গেছে। ঠাঁই ঠাঁই এত ঘন পত্রাবরণের নীচে যেন চির অন্ধকার বাসা বেঁধেছে। ভয় হয় মৌসুমীর। এ তার অচেনা জগৎ!

সুবীর বসু,এই ভয়টাই ওকে দেখাতে চেয়েছিল, তার মাঝেই ওর পৌরুষকে প্রতিষ্ঠিত করা সহজ হবে। বনে বনে হাওয়া বয়—ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে বনান্তরালে সেই হাওয়া। গাছের ডালগুলো নেমে এসেছে—সৃষ্টি পথের মধ্য দিয়ে চলেছে জিপখানা। হঠাৎ বটপট শব্দ ওঠে—বনে বনে সেই কাপটানির শব্দ ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে।

চমকে ওঠে মৌসুমী, সুন্দর মুখ লালচে হয়ে ওঠে উত্তেজনায়। সুবীরের হাতটা চেপে ধরে। হাসছে সুবীর বসু।

—ও কিছু না, ময়ূর। ভাখ না—ওই যে।

গাছের ডালে দুটো ময়ূর বসে আছে। পাহাড়ের কঠিন গা বেয়ে এখানে ঝিরঝিরিয়ে জল পড়ছে। মাঝে মাঝে পিছল পাথরের গায়ে সবুজ ফার্ণের ঝোপ। মৌসুমীর ভয় লাগে।

আর কতো দূর?

অর্থাৎ ক্রমেই বাংলোয় পৌঁছুতে পারলে খানিকটা নিরাপদ বোধ করবে সে। সুবীর বসু ওর কণ্ঠস্বরে সেই ভয়টাকে আবিষ্কার করে মনে মনে খুশী হয়েছে। জানায় সে—আর মাইল চারেক পথ।

সুবীর বসু অবশ্য তৈরী হয়েই বের হয়েছিল। ওর সঙ্গে দুজন শিকারী, তাদের রাইফেল ছাড়া নিজেরও বন্দুক সঙ্গে রয়েছে। তবু সাবধানে চলেছে তারা। উন্মত্ত বাইসনটা ঘুরে বেড়ায় এমনি গভীর জঙ্গলে কোন বিজাতীয় শব্দ শুনলে ছুটে আসবে কালো পুঞ্জ ঘোড়ার মত প্রচণ্ড গতিবেগ নিয়ে চুরমার করে দেবে জিপটা। তাই সাবধানী নজর রেখে চলেছে তারা।

মৌসুমীর এটা বিশ্রী লাগে। আসতে সে চায় নি। একরকম জোর করেই ওকে নিয়ে এসেছে মিঃ বোস। আর কেন এনেছে এটাও পরিষ্কার হয়ে উঠেছে মৌসুমীর কাছে। ওর ভয় পীড়িত মনের এই রহস্যটায় মিঃ বোস খুশী হয়েছে। তাতই বিশ্রী লেগেছে মৌসুমীর। কালো ছায়াগুলো যেন দীর্ঘতর হয়ে আসে, পাহাড়ের এদিকে গহন অরণ্যের আড়ালে সূর্য নেমে গেছে, এদিকে অন্ধকার; দূর পাহাড়ের মাথায় বনসবুজে তখনও দিনের আলো ঝলমল করে। হলুদ রোদ পড়েছে দূর বনের ফেলে আসা বনপর্বতে।

মৌসুমীর মনেপড়ে হারানো দিনের কথা, সেইদিনগুলো ছিল অমনি উজ্জ্বল সতেজ আর স্নিগ্ধসবুজ। আজ সব দূর অধরা পাহাড়ের মৌন রূপনিয়ে তার অন্তরের গহনে হারিয়ে গেছে। ওই দিনগুলো ছিল স্বপ্নময় আর অপরূপ।

আর একজনের কথা মনেপড়ে। এমনি নির্জন নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলোয় এখনও তাকে মনেপড়ে। দুর্বার দুর্দম একটি তরুণ। তার জীবনে বড় ভুলেছিল কিন্তু বাধাহয়ে দাঁড়িয়েছিল মৌসুমীর বাবা ও মা। মা ফেলেছিল চোখের জল-আর বাবা চেয়েছিলেন ওকে সরিয়ে দিতে। নিজের বোঝাটা কাঁধ থেকে নামিয়ে অস্ত্র চালান করে সহজেই দায়মুক্ত হতে।

বাবার তর্জন গর্জনের চেয়ে মার চোখের জলেরই দাম দিয়েছিল সে নিজের ভবিষ্যৎকে এমনি করে বিকিয়ে দিয়ে। আজ তিলেতিলে দগদগে হয়ে আসছে মৌসুমীর। যেন এমনি গহন হিংস্র আদিম অরণ্যের মধ্যদিয়ে সে একা চলেছে পিছনে লোকালয়ের নিরাপত্তাকে স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়ে।

জিপটা পাহাড় থেকে নেমে চলেছে এই নীচুর দিকেই জঙ্গল গভীরতর নীচেও নজর চলেছে। আগাছা লতা-ঝাড়ে ঢাকা। তারই মাঝে মাঝে কলকল শব্দ ওঠে। ওরা বন্দুক রাইফেল হাতে তুলে নিয়েছে। জলের ধারে ঘাসবনে ওদের থাকাই সম্ভব। মিঃ বসু বলে ওই যে নদী ওর নাম করলা।

পাথরে পাথরে জল স্রোত মেখে চলেছে দূর তুলে। গাছগুলো ওই নামের আদরকে নিবিড় প্রহরায় ঘিরে রেখেছে এদের চোখের বাইরেই রাখতে চায় ওটাকে।

সামনে ফাকা জায়গা, বাজরা কিছু ধান-এর চাষ। ধানখেতগুলো কারা যেন তছনছ করেছে। মিঃ বোস বলে।

—এসেগেছি। ওই যে ক্রমেই বাংলো।

সঙ্গী শিকারী একজন বলে ওঠে হাতীও নামে এখানে। চারিদিকে গভীর বন। ওই নদীর জলে হাতিরা চান করতে আসে। বাইসনও।

দেখছেন না ধান ক্ষেতের অবস্থা।

মৌসুমীর মনেহয় হাতিগুলো যেন কালো পাথরের স্তূপের মতই এমুনি বের হবে বনথেকে।

ফাঁকা রৌদ্রোজ্জ্বল মাঠের ধারে সেটবেরা বাগান মাঝখানের লাল ধুলো কাঁকরের পথটা দিয়ে নেমেছে বাংলো ধরণের একতলা একটা বাড়ির সামনে। মৌসুমী তবু দুচার ঘর বসতি লোকজন আর ওই বাড়ীখানাকে দেখে একটু নিশ্চিন্ত হয়।

স্থবীর বোস একটু আত্মপ্রসাদের সুরে বলে কেমন, পছন্দ হয়েছে তো জায়গাটা। সুন্দর বাংলো বাগান। লিটারি ল্যাক!

মৌসুমীর মনে হয় লোকটা নিজেকে অকারণেই বিরাট বলে ভাবে, আর সেইটা জাহির করতে চায়। নিজের পুঁজি যার নেই আশপাশের স্বাভাবিক অনেককিছুকে জড়িয়ে সে প্রতিষ্ঠার জন্য ওতই কাঙাল। ওর মনের এই কাঙালপণাকে মৌসুমী কোনদিনই সহ্য করতে পারেনি। চুপকরে ভিতরে চলেগেল জবাব না দিয়ে।

রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসে সন্ধ্যার আগেই। জায়গাটার চারিদিকে পাহাড় আর ঘনবন। সেই বনে আদিম অন্ধকার বাসা বেধে আছে চিরকালের জন্য, দিনের আলোটুকুকে তারা স্বীকৃতি দিতে চায়না। তাই রাত্রি এখানে চিরন্তন আর দীর্ঘস্থায়ী।

ডাইনিং হলটাতেই বসার ব্যবস্থা, দুপাশে দুটো বেডরুম। ডাইনিং হলের কাচের শ্লেসে কাঠের লগ্ জ্বালানো হয়েছে। ভিজে ভিজে আবহাওয়া শীত আর কনকনে ঠাণ্ডা যেন মাটি পাথর ফুঁড়ে আর পাহাড় বনের গা থেকে বের হয়ে মুহূর্মুহু আক্রমণ চালিয়েছে। মৌসুমী আগুনের ধারে ডেক চেয়ার টেনে বসে আছে। ও ভেবেছিল এরা শিকারে বের হবে। কারণ ক্যাপ্টা বাইসন-এর কথা শুনেছে সে; ফরেষ্ট থেকে তাদের যে কোন একটাকে মারতে হবে তবেই এই অনুমতি বন্ধ হবে। কিন্তু অবাক হয়েছে মৌসুমী ওরাও বাইরে না বের হয়ে সন্ধ্যার আগেথেকেই দিল কপাট বন্ধ করে এই কবোষ্ণ পরিবেশে আরাম করতে এই উপভোগটুকুর জন্যই ওরা দলবেধে এসেছে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে বাহ্যিক ভড়ং দেখিয়ে।

অন্ধকার ঘিরে ধরে আসছে। দেরীতে চাঁদ উঠেছে। পাহাড়ের মাঝখানের এই ফাঁকা ঠাইটুকুতে চাঁদের আলো এসে পড়েছে তির্যক রেখায়। হঠাৎ দিনের শব্দ ওঠে, বনভূমি মুখর হয়ে ওঠে। পাথরে পাথরে ওঠে সম্ভবেত খুরের শব্দ।

খট খট খট খট যেন বড় চিকারায় কে যেন ঘা মারছে। একটানা ক্রতলয়ের শব্দটা উঠছে। কাঁপছে ওই বনপাহাড় গুরু গুরু ধ্বনিতে।

—মিঃ বোস! চমকে উঠেছে শিকারী ভদ্রলোক।

মৌসুমী অবাক হয়েছে ওদের মুখচোখ আবছা আলোয় দেখাযায় ওদের মুখে ফুটে উঠেছে জমাট আতঙ্কের ছায়া। সেই ভদ্রলোক বলেন,

—ষ্টাম্পেডিং শুরু হয়েছে। বাইসনের দল যেন ক্ষেপে উঠেছে সামনে যা পাবে তাই তছনছ করে দেবে। অপরজন ভীত চকিত স্বরে বলে যদি চার্জকরে, দরজা জানালা ভেঙে চুরমার করে দেবে।

মৌসুমী ওদের দিকে চেয়ে থাকে। বাংলোর ভিতরে টাঙানো রয়েছে একটা বড় বিশাল বুল

বাইসনের ছবি। কালো বিশাল ছোট খাটো পাহাড়ের মত জমাট একটা দেহ দুচোখ জ্বলছে। চোখের উপর ভ্রূগুলোর রোঁয়া সাদা, সুন্দর সুগঠিত শিং দুটো সুবিন্যস্ত, ও মূর্তিমান শক্তির প্রতীক। তাতা ভয়ঙ্কর একটা বাইসন।

শব্দটা এগিয়ে আসছে। লোকগুলোর আর্ত চীৎকার ওঠে রক্তের সেই শব্দটা এগিয়ে এসেছে কাছে। আরও কাছে।

—মৌসুমী ফিসফিসিয়ে ওঠে মিঃ বসু।

মৌসুমীর ভয়টা স্তব্ধ হয়ে গেছে। সে এসে দাঁড়িয়েছে জানালার ধারে। বাইরে মসসুইটো নেটের একটা পাল্লা ভিতরে কাঁচের শার্সি বসানো পাল্লা আটকানো। বাইরে চাঁদের আলোভরা আদিম অরণ্য কি জমাট আতঙ্কে সেই অরণ্যানীরা স্তব্ধ নিস্পন্দ। চাঁদের আলোয় মাখামাখি হয়ে বনভূমি চেয়ে আছে ভীত চকিত চাহনিতে। কালোপাথরের সেই স্তূপগুলো প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে বোঝার কুণ্ডলীর মত টুকরো টুকরো হয়ে ওরা বেরে চলেছে, সতেজ একটা বাইসন শিং এ করে কাকে শূন্যে তুলে ছিটকে দিয়ে মিলিয়ে গেল। পাথরে পাথরে ওদের ধারালো ইস্পাত খুরের ঘায় আগুনের ঝিলিক উঠছে। দলটা এদিককার পাহাড় থেকে ওপাশের বনের দিকে ঢুকে গেল তখনও আকাশবাতাস নাগ্‌রা পেটার মত শব্দটা উঠছে। আদিম হিংস্র অরণ্যের চকিত রূপ দেখে শিউরে উঠেছে মৌসুমী।

ওরা ঘরের এককোণ থেকে বেরিয়ে আসে। মৌসুমী ওদের ভীত ত্রস্ত মূর্তিগুলোকে দেখেছে, এই অরণ্যের বিশাল এই শক্তির প্রকাশকে তারা ভয় করে এই অরণ্যে ওরা অনধিকার প্রবেশ করেছে জানে তাই ভয়ে ভীত ত্রস্ত।

ইতিমধ্যে মশাল জ্বলে উঠেছে, আদিবাসী হো-কোলরা বেরহরে ক্যানাস্তারা পিটছে, কলরব করে তারা। কারা ডাকাডাকি করছে এদের : রাইফেল লোড করে বীরের দল বাংলো থেকে বের হল, মৌসুমীও একটা চাদর জড়িয়ে বারান্দায় আসে।

অরণ্যের চারিদিক আকাশবাতাসে যেন হামাদারের দল। দিনের আলোভরা অরণ্য রাতের বিভীষিকা নিয়ে জেগে উঠেছে এদের মুখে ভয় আর কান্নার তরলতা। বাগান-ওপাশের দুএকটা গাছকে ওই পর্বতের চল যেন ভেঙে দুমড়ে তছনছ করে দিয়ে গেছে, ওই বন্যাপ্রবাহ সামনে যা কিছু পেয়েছে তাকেই কঠিন আঘাত হেনে চুরমার করে দিয়েছে। একজন আদিবাসী ছিল ধানক্ষেতের মাচানের উপর ধাক্কায় সে ছিটকে পড়েছে, বন্য বাইসনের দল তাকে শিং এর ঝটকায় আর খুরের আঘাতে ছিন্নভিন্ন করে একতাল রক্তাক্ত মাংসপিণ্ডে পরিণত করে গেছে। ওপাশে পড়ে আছে আর একজন তাদের গতিপথ থেকে তাকে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করে জলের মধ্যে ফেলে গেছে, হাত পা ভেঙে সে কাতরাচ্ছে।

বীভৎস একটা দৃশ্য। এই বন্য প্রকৃতি যেন এদের চোখের সামনে নিমেষের জন্য তার প্রচণ্ড শক্তি আর প্রতাপের পরিচয় টুকরো নমুনা দিয়েগেছে। ভীত আদিবাসীর দল বলে—উটোকে মেরে ফেলাক সাহেব নালে আমাদেরই ঘর থেকি বসতি ফেলে চলে যেতে হবেক। উটোই দলকে তাতা করে কাবু করেছিল। ওটা যাহার ওই বুড়াটাকে মেরা ফেলা।

মৌসুমী ওদের কথা শুনছে। মনে এসেছিল তখন ভালই লেগেছিল এর শান্ত সমাহিত সুন্দর রূপটিকে। কিন্তু তার অন্তরালে এতো বীভৎস পাশবিকতা রয়ে গেছে—রয়ে গেছে বাঁচার জন্য এই সংগ্রাম তা জানতোনা।

এই সংঘাতের মূলে জৈবিক সেই ধর্মই প্রবল হয়ে উঠেছে। বাইসনের বন্য জীবনের এই রীতিটার সঙ্গে আজকের মানুষেরও নিবিড় সাদৃশ্য রয়ে গেছে। যৌবন আর বার্দ্ধক্যের এই সংগ্রাম চিরন্তন। বাইসনের দলের নেতা হঠাৎ কোন যোয়ান বাইসনকে তার প্রাধান্য কেড়ে নিতে দেখলেই ক্ষেপে ওঠে। সে সেই নওযোয়ানকে সহ্য করতে পারেনা। একদিন সুরু হয় দলের প্রাধান্য নিয়ে লড়াই দুটি কাল গুটি বুগ আদিম অরণ্যপর্বতে মুখোমুখি দাঁড়ায়, ওদের জমাট মাংসপেশী ফুলেওঠে লাল চোখদিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বের হয়, মাথানীচু করে সামনের দুটো পা ঠুকছে পাথরে টিকারার যেন ঘা পড়েছে। দুজন ছুটে আসে দুজনের দিকে। বড় মদ্দাটার ওজন মণ পঞ্চাশেক হবেই, দুই শিংএর বিস্তার ফুট তিনেক দেহের পরিসরও প্রায় ততখানি, আর শিংএর গোড়ার দিকে বড় জিন বাইশ হয়তো চব্বিশ ইঞ্চি কিন্তু সেই শিংএ বয়সের ছাপ—কমজোরী হয়ে গেছে ওই তরুণ ক্ষিপ্রতর বাইসনের তুলনায়। তবু লড়তে হবে তাকে। এ তার বাঁচার লড়াই। হেরেগেলে এ লড়াই চলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন। রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত হয়ে তার সব প্রাধান্য হারিয়ে বার্দ্ধক্যের অভিশাপ নিয়ে পরাজিত হয়ে সে সঙ্গে পড়ে পড়ে প্রাণটুকু নিয়ে কোন নিকৃত অরণ্যের গহণে। দলেও স্থান নেই সমাজ থেকে বিতাড়িত, প্রিয়া নেই সঙ্গী নেই, নেই কোনও সহচর একাকী নিঃসঙ্গ সেই বলিষ্ঠ জীবটা করুণ উন্মাদ হয়ে ওঠে।

তরুণ বয়সের কোন বাইসন এই লড়াইএ হেরে গেলে—সে সরে যায়, নিভৃতে শক্তি সঞ্চয় করে আবার এসে হানা দেয় বৃদ্ধ দলপতিকে হটিয়ে নিজেই সম্রাট হয়ে বসে, কিন্তু বৃদ্ধ কোন বাইসন একবার হেরে দলত্যাগী হলে তার আর স্বরাজ্যে ফিরে যাবার কোন আশাই থাকেনা, সে হয়ে ওঠে মরীয়া হিংস্র আর সর্বনাশা। সুযোগ পেলেই সে দলকে আক্রমণ করে। মানুষের সর্বনাশ করবে, যদি দলে ঠাঁই পায় এরই জন্য। কিন্তু সে তখন নিঃসঙ্গ তাই 'বীভৎস' এখানেও সেই ঘটনাই ঘটেছে। দল বিতাড়িত কোন হিংস্র বৃদ্ধ বাইসন স্বরাজ্যে ফিরে যাবার উন্মাদনায় দলকে তার তরুণ প্রতিদ্বন্দ্বীকে লুকিয়ে আঘাত হানবার চেষ্টা করছে, না পেরে মানুষের সর্বনাশ করে চলেছে। বনের আতঙ্ক হয়ে উঠেছে সে।

সুধীর বসু ওদের কথাগুলো শুনছে। তার মতবাদ অন্য ধরণের। দলের মোতুন তরুণ বুলটাকে মারতে পারলেই সব গোলমাল থেমে যাবে, এই ক্যাপা বাইসনটা থেমে যাবে, স্বরাজ্য ফিরে পাবে।

—কিন্তু কে মারবে ওদের? মৌসুমী প্রশ্নকরে। নিজের চোখে দেখেছে ওদের শক্তিমত্তার পরিচয়। মানুষ সেখানে তুচ্ছ। ওই ভয়ার্ত আদিবাসীদের মুখে চোখে হতাশার ছায়া। মিঃ বোস বলেন।

—ওর ব্যবস্থা হবে।

—অনেকদিন হয়ে গেল। এতো লোক মারাপড়ল আর কবে হবেক সাব?

শীতের রাত। কনকনে শীত। সামরিক শান্তি নেমেছে। ওরা আবার ঘর দরজা বন্ধ করে রাগ আর কাঙার গ্লেসের গরমের মধ্যে ফিরে যেতে চান। তাই বলেন তোমরা এখন যাও।

লোকগুলো সত্যি ভয় পেয়ে গেছে। ওরা যেন ঝুপড়িতে ফিরতে ভয় পায়। নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করছে একজন বুড়োমত লোক সেই-ই বোধহয় গাঁও বুড়ো, বেই বলে মারাং শিকারীকে বুলাইছি সাব। সে পায়বেক মারি দিতে উটাকে।

মৌসুমী অবাক হয়। সুধীর বোস এর মুখচোখ কঠিন হয়ে ওঠে নিমেষের মধ্যে লোকটা বদলে যায়। মিঃ বোস কুঠিন কণ্ঠে বলে।

—কেন আমরা পারবো না? সে এসে কি করবে?

—বনের যাদু জানে সাব। সেইই একমাত্র লোক যে বনকে চেনে, জানোয়ারদের জানে। উই পারবেক্।

গাঁও বুড়োর কণ্ঠস্বরে একটা দৃঢ়তা ফুটে ওঠে। মিঃ বোসের উপর ওই দুজন শিকারীর উপর তার কোনো বিশ্বাস নেই। মৌসুমী ঠিক বুঝতে পারে না ব্যাপারটা। সুবীর বোস কঠিন স্বরে জানায়:

—জানো রিজার্ভ করেই এটা। এখানে গুলিকরে জানোয়ার মারা নিষেধ। শুধু বিশেষ ক্ষেত্রে।

গাঁওবুড়ো বিড় বিড় করে, ক্ষেপে যাবেক, দুক মারবেক কি হুল্লোড়, ফল ফসল বসতির খেতি করবেক তবু মারা চলবেক নাই?

দয়া করে যেন বলছেন তিনি—দেখি এটার একটা বিহিত হবে। এখন যাও তোমরা।

রাতের আবছা অন্ধকারে জোৎস্নার ম্লান আলো মিলেছে, শুধু বনের ভিতর থেকে হাতীর পালের তীক্ষ্ণ স্বরের চীৎকার শোনা যায়। সেই ডাক ছাপিয়ে ইঞ্জিনের বাঁশি শব্দ ওঠে একবারক আলো শালগাছের উঁচু মাথাগুলোকে টপকে এগিয়ে আসে। হঠাৎ আদিবাসীদের মুখে ফুটে ওঠে খুশী আর বিশ্বাসের আভা।

মৌসুমীও অবাক হয় এতরাতে এই বনে কে আসবে? মিঃ বসুর চোখমুখের চাহনি বদলে যায়। শিকারী দুজনও চমকে উঠেছে, জিপই। তবে হুড এর বালাই নেই; জোরালো সার্চ লাইট জেলে হেলে দুলে কাৎ হয়ে জিপটা তীরবেগে বাংলোর কাঁকর ঢালা পথদিয়ে চাকার শব্দ তুলে এসে দাঁড়াল। আদিবাসীর দল গাঁওবুড়ো অবধি এগিয়ে গিয়ে হাতে হাত ঠেকায় একটি লোকের সঙ্গে। ওদের নমস্কারের এই রীতি। বিড়বিড় করে ওরা বলাবলি করছে সম্ভ্রমভরা স্বরে মৌসুমী ওদের ভাষা ঠিক বুঝতে পারেনা। তবে মাঝে শিকারী কথাটাই বারবার শোনে মাত্র। খোলা জিপ থেকে একজন নেমে এগিয়ে আসে বাংলোর বারান্দার দিকে। অস্পষ্ট আলোয় ঠিক ঠাওর হয় না, তবে দীর্ঘ দেহী লোকটা মোহারা চেহারা দেহে এতটুকু মেদ নেই। ইস্পাতের মতই কঠিন আর ঋজু, পিছনে নারদ গোলমুখওয়ালা একজন আদিবাসী, ওর চোখ দুটো যেন অন্ধকারে জ্বলছে। বাতাসে নাকতুলে সে একটা বন্য পশুর মতই কি শুকছে। আর যেদিকে সেই দলটা চলেগেছে সেইদিকে। আঙুল বাড়িয়ে কি বলছে আকিনপরা বলিষ্ঠ লোকটিকে। দুজনের চোখে সুদূর প্রসারী দৃষ্টি। বনের দিকেচেয়ে কি বলাবলি করছে ওরা। আকিন-পরা ভদ্রলোকের কাঁধে ঝুলছে ভারি রাইফেল।

বলিষ্ঠ পদক্ষেপে বারান্দায় উঠে এসে ভারি গলায় বলে ওঠেন ভদ্রলোক,

—নমস্কার স্যার।

মৌসুমী চমকে ওঠে হঠাৎ ওই কণ্ঠস্বরে। বেয়ারা একটা আলো এনে রেখে বারান্দায় রাখল। আলোর আভা পড়েছে নবাগত ভদ্রলোকের মুখে।

মৌসুমীর মনেহয় পাহাড় ছেয়ে বিচিত্র সেই শব্দটা বেয়ে আসছে। এখনি দুর্বার কালো দৈত্যগুলো পাহাড় ফুড়ে এসে সব তছনছ করে দেবে। অন্ধ জানহীন একটা অনুভূতি তার সারাদেহে হিমশীতল সাড়া আনে।

নিশীথও দেখেছে মৌসুমীকে। ধারালো অতীতের সেই রৌদ্রঝলমল স্মৃতি আর বনের গভীরে এই আদিম আরণ্যক পরিবেশে এমনিভাবে রূপময় হয়ে উঠবে ভাবেনি। অনেক আগেই সহরের সেই দিনগুলো তার সঙ্গী হারিয়ে গেছে তার জীবন থেকে। কিন্তু সেই মেয়েটিকে এখানে ওই প্রৌঢ়প্রায় মিঃ বসুর সঙ্গে দেখবে ভাবতে পারেনি। তার জীবনে আজ নিশীথের কোন স্থান নেই। ওই বয়স্ক লোকটার অর্থ আর প্রতিষ্ঠাই মৌসুমীকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। মৌসুমীর মত মেয়ে সেই লোকটি মেনে নিতে পেরেছে কিনা জানেনা সে।

কেমন নিরাসক্ত কঠিনতা অনুভব করে নিশীথ তার মধ্যে। ঘনঘন করছে আরণ্যক স্তব্ধতা। হু হু হাওয়া বয়। আকাশের হিম যেন চাঁদের আলোয় গলেগলে পড়ছে। মিঃ বসুই পরিচয় করিয়ে দেয়। আমার ঐ মিসেস বোস। ইনি নিশীথবাবু, বড়বিলের বাসিন্দা ওখানকার কনট্রাক্টার।

মৌসুমীও দেখেছে নিশীথের চোখে প্রথমে বিস্ময় তারপর প্রশ্ন! আজ তার জবাব দেবার কিছুই নেই। নিজের মনের সব যন্ত্রণা আর ব্যর্থতা এতদিনে জমে জমে পাথর হয়েছিল সেই জমাট পাথর যেন গলে পড়বে। কোনরকমে সরে এল সে ভিতরে। মৌসুমীর সারা শরীর কাঁপছে শীত আর ব্যাকুল একটি যন্ত্রণায়। র‍্যাগটা গায়ে জড়িয়ে কায়ায় প্রেসের সামনের ডেকচেয়ারে বসল।

কতক্ষণ বসেছিল জানেনা। হঠাৎ বাইরে ওদের চড়াস্বরে কথাগুলো শুনে উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। মিঃ বসু কণ্ঠস্বর নিশীথের ডবাটি বলিষ্ঠ গলার অনেক নীচে চাপা পড়েগেছে। মৌসুমীর বিশ্রী লাগে, ও যেন জোরকরে সকলের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চায়। মৌসুমী ওদের কথাগুলো শুনছে।

নিশীথ জানায় ওই রোগটাকে মারতেই হবে। অনেক ক্ষতি করেছে। আরও করবে সে। ও এখন দল ছুট শয়তান। মিঃ বসু বলে ওঠেন দলের নেতুন বুলটাকেই মারবার কথা ভাবছি আমি। তাহলে ও দলের প্রাধান্য ফিরে পাবে। সব উৎপাত থেমে যাবে।

নিশীথ চমকে ওঠে। ও জানে বুড়ো বাইসনের শক্তি ফুরিয়ে এসেছে। ও এখন বাছিদের দলে সেখানে ঠাঁই নেবে বলিষ্ঠ তরুণ তরঙ্গোদ্যান একটা বুলবাইসন যে বংশবৃদ্ধি করবে, দল রক্ষা করবে। বাঁচাবে দলের সকলকে তার বুদ্ধি আর সাহসদিয়ে। বুড়োর সেখানে কোন অস্তিত্বই থাকবেনা। করাপাতার মত সে একা একা ঘুরে একদিন মরে যাবে হারিয়ে যাবে বনের গভীরে। বেদনাদায়ক তবু প্রাকৃতিক নিয়মে এইটাই সত্য আর স্বাভাবিক।

নিশীথ জবাব দেয় তা হয়না। বনের অলিখিত নিয়ম কিছু আছে। এখানেও যৌবনেরই জয় বার্দ্ধক্যের ঠাঁই নেই। তাই ওল্ড রোগ মুস্ত তাই।

মিঃ বসু চমকে ওঠে। ওদেখেছে কোথায় চকিতের মধ্যে মৌসুমীর চোখে কি একটা সাড়া, তরুণ নিশীথকে সে দেখেছে। কোথায় যেন একটা কি ঘটে গেছে। তারপরই নিশীথের এই কথাশুনে চমকে উঠছে মিঃ বোস। ও যেন তাকেই কঠিন আর নিষ্ঠুর একটা ইঙ্গিত করেছে। তার মনের গভীর এই ইঙ্গিতটা অন্তর্ধ নিয়ে ফুটে উঠেছে। মিঃ বোস স্পষ্ট সঙ্কেত ভাবেই বাবাদের নো ভাট ব্রাভি বুল মুস্ত ভাই। গাওবুড়া অন্যান্য আদিবাসীরা ভয়ে জড়সড় হয়ে বাংলোর ধারকাছে এসে হাজির হয়েছে, দু একটা জায়গায় আগুন জেলে শীতের রাতে তারা বসে আছে। আহত লোকটার কাতরানির আওয়াজ ওঠে আহত জন্তুর মত থেকে থেকে গোঙাচ্ছে লোকটা।

গাওবুড়ো বলে ওঠে বাঘ শিকারী ঠিক বলেছে সাহেব। বুড়াটা দুষমন—বোঝানটাকে থাকতে দে। মেয়ে কেন বুড়াটাকে উ কুন কাজে লাগবেক? শিং খুইছে যৌবন সেইছে তুরপারা বুড়া।

মিঃ বোস গর্জে ওঠে সাটআপ।

ওর বিকট বিকৃত চীৎকারে মৌসুমী এসে দাঁড়িয়েছে। ও শুনেছে ওদের কথাগুলো। লালাভ আলো পড়েছে ওর মুখে বিকৃত দেখাচ্ছে সুধীরকে। ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে বলিষ্ঠ তরুণ নিশীথ। মনেহয় যেন বনের কোন শালগাছের মতই শক্ত আর বলিষ্ঠ। ও চেনে এই অরণ্যকে-ভালোবাসে। তাই এইভাবেই ও চিন্তা করে।

সুধীর ঘোষও দেখেছে মৌসুমীকে। এবার হনুমন্ত দেয়—

—টউমাই কিল ভাট নিউ বুল বাইসন। ওইটাকে ঘোল বলবো আমি। না পারো যাবেনা অন্ত কাউকে ভাটস্ অর্ডার।

নিশীথ কথার জবাব দিল না ওর মুখের রেখাগুলো কঠিন হয়ে ওঠে মাত্র।

রাত হয়েগেছে। হনুমন্তই শেষকালে মিঃ ঘোষ ঘরে ঢুকতেদিয়ে দাঁড়াল। কি ভেবে নিশীথের দিকে সাধারণ ভদ্রতা দেখাবার জন্যই বলে,—রাতের হিমে বাইরে না থেকে ভিতরে ওই ঘরে আসতে পারেন।

মৌসুমী ওর দিকে চাইল। ওর চোখে নীরব ব্যাকুলতা। ও জানে এই হিংস্র আদিম বনভূমিকে। তাই ও চেয়েছিল নিশীথ আসবে ভিতরে।

কিন্তু নিশীথ জানায় ধন্যবাদ। বাইরে শীতে থাকা অভ্যাস আছে। ও এগিয়ে গেল মাঠের মধ্যে আদিবাসীদের এই আগুনের দিকে। ওরাও নিজেদের ভাষায় কি বলে ওকে আগুন করে দিল। নিশীথ ওদের মধ্যে গিয়ে বসল সহজ ভাবেই, হাত পা সেঁকেছে আগুনে ওই খোলা আকাশের হিমজমা ঠাণ্ডায়। তার অনুচর সেই গোলমুখো লোকটা এদিকে ওদিকে কি শুঁকে শুঁকে ফিরছে রাতের অন্ধকারে অতন্দ্র প্রহরীর মত।

নিশীথের মনেহয় দুজনে ওরা কোথায় হারিয়ে যাবে বাতাস এখানে অনেক হালকা আলোগুলো নীল থরথর। হাসছে মৌসুমী। ওর হাসির সুরটা তার সারা শরীরের রক্ত কণিকায় সারা আনে অনুভূতির সব কণাগুলো রঙীন আলোর মৃদু জ্যোতিতে বর্ণময়, হঠাৎ সেই আলো ঢেকে যায় মেঘে মেঘে। অন্ধকার নামে। কে ডাকছে তাকে ফিসফিসিয়ে—

কিন্তু মৌসুমীকে আর দেখা যায়না। তার জায়গায় বিরাট একটা বাইসন—লাল চোখমেলে চেয়ে আছে তার দিকে। শিংগুলো খয়েরেছে—আকড়িয়ে বিকট শব্দ করে পায়ে মাটি ঠুকছে ওর মুখটা অবিকল ওই সুধীর বসুর মতই লম্বাটে আর দাগপড়া, বার্দ্ধক্যের দাগ—তবু তার ভেঙ্গ কমেনি। ও এখনও ঘুলাকে চায়।

মৌসুমীর ভীত আর্ত কণ্ঠস্বর আকাশে মিলিয়ে উঠছে ওই আদিম হিংস্র জানোয়ারের গর্জন ধ্বনি।

হঠাৎ মুখে কার কঠিন হাতের ছোঁয়ায় ঘুম ভেঙে যায় নিশীথের। তার অনুচর ওকে ইশারা করছে নীরবে। উঠে বসল নিশীথ পাশেই তারি রাইফেল আর কোমরে কার্তুজের বেল্ট স্বাস্থি নাইফ এর ছোঁয়ায় তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। কাঠের আগুন নিস্তু নিস্তু হয়ে এসেছে। ক্লান্ত ভীত আদিবাসীর দল নিস্তু নিস্তু আগুনের ধারে ঘুমিয়ে পড়েছে। জেগেছিল একা অতন্দ্র প্রহরীর মত তার অনুচরই। হঠাৎ তার নাকে এসেছে গন্ধটা। পাথরে পাথরে মৃদু শব্দের প্রতিধ্বনি তার কান এড়ায়নি। ও টের পেয়ে গেছে।

শেষরাতের জ্যোৎস্নার আলোয় দেখা যায় বিরাট কালো পাথরের মত দেহনিয়ে দুর্বার সেই পরাজিত কিন্তু বুলবাইসনটা চেয়ে আছে তাদের দিকে, সামনে টিলার উপর দাঁড়িয়ে আছে। সারা সারা শিং আর চোখের ভ্রুতে চাঁদের আলো পড়েছে সর্বাঙ্গ মসৃণ নিটোল দেহ থেকে আলোটুকু যেন পিছলে পড়ছে।

একক নিঃসঙ্গ একটি যুগ। সব ব্যর্থ স্বপ্ন নিয়ে পাহাড়ে সে সঙ্গী খুঁজে ফেরে—কিন্তু কেউ নেই। কেউ আর আসবেনা তার কাছে!

হঠাৎ মাটি পাথর কেঁপে ওঠে। কি দুর্বার রাগে ওই মূর্তিমান বনস্পতি পাথর চুরছে আর নাকদিয়ে একটা কর্কশ আওয়াজ বের করে। আদিবাসীর দল জেগে উঠেছে। আর্তনাদ করছে তারা। টাঁড়াবারো! টাঁড়াবারো।

বন্য মহিষের রক্ষাকর্তা দেবতা, ওর নামে নাকি বুনোমোষ খেপে যায়। কিন্তু সে তখন দুর্বার মৃত্যুদূতের মত এগিয়ে আসছে কালো ধোঁয়ার রূপে। আকাশ বাতাস কেঁপে ওঠে ফোর সেভেন কাইভ রাইফেলের গুলির শব্দে, একটা পরে আর একটা। ভারি বিশাল দেহটা ছিটকে পড়েছে। প্রচণ্ড গতিবেগের শেষ ছোঁয়ায় তার দেহটা গড়িয়ে পড়ছে টিলার গা বয়ে।

আনন্দে কলরব করে ওঠে আদিবাসীরা। মশাল জলেওঠে সেদরাতে টিকারায় ঘা পড়ে। শত্রু নিপাত করেছে যারাং শিকারী। বুনবাইসনের বিশাল রক্তাক্ত দেহটা পড়ে আছে।

মিঃ বোস মৌসুমী সেই শিকারী দুজন ও এসে পড়ে। মিঃ বোস গর্জে ওঠেন—নিশীথবাবু!

ইচ্ছে করেই নিশীথ সেই তরুণ বাইসনকে মারেনি। তার সামনে উজ্জ্বল রক্তে ভেজা বসন্তের রূপ। যার দিন ফুরিয়ে এসেছে সেই অভিশাপকেই হত্যা করেছে সে।

নিশীথ বলে—নিজের বর্ণক্ষোভ জ্বালাকে চাপবার জন্য তরুণ যৌবনকে হত্যা করার অধিকার আপনার নেই মিঃ বোস।

চমকে ওঠে মৌসুমী। মিঃ বোসও। ও দেখেছে নিশীথের চোখে কি তীব্র ঘৃণার কাঠিন্য।

মিঃ বোস সোনাবার চেষ্টা করেন—আমি এটার জন্য ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবো।

নিশীথ ওদিকে ঘৃণাভরে চাইল। ওর মুখের সঙ্গে মৃত বাইসনটার মুখের নিবিড় মিলই বোধহয় রয়েছে। ওর কথার জবাব দেবার ও প্রয়োজন বোধ করেনা সে। জিপে গিয়ে উঠল—পিছনে লাফদিয়ে গিয়ে উঠেছে সেই অনুচরটা। জিপটা গর্জন করে বের হয়েগেল। আদিবাসীদের আনন্দ কলরব ওঠে।

বনে পাহাড়ে ভোরের নোতুন আলো ফুটে উঠেছে শালবনের মাথায় সেই আলোর দীপ্তি কি পূর্ণতার তৃপ্তিতে বনভূমি তৃপ্ত শান্ত। নিশীথ চেয়ে থাকে ওই জগতের দিকে।

• • • •

বিশ্ববিখ্যাত লেখক তাঁর আর্থার কোনান ডয়েল হঠাৎ টেলিগ্রাম করে বসলেন বারোজন বিশিষ্ট ভদ্রলোককে। যাঁ তাঁরা সব সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং সভ্যতার জন্যে সুবিদিত।
টেলিগ্রামের ভাষায় ছিল সভীর ইঙ্গিত: এখুনি পালিয়ে যান, সব ফাঁস হয়ে গেছে, সব ধরা পড়লো বলে।
সোমবার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বারোজন ভদ্রলোকই দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

গল্পভারতীর পাতা থেকে

[পরশুরাম ছিল তাঁর ছদ্মনাম। আসল নাম ছিল রাজশেখর বসু। বাংলা সাহিত্যে তিনি ছিলেন প্রথম সারির অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক—বাংলা সাহিত্য তাঁর কাছে অনেকখানি ঋণী। রম্যরচনায় তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এমনএকদিন ছিল যেদিন তাঁর লেখা না পাওয়া পর্যন্ত নামকরা কোন কাগজের পূজা সংখ্যা বের করা হতো না—এমনি ছিল তাঁর লেখার চাহিদা ও জনপ্রিয়তা।

গল্পভারতীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং তাঁর অনেক রচনা গল্পভারতীতে প্রকাশিত হয়েছে। আজকার পাঠকদের কাছে তিনি সম্পূর্ণ নূতন। তাই তাঁর একটি রম্যরচনা গল্পভারতীর পাতাথেকে পাঠকদের সামনে তুলে ধরে আমরা রাজশেখর বাবুর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করলেম।]

কাশীনাথের জন্মান্তর—

পরশুরাম

প্রায় দেড়শ' বৎসর আগেকার কথা। তখন কলকাতায় বাঙালীর হিন্দুসমাজে নানারকম পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু তার কোনও লক্ষণ রাঘবপুর গ্রামে দেখা দেয়নি। কাশীনাথ সার্বভৌম সেই গ্রামের সমাজপতি, বিগ্‌গজ পণ্ডিত, যেমন তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান তেমনি বিষয়বুদ্ধি। তাঁর সন্তানরা কলকাতা হুগলি, বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি নানা স্থানে ছড়িয়ে আছে, কিন্তু তিনি নিজে তাঁর গ্রামেই থাকেন, জমিদারি দেখেন, তেজারতি আর দেবসেবা করেন, একটি চতুষ্পাঠীরও ব্যয়নির্বাহ করেন।

একদিন শেষরাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখলেন, তাঁর ইষ্টদেবী কালীমাতা আবির্ভূত হয়ে বলছেন, বৎস কাশীনাথ, তোমার বয়স শতবর্ষ অতিক্রম করেছে, তুমি সুদীর্ঘকাল ইহলোকের সুখদুঃখ ভোগ করেছ। আর কেন, এখন দেহরক্ষা কর।

কাশীনাথ বলিলেন, মা কৈবল্যদায়িনী, এখন তো মরতে পারব না। আমার জাজ্বল্যমান সংসার, চতুর্থ পক্ষের স্ত্রী এখনও বেঁচে আছেন। আঠারোটি পুত্র-কন্যা, একশ পঁচিশটি পৌত্র-পৌত্রী দৌহিত্র-দৌহিত্রী। প্রপৌত্র-প্রদৌহিত্র প্রভৃতি বোধ হয় হাজার খানেক জন্মেছিল, তাদের অনেকে মরেছে কিন্তু এখনও প্রচুর জীবিত আছে। তাছাড়া বিস্তর শিষ্য আমার চতুষ্পাঠীতে পড়ে, আমি তাদের পালন ও অধ্যাপনা করি। এইসব স্নেহভাজনদের ত্যাগ করা অতীব কষ্টকর। তোমার জন্য একটি বৃহৎ মন্দির নির্মাণের সংকল্প করেছি,

তাও উদ্‌যাপন করতে হবে। আমার ছেলেদের বিয়ে কিছু হবে না, তারা স্বার্থপর, নিজের ধান্দা নিয়েই ব্যস্ত। বয়েস বেশী হলেও আমার শরীর এখনও শক্ত আছে। অতএব কৃপা করে আরও দশটি বৎসর আমাকে বাঁচতে দাও।

কালিমাতা ভ্রূকুটি করে অন্তর্হিত হলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে কাশীনাথ লাহিড়ীর চতুর্থ পক্ষের পত্নী হালেশ্বরী বললেন, আজ যে তোমার পুত্র আর পাঁচটি প্রপৌত্রিপুত্রের অন্নপ্রাশন, তার হুঁশ আছে? তুমি চট করে স্নান-আহ্নিক সেরে এস, তোমাকেই তো হোমযাগ করতে হবে।

গঙ্গায় স্নান করে এসে কাতরকণ্ঠে কাশীনাথ বললেন, সর্বনাশ হয়েছে গিন্নী, কালসর্প আমাকে দংশন করেছে, আমার মৃত্যু আসন্ন। হা করালবদনী, এ কি করলে, হায় হায়, সংকল্পিত কর্ম সমাপ্ত না হতেই আমাকে পরলোকে পাঠাচ্ছ।

শাস্ত্রে বলে, যার যেমন ভাবনা তার তেমন সিদ্ধিলাভ হয়। কাশীনাথ যদি খ্রীরামপুরের পাদরীদের কবলে পড়ে খ্রীস্টান হতেন তবে মৃত্যুর পর শেষ বিচারের প্রতীক্ষায় তাঁকে সুদীর্ঘকাল জড়ীভূত হয়ে থাকতে হত, নরীসৃপাদি যেমন শীতকালে থাকে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে তিনি অতি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন, সেইজন্য তাঁর পারলৌকিক পরিণাম অবিলম্বে সংঘটিত হল।

মৃত্যুর পরেই কাশীনাথ উপলব্ধি করলেন, তিনি সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করে শূন্যে অবস্থান করছেন তাঁর প্রাণহীন দেহ অঙ্গনে তুলসীমঞ্চের সম্মুখে পড়ে আছে। তাঁর পত্নী আর আত্মীয়বর্গ চারদিকে বিলাপ করছেন, প্রতিবেশীরা বলছেন ওঃ, একটা উল্কাপাত হল! ক্ষণকাল পরেই তিনি প্রচণ্ড বেগে ব্যোমমার্গে দক্ষিণ দিকে বাহিত হয়ে যমলোকে উপনীত হলেন।

যম বললেন, এস হে কাশীনাথ! তোমার সুকৃতি-দুষ্কৃতির বিচার এবং তদনুরূপ ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি, সংক্ষেপে বলছি শোন। পুণ্যকর্মের তুলনায় তোমার পাপকর্ম অল্প। রামপতি ভট্টাচার্যের জমির কিয়দংশ তুমি অন্যায়ভাবে দখল করেছিলে, তিনবার আদালতে মিথ্যা হলফ করেছিলে, প্রথম ও মধ্য বয়সে বহুপত্নী ও বহুদাসীগমন করেছিলে, অন্তিমকাল পর্যন্ত বিষয় চিন্তায় মগ্ন ছিলে। মুদ্দিকের ন্যায় অনেক সন্তান উৎপাদন করেছিলে এছাড়া আর যা করেছ সবই সৎকার্য। নিয়মিত দুর্গোৎসবাদি করেছ, গঙ্গাস্নান তীর্থভ্রমণ ব্রতাদি এবং ব্রাহ্মণের যাবতীয় কর্তব্য পালন করেছ, তথাপি যথার্থ ভোজন করনি। দুষ্কৃতির জন্য তুমি পঞ্চাশ বৎসর নরক-বাস করবে, তারপর পুণ্যকর্মের ফলস্বরূপ একশত বৎসর স্বর্গবাস করবে। আচ্ছা, এখন যাও কর্মফল ভোগ কর গিয়ে।

নির্দিষ্টকাল নরকভোগ আর স্বর্গভোগের অন্তে কাশীনাথ পুনর্বার যমসকাশে আহূত হলেন। যম বললেন, ওহে কাশীনাথ, তোমার প্রাক্তন কর্মের ফলভোগ সমাপ্ত হয়েছে, এখন তোমাকে পৃথিবীতে ফিরে যেতে হবে। বিধাতা তোমার উপর প্রসন্ন, তুমি অতীত ভুলে জন্মগ্রহণ করতে পারবে। বল, কি প্রকার জন্ম চাও, ধনী বণিকের বংশধর হবে, না ধনিক জ্ঞানী ধর্মাত্মার পুত্ররূপে, না শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে?

কাশীনাথ উত্তর দিলেন, ধর্মরাজ, মৃত্যুকালে আমার অনেক বাসনা ছিল। দয়া করে এই ব্যবস্থা করুন যাতে আমার বর্তমান বংশধরের গৃহেই প্রত্যাবর্তন করতে পারি। আমার প্রপৌত্রের পুত্র শ্রীমান ভবানীচরণ আমার অতিশয় স্নেহভাজন ছিল, তারই সন্তান করে আমাকে ধরায় পাঠান।

যম বললেন, কি বলছ হে কাশীনাথ! জীবিতকালেই তুমি অবশ্য পাঁচ পুত্রের পর্যন্ত দেখেছিলে।

তোমার মৃত্যুর পর যেসব বৎসর কেটে গেছে, তাতে আরও রূপান্তর হয়েছে। এখন যে বংশধর সে তোমার শশিও নয়, তার সঙ্গে তোমার কতটুকু সম্পর্ক? তার পুত্র হয়ে জন্মালে তোমার কি লাভ হবে? আরও তো ভাল ভাল বংশ আছে।

কাশীনাথ বললেন, প্রভু, দয়া করে সেই একাদশ সংখ্যক বংশধরের গৃহেই আমাকে পাঠিয়ে দিন। ব্যবধান যতই থাকুক, সে আমার তথা শ্রীমান ভবানীচরণের সন্তান, অতীব স্নেহের পাত্র। তাকে দেখবার জন্য আমি উৎকণ্ঠ হয়ে আছি।

—তুমি তাকে চিনবে কি করে? তোমার বর্তমান স্মৃতি তো থাকবে না, জ্ঞানহীন ক্ষুদ্র শিশুরূপে প্রসূত হয়ে তুমি ক্রমে ক্রমে বড় হবে, জ্ঞানার্জনও করবে, কিন্তু বিগত কালের সঙ্গে তোমার নবজীবনের যোগ থাকবে না।

—প্রভু, আমার প্রার্থনাটি অবধারণ করুন। নারীগর্ভে ন'মাস দশ দিন বাস করবার পর শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ হতে আমি চাই না। জ্ঞানবান আত্মিয়র করেই আমাকে পাঠিয়ে দিন।

—মরবার সময় তোমার বয়স একশ বৎসরের কিছু অধিক হয়েছিল। সেই বয়স নিয়েই জন্মাতে চাও নাকি?

—আজ্ঞে না। জরাজীর্ণ স্থবির হয়ে যদি পৃথিবীতে যাই তবে নবজন্ম ক'দিন ভোগ করব? আমাকে পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরের যুবা করে পাঠিয়ে দিন।

—তোমার আকাঙ্খা অতি অদ্ভুত। গর্ভবাস করবে না, যুবারূপে নবজন্ম লাভ করবে, পূর্বস্মৃতি বিদ্যমান থাকবে, বর্তমান বংশধরের গৃহে অকস্মাৎ অবতীর্ণ হবে। —এই তো তুমি চাও?

—আজ্ঞে হাঁ।

—আচ্ছা, তাই হবে। দেখাই যাক না এর ফল কি হয়। তোমার গোত্র কি?

—ভরদ্বাজ।

যমরাজ মুহূর্তকাল ধ্যানমগ্ন হয়ে রইলেন, তারপর বললেন, ধরাধামে অনেক সামাজিক পরিবর্তন হয়েছে। তুমি যদি স্বাভাবিক নিয়মে শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ হতে তবে ক্রমে ক্রমে বর্তমান অবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে যেতে। কিন্তু অদৃষ্টপূর্ব সমাজে হঠাৎ অবতরণের ফলে সংকটে পড়বে। তোমার অসুবিধা যাতে অত্যধিক না হয় তার জন্য আমি যথাসম্ভব ব্যবস্থা করছি।

যম তাঁর এক অনুচরকে বললেন, আজ দ্বিপ্রহর রাত্রিতে এই জীবাত্মা ত্রিশ বৎসরের যুবারূপে ধরাধামে ফিরে যাবে। একে পশ্চিমবঙ্গের আধুনিক ভাষা মোটামুটি শিখিয়ে দাও, সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ অপ-ভ্রষ্ট ইংরাজী ও হিন্দীও। বর্তমান কালের উপযুক্ত পরিচ্ছদ, নিতান্ত প্রয়োজনীয় অন্যান্য বস্তু এবং প্রচুর অর্থও একে দেবে। একটি নিক্কাস্ত বটিকাও দেবে। তারপর কলিকাতা নগরীতে গিয়ে শ্রীমধুসূদন রোডে তিন নম্বর বাড়ির ফটকের সামনে একে সুপ্ত অবস্থায় রেখে দেবে। ওহে কাশীনাথ, তোমার বংশধর চক্রধর মুখুয্যের কাছে তোমাকে পাঠাচ্ছি তোমার পূর্ব নামই বজায় থাকবে। যদি দেখ যে বর্তমানে সমাজ ব্যবস্থা তোমার পক্ষে কষ্টকর, কিছুতেই তুমি সইতে পারছনা, তবে নিক্কাস্ত বটিকাটি খেয়ো। তা হলে তৎক্ষণাৎ যমলোকে ফিরে আসবে এবং অবিলম্বে পুনর্বার সনাতন রীতিতে জন্মগ্রহণ করবে।

চক্রধর মুখুয্যে ধনী লোক, বাঙ্গবিধর্মন করপোরেশনের ম্যানেজিংডিরেক্টর, তিন নম্বর শ্রীমধুসূদন রোডে তাঁর প্রকাণ্ড বাড়ি। সকাল আটটার আগে তিনি বিছানা ছেড়ে ওঠেন না, কিন্তু আজ ভোর বেলায় তাঁর স্ত্রী স্বয়োপাঠেলা দিয়ে তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে দিলেন। চক্রধর জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে?

—নীচে গোলমাল হচ্ছে শুনতে পাচ্ছ না? বারান্দায় দাঁড়িয়ে খোঁজ নাও কি হয়েছে। আমার বাপু ভয় করছে।

চক্রধর বারান্দা থেকে দেখলেন গেটের সামনে অনেক লোক জমা হয়ে কলরব করছে। প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছে লালবাহাদুর?

দারোয়ান লালবাহাদুর বলল, কে একজন বাবু ফটকের সামনে রাস্তার উপর শুয়ে আছে, বেঁচে আছে কি মরে গেছে বোঝা যাচ্ছে না।

নেমে এসে চক্রধর দেখলেন, তাঁর বাড়ির ফটকের ঠিক বাইরে একটা চামড়ার ব্যাগ মাথায় দিয়ে আপাদমস্তক বেহুঁশ হয়ে শুয়ে আছে। বার কতক জোরে ঠেলা দিতেই লোকটি মিটমিট করে তাকাল তারপর আস্তে আস্তে উঠে হাই তুলে তুড়ি দিয়ে বলল, তারা ব্রহ্মময়ী করালবদনী, কোথায় আনলে মা?

চক্রধর বললেন, কে হে তুমি? এখন নেশা ছুটেছে? কি খেয়েছিলে বদন। চণ্ডু?

—আমি শ্রীকাশীনাথ মুখোপাধ্যায়, আবার এসে পৌঁছেছি। তুমিই চক্রধর? শ্রীমান ভবানীচরণের বংশধর?

আহা, কতবড়টি হয়েছ! বয়েচল বাবাজী, সবকথা বলছি।

কাশীনাথের আত্মকথা শুনে চক্রধর স্থির করলেন, লোকটা নেশাখোর নয়, মিথ্যেবাদী জুয়োচোর নয়, কিন্তু এর মাথা খারাপ। প্রশ্নকরলেন, তোমার ওই ব্যাগে কি আছে?

—তা তো জানি না, তুমিই খুলে দেখ। এই যে আমার পইতেতে চাবি বাঁধা রয়েছে, খুলে নাও।

চক্রধর ব্যাগ খুললেন। গোটা কতক ধুতি পেন্ট পাঞ্জাবি একটা এণ্ডির চাদর এক জোড়া চটি, একটা গামছা, আরশি চিরুনি ইত্যাদি। নীচে একটা পোর্ট ফোলিও। সেটা খুলে চক্রধর আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, প্রায় পাঁচলাখ টাকার গভর্নমেন্ট কাগজ এবং তাড়াতাড়া নোয়ায়, নগদ দুইহাজার টাকার নোট, আর দশ টাকার আধুলি সিকি ইত্যাদি।

—সব তোমারই নামে রেখেছি।

কি করে পেলে? কিছুই জানিনা বাবাজী সবই জগদম্বার লীলা আর যমরাজের ব্যবস্থা। চক্রধর অনেকক্ষণ ভাবলেন। লোকটি পাগল হলেও গুছিয়ে কথা বলে। একে হাতছাড়া করা চলবে না, বাড়িতেই রাখতে হবে, চিকিৎসাও করাতে হবে। বয়েস তো বেশী নয়, বড় জোর ত্রিশ। তাঁর একমাত্র মেয়ের বিবাহ হয়ে গেছে, কিন্তু তাঁর ভাইঝি চন্দনা তো রয়েছে। এই কাশীনাথের সঙ্গে বিয়ে দিলে সেই বাপ-মা মরা মেয়েটার একটা চমৎকার গতি হয়ে যায়। পাঁচলাখ টাকার ইনভেস্টমেন্ট কি সোজা কথা! লোকটা যদি তিন বৎসর আগে আসত তা হলে চক্রধর নিজের মেয়ের সঙ্গেই বিয়ে দিতেন।

চক্রধর বললেন, শোন হে কাশীনাথ! তুমি আমার পূর্বপুরুষ হলেও আপাতত আমার চাইতে ছোট, তোমার বয়েস বেশি হয় ত্রিশ হবে, আর আমার হল গিয়ে ষাট। তোমার ইতিহাস আমি জানলুম, কিন্তু আর কাকেও বলোনা, লোকে তোমাকে পাগল ভাববে।

তুমি আমার জ্ঞাতি, ছেলেবেলায় তোমাদের পাড়াগাঁ থেকে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে পালিয়েছিলে, এখন সন্ন্যাসে অরুচি হওয়ায় আমার আশ্রয়ে এসেছে এই তোমার পরিচয়। তুমি আমাকে বলবে কাকাবাবু, আমি তোমাকে বলব কাশী বাবাজী। তোমার সম্পত্তির কথা খবরদার কাকেও বলবে না। বুঝলে?

কাশীনাথ বললেন, হাঁ, বুঝেছি। কিন্তু আমি তোমার বাড়ীতে থাকব কি করে? তুমিতো দেখছি

মেঘ হয়ে গেছে। শেয়ালের শব্দ পাচ্ছি, পাশের জমিতে ঘুরপিচরছে। একটি প্রৌঢ়াকে দেখলাম চটিজুতো প'রে চটাং চটাং করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল, ঘোমটা নেই, প্যাট প্যাট করে আমার দিকে চাইল।

—উনি তোমার কাকীমা।

—ও, তা বেশ। কিন্তু স্ত্রীলোক জুতো পরে কেন? ঘোরকলি।

—ঠিক বলেছ বাবাজী, ঘোরকলি। এই কলিযুগের সঙ্গেই তোমাকে বনিয়ে চলতে হবে।

—তুমি বোধ হয় মুসলমান বাবুর্চীর রান্না খাও? তা আমি মরে গেলেও খেতে পারব না।

- না না, বাবুর্চী আছে বটে, কিন্তু মুসলমান নয়, হরিজন, ভাতে চামার।

—রাধামাধব! আমি স্নানাদি করব, আজ শুধু ফলার। আমার থাকবার আলাদা ব্যবস্থা করে দাও।

—বেশ তো, আমার বাড়ীর নীচের তলায় পূর্বদিকের অংশে থাকবে, একবারে আলাদা আর নিরিবিলি।

চক্রধর ডাকলেন, চন্দনা, ও চন্দনা।

একটি মেয়ে ঘরে এল। চক্রধর বললেন এইটি আমার ভাইঝি। প্রণাম কর যে, উনি তোর কাকী হারা দূর সম্পর্ক আমার ভাইপো। চন্দনা প্রণাম করে চলে গেল। কাশীনাথ বললেন, তোমাদের কাণ্ড কিছুই বুঝতে পারছিনা। এতবড় বাড়ী মেয়ের মাথায় সিঁদুর নেই কেন? কপাল পুড়েছে নাকি?

—আরে না না, ওর বিয়েই হয়নি। খুব ভাল মেয়ে, বি. এ. পাশ করেছে।

—দুর্গা দুর্গা। বিবি বামাঙ্গ দেখছি।

—আচ্ছা কাশীনাথ, তোমার বিবাহের মতলব আছে তো?

—আছে বইকি। একজন ভাল ঘটক লাগাও।

—আমার ভাইঝি ওই চন্দনাকে বিয়ে কর না!

—তুমি উন্মাদ হলে নাকি হে চক্রধর? একগোত্রে বিয়ে হবে কি করে? তা ছাড়া ওরকম বেয়াড়া স্ত্রী আমার পোষাবে না। সদ্বংশের নিষ্ঠাবতী মেয়ে চাই। বিদ্যার দরকার নেই, রান্না আর ঘরকন্নার সব কাজ জানবে, বার ব্রত পালন করবে, তোমার গিন্নী আর ভাইঝির মতন বিদ্বী হলে চলবে না?

—ঘুলকিলে ফেললে কাশীনাথ। তুমি যেরকম পাত্রী চাও তেমন মেয়ে ভদ্রঘরে আজকাল লোপ পেয়েছে। আচ্ছা, যতটা সম্ভব তোমার পছন্দসই পাত্রীর জন্যে আমি চেষ্টা করব। এখন তুমি স্নান কর সন্ধ্যা আহ্নিক সেরে আহারাদি কর গিয়ে।

চক্রধর মুখুজ্যে ভাবতে লাগলেন। লোকটা পাগল, কিন্তু কথাবার্তা অসংলগ্ন নয়, সেকেলে মতিগতি হলেও বুদ্ধিমান বলা চলে।

আশ্চর্য ব্যাপার, কাশীনাথ অত টাকা পেল কোথা থেকে? যাই হ'ক, একে আটকে রাখতে হবে, সম্পত্তি যাতে আমার কাছেই সঞ্চিত রাখে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

চন্দনার সঙ্গে বিয়ে হলে খাসা হত, একবারে আমার মুঠোর মধ্যে এসে পড়ত। ওর পছন্দসই পাত্রীই বা পাই কোথায়? সে সেকেলে নিষ্ঠাবতী মেয়ে হবে, পাগল স্বামীকে শাসনাবে, আবার আমার বশে চলবে। হঠাৎ চক্রধরের মাথায় একটি বুদ্ধি এল। আচ্ছা গয়েশ্বরীর সঙ্গে বিয়ে দিলে হয় না? তার তো খুব নিষ্ঠা আর আচার-বিচার, বুদ্ধিও খুব, আমাকেও খাতির করে, সব বিষয়ে আমার মত

নেয়। টাকার লোভে কাশীনাথকে বিয়ে করতে হয়তো রাজী হবে। কিন্তু বয়সের তফাতটা যে বড্ড বেশী। গয়েশ্বরী সম্পর্কে চক্রধরের ভাগনী, জেঠতুতো বোনের মেয়ে। বয়স প্রায় পঞ্চাশ হলেও এখনও তিনি সুস্বাস্থ্যবতী। বাপ-মা অল্প বয়সে মারা গেলে চক্রধরই অভিভাবক হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে ভাগনীর তত্ত্বাবধান বেশী দিন করতে হয়নি। গয়েশ্বরী অসাধারণ মহিলা, অল্প লেখাপড়া আর নানা রকম শিল্প কর্ম শিখেই তিনি স্বাবলম্বিনী হলেন। তাঁর নারী বস্ত্রশালা খুব লাভের ব্যবসা পাঁচজন উদ্‌বাস্তু মেয়ে আর দুই জন বয়স্কা গয়েশ্বরীর দোকানে কাজ করে, তিনটে সেলাইএর কল চলে, অর্ডারের খুব ভিড়। চক্রধর অনেকবার ভাগনীর বিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু গয়েশ্বরী বলেছেন, ওসব হবে না, আমি কত কষ্ট করে ব্যবসাটি খাড়া করেছি, আর এমন একটা উটকো লোক এসে কর্তামি করবে তা আমি সইবনা। চক্রধর স্থির করলেন, খুব সাবধানে কথাটা পাড়তে হবে।

দৈবক্রমে চার দিন পরেই কাশীনাথ গয়েশ্বরী একটা সংঘর্ষ হয়ে গেল।

চক্রধরের বাড়ির তলার পূর্বদিকের অংশে কাশীনাথ স্বতন্ত্রভাবে বাস করতে লাগলেন। তিনি স্বপাকে খান, চক্রধরের একজন পুরনো চাকর তাঁর ফরমাস খাটে। একদিন সকাল বেলা প্রাতঃকৃত্য সেরে কাশীনাথ গড়িয়াহাট মার্কেটে বাজার করতে গেছেন। জামাইষষ্ঠীর জন্য সেইদিন বাজারে খুব ভিড়। কাশীনাথ অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ভাবছিলেন, এ যে ঘোর কলি, বারো আনা সের বেগুন! সব অগ্নিমূল্য, দেশে মন্বন্তর হয়েছে নাকি? কাশীনাথ দুইটি কাঁচকলা কিনবেন বলে ভিড়ের মধ্যে সাবধানে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এমন সময় অকস্মাৎ ধপাস করে গয়েশ্বরীর সঙ্গে তাঁর কলিশন হল।

কাশীনাথের অপরাধ নেই। তিনি রোগা বেঁটে মানুষ, ভিড়ের ঠেলা সামলাতে না পেরে সামনের দিকে পড়ে যাচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময় গয়েশ্বরী উল্টো দিক থেকে আসছিলেন। তিনি স্থূলকায়া, সুতরাং তাঁর দেহেই পতনোন্মুখ কাশীনাথের ধাক্কা প্রতিহত হল। গয়েশ্বরী পড়ে গেলেন না, অত্যন্ত রেগে গিয়ে বললেন, আরে ছোড়া, নেশা করেছিস নাকি? ভদ্রলোকের মেয়ের গায়ে ঢলে পড়িস্ এত দূর আস্পর্ধা!

কাশীনাথ বললেন, ক্ষমা করবেন ঠাকরুণ ভিড়ের চাপে এমন হল, আমি ইচ্ছা করে অপরাধ করিনি।

গয়েশ্বরী বললেন একশ বার অপরাধ করেছিস্, হতভাগা বেহায়া বজ্জাত! এক দল গয়েশ্বরীর পক্ষ নিয়ে আর একদল কাশীনাথের হয়ে তুমুল ঝগড়া আরম্ভ করল। গয়েশ্বরীকে অনেকেই চেনে। একজন টিকিধারী পুরুতঠাকুর বললেন, গয়াদিদি, ব্যাপারটি তো সোজা নয়, তোমাকে প্রায়শ্চিত্তির করতে হবে।

চার-পাঁচজন চিৎকার করে বলতে লাগল, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। তুমি লোকটা কে হে, পাড়াগাঁ থেকে এসেছ বুঝি? ধাক্কা লাগাবার আর মানুষ পেলে না, গয়া ঠাকরুণের গায়ে ঢলে পড়লে কোন আক্কেলে? এক্ষুনি বার কর পঞ্চাশটি টাকা, প্রায়শ্চিত্তিরের খরচ, নইলে তোমার নিস্তার নেই।

এই সময় চক্রধরের একজন চাকর এসে পড়ায় কাশীনাথ বেঁচে গেলেন। পুরুত ঠাকুরটি বললেন, তা বেশতো, গয়াদিদি আর এই ছেকরা আর আপনি দুজনেই যখন চক্রধর বাবুর আপনার লোক তখন তিনিই এর মীমাংসা করবেন।

চক্রধর মুখুজ্যে বোঝেন যে ভগ্ন অবস্থায় না দিলেই লোহার সঙ্গে লোহা জুড়ে যায়। তিনি কালবিলম্ব না করে প্রথমে তাঁর ভাগনীকে প্রস্তাবটি জানালেন। গয়েশ্বরী আশ্চর্য হয়ে বললেন, মামা তোমার মাথা খারাপ হয়েছে নাকি?

চক্রধর সবিস্তারে জানালেন, লোকটা বাতিকগ্রস্ত হলেও ভাল মানুষ, সহজেই পোষ মানবে,

আর তার টাকাও বিস্তর আছে। বয়স কম তাতে হয়েছে কি? আজকাল ওসব কেউ ধরে না গয়েশ্বরী অতি বুদ্ধিমতী মহিলা, মামার প্রস্তাবটি সহজেই তাঁর হৃদয়ংগম হল। পরিশেষে বললেন, তা ও ছোঁড়া যদি রাজী হয় তো আমার আর আপত্তি কি, লোকে কি বলবে তা আমি গ্রাহ্য করি না।

কাশীনাথ অত সহজে বাগমানলেন না। বললেন, কি পাগলের মতন বলছ চক্রধর কাকা! গয়েশ্বরীর বয়েস তো আমার প্রায় তবল। সে কালে কুলীন কন্যার অমন বিয়ে হত বটে, কিন্তু আমি তো পেশাদার পাণিগ্রাহী নই।

চক্রধর বললেন, বেশ করে সবদিকে ভেবে দেখ কাশীবাবাজী। মেয়েটি অতি নিষ্ঠাবতী, সব রকম ব্রত পালন করে। বয়জীর দোকান চালায় বটে, কিন্তু ওর চালচলন তোমারই মতন সেকেলে। দোকানটা তোমারই হাতে আসবে, তোমার আয় বেড়ে যাবে।

—কিন্তু বয়েসের যে আকাশ পাতাল তফাত।

—খুব ঠিক কথা। তোমার ইতিহাস যা বলেছ তাতে তোমার আসল বয়স এখন ছয় পঞ্চাশের বেশী আর গয়েশ্বরীর সবে উনপঞ্চাশ। তোমার তুলনায় তো খুকী। আরও বুঝে দেখ, তোমার শরীরটাই জোয়ান, কিন্তু মনটা তো দু সেঞ্চুরি পিছিয়ে আছে, গয়েশ্বরীর সঙ্গে তোমার মনের মিল সহজেই হবে। আরও একটা কথা।—আধুনিক পণ্ডিতরা বলেন, মেয়েদের পূর্ণ যৌবন হয় পঞ্চাশের পর। মর্ডার্ন কলা খেয়েছ তো? পাকলেই সু-তার হয় না। যার খোসাটি কালসিটে হয়ে কুঁচকে গেছে, শাঁসটি মজে গিয়ে একটু নরম হয়েছে, সেই পরিপক্ক কলাই উৎকৃষ্ট। মেয়েরাও সেই রকম। এখনকার পঞ্চাশীর কাছে তোমাদের সেকেলে ষোড়শী-টোড়শী লাগে না।

চক্রধরের যুক্তি শুনে কাশীনাথ ধীরে ধীরে বশে এলেন। একটু চিন্তা করে বললেন, আমি যখন মারা গিয়েছিলাম তখন আমার চতুর্থ পক্ষের স্ত্রী রাসেশ্বরীর বয়স ছিল তোমার ভাগনী গয়েশ্বরীর মতন। এখন মনে হচ্ছে রাসেশ্বরীই গয়েশ্বরী হয়ে ফিরে এসেছে। আচ্ছা, তুমি ঘটক লাগাতে পার।

—আমিই তো ঘটক। গয়েশ্বরীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। সে রাজী আছে। এখন পাকা দেখাটা হয়ে গেলেই বিয়ে হতে পারবে। আজ বিকেল বেলা তুমি তার বাড়িতে গিয়ে তার সঙ্গে আলাপ করো!

—তোমারও উপস্থিত থাকা চাই চক্রধর কাকা।

—না না, তা হবার নয়, শুধু তোমার সংগে আলাপ করবে।

কাশীনাথকে দেখেই গয়েশ্বরী একটু হেসে বললেন, কি হে ছোকরা, আমাকে মনে ধরবে তো?

কাশীনাথ নীরবে উপরে নীচে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

—তোমার নাকি পাঁচ লাখ টাকা আছে? শোন কত্তা, বিয়েটা চুকে গেলেই সব টাকা আমার হাতে দেবে। তুমি যে রকম ন্যালাখ্যাপা মানুষ, তোমার হাতে টাকা থাকলে খেচি আর কি? লোকে সব ঠকিয়ে নেবে, আমার মামাবাবুকেও বিশ্বাস করিনা।

কাশীনাথ বললেন ভয় নেই গয়েশ্বরী ঠাকরুণ, আমাকে ঠকাতে পারে এমন মানুষ ভূভারতে নেই। যা মতলব করেছি বলি শোন। মেয়েছেলের দোকানদারি ভাল নয়, বিয়ের পর তোমার দোকানটা বেচে দেব। তার টাকা আর আমার যা আছে নিয়ে তেশারতি করব। তোমাকে এক গা গহনা গড়িয়ে দেব।

এই কলকাতা হচ্ছে দানবের নগর, ভয়ঙ্কর জায়গা, আমরা রাঘবপুর গ্রামে গিয়ে বাস করব। বাড়ি বাগান পুকুর গোয়াল সব হবে, একটি দেব মন্দির আর চতুষ্পাঠীও হবে।

সরেশ্বরী হাত নেড়ে ঝংকার তুলে বললেন, আ মরি মরি, কি মতলবই ঠাউরেছ ঠাকুর মশাই। পাগল কি আর গাছে ফলে, তুমি একটি আস্ত উন্মাদ পাগল। শোন হে ছোকরা, স্ত্রী হলেও আমি তোমার চাইতে বয়সে বড়, গুরুজন কুলি। আমার হেপাজতে তুমি থাকবে, আমার বশেই তোমাকে চলতে হবে।

কাশীনাথ কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইলেন, তারপর 'তারা ব্রহ্মময়ী রক্ষা কর মা' বলেই চলে গেলেন।

সন্ধ্যাহ্নিকের পর কাশীনাথ ইষ্ট দেবীকে নিজের অবস্থা নিবেদন করলেন।—একি বিপদে ফেললে মা? তোমারই বা দোষ কি, নিজের কুবুদ্ধিরই ফল ভোগ করছি। পৃথিবীতে কলি যে এত প্রবল হয়েছে তা তো ভাবতে পারি নি। ব্রাহ্মণের বাড়ি বাবুর্চী রাঁধছে, মুন্সী চরছে, বুড়ী মাগীরা জুতো পরে খটখটিয়ে চলছে, ধাড়ী মেয়েরা ইস্কুলে যাচ্ছে। ছোট লোকের আস্পর্দ্ধা বেড়ে গেছে, ব্রাহ্মণকে গ্রাহ্য করে না, সামনেই বিড়ি খায়। এখানে জাত ধর্ম কিছুই রক্ষা পাবে না। ওই সরেশ্বরী একটা ভয়ংকরী মাগীর মাগী, ওকে বিয়ে করলে আমার নরক ভোগের আর বাকী থাকবেনা। চক্রধর একটা পাষণ্ড কুলাঙ্গার, আমার বংশধর হতেই পারে না, যমরাজ নিশ্চয়ই ভুল করে ওর কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন। কালী কৈবল্যদায়িনী, উপায় বাতলাও মা।

সেই রাত্রে কাশীনাথ স্বপ্ন দেখলেন, তাঁর ইষ্টদেবী আবির্ভূত হয়ে হাত নেড়ে বলছেন, সরে পড় কাশীনাথ।

তখনই কাশীনাথের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি বুঝলেন, এই পাপ সংসারে ফিরে আসা তাঁর মস্ত বোকামি হয়েছে। মনস্থির করে কাশীনাথ তখনই যথাসর্বস্ব সেই নিষ্ক্রান্তি বটিকাটি গিলে ফেললেন এবং অচিরে পরলোকে প্রয়াণ করলেন।

সকাল বেলা কাশীনাথকে পরীক্ষা করে ডাক্তার বললেন খুদোসিস। এত কম বয়সে বড় একটা দেখা যায় না! তবে পাগলদের এ রকম হয়ে থাকে।

চক্রধর মুখুজ্যে তখনই কাশীনাথের পইতে থেকে চাবি খুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি ব্যাগটা দখল করতে গেলেন, কিন্তু খুঁজে পেলেন না। নিশ্চয়ই সরেশ্বরী ভোগা দিয়ে সেটা সরিয়েছে এই ভেবে তিনি ভাগনীর বাড়ি ছুটলেন। দুজনের তুমুল ঝগড়া হল, কিন্তু ব্যাগ পাওয়া গেল না। কাশীনাথের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর যথাসর্বস্ব সম্পত্তি যম-সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

• • • •

—"দুঃখেই মানুষকে বৃহৎ করে, মানুষকে আপন বৃহত্ত্ব সম্বন্ধে জাগ্রত সচেতন করিয়া তোলে এবং এই বৃহত্বেই মানুষকে আনন্দের অধিকারী করিয়া তোলে। অল্পে আমাদের আনন্দ নাই। যাহাতে আমাদের খর্বতা, আমাদের ক্ষুদ্রতা, তাহা অনেক সময় আমাদের আরামের হইতে পারে কিন্তু তাহা আমাদের আনন্দের নহে। যাহা আমরা বীর্যের দ্বারা না পাই—আঘাত দ্বারা না পাই, যাহা অনায়াসের তাহা আমরা সম্পূর্ণ পাই না—যাহাকে দুঃখের মধ্যে দিয়া কঠিন ভাবে লাভ করি, তবে তাহাকেই নিবিড়ভাবে সমগ্রভাবে প্রাপ্ত হয়।"

—রবীন্দ্রনাথ।

ক্রীড়ালোক

জ্যোতির্ময়

ষষ্ঠ এশীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

একটি সমীক্ষা

ব্যাংককে সম্প্রসমাপ্ত এশিয়ান গেমস-এর ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখা যায় স্বর্ণপদক জয়ে জাপান রীতিমতো বিস্ময়কর কীর্তি স্থাপন করেছে। ৭৮টি স্বর্ণপদক পেয়েছে জাপান। তারপরের স্থান অধিকার করেছে দক্ষিণ কোরিয়া—মাত্র ১৮টি স্বর্ণপদক। প্রথমের সঙ্গে দ্বিতীয়ের কত ফারাক। দক্ষিণ কোরিয়া ফুটবলে বর্মার সঙ্গে স্বর্ণপদকের সমান অংশীদার হয়ে অবশ্য তার গুনাম রক্ষিত করেছে।

থাইল্যাণ্ড এবং ইরাণ প্রত্যেকে পেয়েছে ৯টি স্বর্ণ পদক। ভারত ও ইস্রাইল পেয়েছে ৬টি করে। মালয়েশিয়া ৫টি এবং বর্মা ৩টি।

এই প্রতিযোগিতায় একটি মাত্র বিশ্বরেকর্ড ভঙ্গ হয়েছে। ইরাণের ভারোত্তোলন-বীর মহম্মদ নর্গসরি ব্যানটাম ওয়েট-এ ১২৫'৫ কে জি তার তুলে বিশ্ব রেকর্ড করেছেন।

জাপানের আধিপত্য হলেও কিন্তু সমালোচকরা মনে করেন না যে পরবর্তী ১৯৭২ সালে মিউনিক-এ অলিম্পিকের যে আসর বসবে তাতে সেই দেশ (জাপান) আমেরিকা বা রাশিয়ার সঙ্গে বিশ্বরেকর্ডের ক্ষেত্রে পাল্লা দিতে পারবে।

জাপানের সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে সাঁতারে। ১০০ মিটার বুক সাঁতারে জাপানের সাঁতারু নবুরু টাওচি ১ মিঃ ৬৮ সেঃ-এ দূরত্ব অতিক্রম করে ১'০৭'৭ মিঃ রেকর্ড (আমেরিকার ম্যাকেনজির রেকর্ড) ভঙ্গ করেছেন। এই সাঁতারের বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী হলেন রাশিয়ার নিকোলাই ক্যানসিন—১ মিঃ ৪।৭ সেঃ।

জাপানী মেয়ে সাতাক ১৭ বছর বয়স্কা মিস যোশমিমি নিশগাওয়া এশিয়ান গেমসএ ৫টি স্বর্ণ পদক লাভ করে এক অনন্য কীর্তি স্থাপন করেছেন।

ভারতকে ফাইনালে হারিয়ে জাপান ১৯৭২ সালের মিউনিক অলিম্পিকে এশিয়ার প্রতিনিধিরূপে ওয়াটার পোলোয় খেলবার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

এই প্রতিযোগিতার একটি বড় আবিষ্কার হল—সাউথ কোরিয়া স্কুলের ছাত্র ১৮ বছর বয়স্ক চো-ইউন। দূর পাল্লার সাঁতারে ইনি যে ভাবে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জাপানী সাঁতারুদের হারিয়ে দিয়েছেন তাতে সমালোচকরা মনে করেন ১৯৭২ সালের অলিম্পিকে ইনি আরো খ্যাতির অধিকারী হবেন।

টাইওয়ানের মেয়ে-দৌড়বীরাঙ্গনা মিস চি চেং-এর দৌড় দেখে মনে হয়েছে ইনি সত্যিই বিশ্ব-প্রতিযোগিতার সমকক্ষ। দুর্ভাগ্যবশতঃ ৪০০ মিটার দৌড়ে পায়ে আঘাত জনিত বেদনায় ভেঙে পড়েন এবং দৌড় থেকে অবসৃত হতে বাধ্য হন।

এই প্রতিযোগিতার আর একটি বড় খবর হল, মিস চেং-এর আসন্ন বিবাহ। তিনি তাঁর শিক্ষা

ধাতা আমেরিকার অধিবাসী ডিক বীল-এর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হতে চলেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর বাবা-মা আপত্তি করেছেন কিন্তু মিস চেং-এর বন্ধুক-ভাঙা পণ—এ বিবাহ হবেই।

যদিও এখনো এশীয় প্রতিযোগিরা বিশ্ব বা অলিম্পিক ক্রীড়া মানের কাছে পৌঁছেতে পারেন নি, তাহলেও তাঁদের মান দিন দিন উন্নত হচ্ছে। এই প্রতিযোগিতায় অ্যাথলেটিকস্-এ ২৪টি এবং সাঁতারে ২৩টি নতুন রেকর্ড তার প্রমান।

এই প্রতিযোগিতার কর্তৃপক্ষ মিস চিচেংকে এবছরের এশীয় অ্যাথলিট রূপে নির্বাচিত করেছেন। পুরুষ বিভাগে শ্রেষ্ঠত্বের আসন পেয়েছেন সিংহলের দুসিয়ান রোজা এবং মেয়ে-বিভাগে ইস্রাইলের গৃহবধূ হানা সেজিকি।

নয়পদ সিংহলী দৌড়বীর দুসিয়ান রোজা পুরুষদের ৫০০০ ও ১০০০০ মিটার দৌড়ে রেকর্ড সময়ে প্রথম স্থান অধিকার করে ২টি স্বর্ণপদক পেয়েছেন। হানা সেজিকি মহিলা বিভাগে ৪০০ ও ১৫০০ মিটার দৌড়ে প্রথম হয়ে ২টি স্বর্ণপদক অর্জন করেছেন।

হকি ও ব্যাডমিনটন প্রতিযোগিতায় উঁচু মানের (বিশ্বমান পর্যায়ের) মান দেখা গেছে। হকির ফাইনালে রোমাঞ্চকর ও অদৃষ্টপূর্ব নৈপুণ্যাত্মক কয়েকটি মুহূর্ত দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত দুর্ভাগ্যবশত ভারত পাকিস্তানের কাছে একটি মাত্র গোলের ব্যবধানে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

ব্যাডমিনটনে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যাণ্ড এবং জাপান বিশ্ব ব্যাডমিনটন-এর সমান মানের ক্রীড়াচাতুর্য প্রদর্শন করেছিল। শেষপর্যন্ত পুরুষ বিভাগে ইন্দোনেশিয়া এবং মহিলা বিভাগে জাপান জয়ী হয়েছে।

এবার ভারত এই খেলায় আগের তুলনায় অনেক ভাল ফল প্রদর্শন করেছে। স্বর্ণপদক পেয়েছে ৬টি, তার মধ্যে অ্যাথলেটিকস-এ ৪টি, মুষ্টিযুদ্ধে ১টি এবং কুস্তিতে ১টি। যাঁরা স্বর্ণপদক পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন, যোগীন্দর সিং (শটপুট), পরভিন কুমার (ডিসকাস), মহিন্দর সিং (ট্রিপল জাম্প), শ্রীমতী কমলজিৎ (৪০০ মিটার), চাঁদমী রাম (কুস্তি হেভিওয়েট) এবং হাওরা সিং (মুষ্টিযুদ্ধ হেভিওয়েট)।

ভারত রৌপ্যপদক পেয়েছে ৯টি। এডওয়ার্ড সিকুইরা (৫০০০ মিটার), প্রীতম সিং (৮০০ মিটার), এম সেটি (ডেকাথলন), লাভ সিং (ট্রিপল জাম্প), ভারতীয় দল (বীলে), জিৎ সিং (কুস্তি) মুহম্মদী (মুষ্টিযুদ্ধ ফেদারওয়েট) ভারতীয় দল (হকি) এবং ঐ (ওয়াটার পোলো)।

ব্রোঞ্জপদকের খতিয়ান হল ১০টি। ভীম সিং (হাই জাম্প), লাভ সিং (লং জাম্প), সুচা সিং ৪০০ মিটার (ট্রিপল চেজ), ভারতীয় দল (বীলে), ওমপ্রকাশ, মুক্তিয়ার সিং ও নেরপাল সিং (কুস্তি), সোলি কনট্রাক্টর ও আব্দিদার হোসেন (হায়ারিং) এবং ভারতীয় দল (ফুটবল)।

প্রথম ছয়টি দলের মধ্যে চূড়ান্ত তালিকা হল এই :—

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
জাপান	১৪	৪৭	২০
দঃ কোরিয়া	১৮	১৩	২৩
থাইল্যাণ্ড	৯	১৭	১৩
ইরাণ	৯	৭	৭
ভারত	৬	৯	১০
ইস্রাইল	৬	৩	৪

এবছর প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দুটি দেশের মধ্যে পদকলাভের বিরাট পার্থক্য লক্ষ্য করবার বিষয়। জাপান যেখানে ১৪৩টি পদক পেয়েছে, সেখানে দক্ষিণ কোরিয়া লাভ করেছে মাত্র ৫৫টি।

এই খেলার বিশেষজ্ঞদের বিচারে (ভোটের মাধ্যমে) যে সব প্রতিযোগী বিশেষ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন, তাঁরা হলেন :—

মিস্ টি চেং (শ্রেষ্ঠ এশিয়ান প্রতিযোগী)। সুলিয়ান রোজা (পুরুষ বিভাগে শ্রেষ্ঠ)। হানা সেজিকি (মহিলা বিভাগ)।

এখানে উল্লেখযোগ্য, হকির ফাইনালে ভাল খেলেও ভারত পাকিস্তানের কাছে ১টি মাত্র গোলে পরাজিত হয়ে শ্রেষ্ঠত্বের আসন থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল : জাপানের ১৭ বছরের স্কুল-ছাত্রী মিস্ ইয়োশনি নিশিগায়া সাঁতারে ৫টি স্বর্ণপদক জয় করে এশিয়ান গেমস-এ অভূতপূর্ব ব্যক্তিগত সাফল্যের নজীর রেখেছেন। এর আগে কোন একজনের পক্ষে একই বছরের এশিয়ান গেমস-এ ৫টি স্বর্ণপদক জয় করা সম্ভব হয় নি। মিস নিশিগায়া ১০০, ২০০ এবং ৩০০ মিটার ফ্রীস্টাইল সাঁতারে নতুন এশিয়ান রেকর্ড স্থাপন করেছেন।

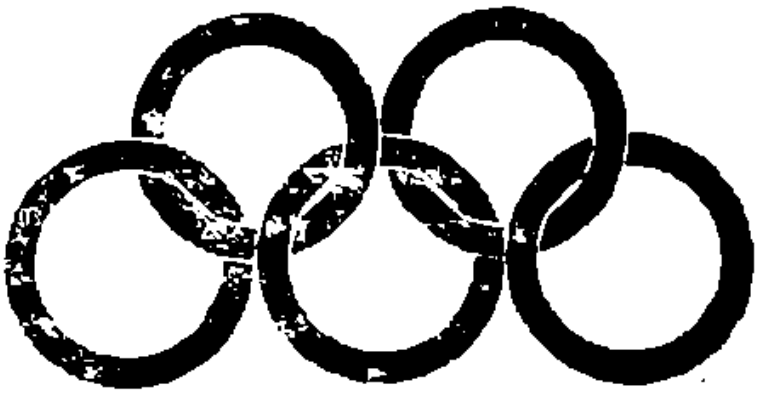

সুজন রায়

"আমি সারা পৃথিবী জয় করেছি"—এমন কথা ঘোষণা করবার মত মানুষ পৃথিবীর ইতিহাসে মাত্র একজনই জন্মেছেন, তিনি উইলিয়ম শেক্সপীয়র। চারশো বছর আগে ইংলণ্ডে তাঁর জন্ম। কিন্তু তিনি আজ আর কোন একটি বিশেষ দেশের বা বিশেষ কালের মানুষ নন, তিনি সকল দেশের, সকল কালের। এমন কোন দেশ নেই যেখানে তাঁর নাটক পড়া হয়না, এমন কোন মঞ্চ নেই যেখানে তাঁর নাটক অভিনীত হয়না। তিনি তাঁর নাটকের মধ্য দিয়ে সর্বকালের সকল মানুষের চিরকালের কাহিনী বলেছেন, সকল দেশের মানুষ তাঁর নাটকের জীবন-দর্শনের মধ্যে নিজেদের জীবনের প্রতিফলন দেখে বিস্মিত উদ্বোধিত হয়েছে। "Every age, and every man in his seven ages, will find a reflection in Shakespeare's universal mirror. The passion and the poetry echo in the corridors of the mind and will go on echoing to the last syllable of recorded time."

সর্বকালের এই সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার বিশেষ করে বিয়োগান্ত নাটকেই তাঁর ঐশ্বরিক প্রতিভার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। সেই নাটকগুলির প্রত্যেকটির কাহিনীই চিরকালের কাহিনী। তাই শেক্সপীয়রের ক্ষেত্রে আমরা তাঁর কোন একটি মাত্র কাহিনীতেই আবদ্ধ থাকব না, আমরা তাঁর বিয়োগান্ত নাটকগুলি, যথা কিং লীয়ার, ম্যাকবেথ, ওথেলো, হ্যামলেট, জুলিয়াস সীজার, অ্যান্টনি ক্লিয়োপেট্রা, রোমিও জুলিয়েট এবং তৃতীয় রিচার্ড-এর কাহিনী পরিবেশন করব। এই নাটকগুলির কাহিনী এবং পাত্র পাত্রীদের চরিত্র রূপায়ণের মাধ্যমে উদ্ঘাটিত হয়েছে, মানবমনের অতলস্পর্শী রহস্য, নিয়তি এবং ষড়রিপুর তাড়নায় মানুষের বিপর্যয় এবং সেই সঙ্গে মহত্তর জীবনের প্রতি মানুষের চিরকালের আকুল অভীপ্সা।

কিং লীয়ার : শেকসপীয়র

ব্রিটেনের রাজা লীয়ার সারাজীবন সুখে রাজত্ব করে বৃদ্ধ হয়েছেন। দেশ শাসনের দায়িত্ব তিনি আর বহন করতে চান না। সব কামেলা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নিরিবিলি বসে আরাম করাই তাঁর কামনা।

তাঁর পুত্র নেই, আছে তিনটি কন্যা—গনেরিল, রিগান আর কর্ডেলিয়া। বড় কন্যা দুইটির বিবাহ বড় ঘরের যোগ্য পাত্রেই দিয়েছেন। বড় জামাই ডিউক অফ আলবানি, মেজ ডিউক অফ কর্নওয়াল। ছোট মেয়েটির বিবাহ এখনও হয়নি, তবে তাঁকে বিবাহ করার আশায় ফ্রান্সের রাজা ও বার্গাণ্ডির ডিউক দুজনেই ঘনঘন এদেশে আসছেন। নাটকের শুরুতে তাঁরা দুজনেই লীয়ারের অতিথিরূপে উপস্থিত রয়েছেন।

লীয়ারের ইচ্ছা—সমস্ত রাজ্য তিন কন্যাকে ভাগ করে দিয়ে নিজে পালা করে তাদের গৃহে গিয়ে বাস করবেন।

এই পরিকল্পনা স্থির করে একদিন তিনি ডেকে পাঠালেন তাঁর তিন কন্যা, দুই জামাতা এবং ছোট মেয়েকে বিবাহ করবার জন্যে যাঁরা এসেছেন, সেই ফ্রান্সের রাজা ও বার্গাণ্ডির ডিউককে। নিজের পরামর্শদাতা ও দেশের বড় লোকদেরও ডাকলেন তিনি।

দেশের মানচিত্র খুলে বসলেন লীয়ার। প্রথমে কাছে ডাকলেন গনেরিলকে, বললেন—"মা, তুমি আমার বড় মেয়ে, তোমার উপরই আমার আশা ভরসা বেশী। তোমার নিজের মুখে আমি শুনতে চাই—তুমি আমায় কতখানি ভালবাস। তোমার উত্তর শোনবার পরে স্থির করব যে রাজ্যের কোন্ কোন্ অংশ তোমায় দেওয়া উচিত।"

এগিয়ে এলেন গনেরিল। মেয়েটির বিষয়বুদ্ধি খুব বাহাদুরি। লীয়ারকে খুশী করে কিভাবে রাজ্যের ভালো ভালো জায়গাগুলি নিজের ভাগে টেনে আনা যাবে তা তাঁর বিলক্ষণ জানা আছে। তিনি বলতে লাগলেন—"আমার ভালবাসা? পিতা, পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নেই, যার সঙ্গে আপনার প্রতি আমার ভালবাসার তুলনা হতে পারে, আপনাকে ছাড়া আর কাউকে আমি জানিনা, চাই না, ভালবাসি না। আপনি আমার জীবনের আনন্দ, চোখের তারা! লবণহীন খাদ্য যেমন বিস্বাদ,' আপনাকে কাছে না পেলে জীবনও আমার কাছে তেমনি বিস্বাদ হয়ে যাবে।"

চমৎকার! এই রকমই তো শোনবার প্রত্যাশা করেছিলেন লীয়ার! গনেরিল সত্যিই তাঁকে ভালবাসে! অতএব রাজ্যের সবচেয়ে ভাল অংশটি তারই পাওয়া উচিত। মানচিত্রের উপর হাত দিয়ে তিনি মন্ত্রী, সেনাপতি, আর্ল, ডিউক যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, সবাইকে দেখিয়ে দিলেন যে রাজ্যের কোন কোন্ অঞ্চল গনেরিলকে দিয়ে দিতে চান!

তারপর ডাক পড়ল রিগানের। চাতুরীতে তিনিও তাঁর বড় বোনের চেয়ে কম যান না। তিনি আরও চড়া পর্দায় তোষামোদ শুরু করলেন। বললেন—"পিতা! আমার ভালবাসার কথা আর নিজ মুখে কি বলব? দিদি যা বলেছেন—সে আর এমন কি ভালবাসা? তারও উপরকার ভালবাসা যদি কিছু থাকে—অবশ্যই তা আছে,—তবে আপনার প্রতি আমার ভালবাসা সেইরকম। আপনাকে ছাড়া কোন আনন্দ আমার নেই, কোন আনন্দের কথা কল্পনাই করতে পারি না।"

লীয়ার যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। এমন সব কন্যা যার সে নিশ্চয়ই ভাগ্যবান। তিনি মানচিত্রে আর একটা অংশ রিগানের জন্য চিহ্নিত করে দিলেন।

তারপর তিনি ডাকলেন কর্ডেলিয়াকে। তাঁর ছোট মেয়ে। তিনটি মা-হারা মেয়ের মধ্যে তিনি ছোটটিকেই সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন। তাঁর মুখ থেকে যে আরও মধুর ভালবাসার কথা

শুনতে পাওয়া যাবে, এতে তাঁর কোন সন্দেহই ছিল না। তিনি তাঁকে সাদরে কাছে ডেকে বললেন—"এইবার শুনি কর্ডেলিয়া, তুমি কী বলতে চাও!"

কিন্তু কর্ডেলিয়া, তাঁর বরাত মন্দ—রাজ্যের লোভে লজ্জা ভয় ভদ্রতা বিবেক সবকিছু বিসর্জন দিতে পারেননি। স্বভাবতঃই তিনি তোষামোদকে ঘৃণা করেন। তার উপর আজ এই বিশেষ ক্ষেত্রে—স্নেহময় পিতাকে ঠকাবার জন্য তোষামোদের কথা বলা—তাঁর কাছে এর চেয়ে ঘৃণার জিনিস আর কিছু হতে পারেনা। অবশ্য পিতাকে তিনি সত্যই ভালবাসেন। কিন্তু তাই বলে কি জেনে শুনে কতকগুলো মিথ্যা কথা বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলতে হবে? একাজ করলে তিনি কি নিজের কাছে ছোট হয়ে যাবেন না?

লীয়ার হাসিমুখে প্রশ্ন করলেন—"তোমার কি বলবার আছে কন্যা।" অনেক কিছু গালভরা মিষ্টি কথা শোনবার প্রত্যাশা তাঁর, তা তাঁর গলার স্বর শুনেই বোঝা যায়।

কর্ডেলিয়ার মুখ দিয়ে কথা বেরুতে চায়না, শেষে অনেক কষ্টে মাথা হেঁট করে বললেন—"কিছুনা"!

—"কিছুনা!"

লীয়ারের মনে হল তিনি ভুল শুনেছেন। তিনি নিজে তিন মেয়ের ভিতর কর্ডেলিয়াকে ভালবাসেন বেশী। বিশ্বাসও করেন যে, তিন মেয়ের ভিতর কর্ডেলিয়াই তাঁকে বেশী ভালবাসে। কিন্তু একী হল? সেই কর্ডেলিয়াই সভাসদের সামনে বলছেন—"কিছুনা!" কিছু বলবার নেই? পিতাকে ভালবাসে কিনা, এ প্রশ্নের জবাবে কিছুই সে বলতে চায় না?

তবে কি কর্ডেলিয়াকে ভুল বুঝেছিলেন এতদিন! তিনি পুনরায় বললেন—"ভেবে বল কর্ডেলিয়া। 'কিছু না' বললে পাওনার বেলায়ও "কিছু না" হয়ে যেতে পারে।

কর্ডেলিয়া কি লোভের বশে তোষামোদ করবেন? না, ভয় পেয়ে যা তা বলবেন? তিনি ধীর স্থির বিনীতভাবে বলতে লাগলেন—"বাবা! আপনি জন্মদাতা। পরম স্নেহে আমায় এতদিন লালন পালন করেছেন আপনি, সকল বিষয়ে সুশিক্ষা দিয়েছেন। সেজন্য যতটা কৃতজ্ঞতা আমার থাকা উচিত, তা ষোল আনাই আমার আছে। যতটুকু ভক্তি আপনার উপর থাকা উচিত, তার চেয়ে এক তিলও কম আমার নেই। এর চেয়ে বেশী আর কি বলব? দিদিরা অনেক কথা বলেছেন, সে সব কথা বলা আমি সংগত মনে করিনা। তাঁরা বলেছেন—আপনাকে ছাড়া আর কাউকে তাঁরা ভালবাসেন না। তাই যদি হয়, তবে তাঁরা বিবাহ করলেন কেন? স্বামীকে দেবার জন্য এতটুকু ভালবাসাও কি তাঁদের অন্তরে অবশিষ্ট নেই? তাই যদি না থাকে তাঁরা স্বামীর সঙ্গে একসাথে বাস করেন কেমন করে?"

লীয়ার রেগে উঠলেন। যুক্তি শোনবার জন্য তিনি বসেননি, বসেছেন তোষামোদ শুনতে, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "এই তা হলে তোমার শেষ কথা? যেটুকু ভালবাসা কর্তব্য, ওটুকুই তুমি ভালবাস তোমার পিতাকে? তার চেয়ে একটুও বেশী নয়? কর্তব্যের তাগিদ ছাড়া হৃদয়ের দরদ নেই?"

কর্ডেলিয়ার আর বলবার কিছু নেই।

লীয়ার মানচিত্রের দিকে তাকালেন। রাজ্যের তিন ভাগের এক ভাগ কর্ডেলিয়াকে দেবার জন্যে আলাদা করে রেখেছিলেন, তার ভিতর দিয়ে দীর্ঘ রেখা টানলেন একটা। ভূমিকের দুটি ভাগ বড় দুই মেয়ের মধ্যে বেঁটে দিলেন। দেশের অর্ধেক হল গনেরিলের, অর্ধেক হল রিগানের।

যেগে চেঁচিয়ে তিনি সবাইকে শুনিয়ে বললেন—"কর্ডেলিয়াকে আমি ত্যাগ করেছি। ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক রইলনা আর। এক ইঞ্চি জমিও ওকে আমি দেবনা, বিবাহের সময় এক কানাকড়ি যৌতুকও দেব না ওকে।"

পুরোনো সভাসদদের ভিতর কেন্ট-এর আর্ল এর প্রতিবাদ না করে পারলেন না। অতি বিচক্ষণ লোক এই কেন্ট। রাজাকে তিনি ভালবাসেন, ভক্তিও করেন। কিন্তু দরকার হলে রাজার কাছে প্রতিবাদ জানাতেও তিনি ভয় পান না।

কেন্ট স্পষ্ট বললেন—"মহারাজ! আপনি ভাল করে বিবেচনা করুন। যেভাবে রাজ্য ভাগ করে দিতে চাইছেন, তা অনুচিত। নিজে যতদিন বেঁচে থাকবেন, ক্ষমতা নিজের হাতে রাখা উচিত। আর যদি রাজ্য মেয়েদের দান করতেই হয়, এভাবে ছোট রাজকুমারীকে বঞ্চিত করার কোন যুক্তি নেই। আপনার প্রতি তাঁর ভক্তি নেই বলে যে আপনার ধারণা, তা একেবারেই ভুল। কর্ডেলিয়া অতি সুশীলা, মনের ভাব চাক পিটিয়ে প্রচার করতে তিনি লজ্জা পাচ্ছেন। তা নইলে তিনি যে মনে প্রাণে আপনাকে ভক্তি করেন, অতি গভীরভাবে ভালবাসেন, এ আমরা সকলেই বুঝি।"

লীয়ার ভীষণ বিরক্ত হলেন কেন্ট এর উপর। রাজার কথার উপর কথা? তিনি আদেশ করলেন —"তুমি চুপ কর আর্ল। আমি যা ব্যবস্থা করেছি, তা আর নড়চড় হবে না। কর্ডেলিয়াকে আমি ত্যাগ করেছি।"

"আপনি অন্যায় করেছেন"—জোর গলায় বলে উঠলেন কেন্ট—"এখনও এ অন্যায় আদেশ বাতিল করুন।"

"তুমি যদি চুপ না কর আমি তোমায় নির্বাসিত করব।"

"নির্বাসনের ভয়ে সত্য ও সংগত কথা বলতে ভীত হব না। কিসে আপনার সত্যকার ভাল হবে, আপনি তা চোখে দেখতে পাচ্ছেন না। সোনা ফেলে কাচের আদর করছেন। আপনার চোখে আঙুল দিয়ে আপনার ভুল যদি না দেখিয়ে দিই, তবে বৃথাই এতদিন আপনার নিমক খেয়েছি।"

লীয়ার আর সহ্য করতে পারলেন না। দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে হুকুম দিলেন—কেন্টকে এখুনি দেশ ছেড়ে নির্বাসনে যেতে হবে।

মাত্র একটি লোকেরই সত্যিকার দরদ ছিল রাজার উপরে। তিনিও নির্বাসনে চলে গেলেন।

তখন রাজা কাছে ডাকলেন বার্গাণ্ডির ডিউক ও ফ্রান্সের রাজাকে—"আপনারা দুজনেই ঐ কর্ডেলিয়াকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন। দেখছেন তো, আমি ওকে ত্যাগ করেছি, ওর বিবাহে কিছুমাত্র যৌতুক দিতে আমি রাজী নই। এ অবস্থায় আপনাদের ভিতর কেউ কি ওকে বিবাহ করতে রাজী আছেন এখন?"

বার্গাণ্ডির ডিউক বললেন—"আপনার মৃত্যুর পরে রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ ছোট রাজকন্যা পাবেন এই আশাতেই আমি ওঁকে বিবাহ করতে চেয়েছিলাম। তা যদি না দেন—তবে আমার পক্ষে এ বিবাহ করা সম্ভব নয়।"

"কিন্তু আমার পক্ষে সম্ভব"—ফ্রান্সের মহানুভব রাজা এগিয়ে এসে বললেন—"আমার পক্ষে তা খুবই সম্ভব। আমার নিজের রাজ্য আছে, ছোট ইংলণ্ডের এক তৃতীয়াংশ না পেলেও আমার চলবে। আমি চাই একটি সুশীলা পত্নী। কর্ডেলিয়ার অন্তর যে কত মহৎ, তা আমি দেখতে পাচ্ছি, বুঝতে পারছি, তাঁর মত

সুশীলাকে পত্নীরূপে পাওয়া ভাগ্যের কথা। সে ভাগ্যকে মুঠোর ভিতর পেয়ে আমি ছেড়ে দেব না। চল কর্ডেলিয়া—আমি তোমায় ফ্রান্সে নিয়ে যাই। সেই খানেই হবে আমাদের বিবাহ।"

লীয়ার বিরক্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সভা ত্যাগ করে চলে গেলেন, সঙ্গে গেলেন সভাসদ পারিষদ সবাই। শুধু মাত্র তিন ভগ্নী রইলেন সেখানে—গনেরিল, রিগান, কর্ডেলিয়া। আর রইলেন ফ্রান্সের রাজা।

"তোমার ভগ্নীদের কাছে বিদায় নাও কর্ডেলিয়া"—রাজা বললেন তাঁর ভাবী পত্নীকে।

কর্ডেলিয়া চোখের জল ফেলে বোনেদের কাছে অনুনয় করলেন—"পিতাকে কাঁকি যা দেবার, তা দিয়েছ। এখন শুধু এইটুকু প্রার্থনা করি—তাঁর কোন অযত্ন তোমরা কোর না।"

রেগে তাঁরা বললেন—"তোমায় আর উপদেশ দিতে হবে না, পিতার সম্বন্ধে আমাদের কর্তব্য আমরা জানি। তুমি যাও, তোমার ভাবী স্বামীর প্রতি তোমার কর্তব্য ঠিকমত করো গিয়ে।"

গনেরিল আর রিগান তাঁদের নিজের রাজ্যের ভিতর চলে গেলেন।

লীয়ার বন্দোবস্ত করেছেন—পালা করে একমাস গনেরিলের বাড়ীতে থাকবেন, একমাস রিগানের বাড়ী, নিজের বলতে তিনি শুধু রেখেছেন 'রাজা' উপাধি আর একশো নাইট। সেকালের ইউরোপীয় বীরদের সাধারণ নাম ছিল 'নাইট।' রাজ্য শাসনের ব্যাপারে তাঁরাই ছিলেন রাজাদের প্রধান সহায়। এখন লীয়ারের রাজ্য নেই, কাজেই তাঁরাও রাজার মতই বেকার।

ঠিক হয়েছে—রাজার সঙ্গে সঙ্গে এই একশো নাইটও একমাস গনেরিলের বাড়ীতে, একমাস রিগানের বাড়ীতে বাস করবেন।

প্রথম মাস গনেরিলের বাড়ীতে থাকবার ব্যবস্থা। দু'চারদিন সেখানে রাজার বেশ ভাল ভাবেই কাটল। তারপরই গনেরিল ক্রমশঃ নিজমূর্তি ধারণ করতে লাগলেন! কোন দিনই তাঁর এমন মতলব ছিল না যে বুড়ো রাজাকে চিরকাল ঠাকুর দেবতার মত মাথায় করে রাখবেন, বা তাঁর সঙ্গের ঐ একশোটা নাইটের রাক্ষুসে খরচা বছরে ছ মাস ধরে বসে বসে করবেন। তিনি নিজের ভৃত্যদের টিপে দিলেন—ঐ নাইটগুলোকে যাতে তারা বিশেষ খাতির না দেখায়। তারা বিদায় হলেই যে এই বাড়ীর লোকেরা বাঁচে এটা যেন তাদের হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দেওয়া হয়।

ইঙ্গিত পেয়ে ভৃত্যরা মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। লীয়ারের একটি প্রিয় বিদূষক ছিল। সে যেমন রসিক তেমনি জ্ঞানী। এই বিদূষকটিকে তারা অপমান করল।

রাজা এতে দারুণ ক্রুদ্ধ হলেন। অপরাধী ভৃত্যটিকে প্রহার করলেন নিজের হাতে। আগুন জ্বলে উঠল। গনেরিল তাঁর সর্দার ভৃত্য অস্বল্ডকে হুকুম দিলেন—বুড়ো রাজার খাতির রেখে আর তোমাদের চলবার দরকার নেই।

সেদিন রাজার সমুখে এল এক প্রৌঢ় ব্যক্তি,—সে একটা চাকরী চায়। নাম তার কেইয়াস। সে আর কেউ নয়—ছদ্মবেশী কেন্টের আর্ল। প্রভুকে তিনি এতই ভালবাসেন যে তাঁকে ছেড়ে বিদেশে বাস করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। কন্যাদের আশ্রয়ে রাজার দিন যে সুখে কাটবে না, এ তিনি আগে থাকতেই অনুমান করেছিলেন। বুড়ো বয়সে বুদ্ধিশুদ্ধি হারিয়ে রাজা তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছেন বটে, কিন্তু এখন রাজাকে যদি দুঃখে পড়তে হয়, তবে তাঁর সেবা করবার জন্য কেন্টকে যে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াতেই হবে। তাই নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে তিনি গরীবের বেশে লীয়ারের কাছেই ফিরে এসেছেন।

কেইয়াসের সঙ্গে লীয়ার কথা কইছেন, এমন সময় অসওয়াল্ড এসে নানারকম অসভ্যতা করতে লাগল। রাজার প্রতি লায়ক্ত কুত্তোর এই অশিষ্ট আচরণ কেন্ট সহ্য করতে পারলেন না। পদাঘাত করে তাঁকে দূর করে দিলেন।

এতে প্রীত হয়ে রাজা বললেন—"তুমি থাক কেইয়াস, আমার কাছেই থাক. আমার কাজ কর।"

এদিকে অসওয়াল্ড গিয়ে অভিযোগ করল গনেরিলের কাছে—রাজার এক নাইট আমাকে লাথি মেরেছে। গনেরিল এতক্ষণ অসুখের ভান করে রাজার সম্মুখে উপস্থিত হননি। এইবার অজুহাত পেয়ে তিনি একটা মুখোমুখি বোঝাপড়া করবার জন্য লীয়ারের কাছে এসে হাজির দিলেন।

"এসব কী অত্যাচার বাবা?" তিনি অভিযোগ করলেন—"তোমার দুর্দান্ত নাইটগুলোর জন্য আমার একতিল শান্তি নেই। তারা হৈ হল্লা করছে, মদ খাচ্ছে, নানারকম অসভ্যতা করছে, আমার রাজপ্রাসাদ যেন একটা সস্তাদামের হোটেল হয়ে দাঁড়িয়েছে! এত অত্যাচার আমি সইতে পারব না।"

লীয়ার আকাশ থেকে পড়লেন—"আমার নাইটরা হৈ-হল্লা করছে? তারা তো সব সুসভ্য, বড় বড় বংশের সন্তান। তোমার এ অভিযোগ একেবারেই যাকে।" তিনি উড়িয়ে দিতে চাইলেন গনেরিলের সব কথা।

কিন্তু গনেরিল মনস্থির করেই এসেছেন। তিনি স্পষ্ট বললেন—"আমার প্রাসাদে একশো নাইটের স্থান হবে না বাবা! তুমি পঞ্চাশজন রেখে বাকীদের বিদায় করে দাও।"

এরকম কথা শোনার অভ্যাস নেই লীয়ারের। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চীৎকার করে উঠলেন—"অকৃতজ্ঞ! রাজ্য ভাগ করে দেওয়ার সময় কী বন্দোবস্ত হয়েছিল? একশো নাইট আমার সঙ্গে থাকবে এই কথা কি প্রথম থেকেই ছিল না? তোরা দুই বোন কি প্রথমেই এত রাজী হোসনি? তোকে আর রিগানকে আমার রাজ্য ঐশ্বর্য ক্ষমতা সব কিছুই দান করে দিয়েছি, আমার বলতে রেখেছি কেবল ঐ একশোটি নাইট। তারাও তোর চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়াল? গোটা রাজ্যটার বিনিময়ে তাদের সামান্য ব্যয়ও দুই বহন করতে ইচ্ছুক নোস্?"

রাজা যতই তিরস্কার করুন, গনেরিলের ঐ এক কথা, পঞ্চাশজন নাইটকে এখুনি বিদায় দিতে হবে। তাদের জায়গা গনেরিলের প্রাসাদে হবে না।

ক্রুদ্ধ লীয়ার তাঁকে অভিশাপ দিতে দিতে বেরিয়ে গেলেন তাঁর প্রাসাদ থেকে। তিনি আর তাঁর বাড়ীতে থাকবেন না। আরও এক কন্যা আছে তাঁর! সে কখনও এমন বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, সে কখনও পিতার অসম্মান করতে পারবে না। তিনি রিগানের বাড়ীতেই যাবেন—এই দণ্ডেই যাবেন। কেইয়াসকেও কেন্টকে তিনি রিগানের কাছে পাঠালেন পত্র দিয়ে। পত্রে লিখলেন—আমি তোমার কাছে যাচ্ছি, এখনই যাত্রা করছি।

কেন্ট রওনা হয়ে গেলেন।

এদিকে গনেরিলও তাড়াতাড়ি রিগানকে এক চিঠি দিলেন। এখানে পিতার সঙ্গে যে কলহ হয়েছে তা সবিস্তারে লিখে তিনি রিগানকে বললেন যেন তিনিও বুড়ো বাপের আবদার না শোনেন। দু' জায়গায় একই ভাবে না খেলে তবেই তিনি নিজের জেদ ছাড়তে বাধ্য হবেন।

কেন্ট উপস্থিত হলেন রিগানের প্রাসাদে। ঠিক সেই সময় অসওয়াল্ডও হাজির হল গনেরিলের চিঠি নিয়ে। দুটি পত্রই পড়লেন রিগান। পত্র পড়েই তিনি স্বামী কর্নোয়ালকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে

পড়লেন। সঙ্গে তাঁর সমস্ত চাকর বাকররাও চলল। রাজা যদি আসেন, এসে দেখবেন যে প্রাসাদের দরজা বন্ধ।

কেন্ট তাই দেখে রিগানকে বললেন—"আমার পত্রের উত্তর দিয়ে গেলেন না তো?"

রিগান বললেন—"আমরা গ্লস্টারের আর্লের বাড়ি যাচ্ছি। সেখানে গিয়ে উত্তর দেব।"

অগত্যা কেন্ট গেলেন তাঁদের সঙ্গে। অসওয়াল্ডও গেল।

গ্লস্টার নিজে বৃদ্ধ হয়েছেন। লীয়ারের প্রতি তিনি বিশেষ ভক্তিমান। সেইদিনই তাঁর বাড়িতে এক বিষম কাণ্ড ঘটে গিয়েছে। পালিত পুত্র এডমণ্ডের মিথ্যা অভিযোগে নিজপুত্র এডগারকে তিনি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। এডগার কিন্তু সত্যিই কোন দোষ করেনি। সে যখন শুনল যে তার পিতা তাকে কঠিন শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যে খুঁজছেন তখন সে বনের মধ্যে পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করল।

সেই ডামাডোলের মধ্যে আর্ল রিগান ও তাঁর স্বামীর আদর আপ্যায়নে মন দিলেন। সেই সময় বাইরে কেন্টএর সঙ্গে অসোয়াল্ডের লড়াই বেধে গেল। কর্নওয়াল কেন্টকে কাঠের গিপার দিয়ে আবদ্ধ করে রাখবার আদেশ দিলেন।

এদিকে লীয়ার এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর আগমনের সংবাদ পেয়ে রিগান আর কর্নোয়াল বাড়ির মধ্যে ঢুকে বসে রইলেন। লীয়ারকে জানানো হল, তাঁর কন্যা জামাতা বড়ই অসুস্থ, এখন তাঁরা রাজার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না।

লীয়ার স্তম্ভিত। এই কি রিগানের ভক্তি আর শ্রদ্ধা? তিনি যে বড় আশা করে ছুটে এসেছিলেন। তারপর তাঁর দূত কেন্টএর অবস্থা দেখে তিনি ক্রোধে আগুন হলেন। বারবার তিনি চিৎকার করে মেয়েকে ডাকতে লাগলেন। তখন অগত্যা রিগান আর কর্নোয়ালকে বেরিয়ে আসতে হল। কেন্টকেও মুক্ত করে দেওয়া হল।

কিন্তু রিগানের মুখে একী কথা শুনলেন লীয়ার। রিগান স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন যে তিনি লীয়ারকে আশ্রয় দিতে পারবেন না।

চিঠি লিখে ভগ্নীকে উস্কে দিয়েও গনেরিল স্থির থাকতে পারেন নি। তিনিও রিগানের বাড়ি হাজির হলেন। ভগ্নীকে বললেন, একশো জন নাইট সমেত রাজাকে স্থান দেবার ক্ষমতা তাঁর নেই। রিগান যদি পারে তো সেই ব্যবস্থা করুক।

রিগান বললেন—তিনি একশোজন বা পঞ্চাশ জন নাইট রাখতে পারবেন না। তাঁর কাছে থাকতে হলে রাজাকে মাত্র পাঁচশজন নাইট নিয়ে থাকতে হবে।

রাজা তখন পাগলের মতো বললেন—"তবে চল, গনেরিল, তোর কাছেই ফিরে যাই। তুই তো পঞ্চাশ জন নাইটকে ঠাঁই দিবি বলেছিলি।"

কিন্তু এবার গনেরিল সুযোগ বুঝে রাজার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। বললেন, রাজার এখন এত নাইটের দরকার কি? নাইটগুলোকে বিদায় করে দিয়ে রাজা যদি একলা থাকতে চান তো তিনি তার ব্যবস্থা করতে পারেন।

তখন আকাশ কালো করে ঝড় আসছে। লীয়ার দুই কন্যার মুখের দিকে বারবার তাকিয়ে দেখলেন। এরা কি তাঁর দুই কন্যা? না, নরকের কীট? মানুষ কখনো এমন অকৃতজ্ঞ হতে পারে? এমন পিশাচের মতো নিষ্ঠুর হোতে পারে? এরা তাঁর সন্তান, না এর মানুষের বেশে দানবী? ক্ষিপ্তের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন লীয়ার—"আমি তোমাদের কারুর কাছেই আশ্রয় চাই না। তোমাদের বাড়িতে বাস করার চেয়ে এই ঝড়ের রাতে খোলা মাঠে পড়ে থাকাও শ্রেয়। তোমরা নরকে যাও। তোমাদের মুখ আর দেখবো না।"

এই বলে পাগলের মতো ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

সে কী ভীষণ রাত্রি। বজ্রবৃষ্টি আর বজ্রপাতে পৃথিবী যেন ধ্বংস হয়ে আজ। মাটি থরথর করে কেঁপে উঠছে। মেঘ ডাকছে আকাশ বিদীর্ণ করে। তারই নীচে শুভ্র কেশ এলিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ লীয়ার খোলা মাঠে এসে দাঁড়িয়েছেন, চীৎকার করে অভিসম্পাত দিচ্ছেন কন্যাদের, আকাশকে ডেকে বলছেন—"পৃথিবীটাকে ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দাও" বজ্র বিদ্যুতকে তিরস্কার করে বলছেন—"আমি তোমাদের কি অনিষ্ট করেছি যে শয়তানী বুড়ো মেয়ের সঙ্গে একজোট হয়ে তোমরা এই বুড়োর মাথার উপর এত অত্যাচার বর্ষণ করে চলেছো।"

এমন সময় কেন্ট এসে তাঁকে একটা ভাঙা কুঁড়ে ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে থেকে পাগলা টম রূপে ছদ্মবেশী এডগার, গ্লস্টারের পলাতক পুত্র।

একটু পরেই বৃদ্ধ গ্লস্টার এলেন মশাল নিয়ে, তিনি রাজাকে কুটির থেকে নিয়ে গিয়ে নিকটবর্তী এক সোয়ান বাড়িতে তুললেন। আহার এনে দিলেন। শয্যা নিয়ে এলেন। রাজাকে সত্যিই ভক্তি করতেন গ্লস্টার। তাই কর্নোয়ালের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি রাজার কাছে ছুটে এসেছিলেন।

কিন্তু তাঁর এই রাজভক্তির ফল হল অতি ভয়ানক। তাঁর পালিত পুত্র, নরাধম এডওয়ার্ড, কর্নোয়ালকে বলে দিল যে গ্লস্টার তাঁর কথা অমান্য করে রাজার কাছে গিছলেন। এই কথা শুনে রাগে ফেটে পড়ে কর্নোয়াল বৃদ্ধ গ্লস্টার ফিরে আসতেই তাঁর চোখ দুটো উপড়ে নিলেন।

গ্লস্টারের এক ভৃত্য প্রভুকে বাঁচাতে গিয়ে কর্নোয়ালের সঙ্গে যুদ্ধ করে মারা পড়ল বটে কিন্তু তার অস্ত্রের আঘাতে কর্নওয়ালও সাংঘাতিক আহত হয়ে, বিবাক্ত ক্ষতের যন্ত্রণায় মারা পড়লেন।

স্বামীকে হারিয়ে রিগান কিন্তু কোন দুঃখ বোধ করলেন না। তিনি পাপিষ্ঠ এডমণ্ডকে বিবাহ করবার প্রস্তাব করলেন এবং তাকে নিজের রাজ্যের শাসক পদে নিযুক্ত করলেন।

এদিকে কেন্ট কিছু লোকজন সংগ্রহ করে লীয়ারকে ডোভারে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সমুদ্র পার হয়ে ফ্রান্সের একটা সৈন্যদল সেখানে অবতরণ করেছে। কর্ডেলিয়া সেই সৈন্যদল নিয়ে নিরাশ্রয় পিতাকে রক্ষা করতে এসেছেন।

লীয়ার তখন বদ্ধ পাগল। কর্ডেলিয়াকে তিনি চিনতেই পারলেন না।

ফ্রান্সের সৈন্য এসেছে শুনে গনেরিলের স্বামী আলবানি এবং রিগানের ভাবী স্বামী এডমণ্ড একত্রে সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্য অগ্রসর হলেন। ধর্মের জয় এ পৃথিবীতে সব সময় হয় না। যুদ্ধে গনেরিল রিগানেরই জয় হল। লীয়ার ও কর্ডেলিয়া বন্দী হলেন। এতক্ষণে লীয়ার কর্ডেলিয়াকে চিনতে পারলেন। বললেন, "চল্ মা, খাঁচার পাখির মতো দুজনে কারাগারে বসে গান গাই।"

কিন্তু সে সুযোগ তাঁদের হল না। দুর্বৃত্ত এডমণ্ডের আদেশে কর্ডেলিয়া নিহত হলেন। আর কন্যার মৃতদেহ-কোলে নিয়ে হাহাকার করতে করতে প্রাণ বিসর্জন দিলেন ভাগ্যহীন রাজা লীয়ার। মরবার আগে তিনি বুঝে গেলেন, তিন মেয়ের মধ্যে কে তাঁকে সবচেয়ে বেশী সত্যিকারের ভালবাসতো।

তারপর গনেরিল চক্রান্ত করে রিগানকে বিষ খাইয়ে মারলেন এবং নিজেও স্বামী আলবানির ভয়ে আত্মহত্যা করলেন।

এডমণ্ডও রেহাই পেল না। এডগারের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে সে মারা পড়ল।

মৃত রাজা লীয়ারের জন্য শোক করতে রইলেন কেন্ট। অন্ধ গ্লস্টারের পরিচর্যা করবার জন্য রইল বিশ্বস্তক পুত্র এডগার। আর রাজ্যশাসন করবার জন্য রইলেন নতুন রাজা আলবানি। তিনি কোনদিন গনেরিল রিগানের পাপ কার্যকে সমর্থন করেন নি।

বিচিত্র ভবঘুরে

ভবানী মুখোপাধ্যায়

[এডমণ্ড লড্ স্নাতক হওয়ার পর শিক্ষকতা করতেন। ব্যক্তিগত সমস্যায় উৎপীড়িত হয়ে প্রায় তিন বছরকাল উদ্দেশ্যহীন ভবঘুরের জীবন যাপন করেছেন। দুর্দশা আর ক্লেশ মানুষকে ভবঘুরে জীবনে আশ্রয় নিতে বাধ্য করায়। এডমণ্ড লড্ তাঁর ভবঘুরে জীবনে মানবিক চরিত্রের—এই বিচিত্র দিকটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করেন এবং স্বল্প পরিচিত জগৎ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ গবেষণার সুযোগ লাভ করেন। "Subways are for Sleeping" নামক গ্রন্থে লড্ তাঁর চোখে দেখা এই জাতীয় কিছু নোঙরহীন মানুষের বিবরণ দিয়েছেন। বিচিত্র জীবনের কাহিনী 'জীবন স্মরণ' পর্যায়ে পরিবেশন করতে বসেছি। এই কাহিনী এডমণ্ড লড্-এর গ্রন্থ থেকে নেওয়া এমনই এক বিচিত্র ভবঘুরের জীবনের কথা। এই কাহিনী সত্য, শুধু নাম ধাম পালটানো হয়েছে।]

জর্জ স্পোকার মাঝারি সাইজের মানুষ, সরু ঠোঁট, চোখে রিমলেস চশমা। গায়ে সব সময় একটা ব্লু সার্ট। কাজ করার সময় ব্যবহার করা হয় এই ধরণের সার্ট। তার সঙ্গে একটি লাল রঙের বো-টাই আর সার্টের ওপর মাপের কাঁটা ধরনের ট্রাইড কোট। লোকটি ভবঘুরে বলে নিজের পরিচয় দিত এবং সাতটি বছর সে এই ভাবেই কাটিয়েছে। ছা ইয়র্ক সিটির ম্যাডিসন স্কোয়ারে আরো অনেক ভবঘুরের দলে মিশে একটি বেঞ্চে বসে থাকত। রাতের বেলায় মৃতদেহবাড়ির জোর গোড়ায় বা শুধু ঘুমাবার জন্য যেসব জায়গা থাকে সেইখানে আশ্রয় নিত, আর আহার বলতে যৎসামান্য যা জুটতো তাই খেয়ে থাকত। কিন্তু অনেক দিক থেকে স্পোকার কিন্তু ছিল অন্যসব ভবঘুরের চেয়ে স্বতন্ত্র।

আসলে স্পোকার ছিলেন সান ফ্রান্সিসকো শহরের একজন ব্যাঙ্কার বা—মহাজন। একদিন অডিটাররা তাঁর খাতা পত্রে আবিষ্কার করলেন গরমিল এবং ঘাটতি, এর ফলে তাঁর আড়াই বছরের কারাদণ্ড হল। কারাবাসের কাল শেষ হল কিন্তু মুক্তি লাভ করে স্পোকার আর ঘরে ফেরেন নি। স্ত্রী তাঁকে ডিভোর্স করলেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি সব বিক্রী হয়ে গেল। কোনো বন্ধু বান্ধবই তাঁর সঙ্গে সংযোগ রাখলেন না।

স্পোকার বলেছিলেন—"সকলের কাছেই আমি একজন অজ্ঞাত, বাইরের ভবঘুরে মাত্র। আমিও স্থির করলাম—দরকার নেই সভ্য সমাজে ফিরে। মানব সমাজের একটা কুশ্রীতম নিদর্শন হিসাবে আমি একটি নোঙরা মানুষ হিসাবে জীবন যাপন করবো। এমন মানুষ সংসার আর দেখেনি।"

গোড়া থেকেই স্পোকার চরিত্রে লক্ষ্যহীনতা প্রবল হওয়ায় তার বন্ধুবান্ধবরা তাঁকে এড়িয়ে চলত, তাদের মধ্যে একটা পার্থক্য গড়ে উঠেছিল। এই লক্ষ্যহীনতাই হল ভবঘুরে চরিত্রের বৈশিষ্ট।

আগে জানা ছিল না। বা আগে হাত দেওয়া হয়নি এমন কোন কিছুর সন্ধান পেলেই স্পোকার সেই কাজের পিছনে ছুটতেন। নতুন অভিজ্ঞতার ছিল অদ্ভুত আগ্রহ।

ভবঘুরে হিসাবে আর একটি পার্থক্য ছিল স্পোকারের সঙ্গে এই শ্রেণীর অন্য সব বাউণ্ডুলে ভবঘুরেদের। স্পোকারের হাতে অনেক টাকা। কারাবাসকালেই পিতৃব্যের মৃত্যু হল, তিনি স্পোকারের নামে ৭৮ ডলারের একটা মাসিক আয় বরাদ্দ করে দিয়েছিলেন. (আমাদের হিসাবে প্রায় ছ'শ টাকা। এই অর্থ বলে স্পোকার ট্রেনের লাউঞ্জ কম্পার্টমেন্টের যাত্রী হয়ে আমেরিকার সর্বত্র ঘুরেছেন—ক্যালডেনন আদি যা মুক্তি ফৌজের আওতায় বোধহয় এই ভাবে একমাত্র তিনিই প্রবেশ করেছেন।

হ্যাইয়র্কে পৌঁছে স্পোকার ভাবলেন যে ভবঘুরে হিসাবে তাঁর রাতের আশ্রয় হবে ছাউনি-চটিতে। বাওয়ারি অঞ্চলে কয়েকটি আশ্রয়ে বসবাস করে হাল ছাড়তে হল ছারপোকার উৎপাতে। আরো একটু খরচ বাড়াতে হল, ২৫ সেন্টের জায়গায় ৪০ সেন্ট ভাড়ায় একটা বাসস্থান জোগাড় হল। একেবারে নীচের তলায় ভোজনশালায় যৎসামান্য আহারের ব্যবস্থা করা হল, কিন্তু এও সহজ নয়, কারণ এখানে সব রকমের পশু একেবারে ষষ্ঠ-পাকিয়ে পাতে পরিবেশন করা হয়। এটা স্পোকারের চক্ষুশূল। সুতরাং সেদিকে থেকেও রীতি বহির্ভূত কাজ করতে হল, খাবার ব্যবস্থাটা একটু ভালো করতে হল। সুরাপানের জন্য কৌত্তোনের ভবঘুরের আড্ডা "বীনির সরাই"-এ যাতায়াত করতেন। এই পানশালায় সবাই দাঁড়িয়ে মদ্যপান করে এবং এখানকার পৃষ্ঠপোষকদের আকৃতি যতদূর সম্ভব অশ্রদ্ধেয়। তাদের মধ্যে স্পোকার যেন শত সংগ্রামে জর্জরিত সেনাদলের আজ্ঞায় নতুন শিক্ষানবীশ।

জর্জ স্পোকার বলেছেন—আমি যেন ওদের মধ্য একজন পরিব্রাজী আনাড়ি মাত্র। আমি প্রতিদিন ছাউনি চটিতে শুয়ে নিজেরই পিঠ চাপড়াই এই ভেবে কত না ক্লেশ ভোগ করছি। কি কষ্টে আছি। কিন্তু—'বীনির সরাই'-এর খদ্দেরদের কাছে ছাউনি-চটির বাসিন্দা রীতিমত ভালো অবস্থার মানুষ, স্বচ্ছল বলা যায়। এরাই হল আসল ভবঘুরে। এরা রাতের বেলায় পাতাল রেলের ট্রেনের দরজায় শুয়ে থাকে। খালিবাড়ির খোলাজায়গায় আশ্রয় নেয়, কখনও গ্রাণ্ড সেণ্ট্রাল ষ্টেশনে, কিংবা পার্কের বেঞ্চে বিড়ালের মত ঘুমিয়ে কাটায়।

যে কাজে ব্রতী হয়েছেন সেই কাজ ঠিকমত পালিত হচ্ছেনা এই ভেবে স্পোকারের ঝোঁক আরো বেড়ে যায়। দৃঢ়চিত্তে খাঁটি ভবঘুরের মত থাকতে হবে। সঙ্গে একটি নোটবই নিয়ে ঘুরতেন কোথাও কোনো নতুন রকমের রাত কাটানোর জায়গার সন্ধান পেলে তার বৃত্তান্ত টুকে রাখতেন। তারপর সেই সব জায়গা খুঁজে বার করতেন, সেসব জায়গায় থাকার চেষ্টা করতেন। সুতরাং অচিরেই বুঝলেন যে পার্কের বেঞ্চে শুয়ে রাত কাটানো বড়ই কঠিন ব্যাপার। সুতরাং মাঝে মাঝে ছাউনি-সরাই এবং মাঝে মাঝে পার্কের বেঞ্চে রাত কাটাতে লাগলেন। যতবার এই অবস্থা ঘটে ততবারই বিরক্তি বাড়ে, তিনি মনে মনে ভাবেন যে প্রকৃত ভবঘুরে হওয়ার মত সামর্থ্য তাঁর নেই। জীবনে তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন। একটিমাত্র পথ আছে যে পথ ধরলে এই জীবনে পাকাপাকি বন্দোবস্ত করা সম্ভব। সে হল নিজের টাকাকড়ি সব বিলিয়ে দেওয়া। এরপর থেকে স্পোকার যথেচ্ছ ভাবে টাকা পয়সা দান করতে সুরু করলেন।

এই অবস্থা কিন্তু রইল না, জর্জ স্পোকারের আসল চরিত্র এইবার কিন্তু আত্মপ্রকাশ করে, সে জাত মহাজন, বিনা স্বার্থে কোনো কিছুর বিনিময়ে পয়সা খরচ তার গায়ে লাগে। স্পোকার স্থির করলেন কোনো কিছু খবর সরবরাহ করলে তবেই তাকে পয়সা দেবেন, তবে তাও মাত্র দশ সেন্ট, তার বেশী নয়। যখনই কোনো সংবাদাত্রীকে পয়সা দিতেন তখনই তার কাছে খোঁজ নিতেন সে কোথায় রাত কাটিয়েছে। এই তথ্য সবসে নোটবই-এটুকে রাখতেন। একটা খাতা শেষ হতে এইবার আরো একটি বড় আকারের খাতা কেনা হল।

খানিবাড়ি, টানেল খোঁড়া হচ্ছে যে সব অঞ্চলে তার সংবাদ, ব্যবহৃত গাড়ির আড্ডা, এবং নানারকমের ছাউনি বা বেড়ের টোলের সংবাদে স্পোকারের নোটবইটির পাতা ভর্তি হতে থাকে। একটি বছর ধরে স্পোকার প্রায় প্রতিটি রাত্রি নতুন জায়গায় কাটিয়েছে। সংগৃহীত তথ্যাবলীর মধ্যে রাতের চৌকিদার বা সেইসব অঞ্চলের পাহারওলাদের মেজাজের রকমফের, আসন্ন বিপদের পথ এবং সেই সব ঘর বা আস্তানা ব্যবহারের উপযুক্ত সময়টুকুও নোট করা হত।

একদিন সন্ধ্যায় একজন ভবঘুরে এসে জর্জকে ধরল, তার প্রতিদিনকার আশ্রয় থেকে সে উৎখাত হয়েছে। একটা নতুন জায়গা দরকার। জর্জ স্পোকারের সন্ধানে যে জায়গা আছে তা দেখার বিনিময়ে সে ২৫ সেন্ট খরচ করতে রাজী আছে। জর্জ একটি জায়গার সন্ধান দিলেন, এইখানটিতে দু'সপ্তাহে অবাধে নিদ্রা দেওয়া যাবে।

এই সাক্ষাৎকার স্পোকারের জীবনে এক বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটালো। মাত্র একটি দশ সেন্ট খরচ করে যে সংবাদ তিনি সংগ্রহ করেছেন তা বিক্রী করে পঁচিশ সেন্ট পাওয়া যেতে পারে এই চিন্তা আগে মাথায় আসেনি। জর্জ সবাইকে জানিয়ে দিলেন যে প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে ম্যাডিসন স্কোয়ারের একটি বেঞ্চে তিনি বসে থাকবেন, এখবর সবাই জেনে গেল। আর অচিরেই প্রতিদিন সাত-আটটি খবর বিক্রী হতে লাগল আর তার বিনিময়ে পঁচিশ সেন্ট। ইতিমধ্যে তিনি প্রায় ২,০০০ থেকে ৩,০০০ মাথা গোঁজার জায়গার সন্ধান সংগ্রহ করেছেন।

আশ্রয় সম্বন্ধীয় সংবাদ ছাড়াও স্পোকার অন্য খবরও সংগ্রহ করতেন। ভবঘুরেরা এসে বলত কোনো মিশন তাদের বিনামূল্যে আহার দিয়েছে, বা কোনো বিশেষ দাতব্য প্রতিষ্ঠান একেবারে বাজে। স্পোকার সংবাদ সংগ্রহ করতে লাগলেন কারা সাইনবোর্ড বাহক চায়, কোথায় কে বাসনপত্র ধোবার লোক সন্ধান করছে এইসব। এ সবই নোটবইতে টুকে রেখে স্পোকার একটি একক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলেন। একক প্রচেষ্টার সমাজ সেবী আন্দোলন। ক্রমশঃ রটে গেল যে সামান্য পয়সার দরকার হলে স্পোকারের কাছে যাও। স্পোকার কাঁচা টাকা দিতেন না তবে কোথায় গেলে তা পাওয়া যাবে তার সন্ধান দিতেন।

১৯৪৮-এর শরৎকালে স্পোকার একটা উত্তম সুযোগের সন্ধান পেলেন। প্রচণ্ড বর্ষণের সময় তিনি একজন লিফটম্যানের সঙ্গে কথা বলছিলেন। চলে আসার সময় তিনি বললেন রাস্তার ওপাশে গিয়ে দেখি এক পাত্র কফি পাওয়া যায় কি না। লিফটম্যান তৎক্ষণাৎ বলল আমার জন্য এক কাপ কফি এনে দেবে ভাই!

স্পোকার আত্মগত ভাবে সেদিনের কথা স্মরণ করেন। তিনি বললেন—পার্কের পথে যেতে যেতে আমি সমানে এই কথা চিন্তা করতে লাগলাম। লোকটি আমাকে কফির জন্য ২৫ সেন্ট দিয়ে বলল যে খুচরা পয়সা আমি আমার জন্য রেখে দিতে পারি। এই থেকে মনে হল এত একটা ভালো কারবার।

এক সপ্তাহের মধ্যে স্পোকার একটি বিরাট বাড়ির সুপারিনটেণ্ডেণ্টের কাছ থেকে অনুমতি পেলেন

সেই বাড়ির সমস্ত কর্মচারীর জন্ত নিয়মিত ভাবে দিনে দুবেলার খাবার আনতে পারবেন। স্পোকার সেই বাড়ির অন্তসব ভাড়াটিয়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অনুরূপ অনুমতি আদায় করলেন। এখানে প্রায় ৬০০ কর্মী কাজ করতেন। স্পোকার হিসাব করে দেখলেন যে ম্যাডিসন স্কোয়ার অঞ্চলে চারপাশে একশো গজের প্রায় ত্রিশ হাজার কর্মী নানা কাজে নিযুক্ত। তারা পঞ্চে ১২,০০০ হাজার কাপ কফি ও তদনুরূপ খাবার-দাবার খেতে পারে। পাঁচ সেন্ট করে এক কাপ কফির দাম ধরলে প্রতিদিনে শুধু বখশিস হিসাবে প্রায় ৬০০ ডলার পাওয়া যাবে। অর্জ স্পোকার এই কাজ হাত নিতে মনস্থ করলেন।

ইতিমধ্যে কাজ বা আশ্রয় স্থানের সন্ধানে আরো অনেক বেশী সংখ্যায় ভবঘুরের দল তাঁর কাছে আসতে লাগল। স্পোকার তাঁর কারবারের নাম দিলেন 'স্পোকার এণ্ড সোসাইটি'—এই প্রতিষ্ঠান স্পোকারের খাদ্য সরবরাহ কোম্পানীর মূল চাবিকাঠি। স্পোকার এমন সব পথ আবিষ্কার করলেন যেখান থেকে খাদ্য সরবরাহ করে বখশিস হিসাবে ১০ থেকে ১৫ ডলার রোজগার করা যায়। তারপর যে সব ভবঘুরে তাঁর কাছে সাহায্যের জন্ত আসত তার হাতে সেই অঞ্চলের ভার দিয়ে নিজের কমিশন হিসাবে মাত্র তিন ডলার নিতে লাগলেন। ক্রমে স্পোকারের কাছে কুড়িজন কর্মী কাজ করতে লাগলেন।

সোড়ার দিকে স্পোকার এবং তাঁর অনুচরবৃন্দ কোনো কফির দোকান থেকে কফি কিনতেন ক্রমে তিনি একটি ঘর ভাড়া নিয়ে নিজের রন্ধনশালা বসালেন। তাঁর লাভের অঙ্ক ক্রমে সপ্তাহে ৬০০ ডলারে দাঁড়াল।

১৯৫২ খৃষ্টাব্দের কারাপ্রত্যাগত আসামী অর্জ স্পোকার এখন একজন সৎ নাগরিক। ফেডারেল ইন্‌কম ট্যাক্স্ রিটার্ণে তার দেয় ট্যাক্সের পরিমাণ সাংসরিক ৩১,০০০ হাজার ডলার। এখনও তিনি সেইরকম বেঁকে বসে থাকেন, সেই ভাবেই ছাউনি চটিতে রাত কাটান, পরণে সেই ব্লু-সার্ট, গলায় বো-টাই এবং অঙ্গে ঝোলঝালো স্যুট। তবে ভবঘুরের মত বেড়ালেও স্পোকার আজ সুখী ও সফল ব্যবসায়ী।

একজন স্ত্রীলোক কিন্তু তাঁর পেশাটির অবসান ঘটালো। কারাবাস কাল থেকে অর্জ স্পোকার স্ত্রীলোকের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখেন নি। এখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ, মাথায় টাক পড়ে আসছে। তেমন কিছু সুশ্রী সুপুরুষ নন, সুতরাং কোনো স্ত্রীলোকের তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কিছু নেই।

কিন্তু একদিন প্রাতে এক সুশ্রী লাল চুলওলা ত্রিশ বছর বয়সের মেয়ে তাঁর কাছে এসে হাজির। মেয়েটি একটি সাধারণ কাহিনী শোনালো, নিউইয়র্কে এরকম কাহিনী অতি সাধারণ ব্যাপার। মেয়েটির নাম সারা হাডসন, সে একজন অভিনেত্রী।

ইদানীং কাজকর্ম পাচ্ছিল না। আজ সকালে তাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। একজন বন্ধু তাকে বলেছেন যে এই অবস্থায় তিনি স্পোকারের কাছে গিয়ে উপকার পেয়েছেন, তাই তিনিও এসেছেন স্পোকার সন্নিধানে আহার ও আশ্রয় কামনায়। আসলে সারা হাডসন ছিলেন একটি সংবাদপত্রের প্রতিনিধি। অর্জ যা কিছু বললেন, সবকিছু তিনি লিখে নিলেন।

স্পোকার বলেছেন—"আমি ম্যাডিসন স্কোয়ারে পাঁচ বছর আছি। এই সর্বপ্রথম একজন স্ত্রীলোক এল আমার কাছে। জীবনে স্ত্রীলোক ভবঘুরে এর আগে আর দেখিনি। এ একটা চ্যালেঞ্জ। আমি স্থির করলাম সর্বপ্রথম ওঁর থাকার একটা ব্যবস্থা করে দিই। তখন মনে পড়ল স্ত্রীলোকের উপযুক্ত কোনো আশ্রয়ের সন্ধান ত' আমার নেই। অবশেষে বললাম রাতের পর আসুন, দেখি কি করা যায়।"

স্পোকার গিয়ে মিস হাডসনের জন্ত একটি ফ্লাট ভাড়া করলেন। একমাসের ভাড়া দিয়ে দিলেন এমন কি মুদির দোকানের মালপত্র কিনে ঘর সাজিয়ে দিলেন। স্পোকার এই ঘরটি ভাড়া নিয়েছিলেন

নিছক ঔচিত্য প্রেরণায়। মিস হাডসন যেন অঙ্কের একটি সমস্যা এবং সেই সমস্যাটির সমাধান করলেন স্পোকার। সমস্যা সমাধানে অর্জের প্রচণ্ড উৎসাহ। বিশেষ গর্ব অনুভব করেন মনে মনে। অস্ত্রাঘাতে যখন হাডসন এলেন তখন সানন্দে স্পোকার তাঁকে নতুন বাসায় নিয়ে গেল।

মিস হাডসনের নিজস্ব উত্তম ফ্লাট ছিল। কিন্তু স্পোকার যা ব্যবস্থা করেছেন তা দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। প্রথমটা ভাবলেন এই অনুকম্পাকে আঘাত করা ঠিক হবেনা। অর্জের মনে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়।

কয়েক সপ্তাহ বিকালের দিকে তিনি এই ফ্লাটটিতে এসে থাকতে লাগলেন। কি রকম সব চলছে। কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা দেখার জন্য স্পোকার রোজই আফিসের পর আসতেন, গল্প করতেন। যতক্ষণ না স্পোকার চলে যেতেন মিস হাডসন এই ফ্লাটেই থাকতেন তারপর নিজের আস্তানায় ফিরে যেতেন।

একমাসের মধ্যে অনুকম্পা এবং এই বদান্যতার মধ্যে রোমান্স ভরে উঠল। স্পোকারের নিজের সম্বন্ধে যাই ধারণা থাকুক না কেন তার আকর্ষণ কম ছিল না এবং মিস হাডসনও সুন্দরী। অর্জ ও সারার বিবাহের পর স্পোকারের জীবনের গুপ্ত রহস্য আর চাপা রইল না। আর সেই রহস্য উদ্ঘাটিত হওয়ার পর স্পোকারের এই নব-বধূ কয়েকটিকটে একটি ভালো ফ্লাট নিয়ে উঠে গেলেন। আর সংবাদপত্র প্রতিনিধি হয়েও সারা নিজের জীবন নিয়ে জড়িয়ে এই কাহিনী লেখেন নি।

এখন প্রতিদিন স্পোকার ট্রেণে ম্যানহাটান যান। ম্যাডিসন স্কোয়ারের পার্কের বেঞ্চে বসে সেই খাবার সরবরাহ কারবার চালিয়ে যাচ্ছেন আর মনে মনে ভাবেন যে তিনি একজনি ভবঘুরে।

অবশেষে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে অবসর নিয়েছেন স্পোকার। একটি কেটারিং কোম্পানীর হাতে কারবার ছেড়ে দিয়েছেন।

সারা হাডসন এবং ক্লান্তি স্পোকারকে পার্কের সেই বেঞ্চটি ত্যাগ করতে বাধ্য করেছে।

এই প্রথম

[গল্প-ভারতীতে 'এই প্রথম' পর্যায়ে আমরা সম্ভাবনাপূর্ণ নবাগত লেখক-লেখিকাদের রচনা আজ বহুদিন ধরে ছেপে আসছি। নূতন লেখক সৃষ্টি করা সাহিত্য-পত্রিকার একটি বিশেষ কর্তব্য। এই ভাবে ভাবান্বিত হয়েই আমরা এই অধ্যায়টির সূচনা করি। সত্যই যাঁদের প্রতিভা আছে, সুযোগ সুবিধা পেলে যাঁরা একদিন সুনাম ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবেন তাঁদের রচনা পাঠকদের সামনে তুলে ধরে তাঁদের উৎসাহ দান করাই আমাদের উদ্দেশ্য। পৃথিবীর সর্বত্রই এমনি করে নূতন লেখক তৈরী হয়ে থাকে। একদিন এইসব নূতন লেখক লেখিকা যে প্রথম সারিতে স্থান পাবেনা তা কে বলতে পারে। লেখকদের কাছে আমাদের অনুরোধ, রচনা পাঠাবার সময় 'এই প্রথম' এই কথাটির যেন উল্লেখ করেন এবং নিজের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি জানিয়ে যেন, কেন না পাঠকদের এইসব জানবার বিশেষ কৌতূহল হয়]

সম্পাদক—গল্প-ভারতী

মানুষ-কল্পনা

শুক্লা ঘোষ

মমতা রুষ্ট বিরক্ত মুখে ঘরে ঢুকে বলল—এ চলবে না।

কি চলবে না? মনোতোষ লিখতে লিখতে বললেন।

মাধবীকে মেরে ফেলা।

মাধবীকে কি আমি মেরেছি?

হ্যাঁ, তুমিই তো মেরেছ, তুমি খুনী।

আস্তে, আস্তে, মমতাময়ী! কেউ শুনে আমাকে পুলিশের হাতে দিক—এই কি পতির ওপর সতী সাধ্বীর উপযুক্ত কাজ হচ্ছে?

খুব হয়েছে। আর কথা দিয়ে ভোলাতে হবে না। মোট কথা মাধবীর মরা চলবে না।

মাধবীকে মারার ওপর আমার কি হাত আছে? ওকে মেরেছে ওর ভাগ্য।

তুমিই তো ওর ভাগ্যবিধাতা।

সেজন্যই তো বিধান দিলাম ওর মরা ছাড়া গতি নেই।

রেখে দাও তোমার বিধান। একেবারে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর হয়েছেন।

এক রকম তাই-ই। ঈশ্বরের সৃষ্ট জগতে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান আর আমার সৃষ্ট জগতে আমি। তবে একটা কথা বলতে পার, ঈশ্বরের এমন মমতাময়ী সহধর্মিনী নেই হয়ত, তাই তিনি নির্ঝঞ্ঝাটে কাজ করতে পারেন।

বটে? ঠিক আছে আর কিছু বলব না, কর তোমার যা খুশী। মমতা খাতাটা ছুড়ে ফেলে ঘর থেকে রেগে বেরিয়ে গেল।

মনোতোষ খাতাটা রেখে থেকে কুড়িয়ে নিয়ে মনে মনে একচোট হেসে আবার লিখতে বসলেন। কিন্তু মন দিয়ে লিখতে পারলেন না। বারবার মমতার মুখটা ভেসে উঠতে লাগল। ওর মায়ের সঙ্গে স্বভাবের অদ্ভুতরকম মিল আছে। ওর মনটা অত্যন্ত কোমল আর স্নেহ-মমতায় ভরন্ত। কারও দুঃখ দুর্দশা দেখতে পারে না। নিজের জীবনেও যাতে তার প্রতিচ্ছায়া না পড়ে সেজন্যে সব সময় হাসিতে আনন্দে সকলকে মাতিয়ে রাখে।

মনে আছে একবার ওর পোষা কুকুরছানাটা মারাযেতে দুদিন কিছু খায়নি, শুধু কেঁদেছে।

কিন্তু ওর এই নরম মন মনোতোষের জীবিকার পক্ষে অসুবিধে হচ্ছে। মনোতোষ একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক। তার প্রত্যেকটি গল্প-উপন্যাসে বাস্তবের স্পর্শ পাঠক মনকে নাড়া দেয়, উদগ্রীব করে পড়বার জন্যে। দুর্বোধ্য মানব মনের রহস্যগুলো বিশ্লেষণ করেন মনোতোষ তাঁর লেখনী দিয়ে। পড়তে পড়তে পাঠকদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে তারই সুখ, তার দুঃখ, তার জীবনের সমস্যা এবং তার সুষ্ঠু সমাধান। সেজন্যে প্রয়োজন হলে মনোতোষকে কঠোর হতে হয়, নিষ্ঠুর হতে হয়, নায়ক নায়িকার জীবনের পরিণতির বিচারে নির্মম রায় দিতে হয়। সেখানে একশ্রেণীর পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্যে কেবলমাত্র সুখের, মিলনের পথই তিনি নির্দেশ করেন না।

মনোতোষকে প্রত্যেকটি গল্প লিখে আগে মমতাকে পড়তে দিতে হয়। আর সেখানেই হয় বিরোধের সূত্রপাত। গল্পে যদি নায়ক কি নায়িকার মৃত্যু ঘটে অথবা কোনও বিয়োগাত্মক ঘটনা থাকে, তাহলেই মমতার মেজাজ বিগড়ে যায়, মনোতোষের কাছে বার বার আবার করে বিয়োগ কেটে যোগ করে দিতে! কিন্তু মনোতোষ ওকে বুঝিয়ে পারে না যে শুধু যোগ দিয়েই জীবনের অঙ্ক কষা যায়না। কেবল সুখের পথ দিয়েই মানুষের হাঁটা সম্ভব নয়। তাকে প্রতিপদে কাঁটা, কাঁকর কাদা মাড়িয়ে পথ চলতে হয়। হয়তো সে পথ গিয়ে শেষ হয় সুখের অট্টালিকায় নতুবা দুঃখের কুঁড়েঘরে। একমাত্র নিয়তিই সে পথের সীমানা ঠিক করে দেয়, তাতে মানুষের কোন হাত নেই।

মানুষের এই বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি লেখকের শিল্প। সেই জগতের পাত্রপাত্রীর জীবনও শুধুমাত্র সুখের, আনন্দের রঙ দিয়ে আঁকলে সেটা শিল্প হয় না, অবাস্তব একটা দিবাস্বপ্ন হয় মাত্র।

কিন্তু মমতা এসব কিছুই বুঝতে চায় না। তার যুক্তি, মানুষের জীবনে দুঃখ আছে—কেননা তার ওপর কারও হাত নেই, কিন্তু গল্প পড়েও সেই দুঃখই আবার পেয়ে কি লাভ! আনন্দের জন্যে সকলে গল্প পড়ে কান্নার জন্যে নয় নিশ্চয়ই।

একমাত্র ছেলে তুহিন মায়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে তর্ক করে—কান্না পাবে বলে যদি কেউ দুঃখের গল্প নাই পড়ত, তা হলে শরৎচন্দ্র এত বড় সাহিত্যিক হতেন না।

আমাকে যদি কেউ বিচারক করে, তাহলে শরৎচন্দ্রের দেবদাসের বদলে ঠাকুরমার ঝুলিকে প্রাইজ দিয়ে বসি। মমতা মন্তব্য করে।

হ্যাঁ, তা তুমি পার। কারণ—ঠাকুরমার ঝুলির শেষ কথা যে, "এইভাবে তাহারা সকলে সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার করিতে লাগিল।" বলে তুহিন আর তার বাবা জোরে হেসে ওঠে।

আজও ঠিক একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। মনোতোষের নতুন উপন্যাস 'তমসা-রাত্রির' নায়িকা মাধবী জীবনযুদ্ধে পরাজিত হয়ে মানসিক দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত আত্মহননের পথ বেছে নেবে। এখানেই মমতার আপত্তি। তাকে খুশী করতে হলে মনোতোষের এখন করণীয় হবে মাধবীকে না মরিয়ে দিয়ে, অলৌকিক উপায়ে তার সুখের পথ বের করে দেওয়া।

মনোতোষ ভাবে, তা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার গল্প লৌকিক, তাতে অলৌকিকের কোন স্থান নেই।

মমতার মনোমত না করতে পারলে, তার পরিণতি, তুহিন কথা বন্ধ, পুস্তকাকারে উপন্যাসটা প্রকাশিত হলে তা বন্ধকট করা, আত্মীয় বন্ধুমহলে উপন্যাসটির অসারত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে তাদের পড়তে নিষেধ করা। এর প্রত্যেকটিই লেখক মনোতোষের পক্ষে ক্ষতিকর। শেষ পর্যন্ত আর একখানা মিলনাত্মক গল্প লেখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মনোতোষ অব্যাহতি পায়।

মনোতোষ ঠাট্টা করে—মমতার মনতুষ্টির করার জন্যেই বোধহয় মা বাবা আমার এই নাম রেখেছিলেন।

মনোতোষ ভাবে আজও ঠিক একই ঘটনার সূত্রপাত হল।

কিন্তু চিন্তিতমুখে মমতাকে ঘরে ঢুকতে দেখে অবাক হয়। মমতা বলে—রাত আটা বেজেগেল, এখনও তুহিন কলেজ থেকে এল না কেন বলতো?

সিনেমা-টিনেমা গেছে হয়তো, অত ভাবছ কেন? মনোতোষ আশ্বাস দিতে চাইল।

কিন্তু সিনেমা গেলে তো বলে যায়, নয়তো ফোন করে।

হঠাৎ টেলিফোনের চিরপরিচিত ক্রিং ক্রিং শব্দটা যেন একটা অন্তত জন্তুর মত উচ্চস্বরে কানে বাজলো।

মনোতোষ তাড়াতাড়ি রিসিভ করলেন—হ্যালো, মনোতোষ রায় স্পিকিং।

আমি মেডিকেল হসপিটাল থেকে কথা বলছি। আপনার ছেলে তুহিন রায়ের একটা এ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। আপনারা এখনই আসুন।

মনোতোষ ও মমতা হতচেতনের মত হাসপাতালে ছুটে গেলেন।

হাসপাতালে গিয়ে খোঁজ করে তুহিনের ঘরে ঢুকতেই ডাক্তার বললেন—ভেরি সরি মিঃ রায়, বাঁচাতে পারলাম না। হাসপাতালে নিয়ে আসার মিনিট দশেকের মধ্যেই মারা গেছে।

মনোতোষের সামনে সব কিছু কাঁপসা হতে হতে অন্ধকার হয়ে গেল। সেই অন্ধকারে তিনি দেখলেন মাধবী যেন তার অতৃপ্ত আত্মা নিয়ে তার ভাগ্য বিধাতা মনোতোষের কাছে ছুটে আসছে আর মনোতোষ ছুটে চলেছেন অভিযোগ জানাতে তাঁর ও জাগতিক ভাগ্যবিধাতা ঈশ্বরের কাছে।

অনেকক্ষণ পর জ্ঞান ফিরে দেখলেন মমতা পাগলের মত মৃত ছেলের বুকের ওপর আছড়ে পড়ে কাঁদছে।

কিন্তু মনোতোষের চোখে জল ছিল না। তিনি ভাবলেন, কঠিন বাস্তবের কষ্টিপাথরে মমতার দুঃখের মূল্য যাচাই হয়ে গেল। মানুষের জীবন জুড়ে দুঃখের কতখানি স্থান আছে, তা ও বুঝতে পারবে। তাই আর ও আমার কাছে কোনদিন আব্দার করবে না গল্পের পাত্র কিংবা পাত্রীকে বাঁচিয়ে দিতে ও বুঝেছে বাস্তব কি নিষ্ঠুর। আর ততোধিক হৃদয়হীন বিধিলিপি। এই নির্মমতার ওপর আমাদের কোন হাত নেই।

তাই এখন আমার কাছে এসে আব্দার করছে না ছেলেকে বাঁচিয়ে দিতে। ও যে জানে বাস্তব নিয়ে আমার গল্প, কিন্তু বাস্তব আমার গল্প নয়, তাই তুহিনের ভাগ্যবিধাতা; আমি নই, আমারই নিষ্করুণ ভাগ্যনিয়ন্ত্রার সে ক্রীড়ানক মাত্র।

অপরাহ্নবতী

সুবোধ সিংহ

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

যখন কোন আশাবার কথা নয় অথবা যে-সময়ে রৌক্ষিৎ কোনমতেই এসে পড়তে পারে না, সে-সময়-টুকুর সদ্ব্যবহার করছে নিশ্চয় সুমিত্রা। সাধনা হয়তো লোক দিয়ে ডেকে আনতে পাঠিয়েছে ওকে, অথবা নিজেই হয়তো গেছে। ফোন নিয়ে বসে থাকতে থাকতে ওর কানটা ফোনের চাপে ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল, হাতও ধরে এল। সাধনাও বেশ মজার মানুষ; একজন ভদ্রলোক ফোনের কাছে যে ফোন ধরে বসে আছে তাকে অন্ততঃ একটা খবর দিয়ে ভদ্রতা করবার মত অবসরও তার হল না। মনে হল কেবল নয়, দুয়ারের বাইরে ছুটো করে রৌক্ষিৎ যেন স্পষ্ট দেখতে পেল সাধনা লোক পাঠিয়ে দিয়ে ফোনের কাছেই একটা চেয়ারে এলিয়ে শুয়ে আছে। সাধনা সোজা মেয়ে নয়, ও অবশ্য চালাক। অবাধের ভয়ে ও ফোনের কাছেই ভিড়েনি। দেরায় মধ্যে জড়িয়ে না পড়বার জন্যে সাধনা তাই আগেভাগে সরে পড়েছে।

ফোনের রিসিভার কানে দিয়ে ও সাধনার জীবনের বিভঙ্গগুলোই একে একে দেখতে লাগল। কিছুক্ষণের জন্যে একটি মমতাহীন কঠোর অনুভূতি দৃঢ়ভাবে বিলীন হয়ে গেল।

সুমিত্রাকে উপলক্ষ্যে ওর ভাবনাটা হঠাৎ সাধনার ঘাড় মটকে দেওয়ার জন্যে কেন যে লাফিয়ে পড়ল তা সে জানে না।

সাধনার কোন ছেলেপুলে হয়নি। এত কটা বছরেও প্রযত্নে বেচারা ওকে একটাও সন্তান দিতে পারেনি। এখন ওর ওপরে সাধনার আর আশা নেই। সুমিত্রার মুখেই শুনেছে ছেলেপুলে হওয়ার জন্যে ওরা দুজনে চেষ্টা করতে কসুর করেনি। যথাকালে যথাবিহিতভাবে সাধনার প্রকৃতিতে ক্রমবিকাশ হয়েছে, বিবাহিত জীবনে এসে সেই ক্রমবিকাশের ধারা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল, সন্তানবতী হওয়ার চরম লক্ষ্যে এসে পৌঁছতে পারল না।

অথচ এই মানুষই, এ পর্যন্ত আগাগোড়া বয়েসের বশবর্তী নিয়মের ব্যতিক্রম না করে জীবনটা বেশ সুন্দর ভাবেই কাটিয়ে এসেছে।

অনেক অনূঢ়া তরুণীর মত সাধনাও প্রাক্‌বিবাহের যুগে ছুটিয়ে প্রেম করেছে এবং বিবাহের পরে এই মানুষটিই স্বামীর ঘরে এসে একেবারে শান্ত, ধীর, স্থির ও নিরীহ হয়ে গেল!

স্বামীর ঘরে ও অন্য পরিচয়ের পাতা উলটিয়ে একেবারে অন্য মানুষ হয়ে বদলে গেল। হয়-বন্ধ-করা হাসির ছটফটানি বেমালুম মুছে গেল ওর প্রকৃতি থেকে। উদ্যম একটি মেয়ে লক্ষ্মীবধূ হয়ে সুন্দর কাটিয়ে দিল অনেক কয়েকটা বছর। ওদের মধ্যে অন্তহীন চেষ্টা কবে থেকে শুরু হল তার সঠিক খবর পরীক্ষিৎ অবিশ্যি জানে না—বোধহয় স্বাভাবিকভাবে উপযুক্ত সময়েই আরম্ভ হয়েছে। সেইসব দিন-বছর গুণে এখন অনেকের মধ্যেই দৃঢ় ধারণা জন্মে গেছে যে ওর জরায়ুর যৌবনে স্থিতিশীল উর্বরতা নষ্ট হয়ে গেছে। সন্তানহীনা বন্ধ্যা নারীর স্বপক্ষে যতগুলো যুক্তি আছে সাধনার কথাবার্তার মধ্যে এখন মাঝে মাঝে সে-সব যুক্তি বিলিক দিয়ে ওঠে।

টা কাজে আটকে গিয়েছিলাম—খুব বেশী হয়ে
।?"
ন? খুব গুরুতর বুঝি?"
না, তেমন কিছু নয়। কাউও বলতে পারো,
ও বলতে পারো—"
াক করতে তো তেইশ মিনিট লাগে না—!
ন মিনিটের ব্যাপার!"
।—"
ই-চুরে লণ্ডভণ্ড করতে তো সময় লাগে না বেশী
লছি।"
ন থেকে ফোন করলে বুঝি?"
তোমাকে বিরক্ত করলাম,—অসময়ে—।"
খুব ভদ্রতা শিখেছো এ-কয়দিনে—।"
ন্টা ফোন ঘরে বসে থাকতে হলে বুঝতে পারতে
কা করা খুব সহজ কাজ নয় —থাকলে—যে
। করছি সেটা বড় অদ্ভুত। একটা ঘটনা শুনে
পাথর হয়ে গেল—একটু উষ্মিও হয়ে উঠেছি
র জন্যে। একটা ছেড়মাসের বাচ্চাকে একটা
গলার নলী কামড়ে ছেড়ে ফেলেছে। মহিলাটি
চ্চাটার মা গিয়েছিল রান্না করতে। এই
ানিলা গন্ধে একটা ভংলী বেড়াল ছোঁড়াটার
বাচ্চার গলা খুবলে খেয়ে পালিয়ে গিয়েছে।
চাদরে পায়ের রক্তের ছাপ পাওয়া গেছে।
না দিয়ে ঢুকেছিল সেই অবধি খাবার ছাপ।
ন মনটা কেন জানি খুব অস্থির হয়ে উঠেছে।"
সাংঘাতিক খবর—অত্যন্ত—মর্মান্তিকও। কিন্তু
স্থির হওয়ার কারণ।"
ঘরে ওদের দুজনকে রেখে যাওয়া ঠিক নয়—।"
ন কামড়াবে—?"

ওরা পুড়ে যেতে পারে?' অথবা 'বিষাক্ত অসুখ বা
বেপাত্তরির দোহায় গুলি কি ওরা গিলে ফেলবে।
"উঃ! তুমি ভীষণ রাগ করেছ।—পাখনাদে
ঘরে রেখেই গিয়েছি এবার নিশ্চিন্ত হলে তো?
এখনও ওদের ঘরে বসে আছে। ওরা ঘুমুচ্ছে!"
"তোমার কি প্রায়ই এ-সময়ে কাজ থাকে?"
"হ্যাঁ। কিছুদিন হল প্রায়ই।"
"ওরা কাছে থাকলে কাজের অসুবিধে হয়?
"সত্যিই তাই—তুমি অবিশ্যি রাগ করেই ব
কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, ওরা থাকলে বড্ড
হয়। অনেকক্ষণ ফোনে বসিয়ে রেখেছি তো
কিন্তু উপায় ছিল না। পরে বলবো সব—ফোনে।
"ওসব অসুবিধেগুলোকে আমার কাছে
দিলেই পারো! তোমার চেয়ে রাজেশ্বরও কম যত্ন
না,—তুমিও নিশ্চিন্ত হয়ে বাঁচতে—কাজে মন
পারতে ভাল করে!"
"চাকর-বাকরের কাছে রাখতে আমারও
থাকতে পারে!"
"ওখানে রেখে ছেলেমেয়েকে তুমি কতটুকু co
দিতে পারো? তোমার হাতে কি অত সময় আ
"কি করি আমি এখানে এসে? তুমি কি
কি ভাবো আমাকে?"
"ভাবে আমার মন। যাতে কথা ভাবতেই ব
অত্যন্ত সাধারণ একটি জীবের অত্যন্ত সাধারণ ও ব
একটি প্রতিক্রিয়া। স্ত্রীর সম্বন্ধে কয়েকটী বিষয়ে
হতে পারিনি—বরং একটু স্বার্থপর। যে ম
নিজের স্ত্রীকে অবাধ মেলামেশার সুযোগ দিয়ে
anti-body তৈরী করছি—protective

"খুব খারাপ প্রকৃতির স্ত্রী পেয়েছ বলে তোমার এরকম বিশ্বাস ও ধারণা হয়েছে ?"

"না। কতগুলো বিশ্বাস ও ধারণা আছে বলেই স্ত্রীর গতিবিধিকে একটু খাটো করে রাখতে চাই। যতটুকু শোভন ততটুকু পর্যন্ত।"

"সে শোভনটুকু কি ছাড়িয়ে গেছি আমি ?"

"গলার স্বরটা ওরকম লাগছে কেন তোমার ? কি হল—?" ধরা-গলার চাপা স্বর শুনতে পেল পরীক্ষিৎ।

"কিছুই হয় নি।"

"তবে—ভাল আছ তো ?"

"ভাল আর থাকবে না। ভাল আর থাকতে দেবে না তুমি।"

"আমার কথা শুনেই এই অবস্থা ? কাছে এলে তো দেখছি শরীর ভেঙে পড়বে—মনও বিগড়ে যাবে।"

"তুমি কি ঝগড়া করতে চাও ? ভাল লাগে ? কিন্তু সে-সুযোগ তোমাকে আর দেবনা আমি।"

"কি করে—?"

"তোমার কাছে আমার আর যেতে ইচ্ছে নেই। আমার কিছুই তোমার ভাল লাগবে না আর। ভাবছি—বাবার সঙ্গে সিঙ্গাপুরেই চলে যাব।"

কোন উত্তর দেওয়ার আগেই ফোন কেটে দিয়ে সুমিত্রা চলে গেল। অফিস থেকে বাড়ী ফিরে সুমিত্রা আর ছেলেপুলেকে দেখে পরীক্ষিৎ বেশ একটু অবাক হয়ে গেল। সেদিনের অকস্মাৎ খুশীর একটি আকাশের নীচে এসে দাঁড়াল। অবশ দুঃখের স্পর্শে ওর কাতর রঙীন মুখচ্ছবি দেখেও কিন্তু পরীক্ষিৎ খুব বেশীক্ষণ খুশীর উৎসবকে মনের মধ্যে ধরে রাখতে পারল না।

অল্প-স্বল্প দুএকটা কথা হল কেবল। খাবার টেবিলে বসে পরীক্ষিৎ একেবারে সোজাসুজি কথা পাড়ল :

"সিঙ্গাপুরে কেন যাচ্ছেন তোমার বাবা ?"

"একটা ভাল কাজ পেয়ে গেছেন সেখানে।"

"হুঁ ! তোমার বাবা খুব কাজের মানুষ। রিটায়ার করে বসে থাকতে চান না উনি।—শুনেছি—he wants to die in harness."

"বাবার সঙ্গে আমিও চলে যাব সেখানে। তোমার এখানে আমি আর টিকতে পারছি না।"

"তা ঠিক। টিকতে না পারলে যাওয়াটা উচিত তোমার মত মা'য়েরা ছেলেমেয়ে ছাড়াও বেশ ভালই থাকতে পারে স্বতন্ত্র।—না—মন্দ প্লান করোনি !"

"ছেলেমেয়েও আমার সঙ্গে যাবে। তোমার কাছে রেখে যাব না।"

"সে বিষয়ে—বোধহয়—তুমি আমার অনুমতি পাবে না।"

"কেন ? ওরা কি আমার ছেলেমেয়ে নয় ? অধিকার নেই আমার ?

"আছে। পুরো নয়।"

"কতটুকু ?"

"সামান্য।"

"তবু—?"

"ওদের যা বয়েস—তাতে,—আইন তোমার বিপক্ষে কথা বলবে।"

"আমার তা মনে হয় না।—বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবো।"

"বাবার অনুমতি নেওয়ার দরকার হয় না আজকাল কিন্তু আর মার কাছ থেকে তুমি অনুমতি পেয়েছ তো যথা—তোমার শোভনাদি—এবং—তার ছোট ভাই ?"

"ওরা হয়তো খুসী হবে না আমি গেলে—কিন্তু যখন হয়তো হবে—অন্ততঃ একটি মানুষকে তো সুখী করতে পারবো। আর ওকে সম্পূর্ণভাবে সুখী করবার জন্যে তপতী-দীপককেও আমার সঙ্গে নিয়ে যাব।—নইলে ওদের ক্ষতি হবে।"

প্রথম কয়েকদিন সুমিত্রার মুখের কথাগুলো ওর মনের কথা নয় বলেই ভাবতে চেষ্টা করেছিল পরীক্ষিৎ।

কিন্তু সে চেষ্টা সম্ভব হয়ে ওঠেনি শেষ পর্যন্ত।

সিঙ্গাপুরে যাওয়ার আগে 'সাহেব' (সুমিত্রার বাবা ওদের দুবোনের দুখানা অয়েল-পেন্টিং ছবি আঁকিয়ে নিয়েছেন। সেই ছবির জন্যেই সুমিত্রাকে দুপুরবেলা ঘণ্টা দুই বসে থাকতে হত। এঁকেছেন একজন নাম করা

আর্টিষ্ট—গৌরমোহন বসাক। পরিচয় না থাকলেও পরীক্ষিৎ ওর নাম অনেক শুনেছে। ওর ছবিও এক্‌জিবিসনে দেখেছে চের। বিদেশে—বিশেষতঃ জার্মানিতে—গৌরমোহন বসাকের ছবির খুব কদর হয়েছে।

এই ভাবলেশহীন লোকের মানুষের মনে কল্পনার সম্বন্ধে সূক্ষ্ম পক্ষপাতিত্ব এমন কড়া, রুঢ় ও শৈথিল্য প্রকৃতি দিয়ে ঢাকা ছিল যে সব লোক তার ভেতরের প্রকৃতি সহজে বুঝে উঠতে পারত না। পরীক্ষিৎ পেরেছিল—পেরেছিল বহুদিন আগে। এই ছবির বিষয় থেকেই পরীক্ষিৎ নিশ্চিত হল,—তার মনের যন্ত্র একেবারে নিষ্ক্রিয় বা বিকল হয়ে যায় নি।

সুমিত্রা তার জীবন থেকে সরে যাচ্ছে—সূচনা আরম্ভ হয়েছে বহুদিন আগে থেকেই।

তার অনুমান মিথ্যে হয়নি। অনুমান তার মিথ্যে হয় না কখনো। সুমিত্রার সম্বন্ধে তার মনের যন্ত্র ভুল খবর পাঠাচ্ছে মনে করে পরীক্ষিৎ বেজায় রেগে গিয়েছিল। ঠিক এই সময়ে, এই ছবি তোলার বিষয়ে সুমিত্রাদের বাবার স্বভাবের একটি স্নিগ্ধ সংবাদ শুনে পরীক্ষিৎ হঠাৎ বড় তৃপ্তিলাভ করল। এই ভদ্রলোকের চরিত্রের এই অংশটির বিষয়ে এমন ভবিষ্যৎবাণী এপর্যন্ত কেউই করেনি। ওর মনের যন্ত্র তাহলে এখন পর্যন্ত বিগড়ে যায়নি।

ব্লাড-হাউণ্ড কুকুর কি আক্রোশ নিয়ে ক্রিমিন্যালের পায়ের গন্ধ অনুসরণ করে ছুটতে থাকে? ওর একটা ইন্দ্রিয়ের বিশেষ শক্তিকে মানুষ শিকা দিয়ে কাজে লাগিয়েছে। তেমনি ওরও মনের বুদ্ধির একটা বিশেষ শক্তি অনেক অজানা খবর এবং অনেক অদৃশ্য ঘটনাকে পৌঁছে দিয়ে যায় পরীক্ষিতের কাছে। ভুল ও বেঠিক খবরও যে আসে না তা নয় কিন্তু খুব বেশী নয়—খুব বেশী আসে বলে মনে পড়ে না পরীক্ষিতের।

এবার এসে সুমিত্রা খুব কম কথাই বলেছে পরীক্ষিতের সঙ্গে। যে-সম্পর্ক ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে তাকে নতুন করে জোড়া লাগাবার আগ্রহ ও ইচ্ছে তার না-ও হতে পারে। অপরিচয়ের দূরত্ব পরিচিত মানুষের সঙ্গে যেমন ঘটে অপরিচিতের সঙ্গে বোধহয় তেমন হয় না।

সন্দিগ্ধ মানুষের মত সুমিত্রার চলাফেরা, ভাব-চরিত্র দেখে আন্দাজ করে মন-গড়া আজগুবি কোন ঘটনা সে তৈরী করেনি। সুমিত্রার সমস্ত খবর আপনিই এসে গেছে ওর মনের নাগালে। সন্দেহের জ্বালায় অস্থির হয়ে কোন একটা বিশেষ ঘটনার জন্ম হয়নি বলে তার মনের সঙ্গে সেজন্যে কোন বিরোধ নেই।

• • •

সুমিত্রার শোভনাদি আজকাল প্রায়ই সন্ধ্যার পরে এ-বাড়ীতে আসে। বেশ ঘণ্টা দুই মজলিসি আলাপ-আলোচনা চলে সুমিত্রার সঙ্গে। এই দুই অল্পবয়েসী মহিলার মধ্যে এতখানি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার পেছনে কি এমন মধুর সম্পর্ক থাকতে পারে তা পরীক্ষিৎ ঠিক বুঝে উঠতে পারেনা। নিশ্চয়ই কিছু আছে নইলে এমন শোভা পেতে পারে না। মনে হয়, এখন বা ভবিষ্যতে, একটা গূঢ় উদ্দেশ্যকে সাধন করবার জন্যেই শোভনাদির মত বয়স্কা একটি মহিলাকে সুমিত্রার মত অল্প বয়েসী একটি তরুণীর সঙ্গে এতখানি ভাব-সাব করবার দরকার হয়ে পড়েছে। কিন্তু উদ্দেশ্য যাই থাকুক, পরীক্ষিতের কাছে পঁয়তাল্লিশ বছরের একজন ঘাগী মাষ্টারনির সঙ্গে অল্প-বয়সের সংসার-অনভিজ্ঞ, সেন্টিমেন্টাল, সেনসেটিভ্ একটি তরুণীর এত মেলামেশা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা মেশার মত কাটিয়ে দেওয়া, কেমন যেন বেমানান বলে মনে হয়।

এই শোভনাদি সুমিত্রার বাড়ীতে এসে ওকে যেন ভদ্রতার বাধ্যবাধকতার ফেলে ছুটির দুপুর বেলাতে ওদের বাড়ীতে টেনে নিয়ে যাওয়ার গূঢ় অভিসন্ধির জাল ফেলেছে। কি উদ্দেশ্য নিয়ে এই ঘাগী স্ত্রীলোকটি এমন নিপুনভাবে জাল ফেলে চলেছে তা পরীক্ষিৎ সঠিক জানে না। স্বামীর প্রতি একটি স্ত্রীকে বিমুখ করে বিষিয়ে দেওয়ার জন্যে শোভনাদি এতখানি উঠে-পড়ে লেগে গেছে এ-কথা ভাবতে পারেনা পরীক্ষিৎ—অন্ততঃ খুব কষ্ট-স্বীকার করে একথা ভাবতে হয়।

[ক্রমশঃ

পৌষ পার্বণ

(সেকালের কথা)

শ্রীগিরিবালা দেবী

বছরের পরে বছর ঘুরে পৌষমাস এলেই আমার মনে পড়ে আমার পিত্রালয়ের ধানভানুনী মহারাণীকে। তার শিশুকালে বাবা মা আদর করে নামকরণ করেছিল মহারাণী। তাদের অনেক আশা ছিল এই নামের গুণেই মেয়েটা হয়তো একদিন সৌভাগ্যের উচ্চশিখরে আরোহণ করবে। কিন্তু ভাগ্যবিধাতা যাদের মেয়ে লেখেছেন, তাদের নামের গুণে কি হবে?

মহারাণীর স্বামী ছিল হেলে-চাষা। নিজের খেত-খামার না থাকলেও পরের জমি চাষ আবাদ করে নিজের সংসার যাত্রা নির্বাহ করতো। কিন্তু মহারাণীর অদৃষ্টে সে সুখটুকুও সইলো না বেশীদিন।

একদিন অকস্মাৎ অকালে তিনটি ছেলেমেয়ে সহ মহারাণীকে রেখে তার স্বামী চলে গেল পরলোকে। মহারাণী বহাল হল আমাদের ঢেঁকিশালায়।

আমাদের বাড়ীর গৃহিণী ছিলেন বাল্য-বিধবা আমার জ্যেঠাইমা, আমরা তাঁকে বড়মা বলে ডাকতাম।

বড়মার হৃদয়ত্তরা দয়ামায়ার সীমা ছিল না। তিনি মহারাণীকে শুধু আমাদের ধানভানুনী করেই ক্ষান্ত হলেন না। আমারই প্রায় সমবয়সী মহারাণীর বড়ছেলে ক্যাবলরামকে দিলেন আমাদের গরুর রাখালী। বছর বারোর ক্যাবলা বেশ চটপটে চালাক চতুর ছেলে, গরুর পালের দিব্যি রাখাল বনে গেল।

সেকালে কিন্তু গরুর রাখালদের মাস মাইনের প্রচলন ছিল না। তারা তিনবেলা পেটপুরে খেতে পেতো। বছরে দুই জোড়া কাপড়, দুইখানা গামছা। শীতের ধোলাই (রঙীন উত্তরীয়) মাথার তেল। এতেই খুসী মনে দিনের পরে দিন কাজ করে যেতো। প্রাপ্ত বয়স্ক জন মজুরদের অবশ্য মাইনে দিতে হতো, কিন্তু তার পরিমাণ বেশী নয়।

তখনকার কালে টাকার মূল্য ছিল বেশী, জিনিষের দাম ছিল কম। গেঁয়ো লোকের বিলাস না থাকায় অভাব বোধ তেমন ছিল না।

মহারাণী দুই কুড়ি ধান ভেনে পাঁচসেরি দুই কাঠা ধান পেতো মজুরী। চালের কুঁড়ও ধানের তুষ দেওয়া হতো বাড়ানীকে। ধানভানুনীদের নাম ছিল পল্লীগ্রামে 'বাড়ানী'।

গ্রামের লোক বলাবলি করতো আমাদের সংসার নাকি লক্ষ্মীর সংসার। তা বলা অসঙ্গত নয়। আমাদের গোলাভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ, গোয়াল ভরা গরু। কল ফুল তরকারির বাগিচা।

বড়মা বালিকা বধূ হয়ে এবাড়ীতে পদার্পণ করবার পরেই নাকি আমাদের এই সমস্ত হয়েছিল। তাই সকলে তাঁকে লক্ষ্মী স্বরূপিণী বলতেন। লক্ষ্মীর নারায়ণ না থাকলেও সকলের বিশ্বাস ছিল, দুর্বাসা-মুনির শাপে লক্ষ্মী নারায়ণ হারা হয়েছেন। এ-হেন লক্ষ্মী যাদের ওপরে সদয়, সে ঘরে লক্ষ্মীছাড়া মহারাণীর দুঃখের অন্ন একভাবে জুটেই যেতো।

ক্যাবলারামের ছোট ভাই বাবুরামের বছর দশেক বয়েস, এখনো রাখালী করতে পারে না: গাভী দেখে ভয় পায়। মেয়ে মতি বছর আট বয়েস। ওরা আলানী কাঠ কুড়োয় গোবর কুড়িয়ে ঘুঁটে বানায় পাড়ায় পাড়ায় বিক্রি করে দু'চার পয়সা আনে, তাই দিয়ে তেল নুন কেনে। বিলের ধার থেকে কলমি শাক এনে তা সেদ্ধ করে, মুড়ের ভাত খায়। গরীব দুঃখীদের এমনি করেই দিন কাটে।

পল্লীগ্রামে পৌষ মাসের বড় ধুম, এই মাসটিকে লক্ষ্মীমাস বলা হয়।

অগ্রহায়ণের নূতন ধান কাটার পরেই ঘরে ঘরে চলতে থাকে মহা সমারোহ। নবান্নের পরে পরপর চলতে থাকে নানারূপ ব্রত অনুষ্ঠান।

মূলো ষষ্ঠী, পাষাণ চতুর্দ্দশী ব্রত, নাটাই পুজো। ঘরে ঘরে চলে পিঠে পুলি খেজুর গুড়ের পরমান্ন। মোয়া মুড়কী তিলের নাড়ু। নূতন গুড়ের সুবাসে চারদিক ভরে যায়। এরই মধ্যে সমাগত হয় পৌষপার্ব্বণ।

তার কত আয়োজন, কত সংগ্রহ। নূতন ধানের চালের গুঁড়ো, নারকেল, গুড়, ক্ষীর ছানা, ভাজা মুগের ডাল, কাঁচা মাসকলায়ের ডাল ইত্যাদি।

দেখতে দেখতে পৌষ মাস শেষ হয়ে গেল। পৌষের ছোটবেলা, তাকে ধরে রাখা যায় না। বাড়ী ঘর দোর মোছা লেপার সাড়া পড়ে গেল।

লক্ষ্মী মাসে মা লক্ষ্মী সংক্রান্তির দিন বাড়ী বাড়ী বেড়াতে আসতেন। অমার্জ্জিত অপরিষ্কার অলেপা আদিনা ঘর দেখলে তিনি সে গৃহের প্রতি বিমুখ হয়ে ফিরে যাবেন।

কেউ তাঁকে ফিরিয়ে দিতে চায় না, আদিনায় আল্পনা দিয়ে তাঁর আসন পেতে রাখে। এই ধারণায় মুসলমান স্ত্রীলোকেরাও ঘর দোর উঠোন নিকিয়ে তক্‌তকে করে রাখে। কারো নিজ ঘরে কাপড় বিছানা পরিষ্কার করে। বাসন-পত্র তেঁতুল দিয়ে ঝক্‌ঝকে করে মাজে।

আমাদের বাড়ীতেও পড়ে গেছে লেপা-পোঁছার ধুম। মালী বৌ রাত শেষ হতে না হতে চুবড়ী চুবড়ী গোবর দিয়ে কলসী কলসী জল ঢেলে উঠোন নিকিয়ে তক্‌তকে করে তুলছে। গোটা গাঁ ভরে চলছে ঘোর থেকে সন্ধ্যা অবধি ঢিঢ়ে কোটা, ধানভানা। পিঠের চাল কোটা ঢেঁকির ঘুম্‌ঘুম্ শব্দ।

আমাদের ঢেঁকির কাজ শেষ করে সেদিন মহারাণী বড়মার কাছে এসে অসঙ্কোচে বলে, "বড়মাঠান, তোমারে একটা কথা কইতে সরম লাগিছে।"

বড়মা প্রসন্ন প্রশান্ত চোখ তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, "সরম কিসের, রাণীবৌ? কি বলবি বল না।"

রাণীবৌ ধীরে উত্তর দেয়; "আমারে চারডা মাসকলাই দিতি পারবেন? ছায়াল ম্যায়া ধরেছে পিঠের জেগে। ওয়াগুনের বাস যাওনের পরে বাড়ীতে পিঠা-পাটা করতি পারি নাই। তাই কইচে এবার পোষরায় পিঠা করিতে।"

বড়মা হেসে বলেন, "আমরা তো কত রকমের পিঠে করবো শামলা শামলা। এরা কত খেতে চায় পেটপুরে খাইয়ে দেব। পিঠের কি কম হাঙ্গাম? নারকেল, গুড়, তেল, চালের গুঁড়ো, কত কি চাই। ক্ষীর ছানার কথা ছেড়েই দি। নারকেল, গুড়, চালের গুঁড়ো না হলে মাষকলায়ের ডাল দিয়ে দুই কি পিঠে ক'রে ওদের দিবি?"

"আমি গরীব মানুষ আমাগরের পিঠায় বেশি দেরা লাগে না। কুদের গুঁড়া কুটে খুইছি। চারডা মাষকলাই পাথুলে কলাই ভাঙাইয়া ডাল হইলেই আমার সরা পিঠা হয়া যাইবে। তোমাগো মিঠে পিঠায় ওয়াগরের নাকি মুখমারি যায়, তাই চাইছে কাল-খুলোর পিঠা খাইতে।"

"দুনকালের পিঠা আবার কিরে? তোদের চাষার পিঠের কথা দিয়ে আমার দরকার নেই বাপু। ছেলেমেয়ে যখন খেতে চেয়েছে তখন করে দিবি বৈকি। ক'দিন আগে আমাদের কলাই ভেঙে অনেক ডাল করা হয়েছে, তার থেকে নিয়ে যা। কুদের গুঁড়ো দিয়ে পরে তোরা রুটি করে খাস, এখন নতুন চালের গুঁড়ো দিচ্ছি খানিকটা, নতুন সরা দিচ্ছি, ওদের পছন্দের পিঠে করেদিস। পিঠেই যখন করবি রাশীবৌ, তখন কাল গোবর আলপনা দিস, ঘরখানা উঠোনখানা লেপে উঠোনে আলপনা দিস। লক্ষ্মীর পা ধানের শীষ আঁকতে পারবি তো? তুই হিন্দুর মেয়ে ছেলের মেয়ের মা তোর তো শুভক্ষণও আছে?"

"তাই কও মা, আমাকে সেখায়ে-পড়ায়ে যাও। লক্ষ্মী ঠাকরোণের পা আলপনা দিতি মতি শিখছে।"

রাণী বৌয়ের পিঠার উপকরণ দিতে বড়মা গোলাঘরে চলে গেলেন।

মকর-সংক্রান্তির আগের দিন গোবর আলপনা। কদিন ধরেই অনবরত গোবর দিয়ে অঙ্গন লেপা হয়েছিল, আজ গোবরের সঙ্গে মাটি মিশিয়ে ছাতা দিয়ে নিকানো হল আলপনা দেবার জন্যে।

দ্বিপ্রহর গড়িয়ে যেতে না যেতেই পুঁইডাঁটার রস চালের গোলা মিশিয়ে আঙিনার মাঝখানে বড়মা রেখায় রেখায় ধারা টেনে দিলেন বিরাট এক বুনো হাতীর।

বড়মা আলপনার পদ্মদর্শিনী। তাঁর আঁকা রেখার ফাঁকগুলি মা পিসিমারা ভরে তুলতে লাগলেন লতাপাতা পদ্ম পদ্ম দিয়ে। আমার ওপর ভার পড়লো লক্ষ্মীর পা ও ধানের শীষ দেবার।

দেখতে দেখতে বিরাট আঙিনা ভরে গেল চিত্র-বিচিত্র আলপনায়। হাতীর কপালে দেওয়া হ'ল সিন্দুর ধান দুর্বা সরষের ফুল।

সন্ধ্যার পর উলুধ্বনি শুভক্ষণ করে সরাপিঠে মাটির নূতন সরা বসানো হল উনুনের উপরে। কুমোর কয়েক জোড়া সরা দিয়ে গেছে। এর জন্যে কাল তারা যাবে, পিঠে পাবে।

আর অনেক রাত পর্যন্ত তৈরি হল সরাপিঠা, পাটিসাপটা আর সিদ্ধপুলি।

মোটা ধরনের পিঠেগুলো রাত্রে করে না রাখলে কাল ভোর হতে নানারকমের পিঠে তৈরি নিয়ে সময় সংকুলান হতে চায় না। যাবে কামার কুমোর, ধোপা-নাপিত, ডুঁইমালীরা তার পরে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবরা তো আছেই। তাত ভাল, তাঙা তরকারি, তিন চার রকমের মাছ, অম্বল, দইয়ের সঙ্গে সকলের পাতায় প্রচুর পিঠে পায়েস দিতে হবে। যে যত পাবে তাকে দিতে হবে তাই।

পরের দিন প্রভাত হতেই সুরু হয়েগেল সংক্রান্তির অনুষ্ঠান। সাত সকালেই গোরুবাছুরদের স্নান করিয়ে সিং-এ তেল ও কপালে সিঁদুর দিয়ে তাদের সর্বাঙ্গে চালের গোলা জলে নূতন কলকে দিয়ে ছাপ দেওয়া হ'ল। তার পরেই কলার পাতায় সরা পিঠে নিয়ে খাওয়ানো হল গরু বাছুরকে।

ওদিকে লক্ষ্মীনারায়ণের পুজোর আয়োজন, পিঠে ভাজার কড়া বসলো উনুনে। ভোরে প্রাতঃস্নান সেরে বড়মা, মা, পিসিমারা উনুনের পাশে বসে গেছেন পিঠে গড়তে।

রান্না ঘরে রান্না চড়বে একটু বেলা হলে—বাজারের মাছ এলে।

নিরামিষ ঘরে রাতের কোটা তরকারি থালায় থালায় সাজানো রয়েছে। এক কড়া পায়েস নামলে বড়মা সেগুলোর সংগতি করবেন। তিনি রন্ধনে দ্রৌপদী, তাঁর হাতের রান্না খেতে সবাই ভালবাসে।

পিঠের বিপুল আয়োজনের ফাঁকে বড়মা একবার বেরিয়ে এসে কড়িভরা লক্ষ্মীর কাঁপি বের করে নূতন ধানের বাইল ও ক্ষীরের লোটন নিয়ে লক্ষ্মীর কথা বলে উলু দিলেন।

বড়দের ব্যস্ততার মধ্যে আমরা ছোটরা রোদে বসে বাসী পিঠে খেয়ে খেজুরের জিরেন কাটা এক গেলাস করে রস পান করে বাড়ী বাড়ী আলপনা দেখতে বেরিয়ে গেলাম।

তখনকার দিনে শুধু ছোটরা নয়, বড়রাও এবাড়ী সেবাড়ীর আলপনা দেখে তার সমালোচনা করতেন।

গোটা দিনব্যাপী চললো পৌষ-পার্বণের উৎসব। পূজো অর্চ্চনা, ভোজন, এতেই কেটেগেল পৌষের স্বল্পায়ু বেলা।

পিঠে যজ্ঞ শেষ হতে হতেই সন্ধ্যা হল, শুক্লপক্ষের চাঁদ উদয় হল বাঁশবনের মাথায়। আল্পনায় চিত্রিত আঙিনায় শুভ্র জ্যোৎস্না লুটিয়ে পড়লো।

তখন বড়মার স্মরণ হল মহারাণীর কথা ছেলেমেয়ে নিয়ে সে খেতে আসেনি।

ব্যাবসা বিপ্রহরে কৃষিভোজন করে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই গরুবাছুর সোয়ালে তুলে বাড়ী চলেগেছে।

বড়মা মহারাণীকে খুব স্নেহ করিতেন, তারা আসেনি, খায়নি, এতে তাঁর অশান্তির অন্ত রইলো না।

বগলাদিদি আমাদের পুরাতন দাসী; বড়মা তাকেই আদেশ করলেন ওদের পিঠে দিয়ে আসতে। মাকে বলে দিলেন ওদের জন্যে ভাত মাছ তরকারি যেন ঢেকে রাখা হয়। সকালে এসে ওরা গরমগরম ভাত, নরপরা ঘেমুণ খাবে।

মহারাণীরা থাকে আমাদের এক পাড়াতেই। এক বৃহৎ বাঁশবন পার হলেই তাদের বাড়ী। বাড়ীখানা আম কাঁঠাল কলার ঝাড়-ঘেরা একখানা খড়ের কুটীর, তার গায়ে রান্নার চালা।

বগলাদি কানা উঁচু বড় পিতলের থালায় কলার পাতায় ঢেকে পিঠে—পায়েস নিয়ে পথে পা দিতেই, আমি তার পিছুনিলাম।

মহারাণীর গাছের পেয়ারা বড় মিষ্টি, তারই লোভে সেখানে যাতায়াতের আমার বিরাম ছিল না।

নিত্য দেখা উঠোনে পদক্ষেপ করে আমি বিস্মিত হলাম। ছোট আঙিনাখানা নিকানো তকতকে। তাতে আলপনা পড়েছে। গরীবের কুঁড়োয় হাতীর পা নয়। অপটু হস্তে আঁকা-বাঁকা লক্ষ্মীর পা, ধানের শীষ, পদ্ম পদ্ম গাছ-পাছালি।

দোবার ঘরের খোলা দরজা দিয়ে চোখে পড়লো একটা নূতন মাটির সাজার মাটির প্রদীপ জলছে মিটমিট করে।

একখানা ছোটখিঁড়ের বিরাজ করছেন মাটির নূতন সরায় আঁকা লক্ষ্মী মূর্তি। তাঁর দুই পাশে নূতন ধানের খাঁটির রাশিকৃত ফুল। এদের এখানে আগে এসব দেখিনি।

আমরা এগিয়ে এলাম রান্নার চালার কাছে। সেখানে কেরোসীনের কুপী জ্বলছে রাজ্যের ধোঁয়া উড়িয়ে। ঘরিভূষের উনুন জ্বলছে ধপ্ ধপ্ করে। উনুনের পাশে একখানা নূতন মাটির শামলায় একশামলা পাতলা কড়াই ভাল রান্না রয়েছে। উনুনের ওপরে বড়মার দেওয়া সেই বড়সরা, তার ওপরে ছোট সরাদিয়ে ঢাকা সরাপিঠে হচ্ছে।

ছেঁড়াচটের আসনে বসে কলাই চটা থালায় ক্যাবলারা তিন ভাই বোন মহা আনন্দে পিঠে খাচ্ছে।

বগলাদি তাকে, "ও রাণীবৌ, তোরা খাইতে বসনি বলে বড়মা তোগকে লেগে পিঠা দিইছে। কাল বিহানে খাইয়া তোরা সগলে কড়্কড়ে ভাত আর সরসরা বেরুন খাইয়া আসিস।"

রাণীবৌ সচকিত হয়ে প্রফুল্লস্বরে সাড়া দেয়, "দেখেছ কাণ্ড বড়মার? আজ যাওয়ার সময় পাইনি, বগলাদি। ছাওয়াল, ম্যাগা ধরিছেল ভদ্দর লোকের মতন লক্ষ্মীপুজা করিবে। ঘরদুয়ার মুক্ত করে আল্পনা দিবে, পিঠা ভাজিবে। এইসব লয়া আমি অস্থির হইয়া পড়ছি। আর বগলাদিদি, এই বেড়ার কাছে আসি বস। ওমা তোর সাথে ঠাকুরঝিও না আইছে।" বলতে বলতে রাণীবৌ ব্যস্তসমস্ত হয়ে একটা বস্তা পেতেদিল চালার সামনে।

বগলাদি পিঠের থালাটা নামিয়ে দিল রাণীবৌয়ের সামনে। ছেলেমেয়েরা উল্লাসে কিস্তির দিয়ে উঠলো। তার নুন-কালের পিঠে নিয়ে বসে গেছে, তাদের মিষ্টি পিঠেও এসে গেল।

আমি বলি, "তোদের নুন কালের পিঠে কেমন লাগছে রে ক্যাবলা? খেয়ে দেখ আমাদের পিঠেই ভাল, না তোদের?"

ছেলেমেয়েরা কথা বলে না। একটার পর একটা ভালে ভিজানো পিঠে খেয়েই চলে।

কথা বলে রাণীবৌ, "ঠাকুর-ঝি, একটা কথা কই, তোমরা তো আমার হাতের চিড়ে মুড়কী, মুড়ি মোয়া, নাড়ু খাও। আজ আমি নারাবাড়ী ধুয়ে-পাখালে নতুন সরায় নতুন শামলায় পিঠা করিচি, দিনমান উপোস থাকি লক্ষ্মীপুজা করিছি। আমার বানানো পিঠা একখানা চাখি দ্যাখ না? মঙ্গল দেবা তোমাগরেরই তোমাগরেরই পিঠা ইয়াতে দোষ হইবে না। তুমি আমার ক্যাবলার বয়সী ছাওয়াল—মুনিষ্যি, বিদ্যা হয় নাই।"

ক্যাবলা খিল্ খিল্ করে হাসে। আমি তার পরিহাসের হাসির ধার না ধরে চেয়ে রইলাম রাণীবৌ-এর দিকে। বড়মার দেওয়া একখানা শুভ্র সাদা ধুতি তার পরিধানে। একহারা শ্যামচিক্কণ দেহ, ক্লান্ত সকরুণ মুখের শ্রী এখনো মুছে যায়নি, দুই চোখে কাতর মিনতি মাখা।

আমি বলি, "সারাদিন পিঠে খেয়ে আমার খিদে নেই রাণীবৌ; তবু তোমার পিঠে একখানা আমাকে দাও। চেখে দেখি।"

ঘরি ভূষের আগুনের আভায় কুপীর আলোয় রাণীবৌয়ের মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেল। মুহূর্তের জন্য যে যেন আর সে রইলো না। মহারাণীর গৌরবে দীপ্তিময়ী হয়ে উঠলো।

যাদের কথা কেউ তেমন লেখে না তেমন ভাবে বা শোনে না, ঘুম-ঘুমাক পরে আমার স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে তা একটুকরো কথা প্রকাশ করলাম।

রূপ ও স্বাস্থ্য

বেলা দে

দেশ বিদেশের কবিরা অনেক বসন্তের সঙ্গে বহুবার তুলনা করেছেন নারীর যৌবনের। কথাটা ঠিকই যৌবনে তার মূল্য বোঝবার বোধহয় সময় হয়না। সময় যায় বিগত প্রায় যৌবনের প্রতি চেয়ে, কবে তাদের মত সাজসজ্জা করতে পারব এই ভেবে তারা তাদের চালচলন অনুকরণের চেষ্টা করে। অবশ্য কিশোরী লোলুপ দৃষ্টিতে অনুসরণ করে পরিণত যৌবনের আর পরিণত যৌবন অনুসরণ করে এগিয়ে যাওয়া যৌবনের এরকম দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

কিন্তু এ প্রসঙ্গ এখন থাক—আমি বলবো রূপ বা সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলতে হলে আগে দেখতে হবে স্বাস্থ্যের রীতি।—স্বাস্থ্য যদি খারাপ হয় যার জন্য আপনাকে রুগ্ন প্রাণহীন ফ্যাকাসে দেখায় এবং চোখে মুখে স্বাভাবিক উজ্জ্বলতার অভাব তাহলে আপনি যতই অঙ্গরাগ ব্যবহার করুন না কেন তাতে নিজেকে সুন্দর করে তুলতে পারবেন না। অনেকে কম বয়সে চেহারার প্রতি অতিমাত্রায় উদাসীন থাকেন তাঁদের বাড়ন্ত বয়স হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। কাজেই অল্প বয়সে মেয়েদের প্রয়োজন নিয়মানুবর্তিতা। এর নড়চড় হলেই সৌন্দর্য্য রক্ষা করা যাবে না।

যাই হোক শীতের দিনে দেহ চর্চ্চার একটু বেশী প্রয়োজন হয়। প্রতিদিন শোবার সময় ঈষদুষ্ণ জলে মুখ ধুয়ে একটু ক্রীম মাখবেন। অথবা গোলাপ জল গ্লিসিরিন মিশিয়ে শিশিতে রেখে দেবেন রাত্রে হাতে মুখে মাখলে চামড়া খসখসে হয়না।

শীতকালে শরীর সাধারণতঃ খসখসে হয়ে যায়। অনেকের পা হাত পা ফাটে, এমন কি পাতলা ছাল শুকিয়ে শুকিয়ে উঠে যায় দেখতে বিশ্রী লাগে। সেজন্য বিশেষ করে গায়ের চামড়া নরম রাখার দিকে নজর দিতে হবে। প্রত্যেক দিন সরষের তেল খুব ভাল করে মাখা দেহে ডলে ডলে মাখা দরকার। যাঁদের সময় আছে তাঁরা যদি রোজে বসে গায়ে তেল মাখেন খুবই উপকার হয়।

ঠাণ্ডা জলে স্নান হয়তো সকলের সহ্য নাও হতে পারে। এমন কি অনেকে ১ দিন বাদে বাদে স্নান করে থাকেন—সেটা যার যেমন সহ্য হয় সেরূপ করাই ভাল। তবে স্নান করুন আর নাই করুন, পায়ের নখে এবং নাভীতে প্রতিদিন সরষের তেল দেবেন। এতে কোনও দিনই ঠোঁট এবং পায়ের তলা ফাটবে না।

শীতকালে যাতে পেট পরিষ্কার থাকে তারজন্য একটু শাকসবজি জোলাপ জাতীয় কিছু নিয়মিত খেতে হবে। মাঝে মাঝে জোলাপ খাওয়া ভালো ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে। এছাড়া রোজ ভোরবেলা মুক্ত বাতাসে কিছুক্ষণ চলাফেরা করলে ভাল হয়। শীতের দিনে কখনো বসে বসে সাবান মাখতে নেই—এতে চামড়ার ক্ষতি হয় গ্লিসারিন জাতীয় সাবান ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া আমাদের দেশে যে চিরাচরিত তেল মাখার নিয়ম আছে সেটি এখনো করা যেতে পারে, তেল মাখার পর সাবান জলে না হাত ধুতে পারেন। এতে চামড়া পরিষ্কার থাকবে। চোখের কোণে অনেক সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা পড়ে। এ অবস্থায় খুব হালকা মালিশ ভালো না হলে চোখের ক্ষতি হতে পারে।

রংয়ের ঔজ্জ্বল্য বাড়াতে হলে আনুষঙ্গিক কতকগুলো নিয়মকানুনের সঙ্গে খাওয়ার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। যে সময়ের যে ফল—নাইবা খুব দামী হল। কাঁচা শাক সবজি, দুধ, ছানা, এগুলোর একটা না একটা খেতে পারলে ভাল হয়। খেতে বসে প্রতিটি খাওয়ার মুখে কখনো জল খাবেন না। খাবার অন্ততঃ আধঘন্টা পরে জল খেলে উপকার পাওয়া যায়।

এইভাবে যদি নিয়মিত স্বাস্থ্য চর্চার সঙ্গে সৌন্দর্য্য চর্চার প্রতি আমরা দৃষ্টি রাখতে পারি, বেশি খরচ না করে তাহলে স্বাস্থ্যের যে আসল রূপটি তা ফুটে উঠবে। তখন আর কৃত্রিম উপায়ে সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করার খুব দরকার হবে না।—

শীতের খাবার

নবকুন্তলা

সকলকে নিয়েই উৎসব। পারস্পরিক একটা আত্মিক যোগের সুর সেখানে শোনা যায়। যেখানে সবাই নেই সেখানে উৎসবের আনন্দও নেই। প্রতিবেশী প্রিয়জন, যাদের সঙ্গে অন্তরের সম্পর্ক তারাই উৎসবের সরিক। সেদিক থেকে দেখতে গেলে বাংলাদেশে পৌষমাসে অনেক উৎসব আর সে উৎসবের কিছুটা দেখা যায় আমাদের রান্নাঘরে। পৌষের রান্নাঘরে কত আয়োজন—ফুলকপি, বাঁধাকপি, কড়াইশুটী, মূলো, বেগুন, টোমাটো, নতুন গুড়, পাটালী, সবই তো এই সময়ের। আমাদের মা বোনেরা তাই বসে যান তাদের নতুন নতুন পরিকল্পনা নিয়ে রান্নার আয়োজন করতে। কেউ বলবেন ছেলের হাম বেশী এসময় কি আর অত রান্না করা যায়। বেশ তো বাড়ীতে যদি প্রেসার কুকার থাকে তাহলে বড় বড় করে ফুলকপি কেটে নিয়ে একটু ঘি গরম মশলা, পেঁয়াজ আদার রস, নুন মিষ্টি দিয়ে কষে নিয়ে প্রেসার কুকারের বাটীতে সাজিয়ে দিন কয়েকটা টোমাটো চাকা চাকা করে কেটে উপরে দিন। অল্প সময়ের মধ্যেই হয়ে

যাবে। সব সবজি এইভাবে রান্না করা যেতে পারে। এছাড়া সালাড তৈরী করে সকলকে খেতেও দেওয়া যেতে পারে।

বাংলাদেশে অবশ্য শীতের দিনে পিঠে পুলি তৈরী করা একটি শুভকাজ! প্রায় প্রতি ঘরেই পিঠে তৈরী করা হয়ে থাকে। যদিও আজকাল

এতে কিছুটা মজা পড়েছে কারণ সত্যিকথা বলতে কি অনেকে পিঠে তৈরী তর্কেও জানেন না। অথচ পিঠে একটি শিল্পকাজ কত রকমের পিঠেই না এক সময় আমাদের দেশের মা ঠাকুমারা করতেন! তবুও এটি আমাদের ভাল লাগে তাই নতুন করে পিঠে প্রস্তুত প্রণালী জানা দরকার।

আজো পল্লীবাংলায় পৌষপার্বণে মেয়েরা পিঠে পুলি তৈরী করে আত্মীয় পরিজনকে তৃপ্ত করেন। এর জন্য কত আয়োজন, কত ছড়া কত গান তাঁরা বাউনি বাঁধতে বসে করে থাকেন। পৌষমাস লক্ষ্মীমাস তাই এই লক্ষ্মীমাসকে বিদায় দিতে গিয়ে তাঁদের মন উতলা হয়ে ওঠে—আজো শোনা যায়—'এসো পৌষ যেওনা—সোনার পৌষ যেওনা।

পৌষপার্বণ

শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায়

"পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে
আয়রে ছুটে আয় আয়
ভালা যে তোর ভরছে আজ
পাকা ফসলে মরি হায় হায়।"

অগ্রহায়ণ শেষ হলো পৌষ এলো। ঘরে ঘরে এলো পিঠে পুলির উৎসব। পৌষ-পার্বণ বাঙালীদের চিরকালের প্রথা হিসাবে চলে আসছে। পল্লীগ্রামে লক্ষ্মীপূজা, বাউনি বাঁধার উৎসব সত্যই

হারি আগবণ—এটাও একটা দেখবার জিনিস। সারা রাত জেগে গ্রাম্য মেয়েরা বাউনি বাঁধে এবং পৌষ লক্ষ্মীকে আগলে রাখে একমাত্রী গান করে। সংক্রান্তির তিনদিন ব্যাপী পিঠে পুলির উৎসব চলে। সহরে গ্রামাঞ্চলের মতো অতো নিয়ম মেনে চলা হয় না। কিন্তু পিঠে পুলি প্রায় সকল বাড়ীতেই হয়ে থাকে। ইহা চিরাচরিত প্রথা হিসাবে চলে আসছে। নানান রকমের পিঠে তৈরীর করার প্রথা আছে, কয়েকটি পিঠে ও পায়েসের তৈরীর প্রথা লিখে দেওয়া হল :—

(১) **পাটিসাপটা** :—ইহাতে দুধ, ক্ষীর, ইত্যাদি প্রয়োজন। আগের দিন রাতে একটি পাত্রে জলসহ আতপচাল, বাদাম পেস্তা, ইত্যাদি ভিজিয়ে পরের দিন ভাল করে বেটে নিন। চাল বাঁটার সঙ্গে (চিনি বেটে নিলে ভাল হয়, বাটাচিনি, দুধ, ডিমের কোলা প্রস্তুত করা হল, পরে নারকেল কোরা পেস্তা বাদাম ক্ষীর একসঙ্গে বেটে নিন।

এখন কড়ায় পরিমাণমতো ঘী দিয়ে গরম করতে হবে এবং ছোট এলাচ, লোভন দিয়ে ক্ষীরটা সাঁতলে নিতে হবে। তারপর অল্প আঁচে চাটু চাপিয়ে তাতে ঘী দিয়ে ছোট হাতার সাহায্যে এক হাতা ঐ গোলা বেশ করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গোলকরে নিন। দেখতে রুটির মত কিন্তু আকারে তদপেক্ষা ছোট আকৃতির হয়। ওর উপর ক্ষীর দিয়ে মুড়ে ফেলুন সকল যেমন ডিমের আমলেট মোড়া হয় ঠিক তেমন করে। চালের বদলে ময়দা দিয়েও করা যেতে পারে। এটা হল পাটিসাপটা—এমনি খাওয়া যায়, ক্ষীরে ডুবিয়ে খাওয়া যায় আবার চিনির রসে ফেলেও খাওয়া তৃপ্তিদায়ক। লোকের রুচির উপর নির্ভর করে।

(২) **আলুর পিঠে** :—আলুকে জলে সিদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে সামান্য পরিমাণে ময়দা মিশিয়ে খুব ভাল করে চটকে নিন। তারপর ছোট ছোট লেচি করুন, ক্ষীর, পেস্তা, বাদাম মিশিয়ে পুর তৈরী করে রাখুন। লেচির মধ্যে পুর দিয়ে ইচ্ছামত আকারে তৈরী করুন, এবং ঘী কিংবা তেলে ভাজা যায়। রসে ফেলে করলে চটকানোর সময় একটু চিনি দিতে হয়। আবার আলুর পরিবর্তে রাঙ্গাআলু দিয়ে তৈরী করা যায়।

(৩) **দুধসাবুলি** :—ভাল দুধের ভাল, জলে সিদ্ধ করে তাতে ময়দা মিশিয়ে বেশ করে চটকে নিন। এমন পরিমাণ জল দেওয়া হয় যে ডালটা সিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে জলটাও যাতে শুকিয়ে যায়। নতুন গুড় ও নারকেল কোরা নিয়ে একটি পাত্রে ভাল করে পুর তৈরী করতে হয়। ডালের কাই পুলিপরতো গড়ে ঘীয়ে বা তেলে ভেজে নিন। যারা মিষ্টি ভালবাসেন না তাদের জন্য ছোট ছোট করে আলুকেটে কড়াই শুঁটি, লঙ্কা, পাঁচফোড়ন দিয়ে পুর করা যেতে পারে। খেতেও সুস্বাদু হয়।

(৪) **ছানার পায়েস** :—পিঠের একমাত্র উপাদান হলো পায়েস। এর উপকরণগুলি হলো : এক সের দুধে চারসের চিনি, টাটকা ছানা, অল্প পরিমাণ পেস্তা, গোলাপজল। এখন উনুনে চিনির রস চাপাতে হবে বেশ গরম হলে ছানাটা ঢেলে দিয়ে ক্রমাগত নাড়তে হয়, ছানাও রস যখন দিয়ে যাবে, তখন নামান হয় এবং ঢাকা দিতে হয়। এবার দুধকে জাল দিতে হয়, এবং চারসের দুধকে মিলিয়ে দু-সের করা হল, নামিয়ে ছানার সঙ্গে অল্প করে মেশান এবং ক্রমাগত নাড়তে থাকুন। সব দুধটা যখন ছানার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হলে পর এর উপর পেস্তার কুঁচি, কিসমিস, ছোট এলাচের গুড়া। ছানা দিলেও চলবে। এবং উহার মধ্যে অল্প পরিমাণ গোলাপজল দিলেন। ছোট ছোট ঘুরিতে ঢেলে রাখুন এবং খাবারের সময় ঘুরি হাতে দিয়ে পরিবেশন করুন, খেতেও সুস্বাদু ও খাইয়েও তৃপ্তি।

(৫) **কমলা লেবুর পায়েস** :—উপকরণ ১ সের কমলা লেবুর রস, ২ সের দুধ, ঘী ১ পো, সুজি ছটাক খানেক। চিনি ১ সের, পেস্তা, বাদাম, কিসমিস ও ছোট এলাচের গুড়া কয়েকটি। প্রথমে লেবুর রস করে

(আধুনিক পদ্ধতিতেই হউক) বা পুরাতন পদ্ধতিই হউক অর্থাৎ কাচের যে যন্ত্র বাজারে দেখতে পাওয়া যায় তাতে হউক। তাতে করে নিঙড়ে নিঙড়ে হউক যে কোন উপায়ে রস প্রস্তুত করুন। পরে ঐ রসে চিনি দিয়ে গরম করুন। ডেকচি হাঁড়িতে ঘী দিয়ে যখন ঘী গরম হবে তখন বাদাম, পেস্তা ভেজে নিন্ এবং বাকী ঘীতে এলাচের দানা গুলি ভেজে নিন। ঠিকমতো ভাজা হলে পর চিনি মেশান, খেজুর রস দিয়ে নাড়তে থাকুন। ফুটলে পর গরম করা দুধ একটু একটু দিন এবং নাড়তে থাকুন এইভাবে দুধটা শেষ হলে কিসমিস্ বাদাম, পেস্তা দিয়ে নামান। চমৎকার হয় খেতে।

(৬) **খৈয়ের পুলী** :—উপকরণ খৈ ২০০ গ্রাম, চিনি রসের জন্য ১½ পেয়ালা। খেজুর গুড় বা চিনি (পুরের জন্য) ½ পেয়ালা, ঘী ১½ পেয়ালা, গরম জল ১ পেয়ালা এবং নারকেল কোরা ২ পেয়ালা।

প্রথমে নারকেলটাকে মিহি করে বেটে নিন এবং গুড় কিংবা চিনিতে মিশিয়ে চটকে নিন, তারপর কড়ায় ঢেলে মৃদু আঁচে পাক দিয়ে কাই করুন। এটি পুর হবে। ১½ পেয়ালা চিনিতে ½ পেয়ালা জল মিশিয়ে ঘন রস বা কড়া রস তৈরী করুন। এবার বাজারে প্রাপ্ত খৈতে ময়লা থাকে সেগুলি বেছে ফেড়ে, অল্প জল ছিটিয়ে রেখে নিন। যাথাটার দিকে বিশেষ নজর রাখবেন ইহা মোলায়েম অথচ শুকনো হবে। তারপর খৈয়ের তালটা ছোট ছোট লেচী কাটুন নারকেল পুর দিয়ে পুলির মতন গড়ে নিন। কড়ায় ঘী দিয়ে ভাজুন এবং হালকা লালচে রং হলে তুলে একটি পাত্রে রাখুন। এইভাবে সবগুলো হলে চিনির রস গরম করে পুলি গুলিকে রসের মধ্যে ফেলুন ভালভাবে রস মাখিয়ে তুলুন। পুলির গায়ে কড়কড়ে হলে পর অর্থাৎ রস জমে গেলে খেতে দিন, সুন্দর খেতে লাগবে। গুড়ের পরিবর্তে চিনি দিয়ে করলে ছোট এলাচের গুড়া দেবেন।

(৭) **পালো** :—উপকরণ দুধ ৪ পেয়ালা, মিহি চালের গুড়া ১ পেয়ালা, চিনি ও টেবিল চামচ কিসমিস, কাজুবাদাম, পেস্তা, ছোট এলাচ।

প্রথমে এক পেয়ালা ঠাণ্ডা জলে মিহি চালের গুড়াতে গুলে নিন, কিসমিস্, বাদাম ইত্যাদিকে জল দিয়ে ভাল করে ধুয়ে নিন। পেস্তা, বাদাম, ভিজিয়ে রেখে ভাল করে বেটে নিন একটি এ্যালুমিনিয়াম পাত্রে কিংবা এ্যালুমিনিয়াম ডেকচীতে দুধ ও চিনি একসঙ্গে চাপিয়ে দিন। তিন চার বার উতলে উঠলে পর চালের গোলাটা ঢেলে দিন এবং নাড়ুন। কাঠের হাতা হলে ভাল হয়। যখন দুধ ক্ষীরের মতো ঘন হয়ে আসবে সেইসময় কিসমিস, পেস্তা, বাদাম ছোট এলাচ সব দিয়ে আঁচটা কমান। যখন পায়েসের মত গাঢ় হবে নামিয়ে রাখুন। ছোট প্লেটে দিন। তারপর কাজুবাদাম ওর উপর ছড়িয়ে দিন পালো যদি ইচ্ছে হয় খেজুর গুড় দিয়ে তৈরী করতে পারেন।

অনিবার্য কারণে শ্রীবিমল মিত্রের ধারাবাহিক উপন্যাস—
"কিছু রঙ কিছু বেরঙ" এ মাসে বন্ধ রহিল।

সদ্য বিকশিত গোলাপের মত সুন্দর আনন ও
কুসুম কোমল
পাপড়ি পেলব তনু

সাধনা বিউটি ক্রীম-এর
এইতো সবচেয়ে বড় অবদান।
নিজেদের সৌন্দর্য্য সম্পর্কে
সচেতন অগুনিকারা তাই
এর প্রশংসায় মুখর।

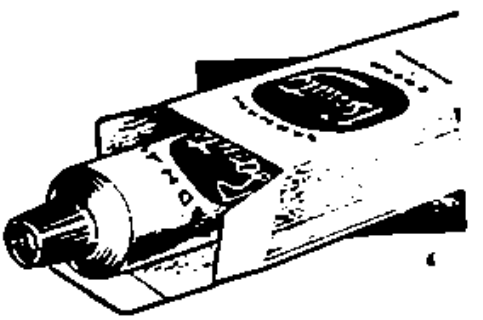

সাধনা
বিউটি
ক্রীম

রূপসাধনার অপরিহার্য্য
অতি আধুনিক অলঙ্কার

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮।

দাঁত ও মাড়ির স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য
এই টুথপেস্ট– **নিম**।

নিম টুথপেস্ট শুধু আপনার দাঁত পরিষ্কারই করে না। নিমের হিতকর বিশেষ দ্রব্যগুণ দাঁত শক্ত করে, মাড়িকে রোগের ছোঁয়াচ থেকে বাঁচায়, মুখের দুর্গন্ধ দুর করে শ্বাস-প্রশ্বাসে এনে দেয় মিষ্টি সুবাস।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল-এর তৈরী।

গল্প-ভারতী

GALPA-BHARATI

মাঘ ১৩৭৭, FEBRUARY, 1971

দ্বাত্রিংশতি-বর্ষ

সম্পাদক : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

সহঃ সম্পাদক : কল্যাণ রায়

মূল্য : এক টাকা

বার্ষিক : পনের টাকা

শ্রীগোল বিহারী দত্ত কর্তৃক ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও কল্পনা প্রেস প্রাঃ লিঃ

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas

Ex. Judge, Calcutta High Court,
Ex-Law Member, Govt. of India

আমি লক্ষ্মী-ঘিই ব্যবহার করি। অন্য ঘিয়ের তুলনায় এঘি অনেক ভাল ও বিশুদ্ধ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সত্যেন মজুমদার
সম্পাদক—আনন্দবাজার-পত্রিকা

লক্ষ্মী ঘি ব্যবহার করে আমার বেশ ভাল লেগেছে। এটা সত্যিই ঘি।

—শিশিরকুমার ভাদুড়ি

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল ঘিনিষ।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই ভেজালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—দৈনিক বসুমতী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজারে প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক ভাল। ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

শ্রীসীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখরোচক হয়।

শ্রীশান্তা দেবী

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়		৭৩৯
সেকালের সভা সমিতি		৭৪০
বিংশ শতাব্দীর-সভ্যতা		৭৪১
কার্টুন		৭৪৩
কিছু রঙ কিছু বেরঙ (ধারাবাহিক উপন্যাস)	—বিমল মিত্র	৭৪৬
ফিরে ফিরে চাই (স্মৃতিচারণ)	—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	৭৫৩
আবার সেই জেল (আত্মকথা)	—দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়	৭৫৯

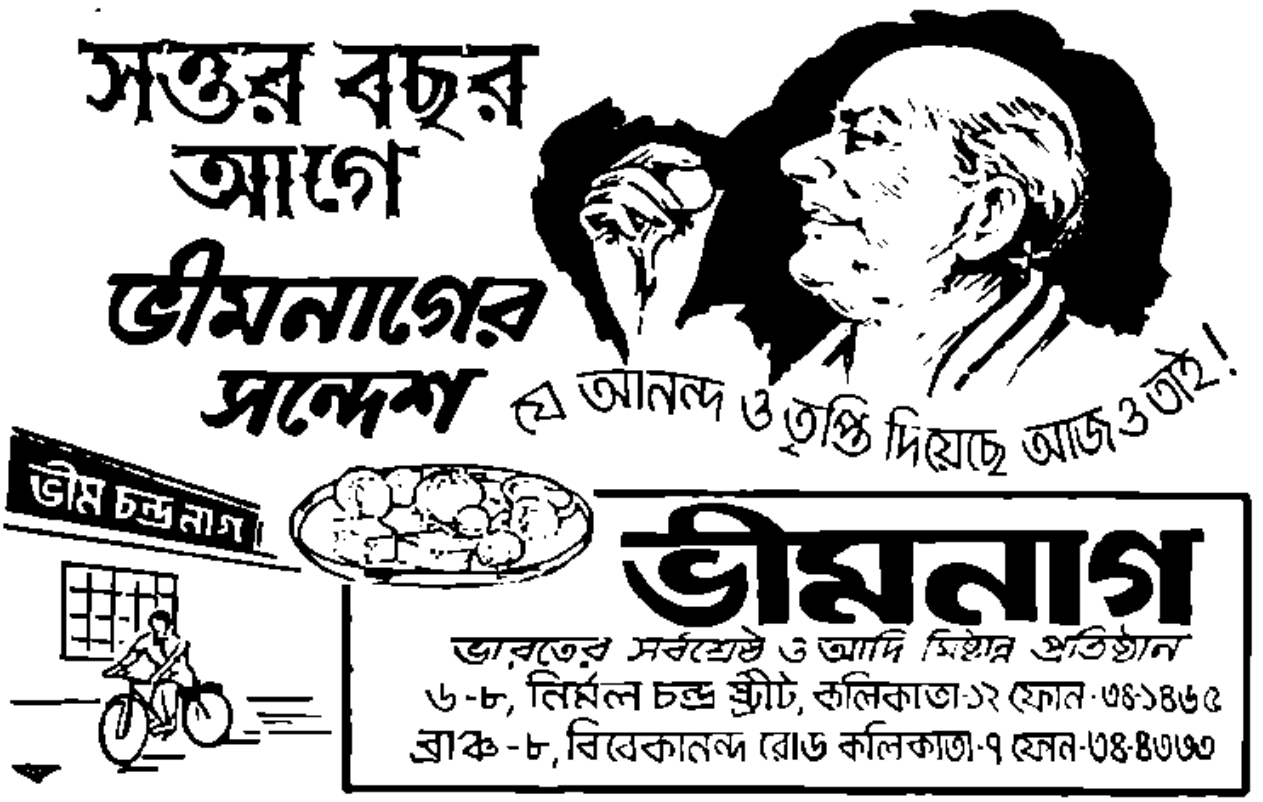

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

পশ্চিমবঙ্গ

বিজ্ঞাপন প্রচারের উপযুক্ত মাধ্যম

বিজ্ঞাপনের হার	
তৃতীয় প্রচ্ছদ	২০০ টাকা
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১২৫ ,,
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	৭৫ ,,

বিজ্ঞাপন প্রচারের শর্তাবলী সম্পর্কে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

বিজনেস্ ম্যানেজার, তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার, রাইটার্স বিল্ডিংস্, কলিকাতা-১

প: বি: (তথ্য ও জনসংযোগ) বিঃ ১৮৮।৭১

একটি বিশ্বস্তযোগ্য কেশ তৈল

বেঙ্গল কেমিক্যালের

ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল

কেশতৈলে সম্পূর্ণ ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল ব্যবহারে
অনিবার্য কেশ-কোমল ও ঘন কৃষ্ণ চুলের সৌন্দর্যে ও
মনোরম আকর্ষণে এ চুল পরে যে কোনো সভাতে সমাদৃত
হবেন।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই

কানপুর • দিল্লী

এই সংখ্যায়

জীবন-নাট্যের খণ্ডচিত্র		
মাইকেল মধুসূদনের অন্ত কথা	—অনাথ উপাধ্যায়	৭৬৭
যে কাহিনী চিরকালের		
ম্যাকবেথ : শেকস্‌পিয়র	—সুজন রায়	৭৬৯
সহযাত্রী (গল্প)	—আশীষ গুপ্ত	৭৭৭
নাটমঞ্চ	—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৭৮৬
খেলাধূলা	—জ্যোতির্ময়	৭৯৬
খবরের গল্প	—ডাকহরকরা	৭৯৯

বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী
সন্দেশ বিক্রেতা
সিমলার বিখ্যাত
বিনোদ বিহারী নাগ
গণেশ চন্দ্র দত্ত

শাখা :
৫/৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন : ১৩-১৮৯৯
১৮, যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ,
কলিকাতা: ৬

হেড অফিস : ৫৬ ২, রামদুলাল সরকার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন : ৫৫-১৪৫০

গম দিয়ে আটা হয়, ময়দা হয়, সুজি হয়, আর হয় দালিয়া।
দালিয়াকে বলে Wheat Rice.

দালিয়া দিয়ে ভাত হয়, খিচুরী হয় আরো কত কি!
যেমন খেতে ভাল, তেমন ভাল গুণে, অথচ সস্তা।

একেবারে টাট্‌কা আর জীবনী শক্তিতে ভরপুর। এই ভেজাল আর দুর্মূল্যের দিন একবার ব্যবহার করে দেখুন না।

অন্নপূর্ণা আটা ভাণ্ডার

৮৫।১এ, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পল্লী-ভারতী

- আষাঢ় মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ।
- যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়।
- বার্ষিক চাঁদার হার সডাক ১৫৲ টাকা।
- বার্ষিক গ্রাহকগণ কোন অতিরিক্ত মূল্য না দিয়াও পূজা ও অন্যান্য বিশেষ সংখ্যাগুলি পাইয়া থাকেন।

আজই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন

প্রতি মাসে গ্রাহকদিগের নিকট সার্টিফিকেট অব পোষ্টিংয়ে পত্রিকা পাঠান হয়। যথাসময়ে পত্রিকা যদি কেহ না পান, অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে, ব্যবস্থা করা হয়।
পত্রিকা বিক্রয়ের জন্য ভারতের সর্বত্র সহরে ও গ্রামে সম্ভ্রান্ত এজেন্ট আবশ্যক।
লেখকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক লেখার কপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন। অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয় না।

পল্লী-ভারতী

২৭৯ বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—৬
ফোন: ৫৩-২১৪ ও ৫৫-১৩৫৫

এই সংখ্যায়

●

এই প্রথম

নষ্টচন্দ্র (গল্প)	—তরু মুখোপাধ্যায়	৮০২
অপরাহ্নবতী (ধারাবাহিক উপন্যাস)	—সুবোধ সিংহ	৮০৯

● মেয়েদের মজলিস ●

সেলাই বাক্স	—বেলা দে	১
গৃহশ্রী-গৃহসজ্জা	—শৈল মিত্র	২
সংকলন : প্রবাদমালা	—শকুন্তলা	৩
ফুলদিয়ে ঘর সাজান	—স্মৃতিকণা বসু	৫
প্রেম ও রাধিকা	—শ্রীরূপা নন্দী	৭

অতুলনায় ঐতিহ্যপূর্ণ

বাংলার তাঁতবস্ত্র

উৎসবে এবং নিত্যপ্রয়োজনে ব্যবহার করুন

সমবায় সমিতিতে উৎপাদিত তাঁতবস্ত্রের প্রাপ্তিস্থান॥

★ দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল স্টেট হ্যাণ্ডলুম উইভার্স কো-অপারেটীভ সোসাইটী লিমিটেড
৬৭, বস্ত্রীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪, ও

শাখা কেন্দ্রসমূহ

★ গভর্ণমেণ্ট সেলস এম্পোরিয়ম : ৭/১, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
১২৮/১, বিধান সরণী, কলিকাতা ; ১৫৯/১/৫, রাসবিহারী এভেন্যু, কলিকাতা,
১৮/এ, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, (সাউথ), হাওড়া।

HOUSE OF NRM

NATIONAL RUBBER MANUFACTURERS LTD.

THE LARGEST MANUFACTURERS OF INDUSTRIAL RUBBER PRODUCTS

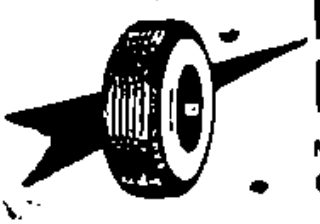

Inchek Tyres Limited

MANUFACTURERS OF TYRES FOR INDIAN ROADS AND CLIMATIC CONDITIONS.

CALCUTTA UNIVERSITY
CENTRAL LIBRARY

ষড়বিংশতি বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

দেশের স্বাধীনতালাভের জন্য যিনি আমৃত্যু জীবনপণ সংগ্রাম করে গেলেন, যিনি বাংলার শুধু বাংলার কেন, সারা ভারতের মানুষের কল্যাণ ও মুক্তির জন্য হবীচির মত সবস্ব দিয়ে গেলেন, সেই পুণ্যশ্লোক দেশপূজ্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের শতবার্ষিকী চলেছে। কিন্তু কি দুঃখ ও পরিতাপের কথা যে তাঁর অসামান্য দেশপ্রেমের ও মানবত্বের বিভিন্ন দিক নিয়ে রচিত তথ্যপূর্ণ সমগ্রোপযোগী আলোচনা দেশের—বিশেষ করে বাংলাদেশের কোন পত্র পত্রিকায় এখনও যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়নি বা তা নিয়ে কোন আন্দোলনও হল না! এর চেয়ে লজ্জার কথা আর কি হতে পারে!

আমাদের বাংলাদেশের মানুষের কথাই বলবো, আমরা দেশবন্ধুকে ভুলে যাচ্ছি।

গল্পভারতী বহুবার দেশবন্ধুকে স্মরণ করেছে। তাঁর মৃত্যুর পর অপরাজের জীবনীকার গল্পভারতীর ভূতপূর্ব সম্পাদক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় রচিত দেশবন্ধুর ধারাবাহিক জীবনকাহিনী বহুদিন ধরে গল্পভারতীতে প্রকাশিত হয়ে সারাদেশে যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল, তার দীপ্তি আজো ম্লান হয়ে যায়নি। তার পরও বিভিন্ন সময়ে দেশবন্ধুর অমর জীবনের নানা কথা ও কাহিনী গল্পভারতীতে প্রকাশিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও আমরা মনে করি, তাঁর শতবার্ষিকী উপলক্ষে, দেশবন্ধুর গৌরবোজ্জ্বল জীবনের অনেক অজানা কথা আজ দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

এই কর্তব্যবোধে এই মাস থেকেই আমরা তা আরম্ভ করলাম।

এই সূত্রে গল্পভারতীর অন্যতম ভূতপূর্ব সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা একটি সরস স্মৃতিকথা —"সিংহ ও শিয়ারকা লড়াই" এই সংখ্যায় অন্যত্র প্রকাশিত হল।

আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ লিখিত "রসরাজ চিত্তরঞ্জন"।

বিমলানন্দ মুখোপাধ্যায়

সেকালের সভা সমিতি

ঊনবিংশ শতকে বেশে বহু প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। তখন নব জাগরণের যুগ। প্রত্যেকের মধ্যেই ভারতমাতার শৃঙ্খল মোচনের ও প্রাচীন কুসংস্কারগুলি ত্যাগ করার প্রবণতা দেখা যায়। তখন এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির নামও অর্থদ্যোতক হইত।

সঞ্জীবনী সভা। ১৮৭৬

ঠনঠনের একটা পোড়ো বাড়িতে এই সভা বসিত। এ বাড়িতে পূর্বে নাকি একটি স্কুল ছিল শুনা যায়। বাড়ির মালিক কে বা কাহারা তাহা সভার উদ্যোক্তাদের কেহই জানিতেন না। সভার আসবাবপত্রের মধ্যে ছিল, ভাঙ্গা ছোট টেবিল একখানি, কয়েকখানা ভাঙ্গা চেয়ার ও আধখানা ছোট টানা-পাখা তাহাও আবার একদিক ঝুলিয়া পড়িয়াছিল।

জাতীয় হিতকর ও উন্নতিকর সমস্ত কার্যই এই সভায় অনুষ্ঠিত হইবে, ইহাই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। যেদিন নূতন কোনও সভ্য এই সভায় দীক্ষিত হইতেন, সেদিন অধ্যক্ষ মহাশয় লাল পট্টবস্ত্র পরিয়া সভায় আসিতেন। সভার নিয়মাবলী অনেকই ছিল, তাহার মধ্যে প্রধান ছিল, মন্ত্রগুপ্তি ; অর্থাৎ এ সভায় যাহা কথিত হইবে, যাহা কৃত হইবে, এবং যাহা শ্রুত হইবে, তাহা অ-সভ্যদের নিকট কখনও প্রকাশ করিবার কাহারও অধিকার ছিল না।

ইহার দীক্ষা অনুষ্ঠানে একটা ভীষণ গাম্ভীর্য ছিল। দীক্ষাকালে, নবদীক্ষার্থীর সর্বাঙ্গ একটা অজ্ঞাত ভাবাবেশে শিহরিয়া উঠিত। কারণ, আদি ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকাগার হইতে লাল রেশমে জড়ান বেদমন্ত্রের একখানা পুঁথি, এই সভায় আনিয়া রাখা হইয়াছিল। টেবিলের দুই পাশে দুইটি মড়ার মাথা থাকিত, তাহার দুইটি চক্ষু কোটরে দুইটি মোমবাতি বসান ছিল। মড়ার মাথাটি মৃত ভারতের সাংকেতিক চিহ্ন। বাতি দুইটি জ্বালাইবার অর্থ এই যে, মৃত ভারতের প্রাণ সঞ্চার করিতে হইবে ও তাঁহার জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এ ব্যাপারের ইহাই মূল কল্পনা। সভার প্রারম্ভে বেদমন্ত্র গীত হইত—"সংগচ্ছধ্বম্ সংবদধ্বম্।" সকলে সমস্বরে এই বেদমন্ত্র গান করার পর, সভার কার্য [অর্থাৎ কিনা গল্প-গুজব] আরম্ভ হইত। সঞ্জীবনী সভাকে সভ্যদের মধ্যে গুপ্ত ভাষায় "হাক্ পাখ্ হাক্" [হা ক্ ছ পা খ্ হা ক্] বলা হইত।

এই সভার প্রধান উদ্যোক্তা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। অধ্যক্ষ ছিলেন রাজনারায়ণ বসু। কিশোর রবীন্দ্রনাথও এ সভার সভ্য ছিলেন।

প্রথম প্রথম সভার কার্য ভাল ভাবেই চলিত। যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইত তাহা কখনই কার্যে পরিণত হইত না। কারণ সকল প্রস্তাবই উদ্ভট কল্পনা প্রসূত। একসময় সভায় প্রস্তাব গৃহীত হইল, ভারতবর্ষে সার্বজাতিক ঐক্য সাধন করিতে গেলে, একটা সার্বজনিক পোশাক হওয়া আবশ্যক। প্রস্তাব

পরিকল্পনায় গৃহীত হইল যে, মালকোঁচা মারিয়া কাপড় পরিলে যেমন হয়, ঐরূপ একটা পোশাক ও মাথায় যাহাতে রৌদ্র বৃষ্টি না লাগে এইরূপ একটা পোশাকি টুপির উপর পাগড়ি বসাইয়া একটা শিরস্ত্রাণ—এই বেশ সার্বজনীন পরিচ্ছদরূপে গৃহীত হইতে পারে।

যথাসময়ে পোষাক প্রস্তুত হইল। কিন্তু কে এ অভিনব পোশাক পরিয়া পথে বাহির হইবে। শেষে প্রস্তাবক জ্যোতিরিন্দ্রনাথই একদিন মধ্যাহ্নের প্রখর আলোকে সার্বজনিক ঐক্যসাধক এই পোশাক পরিয়া কলিকাতা শহর ঘুরিয়া আসিলেন। লোকে এ পোশাকের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বুঝিল না কেবল পরিহাস বিদ্রূপই করিল।

দেশে শিল্প বাণিজ্যের কল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার প্রতি সভা বিশেষ মনোযোগী হইল। সর্বপ্রথম দিয়াশলাইয়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইল। বহু আয়াসে ও অর্থ ব্যয়ে কয়েক বাক্স দিয়াশলাই প্রস্তুত হইল বটে, কিন্তু সে পদার্থ সাধারণের পক্ষে ক্রয়সাধ্য বা ব্যবহারের মোটেই উপযোগী হইল না। লোকে এই দিয়াশলাই মোটেই পছন্দ করিল না। তখন সভ্যগণ দেশের অন্য কোন মঙ্গলকর কার্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত বিবেচনা করিয়া নূতন কাপড়ের কল আনানো হইল। সভ্যদের উৎসাহ বাড়িল। অনেক পরিকল্পনা হইল,—আরও নূতন কল বসাইতে হইবে, বাড়ি তৈয়ারী করিতে হইবে ইত্যাদি। অবশেষে সভা প্রতিষ্ঠিত এই নূতন কলে একদিন একখানি গামছা প্রস্তুত হইল। সভার অন্যতম সভ্য ব্রজবাবু সেই গামছাখানি মাথায় বাঁধিয়া উন্মত্তের মত তাণ্ডব নৃত্য শুরু করিয়া দিলেন। সভার সে এক স্মরণীয় দিন! একে একে প্রায় সকল সভ্যই শেষে তাঁহার সঙ্গে নৃত্যে যোগ দিলেন। তারপর কল উঠিয়া গেল। এই গামছাখানি ছাড়া, অন্য আর কিছুই সে কলে প্রস্তুত হয় নাই।

এই সঞ্জীবনী সভার সভ্যগণের মধ্যে জাতিবর্ণ নির্বিচারে আহারেরও একটি বিধি ছিল। সভার মধ্যে নানা জাতি বর্ণের লোক ছিল, কুলীন ব্রাহ্মণ হইতে শুঁড়ি পর্যন্ত।

সঞ্জীবনী সভায় শিল্প বাণিজ্যের কল প্রস্তুত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কথায়, আমাদের এক বাক্স দেয়াশলাই তৈরী করিতে যে খরচ পড়িতে লাগিল তাহাতে একটা পল্লীর সহৎসরের চুলা-ধরানো চলিত। কাপড় কল সম্পর্কে বলিয়াছেন, সেটা কোনো কাজের জিনিস হইতেছে কিনা তাহা কিছুমাত্র বুঝিবার শক্তি আমাদের কাহারও ছিল না—কিন্তু বিশ্বাস করিবার ও আশা করিবার শক্তিতে আমরা কাহারো চেয়ে খাটো ছিলাম না।

এই সময় করিতে সভার প্রচুর দেনা হইল। পরে তাহা শোধও হইল। আনন্দের কথা যে সে সময় দুটি একটি সুবুদ্ধি সম্পন্ন লোক আসিয়া সঞ্জীবনী সভার হলে ভিড়িলেন, অন্যান্য সভ্যদিগকে জ্ঞান বৃক্ষের ফল খাওয়াইলেন এবং এই স্বর্গলোক ভাঙিয়া গেল।

বিংশ-শতাব্দীর সভ্যতা

প্রতি বৎসর জগৎ থেকে প্রায় চার কোটি লোক খাদ্যের অভাবে মারা যায়।

অথচ মানুষ মানুষকে মেরে ফেলবার জন্যে বছরে বছরে কোটি কোটি টাকা নিয়মিত খরচ করে।

প্রসবের সময় যাতে নারী কোন যন্ত্রণা না অনুভব করে সুপ্রসব করে তার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, অথচ সেই গবেষণাগারের পাশের ঘরে আর দল বৈজ্ঞানিক আপ্রাণ চেষ্টা করছেন কি করে বিজ্ঞানের সাহায্যে সব চেয়ে কম সময়ে সব চেয়ে বেশী লোককে হত্যা করা যায়।

জগতের প্রত্যেক শক্তিশালী রাষ্ট্রের নায়ক দু'বেলা তারস্বরে ঘোষণা করছেন তাঁরা জগতের শান্তি চান, অথচ যুদ্ধ থামে না, (Cold war) ঠাণ্ডা লড়াই লেগেই আছে।

প্রতি বৎসর প্রত্যেক সভ্যরাষ্ট্র সকলের চেয়ে বেশী টাকা খরচ করে মানুষ মারা অস্ত্র তৈরীর জন্য।

'দেশের সেবা'র নামে ক্ষমতা লাভের প্রতিযোগিতায় হত্যাকাণ্ডের তাণ্ডব লীলা চলছে সর্বত্র।

—এই বিরাট নৈতিক আত্মপ্রবঞ্চনার নাম 'বিংশ-শতাব্দীর সভ্যতা'।

আমরা বেশ আছি!

আজকের নেতা· · · ·

ইচ্ছে তো অনেক কিছুই ছিল.....

কিন্তু শেষে দাঁড়াল.....

কিছু রঙ কিছু বেরঙ

ধারাবাহিক উপন্যাস

বিমল মিত্র

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ ৬ ॥

কিন্তু সংসারে এমন অনেক লোক থাকে যারা বাস্তব জীবনের সব রকম গুণকে দোষ বলে কীর্তন করে। একদিকে নিজেরা যেমন আত্ম-যন্ত্রনা পায় তেমনি পরকে যন্ত্রণা দিয়ে আরো অনেক অন্যায় নিন্দ থেকেও বঞ্চিত হয়। জগতে এদের সংখ্যাও খুব কম নয়।

এমনি একজন মানুষই হলেন নিবারণ চক্রবর্তী।

কথাটা লোক-মুখে শুনেছিলেন। কিন্তু প্রথমে বিশ্বাস হয়নি। বারোয়ারিতলায় কথাটা শুনেই রুখে উঠলেন।

বললেন—কে? কাকে বাড়িতে রেখেছে? সুখময়ীকে? শ্যামাপদ সরকারের মেয়েমানুষকে?

বলাই বললে—হ্যাঁ ঠাকুর-মশাই,—

এমন মুখরোচক সংবাদটাকে সহজে ঢোঁক গিলে সহ্য করা যায় না। এ মুখে দিয়ে ভাব টবার মত সংবাদ।

বললেন—তুই ঠিক জানিস?

শুধু বলাই একলা নয়।

শুকদেব বললে—টাকার গরম হয়েছে খুড়োমশাই,—

কেদার বললে—কিন্তু খুড়োমশাই, কাজটা মাষ্টার ভালো করেনি, পেরথম বাড়িতে বাজারের মেয়েমানু ষকানো কি ভালো হয়েছে?

আর থাকতে পারলেন না নিবারণ চক্রবর্তী। উঠলেন। হুঁকোটা হাতে নিয়ে বাড়ির দিকে যাবা জেই উঠলেন। কিন্তু লোকে আসুক তিনি বাড়িতেই গেলেন। তাঁর আসল গন্তব্য-স্থলটি সন্তাপহর বাড়ি।

উঠোনের মধ্যে ঢুকেই ডাকলেন—বৌমা—

লক্ষ্মী রান্নাঘরে ছিল, কিন্তু তার আগেই শোওয়ার ঘরের দাওয়ার ওপর বেরিয়ে এল সুখময়ী।

সুখময়ী তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা দিয়ে দিয়েছে। বললে—মাস্টার মশাই আমাকে এখানে এনে তুলেছেন—

নিবারণ চক্রবর্তী অবাক হয়ে বললেন—তাই নাকি, খুব ভালো, খুব ভালো, তুমি বেঁচে গেলে, তা এখানেই এখন থাকবে নাকি তুমি?

সুখময়ী বললে—যতদিন মাস্টার-মশাই রাখেন আমাকে ততদিন থাকবো—

—বেশ বেশ, ভালো ভালো, এখানেই থাকো তুমি। আর কোথায়ই বা যাবে তুমি। তোমার তো ত্রিভুবনে কেউ নেই!

—আজ্ঞে, না ঠাকুর-মশাই, আমার কেউ নেই—

—আহা, তাই তো বলি, শাস্ত্রে আছে মেয়েমানুষের চরিত্র আর পুরুষ-মানুষের ভাগ্য দেবতারাও জানতে পারে না। অথচ তুমি শ্যামনগরে কত আয়েসে ছিলে বল দিকিনি। আমি তো দেখেছি, সরকার মশাই তোমার কোনও দুঃখু রাখেনি। তাঁর মত লোকের সুনজরে পড়ে গিয়েছিলে তুমি, এ ক'জনের ভাগ্যে ঘটে বলো দিকিনি সুখময়ী? তুমি নামেও সুখময়ী, কাজেও সুখময়ী—তোমার মতন সুখ ক'জনের হয় বলো তো?

সুখময়ীর চোখ দু'টো ছল-ছল করে উঠলো। যেন আর একটু সহানুভূতির কথা শুনলেই সে কেঁদে ফেলবে!

ধরা গলাতেই বলে উঠলো—কিন্তু কেন এমন হলো বলুন তো ঠাকুর-মশাই, আমি কী এমন পাপ করেছিলুম, কোন্ পাপে আমার এমন সর্বোনাশ হলো?

বলতে বলতে সুখময়ী ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেললে।

নিবারণ চক্রবর্তী মশাই বললেন—পাপ, পাপের কথা বলছো সুখময়ী? তোমার মুখে পাপের কথা শুনলে পরম পাপীর মুখেও যে হাসি বেরোবে! পাপের কথা তুমি আর ও-মুখে উচ্চারণ কোর না সুখময়ী, তাতে আরো পাপ হবে—তা জানো?

তারপর একটু থেমে বললেন—আর সর্বোনাশের কথা যে বলছো, সর্বোনাশ কি একলা তোমারই হয়েছে? দেশ সুদ্ধু লোকের যে সর্বোনাশ হয়েছে, তাদের বেলায়? তুমি একলাই তো আর পাপ করোনি, খুঁজে দেখলে দেখতে পাবে তারাও পাপ করেছে—

সুখময়ী বললে—মেয়েমানুষ হয়ে জন্মানোই আমার পাপ হয়েছে ঠাকুর-মশাই—

চক্রবর্তী মশাই বললেন—কী পাপ তুমি করেছ তা তুমিই জানো, তোমার মনকে জিজ্ঞেস করে ভাখো, তাহলেই জানতে পারবে! আর তা ছাড়া শুধু কি এ-জন্মের পাপ? পূর্ব-জন্মেও নিশ্চয় কিছু পাপ করেছিলে—

তারপর বললেন—যাক্ গে, বৌমা কোথায় গেলে গো, ও বৌমা—

লক্ষ্মী উঠোনের কোণের রান্নাঘর থেকে মাথায় ঘোমটা টেনে বেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়ালো।

—বৌমা, তোমার হাত খালি হলে, একটু খুড়িমার বাড়িতে এসো তো—একটা কথা আছে—বলেই বাইরে চলে এলেন।

কী কথা, কেমন কথা, কিছুই খুড়োমশাই বলে গেলেন না। লক্ষ্মী কিছুক্ষণ চুপ করে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। তারপর একবার সুখময়ীর দিকে চেয়ে আবার তার রান্নাঘরের দিকে ঢুকে গেল।

আস্তে আস্তে ক'দিনের মধ্যেই বারোয়ারিতলার বাস্তুহারাদের ভিড় কমে গেল। তারপর ঠিক আগেকার মত ফাঁকাও হয়ে গেল। একদিন শশীপদ হল-ঘর নিয়ে ওদের খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করেছে। সবাই বাড়ি-বাড়ি গিয়ে চাল-ডাল চেয়ে নিয়ে এসেছে। তারপর যখন শেষ প্রাণীটা পর্যন্ত একটা ভিন্ন আশ্রয় চেয়ে নিয়েছে তখন খানিকটা নিশ্চিন্ত হলো শশীপদরা।

কিন্তু সেদিন যখন রাত্রের দিকে হঠাৎ লক্ষ্মী একটা বললে তখন শশীপদ'র মাথাটা কেমন ঘুরে গেল।

শশীপদ জিজ্ঞেস করলে—কেন, সুখময়ীকে বিদায় করে দেব কেন?

লক্ষ্মী বললে—না ও ভালো মেয়েমানুষ নয়—

—ভালো মেয়েমানুষ নয় মানে?

লক্ষ্মী বললে—ভালো মেয়েমানুষ নয় বললে যা বোঝ, তাই। ওকে এখানে এ-বাড়িতে আর রেখো না—

শশী বললে—কে তোমাকে বললে এ-সব কথা শুনি?

—যেই বলুক, এখানে দিদিকে রাখা ঠিক নয়। গাঁয়ের লোকে নানা কথা বলছে?

—গাঁয়ের লোক? গাঁয়ের লোক মানে? নাম বলো গাঁয়ের কোন লোক?

লক্ষ্মী বললে—কিন্তু তুমিই বা জেনে-শুনে অমন নিচু জাতের মেয়েমানুষকে ঘরে আনলে?

—নিচু জাতের মানে কী? মানুষ কি নিচু জাত? আর যদি নিচু জাত হয়েই থাকে তা তুমি তো জানো আমি জাত-টাত মানি না। তোমরা যাকে নিচু জাত বলো আমি সেই হাড়ি-মুচি-ডোমের সঙ্গেও এক সারিতে বসে খেতে পারি।

লক্ষ্মী বললে—আমি তো তা বলছি না, আমি বলছি দিদির স্বভাব চরিত্র ভালো নয়।

—স্বভাব চরিত্র?

শশীপদ সেই বিছানায় শোওয়া-অবস্থাতেই উত্তেজিত হয়ে উঠলো। বললে—কে তোমাকে এ-সব কথা বলেছে? বলো, কে বলেছে? আমি জানতে চাই কে এ-সব কথা তোমায় বলে?

লক্ষ্মী বালিশের ওপর মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগলো।

শশীপদ আবার জিজ্ঞেস করলে—বলো! বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদলে চলবে না। তোমাকে বলতে হবে কে এ-সব কথা তোমায় কানে তোলে! আর যদি কেউ বলেই বা তো তুমি বলতে পারো না তুমি এ-সব মানো না? স্বভাব-চরিত্র যদি কারো খারাপই হয় তো সে কি তার গায়ে লেখা থাকে? মানুষের বিপদের দিনে তার বিপদের দিকটা দেখবো না তার স্বভাব চরিত্রটা দেখবো?

লক্ষ্মী কাঁদতে কাঁদতে বললে—কিন্তু আমারও তো ছেলে-মেয়ে আছে! আমারও তো মেয়ের বিয়ে দিতে হবে—

শশীপদ বললে—মেয়ের বিয়ে যখন দিতে হবে তখন আমি বুঝবো। মেয়ের বিয়ের দায়িত্ব শুধু তোমার একলার দায়িত্ব নয়। আমারও সে-ব্যাপারে একটা দায়িত্ব আছে। বুলু যেমন একদিকে তোমার মেয়ে, অন্যদিকে আমারও মেয়ে তো সে!

—কিন্তু আমার যে গাঁয়ের কথা শুনে ভয় করে!

শশীপদ বললে—কেন, কীসের ভয় তোমার?

লক্ষ্মী বললে—তাহলে ভগবানের কাছে আমি কী বলবো? আমি কী বলে অভাবদিদি করবো ভগবানের কাছে?

শশীপদ বললে—রেখে দাও তোমার ভগবান, এই যে হাজার-হাজার লোক জায়নগরের দিক থেকে ভিটে-মাটি ছেড়ে এক কাপড়ে এপারে চলে এলো, ওদের বুঝি ভগবান ছিল না! ওরা বুঝি তোমার মতন ভগবানকে মন দিয়ে ডাকেনি? ভগবান বুঝি তোমারই একচেটে সম্পত্তি? তাহলে ওরা কেন ওদের সব কিছু খুইয়ে এমন করে এখানে এসে পরের বাড়ির গলগ্রহ হয়ে রয়েছে? তোমার ভগবানের কাছে ওরা কী অপরাধ করেছিল?

লক্ষ্মী বললে—আমি মুখ্যু মানুষ, অত সব আমি বুঝি না, আমাকে তুমি মণিরামপুরে পাঠিয়ে দাও।

—সেখানে গিয়ে তুমি যাবে কী? থাকবে কোথায়? কে তোমার দেখাশোনা করবে? সেখানে আছে কে তোমার যে তোমাদের তিন জনকে দেখবে?

লক্ষ্মী বলল—কিন্তু আমি তোমাকে বলছি এখেনে আর আমি থাকতে পারবো না কালই আমাকে মণিরামপুরে পাঠিয়ে দাও তুমি—

শশীর কেমন যেন রাগ হয়ে গেল।

বললে—কাল কেন এখুনি তুমি চলে যাও—এখন থেকে চাইলে এখুনি তোমাকে পাঠিয়ে দিতে পারি—যাবে?

লক্ষ্মী চুপ করে রইল খানিকক্ষণ।

শশীপদ আবার বললে—কই, কথা বলছো না, যে? যাবে?

লক্ষ্মী বলে উঠলো—তুমি সব সময় আমার সঙ্গে অমন করে কথা বলো কেন বলো তো? আমি কী করেছি তোমার কাছে?

বলে আর কথা না বলে পাশ ফিরে শুলো। শশীপদও লাথি দিয়ে হাড়-ভাঙা খাটুনির পর ক্লান্ত হয়ে পাশ ফিরে ঘুমোবার চেষ্টা করতে পেরে যেন বেঁচে গেল।

কিন্তু ভোর বেলা ঘুম ভেঙে উঠেই অবাক হয়ে গেল শশীপদ। বরাবর ঘুম থেকে ভোর বেলাই ওঠে শশীপদ। লক্ষ্মীও ওঠে। শশীপদর আগেই ওঠে। উঠেই তাকে উঠোনে গোবর নিকোতে হয়। তারপর ধান সেদ্ধ করা আছে। সেই ধান সেদ্ধ করে শুকোতে দিতে হয় রোদ্দুরে। তারপর আগের দিনের ধান ভেঁকিতে পাড় দিয়ে কুটতে হয়। সেই চাল দিয়ে সেদিনের ভাত রান্না হয়।

শশীপদ ভেঁকির শব্দ শুনতে পায় বিছানায় শুয়ে শুয়ে। তারপর কিছুক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ দিয়ে এক সময় তড়াক করে উঠে পড়ে। কদমতলীর সব বাড়িতেই তখন একই অবস্থা। যারা ক্ষেত-খামারে যাবে তাদের জন্যে পান্তা-ভাত তৈরি থাকে। রাত থাকতেই খেয়ে নিতে হয়। কদমতলীর মানুষের জীবন-যাত্রা সুরু হয় পুবের আকাশে সূর্য ওঠবার অনেক আগে।

কিন্তু সেদিন শশীপদর মনে হলো বাড়িটা যেন নিস্তব্ধ। কোথাও কোনও শব্দ কিংবা সাড়াশব্দ নেই। যেন নিস্তব্ধি রাত। অথচ পাশের বাগবাড়ের ডাল থেকে কয়েকটা পাখি শব্দ করতে করতে কোন্‌দিকে উড়ে যাচ্ছে। তবে কি শশীপদর ঘুম ভাঙতে দেরি হয়ে গেছে নাকি?

তাড়াতাড়ি পুবের দিকের ছোট জানালাটি খুলে দিতেই আবছা পাতলা আলোর একটা আভাস

ঘরের ভেতর ঢুকলো। সেই আলোতে বিছানার ওপর নজর পড়তেই দেখলে ঘরের বিছানায় বুলু টুলু কেউ নেই। তারপর কেমন অবাক হয়ে গেল দরজাটার দিকে চেয়ে। রাত্রে শোবার আগে ওটাতে তো হুড়কো দিয়েই শুয়েছিল সে। কিন্তু তখন সেটা খোলা। তবে কি লক্ষ্মী বাহিরে বেরিয়ে গেছে? কিন্তু বুলু টুলুকে নিয়ে কোথায় গেল? তাদের নিয়ে গেল কেন? তবে কি ভোর-রাত্রেই মণিরামপুরে চলে গেল।

কথাটা মনে হতেই আগের রাত্রের ঝগড়ার ঘটনাটিও মনে পড়লো। তারপর দরজা দিয়ে বাইরের দাওয়ায় গিয়ে দাঁড়ালো।

না, উঠোনে তখন গোবর-ছিটে পড়েনি। বাসি দাওয়া বাসি উঠোন। উঠোনের দক্ষিণের সদর দরজাটাও আধ ভেজানো।

শশীপদ পাশের সুখমতীর ঘরটার দিকে চেয়ে দেখলে। সুখমতী তখনও বোধহয় ঘুম থেকে ওঠেনি। ভেতর থেকে তার দরজা বন্ধ।

শশীপদর মাথাটা কেমন ঘুরে গেল।

সুখমতীর দরজায় গিয়ে আস্তে আস্তে ধাক্কা দিল।

—ও সুখমতী, সুখমতী—

সুখমতীর দরজা খুলতে একটু দেরি হলো। খানিকক্ষণ পরে বেরিয়ে এসে বললে—কী দাদা, কী হয়েছে?

শশীপদ বললে—লক্ষ্মী কোথায় গেল, জানো তুমি?

—বউ?

সুখমতীও অবাক। বললে—বউ আবার কোথায় যাবে দাদা? এখানেই কোথাও আছে বোধহয়—

শশীপদ বললে—কিন্তু বুলু টুলু, তারাও তো কেউ নেই কোথাও!

সুখমতী বললে—কিন্তু যাবে আর কোথায়?

শশীপদ বললে—মণিরামপুরে চলে গেল না তো! কাল রাত্তিরে তো বলছিল মণিরামপুরে চলে যাবে। কিন্তু বলা-নেই কওয়া-নেই, মণিরামপুরে যাবেই বা কার সঙ্গে—

—মণিরামপুর? মণিরামপুরে কে থাকে?

শশী বললে—আমার শ্বশুরবাড়ি—

বলে আর সেখানে দাঁড়ালো না। আবার নিজের ঘরের ভেতরে গিয়ে ঢুকলো। সুখমতী সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খানিকটা যেন ঘটনাটা আন্দাজ করবার চেষ্টা করতে লাগলো। কাল রাত্রে অনেকক্ষণ ধরে শশীপদদের শোবার ঘরে কথা কাটাকাটির শব্দ কানে এসেছে। ঝগড়ার মত আওয়াজ।

খানিক পরেই শশীপদ গায়ে জামা চড়িয়ে বেরিয়ে এল। মুখের চেহারাটা গম্ভীর গম্ভীর।

সুখমতী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শশীপদকে দেখছিল। শেষকালে শশীপদ জুতো জোড়াও পায়ে গলিয়ে নিলে। নিয়ে দাওয়া থেকে উঠোনের দিকে নামলো। সদরের দিকে যেতে যেতে একবার পেছন ফিরে বললে—সদর-দরজাটা একবার বন্ধ করে দাও সুখমতী, আমার ফিরতে একটু দেরি হবে—

সুখমতী একবার শুধু শুধনো গলায় জিজ্ঞেস করলে—কোথাও চললে নাকি দাদা?

শশীপদ বললে—হ্যাঁ, একবার মণিরামপুরের দিকেই যাচ্ছি—

সুখমতী বললে—কিন্তু তাহলে তো অনেক দেরি হবে তোমার ফিরতে—

শশীপদ বললে—হ্যাঁ, যেতে তো সময় লাগবেই এখান থেকে কুড়ি মাইল রাস্তা, সেখানে পৌঁছতেই বেলা হয়ে যাবে। তবে তাড়াতাড়ি খেলে হয়ত পথেই ধরে ফেলবো তাদের—তুমি রান্নাঘরে যা-কিছু আছে,—যেখেজনে নিয়ে ভাতে-ভাত ফুটিয়ে নিয়ো, আমি ততক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবো—

বলে সদর দরজা পেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়লো।

হাজার কাজের মধ্যে শশীপদ আগে কখনও এমন করে লক্ষ্মীর কথা ভাবেনি। সারা জীবন বাইরের কাজের মধ্যে নিজের দায়িত্ব-বোধের সীমা সঙ্কুচিত করে রেখেছিল। এই প্রথম যেন তার স্ত্রীর কথা মনে পড়তে লাগলো। সন্তান-সন্ততির কথা মনে পড়তে লাগলো। যেটা একদিন পরম বোঝা বলে মনে করেছিল শশীপদ সেইটের অভাবই যেন তাকে বড় নিঃস্ব করে ছেড়ে দিলে। একেবারে পুরোপুরি নিঃস্ব। এতদিনে মনে হলো যে-মাটির ওপর সে এতদিন আশ্রয় নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিল, আজ প্রথম তার গুরুত্ব সে উপলব্ধি করতে পারলে। তার মনে হলো এখন সেই মাটির আশ্রয়টুকুও তার পায়ের তলা থেকে ঘুরে সরে চলে গেছে।

রাস্তার দুপাশে বাড়িটিতে গাছের জোপ জাড়। একটা ছাড়া সকলে গাছ তার মস্ত শুড়িটা নিয়ে রাস্তার ওপর এসে নিজের অধিকার বিস্তার করতে চাইছিল। সেটা এড়িয়ে শশীপদ বাঁ দিকে সরে মুহূর্ত পরামানিকের ভিটের পাশ দিয়ে লাফিয়ে তাহার ওপর গিয়ে দাঁড়ালো। বর্ষার জল যবে রাস্তার ওপর জমে পুকুরের সৃষ্টি করেছিল, সে জল তখনও শুকোয়নি। যারা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় তারা ওটা ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে চলে। এখন জলটা শুকিয়ে শুকিয়ে ছোট গর্ততে পরিণত হয়েছে। কিন্তু একেবারে শুকোয়নি। শশীপদর মনে হলো এইখান দিয়েই তো লক্ষ্মী গেছে। বুলু টুলুকে নিয়ে এটা কেমন করে পার হয়েছে কে জানে। অথচ গাঁয়ের কারোর এতটুকু হুঁশ নেই। দু'চার কোদাল মাটি ফেলে দিলেই রাস্তাটা সুগম হয়ে ওঠে। কারোরই অসুবিধে হয়না আর। কিন্তু কে করবে? কার গরজ?

হঠাৎ পেছন থেকে চক্রবর্তী— মশাই—এই গলা শোনা গেল।

—কে? শশী নাকি?

শশীপদ পেছন ফিরলে। বললেন—আজ্ঞে, আমি খুড়োমশাই—

চক্রবর্তী মশাই বললে—এত সকালে কোথায় চলেছ? খেতে?

—আজ্ঞে, না—

কিন্তু কথাটা খুলে বলতেও যেন লজ্জা হলো শশীপদর। বাড়ি থেকে বউ পালিয়ে যাবার ঘটনাটা খুড়োমশাইকে বললে এখুনি সারা গ্রামে টি টি পড়ে যাবে।

কিন্তু চক্রবর্তী মশাই নিজেই কথাটা তুললেন।

বললেন—বৌমার সঙ্গে বুঝি আবার ঝগড়া করেছিল?

শশীপদ বললেন—ঝগড়া ঠিক নয়…

—ঝগড়া ঠিক নয়, তবে ঝগড়ার মতন?

শশী বললে—আজ্ঞে খুড়োমশাই, তাও না—

—তা-ও না বললেই হলো? আমি কিছু শুনিনি বলতে চাস? নিজের বাপকে তো সারা জীবন জ্বালিয়েছিলি, এখন পরের বাড়ির একটা অবলা মেয়েকেও জ্বালাতে শুরু করেছিস?

শশী বললে—আজ্ঞে, আমি কেন জ্বালাবো, আপনার বৌমাই বরং…

—বৌমাই বরং তোকে জানাচ্ছে। তা অতই যদি জানা তো এখন আবার সেই বৌ-এর খোঁজ করতে যাচ্ছিস কেন?

শশীপদর কেমন যেন সন্দেহ হলো হঠাৎ। খুড়োমশাই এত কথা জানলো কী করে?

বললে আপনি কি ওদের দেখেছেন নাকি খুড়োমশাই? আমার বুলু-টুলু। তাদেরও সঙ্গে করে নিয়ে গেছে—

চক্রবর্তী মশাই বললে—তা নিয়ে যাবে না তো কী করবে? তুই মরবারী এক মেয়েকে নিয়ে বাড়িতে তুলবি আর সে সতী-লক্ষ্মী বউ হয়ে কেমন করে সেই বাড়িতে তোর সঙ্গে থাকে? তারও তো ধর্ম বলে একটা জিনিষ আছে!

শশীপদ বললে—তাহলে কি বুলু টুলুরা আপনার বাড়িতেই আছে নাকি খুড়োমশাই? বলুন না খুড়োমশাই আমি বড় ভাবনায় পড়েছি···

নিবারণ চক্রবর্তীমশাই গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন—আমি কেন বলতে যাবো রে চারামজাদা? যখন বৌ-এর সঙ্গে ঝগড়া করেছিলি তখন কি আমায় জিজ্ঞেস করে করেছিলি যে এখন বলবো? যা, তুই যেখানে যাচ্ছিলি যা—

(ক্রমশঃ)

নাটমঞ্চের সেবাংশ

ক্যালকেমিকো ইনষ্টিটিউট কর্তৃক "রাহুমুক্ত" অভিনীত

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ত্যাপরাজ হলে ক্যালকেমিকো ইনষ্টিটিউটের সারস্বত সম্মেলন উপলক্ষে সংস্থার সভ্যবৃন্দ কর্তৃক বীরু মুখোপাধ্যায় রচিত "রাহুমুক্ত" নাটকটির অভিনয় হয়। বহু অভিনীত এই নাটকটি ঐদিন পরিবেশনার গুনে পরিতৃপ্ত মন নিয়েই প্রেক্ষাগৃহ ছেড়ে ছিলেন সমবেত অভ্যাগতেরা। পরিচালক আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় এই যুগপযোগী নাটকটি খুবই কৃতিত্বের সঙ্গে উপস্থাপনা করেন। সংগ্রাম সিংহ, অধীশ সিংহ, পুণ্ডরীক, ভীম এবং চৌধুরী চরিত্রে দর্শকমন জয় করেছিলেন যথাক্রমে সত্যব্রত মৌলিক, মুকুন্দমোহন ভৌমিক, তপেন সাহিড়ী, নিমাই মণ্ডল, এবং তারাপদ মুখোপাধ্যায়। অন্যান্য ভূমিকায় সু-অভিনয় করেন ব্রজগোপাল দে, বলরাম ঘাটোয়া, উমাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, নিত্যানন্দ অধিকারী, রণজিত দাশ গুপ্ত, বাপি সিংহ, তারামোহন চক্রবর্তী, মণীন্দ্র চিত্রকর, অমলেন্দু বিকাশ রায় এবং সুধাময় মজুমদার। স্ত্রী চরিত্রে মায়া ঘোষ পদ্মর ভূমিকায় চমৎকার সাবলীল অভিনয় করেন। অরুন্ধতী এবং ইন্দিরার ভূমিকায় ছন্দা চ্যাটার্জী ও আরতী ঘোষ সঠিক রূপদানে সমর্থ হয়েছিলেন। সঙ্গীত পরিচালনায় এবং ঠাকুরমশায়ের ভূমিকায় বিষাদ মুখোপাধ্যায় বিশেষ কৃতিত্বের দাবী রাখেন। আলোক সম্পাতে দিলীপ ঘোষের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। সম্পাদক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য ও প্রফুল্ল সিংহের পরিশ্রমে উৎসব সার্থক হয়।

ফিরে ফিরে চাই

স্মৃতিচারণ

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বড়কাকা বারাকপুর স্কুলের শিক্ষক। কী একটা ছুটির দিনে আমরা দুই ভাই কাকার সঙ্গে বারাকপুর যাই। তখন বারাকপুরে ছিল বড়লাটের একটা বাড়ি—গোরা সৈন্যদেরও একটা ছাউনি। বড়কাকার কাছে শুনেছিলাম এখানে নাকি সিপাহী বিদ্রোহ প্রথম সুরু হয়—মঙ্গল পাণ্ডে নামে এক সিপাহী বিদ্রোহের সর্দার। বড়কাকা বলতেন, মঙ্গল পাণ্ডেকে ধরতে সাহেবদের বেশ বেগ্ পেতে হয়েছিল। সৈনিক বিভাগের দুজন উচ্চপদস্থ সাহেব তাকে ধরতে গিয়ে প্রাণ দেয়। মঙ্গল পাণ্ডে ধরা পড়ে, বিচারে ফাঁসিও হয়—কিন্তু আজ দেখছি দেশবাসী তাকে ভোলেনি। বড়কাকার কাছে এইসব কাহিনী শুনে বারাকপুর দেখতে ইচ্ছা করে, তিনি নিয়ে গিয়ে অনেক কিছু দেখালেন। বললেন 'হারে, লেডিকেনি পাওয়া খাস্ নিশ্চয়ই। লেডিকেনি কেন বলে জানিস?' আমরা কি ক'রে জানবো ঘারিকের দোকান থেকে কিনে খাই। কাকা বললেন ভারতের বড়লাট লর্ড ক্যানিংএর নাম শুনেছিস তো? যাঁর সময়ে সিপাহী বিদ্রোহ হয়। সেটা জানতাম আবদুল করীমের ছোট ইংরেজি পাঠ্য ইতিহাসের বই থেকে। কাকা বললেন 'লর্ড ক্যানিং-এর স্ত্রী লেডি ক্যানিং-এর নাম অনুসারে এই মিষ্টান্নের নাম। বাংলাদেশের বারাকপুর তাঁর খুব ভালো লাগতো। এখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। দেখেছো তো তাঁর সমাধি—কতদূর থেকে দেখা যায়।'

ছোটবেলার কথা। সহর ঘুরলাম কাকার সঙ্গে, উনি স্টেশনে পৌঁছিয়ে দিলেন। এমন সময়ে কলকাতাগামী ডাউন ট্রেন এসে থামলো—কাকা বললেন 'ঐ দেখ সুরেন বাঁড়ুজ্জে যাচ্ছেন। উনি খুব পণ্ডিত, রীপন কলেজের অধ্যাপক ও 'বেঙ্গলি' নামে কাগজের সম্পাদক। 'বেঙ্গলি' কাগজ জানতাম—বাবার জন্য রোজ বিকালে লালু পালের দোকানের উপর অবস্থিত পাবলিক লাইব্রেরি থেকে ঐ কাগজ আনতাম। পরের দিন ফেরত দিয়ে আবার আনতাম। সুতরাং বেঙ্গলি কাগজের সম্পাদককে চোখে দেখলাম। তখন স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয়নি—বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের নেতারূপে তাঁর কথা পরে আসবে।

স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি গাড়ির অপেক্ষায়। দেখি দুটো গোরা সাহেব আমাদের দিকে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে কী বলাবলি করছে। আমাদের দুই ভাইএর প্রাণ উড়ে গেল—এদের দৌরাত্ম্যের কথা জানতাম। এমন সময়ে ট্রেন এসে গেল—উঠে পড়লাম—বাঁচা গেল!

গরুর গাড়ির বড় বড় দুই কাঠের চাকা টানে জোড়া বলদে, চালায় গাড়োয়ানে। ঘোড়ার গাড়ির চার চাকা, টানে দুই পক্ষীরাজ ঘোড়ায়। চালায় কোচম্যান উপরে বসে। কিন্তু যেদিন লালু পালের এক ছেলে বাই-সাইকেলে চড়ে রাস্তা দিয়ে চলে গেল—দেখবার জন্য লোকে ছুটে এলো। আজও ঐ বস্তুটির দিকে তাকিয়ে আমার বিস্ময়ের অবধি থাকে না—কয়লা পোড়ায় না, তেল খায় না,—চলবার সময় বিকট শব্দ করে না। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ যান্ত্রিক আবিষ্কার এই সাইকেল—কেবল পায়ের জোরে চলে। ভারতচন্দ্র অশ্ব শক্তির প্রশস্তি করেছিলেন—

কাঞ্চীপুর বর্ধমান দু' মাসের পথ
ছয়দিনে উত্তরিল অশ্বমেধরথ।

আজ যদি ভারতচন্দ্র ফিরে এসে কাব্য লেখেন তবে তাঁকে সাইকেলের উপর ছড়া কাটতে বলতাম। জানিনা কোনো নবীন কবি এই দ্বি-চক্রযানের উপর আধুনিক কবিতা লিখেছেন কিনা। আমি আধুনিকও নই কবিও নই—তাই সাইকেলের উপর কবিতা লেখা হলো না!

অবাক হয়ে ভাবতাম দু'চাকার উপর ব্যালেন্স রাখে কি করে—পড়ে যায় না। ভাবতাম দুপাশে দুটো রেলিং থাকবে মাঝখানে পথ—সাইকেলে চেপে পাশের রেলিং ধরে যাওয়া যাবে না—দুহাত দুটো যে সাইকেলটাকে নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে, হাত ছাড়া হবে কেমন করে! সুতরাং ওভাবে শেখা তো যাবে না। তারপর যৌবনে একদিন সাইকেল কিনলাম, চড়তে শিখলাম। তখন মনে হলো, 'যাঃ এতো সহজ।' আজ অর্ধ-শতাব্দী পরে দেখছি সাইকেল চড়তে জানে না এমন বালক-বালিকাও সহরে গ্রামে দেখা যায় না। শান্তিরা খোপায় গাধার কাপড়ের মোট বয় না। সে তার সাইকেলের উপর পাঁচটা বিরাট মোট চাপিয়ে নিয়ে যায়। ভবল-রাইডিং মুন্সিপালটি এলাকায় নিষিদ্ধ থাকলেও কেউ মানে না—দুই তিনজনও চড়ে। আমার জ্যেষ্ঠপুত্র তার কনিষ্ঠ তিন ভাইকে পিছনে ও হতে ঝুলিয়ে, পিনে গাঁথকরিয়ে স্কুলে নিয়ে যেতো। বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলতেন প্রভাতবাবুর লরী আসছে! আজ বাড়িতে ন'টা সাইকেল—নাতি, নাতনী, পুত্রবধূরা, সেবকরা সবাই চড়ে।

যানবাহনের কথাটা শেষ করা যাক্। সেকালে অশ্বযান বা ঘোড়ার গাড়ি ছিল সহরে চলাচলের শ্রেষ্ঠ যান—পালকি চলতো মানুষের কাঁধে ঝুলে। সাহেবরা পালকিটাকে চার-চাকার উপর উঠিয়ে গাড়ি বানিয়ে ঘোড়া দিল জুঁতে। আমাদের স্কুলের পাশ দিয়ে যে পথ নদীঘাটে এসেছে, সেই পথের ধারে ছিল ঘোড়ার গাড়ির আস্তাবল। এ আস্তাবল শব্দটাকে নিয়ে আরবী ভাষীরা দাবী করে ওটা তাদের শব্দ; ইংরেজি stable-এর সঙ্গে আবার আশ্চর্য শব্দ সাদৃশ্য; কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা বলেন যে শব্দটা লাতিন থেকে এসেছে। ছোটবেলা থেকে ঐ পথের আস্তাবল বা ঘোড়ার আস্তানা এবং সহিস কোচম্যানদের বাসস্থান গায়ে-সায়ে লেপ্‌টা। গাড়োয়ান তার স্ত্রী, তাদের ছেলেমেয়ে—ঘোড়া, ঘোটকী, তাদের বাচ্চা—ঘোড়ার ঘাস, ঘোড়ার মূত্র, বিষ্ঠা—সমস্ত কাছাকাছি। অশ্ববিষ্ঠা ধনুষ্টংকার বা টিটেনাস রোগের উৎস জেনেছি বলে পথে-ঘাটে সামান্য আঘাত লাগলেই ডাক্তাররা অ্যান্টি-টিটেনাস ইনজেকশন দেন। অথচ ঐ ছেলেমেয়েগুলো ঐ আবর্জনার মধ্যে থাকতে থাকতে কি ইম্যুনিটি পেয়েছিল?

খেয়ালি ছিল আমাদের গাড়োয়ান, বাবাকে নিত্য আদালতে নিয়ে যেতো। তাদের পরিবারকে চিনতাম—গাড়ির দরকার হলে এদের বাড়িতে এসে বলে গেলেই ঠিক সময়ে খেয়ালি হাজির হতো। ঘোড়াগুলো পক্ষীরাজের বংশধর নয়। অনেকগুলি তাদের ঘরের বাচ্চা। ছোট বাচ্চা মায়ের দুধ খায়,

মাঝের পাশে ঘুরঘুর করে, যাকে কেন্দ্র করে গোল হয়ে ঘোরে। পিকউইক শুধিয়েছিল, গাড়োয়ানকে 'গাড়ির ঘোড়া কখন খোল।' সে বলেছিল, যাঁদন খুলিনে, খুললেই বলে পড়বে—ঘোড়া একবার বসলে, আর ওঠে না।' আমাদের পক্ষীরাজদের সাজসজ্জার আভিজাত্য ছিল না—লাগাম দড়ির, জিন্ চটের—কারও কারও চামড়ার জিন্ লাগাম সাজসজ্জা পরবার সৌভাগ্য ছিল। এমন কি পাল-ঢাকা চলমাও পরতো কেউ কেউ! এমনই বলবান্ এরা যে দুজনে ছাড়া চারচাকার পালকি গাড়ি টানতে পারতো না। অবশ্য সহরের জঞ্জাল ফেলার দুচাকার গাড়ি একজনেই টানতে পারতো।

তবে দেখলাম বটে 'ওয়েলার' ঘোড়াকে পালকী গাড়ি টানতে। সোনা-রূপার কাজ করে পয়সা হয়েছে পরামানিকদের—পাকা বাড়ি উঠলো—দোতলা। বড়লোকের 'ঘোড়া রোগ' দেখা ছিল। এক দামী পালকি গাড়ি ও বিরাট 'ওয়েলার' ঘোড়া এলো। স্কুলে যাবার পথে দেখতাম তাকে দুইজন সহিস হিস্ হিস্ শব্দ করছে আর দলাই-মলাই করছে—দুটো বুরুশ দিয়ে গা সাফ করছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রোজই দেখতাম। ছেলেদের কাছে শুনতাম, 'ওয়েলার' ঘোড়া অষ্ট্রেলিয়া থেকে আসে। ভূগোল পড়েও জানতাম অষ্ট্রেলিয়া ঘোড়ার জন্য বিখ্যাত ছিল। তবে 'ওয়েলার' অষ্ট্রেলিয়ার জাত কি না তা জানি না আজও।

চকচকে নূতন পালকি-গাড়ি নিয়ে চলেছে ওয়েলার ঘোড়া—কী সাজ ঘোড়ার, কী সাজ কোচ্‌ম্যানের। কোচম্যান ঠগান—মাথায় পাগড়ি এঁটে, চামড়ার লাগাম ধরে, হাতে লম্বা চাবুক নিয়ে বসে। পায়ের কাছে ঘন্টা, টিপলেই টিং টিং শব্দ করে অন্যমনস্ক পথচারীকে সচকিত করে তোলে—ভয়ে বেচারা গাড়ির পথ করে দেয়।

রোজ দেখি রাজকীয় চালে চলেছে ওয়েলার ঘোড়া—ঠগান কোচবেসে বসে লাগাম টেনে ধরে। একদিন দেখি ওয়েলার ঘোড়া গাড়ি টানবে না বলে প্রতিজ্ঞা করে দাঁড়িয়ে গেছে রাস্তার মাঝে। ঠগান চাবুক মারে। ফল উলটো হয়। চিঁহি শব্দ করে, আর পিছনের পা দিয়ে লাথাচ্ছে—গাড়িটা জখম হয়ে গেল। লোক জড় হয়ে গেল। সবাই শুধোয় পাগল হলো নাকি? অনেক কষ্টে ঠগান ঘোড়ার মুখ ধরে আস্তাবলে নিয়ে যায়। পরদিন ভোরে শুনি বলে 'পরামানিকদের সেই ঘোড়াটা মরে গেছে কাল রাতে।' স্কুলে যাবার সময়ে রোজ যাকে দেখতাম সহিসদের সেবা করতে—আজ সেই বিশালকায় জন্তুটা চার পা সটান করে পড়ে আছে। অতবড়ো প্রাণীটাকে এভাবে পড়ে থাকতে দেখে মনটা খুবই খারাপ হয়ে যায়! তারপর তার কী গতি হলো জানিনে—হয়তো তার বিরাট চামড়াটা কোনো বিলাতী পাইপ-অর্গান বাদ্য যন্ত্রের 'হাপর' (bellows) তৈরীর জন্য কাজে লেগেছিল! কে জানে!

কলকাতায় তখন ঘোড়ার ট্রাম; আমি দেখিনি সে অদ্ভুত যান। তবে দাদা একবার বাবা ও কাকার সঙ্গে কলকাতায় বেড়াতে গিয়ে ঐ অশ্বযানে চড়ে কী বিপদে পড়েছিলেন তার গল্প শুনি তাঁরা কলকাতা থেকে ফিরে এলে। একদিন তিনজনে মিলে কোথায় যাবেন—বাবা ট্রামে উঠে গেছেন—কাকা দাদাকে নিয়ে উঠবেন এমন সময় ঘোড়া চলতে আরম্ভ করলো। কাকা 'রোখো রোখো' করে চিৎকার করেন—। কিন্তু 'রোখো' বললেই অশ্বশক্তি সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না—গাড়িতে 'ব্রেক' কষ্‌তে হয়। ইতিমধ্যে এক পাঞ্জাবী কাকা ও দাদাকে টেনে ট্রামে উঠিয়ে নিয়েছেন। মা শুনে বললেন, 'ভাগ্যে পাঞ্জাবী ছিল! নইলে, ঠাকুরপো তাইপোকে নিয়ে রাস্তায় পড়ে থাকতেন। আর 'বাবু' কোথায় গিয়ে নামতেন?' দাদার কাছে শুনলাম লোহার রেললাইনের উপর একটা করে গাড়ি ঘোড়ায় টানতো। গাড়ি থামবার দরকার

হলে ড্রাইভার 'ব্রেক' দিলে চাকা আর ঘুরতে পারে না—গাড়ি থেমে যায়। দাদা অনেক খবর দিলেন, ঘোড়া বদলের স্থান আছে, পথে জলখাবার জন্য চৌবাচ্চা আছে। কাকা বললেন, উনি কোথায় বেড়াতে যান, দেখেন দুপুরে সহিসরা হয়ে একটা ঘোড়া ধরে রয়েছে রাস্তার উপর। যাবার কাছে পরে শুনি ১৮৭৯ সালে একটা ইংরেজ কোম্পানি ট্রাম খোলবার অনুমতি পেয়ে কলকাতায় ট্রামওয়ে আরম্ভ করে। প্রথমে ঘোড়ায় ট্রাম টানতো। মাঝে স্টীম ইনজিন দিয়ে কিছুকাল কাজ চলে—১৯০২ সালে সর্ব প্রথম ইলেকট্রিক ট্রাম চলে।

দাদা ঘোড়ার ট্রামে প্রথম চড়েন, আর মোটরকারেও প্রথম দেখেন। একবার দেশের বাড়িতে দাদা আছেন মা'র কাছে—আমি শহরে আছি বাবার কাছে। দাদা শহরে এসে গল্প বললেন, 'একদিন আমি ও দেবেনদা, বেড়াচ্ছি—এমন সময়ে দেখি একটা অদ্ভুত গাড়ি এসে থামলো আমাদের সম্মুখে—তার না আছে ইঞ্জিন, না-আছে ঘোড়া—অথচ ভিতরে ভিতরে ঘড় ঘড় করছে। আরোহীরা নেমে যে ভাষায় কথা বললো, তা বুঝলাম না। কেবল বুঝলাম 'কালকুত্তা' 'গো' অর্থাৎ তাঁরা কলকাতায় যাবেন, পথ পাচ্ছেন না। আমাদের ইংরেজি বিদ্যায় বুঝিয়ে দিলাম কোন্ দিকে গেলে পুরাতন বাদশাহী সড়ক পাবে। তারা ফরাসী—হাজিলিং থেকে আসছে, কলকাতায় ফিরছে—পথ ভুলে এদিকে এসে যায়।' এখন সে-পথ 'টায়ম্যার্ক' করা—সর্বদাই বাস্, লরী, মোটর গাড়ি চলছে। ফরাসীরা কেন এপথে আসে—কি উদ্দেশ্যে ঘুরছিল, কিছুই জানলাম না। কয়েক বৎসর পরে দুই ভাই কলকাতায় গিয়েছি—আছি বাগবাজার পাড়ায় হরিতকী বাগান লেনে হরগোপাল সরকারদের বাসায়। সকালে দুই ভাই যাই হেদোতে—যার নাম আজ হয়েছে 'আজাদ হিন্দ সরোবর'। রেলিঙের ভিতর দাঁড়িয়ে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট দিয়ে কত মোটর গাড়ি যাচ্ছে গুণতাম—দাদা উত্তর-মুখী গাড়ি, আমি দক্ষিণমুখী গাড়ি। কে কয়খানা মোটর গাড়ি বা হাওয়া-গাড়ি দেখলাম তা নিয়ে হতো তর্ক! মোটর গাড়ি চড়েছি অনেক পরে।

আমার জন্মের ত্রিশ বৎসর পূর্বে বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে (১৮৫৪) নির্মিত হয়—এবং এই রেলপথ তৈরীর সঙ্গে আমাদের পিতামহদের বৈষয়িক উন্নতি-অবনতির যে যোগ ছিল, তা পূর্বেই বলেছি। আমাদের ছোটবেলায় রেলওয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল খুবই কম—কারণ দেশের বাড়ি নির্মিত হয় অনেক পরে। আজ-কালকার মতো ভ্রমণের নেশা তখনো বাঙালী মধ্যবিত্তকে পেয়ে বসেনি; এখন তো ঘরে ঘরে পূজার ছুটি হবার কয়মাস পূর্ব থেকেই টাইমটেবল নিয়ে কর্তা, গিন্নী, ছেলে-মেয়ের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা সুরু হয়।

সেকালে ট্রেনের গাড়ি ছিল চার শ্রেণী—প্রথম, দ্বিতীয়, মধ্যম বা ইণ্টারমিডিয়েট ও তৃতীয় বা থার্ড ক্লাস। ফার্স্ট ক্লাসে শ্বেতাঙ্গরাই ভ্রমণ করতো ব'লে বোধহয় সে গাড়ির রঙ ছিল সাদা। সেকেণ্ড ক্লাসের রঙ ছিল সবুজ, মধ্যমের পাটকিলে, থার্ডের মেটে-লালচে। আজকাল সব গাড়িরই এক রঙ! ব্রিটিশ যুগেই গাড়ির রঙে 'ডিমোক্রেসি' এসে যায়। তার গুঢ় কারণ ছিল। স্বদেশীযুগে ক্রান্তিকারীরা যখন শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের হত্যা চেষ্টা আরম্ভ করেন, তখন 'শ্বেতাঙ্গ' ফার্স্টক্লাস ছিল তাদের লক্ষ্য। সেটি সরকার নিরাকৃত করেন—সব গাড়ির এক রঙ করে।

আমরা মধ্যবিত্ত তাই আমরা ট্রেণের মধ্যম শ্রেণীতেই যাতায়াত করতাম। তাছাড়া আর একটা সুবিধা ছিল—রিটার্ণ টিকিট কিনতে পারা যেতো। অর্থাৎ যাওয়া-আসার দেড়া-ভাড়া দিলে তিন দিনের জন্য রিটার্ণ টিকিট পেতাম। আজ আমরা সে সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ভারত স্বাধীন হয়ে কর্তৃপক্ষ প্রথমেই ঠিক করলেন দুনিয়াতে দুটি জাত আছে—প্রভু ও ভৃত্য বা শোষক ও শোষিত।

মধ্যবিত্তরা সুখেস্বাচ্ছন্দ্যে থাকে—এটা ডিমক্রেসির আদর্শ নয়—অতএব ট্রেণের মধ্যে 'মধ্যম শ্রেণী' গাড়ি উঠিয়ে দাও। পয়সা কম থাকে জনতার সঙ্গে থার্ড ক্লাসে যাও,—গান্ধীজি যেতেন না? পয়সা বেশী থাকে ফার্স্ট ক্লাসে যাও, এয়ার কনডিশন কামরায় যাও! শ্রেণীহীন সমাজ গড়বার প্রথম পদক্ষেপে মধ্যম শ্রেণী বিলুপ্ত করা হলো।

আজকাল সেকেণ্ড ক্লাস বলে যে কামরা থাকে তাতে রিজার্ভেশন হয় না—খাড়া হয়ে সারা রাত্রি বসে থাকো পয়সা বেশি দিয়ে। তা না হলে দশ দিন আগে তিন তলা (থ্রী টায়ার) বা দুই তলা (টু-টায়ার) গাড়িতে রিজার্ভেশন পাবার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা 'কিউ' করে দাঁড়িয়ে থাকো—অথবা অ-যাত্রী টিকিট ক্রেতার কাছ থেকে খেসারত দিয়ে গোপনে টিকিট সংগ্রহ করো। লোকাল ট্রেণে দুটো মাত্র ক্লাস ফার্স্ট ও থার্ড—গণিত শাস্ত্র মতে এক ও-তিনের মধ্যে দুই বলে একটা সংখ্যা আছে—তা লোপ পেয়ে গেছে। তবে 'জনতা' ট্রেনে কেবল 'থার্ডক্লাস' দিয়ে সাধারণের সুবিধা করে দিয়েছেন সরকার। কিন্তু মধ্যবিত্তদের জন্য? সেকালে মধ্যবিত্ত আমরা 'মধ্যম' শ্রেণীতেই যাওয়া-আসা করতাম সাধারণত।

আমাদের স্টেশন মাত্র সংযোগ হয়েছে। বনগাঁর লাইন তৈরী হয়েছে, সেই পথ গিয়েছে যশোর পর্যন্ত, কলকাতার শিয়ালদহ স্টেশন থেকে দমদম হয়ে সাধা রেলপথ বনগাঁ হয়ে যশোহর পর্যন্ত নির্মিত হয়েছিল। রেলপথ নির্মিত হবার পূর্বে চাকদহ স্টেশন থেকে ঘোড়ার গাড়ি করে লোকে যেতো বনগাঁ যশোহর। ছোটবেলায় দেখেছিলাম চাকদহ ষ্টেশনের পূর্বদিকে—আমাদের গ্রামে যাবার পথের ধারে পড়ে আছে ভগ্ন ঘোড়ার গাড়ি কারও চাকা আছে পালকিটা নেই, কারও পালকিটা আছে, চাকা নেই।

একবার যশোহর যাই ; দাদা মশাই তখন সেখানে জনৈক ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। মনে পড়ছে স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি সেগুনবনের মাঝ থেকে হঠাৎ ধক্ ধক্ করতে করতে ট্রেন এলো। সেই ট্রেন ফিরে যাবে যশোহর।

ছবির মতো ক্ষীণ স্মৃতি ভেসে উঠছে—তখন বয়স বোধহয় ৭।৮ বৎসর হবে। স্টেশন থেকে ঘোড়ার গাড়ি করে যেতেই পথে দেখলাম ভৈরব নদীর মজে যাওয়া রূপ। আজ শুনি পাকিস্তানী সরকার ভৈরবের রূপ ফিরিয়ে এনেছেন নদী নাকি বহতা হয়েছে।

ডেপুটি দাদামশায়ের বাড়ি দোতলা—চার মামা ও ছোট মাসি থাকেন। পূজার ছুটিতে আমরা এসেছি, মাসিও এসেছেন কালনা থেকে তার ছেলে পাঁচু (নলিন)-কে নিয়ে। দোতলা থেকে দেখা যায় একটা পুষ্করিণী গোল পানায় ভরতি—তখনো কচুরিপানার আমদানী হয়নি এদেশে। দোতলায় এক কোনে ছিল ছোট একটুরো বারান্দা সেখানে দাঁড়িয়ে দেখতাম পুকুরটা—সিঁড়ি ভেঙে পড়ছে। কবে কোন্ পুণ্যাত্মী পুকুর কেটে সর্বজনহিতায় উৎসর্গ করেছিলেন তার নাম সবাই হয়তো ভুলে গেছে। হয়তো ম্যালেরিয়া মহারাক্ষসী সমস্ত পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। সেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম পুকুরে লোকের আনাগোনা, পানা সরিয়ে ডুব দিতে। ঘাসগুলো চরছে তাদের স্নান ও আহার যেন শেষ হয় না। একটা ডুব দিল—দেখতে পাইনে ভাবছি ডুবে মরলো নাকি হঠাৎ দেখি অনেক দূরে উঠেছে। অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়ে নূতন শহরের যেটুকু দেখা যায় তাই দেখছি। এমন সময় শুনি ঘরের ভিতর হাসির হল্লা - মা, মাসি, দিদিমা, চারজন কি নিয়ে তর্ক হচ্ছিল। তর্কের মীমাংসা হচ্ছেনা দেখে মেজো মামা তাঁর ঘর থেকে কয়েকটা লাঠি, চেলা কাঠ এনে প্রত্যেকের সামনে রেখে দিয়ে বলেছিলেন 'এইবার তর্কের মীমাংসা হবে।' এতেই তর্ক বন্ধ হলো হাসির হল্লায়।

মেজো মামার ধর্মে গিয়েছিল মন, তাই দোতলার ছোট বারান্দার পাশে একটা ছে-কোনা ঘরে জপতপ করতেন। ঘরে দেখতাম কোষাকুষি ঠাকুরদেবতার পট দেয়ালে টাঙানো।

সেইসময়ে যশোহরে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (১৮৬৯-১৯০১) অনেক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটরূপে আছেন। মনে পড়ছে একদিন বাবা আমাদের নিয়ে গেলেন তাঁর বাসায়। বড়ের বিরাট ঘর সামনে লম্বা বারান্দা সেখানে খানকয়েক কাঠের চেয়ার যোগেন্দ্রবাবু সেখানে বসে। তখন কি জানতাম সাহিত্য ও স্বাদেশিকতায় তাঁর স্থান কোথায়। যাঁরা জানতেন। তাঁদের যৌবনে হয়তো তাঁরা যোগেন্দ্রনাথের রচনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধে ইনি ইতালির মুক্তি আন্দোলনের ভাবুক মাৎসিনি ও গ্যারিবল্ডির জীবনী লেখেন বাংলায়। এসব কথা জানবার ও বুঝবার বয়স হয়নি। তবুও সেই মহাপুরুষকে দেখে ধন্য হয়েছিলাম তা আজ মনে পড়ছে।

যশোহরের বাড়িতে মা, মাসি দিদিমারা যোগেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিসব আলোচনা করতেন ছোটছেলে হলেও কিছুটা বুঝতাম বৈকি। শুনতাম তাঁরা বলাবলি করছেন যে যোগেন্দ্রনাথ নাকি বিধবা বিবাহ করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পাল্লায় পড়ে! মদনমোহন তর্কালঙ্কারের ছোট বিধবা মেয়েকে বিবাহ করেন।

সে যশোহর আজ বিদেশ। সেখানকার বাসিন্দারা তারা হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক তাদের পরিচয় পাকিস্তানী বলে। খোলা পথে যাওয়াআসা নিষিদ্ধ কিন্তু রাতভর চলে অ-পথে আনা-গোনা কিছু দক্ষিণা চেক্‌পোস্টে এপারে ওপারে দিলেই সব শুদ্ধ হয়ে যায়।

পার্টিশনের পূর্বে খুলনায় যাই—পথে যশোহর পার হই তখন জানতাম না যে ঐসব স্থান 'বিদেশ' হয়ে যাবে।

[ক্রমশঃ

আবার সেই জেল

দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

তেরো।

কিরণ বাবুকে একদিন দ্বিজেন করলাম, আচ্ছা, আপনি বলছিলেন যে, বয়লার সাপ্লাই কোম্পানী বলছে যে, গেজের টিল শীটের তৈরী বয়লার ওরা সাপ্লাই করবে বলেছিল, এখন তা আর দিতে পারবে না, কারণ বয়লার ওরা তৈরী করতে পারে না। তৈরী করে আমেরিকার একটা কোম্পানী, তারা খবর পাঠিয়েছে যে, ঐ গেজের শীট নয়, সামান্য পাতলা গেজের শীটের বয়লার তারা তৈরী করে পাঠাতে পারে, তাই নয় কি? ওরা নাকি সেজন্য দামও কিছু কমিয়ে দিতে রাজী আছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

তাহলে গভর্ণমেণ্টের কাছে দুটো পথ খোলা আছে। হয় পাতলা গেজের বয়লার নিতে হবে, নইলে নতুন করে টেণ্ডার ডাকতে হবে নতুন করে ঠিকাদার নিয়োগের জন্য। এজন্য এত দেরী হচ্ছে কেন?

কিরণবাবু বললেন, আবার টেণ্ডার ডাকার হাঙ্গামা করলে দেরী হয়ে যাবে বলে গভর্ণমেণ্ট ফাইন্যান্স ডিপার্টমেণ্টের অনুমোদন চেয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে পাতলা শীটের বয়লারই এই ঠিকাদারের কাছ থেকেই কেনা যায়।

তারপর?

তারপর স্যার, ফাইন্যান্স থেকে কোন জবাব আসেনি।

মানে, তারা হ্যাঁ-ও বলছে না, না-ও বলছে না?

হ্যাঁ স্যার।

কিরণবাবু আরও বললেন, কখন তৈরীর উলের সুতো সাপ্লাই ব্যাপারটা স্যার, আরও মজার। টেণ্ডার ডেকে ঠিকাদার ঠিক হয়ে গেছে অনেকদিন। তারা আগেই মানি ডেপোজিট নিয়ে সিকিউরিটি মানি ট্রেজারীতে জমাও দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু বয়লারই নেই, ইলেকট্রিক কানেকশনও নেই, আগেই সুতো কিনে কি হবে? তাই অর্ডার দেয়া হচ্ছে না। ওদিকে সুতো সাপ্লাই কোম্পানী নোটিশ দিয়েছে যে, তিন মাসের মধ্যে তোমাদের সুতো কিনে নেবার কথা, অথচ বছর পার হয়ে গেল, অর্ডারই দিচ্ছ না। ওদিকে

আমাদের সিকিউরিটির অনেকগুলো টাকা বিনা সুদে ট্রেজারীতে পড়ে রয়েছে। সেজন্য তোমরাই দায়ী। সুতরাং আগামী তিন মাসের মধ্যে যদি সুতো সরবরাহ করতে না বল, তাহলে আমাদের জমা-দেয়া টাকার সুদ দিতে হবে সিক্স পারসেন্ট।

বেশ কৌতুক অনুভব করছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কোম্পানীর নোটিশ পেয়ে গভর্ণমেণ্ট কি করলেন?

ফাইল ফাইন্যান্সে গেছে স্যার, কিরণবাবু জবাব দিলেন, এখনও ফেরৎ পাওয়া যায়নি। অনেক বার তাগাদা দেয়া হয়েছে, জবাব আসেনি।

ফাইন্যান্স! ফাইন্যান্স! ফাইন্যান্স!

গভর্ণমেণ্টের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের একচ্ছত্র অভিভাবকের মত এই ফাইন্যান্স ডিপার্টমেণ্ট। হাজারো চোখ মেলে তাকিয়ে রয়েছে সরকারের সর্বপ্রকার তৎপরতার ওপর। রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার মহৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে যতই কেন না আপনি নিখুঁত পরিকল্পনা করুন, ঘরে ঘরে ভাতের পাহাড় সৃষ্টি করবার আর দুধের বন্যা বইয়ে দেবার জন্য যতই কেন না আপনি উন্নয়ন-সূচী গ্রহণ করুন, সব কিছুতেই আবশ্যিকভাবে প্রয়োজন হবে ফাইন্যান্সের অনুমোদন। অসংখ্য নদী যেমন অসংখ্য জনপদের মধ্যদিয়ে অসংখ্য পথে ধাবিত হলেও অবশেষে সেই মহাসাগরেই তাদের চলে পড়তে হয়, তেমনি অসংখ্য সরকারী ফাইল যতই কেন না মনের পুলকে এ টেবিল, ও টেবিল, সে টেবিলে ঘুরে ঘুরে শিশুর মত নৃত্যে মেতে উঠুক, অবশেষে তাদের এসে কুর্নিশ জানাতে হবে এই ফাইন্যান্সের দরজায়।

সে দরজায় নালন্দার গেট, সহস্র মার্কারি লাইট, পদ্ম ও পুষ্প শোভিত দোদুল্যমান লাল শালুতে বড় বড় হরফে লেখা, ওয়েল কাম। কিন্তু যেই ভেতরে ঢুকে আনন্দে ডগমগ হয়ে আপনি নেচে নেচে এগোতে লাগলেন, দেখবেন পথ সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে, অন্ধকার হয়ে আসছে, অবশেষে কোন্ সুরঙ্গ পথে এগিয়ে গিয়ে আপনি কোন্ পচা নর্দমায় মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবেন, দুনিয়ার কেউ তার হদিসও পাবেনা। চক্রব্যূহের মত এর দরজায় দেখতে পাবেন সহাস্য সাদর হাতছানি, কিন্তু সেই গোলকধাঁধা থেকে নির্গমনের পথ পাথর দিয়ে বন্ধ। ওয়ান ওয়ে রাস্তার মত ফাইন্যান্সের পথে তরতর করে যাওয়া যায়, ফিরে আসা যায়না।

যতই জরুরী হ্যাপ-হ্যাটা ফাইল আপনি ফাইন্যান্সে পাঠান না কেন, সে ফাইল ওখানে ঢুকেই কুম্ভকর্ণের নিদ্রায় ঢলে পড়বে, পড়ে থাকবে কম করে ছয় মাস, তারপর ঘন ঘন স্মারক মেমোর ঢাক ঢোল বাজিয়ে সেই সরকারী কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙতে লাগবে আরও ছয় মাস।

এ যেন ফাইন্যান্স ভূতের সঙ্গে কলম-লড়াই সুরু করলাম।

চিঠি। চিঠি। চিঠি। অবিরাম অবিশ্রাম চিঠি লিখতে সুরু করলাম।

ওরা কিছু লিখলেই তৎক্ষণাৎ তার জবাব পাঠাই। জবাব না পেলেই রিমাইণ্ডার। রিমাইণ্ডারের রিমাইণ্ডার।

সমস্ত জেল শিল্প তত্ত্বাবধানের জন্য একজন স্পেশাল অফিসার আছেন। প্রেসিডেন্সী জেলে তাঁর অফিস। নাম, যোগিনী চন্দ্র দাস। তাঁকে একবার আসতে অনুরোধ জানালাম।

এলেন। এসেই হল্লা করে উঠলেন। ১৯২৮ সালে যাদবপুর বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউটে তিনি আমার সহপাঠি ছিলেন। ওখানে একসঙ্গে নাট্যাভিনয় করেছিলাম, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'দুর্গাদাস।'

আমি হয়েছিলাম দিলীপ রায় আর উনি গুরুদেবের। ঐরকমই হয়েছিলেন নীরেন লাহিড়ী। পরে তিনি চিত্র পরিচালক হিসেবে সুনাম অর্জন করেন। আমাদের প্লটার ছিলেন ত্রিগুণা চরণ সেন। এখন কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী। সর্বোৎকৃষ্ট অভিনেতার মেডেল পেয়েছিলাম আমি। বিচারক ছিলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী।

মিঃ হাল গড় গড় করে পুরোনো কথা সব বলে গেলেন! বললেন, সে নাটকের একখানা প্রোগ্রাম এখনও আমার কাছে আছে। জানালেন, আমাদের ক্লাস-মেট জাহাঙ্গীর কবির ট্রেড ইউনিয়ন করে, বিজয় সেন নামকরা ফুটবলার, বীরেন ঘোষ বিহারে নামকরা ক্রিকেটার।

চা এল, বিস্কুট এল, হাল তাঁর কৌটো থেকে এলাচ, লবঙ্গ, শুপুরি দিলেন। ত্রিশ বছর আগেকার দুই সহপাঠি পুরোনো দিনের কথায় মশগুল হয়ে উঠলাম।

অবশেষে বললাম কমল ক্যাইরীর কথা এবং আমার আধা-চুল বেয়ে নেমে যাবার কথা।

হাল তৎক্ষণাৎ সর্বপ্রকার সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

বেড়ে গেল আমার কলমের জোর। লেখনি হয়ে উঠল তরবারি।

এদিক থেকে আমি আর ওদিক থেকে যোগিনী হাল। সাঁড়াশি অভিযান সুরু করলাম।

অবশেষে, কৃষ্ণকালো অমাবস্যার বিষণ্ণ দীর্ঘ রাত্রির শেষে যেমন প্রসন্ন প্রভাতের দ্যুতি পূর্বাচল দ্যুতিময় করে তোলে কিংবা সুদীর্ঘকাল সুকঠোর তপশ্চর্যার পর কৈলাস ভবনে মহাদেবের আসন যেমন ভক্তের টানে টলে ওঠে, তেমনি ফাইন্যালের ধূলিশয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কমল ক্যাইরীর ফাইল, নাইল নড়ে উঠল, নড়ে উঠলেন গভর্নমেন্ট, নড়ে উঠলেন আমাদের আই জি। আমায় লিখলেন, 'কিছু কম দামে পাইলে পাতলা সেজের বয়লার কিনিতে গভর্নমেন্ট রাজী হইয়াছেন। আমি বয়লার সাপ্লাই কোম্পানীকে আমার সহিত দেখা করিতে লিখিয়াছি। ফলাফল যথাসময়ে জানানো হইবে।'

কিন্তু আশ্চর্য, কি করে জানিনা, আমাকে 'যথাসময়ে জানাইবার পূর্বেই' সর্বাধিক পঠিত নিরাকার বৈনি গেজেটের সর্বশক্তিমান অপরীরী রাঁক রিপোর্টার আমাদের মহারাজ আই জি-র সঙ্গে বয়লার সাপ্লাই কোম্পানীর প্রতিনিধি ইঞ্জিনীয়ার এস. চ্যাটার্জীর সাক্ষাৎকারের পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করে ফেলল এবং গেজেটের প্রথম পৃষ্ঠায় সেই বিবরণ অদৃশ্য কালিতে একাধিকার মত প্রকাশ করে ফেলল।

সেই একাধিকাখানি হুবহু তুলে দিচ্ছি—

[স্থান—হাইটার্স বিল্ডিংস-এর ত্রিতলে ইনসপেক্টর জেনারেল অব প্রিজন্স-এর অফিস-কক্ষ। সময়—অপরাহ্ণ আড়াইটা। প্রকাণ্ড টেবিলের উপর এদিকে দুই সারি ও ওদিকে দুই সারি ফুলস্কেপ ফাইল। বাঁ পাশের র‍্যাকভর্তি ফাইল। বাঁ দিকের একটি টুলের উপর এক গাদা ফাইল। আই জি-র সম্মুখেও অনেকখানেক ফাইল। তিনি সেই ফাইলগুলি এক এক করিয়া পড়িতেছেন, খস খস করিয়া কি লিখিতেছেন, তারপর ফাইল মেঝেতে ধপাস করিয়া ফেলিয়া দিতেছেন। বার বার দেয়াল ঘড়ির দিকে চাহিতেছেন। চোখে মুখে বিরক্তির ভাব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। এমন সময় ফোন বাজিয়া উঠিল]

আই জি। (ফোন তুলিয়া ও রিসিভারটি কান হইতে একটু দূরে ধরিয়া) হ্যালো!—কে, মুখার্জী? আরে বল কেন ভাই, শনিবার, কোথায় বেড়াতে বেরিয়ে যাব, তা নয়, একগাদা ফাইল এখন

দিয়ে গেল। সবগুলোতেই ইমার্জেন্সী স্লিপ আঁটা—গভর্ণমেণ্টের সবকাজই ত ইমার্জেন্ট। কোন্‌টা দেরী করলে চলে, বল। কতক্ষণ গেছ কফি হাউসে?—ও, তুমি তাহলে দুটোর আগেই উঠে পড়েছ? ভালই করেছ। আমিও উঠছি। এত ফাইল একদিনে দেখলে গভর্ণমেণ্ট স্পেশাল ইনক্রিমেণ্ট দেবে কিছু? আঁা, বল। তুমি পালিও না যেন মুখার্জ্জী, দরকার হলে আর এক কাপ নাও। আচ্ছা—আচ্ছা।

(হাসি মুখে রিসিভারটি রাখিয়া আবার দ্রুততর গতিতে ফাইল দেখিতে লাগিলেন এবং মেরুর ছুঁড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন। একটু পর কার্ড হাতে পিওনের প্রবেশ)

আই জি। (কার্ড লইতে লইতে) আবার কে আড়াইটের সময়? (কার্ড দেখিয়া) এস. চ্যাটার্জ্জী, রিপ্রেজেনটেটিভ, বয়লার সাপ্লাই কোম্পানী।—একি, এ লোকটাকে আজ আসতে বলেছিলাম নাকি? (প্রশ্নটা যেন পিওনকেই করিলেন, পিওন নীরবে বোকার মত দাঁড়াইয়া রহিল। একটু পরে) যাঃ, আসতে বল। আজ আর কফি হাউসে যাওয়া হবে না দেখছি। (ফোলিও ব্যাগ হাতে চমৎকার স্যুট পরিহিত সুশ্রী চেহারা ইঞ্জিনীয়ার এস. চ্যাটার্জ্জীর প্রবেশ।)

চ্যাটার্জ্জী। নমস্কার।

আই জি। (প্রতি নমস্কার না করিয়া এবং বসিতে না বলিয়া) ওয়েল, আপনাকে আজ আসতে বলেছিলাম নাকি? বলে থাকলেও আজ শনিবারটা বাদ দিয়ে আসতে পারলেন না? এই আড়াইটের পরে কেউ অফিস করে?—যাকগে, কি বলতে চান, চটপট বলে ফেলুন আর কথায়। আমার সময় নেই, চলে যাব।

চ্যাটার্জ্জী। (তখনও দাঁড়াইয়া আছেন) আপনিই লিখেছিলেন পত্র পাওয়ামাত্র আপনার সঙ্গে দেখা করতে, আজ দুপুরের ডাকে আপনার চিঠি পাওয়া গেছে। তা আপনার যদি শনিবার বলে অসুবিধে হয়, তাহলে আজ থাক। সোমবার বরং আসব—

আই জি। না, না, এসেছেন যখন, সেরেই ফেলা যাক। ওয়েল, আর সারবারই বা কি আছে? আপনারা যে কোয়ালিটির বয়লার দেবেন বলেছিলেন, এখন বলছেন আমেরিক্যান কোম্পানী সে রকম বয়লার তৈরী করছে না। ওয়েল, সেজন্য গভর্ণমেণ্ট দায়ী নয়, দায়ী আপনারা। আমেরিকা, না সাউথ আফ্রিকা কোথা থেকে বয়লার আনবেন, সে সব আমরা জানিনা। চুক্তিমত সাপ্লাই করতে হবে আপনাদের।

চ্যাটার্জ্জী। আমরা যে ম্যানুফ্যাকচারার নই, টেণ্ডারে তা উল্লেখ করা ছিল, আর কোন কোম্পানীর কত গেজ পাইপের বয়লার আমরা সাপ্লাই করতে পারি, তাও লেখা ছিল। কিন্তু সেই ম্যানুফ্যাকচারার কোম্পানী যদি ঐ কোয়ালিটির বয়লার আর সাপ্লাই করতে না পারে—

আই জি। ওসব বাজে কথা রাখুন। ঐ কোম্পানী কি আপনাদের বলেছিল, এখন কি বলছে, এসব ত মশাই, আপনি বলছেন। আপনি যে সত্যি কথা বলছেন, না আপনাদের লাভের অঙ্ক কষে যাবে বলে ফাঁকি দিচ্ছেন—ওয়েল, আমরা তা কি করে বুঝব? (ফাউণ্টেন পেন টেবিলে ঠুকিয়া) We want as per your specification and if you fail Security money will be forfeited—যান, আপনার কোম্পানীকে বলে দিন গে। (একটু থামিয়া) ঘাড়োয়ারী কোম্পানীর টেণ্ডার এ্যাকসেপ্ট করাই আমাদের ভুল হয়েছে। ওদের বিশ্বাস করা কঠিন। অর্ডার

নেবার বেলায় বড় বড় কথা বলে আর সাপ্লাইয়ের বেলায় ঘাড়ে মাল চালিয়ে দিতে চেষ্টা করে—

চ্যাটার্জী।—আচ্ছা, তাহলে চলি।

আই জি।—মানে? যে জন্ত আপনাদের ডেকেছি, সে কথাই ত হল না।

চ্যাটার্জী।—আপনি যে আগেই আপনার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন যে, আমাদের সিকিউরিটির টাকা কমপিট করে দেবেন। তাহলে আর আলোচনা করে কি হবে বলুন।

আই জি।—(ক্রোধে চোখমুখ লাল হইয়া উঠিল) আপনার নামে আপনাদের কোম্পানীতে আমি কমপ্লেন করতে পারি জানেন? (একটু পর) যাকগে, আপনার প্রপোজাল বলুন।

চ্যাটার্জী।—(এতক্ষণে চেয়ারে বসিয়া পোর্টফোলিও ব্যাগ হইতে ক্যাটালগ বাহির করিয়া। এই দেখুন, এই বয়লারটা আমরা দিতে চাই। যেটা দোষ বলেছিলাম, সেটা এই যে। স্পেসিফিকেশন পড়ে দেখুন, দুটোই এক। শুধু সেফটা কম, তেমনি দামও দু হাজার টাকা কম। এটা আমাদের ষ্টকেই আছে, ইমিডিয়েটলি সাপ্লাই করতে পারি। এটা গত বছর আনাহয়েছিল—

আই জি।—ওয়েল, গত বছরের, মানে ওল্ড ষ্টক? মানে, হয়ত ঘরচে ধরে পড়ে আছে, আমাদের চালিয়ে দিতে চান, দু বছরের মধ্যেই ফুটো হয়ে যাবে। ওয়েল—

চ্যাটার্জী।—খাঁটি ইস্পাতের তৈরী জিনিষ এক বছরেই ওল্ড হয়না, আর ইস্পাতে মরচে ধরে না। এরও গ্যারান্টি দশ বৎসর—

আই জি।—রাখুন, রাখুন, মাড়োয়ারী কোম্পানীর আবার গ্যারান্টি। ওদের গ্যারান্টির কোন দাম আছে? (ফোন বাজিয়া উঠিল। রিসিভার তুলিয়া অভ্যাসমত কান হইতে একটু দূরে ধরিয়া) হ্যালো! কে, পরামাণিক? কি? দীনবন্ধু নামের কোন কয়েদী গত পাঁচ বছরে আপনার ওখানে ছিল কিনা বলতে পারেন না? কি? আবার কি পার্টিকুলারস দরকার? বাপের নাম, ঠিকানা, কি কেস সব বললে তবে খুঁজে দেখতে পারেন? কয়েদীদের নাম বললেই যদি চিনতে না পারেন, তার কেসটা না বলতে পারেন, you are unfit to be Jailor! আবার খুঁজুন, পরশু বারোটার মধ্যে চাই। যদি না পারেন, you will be transferred to a very remote Jail as punishment, বুঝলেন? আমি যখন মেদিনীপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলাম, ডিষ্ট্রিক্টের প্রত্যেকটি লোকের কথা আমার মুখস্থ ছিল, আর আপনার সামান্ত একটা জেলের আসামীদের কথা মনে থাকেনা? (ধপ করিয়া ফোন রাখিয়া) আপনাদের এই বয়লারটা নিতে পারি, কিন্তু দু হাজার নয়, চার হাজার টাকা কম দোব।

চ্যাটার্জী।—আমাদের লোকসান হয়ে যাবে—

আই জি।—ওয়েল, আপনাদের লাভ লোকসানের কথা আমরা জানিনা। চুক্তিমত আপনারা বয়লার দিতে পারছেন না, এজন্ত আমরা breach of contract case করতে পারি, তা জানেন? যান, জিজ্ঞেস করে আসুন। যদি রাজী থাকেন, ভালই, নইলে—ওয়েল, উই উইল সি আওয়ার ওয়ে—যান।

চাটার্জী।—(একটু ভাবিয়া) আচ্ছা, আড়াই হাজার টাকা কমিয়ে দেয়া যাবে।

আই জি।—ওয়েল, এটা মাছের দর কষাকষি নয়। গভর্ণমেণ্ট মাছ কিনছেন না, কিনছেন বয়লার। আমি যখন মেদিনীপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলাম, তখন আপনাদের মত অনেক মাড়োয়ারী কোম্পানী দেখেছি। ওরা থ্রি হানড্রেড পারসেণ্ট লাভে ছাড়া মাল ছাড়ে না। যান—

চ্যাটার্জী।—আচ্ছা, আড়াই হাজার টাকাই ছেড়ে দোব। এর বেশী পারব না—

আই জি।—(ফোন বাজিয়া উঠিল, রিসিভার তুলিয়া যথারীতি কান হইতে দূরে ধরিয়া) হালো? কে, মুখার্জী? আর বল কেন ভাই, এক মাড়োয়ারী কোম্পানীর পাল্লায় পড়েছি বয়লার কেনা নিয়ে। খালি হিগলিং জাগলিং করছে আর দেরী করিয়ে দিচ্ছে।—কি, চু কাপ হয়ে গেছে? (হাসিয়া) আরও এক কাপ নাও ভাই, আমার জন্যেও নাও, এই দশ মিনিটের মধ্যেই এসে যাচ্ছি। (ফোন রাখিয়া) শুনুন, আপনার সঙ্গে আর বক বক করতে পারিনা। আমার কাজ আছে। ঐ তিন হাজারেই রাজী হলাম। তবে ফাইন্যান্সের স্যাংশন নিতে হবে—

চ্যাটার্জী।—আমরা আড়াইর হাজারের বেশী নামতে পারছি না।

আই জি।—(রাগতভাবে) বেশ, তাই হবে। আপনার সঙ্গে আর সময় নষ্ট করতে পারছি না। ওদিকে আমার কফি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে –

চ্যাটার্জী।—বেশ, তাহলে আড়াই হাজার কমেই এই বয়লারটা পাঠাব হুমদম জেলে। আপনারা আমাদের অর্ডার দিয়ে চিঠি দেবেন।

আই জি।—সে আপনি পাবেন ইন ডিউ কোর্স। বাট ওয়েল, আপনি যে বলে যাচ্ছেন আড়াই হাজার টাকা কম নেবেন, আপনার কোম্পানী যদি রাজী না হয়? ওসব মশাই, মাড়োয়ারী কোম্পানীর ব্যাপার—

চ্যাটার্জী।—(কোলিও ব্যাগে ক্যাটালগ ও কাগজপত্র ভরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আমি যা বলে যাচ্ছি, সেটাই কোম্পানীর কথা বলে জানবেন। তবে হ্যাঁ, আমরা চিঠিও দোব আপনাকে। (নমস্কার করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত)

আই জি।—(প্রতি-নমস্কার না জানাইয়া) শুনুন, শুনুন। আপনি কি ইঞ্জিনীয়ার?

চ্যাটার্জী।—আজ্ঞে হ্যাঁ।

আই জি।—কোথা থেকে পাশ করেছেন? ডিগ্রি, না ডিপ্লোমা?

চ্যাটার্জী।—(কৌতুক অনুভব করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া) ডিগ্রি, শিবপুর। তারপর গ্ল্যাস্গো, তারপর মিউনিক।

আই জি।—এঁ্যা? তবে কার্ডে শুধু এম. চ্যাটার্জী লিখেছেন যে?

চ্যাটার্জী।—কি হবে নিজের ল্যাজ নিজে মেপে? চাকরি নেবার সময় দরকার ছিল, তখন দেখিয়েছি।

আই জি।—আপনার চেহারাটা ত দেখছি ভালই মনে হয় পার্সোনালিটি আছে, পাশও করেছেন অনেকগুলো। তবে মশাই, বাঙ্গালী হয়ে ঐ মাড়োয়ারী কোম্পানীতে কেন পড়ে আছেন? ওরা ঠিকমত মাইনে-টাইনে দেয়?—শুনুন, আমাদের গভর্নমেণ্টে ত ইঞ্জিনীয়ার নেয়, মাইনেও মন্দ নয়—এখানে চাকরির চেষ্টা করলেই পারেন?

চ্যাটার্জী।—(সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া) কত মাইনে দেবে আপনার গভর্নমেণ্ট? আপনাকে যা দেয়, তাই? আমি এখন কত পাই জানেন? আপনার যা ম্যাকসিমার গ্রেড, তার চাইতেও কয়েক শো টাকা বেশী। দেবে আপনার গভর্নমেণ্ট? তারপর ফ্রি এয়ারকণ্ডিশন্ড কোয়ার্টার্স আর ড্রাইভারসহ গাড়ী। তারপর আছে কন্ট্রিবিউটরী প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড আর কমিশন, বছরে দুটো করে ইনক্রিমেণ্ট। আছে আপনাদের এসব? তারপর অবশ্যি। আপনাকে আড়াই হাজার কম টাকায় বয়লার কেনার জন্য ফাইন্যান্স ডিপার্টমেণ্টের এ্যাপ্রুভাল নিতে হবে। আর আমি যদি আপনাকে চার হাজার টাকা কমের কথাই বলে যাই কোম্পানী বিনা প্রশ্নে তা মেনে নেবে। বুঝলেন? এই জন্যই আপনাদের

গভর্ণমেণ্টে চাকরি না করে চাকরি করি মাড়োয়ারী কোম্পানীতে। ওরা লোকের ওয়ার্থ বোঝে এবং সে ওয়ার্থের মূল্য দিতে জানে। ওয়ার্থলেস লোককে কখনও অথরিটি দেয়না। (হরলা পর্য্যন্ত যাইয়া। আবার ফিরিয়া আসিয়া) আর মাড়োয়ারীদের ব্যবহার অনেক বাঙ্গালী অফিসারের চাইতে ভাল।

[এস. চ্যাটার্জ্জী গট গট করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। আই জি কোল-খাওয়া দুইং হরজার দিকে মুক্ত প্রেক্ষণে চাহিয়া রহিলেন। কোন বাজিয়া 'উঠিল, বাজিয়া চলিল, আই জি ভ্রূক্ষেপ করিলেন না, হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিলেন। কে জানে, হয়ত কফি হাউসে মুখার্জ্জীর তৃতীয় কাপ কফিও শেষ হইয়া গিয়াছে এবং আই জি-র জন্ত নেয়া কফিও জল হইয়া গেল]

অবশেষে কাঠ খড় কেরোসিন পোড়ানো সার্থক হল। দুঃখ রাত্রির হল অবসান।

আই জি-র চিঠি পেলাম, 'অমুক তারিখ বেলা দুইটার মধ্যে হরলার কোম্পানী হরলার লইয়া জেলে যাইবে। উহাদের লোকই হরলার বসাইয়া দিয়া আসিবে। আপনি নিজে উপস্থিত থাকিয়া কাজ করাইয়া লইবেন ও রিপোর্ট পাঠাইবেন।'

যোগিনী দাস এসে বললেন, কি রকম বুঝছেন, দেখুন মিঃ গাঙ্গুলী। হরলার যেন একটি মাটির ঘট, ওরা এসে মাটিতে স্থাপন করে দেবে। ওটা বসাবার জন্ত কংক্রিটের প্লাটফরম দরকার, সেটা কোথায় ?

আমরা প্রকাশ করলাম, তার মানে কি আবার টেণ্ডার ডেকে কনট্রাকটর ঠিক করতে হবে নাকি ? তাহলেই তো্বালেন মিঃ দাস।

কিন্তু লাগবে না, দাস ভরসা দিলেন, আমি এখুনি যাচ্ছি হরলার কোম্পানীর ইঞ্জিনীয়ারের কাছে। কত নীচে থেকে গেঁথে তুলতে হবে, কতখানি পাথরকুচি, কতখানি খোয়া, তার ওপর কংক্রিটের লেয়ারটি ক ইঞ্চি পুরু হবে, আর কতখানি ভায়মেটার, আমি জেনে আসছি। তারপর যে কনট্রাকটররা আপনার জেলে রিপেয়ার ওয়ার্ক করছে, ওদের দিয়েই প্লাটফরমটা তৈরী করিয়ে নোব। আমি কথা বলেছি, ওরা দিনে পনরায় করে দিতে রাজীও হয়েছে। কোকটসে করাতে পারলে আর কাইন্ডাপে বর্ণা দিতে হবে না।

বললাম, কিন্তু হরলার যে পনেরো দিন পরেই এসে যাচ্ছে ?

ও—নাকিসিয়েণ্ট টাইম, দাস আশ্বস্ত দিলেন, কংক্রিট দুচার দিনেই শুকিয়ে যাবে। আমি এখুনি যাই মিঃ গাঙ্গুলী।

কৌটো থেকে মশলা দিয়ে যোগিনী দাস তৎক্ষণাৎ বিদায় নিলেন।

ঠিক কথা রাখলেন।

দশ দিনের মধ্যেই প্লাটফরম রেডি হয়ে গেল।

যথানির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ে হরলারের লরী এসে গেল।

আমিও বারোটায় বাড়ী না গিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম।

উসখুস করতে লাগলেন ওভারসিয়ার সুরজিৎ বাবু। বল্ না গেলে উনি বাড়ী যান কি করে ? সেটা যে ভারী দৃষ্টিকটু হবে। তাই হাত কচলাতে কচলাতে এসে নিবেদন করলেন, আপনার স্যার, আর থাকবার দরকার কি ? সাড়ে তিনটে বেজে গেছে, এখনও আপনার নাওয়া-খাওয়া হয়নি—

আপনারও ত হয়নি, বাধা দিয়ে বললাম, আপনি থাকতে পারলে আমিও থাকতে পারব।

সাড়ে চারটেতে ওদের কাজ শেষ হয়ে গেল।

কদিনের মধ্যেই এসে গেলেন ফ্যাক্টরী ম্যানেজার দিলীপ মুখার্জী।

কয়েকদিনের মধ্যেই বয়লার স্যান।

ইলেকট্রিক কানেকশন এসে গেল।

তারপর একদিন এক শুভ সকালবেলায় বয়লারে আগুন দেওয়া হল, হস হস করে মেসিনগুলো চলতে লাগল, খটাখট খটাখট চলতে লাগল পাঁচখানা পাওয়ার লুম।

প্রথম কম্বলখানা নিয়েই যোগিনী দাস ছুটলেন রাইটার্স বিল্ডিংস-এ আই জি-কে দেখাবার জন্ত।

আই জি দেখে মন্তব্য করলেন, পাঞ্জুলীর টেনাসিটি আছে বলতে হবে। অচল কম্বল ফ্যাক্টরী চালু করল, তবে ছাড়ল।

দাস ফিরে এসে সাক্ষাৎকারের বিবরণ দিয়ে হেসে বললেন, কিন্তু এ সবের ক্রেডিটটা পুরোপুরি নেবেন উনি। নিশ্চয়ই গভর্ণমেণ্টকে জোরালো ভাষায় লিখবেন, আমারই উদ্যোগে আমারই নিয়ন্ত্রিত শ্রমে এত বছর পর হরদম জেলের কম্বল ফ্যাক্টরী চালু করা সম্ভব হইল। সুতরাং আমার চাকরির একসটেনশন দিতে আজ্ঞা হয়—'

দূর মশাই, বাধা দিয়ে বললাম, একথা কখনও লিখতে পারে? আপনার যত সব কেচ্ছা।

দাস হাসতে হাসতে মশলার কৌটো বার করলেন।

(ক্রমশঃ)

মাইকেল মধুসূদনের অঙ্ক কষা

অনাথ উপাধ্যায়

মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাব্য প্রতিভা সম্বন্ধে আজ আর কোন কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু তাঁর জীবনে এমন একটি নাটকীয় ঘটনার অবতারণা হয়েছিল যা স্মরণযোগ্য এবং যে ঘটনার কথা তিনিও নিজে একাধিকবার বলেছিলেন।

কলেজ জীবন থেকেই মাইকেল ইংরাজী কবিতা লিখতেন। সেইসব কবিতা শুনে তাঁর সহপাঠীরা তারিফ করত, তাঁকে বলতো 'পোয়েট মধুসূদন'।

লেখা-পড়ায় খুবই ভাল। কিন্তু এক বিষয়ে তাঁর ভারী ভয়। অঙ্ক। গণিত। অঙ্ক কষা তাঁর কাছে যেন বিভীষিকা। অঙ্কের ক্লাসে মাষ্টার মশায়ের একটা কথাও তাঁর কানে ঢুকতো না। তিনি আনমনা হয়ে বসে থাকতেন। কখনো বা কবিতার বই খুলে পড়তেন।

একদিন ক্লাসের ছেলেদের মধ্যে এক তুমুল তর্ক বাধল। কে বড়? নিউটন, না শেকস্‌পীয়ার? বৈজ্ঞানিক না সাহিত্যিক?

শক্ত তর্ক। দুই-ই বড়। শুধু জ্ঞান নিয়ে যেমন মানুষের চলে না, তার আনন্দ চাই। তেমনি শুধু কাব্যের আনন্দ নিয়েই মানুষের চলে না, তার জ্ঞান চাই।

তর্কের গতি সহসা অন্য দিকে ঘুরে দাঁড়াল, কে বড়? প্রতিভার শক্তিতে নিউটন বড়, না, শেকস্‌পীয়ার?

তর্কের মাঝখানে মধুসূদন বলে উঠলেন—শেকস্‌পীয়ার নিউটনের চেয়ে বড়, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

একজন প্রশ্ন করল, কেন, কিসে বড়?

মধুসূদন উত্তর দিলেন, শেকস্‌পীয়ার ইচ্ছে করলে নিউটনের মত বৈজ্ঞানিক হতে পারতেন, কিন্তু নিউটন হাজার চেষ্টা করলেও শেকস্‌পীয়ারের মত নাটক লিখতে পারতেন না।

প্রতিবাদ উঠল—কখনো না। নিউটন নাটক লিখতে চেষ্টা করেন নি, তাই। নইলে তিনিও শেকস্‌পীয়ারের মত সাহিত্যিক হতে পারতেন, হতে পারতেন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার।

ছেলেদের মধ্যে গণিতের দলই ছিল ভারী। তারা সমস্বরে বলে উঠল—নিশ্চয়। নিশ্চয়।

মধুসূদনের মেজাজ চড়ে গেল। উত্তেজিত স্বরে বললেন, তোমরা তো এক একজন খুদে নিউটন, অঙ্কে খুব ওস্তাদ। কিন্তু তোমরা কি কেউ আমার মতো কবিতা লিখতে পারো?

পাল্টা জবাবে ছেলেরা বললে, তুমিও তো একটি খুদে শেকস্‌পীয়ার, পারো তুমি আমাদের মতো অঙ্ক কষতে?

ঝোঁকের মাথায় মধুসূদন বললেন—আলবৎ পারি।

ছাত্ররা হেসে উঠল—বললেই হল আর কি? গণিতের ক্লাসে তো লুকিয়ে কবিতার বই পড়। তুমি আবার অঙ্ক কষতে পারবে?

মধুসূদন হেসে গিয়ে বললেন, পারি কি না, দেখিয়ে দেব।

এর পর থেকে মধুসূদন লুকিয়ে লুকিয়ে অঙ্ক কষতে শুরু করলেন। তাঁর দুর্জয় সংকল্প, চেষ্টা করলে গণিতে পারদর্শিতা অর্জন করা এমন কিছু কঠিন নয়—একথা তিনি প্রমাণ করে দেবেন।

সুযোগও একদিন এসে গেল।

সেদিন গণিতের ঘণ্টায় ক্লাস নিচ্ছেন একজন ইংরেজ অধ্যাপক। ব্লাকবোর্ডের উপর গণিতের একটি জটিল প্রশ্ন লিখে তিনি ছাত্রদের সেটি সমাধান করতে আহ্বান করলেন। যারা ক্লাসের সেরা ছাত্র তারা সবাই এগিয়ে গেল, কিন্তু কেউই অঙ্কটি কষতে পারল না।

তখন অধ্যাপক ক্লাসের অপর ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আর কি কেউ চেষ্টা করবে?

কোন উত্তর নেই। অধ্যাপক বুঝলেন, অঙ্কটি কেউই কষতে পারবে না।

এমন সময় মধুসূদন হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন।

অধ্যাপক বললেন, কিছু বলতে চাও।

মধুসূদন বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ।

বল, কি বলবে।

মধুসূদন বললেন, আমি একবার অঙ্কটা কষবার চেষ্টা করি।

ক্লাস শুদ্ধ সবাই অবাক। মধু বলে কি?

যে-অঙ্ক কষতে গণিতের পাকা ছেলেরা বিফল হয়ে ফিরে এলো, সেই অঙ্ক কষবে মধুসূদন, যে চিরদিন অঙ্কে কাঁচা, অঙ্ক যার কাছে বিভীষিকা, অঙ্কের ক্লাসে যে কবিতার বই পড়ে?

অধ্যাপকও কম বিস্মিত হলেন না। কারণ তিনি জানতেন, কাব্যে, সাহিত্যে মধুসূদনের জুড়ী নেই, কিন্তু অঙ্কে সে একেবারেই কাঁচা। বললেন, তুমি চেষ্টা করবে? আচ্ছা, কর চেষ্টা: দেখি তোমার এলেম।

ব্লাক বোর্ডের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন মধুসূদন। কিছুক্ষণ নিবিষ্ট চিত্তে প্রশ্নটি অনুধাবন করলেন। তারপর, কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই কঠিন অঙ্কটি নির্ভুল ভাবে কষে ফেললেন।

ছাত্র, অধ্যাপক সবাই অবাক! অধ্যাপক যখন বললেন, ওয়ান্ডারফুল, মধু ইজ এ জান ইট,—তখন ছাত্রদের মুখে আর কথা নেই, মধু আজ এ কী অসম্ভব সম্ভব করল? অধ্যাপক পঞ্চমুখে মধুসূদনের প্রশংসা করতে লাগলেন।

গণিতের ঘণ্টা শেষ হল। সেদিন যারা নিউটনের পক্ষ নিয়ে তর্ক করছিল তাদের লক্ষ্য করে মধুসূদন বললেন, দেখলে তো, শেকস্‌পীয়ার চেষ্টা করলে নিউটন হোতে পারতো। এবার তোমরা কেউ শেকস্‌পীয়ার হবার প্রমাণ দেখাও।

তারা হার মেনে চুপ করে রইল।

অবশ্য তারপর আর মধুসূদন অঙ্ক কষা নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামান নি। কাব্যের সমুদ্রে ডুবে গিয়েছিলেন তিনি এবং সেই সমুদ্র মন্থন করে "মধুভাণ্ড" দেশবাসীকে উপহার দিয়ে বলেছিলেন:

—গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

ম্যাকবেথ ঃ শেকসপীয়র

শুভম রায়

স্কটল্যাণ্ডের রাজা পরম ধার্মিক দয়ালু বৃদ্ধ ডানকান। তাঁর এক জমিদার কডোরের থেন বিদ্রোহ করল। সেই বিদ্রোহ দমন করে রাজার দুই সেনাপতি ম্যাকবেথ ও ব্যাংকো রাজপ্রাসাদে ফিরছেন। ইতিমধ্যে ডানকান সেই বিজয় সংবাদ শুনে এবং ম্যাকবেথের অসীম বীরত্বের কাহিনী অবগত হয়ে আনন্দিত হয়ে ঘোষণা করেছেন, কডোরের থেনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক এবং তার জমিদারি ম্যাকবেথকে দিয়ে তাঁকে করা হোক নতুন 'থেন অফ কডোর।'

একটা পাহাড় ঘেরা জলা। জলায় ধোঁয়ায় কুণ্ডলী উঠছে আর তার মধ্যে তিনটে ছায়ামূর্তি নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। অদ্ভুত তাদের আকৃতি। নারীর মতো দেহ। কিন্তু তাদের মুখে দাড়ি। দেখলে মনে হয় না এজগতের মানুষ। ঘুরে ঘুরে তারা নৃত্য করছে আর নিজেদের মধ্যে দুর্বোধ্য ভাষায় ছড়া কাটছে।

সেই জলার পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করবার সময় ম্যাকবেথ আর ব্যাংকো সেই তিনটে ডাইনীকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন।

বিস্ময়ের ঘোর কাটবার পর ম্যাকবেথ উচ্চকণ্ঠে তাদের প্রশ্ন করলেন—কে তোমরা? কথা কইতে পারো তো উত্তর দাও।

প্রথম ডাইনী বললে—জয় হোক ম্যাকবেথ। তুমি গ্রামিসের থেন, তোমার জয় হোক।

গ্রামিস নামক জমিদারির থেন অর্থাৎ অধিপতি ছিলেন ম্যাকবেথ। তাই বোধ করি তারা তাঁকে গ্রামিসের থেন বলে সম্বোধন করল।

দ্বিতীয় ডাইনী এবার বলে উঠল—জয় হোক ম্যাকবেথ। তুমি কডোরের থেন। তোমার জয় হোক।

সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় ডাইনী বলে উঠল—জয় হোক ম্যাকবেথ। তুমি হবে স্কটল্যাণ্ডের রাজা।

শুনে চমকালেন ম্যাকবেথ। এরা বলে কি? কডোরের থেন? স্কটল্যাণ্ডের রাজা? এসব তো তিনি কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেন নি।

এবার ব্যাংকো বললেন—সত্যি করে বল, তোমরা কি দেহধারী প্রাণী, না হাওয়া মাত্র, আমার বন্ধুকে তোমরা অনেক ভাল ভাল কথা বললে, কিন্তু আমায় তো কিছু বললে না। আমার কি কিছুই বলবার নেই তোমাদের?

তখন প্রথম ভাইনী বললে—জয় হোক ব্যাংকো, তুমি ম্যাকবেথের মত বড় হবে না। আবার একদিক দিয়ে ম্যাকবেথের চাইতেও বড় হবে।

দ্বিতীয় জন বললে—জয় হোক ব্যাংকো, একদিক দিয়ে ম্যাকবেথের চাইতে অনেক বেশী সুখী হবে তুমি।

তৃতীয় ভাইনী যোগ করলে—তুমি নিজে রাজা হবে না। কিন্তু তোমার বংশের লোক এদেশের রাজা হবে।

বলতে বলতে তারা সেই কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেল।

ম্যাকবেথ আর ব্যাংকো দুজনের চিত্তই আলোড়িত। এ কী অদ্ভুত দৃশ্য তাঁরা দেখলেন, কী সব বিচিত্র ধর্মাবোধক কথা শুনলেন।

ম্যাকবেথ গভীর চিন্তামগ্ন। তিনি গ্লামিসের থেন বটে, কিন্তু কডোরের থেন কেমন করে হবেন, কডোরের থেন তো জীবিত! আর ফটল্যাণ্ডের রাজা? তাই বা কী করে সম্ভব।

ব্যাংকো বললেন,—অদ্ভুত ব্যাপার! তাই না? কী ভাবছ।

ম্যাকবেথ বললেন,—ভাইনীদের কথা, তোমার বংশধরেরা রাজা হবে।

ব্যাংকো ম্যাকবেথের মনের প্রতিক্রিয়া বুঝতে পারলেন। পরিহাসের সুরে বললেন—আর তুমি যে নিজেই রাজা হবে।

হঠাৎ অদূরে কয়েকজন অশ্বারোহীকে দেখা গেল, তারা রাজসভার লোক, রাজা ডানকান তাদের পাঠিয়েছেন, রণজয়ী সেনাপতি দুজনকে আগ বাড়িয়ে সম্বর্ধনা জানিয়ে রাজার কাছে নিয়ে যাবার জন্যে। তারা জানালো, রাজা আদেশ দিয়েছেন, কডোরের থেনকে বধ করা হবে এবং তার জমিদারি বাজেয়াপ্ত করে তা ম্যাকবেথকে দেওয়া হবে। ম্যাকবেথ হবেন কডোরের থেন।

শুনে যেন বিহ্বল হলেন ম্যাকবেথ! ভাইনীদের মধ্যে দ্বিতীয় জনের কথা মিলে গেল। তাহলে বাকি কথাটাও কি সত্য হবে? তিনি কি সত্যিই ফটল্যাণ্ডের রাজা হবেন?

ম্যাকবেথের মন উচ্চাশার দোলায় দুলতে লাগল।

॥ দুই ॥

ম্যাকবেথের গ্লামিস দুর্গে তাঁর সঙ্গে বাস করেন তাঁর স্ত্রী লেডী ম্যাকবেথ।

ম্যাকবেথ রাজধানীতে পৌঁছে তাঁর স্ত্রীকে পত্র দিয়ে ভাইনীদের সব কথা সবিস্তারে জানিয়েছেন, পত্র পড়ে লেডী ম্যাকবেথ দারুণ উত্তেজিত হয়েছেন। লেডী ম্যাকবেথ ছিলেন এক অতি লোভী এবং উচ্চাভিলাষিনী রমণী। স্বামীর বাহুবল এবং নিজের মনোবলের উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। চেষ্টা করলে ফটল্যাণ্ডের সিংহাসন লাভ করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব নয় বলে তিনি মনে করলেন। ভাইনীদের ভবিষ্যৎবাণী তাঁকে সফল করতেই হবে। তিনি জানেন, তাঁর স্বামীর মন দুর্বল। তাঁকে উত্তেজিত করতে হবে, সাহস আর উৎসাহ জোগাতে হবে। লেডী ম্যাকবেথ নিজেকে প্রস্তুত করে নিলেন।

এমন সময় দূত এসে জানালো, রাজা ডানকান আজ এই দুর্গে আসছেন। ম্যাকবেথের উপর তাঁর স্নেহ যে কত গভীর তা প্রমাণ করবার জন্যেই তিনি আজ রাত্রে এখানে এসে অতিথি হবেন।

সংবাদ শুনে লেডী ম্যাকবেথের বুকটা ধক্ করে উঠল। এ কী নিয়তির ইশারা? নিজেকে সংযত করে তিনি দূতকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার প্রভু কোথায়—সেনাপতি ম্যাকবেথ?

তিনি এখনি আসবেন। বলে দূত চলে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ম্যাকবেথ এলেন। লেডী ম্যাকবেথ তাঁকে প্রশ্ন করলেন—রাজা আসছেন কখন?

—আজ সন্ধ্যায়, উত্তর দিলেন ম্যাকবেথ।

—ফিরতে চান কবে?

—রাত্রি শেষেই।

লেডী ম্যাকবেথ বলে উঠলেন—তাহলে এ রাত্রি তাঁর শেষ হবে না।

চমকে উঠলেন ম্যাকবেথ—এ কী কথা বলছ তুমি?

নিজের মনে যে চিন্তা এক একবার বিদ্যুতে চমকের মত হানা দিয়ে যাচ্ছে, স্ত্রীর মুখে সেই কথা উচ্চারিত হতে শুনে ভয়ে এক পা পিছিয়ে গেলেন তিনি।

। তিন ।

রাজা এলেন, সঙ্গে সেনাপতি ব্যাংকো, সেনানায়ক ম্যাকডাফ, রাজপুত্রদ্বয় ম্যালকম ও ডোনালবেন এবং উচ্চপদস্থ পারিষদবর্গ, সবাই আজ ম্যাকবেথের অতিথি। সবাই সম্মান জানাতে এসেছেন যুদ্ধজয়ী বীর সেনাপতিকে।

মহাভোজের আয়োজন করেছেন ম্যাকবেথ, অতিথিরা সবাই আহারে বসলেন। কিন্তু ম্যাকবেথ তাঁদের সঙ্গে বসতে পারছেন না। লেডী ম্যাকবেথ তাঁর কানে যে মন্ত্র শুনিয়েছেন তা তাঁর চিত্তকে তোলপাড় করে তুলেছে। দুটো শক্তি দুদিকে টানছে তাঁর মনকে। উচ্চাশা বলছে—এ সুযোগ হারিও না। রাজমুকুট আজ তোমার হাতের মুঠোয়। ভাইনীরা তো বলেছে তুমি রাজা হবে। সুতরাং সাহস করে হাত বাড়াও। বুড়ো রাজার মাথা থেকে মুকুট তুলে নিজের মাথায় পর। এ সুযোগ হারিও না।

কিন্তু বিবেক প্রতিবাদ জানাচ্ছে—ধিক্ তোমার চিন্তাকে। তোমার রাজা, তোমার অতিথি, ধর্মপ্রাণ বৃদ্ধ তোমার ভালবেসে যেচে তোমার ঘরে এসেছেন। তাঁকে তুমি হত্যা করবে? এ পাপ কি সয়? এমন কাজ করো না ম্যাকবেথ।

অন্তরের এই দোটানায় অস্থির হয়ে ভোজসভা থেকে পালিয়ে এলেন ম্যাকবেথ। সঙ্গে সঙ্গে লেডী ম্যাকবেথ এসে তাঁর পাশে দাঁড়ালেন। তিনি স্বামীর দুর্বলতা ধরে ফেলেছেন। কঠোর তিরস্কার করে বললেন—কেমন ধারা পুরুষ তুমি, অন্তরে যা চাও তা পাবার চেষ্টা করতে ভয় পাও?

ম্লান স্বরে ম্যাকবেথ বললেন—ভয় নয়। কিন্তু লোকে আমাকে ভালবাসে, সম্মান করে, একাজ যদি আমি করি আর তা যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে তাহলে তা কি কলঙ্কের ব্যাপার হবে বল দেখি।

গর্জে উঠলেন লেডী ম্যাকবেথ—কলঙ্কের ভয়। তুমি পুরুষ, বীর তুমি, নিয়তিকে যদি বিশ্বাস করতে হয়, সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী তুমি। তুচ্ছ কলঙ্কের ভয়ে তুমি ভীত। বেশ, তোমায় কিছু করতে হবে না। আমিই নিজের হাতে এ কাজ করব।

চার।

গভীর রাত্রি, রাজকর্মচারী, পারিষদবর্গ সবাই ঘুমে অচেতন। কেউ দুর্গের ভিতরে। কেউ বা দুর্গ সংলগ্ন ভবনে।

সবাই ঘুমুচ্ছে। এমন কি রাজার শয়নকক্ষের দরজায় যে দু'জন প্রহরী আছে তারা পর্যন্ত। তাদের জেগে পাহারা দেবার কথা। কিন্তু লেডী ম্যাকবেথ তাদের পানীয়ের মধ্যে এমন কিছু ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছেন যা খেয়ে তারা ঘুমে অচৈতন্য হয়ে পড়েছে।

ম্যাকবেথকে পাশের ঘরে রেখে লেডী ম্যাকবেথ রাজার ঘরে ঢুকলেন। তাঁর হাতে ছুরিকা। দু'চোখে খুনের নেশা।

ঘরে ঢুকেই বেরিয়ে এলেন লেডী ম্যাকবেথ। তাঁর সারা দেহ কাঁপছে। স্বামীকে বললেন,—পারলাম না। ছুরি তুলেছিলাম তাঁর বুকে বসিয়ে দেবার জন্যে, কিন্তু হঠাৎ কেমন মনে হল, রাজার মুখটা যেন আমার স্বর্গগত বাবার মুখের মত, আমার হাত কেঁপে গেল, বুকও কেঁপে উঠল। ছুরি আর তুলতে পারলাম না।

ম্যাকবেথ তখন এগিয়ে গেলেন। মন থেকে ভয় দ্বিধা ঝেড়ে ফেলেছেন তিনি। সামনে দেখলেন, একটা প্রকাণ্ড ছোরা যেন হাওয়ায় দুলছে। সেই ছোরাই তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। ম্যাকবেথ প্রবেশ করলেন রাজার ঘরে।

একটু পরেই ফিরে এলেন। হ্যাঁ, তিনি কাজ সমাধা করে এসেছেন। তাঁর হাতের ছুরিতে রক্ত। তাঁর দু'চোখে উন্মাদের দৃষ্টি। ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করলেন স্ত্রীকে—একটা চিৎকার শুনছি না? একটা চিৎকার!

লেডী ম্যাকবেথ সবিস্ময়ে বললেন—চিৎকার! কোথায়? কই না তো! ওটা বোধহয় পাঁচার ডাক!

ঘাড় নেড়ে ম্যাকবেথ বললেন—কিন্তু আমি স্পষ্ট চিৎকার শুনেছি। কে যেন বলে উঠল—আর ঘুমিও না, জাগো। গ্লামিস ঘুমকে হত্যা করেছে। সে আর ঘুমুবে না। কডোর আর ঘুমুবে না। ম্যাকবেথও আর ঘুমুবে না।

লেডী ম্যাকবেথ ধমক দিয়ে উঠলেন—ও তোমার মনের ভুল। রক্তমাখা ছুরিটা নিয়ে এসেছো কেন? ওটা তো প্রহরীদের হাতে গুঁজে রেখে আসার কথা, যাও রেখে এসো।

কিন্তু অসমসাহসী ম্যাকবেথের সে সাহস আর নেই। আবার সেই বিভীষিকার ভিতর যাওয়া, না। তিনি পারবেন না। তখন লেডী ম্যাকবেথ নিজেই গিয়ে ছোরাটা রেখে এলেন নিদ্রিত প্রহরীদের হাতে।

পাঁচ।

রাত্রিশেষে পাশের ভবন থেকে ম্যাকডাফ এসে দুর্গের দ্বারে করাঘাত করতে লাগলেন। রাজার নিজস্ব কাজগুলি তিনিই করেন। রাজার আদেশ ছিল সূর্য ওঠবার আগেই ম্যাকডাফ এসে রাজাকে জাগাবেন।

দুর্গদ্বারের প্রহরী দরজা খুলে দিলে। ম্যাকডাফ সোজা ওপরে উঠে রাজার ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে বেরিয়ে এলেন তিনি। উচ্চকণ্ঠে হাহাকার করতে লাগলেন।

তাঁর সেই প্রবলকণ্ঠের বিলাপ শুনে দুর্গের সবাই জেগে উঠল। ব্যাপার কি?

রাজা খুন হয়েছেন! রাজা নিহত? শুনে সবাই যেন ভয়ে পাথর হয়ে গেল।

ম্যাকবেথ যেন ঘুম থেকে জেগেই ছুটে এলেন। রাজার ঘরে ঢুকেই বেরিয়ে এসে তিনি কপালে করাঘাত করে বলতে লাগলেন—এ কী হল! আমার বাড়িতেই রাজা খুন হলেন! অমন দয়ালু প্রভু আমার বাড়িতে অতিথি হয়ে এসে প্রাণ হারালেন! এর চেয়ে যে আমার মরণ ছিল ভাল।

লেডী ম্যাকবেথ এলেন। খবর শুনে তিনি মূর্ছিতা হয়ে পড়লেন। তাঁকে সবাই পাশের ঘরে রেখে এল।

তারপর প্রশ্ন উঠল—কে এ কাজ করলে।

প্রহরী দু'জন তখনো অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। তাদের পাশে রয়েছে রক্তমাখা ছোরা। ম্যাকবেথ বললেন—নিশ্চয়ই এরা হত্যা করেছে।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেন ক্রোধে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। নিজের তলোয়ার টেনে নিয়ে ছুটে গিয়ে প্রহরী দুটোকে নির্মমভাবে বধ করলেন। পাছে চৈতন্য ফিরে আসার পর তারা ম্যাকবেথের সম্বন্ধে কিছু বলে, তাই তার পথ আগে থেকেই বন্ধ করলেন ম্যাকবেথ।

রাজপুত্ররা যখন রাজার মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে শোক প্রকাশ করছেন সেই অবসরে ম্যালকম আর ডোনালবেন দুর্গ থেকে বেরিয়ে ঘোড়ায় চড়ে পলায়ন করলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন, যে-শত্রু রাজাকে হত্যা করেছে, রাজ্যলোভেই একাজ সে করেছে, তাই তাঁদের জীবনও নিরাপদ নয়। তাঁরা পালালেন দক্ষিণ দিকে। ইংলণ্ডের রাজার আশ্রয় নেওয়াই তাঁদের উদ্দেশ্য।

তাঁরা পালিয়েছেন শুনে ম্যাকবেথ সুযোগ পেয়ে গেলেন। তিনি বলতে লাগলেন—রাজপুত্রেরা এভাবে পালালেন কেন? নিজেরা দোষী না হলে এভাবে পালানোর কোন অর্থ হয়না। নিশ্চয়ই রাজ্যলোভে তাঁরাই একাজ করেছেন।

রাজা রাজাহীন থাকতে পারেনা রাজবংশীয় বলতে ম্যাকবেথই এখন আছেন। সুতরাং সকলে তাঁকে রাজা বলে স্বীকার করে নিলে। ডাইনীদের তৃতীয় ভবিষ্যৎবাণীও সফল হল।

৫ ছয় ৫

ম্যাকবেথ রাজা হলেন। কিন্তু তাঁর মনে শান্তি নেই। কেবলই মনে পড়ে তাঁর বংশে রাজপদ স্থায়ী হবেনা। ডাইনীদের কথায় তো আর অবিশ্বাস করা যায়না, তারা বলেছে, ম্যাকবেথের পরে ব্যাংকোর বংশধরেরাই রাজা হবে। ম্যাকবেথ চিন্তা করছেন। অনবরত ভাবছেন। ব্যাংকোকে আর তাঁর ছেলে ফ্লিয়ান্সকে যদি হত্যা করা যায় তাহলে তো আর ব্যাংকোর বংশ রইলনা। রাজপদ তাহলে আর ব্যাংকোর বংশে যাবে কেমন করে? হ্যাঁ, এই পথ। এছাড়া আর পথ নেই।

কয়েকদিনের মধ্যেই ম্যাকবেথ এক বৃহৎ ভোজের আয়োজন করলেন। তিনি সিংহাসন পেয়েছেন সেই উপলক্ষ্যেই এই ভোজ। রাজ্যের সমস্ত গণ্যমান্য লোকদের নেমন্তন্ন হল, ব্যাংকো ও তাঁর পুত্র ফ্লিয়ান্সও নিমন্ত্রিত হলেন।

এদিকে ম্যাকবেথ দু'জন হত্যাকারী নিযুক্ত করলেন। ভোজের সন্ধ্যায় তারা পথের ধারে ওৎ পেতে রইল। ব্যাংকো ও ফ্লিয়ান্স যখন একটা বাগানের পাশ দিয়ে ভোজসভার দিকে আসছেন তখন

হত্যাকারী দু'জন তাঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ব্যাংকো নিহত হলেন। ফ্লিয়ান্স হত্যাকারীদের এড়িয়ে পালিয়ে গেলেন।

ওদিকে ম্যাকবেথের প্রাসাদে ভোজ সুরু হয়েছে। ভোজন কক্ষ আলোয় ঝলমল করছে। দুর্লভ রাজভোগ টেবিলে টেবিলে সাজানো। দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা সব নিজ নিজ আসনে বসেছেন। সঙ্গে সুন্দরীর দল।

ম্যাকবেথ ঘুরে ঘুরে সবাইকার সঙ্গে মিষ্টালাপ করছেন। ব্যাংকো আসেননি দেখে বারবার দুঃখ প্রকাশ করছেন। কথা বলতে বলতে তিনি মাঝখানে যে উঁচু আসনটি তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট ছিল সেই আসনের দিকে অগ্রসর হলেন—এক পা—দু'পা। তার পরেই তাঁর পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিউরে উঠল। তাঁর সিংহাসনে বসে আছে কে? ও যে স্বয়ং ব্যাংকো।

ব্যাংকো তো মরে গিয়েছে। এ খবর তো তিনি হত্যাকারীদের মুখে ইতিমধ্যে শুনেছেন! তবে রক্তমাখা ওই মূর্তি কার? ওকি ব্যাংকোর প্রেতাত্মা!

অতিথিরা কেউ সে ছায়ামূর্তিকে দেখতে পাচ্ছেন না। এমন কি লেডী ম্যাকবেথও না। দেখছেন একমাত্র ম্যাকবেথ। দেখতে দেখতে তাঁর মাথা গোলমাল হয়ে গেল। পাগলের মত চিৎকার করতে লাগলেন—কেন এসেছো। তুমি বলতে পারোনা যে একাজ আমিই করেছি। যাও চলে যাও, আমি সহ্য করতে পারছি না। যাও, যাও—

হঠাৎ তাঁর চোখের সামনে থেকে ছায়ামূর্তি অদৃশ্য হল। অতিথিরা ম্যাকবেথের এবম্বিধ প্রলাপ শুনে ভয়ে ও বিস্ময়ে হতবাক। কাকে এসব বলছেন ম্যাকবেথ! কেউ তো কিছু দেখতে পাচ্ছেনা। তাঁদের মনে একটা আবছা সন্দেহ উঁকি দিল।

স্বামীর অবস্থা দেখে এগিয়ে এলেন লেডী ম্যাকবেথ। অতিথিদের সম্বোধন করে বললেন—আপনারা কিছু মনে করবেন না। আমার স্বামীর মাঝে মাঝে এরকম মাথা গরম হয়। ছেলেবেলাতেই এর সুরু। রাজার শোচনীয় মৃত্যুর পর থেকে অসুখটা বেড়ে গেছে। এখনি সামলে উঠবেন। আপনারা ঠাণ্ডা হয়ে বসুন।

অতিথিদের এই কথা বলে স্বামীকে একান্তে নিয়ে গিয়ে ভৎর্সনা করে বললেন—কি করছ তুমি। স্থির হও। তোমার আচরণে সবাই সন্দেহ করবে যে, ঠাণ্ডা হও, নিজের আসনে বসে ভোজে যোগ দাও। নইলে সব পণ্ড হবে।

ম্যাকবেথ নিজেকে সামলে নিলেন। আসনে বসে এক পাত্র পানীয় তুলে নিয়ে সবাইকার স্বাস্থ্য কামনা করে পাত্র মুখের কাছে তুললেন। এমন সময় আবার সেই প্রেতাত্মা। ম্যাকবেথ আবার সব ভুলে চিৎকার করতে লাগলেন—চলে যাও, দূর হও।

এরপর অতিথিরা আর থাকতে রাজী হলেন না। ভোজসভা ভেঙে গেল। নানা রকম সন্দেহ নিয়ে সবাই চলে গেলেন।

॥ সাত ॥

পরের দিনই ম্যাকবেথ ভাইনীদের সেই জলার ধারে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি আরো ভবিষ্যৎ জানতে চান। ব্যাংকো মরেছে কিন্তু তার ছেলে বেঁচে আছে। তাকে সরানোর জন্যে ম্যাকবেথের চেষ্টা কি সফল হবে না? এসব কথা জানতে হবে।

ডাইনীরা তৈরী হয়েই ছিল। তাদের সামনে গনগনে আগুনে একটা প্রকাণ্ড কড়ায় সাপ, ব্যাঙ, প্যাচা, শেয়ালের নাড়িভুঁড়ি, নেকড়ের দাঁত, হাঙরের চোয়াল আর বিষাক্ত হেমলকের শিকড় সিদ্ধ হচ্ছিল, ধোঁয়া আর দুর্গন্ধ চারদিকে।

ম্যাকবেথ এসেই তাদের দেখে প্রশ্ন করলেন—আমার কথা কি জান, বল।

তাঁর কথার উত্তর না দিয়ে ডাইনীরা কড়াটা আগুনের মধ্যে উল্টে দিল। অমনি আকাশে কড়কড় শব্দে বাজ ডাকল আর একটা লোহার টুপি পরা কবন্ধ ম্যাকবেথের দৃষ্টি গোচর হল।

কবন্ধ বলে উঠল—ম্যাকবেথ! ম্যাকডাফকে সাবধান!

ম্যাকডাফ। হুঁ। ওই লোকটা ম্যাকবেথকে বেশ ভেবে বলে মনে হচ্ছে! ভূতের কথা ঠিক।

কবন্ধ অদৃশ্য হল। আবার বাজ ডাকল। এবার এলো দ্বিতীয় ছায়ামূর্তি—রক্তমাখা একটা শিশু। সে বললে—ম্যাকবেথ! রক্তপাত করতে ভয় পেও না। তোমার কোন আশংকা নেই। নারী গর্ভজাত কোন সন্তান তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

শুনে তাঁরী আশ্বস্ত আর খুশী হলেন ম্যাকবেথ। তবে আর ম্যাকডাফকে ভয় কিসের? নারী গর্ভের সন্তান কে নয়? ম্যাকডাফও তো মাতৃগর্ভ থেকেই ভূমিষ্ঠ হয়েছে।

দ্বিতীয় ছায়ামূর্তি মিলিয়ে গেল। এলো তৃতীয় ছায়ামূর্তি মুকুটপরা এক বালক, তার হাতে একটা বিরাট গাছ। সে বললে—ম্যাকবেথ! তোমার ভয় নেই। বার্ণাম বন যতদিন না ডানসিনান পাহাড়ে উঠে আসছে ততদিন তোমার কোন ভয় নেই।

ম্যাকবেথ আনন্দে অধীর হলেন। ব্যস! আর তাহলে তাঁকে পায় কে? একটা বন কি করে পাহাড়ের মাথায় উঠে আসবে। গাছের কি পা আছে?

॥ আট ॥

এদিকে পাপের ফল হাতে হাতে ফলতে শুরু করেছে। লেডী ম্যাকবেথের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। একেবারে বদ্ধ উন্মাদ। রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থাতেই ঘুরে বেড়ান। বিড় বিড় করে আপন মনে কথা বলেন। চিকিৎসকরা বললে—এ ব্যাধি মনের, দেহের নয়। এ রোগের ওষুধ নেই।

ম্যাকবেথ রেগে বললেন—মনের ব্যাধির ওষুধ নেই? তাহলে ছুঁড়ে ফেলে দাও তোমাদের ওষুধের বাক্স।

কিন্তু স্ত্রীর অসুখ নিয়ে ভাববার সময় তাঁর নেই। তিনি ম্যাকডাফকে ধরে আনবার জন্যে সৈন্য পাঠালেন। কিন্তু চতুর ম্যাকডাফ অবস্থা বুঝে আগেই ইংলণ্ডে পালিয়েছিলেন। ম্যাকবেথের সৈন্যরা তাঁকে না পেয়ে তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের হত্যা করে ফিরে এলো।

সারা দেশে দারুণ অসন্তোষ ঘনিয়ে উঠল। সবাই কানাকানি করতে লাগল রাজা ডানকান ও সেনাপতি ব্যাংকোকে ম্যাকবেথই হত্যা করেছেন। ম্যাকডাফের দেখাদেখি অনেক গণ্যমান্য লোক ইংলণ্ডে চলে গেলেন। সেখানে রাজা এডওয়ার্ডের আশ্রয়ে যুবরাজ ম্যালকম ও রাজপুত্র ডোনালবেন বাস করছেন। ম্যালকম ও অন্য সকলকার একান্ত অনুরোধে ইংলণ্ডের রাজা ঘটনাস্থলে অরাজকতা দূর করবার জন্যে মনস্থ হলেন এবং ম্যাকবেথকে দমন করবার জন্যে সেনাপতি সিউওয়ার্ডের অধীনে একদল সৈন্য পাঠালেন। সিউওয়ার্ড ম্যালকম, ম্যাকডাফ ও অন্যান্য থেন ও যোদ্ধাদের নিয়ে সৈন্য সমভিব্যাহারে ঘটনাস্থলে প্রবেশ করলেন।

ম্যাকবেথ হাসলেন। কোন্ শত্রু তাঁর কি করতে পারে? ডাইনীরা বলেছে, বার্ণাম কানন যতদিন না তাঁর এই ডানসিনান পার্বত্য দুর্গে না উঠে আসছে ততদিন তাঁর কোন ভয় নেই।

হঠাৎ অন্তঃপুরে রোদনের রোল! কি ব্যাপার! খবর এলো রেডী ম্যাকবেথ মারা গেছেন। একটা নিঃশ্বাস ফেলে ম্যাকবেথ বললেন—এজীবন যেন একটা ছোট্ট বাতি, যেন একটা চলমান ছায়া।

তদ্দণ্ডে এসে একটা ভয়ংকর সংবাদ শোনাল। বার্ণাম বন উঠে আসছে ডানসিনান পাহাড়ের মাথায়!

ক্রোধে ফেটে পড়লেন ম্যাকবেথ। অবিশ্বাস্য কথা! প্রতারণা! এ হতে পারেনা। একটা গোটা বন কখনো—

কিন্তু বেরিয়ে এসে তিনি সভয়ে সবিস্ময়ে দেখলেন, সত্যিই, বার্ণাম বন ধীরে ধীরে উঠে আসছে পাহাড়ের মাথায়। আসলে ব্যাপারটা হল, ইংরেজ সৈন্যরা শত্রুর তীর থেকে নিজেদের বাঁচার জন্যে বার্ণাম বনের এক একটা গাছের ডাল কেটে তাই সামনে ধরে পাহাড়ের মাথায় উঠে আসছে। দূর থেকে সৈন্যদের চোখে দেখা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে যেন ডালের আড়ালে একটা বন ক্রমশ উপরে উঠে আসছে।

তাহলে ডাইনীরা ম্যাকবেথের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। এই কি তাহলে বার্ণাম বন উঠে আসার অর্থ?

পাপী হলেও ম্যাকবেথের মধ্যে বীরত্বের অভাব ছিল না। যুদ্ধ করতে জানতেন। তাই ভয় পেলেন না। রণসাজে সেজে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর অস্ত্রের আঘাতে বহু শত্রু সৈন্য মারা পড়ল।

তখন এগিয়ে এলেন ম্যাকডাফ। ম্যাকবেথের ভয় হল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে গেল মৃকুটপরা প্রেতের আশ্বাস—নারী গর্ভে যার জন্ম সে তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবেনা।

এই আশ্বাসে তিনি নির্ভয়ে ম্যাকডাফকে আক্রমণ করলেন। যুদ্ধ করলেন অসীম বীরত্বের সঙ্গে। বললেন, যার নারী গর্ভে জন্ম তাকে আমি ভয় করিনা।

কিন্তু যখন ম্যাকডাফের মুখে শুনলেন, স্বাভাবিকভাবে ম্যাকডাফ ভূমিষ্ঠ হননি, চিকিৎসকের হাত তাঁকে টেনে মাতৃজঠর থেকে বার করেছিল, তখন বিষম আতংকে ভীত হলেন ম্যাকবেথ। ডাইনীরা তাহলে এদিক দিয়েও তাঁকে ফাঁকী দিয়েছে।

আজ স্ত্রী পুত্র কন্যার হত্যার প্রতিশোধ নিতে এসেছেন ম্যাকডাফ, তাই মরীয়া হয়ে তিনি লড়ছেন। আর বীর হলেও নিজের পাপের ভারে ম্যাকবেথ দুর্বল হয়ে পড়লেন, গভীর হতাশায় তাঁর মন বিক্ষুব্ধ, তাঁর হাত কাঁপছে তলোয়ার চালাতে, পা টলছে, মাথা ঘুরছে।

বর্শের জন্ম হল শেষ পর্যন্ত। ম্যাকডাফের হাতে ম্যাকবেথ নিহত হলেন। যুদ্ধ শেষ হল। ম্যাকবেথের ছিন্নমুণ্ড ম্যালকমকে উপহার দিয়ে ম্যাকডাফ তাঁকে স্কটল্যাণ্ডের রাজা বলে অভিবাদন জানালেন।

সহযাত্রী

আশীষ গুপ্ত

বাহিরখণ্ড যাচ্ছিলাম, তারকেশ্বর লাইনের বাহিরখণ্ড। যাচ্ছিলাম একটা দুঃসাধ্য প্রয়াসে। বেয়াদ-বাচ্চা বেয়ন নিজের ল্যাজ ধরবার চেষ্টায় বন্ বন্ করে ঘুরপাক খায় তেমনিতর এক চেষ্টায় বলা চলে।

যাচ্ছিলাম কিন্তু পাওনা টাকা আদায়ের জন্যে। একাজ আমি সাধারণত করিনে। যখন দিই "গোবিন্দায় নমঃ" বলেই দিই। ফেরত পাই ভালো, না পাই সে তো সবই "তাঁর ইচ্ছে"। তবে এই "তাঁর ইচ্ছে"র প্রাচুর্য জীবনে এতবার ঘটল এবং ঘটছে যে সম্প্রতি বেকায়দায় পড়ে গিয়েছি। তাই যাচ্ছিলাম একটা ক্ষীণ চেষ্টায়, যদি দৈবাৎ—

লোকাল ট্রেনের তিন-ধাড়ি কামরায় উঠে পড়লাম। জানালার দিকে একটু জায়গা ছিল, বসে পড়লাম সেখানে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এক ভদ্রলোক এসে বসা দিলেন।

কি মশাই, বসবার একটুকরো জায়গা হবে নাকি? দরুন না একটু চ্যাপ্টা হয়ে, আদ্‌তোভাবে কিছুক্ষণ বসি।

অপেক্ষা করলেন না আমাদের উত্তরের। আমার পার্শ্ববর্তী ভদ্রলোককে ও আমাকে দুদিকে ঠেলে দিয়ে মাঝখানে বসে পড়লেন। প্রথমে বসলেন কুঁকড়ে। কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যে নিজেকে সোজা করে নিয়ে জানালার গা পর্যন্ত শরীরটাকে ঠেলে দিলেন। দুদিকে আমরা দুজনে সঙ্কুচিত হয়ে বসে রইলাম।

এই যেমন কেমন ঝুলিয়ে গেল। যদি হয় সুজন—

প্রসন্নমুখে প্রবাদ বচনের বাকিটা আর উল্লেখ করলেন না। ঝোলা থেকে একটা প্রমাণ সাইজের শিশি বের করলেন, সেটাকে শিশি না বলে বোতলও বলা চলে। বিশাল তার চেহারা, আউন্স ছয়েক তার ধারণ-শক্তি হবে।

এতক্ষণে লোকটির দিকে ভালো করে তাকাবার সুযোগ পেলাম। ছেঁড়া ময়লা শার্ট গায়ে, কাঁধে একটা বিশাল ঝোলা। কোরা কাপড় পরনে, খালি পা। হাত-পায়ের নখ সম্ভবত বছরখানেকের মধ্যে কাটা হয়নি, হিংস্র শ্বাপদের মতন হয়ে উঠেছে। মুখে কয়েকদিনের সঞ্চিত দাড়ি, মাথায় বেয়ালের ল্যাজের মতন একগোছা টিকি।

সেই শিশি—অথবা বোতল—থেকে ঘন ঘন নস্যি নিতে লাগলেন। ওপাশের ভদ্রলোক এতক্ষণে তাঁর হতচকিত ভাব কিছুটা সামলে উঠেছেন। বললেন, কেমন নস্যি? দিন তো এক টিপ।

এ নস্যি? কেমন!—নস্যি নয় মশাই, এ হল সোনার গুঁড়ো, স্বর্ণভস্ম! আড়াই শ' টাকা একবার ধার নিয়েছিলাম একটা বদমাইশ লোকের কাছ থেকে। জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল সুদের জন্যে, আসলের জন্যে। অন্যায় আবদার! টাকা দিয়েছিল, দিয়েছি। যখন পারব ফেরত দেব। তা নয় দিনরাত উপদ্রব! এল টাকা চাইতে। সমাদর করে বসালাম। দিলাম খাতির করে একটিপ নস্যি। বলল, টাকা দাও। বলেই এক বিরাট হাঁচি। তারপর সেই যে হাঁচ্ছো, হাঁচ্ছো আরম্ভ হল তারই ধাক্কায় ব্যাটা শেষে পালাতে পথ পায় না। তারপর থেকে আর তাগাদায় আসেনি। শুনছি নাকি সেই হাঁচি থেকে হাঁপানি ধরার অ্যালার্জি

হয়েছে। ঘোর সকালবেলা পাঁচ মিনিট ধরে অনবরত হেঁচে চলে, কিছুতেই থামে না। পাগলের মতন হয়ে গিয়েছে, যত যত ডাক্তার দেখাচ্ছে, কিন্তু হচ্ছে না।

আবার একটিপ নস্যি নিলেন।

যত্ ব্যাটা হেঁচে! আর তাগাদায় আসবি? —সুপ্রসন্ন মন্তব্য।

কাহিনী শুনে ওপাশের ভদ্রলোক তাঁর বাড়ানো হাত গুটিয়ে নিলেন। কিন্তু মধ্যবর্তী কণ্ঠে অভয়বাণী উচ্চারিত হল, নিন না, নিন। আপনার কোন অ্যালার্জি হবে না, উপকারই হবে। আপনি তো আর টাকার তাগাদা করেন নি।

কিন্তু পিছোন হাত আর এগোল না। মুখে বললেন, থাক্‌গে—

মুচকি হাসলেন হাইকেন।

বৃথাই ভয় পেলেন মশাই। একটিপ নিলে সত্যি সত্যিই বুঝতেন এ নস্যি নয়, হীরকচূর্ণ।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। গুটোন হাত গুটিয়েই রইল। প্রবল উত্তর এল, না, না: নস্যি তো আর আমি সাধারণত ব্যবহার করিনে।

উত্তরপাড়ার গাড়ী থামতেই দাঁতের মাজনের লোক উঠল, গজপতি দাঁতের মাজন। মলিন, জীর্ণ, বুভুক্ষু চেহারা। চোখে অসহায় দৃষ্টি। হাতে একটা এআর-ওএস্-এর ছেঁড়া ব্যাগ, তার মধ্যে কতকগুলো মাজনের শিশি এবং কৌটো।

বলতে লাগল সে, অভ্যস্তভাবে গুছিয়ে।

মানুষের শরীরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল দাঁত। আপনারা এর যত্ন করুন, দেখবেন রোগ বালাই কিছু থাকবে না। সুস্থ শরীরে, অটুট স্বাস্থ্যে চিকিৎসকবিহীন দীর্ঘজীবন যাপন করতে পারবেন। আর যদি দাঁত খারাপ হয়, যদি পাইওরিয়া হয়, জিঞ্জিভাইটিস হয়, ক্যারিস হয়, দাঁতের যে কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়, তাহলে বাত হবে, চোখ খারাপ হবে, কান খারাপ হবে, হৃদয়ের গোলমাল হবে এবং পেটের এই গোলযোগ থেকে শেষ অব্দি কি রোগ যে হবে না বলা শক্ত। যে কোন অসুখের জন্যে ডাক্তারের কাছে যান, প্রথমেই শুনবেন 'দাঁতটা দেখিয়ে আসুন।' সুতরাং—

এবার একটু দম নিল তার এই রুদ্ধশ্বাস বক্তৃতার মাঝখানে।

সুতরাং এই 'গজপতি মাজন' ব্যবহার করুন। এতে নড়া দাঁত শক্ত হয়, ভাঙ্গা দাঁত জোড়া লাগে, পড়া দাঁত নতুন করে গজায়। সর্বরকমরোগের মহৌষধ এই 'গজপতি দাঁতের মাজন।' কৌটো ২৲ পয়সা, শিশি ৪০। শিশিতে থাকে কৌটোর তিনগুণ।

বক্তৃতা আরও চলল এক নাগাড়ে। টপাটপ কিন্তু কৌটো ও শিশি বিক্রী হতে লাগল। তা বিক্রী হল প্রায় পাঁচ ছ' টাকা। লোকটা নেমে গেল শেওড়াফুলিতে। হাইকেন ফিসফিস করে বললেন আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে, সব সাজানো। এ খদ্দের হল সব নিজের লোক, দু'একজন ছাড়া। এর বেশীর ভাগ কৌটো শিশি আবার কালই ওর কাছে ফেরত যাবে। নতুন খদ্দের জমাবার এটা একটা পুরোন কৌশল।

উদাসীন ভাবে বললাম, হতে পারে।

হতে পারে কি মশাই? হয়েছে। ঝাঁঝিয়ে উঠলেন এইবার।

পনেরো মিনিটে যদি পাঁচ টাকা বিক্রী হত তাহলে ওর আর ওই চেহারা থাকত না। ছেলে ঘুচঘুচে গা থেকে তেলের শিশি ভর্তি করে নিতে পারতেন তাহলে।

আবার নস্যি নিলেন। গলার সুর উঁচু করে বললেন, ঘরের জমাবার, সভা জাঁকাবার একটা গল্প বলি তাহলে।

ঘুচকি হাসলেন।—ইউনিভার্সিটিতে পড়ি তখন। সংস্কৃত নিয়ে এম-এ।

আমি যে এই অপ্রত্যাশিত, অভাবনীয় সংবাদে চমকে উঠেছি তা লক্ষ্য না করেই বললেন, রবীন ছিল আমাদের মধ্যে প্রয়োগনিপুণ রসিক। বলল সে, বিকেলবেলা কলেজ-স্কোয়্যারে মীটিং করব। কিরকম সভা জমাই দেখবি। তোরা জন আটেক থাকবি সামনে পিছনে ছড়িয়ে। জায়গা বুঝে হাততালি দিবি। ব্যস আর কিছু করতে হবে না তোদের।

বিকেলে শুরু হল সভা। আমরা দু'জন বসলাম সামনের ধাপে, বাকি চ'জন রইল এদিক সেদিক ছড়িয়ে।

বেঞ্চির ওপর উঠে দাঁড়াল রবীন। হাত-পা নেড়ে শুরু করল, 'বন্ধুগণ, দেশের আজ নিদারুণ দুরবস্থা, বাঙালীর তো আরও। আগে আর কিছু না হক বাঙালীর গলায় জোর ছিল, চেঁচিয়ে কথা বলত। গুছিয়ে কথা বলত, যুক্তি দিয়ে কথা বলত। এখন তো আবোল-তাবোল বকে, তা-ও আবার চিঁচিঁ গলায়। অন্যপ্রদেশের লোকেরা বাঙালীর বক্তৃতা সম্পর্কেও হতাশ হয়ে পড়েছে। সম্প্রতি ঢিল ছোড়ার বিষয়ে বাঙালী কিছুটা দক্ষতা অর্জন করেছে বটে, কিন্তু—'

এইবার লাগালাম আমরা সামনের দু'জন জোরসে হাততালি। লোক জমে গিয়েছিল এর মধ্যে, তারই ভেতর দাঁড়িয়ে ছিল আমাদের ছ'জন বন্ধু ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে। তারাও লাগাল হাততালি। সুতরাং সভা জমে উঠল। কৌতূহলী জনতা এপাশ-ওপাশ থেকে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। সকলেই লাগাল হাততালি।

প্রবল উৎসাহে বলে চলল রবীন, 'বাপিয়ায় আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন মাদাম লজটোভস্কি, হস্ত মশাই, এটা কি সত্যি যে আপনাদের দেশে লোকেরা সোনার থালায় ভাত খায়?—মাথা মুঁকিয়ে বাউ করে জবাব দিলাম, হাঁ মাদাম, একদিন হয়তো ছিল ওকথা সত্যি। কিন্তু এখন তারা কলাপাতাতেও ভাত খেতে পায় না।—পাতা হয়তো কিছু অবশিষ্ট আছে, কিন্তু ভাত নেই।'—এইবার প্রবলতর হাততালি।

রবীন খেয়ে একটু দম নিল। সুপ্রসন্ন মুখে হাততালিটা পরিপাক করে, পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাম মুছল কপালের। চীৎকার করে দ্বিগুণ উৎসাহে বলতে লাগল সে, 'মনে পড়ে বিদ্যাসাগরের সেই অমর বাণী,—বস্তু তিন প্রকার, কঠিন, তরল, বায়বীয়—'

এবারও হাততালি! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একখানা ইঁট এসে পড়ল পিছন থেকে রবীনের মাথা লক্ষ্য করে। এক নিমিষে রবীন হাওয়া। একেবারে সামনে বসেও বুঝতে পারলাম না সে কোথা দিয়ে সরে পড়ল।—সভা ভাঙল। আমরা রবীনের জোরারের জল আলাদা-আলাদাভাবে কেটে পড়লাম।

ওপাশের ভদ্রলোক সন্তর্পণে হাসি চাপতে গিয়ে হাঁচলেন, হ্যাঁচ্চো, হ্যাঁচ্চো। তাঁর দিকে তাকালেন হাইকেন করুণাসুন্দর দৃষ্টিতে।

সদি হয়েছে দেখছি। খবরদার ডাক্তারী ওষুধ খাবেন না। যারা পড়বেন খেলে। ইংরেজরা রসিকতা করে বলে, অসুখ হলে ডাক্তার ডেকো। নইলে ডাক্তাররা বাঁচবে কি করে? প্রেসক্রিপ্‌শন

পেলে ওষুধ কিনো। নইলে ডাক্তারখানাগুলো বাঁচবে কি করে? ওষুধ কিনলে তা ফেলে দিয়ো। নইলে তুমি বাঁচবে কি করে?

আবার নস্যি নিলেন।

বিচক্ষণ ভাক্ত মশাই। সব জানে। ওষুধের কারখানা করে, কলাও করে বিজ্ঞাপন দিয়ে পৃথিবীর লোককে ভোবায়। অথচ রসিকতা করে সত্যি কথা শুনিয়ে দেয়। নিজেদের প্রাণ বাঁচায় বোধ হয় অমনি করে। যাকগে আপনার সদ্গির বন্দোবস্ত আমিই করে দিচ্ছি। কিন্তু খবরদার খুনেদের কাছে যাবেন না। বিষগুলো উদরস্থ করবেন না। করেন যদি তো হোমিওপ্যাথি। একফোঁটা ওষুধ আর একমাসের ভগবদ্বিশ্বাস। তিরিশদিন পরে একেবারে রোগমুক্তি। পারমাণবিক শক্তি মশাই,—সোজাসুজি আটম বম।

সিন্ধুর এসে গিয়েছিল। অনেক লোক নামল, উঠল। হাইকেন গ্র্যাটকর্মের দিকে তাকিয়েছিলেন। আমরা দুপাশের দুজন "চিত্রার্পিত প্রায়" বসে! গাড়ী স্টেশন ছাড়তেই আবার শুরু করলেন—

বাবা একদিন ঘুম থেকে উঠে ছটফট করতে লাগলেন। সমস্ত শরীরে নিদারুণ অস্বস্তি। অথচ ঠিক যে কি কষ্ট তা বলতে পারেন না। কেবল পাগলের মত ছটফট করতে থাকেন। ভয় পেয়ে গিয়ে ডাকলাম প্রথমেই বড় ডাক্তার বিজয় বোসকে।

তিনি তো অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন টিপেটুপে, প্রশ্ন করলেন তজনখানিক। ফসফস করে লিখে ফেললেন বিরাট প্রেসক্রিপশন। গম্ভীর মুখ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। পিছনে পিছনে আমি।

একটু চোখে চোখে রাখবেন। মাথাখারাপের পূর্বলক্ষণ। পাকাপাকি বলতে পারব দু'একদিন কাটলে পর। ঘুমটা ভালো হওয়া দরকার। ঘুমের ওষুধ দিয়ে গেলাম। কাল খবর দেবেন।

মাথায় হাত দিয়ে বসলাম। বাড়ীসুদ্ধ সকলেরই মুখ শুকনো।—ঠিক করলাম তখনই শৈলেন ডাক্তারকে ডাকা হবে। ক্ষুদে ডাক্তার, আমাদের পারিবারিক চিকিৎসক। হাঁকডাক, হামবড়াই বেশী নয়।—কিন্তু সাধারণ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য।

এল শৈলেন। তাকে বিজয় বোসের diagnosis-এর কথা কিছু বলা হল না। অনেক প্রশ্ন করল শৈলেন। শেষে বলল, কিছু হয়নি ওঁর। কাল সমস্তদিন urine হয়নি।—একটা diuretic দিয়ে গেলাম। এতে যদি না হয় তাহলে বিকেলে এসে catheter দেব।

শৈলেন ডাক্তারের কথাই ঠিক হল। catheter-এর পর বাবা খুবই relief পেলেন। মাথা খারাপের কোন লক্ষণ আর দেখা গেল না।—এটা চারবছর আগের ঘটনা।

বাবার এখন আশী বছর বয়স। এখনও কারও সাহায্য ছাড়াই সত্যিমিথ্যে মিশিয়ে ইনকাম ট্যাক্সের নির্ভুল রিটার্ণ submit করেন। কাজেই ওঁর মাথা কত সাফ সহজেই বুঝতে পারছেন।

একটু থেমে বললেন, দ্বিতীয় ঘটনাটা হল আমার মাকে নিয়ে।

পরের স্টেশন কাঁথারকুণ্ডুতে কিছু লোক নামল, উঠল। হাইকেন আবার নস্যি নিলেন।

গাড়ী ছাড়তেই পুনরায় ছিন্ন কাহিনী শুরু করলেন।

মার গলায় একটা ব্যথা, চোঁক গিলতে কষ্ট হয়। আমার এলেন বিখ্যাত বিজয় বোস। পরীক্ষা করলেন, প্রশ্ন করলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে গম্ভীরমুখে বললেন, specialist দেখান। হয়তো শেষ অবধি cancer-এ দাঁড়িয়ে যেতে পারে।

বাড়ীতে আতঙ্কের ছায়া। হৈচৈ লাগল সেন কার্যালয়ে। সেখানকার ডক্টর সেনের সঙ্গে ক্যানসার হাসপাতালের ডক্টর প্রবোধ মিত্রের খুব ভাব।

ডাক পাড়লেন ডক্টর সেন। প্রবোধ মিত্র গলার cancer-এর স্পেশালিস্ট নন। বিশেষ করে মেয়েদের যে-ধরণের cancer হওয়া সম্ভব তারই স্পেশালিস্ট তিনি। গলার cancer-এর জন্যে অন্য স্পেশালিস্ট দরকার।

আজকাল তো বিশেষজ্ঞদেরই দিন। চার কান, দাঁ কানের জন্যে আলাদা আলাদা বিশেষজ্ঞ। হোতলা থেকে পড়ে হাত ভাঙলে একজন হোতলার বিশেষজ্ঞ। তিনতলা থেকে পড়লে আর একজন! কিন্তু যাবলে দেখা।

খুঁজলাম। বেরোলেন একজন। নাক, কান, গলা হল তাঁর অধিকারে। তিনিই দেখলেন মাকে। দেখলেন তাঁর চেম্বারে। নানারকম যন্ত্রপাতি, নানারকম আলোর রশ্মি একশ' রকমের কায়দাকানুন করে দেখলেন তিনি। অবশেষে বললেন, cancer নয়। এমনি সাধারণ গলাব্যথা। E. N. T. Specialist-এর কাছে যান।

চৌষট্টি টাকা গুণে নিলেন। কিন্তু আড়ম্বর যা হল তাতে টাকাটা সার্থক হল বলে মনে করে খুবই সান্ত্বনা পেলাম।

কিন্তু তার পরদিনই মার একেবারে গলার স্বর বন্ধ! একদম কথা বলতে পারেন না। শুধু চোখ দিয়ে জল পড়ে।—ভাবনা গেল বেড়ে। আচ্ছা একবার ডেকে দেখ আমাদের স্কুলে ডাক্তার শৈলেন চাটুয্যেকে।

এল শৈলেন ডাক্তার। দেখল মাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। হেসে বলল, মা, আপনার হার, আমার জিত।

মা তো কথা বলতে পারেন না, কাজেই তাকিয়ে রইলেন বোবা প্রশ্নের দৃষ্টিতে। বলল শৈলেন, আপনার কিছু হয়নি। কালই আপনি কথা কইতে পারবেন।—ডক্টর রায় আপনার জিভ ধরে টানাটানি করেছিলেন খুব?

হঠাৎ মার মুখ দিয়ে কথা বেরোল, হাঁ বাবা। সে যেন গোরুর জিভের মতন—জাকড়া জড়িয়ে সে কী টান। জিভ যেন মুখ থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে!—তাড়াতাড়া সুরে কেটে কেটে মা বললেন।

এই তো বেশ কথা কইতে পারছেন। জিভ খুব ব্যথা করছে তো? কালই ঠিক হয়ে যাবে। শুধু শুধু আমি আমার ফিএর টাকাটা পেয়ে গেলাম. যা—আর আপনি তা ভোগালেন।—হাসতে হাসতে চলে গেল শৈলেন। মা তো তার পরের দিনই all right।

আমার চোখেমুখে অবিশ্বাসের ছায়া ফুটে উঠল। হয়তো নিজের অজ্ঞাতসারেই তাঁর বেশভূষা এবং আকৃতি প্রকৃতির দিকে নজর পড়ল। কিন্তু ভদ্রলোক যে বুদ্ধিমান তাতে সন্দেহ নেই। এক লহমায় বুঝে নিলেন সমস্ত ব্যাপারটা। খানিকটা তিক্ত কণ্ঠে বললেন, ওঃ! আমার চেহারা দেখে গল্পগুলো বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? ভাবছেন বানিয়ে বলছি? না মশাই মিথ্যে বলবার পাত্র এ-পর্যন্ত নয়। এর প্রতিটি অক্ষর সত্যি।

ধরা পড়ে গিয়ে অপ্রস্তুত হয়ে সাধুখাঁর প্রতিবাদ জানালাম, না না, তা নয়। আপনার কথা আমরা অবিশ্বাস করিনি।

উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, আলবৎ করেছেন। মিথ্যে কথা বললেই হল? আর কেউ না করলেও আপনি করেছেন। ও-ধরণের শুভ্র মিথ্যের কোন মানে হয়না।

নস্যি নিলেন আবার। আনালা দিয়ে নাক ঝাড়লেন সশব্দে। নিজের আকস্মিক উত্তেজনায় যেন খানিকটা লজ্জিত হয়েছেন এমনিভাবে মৃদু হেসে বললেন, কিছু মনে করবেন না। হঠাৎ রাগ হয়ে গিয়েছিল। মামলা করে করে এইরকম মেজাজ হয়েছে। চারটে মামলা চালাচ্ছি একসঙ্গে। তারই ফলে চেহারা ও বদনক্ষুণ এই পর্যায়ে পৌঁছেছে। ধর্মাধিকরণের ধর্মজ্ঞানী উকিল, মুহুরী, পেয়াদা, পেশকার, মাছির ঝাঁকের পাল্লায় একবার পড়লে দাড়ি কামাবার সময় থাকবে না, চুল-নখ কাটাবার সময় থাকবে না, জুতো কেনবার সময় থাকবে না। জীবনে কখনও ও-রাস্তা মাড়াবেন না।—পারলে একদিন আমাদের কলকাতার বাড়ীতে আসবেন। সার্কিন ৪৮।২।১এ বালীগঞ্জ প্লেস। অধীনের নাম অধ্যাপক দাশুকড়ি মুখোপাধ্যায়।

একটু স্নেহের হাসি হেসে বললেন, দেখবেন বাড়ীর অবস্থা মোটের ওপর ভালোই। গল্পের সঙ্গে বিশেষ মেলানান হবে না।

বৈকালী প্রায় এসে গিয়েছিল। উঠে দাঁড়ালেন নামবার জন্যে।

আপনাদের সঙ্গে বকে বকে মাথা ধরে গেল। —ফোলা থেকে একটা শিশি বের করে একটা ট্যাবলেট খেয়ে ফেললেন।

কি খেলেন ওটা? অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম

Novalgin। অদ্ভুত কাজ করে। সঙ্গেই থাকে, দরকার হলেই খাই।

ওপাশের ভদ্রলোকটি এতক্ষণ পাথরের মত নিস্পন্দ হয়ে বসে ছিলেন। তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, ওঃ, আপনার নস্যির গুণটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।

আবার থলি থেকে বার করলেন একটা শিশি। বার করলেন একটা ট্যাবলেট।

নিন খান। ম্যাজিকের মত ফল হবে।

ভয়ে ভয়ে পুনরায় প্রশ্ন করলাম, কি ওটা?

Vitamin C, 500 mg.। নস্যির মত। একটু জল খেয়ে নেবেন। আমারও একটু জল খেতে হবে, তা স্টেশনে নেমে খেয়ে নেব'খন।

বৈকালীর গাড়ী থামল।

আচ্ছা আসি তাহলে, নমস্কার। একদিন আসবেন কিন্তু আমাদের বাড়ী।

গাড়ী থেকে নেমে হনহন করে হাঁটতে লাগলেন, মুখে বাঙ্গ-তীক্ষ্ণ হাসি।

হতভম্ব হয়ে তাঁর অপসয়মান মূর্তির দিকে তাকিয়ে রইলাম। ওপাশের ভদ্রলোকেরও আমারই মতন অবস্থা। কিন্তু বিশেষ কিছু চিন্তা করবার অথবা আলোচনার অবকাশ পাওয়া গেল না।

বাহিরথণ্ড এসে গেল।

প্রখ্যাত ও জনপ্রিয় সাহিত্যিক এবং বিচিত্রা ও গল্প-ভারতীর সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বহু গল্প উপন্যাস ও স্মৃতিকথা একদিন বাংলা সাহিত্যে এক আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। অনেকদিন তাঁর লেখনী স্তব্ধ। আজকের পাঠকদের অনেকের কাছেই উপেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ নূতন, তাই দেশবন্ধুকে নিয়ে উপেন্দ্রনাথের লেখা একটি সুন্দর স্মৃতিকথা গল্প-ভারতীর পাতা থেকে পাঠকদের সামনে তুলে ধরে দেশবন্ধু শতবার্ষিকী বছরে আমরা দেশবন্ধু ও উপেন্দ্রনাথ উভয়েরই প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করলেম।

সিংহ ঔর শিয়ারকা লড়হাই

—স্মৃতিকথা—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১৯১৫ সালের জুলাই মাস হইতে ভাগলপুরের প্রথম সবজজের এজলাসে বিখ্যাত লছমীপুর কেস আরম্ভ হইয়াছে। মকর্দমার দাবি সমগ্র লছমীপুর ষ্টেটের স্বত্বাধিকার লইয়া। কোর্ট-ফিস্ এবং জুরিসডিক্‌শনের জন্য মকর্দমার মূল্য নির্ধারণ করা হইয়াছে চল্লিশ লক্ষ টাকা, কিন্তু বস্তুতঃ মূল্যবান ধান-খনি পাহাড়-পর্বত অরণ্যানী সমাকীর্ণ সুবিস্তৃত জমিদারীর প্রকৃত মূল্য চল্লিশ লক্ষ টাকার অনেক বেশী। মকর্দমার বিচার্য ইস্যুর সংখ্যাও চল্লিশ।

ইস্যু ধার্যের সময়ে বিবাদী পক্ষে, অর্থাৎ রাণী কুসুম কুমারীর পক্ষে আসিয়াছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের ভারত বিখ্যাত অ্যাডভোকেট ভবীর (পরে স্যার) রাসবিহারী ঘোষ। শুনানির সময়ে আসিয়াছেন বনামধন্য ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশ। বাদী পক্ষের ব্যবহারজীবিগণের শীর্ষ স্থানে আছেন কলিকাতা হাইকোর্টের সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার, চিত্তরঞ্জনের কনিষ্ঠ সহোদর, প্রফুল্লরঞ্জন দাশ (পরে পাটনা হাইকোর্টের জজ মিঃ পি. আর. দাশ) এবং স্যার (পরে লর্ড) এস. পি. সিংহ। ইহা ভিন্ন প্রত্যেক পক্ষে বড় ছোট মাঝারি দরের ওকালার জন করিয়া স্থানীয় উকিল আছেন। যে আকাশে চিত্তরঞ্জন প্রদীপ্ত চন্দ্রমা, আমি হচ্ছি সেই আকাশের একটি ক্ষীণপ্রভ তারকা,—অর্থাৎ বছর আড়াইয়ের একজন জুনিয়ার উকিল।

এজলাসে মকর্দমা আরম্ভ হইবার পূর্বে বৎসর দুই আড়াই ধরিয়া উভয় পক্ষে কমিশনের সাহায্যে বহু সাক্ষীর জবানবন্দি গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে, ১৯১৫ সালের লছমীপুরের কেস মামলা মকর্দমার ইতিহাসে একটি রাজসূয় যজ্ঞ। ভাগলপুরের বিবাদী অধিবাসীগণের মধ্যে মামলা-জগতে এই বিরাট যজ্ঞটি সিংহ ঔর শিয়ারকা লড়হাই (সিংহ ও শৃগালের যুদ্ধ: নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। সিংহ অর্থে বাদী পক্ষে স্যার এস্. পি. সিংহ; এবং শিয়ার অর্থে বিবাদী পক্ষে মিঃ সি. আর. দাশ। শেষ পর্যন্ত কিন্তু শৃগালের নিকট সিংহকেই পরাজিত হইতে হইয়াছিল। মামলায় বিবাদী পক্ষ জয়লাভ করিয়াছিলেন।

(২)

ভাগলপুরের বাঙ্গালীদের মধ্যেও এই মকর্দমার নামকরণ লইয়া বেশ একটি কৌতুকাবহ যোগাযোগ দেখা দিয়াছিল। বাঙ্গালীরা লছমীপুর মকর্দমার নাম রাখিয়াছিল নাতী—মাতামহের মামলা। এ নামের সহিত বাদী-বিবাদী পক্ষের আত্মীয়তাগত কোনো যোগ ছিল না; উভয় পক্ষের কৌন্সিলের সম্পর্ক ধরিয়াই এই নামের উৎপত্তি হইয়াছিল। নাতী অর্থে স্যার এস. পি. সিংহ এবং মাতামহ অর্থে মিষ্টার সি. আর. দাশ। বস্তুত, উভয়ের মধ্যে এমন কোন সম্পর্ক না থাকিলেও এ সম্পর্ক স্থাপিত হইবার পক্ষে একটি অকাট্য যুক্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। চিত্তরঞ্জনের পুত্র শ্রীমান চিররঞ্জনের ডাক-নাম ছিল ভোম্বল, উপাধি ত দাশ বটেই। আর. সিংহের মামা যে ভোম্বল দাশ, এ কথা বাঙ্গালী মাত্রেই অবগত আছেন। সেই সূত্র অনুযায়ী চিররঞ্জন, অর্থাৎ ভম্বল দাশ হইলেন স্যার এস. পি. সিংহের মাতুল। ইহার পর মাতুলের পিতা চিত্তরঞ্জনের পক্ষে মাতামহ না হইবার উপায় ছিল না।

(৩)

চিত্তরঞ্জনের ভাগলপুরে অবস্থানের জন্য লছমীপুর-রাজ বিহারের জনপ্রিয় কংগ্রেস-নেতা পরলোকগত দীপনারায়ণ সিংহের সুবৃহৎ এবং সুরম্য বৈঠকখানা বাড়ীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেই গৃহে চিত্তরঞ্জন সপরিবারে বাস করিতেছেন। গৃহের সম্মুখে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ এবং পুষ্পোদ্যান; তাহার অব্যবহিত দক্ষিণে ফ্রীগঞ্জ রোড। ভাগলপুরের পূর্ব-পশ্চিম প্রসারী দীর্ঘতম রাজপথ, ভাগলপুর সহরের মেরুদণ্ড; গৃহের অব্যবহিত উত্তরে কলহনা। পূর্ববাহিনী ভাগীরথী নদী। তাহার উত্তরে দিগন্ত বিস্তৃত চরভূমি এবং তদুত্তরে ভাগলপুর হইতে বোধকরি দশ মাইল দূরে দিবলয়, অর্থাৎ আকাশ এবং ধরিত্রীর মিলন রেখা।

চিত্ত এবং চক্ষু—উভয়ের আনন্দদায়ক এই পরম রমণীয় পরিবেশের মধ্যে আমাদের প্রত্যহ সকাল এবং সন্ধ্যায় দুইবার করিয়া বৈঠক বসিত। সকালে বসিত লছমীপুর মামলা সংক্রান্ত আইন এবং এজাহার বিচারের পরামর্শ সভা; এবং সন্ধ্যায় বসিত সাহিত্য এবং সঙ্গীত আলোচনার স্পৃহনীয় আসর। যুক্তি এবং তর্কের নির্মম পাথরে শাণিত হইয়া যে-সকল নিষ্ঠুর অস্ত্র সকালের মন্ত্রণা-সভায় প্রস্তুত হইত, তদ্দ্বারা আদালতের এজলাসরূপ রণক্ষেত্রে প্রতিপক্ষকে জর্জরিত করিয়া বৈকালে দাশ সাহেব গৃহে ফিরিতেন কবি এবং সাধারণ ভদ্রলোকের নিশ্চিন্ত চিত্ত লইয়া। পিছনে পড়িয়া থাকিত আইন এবং আদালত। সে দিনের মতো লছমীপুর মকর্দমার বিষাদলক্ষ্মী খেরুয়ার কারাগারে প্রবেশ করিয়া ব্রীফ্ এবং নথিপত্রের সহিত বন্দী হইতেন; তৎপরিবর্তে সান্ধ্য সভায় অবতরণ করিতেন সাহিত্য এবং সঙ্গীতের কলালক্ষ্মী। চিত্তরঞ্জন ব্যতীত আমিই ছিলাম একমাত্র ব্যক্তি যাহাকে সকাল এবং সন্ধ্যার উভয় বৈঠকে হাজিরা দিতে হইত;—সকালে ব্যারিষ্টার দাশ সাহেবের জুনিয়ার রূপে মন্ত্রণা সভায়, সন্ধ্যাকালে কবি চিত্তরঞ্জনের সুহৃদরূপে শিল্প-মজলিসে।

এইরূপে আইন এবং এজাহার, সাহিত্য এবং সঙ্গীতের মধ্যে দিনগুলি আলোড়িত হইতে হইতে অবশেষে আসিয়া পড়িল অক্টোবর মাসের প্রারম্ভকাল.—অর্থাৎ পার্বণীয় পূজার সুদীর্ঘ তেত্রিশ দিনের ছুটি।

ছুটি হইবার কিছু পূর্ব হইতে মনের মধ্যে বেশ ভ্রমণের একটা প্রবল বাসনা জাগিয়াছিল। আলিপুরের উকিল বন্ধুবর শ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়ের সহিত কথা ছিল, ছুটি হইলে কলিকাতায় গিয়া কোনো একটা স্থান নির্বাচিত করিয়া লইয়া উভয়ে মিলিয়া ভ্রমণে নির্গত হওয়া যাইবে। যথা সময়ে বন্ধুবরের নিকট হইতে তদ্বিষয়ে নোটিশও পাইলাম। কিন্তু ছুটি যতই নিকটবর্তী হইতে লাগিল, সমস্যা ততই জটিলতর

হইতে আরম্ভ করিল। সংশয় পীড়িত মনের মধ্যে কে যেন থাকিয়া থাকিয়া বলে, কোথায় যাই, কোথায় যাই। সিমলা পাহাড় হইতে শ্রীযুক্ত মেজদাদার আহ্বান আসিয়াছে; কয়েকজন বন্ধু দার্জিলিং যাইবার কথাও বলিতেছেন। কিন্তু যেটখানেই যাই না কেন, সর্বপ্রথম কলিকাতায় যাইতেই হইবে। তথায় উপস্থিত হইয়া একটা কোনো বিষয়ের অবস্থা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া তাহার পর কোথাও যাওয়া না যাওয়ার কথা।

সিমলা অবশ্য আমার খুব ভাল লাগে। সিমলার কথা মনে হইলেই মনের মধ্যে বিরাট ও মধুরের এক অপূর্ব চিত্র ফুটিয়া উঠে, যাহার আকর্ষণ কোনোদিনই মন্দীভূত হইবে বলিয়া মনে হয় না। মহাকায় দৈত্যের মত বড় বড় নগ্ন পাহাড়ের লাফালাফি করিয়া আকাশের দিকে অগ্রসর হইবার সমারোহ সিমলা সহর হইতে ছুচার মাইল উত্তরে যাইলে যেমন দেখা যায়, হিমালয়ের আর কোনও অঞ্চলে তেমন দেখা যায় কিনা সন্দেহ।

তথাপি, সিমলা কয়েকবারই গিয়াছি। দার্জিলিং দেখিবার বাসনা বহুদিন হইতে মনের গোপন প্রদেশে লুকাইয়া বাস করিতেছে।

বাংলা দেশ হইতে সহস্রাধিক মাইল ঘুরে হিমালয়ের সুদূর পশ্চিমপ্রান্তস্থিত সিমলা কয়েকবারই আমাকে টানিয়া লইয়া গেল, অথচ বাংলার শীর্ষ দেশে অবস্থিত এক রাত্রির পথ দার্জিলিং এপর্যন্ত দেখা হইল না, ইহা শুধু দুঃখেরই নহে, লজ্জার কথাও বটে। শুনিয়াছি দার্জিলিং হিমাচ্ছন্ন, কুয়াশাময়, কুজ্ঝটিকার প্রহেলিকায় রহস্যাবৃত। না দেখিয়া দেখিয়া, এবং দেখিবার একটা তীব্র বাসনা মনের মধ্যে সজাগ রাখিয়া, আমার মানস—দার্জিলিংকে বাস্তব—দার্জিলিং অপেক্ষা বোধ করি দশগুণ রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছি। মনে করিতেছিলাম কলিকাতায় গিয়া বন্ধুবরকে সম্মত করিয়া লইয়া এবার পূজার অবকাশে দার্জিলিং-এর রহস্যগুণ্ঠন উন্মোচিত করা যাইবে, এবং তদনুযায়ী মনে মনে প্রস্তুতও হইতে ছিলাম, এমন সময়ে আর একবার সেই মহাসত্য উপলব্ধি করিবার কারণ ঘটিল, জীবনের মধ্যে যাহা বহুবার হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, এবং করিতে হইবে। অর্থাৎ "Man proposes and God disposes"—ভারতবর্ষের ভাষায়, 'নিয়তি কেন বাধ্যতে'। দার্জিলিং যাইবার পরিকল্পনা মনের মধ্যে বাস্তবতার প্রদীপ্ত রঙে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময়ে সহসা অপ্রত্যাশিত এক পক্ষ কর্তৃক অচিন্তিত এক দিকের জন্য প্রবলভাবে আকৃষ্ট হইলাম।

ছুটি হইতে তখনো দিন দুই বাকি। আদালত খোলবার পর নবোদ্যমে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কি উপায়ে সাংঘাতিক আক্রমণ চালাইতে হইবে প্রভাতকালের তৎ সম্বন্ধে মন্ত্রণা সভা বসিয়াছে, এমন সময়ে গেট অতিক্রম করিয়া কম্পাউণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিল একটি ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি। গাড়ির ক্ষুদ্রতার অনুপাতেও ঘোড়া দুইটি কিছু বেশী ক্ষুদ্র এবং শীর্ণ। রাজপথে হয়ত কতকটা দৌড়িয়াই আসিয়াছিল, কম্পাউণ্ডের ভিতর প্রবেশ করিয়া কিন্তু তাহারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়া গিয়াছে উপলব্ধি করিয়া আমাদের কৌতূহলের সময়কে দীর্ঘতর এবং মাত্রাকে উচ্চতর করিতে করিতে ধীরে ধীরে হাঁটিতে আরম্ভ করিয়াছে। কোচম্যানের হয়ত ইচ্ছা ছিল কতকটা দৌড়াইয়া আসিয়া অকস্মাৎ রাশ করিয়া থামিয়া মর্যাদা রক্ষা করে; কিন্তু তাহার মৌখিক উৎসাহ এবং চাবুকের আস্ফালনকে অটুট দার্শনিক ঔদাসীন্যের সহিত উপেক্ষা করিয়া ঘোড়া দুইটি শেষ পর্যন্ত হাঁটিয়া আসিয়াই বারান্দার সম্মুখে দাঁড়াইল।

এমন ধীর মন্থর গতি গাড়ির মধ্যে বসিয়া কে আসিতেছে জানিবার কৌতূহলে ক্ষণিকের জন্য কাজ-কর্ম বিরতিলাভ করিয়াছিল। কোচবক্স হইতে ক্ষিপ্রবেগে অবতরণ করিয়া কোচম্যান গাড়ির দরজা তুলিয়া

একটি ব্যাগ এবং পথে ব্যবহারের উপযোগী একটি লঘুভার বিস্তারা (বেডিং) নামাইয়া রাখিল। তৎপরে গাড়ির ভিতর হইতে অবতরণ করিলেন মধ্য যৌবন বয়সের এক ভদ্রব্যক্তি; পরিধানে খদ্দরজাতীয় সাদা কাপড়ের ধুতি পিরাণ ও উড়ানি; মাথায় সেইরূপ সাদা কাপড়ের ইঞ্চিচারেক কালা উঁচুটুপি; পায়ে ক্যাম্বিসের জুতা। নিষ্ঠাপূত গৌরবর্ণ মুখাবয়বে সহজসরলতার প্রসন্নমধুর দীপ্তি, এবং সাজ-সজ্জার সাদাসিধা সাত্ত্বিক সঙ্গতি দেখিয়া সাধু-সন্ন্যাসী বলিয়া মনে হয়।

বারান্দার উঠিয়া ভদ্রলোক চিত্তরঞ্জনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন; তাহার পর একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া মৃদুস্বরে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। এঞ্জিন থামিলে পিছনের গাড়ি সকলও যেমন সঙ্গে সঙ্গে থামিয়া যায়, তেমনি দাশ সাহেব থামার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও থামিয়া গিয়াছিলাম। কাজেই, দাশ সাহেব এবং তাঁহার সভাগত অতিথির প্রতি মাঝে মাঝে দৃষ্টিপাত করা ভিন্ন আমাদের আর বেশী কিছু করিবার ছিল না। সহসা এক সময়ে লক্ষ্য করিলাম, আমার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া চিত্তরঞ্জন যেন কিছু বলিতেছেন, এবং তদুত্তরে আমাকে দেখিতে দেখিতে আগন্তুক উৎসাহ এবং সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়িতেছেন। সন্দেহ হইল আমার বিষয়েই হয়ত কোনো আলোচনা হইতেছে।

ক্ষণকাল পরেই সন্দেহের নিরসন হইল। আমার নিকট উঠিয়া আসিয়া আগন্তুক বলিলেন, "উপেনবাবু, নমস্কার।"

তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম "নমস্কার! আপনি?"

আগন্তুক বলিলেন, "আমি গণেন ব্রহ্মচারী! সম্প্রতি মায়াবতী থেকে আসছি।"

বলিলাম "সৌভাগ্যের কথা,—সকাল বেলা সাধু সন্দর্শন হল, দিন ভাল যাবে! এতদিন নামের সঙ্গেই পরিচয় ছিল, আজ সাক্ষাৎ দর্শন পেলাম। কি আদেশ বলুন?"

গণেন মহারাজ বলিলেন, "আদেশ নয় অনুরোধ। একটু একান্তে যদি আসেন।"

বারান্দার এক প্রান্তে গিয়ে রেলিংএর ধারে দুইজনে দাঁড়াইলাম।

গণেন মহারাজ বলিলেন, "মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ প্রজ্ঞানন্দ স্বামীজী আমাকে পাঠিয়েছেন। পূজার ছুটিটা মায়াবতীতে গিয়ে কাটাইবার জন্যে আমি মিষ্টার দাশকে সপরিবারে নিমন্ত্রণ করেছি আপনাকেও করছি। আপনাকে আমরা কিছুতেই ছাড়ছিনে উপেনবাবু, নিশ্চয়ই আপনাকে যেতে হবে।"

যাঁহারা আমাকে কিছুতেই ছাড়িবেন না বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছেন সেই 'আমরা' যে কাহারা, এবং সেই 'আমরা'র সহিত মায়াবতী নিবাসী প্রজ্ঞানন্দ স্বামীজীর যে কোনো সংস্রব থাকিবার কথা নহে, সেটুকু বুঝিবার পক্ষে অনুমান শক্তির আমার অভাব হইল না। একবার ইচ্ছা হইল, এসম্বন্ধে দুটো একটা প্রশ্ন করি। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা একজন সাধু ব্যক্তিকে অনাবশ্যক জেরার দ্বারা বিপন্ন করিয়া পাপ সঞ্চয় করিতে মন চাহিল না। তাঁহার সদয় প্রস্তাবের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলাম যে, মায়াবতী যাইবার কল্পনা যৎপরোনাস্তি লোভনীয় হইলেও সে লোভের হস্ত হইতে আমাকে মুক্তিলাভ করিতেই হইবে, যেহেতু আমি অন্যত্র অপরের কাছে চুক্তি বদ্ধ। আমাকে চুক্তি ভঙ্গ করিতে সম্মত হইবার জন্য ক্ষণকাল নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া গণেন মহারাজ তাঁহার তৃতীয় ব্যক্তিহীন 'আমরা'র প্রধান ব্যক্তির হস্তে আমার মায়াবতী যাওয়া না যাওয়ার সমস্যা অর্পন করিয়া চা পানাদি করিবার আহ্বানে প্রস্থান করিলেন। একথা বোধ করি না বলিলেও চলে যে গণেন মহারাজের দ্বৈ-বচনিক 'আমরা'র অপর এবং প্রধান ব্যক্তি হইতেছেন স্বয়ং চিত্তরঞ্জন। চিত্তরঞ্জনের পাল্লায় পড়িয়া আমার সঙ্কল্পের নৌকার বানচাল হইতে খুব বেশী বিলম্ব হইলনা।

চিত্তরঞ্জনের সহিত যাঁহারা কিছুকাল একত্রে বাস করিয়াছেন অথবা কাজ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে চিত্তরঞ্জনের পায়রা শক্ত পায়রা, সঙ্কল্পকে সিদ্ধিতে পরিণত করিবার জন্য যখন তিনি বদ্ধপরিকর হন, তখন তাঁহার দ্বারা প্রাণ্যনীয় কোন শক্তিকেই প্রয়োগ করিতে তিনি বিরত থাকেন না—ইংরাজী ভাষার উপমায়, কোন পাথরকেই উল্টাইতে বাকি রাখেন না। মকর্দমায় সাফল্য লাভের উদ্দেশে তাঁহার ব্যবসায়-গত অপরিমেয় শক্তির সহিত মস্তিষ্কের দ্বারা তান্ত্রিক অনুষ্ঠান করাইয়া দৈবশক্তির যোগ সাধন করিতেও দেখিয়াছি। বিশেষ প্রাসঙ্গিক না হইলেও, এই সম্পর্কে একটি কৌতুকাবহ গল্প বলিলে বোধকরি সময়ের নিতান্ত অপব্যবহার হইবে না গল্পটি লছমীপুর অন্তর্গত একটি ঘটনা। বিবাদী পক্ষের জবাবের (written statement) বিশেষত্ব হেতু মকর্দমার সর্বপ্রধান বিচার্য বিষয়ের প্রমাণ ভার (onus) পড়িয়াছিল বিবাদীর উপর। সুতরাং আইনত শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাসকেই প্রথম বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল। সুদীর্ঘ তেড়মাস কাল ব্যাপিয়া বক্তৃতা চলিয়া চলিয়া অবশেষে তার চরমপ্রান্ত আসিয়া ঠেকিল কোন এক বুধবারে। স্বাভাবিক ভাবে দাস সাহেব যদি তাঁর বক্তৃতা শেষ করেন তাহা হইলে অপর পক্ষে বুধবারেই বক্তৃতা আরম্ভ করিবার সুযোগ পায়। কিন্তু বাদী পক্ষকে বৃহস্পতিবারের বার বেলায়, অন্তত ক্ষণে আরম্ভ করাইতে পারিলে দৈবকেও তাহাদের প্রতিকূল করানো যায়, এই সংস্কারের বশবর্তী হইয়া চিত্তরঞ্জন তাঁহার উপসংহার ভাগকে টানিয়া টানিয়া বৃহস্পতিবারের অপরাহ্ণে লইয়া আসিয়া ঘড়ি দেখিয়া বারবেলার ঠিক প্রাক্কালে সহসা বসিয়া পড়িলেন।

নিতান্ত অন্তরঙ্গ আমরা দু-চার জন চিত্তরঞ্জনের গুপ্ত মতলবের কথা অবগত ছিলাম। আমরা ভাবিলাম অপর পক্ষের অজ্ঞাতসারে বেশ সাঙ্ঘাতিক এক চাল চালা গিয়াছে। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল, সে ধারণা আমাদের সম্পূর্ণ ভুল। চিত্তরঞ্জনের দুরভিসন্ধির বিষয়ে অপর পক্ষের স্যার সত্যেন্দ্র প্রসন্ন যথেষ্ট সজাগ ছিলেন। চিত্তরঞ্জন আসন গ্রহণ করিবামাত্র তিনি দাঁড়াইয়া উঠিয়া হাকিমকে বলিলেন, "আমি আজ আমার বক্তৃতা আরম্ভ করব না ;—কাল করব।"

তখনো কাজ করিবার মতো আদালতের ঘণ্টা দেড়েক সময় বাকি ছিল। ঈষৎ বিস্মিত কণ্ঠে হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ?"

স্যার সত্যেন্দ্র বলিলেন "মিষ্টার দাস অনায়াসে সমস্তকাল তাঁর বক্তৃতা শেষ করতে পারতেন। শুধু আমাকে বৃহস্পতিবারের বারবেলায়, অন্তত ক্ষণে আরম্ভ করবার জন্য পুনরাবৃত্তি দ্বারা অনেকক্ষণ টেনে টেনে তিনি দু'দিন বক্তৃতা চালিয়েছেন। আমি কিছুতেই বৃহস্পতিবারের বারবেলায় আরম্ভ করব না।"

একটা উচ্চ হাস্যরবে এজলাস ঘর চকিত হইয়া উঠিল। দেখা গেল শুধু চিত্তরঞ্জনেরই উপর নহে, বৃহস্পতিবারের বারবেলার সংস্কার স্যার সত্যেন্দ্রের উপরও সমান আধিপত্য বিস্তার করিয়া আছে।

চিত্তরঞ্জন দাঁড়াইয়া উঠিয়া স্যার সত্যেন্দ্র প্রসন্নের উক্তির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "মনে রাখতে হবে এটা বিয়ে, পৈতে অথবা শ্রাদ্ধের মতো কোনো ধর্মানুষ্ঠান নয়! এটা ইংরেজের আদালতে হুকুম মতো আইন-মাফিকের দ্বারা পরিচালিত মকর্দমা ; এখানে হাঁচি, টিকটিকি বারবেলার ওজর আপত্তির স্থান নেই।"

স্যার সত্যেন্দ্র বলিলেন, "সেই কথা মনে রেখে বন্ধুবর যদি কাল তাঁর বক্তৃতা শেষ করতেন তা'হলে তো কোনো গোলই থাকত না। তা'ছাড়া, এখন যদি তিনি তাঁর মকর্দমার অপরাজেয়তা সম্বন্ধে আরও আধঘণ্টাটাক বক্তৃতা ক'রে আসন গ্রহণ করেন, তা'হলে তৎক্ষণাৎ আমি আমার বক্তৃতা আরম্ভ করব, এ

প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। তিনি বারবেলার শেষ করলে বারবেলায় আরম্ভ করতে আমার কোনই আপত্তি থাকবে না। আমি আশাকরি আমার এ প্রস্তাব আদালত ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব বলে বিবেচনা করবেন। কিন্তু একেবারে বারবেলার কিনারায় এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে প'ড়ে যদি আমাকে বারবেলার নিবিড় সলিলে ঠেলে ফেলতে চান, তা'হলে নিশ্চই আপত্তি করব।"

পুনরায় একটা উচ্চ হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল। বারবেলায় তার সত্যেন্দ্রপ্রসঙ্গকে আরম্ভ করানো সম্ভব হইবে না বুঝিয়া চিত্তরঞ্জন ভিন্নপথ অবলম্বন করিলেন; বলিলেন, "তার সত্যেন্দ্র যদি নিজের সুবিধা মতো অসময়ে বক্তৃতা আরম্ভ করবার বিলাস উপভোগ করতে চান, তা'হলে তাঁকে সে বিলাস অর্থ দিয়ে ক্রয় করতে হবে। আদালতে প্রতিদিন কম বেশী পাঁচ ঘণ্টা করে ব্যবসা চলে। এই পাঁচ ঘণ্টার জন্যে আমার মক্কেলকে নিত্য যে মোটা টাকা ব্যয় করতে হয়, তার অনুপাতে বেশ ঘণ্টার যে টাকা দাঁড়ায় সেই টাকা তাঁকে আমাদের খরচা বাবদ দিতে হবে।"

উত্তরে তার সত্যেন্দ্র বলিলেন, "দিতে আপত্তি নেই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা হিসেব করতে হবে। কালকের পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে অন্ততঃ সাড়ে তিন ঘণ্টা, আর আজকের সাড়ে তিন ঘণ্টা, মোট সাত ঘণ্টা সময় বন্ধুবর অপব্যয় করেছেন শুধু আমাকে বারবেলায় ছেড়ে দেবার সদুদ্দেশ্যে। সুতরাং আমি এই সাত ঘণ্টার খেসারৎ পাবার অধিকারী। আদালতের পাঁচ ঘণ্টার জন্যে আমার মক্কেলের দৈনিক যে টাকা ব্যয় হয়, তার অনুপাতে সাত ঘণ্টার মূল্য নিরূপণ করলে দেখা যাবে আমার প্রাপ্য টাকা বন্ধুবরের প্রাপ্য টাকাকে পাঁচ ছবার গিলে খাবার উপযুক্ত।"

পুনরায় একটা হাসির রোল উঠিল। বিচারক ছিলেন মৌলভি বেদার বখ্‌ৎ বর্ধমান নিবাসী বাঙালী ভদ্রলোক। বৃহস্পতিবারের বারবেলার রহস্যের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। চিত্তরঞ্জনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি সহাস্য মুখে বলিলেন, "যে রকম দেখা যাচ্ছে, বারবেলায় আরম্ভ করতে তার সত্যেন্দ্র প্রসন্নকে কিছুতেই রাজি করানো যাবে না। সুতরাং কাল এগারটায় আবার মিলিত হওয়া ছাড়া আমাদের উপায়ান্তর নেই। আর, খরচার কথায় একথা আপনিও স্বীকার করবেন মিষ্টার দাশ, পাঁচ-ছ'বার না হোক, তার সত্যেন্দ্রের প্রাপ্য টাকা অন্ততঃ একবার আপনার প্রাপ্য টাকাকে গিলে খাবার উপযুক্ত সুতরাং খরচার টাকা গায়ে গায়ে শোধ।" বলিয়া হাসিতে হাসিতে লেখকাদের সহিত বিষয়ান্তরে প্রবৃত্ত হইলেন।

বারবেলা লইয়া কলিকাতা হাইকোর্টের দুইজন দুর্ধর্ষ বাঘা-ভালুক ব্যারিষ্টারের এইরূপ ছেলে মানুষী দেখিয়া আমরা সেইদিন যথেষ্ট কৌতুক অনুভব করিয়াছিলাম।

সকালবেলা বৈঠক ভাঙ্গিলে চিত্তরঞ্জন ইসারায় আমাকে নিকটে ডাকিলেন। কাছে গিয়া দাঁড়াইলে বলিলেন, "রাজি ত?"

বুঝিতে বাকি ছিল না, তথাপি মৃদু হাসিয়া বলিলাম, "কিসে?"

"দারাবতী যাওয়ায়?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া কুণ্ঠিতস্বরে বলিলাম, "আপনিত' জানেন—

কথা শেষ করিতে না দিয়া চিত্তরঞ্জন হাসিমুখে বলিলেন, "হ্যাঁ আমি জানি, আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতেই হবে। না গেলে প্রত্যবায়ের ভাগী হবেন।"

হাসিয়া বলিলাম, "কিসের প্রত্যবায়?"

চিত্তরঞ্জন বলিলেন, "আমাদের আনন্দের মূলে খানিকটা কুঠারাঘাত করার।"

এতবড় কথার বিরুদ্ধে কথা মুখ দিয়া বাহির হইল না। "আচ্ছা, দেখি," বলিয়া চিন্তিত মনে গাড়িতে গিয়া উঠিলাম।

বিপদ দেখিয়া সন্ধ্যাকালে শ্রীমতী বাসন্তী দেবীর শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে উকিল নিযুক্ত করিলাম। দেখিলাম, খুব নিরাপদ বলে ব্রীফ্ প্রদান করি নাই, অপর পক্ষের কেস্ খুব জোরালো বলিয়া তাঁহার ধারণা। কিন্তু যতই হউক, রমণী হৃদয় ত! আমার কাতর প্রার্থনায় দয়া পরবশ হইয়া আমার আদি চিত্তরঞ্জনের নিকট পেশ করিলেন।

ধৈর্যসহকারে সমস্ত কথা শুনিয়া চিত্তরঞ্জন বলিলেন, "এত ভাল কথা। রোগিণী যখন রোগমুক্ত হয়েছেন, তখন ত' তাঁর চেঞ্জেই দরকার। আমাদের টুরিষ্টকার ত' হাওড়া থেকে আসবেই, উপেনবাবু কলকাতায় গিয়ে বউমাকে টুরিষ্টকার করে নিয়ে আসুন।"

বাসন্তী দেবী, বলিলেন—"শরীর দুর্বল, এতটা পথশ্রম সইবে কি?"

চিত্তরঞ্জন বলিলেন, "টুরিষ্টকারে জার্ক্ ত একেবারেই নেই, ঘরের মতোই আরামে আসবেন।"

বাসন্তী দেবী বলিলেন, "কিন্তু কাঠগুদাম থেকে মায়াবতী, সাত আট দিনের পাহাড়ে পথ?"

চিত্তরঞ্জন বলিলেন, "কাঠগুদাম পৌঁছোতে পৌঁছোতে তিনি সবল হয়ে যাবেন। যদিই বা কিছু দুর্বলতা থাকে, পাহাড়ের হাওয়া লেগে দেখতে দেখতে তা লোপ পাবে। আর পাহাড়ে পথের কথা বলছ? পাহাড়ে পথের যা-কিছু দুঃখ তা'ত ডাণ্ডীওয়ালা কুলির। ডাণ্ডীতে যে চ'ড়ে যায় সে ত' পাহাড়ের উপর দিয়ে যায় না, হাওয়ার উপর দিয়ে যায়। ইচ্ছা সুখে চলা, কষ্ট যদি একান্তই হ'ল ডাণ্ডী নামিয়ে একটু জিরিয়ে নিলাম; হয়'ত বা একটু কিছু খেয়েও নিলাম;—তারপর তাজা হয়ে নিয়ে আবার দুলতে দুলতে চলে চললাম।"

ছেলেবেলায় পড়িয়াছিলাম, দুরাত্মার ছলের অভাব নাই। আজ দেখিলাম, মহাত্মারও নাই। বাসন্তী দেবী পরাজয় স্বীকার করিলেন। যতটা সহজে করিলেন, তত সহজে আমরা করিলে আমাদের মক্কেলরা আমাদের প্রতি সন্দেহপরায়ণ হয়।

দিন দুই পরে বলিলাম, "মায়াবতীই যাচ্ছি।"

হর্ষোজ্জ্বল মুখে চিত্তরঞ্জন বলিলেন, "ভালো কথা। তা'হলে কলকাতায় যাচ্ছেন কবে?"

বলিলাম, "আর যাচ্ছিনে।"

"কেন? বউমাকে মায়াবতী নিয়ে যাবেন না?"

ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, "না।"

মনে মনে একটু চিন্তা করিয়া চিত্তরঞ্জন বলিলেন, "হ্যাঁ, উপস্থিত অবস্থায় বিশ্রামই বোধ হয় তাঁর পক্ষে শ্রেয়।"

একথার প্রতিমন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

এজলাসে চিত্তরঞ্জন সিংহবিক্রমে সাক্ষীকে পরাজিত করিতেন; তাঁহার জলন্ত অন্তর্ভেদী দৃষ্টির প্রতি চাহিয়া সাক্ষী বাপের নাম ভুলিত।

আদালতের বাহিরেও চিত্তরঞ্জন ছিলেন অপরাজেয়; কিন্তু সেখানে প্রতিপক্ষ বাপের নাম না ভুলিলেও আর সকলই ভুলিত।

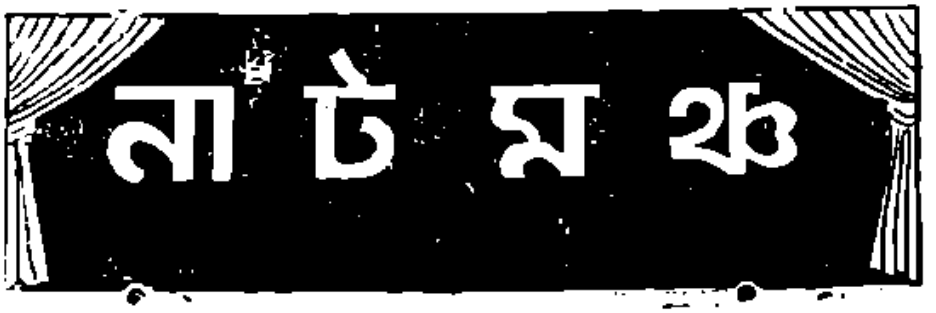

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

নটকেশরী অমরেন্দ্রনাথ দত্ত

গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে বিরোধ

গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে অমরেন্দ্রনাথের একবার বেশ কিছুদিন ধরে দারুণ মতবিরোধ ঘটেছিল। ১৮৯৮ সালে গিরিশচন্দ্র যখন দ্বিতীয়বার ক্লাসিকে চাকরি নেন তখন সর্ত হয় যে তিনি বছরে অন্তত তিনখানি নতুন নাটক দেবেন এবং থিয়েটারের ম্যানেজার রূপে কাজ করবেন। কিন্তু তারপর ন'মাস পর্যন্ত গিরিশচন্দ্র এক 'চেলদার' ছাড়া আর কোন নাটক দিলেন না। উপরন্তু তিনি অমরেন্দ্রনাথের কাছে লাভের খবরা চাইলেন। অমরেন্দ্রনাথ তাতে সম্মত হলেন না। তখন গিরিশচন্দ্র অন্য থিয়েটারে যাবার জন্য উদ্যত হলেন। অবশেষে তিনি সে সংকল্প ত্যাগ করে ক্লাসিকের জন্য নাটক লিখলেন—'পাণ্ডব গৌরব'। গিরিশচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল, ঐ নাটকের হীরো ভীমের পার্ট তিনি ধানীবাবুকে দিয়ে করাবেন! কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ তাতে রাজী হলেন না। তিনি নিজে ভীমের ভূমিকায় নামলেন। ফলে গিরিশচন্দ্র অত্যন্ত চটে গেলেন এবং ক্লাসিক ত্যাগ করে মিনার্ভায় চলে গেলেন।

অমরেন্দ্রনাথ রাগে অধীর হয়ে গিরিশচন্দ্রের নামে মামলা করলেন, কিন্তু তাতে যখন কোন ফল হলনা, তখন তিনি নিজের থিয়েটারের উন্নতির জন্যে আরও বেশী চেষ্টিত হলেন এবং ১৯০০ সালের ২৮শে মে শনিবার নিজ রচিত গীতিনাট্য 'দুটি প্রাণ' মঞ্চস্থ করলেন। বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই গীতিনাট্য খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

'দুটি প্রাণ' যখন খুব জমে উঠেছে সেই সময় একদিন বাগান থেকে থিয়েটারে আসবার সময় বীডন ষ্ট্রীটের এক বাড়ীর দেওয়ালে একটি পোস্টার অমরেন্দ্রনাথের নজরে পড়ল—'মিনার্ভায় সীতারাম'।

থিয়েটারে এসেই তিনি সীতারাম উপন্যাসটি আনিয়ে সেই রাত্রের মধ্যেই তাকে নাটকাকারে সাজালেন এবং মাত্র এক সপ্তাহের মহলার পর ৩০শে জুন 'সীতারাম' মঞ্চস্থ করলেন।

এর আগের সপ্তাহে গিরিশচন্দ্র স্বয়ং নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে মিনার্ভায় 'সীতারাম' খুলেছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ সদর্পে তা'তবিলে ঘোষণা করলেন—

"ক্লাসিকের সীতারাম দৃশ্য মুখা, ছবির নহে।"

তাঁর সীতারাম দেখে জনৈক কবি লিখলেন :

"অশ্বপৃষ্ঠে সীতারাম—কি অপূর্ব শোভা!
ছুটে যেন রোধিবারে গিরিশ প্রতিভা।
নটগুরু মনে রণ!
জোরে করে আস্ফালন
ক্লাসিকের 'সীতারাম' বলদৃপ্ত মুখা"

দুই থিয়েটারের 'সীতারাম' দেখবার জন্য নাট্যানুরাগীরা দলে দলে আসতে লাগলেন। তর্ক বিতর্ক চলতে লাগল। জানা যায়, তিন রাত্রি অভিনয়ের পর গিরিশচন্দ্র আর নিজে না সেজে সীতারামের ভূমিকা চুনিলাল দেবকে দিয়ে দেন।

যাই হোক, উভয়-থিয়েটারে অভিনয় ব্যাপারে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতে লাগল। উভয় থিয়েটারই হ্যাণ্ডবিলে পরস্পরকে প্রচণ্ড গালিগালাজ করতে আরম্ভ করলেন। অমরেন্দ্রনাথ লিখলেন—"নট, নর্তকী ও নাপিত—তিন চল্লিশের পার হইলেই কাজের বার হইয়া যায়।" শুধু তাই নয়, গিরিশচন্দ্রকে লক্ষ্য করে নানাপ্রকার ছড়া কেটে হ্যাণ্ডবিলে ছাপানো সুরু হল। সঙ্গে সঙ্গে নানারকম ব্যঙ্গচিত্রও বেরুতে লাগল। কোনটাতে হনুমত দাঁড়িপাল্লা এঁকে একদিকে অমরেন্দ্রনাথকে ও অপরদিকে গিরিশচন্দ্রকে বসানো হল। অমরেন্দ্রনাথের দিক ভারী হওয়ায় নীচের দিকে ঝুলে পড়েছে আর গিরিশচন্দ্রের দিক হালকা হওয়ায় উপর দিকে উঠে গেছে। আবার অন্য কোন কার্টুনে হনুমত টাগ অফ ওয়ার, দড়ি টানাটানি হচ্ছে, আর অমরেন্দ্রনাথের দল হেলায় গিরিশচন্দ্রের দলকে হারিয়ে দিচ্ছে।

গিরিশচন্দ্রও কোমর বেঁধে রণক্ষেত্রে নামলেন। তখন ইংরেজীর যুগ চলছে। তাই তিনি হ্যাণ্ডবিলে ও খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে লিখলেন—"Our representation, we feel bold to say, will prove to them that howling is not acting and that such a subject, at once serious and sublime, ought not to be handled by quacks who will unscrupulously lay their hands on the most complicated cases without possessing the requisite qualification of even a common-place ameteur.

উত্তরে অমরেন্দ্রনাথ লিখলেন—"We dont know, rather we are not ambitious of making a gigantic preface, but to appeal to our patrons and friends with due courtesy and dignity to come and see our performances and then compare. No doubt they will find a difference of Heaven and Hell. No more for the present."

গিরিশচন্দ্রও ছটবার পাত্র নন, তিনি পরদিন নিজেদের বিজ্ঞাপনে লিখলেন—"N. B.—It has been said that there is a difference of Heaven and Hell! Aye! Let us hope so at least."

এই দ্বৈরথ সমর শুধু হ্যাণ্ডবিল ও বিজ্ঞাপনীতেই আবদ্ধ রইল না। গিরিশচন্দ্রকে ও মিনার্ভার সত্ত্বাধিকারী নরেন্দ্রনাথ সরকারকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে অমরেন্দ্রনাথ "থিয়েটার" নামে একটি কৌতুক নাট্য রচনা করলেন এবং "সোনার স্বপন" নামে গীতিনাট্যের সঙ্গে তার অভিনয় শুরু করে দিলেন।

তাই দেখে অমরেন্দ্রনাথকে পালটা বিদ্রূপ করে নরেন্দ্রনাথ সরকার 'সাধের বাসর' নামে একটি কৌতুক নাট্য লিখে তাঁর থিয়েটারে অভিনয় করাতে লাগলেন। কিন্তু তাতে বিশেষ সুবিধা হল না। মিনার্ভা থিয়েটার যেন কান্না হয়ে গেল। আর ক্লাসিক রাতের পর রাত হাউসফুল দিতে লাগল। শেষপর্যন্ত নরেন্দ্রনাথ সরকার আর্থিক ক্ষতি সহ্য করতে না পেরে গিরিশচন্দ্রকে বরখাস্ত করলেন।

এই সংবাদ শুনে অনেকে অমরেন্দ্রনাথকে পরামর্শ দিলেন, তাঁর পক্ষে উচিৎ হবে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে ফেলে তাঁকে আবার ক্লাসিকে নিয়ে আসা। গিরিশচন্দ্রের প্রতি অমরেন্দ্রনাথের নিভৃত মনে

শ্রদ্ধার অভাব ছিলনা। তিনি গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করলেন। গিরিশচন্দ্রও মনে মনে অমরেন্দ্রনাথকে ভালবাসতেন। তাঁর ক্ষমতাকে স্বীকার করতেন। তাই বিবাদ সহজেই মিটে গেল এবং গিরিশচন্দ্র আবার ষ্টাগকে যোগদান করলেন। এই উপলক্ষে অমরেন্দ্রনাথ যে বিজ্ঞপ্তিটি প্রচার করেছিলেন তা থেকে তাঁর মনের একটা বড় দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখলেন—"নাট্যামোদী সুধীবৃন্দকে সানন্দে জানাইতেছি যে, নটকুলচূড়ামণি পুণ্যশ্লোক শ্রীযুক্তবাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সহিত আমাদের সকল বিবাদ মিটিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালায় যে কয়েকটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হইয়াছে, সকলগুলিরই সৃষ্টিকর্ত্তা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র! প্রায় সকল অভিনেতা অভিনেত্রীই—গিরিশচন্দ্রের শিক্ষায় শিক্ষিত। তাহার মধ্যে আমিও একজন। গিরিশবাবুর সহিত বিবাদ করিয়া নিতান্তই দুইতার পরিচয় দিয়াছিলাম!—বড়ই সুখের বিষয়, সমস্ত মনোমালিন্য অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলিয়া, তাঁহার স্নেহময় কোলে আবার তিনি আমায় টানিয়া লইয়াছেন। গিরিশবাবুর কোন থিয়েটারের সহিত এখন কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই। তাঁহার সমস্ত নূতন নূতন নাটক, ষ্টডিনাট্য ও পঞ্চরং এখন ষ্টাসিকে অভিনীত হইবে। "ষ্টাসিক থিয়েটার" ব্যতীত আর কোন রঙ্গমঞ্চের সহিত গিরিশবাবুর কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র এখন ষ্টাসিকের। নিবেদনমিতি।"

(পরবর্তী অধ্যায়ে অমরেন্দ্রনাথের সমাজ সেবা ও সমাজ সংস্কার সম্পর্কে চিত্তাকর্ষক কাহিনী পরিবেশিত হবে।)

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে রবীন্দ্রনামাঙ্কিত রঙ্গশালা

রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সারা ভারতে যে কর্মসূচী পালিত হয় তার মধ্যে বিশেষ করণীয় রূপে গণ্য হয়—প্রতি রাজ্যের মহানগরী বা রাজধানীতে রবীন্দ্রনাথের নামে নাট্যগৃহ নির্মাণ। তদনুসারে ভারতের প্রায় প্রতি রাজ্যেই রবীন্দ্ররঙ্গশালা নির্মিত হয়েছে! কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এই রঙ্গশালাগুলি স্থাপিত হয়েছিল সে উদ্দেশ্য কোন্ রাজ্যে কতটা সফল হয়েছে তা জানার জন্য আগ্রহ বোধ করা স্বাভাবিক। কোন্ রাজ্যে রবীন্দ্র নাট্যশালা কতখানি অগ্রসর হয়েছে, কোন্ রাজ্যে হয়নি, কী বা তাদের সমস্যা, এই সকল বিষয় জানা বোধকরি আজ প্রয়োজন। আমরা বিভিন্ন রাজ্য থেকে এই সম্বন্ধে যেসব তথ্য আহরণ করেছি তা পাঠকদের গোচর করব। এই সংখ্যায় কয়েকটি রাজ্যের রবীন্দ্র রঙ্গশালা সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

বোম্বাই

২১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত এখানকার 'রবীন্দ্রনাট্যমন্দিরে' বছরের প্রায় প্রতিদিনই অভিনয় বা নাচগানের আসর বসে।

বৃহত্তর বোম্বাই কর্পোরেশন এই উদ্দেশ্যে একখণ্ড জমি দান করেন। তার উপর ইমারতটি ১৯৬৪ সালের ১লা মে সর্বসাধারণের জন্য প্রদর্শনীর সূত্রপাত করে। ভারত সরকার ভবনটি নির্মাণের জন্য আড়াই লক্ষ টাকা দেন। তদুপরি রাজ্য সরকার ব্যয় করে আঠারো লক্ষ টাকা।

প্রেক্ষাগারে ৯২৩ জনের বসবার আসন আছে। সুবৃহৎ ঘূর্ণায়মান মঞ্চ। আটটি সাজঘর এবং কুড়িজন শিল্পীর থাকবার জন্য দশটি শয়নকক্ষ। প্রেক্ষাগার শীতাতপনিয়ন্ত্রিত।

সপ্তাহের দিনে হলের ভাড়া ৪০০ টাকা। শনিবার রবিবার ও ছুটির দিনে ভাড়া ৪৫০ টাকা। মহলা দেবার জন্য ভাড়া লাগে ১০০ টাকা। হলটি খুবই জনপ্রিয়। অক্টোবর মাসেই আগামী বছরের মার্চ পর্যন্ত সব দিনের জন্য ভাড়া হয়ে গেছে।

পরিচালক মণ্ডলীর একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন যে নিজেদের খরচ খরচা বাদে এই প্রেক্ষাগৃহ প্রতি বছর সরকারকে এক লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা দিচ্ছে। এর দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যায়, ভাড়া আরও কমানো যেতে পারে। এখানে নাটক নৃত্যনাট্য ও জলসার আসরই বেশী বসে। একটি আপত্তিকর ব্যবস্থা চলে, মহারাষ্ট্র রাজ্য লটারির অনুষ্ঠান। রবীন্দ্র নাট্যভবনে এ ধরণের অনুষ্ঠান অনেকেই পছন্দ করেন না। এই থিয়েটারে নাটক বা সঙ্গীত শিক্ষা দেবার কোন ব্যবস্থা নেই। সে কারণে একটি বিশেষ বিভাগ যে থাকা দরকার তা কর্তৃপক্ষ মানেন বটে কিন্তু কাজে এতাবৎ কিছু করেন নি।

জয়পুর

জয়পুরের 'রবীন্দ্রমঞ্চ' যে উদ্দেশ্যে তৈরী হয়েছিল তা এতাবৎ সার্থক হয় নি। সর্বদিক দিয়ে এই সৌন্দর্যমণ্ডিত মঞ্চটি বর্তমানে কেরাণীদের আস্তানায় পরিণত হয়েছে। রাজ্য সঙ্গীত নাটক আকাদামির উপর এর পরিচালনার ভার ন্যস্ত হয়েছিল কিন্তু তাদের কোন কর্মসূচী যে আছে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। এই নাট্যশালার সঙ্গে সংযুক্ত কোন সঙ্গীত নাট্য শিক্ষালয় নেই। তাছাড়া শহরের নাট্য-সম্প্রদায়গুলিও এখানে তাঁদের অনুষ্ঠান করবার জন্য কোন উৎসাহ বা সহযোগিতা পান না। এখানে নাট্যাভিনয়ের চেয়ে বক্তৃতা, কনফারেন্স, আলোচনা সভা—এই সবই বেশী হয়। এমন কি পান-বিড়ি ব্যবসায়ী সমিতির বার্ষিক কনফারেন্সের অনুষ্ঠানও হয়।

হুমায়ুন কবীর যখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি পরিকল্পনা করেন প্রত্যেক নাট্যশালায় একটি নিজস্ব নাটুকে দল থাকবে এবং তিনি জয়পুরের রবীন্দ্র মঞ্চেই প্রথম এই পরীক্ষা করবার আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় দপ্তরের সঙ্গে জয়পুরের রাজ্য দপ্তরের নানা বিষয়ে মতভেদের ফলে সে পরিকল্পনা কার্যকর হয়নি। এর পরিচালক-মণ্ডলীর মধ্যে যাঁরা আছেন তাঁরা কেউই নাটক ও নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নন। কারুকলার তাঁরা কিছুই বোঝেন না। ফলে শিল্পীদের কিসে সুবিধা কিসে বা অসুবিধা তা তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না।

সম্প্রতি মঞ্চের সাজসরঞ্জাম কেনবার জন্য রাজ্য সরকার ৪০০০০ টাকা দেন। মঞ্চের ম্যানেজার কমিটির সঙ্গে পরামর্শ করে সেসব কেনেন। কিন্তু সেসব সম্বন্ধে তাঁদের কোন সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা ছিল না। ফলে এমন একটি পুরণো পিয়ানো কেনা হল যা কোন কাজে লাগল না। তাছাড়া যাঁরা নাট্যাভিনয়ের অনুষ্ঠান করেন তাঁরা ঠিকমতো আলো পান না—আলোগুলোতে প্রায়ই বাল্‌ব থাকে না। মঞ্চের পরিচালকদের এদিকে তেমন কোন দৃষ্টি বা সতর্কতা নেই। এলোমেলো অব্যবস্থা।

লাখনৌ

ভারতের মধ্যে এখানকার 'রবীন্দ্রালয়' বোধ করি একমাত্র নাট্যগৃহ যা পরিচালনা করেন একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। এঁরা খোলাখুলি স্বীকারই করেছেন যে, নাট্য উন্নয়নে এঁরা তেমন কোন কাজ করতে পারছেন না। ভবনের প্রেক্ষাগারটির নির্মাণে এমন কতগুলি ত্রুটি ঘটেছে যার ফলে প্রথম দু'তিন লাইনের দর্শক মঞ্চের সবটা দেখতে পান না—ফলে সেসব আসনে লোক বসে না। তাছাড়া প্রেক্ষাগারটি

শব্দনিয়ন্ত্রিত নয় বলে অত্যন্ত প্রতিধ্বনি হয়। পরিচালক মণ্ডলী এখানকার ভাড়া বাবদ স্কুল কলেজের কাছ থেকে নেন ২৫০ টাকা, অন্যান্য সংস্থাদের কাছ থেকে ৩৫০ টাকা এবং বহিরাগত দলের কাছ থেকে ৪০০ টাকা। ভাড়াটা বেশী মনে হত না যদি মঞ্চের সাজসরঞ্জাম ও রুসাকুশলীর ব্যবস্থা ঠিকমতো থাকতো।

শ্রীনগর

জম্মু কাশ্মীর সরকারই এদেশে প্রথম রবীন্দ্রনাথের নামে নাট্যগৃহের স্থাপনা করেন। ১৯৬১ সালে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়—'রবীন্দ্রভবন'। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। শুধু একটি বিরাট হল। না প্রেক্ষাগার, না বা স্টেজ। যাঁরা নাট্যানুষ্ঠান করেন তাঁদের সব কিছুই করে নিতে হয়। রাজ্য সরকারের পরিচালনায় ইনস্টিটিউট অফ ফাইন আর্টস নামে প্রতিষ্ঠানটি এখানে নৃত্য শিক্ষার ক্লাস বসান বটে কিন্তু তাও ঠিকমতো পরিকল্পনা অনুযায়ী চালিত হচ্ছে বলে মনে হয় না। এখানে বছরে আকাদামি ২০ থেকে ৩০টি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন তার মধ্যে নাট্য প্রতিযোগিতাও একটি আছে। নানা সম্প্রদায় ৩০।৪০টি অভিনয়ের আয়োজন করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ভগৎ থিয়েটারের অনুষ্ঠান। গ্রীষ্মকালে বহু সংখ্যক ভ্রমণকারী এখানে আসেন কিন্তু তাঁদের জন্য এখানে কোন আয়োজন করার পরিকল্পনা নেই। ফলে অবসর বিনোদনের জন্য তাঁদের একটা পুরণো অব্যবস্থাগ্রস্ত সিনেমায় গিয়ে পুরণো ছবি দেখেই তৃপ্ত থাকতে হয়।

(পরবর্তী সংখ্যায় আরও কয়েকটি রাজ্যের তথ্য জানান হবে)

নাট্যপ্রবাহ

•শ্যামল ভট্টাচার্যের পরিচালনায় ডঃ নীহার গুপ্তের "উল্কা" নাটকটি অভিনয় করলেন সম্প্রতি গ্যাল্রেস স্টাফ ক্লাবের সভ্যরা। অভিনয় বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয়। বিভিন্ন ভূমিকায় সুঅভিনয় করেন, শ্যামল ভট্টাচার্য, বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিষ বিশ্বাস, মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক চক্রবর্তী, গীতা সেনগুপ্ত, মমা ঘোষ প্রমুখ।

•হলদিয়া ডক আপিসের সদস্যরা গত ২১শে ডিসেম্বর বিশ্বরূপা মঞ্চে পরিবেশন করলেন একটি হাসির নাটক—প্রবোধবন্ধু অধিকারী ও শৈলেশ গুহনিয়োগীর "সেলসাইড।" নাটকটি পরিচালনা করেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেন· গোপিকামোহন চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় গাঙ্গুলী, রত্নেশ্বর চৌধুরী, তপন ভট্টাচার্য, চন্দ্রনাথ দে, প্রশান্ত মিত্র, গণেশ চক্রবর্তী, শান্তনু রায়, দিবানী গাঙ্গুলী। পরিচালনা মুন্সী। অভিনয় নিন্দনীয় নয়।

•উৎপল দত্তের "কেরানী কৌজ" একটি আকর্ষণীয় নাটক, গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল স্টোর্স ক্লাবের সভ্যরা এই নাটকটি গত ৮ই জানুয়ারী বিশ্বরূপা মঞ্চে সুখ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করলেন. পরিমল রায়চৌধুরী, বলরাম আচা, কৃষ্ণেন্দু নন্দী. প্রাণবন্ধু সরকার ও আশা বসু সুঅভিনয় করে নাটকটিকে দর্শকদের মনোরঞ্জনকারী করে তোলেন। পরিচালনা অরুণ রায়ের।

•যৌথাপানি সঙ্গীত সমাজ ও নাট্যসংস্থার সভ্যরা সম্প্রতি বেহালায় প্রমুখ সদন প্রাঙ্গণে রমেন গোস্বামীর "কেদার রায়" নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। অভিনয়ে উল্লেখযোগ্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন, সুশীল

চট্টোপাট্যায়, সুনীল ভট্টাচার্য, সন্তোষ লাহিড়ী, প্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, অতুল চক্রবর্তী, রণজিৎ বসু, সুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ পাল, মানিক গঙ্গোপাধ্যায়, অরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীর দাস, বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণাল ঘোষ, কমল মিত্র, সুকুমার মজুমদার, প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, অদিতি ঘোষ, মায়া রায়, তাপসী গুহ ও বেবী ঘোষ। বহু চরিত্র সম্বলিত নাটকটির দলগত অভিনয় দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করে।

বাংলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চের নাটক
প্রযোজনা ও অভিনয়

বাণী বিতানের উদ্যোগে গত ২৩শে জানুয়ারী একটি আলোচনার সভায় (লাহাভবনে অনুষ্ঠিত) নাট্যকার মন্মথ রায়ের পৌরোহিত্যে, বাংলা থিয়েটারের নাটক প্রযোজনা ও অভিনয় সম্বন্ধে আলোচনা করেন যথাক্রমে দেবনারায়ণ গুপ্ত, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও সন্তোষ সিংহ। তিনজনের আলোচনাই নানা দিক দিয়ে তথ্যপূর্ণ এবং চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। সভাপতিও একটি মনোজ্ঞ ভাষণে তাঁর বক্তব্য বলেন।

আলোচনার পর কয়েকটি নির্বাচিত দৃশ্যের আবৃত্তি ও নাট্য সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। কানাই বন্দ্যোপাধ্যায়, কেশব দে, দুর্লভ মুখোপাধ্যায়, অরুণকৃষ্ণ সান্যাল, কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়, বীথিকা চট্টোপাধ্যায়, রেণু ভৌমিক প্রমুখ অনেকেই আবৃত্তি ও সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন।

• • • •

বিখ্যাত কৌতুকাভিনেতা হ্যারল্ড লয়েডের ছবি দেখতে গেছেন ইংলণ্ডে তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ। ছবি দেখে ফেরবার সময় হ্যারল্ড লয়েড এগিয়ে এসে বিনীতভাবে প্রশ্ন করলেন, কেমন দেখলেন? আপনার ভাল লেগেছে কোনখানটায়?

প্রধান মন্ত্রী হেসে বললেন: ভাল লেগেছে এই দেখে যে, কথাটা অবশ্য আমাদের মধ্যে, One thing is common.

হ্যারল্ড লয়েড একটু হতভম্ব হলেন, বললেন common-টা কোথায় দেখলেন?

লয়েড জর্জ হেসে বললেন: তা' আর বুঝতে পারলেন না? শুধু একটি জিনিস আমাদের মধ্যে common.

কোনটা? আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন হ্যারল্ড লয়েড।

ঐ 'লয়েড' কথাটা,—আমি লয়েড জর্জ আর আপনি হ্যারল্ড লয়েড।

—হো হো করে হাসলেন দুজনেই।

খেলাধুলা

জ্যোতির্ময়

সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানের স্মরণীয় সেঞ্চুরি

ইংলণ্ড অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে টেস্ট খেলা শুরু করে এলো। এই সিরিজের ফলাফল সবাই জানেন। তাই তার পুনরুক্তি করার আবশ্যক নেই।

ক্রিকেট খেলায় অনেক ব্যাটসম্যানের অনেক চমকপ্রদ নৈপুণ্য দেখা গেছে। তার মধ্যে একটি (বোধ-করি সবচেয়ে) চিত্তাকর্ষক ঘটনা এখানে লিপিবদ্ধ করছি। এই ঘটনা ঘটিয়েছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান ডন ব্র্যাডম্যান। নিজেও স্বীকার করেছেন যে অনেক ভাল ইনিংস তিনি খেলেছেন, কিন্তু ১৯৩৪ সালে ইংলণ্ডে গিয়ে অস্ট্রেলিয়ার তরফে মিডলসেক্স-এর বিরুদ্ধে তিনি যে সেঞ্চুরি করেন সেটাই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সেঞ্চুরি। প্রতিকূল অবস্থায় ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সেদিন অদ্ভুত খেলা খেলেছিলেন তিনি।

১৯৩৪ সালের ২৬শে মে। শনিবার। লর্ডস মাঠে বিক্রমশালী কাউন্টি দল মিডলসেক্স-এর সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার খেলা। মাঠে দশ হাজারেরও বেশী দর্শক। সবলে চান অস্ট্রেলিয়া টসে জিতুক এবং ব্র্যাডম্যান খেলতে নামুক। ক্রিকেট অনুরাগীদের কাছে ব্র্যাডম্যান এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ।

কিন্তু টসে জিতলো মিডলসেক্স এবং তারা ব্যাট করতে লাগল। মিডলসেক্স-এর ইনিংস মোটের উপর মন্দ হল না। বিখ্যাত খেলোয়াড় হেনড্রেন করলেন ১১৫ রান, রবিনস করলেন ৬১। হেনড্রেন-এর খেলা সেদিন খুবই দর্শনীয় হয়েছিল।

বেলা পাঁচটার আগেই মিডলসেক্স-এর ইনিংস শেষ হয়ে গেল ২৫৮ রানে। খেলা শেষ হতে তখনো দেড়ঘণ্টা বাকী। দর্শকদের আশা হল, তাঁরা হয়ত আজই ব্র্যাডম্যানের ব্যাটিং দেখতে পাবেন।

অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শুরু হল। প্রথম জুটি উডফুল ও পনসফোর্ড।

কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার একী দুর্দৈব! অমন যে পাকা খেলোয়াড় উডফুল, তিনি মিডলসেক্স-এর ফাস্ট বোলার জিম স্মিথের বল সামলাতে পারলেন না। প্রথম ওভারের দ্বিতীয় বলেই এল. বি. হয়ে তাঁবুতে ফিরে গেলেন। পরের ব্যাটসম্যান চিহ্নিত ছিলেন ডন ব্র্যাডম্যান। কিন্তু তিনি কি এই সন্ধ্যাবেলায় খেলতে নামবেন? হয়ত সোমবার তিনি খেলবেন? দর্শকরা উচ্চকিত! কে আসছে?

আসছে, আসছে, ডন ব্র্যাডম্যান খেলতে আসছে। সারা মাঠ তুমুল করতালিতে মুখরিত হল।

খেলা শুরু করলেন ব্র্যাডম্যান! কিন্তু একী তাঁর খেলা? যেন ভয়ে ভয়ে খেলছেন, যেন তাঁর খেলায় আত্মবিশ্বাসের একান্ত অভাব! স্মিথের একটা বল ফসকালেন তিনি। আর একটু হলেই আউট হয়ে যেতেন। পর পর দুবার। দর্শকরা মনে মনে হায় হায় করছেন। বোধ হয় বেশীক্ষণ টিঁকতে পারবেন না ব্র্যাডম্যান।

ততক্ষণে কতকটা ধাতস্থ হয়েছেন ব্র্যাডম্যান। ব্যাট চালাতে লাগলেন জোরে। স্মিথের ওভারের শেষ বলে একটি রান নিলেন।

অপরদিক থেকে বল করতে এলেন আঠারো বছরের স্কুলের ছেলে জাভ'। তাদেই বল করতে লাগলেন। কিন্তু ব্র্যাডম্যান তখন তাঁর আত্মপ্রত্যয় আর আক্রমণাত্মক মনোভঙ্গী সম্পূর্ণ ফিরে পেয়েছেন। এগিয়ে গিয়ে বল পিটোতে লাগলেন। পর পর দুটি বাউণ্ডারি হল।

পনসফোর্ড এবার স্মিথের সম্মুখীন হলেন এবং তাঁর দ্বিতীয় বলেই এল. বি. হয়ে ফিরে গেলেন। অস্ট্রেলিয়া মুষড়ে পড়ল। দুটো বাঁধা ব্যাটসম্যান এভাবে আউট হয়ে যাবে তা যে তাদের কল্পনাতীত ছিল।

গ্রীফা ব্যাটসম্যান ডারলিং খেলতে এলেন। ঘড়িতে তখন পাঁচটা বেজে তেইশ মিনিট। কোন রকমে স্মিথের মারাত্মক ওভারটা শেষ হল।

আজের ওভারে ব্র্যাডম্যান আবার দুটো বাউণ্ডারি করলেন। প্রথমটা কভারের মাঝখান দিয়ে নিখুঁত ড্রাইভ, দ্বিতীয়টা প্রচণ্ড হুক। দুটো চারের বাড়ির সামনেই ফিলডার-রা নড়বার চড়বারও অবকাশ পেলেন না, মার দুটো এমনি জোর ছিল।

ডারলিং আবার স্মিথের সামনে পড়লেন। একটা রান হল।

ব্র্যাডম্যান ঠিক এই চাইছিলেন। অর্থাৎ স্মিথকে পিটিয়ে শেষ করতে হবে। স্মিথের জোর বলে আক্রমণাত্মক খেলাই হবে উপযুক্ত। স্মিথের একটা বল মিড অনে ঠেলে দিয়ে দু'রান নিলেন। অস্ট্রেলিয়ার রান হল দুই উইকেটের বিনিময়ে ২২। সব কটি রানই করলেন ব্র্যাডম্যান।

এবার রান ধীরে ধীরে উঠতে লাগল। ডারলিংও কিছু রান করলেন। একবার ক্যাচ আউটের হাত থেকে অব্যাহতি পেলেন স্মিথের বলে।

বোলার বদলানো হতে লাগল। মিডলসেকস-এর অধিনায়ক এনথোভেন এলেন বল করতে। তারপর রবিনস।

রবিনস-এর প্রথম ওভারে ১০ রান হল। তার মধ্যে ব্র্যাডম্যান করলেন সাত রান।

ছটা বেজে পাঁচ মিনিট। রবিনস-এর পরের ওভারে দুটি বাউণ্ডারী মেরে ৪৯ মিনিটে ব্র্যাডম্যান নিজস্ব ৫০ রান পূর্ণ করলেন।

স্মিথের পরবর্তী ওভারে ব্র্যাডম্যান নিলেন ৫ রান তারপর রবিনস-এর বলে পরপর দুটি বাউণ্ডারি মারলেন। রবিনস ও স্মিথ দু'জনকেই অতঃপর বিশ্রাম দিলেন মিডলসেকস-এর অধিনায়ক। ৯ ওভারে মাত্র ৩৪ রান দিয়ে স্মিথ তখন দুটি উইকেট নিয়েছেন।

স্মিথের জায়গায় পিবলস বল করতে এলেন। তাঁর বলে একটি চার মারলেন ব্র্যাডম্যান। তাঁর রান সংখ্যা ইতিমধ্যে বেড়ে দাঁড়াল ৭৪।

ঘড়িতে তখন ৬'১০। খেলার সময় আছে আর মাত্র ১১ মিনিট। ৬-৩০-এ খেলা শেষ হবে। সেঞ্চুরি করতে গেলে ব্র্যাডম্যানকে ঐ ১১ মিনিটে ২৬ রান করতে হবে। অসম্ভব। ১১ মিনিটে ২৬ রান।

এনথোভেনের পরের ওভারে ডারলিং কোন রান করতে পারলেন না। তিন মিনিট সময় চলে গেল বৃথা। তাহলে ১৪ মিনিটে ব্র্যাডম্যানকে করতে হবে ২৬ রান। অকল্পনীয়। আজ আর ব্র্যাডম্যানের শত রান পূর্ণ হবার আশা নেই—এই সত্যই মেনে নিলেন দর্শকবৃন্দ।

পরের ওভারে পিবলস-এর বলে ব্র্যাডম্যান মাত্র একটি রান নিতে সক্ষম হলেন। তারপর ডারলিং আর একটিও রান করতে পারলেন না।

ব্র্যাডম্যানের রান সংখ্যা ৭৫। খেলা শেষ হতে বাকি আছে আর মাত্র ১২ মিনিট। ঐ সময়ের মধ্যে ২৫ রান করা কি সম্ভব? ভাবতেই পারা যায় না।

পরের ওভারে এনথোভেন বল করতে লাগলেন। প্রথম বলে স্কোয়ার কাট করে বাউণ্ডারি করলেন ব্র্যাডম্যান। পরের দুটো বল বৃথা গেল। চতুর্থ বলে নিলেন একটি রান। পরের বলে ডারলিং নিলেন এক রান। কিন্তু ব্র্যাডম্যান তখন উদ্দীপ্ত। শেষ বলে তড়িঘড়ি একটি রান নিলেন।

খেলা শেষ হতে বাকি আর মাত্র তিনটি ওভার। ব্র্যাডম্যানের রান সংখ্যা ৮১। মাঠের বিশ-হাজার দর্শক রুদ্ধশ্বাসে বসে দেখছেন, কি হয়, কি হয়। তাঁরা একান্ত মনে চাইছেন, তব শত রান পূর্ণ করুন। সারা মাঠে তুমুল উত্তেজনা।

পিবলস-এর সম্মুখীন হলেন ব্র্যাডম্যান। প্রথম বলটি পিছিয়ে দিয়ে মারলেন অদ্ভুত কবজির কায়দায়। বল চলে গেল বাউণ্ডারির সীমারেখা ছাড়িয়ে। পরের বলে একটি রান। এখন ডারলিংএর উপর নির্ভর করছে সব কিছু। একটা সট রানের এখনি প্রয়োজন। ডারলিং হতাশ করলেন না। একটি রান নিলেন। পরের দুটি বলে ড্রাইভ আর পুল করে ব্র্যাডম্যান করলেন ৮ রান।

৯১ রান হল ব্র্যাডম্যানের। এখন পিবলস-এর শেষ বলে একটি রান নিতে পারলে ব্র্যাডম্যান পরের ওভার খেলতে পারবেন। কিন্তু ঐ রানটা যাতে না নেওয়া যায় তার জন্যে চেষ্টার কসুর করলেন না মিডলসেকস-এর ফিল্ডাররা। শেষ বলের আর রবিন কাঁপিয়ে পড়ে রুখলেন। ফলে কোন রান হলনা।

পরের ওভারে এনথোভেনের দ্বিতীয় বলে ডারলিং একটি রান নিয়ে ব্র্যাডম্যানকে খেলবার সুযোগ দিলেন। তৃতীয় বলে কোন রান হল না। চতুর্থ বলে ব্র্যাডম্যান একটি রান করলেন।

খেলা শেষ হতে বাকি মাত্র তিন মিনিট। ব্র্যাডম্যানকে সেঞ্চুরির জন্যে এখনো ৫ রান করতে হবে। সেই ওভারে ডারলিং আবার ক্যাচ আউট হতে হতে বেঁচে গেলেন।

শেষ ওভার। ব্র্যাডম্যানের শেষ সুযোগ! পিবলস-এর হাতে বল তুলে দিলেন মিডলসেকস অধিনায়ক—স্মিথকে না দিয়ে, যা অনেকেই আশা করেছিল।

প্রথম তিনটি বলে কোন রান করতে পারলেন না ব্র্যাডম্যান। আর বাকী আছে মাত্র তিনটি বল। ব্র্যাডম্যানকে ৫ রান করতে হবে। সমস্ত মাঠ যেন উত্তেজনায় কাঁপছে।

পিবলস-এর চতুর্থ বলটি ধীরে সুস্থে দেখে শুনে কভার পয়েন্টের ভিতর দিয়ে বাউণ্ডারিতে পাঠালেন ব্র্যাডম্যান।

বাকি রইল দুটি বল। কিন্তু পিবলস-এর পঞ্চম বলটি ব্র্যাডম্যান যেন খেলেও খেললেন না— সোজা পাঠিয়ে দিলেন স্কোয়ারের কাছে।

কিন্তু তখনো একটা বল বাকি। পিবলস দিলেন সেদিনকার খেলার সেই শেষ বল।

কিন্তু কৈ! ব্র্যাডম্যান তো বলটা খেললেন না। তিনি তো একটুও নড়াচড়া করলেন না। কিন্তু না, ঐ যে বলটা চলেছে মিড অন ফিলডারের কাছ দিয়ে।

রান নেওয়ায় বিপদ আছে। কিন্তু ততক্ষণে বিদ্যুৎগতিতে ছুটেছেন ব্র্যাডম্যান আর ডারলিং। বল উইকেটে আসবার আগেই তাঁরা পৌঁছে গেলেন দুই প্রান্তে।

শত রান পূর্ণ হল ব্র্যাডম্যানের। দিনের শেষ বলে শেষ রানটি নিয়ে ব্র্যাডম্যান দর্শকদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। উত্তাল হয়ে উঠল দর্শক সমুদ্র। সে এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য। হাজার হাজার দর্শক মাঠে নেমে ব্র্যাডম্যানকে ঘিরে নাচতে লাগল। এমন খেলা বুঝি তারা আর এ জীবনে দেখেনি, দেখবে না। নব্বুই মিনিটেরও কম সময়ে ব্যক্তিগত শতরান—এমন নজীর কী আর আছে!

ব্র্যাডম্যান দর্শকদের উদ্দেশে বললেন, আপনাদের আনন্দ দিতে পেরেছি বলে আমি কৃতার্থ। এটি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সেঞ্চুরি।

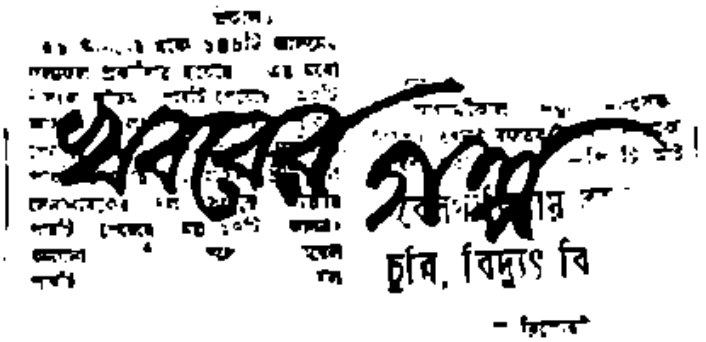

ডাকহরকরা

গল্প-ভারতীর পাঠকদের সতর্ক করে দেবার জন্যে একটি সত্য ঘটনা বলছি। আমার এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর পুত্র, এম. এ. পাশ, একটি স্কুলের শিক্ষক, বড়বাজারে তার কর্মস্থল, কয়েকদিন আগে বেলা দুপুর নাগাদ বড়বাজার স্কুলটির সামনে দিয়ে আসছে, এমন সময় এক সাধু তার পথরোধ করে দাঁড়ালো। ছেলেটি সাধুর দিকে তাকালো, দেখলো, সাধু একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে আছে। চোখোচোখি হতেই সাধু বললে, আমাকে কিছু দাও :

ছেলেটি সাধুর দিকে তাকিয়ে আছে। সাধুও তাকে দেখছে। পকেট থেকে দুটিটি পয়সা বার করল ছেলেটি, সাধুর হাতে দিল।

মাথা নেড়ে সাধু বললে, এতে দিল্ খুশী হল না, আরও কিছু দাও।

ছেলেটি তখন যেন কেমন হয়ে গেছে। তার পকেটে ছিল সাত টাকা। নিঃশব্দে বার করে সেই সাত টাকা সাধুর হাতে দিলে।

সাধু তখনো তেমনি করে ছেলেটির পানে চেয়ে আছে, বললে, উঁহুঁ, আরও কিছু চাই। ছেলেটি নির্বাক। সাধু বললে, তোমার ঐ হাতের ঘড়িটা খুলে আমায় দাও।

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল না ছেলেটি। দামী ব্যাণ্ড সমেত দামী রিস্টওয়াচটি কব্জি থেকে খুলে সাধুর হাতে অর্পণ করল। সাধু বললে, এবার বাড়ী চলে যাও।

মোহগ্রস্তের মত ছেলেটি বাড়ী চলে এল। সারা দিনরাত মাথা এবং শরীরের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। রাত্রে ঘুমতে পারল না। তার বাবা জিজ্ঞেস করাতে সব কথা খুলে বললে। পরের দিন অবশ্য সে সম্পূর্ণ সুস্থ এবং সচেতন হল আর নিজের বোকামির জন্য অনুতপ্ত হল।

এই ঘটনাটি পড়ে পাঠকরা এটুকু অন্তত বুঝবেন যে, পথে ঘাটে কোনো ভিখারী, সাধু, অপরিচিত ব্যক্তি বা অন্য কেউ, যাকে আমি না, তার কোনো কথা শোনবার জন্যে তার কাছে দাঁড়ানো বা তার সঙ্গে কথা বলা একেবারেই সমীচীন নয়।

• • • •

সাহিত্য, বিশেষ করে চলচ্চিত্রের প্রভাব তরুণ মনে যে কতখানি মন্দ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে তার ভূরিভূরি প্রমাণ ইতিপূর্বে পাওয়া গেছে। বিদেশী চলচ্চিত্র দেখে নানা রকম কু-অভ্যাস এদেশের দর্শকদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে এমন নজীরের অভাব নেই।

সম্প্রতি দুর্গাপুরের চিত্তরঞ্জনে যে ব্যাঙ্ক ডাকাতি হয়ে গেছে সেই সম্বন্ধে ধৃত ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেছে যে, তারা একটি বিদেশী চলচ্চিত্র দেখে ডাকাতির কায়দা কৌশল এবং পদ্ধতি

শিক্ষা করেছে। এই চিত্রটি ছিল ডাকাতি সম্পর্কে এবং তারা ডাকাতির কৌশল শিক্ষা করবার জন্যে ২৬ বার ছবিটি দেখেছে।

এ সম্বন্ধে আর বিশেষ টীকা টিপ্পনি নিষ্প্রয়োজন। একথা আগেও বলা হয়েছে যে বিদেশী চলচ্চিত্রগুলি নানা ভাবেই এদেশের দর্শকদের মনে কু-প্রভাব বিস্তার করে, অবশ্য সব ছবি নয়, কিন্তু এমনিতর কু-প্রভাব বিস্তারকারী ছবি নিয়মিত আসে এদেশে। কিন্তু রাজ্যের বা কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট বিভাগ এ নিয়ে মাথা ঘামায় না বা কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রয়োজনীয়তা আছে বলেও মনে করেন না। যাক ডাকাতির ব্যাপারে উক্ত যে তথ্যটি উদ্ঘাটিত হয়েছে সেটি কী ভেবে দেখবার মত নয়?

• • • • •

প্রেমের বিচিত্র গতি!

পঞ্চাশ বছর আগে বিলাতের কোলচিল নামক স্থানের বাসিন্দা কয়লাখনির তরুণ মালিক জো কক্স্ ম্যাগি নামে একটি মেয়ের প্রেমে পড়লেন। বাগদান হয়ে গেল। তার পর জীবনের আবর্তে তাঁরা দুজনে দুদিকে চলে গেলেন। তাঁদের বিবাহ সম্পন্ন হল না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেধে গেল। তাঁরা পত্র বিনিময় করতেন। কিন্তু আর পত্র পাওয়া যায় না। যুদ্ধের হিড়িকে সব গোলমাল হয়ে গেল। কিন্তু ছাড়াছাড়ি হলেও বা যোগাযোগ না থাকলেও তাঁদের এনগেজমেণ্ট তাঁরা ভঙ্গ করেন নি।

ইতিমধ্যে জো বিবাহ করলেন। ম্যাগিও তিনতিনবার বিয়ে করে তিনবারই বিধবা হলেন।

তিন বছর আগে জোর স্ত্রীবিয়োগের পর তিনি তাঁর প্রথম প্রেমিকার খোঁজ করতে লাগলেন। খুঁজতে খুঁজতে পাওয়া গেল ম্যাগিকে। দু'জনে মিলিত হলেন। সুখদুঃখের অনেক কথা বললেন পরস্পরের মধ্যে। তারপর তাঁরা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হলেন। এটাই তাদের জীবনের সাম্প্রতিকতম খবর, জো-র বয়স বর্তমানে পঁচাত্তর, ম্যাগির তিয়াত্তর। তা হোক বয়স, প্রেমের জোয়ারে আজও তাঁরা নবীন। বিয়ের সময় ম্যাগি কেঁদে বলেছেন, আমি সুখী, এছাড়া আমার আর কিছু বলবার নেই। আমি সব সময় প্রিয়তম জো-র কাছে কাছে থাকবো।

• • • •

যৌন সহবাসের উপর ট্যাক্স ধার্য হয়েছে—এমন কথা শুনেছেন কখনো? কিন্তু সত্যিই হয়েছে। নিউ-আইল্যাণ্ডে সম্প্রতি এই কর চালু করা হয়েছে। মাননীয় গ্ল্যাডস্টোন নামে রাজসচিব বলেছেন শীঘ্রই এসম্বন্ধে একটি বিল পাশ করা হবে, এই বিলে বলা হয়েছে, প্রতিবার যৌন সংসর্গের জন্য দু'ডলার (একডলার পাঁচ টাকার সামিল) ট্যাক্স দিতে হবে। তিনি আরও বলেছেন প্রথম বছর এই ট্যাক্স আদায়ের দ্বারা ৩০ মিলিয়ন ডলার সরকারের ঘরে আসবে।

এ সম্বন্ধে তিনি আরও পরিসংখ্যান দাখিল করেছেন, সে সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল নেই। আমরা শুধু ভাবছি, ট্যাক্স আদায় হবে কীভাবে। এতো আয় কর, সম্পত্তি কর, বা অন্য কোন প্রকার কর নয়, যা খাতাপত্র দ্বারা প্রমাণ করা যায়। তাহলে কী প্রত্যেক পুরুষকে তার মাসিক বা বার্ষিক যৌনসংসর্গের হিসাব দাখিল করতে হবে? আর, সে হিসাব যে নির্ভুল তা প্রমাণ হবে কেমন করে? এ সম্বন্ধে গ্ল্যাডস্টোন সাহেব আলোকপাত করলে ভাল করতেন।

• • • •

এমন কথা শুনেছেন কোথাও যে একটি চলচ্চিত্রাভিনেত্রী তার ছবি যাতে দর্শক আকর্ষণ করে সেজন্যে, যে ছবিঘরে তার ছবিটি প্রদর্শিত হচ্ছে সেই ছবিঘরের সামনে রাজরাস্তায় দাঁড়িয়ে সে গায়ের কাপড় চোপড় সব খুলে ফেলে ভীড় জমাতে লাগল ?

এদেশে এখনো ওরকম ব্যাপার চালু হয়নি। খবরটি এসেছে ম্যানিলা থেকে। সেখানকার এক চিত্রতারকা এই কাণ্ড করেছিল, যার ফলে, তার নগ্নরূপ দেখবার জন্যে এবং তার কাছে যাবার জন্যে হাজার হাজার মানুষ ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি করে শেষ পর্যন্ত এক মহাদাঙ্গার সৃষ্টি করেছিল এবং পুলিশ ক্ষিপ্ত জনতাকে কাঁদানে গ্যাস দিয়ে খেদিয়ে অভিনেত্রীটিকে থানায় নিয়ে গিয়ে পুরেছিল।

অভিনেত্রীটির নাম ভিয়োনি। যে ছবিঘরে তার ছবি চলছিল সেখানে ভীড় হচ্ছিল না। তাই ভীড় বাড়াবার জন্যে সে চিত্রগৃহের বার-বালানের উপর দাঁড়িয়ে একটি একটি করে তার পরণের পোষাক খুলে ফেলে রাস্তার লোককে একেবারে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল।

পুলিশের কাছে সে বলেছে—এতে এমন কি অন্যায় কাজ আমি করেছি ! শিল্পের জন্যেই আমি এই আয়োজন করেছিলাম। তাছাড়া আরও উদ্দেশ্য ছিল, তা হল আমার ছবির জন্যে আরও দর্শক সমাগম করা। এতে অপরাধ কিসের ?

পুলিশ তাকে তার অপরাধের গুরুত্ব বোঝাতে পেরেছিল কিনা, তা জানা যায় নি।

• • • •

"অনেক দিন হইল একটী সুইডেনের মানুষকে দেখিয়াছিলাম। তাঁহার নাম 'জামারগ্রেণ'। তিনি সেই সুদূরদেশে বসিয়া দৈবক্রমে রামমোহন রায়ের কি একটুকু পরিচয় কোন একটা ব্যাপারে পাইয়াছিলেন। ইহাতেই তাঁহার মনে এমন একটী ভক্তি জাগ্রত হইয়াছিল যে তাঁহার দারিদ্র্য সত্ত্বেও দেশ ছাড়িয়া তিনি বহু কষ্টে সমুদ্র পার হইয়া এই বাংলা দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই রামমোহন রায়ের দেশকে তিনি বরণ করিয়া লইলেন। যে অল্প কয়েকদিন বাঁচিয়াছিলেন, কী দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিয়া, কী নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে অথচ কী সম্পূর্ণ নম্রতার মধ্যে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া এই দেশের হিতের জন্য তিনি নিজের প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। নিমতলার ঘাটে তাঁহার মৃত দেহ দাহ করা হইয়াছিল। তদুপলক্ষ্যে হিন্দুর শ্মশান কলুষিত করা হইল বলিয়া আমাদের কোন সাপ্তাহিক পত্র ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিল।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই প্রথম

[গল্প-ভারতীতে 'এই প্রথম' পর্যায়ে আমরা সম্ভাবনাপূর্ণ নবাগত লেখক-লেখিকাদের রচনা আজ বহুদিন ধরে ছেপে আসছি। নূতন লেখক সৃষ্টি করা সাহিত্য-পত্রিকার একটি বিশেষ কর্তব্য। এই ভাবে ভাষায়িত হয়েই আমরা এই অধ্যায়টির সূচনা করি। সত্যই যাঁদের প্রতিভা আছে, সুযোগ সুবিধা পেলে যাঁরা একদিন সুনাম ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবেন তাঁদের রচনা পাঠকদের সামনে তুলে ধরে তাঁদের উৎসাহ দান করাই আমাদের উদ্দেশ্য। পৃথিবীর সর্বত্রই এমনি করে নূতন লেখক তৈরী হয়ে থাকে। একদিন এইসব নূতন লেখক লেখিকা যে প্রথম সারিতে স্থান পাবেনা তা কে বলতে পারে। লেখকদের কাছে আমাদের অনুরোধ, রচনা পাঠাবার সময় 'এই প্রথম' এই কথাটির যেন উল্লেখ করেন এবং নিজের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি জানিয়ে যেন, কেন না পাঠকদের এইসব জানবার বিশেষ কৌতূহল হয়]

সম্পাদক—গল্প-ভারতী

নষ্টচক্র

শুক্ল মুখোপাধ্যায়

ছোট একখানি গ্রাম নাম হারিদা।···হাজারিবাগের পার্বত্য অঞ্চল ঘেরা জনপদ। কাছে তার নূতন নূতন শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠ্‌ছে।

একদিকে একটি অভিকায় লৌহ শিল্পসংস্থা গড়ে উঠ্‌ছে অন্য দিকে দামোদরের একটী বাঁধের জন্য কর্মপ্রচেষ্টায় শ্রমিকের মন ক্রত তার কৃষিজীবন থেকে উৎক্ষিপ্ত করছে। ফলে বাধছে পুরাতনের সঙ্গে নূতনের দ্বন্দ্ব ; সৃষ্টি করছে নূতন নূতন সমস্যা। শিল্পশ্রমিক তার বৃত্তিসুলভ আয়ের অভিমানে গর্বিত, তার অর্থের ঝলসানি যারা এখনও দেশের ক্ষেতের কাজ করে ফসল তৈরী করছে তাদের উদ্ভ্রান্ত করছে, মেয়েদের প্রলুব্ধ করছে।

আদুর হারিদার চাষী—বয়সে যুবক, প্রায় উত্তর তিরিশ। ক্ষেতের কাজ করে আর বাকি সময় মজুরের কাজ করে। যখন মহুয়া গাছে মহুয়া ধরে, গাছের রঙে মাঠের রঙ রঙিন হয়ে ওঠে, তারই ছায়া পড়ে বুঝি মনে ; রঙের আবাহনে সারা গ্রাম মেতে ওঠে। মাঠে ঘাটে পাহাড়ে সব মেয়েরা রঙিন শাড়ী পরে মহুয়া কুড়াতে যায়। সঙ্গে সঙ্গে গান করে সুর করে, এ যেন একটা উৎসব। তারপর সেই সব কুড়ানো মহুয়া ছাড়িয়ে তার থেকে মহুয়ার মদ তৈরী হয় ঘরে ঘরে। উৎসব রাত্রির অভিষেক হয় মাদলের তালে তালে যখন প্রত্যেকটি যুবক যুবতী নূতন তৈরী মহুয়ার মদে মাতাল হয়ে ওঠে। মহুয়ার মদ আর মহুয়ার তেল প্রতি বাড়ীতে মেয়েদের তৈরী করতে হয়। এতেই এদের পালন করে সারা বছর। বাড়তি মদ আর তেল ওরা নিয়ে যায় দূরের গ্রামাঞ্চলে, হাটে বিক্রী করতে। তারপরে যখন আবার মহুয়ার রঙ বিলীন হয়, তখন সব ছেলেরা আবার শিঙা নাড় মনে মাঠের কাজে নামে। জ্যৈষ্ঠের কাঠফাটা রোদে দু'ক্রোশ পথ চলে আদুর দিলদারের ঘরের দাওয়ায় এক হাঁড়ি রস আর কিছু পাটালী গুড় নামিয়ে ডাকল 'পিয়ারী ! ভাবী !'

পিয়ারী আবুবের খুড়তুতো ভাই দিলদারের বৌ। সে অনেকদিনের কথা, যখন পিয়ারী নূতন বৌ হয়ে দিলদারের ঘরে আসে। তখন কিশোর আবুবের সে হল খেলার সঙ্গী আবুবকে ডাকতো মিতে।·· আবুবের মনে সে সব কথা ভীড় করে এলো। পিয়ারী তার ঘুড়ির সুতোয় মিতো ঘুট পাকিয়ে, লুকিয়ে কেলুতো লাট্টু, আবার আবুবকে জব্দ করার আনন্দে নিজেই তাকে এনে দিতো।···আবুবের মনে পড়লো একদিন পিয়ারীর ধরা টিয়াপাখী আবুব উড়িয়ে দিতে পিয়ারীর সে কি কান্না থামলো যখন আবুব তাকে চাংদোলা করে নিয়ে গিয়ে তার কৌচড় ভরে দিল কাঁচা পাকা পিয়ারায়। আবার অমাবস্যার রাতে বোরখা পরে পিয়ারীকে ভূতের ভয় দেখিয়ে তার কাছ থেকে গলার হার নিয়ে গিয়েছিলো। কদিন বাদে যখন দিলদারের নজরে পড়লো তখন আবুব পিয়ারীকে বোকা বানিয়ে খুঁজে এনে দিল সেই হার। সেই পিয়ারী এখন বড় হয়েছে, সে পাকা গিন্নি শুধু নয়, দিলদারের দিল থেকে সুরু করে সব কিছুর ভার সে তুলে নিয়েছে নিজের পাকা হাতে। শুধু তাই নয়, মহুয়ার মদ তৈরী করে সে চমৎকার। মদ তৈরী করা বুঝি একটা আর্ট। সকলের হাতে ভালো হয় না। কিন্তু পিয়ারী যখন হাত লাগায় তখন সে বুঝি অদ্ভুত হয়ে ওঠে।

পিয়ারী আবুবের গলা শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। কিছুক্ষণ আগেই সে ক্ষেত থেকে ফিরেছে, দিলদারের খাবার নিয়ে গেছলো।···পিয়ারী আবুবকে বলে—মিতে, অনেকদিন আর এমুখো হওনি। বিবি কি খাঁচলে বেঁধে ফেলেছে নাকি। বসো, তামাক খাও। আবুবের আনা রস আর গুড় দেখে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

আবুব বলে, "মিতে তোমার জন্ত গুড়পাটালি আর তাইজানের জন্ত একটু রস এনেছি।··আমার অদৃষ্টির কি সেদিন করবে যে বিবিকে ঘরে আনবো। তাইতো তোমার মুখ দেখে প্রাণ ঠাণ্ডা করতে আসি। আজকাল মেয়ের বাপদের যে টাকার খাঁই হয়েছে। বিয়ে সাদি বোধহয় আমার অদৃষ্টে আর নেই।

পিয়ারীর মুখে হাসি ফোটে। তবে সে খুব ভীক্ষ্ণধী; একটা মতলব না নিয়ে যে আবুব আসেনি এটা সে বেশ বুঝেছে।··নানা রকম কথাবার্তা চলে। দিগন্তের রঙের ছিটে বুঝি পিয়ারীর চোখে আর মনেও লেগেছে। আবুবকে এতদিন পরে তার বেশ ভালো লাগে। আবুব পিয়ারীকে জানায় যে তার মহুয়া তোলা শেষ হয়েছে, এখন পিয়ারী যদি তার হাত লাগায় তবে যে মদ তৈরী হবে তাতে তার মান বজায় থাকে। পিয়ারী আগের বছরও মদ তৈরী করে দিয়েছিল আবুবের।

"না, মিতে," পিয়ারী বলে চলে, "গত বছর দিলদার বড়ো রাগ করেছে; মজুরী ছাড়া আমার খাটুনী যদি বাড়তে দেখে তবে আর আমায় আস্ত রাখবে না। মজুরীটাও এবছর একটু বেশী করতে হবে।"

"শোন, পিয়ারী আবুব জবাব দেয়, "তুমি আমার কাছে যা চেয়েছ, না দিয়েছি কী কোনদিন। না, তোমায় অতো ভাবতে হবে না। ভাইজানকে বলে রাজি করে রেখো।"

বেলা গড়িয়ে চলেছে, আবুবকে আবার অনেকদূর ফিরতে হবে। আবুব বিদায় নিয়ে ওঠে। নিশ্চিন্ত মনে আবুব ভাবে ফেরার সময়, যে এতোদিন আবুব তার ঘরে কেউ নেই বলে পিয়ারীর কাছে আসতো তার তোলা মহুয়া নিয়ে মদ তৈরী করার জন্ত। তার জন্ত তার মজুরী বা দরকার কবুল করতো। দিলদার এটা কোনদিনই ভালো চোখে দেখে নি তবে পিয়ারীর টান আবুবের উপর অনেকটাই তাই বুঝে বেশী কিছু বলে না। তবে এমন করে আর কতদিন চলবে।

পিয়ারী দেখতে মোটেই ভালো নয় তবে গড়ন খুব ভালো। একা দশজনের কাজ তুলতে মোটেই ভয় পায় না। বাড়ীর সবকিছু কাজ সে নিজে তো করেই, দিলদারের সেবাযত্নও করে।·· কিন্তু পিয়ারীর

সমস্ত শরীরে কেমন একটা নরম শ্রী আছে, যাতে তাকে লক্ষ্মীমন্ত দেখায়। আদুর যখনই আসে পিয়ারী তাকেও খুব আদর আপ্যায়ন করে। আদুর পিয়ারীকে ঠিক বুঝতে পারে না, কখনও কখনও তার মনে হয় যে এই মেয়েটির মতো তার শুভাকাঙ্ক্ষী বুঝি জগতে আর কেউ নেই।

…মহরমের দিন শেষ হয়ে আসে। পিয়ারীর যত্নে আর পরিশ্রমে আদুর তার ঘর আর ক্ষেত তৈরী করে হাটে বাজারে নিয়ে যায়।…পিয়ারীর জন্য শাড়ী আর তার প্রাপ্য টাকা পৌঁছে দিতেও ভোলে না। আদুরের লাভের অঙ্ক এ বছর যেন স্ফীত হয়ে ওঠে। আদুর তখন আবার আগুছে-বছরের স্বপ্ন চোখে নিয়ে মাঠের কাজে নামে।

আবার বর্ষা নেমেছে, গ্রামের সকলে ক্ষেতের কাজে ব্যস্ত। দিলদার ভাল চাষী; তার জমি অনেক ছিল। আর সে নিজে সব সময়ে ক্ষেতে হাজির থেকে কাজ করাতো। ক্ষেতের মাটি নরম হলে সেই নরম মাটির ঢেলা ভেঙে তাতে লাঙল চালিয়ে আর বই চালিয়ে মাটি তৈরী করতে হয়। তারপরে আসে রোপণের সময়। কাদার মধ্যে নেমে হাজার হাজার চারা লাগাতে হয়, কাজ চলে অবিশ্রান্ত। অনেক সময় রাত ৮।৯টা পর্য্যন্ত দিলদার মজুরদের সঙ্গে খাটে। কাজের মধ্যে থাকলে তার কোন জ্ঞান থাকে না। পিয়ারী খাবার নিয়ে হুবেলা তাকে খাওয়ায়; আর তার পরে দিলদারের কাজের কাছাকাছি থেকে তাকে জোগায় শক্তি, তাকে দেয় আনন্দ। এমনি একটা দিনে সন্ধ্যার পরে যখন আলের উপর দিয়ে পিয়ারীর সাথে দিলদার ঘরে ফিরছে, দেহ তার পরিশ্রান্ত যেন আর টানতে পারছে না। হঠাৎ দিলদার বসে পড়েছে, তার বাঁ পায়ে কামড় দিয়েছে কিছু; পিয়ারী চেয়ে দেখে একটা কাল সাপ অন্ধকারের মধ্যে চলে গেলো। দিলদার কিছুক্ষণের মধ্যেই মাটিতে চলে পড়লো। সাপের বিষে তার সারা শরীর নীল হয়ে গেছে। পিয়ারীর আর্ত্তনাদে গ্রাম শুদ্ধ লোক এলো, দিলদারকে তুলে বাড়ী নিয়ে গেল। রোজা আনা হল দূর গ্রামান্তর থেকে, কিন্তু দিলদার ভোর রাত্রে চলে গেল চিরদিনের জন্য। খবর শুনে আদুর পিয়ারীর চোখের জল মুছল দু'চার দিন, তারপর একদিন তাকে নিকে করার প্রস্তাব করলে।

• • • •

গুলসন গফুরের মেয়ে। বড়ো আদরে মেয়েটার মাথা খেয়েছে বুঝি গফুর মিঞা। ছোটবেলা থেকে তার রূপের জন্য সবাই তাকে আদর করে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রূপের গরবে বুঝি তার মাটিতে পা পড়ে না। গুলসনের বিয়ে হয় প্রৌঢ় সামসেরের সঙ্গে সাহাং গ্রামের। সামসের সাহাং গ্রামের ছিল মাতব্বর। ছিল তার অনেক ক্ষেত আর বাঁশবন কাটার ঠিকাদারী। একটা কাগজের কলে সে আদিবাসীদের দিয়ে এই বাঁশ কেটে চালান দিত। তবে সামসেরের মেজাজ ছিল বেজায় কড়া; আর তার বড়ো ছেলে বেশ জোয়ান, নাম আরসেদ। বুড়ো গফুরকে বেশ কিছু টাকা কবুল করে সামসের গুলসনকে ঘরে আনলে।…কিন্তু সামসের বুঝলো যে এ মেয়ে যেন আগুনের গোলা। আধবুড়ো সামসেরের থেকে যে আরসেদের দিকেই তার নজর বেশী সেটা বুঝতে তার দেরী হল না। তারপরে একদিন রাতে আরসেদের সঙ্গে গুলসনকে এমন একটি ভঙ্গীতে সামসের আবিষ্কার করল যে গুলসনকে সে নিয়ে করলো তাড়া। আর তাকে তালাক্ দিয়ে চিরদিনের মতো তার বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিতে দেরী করল না সামসের।

…গুলসন্ আবার ফিরে এলো তার পুরাণো ঘরে। বাড়ীতে কেউ তাকে কিছু বলতে পারেনা, বরং তাকে ভয় করে চলে। কারণ বুড়ো গফুরের সে বড় আদরের মেয়ে। অষ্টাদশী গুলসন ছিপছিপে

ফরসা, গড়নে অতুলনীয়। চল চল মুখের মধ্যে হাসির সঙ্গে যেন একটা সুপ্ত লালসার আবেদন আছে যা প্রতিটি যুবকের মন চঞ্চল না করে পারে না।—সেদিন আমুর যখন বাড়ী ফিরছিল তার মহয়ার মদ করার ব্যবস্থা দেখে তখন বেশে পুকুর থেকে ডুব দিয়ে ভিজে কাপড়ে গুলসন ঘরে ফিরছে। নীলাম্বরী শাড়ীখানি দেহবল্লীর সাথে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে গেছে। বুক দুটি যেন দুটি লালপদ্মের কুঁড়ির মতো উঁচু হয়ে রয়েছে। কালো চুলের রাশ ভেঙে পড়েছে ঘাড়ের পাশদিয়ে এসে কাঁধের উপর আর এতোক্ষণ জলে থাকায় শাড়ী উঠেছে হাঁটুর উপরে। উন্মুক্ত সাদা মোটা মোটা পাদুটিতে সরু দুটি মল যেন তার আওয়াজে আর আঘাতে আওয়ারা করে দিতে চাচ্ছে মনকে। আমুরের মনে হল যে গুলসনের এ স্বর্গরাজ্য থেকে সে যেন খেজুর নির্ব্বাসিত হয়ে পিয়ারীর মতো মেয়ের জোড়সঙ্গ হতে যাচ্ছে।

গুলসন্ আমুরকে আগে থেকেই চিন্‌তো। একটা রসিকতা করে আমুরকে তাদের বাড়ীতে আমন্ত্রণ জানাল। আমুর বল্‌লে "যাবার তো ইচ্ছা ছিল কিন্তু তোমার আব্বাজানের যে খাঁই তাতে আর যাবার মন নেই। গুলসন্ যেন সপ্রেম দৃষ্টিতে আমুরকে ইঙ্গিতে জানালো যে সে তার ঘরে যাবার জন্য প্রতীক্ষা করছে তার আর তর সইছে না।…গুলসনের রূপে আর কথায় আমুরের মাথা ঘুরে গেল। গুলসন্ তার ঘরে গেল আর আমুর নূতন একটী মতলব ফেঁদে বাড়ী ফিরলে।

তার পরদিন সকালে…বুড়ো গফুর উঠে বসেছে দাওয়ায় তার হুঁকো নিয়ে এক ছিলিম তৈরী করছে, এমন সময় দাওয়ার উপর উঠে আদাব জানালে আমুর আর সামনে রাখলে ভালো তামাকের ছোট একটি পুঁটলি। বল্‌লে "চাচা, অনেকদিন এদিকে আসতে পারি নি কাজের জন্য; আমার আনা তামাক একটু খেয়ে দেখুন আজ। অনেক কষ্টে এই তামাক আনিয়েছি আপনার জন্যে।

গফুরের বয়স ষাটের কোঠা প্রায় পার হয়েছে, চোখে ছানির জন্য একটু কম দেখে।…ভালো করে দেখে আমুরকে চিনতে পারলে, আর তামাকটা বার করে দেখে বেশ খুসী হয়ে গেলো। বল্‌লে "বাপ্‌জান! এতোদিন পরে আমার মনে পড়লো। তোমার বাবা করিম আমার ছিল খুব পেয়ারের দোস্ত।…তুমি এতো বড় হয়েছ, কাজকর্মেও খুব ভালো; বুড়ো চাচাকে মাঝে মাঝে দেখতে এসো! কথা বলতে বলতে বুড়ো এক ছিলিম তামাক মুখে তুললো, আর তারপর ভালো তামাকের আস্বাদে সব করলো আঃ।

আমুর এই সুযোগেরই বুঝি অপেক্ষা করছিল। আলাপ সুরু করে দিলে আর গফুরের সঙ্গে তার মৃত পিতার যে খুব দোস্তি ছিল সেই কথায় কথায় ঘনিষ্ঠতা বেড়ে উঠ্‌লো। যখন গফুরের সঙ্গে কথা বল্‌ছে সেই সময় ফকির বেড়ার ফাঁক দিয়ে আমুর দেখলে একজোড়া সুন্দর কাজল কালো চোখ তার দিকে চেয়ে ইসারায় মিনতি জানাচ্ছে বুঝি। আমুরের অমনি মনে পড়ল গুলসনের সঙ্গে তার পথে দেখা হওয়ার কথা।…আমুর বুড়োর কাছে আস্তে আস্তে গুলসন্‌কে নিকে করবার কথা তুল্‌লে। বুড়ো গফুর তার কাজকর্ম, জমিজমা আর বিষয় আশয় নিয়ে প্রশ্ন করে করে সব কিছু জেনে নিলে। সব জেনে গফুরের আর গুলসন্‌কে তার হাতে তুলে দেওয়ার কোন আপত্তি রইলো না মনে। বুড়ো শুধু বল্‌লে "বাপজান, আমার গুলসন্ লক্ষ্মীরার সামিল! সে যে বাড়ীতে যাবে, তার মান রাখতে তাকে দিতেই হবে কুড়িগণ্ডে টাকা।" আমুরও মন থেকে খুব গররাজি ছিল না।…তবে টাকার অঙ্ক শুনে ওর মনটা হল কিছু ভারাক্রান্ত। আর বেশী কথা বল্‌লে না গফুরের সঙ্গে; শুধু বিনয়ের সঙ্গে জানালে যে সে তার সব ব্যবস্থাই মেনে নিতে রাজি।…একভাঁড় মহুয়ার মদ এনে দিতে বল্‌লে গফুর তার আদরের মেয়ে গুলসন্‌কে। গুলসন্ একবারে নাচের ভঙ্গীতে বেরিয়ে এলো দাওয়ায়, তারপর মহুয়ার ভাঁড় আমুরের সামনে বসিয়ে দিয়ে একটু

হেসে কটাক্ষ হেনে দ্রুত ভিতরে চলে গেল। তার সেই কটাক্ষে আহুবের বুকের স্পন্দন যেন স্তব্ধ হয়ে গেল, রক্ত হয়ে উঠ্‌লো চঞ্চল ; দুজোর দিকে তাকিয়ে দেখে, বুড়ো এসব কিছুই লক্ষ্য করে নি। বুড়ো তার হুঁকোটি আহুবের দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে।…

সেদিন গফুরের বাড়ী থেকে আহুব যখন বার হলো তখন গুলসনকে নিকে করার প্রস্তাব প্রায় পাকা করে এনেছে। শুধু দশ কুড়ি টাকা গফুরের চাইই চাই। যে জিনিষে সে হাত দিতে বসেছে তা তো বিনি পয়সায় আহুব আশা করতে পারে না।…আহুব একটু সময় নিলে। অঘ্রাণে ক্ষেতের ফসল কেটে ঘরে তুলবে। তারপরে আসবে মহুয়ার দিন।… সে দিনের দেখে চাঁাকে তার আসবে বেশ কিছু টাকা! মহুয়ার মদ যদি পিয়ারী তৈরী করে তবে যে মদের চাহিদা খুব বেড়ে যাবে এ কথাটাও এক পলকে আহুবের মনে পেঁথে গেল।

একটু আড়ালে গিয়ে হাতছানি দিয়ে গুলসনকে ডাকলে আহুব। তার পরে গুলসনকে তার মতলব সব বলে আর তার বাঁকা চোখের চাহনী আর চাঁদমুখের মিঠে হাসির পাখের নিয়ে আহুব সেদিন ঘরে ফিরলো।

ক্ষেতের কাজ পুরোদমে চলেছে! …আহুব পিয়ারীকে নিকে করে তার বাড়ীতে এনে তুললো। আহুবের মা মরা থেকে তার বাড়ীতে কোন স্ত্রী ছিল না। পিয়ারী দুদিনেই বাড়ীর চেহারা বদলে ফেল্‌লে।… খাটতে তার কোন দিনই ক্লেশ ছিল না। বাড়ীর সব কাজ করে, ক্ষেতের কাজে আহুবকে সাহায্য করে, আহুবের খাবার তৈরী করে রোজ ক্ষেতে পৌঁছে দিয়ে আহুবের মনের আর দেহের তার যেন দুদিনেই নাগর করে তুল্‌লে।…আর তারপর এলো মহুয়ার দিন। সোনার ঘড়ে ভরা সেই দিনগুলি যেন হুড়মুড় করে এলো আর চলে গেলো। রাশি রাশি পাকা পাকা মহুয়া তুলে এনে তার থেকে মদ আর তেল তৈরী হলো যেন যান্ত্রিক গতিতে পিয়ারীর তত্ত্বাবধানে। পিয়ারীর হাতখানি বুঝি সোনা দিয়ে বাঁধানো। উৎসব দিনের সব কিছু খরচ খরচা যাবে সে বছর আহুব অন্যান্য বছরের থেকে তিনগুণ টাকা জমালো।

আদর করে পিয়ারীকে করে দিল রূপার পৈঁছা।…আহুবের মনের রক্তমহলে গুলসনের জন্যে যে একটা তীব্র আকর্ষণ ছিল তা তাকে বরাবরই উদ্‌ভ্রান্ত করছিল। তবে পিয়ারীর আদরযত্নে তার মনকে সে প্রশ্ন করে বললো যে পিয়ারীকে সরিয়ে এখন গুলসনকে আনাটা তার ধর্মে কী সইবে। সেদিন রাত্রে বিছানার ওপরে পিয়ারীর বিগতপ্রায় যৌবন শরীরখানা দেখে লালসা-লোলুপ আহুব বুঝি তার মন ঠিক করে ফেল্‌লে যে গুলসনের সদ্য প্রস্ফুটিত উদ্ভিন্ন যৌবন তার সেবায় না লাগালে বুঝি তৃপ্তি আর আসবে না। সে যেন ভাগ্রত হয়ে অনুভব করলে যে তার ভোগের দিন দ্রুত শেষ হয়ে আসছে। গুলসনের রূপবহ্নি তাকে কাছে পাবার লোভে। পিয়ারীর কথা তখন মনে হতে তার মানসচক্ষে যেন দেখলো সে সোনার ফসল ভাসিয়ে দিয়ে মাটির ফসল তুলে নিয়েছে।

দুরাত্মার বুঝি ছলের অভাব নেই। গ্রীষ্ম তখন যায় যায়, বর্ষার প্রথম পদার্পণে মাঠের শুকনো মাটী সরস হয়ে উঠেছে। কালো মেঘের পৌঁচড়ায় আকাশের রূপ গেছে বদলে, নূতন বর্ষার জলে মাটীর গন্ধ আর কাজের তাড়া যেমনতি মানুষকে মরমাতা করেছে। এমন দিনে পিয়ারীর সঙ্গে অনর্থক এক ঝগড়া করে কাজের শেষের সঙ্গে তার অসমত চলাকেরার নাম করে আহুব তাকে বিদায় করলে, তালাক দিলে।… আহুবের ঘর আবার শূন্য হয়ে গেলো।…তবে আহুবের মন মহুয়ার মত মেতে উঠ্‌লো। সে বুড়ো গফুরের

কাছে সেই দিনই দশকুড়ি টাকা নিয়ে গেল ; গুলসনকে সে নিকে করে ঘরে আনবে।…আহুবের মনে হলো সে যেন দিনদুনিয়ার মালিক হতে চলেছে।

দু'দিন পরেই গুলসন্ আহুবের বাড়ী এসে উঠলো।… গুলসন্ ছিল নিজের রূপের গর্বে গর্বিত আর তার কাজ করার ইচ্ছা বা শিক্ষা ছোটবেলা থেকে ছিল খুব কম। সে ছিল আরামী আর আবদার আর অভিমান তার সারা সব কাজে ফুটে উঠ্তো! আহুবের দিনগুলি হঠাৎ সোনার খাঁচায় অপরূপ হয়ে উঠলো। নূতন করে গুলসনের প্রেম, রূপযৌবন আর আদর আবদারের লুকোচুরি তার জীবনকে যেন নবজীবনের স্পর্শ দিলে। আহুবের মনে হতো সে যেন হঠাৎ স্বপ্নলোকে জেগে উঠেছে ; রাতের গুলসন্ যখন বিছানার গুলবাগিচায় যাদুরাই গোলাপের মতো তার রূপে গন্ধে ফুটে উঠে নিজেকে আহুবের কাছে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতো তখন যেন সে কোন বিদেহিনী শক্তিতে নিজেকে হারিয়ে ফেল্তো। সাপের ছোবল তোলার যে ক্ষমতা সে যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে নিজের সকল আর শক্তি হারিয়েছে। সে যেন সাপুড়ের বাঁশিতে তারই বাঁশির তালে তালে নেচে চলেছে। আহুব কী ক্ষুদ্র পতঙ্গের মতো প্রখর দীপশিখার আকর্ষণে নিজেকে সঁপে দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। গুলসন্ কী সেই দীপশিখা! কিন্তু এতো পিয়ারীর মতো শান্ত মৃদুকোপের প্রদীপ নয়। এ যে তীব্র বিদ্যুৎবহ্নি, বিজলীর তরঙ্গরেখা। এর আলোড়ন বেশ কিছুদিনের মতো আহুবের সবকিছু বোঝবার শক্তি বুঝি হরণ করলো। আহুবের যা কিছু ছিল গুলসনের পায়ে তার সব কিছু দিল। কিন্তু গুলসনের মন ছিল উটু তারে বাঁধা, আকাঙ্ক্ষা তার ছিল দুর্বার সীমাহীন। সে আহুবের ছোট ঘরের গণ্ডির মধ্যে যেন তৃপ্তি পাচ্ছিল না তার মন ছুটে যাচ্ছিল আরো ঐশ্বর্যের অভিমুখে যা সে এখনও পায় নি।… খাটতে গুলসন চিরদিনই নারাজ ; এই নিয়ে বাধলো গোল। আহুব পিয়ারীর হাতে নিজের ভার তুলে দিয়ে যেমন বেঁচেছিল, গুলসনের কাছ থেকে তার সব আশা ফিরে এলো অনায়ত্ত হয়ে। ক্ষেতে আহুব কাজ করে, তার খাবার পৌঁছায় না ; পরিশ্রান্ত আহুব বিলম্ব বেলায় বাড়ী ফিরে দেখে প্রসাধন আর বেশবিন্যাস করে খেয়ে দেয়ে গুলসন্ হয়তো ঘুমুচ্ছে না হয় 'কভিমা বিবির কেচ্ছা' পড়ছে।…ক্ষেতের কাজ কোনো রকমে তুলে দিল।…তার পরে এলো মহুয়া তোলার দিন। আহুবের মনে বুঝি রঙের পিচকারী রং ছিটিয়ে ছিল ; গুলসনকে দু'তিন দিন তার সঙ্গী করে মহুয়া কুড়াতে যায়। গুলসন হাসি তামাসা করে, নাচে, গায় ; কিন্তু মহুয়ার মধ তাকে দিয়ে তৈরী হয় না সে পরিষ্কার বলে দেয় এইরকম বনজের মতো খাটতে তার জন্ম নয়। এই খাটুনির কাজ করবার জন্য যদি দরকার আহুব যেন একটী জানোয়ারের সঙ্গে ঘর করে। আহুব প্রথমে রাগ করলে, একবার অভিমান করলে, একটু বকাবকি করলে, তারপরে যখন দেখলে যে গুলসন্ শুধু তার নর্মসঙ্গিনী, শুধু তার লালসায় তৃপ্তি দিতে পারে, আর কোন কাজে তার সহায় নয়, তখন তার মন একটু টল্লো।

দুতিন দিন ঝগড়ার গুলসন্ও বললে যে তার রূপ যৌবন দিলে সে অনেক ভালো ঘরে যেতে পারে। গুলসনের তার কাছে তার প্রসাধন আর দেহচর্চার জন্য যে সব জিনিষ প্রয়োজন তার কিছুই আহুব নিজের পয়সা দিতে পারেনি। শাড়ী কি সালোয়ার তার যা আছে তাতে তার মতো মেয়ের কী মন ভরে, তার যৌবন কী ঢাকা যায়। এখন না পরলে সে কখন আর ভোগ করবে জীবনের সব সুখ। আহুবের রক্ত গরম হয়ে ওঠে ; কিন্তু ক্ষমতা তার সীমাবদ্ধ। দশকুড়ি টাকা তো বুড়ো গরুরের তহবিলে গেছে। এবার মহুয়ার মধ করাতে যে গুলসনের সাহায্য পায় নি বলে তার বিক্রীও কম হয়েছে, আয় গেছে কমে। গুলসন্তো এ সবের কিছুতেই মাথা দিতে চায় না।

সেদিন ছিল মহুয়া উৎসবের রাত। সারা গ্রাম মহে ও রঙে মেতে উঠেছে।... রাতে রাতে বড় বড় আগুন জেলে তার চারদিক ঘিরে দল বেঁধে নরনারী উৎসব রাত্রির মাদল আর গান সুরু করেছে। খাদ্য আর পানীয় নিয়মিত আসছে আর রাতের প্রহর যতো বেড়ে উঠ্‌ছে ততো চলা যাচ্ছে বেড়ে। দু'একজন নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছে এই উৎসবে অন্য গ্রাম থেকে।

আহুদের পাড়ীতে গুলশন্, আহুদ ও পাড়ার ছেলেমেয়েদের নিয়ে মাদল সুরু করেছে। আজ মহুয়ার মদ এক হাড়ি পিয়ারী পাঠিয়ে দিয়েছে হঠাৎ; আহুদ ভাঁড়ের পর ভাঁড় শেষ করে চলেছে। তার মনে হচ্ছে যেন গুলশন্ নাচ্‌তে সুরু করেছে তার সামনে আর তার দেহ যেন ক্রমশঃ নগ্ন ও নিবাবরন হয়ে নিজেকে লালসা বিহ্বল করছে। নিমন্ত্রিত একজন আহুদের বাড়ি আজ অতিথি। সে ইকবাল। ইকবাল নাকি গুলশনের খুব দূর সম্পর্কের ভাই হয়। ইকবাল মাঝে মাঝে গুলশনের বাড়ি আসতো আর আনতো তার জন্য নানারকম উপহার, নানারূপ প্রসাধনের সামগ্রী। গুলশন্‌ও প্রতিদানে ইকবালকে তার মহব্বতের একটু ঝাঝিণা ছিটিয়ে দিতে ক্ষুণ্ন হতো না। আজ গুলশনের সন্ধানে এসে ইকবাল আহুদের সঙ্গে হলো পরিচিত। হলো উৎসব রাত্রিতে আহুদের অতিথি। আহুদ ইকবালকে ভালো চোখেই দেখেছিল।

ইকবাল জামা কাপড়ে অতি আধুনিক, লুঙ্গি, পাজামা ছেড়ে সে শার্ট ও প্যান্ট পরতে সুরু করেছে। নাগরিক সভ্যতার হাওয়ায়, আর একটা শিল্পসংস্থার কারিগরী কাজের মাহাত্ম্যে তার চলাফেরায় হাবভাব সব বদলে গিয়েছিল। এই গ্রামে তার বাড়ি হলেও সব বাধা নিষেধ না মেনে সে ঘারাঙ্কারির নূতন ইস্পাত কারখানার ঠিকাদারের কর্মসংস্থায় বেশ ভালো মাহিনাই পায় মাস হিসাবে। সে থাকে ওখানেই, শুধু মাঝে মাঝে গরিব চাষিদের কাছে নিজের সৌভাগ্য জাহির করতে দেখা দেয় দারিদার মাটিতে। আর এই ছোট রুক্ষ সমাজেও অর্থের কল্যাণে তার মান খুব উঁচুতে। সে হুঁকা খায় না, সিগারেট প্যাকেট প্যাকেট এনে গ্রামের ছেলেদের মধ্যে বিতরণ করে। মহুয়া সে খায় বটে তবে সে যে বিলাতী মাল ইচ্ছামত চালায় সে কথা সবাইকে জানাতে ভুলে না। গুলশন্ আহুদকে নিকে করার আগে একবার ইকবালের খুব কাছাকাছি এগিয়ে গিয়েছিল মাত্র। কিন্তু বুড়ো সহুরের এই অতি আধুনিকতা ভালো লাগেনি। সে বলতো যে নূতন নাগরিক সভ্যতার হাওয়া গ্রামকে ধ্বংস করবে আর যুবকদের করবে বিপথগামী; সে তার হাতে কখনও মেয়েকে তুলে দেবে না। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উৎসবের উত্তেজনা যেন সমানতালে বেড়েই চলেছে।

ইকবাল একটা গান ধরলো তার অর্থ এই "মরুভূমিতে চাষ করতে গিয়ে যে প্রেমিক বেওয়ানা হয়েছে, তাকে আজ সবুজ গাছের ইসারায় ডেকেছে যে অজানা মন সেই মনের আবাহনে আওয়ারা আজ সাজালো তার ডালা ফুলের ডালা—সে ফুল তার হৃদয়ের রক্তে সিঞ্চিত; সে মনের পরতলে লুটায় আজ তার জিন্দেগী আর মহব্বত; সে মন কী আজ তার বেওয়া কোরবান্ নেবে না!"

আহুদের নেশা বেড়ে উঠেছিল। ইকবাল আবার তাকে আর এক পেয়ালা মহুয়া দিল। আহুদ আর বুঝি নিজেকে ধরে রাখতে পারলে না। সে গুলশনের দিকে হাত বাড়িয়ে মাটিতে ঢলে পড়লো।

সেদিন রাত্রে আহুদকে ঘরে শুইয়ে দিয়ে গুলশন্ ইকবালের সঙ্গে পথে পা বাড়ালে। তার চোখে তখন বুঝি ভবিষ্যতের স্বপ্ন বাস্তবের রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে আহুদের ঘর সে আর করবে না। আরো বড়ো, আরো ঐশ্বর্যময় ঘর বাড়ি, আরো গহনা আর শাড়ী আর প্রসাধনের সব কিছু আধুনিক উপাদান সব ইকবাল [illegible]

ও বিশাস ব্যাকুল গুলসন্। আয়ুবের সব পাবিব আশা আকাঙ্খাকে অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে সে বাড়ির। ছেড়ে সেই রাত্রেই চলে গেল।

অনেক বেলায় তার পরদিন আয়ুবের ঘুম ভাঙলো চোখ খুলে কাউকে দেখ্‌তে পেলে না। আগে আয়ুব মনে করেছিল গুলসন্ বোধ হয় স্নান করতে গেছে বা কোন কাজে গেছে। কিন্তু তন্নতন্ন করে যখন ইকবাল কি গুলসন্ কাউকেই খুঁজে পেলে না তখন দৃঢ়নিশ্চয় হল যে গুলসন্ তাকে ছেড়ে গেছে। আয়ুব অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল; তার পরে উঠলো। তার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে। গুলসন্ যে কোনদিনই তার হয়নি সে বেশ বুঝতে পারলে; তার অহঙ্কার বুঝি মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তার বড়ো দুঃখ হল, তার মনে হল যেন সে মাটিতে মাথা কোটে; কেন সে পিয়ারীর মতো বউকে বিনাদোষে তালাক দিয়েছে। অনেকক্ষণ সে মাটিতে পড়ে রইল তার পরে উঠে স্নান করে কিছু খেলো। আর তার পরে বিকাল নাগাদ রওনা হল পিয়ারীর বাড়ীর অভিমুখে।

পিয়ারীকে কাদের আদর করে নিয়ে গিয়ে ঘরে স্থান দিয়েছে। যে বৃথা কলঙ্ক পিয়ারী আর কাদেরকে নিয়ে রচনা করেছিল আয়ুব, কাদের তাকে মেনে নিয়ে পিয়ারীকে নিকে করেছে। কাদের এক সময়ে দুর্ধর্ষ গুণ্ডা ছিল সে কাউকে ভয় করে না। পিয়ারীকে সে যেন সত্যি সত্যি ভালোবেসেছে; সে যে তার খাথায় বাস এটা বোঝানর জন্য কাদের পিয়ারীর হাতে তার সব কিছু টাকাকড়ি থেকে সুরু করে ঘরের সব কিছুর ভার তার শান্ত নিপুণ হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে। কাদের এখন যেন পেয়েছে তার তৃষ্ণার জল, দুদিনের বন্ধু, আঁধার রাতের অন্ধের নড়ি। পিয়ারীও তার নিজের স্থান এর ঘরে করে নিয়েছে পূর্ণ সম্মান আর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। কাদেরের মা মরা মেয়ে আর ছেলেরা মা পেয়ে বেঁচেছে। কাদেরের বড়ো মেয়ে সতেরো বছরের লায়লা তার বড়ো আদরের হয়েছে। কাদের লায়লার বিয়ে দিয়েছিল কিন্তু জামাই জবেদ্ একটা পাঁড় মাতাল সে শুধু মদ আর জুয়া নিয়েই থাকে। কাদের তার তালাক করে তাকে ঘরেই রেখেছে। লায়লা মেয়েটি বড়ো শান্ত, বিনম্র স্বভাবের। সে যেন চাঁদের আলোর মতো স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাধারা বিলিয়ে সবাইকে নিজের করে নেয়। রূপে শ্যামলা, ছোট ছোট দুটি চোখ আর টিকালো নাক আর গোলগাল মুখখানি অপরূপ শ্রীমণ্ডিত। লায়লা খুব খাটতে পারে; শাড়ী পরে আঁট সাঁট করে সারা শরীর ঢেকে আর ছোট মেয়েটির মতো সারা বাড়ীতে ছুটোছুটি করে কাজ করে। বলা বাহুল্য দুদিনেই লায়লা পিয়ারীকে নিজের মায়ের মতো করে তার মন জয় করে নিয়েছিল।

আয়ুব যখন পিয়ারীর বাড়ী পৌঁছাল তখন কাদের বাড়ি ছিল না। তা নাহলে আয়ুবের মাথা আর আস্ত থাকতো না। কারণ কাদের এখনও একা দশজন লাঠিয়ালের পর্দান নিতে পারে, আর বড়ো কড়া মেজাজের লোক। পিয়ারী চিকের ফাঁক দিয়ে আয়ুবকে দেখে বেরিয়ে এলো। তার বুক দুলে উঠ্‌লো একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায়।

পিয়ারীকে দেখে আয়ুব একটু অপ্রস্তুত হলেও পিয়ারী ওকে বেশ সহজভাবেই অভ্যর্থনা জানালে। পিয়ারীর মন বলে গেছলো কাদেরের ঘরে সদয় ব্যবহারে আর ছেলে মেয়েদের ভালোবাসায় আর আয়ুবের ঘর ছাড়ার বেদনা সে প্রায় ভুলতে বসেছিল। তার মন ক্রমে ক্রমে আয়ুবকে ক্ষমা করে আসছিল; আয়ুব যে এক দুরভিসন্ধির চক্রান্তে প্রায় উন্মাদ হয়ে তার পিছনে উন্মাদ মতো ছুটেছিল আর তাতে বিফলকাম হয়েছে এই চিন্তা আয়ুবের প্রতি তার মমতা বাড়িয়ে তুলেছিল।

পিয়ারী আদুরকে বললে—"মিতে, তুমি বসে একটু বস তামাক খাও, মিতা এখনই এসে পড়বে। তোমার মুখ আমার এ বাড়িতে যে দেখবো এ আশা তো করি নি!"

আদুর একটু এগিয়ে এলো, তারপরে হঠাৎ পিয়ারীর কোলের উপর মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়লো! পিয়ারী এখনও যে তাকে তার আগেকার 'মিতে' ডাকে ডাকছে এ যে তাকে নির্মম আঘাত করলো। সে বুঝি নিজেকে আর ক্ষমা করতে পারছিল না, পিয়ারীর প্রতি তার অবিচার যে মানবিক বিচারে তাকে একেবারে নিচে নিয়ে গেছে আর তার অভিশাপ আজ ফলন করেছে মনের পাপি।

"মিতে! পিয়ারী! তোমাকে আমার আজ ডাকতেই লজ্জায় বুক ফেটে যাচ্ছে। যা হয়ে গেছে থাক্, এখন আমায় ক্ষমা করে আবার আমার ঘরে চলো তুমি, আমাকে বাঁচাও।" আদুর বলে চললো।

পিয়ারী হঠাৎ আদুরের এই ভেঙে পড়ায় বিহ্বল হয়ে কি করবে প্রথমেই ঠিক করতে পারলে না, তার পরে নিশ্চল হয়ে বসে রইল ঐভাবে।

আদুর অনেকক্ষণ পরে পিয়ারীর কোল থেকে যখন মুখ তুলে পিয়ারীর মুখের দিকে চাইলে তখন পিয়ারীর মনের যেটুকুও বুঝি কেটে গেছে। প্রশান্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠে স্মিত মুখে পিয়ারী বললে—"মিতে! আমি আজ তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েও তোমার খুব কাছে। তবে যে অনেক দেরী হয়ে গেছে। আমি আজ আর আমার এ বাড়ীর দায়িত্ব ছেড়ে যেতে পারছি না; তা হলে খোদা আমায় মাপ করবে না। তবে তোমায় আজ আমি কিছু দিতে চাই যাতে তুমি শান্তি পাও; আমার বড়ো আদরের লায়লাকে তোমার হাতে তুলে দেবো। সেই এখন থেকে তোমার ঘরদারি করবে। কাদেরকে বোঝাবার ভার আমার উপরই রইলো। আমার এ ব্যবস্থাতে তুমি আর কিছুতেই না বলতে পারবে না।"

আদুর নিজের মনকে বিশ্বাস করতে পারলে না সে কি শুনছে। গালে হাত দিয়ে বসে রইলো পিয়ারীর পায়ের কাছে। তার পরে যখন মুখ তুললে, পিয়ারীর কোলের খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছে হাস্যময়ী লায়লা, পিয়ারীর চোখে শুধু দুটী মুক্তাবিন্দু চলচল করছে যেন আনন্দাশ্রুর মতো!

• • • •

মাসিকপত্র বহুলোকের প্রিয় করে তোলার জন্যে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন লেখার বিচিত্রতা ও সুষম। উগ্রতায় অতিভূত করে দেবার সংকল্প নিয়ে যে লেখা রচিত হয় তার পোষাক ও বাইরের আভিনব্য ক্ষণকালের জন্যে পাঠকের চিত্ত চকল করে তুললেও সে স্থায়ী তো হয়ই না, পরন্তু, প্রতিক্রিয়ায় অবসাদ প্রশ্রয় করে দেয়। সে রচনা অন্তঃসারশূন্য। সে স্থিতি করে না।

—শরৎচন্দ্র

অপরাহ্নবতী

সুবোধ সিংহ

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

অফিস থেকে ফিরে পরে যায় কোট-ট্রাউজার ছাড়ছে এমন সময় পোষার ঘরের লাগোয়া বাথ-রুম থেকে কাপড় ছেড়ে পা ঘুরে হাসিমা বেরুল।

হঠাৎ পরীক্ষিতের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল,—

"এখনই ফিরলে বুঝি ?"

"হ্যাঁ ; বাইরে গিয়েছিলাম একটু—।"

"শোভনাদি নিশ্চয়ই ?"

"ঠিকই ধরেছ।—ডেকে পাঠিয়েছিলেন।"

"কেন।"

"শোভনাদির কাছে একটা মজার খবর শুনলাম।"

"মজার খবর তিনি ছাড়া আর দেওয়ার লোক কোথায় পাঁচার মধ্যে ?"

"বরণার খবর— ।"

"মজার ?"

"সাংঘাতিক মজার।"

"শুনিনি তো আগে।"

"শুনবে আস্তে পরে।—আচ্ছা—বরণা কি সাত আট মাস আগে দিল্লীতে ওর মামার বাড়ীতে গিয়েছিল ?"

"মামা কি যেসো, তা জানিনা দিল্লীতে তার কোন এক আত্মীয়ের বাড়ীতে গিয়েছিল।"

"সে কাল ফিরে এসেছে,—জান ?"

"না।—তোমার মুখেই প্রথম শুনলাম।"

"ও একটা বাচ্চা নিয়ে এসেছে সঙ্গে করে—কচি বাচ্চা একমাস হয়নি। কি ব্যাপার বলতো ! কি হচ্ছে এসব ! বলছে—ছুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে কুড়িয়েও পেয়েছে আমি অদ্ভুতভাবে। শুনলে মনে হবে বানানো গল্প। বিশ্বাস হয়না শুনলে। কেউই বিশ্বাস করেনি ওর গল্প।"

"তত্তখানি বয়া-ছোঁড়া নিয়ে এতখানি মেকুরের মত কাজ করবে কি বরণা ? একজন প্রেম সামলাতে পারেনা এমন মেয়ে আজকালকার দিনে খুব কম আছে। তাছাড়া ওর বয়েস হয়েছে—কিশোরী মেয়েদের মত একরোখা নয়। কিন্তু গল্পটা কি শুনি—?"

"বিশ্বাসের আরশা কোথায় ?—ও নাকি গিয়েছিল কাপড় কিনতে। সে পাড়ায় সস্তা একটা কাপড়ের ছোট দোকানে। ঘটনাটা সন্ধ্যার পরে। ও তখন বিছানায় চাদর দেখছে। খান খুলে দোকানদার চাদরের বহর দেখাচ্ছে তখন। পাশেই ছিল একজন আঠারো উনিশ বছরের মেয়ে। তার—আগাগোড়া ঢাকা—কেবল মুখটা দেখা যাচ্ছে—সুন্দর মুখ, টুল টুল করছে—কর্সা,—টিপপরা কাজল দেওয়া, সাজিয়ে এনেছে। বরণা প্রথমটা লক্ষ্য করেনি। লক্ষ্য হল ওর আনাড়ি ভাব দেখে। বললোও সে,—এই লোকজনের ভিড়ে এনেছেন কচি বাচ্চাটাকে ? তার মেয়েটি খুব ভয় পেয়েছে—চেহারা, হাবভাব দেখলেই বোঝা যায়। কেমন যেন একটু অসহায়-অসহায় ভাব। দেখলেই কেমন মায়া হয়। মেহাতই বাচ্চা। মা শাড়ী কিনতে এসেছে। ব্যাখ্যা অবিশ্যি বরণা তাদেরই করেছে এ-পর্যন্ত।

"বাঃ! তারপর— ?"

"তারপর যেন একটু খোঁজাখুজি। আমার তো তাই মনে হয়। শোনো—শুনলেই বুঝতে পারবে।"

"এ-সব কথা শুনেছ কার কাছ থেকে ?"

"আগেই তো বল্লাম, শোভনাদির কাছে—। পাড়ায় কে না জানে ! বরুণার কথায় বেশ ঝাঁট আছে, বলে,—মেয়েটা সেয়ানা আছে,—ভালমানুষ সেয়ানা—"

"হ্যাঁ মেয়েরা তাই হয় !"

"ভালমানুষ সেজে বসে আছে—শাড়ীও দেখেশুনে কিনতে পারছে না,—বাচ্চাটাকেও সামলাতে পারছে না। বরুণার কেনা হয়ে গিয়েছে তখন,—চাদরের প্যাকেট নিয়ে উঠতে যাবে,—মেয়েটি বললো,—'একটু ধরবেন এটাকে—শাড়ীটা দেখতে পারছিনা ভাল করে।' ভদ্রতায় খাতিরে ধরতে হল তার। শাড়ী পছন্দ হল, দোকানদার কাগজে মুড়িয়ে দিল,—ক্যাসমেমো দেখে ব্যাগ থেকে টাকা দিতে গিয়ে দেখলো কয়েক টাকা কম আছে। প্যাকেট রেখেই, বাইরে নাকি ওর স্বামী দাঁড়িয়ে আছে—টাকা আনতে গেল তার কাছ থেকে।—বাইরে তার স্বামী দাঁড়িয়ে থাকবে কেন ? ভেতরে যথেষ্ট জায়গা ছিল। ভিড় ছিল ঠিকই—কিন্তু জায়গার অভাব ছিল না মোটেই। তখনই তো বরুণার সন্দেহ করা উচিত ছিল। মেয়েটি আর ফিরে আসেনি। বাচ্চা নিয়ে শেষ পর্যন্ত বরুণাকে নিজের ঘরে ফিরতে হল। পুলিশে খবর দেওয়া দরকার—দিয়েও ছিল সে—কে বলতে পারে কি অঘটন ঘটলো মায়ের ! অনাথ আশ্রমেও দিতে পারতো,—দেয়নি। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা—একজন টাকা-পয়সা-ওয়ালা নিঃসন্তান মহিলা বাচ্চাটাকে নিয়ে মানুষ করতে চেয়েছিল, কিন্তু বরুণা তাকেও দেয়নি। দু-সাত দিনে নাকি ভয়ানক মায়া পড়ে গিয়েছিল মেয়েটার ওপর। এর কোন মানে হয় ?"

"অদ্ভুতত্ব আছে অধিকাংশ ঘটনাটাতে।"

"মানে—?"

"তবু—বানানো না-ও হতে পারে,—মায়াও হতে পারে, এবং নিজের অবৈধ সন্তান নিয়ে ভাঁড়ামোও না করতে পারে—যা তার পক্ষে সমীচীন, সম্ভবত ও সঙ্গত। ভাবছি—বরুণার নিজের এতগুলো কাচ্চা-বাচ্চা—ও আরেকটিকে পুষবে কি করে ? এতেই তো ওর সংসার চলে না !"

"তুমি ভাবছো—উনি ভাবেন না। আর ওর ভাবনার আছেই বা কি ! তুমিই তো আছো। তুমিই সাহায্যের টাকা একটু বাড়িয়ে দেবে।"

হাওয়াটা কোন দিক থেকে বইছে তা বুঝতে সেদিন পরীক্ষিতের কোন কষ্ট হয়নি। তবু ওটাকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে আরো কদর্য করে তোলেনি সে। কিন্তু এরপর থেকে সে লক্ষ্য না করে পারল না যে সুমিত্রা—নরম ও নমনীয় স্বভাবের সুমিত্রা পরীক্ষিতের ইচ্ছের বিরুদ্ধে বেশ স্পষ্ট ও বেশ স্বতন্ত্র হয়ে অন্য একটা রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে—যে-রাস্তার শেষ প্রান্তে পরীক্ষিতের জন্যে একটা দারুণ ও দুর্জয় অপমানের আঘাত নৃশংস হন্যার মত অপেক্ষা করে আছে।

শোভনাদি ও তার আর্টিষ্ট ভাই অজিতবাবু একদিন পরীক্ষিতের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। রামেশ্বর খবর দিয়ে গেল। ওদের আসার খবর এবং বিশেষ করে তার সঙ্গেই দেখা করবার ইচ্ছে শুনে তার মেজাজ হঠাৎ মেজাজ খারাপ হয়ে উঠল। বরুণার কুড়িয়ে পাওয়া বাচ্চাটাকে নিয়ে পাড়ায় যে-সব কদর্য কথা উঠেছে মহিলাটি তাদেরই মুখপাত্র হয়ে পরীক্ষিতের কাছে জানতে চায় যে এ-বিষয়ে তার কোন দায়িত্ব আছে কি না। পরীক্ষিতের সুনামের স্বার্থ চক্রান্তে পড়ে যদি নষ্ট হওয়ার উপক্রম করেই থাকে তবে তাকে বিনীতভাবে নম্রতা দেখিয়ে অস্বীকার করলেই ওদের সন্দেহ যাবে না। ওদেরকে বুঝিয়ে ছাড়তে হবে যে পরীক্ষিতকে ঘাঁটানো কতখানি বিপজ্জনক। সুমিত্রার হিতৈষিনী এই নীতিবাগিশ মহিলার মারফৎ তাকে জানিয়ে দিতে হবে সকলকে যে তাদের মধ্যে অনেক চরিত্রবান পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জঘন্য কুৎসাও তার অজ্ঞাত নয়। কাঁটাকে কাঁটা দিয়েই তুলতে হয় এবং নিজের অখ্যাতিকে ঘুচে ফেলতে হলে অন্যের ঘাড়ে অনেক এলোপাথারি অপযশ চাপাতে হয়। পরীক্ষিতের চরিত্র সংশোধন ও সংস্কার করবার দায়িত্ব নিয়েই মহিলাটি আজ এখানে এসেছে

তাতে তার আর সন্দেহ নেই। খুব সম্ভবতঃ ওরা যখন ফিরে যাবে তখন ওদের স্পর্দ্ধা এবং সাহস একটা নতুন অভিজ্ঞতা সঙ্গে করে ফিরে যাবে। সে অভিজ্ঞতা সুখের হবে না ওদের পক্ষে কিন্তু সঙ্গত হবে পরীক্ষিতের পক্ষে।

সুমিত্রা বাথরুমে ছিল, তাকেও ডাকতে পারতো, ইচ্ছে করেই ডাকল না। ওদের খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তখনই নীচে দেখা করতে গেলনা, ইজি চেয়ারে শুয়ে বেশ ধীরে সুস্থেই তামাক খেতে লাগল। তামাক খেলও বেশ অনেকক্ষণ ধরে। তারপর উঠে পড়ল। একটা পাঞ্জাবী পরতে যাচ্ছিল, কি মনে করে তা আবার আলনাতে রেখেদিল। যাহার টকিয় ফিন ফিনে বুটির ওপর দামী ফটফটে পাট ভাঙা একটি সেক্তি গায়ে চড়িয়ে নীচে নেমে গেল পরীক্ষিৎ।

ওরা বসে ছিল দুইং রুমে।

যেন ভদ্রমহিলাটিরই বাড়ী—এমনি একটা ভাব নিয়ে অনুগ্রহ করে বসেছিলেন তিনি। পরীক্ষিৎ ঘরে ঢুকতেই তিনি একটা হাত বাড়িয়ে শরীরে একবার একটু উঠবার ভঙ্গী করে বললেন,—

"বসুন—নমস্কার!"

একে দেখলেই মনে হবে, মোটায় এর একটি ব্যাধি। স্নেক অল খাইয়ে মারলেও ওর মেদের বাহুল্য আটকানো যাবেনা। স্কুলের অবরদস্ত মাষ্টারণী হতে হলে যে-ধরনের গায়ের রং ও বিরাট বপু হওয়ার প্রয়োজন, এর সেসব বিশেষত্বগুলো আছে। পনেরো বছর মাষ্টারি করে যে মহিলা নিজের অর্থে একটা ছোটখাটো বাড়ী তুলতে পারে, তিনি যে একজন কর্মিত-কর্মা হিম্মতওয়ার মেয়েমানুষ তাতে কোন সন্দেহ নেই। বড়লোক আছ তুমি আছ, তাই তোমাকে সমীহ বা তোয়াজা করে চলতে হবে এমন কোন বাধ্য বাধকতা নেই—এইরকম একটা ভাব নিয়ে ভদ্রমহিলা দামী কৌচে মাথা এলিয়ে বসেছিলেন। কৌচের সোনালী রংয়ের কভারের কাজে ওর জলে ভেজা চুলের ভেজের দাগ এতক্ষণে যে কায়েমী হয়ে বসে গেছে সে বিষয়ে পরীক্ষিতের উৎকণ্ঠায় সন্দেহ ঘির সিদ্ধান্তে এসে গেছে। মোটা মাংসল উরুর পা-দুখানি একটু উদ্ধতভাবে পুরুষালি কায়দায় দুদিকে ছড়ানো। এ-সব বিষয়ে খেয়াল করবার সময় নেই তার এবং তার চেহারা ছবি কেমন দেখাচ্ছে, অন্তে সে কি মনে করল,—সে জন্তে তার বিন্দুমাত্র মাথা-ব্যথা নেই! মহিলাটির চারপাশে যেন তাচ্ছিল্যের আবহাওয়া এবং সে আবহাওয়ার আবর্তে তাকে যেন একটু লঘিত বলে মনে হয়। পরীক্ষিতের ঘরে ঢোকবার পর তিনি কৌচ থেকে পিঠটা একটু আলগা করে বললেন। ছড়ানো পায়ের পুরুষালি ভাবকে যথাসম্ভব শায়েস্তা করে একটু শালীনতার ভাব আনতে চেষ্টা করলেন। বাঁ-হাতের খলখলে মাংসপিণ্ডকে চেয়ারের হাতলে রেখে বাঁ হাত বাড়িয়ে বললেন,—

"এটি হল আমার ছোটভাই—অজিত, আর্টিষ্ট, মানে ছবি আঁকে, চিত্র বিদ্যায় ফাইনেল পরীক্ষা দিয়ে এবার প্রথম স্থান অধিকার করেছে।"

এই কালো, রোগা দিলদিলে যাত্রাদলের কেষ্ট-কেষ্ট মার্কা ছেলেটি বসেছিল তার দিদির প্রায় আড়ালে- ঘুরের একটা ছোট চেয়ারে। এতক্ষণ দেখেনি ওকে, এইবার নজরে পড়ল। বেড়ে বাবরি চুল রেখেছে ছেলেটি! দিনরাত ওর পেছনে কম মেহনৎ করতে হয় না ওকে। কেবল ঠোঁটের কাছে একটা বাঁশী তুলে ধরলেই একটি সম্পূর্ণ চিত্ররূপের অভাব পূর্ণ হ'ত। কিন্তু চেয়ারে সবচেয়ে কম জায়গা নিয়ে একেবারে ধার ঘেঁষে পিঠ সটান করে বসে আছে লোকটা? ও যে কোন মুহূর্তে মারাত্মক ভাবে মেঝেতে পড়ে যেতে পারে সে খেয়ালও নেই দেখে পরীক্ষিৎ অস্বস্তি বোধ করল। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা হাসির সুড়সুড়ি গলা পর্যন্ত এসে গিয়েছিল হঠাৎ থেমে গেল।

"খুব খুশী হলাম ওকে দেখে।"

"আপনি ভুলে গেছেন হয়তো। বরুণাদের বাড়ীতে ওর সঙ্গে একবার আলাপ পরিচয় হয়েছিল।"

"ঠিক! একে যেন কোথায় দেখেছি দেখেছি মনে হচ্ছিল বটে। খুব চেনা মুখ, কিন্তু কোথায় দেখেছি fix করতে পারছিলাম না। তখন—এ যে আপনারই বোন তা ধরতে পারিনি।"

এর কথাতে শোভনাদি এমন গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন কেন তা প্রথমটা পরীক্ষিৎ বুঝে উঠতে পারেনি। বুঝতে পারল পরেই, কিন্তু হাসির একটা খোরাক দিয়ে সে যে বিন্দুমাত্র লজ্জিত হয়েছে তা মনে হল না মোটেই।

"ঠিকই বলেছেন—বলেছেন ঠিকই—মিনমিনে, লাজুক, মুখো, বিয়ের কনেকে পছিপাটি করে সাজাতে পারে, চমৎকার ভাল রান্না করতে পারে, কোন ভালে কি মশলা দিতে হয় জিজ্ঞাসা করুন—একেবারে মুখস্ত। কিন্তু লোকের সঙ্গে মিশতে পারে না—পুরুষমানুষ হলে তো কথাই নেই—মুখ যেন কেউ সেলাই করে দিয়েছে—চুপ—।"

এরপর আর্টিষ্টের মুখখানা একবার দেখতে ইচ্ছে হল পরীক্ষিতের; কিন্তু সেদিকে তাকাতে তার হঠাৎ কেন যেন সঙ্কোচ বোধ হল। ওদিকে না তাকিয়েও ওর প্রতিবাদহীন মুখের ছবি ভেসে উঠল তার চোখে। অপরিচিত একটি মানুষের সামনে একটি প্রাপ্ত বয়স্ক যুবকের চরিত্রের একটি অপ্রকাশ্য অংশের এমন বিশ্লেষণ যেকোন মানুষের পক্ষেই হজম করা খুব কঠিন। কঠিন হল না এ ছেলেটির পক্ষে,—এমন আশ্চর্য যন্ত্র পরীক্ষিৎ দেখেনি জীবনে। বোধহয় এমন করুণতা, অসহায়তা এবং দুর্বলতাকে ভালবাসার অত্যাচারে প্রলুব্ধ ও প্রলীত করে কোন কোন নারী সুখ বোধ করে। সহজাত কর্তৃত্বাভিমানী তরুণীর দুর্বল প্রশ্রয় এসে যায় এদের মত মানুষের জীবনে। ওদের প্রতিভাকে ধন্য ও সার্থক করবার জন্যে সুমিত্রাদের মত মেয়ে এসে জোটে ওদের ভাগ্যের আকাশে।

হাত-ঘড়িটা একবার দেখে নিয়ে পরীক্ষিৎ বলল,—

"একটা আসরে আবার যেতে হবে আজ—।"

"আসরে—? এখুনি?—তবে তো অন্যসময়ে এসে আপনার খুব অসুবিধে করলাম।"

"লালকিয়াতে এক সাহিত্যের আসরে প্রেসিডেন্ট করেছে আমাকে। সন্ধ্যের পরে সেখান থেকে লোক আসবার কথা আছে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।—কাজেই দেরী আছে ঢের—এখনও।"

"বাঃ! খুসী হলাম শুনে। কিন্তু সুমিত্রা তো কোনদিন বলেনি আপনি লেখেন-টেখেন!"

"বলবার মত কিছু নয় বলেই হয়তো বলেনি!"

"সুমিত্রাকে আমি যতদূর জানি—ও নিজের সম্বন্ধে কিছু বলেনা—নিজের ঢাক পেটানো ওর অভ্যেস নয়—স্বভাবও নয়। কিন্তু আমার দরকারি কাজটা আগে সেরেনি। কি বলেন? এসব কথা নিয়ে কাউকে বিরক্ত করতেও ইচ্ছে হয় না—কিন্তু যাকে পড়লে বিরক্ত না করেও পারি না।"

একটু শক্ত হয়ে উঠল পরীক্ষিৎ। ঘাড়টাও বেঁকে গেল একটু। বক্তব্যার কথা শুনলে সে একটা ঝড় তুলবে। এমন ঝড় তুলবে যে সেরকম ঝড়ের পাল্লায় ওরা কখন পড়েনি।

"নিশ্চয়! আপনার দরকারি কথা বলবেন বৈকি! ভাল হোক, মন্দ হোক—বলবার অধিকার আপনার সব সময়েই আছে। আমিও প্রস্তুত—সব রকমের কথা শুনবার জন্যে আমিও প্রস্তুত হয়েই এসেছি—।"

সুমিত্রার শোভনাদি বেশ একটু ঘাবড়ালেন এবার। ঘাড় নীচু করে কি যেন ভাবলেন কিছুক্ষণ। ঘাড় উঠিয়ে রুমাল দিয়ে ঠোঁটের ওপরের চামড়ার ঘাম মুছলেন।

"আপনার কথা শুনে এখন আমার মনে হচ্ছে—থাকগে, কিন্তু ঠিক অতটা ভাবিনি। সুমিত্রাকেও বলেছি সেও তো এমন ভাব দেখায়নি যাতে মনে হতে পারে আপনি অসন্তুষ্ট হবেন! বরং, ওর কোন ক্ষতি হতো না, কিন্তু আমার এতটা অপদস্থ হতে হয়তো হত না। বাড়ী ঘুরিনের জন্যে ভাড়া আমি পেতে পারি কিন্তু আমাদের বাড়ী থেকে বক্তব্য দূর হয়ে পড়ে—কাজে পাচ্ছিনা একটাও। আমার এই ছোট বোনটির বিয়েতে আমাকে বিলক্ষণ নাস্তানাবুদ হতে হচ্ছে—জানি না শেষ পর্যন্ত কি কপালে আছে।"

"ভাড়া? বিয়ের জন্যে?"

"ভাড়ার কথা বলে একজন মানী লোকের মান নষ্ট করবার স্পর্দ্ধা অবিশ্যি আমার ছিল না। সেকথাও সুমিত্রাকেও আমি বলেছি। বিয়েও এ বাড়ীতে হবেনা

তাও বলেছিলাম। কেবল নীচের দুটি ঘর দুদিনের জন্যে চেয়েছিলাম। সুমিত্রাকে তো সবই বলেছি ও আপনাকে বলেনি কিছু?"

"সুমিত্রা? ওর সঙ্গে তো—ও তো বলেছে বলে মনে হয় না আমার।"

"আশ্চর্য তো!—কিছু মনে করবেন না পরীক্ষিতবাবু—আমার সবই আশ্চর্য ঠেকছে।—সুমিত্রা আছে বাড়ীতে?"

"স্নান করতে গেছে—।"

"বরযাত্রীদের থাকবার জন্যে। দুদিন থাকবে তারা। পাটনা থেকে আসছে। সেই জন্যেই নীচের তলার দুটি ঘর দুদিনের জন্য চাইতে এসেছিলাম। ঘুরে যেটা পাওয়া গেছে অগত্যা সেটাকেই ঠিক করে নিতে হবে আর কি! আপনাকে অযথা বিরক্ত করলাম কেবল।"

পরীক্ষিতের মনটা সহসা ধরাজ হয়ে উঠল। নীতি-বাগিশ মানুষের মত এই মহিলাটি তাহলে তত ভাপল নয়।

চূড়ান্ত ভদ্রতা করে বলল পরীক্ষিৎ—

"সুমিত্রা যদি এ-কথা আগে আমাকে একবার মুখ ফুটে জানাতো তাহলে এত কষ্ট করে আপনাদের এখানে আসতে হত না। আপনি এত উতলা হবেন না—এই সামান্য একটা বিষয়ে এই সামান্য একটু উপকার না করতে পারলে নিজের কাছেই আমার অশ্রদ্ধা জন্মাবে। আমি নীচের সব ঘরগুলোই ছেড়ে দেবো—দুটো মাত্র ঘরে বরযাত্রীদের সুবিধে না-ও হতে পারে। সুমিত্রাই তো অনায়াসে এ-কথা আপনাকে বলে দিতে পারতো। এ-বাড়ীর ওপরে তার কি কোন অধিকার নেই? সুমিত্রার এ বড় অন্যায়।"

"না—না, তা বলবেন না। ও কিছুই অন্যায় করে নি। সুমিত্রা মেয়েটি খুব ভালো। বোধহয় একটু চাপা—চাপা প্রকৃতির মেয়ে।"

"মিসেস মুখার্জি।" ভদ্রতাসূচক একটি সংশোধন করল অজিত। এতক্ষণ পরে একটা কথা শোনা গেল তার। একটা জাহাজের সরু চোঙা থেকে অপ্রত্যাশিত মোটা আর গম্ভীর আওয়াজের মত একটি বিস্ময়কর অনুভূতি। শোভনাদি ততক্ষণে এত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন যে কৃপকায় ভাইয়ের মৃদুকায় সমৃদ্ধ কণ্ঠস্বর তিনি বোধহয় শুনতে পাননি।

"দেখুন পরীক্ষিতবাবু। লোক আমি চিনি—আমি জানি আমার অনুরোধ আপনি অগ্রাহ্য করবেন না। আপনাকে আমার অশেষ ধন্যবাদ। আজ অবিশ্যি একটা শুকনো ধন্যবাদ দিয়েই বিদেয় নেবো—এরপর বিয়ের গণ্ডগোলটা মিটুক—আপনাকে একটা জিনিস দেখিয়ে অবাক করে দেবো।"

অজিতের গলা শোনা গেল—আবার,—

"একটা জিনিস দেখিয়ে নয় কেবল,—সেটাকে উপহার দিয়ে—।" বৃহৎ ভগ্নীর ভ্রু-টা কুঞ্চকালো।

"এখন আমি কিছুই বলতে চাই না।—সুমিত্রা, আর আমার এই ভাই একটা ষড়যন্ত্র করেছে আপনার বিরুদ্ধে—কিছুই জানতে দেওয়া হবে না আপনাকে। সুমিত্রা নিশ্চয়ই আপনাকে কিছুই বলে নি এ-বিষয়ে?"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন! সে কিছুই বলবে না আমাকে—সুমিত্রাকে আপনি চেনেন নি তাহলে।"

বলেন কি পরীক্ষিতবাবু! সুমিত্রাকে চিনি না আমি? কিন্তু এ-কথা আমি জোর গলায় বলবো—আপনার এই মেয়েটি বড় ভালো।"

অজিতকে আবার একটি সংশোধনি মন্তব্য করতে হল,—

"মেয়ে কথাটা কি ঠিক হল দিদি? বড্ড কানে লাগে—স্ত্রী—। স্ত্রী বলাই ঠিক।"

হঠাৎ শোভনাদির গর্দানটা ঘুরে গেল অজিতের দিকে। ওর দিকে চেয়ে কিন্তু হেসে উঠলেন তিনি, বেশ জোরেই হেসে উঠলেন। পরীক্ষিতের দিকে তাকিয়ে বললেন শেষে,—

"এই মুখুয্যে কথা শুনে এম. এ. ক্লাশের একজন প্রফেসারের কথা আমার মনে পড়ে গেল—যাক্‌গে সে-সব কথা! আপনাকে বাজে কথা বলে দেরী করিয়ে দিচ্ছি। —আচ্ছা—।" একটু থম নিয়ে তিনি আবার বলতে লাগলেন,—"বোনটির বিয়ে দিচ্ছি—খুব কষ্ট করেই দিতে

হচ্ছে আমাকে। আমার যা সাধ্য আমি তা করছি।—সাত সাতটি মানুষের মুখের অন্ন জোগাড় করতে হয় আমাকেই—মাথা গোঁজবার জন্যে ধার-দেনা করে যা-হোক একটা বাড়ী তুলেছি—তারপর বাবার এই অবস্থা, বুড়ো হয়েছেন, চলতে ফিরতে পারেন না—এই সব আর কি—এর জন্যেই—সব তো একা সামলানো যায় না—!"

"তা ঠিক।" এই কথাটাই পরীক্ষিৎ বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু থমকে গেল কি ভেবে। মনে হল সে বলে,—"ভাইটিকে ঢুকিয়ে দিন কোন চাকরিতে।" কিন্তু সে-কথাও বাতিল করে পরীক্ষিৎ একটা জ্ঞানগর্ভ কথা বলল,—

"দিন কারো সমান যায় না।"

"যায় না ঠিকই। যেতোও না। যদি আমার মেজো ভাইটির একটু সুবুদ্ধি হত।"

"মেজো ভাই? আর একজন ভাই আছে নাকি আপনার?"

"আছে। কিন্তু তাকে আমরাও ভুলে যেতে বসেছি। সহৃদয়, সুন্দর আর ভাল স্বভাবের ছেলে ছিল সে। আগাগোড়াই লেখাপড়াতে ভাল। সংসারের অবস্থার দিকে ভীষণ নজর ছিল তার। জিওলজির ছাত্র—কিন্তু তখন থেকেই ট্যুশানি করে নিজের পড়া চালিয়ে যেতো—এবং কিছু কিছু—যখন যা পারতো, বাবার হাতে এনেও দিত। সেই ছেলে কাই হয়ে পাশ করলো। স্কলারশিপের টাকায় বিলেত গেল ব্রিলিয়েন্ট রেজাল্ট করলো—এখানে এসেই চাকরি পেল, ভাল মাইনে হল; তারপর বিয়ে।—আপনাকে বিরক্ত করছি না তো?"

"একটুকুও না।"

"কারো কাছে বলিনি এ-সব কথা। বলবার কথাও নয়—সুমিত্রাকেও বলিনি। আপনাকে কেন বলছি জানি না—আজই তার চিঠি পেয়েছি—এই মাত্র। বোধ হয় এই চিঠিই তার কারণ। মনটাকে একটু হাল্কা করবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছি—একটি মানুষের কাছে—তারপর আরো—তারপর বহু মানুষের কাছে বলে বোধহয় একটি বিশেষ দুঃখের কিছুটা অন্ততঃ লাঘব হয়!"

'কোথায় আছেন উনি এখন?'

"বর্ধমানে। বর্ধমান হেড কোয়ার্টার। ওটাকে সেন্টার করে ঘুরতে হয়।"

"চিঠি পড়ে আপনি খুব বিচলিত হয়ে পড়েছেন,—কিন্তু—।"

"আদি অন্ত নই, যত আমার বাবা—মুখে একটাও কথা বলেননি কিন্তু ওঁর বুক ভেঙে গেছে—এ ভাবের চিঠি তিনি আশা করতে পারেন নি।"

"বাপমাকে ছাড়া সন্তান কাকে আর দুঃখ দেবে?"

"তা ঠিক। যারা সব চেয়ে বেশী আশা করে তারাই সবচেয়ে বেশী বঞ্চিত হয় সেজন্যে। বাবা খুব আশা করেছিলেন। ওর ওপরে নির্ভরও করেছিলেন খুব এই বিয়ের ব্যাপারে।"

"মানুষ কিছুটা দৃষ্টিহীন হয়ে পড়ে বিয়ের পরে। যে যাচ্ছে—যে ঘুরে চলে গেল—অবদান হবে খানিকবাদে যার, তার চেয়েও যে এসেছে, এবং যারা এসেছে—এগিয়ে এলো যারা—আরম্ভ হল যাদের জীবন—তার দিকেই দৃষ্টি থাকে খোলা। একদিক অবারিত না হলে অন্যদিক অভ্যাবশ্যক হবে কি করে।"

"বোধহয় আপনি যা বলেছেন সে-কথাই ঠিক। অভাব এত বাড়িয়ে রেখেছে—এত প্রয়োজনে ঠাসা যে উদ্বৃত্ত বলে এমন কিছু রাখেনি যার দিকে তাকিয়ে ভরসা পেতে পারে মানুষ। তার অভাব দেখলে আপনিও ভয় পেয়ে যাবেন, তার প্রয়োজন ও ব্যবস্থার এতটুকু খাঁচড় কেটে হেরফের করতেও আপনার লজ্জা হবে।"

কথা শেষ করে মহিলাটি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন—মনে হল যেন তার হঠাৎ চেতনা হল যে তিনি তাদের ঘরোয়া কথাকে বড্ড বেশী টেনে নিয়ে এসেছেন। অজিতের জন্যে চোখ আর ঘাড় ফেরালেন পেছনের দিকে। এদের কথার মধ্যে কখন যে সে উঠে গেছে কেউই জানতে পারেনি।

অপ্রস্তুত, অসন্তুষ্ট ও রাগতভাবে বললেন,—

"বেশী বেশী!—বাড়াবাড়ি! এসব কথা বলাচ্ছে বাবার রবি মান গেল।" [ক্রমশঃ]

সেলাই বাক্স

বেলা দে

বটুয়া তৈরী

উড়িষ্যা দেশে 'বটুয়া' ব্যবহার প্রচলিত বহুকাল ধরে। পানের সরঞ্জাম রাখবার জন্যই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এটী ব্যবহার হোত। কাশ্মীরী সুন্দরীরাও এই 'বটুয়া' ব্যবহার করেছেন দেখেছি। কিন্তু এই ধরণের বটুয়া সবই গোল এবং চ্যাপটা আকারের। যদিও সেই চির পুরাতন বটুয়াই আজ আবার কিছু পরিমাণে অদল বদল করে প্রায় সব মেয়েদের হাতেই দেখতে পাচ্ছি। এতে পিন্নির চাবির গোছা রাখা থেকে সুরু করে অল্পস্বল্প বেশবিন্যাসের জিনিসপত্রও রেখে বেশ কাজ চলে যাচ্ছে।

কাজেই এহেন বটুয়া যদি আমরা অল্প খরচে এবং অল্প পরিশ্রমে ঘরে বসেই তৈরী করতে পারি মন্দ কি? আমরা তৈরী হয়ে যদি ৯ ইঞ্চি আন্দাজ কাপড় বাঁচে, তাহলেই এই বটুয়ার পক্ষে যথেষ্ট। ৯ ইঞ্চি চওড়া এবং ২২ ইঞ্চি লম্বা রেশমের কাপড় চাই। ভিতরের কাপড়ও ঐ মাপেরই চাই। তবে একটু মোটা কাপড় হলেই ভালো।

তিন ইঞ্চি গোল একটী কাঠের বা পিচবোর্ডের চাকতি চাই। এক গজ রেশমের বা জরীর দড়ি, খুব কড়া হবে কিন্তু, যেমন দশ নম্বরের বোনার কাঠির মত। এক জোড়া রেশমের বা সুতোর ঝুপনি চাই।

গোল কাঠের বা পিচবোর্ডের চাকতিটী একদিকে রেশম, অন্যদিকে মোটা কোনো কাপড়ে মুড়ে রাখতে হবে। বাকী ৯ ইঞ্চি × ১৮ ইঞ্চি রেশম এবং মোটা কাপড়টী এক সঙ্গে তিন দিক মুড়ে নিয়ে, উল্টে ফেলবেন। তারপর দুটো মুখ মুড়ে দিন। এবারে দুটো খোলা মুখের একদিক কুঁচিয়ে নিয়ে গোল চাকতিটীর চারধারে মুড়ে নিন। অন্যদিকের আধ ইঞ্চি নীচে (শুধু রেশমের দিকে) দুটী দু'ধারে ছিদ্র করতে হবে দড়ি পরানোর জন্য।

এখন রেশমের সব দড়িটী অর্দ্ধেক করে বরাবর চালিয়ে, যেদিক দিয়ে ঢোকালেন, সেইদিক দিয়েই বার করে ছুড়ে, একটী থুপনি লাগিয়ে ফেলবেন। ঠিক উল্টো দিকে ঐভাবেই বাকী অর্দ্ধেক দড়ি চালিয়ে থুপনিটা লাগিয়ে নেবেন। এবারে এই দুই থুপনি ধরে টানলেই বটুয়ার মুখটা আপনিই কুঁচকে বন্ধ হয়ে যাবে।

গৃহশ্রী—গৃহসজ্জা

—শ্রীমতী শৈল মিত্র

হাজার হাজার বছর আগে প্রথম মানুষের জীবনযাত্রা ছিল সংক্ষিপ্ত। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা ছিল প্রধান কাজ। আর ঘরবাড়ী বলতে ছিল পাহাড়ের গুহা কিন্তু সে আদিম যুগ আমরা বহুদিন পেরিয়ে এসেছি তার পরে কতকাল কেটে গেছে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাদীক্ষা লাভ করেছি আমরা। তারপর আজ মানুষের মনে রুচি ও অনুভূতি প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। সে চায় সুন্দর পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে চলতে। কাজেই দরকার একখানি ছিমছাম গৃহ। কিন্তু সকলের পক্ষে তো একখানি নিজস্ব বাড়ী ভাড়া নেওয়া বা তৈরী করা সম্ভব নয়। তাই এখানে ধরে নেওয়া যেতে পারে একখানি-ঘরওলা ফ্ল্যাট। আজকাল যৌথ পরিবার নেই বললেই চলে কাজেই 'ওয়ান রুম ফ্ল্যাট' আর তার কোলে একফালি বারণ্ডা। কিন্তু কি করে একটি ঘরকে গুছিয়ে নেওয়া যায় ভাবছেন তো ?

ঘরখানি যদি বড় হয় তাহলে ঐ ঘরের মাঝখানে ম্যাসোনাইটের পার্টিসান দিয়ে নিন। পার্টিসানটী বং করে নেবেন। একটী টেবিল চেয়ার কোণায় রাখুন খাবার জন্য—রাত্রে ও সকালে ছেলে মেয়েরা ঐখানেই পড়াশুনা করবে। কাঁচের বাসন হলে দেয়ালে তাক্ করে নিন ঐখানেই সাজিয়ে রাখবেন। শোবার ঘরের কোণের দেওয়ালে একটী আয়না তার নীচে ব্র্যাকেট থাকবে আপনার অঙ্গরাগের জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতে পারেন। বিদেশে একখানি ঘরের ফ্ল্যাটে দেওয়াল আলমারী করা থাকে তার মধ্যেই জামা, কর্ত্তার স্যুট সবই তুলিয়ে রাখতে পারবেন। আরো ভালো হয় যদি দেওয়ালে ঢুকানো খাট করে নেওয়া যায় এতে জায়গা কম লাগে রাত্রে শোবার আগে দেওয়াল থেকে বার করে নিলেই হবে। আজকাল আমাদের দেশেও এই ধরণের ফ্ল্যাট যথেষ্ট ব্যবহার হচ্ছে। ছোটঘর কাজেই দেওয়ালে বেশী ছবি না টাঙানোই ভাল। দু' একখানি পছন্দ মত রাখবেন। জানলার ধারে একটী টেবিলে মাটীর ফুলদানীতে জল দিয়ে মানিপ্ল্যাণ্ট, বা যে কোনো লতানে গাছ দিয়ে রাখুন দেয়ালের সঙ্গে আটকে দেবেন ভালই দেখাবে।

কিন্তু রান্না ভাড়ারের কি করবেন সেই নিয়ে খুব চিন্তা করছেন তো? বেশ তো বারণ্ডাটা যদি খোলা থাকে তাহলে ঐ বারণ্ডার খোলাদে জালের আলমারী লাগিয়ে নিন। তাল, মসলার টিনগুলো রং করে প্রত্যেকটার গায়ে কোন শিশি বা টিনে কি আছে রং দিয়ে লিখে দিন। একটী মাটীর কলসী বা টিনের টবে চাল রেখে দিন। তার উপর ঢাকা দিয়ে অন্যান্য জিনিসপত্র রাখতে পারেন। রান্নার জায়গাটী যদি খুব ছোট মনে হয় তাহলে কিন্তু ঘুঁটে, কয়লা, কেরোসিন নিয়ে বেশ বিব্রত হয়ে পড়বেন। কাজেই কর্তার সঙ্গে পরামর্শ করে অন্যান্য খরচপত্র কিছু কমিয়ে একটী প্রেসার কুকার আর যে কোনো একটী বা দুটী কেরোসিন অথবা ইলেকট্রিক ষ্টোভ রাখুন। সকালে তাড়াতাড়ির সময়ে একেবারে ভাল ভাত রান্না হয়ে যাবে। রান্নাঘরে একটী ঢাকা দেওয়া জলের টব রাখবেন। উনুন কিন্তু একটী উঁচু জায়গায় বসিয়ে নেবেন—না হলে রান্নার জায়গাটী তাড়াতাড়ি অপরিষ্কার হবে।

আজকাল অবশ্য আমাদের দেশের মেয়েরা সবাই বেশ গুছিয়ে সংসার করছেন। তবে অনেকের ধারণা গুছিয়ে সংসার করতে হলে অনেক টাকার প্রয়োজন। এ ধারণা কিন্তু ভুল—সুশ্রী রুচিসম্মতভাবে থাকবার ইচ্ছে হলে অর্থের চেয়ে বড় কথা নিজের সুনিপুণ কর্মপ্রচেষ্টা। নারীর কল্যাণহস্ত চিরদিনই সংসারকে ভাঙনের পথ থেকে সরিয়ে এনেছে। তাই আজো সে পিছিয়ে থাকবে না যত ঝড়ঝাপটা আসুক না কেন সে মাথা পেতে নেবে এবং তার শক্তি দিয়ে গড়ে তুলবে একটী সুন্দর পরিচ্ছন্ন ঘর। কারণ গৃহের অন্তরালেই গড়ে ওঠে মানুষের জীবন। খাদ্যে সম্পদে বুদ্ধির দীপ্তিতে জীবনকে বিকশিত করে গৃহ। কাজেই মানুষের জীবনে গৃহসজ্জার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। সুন্দর গৃহ ও গৃহের পরিবেশ মানুষের জীবনেও সৌন্দর্য্য এনে দেয় এবং জীবনকে আরো মনোরম করে তোলে।

প্রেম ও রাধিকা

শ্রীরূপা মল্লী

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত মাধুরী জীব হতে অজীব। অব্যক্ত হতে ব্যক্ত অণুপরমাণু পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সমগ্র অন্তর্লোকে তরঙ্গায়িত হয়েছে উদ্ভাবিত সেই শব্দটির ধ্বনিযুক্ত প্রকাশ হচ্ছে "প্রেম"। ধর্ম্মীয়, ভাগবৎ, জাগতিক কিংবা মানবীয় যে রূপেই দেখিনা কেন জগতের সৃষ্টি রহস্যের মূল কেন্দ্রে যে বিষয়টি যে শক্তিটি প্রাণস্বরূপ বিকশিত তাহাই "প্রেম"।

পরমাত্মনের অসীমলীলার মধুরিমা তাঁর ইচ্ছার আবরণে আকার পেয়েছে এই লীলাময় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রাঙ্গনে। বিশ্বরূপান্তরণ যখনই উদ্ভাসিত হতে চাইলেন সত্যম, শিবম্ ও অদ্বৈতম সুন্দরম আবির্ভাবন রূপে তখনই সে অপাপবিদ্ধ আনন্দঘন অমৃতময় করুণারস সিঞ্চিত হয়ে উঠেছে সেই মধুময় সৃষ্টিই প্রেম রসধারা।

অন্তাবধি উপলব্ধির পরম অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে গেলে সমস্ত বিশ্ববীণায় যে যে রাগিনী বেজেওঠে যার অনুরণন্ উপলব্ধির উচ্চ ভূমিতে উত্তীর্ণ হয়—মানবজীবনে সেই রাগিনী প্রেমের অনুভবে করে পরমসুন্দরের ধ্যান। পরমাত্মার আলো মানবাত্মায় প্রেমের বহ্নি শিখায় প্রজ্বলিত। সাধনা আর ব্যাকুলতা প্রেমের তরঙ্গে একাত্ম হয়ে চলেছে। অনন্ত শক্তি পরম পুরুষোত্তম্ প্রকৃতির অন্তরে আপন প্রকাশ করার জন্যই প্রেমকে করেছেন বিকাশ। বেদ বেদান্ত হতে দেখে আসছি পরমের চরম সার্থকতার জন্য পূর্ণানন্দ নিজেকে পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে আপন অনুগামিনী শক্তি স্বরূপ পরমাত্মিকার ব্যাকুলতায় প্রেমকে করেছেন সঞ্চার। শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন সত্তা এই বোধের উন্মোচন কারণ স্বরূপ নিষ্কলঙ্ক নিরঞ্জন পরব্রহ্ম অন্তরঙ্গশক্তির অভিব্যক্তি ক্ষেত্রে উন্মেষিত করেছেন 'প্রেমের' স্পন্দন।

'প্রেম' কিরূপ তার ব্যাখ্যার্থে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—"প্রেমই ঈশ্বর" প্রেমের সঞ্চারে ঈশ্বর প্রেম-স্বরূপ হয়ে যান। সর্ব্বোচ্চ প্রেমেই হয় আত্মার প্রকৃত মিলন। রবীন্দ্রনাথ প্রেমকেই অন্তরের অন্তহীন নিবেদনে পূজা করেছেন স্থলে জলে বনতলে ভূমিতলে। এক কথায় বলতে চাই—অনাবিল প্রেমই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়। প্রেমের জন্য জন্ম, প্রেমের জন্যই জীবনপ্রবাহ আর প্রেমের উপলব্ধিতেই মোক্ষ।

অধরা বুঝি অপেক্ষা করেন মানব অন্তরে প্রেমের বিকাশের জন্য। সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য মধুর যে অভিব্যক্তিই হোক না কেন অণু হতে অণু পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র 'প্রেম' আপনাকে বিকাশ করে চলেন প্রেমের প্রকাশ অন্তহীন আনন্দঘন নির্ব্বিকার উত্তম বেশ। প্রেমের আলিঙ্গনে মানব জীবনে আসে মোক্ষ, উপেক্ষা করে পার্থিব আবিলতাকে। নরনারীর প্রাকৃতিক প্রেমকে ঠিক "প্রেমের' ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যায়িত করা যায়না। একে বলে ভালবাসা। এক কথায় বলাযায় ভালবাসা সোপান শ্রেণী 'প্রেম' তার লক্ষ্য মন্দির স্বরূপ। প্রেম মানেনা বন্ধনজাত তত্ত্বকে। আবর্তাসিক কামনায় প্রেম পায়না মূর্তি। প্রাকৃতিক তীব্র কামনা ভালবাসায় উদ্বেলিত কিন্তু প্রেমে নেই জাত, ধর্ম,

যন্ত্রণা, কর্তব্য সংস্কারের মিথ্যা আবর্তন। আত্মিক মিলনেই প্রেমের স্বীকৃতি। দেহের দহন জ্বালায় ভালবাসা শুধু তীব্র।

প্রেম পিয়াসের আকুলতা ব্যক্ত করতে গেলে যে মূর্তি স্বয়ংএর সিংহাসনে আসীন সেই প্রেমধনে ধনী হলেন শ্রীরাধিকা। প্রেম ও রাধিকা যে এক ও অভিন্ন এটাই আমার বক্তব্য। রাধা ও প্রেম অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। যে ভাবেই দেখিনা কেন শ্রীরাধিকাই প্রেমের বিগ্রহ? যেখানেই প্রেম পেয়েছে স্বীকৃতি সেখানে শ্রীরাধিকা মানস লোকে প্রেম-প্রতিমূর্তি হয়ে উদ্ভাসিতা হয়েছেন।

রাধা শব্দটির পূর্ণঅর্থ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। "রাধা" শব্দটির অর্থ, যে নাম স্মরণ, ধারণ ও আরাধনা করলে চির মোহমুক্তি লাভ করা যায় তিনিই "শ্রীরাধা"। তিনিই পরমাত্মনের অনুগামিনী শক্তিসঞ্চারিকা শক্তি। তিনি ভিন্ন পরমাত্মনের পরম সত্তা ব্যক্ত হতনা। তিনিই জগতের আদি জ্যোতির্ময়ী শক্তি। শ্রীরাধিকার সৃষ্টি 'প্রেম স্বরূপ ঈশ্বরকে পূর্ণাবয়বরূপে উপলব্ধি করা।

প্রেমের অনাবিল প্লাবনে পরমাত্মন আপনলীলা ব্যক্ত করার আকুলতা রাধাচিত্তেই সৃষ্টি করেছেন। তাই সেই পরমাত্মন তাঁর তৃপ্তির ভাণ্ডার শূন্য করে পূর্ণকলায় আনন্দে শ্রীকৃষ্ণরূপে লীলা করেছেন। তাঁর লীলা সঙ্গিনী ও বিলাসিনী হয়েছেন শ্রীরাধিকা, জগত প্রপঞ্চের উদ্ধারের জন্য। তাই তাঁর পূর্ণায়িত অস্তিত্ব সম্পূর্ণ নির্ভর করে রাধিকার আকুলতায়। তিনি কি কোনকালেই পূর্ণ হতেন যদিনা শ্রীরাধিকার আবির্ভাব হত। না তা হত না। শ্রীকৃষ্ণ জগত বন্দিত হয়েছেন শুধু শ্রীরাধিকার প্রেম উদ্বোধনায়। তিনিই প্রবর্তন করেছেন মানবাত্মাকে মুক্তির পথ।

প্রেম যে মহিমময় তার শক্তি যে দুর্বার শ্রীরাধিকার আত্মনিবেদনে তাঁর প্রকাশ সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। দেহাতীত আকুলতা একান্ত সাধনায় সমগ্র জাত, কুল, মান, মর্যাদা, ঘৃণা, ভয় লজ্জাকে সংসার, পরিজনকে যার স্বামীকে পর্যন্ত তুচ্ছ তুচ্ছাতীত জ্ঞান করে বিসর্জন দিয়েছেন আপনার যা কিছু সব। এই বিশ্বিজ্ঞানে কৃষ্ণকে নিবেদন করেছেন আপন আত্মাকে। যে জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত হলে সর্বং খলিদং ব্রহ্ম অখণ্ডিয়ে আবভাসিক জগৎ বিলুপ্ত হয় সেই আলোক শ্রীরাধিকা দেখিয়েছেন আপনার প্রেমে। প্রেমের অনাবিল সত্তাকে আপন ব্যাকুলতায় বিলুপ্ত করে নিময় করেছেন প্রচণ্ড প্লাবনে, দু'কূল প্লাবিত করে কৃষ্ণ নামে কৃষ্ণ চরণে নিবেদন করেছেন। তাই কৃষ্ণবিনা তিনি আঁধার দেখেন। কৃষ্ণের প্রতি রাধিকার ভালবাসাই কৃষ্ণকে করেছে সার্থক। কৃষ্ণ রাধিকার সত্তার বৃন্ত হতে বৃন্ত পর্যন্ত একান্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

রাধিকার এই উদ্দাম প্রেম নিরন্তর ব্যাকুলতা, নিভিক পথ সকার মানব জীবনের পাথেয়। তাঁর প্রেম আত্মিক মিলনের। অনুভবের শতদল শ্রীরাধিকাই মানব অন্তরে ফুটিয়েছেন। তাঁর একাগ্রতা, অপার্থিব বাসনা আপনাকে পূর্ণকরে নিবেদনের আকাঙ্ক্ষা আজ মানবের আদর্শ। কৃষ্ণের লীলা সার্থক হয়ে পর্যবসিত হয়েছে রাধিকার প্রেমসত্তিতে। যুগযুগান্তরের লীলা মধুরস রসিকা শ্রীরাধাই পূর্ণ সত্তারূপে প্রেমের আকরে উন্মেলিত করেছেন একটি একটি পল্লব উন্মোচন করে। তাঁর প্রেম সাধনা ঈশ্বর সাধনা। এখানে মিলন আকাঙ্ক্ষা তীব্র, তবে ইন্দ্রিয় আসক্তিজনিত ইন্দ্রিয় তৃপ্ত কল্প নয়। এখানে দেহ তুচ্ছ আত্মা পূজ্য।

প্রেমের বিগ্রহই শ্রীরাধিকা। তিনিই প্রেম, তিনিই প্রেমকে দিয়েছেন সরসতা ও মাধুর্য। তিনি একেশ্বরে একাত্মস্বরূপা। জগত জীবন তার কৃষ্ণময় কৃষ্ণপ্রেমেই তপস্যার আসন পেতেছেন। এই মাধুর্যময়ীর প্রেমময়ীর আবির্ভাবেই শ্রীকৃষ্ণের সকলই মধুরান্বিত তাঁর সর্বাত্মিকা শক্তিই রাধা। শ্রীরাধার প্রেমবশ হয়েই কৃষ্ণ বিশ্বরূপ। তিনিই কৃষ্ণের আনন্দ, শক্তি, উল্লাস উন্মাদনা ও পরম মধুরা প্রেমবৃত্তিময়ী। কৃষ্ণ পরিস্ফুট হয়েছেন রসময়ীর অনুকৃতিতে। রাধাই প্রেম, আনন্দ, ও চিৎ স্বরূপ। তিনি ভেদাভেদ হীন নিত্য প্রেম। রাধা বিনা কৃষ্ণ মিথ্যা, অপ্রকাশ অনার্থক। অতএব প্রেম ও প্রেমস্বরূপিনী রাধা অভিন্ন। পুনঃ বলতে হয়, জগৎ পারাবারে শ্রীরাধিকাই প্রেম প্রেমই শ্রীরাধিকা তিনি কৃষ্ণস্বরূপ তাৎপর্য্য প্রেম যদি ঈশ্বর হয় রাধিকা উপাসনা। রাধা ভাবই পরমেশ্বর ভাব। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ডের অখিল যোগ নিত্য মধুর হয়েছে কৃষ্ণ রাধিকার প্রেমবিলাসে।

সংসার অনিত্যতায় ভালবাসার রূপ বাস্তব সত্যে আবর্তিত কিন্তু প্রেম পূর্ণ সত্য, আর প্রেমের দর্পণে রাধিকা হলেন প্রকাশ—শক্তি। ভবার্ণবের পরপারে নিরাকারকে উপলব্ধির বেদীমূলে এনেছেন শ্রীরাধিকা প্রেমের হিল্লোলে। পার্থিব যোগ সেখানে ছিন্ন।

"সই পীরিতী হোসর ধাতা
বিধির বিধান সব করে আন
না জানে ধরম কথা।"

প্রবাদ মালা

সংকলন

শকুন্তলা

১। অনুতাপই অন্তঃকরণের বন্ধন।
২। আলস্য দারিদ্রের চাবি।
৩। আশায় যে ভর করে, অনাহারে সেই মরে।
৪। বাড়ী বানায় অজগণ, ক্রয় করে বিজ্ঞজন।
৫। চিত্রিত পুষ্পে গন্ধ নাই।
৬। বংশ মাহাত্ম্য অপেক্ষা মনের মাহাত্ম্য সমধিক পূজ্য।
৭। বড় গাছেই বড় ঝড়।
৮। স্বর্ণ অঙ্গুরী ধারণ করিলেও যে বানর সেই বানর।
৯। যাহাতে ব্যয় নাই, তার আবার মূল্য কি?
১০। যার বহুৎ প্রয়োজন সে যেন মৌমাছির হুলে ভয় করে না।
১১। কাজের বেলা গা শিহরে, খাবার বেলা ঘর্ম ঝরে।
১২। কাজে কুঁড়ে, ভোজনে ষেড়ে, বচনে মারে পুড়িয়ে পুড়িয়ে।
১৩। কুঁজো আপন কুঁজ দেখতে পায়না, পরের দেখতে পটু।
১৪। ছুরির ঘায় মিটে, কিন্তু জিহ্বার ঘায় মিটে নয়।
১৫। তিনটি বিষয়ে আনে মানুষের কাল—খরৌদ্র, রাত্রে ভোজ, আর চিন্তাকাল।
১৬। দরিদ্র হলে ধাতা, ধনী হলে কৃপণ।
১৭। যে জন সমাজে নাহিক মিশে হইবে তাহার সুজ্ঞান কিসে?
১৮। সত্য তেলের মতো, উপরেই আসিয়া ওঠে।
১৯। হাতের ঢিল আর মুখের কথা ছেড়ে দিলে আর ফেরে না।
২০। কলসী পাতরকে আঘাত করুক আর পাতর কলসীকে আঘাত করুক, কলসীরই সর্বনাশ।
২১। যার নেই ঋণ, সেই চিন্তাহীন।
২২। রন্ধনশালে যার বাস, তার অঙ্গে ধোঁয়ার বাস।
২৩। সংসার এক সিঁড়ি, কেউ ওঠে কেউ নামে।
২৪। ব্যাং সোনার পিঞ্জিতে বন্দলেও ভোবা দেখলে লাফ দেবে।
২৫। কালো মন অপেক্ষা রাঙা মুখ ভালো।
২৬। দয়িতা ও দর্পণ সর্বদা বিপদাক্রান্ত।
২৭। যেই জন মাছ ধরে।
সে যেন না জলে ডরে।
মাছ ধরতে গেলেই কাদা মাখতে হয়।

ফুল দিয়ে ঘর সাজানো

শ্রীমতী স্মৃতিকণা বসু

Home Home Sweet Home
There is no place like Home.

ফুল কেনা ভালবাসে? যে ঘরে ফুল থাকে সে ঘর যতই শ্রীহীন হোক না কেন ফুলের নিজস্ব সৌন্দর্যে তা শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠে ঘর ও ঘরনীকে মধুরতায় ভরে দেয়। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে ফুল ঠিকভাবে রাখার ব্যবস্থার অভাবে—নষ্ট হয়ে যায়। যে ভাবেই ফুলদিয়ে ঘর সাজিয়ে তুলুন না কেন—লক্ষ্য রাখবেন যেন ফুলের পাতা বেশী জলের ভেতর ডুবে না থাকে। এতে পাতা সহজে পচে যায়—এবং পাতা পচেগেলে ফুল তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। পাতা পচেগেলে সেই জল থেকে যে দুর্গন্ধ বার হয় তা ঘরের আবহাওয়াকে অনেকখানি নষ্ট করে দেয়। ফুলদানীর ভেতর এমনভাবে জল দেবেন—যাতে ফুলের পাতা জলের তলায় থাকতে না পারে এবং থাকলেও তা কাঁচি দিয়ে ছেঁটে দেবেন। ফুলদানীর মুখটি যদি একটু বড় হয় তবে ফুল সাজাবার জন্য প্রয়োজন হয় Pin holder এবং একটি তারের জালির। ঐ তারের জালিতে যদি একটি একটি করে ফুল গেঁথেদিয়ে একটি ছোট্ট টেবিলের ওপর ঐ জালিটি রাখেন তবে ঘরটি খুবই সুন্দর ও মধুময় হয়ে ওঠে। ফুলের ডাঁটাগুলি Pin-holder-এ বিঁধিয়ে মাঝখানে ফুল উঁচু করে দেবেন। প্রতিদিন ফুলদানীর জল বদলানো দরকার—যদি তা সম্ভব না হয়ে ওঠে তবে এক টুকরো ভেজা পরিষ্কার কাপড়ের টুকরো ডাঁটায় জড়িয়ে দেবেন। কিন্তু কাঁচের ফুলদানী—যাতে বাইরে থেকে ভেতরটা বেশ ভালো দেখা যায়—তাতে কিন্তু ফুলের ডাঁটায় ঐ কাপড়ের টুকরো জড়ানো থাকলে ভালো দেখাবে না। ফুল সাজাবার সময় গাদাগাদি করে না দিয়ে একটু ফাঁক রাখবেন—যাতে হাওয়া খেলতে পারে। এতে ফুল বেশীদিন টাটকা থাকে।

ফুলের দৈর্ঘ্য ফুলদানীর চেয়ে বড় হওয়া চাই। বিদেশে বলাহয় যে ব্যাস রেখা ফুলদানীর সবচেয়ে মোটা অংশের যা হবে—তার এক-চতুর্থাংশ হিসেব করে নেবেন। অর্থাৎ ফুলদানীর ব্যাসটি আর ঐ এক চতুর্থাংশ যোগ দিয়ে ব্যাসটি হিসেব করে পুষ্পসজ্জার বৃত্ত রচনা করুন। অবশ্য আমি এর জন্য যা বোনেদের বলছিনা যে কম্পাস নিয়ে বসে মেপে জোঁকে সব করুন কারণ তা করতে গেলে আনন্দ থাকেনা। বরং আপন মনের মাধুরী-মিশিয়ে ঘর সাজিয়ে রাখবার চেষ্টা করবেন। ঘরে ঢোকামাত্রই যে কোনটিতে প্রথম নজরে পড়ে—সেই দিকেই ফুলের বাহার বেশী দেবেন। ঘরের অন্য কোণের দিকটাতে ফুল বেশী না দিলেও চলে।

বর্তমানে অর্থসঙ্কটের দিনে আমরা সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত ছুটে বেড়াই বাঁচার তাগিদে। এই Struggle for existence-এর মধ্যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিনের শেষে আমরা যখন বাড়ী ফিরি—তখন ঘরটিকে সুন্দর ভাবে সাজানো দেখলে মন আমাদের ভরে যায়। এর ওপর যদি একটি ছোট্ট ভিসের ওপর চাপা ফুল দেখতে পাই আর তার সুগন্ধটি ঘরটিকে ভরে দেয় তবে আমাদের সকল ক্লান্তি ও শ্রান্তি দূর হয়ে যায়। আমরা নোতুন করে উৎসাহ পাই বাঁচবার—আগামী দিন আবার কর্মক্ষেত্রে বেরবার।

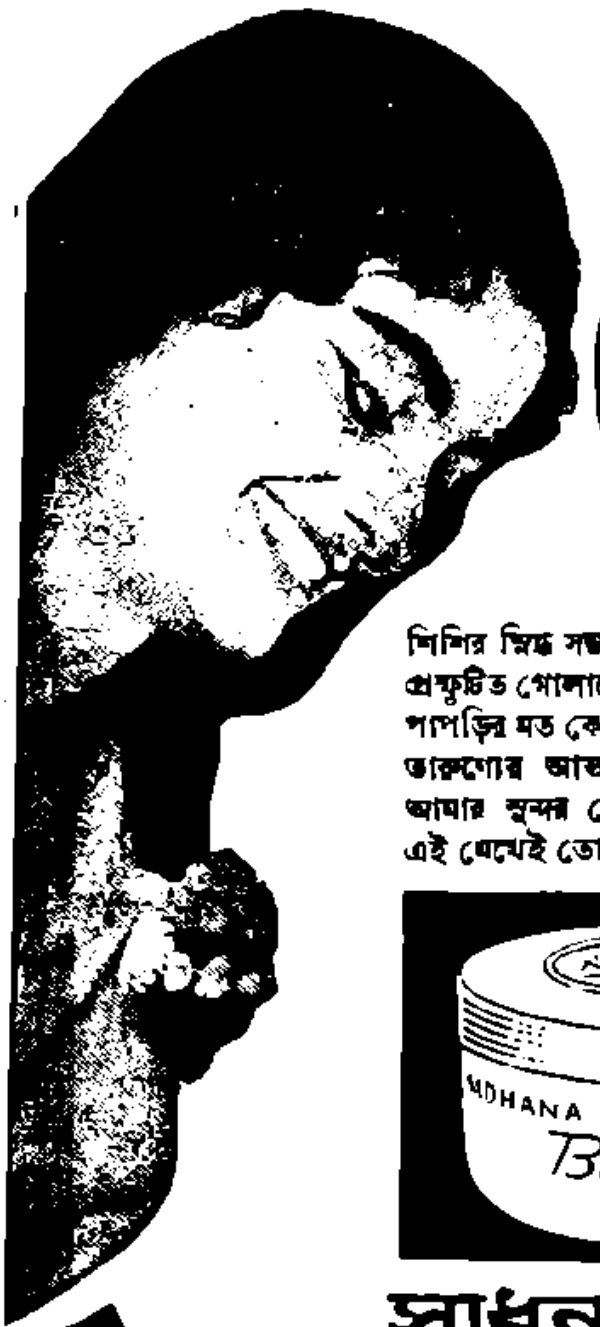

এর কোমল স্পর্শে
সৌন্দর্য
বিকশিত হয়

শিশির স্নিগ্ধ সদ্য
প্রস্ফুটিত গোলাপের
পাপড়ির মত কোমল ও
তারুণ্যের আভায় উজ্জ্বল
আমার সুন্দর দেহশ্রী
এই মেখেই তো।

সাধনা
বিউটি স্নো
একটি অতি আধুনিক
অঙ্গরাগ

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
কলিকাতা-৫

(ক)

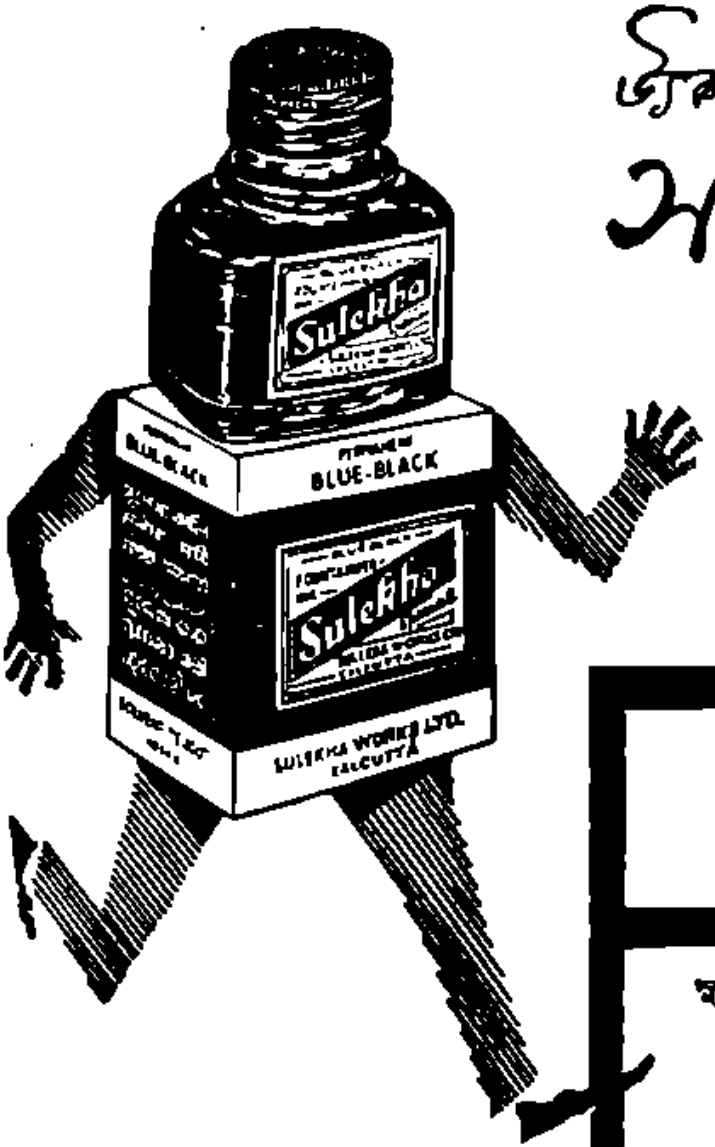

ঐতিহ্য ও উৎকর্ষতায়

সবার আগে সুলেখা

ভারতে সর্বাধিক বিক্রয়ে তো বটেই, ক্রমবর্ধমান রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে সুলেখা আজ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও উল্লেখযোগ্য গতির পালন ক'রে চলেছে।

দেশ-বিদেশে সমাদৃত

সুলেখা-উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে আছে :
'অ্যাডসল' পেস্ট এবং গাম,
'সিল্ভ্যাসিল' সিলিং ওয়াক্স,
'পেনসল', স্ট্যাম্প প্যাড, বিভিন্ন লেখার কালি এবং স্টেনসিল, স্ট্যাম্পিং, মার্কিং ও ড্রইং-এর কালি।

সুলেখা

স্পেশাল
ফাউন্টেন পেনের
কালি

ব্লু ব্ল্যাক, রয়াল ব্লু, ব্ল্যাক, এবং ব্রাউন রঙে
৫ এবং ৩০, ৬০, ১২০, ৩৬০ সি.সি. এল. সাইজে
পাওয়া যায়।

প্রস্তুতকারক : সুলেখা ওয়ার্কস প্রাঃ
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২
ভারত।

গল্প-ভারতী

GALPA-BHARATI

চৈত্র ১৩৭৭, APRIL, 1971

ষড়বিংশতি-বর্ষ

মূল্য : এক টাকা

বার্ষিক : পনের টাকা

সম্পাদক : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

সহ: সম্পাদক : কল্যাণ রায়

শ্রীগোপাল বিহারী দত্ত কর্তৃক ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও কল্পনা প্রেস প্রা: লি:
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas

Ex. Judge, Calcutta High Court,
Ex-Law Member, Govt. of India

আমি লক্ষ্মী-ঘিই ব্যবহার করি। অন্য ঘিয়ের তুলনায় এ ঘি অনেক ভাল ও বিশুদ্ধ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সত্যেন মজুমদার
সম্পাদক—আনন্দবাজার পত্রিকা

লক্ষ্মী ঘি ব্যবহার করে আমার বেশ ভাল লেগেছে। এটা সত্যিই ঘি।

—শিশিরকুমার ভাদুড়ি

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল জিনিষ।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই তেজানের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—দৈনিক বসুমতী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজারে প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

শ্রীসীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখরোচক হয়।

শ্রীশান্তা দেবী

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকা

গল্প ভারতী সমসাময়িক সাহিত্যজগতে যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে তা অভূতপূর্ব।

গল্প ভারতী নবজাগ্রত জাতির মর্মরাঙা মর্মকাহিনী।

গল্প ভারতী সকল শ্রেণীর নবীন ও প্রবীণ সাহিত্যিকদের মিলনতীর্থ।

গল্প ভারতী সরস সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জাতির অন্তরের ব্যথা ও বেদনার কথা আপনার কাছে পৌঁছে দিচ্ছে।

গল্প ভারতী নূতন যুগের চিন্তার দ্বারকে উন্মোচন করে দিয়েছে।

গল্প ভারতী অনুবাদ সাহিত্যে নূতন ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে

গল্প ভারতী বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের মান উন্নীত করেছে।

গল্প ভারতীর প্রত্যেক পাতা স্থায়ী সাহিত্যের দাবী করে।

গল্প ভারতী জাতির ভাবজীবনে ও চিন্তাধারায় এক নূতন যুগের সৃষ্টি করেছে।

গল্প ভারতী পূজা সংখ্যার প্রধান বৈশিষ্ট এই যে ইহা শুধু একটি উৎসব ঋতুর সামগ্রী নয়। প্রত্যেক সুধীজনই সানন্দে স্বীকার করেছেন যে এই পত্রিকা বর্তমান বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতির চিরস্থায়ী নিদর্শন এবং সেইজন্যেই দেশব্যাপী প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীর কাছে পূজা সংখ্যা গল্প ভারতী বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেছে।

গল্প ভারতীর গ্রাহক হওয়া মানে বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতিতে সাহায্য করা।

আজই গল্প-ভারতীর গ্রাহক হউন

সডাক বাৎসরিক চাঁদা মাত্র ১৫৲

যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়।

ভারতের সর্বত্র সম্ভ্রান্ত এজেন্ট আবশ্যক

ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিঃ

২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬

ফোন : ৫৫-৩২৯৪ ও ৫৫-১৩১৫

এই সংখ্যায়

মানুষ আজ তুমি কোথায় ?		৯৩৩
সঙ্গীতই আনবে জয় গৌরব	—সত্যেন রায়	৯৩৪
যেখানে বাঙালী সেখানেই বাংলা	—সদানন্দ	৯৩৯
কার্টুন		৯৪১
কিছু রঙ কিছু বেরঙ (ধারাবাহিক উপন্যাস)	—বিমল মিত্র	৯৭৩
বাঙালীর বীরত্ব	—সুপর্ণ রায়	৯৪৬
বন্যা কন্যা (ধারাবাহিক উপন্যাস)	—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৯৪৯

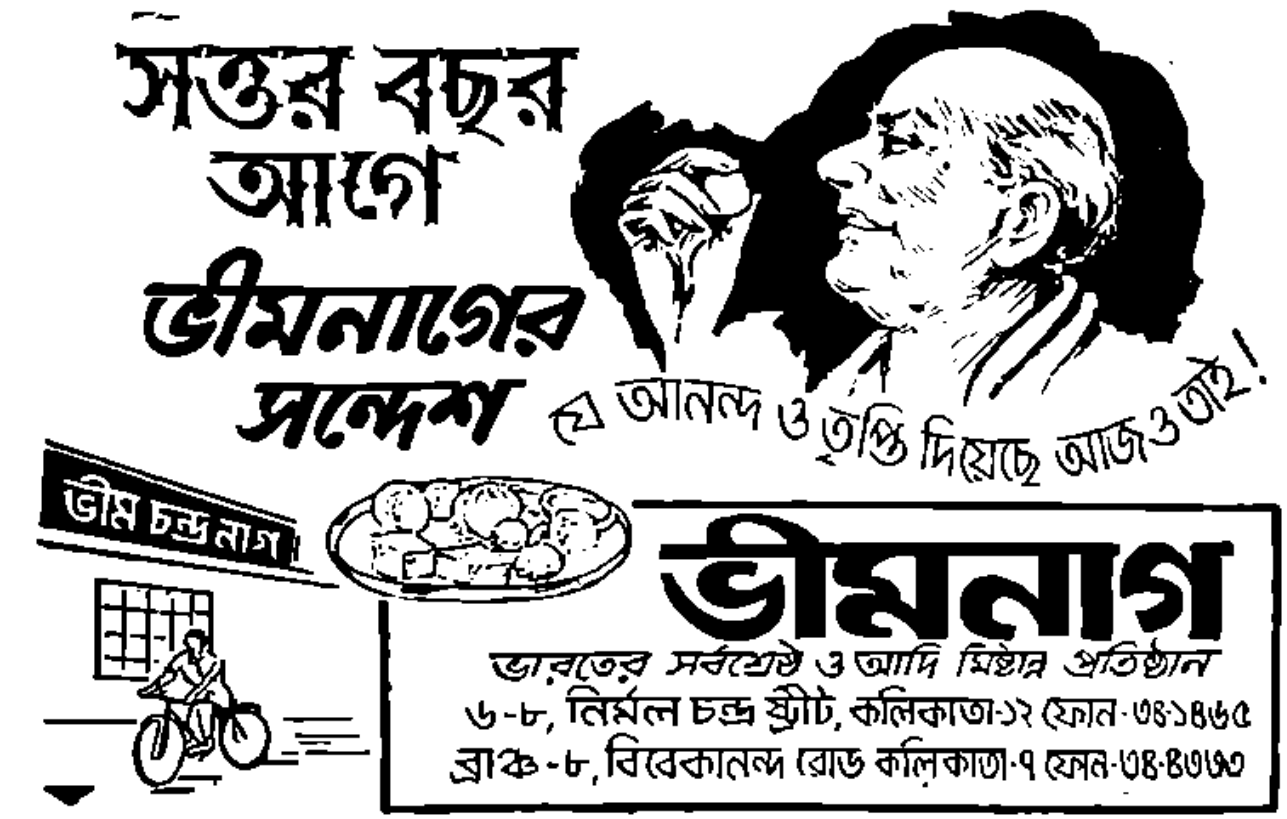

এই সংখ্যায়

ফিরে ফিরে চাই	—প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়	৯৬১
জীবননাট্যের খণ্ড চিত্র :		
ভোলামনের মহাবিজ্ঞানী	—অনাথ উপাধ্যায়	৯৬৪
বিপ্লব বহ্নি		
পেডিনিধন : ভিলিয়ার্সকে আক্রমণ	—দীপঙ্কর	৯৬৭
আবার সেই জেল	—দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়	৯৭৫
নাটমঞ্চ	—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৯৮৩
বঙ্কিমচন্দ্রের ললিত গিরি	সুকুমার রায়	৯৯১

তন্বী, তব
তরুণ তনু ঘিরে
বসন্তের সুরভি যত
উচ্ছ্বসিয়া ফিরে !

তিয়া সুরভি মেখে যেখানেই যাবেন সেখানেই আপনার জয়-জয়কার। আপনার দারিদ্র্য দূরে যাবে ভাগ্য কাছে।

প্রিয়া পারফিউম

কসমেটিক ডিভিশন
বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা বোম্বাই দিল্লী মাদ্রাজ

এই সংখ্যায়

●

গল্পভারতীর পাতা থেকে		
নোট্রাম্‌স্‌	— হরিসাধন চট্টোপাধ্যায়	৯৯৫
এই প্রথম		
দক্ষিণগড়ের সেই পুরানো গল্প	— অচিনারায়ণ ভট্টাচার্য	১০০১
খেলাধূলা	— জ্যোতিময়	১০০৯
অপরাহ্নবতী (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— সুবোধ সিংহ	১০১১
বাসে কলকাতা থেকে ভুটান (ভ্রমণ কাহিনী)		
	—সুধীর ব্রহ্ম	১
সাত্বিক (গল্প)	—ডাঃ হরেন্দ্রনাথ রায়	৮

আরো দুটো দাও না...

বিনোদের

ক্ষীরের সিঙ্গাড়া

ভাল জানতাম-কিন্তু এতো ভাল তা তো জানতাম না

বিনোদ বিহারী নাগ

গণেশ চন্দ্র দত্ত

৫৭, রামদুলাল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

ফোন : ৫৫-১৪৫০

৫, ৬, হেয়ার স্ট্রীট,

ফোন : ২৩-১৮২৯

শাখা

২৮; যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ,

এই সংখ্যায়

জাপানের চা উৎসব —নীলিমা দে

উৎসব—ইওরোপের শেষ সীমান্তে

চিঠি শুধু চিঠি নয়

● মেয়ের মজলিশ ●

বর্ষশেষ —বেলা দে ১

গৃহসজ্জা —সুরঞ্জনা সেন ২

ঘর না ফুলের বাগান —প্রতিমা চক্রবর্তী ৩

অস্বাভাবিক মোটা যারা তারা কত অসহায় ৫

যুগে যুগে প্রসাধন —জ্যোতির্ময়ী দেবী ৬

অতুলনীয় ঐতিহ্যপূর্ণ

বাংলার তাঁতবস্ত্র

উৎসবে এবং নিত্যপ্রয়োজনে ব্যবহার করুন

॥ সমবায় সমিতিতে উৎপাদিত তাঁতবস্ত্রের প্রামাণ্যস্থান ॥

★ দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল স্টেট হ্যাণ্ডলুম উইভার্স কো-অপারেটীভ সোসাইটী লিমিটেড
৬৭, বস্ত্রীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪,

ও

শাখা কেন্দ্রসমূহ

★ গভর্ণমেণ্ট সেলস এম্পোরিয়ম : ৭/১, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
১২৮/১, বিধান সরণী, কলিকাতা ; ১৫৯/১/এ, রাসবিহারী এভেন্যু, কলিকাতা,
১৮/এ, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, (সাউথ), হাওড়া।

HOUSE OF NRM

NATIONAL RUBBER MANUFACTURERS LTD.

THE LARGEST MANUFACTURERS OF INDUSTRIAL RUBBER PRODUCTS

Inchek Tyres Limited

MANUFACTURERS OF TYRES FOR INDIAN ROADS AND CLIMATIC CONDITIONS.

মানুষ আজ তুমি কোথায় ?

বিংশ শতকের সভ্যতার বড়াই করো।

তোমার শিক্ষা-দীক্ষা, বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও অগ্রগতির গর্ব করো।

পারমাণবিক মারণাস্ত্র তৈরী করে ও চন্দ্রলোক পরিভ্রমণ করে মনে করছো অনেক—অনেক এগিয়ে গিয়েছো,

আজ তোমার সামনে নিরস্ত্র নিরীহ অসহায় মানুষের ওপর যে অবর্ণনীয় অমানুষিক অত্যাচার ও অবাধ হত্যাকাণ্ডের তাণ্ডবলীলা দুর্বার গতিতে চলেছে তা দেখেও তুমি নির্বাক, নীরব।

ছিঃ ছিঃ লজ্জা করে না।

কোথায় তোমার বিশ্বসংঘ, কোথায় তোমার বিশ্ববিবেক ?

সবই প্রহসন।

তাই বুঝি বিশ্বজননীর কণ্ঠে আজ বিষাদের সংগীত, বিশ্বজননীর মুখ তোমার কুকীর্তির কালিমায় মসীলিপ্ত।

একবার চেয়ে দেখো।

সংগীতই আনবে জয় গৌরব

—সত্যেন রায়

মানুষের চেতনাকে জাগ্রত করতে সংগীতের অবদান অপরিসীম। পৃথিবীর আদিম কাল থেকেই গানের সুরে সুরে মানুষ উজ্জীবিত হয়েছে। আমাদের দেশে সভ্যতার আদি যুগেও এই গানই ছিল প্রাণের আকাঙ্ক্ষা জাগাবার বাহন। ভগবানের আরাধনায় যেমন, জন্মভূমির আরাধনারও তেমনি গানের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্য ও গুরুত্বপূর্ণ। একদিন স্বাধীনতার ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্ সংগীত আসমুদ্র হিমাচলের কোটি কোটি কণ্ঠে নিনাদিত হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামকে জয়যুক্ত করেছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ প্রথমে এই মৃত্যুঞ্জয়ী সংগীত জাতীয় মহাসভার এক বিশিষ্ট অধিবেশনে পরিবেশন করে সেদিনের সংগ্রামী দেশপ্রেমিকদের মনে এক অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন, যার ফলে দেশ হয়েছিল স্বাধীন। আমাদের দেশের বহু বীর শহীদ এই বন্দেমাতরম্ মন্ত্র-সংগীত কণ্ঠে নিয়ে ফাঁসীর মঞ্চে গেয়ে গেছে জীবনের জয়গান। সপ্তকোটী মানুষের কণ্ঠে একদিন বন্দেমাতরম্ সংগীত ধ্বনিত হয়ে দেশের আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করেছিল, বিদেশী শাসকদের নিদ্রাহরণ করেছিল, তাদের ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। ঋষি বঙ্কিমের পর এলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশী গানের অফুরন্ত প্রেরণা ও উদ্দীপনার উৎস নিয়ে। তাঁর গানে গানে জেগে উঠল বাংলাদেশের মানুষ। প্রাণ এলো মৃতপ্রায় জাতির দেহে। সে সব গানের চিরন্তন আবেদন যে কত সত্য কত কালজয়ী কত মৃত্যুঞ্জয়ী তার জলন্ত প্রমাণ আজ আমরা দেখতে পেলাম পূর্বগগনে রবিকরে উদ্ভাসিত নব প্রভাতে। যখন এপারের বাংলাদেশে সংগীতের মৃত্যুঞ্জয়ী আবেশ ও গরিমাময় মহিমা ধীরে ধীরে তিমিত হয়ে আসছে ঠিক সেই সময়ে কবির অমর সংগীত আজ ওপারের বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত! সেই সংগীত কণ্ঠে নিয়ে আজ বাংলাদেশের সাতকোটি মানুষ জঘন্যতম বর্বরতম হিংস্রতম পাশবিকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে—মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। আমরা এপারে দাঁড়িয়ে স্তব্ধ স্তম্ভিত বিহ্বল চিত্তে দেখছি তাঁদের সেই মৃত্যুঞ্জয়ী সংগ্রাম আর শুনছি

"আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি"

গল্পভারতী প্রতি বছর বৈশাখ সংখ্যাটি রবীন্দ্রনাথের পায়ে উৎসর্গ করে তাঁর জীবনাদর্শের কথা পাঠকদের শুনিয়েছে। আমরা মনে করি স্বতন্ত্রভাবে রবীন্দ্রনাথের মহাসাগর-তুল্য অপরিমেয় সংগীত-ভাণ্ডারের অমূল্য রত্নরাজি সম্বন্ধে আলোচনা আজ একান্ত আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের গান জাতির মহোত্তম সম্পদ! এই মহাসম্পদের যে উত্তরাধিকার আমরা পেয়েছি তার যোগ্য ব্যবহার যেন করতে পারি—তাই আমরা স্থির করেছি এই জাতীয় জাগরণের দিনে দেশবাসীর কাছে নূতন করে তার আবেদনকে পৌঁছিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে গল্পভারতীর নববর্ষ সংখ্যায় আমরা রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সংগীতের একটি আবেগ আবিষ্ট আলোচনা করবো।

স্বদেশী যুগে যেসব অমর জাতীয় সঙ্গীত দেশবাসীর মনে এক অভূতপূর্ব উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল, যার মৃত্যুঞ্জয়ী সঞ্জীবনী শক্তি একদিন হাজার হাজার সংগ্রামী দেশপ্রেমিককে অদম্য উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছিল, তার দুই একটি আজকের পাঠকদের সামনে তুলে ধরে আমরা ধন্য হলেম।

দেশের মানুষকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করায়, এইসব সঙ্গীতের যে কী ক্ষমতা, সেদিনের মানুষদের অনন্ত দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মবলিদান তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। আজ আমরা এইসব সঙ্গীতের মহাত্ম্য ভুলতে বসেছি, অথচ এদের নতুন করে অনুশীলন করার প্রয়োজন আজ দেশের এই দুর্দিনে সবচেয়ে বেশী।

টাউন হলের সভা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের তৎকালে রচিত নূতন সঙ্গীত "আমার সোনার বাংলা" বাউল সুরে গীত হইয়াছিল। জাতীয় সঙ্গীতাবলীর মধ্যে এই সঙ্গীতটি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১৯০৫ খৃঃ ৭ই সেপ্টেম্বর (১৩১২ সনের ২২শে ভাদ্র) তারিখের "সঞ্জীবনী" পত্রিকায় ওই গানটি রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরে প্রথম প্রকাশিত হয়। তৎপরে তাঁহার সম্পাদিত "বঙ্গদর্শন" (নব পর্যায়) মাসিক পত্রের আশ্বিন (১৩১২ সন) সংখ্যায়ও উহা প্রকাশিত হইয়াছিল। "সোনার বাংলা" সঙ্গীতের প্রথম দুইটি চরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

"আমার সোনার বাংলা,
আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।
ওমা, ফাগুনে তোর আমের বনে
ঘ্রাণে পাগল করে,
ওমা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে
কী দেখেছি মধুর হাসি।"

... ...

• • •

বঙ্গ-বিভাগের পরিকল্পনা কার্যকরী হইল ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর অর্থাৎ ১৩১২ সনের ৩০শে আশ্বিন। ওই দিবস হইতে বঙ্গভাষাভাষী অখণ্ড বাঙালী জাতিকে খণ্ডিত করা হয় বাঙলা দেশকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ঐক্যের যোগ-সূত্র অবিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য এবং রাজনীতিক কূটির বিভাগ অস্বীকার করিয়া সমগ্র বাঙালী জাতির সৌভ্রাত্রের বন্ধন অটুট রাখিবার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত হইল রাখি-বন্ধন অনুষ্ঠান। অরন্ধন ও উপবাস এবং কলিকাতায় 'ফেডারেশন হল' বা অখণ্ড বঙ্গভবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠাও ছিল সেই দিবসের কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। কলিকাতায় নেতৃমণ্ডলের এক ঘরোয়া বৈঠকে পূর্বোক্ত কার্যক্রম গৃহীত হয়। রাখি-বন্ধন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথের, আর "ফেডারেশন হল"

নির্মাণের পরিকল্পনা রাষ্ট্র-গুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। রাখি-বন্ধন অনুষ্ঠানের জন্য কবি-গুরু রচনা করিলেন এই সঙ্গীতটি :—

"বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল—
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান।
বাংলার ঘর, বাংলার হাট, বাংলার বন, বাংলার মাঠ—
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান।
বাঙালির পণ, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা—
সত্য হউক, সত্য হউক সত্য হউক, হে ভগবান।
বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন—
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।"

• • •

বাংলার যশস্বী কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যে সকল জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে স্বদেশী যুগে রচিত একটি লোকপ্রিয় সঙ্গীত নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"কোন্ দেশেতে তরুলতা—
সকল দেশের চাইতে শ্যামল ?
কোন্ দেশেতে চল্‌তে গেলেই—
দল্‌তে হয় রে দুর্বা কোমল ?
কোথায় ফলে সোনার ফসল,
সোনার কমল ফোটে রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরই বাংলা রে !
কোথায় ডাকে দোয়েল শ্যামা—
কিঙে নাচে গাছে গাছে ?
কোথায় জলে মরাল চলে—
মরালী তার পাছে পাছে ?
বাবুই কোথা বাসা বোনে—
চাতক বারি যাচে রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরই বাংলা রে !
কোন্ ভাষা মরমে পশি—
আকুল করি তোলে প্রাণ ?
কোথায় গেলে শুনতে পাব—
বাউল সুরের মধুর গান ?
চণ্ডীদাসের রামপ্রসাদের—
কণ্ঠ কোথায় বাজে রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরই বাংলা রে !
কোন্ দেশের দুর্দশায় মোরা—
সবার অধিক পাই রে দুখ ?
কোন্ দেশের গৌরবের কথায়—
বেড়ে উঠে মোদের বুক ?
মোদের পিতৃ পিতামহের—
চরণ-ধূলি কোথা রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরই বাংলা রে !"

BANDE-MATARAM

Mother, I bow to thee !
Rich with thy hurrying streams ;
Bright with thy orchard gleams ;
Cool with thy winds of delight,
Dark fields waving, Mother of might,
Mother free.

Glory of moonlight dreams
Over thy beaches and lordly streams ;
Clad in thy blossoming trees,
Mother, giver of ease,
Laughing low and sweet !
Mother, I kiss thy feet,
Speaker sweet and low !
Mother, to thee I bow.

Who hath said thou art weak
in thy lands,
When the swords flash out in
seventy million hands
And seventy million voices roar
Thy dreadful name from shore
to shore ?

With many strengths who art
mighty and stored,
To thee I call, Mother and
Lord !

Thou who savest, arise and save !
To her I cry who ever her
foemen drove
Back from plain and sea
And shook herself free.

Thou art wisdom, thou art law !
Thou our heart, our soul, our breath,
Thou the love divine, the awe
In our hearts that conquers
death.

বন্দে মাতরম্

বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্ ।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং,
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুর-ভাষিনীং,
সুখদাং বরদাং মাতরম্ ।
সপ্তকোটি কণ্ঠ কলকলনিনাদ করালে,
দ্বিসপ্তকোটি ভুজৈধৃত-খরকরবালে,
অবলা কেন মা এত বলে ?
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরম্ ॥

তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম,
তুমি হৃদি, তুমি মর্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে ।

বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে ।

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ-ধারিণী,
কমলা কমলদল-বিহারিণী,
বাণী বিদ্যাদায়িনী,
নমামি ত্বাম্ ।

Thine the strength that nerves
the arm,
Thine the beauty, thine the
charm.

Every image made divine
In our temples is but thine.
Thou art Durga, Lady and Queen,
With her hands that strike
and her swords of sheen,
Thou art Lakshmi lotus-throned,
And the Muse a hundred-toned.

Pure and perfect, without peer,
Mother, lend thine ear.
Rich with thy hurrying streams,
Bright with thy orchard-gleams,
Dark of hue, O candid-fair
In thy soul, with jewelled hair
And thy glorious smile divine,
Loveliest of all earthly lands,
Showering wealth from well-stored
hands !

—*Sree Aurobindo*

নমামি-কমলাং
অমলাং অতুলাং
সুজলাং সুফলাং
মাতরম্ ।

বন্দে মাতরম্,
শ্যামলাং সরলাং
সুস্মিতাং ভূষিতাং
ধরণীং ভরণীং
মাতরম্ ॥

—ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র

• • •

বন্দেমাতরম্ সংগীতের মধ্য দিয়ে একদিন পরাধীনজাতি তার প্রাণমন্ত্রের সন্ধান পেয়েছিল দেশমাতৃকার এমন মহীয়সী গরীয়সী রূপমাধুর্য ও মহিমা সংগীতের একটি সূচনা পদের মধ্য দিয়ে ভারত ইতিহাসে আর কখনও অঙ্কিত হয়নি।

একটি সাহিত্যিক জাতি এই বন্দেমাতরম্ অক্ষর কয়টিকে ধ্যান করেছে বীজমন্ত্ররূপে, এরই মধ্যে পেয়েছে সেই পরমা শক্তি ; অনুভব করেছে এক অলৌকিক প্রভাব যার ফলে দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বলি দিয়েও মানুষ পেয়েছে এক অপার্থিব আনন্দ, এবং ত্যাগের যে পথ মানুষ সম্মুখে দেখেছে, সেই পথ ধরেই দিয়েছে এগিয়ে দুর্জয় শক্তি নিয়ে।

যেখানে বাঙালী সেখানেই বাংলা

—সম্পাদক

প্রখ্যাত সাহিত্যিক স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় যখন গল্পভারতীর সম্পাদক ছিলেন তখন গল্পভারতীর কতিপয় অন্তরঙ্গ সাহিত্যিক বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম যে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে যেখানে যে বাঙালী আছেন যদি তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ দৃঢ় স্থাপন করে, তাঁর ও চিন্তার আদান-প্রদানের একটি বিশ্ব-সংগঠন গড়ে তোলা যায়, তাহলে তার মাধ্যমে বাংলা ও বাঙালীর সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও কল্যাণ সাধিত হতে পারে। যে-বাঙালী একদিন শৌর্যে বীর্যে জ্ঞান গরিমায় দেশের পুরোভাগে ছিল সে-বাঙালী আজ মৃতপ্রায়, দিগ্‌ভ্রান্ত। বাঙালাদেশের আজকের এই অধঃপতন ও দুরবস্থা দেখে প্রত্যেক চিন্তাশীল বাঙালী, যিনি সত্যিই মনে-প্রাণে বাংলা দেশকে ভালবাসেন, তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, অত্যন্ত ব্যথিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। তাই, আমরা চেয়েছিলাম, প্রবাসে যেসব বাঙালী আছেন তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা। কী করে, কোন্ পরিকল্পনায়, কোন্ পথে অগ্রসর হলে বাঙালীকে আবার তার পূর্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা যায়, কী করে আমার বাঙালী জাতির চরিত্র, সাহিত্য, শিক্ষা-দীক্ষা শিল্প-সংস্কৃতি ও সমাজব্যবস্থা পুনর্জীবন লাভ করতে পারে সে সম্বন্ধে প্রবাসী বাঙালীদের ঐতিহ্যপূর্ণ চিন্তাধারা যদি আমরা গল্পভারতীর পৃষ্ঠায় তুলে ধরতে পারি তাহলে তাঁদের সেই চিন্তার প্রভাব জাতির মনে সঞ্চারিত হবে এবং তার ফলে ক্রমে একটা সর্বব্যাপী আন্দোলন গড়ে উঠবে বাঙালীকে গৌরবের পথে এগিয়ে দেবার।

সেদিন আমাদের এই পরিকল্পনা গল্পভারতীতে প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেশবিদেশের বাঙালী সুধীবৃন্দের কাছ থেকে বিপুল সংবর্ধনা পেয়েছিলাম। উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হতে যাব এমন সময় মৃত্যুর করাল হস্ত উপেন্দ্রনাথকে আমাদের মধ্য থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

সেদিন আমাদের বাণী ছিল—"যেখানে বাঙালী সেখানেই বাংলা।" এই বাণীর মধ্য দিয়ে বাঙালী জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য একটি ঐকাবদ্ধ প্রচেষ্টাই ছিল আমাদের লক্ষ্য। এর মধ্যে প্রাদেশিকতার কোন প্রশ্নই আসে না। বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য, বাংলার শিল্প ও বাংলার সংস্কৃতিকে পুনর্জীবিত করাই হল আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। বাংলাদেশ ভারতের একটি বলিষ্ঠ অঙ্গ। বাংলাদেশের উন্নতি মানে সারা ভারতের উন্নতি। বাংলার অবনতিতে সারা ভারতবর্ষ আজ ক্ষতিগ্রস্ত। এইভাবে যদি বাঙালী ও বাংলাদেশ পুনর্জীবিত ও উন্নীত হয় তাহলে তা ভারতেরই সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও অগ্রগতিতে সাহায্য করবে।

এই লক্ষ্য নিয়ে গল্পভারতী বরাবরই অগ্রসর হয়েছে। বীরত্বে শৌর্যে ধীর্যে মনীষায় দেশপ্রেমে যেসব কীর্তিমান বাঙালী দেশের গৌরব বৃদ্ধি করে গেছেন, আজিকার তরুণ তরুণীদের উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াসে গল্পভারতীর পৃষ্ঠায় নিয়মিতভাবে তাঁদের জীবন আদর্শ ও কর্মকীর্তির ইতিবৃত্ত প্রকাশিত হয়ে আসছে।

উপেন্দ্রনাথের সেই পরিকল্পনাকে আমরা আবার রূপ দিতে উদ্যত হয়েছি এবং দেশবিদেশের সকল বাঙালীর কাছে আমাদের আবেদন তাঁরা এবিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করুন এবং আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন।

বিশ্বের নানা স্থানে যেখানে যে বাঙালীরা আছেন তাঁরা তাঁদের চিন্তা ও পরিকল্পনা সমৃদ্ধ সুচিন্তিত মূল্যবান রচনা আমাদের কাছে প্রেরণ করুন। আমরা সাদরে তা পত্রস্থ করব। এইভাবে গড়ে উঠুক ভাবের ঐক্যে সংবদ্ধ, আদর্শের ঐক্যে মহৎ একটি বিশ্ব-বাঙালী গোষ্ঠী। বাঙালী জাতি তার হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করে পুনরায় স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হোক—এই কামনা নিশ্চয়ই আজ সকল বাঙালীর!

প্রবাসী বাঙালীদের কাছেই আমাদের বিশেষ আবেদন এই কারণে যে তাঁরা দূরে আছেন এবং অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত অবস্থায় বাস করছেন, কিন্তু আমরা জানি, আজিকার বহু সমস্যা কণ্টকিত বাঙলা ও বাঙালীর জন্যে তাঁদের মন ভারাক্রান্ত ও বেদনাহত! তাই তাঁদের সহানুভূতি ও সদিচ্ছা প্রণোদিত গঠনমূলক পরিকল্পনা যদি গল্পভারতীর মাধ্যমে প্রকাশিত হয় তাহলে সারা দেশে তার প্রতিধ্বনি হবে, ফলে নতুন চিন্তায়, নতুন ভাবনায় জাতি আবার উদ্বুদ্ধ হবে।

আমরা বিশ্বাস করি সারা বিশ্বের বাঙালীর ঐকান্তিক সহযোগিতা লাভ করতে পারলে আমরা আমাদের পরিকল্পনাকে সার্থকরূপ দিতে পারব এবং ধৈর্য ও নিষ্ঠা সহকারে অগ্রসর হলে একদিন, হতে পারে বহুদিন পরে, আমরা লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছাতে নিশ্চয়ই পারবো।

বাঙালির যা কিছু শ্রেষ্ঠ, শাশ্বত, যা সর্বমানবের বেদীমূলে উৎসর্গ করবার উপযুক্ত, তাই আমাদের বর্তমানকাল রেখে দিয়ে যাবে ভাবীকালের উত্তরাধিকার রূপে। সাহিত্যের মধ্যে বাঙালির যে পরিচয় স্পষ্ট হচ্ছে বিশ্বসভায় আপন আত্মসম্মান সে রাখবে, কলুষের আবর্জনা সে বর্জন করবে, বিশ্বদেবতার কাছে বাংলাদেশের অর্ঘ্যরূপেই সে আপন সমাদর লাভ করবে।

—রবীন্দ্রনাথ

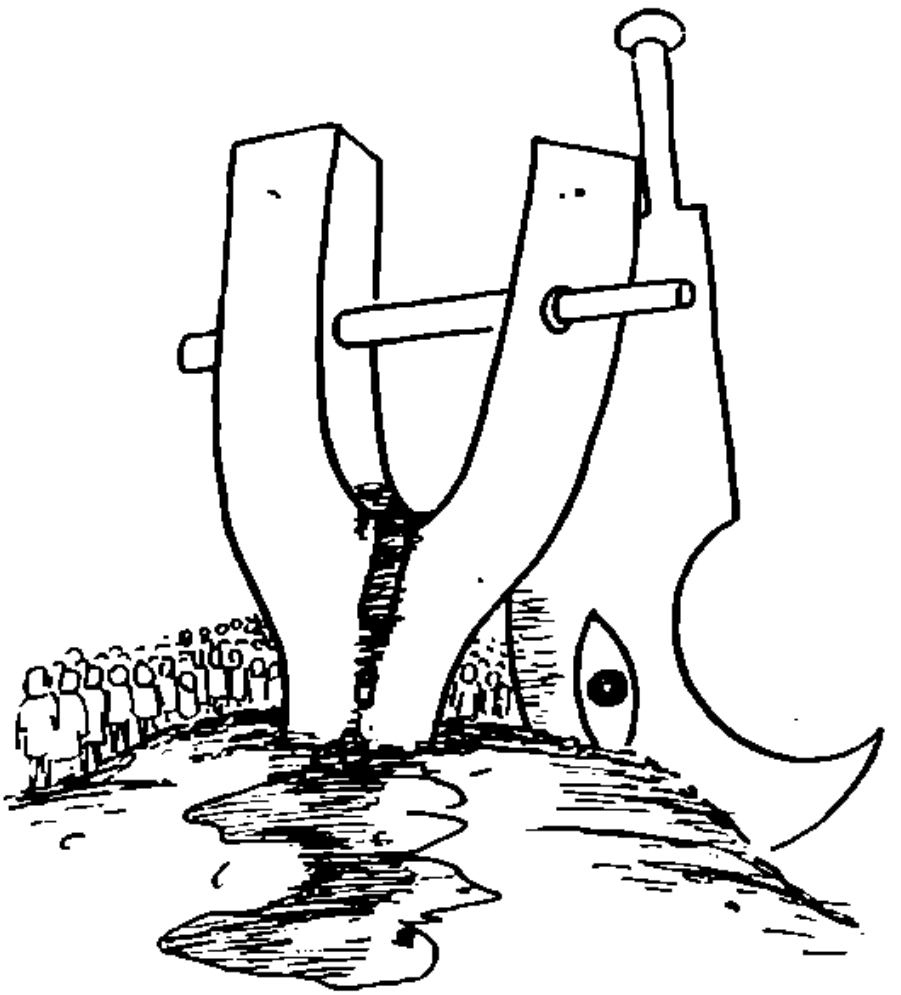

আজ মানুষকে হত্যা করলে কে ?

পালিয়ে কোথায় যাবেন ?

বনে, জঙ্গলে ?

সেখানেও কি নিস্তার আছে !

আজ এইতো জীবন !!

কিছু রঙ কিছু রেখা

ধারাবাহিক উপন্যাস

বিমল মিত্র

॥ ৭ ॥

নিবারণ চক্রবর্তী মশাই কথাগুলো বলে শশীর মুখের দিকে তাকালেন। বুঝলেন যে খুবই কষ্টের মধ্যে উদ্বেগের মধ্যে কাটাচ্ছে শশী।

শশীপদ আর থাকতে পারলে না। বললে—তাহলে একবার আপনার বৌমাকে ডেকে দিন না খুড়োমশাই,—

নিবারণ চক্রবর্তী বললেন—কেন, তাহলে তুই বৌমাদের বাড়ি নিয়ে যাবি? বাড়ি নিয়ে গিয়ে ও মরয়ানী-মাগীর কি, করে রাখবি নাকি?

শশীপদ বললে—আপনি কী বলছেন খুড়োমশাই, নেহাৎ ওপায় থেকে বাস্তহারা হয়ে এসেছে বলে বাড়িতে ঠাঁই দিয়েছি, ওর কোনও যাবার জায়গা থাকলে কি আর নিজের বাড়িতে রাখতাম ওকে—

নিবারণ চক্রবর্তী হাসলেন। হেসে যেন বলতে চাইলেন যে তিনি অত নির্বোধ নন্, তিনি সবই বোঝেন, শুধু স্পষ্ট কথা বলে নিজেকে বোকা প্রমাণ করতে চান না।

হেসে শুধু বললেন—তোদের মধ্যে কী হয়েছে আমি জানবো কী করে বল? শুধু বৌমা কাঁদছে দেখে ভাবলাম হয়ত আবার ঝগড়া করেছিস তুই। তোদের ঝগড়া তো দিন-রাত লেগেই আছে।

শশীপদ বললে—তাহলে আমি নিজেই গিয়ে ডেকে আনছি—

নিবারণ চক্রবর্তী বললেন—তুই থাম্ বাপু আমি আগে ভেতরে গিয়ে জিজ্ঞেস করে আসি বৌমা তোর সঙ্গে কথা বলবে কি না—

বলে নিবারণ চক্রবর্তী ভেতরে চলে গেলেন।

শশীপদও সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির উঠানের মধ্যে ঢুকবে কি না ভাবছে, এমন সময় দেখলে তার বাড়ির খিড়কী দিয়ে মুখমণ্ডী রাস্তার দিকে বেরিয়ে আসছে। তারপর শশীপদকে দেখেই চোখ দুটো নামিয়ে নিলে।

শশীপদ তার দিকে দু'পা এগিয়ে গেল।

জিজ্ঞেস করলে—কী হলো, তুমি কোথায় যাচ্ছো—

সুখমতী সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো, বললে—আমাকে যেতে দাও দাদা, আমি কারোর অশান্তি করতে চাই না—ভেবে দেখলুম তোমাদের এখানে আমার না থাকাই ভালো—

শশীপদ বললে—কিন্তু তোমাকে কি কেউ কিছু বলেছে?

সুখমতী বললে—কে আর আমাকে কী বলতে যাবে দাদা, আমি নিজেই বলছি—

শশীপদ বললে—তুমি আমার বাড়িতে আছো, আমি বাড়ির কর্তা, আমি নিজে তোমাকে আমার বাড়িতে এনে তুলেছি, আমি না বললে তো তুমি যেতে পারো না। আমি নিজে তোমাকে কিছু বলেছি?

সুখমতী বললে—তোমার পায়ে পড়ি দাদা, আমাকে তুমি আটকিয়ো না—আমি চাই না আমার জন্যে কারো ক্ষতি হয়। আমার নিজের কপাল পুড়েছে বলে যেন অন্য কারো কপাল না পোড়ে। পেল জন্মে কত পাপ করেছিলুম, এ জন্মে তাই আমার এত ভোগান্তি—

বলে হাতের পুঁটলিটা নিয়ে নিজের গন্তব্য স্থানের দিকে চলে যাবার উদ্যোগ করলে।

শশীপদ সামনে গিয়ে বললে—কিন্তু কোথায় যাবে তুমি?

সুখমতী বললে—কী জানি! বেরিয়ে তো পড়েছি, তারপর যে-দিকে দুচোখ যায়—

শশী বললে—কিন্তু তুমি তো জানো অনাথা মেয়েমানুষের দুনিয়ায় কোথাও স্থান নেই—

সুখমতী বললে—কিন্তু অনাথা হওয়া তো এই আমার প্রথমবার নয় দাদা। অনাথা তো আমি জন্ম থেকেই—জন্ম থেকেই জানি আমার কপালে অনেক দুঃখু। নইলে এত কাল পরে এমন করে কে পাকিস্তান তৈরি করলে? শ্যামনগরে থাকলে আমি ওদের কী ক্ষতি করতুম? ওদের পাকিস্তান কথা কি আমি উল্টে দিতুম?

শশী বললে—সে সব কথা তো রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলা যায় না।

সুখমতী বললে—তা তো বটেই দাদা। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কি কাটা কপাল জোড়া লাগানো যায়! আমি এই ক'দিন থেকেই তাই কেবল ভাবছি···

কথা বলতে বলতে সুখমতী সামনের পথের দিকে এগোচ্ছিল। শশীপদও কী করবে বুঝতে না পেরে যাচ্ছিল তার সঙ্গে সঙ্গে।

শশীপদ চলতে চলতে বললে—কিন্তু সত্যিই তুমি চলে যাবে?

সুখমতী বললে—আমাকে সত্যিই তুমি বাধা দিও না দাদা। আমার এমনিই কপাল যে আমি যার ঘরে যাবো তারই ঘর জলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। শ্যামনগরেও সেই জন্যে কারো ঘরে উঠিনি, নিজেই নিজের ঘর করে থাকতুম। কিন্তু তাও আমার কপালে সইলো না—

—কিন্তু কোথায় যাবে তার তো একটা ঠিকানা আছে!

সুখমতী বললে—যদি কখনও ঠিকানা একটা হয় তো নিশ্চয় তোমাকে জানাবো।

শশীপদ বললে—দেখ সুখমতী, জীবনে আমার অনেক আশা ছিল। তুমি হয়ত জানো না, ছোটবেলা থেকেই আমি এই সব রকম অন্যায়ের সঙ্গে লড়াই করে আসছি। কোথাও জিতেছি। কোথাও বা হেরেছি, কিন্তু কখনও এমন করে নিরাশ্রয়কে ঘর থেকে তাড়াবার যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়নি।

সুখমতী বললে—যাবে, তুমি কোথায় তাড়ালে দাদা? আমি তো নিজের ইচ্ছেতেই চলে যাচ্ছি। যেমন করে পাকিস্তান ছেড়ে এক কাপড়ে চলে এসেছি। তেমনি করে তোমার কাছ থেকেও চলে যাচ্ছি।

শশীপদ বললে—কিন্তু দুটো চলে যাওয়া কি এক?

সুখমতী বললে—পাকিস্তান থেকে চলে আসার সঙ্গে এই চলে আসার তুলনা করছি বলে কিছু মনে কোরনা দাদা। আমার কাছে আজ সব একাকার হয়ে গেছে বলেই ওই কথা বলছি। আমার কাছে আজ সবাই-ই পর—

শশীপদ বললে—কিন্তু তুমি যদি আমার বাড়িতে থাকতে তো আমি আর একবার না-হয় চেষ্টা করে দেখতুম—

—কী চেষ্টা করতে?

—লক্ষ্মীর সঙ্গে মিটমাট্ করতে।

সুখমতী হাসলো।

বড় মর্মান্তিক সে-হাসি। বললে—আমি আবার একটা মানুষ। আমার জন্যে কিনা তুমি বৌদির সঙ্গে মিটমাট্ করতে যাবে? তাহলে পাপের যে-টুকু বাকি ছিল তাও পূর্ণ হতে আর দেরি হতো না—

শশীপদ বললে—সত্যি বলছি সুখমতী, আমার বড় অহঙ্কার ছিল আমি দেশের লোকের সেবা করি বলে। আজ একমাত্র তুমিই আমার সে অহঙ্কার ভেঙে গুঁড়িয়ে চুরমার করে দিলে—

সুখমতী বললে—ছি, অমন কথা বোল না দাদা, ও-কথা তোমার মুখ থেকে বেরোলে আমি মরেও শান্তি পাব না—

শশীপদ বললে—তাহলে তুমি যা ভালো বোঝ তাই করো, কিন্তু একটা শুধু কথা দাও যে যেখানে তুমি থাকবে সেই ঠিকানাটা আমাকে জানাবে—

সুখমতী বললে—না—

শশীপদ অবাক হয়ে গেল। বললে—জানাবে না?

সুখমতী বললে—তুমি তো জানো না দাদা, যদি আমার আসল পরিচয় জানতে তাহলে আমার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখতে তোমার ঘেন্না হতো—

—তার মানে?

সুখমতী বললে—কথায় আছে মড়ার আবার মরতে ভয়। আমারও হয়েছে তাই। আমি শ্যামনগরে ছিলাম তা তো বুঝতেই পারছো। ওখানে আমার কী পরিচয় ছিল তা জানো?

—তার মানে? তুমি খুলে বলো।

সুখমতী বললে—লোকে আমাকে শ্যামাপদ সরকারের মেয়েমানুষ বলেই জানতো। সে-পরিচয়টা যে গৌরবের নয় সে তো একটা ছোট ছেলেও বুঝতে পারে—

কথাটা শুনে শশীপদ হো-হো করে হাসতে লাগল। সে হাসির কোনও মানে বুঝতে না পেরে সুখমতী শশীপদর মুখের দিকে চেয়ে বললে-ওকি, তুমি হাসছো যে?

[ক্রমশঃ]

সুপর্ণা রায়

ব্রতমন্ত্রে বাঙালীর সামরিক স্মৃতি

প্রাচীন কালের ব্রতমন্ত্রে বাঙালীর মেয়েরা রামের মত স্বামী, লক্ষ্মণের মত দেবর, 'সতা উজ্জ্বল জামাই' আর 'নিত্যানন্দ ভাই' পাবার জন্যই শুধু প্রার্থনা জানায় নি ; যুদ্ধনিরত স্বামী নিরাপদে ঘরে আসুক এই প্রার্থনাও করেছে ঈশ্বরের কাছে। এইসব বিস্মৃত ব্রতকথা প্রমাণ করে বাঙালী একদিন সত্যি-সত্যি সমরকুশল জাতি ছিলো। মনে আছে অশ্বপৃষ্ঠে বাঙালী বীরাঙ্গনার মূর্তি। একদিন তারা দোলায় আসতেন, ঘোড়ায় যেতেন। 'রণে আইয়ো চইও' ব'লে একদিন তাদের আশীর্বাদ করতে হতো। বাঙালীর যুদ্ধযাত্রা একটি সহজ ও সাধারণ ঘটনার মধ্যে ছিলো ব'লেই তার স্মৃতি স্থান পেয়েছে বাঙলার মেয়েদের ব্রতকথায়। যা নারীজীবনের অতি সহজ ও স্বাভাবিক, যা প্রতিদিনের আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী, মেয়েদের ব্রতকথায় শুধু তা-ই স্থান পেয়েছে ; এতে মিথ্যা বা অত্যুক্তির স্থান নেই। বাঙলার ও বাঙালীর প্রকৃত ইতিহাস যিনি রচনা করবেন এই ব্রতকথার খোঁজ তাঁকে অবশ্যই করতে হবে। এ-রকম কয়েকটি ব্রতমন্ত্র উদ্ধৃত করা হলো :

"পাকা পাণ, মর্তমাণ,
আমার স্বামী নারায়ণ
যখন যাবেন রণে,
নিরাপদে ফিরে আসেন যেন ঘরে।"

"রণে রণে এয়ো হবো।
জনে জনে সো হবো।
আকালে লক্ষ্মী হবো
সময়ে পুত্রবতী হবো।"

"রণে এয়ো ব্রত ক'রে যেন হই স্বামীর সো।
[illegible] যেন না পড়ে আমার সো।"

"দোলায় আসি, ঘোড়ায় যাই।
আঁকে বইসা দই ভাত খাই" (পূর্ববঙ্গের মাঘমণ্ডল ব্রতকথা)

"আকালে ভাতস্নি হইও,
সকালে সুতস্নি হইও,
রণে আইয়ো হইও,
জনে সাহতি হইও—" (পূর্ববঙ্গের ধুয়া ব্রতের কথা।)

আমরা আত্মবিস্মৃত জাতি। তাই এই সব ব্রতকথা ও ছড়া আজ বেশির ভাগই লুপ্ত। যা আছে তা উদ্ধার করার উৎসাহও আমাদের নেই। অথচ বাঙালীর শৌর্য-বীর্যের ইতিহাসে এই ব্রতকথাগুলি যে আলোকপাত করে তার গুরুত্ব অসাধারণ। ব্রতকথায় আমরা যে চিত্র পাই, ইতিহাস তা সমর্থন করে।

রঙ্গপুরে 'হরিশ্চন্দ্র পাট' নামে একটি গুপ্ত মাণিকচন্দ্রের বাণী ময়নামতীর গানের সঙ্গে যুক্ত থেকে বঙ্গনারীর অসিধারণ পটুত্বের ইতিবৃত্ত দিচ্ছে। সর্বেশ্বর নগরের রাজকন্যা অঞ্জনা ও পঞ্জনাকে বিয়ে করেছিলেন রাজা গোবিন্দচন্দ্র। পরে তিনি রত্নমালা ও কাঞ্চনমালাকে বিয়ে করেন। কিন্তু এদের বিয়ে করতে গিয়ে রাজাকে যুদ্ধ করতে হয়। রাজা গোবিন্দচন্দ্রের বিয়েতে বাদীর সঙ্গে রণভেরীও বেজেছিলো। এইসব তথ্য পাচ্ছি ভবানী দাস লিখিত 'ময়নামতী' পুঁথি থেকে।

সাময়িক পত্রে বাঙালী নারীর সাহস

প্রতিকূল অবস্থাতেও কোন মহিলা সাহস দেখাইলে তাহা প্রাণে আশা ও উৎসাহের সঞ্চার করে। এইরূপ একটি সাহসের দৃষ্টান্ত কলিকাতার দৈনিক "হিন্দুস্থান" হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"গিরীশচন্দ্র আদক বজবজ থানার এলাকাধীন রাজারামপুরের একজন ধনী গৃহস্থ। গত ১১ই জানুয়ারি সন্ধ্যার কিছু পরে গিরীশবাবুর স্ত্রী তাঁহার ঘরের বারান্দায় বসিয়াছিলেন। ছেলেপিলেরা তাঁহার পাশে খেলিতেছিল। ঐ সময় তিনি কতকগুলি লোককে তাঁহাদের বাড়ীর ভিতরে ঢুকিতে দেখিতে পান। স্বামী গৃহে ছিলেন না, এমন অবস্থায় অপরিচিত লোকদিগকে ঐরূপ সময় বাড়ীতে ঢুকিতে দেখিয়া স্ত্রীলোকের মনে স্বভাবতঃই ভয় হয়। তিনি ছেলেপিলেদিগকে ঘরের ভিতরে দিয়া নিজেও তাহাদের পিছনে ঘরে ঢুকিতে যাইতেছেন ঠিক সেই সময়ই ডাকাতদের মধ্যে একজন ছুটিয়া বারান্দার উপর উঠে এবং দরজা বন্ধ করিতে বাধা দেয়। গিরীশবাবুর পত্নী ঘরে ঢুকিতে চেষ্টা করেন—দুই দিক হইতে প্রবল সংগ্রাম চলিতে থাকে। দরজা বন্ধ হইতেছিলনা ভিতরে মাঝে ফাঁক একটু বেশী হইতেছিল, একজন ডাকাত ঐ ফাঁকের ভিতর দিয়া একটা পটকা ছুঁড়িয়া দেয়; পটকাটি ফাটিয়া গিরীশ-বাবুর পত্নীর গায়ে লাগে। এই ব্যাপারে তাঁহার হাতের জোরে একটু ঢিলা হয়। দরজার ফাঁক আরও বেশী হয়। ঐ সময় একজন ডাকাত দরজার দুইটি পাটের ভিতর দিয়া হাত গলাইয়া দেয়। গিরীশ-বাবুর পত্নী মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিলেন—তিনি দমিয়া না গিয়া দ্বিগুণ জোরে দরজা চাপেন এবং ডাকাতের ৪টি আঙুল সহিতই দরজার খিল আঁটিয়া দেন। অতঃপর ডাকাতেরা তাহাদের সঙ্গীকে ছাড়াইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুতেই সক্ষম হয় না। অবশেষে তাহাদের সঙ্গীর চারিটি আঙুল সেই দরজার সঙ্গে রাখিয়াই তাহাদিগকে প্রাণ লইয়া পলাইতে হয়। পুলিশ ঐ চারিটি আঙুলকে সূত্র স্বরূপে গ্রহণ করিয়া ডাকাতদের খোঁজ করিতে থাকে। খোঁজ হয় যে, রাজারামপুরের নিকটবর্তী কালীপুরের যোগেন্দ্রনাথ দাসের পুত্র বঙ্কিমচন্দ্র দাসের চারটি আঙুলের সম্প্রতি অভাব ঘটিয়াছে।

যোগেন্দ্রবাবু সম্ভ্রান্ত এবং ধনী ব্যক্তি, বঙ্কিম তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। আলীপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বঙ্কিমকে হাজির করা হইয়াছিল। বঙ্কিম তাঁহার কাছে স্বীকারোক্তি করিয়াছে। তাহাকে হাজতে রাখা হইয়াছে।"

নারীর সাহসের দৃষ্টান্ত বাংলা দেশে বিরল নহে। দৃষ্টান্তগুলি যদি কেহ সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাহার দ্বারা নিশ্চয় দেশের উপকার হইবে। যিনি সংগ্রহ করিবেন, তিনি কোন্ ঘটনা কোন্ তারিখের কোন্ সংবাদপত্র হইতে গৃহীত, তাহা যেন সকল স্থলে নির্দ্দেশ করেন। দৃষ্টান্তগুলি সংকলিত ও সুবিন্যস্ত হইলে প্রকাশকের অভাব হইবে না।

প্রবাসী—কার্ত্তিক, ১৩৩২

বাঙালী সৈনিকের চিঠি

যুদ্ধে যোগ দিতে পেরে বাঙ্গালী সৈনিকের মন কী রকম আনন্দিত হয়ে উঠেছিলো তার পরিচয় পাওয়া যাবে নিচের দুখানা চিঠি থেকে :

হাইয়ারস, (ফ্রান্স)
৩ সেপ্টেম্বর, ১৯১৬

প্রিয় বন্ধু মহাশয়,

আপনি নিশ্চয়ই শুনিয়া সুখী হইবেন যে আমরা সত্বরেই সেলোনিকার যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতেছি। বাঙালীই সেখানে প্রথম প্রেরিত হইবে। আমরা সেইরূপ অনুমতিই চাহিয়াছিলাম এবং পাইয়াছি। কিছুদিন হইল প্রস্তাব হইয়াছে যে আমাদের মধ্যে কোন কোন সৈনিককে কর্মচারীর পদে উন্নীত করা হইবে। আপনারা সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করুন যেদিন আমার বন্ধুগণ জয়মাল্যে বিভূষিত হইয়া জয়ডঙ্কা নিনাদ করিতে করিতে আবার মধুময় গৃহে প্রত্যাগমন করিবে। এখন তবে বিদায়। এই পত্র যে দিন আপনার হস্তগত হইবে, আমি হয়ত সেদিন যুদ্ধক্ষেত্রে……

আপনার
শ্রীহরধন বক্সী।
(The Bengalee (Dak) 11th Oct. 1916)

টুলন (ফ্রান্স)
২৮ জুন, ১৯১৭

……আমি আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে আমাদের গৌরবের দিন আসিয়াছে। কল্য প্রত্যুষে ছয়টার সময় আমরা—স্থানে যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিব।……জীবন-মরণ সংগ্রামের সময় আসিয়াছে আমাদের যতদূর সাধ্য যুদ্ধক্ষেত্রে বাঙালীর শক্তির পরিচয় দিব। আমরা দেখাইব যে বাঙালী ভীরু নহে। জার্মানদিগকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবার জন্য আমরা যথাসাধ্য আয়োজন করিতেছি।

কে. মুখার্জ্জি
(The Bengalee (Dak) 8th August, 1917

বন্যাকন্যা

উপন্যাস

অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত

[পূর্বকথা : সরসিজ মজুমদারের মেয়ে বনছায়া। বাপ বড়লোক হওয়া সত্ত্বেও বনছায়া চাকরি করে, গল্প উপন্যাস লেখে। বড় সাহিত্যিক হবার স্বপ্ন দেখে। কখনও বা ভাবে জার্নালিস্ট হই যেহেতু আজকাল সাহিত্যের চেয়ে জার্নালিজমেই বেশি গ্ল্যামার। সম্পাদক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক অনেকের সঙ্গেই দহরম-মহরম করে। সুবীর নামে এক আধুনিক কবিকে ভালোবাসে। যে কিনা বড়লোকের মেয়ে গরিবকে ভালোবাসতে পারে, ভালোবাসতে পারলেও বিয়ে করতে পারে, এমন প্রবাদে বিশ্বাস করে না। বনছায়া যেমন কবিকে ভালোবাসে তেমনি এক ঔপন্যাসিককেও ভালোবাসে। তার নাম সন্দীপ সেন। কিন্তু সুবীর যদি সমুদ্রের মত উত্তাল, সন্দীপ পাহাড়ের মতই ধীরস্থির। সন্দীপও দুঃস্থ কিন্তু আদর্শনিষ্ঠ। দারিদ্র্য যেন তার আদর্শকে ম্লান করতে না পারে সে সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ। সরসিজ মেয়ের জন্যে হিমাংশু বোস নামে এক কৃতী এঞ্জিনিয়র ঠিক করেছে, কিন্তু বনছায়া তাকে বিয়ে করতে রাজি নয়। তাকে রক্ষা করতে কে এগিয়ে আসবে? সন্দীপ না সুবীর? না, বনছায়া শেষ পর্যন্ত হিমাংশুকে বরণ করবে? হিমাংশুর বন্ধু আর মুরুব্বি দেবজ্যোতি ভৌমিক, যে অফিসে বনছায়ার বস্, তার দৃষ্টিও না কোন বনছায়ার দিকে। বনছায়া প্রেমের জন্যে কেরিয়র মাটি করবে, না কেরিয়রের জন্যে প্রেম?

অতঃপর সরসিজের বাড়িতে টি-পার্টিতে নিমন্ত্রিত হল হিমাংশু। বনছায়াকে পাত্রী হিসাবে মনোনীত করল। তার কার্মে অনেক চাকরি আছে—বনছায়া চাইল সুবীরকে সুপারিশ করতে। সে সুপারিশ গ্রহণ করল হিমাংশু, সুবীরকে চাকরি দিল। সুবীর ভাবতেই পারেনি এমন অঘটন ঘটতে পারে। আর সুবীরের চাকরি হবার পর তার সঙ্গে বিয়ের নোটিশ দিল বনছায়া। এ ব্যাপারে হিমাংশু অন্ধকারে। হিমাংশুর সঙ্গে বিয়ের তারিখটা পিছিয়ে দিতে পারলেই নোটিশের মেয়াদ অন্তে সুবীরের সঙ্গে বিয়েটা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হতে পারে। সেই মতলবে হিমাংশুর কাছ থেকে মিথ্যা ওজুহাতে বিয়ের তারিখটা পিছিয়ে নিল বনছায়া। সরসিজবাবু জানলেন হিমাংশুর নিজের সুবিধের জন্যেই তারিখটা লম্বা করছে। এখন বনছায়ার ভয় তার আগেই সুবীরের সঙ্গে তার বিয়ের রেজিস্টটা পাকা করতে পারবে কিনা।

সুবীরের সঙ্গে বনছায়ার বিয়ে নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হল। কিন্তু প্রথম মিলনক্ষণেই মনে হল যেমনটি চেয়েছিল তার চেয়ে কিছু কম পড়ল। আরো কম পড়ল যখন সরসিজবাবু এ ব্যাপারে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেলেন। বনছায়া বুঝল পিতৃগৃহ ত্যাগ না করলে বাবা শান্ত হবেন না। একটা সুটকেস আর বিছানা নিয়ে বনছায়া বাপের বাড়ি ছেড়ে সুবীরের ঘরে গিয়ে উঠল।

যাবার আগে ছোটবৌদি শাশুড়ীর সিঁদুর-কৌটা থেকে সিঁদুর নিয়ে সিঁথিতে ঘন করে রেখা টানল—জগজ্জনকে জানাবার জন্যে যে সে জয়ী, সে সুখী।

সুবীরের কবি-বন্ধুরা ঠিক করল এ বিয়ে-উপলক্ষে সম্পাদক পীযূষ দত্তের বাড়ির ছাদে একটা পার্টি হবে। স্বামীর ঘরে নির্জনে বসে বনছায়া যখন সাজছে তখন দরজায় হিমাংশুর টোকা পড়ল। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল বনছায়া, দরজা খোলে কি না খোলে কিন্তু স্পষ্ট করে কিছু স্থির করবার আগেই দরজা খুলে দিল।

হিমাংশু ঘরে ঢুকে দেখল এক-ঘরের ফ্ল্যাটে লব্ধিতা মেয়েটা সুখে সৌভাগ্যে একেশ্বরীর মত বিরাজ করছে। ভাবছে তার এই অহঙ্কারটা চূর্ণ করা যায় কী করে? সে গেল বনছায়ার বর দেবজ্যোতি ভৌমিকের কাছে নালিশ করতে। দেবজ্যোতি বললে, সুবীরকে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিন। আর হিমাংশু বললে, বনছায়ার কাপটোরও শাসন হওয়া উচিত। দেবজ্যোতি সায় দিল। বললে, দেখি, ভাবি, কী করা যায়।

আসলে দেবজ্যোতি বনছায়ার মাইনে পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দিল। বনছায়া যে প্রেমের মুখে জয়ী হয়েছে, কৃতী ও বড়লোক বলে হিমাংশুতে আকৃষ্ট হয়নি, এ যেন তারই পুরস্কার। কিন্তু সুবীরের মুখে এ মাইনে-বাড়ার খবর পেয়ে হিমাংশু ক্রুদ্ধ হল। সুবীর ভেবে পেল না এ প্রতিক্রিয়ার অর্থ কী।

হিমাংশু নানা প্রশ্নে জেনে নিল একটা ছোট ঘরে সুবীর আর বনছায়া কেমন সুখে দিন কাটাচ্ছে। সঙ্গে সাহিত্যে তাদের সন্ধ্যাগুলি কী রমণীয়। স্বামীর মাইনে কম স্ত্রীর মাইনে বেশি এ তাদের কাছে কোনো সমস্যা নয়। হিমাংশু চাইল তাদের মধ্যে বিরোধের ছুরি চালাতে। শত্রুতাতেই এখন তার শান্তি। আর শত্রুতার মহত্ত্ব সূক্ষ্মতম কারুকার্যে —অশ্বত্থামা হত ইতি গজে।

হিমাংশু সুবীরের জন্যে অফিসে ওভারটাইমের ব্যবস্থা করলে। টাকা রোজগার বেশি হবে বুঝে সুবীর তাতে আনন্দিত হল। আর এদিকে বনছায়ার সন্ধ্যাগুলি নিঃসঙ্গ হয়ে উঠল। হিমাংশুই তার রঙিন মদির সুন্দর সন্ধ্যাগুলি নিল হরণ করে। আবার দেবজ্যোতি বনছায়ার জন্যে একটা বাড়ি দেখে দিল বলে হিমাংশুও সুধীরের জন্যে আরেকটা দেখে দিল। সেটা তুলনায় খারাপ হলেও সুবীর দাবি করল সেটাই তার কোয়ার্টার, সেখানেই বনছায়াকে যেতে হবে। সুবীর যেমন তার বস্-এর হুকুম মানে, বনছায়ারও তেমনি সুবীরের কথা মানা উচিত।

বনছায়া সুবীরের কথা মেনে সুবীরের মনোনীত বাড়িতেই সংসার পাতল। সুবীরের অফিস থেকে অভিরামকে পাঠানো হল কাজ করার জন্য। কিন্তু নিঃসঙ্গতার নির্যাতন থেকে রেহাই পেল না বনছায়া। ভাবল কোথাও গিয়ে হৃদয় জুড়াই। সন্দীপের কথা মনে পড়ল। সন্দীপের কাছে গিয়ে বসল বনছায়া। সে উপন্যাস রচনায় রত। মনে হল বনছায়ার উপস্থিতি থেকেও সাহিত্যই বুঝি তার প্রিয়তর—তাতে না থাক টাকা না থাক নাম-যশ। বনছায়ার যে বিয়ে হয়ে গেছে এতেও যেন তার ভালোবাসার কোনো ক্ষতি নেই। বাড়ি ফিরে এসে দেখল সুবীর লিখছে। কিন্তু কবিতা নয়, অফিসের রিপোর্টের বাংলা

অনুবাদ। তারপর থেকে রোজ সন্ধ্যায়ই বনছায়া বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় একা একা। ওভারটাইম করে সুবীর কতক্ষণে ফিরবে তার প্রতীক্ষা করে না।

বনছায়াকে বাইরে বেরুনো থেকে নিরস্ত করবার অভিসন্ধিতে সুবীর তার সঙ্গ নিতে চাইল, নিতে চাইল হিমাংশুর বাড়ি। বনছায়া গেল না। একদিন হিমাংশুই সুবীরের ফ্ল্যাটে এসে হাজির। বনছায়া ঘরে নেই, সুবীর গেল চা দিতে। হিমাংশু নিল না, বললে বনছায়া নিজে যেদিন চা করে দেবে সেদিন খাবে। বনছায়া ফিরে এলে সুবীর তাকে শাসন করতে চাইল আর বনছায়ার মধ্যে ভর ঢুকল একা বাড়িতে হিমাংশুই যা একদিন আক্রমণে উদ্যত হয়ে আবির্ভূত হয়। তাই কদিন পর সুবীর যখন বনছায়াকে ঘুমের মধ্যে আবদ্ধ করতে চাইল তখন দুঃস্বপ্নের মধ্য থেকে ভুল করে বনছায়া চেঁচিয়ে উঠল এ কী অন্যায়। ছি ছি ছাড়ুন ছাড়ুন—

অফিসের পার্টিতে বস-এর পাল্লায় পড়ে সুবীর মদ খেল। সেই থেকে সে নেশা তাকে পেয়ে বসল। বনছায়াকেও সে শেখাল মদ খেতে। একটা কুৎসিত সন্দেহ থেকে মুক্ত হবার জন্যেই বনছায়া স্বামীর প্রস্তাবে সম্মত হল। কিন্তু সুবীর আর নিজের সঙ্গ পালন করল না। বিরোধ ঘুমায়িত হল।

তারপর বিরোধের মধ্যে বনছায়া আবিষ্কার করল সে মা হতে চলেছে। তার পেটে সুবীরের সন্তান।

বনছায়া অনুভব করল এ সন্তান আনন্দের অভিজ্ঞান নয়, শুধু মাতলামির পরিণতি। পরাভবের অপমানের প্রতীক। বনছায়া ডাক্তার অরবিন্দের কাছে গেল, পেটের সন্তানকে নষ্ট করবে। অরবিন্দ যখন জানল এ সন্তান বৈধ, তখন প্রস্তাবে রাজি হল না। তখন কুমারী সেজে সন্তানকে অবৈধ বলে বুঝিয়ে বনছায়া গেল আরেক ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার কমলেশ তার কি বাবদ এমন এক জিনিস দাবি করল যাতে সে রাজি হতে পারল না।

সেবারের পার্টিতে হিমাংশু বেশি করে মদ খাইয়ে সুবীরকে মাতাল করে দিল। বাড়িতে পৌঁছে দেবার জন্যে গাড়ি ও তাতে একটি নারীর ব্যবস্থা করলে। নারীর নাম সাবণি, তাকে বলে দিল যেন সুবীরকে একেবারে তার স্ত্রীর কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। যাতে বনছায়া বুঝতে পারে সুবীর কতদূর নেমে গিয়েছে। যখন সুবীর বাড়ি ফেরে, দেখতে পায় সন্দীপ সেন এসেছে আর বনছায়া তাকে তার উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পড়ে শোনাচ্ছে। নিজে ধরা পড়ে যাবার ভয়ে চটে গিয়ে সুবীর সন্দীপের উপর প্রতিশোধ নেয়, তাকে গালাগাল দিয়ে তাড়িয়ে দেয় বাড়ি থেকে।

সুবীর বনছায়ার কাছে দুঃখ প্রকাশ করে বিরোধ মিটিয়ে নিল। সন্দীপের কাছে ক্ষমা চাইতে রাজি হল, বললে, তাকে একদিন বাড়িতে ডেকে নিয়ে এস। বনছায়াকে অনুরোধ করল হিমাংশুকে ধরে তাকে বম্বেতে উচ্চতর পদে বদলি করিয়ে দিতে। বনছায়া রাজি হল না। অথচ সন্দীপকে নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে তার আলিঙ্গনে ধরা দিল।

সন্দীপের অন্তরলোকে ভয় ঢুকল—শিল্পীর পক্ষে এমন কোনো আকর্ষণে লিপ্ত হওয়া

উচিত নয় যাতে তার সৃষ্টির শান্তি নষ্ট হতে পারে। কিন্তু কার্যতঃ সে উদাসীন থাকতে পারল না। বনছায়ার বাড়ি গেল তার উপন্যাসের বাকি অংশ শুনে আসতে। ঈর্ষায় দগ্ধ হয়ে সুবীর সে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল আর সেই টুকরোগুলি কুড়িয়ে নিয়ে চলে গেল সন্দীপ।

ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঘরের বাঁটোয়ারা হয়ে গেল—এক ঘরে সুবীর, অন্য ঘরে বনছায়া। সুবীর তার ঘরে একটা ক্লাব বসাল যাতে বনছায়ার সাহিত্য-সাধনা বিপর্যস্ত হয়ে যায়। লেখার জন্যে নিরিবিলি জায়গা খুঁজতে বনছায়া সন্দীপেরই দ্বারস্থ হল। সেখল সন্দীপ সযত্নে তার পাণ্ডুলিপির ছেঁড়া টুকরোগুলি একটা খাতার পৃষ্ঠায় সেঁটে সেঁটে উপন্যাসের পুনরুদ্ধার ঘটিয়েছে। বনছায়া ঠিক করল সন্দীপের বাড়িতে বসে বইটার একটা নকল তৈরি করবে।

সন্দীপের বাড়ীতে বসে উপন্যাস নকল করল বনছায়া। প্রবাহের সম্পাদক পীযুষ দত্তের সঙ্গে হোটেলে দেখা করবে বলে টেলিফোনে নিমন্ত্রণ করে পাঠাল। তুমি মদ খাবে? জিজ্ঞেস করল পীযুষ। বনছায়া বললে, আমি খেতে শিখে গিয়েছি।

বনছায়া পীযুষের সঙ্গে হোটেলে মদ খেল, এক ট্যাক্সিতে বেড়াল। তার উপন্যাস 'অবগুণ্ঠনা' 'প্রবাহ' পত্রিকার জন্যে মনোনীত হল। তারপর মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরলে সুবীর গর্জে উঠল: তুমি মদ খেয়েছ? বনছায়া বললে, তুমিই তো শিখিয়েছ মদ খেতে।

বনছায়া উপন্যাসের প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হতেই পাঠকমহলে সাড়া পড়ল। কিন্তু সুবীর খুশি হতে পারল না। জানতে চাইল কোথায় বসে সে নতুন করে লিখেছে এবং কী উপায়ে বাগিয়েছে পীযুষ দত্তকে। বনছায়া বললে, অফিসে বসেই লিখেছে, আর যেহেতু পীযুষ দত্তের রুচি কিছু মোটা, তদবিরটা সে মোটা করেই করেছে। রাগে 'প্রবাহে'র কপি ছিঁড়ে ফেলল সুবীর আর তার অক্ষম ঈর্ষাকে ব্যঙ্গ করল বনছায়া। লেখাটা পড়ে হিমাংশু খুব উত্তেজিত হল। সুবীরকে ডাকিয়ে বলল, এ অশ্লীল লেখা বন্ধ করে দিন। শেষকালে আপনার নামের সঙ্গে জড়িয়ে আমার কার্যের না বদনাম হয়।

অফিসে বনছায়া অসুস্থ হয়ে পড়লে দেবজ্যোতি তাকে নিউডন নার্সিং হোমে পাঠিয়ে দিলে, দেবজ্যোতি বনছায়ার বাপের বাড়িতে খবর দিলে, খবর দিলে হিমাংশুকে। হিমাংশু সুবীরকে খবর দিল। সুবীর উদাসীন রইল। তার বিদ্বেষের কারণ পীযুষ দত্তের কাছে গিয়েছিল 'অবগুণ্ঠনা'র প্রকাশ বন্ধ করে দিতে আর পীযুষ তাতে রাজি হয়নি যেহেতু বনছায়ার মতে স্বামী ও সংসারের চেয়েও তার আর্ট বড়। এই নিয়ে সুবীরের সঙ্গে বনছায়ার আবার ঝগড়া হয় আর সুবীর তাকে তার আর্টের গুরু সন্দীপ সেনের কাছে চলে যেতে বলে। নার্সিং হোমে গিয়ে হিমাংশু শোনে বনছায়ার অপারেশন হয়েছে কিন্তু গর্ভের সন্তান বেঁচে নেই।

নার্সিং হোমে অপারেশনের আগে ডাক্তারকে বনছায়া অনুরোধ করল যেন তাকে আর সন্তানধারণ করতে না হয়। ডাক্তার সেই রকম ছুরি চালাল। নার্সিং হোমে যতদিন ছিল বনছায়ার কোন খোঁজ নেয়নি সুবীর। সন্দীপই সব দেখাশোনা করেছে। তারপর যখন ছুটি পেল বনছায়া সন্দীপের সঙ্গে সন্দীপের বাড়িতে গিয়েই উঠল।

বনছায়া সন্দীপ সেনের বাড়িতে গিয়ে উঠেছে এ খবর পেয়ে হিমাংশু দারুণ ক্রুদ্ধ হল। প্রতিশোধ নেবার জন্যে সুবীরকে উত্তেজিত করতে লাগল। বললে আপাতত ডিভোর্সের মামলা করতে। ওদিকে লাবণি সুবীরের প্রতি প্রেমমুগ্ধ হল, চাইল গৃহিণী হতে। সেই স্বার্থেও তো বনছায়ার সঙ্গে বিবাহের বিচ্ছেদ দরকার। সুবীর গেল উকিলের পরামর্শ নিতে।

সুবীর বিচ্ছেদেরই মামলা করবে ঠিক হল। হিমাংশু অভিরামকে ডাকল সেই মামলায় বনছায়ার বিরুদ্ধে ব্যভিচারের সাক্ষী হতে। অভিরাম রাজি হল না। মামলার কথা সন্দীপ বনছায়াকে জানাল। এ মামলায় সুবীর ডিক্রি পেলেই তো সন্দীপের সঙ্গে বনছায়ার মিলন সুগম হবে। কিন্তু বনছায়া বললে, মামলা সে কনটেস্ট করবে।

সুবীরের মামলায় অভিরাম সাক্ষ্য দিতে রাজি হল না বলে অভিরামের চাকরি গেল। অভিরাম বনছায়ার কাছে কেঁদে পড়ল, বনছায়া যদি বোস সাহেবকে তার জন্যে একটু সুপারিশ করে ত তার চাকরিটা সে আবার পায়। বনছায়া হিমাংশুকে ফোন করল। বনছায়ার অনুরোধ হিমাংশু অভিরামকে ফের চাকরি দিতে রাজি হল। হিমাংশু ভেবেছিল ধন্যবাদ জানিয়ে বনছায়া বুঝি আবার খোঁজ করবে, কিংবা জানাবে তার বর্তমান সমস্যার কথা। বনছায়া স্তব্ধ হয়ে রইল—একা ঘরে বসল মদ খেতে। আর তাই দেখে সন্দীপ তার কাছে বসল না, চলে গেল উপরে।

লাবণিকে হিমাংশু প্ররোচিত করল সুবীরকে দিয়ে ডিভোর্সের মামলা করতে। এদিকে ঠিক করল বনছায়ার বই 'অবন্ধনা' সে ফিল্ম করবে। ডিরেক্টর সমীর সাহাকে পাঠাল চুক্তি করতে। ঠিক হল বনছায়ার সঙ্গে পরামর্শ করে সিনারিয়ো লিখতে হবে। পরামর্শ করবে কে? পরামর্শ করবে প্রডিউসার হিমাংশু বোস।

লাবণি সুবীরকে ডিভোর্সের মামলা করাতে রাজি করাল। এ খবর পেয়ে হিমাংশু লাবণির উপর খুব খুশি। ঠিক হল 'অবন্ধনা' ফিল্মে লাবণিকে দ্বিতীয় নায়িকার পার্ট দেওয়া হবে। আরও সুসংবাদ, বনছায়া সিনেমার সিনারিয়ো লেখায় কোনো হস্তক্ষেপ করবে না —তারও চেয়ে বেশি, কোনো আলোচনায়ই বোস দেবে না। হিমাংশু দেখল বনছায়ার অহঙ্কার এখনো যায়নি।

কিন্তু আসল যে বিবাহবিচ্ছেদ তাতে কোনো পক্ষই আদালতে যাচ্ছেনা। এ গেলে ওর সুবিধে, ও গেলে এর সুবিধে—এই মনোভাবেই দু পক্ষ নিষ্ক্রিয় থাকছে। তখন সন্দীপ পথ বাতলাল, মামলার হাঙ্গামায় না গিয়ে ডিভোর্স বাই মিউচুয়াল কনসেন্টে করা যাক। আদালতে সংযুক্ত দরখাস্ত করেই বিবাহবিচ্ছেদ।

এদিকে খবর এল 'অবন্ধনা' ফিল্ম আর হবে না। অথচ তার দ্বিতীয়া নায়িকা রূপে নির্বাচিতা লাবণি বনছায়ার ফ্ল্যাটে এসে হাজির হল। তার কাছে নতুন খবর।]

আটত্রিশ

সমীর সাহা টাকা ফেরত নিতে রাজি নয়। তার সহজ যুক্তি, টাকা যখন তার নয় তখন সে তা ফেরত নিতে পারে না। টাকা কোম্পানির, প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের, অর্থাৎ হিমাংশু বোসের, সুতরাং ফেরত দিতে হলে তাকে দিন।

'তাকে আমি চিনি না। আমি আপনার কাছ থেকে পেয়েছি, আমি আপনাকে দেব। আর আপনি আমার দেয়া সেই রসিদটা ফেরত দেবেন।'

'রসিদ—সে কোথায় আছে কে জানে?'

'বেশ, আপনি তবে নতুন রসিদ দেবেন। এখন কবে আসছেন বলুন?'

ছোট্ট একটা উত্তর পেয়েই রিসিভারটা নামিয়ে রাখবে এমনি উদ্যোগ করছিল বনছায়া, সমীরের গলার অন্যরকম সুর পেয়ে দাঁড়াল উৎকর্ণ হয়ে।

'শুনুন, আপনি এক কাজ করুন।'

'কী কাজ?'

'আপনি বরং মিস্টার বোসকে ফোন করুন।'

তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল বনছায়া: 'আমি ফোন করতে যাব কেন?'

'টাকাটা তাঁর, সেইজন্যে। তাঁর কাছেই জেনে নেওয়া ভালো টাকাটা কী ভাবে শোধ হবে? তাঁকেই সরাসরি দেবেন, না, আমার মারফত দিলেও চলবে?'

'আপনিই জেনে নিয়ে জানাবেন আমাকে।' ক্রুদ্ধ শব্দে রিসিভার রেখে দিল বনছায়া। বয়ে গেছে সরাসরি ফেরত দিতে। এর মধ্যে মিস্টার বোস আসেন কী করে? তারপর, আত্মরক্ষার আইনের কথাটাও ভাবল একবার বনছায়া। আইনে টাকা ফেরত দেবার তার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। সে যে ফেরত দিতে চেয়েছিল সেটা নিতান্তই ন্যায়বোধে। সেখানে টাকার প্রাপক সমীর সাহা ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।

'আমি সমীর সাহা।' দুদিন পরে আবার ফোন করল সমীর।

'হ্যাঁ, কী দরকার?' বনছায়া অন্যমনস্কের মত বললে।

'সেই টাকার কথাটা জানাতে বলেছিলেন—আমি মিস্টার বোসকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—'

'ও, হ্যাঁ, তিনি কী বললেন?'

'বললেন ও আপনার কাছে থাক।'

'মানে?'

'বললেন যা একবার দিয়েছি তা আর ফেরত নিতে পারব না।'

'তবে—' অসহিষ্ণু হয়ে আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল বনছায়া কিন্তু ওপারে সমীর সাহা ছেড়ে দিয়েছে।

নিজেকে কেমন অপমানিত ও অশুচি বলে মনে হচ্ছিল বনছায়ার কিন্তু প্রতিকার কী কিছু ভেবে পেল না। কোনো সেবা বা শিশু-প্রতিষ্ঠানে টাকাটা দান করে দিলে কেমন হয়? মনে হল যেন দানের জলেও এ কলঙ্ক ধুয়ে যাবে না। উদাসীন হয়ে থাকাও কঠিন। অফিসে সারা দিন ঘোর-অস্বস্তিতে কেটেছে, এখন বাড়িতে ফিরে এ আবার আরেক সংকট।

লাবণি বিস্তৃত হয়ে বসল, অম্বরজের মত বললে, 'আপনি আমাকে চিনবেন—আমি এক রাত্রে আপনার অসুস্থ স্বামীকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলাম।'

'সে আবার কে?'

'আমি সুবীরবাবুর কথা বলছি।' তারপর চটুল অভিনেত্রীর মত সুস্থ একটু হাসল লাবণি। বললে, 'যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের বিয়েটা আইনত না ভেঙে যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সুবীরবাবু আপনার স্বামী—অন্তত কাগজে-কলমে—কী বলুন, তাই তো?'

'কিন্তু আপনাকে তো কই দেখিনি।'

'দেখবেন কী করে? সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যাচ্ছি আপনার চাকর দরজা বন্ধ করে দিলে। যিনি পৌঁছবার তিনি পৌঁছে গেলেন আর আমি যে পৌঁছিয়ে দিলাম, আমাকে কেউ একটু কৃতজ্ঞতা জানাল না।' নালিশের পাত্রী যেন বনছায়া স্বয়ং, এমনি ভাবে বললে লাবণি।

'আপনি বুঝি ফিল্ম-র‍্যাকট্রেস?'

সরলতায় ছবি ফুটিয়ে লাবণি হাসল। বললে, 'এখনো হইনি, তবে এবার হব। আর সেটা আপনার বইয়ে।'

'আমার বই মানে?'

'আপনার 'অবন্ধনা'র—যেটা হিমাংশু বোস এণ্ড কোম্পানি কিনেছে।'

'কিনেছে?' নিশ্চিন্ত মুখে হাসল বনছায়া: 'আপনি কোনো খবর রাখেন না।'

'আমি সমস্ত খবর রাখি।' জরীর মত ভঙ্গি করল লাবণি: 'শুধু বাইরের খবর নয়, ভিতরের খবর।'

'ভিতরের খবর!' সে আবার কী, বিরক্ত হল বনছায়া।

'হাঁ, জানি, সামান্য একটা টাকা আপনাকে এডভান্স করেছে—সেটা কিছু নয়—আস্ত পুরো টাকা পরে আসবে।'

'পরে আসবে!' বনছায়ার হাসিতে শব্দ ফুটল: 'আপনি কিছু জানেন না।'

'আমি সমস্ত জানি। আদ্যন্ত জানি।' আরো যেন গাঁট হয়ে বসল লাবণি।

বনছায়ার মনে হল লাবণির এ ভঙ্গিটা যেন বলছে বনছায়া তার প্রতি আতিথেয়তার একটু প্রসারিত হোক। অন্য কোনো পানীয়ে না হোক অন্তত চা-য়ে। কিন্তু বনছায়া কিছুতেই ভুলতে পারছেনা লাবণি তার পক্ষপক্ষের লোক, সুবীরের সহচরী। কিন্তু এখন যে দেখছি সে অন্য দিকের কথা কইছে—'অবন্ধনা'-র কথা। তার আসল বক্তব্য কী আন্দাজ করতে পারছে না বলেই বনছায়া স্বাভাবিক হতে পারছে না। কথাটাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে তাই বনছায়া জিজ্ঞেস করলে, 'কত আসবে?'

'আপনি যা চাইবেন তাই। বিশ্বাস করুন আমি বাড়িয়ে বলছি না।' গভীর চোখে তাকাল লাবণি।

'কিন্তু এদিকে ডিরেক্টর সমীর সাহা যিনি চুক্তি করতে এসেছিলেন, খবর দিলেন যে প্রডিউসার ও-বই ড্রপ করেছেন।'

'ড্রপ করেছেন মানে?'

'মানে, ঠিক করেছেন ও-বই নেবেন না।'

'নেবেন না!' লাবণি চোখ বিস্ফারিত করল: 'আপনার বই নেবেন না? পাগলে বললেও কেউ

বিশ্বাস করবে না। উনি সমীর সাহাকেই ড্রপ করেছেন। তার বদলে নিয়েছেন অখিল গাঙ্গুলিকে। অখিল গাঙ্গুলি নম্বর ওয়ান ডিরেক্টর। তার হাতের বই কখনো ফ্লপ হয়নি।'

'বলেন কী। এদিকে সমীরবাবু যে হাজার টাকা এডভান্স করেছিলেন তা ফেরত দিতে বলেছেন।' অলক্ষ্যে বনছায়া ঢোঁক গিলল।

'ফেরত দিতে বলেছেন? কাকে ফেরত দিতে বলেছেন?'

'বলেছেন প্রডিউসরের টাকা, প্রডিউসারকেই ফেরত দেওয়া উচিত।'

'আপনি হিমাংশু বোসকে টাকা ফেরত দেবেন! এক হাজার টাকা! আপনি ক' হাজার চান?'

'শুধু আমি চাইলেই হবে কেন?'

'হবে। আপনি জানেন না উনি আপনাকে কত দিতে পারেন।'

বনছায়ার কেমন অস্বস্তি লাগল। সতর্ক কণ্ঠে বললে, 'কত আর দেবেন। যা ন্যায্য, যা আমার পক্ষে ম্যাক্সিমাম—'

'আপনি জানেন না আপনার সে ম্যাক্সিমাম কত।' লাবণি প্রায় উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে।

'আপনি জানেন?' বনছায়ার স্বরে একটু বুঝি বিরক্তির রেখা ফুটল।

'পুরোপুরি জানিনা, কিন্তু আন্দাজে বুঝতে পারি। দেখুন আমি এ বইয়ে একটা পার্ট পেয়েছি—আপনার দ্বিতীয় নায়িকা তপতীর পার্ট, তাই আমার বিশেষ ইন্টারেস্ট যাতে আপনাদের এ কন্ট্রাক্টটা হয়।' লাবণি একটু নড়ে-চড়ে বসল: 'আপনি টাকার জন্যে, তার সংখ্যার জন্যে ভাববেন না।'

'তার জন্যে মোটেও ভাবছি না কনট্র্যাক্ট কই?'

'যদি বলেন তো মিস্টার বোস টাকা আর কনট্র্যাক্ট নিয়ে নিজেই আসবেন একদিন।'

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল বনছায়া। বললে, 'তাঁর নিজের আসবার দরকার কী। তাঁর ডিরেক্টর অখিল গাঙ্গুলিকেই পাঠাতে পারেন, কিংবা আপনি—' সূক্ষ্ম একটু হাসল বনছায়া: দেখা যাচ্ছে আপনি তো তাঁরই লোক—আপনাকে—'

'হ্যাঁ, আমাকেও পাঠাতে পারেন।' মুখের কথা লুফে নিয়ে বললে লাবণি।

'সে কবে?' বনছায়া হাসি-হাসি মুখ করল।

লাবণি ত্বরিত উত্তর দিল না, খানিকক্ষণ চুপ করে রইল।

কী সন্দেহ করে বনছায়া গায়ে ঠেলা দেবার মত করে জিজ্ঞেস করলে, 'না কি আজই পাঠিয়ে দিয়েছেন?'

'না। ওঁর কন্ট্রাক্ট পরে আসবে।'

'তাইতো জিজ্ঞেস করছিলাম, সে কবে?'

লাবণি গম্ভীরমুখে বললে, 'আপনার ডিভোর্সের পরে।'

'আমার ডিভোর্সের পরে মানে?' সহসা জ্বলে উঠল বনছায়া: 'আমার বইয়ের কিন্স-কনট্র্যাক্টের সঙ্গে আমার ডিভোর্সের সম্পর্ক কী?'

'আছে কিছু সম্পর্ক। আমি বলছি বুঝিয়ে। আপনি উত্তেজিত হবেন না। আপনি বরং হাত-মুখ ধুয়ে ঠাণ্ডা হয়ে আসুন।'

'তার দরকার নেই। বলুন কী বলতে চান।'

'মানে, আপনার স্বামী সুবীরবাবু মিস্টার বোসের অধীনে একজন মানী অফিসর, চালে ক্যাশ-এসিস্টাণ্ট —তারই স্ত্রীর সঙ্গে কনট্র্যাক্ট হচ্ছে—'

'আমি তার সঙ্গে থাকি না।'

চারদিকে একবার তাকাল লাবণি। বললে, 'তাতো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু একসঙ্গে না থাকলেও আপনি এখনো তার স্ত্রী। আপনাদের দুজনের যে মুখ-দেখাদেখি-নেই ঝগড়া তা তো মিস্টার বোসের অফিসিয়্যালি জানবার কথা নয়। তাই এক্ষেত্রে স্বভাবতই, স্বামী যখন বস্-এর এসিস্টাণ্ট তখন স্বামীর খু-তেই স্ত্রীর কাছে পৌঁছনো উচিত—'

'না। খবরদার। ওর খু দিয়ে এলে আমি নেই।' বনছায়া উঠে দাঁড়াল।

'সেখানে তো সুবীরও নেই। ওকে কিছু বলতে গেলে ও বাধা দেবে, বারণ করবে।' লাবণি চঞ্চল হল না, স্থিরস্বরে বললে, 'ওর বাধা-বারণ না মেনে কিছু করতে গেলে ও অসন্তুষ্ট হবে। অফিস-মাস্টার কি নিজের এসিস্টাণ্টকে অসন্তুষ্ট করতে চায়?'

'ও কে? আমার বই, আমি লেখিকা, চুক্তি হবে আমার সঙ্গে। সেখানে তৃতীয় ব্যক্তির কিসের মাথাব্যথা?'

'কথাটা তো তাই। স্বামীকে অগ্রাহ্য করে স্ত্রীর সঙ্গে গোপনে চুক্তি করতে গেলে স্বামী আবার কিছু না সন্দেহ করে। বস-এর সঙ্গে—'

'ঘরে গেল!' বনছায়া দাঁড়াল স্থির হয়ে: 'আমি নিজের ব্যক্তিত্বে নিজের পৃথক সত্তায় চুক্তি করছি।'

'এই পৃথক সত্তাটা পেতে হলে ডিভোর্স দরকার।' মানে,' তাড়াতাড়ি কথাটা মোলায়েম করবার চেষ্টা করল লাবণি: 'মানে সুবীরের বস-এর পক্ষে কনট্র্যাক্ট করা তখন সহজ হয়।'

'দরকার নেই আমার কনট্র্যাক্টে।' দরজার পাশে সরে গেল বনছায়া। বললে, 'আপনি এবার আসুন।'

'আপনি মিছিমিছি চটছেন।' লাবণি মিটিমিটি হাসতে লাগল।

'চটছি মানে? কবে ডিভোর্স হবে তারপরে কনট্র্যাক্ট—এমনি আজগুবি অবস্থা কেউ সহ্য করতে পারে নাকি? বলেছি তো আমার দরকার নেই।'

'আহাহা, ডিভোর্স হওয়া মানে সমূহ একটা মামলা ফাইল করা।' লাবণি শান্ত গলায় বললে, 'মামলা ফাইল করার সঙ্গে-সঙ্গেই আর ডিক্রি হয় না, সময় লাগে। তবে চোখের সামনে একটা মামলা পেলে মিস্টার বোসের পক্ষে সুবিধে হয়, আপনাকে পৃথক বলে উনি ট্রিট করতে পারেন, তাঁর আর ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে হয় না—আর বিচ্ছেদ হয়ে গেলে তো কথাই নেই, আপনার-আমার সকলের সুবিধে।'

'তা হলে মামলা একটা নিতান্তই ফাইল করা দরকার?' কুটিল চোখে তাকাল বনছায়া: 'কিন্তু মামলা যদি ফাইল না হয়?'

'না, না, মামলা ফাইল হবে বৈকি। আপনি না করেন, সুবীর করবে।'

'তবে ও ই করুক।'

'হ্যাঁ, করতেই হবে। আমার শরীরের যে অবস্থা সুবীরের আমাকে বিয়ে না করলেই নয়।' মুখ-চোখ করুণ করল লাবণি: 'আপনি আমার মত বোকা নন, ভাড়াটে সেজে এক বাড়িতে থেকেও দিব্যি ক্রি আছেন। তাই না? কিন্তু আমার মত ফাঁদে পড়তেন আপনাকেও বিচ্ছেদের জন্যে বেরুতে হত। এখন দেখুন তো এই কনট্র্যাক্টটা—' হাত-ব্যাগ থেকে একটা টাইপকরা কাগজ বের করল লাবণি: 'পড়ুন, পড়ে সই করে দিন। এ কনট্র্যাক্টটা সই করে দিলেই ফিল্মের কনট্র্যাক্টটা এসে যাবে।'

কাগজটা হাতে নিল বনছায়া। এক নজর তাকিয়েই বুঝল সেই ডিভোর্স বাই মিউচ্যুয়াল কনসেন্টের দরখাস্তের মুসাবিদা। সুবীরের পক্ষের উকিলের তৈরি। সন্দীপ সেদিন যেটা দেখিয়েছিল তারই অনুরূপ। শুধু বিবরণে বিস্তৃত।

লাবণি উস্কে দিল : 'এমনিতে মামলা করতে গেলে দেরি হবার সম্ভাবনা। এই জয়েন্ট পিটিশনই দ্রুত ও সহজ সমাধান। তাই না ?'

'কিন্তু একলা আমার সই করলে হবে ?' বনছায়া রুখে উঠল।

'আপনি সই করে দিলে আমি সুবীরকে দেখাব। সুবীর তো আপনার সই চেনে, ও স্যাটিসফাইড হয়ে নিজে সই করে আদালতে দাখিল করে দেবে।'

'আগে ও-পক্ষকে সই করতে বলুন। আমিও ওর সই চিনি। ওর সই দেখে আমি আগে,স্যাটিসফাইড হই। আদালতে দাখিল আমিও করতে পারব।' পালটা হুকুম করলে বনছায়া।

'এখন দরখাস্তে কে আগে সই করবে এ নিয়ে কাড়া। ও বলে এ করুক, এ বলে ও করুক।' প্রায় কাঁদো কাঁদো মুখ করল লাবণি। বললে, 'আচ্ছা আপনারা দুজনে কোথাও একত্র হতে পারেন না ? সেখানে টস করে ঠিক হল কে আগে সই করবে।'

বনছায়া গম্ভীর মুখে বললে, 'আমি ওর সঙ্গে কোথাও একত্র হতে রাজি নই।'

লাবণির মুখ কী রকম শুকিয়ে গেল। ক্ষীণ কণ্ঠে বললে, 'আপনি কি তবে বিচ্ছেদ চাননা ?'

'আমি তো বিচ্ছিন্ন হয়েই আছি। আমি আবার চাইব কী !'

লাবণি চেয়ার থেকে উঠি-উঠি করেও উঠল না। বললে, 'এ অবস্থাটা তো একটা বোঝাবাজি। আইনমত বিচ্ছেদ করাতে পারলেই বুঝতেন, আপনি সত্যিকার ফ্রি হয়েছেন। তখন আপনি আর এই নিচের তলার ভাড়াটে হয়ে থাকতেন না, আপনি স্বয়ং বোস সাহেবের গৃহিণী হয়ে উঠতেন।'

রাগে দাউ দাউ করে উঠল বনছায়া। হাতের কাগজটা টুকরো টুকরো করতে-করতে বললে, 'আপনি যান গুহ-সাহেবের গৃহিণী হোন গে।' পর মুহূর্তে অতর্কিতে একটা অদ্ভুত স্বগতোক্তি বেরিয়ে এল : 'লোকটার কী রুচি ! শেষকালে এই একে বিয়ে করবে।'

কথাটা শোনেনি লাবণি, তাই শেষবারের মত মিনতি করল : 'অন্তত আমাকে উদ্ধার করার জন্যে আপনি রাজি হোন।'

'আপনার ক্যাশ-এসিস্ট্যান্ট গুহসাহেবই আপনাকে উদ্ধার করতে পারবেন।'

'আপনি—'

'আমি গঙ্গা নই, আমি পতিতাকে উদ্ধার করতে জানিনা।'

'আপনি যে গঙ্গা নন তা তো দেখতেই পাচ্ছি। গঙ্গা আপনার থেকেও অনেক দূরে। তবে বেশি দেরি নেই, গুহ সাহেব আপনাদের ছাড়বে না, ফৌজদারি করবে। নিচের তলার ভাড়াটে হয়ে আছি, ফাঁকা রসিদ দেখিয়ে পার পাবেন বলে মনে হয় না। রাতদিন ফাঁকা এক বাড়িতে দুজনে আছেন, আর কোনো আত্মীয়স্বজন নেই, উকিল বলেছে, এতেই ন্যাডালটারির দামলা চলবে। তার জন্যে প্রস্তুত থাকুন। তখন আদালতই সাব্যস্ত করে দেবে কে পতিতা ! আচ্ছা আসি।'

উপরে সন্দীপের কাছে ছোট একটি চিঠি পাঠাল বনছায়া। চিঠি পাঠাল খামে পুরে, আঠা দিয়ে বন্ধ করে।

কী এমন সংবাদ যা মুখে বলা যায় না, চিঠিতে লিখে পাঠাতে হয় ভেবে পেলনা সন্দীপ।

দু চোখে প্রগাঢ় ঔৎসুক্য নিয়ে খামটা খুলল সন্দীপ।

দেখল ভাঁজ করা ছোট্ট একটু কাগজের টুকরো। তাতে ছোট ছোট অক্ষরে বনছায়ার লেখা : রাতে ঘরের দরজা খোলা রেখো, আমি যাব।

কেন যাব, কী দরকার, কিছুই লেখা নেই। কিন্তু লেখার অতীত আর কোনো অসম্ভব ইঙ্গিত যেন ফুটে উঠল।

ভাবল, তাড়াতাড়ি খেয়ে আলো নিবিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ি। যদি ধাক্কা মারে বলা যাবে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

কিন্তু ভয় পাবে কেন? ভালবাসা কখনো ভয় পায় না।

তাই বলে রাত বারোটার পরেও সন্দীপ জেগে থাকবে? তার মানে এলনা, কী মনে হয়েছে, নিজেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

সাড়ে বারোটা। একটারও আর দেরি নেই।

পা টিপে টিপে উপরে উঠে গেল বনছায়া। ঘুমন্ত বাড়িতে নিজেকে মনে হচ্ছে যেন নিজের প্রেতচ্ছায়া।

এসে দেখল দরজা বন্ধ। ভাবল দরজার বলে মাথা কুটবে।

হাত দিয়ে ঠেলা দিতেই খুলে গেল দরজা। ঘরের মধ্যে আলো।

'ভাগ্যিস খিল চাপাওনি।' বনছায়া ঘরে ঢুকে নিজুল খিল চাপাল।

'আমি ভাবলাম সমস্ত রাতই বুঝি জাগিয়ে রাখবে।' সন্দীপ শুয়ে ছিল, উঠে বসল। জিজ্ঞেস করল, 'নিচে তোমার ঘরে আলো জ্বলছে?'

'না।'

'পাশেরে?'

'না।'

'সিঁড়িতে?'

'না। সমস্ত অন্ধকার।'

'অন্ধকার করে এসেছ কেন?' সন্দীপ মুগ্ধের মত দেখল বনছায়াকে : 'এ ঘরে কিন্তু আলো জ্বলবে।'

'জ্বলুক। আমি আর কিছুকে ভয় করিনা। তোমার অটল ভালোবাসাকেও না। না, তোমার শিল্পবোধ, তোমার কল্যাণবোধ, তোমার নীতিবোধকেও না।'

'কিন্তু আমার ভয়কে?' হাসল সন্দীপ।

'না, তোমার ভয়কেও না। শোনো তোমার সেই মিউচুয়াল কনসেন্টের পিটিশনটা দাও, আমি সই করে দিচ্ছি।'

'সত্যি?' সন্দীপ উল্লসিত হল : 'তুমি মন স্থির করেছ?'

'হ্যাঁ, করেছি। ডিভোর্স নিতেই হবে। হ্যাঁ, মামুলি আদালতী ডিভোর্স। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, কিংবা তারও আগে। যদি জয়েন্ট পিটিশনে না হয়—'

'তোমাদের স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টের বিয়ে, জয়েন্ট পিটিশনেই হবে।' সন্দীপের ঘরে আশ্বাস ফুটে উঠল : 'আমি পীযূষ দত্তকে দিয়ে সাউণ্ড করেছিলাম, সুবীরবাবু রাজি আছেন—শিগগির একদিন সবাইকে ডাকবেন পীযূষবাবু।'

'তখন কে আগে সই করবে আমি না ও, এ নিয়ে ঝগড়া বাধতে দেব না—আমিই আগে সই করব।' খোলা মনে হাসল বনছায়া। পরমুহূর্তেই চিন্তিত মুখে বলল 'কিন্তু কে জানে ও যা বিশ্বাসঘাতক, হয়তো লাস্ট মোমেন্টে এল না, রিট্রে করল, কিংবা সই করল না, উলটে পিটিশনটাই ছিঁড়ে ফেলল রাগ করে। তখন কিন্তু মনে রেখ, স্ট্রেইট মামলা করব।'

'নিশ্চয়।' সন্দীপ ভরাট গলায় বললে 'আর সুবীরবাবু তো বলেছেন তুমি মামলা করলে ওরা কনটেস্ট করবে না। একতরফা ডিক্রি পাশ হতে দেবে।'

'বলা যায় না। শেষমুহূর্তে হয়তো রিট্রে করল, মামলায় জবাব দিয়ে বসল। তখন কিন্তু মামলা সপাটে চালিয়ে যাব। তার জন্যে মাল-মশলা অস্ত্র-শস্ত্র সব মজুত রেখো। আর উকিল রেখো পাকা দেখে।'

'নিশ্চয়। পাকা উকিল গোড়াগুড়ি থেকেই থাকবে।' সন্দীপ আবার অভয় দিল: 'কোনো অসুবিধে হবে না। আমার মনে হয় আনডেটেড কনসেন্ট পিটিশনেই কাজ হবে। মামলার কোনো হাঙ্গামা পোয়াতে হবে না। পিটিশনের এক বছর পরেই আদালতের ডিক্রি।'

'তবে আর তোমার ভয় কী।' বলে বনছায়া হাত বাড়িয়ে সুইচ অফ করে ঘর অন্ধকার করে দিল।

সন্দীপ বুঝল বনছায়া খাটের উপর উঠে এসেছে। শুধু উঠে এসেছে নয়, উথলে পড়েছে।

একলহমায় পৌরুষের পশুকে জাগিয়ে তোলা যায়। জেগে উঠলও বুঝি হুঙ্কার দিয়ে। কিন্তু সন্দীপ প্রাণপণ শক্তিতে তাকে বশীভূত রাখল। বললে, 'আমার এখনো ভয় যায়নি।'

'এখন আবার কাকে ভয়?' বনছায়া ছটফট করে উঠল।

'অন্ধকারকে।'

'এই অন্ধকার?'

'না, গর্ভের অন্ধকার।'

স্বস্তির গভীর নিশ্বাস ফেলল বনছায়া। বললে, 'তোমার ভয় নেই, আমার সন্তান হবে না।'

'হবে না?'

'না। আমি অপারেশান করিয়ে নিয়েছি।'

'আমাদের মিলনের কোনো সন্তান হবে না?' আর্তস্বরে সন্দীপ বললে, 'আমাদের সাহিত্যসৃষ্টির কোনো উত্তরাধিকারী থাকবে না?'

'না।'

'তবে তোমাকে দিয়ে আমার কী হবে? ফুল নেই ফল নেই—একটা হাহাকারের মরুভূমি নিয়ে আমি কী করব?' সন্দীপ উঠে পড়ে দৃঢ় হাতে সুইচ জেলে দিল: 'আমি তো তোমাকে বাতিচারে চাইনি, বিবাহে চেয়েছি। কিন্তু যে বিবাহ সুরু হতেই নিষ্ফল তাকে আমি বয়ে বেড়াব কী করে?'

আলো জেলে দেখল বনছায়ার এক অদেখা মূর্তি বিছানায় শুয়ে আছে। কেন কে জানে নির্লজ্জতা-টুকুকে মনোরম মনে হলনা। তবু কণ্ঠস্বরে মমতা এনে বললে, 'বেশ, তোমার ঘুম পেয়েছে, তুমি এখানে ঘুমোও আমি বরং তোমার নিচের ঘরে গিয়ে শুই।'

'না। আমিই আমার ঘরে যাচ্ছি।' বনছায়া ক্ষিপ্র হাতে নিজের শৈথিল্যকে সংশোধন করতে লাগল।

সিঁড়ির আলো সন্দীপই জালিয়ে দিল। পরে নেমে এসে প্যাসেজের আলো। বনছায়ার ঘরে ঢুকে খিল দেবার আওয়াজটুকু শোনা পর্যন্ত বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল। তারপর উঠে এল নিজের ঘরে। এসে দরজা বন্ধ করল।

[ক্রমশঃ

ফিরে ফিরে চাই

স্মৃতিচারণ

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

আমাদের চাকদহ বেল ষ্টেশনের ষ্টেশনমাষ্টার বিনোদবাবু এক ফৌজদারি মামলায় পড়ে 'সাস্‌পেণ্ড' হলেন। কী অপরাধে সে সব কিছু শুনিনি। অবাক হয়েছিলাম। বিশ্বাস করতে পারি নি। বিনোদবাবুকে সবাই খুব ভালবাসতো—অত্যন্ত অমায়িক ভদ্র। সে কালের চাকদহ ষ্টেশনে আঙুলে গোনা ডেলি প্যাসেঞ্জার ট্রেণ যাতা করতেন,—সবারই নির্দিষ্ট ট্রেন ছিল যাওয়া আসার, সবারই মান্থলি টিকিট। চাকদহ ও তার আশে পাশে আজ বহু-বিস্তারিত জনপদ গড়ে উঠেছে। পাকা সড়ক, বিজলি বাতি জলছে। রিক্‌শ, ট্যাক্সি, মোটরকার চলছে। ফোন বাজছে। মনে পড়ছে ১৯৪১ সালে পাবনায় এক সভার পর ফিরছি। নামলাম চাকদহে পিতাপুত্রে। পৈতৃক গ্রাম ও গৃহ দেখবো বলে। জনশূন্য প্রান্তর দিয়ে গেছি—ফিরছি অন্ধকারে পিচ্ছল রাস্তা দিয়ে জলে ভিজতে ভিজতে। জন-মানব পথে দেখা যেতো না। সেই deserted village মনে মনে পূর্ণ হলো গ্রিন্‌সা সাহেবের ম্যাজিক দণ্ডের স্পর্শে। দেশ ভাগ হলো—দলে দলে লোক এলো জনহীন অরণ্যসঙ্কুল স্থানে জনপদ গড়ে তুললো। জনহীন চাকদহে বিনোদবাবু থাকতেন সপরিবারে প্লাটফর্মের উপর একটি কোয়াটারে। পরিবারের মধ্যে এক পুত্র সে কলকাতায় কাজ করে যায় আসে। আমরা দেশের বাড়ি থেকে রাণাঘাটে ফেরবার সময়ে তাঁদের ঘরেই বিশ্রাম করতাম। ওয়েটিং রুম ছিল, কিন্তু বিনোদবাবু নিয়ে যেতেন তাঁর কোয়াটারে। বিনোদবাবুর স্ত্রী সারাদিন একা একা থাকেন—সঙ্গী নেই কথা বলবার। মা ও আমরা গেলে খুব খুসি হন। হঠাৎ শুনি বিনোদবাবু কী এক অপরাধে 'সাস্‌পেণ্ড' হয়েছেন। কাজ করতে পারবেন না—তবে জীবন ধারণের জন্য কিছু টাকা পাবেন।

মামলা রাণাঘাটের ফৌজদারি আদালতে হচ্ছে। সরকারী উকিল বাবার বন্ধু অক্ষয় মৈত্র আসেন কৃষ্ণনগর থেকে—ওঠেন আমাদের বাসাতেই। মা তাঁর জন্য খাওয়ার ভাল ব্যবস্থা করেন। এ সব দেখে আমরা হই বিরক্ত—বলি, 'বিনোদবাবুকে জেলদেবার জন্য আসছেন—তাঁর এতো খাতির কেন।'

রেলে, আদালতে, পুলিশে ও সরকারী অপিসে যুধিষ্ঠিররা নিশ্চয়ই কাজ করে না। ঘুস খায় একজন আর ঘুস দেয় দশজন। ঘুস যারা দেয় তারা বিভাগীয় বিধি নিষেধের বেড়া সহজে টপকাবার জন্য বা কাজকে ত্বরান্বিত করবার জন্য অল্পপ্রাণ, অল্পবিত্ত কেরাণীদের প্রলোভিত করে; অধিকাংশেরই

অভাবের সংসার। ফলে ঘুস পেতে পেতে উপরি পাওয়াটা স্বভাবে এসে যায়; তখন তাদের অভাব ও বাড়ে খাঁকও বাড়ে—দস্তও বাড়ে সাথে সাথে।

যারা রক্ষা করতো সেই পুলিশের বদনাম সুপরিচিত। রেলওয়ে কর্মচারীদের সুনাম ছিল না। আদালতের কেরানী কুলের অপযশ প্রবাদগত। এখন খবরের কাগজ খুললেই চোখে পড়ে Anticorruption squad-এর কাণ্ড কারখানা। তবে দেখা যায়—যতটা গর্জায় ততটা বর্ষায় না। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে ঘুষ দেওয়া-নেওয়া চলে—'এ রাজ্য তুমি নাও, ও রাজ্যটা আমায় দাও।' কিন্তু ঘুসের খাঁক বেড়ে যায়—Munich pact করেও যখন শান্তি এলো না—তখনই ঘুসের হলে 'ঘুসি' বর্ষণ শুরু হলো। দুনিয়াটা চলছে এই ঘুস-ঘুসির আবর্তে। যতদিন সম্ভব ভোগণ চলে—তারপরেই সুরু হয় শেষণ। কেউ যে আজ যুদ্ধে নামছে না, শান্তিকামী বলে নয়—ভাবী যুদ্ধের মহা প্রলয়ঙ্করীরূপের কথা ভেবেই।

আমার এক পরিচিত বন্ধু বি. এ. পড়তে পড়তে রেলে কাজ পান—অবশ্য বহু বৎসর পূর্বে। বৎসর খানেকের পরে ষ্টেশন-মাষ্টার তরুণ কর্মীর হাতে একটা বন্ধ-খাম দিলেন। খাম খুলে দেখেন দুই শো টাকার দুখানা নোট। নূতন কর্মী হক-চকিয়ে গেলেন—ব্যাপার বুঝতে পারেন না। হাড়বাকো ষ্টেশন-মাষ্টার বললেন, 'ওটা আপনার ভাগের প্রাপ্য। কাজ করতে করতে কয় বছরের মধ্যেই সবই বুঝতে পারবেন। পরে তিনি বুঝতে পারেন এবং বিজ্ঞ হয়েই অবসর গ্রহণ করেন। বড় ষ্টেশন যেখানে মালগাড়ি খালাস হয়, তরতি হয়—সেই রকম একটা ষ্টেশনে বদলি হয়ে আসবার জন্য যথাযথ স্থানে কী পরিমাণ তদ্বির করতে হয় তা তো প্রবাদগত। যুদ্ধোত্তর পর্বে হাওড়া ষ্টেশনে একটা মালগাড়ি (wagon) পাবার পারমিট বা ছাড়পত্র যিনি দিতেন, তাঁর কথা অনেকেরই জানা। আসলে 'চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা, যদি না পড়ে ধরা, অথবা উপর তলা থেকে নিচের তলা পর্য্যন্ত সমস্ত কর্মীর মধ্যে চোখ টেপাটিপি থাকলে সবাই চুপ করে থাকবে—ভাগ পাবে জানে।

সিমেন্ট 'কনট্রোল' কড়াভাবে চলছে—অথচ দেখছি বাড়ির পর বাড়ি উঠছে। সহরে সরকারী বিশেষ বিভাগ আছে চোরা কারবারী তল্লাস করবার জন্য—তারা কি করেন? নিজ অভিজ্ঞতার কাহিনী বলি। এক ভাড়াটে আসলেন। তিনি এই বিভাগের দারোগা। পরিচয় হলে বললাম, 'পুঁটি মাছ ধরবেন তো রুই কাতলা ঠিক ঘুরলে যাবে।' বললেন 'দেখবেন আমাকে।' দেখালায় সেটা একদিন। রেড ইংক নিব বিক্রীর দাম বুঝি ছিল দুই পয়সা—এক বেচারা দোকানী বেশী দামে বিক্রী করার অপরাধে চালান হয়ে গেল। আর একদিন ঘরে বসে কাজ করছি গোপাল আকুড়ি কেঁদে এসে বললে,—থানায় তাকে ধরে নিয়ে সিউড়ি চালান দিচ্ছে। ব্যাপারটা শুনলাম। কলকাতার এক ধনীর দুলাল গ্রামে আছেন শিল্প উন্নয়ন কাজ নিয়ে। একদিন তাঁর এক মোসাহেব জনৈক প্রাক্তন কংগ্রেস কর্মী সন্ধ্যার সময়ে গোপালের কাছে এসে বলেন 'সাহেব আসবেন' রাত্রির জন্য 'কয়লা চাই'। বেচারা গোপাল গাড়ি ঝাড়া কয়লা কিছু জমিয়ে রাখে—সের দর হলো কোনো রকমে—দাম নিল এক টাকা। গরীব গোপাল বুঝতে পারলে না যে সেটা দহি-করা নোট। কয়েক মিনিট পরে সেই দুর্নীতি-নিবারক পুলিশ কর্মচারী এসে হাজির—খানা-তল্লাসী করে সেই নোট বের করলেন। বিশেষ তল্লাসী করতে হলো না, কারণ বস্তার নিচে ঐ একটাই নোট ছিল—আর কয়েকটা পয়সা। সুতরাং সে কয়লা বেশি দামে বিক্রয় করে Black market করছে। সেই অপরাধে সিউড়ি চালান হলো গোপাল। সে রাতে কলকাতার ধনীর দুলাল ও রাজ-কর্মচারী নিষিদ্ধ পক্ষী মাংস সানন্দে ভোজন করলেন। অপর দিকে সিউড়িতে মহামতি জনৈক মেজিষ্ট্রেট পনেরো টাকা জরিমানা করলেন গোপালের

আমার কাছে গোপাল কেঁদে এসে কাহিনীটা বলেছিল। খুব সংক্ষেপে পরবর্তী ঘটনাটুকু বলি। ভদ্রলোককে ডেকে পাঠাই। বুঝিয়ে বললাম—গ্রামে থাকতে হলে গ্রামের লোকের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করে থাকতে হবে। তাঁকেই শেষ পর্যন্ত জরিমানার টাকাটা দিতে হলো। ...এই শ্রেণীর সরকারী কর্মচারী জনসেবা করতে আসেন। এই শ্রেণী-ভুক্তেরা গ্রামের শিরোন্নতি করতে আসেন।

সমাজ কীভাবে কর্মচারীদের প্রয়োচিত করে, তার একটা কাহিনী বলি। আমাদের দূর সম্পর্কীয় এক কুটুম্ব পুলিশের দারোগা। তখন তিনি থাকেন উত্তরবঙ্গের এক থানায়। কোথায় কোন ধনী গৃহে একটি বিধবা বধূ অন্তঃসত্ত্বা হয়ে 'আত্মহত্যা' করে। পুলিশই সেটা খুন বলে জমিদারকে চালান দিতে পারে, পুলিশই সেটা আত্মহত্যা বলে সাফাই করতে পারে। সবই নির্ভর তাঁর রিপোর্টের উপর। হঠাৎ গভীর রাতে জমিদারের ঘর থেকে লোক এলো দুই বালতি ভরা রূপোর টাকা নিয়ে—মামলাটা 'হাস্-আপ' করবার প্রস্তাব এলো। ষাট টাকা মাহিনার দারোগা—পাঁচ সাতটি অবিবাহিতা কন্যা। দারোগাকে বালতি ঘরে নিয়ে যেতেই হলো।

তাই আমার প্রশ্ন ঘুষ খায় একজন, দেয় দশজন। মনে পড়ছে সিন্ধুর কথা। সদ্গোপের মেয়ে ঘরে বিবাহিত মেয়ে রেখে 'বের' হয়ে আসে। তারপর যা হয়—তাই ঘটেছিল। পুরুষের গায়ে তো কলঙ্কের দাগ লাগে না—সে ফিরে গেল আপনা গাঁয়ে-সমাজে কোনো কথাই উঠলো না—সে যে পুরুষ। মেয়েটা দাসীগিরি করে। অবশেষে গ্রামের লোকে অত্যাচার সুরু করলে সে মুসলমানকে বিবাহ করবে বলে ঠিক করলো। সেই মুসলমানটি আমারই পরিচিত। আমি সিন্ধুকে ডেকে পাঠাই। সে এসে কেঁদে বললে, 'বাবু, গাঁয়ের লোক বলছে আমার নামে টাক্স বসাবে—অর্থাৎ (মেয়ে বসে পুলিশ থেকে ঘোষণা করাবে।') আমি পরে গ্রামের হিন্দু কয়েকজনকে বলি,ব্যাপারটা। তাঁদের একজন বললেন, 'মেয়েটা খারাপ বড়।' আমি তাকে শুধিয়েছিলাম 'একটা খারাপ মেয়ের পিছনে কতগুলি খারাপ পুরুষ থাকে বলো। তাদের কী হয়?' সুতরাং ঘুষ খায় একজন দেয় দশজন—সমাজে তাদের কেউ দেখতে পায় না।

বিনোদবাবু যে-চশমা খালাস পেলেন, মনে পড়ছে তাঁর ছেলে একদিন আমাদের বাড়ী এসে মা'র কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে বলছে—'মামিমা বাবা খালাস পেয়েছেন।' বাপের কলঙ্ক মুছে যেতে ছেলের কী আনন্দ তার সেই দীপ্ত উত্তেজিত মুখটি এখনো মনে আছে। স্বর্গ নিয়ন্ত্রণ সময়ে দেখেছি সহরে চোদ্দ ক্যারেট সোনা দিয়ে কে কত গয়না করছেন! বিশিষ্ট ভদ্রলোক, মেয়ের বিয়ে—গিনী সোনার অলঙ্কার করালেন পুরোপুরি। বেচারী স্বর্ণকার দোকানে বসে চোদ্দ ক্যারেট নিয়ে টুকটাক করে, ভিতরে গিনি সোনার কাজ চলে, কর্তৃপক্ষের চোখে ধুলো দেয়, মাসকাবারী দক্ষিণাটা পৌঁছয় যথাস্থানে যথাসময়ে।

দুনিয়াটা চলে দুটো জিনিষ ঘুষ ও ঘুসি। ঘুষ দিয়ে তোষণনীতি করে, যতদিন অন্যকে ঠেকিয়ে রাখা যায়। তারপরই ঘুসি। এই কোমার ভাঁটা চলছে অনাদি কাল থেকে। [ক্রমশঃ

* * * *

তিনখানা মাটির টিপি ও খানকতক কাঠ লইয়া এ দেশের রাঁধুনি যে সুস্বাদু অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে তা আর কোথাও নাই। একটা মাজাতা আমলের এক টাকা দামের ডাঁস ও একটা গর্তের ভেতর পা, এই সরঞ্জামে কুড়িটাকা দামের ডিনার কেবল এ দেশেই সম্ভব। একখানা ছেঁড়া মাদুর, একটা মাটির প্রদীপ, তার সেঁড়ার তেল, এই উপাদান সহায়ে দিগ্‌গজ পণ্ডিত এ দেশেই হয়। —বিবেকানন্দ

ভোলা মনের মহাবিজ্ঞানী

অনাথ উপাধ্যায়

মহাবিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসনের জীবননাট্যে আকর্ষণীয় বৈচিত্র্যের অভাব ছিল না। বাল্যকালের একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে এর শুরু। একদিন দুপুর বেলা। বালক এডিসন তাঁর ছোট ভগ্নীকে নিয়ে বাড়ীর পিছন দিকে এক গোয়ালঘরে গিয়ে আসন পিঁড়ি হয়ে বসেছেন। পায়ের তলায় একটি হাঁসের ডিম। বোন বললে, 'কি করছ দাদা, এমন করে বসে?' গম্ভীর মুখে এডিসন বললেন, 'ডিমে তা দিচ্ছি। হাঁসেরা যদি এমনি করে বসে ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফোটাতে পারে, তা হলে আমিই বা পারবো না কেন?' সারা দুপুর গড়িয়ে গেল। বাচ্চা ফুটলো না। এডিসন বললেন, 'একদিনে হবে না। দুচার দিন লাগবে।'

এই সংবাদ যখন বাড়ীর মধ্যে চাউর হল তখন মহা হাসির রোল উঠল। এডিসনের বোকামীর জন্যে অনেক মন্তব্য শোনা গেল। এ ছেলের দ্বারা মোটা মাথা, এর দ্বারা কিছু হবে না। আরও নানা বিষয়ে তাঁর মোটা বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে এডিসনের বাবা নিরুৎসাহ হয়ে ছেলের শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই করলেন না। এ ছেলের জন্যে স্কুলের মাইনে গোনা বা টিউটর রাখা একেবারেই নিরর্থক।

কাছাকাছি এক নীচু শ্রেণীর পাঠশালা ছিল। শিশু এডিসনকে সেখানে পাঠানো হল। যাই হোক অক্ষর পরিচয়টা তো হওয়া দরকার! মাস দুই বাদে একদিন কাঁদতে কাঁদতে এডিসন বাড়ী এলেন। মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে বললেন, 'আমি আর ও পাঠশালায় যাব না মা।' মা প্রশ্ন করলেন, 'কি হয়েছে বল্।' ছেলে জানালো, পড়া বলতে পারেনি বলে মাস্টার মশাই তাঁর মাথায় গাট্টা মেরেছেন আর গাধা, বোকা, ক্যাবলা, গবেট এই সব বলে গাল দিয়েছেন।

ছেলের কথা শুনে মা রেগে আগুন। তখুনি পাঠশালায় গিয়ে হাজির হলেন। তাঁর সেই রণচণ্ডী মূর্তি দেখে মাস্টার মশাইরা ভয়ে কেঁচো। যে সব কথা এডিসনের মা তাঁদের শোনালেন তা তাঁরা জীবনে শুনেছেন কিনা সন্দেহ।

পাঠশালা খুলে বসেছো? কসাইএর দল! কোথাকার! পাঠশালা না ছাই! বেঞ্চিগুলো যেমন গরু, মাস্টার গুলো তেমনি গরু।

মনের ঝাল মিটিয়ে বাড়ী ফিরে এসে ঘোষণা করে দিলেন, তাঁর ছেলে আর পাঠশালায় যাবে না, ঘরে বসে তাঁর কাছে পড়বে।

বাপ বললেন, অমন পরিচয়টাও হোলনা তাহলে !

মা তাঁকে ধমক দিয়ে বললেন, 'থামো তুমি। তুমি আর তোমার ভাইরা আমার ছেলেকে যতখানি মূর্খ গবেট ভাবছো, দেখে নিও, সে তা নয়। আমার ছেলে তোমাদের বংশের মান বাড়াবে, তোমাদের চেয়ে অনেক বড় হবে সে। আমার ছেলে মানুষের মতো মানুষ হবে।'

'মিথ্যা হয় নি মায়ের কথা। ধনা মা পেয়েছিলেন এডিসন। পরম যত্নে আর স্নেহে তিনি ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে লাগলেন। বিবাহের আগে তিনি শিক্ষাত্রিত্রীর কাজ করেছিলেন। সুতরাং তাঁর হাতে ছেলে ভাল মতোই মানুষ হতে লাগল। কঠিন নির্মম বিরূপ ভরা পরিবেশ পেল মুক্তি থেকে বালক এডিসন নতুন চেতনায় নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হলেন। মায়ের বিশ্বাস আছে, তিনি বড় হবেন, নামজাদা লোক হবেন। মায়ের সেই বিশ্বাস আর স্নেহের মর্যাদা তাঁকে রাখতেই হবে। সমস্ত প্রাণ ঢেলে এডিসন লেখা পড়া শিখলেন। বুদ্ধি আর মেধা ছিল অফুরন্ত। অল্প বয়সেই মোটা মোটা বিজ্ঞানের বই রপ্ত করে ফেললেন। নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ব্যাপৃত হলেন।

তারপর কতরকমের আবিষ্কার যে করলেন তার ইতিবৃত্ত তো অনেক লেখা হয়েছে। টেলিগ্রাফী, বিজলী বাতি, টাইপ-রাইটার, গ্রামোফোন চলন্ত ছবি এবং আরও বহু প্রকার আবিষ্কারের জনক ছিলেন তিনি। আবিষ্কার সম্পূর্ণ হবার পর তিনি সেগুলির পেটেন্ট, অর্থাৎ আইনগত স্বত্ব, গ্রহণ করেন। ১৮৬৯ সালে প্রথম পেটেন্ট গ্রহণ করেন। ১৯১০ সালে তাঁর পেটেন্টের সংখ্যা দাঁড়িয়ে ছিল ১৩০০। ভাবতে অবাক লাগে। কলস্থায়ী একটি জীবনের কী অপরিমেয় কর্মকুশলতা ! লোকে তাঁকে বলত—'বিজ্ঞানের যাদুকর।'

কিন্তু এই যাদুকরটি ব্যক্তিগত জীবনে কী ভোলা মনের মানুষই না ছিলেন। পরীক্ষাগারে যখন গবেষণায় নিমগ্ন হতেন, তখন নাওয়া খাওয়া ভুলে যেতেন, তখন যেন তাঁর আর বাহ্যজ্ঞান থাকতো না।

জীবনের একটা বড় কাজ—বিবাহ, সেই বিবাহের ব্যাপারেও তিনি এমন কাণ্ড করেছিলেন যার কথা তাঁর স্ত্রী কোনদিন ভুলতে পারেননি। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়রাও না।

এডিসনের বিবাহ। কনে দেখা হয়েছে। আলাপ পরিচয় হয়েছে। বিয়ের দিনও স্থির হয়েছে। কিন্তু সে সব কথা আর তাঁর মনে নেই : তিনি গবেষণাগারে এক কঠিন আবিষ্কারের সাধনায় মগ্ন। কথায় আছে, যার বিয়ে তার হুঁস নেই, পাড়া পড়শীর ঘুম নেই ! তেমনি অবস্থা।

শেষ পর্যন্ত বন্ধুরা গবেষণাগারে হানা দিলেন। - ব্যাপার কি ? জানো না, আজ যে তোমার বিয়ে।

আমার বিয়ে ? আজ ? সে কি ? এখন যে আমি বড্ড ব্যস্ত !

বন্ধুরা ধমকে উঠলেন, রাখো তোমার ব্যস্ততা। এদিকে কনে আর তার আত্মীয়রা গির্জায় অপেক্ষা করছে।

এডিসন বললেন, কিন্তু আমার পরীক্ষাটা যে শেষ হয়নি !

না হোক শেষ ! কাল হবে !

না না তা কি হয়।

খুব হয়।

শেষ পর্যন্ত বন্ধুরা তাঁকে গবেষণাগার থেকে একরকম জোর করেই টেনে বার করলেন এবং সেই অবস্থায় প্রায় চাংদোলা করে নিয়ে গির্জায় বিবাহ বাসরে হাজির করলেন।

সেখানে অপেক্ষা করছিলেন ধর্মযাজক, তাঁর বন্ধু-পত্নী এবং বহু অতিথি অভ্যাগত।

এডিসনের অবস্থা, তাঁর পোষাকের চুলের আর চেহারার বাহার দেখে তাঁরা তো হতবাক! এ কী রকম বর! শেষকালে একটা পাগলের হাতে পড়ল নাকি মেয়েটা! রাম! রাম!

চারিদিকে তাকিয়ে এডিসন যেন এতক্ষণে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বুঝতে পারলেন. ভাবী বধূর দিকে তাকিয়ে ঈষৎ হাসলেন, তারপর বিস্মিত অতিথিদের দিকে ফিরে বললেন, মহাশয়গণ, আপনাদের মুখ চোখের অবস্থা দেখে বুঝতে পারছি, আমার আচরণে আপনারা কিছু বিভ্রান্ত বোধ করছেন। বোধ করা অস্বাভাবিক নয়। আমার অঙ্গে বরের সাজ নেই। না থাক, বেশভূষার চাকচিক্য সাধন করা শক্ত নয়। কিন্তু আমি যে পরীক্ষায় নিযুক্ত ছিলাম তা সহজ নয়। খুব শক্ত ব্যাপার। বলতে আনন্দ বোধ করছি, আমার সে পরীক্ষা সফল হয়েছে। কাল আপনারা ঘরে বসে একটি ছোট বাক্স যন্ত্র চালিয়ে আমার কণ্ঠস্বর শুনতে পাবেন।

এডিসন সেদিন তাঁর গ্রামোফোন ও গ্রামোফোন রেকর্ডের আবিষ্কার কার্য সম্পূর্ণ করেছিলেন।

* * *

এডিসন ছোটবেলা থেকেই নিজে রোজগার করে নিজের পড়াশুনোর খরচ চালাতেন। কিছুদিন তিনি খবরের কাগজ ফেরী করেছিলেন। পথে-ঘাটে নয়—ট্রেনে। সেসময় ট্রেনে লম্বা বারান্দা থাকতো। সেই বারান্দা দিয়ে চলতে চলতে কামরার ভিতর মুখ বাড়িয়ে জোর গলায় হাঁক দিতেন—আজকের খবরের কাগজ—গরম গরম তাজা খবর, হাতে গরম, টাটকা···

একদিন এক কামরার মধ্যে ছিলেন এক ধনপতি ব্যবসায়ী। এডিসনের কর্কশ চীৎকার শুনে বিরক্ত হয়ে বললেন, এই ছোকরা! তোমার কাছে কতগুলো কাগজ আছে? এডিসন বললেন, আজ্ঞে তা দুশো খানা হবে। পকেট বইও আছে পঞ্চাশ খানা! ভদ্রলোক বললেন, সব গুলো আমায় দাও। কত দাম বই আর সংবাদ পত্রের?

এডিসন হিসাব করে দাম বললেন। ভদ্রলোক মণিব্যাগ থেকে কয়েক খানা নোট বার করে এডিসনকে দিয়ে বললেন, চলে যাও! আর তো তোমার আজকের মতো কাগজ বিক্রির হাঁক পাড়তে হবে না? এডিসন বললেন, আজ আর হবে না! ভদ্রলোক বললেন, হ্যাঁ, বাড়ি চলে যাও! তোমার চীৎকারে আমার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটছে। তাই সবগুলোই নিয়ে নিলাম, তোমার চেচানো বন্ধ করবার জন্যে। টাকা নিয়ে এডিসন চলে গেলেন। একসঙ্গে অনেকগুলো টাকা পেয়ে তাঁর মহা উপকার হল। অনেকদিন থেকে কয়েকখানা বিজ্ঞানের বই কিনবেন ভাবছিলেন, কিন্তু পয়সার অভাবে পারছিলেন না। এখন টাকা পেয়ে সেই বইগুলি কিনলেন এবং তাদের সাহায্যে কয়েকটি বড় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় সফলকাম হলেন।

॥ বিপ্লব-বহ্নি ॥

—দীপঙ্কর

পেডি নিধন ঃ ডিলিয়ার্সকে আক্রমণ

১৯২৮ সাল।

ঢাকা শহরকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে গুপ্ত সমিতির শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত হতে লাগল দিকে দিকে—নারায়ণগঞ্জে, মানিকগঞ্জে ও মুন্সীগঞ্জ মহকুমায়, বিশেষ করে বিক্রমপুর পরগণায়। কলকাতায় শাখা বিস্তৃত হয়েছে আগেই, শাখা কেন, কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কারণ কলকাতায় গোপনভাবে বাসা করছেন সতীশ গুপ্ত। বাসা তাঁর ১-সি বলা রোডের দোতালায়।

আরও আরও দূরে শাখা বিস্তার করলে ক্ষতি কি?

দীনেশ গুপ্তের দাদা জ্যোতিষ গুপ্ত মেদিনীপুর শহরে ওকালতি করেন। দীনেশ পড়ে ঢাকা শহরে। একটি সুচিন্তিত গুপ্ত পরিকল্পনা নিয়ে দাদার অনুমতি সংগ্রহ করে দীনেশ ১৯২৮ সালে মেদিনীপুরে পড়তে এল, কলেজে ভর্তি হল। কিন্তু গুড বয়ের মত পড়াশুনাই ত তার লক্ষ্য নয়। অপরিচিত শহরে সে নজর রাখল কিশোর ও যুবকদের প্রতি, কার মাঝে দেখা যাচ্ছে আত্মত্যাগের অভীপ্সা, কার অন্তরে আছে পরাধীনতার জ্বালাবোধ, কোথায় সেই উর্বর জমি নিশ্চিত হয়ে যেখানে ঢাকা থেকে বহন করে আনা বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির চারাগাছটি রোপন করা যায়।

অবশেষে নজর পড়ল একটি সাধারণ সমাজসেবা সংগঠনের প্রতি, নাম, সৎকার সমিতি। শুধু শবদেহ সৎকারই সমিতির ছেলেদের কাজ নয়, শুধু শ্মশানে মৃত মানুষ পৌঁছে দেওয়াই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, সমাজ সেবামূলক নানা কাজে এরা অগ্রণী। কি প্রচণ্ড এদের উৎসাহ উদ্দীপনা, কি অকপট উদ্যম, কি ঐক্যবদ্ধ সংগঠন। দীনেশ স্থির করল এখান থেকেই সুরু করতে হবে। পরিচিত হল প্রফুল্ল ত্রিপাঠির সঙ্গে, পরিমল রায়ের সঙ্গে, হরিপদ ভৌমিকের সঙ্গে এবং ক্রমে ক্রমে আরও, আরও অনেকের সঙ্গে।

দীনেশের সাফ কথা : নিরুপদ্রব অহিংস সংগ্রামে আমাদের আস্থা নেই। যে শাসক ও শোষকের হাতে রয়েছে হাতিয়ার, তাকে অনুরোধ জানালেই অথবা হুমকির ফাঁকা আওয়াজ তুললেই সে তল্পি-তল্পা নিয়ে সাগর পাড়ি দেবে, আমরা তা বিশ্বাস করি না। হাতিয়ার সে তুলবেই, আঘাত সে হানবেই, ভারতের মাটি কামড়ে পড়ে থাকবার প্রয়াসে সে সর্ব পাশব-শক্তি প্রয়োগ করবেই। সুতরাং আমাদেরও হাতিয়ার তুলতে হবে, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে। আমাদের নীতি, চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত।

মেদিনীপুরে বিপ্লবী সংস্থার বীজ বপন করল দীনেশ গুপ্ত। দীনেশ, মানে সেই দীনেশ, যেজন ভলান্টিয়ার্সের ক্যাপ্টেন দীনেশ গুপ্ত, ১৯৩০ সালের ৮ ডিসেম্বর বিনয় বসু আর সুধীর (বাদল) গুপ্তের সঙ্গে যে হানা দিয়েছিল কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংস-এ।

দীনেশ বিপ্লবের বীজ বপন করল যখন, ঢাকার শ্রীসংঘ তখন ভেঙ্গে গিয়ে দু-টুকরো হয়নি। ১৯২১ সালের প্রথম দিকে পারিবারিক কারণে যখন তাকে আবার ঢাকায় ফিরে আসতে হল, শ্রীসংঘ ভেঙ্গে তখন

বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' বিপ্লবী দল তৈরী হয়ে গেছে। সংক্ষেপে সবাই বলে, বি ভি। সে দলের সর্বাধিনায়ক যেজর সত্য গুপ্ত।

দীনেশ ফিরে এসে মেদিনীপুর সংগঠনের ভার ও দায়িত্ব তুলে দিল সশান্ত (কমেট) দাশগুপ্তের হাতে। কমেট কলকাতায় কলেজে পড়ছিল, ১৯২৯ সালে সে ফিরে মেদিনীপুর কলেজে বি এস সি ক্লাসে ভর্তি হল। কলেজ হোষ্টেলেই রইল সে।

মেদিনীপুর শহরের নানা জায়গায় তখন কুস্তির আখড়া তৈরী হয়ে গেছে, স্থাপিত হয়েছে ব্যায়ামাগার, খোলা হয়েছে লাইব্রেরী। সেখানে কিশোর ও যুবকদের ভিড়। কমেট তাদের সঙ্গে পরিচিত হল, মেলামেশা ও আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে পরিচয় রূপান্তরিত হল নিবিড় বন্ধুত্বে। দীনেশ বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের যে বীজ বপন করে গিয়েছিল, কমেটের অক্লান্ত শ্রম ও ক্ষুরধার বুদ্ধি প্রয়োগে সেই বীজ অঙ্কুরিত হল।

১৯২৯ সালের শেষ ভাগে কমেটেরই উদ্যোগে মেদিনীপুর যুব সম্মেলনের অধিবেশন হল। সভাপতি আর কেউ নন, স্বয়ং দেশবন্ধুর সুভাষচন্দ্র বসু। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়কত্ব করবার জন্য ঢাকা থেকে পাঠানো হল আর কাউকে নয়, দীনেশ গুপ্তকে। তার পাশে পাশে রইল সংগঠন-প্রধান কমেট।

কিশোর ও যুবকদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল, দলে দলে এসে যোগদান করতে লাগল কুস্তির আখড়ায় ব্যায়ামাগারে, লাইব্রেরীতে। শরীর গঠনের সঙ্গে সঙ্গে মন গড়ে উঠতে লাগল। ওদের মধ্যে থেকে বাছাই করে, যাচাই করে ছেলেদের গুপ্ত সংগঠনে টেনে আনতে লাগল কমেট। বি ভি-র মেদিনীপুর শাখা শক্ত বনিয়াদের ওপর গড়ে উঠল। সবারই মুখে কমেটদা, কমেটদা।

কলেজ অধ্যক্ষ প্রমাদ গুনলেন। কমেটের ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রিয়তার মধ্যে তিনি সাংঘাতিক আপত্তিকর কিছু আঁচ করলেন। কলেজ ছুটির পর কোথায় যায় সে, এত রাত করে কেন ফেরে, হোষ্টেলে তার কাছে এত ছেলের আনাগোনা কেন, কি মতলব এদের—কমেটকে নোটিশ দিলেন অধ্যক্ষ অবিলম্বে হোষ্টেল ছেড়ে দেবার জন্য।

হোষ্টেল ছেড়ে দিয়ে কমেট ও তার এক সহপাঠি একখানা ঘর ভাড়া করল। মাথা গোঁজবার স্থান হল বটে, কিন্তু খাওয়া? ওরা নিজেরাই রান্না করতে লাগল। কমেটের বয়স তখন মাত্র বিশ বৎসর।

কমেটের দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় মানস রঞ্জন সেন কালেকটরেটে ট্রেজারী অফিসার। তখন একাই থাকতেন, চাকর রান্না করত। সরকারী চাকুরে বলে কমেট তাঁর ওখানে বড় একটা যেত না। কিন্তু কমেট নিজের হাতে রান্না করে শুনে তিনি ওকে নিজের বাড়ীতেই নিয়ে এলেন। তিনি কিন্তু আদৌ টের পাননি যে, বিশ বৎসর বয়সী কমেট মেদিনীপুরে পড়তে শুধু আসে নি, বিপ্লবী দল গঠনেও সে আত্মনিয়োগ করেছে এবং সেটাই তার প্রাথমিক কাজ।

১৯৩০ সালের এপ্রিলে মহাত্মা গান্ধী কাঁথিতে সদলবলে লবণ আইন ভঙ্গ করলেন। তিনি ভঙ্গ করবার সঙ্গে সঙ্গেই সারা মেদিনীপুরে, বাংলাদেশে, সমগ্র ভারতে আইনভঙ্গ আন্দোলন শুরু হয়ে গেল পুরোদমে। দলে দলে সত্যাগ্রহীরা কারাবরণ করতে লাগল।

মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তখন কর্ণেল জেমস পেডি, কাঁথি মহকুমার এস ডি পি ও সামসুদ্দোহা আর সেখানকার মহকুমা হাকিম আবদুল গফুর। এই তিনটি দানব মিলে নিরস্ত্র আন্দোলন নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্য সত্যাগ্রহী নরনারীর ওপর যে বর্বর অত্যাচার চালাচ্ছিল, ভাষায় তা প্রকাশ করা যায় না। নরী-

ভক্তি সত্যাগ্রহীদের পঞ্চাশ ষাট মাইল দূরে নিয়ে গিয়ে হয় নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে, নয়ত জনবসতিহীন প্রান্তরে লাথি মেরে ফেলে আসা হত রাত্রির অন্ধকারে। বুট চালাত, লাঠি চালাত, গুলী চালানো হত। নরপিশাচ পেডি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মেয়েদের উলঙ্গ করিয়ে আমোদ উপভোগ করত, তারপর নারী-খাদক নরপশুদের কবলে তাদের ফেলে দিয়ে উল্লাসে ফেটে পড়ত।

সারা বাংলা দেশ, বিশেষ করে মেদিনীপুরবাসী সেদিন প্রচণ্ড ক্রোধে নিজেদের হাত কামড়েছিল। সবার মুখে মুখে ঘুরছিল একটি অসহায় জিজ্ঞাসা: এই নৃশংস অত্যাচারের কি কোন জবাব নেই! কোন প্রতিবিধান নেই! এমন কি কেউ নেই মেদিনীপুরে—

সরকারী কর্মচারী মানস সেনও মাঝে মাঝেই কমেটের কাছে মন্তব্য করতেন, শালা পেডিকে কেউ মারতে পারে না?

বি এস সি-র টেষ্ট পরীক্ষা তখন হয়ে গেছে, কমেট তখন চলে এসেছে হিজলীতে। এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনীয়ার আত্মীয় ইন্দুভূষণ দাশগুপ্তের বাড়ীতে সে থাকে, মাঝে মাঝেই সাইকেলে চলে যায় মেদিনীপুরে। গেলেই মানসবাবুর সঙ্গে দেখা করে আসে আর দেখা হলেই মানস সেন বলেন, শালা পেডিকে কেউ মারতে পারে না?

পারে, পারে, নিশ্চয় পারে। দীনেশ গুপ্ত যে সংগঠনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছে, কমেট দাশগুপ্ত যে ভিত্তির ওপর গড়ে তুলেছে বি ভি-র মেদিনীপুর শাখা, স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্ম-বলিদানের মন্ত্র গ্রহণ করে যে শাখার ছেলেরা প্রাণ-প্রাচুর্য্যে টগবগ করে ফুটছে, কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল তারা, নরপিশাচ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট জেমস পেডিকে চিরদিনের মত ধরাধাম থেকে সরিয়ে দিতে হবে!

কলকাতায় সুপতি রায় একদিন প্রফুল্ল দত্তকে, আমাদের ফুলদাকে বলল যে, মেদিনীপুরের ছেলেরা পেডি নিধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, এমন কি, দুটি ছেলেকেও মনোনয়ন করেছে তারা, যারা আক্রমণ করবে, তাদের নাম বিমল দাশগুপ্ত আর যতিজীবন ঘোষ।

স্থির হল, ফুলদাই যাবেন মেদিনীপুরে একটি আটত্রিশ বোরের রিভলভার ও একটি পিস্তল নিয়ে, কথা বলবেন ছেলেদের সঙ্গে, বিশেষ করে বিমল ও যতির সঙ্গে, শুনবেন ওদের প্ল্যান, প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবেন, তারপর ওদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র দুটি দিয়ে ফিরে আসবেন কলকাতায়। এ্যাকশন হবে তারপর।

নির্দ্দিষ্ট দিনে ধবধবে ধুতি পাঞ্জাবী পরে একটি ষোল ইঞ্চি চামড়ার এ্যাটাচি কেস নিয়ে মেদিনীপুর-গামী ট্রেনের একখানি প্রথম শ্রেণীর কামরায় ফুলদা উঠে বসলেন ফুলবাবুটি সেজে। সঙ্গে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র, একটি আটত্রিশ বোরের রিভলবার, আর একটি পিস্তল।

সরকারী সেচ বিভাগীয় এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনীয়ার খগেন্দ্রনাথ গুহ মেদিনীপুর শহরে থাকেন। ফুলদার আত্মীয়। পেডির অতি বিশ্বস্ত বন্ধু ও অনুচরদের অন্যতম তিনি। ১৯৩০ সালে অনেকগুলি বৈপ্লবিক এ্যাকশন হয়ে গেছে, তাই সতর্ক হয়েছেন ইয়োরোপীয় অফিসাররা, কার্ড না পাঠিয়ে কেউ তাঁদের খাস কামরায় প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু এতই বিশ্বস্ত খগেনবাবু যে, পেডির কামরায় কার্ড ছাড়াই যখন খুশী ঢুকে পড়তেন এবং শুধু তাই নয়, উনি এলেই পেডি অন্য কেউ থাকলে তাকে বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করতে বলত। লোকে তাই বলাবলি করত আড়ালে, খগেন গুহ পেডি সাহেবের এক নম্বর ইনফরমার।

এ হেন আস্তানার খুবই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ। ১৯৩১ সালের মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ফুলদা এসে খগেনবাবুর বাড়ীতে উঠলেন।

কমেট এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করল, বলল সব।

তারপর কাঁসাই নদীর চরে ফণী দাস, নরেন দাস দেখা করল, বলল সব।

তারপর একদিন রাত্রে শহরের একটি বাড়ীতে এসে ফুলদার সঙ্গে দেখা করল বিমল আর ঘতিজীবন, বলল সব। নিশ্চিন্ত হলেন ফুলদা যে, যোগ্য দুটি ছেলেকেই মনোনয়ন করা হয়েছে। রিভলভার আর পিস্তল দিলেন, নির্দেশ দিলেন, কাজ শেষ করে পালিয়ে যাবে তোমরা।

তারপর ফুলদা আবার ফুলবাবুটি সেজে কলকাতায় ফিরে এলেন।

১৯৩১ সাল। ৭ এপ্রিল।

মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে প্রধান শিক্ষকের উদ্যোগে একটি শিক্ষামূলক প্রদর্শনী খোলা হয়েছে। অনুগ্রহ করে একদিন প্রদর্শনীতে পদধূলি দিয়ে উদ্যোক্তাদের ধন্য করবার জন্য জেলা শাসককে সবিনয় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। প্রাক্তন সামরিক অফিসার কর্নেল জেমস পেডি অতুল স্বাস্থ্যের অধিকারী, বোধহয় সেজন্যই বেশ সাহসী ও কতকটা বেপরোয়া।

৭ এপ্রিল পেডি দলবলে গিয়েছিল শিকার অভিযানে। সেদিনই আবার প্রদর্শনীর শেষ দিন। সারাটা দিন বাইরে কাটিয়ে ফেরবার পথে উদ্যোক্তাদের আমন্ত্রণের কথা মনে পড়ল। ভাবল, প্রদর্শনীটা একবার ঘুরেই যাওয়া যাক।

গান্ধীজীর প্রবর্তিত আইন অমান্য আন্দোলন তখন প্রত্যাহৃত। ৫ মার্চ গান্ধী-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে গেছে। আইন অমান্য আন্দোলনের বন্দীরা মুক্তি লাভ করেছেন। তখন চলছে ইংরেজ গভর্নমেন্টের সঙ্গে বৈঠকের পর বৈঠক, আলাপ আলোচনা, দর কষাকষি, গভর্নমেন্ট কতখানি স্বায়ত্ত-শাসন দিতে সম্মত এবং তাতে করে কংগ্রেসের দাবী কতখানি পূর্ণ হবে, তাই নিয়ে টানাপোড়েন। প্রচণ্ড ঝটিকার শেষে মৃত্যুর শীতলতার মত সমগ্র দেশে কেমন একটা থমথমে ভাব।

পাঠান দেহরক্ষিকে সঙ্গে নিয়ে পেডি যখন প্রদর্শনীতে এসে পৌঁছল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ সাতটা বেজে গেছে।

উদ্যোক্তারা ছুটে এলেন অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। প্রদর্শনীতে আলোর ব্যবস্থা থাকাসত্ত্বেও ছুটে লণ্ঠন নিয়ে এলেন পেডিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রদর্শনী দেখাবার জন্য। চতুর্দিকে দর্শকদের ভিড়, সেই ভিড়ের মধ্য দিয়ে পথ করে তাঁরা এগিয়ে নিয়ে চললেন পেডি ও তার দেহরক্ষিকে।

স্কুলের কক্ষে কক্ষে প্রদর্শনীর পোষ্টার, ছবি, ফটো ও নানারকম দ্রব্য। পেডি প্রথম কক্ষে প্রবেশ করল। সঙ্গে উদ্যোক্তারা, পোষ্টার ও ছবিগুলি ব্যাখ্যা করছেন। পশ্চাতে ক্ষুব্ধ জনতা।

রাত্রি ঠিক সাড়ে সাতটায় পেডি যেই দ্বিতীয় কক্ষে প্রবেশ করে মনোযোগ সহকারে পোষ্টার-গুলি দেখছে, উদ্যোক্তারা কথা বলছেন, এমন সময় অকস্মাৎ পেডির পেছনে মাত্র তিন ফুটের মধ্যে থেকে রিভলভার আর পিস্তল গর্জে উঠল পর পর সাত আট বার। পেছনেই দরজা, দরজা দিয়ে আততায়ীরা প্রাণপণে ছুটল।

হৈ চৈ পড়ে গেল। ঠেলাঠেলি, ছোড়াদৌড়ি, ছুটোছুটি। লণ্ঠন ছিটকে পড়ে দপ দপ করে নিভে গেল। পাঠান দেহরক্ষি বেল্ট থেকে চকিতে রিভলভার খুলে ফেললেও গুলী করবে কাকে? কোথায় আততায়ী।

জনতার মধ্যে থেকে কে একটি ছেলে চীৎকার করে উঠল, আরেঃ, ও যে বিমলদা।

বিমলদা, মানে, বিমল দাশগুপ্ত। যতিজীবনকে কেউ চিনতে পারেনি।

কিন্তু আততায়ীরা পালিয়ে গেলেও পেডি কোথায়? পেডি?

দেখা গেল, পাশের কক্ষে চলে গেছে সে, দেয়াল ঠেস দিয়ে প্রস্তর মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। তিনটে বুলেট পিঠের মধ্য দিয়ে তার শরীরে ঢুকে গেছে, দুটি বুলেট বিঁধেছে দুই হাতে। রক্তস্রোতে মেঝে ভেসে যাচ্ছে, কিন্তু আশ্চর্য্য, তখনও সংজ্ঞা হারায়নি সে। দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মারাত্মক অবস্থায় তৎক্ষণাৎ একখানা ঘোড়ার গাড়ীতে পেডিকে হাসপাতালে পাঠানো হল।

ফোন করা হল কলকাতায়।

একখানি স্পেশাল ট্রেনে সার্জ্জন ও নার্স এসে পৌঁছলেন রাত আড়াইটেতে।

তৎক্ষণাৎ অস্ত্রোপচার করে একটি বুলেট বার করে ফেলা হল।

পরদিন সকালে দশটায় আবার অস্ত্রোপচার।

কিন্তু অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে লাগল।

অবশেষে, ডাক্তারদের সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা ও শ্রম ব্যর্থ করে দিয়ে, বি ভি-র মেদিনীপুর শাখার প্রথম টার্গেট দুর্দ্ধর্ষ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ণেল জেমস পেডি ৮ এপ্রিল অপরাহ্ণ পাঁচটায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

নিরস্ত্র নিরুপদ্রব আইন অমান্য হলেও এবং গান্ধীজীর এই আন্দোলনের ফলে দেশ স্বাধীন হবে, বিপ্লবীরা তা বিশ্বাস না করলেও এই আন্দোলন নিঃসন্দেহে জাতীয় আন্দোলন, এই জাতীয় অহিংস আন্দোলনের সত্যাগ্রহীদের ওপর, বিশেষ করে মা বোনের ওপর যে ইয়োরোপীয় পাশব নৃশংস অত্যাচার করেছিল, বি ভি-র অকুতোভয় বিপ্লবীরা তার জীবনের ওপর রক্তাক্ত যবনিকা টেনে দিল।

কিন্তু ঐ যে, একটি ছেলে বলে উঠেছিল, ও যে বিমলদা, পুলিশ তাতেই জানতে পারল যে, আততায়ী দুজনের অন্যতম বিমল দাশগুপ্ত। কিন্তু আরেকজন? হয়ত প্রদর্শনীতে আলোর ব্যবস্থা প্রচুর ছিল না কিংবা হয়ত নিরীহ গোছের ছেলে যতিজীবনকে কেউ বড় একটা চিনত না কিংবা হয়ত তার প্রতি ভাল করে নজর দেবার পূর্ব্বেই সে দ্রুত ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। তাই পরম নিশ্চিন্তে যতিজীবন আবার বাড়ীতে ফিরে গেল।

পুলিশ তৎক্ষণাৎ হানা দিল বিমলদের বাড়ীতে। নেই। হানা দিল শহরের সম্ভাব্য সমস্ত জায়গায়। নেই। শহর থেকে বেরিয়ে যাবার সবগুলো পথের ধারে ওৎ পেতে অপেক্ষায় রইল। নাঃ, বিমলের পাত্তা নেই। বিমলকে গ্রেপ্তারের জন্য আড়াই হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হল।

বিমল তখন নিরাপদে কলকাতায় চলে এসেছে।

ফেরারী বিমলকে কোথায় রাখা যায়? পুলিশের চর গিজগিজ করছে কলকাতায়। সুতরাং কলকাতা আদৌ নিরাপদ নয়। বিমল কিন্তু লোম্যান নিধনকারী বিনয় বসুর মত বার বার দাবী জানাতে লাগল, আর একটা এ্যাকশনে আমায় নিয়োগ করা হোক। কিন্তু পরবর্ত্তী টার্গেট নির্ব্বাচনেও ত সময় লাগবে, ততদিন কোথায় রাখা যায় ওকে লুকিয়ে?

ঝরিয়ার আপার লোদনা কোলিয়ারীর অন্যতম কয়লা তোলার ঠিকাদার কৃষ্ণকালী বসু। তাঁর নিজেরও একটা কারখানা আছে। সেখানকার ইঞ্জিনীয়ার পুলিন বিশ্বাসী পাইন। এঁরা দুজনায় বিশেষ

পরিচিত। ফুলদা ওঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সব বললেন, ওঁরা রাজী হলেন। বিমলকে সেই আপার সোবনা কোলিয়ারীতে পাঠানো হল।

নিশ্চিন্ত রইল সে দু তিন মাস।

তারপর অন্য একটা কোলিয়ারীতে থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন রসময় সুর, বি ভি-র অন্যতম প্রথম সারির নেতা। তারপর সরে গেল বিমল আর এক জায়গায়। আবারও সে দাবী জানাতে লাগল দ্বিতীয় এ্যাকশনের।

অবশেষে ফুলদা সুপতি রায়ের সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করলেন, এবার খতম করতে হবে ইয়োরোপীয়ান এ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান ভিলিয়ার্সকে আর সে কাজের ভার দেওয়া হবে ফেরারী বিমল দাশগুপ্তকে। ভিলিয়ার্সের নিজের একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে। অফিস ক্লাইভ ষ্ট্রীটে গিল্যাণ্ডার্স হাউস বিল্ডিং-এর তেতলায়। স্থির হল, সেখানেই যাবে বিমল।

আক্রমণের তারিখ নির্দ্দিষ্ট করা হল ২১ অকটোবর, ১৯৩১সাল।

আবার ফুলদার সেই ভূমিকা। রাইটার্স অভিযানের মাত্র দু দিন পূর্ব্বে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এর ডিগ্রীধারী ফুলদা চাকরি প্রার্থীর ভূমিকা নিয়ে গিয়েছিলেন সোজা রাইটার্স বিল্ডিংস-এ দেখে আসতে কোথায় দোতলায় যাবার সিঁড়ি, দোতলায় পাশাপাশি চেম্বারগুলোর বাইরে কোন্ কোন্ ইয়োরোপীয় অফিসারের নেম প্লেট, কোথা দিয়ে উঠবে বিনয় বাদল দীনেশ আর কোথা থেকে সুরু করবে আক্রমণ।

ভিলিয়ার্সকে আক্রমণের সিদ্ধান্ত যখন নেয়া হল, ফুলদা তখন শিল্পপতি, বরানগরে গোপাললাল ঠাকুর রোডে স্থাপন করেছেন শিল্পপীঠ নামে প্রতিষ্ঠান। সুতরাং আর চাকরি প্রার্থীর ভূমিকা চলবে না। আক্রমণের মাত্র পাঁচ সাতদিন পূর্ব্বে ফুলদা সোজা গেলেন ভিলিয়ার্সের অফিসে। কার্ড পাঠালেন। ডাক এল। ফুলদা এ্যাটাচি কেস হাতে ভিলিয়ার্সের কক্ষে প্রবেশ করলেন। আলোচনা মুখোমুখি বসে : শিল্পপীঠে নির্ম্মিয়মান স্পিরিট ষ্টোভ ও স্পিরিট ল্যাম্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল ভিলিয়ার্স সরবরাহ করতে পারবে কিনা।

আলোচনা করে, যা যা লক্ষ্য করবার, সব ভাল করে দেখে ফুলদা চলে এলেন।

মেদিনীপুরের ছেলে বিমল দাশগুপ্ত। মেদিনীপুরে বি ভি-র শাখা সংগঠক শশাঙ্ক (কমেট) দাশগুপ্ত। মেদিনীপুরে পেডিকে হত্যা করে বিমল এসেছে কলকাতায় ফেরারী হয়ে। বিমল আজ, ২১ অকটোবর ১৯৩১ সাল, ভিলিয়ার্সকে আক্রমণ করবে। সুতরাং কমেট কি আর হিজলীতে থাকতে পারে নিশ্চিন্তে বসে? সে তাই কলকাতায় চলে এসেছে। বি ভি-র বিনয় (ওরফে সর্ব্বা) সেন তখন থাকত বহুবাজার স্ট্রীটে ডোমিনিয়ন ক্লাব নামীয় একটি মেসে। কমেট এসে সেই মেসে উঠেছে সর্ব্বার গেষ্ট হয়ে।

আক্রমণের দিন সকাল বেলা সর্ব্বা কমেটকে বলল দেখে আসতে ভিলিয়ার্স তার অফিসে এসেছে কিনা, অফিসে আছে কিনা।

চাকরি প্রার্থীর ভূমিকা নিয়ে বেলা দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে কমেট গিয়ে হাজির হল গিল্যাণ্ডার্স হাউসে। লিফট-এ উঠল তেতলায়। করিডরের দুপাশে সারি সারি অনেক অফিস। প্রায় শেষ দিকের একটি ঘরের বাইরে চক চক করছে নেম প্লেট, ই. ভিলিয়ার্স। দরজায় চাপকান-পরা বেয়ারা।

সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চায় শুনে বেয়ারা ভিজিটর্স স্লিপ দিল, কমেট নাম লিখে দিল, মাধব রায়। সাক্ষাতের কারণ লিখল, সিকিং এমপ্লয়মেণ্ট।

স্লিপ হাতে হাফ সুইং ডোর ঠেলে বেয়ারা ভেতরে ঢোকবার সময়ই এক ঝলক দেখতে পেল কমেট যে, দরজার সোজা বেশ বড় সেক্রেটারীয়েট টেবিল, টেবিলের ওপাশে বসে ভিলিয়ার্স নিবিষ্ট মনে কি লিখছে।

বেয়ারা একটু পরই ফিরে এল, বলল, সাহেব বললেন কোন চাকরি খালি নেই, এখন দেখা হবে না।

না হল, কমেটের যা দেখবার, তা সে দেখে নিয়েছে। বেয়ারার কাছে বেকারের দুঃখ-বেদনা জানিয়ে সে ধীরে ধীরে চলে এল। নেমেই সোজা ডোমিনিয়ন ক্লাবে। সর্দা সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল, শুনল সব।

একটি গোপন আশ্রয়ে রেডি হয়ে অপেক্ষা করছিল বিমল। পরণে কেতাদুরস্ত সাহেবী পোষাক, মাথায় মুসলমানী ফেজ, এখন যাকে বলে, জিন্না টুপি। আর দুই পকেটে দুটো রিভলবার। একই সঙ্গে দুহাতে দুটো চালাবার জন্য নয়। একটির চেম্বারগুলো খালি হয়ে গেলে আবার তাতে গুলী ভরে নেবার সুযোগ ও সময় নাও পাওয়া যেতে পারে। তাই একটি শেষ হয়ে গেলেই আরেকটি বার করবে।

বেলা প্রায় বারোটা। সর্দা বিমলকে ভিলিয়ার্সের অফিসে নিয়ে চলল। লিফট এ উঠল তেতলায়। করিডরের আধখানা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে দুজনে দাঁড়াল একটু। তারপর সাফল্য কামনা করে সর্দা নেমে চলে গেল। বিমল এগিয়ে চলল।

বেয়ারা জানাল, স্লিপ দিতে হবে। তবে সাহেব এখন তিনজন সাহেবের সঙ্গে কথা বলছেন। ওঁরা চলে যাবার পর দেখা হতে পারে।

চলে যাবার পর। সে ত আর ঘণ্টা এক ঘণ্টাও হতে পারে। পেডি নিধনকারী ফেরারী বিমল দাশ গুপ্ত, যার মাথার দাম ধার্য্য হয়েছে আড়াই হাজার টাকা, এতগুলো অফিসের সামনে এত লোকজন আনা-গোনার মাঝে কতক্ষণ অপেক্ষা করবে সে? যদি কেউ চিনে ফেলে?

এক ধাক্কা মেরে বেয়ারাকে সরিয়ে দিয়ে সুইং দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল বিমল। ঢুকেই গুলী চালাল।

প্রাণভয়ে ভিলিয়ার্স টেবিলের নীচে ঢুকতেই বিমল লাফ দিয়ে টেবিলের ওপর উঠে উপুড় হয়ে আবার গুলী চালাল। আগের দুটো গুলী লাগেনি, তৃতীয়টি ওর পিঠ ছেড়ে দিয়ে গেল।

এমন সময় সাহেব তিনজন মরিয়া হয়ে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে টেবিলের সঙ্গে চেপে ধরল। ধস্তা-ধস্তি করল বিমল, কিন্তু তিনজনের সঙ্গে পারা কি সম্ভব?

বিমল ধরা পড়ে গেল।

সুসংবাদ বহন করে নিয়ে যাবে বলে নীচের ফুটপাথে অপেক্ষা করছিল সর্দা।

কিন্তু হায়, সুসংবাদ দুঃসংবাদে পরিণত হল।

ডোমিনিয়ন ক্লাবে যখন ফিরে এল, তার উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা আর বিবর্ণ মুখ দেখে কমেট উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, কি বিনয়বাবু, কি হয়েছে আপনার?

কোনো জবাব না দিয়ে সর্ব্বা কুঁজোটা তুলে নিল। কমেট বলে উঠল, আরে মশাই, গ্লাসে খান। শুনল না সর্ব্বা, কুঁজোটা তুলে চক চক করে অনেকখানি জল খেল, তারপর বিছানায় পড়ে রইল চোখ বুঁজে।

কমেট স্পষ্ট কিছুই বুঝতে পারল না। কিন্তু স্পষ্ট করে কিছু জিজ্ঞাসাও করতে পারল না। গুপ্ত সমিতির সদস্যদের সর্ব্বপ্রকার কৌতূহল অবশ্য পরিত্যাজ্য। তোমার ডান হাত কি করছে, বাঁ হাতের তা জানবার অধিকার নেই।

বিকেলেই বেরুল খবরের কাগজের বিশেষ সংস্করণ, তাতে বড় বড় হরফে শিরোনামা, ইয়োরোপীয়ান এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ভিলিয়ার্স আক্রান্ত। বিপ্লবীর উপর্য্যুপরি গুলীবর্ষণ। ভিলিয়ার্স সামান্য আহত। হাতেনাতে ধৃত বিপ্লবীর নাম বিমল দাশগুপ্ত। পেডি হত্যার ব্যাপারে ফেরারী।

সর্ব্বা বলল, আজই মেস ছাড়তে হবে আমাদের।

যেই কথা সেই কাজ। সেই রাত্রেই সর্ব্বা চলে গেল অন্যত্র আর কমেট এসে আশ্রয় নিল বিপ্লবী সহকর্ম্মি মনোরঞ্জন সেনদের ১০-এ শ্যাম খোয়ারের বাসায়।

দুদিন পর রাত্রে এসে বিপ্লবী-বন্ধু বীরেন ঘোষ খবর দিল, পুলিশ মনোরঞ্জন আর কমেটকে খুঁজছে। শোভাবাজারে বিপ্লবী সহকর্ম্মি ইন্দুভূষণ সরকারের একটি গুপ্ত আশ্রয়-স্থল ছিল একটি দরজির দোকান। মনোরঞ্জন আর কমেট সেই রাত্রেই সেখানে সরে পড়ল।

পরদিন সকালেই বীরেন নিয়ে গেল বৌবাজারে একটি মেসে। রাত্রেই ওরা আবার চলে গেল দক্ষিণ কলকাতার কমেটের দিদির বাসায়।

রাত এগারোটায় বীরেন ওদের নিয়ে এল ৩১ কানাই ধর লেনে বন্ধু সুকুমার মজুমদারের বাড়ীতে। পৌঁছে দিয়ে বীরেন চলে গেল। পরদিন আবার আসবে সে, ওদের অন্য জায়গায় নিয়ে যাবে।

কিন্তু ভোরবেলাই পুলিশ বাড়ীখানা ঘিরে ফেলল। ওদের শীকার বিপ্লবী সুকুমার মজুমদার। সে থাকত দোতলায়। তাকে গ্রেপ্তার করে বেরিয়ে যাবার সময় হঠাৎ দেখতে পেল নীচের তলার একটা ঘর ভেতর থেকে বন্ধ। দরজা খোল, দরজা খোল, পুলিশ হাঁক দিতে লাগল।

আর উপায় নেই। দরজা খুলে দিল কমেট। ধরা পড়ে গেল কমেট (শশাঙ্ক) দাশগুপ্ত আর মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত।

সেটা নভেম্বর মাস, ১৯৩১ সাল।

কিন্তু বিমল? বিমল দাশগুপ্ত? অনেক চেষ্টা করল পুলিশ পেডি হত্যা এবং ভিলিয়ার্সকে আক্রমণ কেন্দ্র করে একটি ষড়যন্ত্র মামলা করার। কিন্তু সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। তখন সুরু হল বিমলের নামে ভিলিয়ার্সকে আক্রমণের মামলা।

তার দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়ে গেল।

কিন্তু মনোরঞ্জন আর মেদিনীপুর সংগঠনের অন্যতম নায়ক কমেটের নামে কোন মামলা করতে পারল না পুলিশ। তাদের রাজবন্দী করে আটক রাখা হল।

[ক্রমশঃ

আবার সেই জেল

জলপাইগুড়ী জেলের সুপার পর্ব্ব

বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(পনেরো)

জেলার ফণীন্দ্র নাথ ঘোষাল। ডেপুটি জেলার অনঙ্গ ভূষণ গাঙ্গুলী। এ্যাকাউনটেন্ট নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। কেরাণী অজিতকুমার গুহ ঠাকুরতা। —ব্যস. এই চারজন নিয়ে আমার জলপাইগুড়ী জেল অফিসের সংসার। না, আরও একজন আছেন, সাব এ্যাসিষ্টেন্ট সার্জ্জন ডাক্তার সুদেব ব্যানার্জ্জী। তাঁর অফিস জেলের হাসপাতালে। বন্দীর সংখ্যা প্রায় তিনশো, কখনও কখনও নাকি চারশো ছাড়িয়ে যায় শুনলাম। অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর ডিসট্রিক্ট জেল। আর বন্দীদের গার্ড দেবার জন্য সিপাই-এর সংখ্যা পঞ্চাশ এখানে মেয়ে বন্দীও রাখা হয় বলে একজন মাত্র ফিমেল ওয়ার্ডার আছে, নাম বিনোদিনী ঘোষ।

দমদমের তুলনায় সংসার আমার অতি ক্ষুদ্র হলে কি হবে, এখানকার ঝামেলা অতি বৃহৎ ও জটিল। এই প্রথম একটা পুরো জেলের ভার পেলাম, অর্থাৎ হাতের কাছেই সুপারিনটেনডেন্ট সুধীর মজুমদার নেই যে বৃহৎ জটিলতার সমাধানে বুদ্ধি ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবেন অভিভাবকের মত।

একেবারে একক হাতে সর্ব্বপ্রকার অবস্থার মোকাবিলা করতে হবে।

জেলার বললেন যে, তিনি এই জেলে যোগদানের পূর্ব্বেই বন্দীরা তিন তিনবার বিষ্ঠা মেশানো জল ডাক্তার ব্যানার্জ্জীর গায়ে ঢেলেছে। তাঁর ধারণা, ডাক্তারের হীনমন্যতা ও কূটনীতিই এই গোলমালের কারণ। এখানে কারুর সঙ্গে কারুর সদ্ভাব নেই।

ডেপুটি জেলার বললেন যে, ব্যানার্জ্জী বন্দীদের সঙ্গে অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করেন বলেই ওরা রেগে ওঁর গায়ে বিষ্ঠা ফেলেছে। তিনি নিজে সাতেও নেই, পাঁচেও নেই।

এ্যাকাউনটেন্ট সবিনয়ে জানালেন যে, মিছেমিছি তাঁকে এর মধ্যে জড়ানো হয়েছে। ছিলেন আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে। আই জি ওখানকার সুপার চারু চক্রবর্ত্তী মশায়কে ধায়েল করবার উদ্দেশ্যে যে ফাঁদ পেতেছিলেন, আই জি-র ধারণা, নীরেনবাবুই ষ্টোরের ডবল রেজিষ্টার যাতায়াতি তৈরী করে চারুবাবুকে

বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। তাই কিছু করতে না পেরে আই জি ওঁকে এতদূরে পানিশমেন্ট ট্রান্সফার করেছেন। এই অফিসের কোন রাজনীতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নেই।

কেয়ানীবাবু বরিশালের লোক, সাধারণতঃ উচ্চকণ্ঠে কথা বলেন। বললেন, স্যার, ডাক্তার যেমন দেমাকী, তেমন অভদ্র। মেডিক্যাল স্কুল থেকে পাশ করা এল এম এফ ডাক্তারদের আমাদের জেল কোডে বলা হয়েছে সাব এ্যাসিষ্টেন্ট সার্জেন, অর্থাৎ এস এ এস। কিন্তু হেলথ ডিপার্টমেন্টের সার্কুলারে বলা হয়েছে, যে, এ্যাসিষ্টেন্ট সার্জেনের মত ওঁরাও 'মেডিক্যাল অফিসার।' উনি বলেন আমরা নাকি ষড়যন্ত্র করে বন্দীদের দিয়ে ওঁর গায়ে বিষ্ঠা ফেলিয়েছি। একটু থেমে বললেন, ওঁকে কিছু করতে হলে অপর কারুর সাহায্যের দরকার কি স্যার, আমার একটা চড় খেলেই যে ওঁর ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যাবে।

অজিতবাবুর দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, কথাটা আদৌ মিথ্যে নয়। হাফ সার্টের নীচে বুকখানা বেশ চওড়া, মাথার চুলে মড়ক লেগেছে বলেই ঘাংসল ঘাড়ের স্বাস্থ্য আরও প্রকট, হাতের যে অংশটুকু এবং যে কটি মোটা মোটা আঙুল দেখা যাচ্ছে, তাতে আর বিন্দুমাত্র সংশয়ের অবকাশ নেই যে, স্থূলকায় ডাক্তার ব্যানার্জীর পক্ষে ওঁর একটি চপেটাঘাতই যথেষ্ট।

আর সবার ওপর, অজিতবাবুর দেশ ছিল বরিশালে। আমার অনেক বন্ধু আছেন, যাঁদের বাড়ী বরিশালে। যে দেশে রেলওয়ে নেই, যে দেশে বহু অঞ্চল বারো মাসই জলের নীচে ডুবে থাকে, যে দেশের ওপর দিয়ে বঙ্গোপসাগরের প্রবল সাইক্লোন হামেসাই বয়ে যায়। বাংলা দেশের মধ্যে এই একটি দেশ, যে দেশের মানুষকে দেখেছি অত্যন্ত বেহিসাবী বেপরোয়া। মনের কথা, তা সে যতই কড়া হোক, কঠিন হোক, মুখে উচ্চারণ করতে এতটুকু দ্বিধা নেই, নেই কোন সঙ্কোচ। সে কথার ফলাফল কি হবে, কি হতে পারে, তা নিয়ে বিন্দুমাত্র ভাবনা চিন্তা নেই। চুলিসারে কাজ সারবার কলাকৌশল এদের জানা নেই, গরিলা যুদ্ধের রণনীতি এদের হৃদয় স্পর্শ করে না, এদের লড়াইয়ে নেই কোন বিবর খাটি, নেই কোন পাথর ঢিবি বা ঝোপ-ঝাপের আড়াল থেকে লড়াই চালানোর ট্যাকটিক্স, সাইরেন শুনে এরা কোন ব্লিচ ট্রেঞ্চের নিরাপত্তায় আশ্রয় নিতে রাজী নয়। এরা আলোর মত স্পষ্ট, খাপখোলা তলওয়ারের মত বে-আব্রু। ইস্পাতের মত এরা ভেঙ্গে টুকরো হয়ে যেতে পারে, কিন্তু লোহার মত দুমড়ে মুচড়ে গিয়েও বেঁচে থাকতে রাজী নয়।

তাই অজিতবাবু স্পষ্ট অর্থহীন ভাষায় মনের কথা জানিয়ে দিলেন।

ডাক্তার সুদেব ব্যানার্জী বললেন যে, এ জেলের সবাই চোর। বন্দীদের সঙ্গে দেখা করতে এলে ডেপুটি জেলারকে বিশ টাকা সেলামী না দিলে দেখা হয় না। ওঁর বাড়ীর বাগানে জেলের গুদাম থেকে আলুর বাঁচন নিয়ে লাগানো হয়েছে। ঠিকাদার ত্রিশ সের চিড়ে সাপ্লাই করলে অজিত বাবু এক মণ লিখে রাখেন। ওঁর বাড়ীতে যে টেবিল ফ্যানটা আছে, তা ঐ ঠিকাদারের দেয়া। নীরেন বাবু অজিতবাবুর যোগসাজসে জেলের গুদাম থেকে চাল ডাল তেল নুন নিয়ে যান। আর গুরুদেবের শ্রীচরণে সমর্পিত প্রাণ জেলার এসব পার্থিব ব্যাপারে বিন্দুমাত্র অনীহা দেখান, অথচ সন্ধ্যের পর তাঁর বাড়ীতে ফিমেল ওয়ার্ডার বিনোদিনীকে যেতে দেখা যায়। ওর স্বামী এখানে থাকে না আর জেলারের বাড়ীতে আছে শুধু তাঁর সত্তর বছরের শাশুড়ী। বাকি দেয়া কত সহজ বুঝে দেখুন।

পরিশেষে ব্যানার্জী বললেন, এসব অন্যায় আমি বরদাস্ত করতে পারি না, বাধা দিই, আই জি-কে সব জানিয়ে দিয়েছিলাম বলেই আমার ওপর ওঁদের রাগ, তাই বন্দীদের দিয়ে আমার গায়ে বিষ্টা মেশানো জল ফেলিয়েছেন। আমি একা মেডিক্যাল অফিসার, পারব কেন ওদের সঙ্গে?

এই হচ্ছে জলপাইগুড়ী জেলের পরিস্থিতি। অনেক বিবেচনার পর ক্যাবিনেট আমায় পাঠিয়েছেন এই সব ক্রেদ সাফ করবার জন্য। ডি এম ও পারেননি, তাই নিয়োগ করা হয়েছে আমাকে। হোলটাইম বিভাগীয় সুপারিনটেনডেন্ট।

কিন্তু বুঝতে পারলাম, মামলা সহজ নয়।

জলপাইগুড়ী শহরে আমার বড় ভাসুরের বাড়ী, তাঁর নামও বিজেন গাঙ্গুলী। বয়সে আমার চাইতে অন্ততঃ পনেরো বছর বড়। রংপুর জেলার সৈয়দপুরে জমিজমা ও বাড়ী ছিল, বঙ্গ বিভাগের পর এখানে এসে নয়াবস্তিতে বাড়ী করেছেন।

যতদিন না ভাড়াটে বাড়ী পাই, ততদিন তাঁর বাড়ীতে থাকবার জন্য উনি সাদর আমন্ত্রণ জানালেন। ওঁর স্ত্রী, মানে আমার শ্যালিকা, আমার চাইতে তিন বৎসরের বড়, ওঁর স্বামীর নামে নাম বলে আমার নতুন নামকরণ করেছেন, 'সুদর্শন', একান্তে ডেকে পটাবার চেষ্টা করলেন, যাতে আমি ওঁদের বাড়ীতেই থাকি।

হেসে বললাম, আমার আই জি যেই জেনে যাবেন যে, এখানে আত্মীয়ের বাড়ীতে আমি থাকবার সুবিধা পেয়ে গেছি, তাহলে আর সরকারী বাড়ীর জন্য মাথা ঘামাবেন না, বুঝলেন বড়দি?

বড়দির বুঝতে আদৌ অসুবিধা না হলেও তিনি জেলারের বাড়ীতে এসে জেলার ও তাঁর শাশুড়ীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে গেলেন এবং মাঝে মাঝেই টিফিন ক্যারিয়ার ভর্তি করে রান্না-করা এটা ওটা সেটা জেলার ও আমার জন্য পাঠাতে লাগলেন।

আর চেনাজানা সবাইকে নিয়োগ করতে লাগলেন আমার জন্য একটা ভাল ভাড়াটে বাড়ী খুঁজে দেবার জন্য জেল থেকে আধ মাইলের মধ্যে। বাড়ী না পেলে তাঁর ছোট বোনটি অর্থাৎ আমার শিল্পা আদবে কি করে? সেও ত আর জেলারের বাড়ীতে উঠতে পারে না।

জেলার ও তাঁর শাশুড়ীর আদর আপ্যায়নে বিন্দুমাত্র ত্রুটি নেই। জেলারের স্ত্রী মৃত। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলে দমদম জেলের কাছে একটি বিরাট কারখানায় ইঞ্জিনীয়ার এ্যাপ্রেন্টিস। তাই বিধবা বৃদ্ধা শাশুড়ীকে আনিয়েছেন। আমি আসাতে ওঁর ভালই হয়েছে। তবু পরের বাড়ীতে অনির্দিষ্ট কাল থাকা ভাল দেখায় না। তারপর ছেলেমেয়েকে এনে স্কুলে ভর্তি করা দরকার। তাই প্রায়ই বিকেলে জেলার ও আমি ভাড়াটে বাড়ীর সন্ধানে শহরে ঘোরাঘুরি করা সুরু করলাম।

জলপাইগুড়ী জেলের পরিধি এত কম যে, অন্ততঃ দশটা এরকম জেলকে অনায়াসে দমদম সেনট্রাল জেলের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া যায়। জেলের গেটটাও অভিনব, এখনকার বৈদ্যুতিক ট্রেনের বগির দরজার মত পাট দুটি দুপাশে ঢুকে যায়। পাটের নীচে ছোট ছোট লোহার চাকা লাগানো আছে বটে, কিন্তু বিরাট পাট সরাবার জন্য অন্ততঃ আট দশ জন লোকের দরকার হয়। গেজেটেড অফিসারদের জন্য বড় গেট খোলার নিয়ম আর ঐ গেটের একটি পাটে যে আরেকটি ছোট গেট লাগানো আছে, যাকে বলা হয়, 'উইকেট গেট', সেটা খোলা হয় নন-গেজেটেড কর্মচারীদের বেলায়। কিন্তু জেলার বা আমার যাতায়াতের বেলায় বড় গেট খোলার জন্য বার বার একদল বন্দীকে ডেকে আনা সম্ভব কি? জেলার আগেই করতেন, আমি বললাম যে, আমিও উইকেট গেট দিয়েই যাতায়াত করব।

জেলার জানালেন, স্যাংশন এসে গেছে স্যার, এবার কবজাওয়ালা পাট তৈরী হবে।

আরও একটি মহা অসুবিধা, সুপারিনটেনডেন্টের জন্য পৃথক কোন অফিস কক্ষ নেই। জেলারের কক্ষেই সুপারের টেবিল। ডি এম ও থাকতে বিশেষ কোন অসুবিধা হয়নি। দৈনিক আসতেন না তিনি, এলেও থাকতেন মাত্র ঘণ্টাখানেক। জেলারই সব রেজিষ্টার ও চিঠি রেডি করে রাখতেন, নিজে ইনিশিয়েলও করে রাখতেন, ডি এম ও এসে চোখ বুঁজে সই করে দিয়ে চলে যেতেন। কোনওদিন খুশী হলে জেলের মধ্যে একটা ঘুরপাক দিয়ে যেতেন।

কিন্তু হোলটাইম সুপার আমার পক্ষে দারুণ অসুবিধা। আমার দৈনিক অফিস সকাল সাড়ে সাতটা থেকে বারোটা, আবার বিকেল চারটে থেকে যতক্ষণ প্রয়োজন। একেবারে আক্ষরিক অর্থে জেলার জেলের চীফ একজিকিউটিভ অফিসার। হরদম তাঁর কাছে লোক আসে। আসে অফিসের বাবুরা, সিপাই, মেট, পাহারা ও বন্দীরা। নানারকম অভিযোগের ফয়সালা করতে হয়। বাইরে থেকে আসেন ঠিকাদার, উকিল, মোক্তার। সবার সঙ্গেই জেলারের কথা বলতে হয়। আমার উপস্থিতিতে ওদের যেমন অসুবিধা হয়, তেমনি ওদের কথোপকথনের মধ্যে আমার পক্ষেও নিবিষ্ট মনে কাজ করা সম্ভব নয়। তারপর জেলের আইন অনুসারে সুপার এলেই জেলারকে উঠে দাঁড়িয়ে স্যালুট করতে হবে, সুপার প্রয়োজন বোধে জেলারের বিরুদ্ধে ডিসিপ্লিনারী এ্যাকশনও নিতে পারেন। সুতরাং সেই জেলারের সঙ্গে একই ঘরে বসে পাশাপাশি টেবিলে কাজ করা বিসদৃশ নয় কি?

জেলার বললেন যে, স্যাংশন এসে গেছে। জেলারের কক্ষের পশ্চিম দিকে যে এক ফালি বারান্দা আছে, তাতে দরজা জানালা বসিয়ে সুপারিনটেনডেন্টের পৃথক অফিস কক্ষ তৈরী হবে।

জেলের অভ্যন্তরের পরিধি ছোট হলে কি হবে, জেলের পেছনে প্রায় ত্রিশ বিঘা জমির সবজি বাগান। তরিতরকারীর চাষ হয় এবং তাতে বন্দীদের প্রায় ছয় মাসের প্রয়োজন মিটে যায়। তা ছাড়া আছে বারোমেসে কাঁঠাল গাছ, আম জাম তেঁতুল গাছ, আছে গন্ধরাজ লেবু গাছ ও আনারস গাছের ঝাড়। বহু কাঁচকলার গাছ আছে আর আছে পেঁপে গাছ। বাগানের একদিকে একটা ছোট পুকুর আছে আর মাঝখানে একটা ইঁদারা সেচ ব্যবস্থার জন্য।

একেবারে রায়কত পাড়ার মাঝখানে এই জেল আর কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা জেলের এই বাগান। পূব দিকে অপ্রশস্ত একটি খাল, খালের ওপারে রিফিউজী কলোনী। কাঁটা তার দিয়ে চুরি ঠেকানো যায় না। আইন অনুসারে রাত্রিকালে একজন সিপাই বাগানের মধ্যেই থাকে, তার জন্য আছে খড়ের ঘর ও রান্না ঘর। লণ্ঠন হাতে সে ফল ও ফসল পাহারা দেয়। কিন্তু কে না জানে যে, পাহারাওয়ালার লণ্ঠনই চোরদের কাছে সতর্ক হবার ইসারা। লণ্ঠন ওদিকে গেলে তারা এদিকটাতে কাজ হাসিল করে ফেলে।

চোরের অত্যাচারের সঙ্গে আছে শূকরের অত্যাচার। সদর হাসপাতালের ভোম বস্তি দক্ষিণ দিকে ঠিক বেড়ার বাইরে। ওদের পোষা শূকরের দল ফাঁক ফাঁক কাঁটাতারের তলা দিয়ে দিব্যি বাগানে ঢুকে ফসল খেয়ে যায়। বিশেষ করে আনারসের গাছগুলোর গোড়া খুঁড়ে খেতে ওদের ভারী আনন্দ।

জেল কম্পাউণ্ডে ঢুকলেই বাঁ দিকে একটা ছোট পুকুর আর গেটের কাছে গোটাকতক লিচু গাছ। গেটের উলটো দিকে চল্লিশ গজের মধ্যেই জেলারের বাড়ী, একতলা। যে ঘরে আমি থাকি, সেখান থেকে স্পষ্ট জেলের গেট দেখতে পাওয়া যায়। দূরত্বই বা আর কতটুক? মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটা ত্রিশ গজের বেশী হবে না।

জেলারের বাড়ীর উত্তর দিকে জমাদারের কোয়ার্টার্স, ফিমেল ওয়ার্ডারের কোয়ার্টার্স, গোটা কয়েক সিপাই-এর বাড়ী, তারপর ডেপুটি জেলারের কোয়ার্টার্স। দক্ষিণে ডাক্তার সুখের ব্যানার্জীর বাড়ী। এ্যাকাউনটেন্ট নারেনবাবু বায়ুকত পাড়ার বাড়ীভাড়া করে থাকেন আর কেরাণী অজিতবাবু থাকেন জেলের সিভিল ওয়ার্ডে।

পাওনা টাকা না দিলে, পাওনাদার যদি দেখেন দেনাদারের এমন কিছু নেই যা আদালতের হুকুমমত ক্রোক করিয়ে টাকা আদায় করতে পারেন, তাহলে বডি ওয়ারেন্ট করিয়ে তিনি দেনাদারকে জেল খাটাতে পারেন। একে বলে সিভিল জেল। বন্দীকে বলা হয় সিভিল প্রিজনার। জেলে তার খাওয়া পরার খরচা দেন পাওনাদার। সিভিল প্রিজনারকে জেলে কোন শ্রম করতে হয় না সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীর মত। অনেক জেলে এমনি সিভিল প্রিজনার থাকবার ব্যবস্থা আছে। জলপাইগুড়ী জেলের সিভিল ওয়ার্ডের দরজাটা একেবারে বাইরের দিকে, মেন গেট দিয়ে ঢুকতে হয় না। অজিতবাবু সপরিবারে এই সিভিল ওয়ার্ডের ঘরে আশ্রয় নিয়েছেন।

জেলারের বাড়ীতে আমার অসুবিধা কিছুই নেই। বরং বৃদ্ধা শাশুড়ীর আদর আপ্যায়নে মাঝে মাঝে বিব্রত বোধ করি।

একই টেবিলে দুজনে মুখোমুখি খেতে বসি। কপী ঘোষাল গল্প বলেন।

অনেক দিন ছিলেন বর্মায়। সেখানকার জেল ডিপার্টমেন্টেই চাকরি করতেন। ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় একটি ডিসট্রীক্ট জেলের সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন।

জাপানী বোমারু বিমান যখন ঝাঁকে ঝাঁকে হানা দিয়ে রেঙ্গুণ শহরকে প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দিয়ে চলে গেল, সুপার ঘোষাল তখন গভর্ণমেন্ট অর্ডার পেয়েছিলেন, জাপানীরা যদি আবার এমনি আক্রমণ চালায়, তাহলে জেলের দরজা খুলে দিও, সব বন্দীকে ছেড়ে দিও। অন্ততঃ খাঁচায় আটকানো নিরুপায় ইঁদুরের মত মরা থেকে যদি ওরা বেঁচে যায়, বাঁচুক। অফিসারদের প্রতি নির্দেশ ছিল, অবস্থা যদি আয়ত্তের বাইরে চলে যায়, তাহলে যা ভাল বিবেচনা করবে, তাই করবে এবং তোমার নিজের ও পরিবারের সবার নিরাপত্তার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্ণ স্বাধীনতা রইল।

দুটি ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে ঘোষাল সরকারী কোয়ার্টার্স ছেড়ে দিয়ে কয়েক দিন এয়ার রেড সেল্টারে কাটালেন। দিনের বেলা একবার করে অফিসে যান, কিন্তু কোন ঠিকাদার আসে না, কোন জিনিষের সরবরাহ নেই। ঘরে যা ছিল, তাই দিয়েই বন্দীদের আহার চলতে লাগল।

রেঙ্গুনের সরকারী দপ্তরখানা আগেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল, এখন টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের ব্যবস্থাও বিপর্য্যস্ত হয়ে গেল। তবু, কয়েকদিন শান্ত থাকায় মনে হল, জাপানীরা আর আক্রমণ চালাবে না।

কিন্তু সে ধারণা যে কতখানি মিথ্যা, কয়েকদিনের মধ্যেই তা প্রমাণিত হল। অকস্মাৎ এক দিন দুপুরবেলা আবার আকাশে দেখা দিল এক ঝাঁক জাপানী বোমারু, মুহূর্তকাল মধ্যে আক্রমণ সুরু হয়ে গেল। জেলা শহরটাই ছিল ওদের লক্ষ্যস্থল, কিন্তু ভাগ্যক্রমে বোমাগুলি গিয়ে পড়ল শহরের উপকণ্ঠে।

না, আর দেরী করা চলে না। ঘোষাল বললেন, জেল গেট খুলে দেবার হুকুম দিলাম। ক্যাশ ইন হ্যাণ্ড যা ছিল, বন্দীদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে বললাম, তোমরা তাই নিজের নিজের পথ দেখ। আর আমি ছেলে মেয়ে নিয়ে স্ত্রীর হাত ধরে বেরিয়ে পড়লাম।

তারপর সুরু হল ওঁদের সেই ভয়ঙ্কর দুঃসাহসিক পদযাত্রা। উত্তর বর্মার মধ্য দিয়ে হাঁটা পথে আসামের নিরাপদ অঞ্চলের উদ্দেশ্যে দুর্দুঃসহ অভিযান। পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে গহন অরণ্যের মধ্য দিয়ে পায়ে-চলা সেই বিপদসঙ্কুল অচেনা পথ। কোথাও তা খাড়া উঠে গেছে পাহাড়ের চূড়ায়, কোথাও খাড়া নেমে গেছে অতল গহ্বরে। কোথাও দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মধ্যে অথবা বিদ্যুৎগতি পাহাড়ী ঝরণার স্রোতে সে পথ নিশ্চিহ্ন হয়ে হারিয়ে গেছে। সারাদিন ঘুরতে ঘুরতে চলা আর রাত্রিকালে কোন পার্বত্য গুহায় বা কোন পাহাড়ী বস্তিতে আশ্রয় গ্রহণ। সেখানেও বাঘের মত ওৎ পেতে অপেক্ষায় আছে দুষ্কৃতের দল, প্রাণভয়ে পলাতক মানুষের অসহায়তের সুযোগ নিতে যারা বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করে না।

অনিদ্রায় অর্দ্ধাহারে ও অনাহারে দিনের পর দিন কাটিয়ে দীর্ঘ বাইশ দিন পর ভারতের নিরাপদ অঞ্চলে পৌঁছতে পেরেছিলেন ফণী ঘোষাল।

বোধহয় তার ফলেই, গাঢ় স্বরে বললেন ঘোষাল, আমার স্ত্রীর হৃদরোগ দেখা দিল। শয্যা নিলেন তিনি। প্রাণপণ চেষ্টা করলাম, কিন্তু ধরে রাখতে পারলাম না। যেন স্বামী আর পুত্র কন্যাকে পৌঁছে দেবার পরই তাঁর ইহ জগতের কাজ শেষ হয়ে গেল।

তারপর হিরোসিমা আর নাগাসাকি।

বিনা সর্ত্তে জাপানের আত্মসমর্পণ!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান।

জেলারের শোবার ঘরের টেবিলে একখানা ছবি দেখেছি, ওঁর স্ত্রীর ছবি, রোজ সন্ধ্যায় জেলার তার সামনে ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দেন, ঘোষাল নিত্য সন্ধ্যায় তাঁকে স্মরণ করেন। স্বামী-প্রেমধন্যা মহিলাটির অকাল মৃত্যুর পশ্চাতে যে এমন একটি করুণ কাহিনী আছে, অনুমান করতে পারিনি।

ছয় ফুটেরও বেশী উঁচু ঋজু শরীর ফণী ঘোষালের, তেমনি পেটানো স্বাস্থ্য। বয়স চোয়ান্ন পেরিয়ে গেলে কি হবে, এখনও হাঁটাচলায় বেশ ধার। বর্ম্মাতে সুপারদের মিলিটারী ইউনিফরম ছিল, সঙ্গে করে কিছু কিছু আনতে পেরেছেন, মাঝে মাঝে পরেন, তখন হাইল্যাণ্ডার্সের মত মনে হয়। কিন্তু ভদ্রলোক আবেগের সঙ্গে কথা বলতে বলতে যখন দীক্ষাগুরু শ্রীওঙ্কারনাথজীর নামোচ্চারণমাত্র ভক্তিভরে দুই করতল যুক্ত করে কপালে ঠেকান কিংবা কখনও নিজের কক্ষে আলো নিভিয়ে বসে বসে যখন গুনগুন করে কীর্ত্তনের সুরে আওড়ান, তখন মনে হয়, বাইরের ঐ হিংস্র পোষাকটি নেহাৎই একটা লোক-দেখানো মুখোস, ওর অন্তরালে দেদীপ্যমান শুচিস্নিগ্ধ একটি বৈষ্ণব মন।

বন্দীরা ওঁকে যমের ভয় করে, ওঁর হুমকিতে অন্তরাত্মা ওদের কেঁপে ওঠে, কিন্তু দেখতাম, সহজে উনি বন্দীদের নামে আমার কাছে লিখিত রিপোর্ট করতেন না, নিজেই শাসন করে ব্যাপার মিটিয়ে ফেলতেন।

১৯৫৭ সালে আলিপুর সেনট্রাল জেলে ওঁর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। উনি তখন ডেপুটি জেলার আর আমি আলীপুরের প্রবেশন অফিসার। উনি আমায় মাঝে মাঝে জেলারের কাছে আসতে দেখতেন, আমিও দেখতাম ওঁকে। আমি যে জেল ডিপার্টমেন্টের 'চাকুরে, তা জানতেন, তবে কোন কথা হয়নি।

আলীপুর জেলের অভ্যন্তরে বিরাট মণ্ডপ তৈরী করে প্রতি বৎসর শীতকালে গানের জলসা হয়। প্রথম দিন আধুনিক গান, দ্বিতীয় দিন রাগপ্রধান। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত চলে। কারারুদ্ধ মানুষগুলিকে আনন্দ দানই এর উদ্দেশ্য বলে শিল্পী ও যন্ত্রীরা কর্ত্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে বিনা সম্মান-দক্ষিণায় এই জলসায় যোগদান করেন।

কিছু বাইরের দর্শকদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়, তাছাড়া জেল ডিপার্টমেন্টের অনেকেই এবং অন্য ডিপার্টমেন্টেরও কেউ কেউ আসেন। বন্দী শ্রোতা আর আমন্ত্রিত শ্রোতাদের বসবার ব্যবস্থা পাশাপাশি।

জেলে প্রবেশের সময় আমন্ত্রিতদের প্রত্যেককে একখানা করে প্রবেশ-পত্র দেওয়া হয়, বেরিয়ে যাবার সময় পত্রখানা গেটে জমা দিয়ে যেতে হয়। আলীপুরে সর্বদাই প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত বন্দীরা কিছু সংখ্যক থাকে। তারপর বিচারাধীন বন্দীরা নিজেদের জামা-কাপড় পরে। সুতরাং কোন বন্দী শ্রোতা যাতে আমন্ত্রিত শ্রোতার প্রবেশ-পত্র সংগ্রহ করে বেরিয়ে যেতে না পারে, সেজন্য গেটে ডিউটি থাকে বাছাই-করা অফিসার ও সিপাইদের।

১১৫৭ সালের জলসার দ্বিতীয় দিন গেটে ডিউটি ছিল ডেপুটি জেলার ফণী ঘোষালের।

আমাদের চীফ প্রবেশন অফিসারের অফিসের নব নিযুক্ত টাইপিস্ট মনে করল, প্রবেশন ডিপার্টমেন্ট জেল ডিপার্টমেন্টেরই অন্তর্ভুক্ত, প্রবেশন অফিসারদের যেমন জেলের সবাই চেনে, তাঁদের যেমন প্রবেশ-পত্রের প্রয়োজন হয় না, তেমনি তারও কোন পত্রের দরকার নেই। যদি কেউ চ্যালেঞ্জ করে, তাহলে পরিচয় দিলেই যথেষ্ট হবে। সুতরাং গেট থেকে প্রবেশ-পত্র সংগ্রহ না করেই সে জেলে ঢুকে গেল।

কিন্তু গেটে আছেন কঠিন কর্তব্যপরায়ণ ডেপুটি জেলার ফণী ঘোষাল।

টাইপিষ্ট বিনা প্রবেশ-পত্রে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গেছে বটে, কিন্তু বিনা প্রবেশ-পত্রে ফণী ঘোষাল তাকে জেল থেকে বেরিয়ে যেতে দিলেন না।

অনেককেই জিজ্ঞেস করা হল, কিন্তু কেউই নতুন টাইপিষ্টকে চেনেন না।

অবশেষে ফণী ঘোষাল টাইপিষ্টকে নিয়ে এলেন জলসা মণ্ডপে।

আমাকে সামনে পেয়েই সব বললেন, জিজ্ঞেস করলেন, দেখুন ত মিঃ গাঙ্গুলী, আপনি এঁকে চেনেন কি না।

আমাকেও বেশ কষ্ট করে মনে করতে হল যে, সি পি ও-র অফিসে ওকে টাইপ করতে দেখেছি। নতুন নিযুক্ত টাইপিষ্ট।

ফণী ঘোষাল বললেন, দেখুন মিঃ গাঙ্গুলী, আপনি যদি আইডেনটিফাই করেন, তাহলে ওঁকে ছেড়ে দিই। নইলে জলসা শেষ হয়ে গেলে বন্দীদের রোলকল ও লক আপ না হওয়া পর্যন্ত ওঁকে বসিয়ে রাখতে হবে।

অবশ্য আমি ছেড়ে দিতে বললাম।

ফণী ঘোষালের কর্তব্যপরায়ণতা দেখে সেদিন খুশি হয়েছিলাম।

সেই ফণী ঘোষাল এখন জলপাইগুড়ী জেলের জেলার।

একদিন জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, বর্মায় আপনি ছিলেন সুপারিনটেনডেন্ট, এখানে এসে নীচে নেমে ডেপুটি জেলার হয়েছিলেন কি করে?

হেসে বললেন, সেও আর এক দুর্ভাগ্যের কথা। ভারত গভর্নমেন্ট ঘোষণা করেছিলেন যে, ওখানে চাকরী করতে করতে যাদের পালিয়ে আসতে হয়েছে, এখানে তাদের সেম ষ্ট্যাটাসের চাকরি দেয়া হবে। কিন্তু ঐ ঘোষণা পর্যন্তই। বছরের পর বছরকাটতে লাগল, বেকার হয়ে বসে রইলাম। স্ত্রীর মরণাপন্ন অসুখ, চিকিৎসা করাবার টাকা নেই। ছেলেমেয়ের লেখাপড়াতেও ছেদ পড়ল। এমন কি, দৈনন্দিন বাজার করাও কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ল। অবশেষে বাধ্য হয়ে যা পেলাম, তাই আঁকড়ে ধরলাম।

একদিন বিকেলে ফণীবাবু ও আমি যথারীতি বাড়ী খুঁজতে বেরিয়েছি, অকস্মাৎ নতুন পাড়ায় কেষ্টর সঙ্গে দেখা। কেষ্ট মুখোপাধ্যায় আমার দূর সম্পর্কীয় শ্যালক।

আমার পদধূলি নিয়ে বলল, আপনি এসে যে ওঁর বাড়ীতে উঠেছেন, দিদিকে আনেননি, সে খবর পেয়েছি দাদাবাবু, কিন্তু বাড়ীতে অসুখ বলে আর দেখা করে আসতে পারিনি—

সে কি মশাই, ফণীবাবু কলরব করে উঠলেন, উনি আপনার দাদাবাবু। তাহলে ত আর, কেষ্টবাবু আবার আমার গুরুভাই। এবার আপনার দাদাবাবুর জন্ম একখানা বাড়ী খুঁজে দিন না ভাই।

কেষ্ট আমায় বলল, নয়াবস্তীতে গিয়ে বড়দির কাছে শুনেছি যে, আপনার বাড়ী দরকার, খুঁজছিও আমি। কাল নগেনদাকে বললাম। শুনে বললেন, সে কি, বিজেনবাবুর বাড়ী দরকার, তা আমায় বলিসনি কেন! আমার শিল্প সমিতি পাড়ার বাড়ীটা এ মাসের শেষেই খালি হয়ে যাচ্ছে—

নগেনবাবু! ফণীবাবু বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, নগেন গাঙ্গুলী মশাইও আপনার আত্মীয় নাকি স্যার? আপনি তাহলে এ সহরে আগেও এসেছেন নাকি?

কেষ্টই জবাব দিল হেসে, কত বার এসেছেন। চুয়াল্লিশের মেটেলিতে ওঁর ব্যাঙ্ক ছিল, তখনও কতবার এসেছেন। আর বেশী কি মশাই, ১৯৪৪ সালে আপনার ঐ জেলেই কিছুদিন সরকারী অতিথি হয়ে বাস করে গেছেন—

সে কি স্যার, ফণীবাবু বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, যেই জেলে ছিলেন বন্দী, আজ আপনি সেই জেলেরই সুপারিনটেনডেন্ট। সার্টেনলি এ গুড প্যারাডক্স।

মনে মনে বললাম, এটা ছ নম্বর প্যারাডক্স। এক নম্বর ছিল দমদমে সুধীর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ। এরপর তিন নম্বর কোথাও অপেক্ষায় আছে কিনা কে জানে!

[ক্রমশঃ

• • • •

উড্রো উইলসন প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হলেন। তাঁর অনিদ্রা রোগ হওয়াতে ডাক্তারের পরামর্শ চাইলেন।

ডাক্তার বললেন— আপনাকে রাজনৈতিক চিন্তা, যুদ্ধের চিন্তা, দেশের চিন্তা সব ছাড়তে হবে। নইলে এ রোগে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

উড্রো উইলসন হেসে বললেন,— তা'হলে দেখছি ডাক্তার, আমাকে মরতেই হবে। এবং দেশের চিন্তা করে যে মৃত্যু যত শীঘ্র এগিয়ে আসে ততই ভাল।

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

নটকেশরী অমরেন্দ্রনাথ দত্ত

সেবাব্রতী ও সমাজসংস্কারক

রঙ্গমঞ্চের অভিনেতৃবর্গের অধিকাংশ মঞ্চের উপরেই দেখা যায়। মঞ্চের বাইরে সামাজিক মানুষরূপে বিশেষ কোন পরিচয়ের ছাপ তাঁরা প্রায়ই রাখেন না। সত্যসত্যিই কথা বলছি না। বলছি, সমাজের কোন কাজে লাগা, বা সমাজ-সেবার কোন নজীর স্থাপন করা। এর মহৎ ব্যতিক্রম দেখেছি অমরেন্দ্রনাথের জীবনে।

১৮৯৮ সাল। অমরেন্দ্রনাথ সাফল্যের সঙ্গে ক্লাসিক থিয়েটার চালাচ্ছেন। এমন সময় মেঘ দেখা দিল সে এক ভয়াবহ ব্যাপার! চারিদিকে সে কি ত্রাস। জনপদগুলোয় সে কী বিশৃঙ্খলা!

রোগ এমন ভাবে মহামারীর আকারে নিয়ে ছড়িয়ে পড়ল যে শতকরা লোক কলকাতা ছেড়ে পালাতে লাগল দলে দলে, চালানে চালানে।

নিখিলচন্দ্র সে সময় স্টার থিয়েটার ছেড়ে দেন এবং কয়েকজন অভিনেতা অভিনেত্রী নিয়ে কলকাতা ছেড়ে রামপুর-বোয়ালিয়ায় চলে যান।

মে মাস নাগাদ শহরে রোগের প্রকোপ বৃদ্ধিতে এমন আতঙ্কের সৃষ্টি হয় যে স্টার থিয়েটার দেড় মাস অভিনয় বন্ধ রাখেন। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ থিয়েটার চালাতে থাকেন। তাই কলকাতা ত্যাগ করা তো দূরের কথা, তিনি সেই মহামারীর মধ্যে একজন সেবাব্রতীরূপে রোগীদের সাহায্যে অগ্রসর হন। সেই সময় তাঁর নূতন মূর্তি দেখে একজন কবি তাঁর স্মরণে লিখেছিলেন—

মহামারী মৃত্যু রোগে নগরী মুখর—
করেছো রোগীর সেবা নির্ভীক অন্তর।
পলাইছে নরনারী
মৃতদেহ সারি সারি—
দেখেছি শ্মশানঘাটে সৎকারে তৎপর।
শীতার্ত অনাথে হেরি কণ্ঠার গলে
অঙ্গবাস মুক্ত করি তাহারে যে দিলে—
তাই তব পদ্মা পাশে
তারাও কেঁদেছে বসে
মক্ত গন্ধোপকে তুমি অমরায় গেলে।

অমরেন্দ্রনাথের সাহায্যে অনেক রোগী প্রাণ পেল, অনেক দুঃস্থ পরিবার সংকট থেকে পরিত্রাণ লাভ করল। অনেক দুঃস্থ খেয়ে পরে বাঁচলো।

অমরেন্দ্রনাথের সে এক নতুন রূপ। প্রাণের মায়া ত্যাগ করে স্বহস্তে প্লেগরোগীর সেবা করেছেন, স্বয়ং মৃতদেহ সংকারের ব্যবস্থা করেছেন। উপযাচক হয়ে শোকার্ত আত্মীয়স্বজনের প্রতিপালনের ভার নিয়ে তাঁদের রক্ষা করেছেন।

তাঁর সেই সেবাকার্যে মুগ্ধ হয়ে তখনকার বিখ্যাত সংবাদপত্র নায়ক লিখেছিলেন—"হৃদয়ের তুলনায় অমরেন্দ্রনাথ অপরাজেয়। বুঝি বা অদ্বিতীয়।"

সাহিত্য সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখেছিলেন—"যে বাড়ীতে প্লেগ ঢুকিতেছে সে বাড়ী একেবারে উজাড় করিয়া দিতেছে। আত্মীয়লোক প্লেগ হইলে ভয়ে আত্মীয়ের সেবা করিতেছে না। এইরূপ যখন অবস্থা তখন অমরেন্দ্রনাথ অর্থ সাহায্য করিয়াছেন এবং নিজের থিয়েটারের অভিনেতাদের লইয়া প্লেগে মরা বহু মড়া ঘাড়ে করিয়া সৎকার করিয়াছেন। অল্পদিন গত হইল, যখন দামোদরের ভীষণ বানে বর্ধমান জেলা ডুবিয়া যায়, বহু লোক নিরাশ্রয় গৃহহীন হয়, সেই সময় অমরেন্দ্রনাথ স্বেচ্ছাসেবকরূপে দেখা দিয়াছিলেন। বন্ধুবান্ধব লইয়া নিজের মোটরে চড়িয়া চিঁড়া মুড়কির বস্তা ও কাপড়ের বস্তা লইয়া বন্যাপীড়িত ব্যক্তিগণকে সাহায্য করিয়াছিলেন।"

নায়ক-সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছিলেন—"কলিকাতায় যখন প্লেগ ভীষণ ভাবে দেখা দিয়াছিল তখন অমরেন্দ্রনাথ বহু প্লেগ রোগীকে নিজ অর্থব্যয়ে চিকিৎসা করাইয়া ছিলেন ও বহু মৃত ব্যক্তির সৎকারাদি করাইয়া ছিলেন। একবারের কথা আমার স্মরণ আছে। অমরেন্দ্রনাথের ক্লাসিক থিয়েটারের অভিনয় শেষ হইল। অমরেন্দ্রনাথ ও আমি টমটম হাঁকাইয়া অমরেন্দ্রনাথের বাটীতে গমন করিতেছিলাম। ছাতুবাবুর বাজারের পাশ দিয়া যখন আমরা গমন করিতেছিলাম আমি দেখিতে পাইলাম যে একটি বৃদ্ধার একমাত্র পুত্রের প্লেগে মৃত্যু হওয়ায় সে অত্যন্ত কাঁদিতেছে। কিন্তু তাহার রোদন শুনিয়াও কেহ ওই পুত্রের সৎকারের নিমিত্ত অগ্রসর হইতেছে না। তখন শীতকাল। তাহার উপর প্লেগের সময়। কেহ ভয়ে স্বগৃহ হইতে বাহির হইতেছে না। আমি টমটম থামাইয়া নামিবার উদ্যোগ করিতেছি এমন সময় আমার হস্তে ঘোড়ার রাশ দিয়া অমরেন্দ্রনাথ শীঘ্র টমটম হইতে অবতরণ করিল। আমি তাহাকে অনেক নিষেধ করিলাম। কিন্তু সে তাহা না মানিয়া সেই বৃদ্ধার দিকে অগ্রসর হইল। আমিও রাশ রাখিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলাম। অমরেন্দ্রনাথ সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করিয়া ক্লাসিক থিয়েটার হইতে লোক আনাইয়া তাহার সৎকারের ব্যবস্থা করাইয়া দিল এবং শবের সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানঘাটে চলিল। সেখানে তাহার দাহ করাইয়া রাত প্রায় সাড়ে চারিটার সময় বাটী ফিরিয়া আসিল।"

অমরেন্দ্রনাথের পরদুঃখকাতর অন্তরের একটি উদাহরণ দিয়েছেন ভারতবর্ষ সম্পাদক জলধর সেন তাঁর আত্মস্মৃতিতে—"একদিন আমি ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনয় দেখতে যাই। অভিনয়ের পর অমরবাবু বললেন—'চলুন দাদা আপনাকে আপনার বাড়ী নামিয়ে দিয়ে যাই।' আমি তাঁর কথায় সম্মত হয়ে তাঁর সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলুম—তাঁর টমটম গাড়ী ছিল, আমরা গাড়ীতে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় দেখি যে ফুটপাতের উপর একটি বুড়ো একখানি ছেঁড়া কাপড় গায়ে দিয়ে থরথর করে কাঁপছে। তখন শীতকাল। সেই দারুণ শীতে পরম জামাকাপড় গায়ে দিয়েও আমরা বেশ শীত অনুভব করছিলাম। সে বেচারাকে সেই রকম অবস্থায় দেখে অমরবাবু আমায় বললেন, 'দেখছেন দাদা, আমাদের দেশের অবস্থা দেখছেন—

এই দারুণ শীতে এই বৃদ্ধ একখানা শীতবস্ত্র অভাবে মৃতপ্রায় হয়ে রয়েছে। যে রকম অবস্থা দেখছি তাতে বোধ হয় যে অল্পক্ষণ পরে শীতের প্রকোপে এ ঘরে যেতে পারে—এতেও বলেও কিনা যে আমাদের দেশের অবস্থা আগেকার চেয়ে ভাল হয়েছে'—এই কথা বলে অমরবাবু নিজের গা থেকে মহামূল্য শালখানা খুলে নিয়ে সেই বৃদ্ধের গায়ে সযত্নে চাপা দিয়ে দিলেন। বৃদ্ধ বিস্ময়ে অবাক হয়ে তাঁর মুখের পানে খানিকটা চেয়ে রইল। সেই দারুণ শীতে তার কথা কইবার শক্তি ছিল না—নীরবে চেয়ে থেকে সে তার কৃতজ্ঞতা জানালো।"

অভিনেতা হলেও দেশের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি যে কতখানি সচেতন ছিলেন, দেশের মানুষের দুঃখ দারিদ্র তাঁকে যে কতখানি ব্যথিত করত, দেশবাসীর প্রতি তাঁর যে কতখানি মমত্ববোধ ছিল, জলধর সেন কর্তৃক উল্লিখিত কথাগুলির মধ্যে তার গভীর দ্যোতনা নিহিত রয়েছে।

অমরেন্দ্রনাথের পরদুঃখকাতরতা ও দানের আরও দৃষ্টান্ত আছে।

শুধু জনসাধারণের দুঃখকষ্টে না, তাঁর কাছে যেসব অভিনেতা-অভিনেত্রী কাজ করতেন তাঁদের আর্থিক উন্নতি এবং সামাজিক স্বীকৃতির জন্যেও তিনি সর্বসময়ে উৎসুক ও সচেতন ছিলেন। তিনি ছিলেন বড় ঘরের ছেলে—প্রভূত প্রতিপত্তিশালী ও গৌরবোজ্জ্বল ছিল তাঁদের বংশ, তাই নিজের সামাজিক-প্রতিষ্ঠার অভাব ছিল না। কিন্তু তিনি জানতেন সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতি দেশের গণ্যমান্যদের অসীম বিতৃষ্ণা এবং সাধারণ রঙ্গালয়ের নটনটীদের তাঁরা অত্যন্ত হেয়জ্ঞান করেন। অমরেন্দ্রনাথ এতে ব্যথিত বোধ করতেন। তাঁরাও তো সব মানুষ, অশেষ দুঃখ ও আর্থিক কৃচ্ছ্রতা, সেই সঙ্গে নিন্দা ও বিদ্রূপ মাথায় নিয়ে তাঁরা একটি মহৎ শিল্পের সাধনায় নিযুক্ত, তাঁরা কেন হেয় হয়ে থাকবেন সমাজের কাছে, অপাংক্তেয় হয়ে একঘরের মত থাকবেন।

শিল্পীকে মর্যাদা দিতে জানতেন তিনি। অন্যান্য মঞ্চ-মালিকদের মতো তাঁর শুধু প্রভুভৃত্যের সম্পর্ক ছিল না। অসীম স্নেহ দিয়ে তিনি তাঁদের সুখদুঃখের ভাগ নিতেন। তিনিই প্রথম শিল্পীদের জন্যে বেনিফিট-নাইটের এবং বোনাসের প্রবর্তন করেন। তাঁদের বেতন বৃদ্ধি করেন। আরও নানা সুবন্দোবস্ত প্রদান করেন। আগে কোন শিল্পী ছুটি চাইলেই মঞ্চ-মালিক বলতেন, ছুটি হবে না। ছুটি যদি চাও একেবারেই ছুটি নিয়ে যাও। অমরেন্দ্রনাথ শুধু তাঁদের যে ছুটি মঞ্জুর করতেন তাই নয়, ছুটি যাতে তাঁরা পুরো উপভোগ করতে পারেন সেজন্যে আর্থিক ব্যবস্থাও করে দিতেন।

শিল্পীদের স্বীকৃতি পাবার পথ সুগম করার জন্যে অমরেন্দ্রনাথ স্থির করলেন সাধারণ মঞ্চের প্রতি দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মন থেকে বিদ্রূপতা যাতে হ্রাস পায় তার উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। এবং তাঁর মনে হল, সাধারণ রঙ্গমঞ্চকে দেশের বড় বড় লোকদের এবং সেই সঙ্গে বিদেশীদেরও যদি আমন্ত্রণ করে আনা যায় তাহলে জনসাধারণ বুঝবেন, সাধারণ মঞ্চ যখন এত সব বড় বড় লোকদের দ্বারা সমাদৃত হচ্ছে তখন তা তাচ্ছিল্যের বস্তু নয় এবং সেখানকার শিল্পীরাও অবহেলার পাত্র নয়।

অমরেন্দ্রনাথ রঙ্গমঞ্চকে পাংক্তেয় করবার জন্য নিজের থিয়েটারে যেন মহোৎসব লাগালেন। প্রচুর অর্থ ব্যয় হোতে লাগল। থিয়েটার সাজানো, অতিথিদের জন্য পানীয় খাদ্যের ব্যবস্থা, আরও কত কি! দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অমরেন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে তাঁর থিয়েটারে আসতে লাগলেন, শিল্পীদের সঙ্গে পরিচয় করলেন, তাঁদের সুঅভিনয়ের জন্যে অভিনন্দিত করলেন। সেই সঙ্গে জনসাধারণও যোগ দিলে।

ক্লাসিকের সে-এক দিনই গেছে। আজ এলেন চৌগাছার রাজা রজনীকান্ত রায় চৌধুরী, পরের অভিনয় রাত্রে এলেন নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায়। তারপর এলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবাব

বাহাদুর আমীর হোসেন, কাশীর মহারাজা, মহারাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, মহারাজা প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর, রাজপুরের নবাব, মহারাজা মণীন্দ্র নন্দী, রায়েশ্বর-রাজ বৈকুণ্ঠ নাথ দে, এডেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিচারপতি চন্দ্র মাধব ঘোষ প্রভৃতি দেশমান্য নাগরিকবৃন্দ। জনসাধারণের মধ্যে সাড়া গেল পড়ে রীতিমত। শুধু বাঙালী গণ্যমান্যরাই নন, অনেক বড় বড় সাহেবও এলেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান বিচারপতি সার জ্যানসিস ম্যাকলিনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই প্রসঙ্গে অমরেন্দ্রনাথের জীবনীকারের লেখা থেকে কিছু উদ্ধৃত করে দিলাম :—

"অমরেন্দ্রনাথ কলিকাতা হাইকোর্টের চীফ জাসটিস হইতে আরম্ভ করিয়া জজ, রেজিষ্ট্রার, ম্যাজিস্টেট কমিশনর প্রভৃতিকে ক্লাসিক থিয়েটারে আনিয়া অকাতরে ধূলিমুষ্টির ন্যায় অর্থ ব্যয় করিয়া বড় বড় পার্টি দিতে লাগিলেন। দেশের সমস্ত সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষগণ অমরেন্দ্রনাথের সুমধুর আলাপে ও আদর আপ্যায়নে প্রীত হইয়া তিনি যাহাতে বঙ্গীয় নাট্যশালার উন্নতি বিধান করিতে পারেন সে বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

"বঙ্গরঙ্গমঞ্চের মসীলিপ্ত মুখ ও শিল্পীদের সম্মানলাভের উদ্দেশ্যেই অমরেন্দ্রনাথ যে এই প্রকার ব্যাপারের প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মিঃ স্ট্যানলিকে প্রদত্ত (১লা আগষ্ট ১৯০১) অভিনন্দন হইতেই জানা যায়। ঐ অভিনন্দন পত্রের এক স্থানে অমরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—The native stage, though yet in its infancy, exerts an educative influence over native society unsurpassed by any other educational institution of this country. To encourage the stage is to encourage healthy education and to develop the fine feelings of the human heart. Your Lordship by your kindness and generosity towards me—the manager actor of this theatre, has raised the native stage in the estimation of the public.

"অমরেন্দ্রনাথ এই নীতির অনুসরণ করিয়া বঙ্গরঙ্গভূমির তথা অভিনেতৃবর্গের এক মহা কল্যাণ সাধন করিলেন। এই সকল মহামান্য ব্যক্তিগণের পদার্পণে বঙ্গীয় রঙ্গালয় শিক্ষিত সমাজ কর্তৃক গৃহীত ও অনুমোদিত হইল, অভিনেতারা সমাজে যতটা ঘৃণার পাত্র ছিলেন, ততটা আর রহিলেন না। বড় বড় রাজপুরুষগণ ও নেতৃবৃন্দ অভিনেতাদিগকে সাদর সম্ভাষণ পূর্বক বহু সুখ্যাতি ও ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সসম্ভ্রমে করমর্দন করিয়া সম্মানিত করিতে লাগিলেন। অমরেন্দ্রনাথ সংবাদপত্রে এবং নানারূপ পুস্তিকায় লিখিয়া অভিনেতাগণ যে ঘৃণার পাত্র নহেন—তাঁহারা যে দেশের এবং জাতির উন্নতি ও কল্যাণ কামনা করিতে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহা দেশবাসীকে বিশেষরূপে বুঝাইতে লাগিলেন। তিনি নানা শ্রেণীর লোকের সহিত মিশিয়া, তাঁহাদিগকে নিজকৃত সমুদয় কার্য দেখাইতে লাগিলেন। অভিনেতারা যে কি বস্তু—তাঁহারা যে যথার্থই জাতির সম্মানযোগ্য—তাহা বুঝিতে পারিয়া, সাধারণে অভিনেতাগণকে সম্মান করিতে লাগিলেন। এইরূপে রঙ্গালয়ের বহিরুন্নতির সঙ্গে আভ্যন্তরীণ উন্নতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া তিনি এমন ভাবে সমস্ত বিষয়ের উন্নতি সাধন করিলেন যে জনসাধারণ ও সমস্ত কর্মচারীবর্গ রঙ্গালয়কে একটা বড় অফিসের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন।"

উপরে যে তথ্য পরিবেশন করা হল তা থেকে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে বাংলা রঙ্গমঞ্চের জন্যে অমরেন্দ্রনাথ যত না করে গেছেন তার তুলনা নেই, আধুনিক রঙ্গমঞ্চ তাঁরই কর্মকৃতির সুফল ভোগ করছে এবং রঙ্গরঙ্গমঞ্চ অমরেন্দ্রনাথের কাছে চিরকাল অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ থাকবে।

(আগামী সংখ্যায় অমরেন্দ্রনাথের কর্মবহুল উত্থান পতনে বিচিত্র সংগ্রামী জীবনের শেষ অধ্যায় লিপিবদ্ধ হবে)

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে রবীন্দ্র রঙ্গশালা

ভূপাল

ভূপালের 'টেগোর ভবন' ছবির মতো সুন্দর পরিবেশে স্থাপিত। পাশে একটি ছোট ঝিল, মাঝখানে তার একটি দ্বীপ, চারিদিকে বাগান প্রচুর ফুলফোটবার গাছ আশে পাশে। টেগোর ভবন স্থানীয় কলারসিকদের মনে বিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি করে চলেছে। এখানে প্রায় নিত্যই কোন না কোন অনুষ্ঠান হয়, হয় নাট্যাভিনয়, না হয় জলসা, মাসিক এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক বাসর।

কিন্তু এর প্রশস্ত প্রেক্ষাগারটি আশানুরূপভাবে শ্রোতা বা দর্শকদের আনন্দ দেয় না। গরমকালে গ্রীষ্মের দাবদাহকে রোধ করবার কোন ব্যবস্থা নেই। দোতলায় কোন জানলা বা ভেনটিলেটার নেই, ফলে যেন মনে হয় রুদ্ধ এক কারাকক্ষ। নীচে বা উপরে ইলেকট্রিক পাখা নেই—শীতাতপ ব্যবস্থা তো দূরের কথা।

বসবার আসন আছে ৭৪০টি। যাঁরা হলটি ভাড়া নেন, আলো ও মাইকের ব্যবস্থা তাঁদের নিজেদেরই করে নিতে হয়। টিকিট বিক্রি না করে যাঁরা হল ভাড়া নেন তাঁদের দিতে হয় পঁচিশ টাকা তদুপরি অন্য খরচ বাবদ দশটাকা। তাছাড়া আলো ও মাইকের জন্য তাঁদের লাগে আরও একশো পঞ্চাশ টাকা। যাঁরা টিকিট বিক্রি করে অনুষ্ঠান করেন তাঁদের দিতে হয় একশো ত্রিশ টাকা তাছাড়া আলো ও মাইক বাবদ একশো পঞ্চাশ টাকা। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ভাড়া প্রভৃতিতে যা লাগে তা নিতান্ত সামান্য নয়। 'টেগোর ভবন' পরিচালনা করেন রাজ্যের পূর্ত বিভাগ। কিন্তু হলটির সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের জন্যে তাঁদের কোন প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় না।

বাঙ্গালোর

এখানকার 'রবীন্দ্র কলাক্ষেত্র' নাট্যানুষ্ঠানের একটি প্রধান কেন্দ্ররূপে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। যদিও কানাড়ী নাটকের অভিনয়ই এখানে বেশী হয় তাহলেও মাঝে মাঝে ইংরাজী, তামিল, তেলেগু এবং হিন্দি নাটকের অভিনয়ও অনুষ্ঠিত হয়। পঁচিশটির অধিক নাট্য সম্প্রদায় এখানে নিয়মিত তাঁদের নাটকগুলির অভিনয় করেন। বাঙ্গালোরের অধিবাসীরা দিন দিন অধিকতর নাট্যানুরাগের পরিচয় দিয়ে চলেছেন। নৃত্য এবং নৃত্যনাট্যও এখানে হয়। জনসাধারণ এ সম্বন্ধেও আজকাল অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। বহু স্থানীয় শিল্পী নাচে ও অভিনয়ে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। তাছাড়া বাইরে থেকেও ভরতনাট্যম, কথাকলি, কথক ও অন্যান্য নৃত্য সম্প্রদায় এখানে আসেন।

হলের ভাড়া দুশো তিরিশ টাকা। কিন্তু এখনো মঞ্চের সাজসরঞ্জাম যথেষ্ট নয়। ফলে, নাট্য বা নৃত্য সম্প্রদায়ের অনেক প্রকারের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। বসবার আসন আছে ১৫০০টি।

বাড়ী এবং প্রেক্ষাগার সব মিলিয়ে বেশ প্রকাণ্ড ব্যাপার। স্থাপত্য নয়নানন্দকর, পাশ্চাত্য রীতিতে গঠিত ভবনটির মধ্যে দুটি লাউঞ্জ, চতুর্দিকে বারান্দা। ভিতরেও বসবার জায়গা। দুপ্রস্থ সাজঘর—সেদিক থেকে ব্যবস্থা ভালই, কিন্তু মঞ্চটি অত্যধিক বড়। এর উচ্চতা ৯০ ফুট। ফলে দু তিন প্রস্থ কোলানো পরদা লাগে এবং সেই অনুপাতে দৃশ্যপট সাজাতেও অনেক বেশী আয়োজন করতে হয়।

ত্রিবান্দ্রম

তদানিন্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হুমায়ুন কবীরের চেষ্টায় ষোল লক্ষ টাকা ব্যয়ে পাঁচ বছর আগে এখানে যে টেগোর শতবার্ষিকী থিয়েটার নির্মিত হয়েছে তার আসল উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে বলা চলে না। তার প্রধান কারণ হল, ভবনটি শহর থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। ফলে সেখানে কোন অনুষ্ঠানে লোক সমাগম হয় না। বিশেষ করে রাতের অনুষ্ঠানে। এখানে বসবার আসন আছে ১৩১০টি।

এখানকার পরিচালনা যেন গোলে হরিবোল। কে যে এর কর্তা বোঝা যায় না। একজন রাজকর্মচারী সেক্রেটারী রূপে আছেন বটে, কিন্তু তাঁর অন্যান্য কাজ এত বেশী যে এই ভবনের উন্নতিকল্পে তিনি মনোযোগ দিতে পারেন না। তাছাড়া নাট্য সম্প্রদায়গুলি এত দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত হলটি ভাড়া নিতেও চান না। ফলে ত্রিবান্দ্রমের রবীন্দ্র রঙ্গশালা অবহেলিত এবং তার লক্ষ্যে অনগ্রসর।

হায়দারাবাদ

এখানকার 'রবীন্দ্র ভারতী' অন্ধ্রপ্রদেশের মধ্যে সবচেয়ে সুগঠিত সুবিন্যস্ত এবং সুপরিকল্পিত একটি প্রতিষ্ঠান। নৃত্য নাট্য এবং সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই ভবন সারা রাজ্যে বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে। এখানে নীচের তলায় একটি 'মিনি' থিয়েটার আছে, তাতে আছে মোট ১২০টি আসন। পূর্ত বিভাগের অধীনে একটি স্বয়ং শাসিত কার্যকরি পরিষদ ভবনটি পরিচালনা করেন। এর প্রেক্ষাগার সুব্যবস্থিত। মঞ্চটিও সুপরিকল্পিত। সাজ সরঞ্জামের অভাব নেই। ভাড়া ন্যূনে, পেশাদার দলের জন্য ছশো অথবা পাঁচশো টাকা। অন্যদের সাড়ে তিনশো অথবা আড়াই শো, শনি রবি ও ছুটির দিনে বেশী ভাড়া পঁচিশ টাকা। ভবনটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত।

পাটনা

পাটনার 'রবীন্দ্র ভবন' পরিচালনা করেন রবীন্দ্র পরিষদ নামে একটি অবৈতনিক প্রতিষ্ঠান। ১৯৫২ সালে রাজ্য সরকার পরিষদকে ৩০১ একর জমি প্রদান করেন, তারই উপর গড়ে উঠেছে এই বিরাট এবং মনোরম ভবন। ভবনের সঙ্গে একটি মুক্তাঙ্গনও আছে। সেখানেও নাট্যানুষ্ঠান হয়। চমৎকার ব্যবস্থা। প্রেক্ষাগারে ৬৫০ এবং মুক্তাঙ্গনে ৩৫০টি আসন আছে। তাছাড়া এখানকার অন্যান্য ঘরে একটি সঙ্গীত শিক্ষালয় আছে। আর আছে একটি গ্রন্থাগার। রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে গ্রন্থাগারে এক হাজারের অধিক বই আছে। সঙ্গীত শিক্ষালয়টির নাম 'গীত ভবন' এখানে শুধু রবীন্দ্র-সঙ্গীত শেখানো হয়। শান্তিনিকেতনের পাঠক্রম অনুসারে এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়। বেতন মাসিক মাত্র পাঁচ টাকা। মাসে মাসে এখানে অন্যান্য রাজ্যের নাট্য-সম্প্রদায় বা সাংস্কৃতিক সংস্থা তাঁদের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

রবীন্দ্রভবনের কর্মসচীব বলেন, সরকার যদি নিয়মিত সাহায্য করেন তাহলে রবীন্দ্র ভবন রবীন্দ্র সাহিত্য ও রবীন্দ্র সংগীতের আরও ব্যাপক প্রচারকল্পে কর্মসূচী প্রণয়ন করে এই ভবনটি সবদিক দিয়ে আরও বেশি সার্থক করে তুলতে পারে।

নাট্য দর্শন

স্টার থিয়েটারে 'সীমা'। আবেগধর্মী গার্হস্থ্য নাটক।

দেবনারায়ণ গুপ্ত অনেকগুলি নাটক লিখেছেন। 'সীমা' তাঁর সাম্প্রতিকতম নাট্য প্রচেষ্টা। এ নাটকটিতে তিনি নতুন সুর যোজনা করেছেন—কাব্যের সুর। রবীন্দ্রনাথের একাধিক কবিতার অংশ-বিশেষের আবৃত্তি, রবীন্দ্রনাথের গান এবং মুখ্য চরিত্রের রূপায়নের মধ্যে একটি করুণ কাব্যময় ব্যঞ্জনা আছে।

নাটকটির মধ্যে চড়া সুর কোথাও নেই, নেই ঘটনার ঘনঘটা বা কোন ঘাত-প্রতিঘাতজনিত বড় রকমের নাট্য সংঘর্ষ। নায়িকার বাবার মতবাদ এবং নায়িকার মনের দ্বন্দ্বই নাটকটির প্রধান উপজীব্য। নাটকের নায়িকা সীমা অসুখে পঙ্গু, তাকে ক্রাচ নিয়ে চলাফেরা করতে হয়, তার জীবন সবদিক দিয়ে ব্যর্থ, এই হতাশায় সে সদাই ম্রিয়মাণ। তার বাবা অধ্যাপক শৈলেশ্বর মনে করেন তাঁর মেয়েকে সকলেই করুণার চোখে দেখে, তাই তাঁর মেয়েকে পরের করুণার উপর নির্ভর করে বিবাহ দেওয়া তাঁর মত নয়। তিনি দৃঢ়চিত্তে স্থির করে রেখেছেন, সীমার বিবাহ দেবেন না। সীমাও তাই মনে করে। কিন্তু তা মানতে চায় না অসীম—শৈলেশ্বরের বন্ধুপুত্র এবং ছাত্র। শেষ পর্যন্ত অসীম সকল দ্বন্দ্বের অবসান ঘটায় সীমাকে বিবাহ করবার বাসনা জানিয়ে এবং তাকে গ্রহণ করে। সীমা অবশ্য অসীমকে তার ভালবাসা দিয়েছিল।

এর মধ্যে আছে আর-একটি প্রণয় কাহিনী—অলক ও সরমাকে কেন্দ্র করে। দু'জনেই ডাক্তারি পড়ে এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত।

মিলনান্ত নাটক। মধুর পরিবেশে এর পরিসমাপ্তি। দু'জোড়া তরুণ তরুণীর মনদেওয়া নেওয়ার খেলাটি সরস সংযত বিন্যাসে বিধৃত। ঘটনাসংস্থাপন ও চরিত্রচিত্রণ সরলীকৃত। অবশ্য তার মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের চিত্রটি সুপরিস্ফুট।

অভিনয়ে প্রতি শিল্পীই যথাসম্ভব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সীমার ভূমিকায় সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়ের কারুণ্যসিক্ত সংবেদনশীল অভিনয়ে চরিত্রটির মর্মবেদনা সার্থকতার সঙ্গে রূপায়িত। সুখেন দাস ও বাসন্তী চট্টোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যেকার প্রেমের ব্যাপারটি প্রাণোজ্জ্বল অভিনয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। অসীমরূপে সত্যেন্দ্র ভট্টাচার্য একটি চিত্তাকর্ষক চরিত্রচিত্রণের নজীর উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু প্রৌঢ় অধ্যাপক রবীন্দ্রকাব্যগ্রন্থের শৈলেশ্বর রূপে অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের কিছুটা হতাশ করেছেন। তিনি অনেকগুলি রবীন্দ্রনাথের কবিতার অংশ আবৃত্তি করেছেন যা আমাদের আনন্দ দিতে পারেনি। তাছাড়া অভিনয়ের মধ্যে তিনি প্রাণের বা ব্যক্তিত্বের ছাপ রাখতেও সম্পূর্ণ সফলকাম হন নি বলেই মনে হয়েছে। বিরাট শিল্পপতিরূপে দাড়ি পরা প্রেমাংশু বসুকে মেনে নেওয়া শক্ত ঠেকছিল, যদিও অভিনয় তিনি ভালই করেছেন।

ভাল লাগল, বাচ্চামেয়ে কুমারী রিঙ্কুর ছোট ছেলে বাবুয়া সেজে মনমাতানো অভিনয়, মেয়েটি সত্যিই আশ্চর্য সহজ সুন্দর ভাবে অভিনয় করেছে—অতটুকু মেয়ের কাছ থেকে যা আশাতীত! প্রযোজনা ও পরিচালনা সৌষ্ঠবসম্পন্ন।

রঙমহলে 'বাবা বদল'। একটি উপভোগ্য স্ক্যাটায়ার।

নাতনী মালার জন্মদিনে বৃদ্ধ বেচারাম চাটুজ্যে অকস্মাৎ হলেন নিরুদ্দেশ। খবর পেয়ে ছুটে এলো বেচারামের মেয়ে জামাই। দশদিনেও যখন নিখোঁজ বাবার দেখা মিললো না, তখন অগত্যা, মেয়ে বুড়ি চাইলো বাবার সম্পত্তি, মায়ের গয়নার ভাগ। বড় ছেলে শুভেন্দুর ব্যবসায়ে মন্দা চলেছে। তার স্ত্রী দীপ্তিরও অনেক স্বপ্ন ঐ বিষয় আশয় ঘিরে।

এমনি সময়ে এলো বর্ধমানের নগেন পাত্রা···নিরুদ্দিষ্ট বেচারাম চাটুজ্যেকে নিয়ে। উপযুক্ত পুরস্কার দাবী করে বসলো সে। সকলে তাজ্জব। বলছে এ নাকি বেচারাম চাটুজ্যে নয়। ফতুয়া লুঙ্গি মাতৃভাষা ছাড়া এবং চাপাদাড়ি-সবই যেখানে মিলে যাচ্ছে সেখানে আটকে গেল কিনা লোকটার দুটো দাঁতে। ওদিকে নিঃস্ব রিক্ত কেনারাম বাড়ুজ্যে (নকল বেচারাম), আজীবন যে পথের ভিখিরি, সেও আজ চায় বেচারামের ঐশ্বর্য দখল করতে।

সংসারের সবাই যখন লোভে হিংসায় উন্মত্ত, তখন নগেন পাত্রা বললো, হ্যাঁ মশাই যে দেশে ভোটার ভাল করে লোকে রাজা মন্ত্রী হয়-সে দেশে একটা বাবা ভাল করে একটা সংসার রক্ষা করলে কি মান যায়? আমি নগেন পাত্রা ····একবার যখন চালিয়ে দিয়েছি, শেষ পর্যন্ত চালিয়ে দেব·····চলে কি না চলে দেখুন·····।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত নগেন পাত্রার চালাকি খাটলো না। বেচারাম বাবু ফিরে এলেন এবং আনন্দের মধ্যে নাটকের যবনিকা নামল। নাটকটির মধ্যে শুধুই হাসি নয়, জীবনের কিছু বাস্তব মর্মস্পর্শী চিত্রও আছে। নাটকটির সার্থক রূপায়নে যাঁরা অংশ নিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন তরুণ রায় (নাটকটির পরিচালকও তিনি), হরিধন মুখোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, মিন্টু চক্রবর্তী, মানস ঘোষ, তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়, সরযূ দেবী, সাধনা রায়চৌধুরী, ইন্দিরা দে, রত্না ঘোষাল ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

• • •

সিরাজদ্দৌলা নাটকের অভিনয় হয় ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯০৬ সালে। তখন এক নূতন যুগের প্রবাহ বাংলা দেশের বক্ষ দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল। সিরাজের ভূমিকায় দানীবাবুর প্রকৃষ্ট অভিনয় তৎকালীন যুবক সম্প্রদায়ের মনে এইরূপ গভীর রেখাপাত করিয়াছিল যে সেই স্বদেশী যুগে প্রসঙ্গক্রমে কেহ যদি বলিতেন, "এবার দেশ স্বাধীন হলে নবাব হবেন কে?" অমনি উত্তর হইত, "নবাব হতে পারেন একমাত্র দানীবাবু।"

সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যকেও এইকথা একাধিকবার বলিতে শোনা গিয়াছে।

—ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

বঙ্কিমচন্দ্রের ললিত গিরি

সুকুমার রায়

আমার লেখক-বন্ধু সোমেন বেড়াতে এল কটকে। আমাকে বললে, দু চারদিন থেকে বেশ একটা অভিজ্ঞতা নিয়ে ফেরা যাবে। কি বলো?

জিজ্ঞেস করি, লেখার জন্যে কিছুমাল মসলা চাই বুঝি?

তা যা মনে করো।

বললুম, দয়া করে ওটি করো না। যাকে ভাল করে চিনে নেবার সময় হবে না, তাকে নিয়ে লিখতে যেও না। বাংলা দেশে এমন লেখা অনেক চলেছে। দু'মাসি বাস একটি খাস ইট উপন্যাস অথবা ভ্রমনাস।

হাসছিলুম। বন্ধু রেগে গেল। অনাবশ্যক উপদেশ ঝাড়লুম তো!

সোমেন মুখ কুঁচকে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লে,—যাকে একবার দেখেছি তাকে নিয়ে লেখা কি অন্যায়?

অন্যায় হবে কেন। পূর্বরাগের নজিরও তো আছে সাহিত্যে।

সোমেন বললে, লেখকের অভিজ্ঞতা আর অন্যান্যের অভিজ্ঞতা কি সমান? রুশ, চীন, আমেরিকা এক আধমাস ঘুরে এসে দু একজন যদি বড়ো লেখা চালাতে পারেন, আমাদের দেশের নানা অজ্ঞাত যায়গা ঘুরে আমরা লিখব না কেন? লেখা মানেতো ব্যক্তিগত কথারই স্ফুরণ।

যেমন প্রশ্নবাণে বিদ্ধ হলাম, কিন্তু দু একটি তড়কাও ফিরিয়ে দিতে পারিনি। বিদেশের সম্বন্ধে লিখলে খারাপ লাগে না, কারণ তাদেরতো আদৌ জানিনে। কিন্তু যাঁরা আমার পড়শী তাদের গভীর ভাবে জানতে হবে তো? দু'দিনে সে কাজ হয়?

তর্ক বিতর্ক আর বাড়েনি। একটা প্ল্যান করে ফেললাম। দপ্তরের বন্ধু সনাতন মহান্তীকে জিজ্ঞেস করি, সনাতন সবিতা কোথায়?

এখানেই তো। কেন কিছু বলতে হবে?

বললাম, হ্যাঁ আমার এক বন্ধু এসেছেন। তোমাদের বাড়ীতে ওঁকে নিয়ে যাব। সবিতার মতো বন্ধুটিও সাহিত্যিক। তোমার বাড়িতে চা আর তেলেভাজা খেয়ে আসব আর কিছু সাহিত্যের গল্পও হবে।

সনাতন হেসে বললে, ও হ্যাঁ। সেই যে বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্র—এসব তো?

সনাতন জানে যেদিন ওদের বাড়িতে যাই সেদিনই এসব নিয়ে সবিতার সঙ্গে আলাপ আলোচনা হয়। বহু প্রশ্নও জিজ্ঞেস করে, যতটা জানি উত্তর দিই। ভালই হল, সোমেন এখন কিছু ভাল ভাল কথা শোনাতে পারবে।

পরদিন সনাতন এসে বললে, মামার বাড়ি থেকে ডাক এসেছে, সবিতাকে নিয়ে যেতে হবে। মামু গাড়ি পাঠাবেন যাবার জন্যে।

সনাতনের মামা প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কন্ট্রাক্টার, ওদের গ্রামেই কাছের পাহাড়ের রাস্তা তৈরি করেন। এখন খোঁড়াখুঁড়ি করছেন। গাড়ি পাঠাবেন শুনে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এ সুযোগ হারানো যায় না। সোমেনকে বললুম, চলো সনাতন আর সবিতার সঙ্গে ওদের মামার বাড়ির দেশে যাওয়া যাক। গ্রামের ভেতরেতো যাওনি গেছ শুধু সমুদ্রে আর মন্দিরে।

সোমেন জিজ্ঞেস করে, ওরা কে ?

আমার দপ্তরের সহকর্মী। ওর বোন সবিতা শিক্ষিকা, সাহিত্যিকও বটে। প্রায়ই বঙ্কিম-শরৎ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন কোরে আমাকে ঘায়েল করে দেয়। মেয়েটি কালো, বয়স হয়েছে কিন্তু বিয়ে দিতে পারেনি সনাতন। ওরা পিতৃহীন। তা হলেও সবিতাকে তোমার ভাল লাগবে। চোখেমুখে দীপ্তি আছে, ওরা বলে "কলা কজ্জল পরি রঙ্গ, দেখি বাকু বেশ ভৌল ডাউল।"

বেশ তো।

পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলুম, এই আমার লেখক বন্ধু সোমেন, তোমাদের গ্রামদেশে যেতে চায়, দেখতে চায়। বঙ্কিম শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে প্রশ্নগুলো ওকেও জিজ্ঞেস করতে পারো।

প্রথম দিনে সবিতা বিশেষ কিছু বলেনি, চা খাইয়ে যাবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে জানিয়ে দিয়ে বিদায় দিয়েছিল। আমাকে বলেছিল, আমরা রাজপুরের দিকে যাব।

দুদিন পর এক শুভ্র স্বচ্ছ সকালে জিপগাড়ি নিয়ে এল সনাতন ও সবিতা আমাদের হোটেলে। রওনা হওয়া গেল, এখনো নিরুদ্দেশ যাত্রা। গাড়িটা রাজপথ ধরে মহানদী পেরিয়ে এল। সোমেন জিজ্ঞেস করে আমরা কোন দিকে যাচ্ছি ?

রাজপুর মহকুমার দিকে। টানা পথে কলকাতা অবধি যাওয়া যায়।

সোমেন বললে, আমি ভাবছিলুম উল্টো দিকেই যাচ্ছি বুঝি ! অর্থাৎ সমুদ্রের দিকে।

একথা বলবার কারণ বুঝতে পারি। সোমেন সমুদ্রে যেতেই ভালবাসে। ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব—বোধহয় এসব সম্বন্ধে তেমন আগ্রহ ওর নেই। কিন্তু আমরা যাচ্ছি প্রত্নতত্ত্বেরই নতুন প্রস্তুতি ক্ষেত্রে। কেন্দ্রাপাড়া রোড পেরিয়ে সালেপুর বাজারে এসে গাড়ি থামল। সবিতা বলল, আমরা যাচ্ছি ললিত গিরিতে—সালেপুর থেকে চৌদ্দ মাইল।

সোমেন জিজ্ঞেস করে, ললিত গিরিতে কি আছে ?

সবিতা হেসে আমার দিকে তাকায়, ওর দাদা সনাতনকে বলে, তমে জান কি যে এহি ললিত গিরির সম্পদকু প্রথমে চিত্রন করি থিলে বঙ্কিমচন্দ্র। আমে সে স্থলকু যাউচি।" (তুমি জানো কি যে এই ললিত গিরির সম্পদকে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম চিত্রিত করেছিলেন। আমরা সেখানে যাচ্ছি।)

সোমেনকে কথাটি বুঝিয়ে দিলুম। চারদিকে চেয়ে দেখছিল সে—এটা সবিতার মামার বাড়ির দেশ। মূল রাজপথ থেকে ডান পাশে মোড় ফিরে এগিয়ে গেলাম আর একটি নতুন রাস্তায়। পটামুণ্ডির খাল বাঁ দিকে। সবুজ গাছগাছালিতে ভরা চারদিক, খালের পাড়েই পাথুরে টিলা পাহাড়। ডান দিকে মাঠ আর মাঠ—দূরে অজস্র তাল নারকেলে ভরা গ্রামগুলো। খাল পার হয়ে উঁচু পাহাড়টাকে পেছনে রেখে একটি লাল পাথুরে মাটির ছোট পাহাড়ে এসে ঠেকে গেলাম ডান দিকে। রাস্তা তৈরি হচ্ছে। মাটি কাটা চলেছে। লাল পাথুরে মাটি। এখানেই কোথাও সনাতনের মামার একটা আফিস আছে। পাহাড়ের গা বেয়ে দুটো গ্রামের মধ্য দিয়ে গাড়ি এগিয়ে এসে ওপরে উঠে এল। অনেকটা ভেতরে এসেগেছি।

গাড়ি এসে থামল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের চাল আমলের একটি নতুন দালানের পাশে। অন্যমনস্ক ছিলাম। সোমেনও নীরব। সবিতা বললে, এ পাথরে ভল পিক্‌নিক্ হবে, ক'ন? (এদিকে ভাল পিক্‌নিক হবে, কেমন?)

ভালো চড়ুইভাতি হবার একটি প্রস্তাব তো ছিলই। আমরা চারজন নেমে এলুম, ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে চলে গেল, সনাতন গেল ওর মানুষ সঙ্গে দেখা করতে। তিনি এখানেই তদারকী করতে আসেন। হলরুমটির ভেতরে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের একটি লোক দেওয়ালে আশে পাশে লাইন করে সাজানো অসংখ্য বুদ্ধ মূর্তিগুলো দেখতে লাগল। অনবদ্য ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তিগুলো দেখছিলাম। কোমলাঙ্গী বজ্রতারার প্রতিমাটি আমাকে মুগ্ধ করেছে। নবম ও দশম শতাব্দীর অথবা তারও পূর্বের বৌদ্ধতন্ত্র যুগের পাথুরে শিল্পের নিদর্শন। তার চেয়েও বেশি সে যুগের মাসলিকতার একটা সমন্বয় শিল্প। একদিকে সিমাট কালো হাত-পা-মাথা ইত্যাদি পাথরের অংশগুলো জড় করে রাখা হয়েছে। সবগুলো মিলিয়ে দশ বারো ফুট ধ্যানী-বুদ্ধের একটি মূর্তি এখানে বসানো হবে। এখানে কিছু কিছু সংগ্রহ করা হয়েছে রত্ন-গিরি থেকে।

রত্নগিরি! সোমেন জিজ্ঞেস করে।

সবিতা বললে, আমরা যে পথেই এসেছি, সে পথে কিছু আগে বাণপুর ঘাট দিয়ে বিরূপা নদী পার হয়ে সেখান থেকে এক মাইল আন্দাজ পথ গেলে—"রত্নগিরি"। সে টিলাতে অসংখ্য সমাধিস্তূপ, বৌদ্ধদের পূর্বযুগের ছাত্রাবাস, অধ্যাপক নিবাস, চৈত্য। বটগাছতলায় অসংখ্য ভাঙাচোরা বুদ্ধমূর্তির মেলা। এটা প্রাচীন বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে তৈরি হয় পরের যুগে মহাকালের মন্দির। আজও বছরের প্রথম দিনে যাত্রা (মেলা) হয়, পুজোপার্বন চলে।

দেখেশুনে সোমেন বলল, বেশ ভালো। প্রত্নতত্ত্ব মৃত ইতিহাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে মূল্যবান। দেশের দশের কাছে আর আজকের সাহিত্যিকদের কাছে এর কি দাম?

রাগ হল সোমেনের ওপর। সবিতা ওর মনোভাবটা বুঝতে পেরেছে। একবার শুধু বললে, মাঠ, ঘাট, প্রকৃতি সমূহ এসব দেখতে হয় সাদা মন নিয়ে। নিরেট মনেও ওর একটা রেখাপাত হয় কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব দেখতে আসতে হয় চলন্ত মন আর বুদ্ধি নিয়ে তবে তো ভাল লাগে।

ওড়িয়া ভাষার একখাটি সোমেন বুঝলে না হয়ত।

ঘর থেকে বেরিয়ে আমরা পাহাড়টির পশ্চিম প্রান্তের পাথুরে দেওয়ালের কাছে এসে দাঁড়ালুম। বহু নীচে দিগন্ত ব্যাপ্ত মাঠ, মাঠের সীমানা পেরিয়ে গ্রাম তারপর বহুদূর পর্যন্ত বিস্তার। পূবকোণে আর একটি ছোট পাহাড়—তার মাথায় অবলুপ্ত গুম্ফা। সোমেনকে বললুম, ভেবে দেখো প্রায় নব্বুই বছর আগে বঙ্কিমচন্দ্র এখানে এসে দাঁড়িয়েছেন, বলেছেন "এপারে উদয়গিরি ওপারে ললিতগিরি। মধ্যে স্বচ্ছসলিলা কল্লোলিনী বিরূপা নদী (যদিও বিরূপা নদী আজকাল কয়েক মাইল দূরে) নীল বারিরাশি লইয়া সমুদ্র অভিমুখে চলিয়াছে। উদয়গিরি (বর্তমান আলতি গিরি) বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু ললিত গিরি (বর্তমান ললিত গিরি) বৃক্ষশূন্য প্রস্তর ময়। এককালে ইহার সানুদেশ অট্টালিকাস্তূপ এবং বৌদ্ধ মন্দির শোভিত ছিল। এখন শোভার মধ্যে শিখর দেশে চন্দন বৃক্ষ আর মৃত্তিকা প্রোথিত ভগ্নস্তূপ বিশিষ্ট প্রস্তর, ইষ্টক বা মনোমুগ্ধকর প্রস্তর গঠিত মূর্তিরাশি। আমি যাহা দেখিতেছি তাহাই লিখিতেছি। সেই ললিতগিরি মনে থাকিবে। চারদিকে যোজনের পর যোজন ব্যাপিয়া——।" মনে নেই সোমেন ইস্কুলের পাঠ্য বলায় আমাদের মুখস্থ করিয়েছিলেন? তখন কি জানতুম কোথায় এই ললিত গিরি? এমন কি

উড়িষ্যাতে যারা বেড়াতে আসেন তাঁরাও খবর রাখেন না। কিন্তু সে যুগেও বঙ্কিম অনুসন্ধিৎসা মনে জাগিয়েছিলেন—"এসব কারা করেছে ?"

সোমেন বললে, সব বুঝলুম ভাই। পিকনিকটা ভাল লাগবে এখানে। কিন্তু সেই পুরোনো ব্যাপার আজকের জীবনের আর আমার মতো সাহিত্যিকের কি কাজে লাগবে ?

তাইত। নীরবে ভাবছিলাম। আজকের সাহিত্যিক সোমেনের কাছে এর মূল্য সামান্যই। আজকের মানুষ—মাঠ, ঘাট, বন্দর, ছায়াছবি, প্রকৃতি, সংগ্রাম—এসব নিয়ে ব্যস্ত। কি দরকার বঙ্কিমচন্দ্র কবে এখানে এসেছিলেন—সে কথা নিয়ে ? তবু একবার বললাম, বঙ্কিমচন্দ্র সেই যুগে, যে সময়ে এখানে এর কিছুর সন্ধান হয় নি—শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল ছিল—তখন তাঁর চরিত্র "শ্রী"কে এখানে এনে দাঁড় করিয়েছিলেন।

সোমেন বললে, তা তিনি নিয়ে আসুন। আপাততঃ আমার কাছে ইম্পরট্যান্ট সবিতা দেবীর এই মামাবাড়ির দেশের দৃশ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রী থেকেও ভাল লাগছে সবিতা দেবীকে।

আমি বললুম, কিন্তু সবিতা যে ওর মামার বাড়ির দেশের সম্বন্ধে গবিতা !

সবিতা হেসে উঠল। সাহিত্যিক বন্ধু উড়িষ্যার একটা ভাল অভিজ্ঞতা বলতে সবিতার সঙ্গে পরিচয়টাই বোঝে। এ যুগের কবিকে বুঝতে চায়। প্রাচীন ইতিহাস বুঝতে চায় না। কটকে ফিরে গিয়ে সে পুরী সমুদ্রেই যাক। তবু বললাম, বঙ্কিমচন্দ্র এখানে নির্জন জীবনের মধ্যে যে রত্ন খুঁজে পেয়েছিলেন—তা এ যুগে বুঝতে পারছি না। ললিত গিরি উপলক্ষ করে তিনি প্রশ্ন রেখে গিয়েছিলেন ধর্ম-সংস্কৃতি, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব আবিষ্কারের প্রেরণা দেবার জন্যে। গোটা জাতিটার গোড়ার কথা বোঝবার চেষ্টায়। সে কালটা আজ ধীরে ধীরে পাথুরে স্তর বলে মনে হয় বর্তমানের কাছে।

নেমে আসছিলাম আমরা যেখানে গাড়িটা এসে থেমেছে। সমাতন দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। অতীত সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাবটা সবিতার পছন্দ হয় নি। বিশেষ করে ওর মামাই যে সবসময় খোঁড়া-খুঁড়ি করে সবকিছু বের করে দিচ্ছে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগকে। উড়িষ্যার তরুণ জীবন অতীতের জীবনধারার সঙ্গে এখনো যুক্ত। এখনো উড়িষ্যায় ছড়িয়ে আছে অনেক অনাবিষ্কৃত রত্নদীপ। সবিতা আমাকে বললে, আপনার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করছি, পুরীর সমুদ্র, ভুবনেশ্বরের মন্দির, কোণার্ক—এসব ছেড়ে বঙ্কিমচন্দ্র এই মাটি, পাথর, জঙ্গলে ঢাকা যায়গাটাকেই কেন চিত্রিত করলেন ? আপনারা হয়ত বলবেন, যেহেতু বঙ্কিমচন্দ্র একবৎসরকাল ওড়কে ছিলেন, সেজন্যেই তিনি একাজ করেছেন। কিন্তু আর কোন তাৎপর্য কি নেই।

প্রশ্নটা বুঝিয়ে দিলুম সোমেনকে। সবিতা আমাকে সমর্থন করছে, বুঝতে পারছি। সোমেন উত্তর ভাবছিল, হয়ত ওর মতামত—যা সর্বদাই বলে—এখানেও বলবে,—আমরা আজকাল সার্ত্রের যুগের লোক, আর বঙ্কিম ছিলেন যুক্তিবাদী কোমতের যুগের লোক। অনেক প্রভেদ।

সোমেন বললেও এ কথা। সে দিন আর নেই।

নেইতো সত্যি। সবিতা বললে, নেই তো সত্যি। কিন্তু আপনি বঙ্কিমকে ছেড়ে জিপগাড়ির যুগে এসে পড়েছেন। আমরা এখনো উড়িষ্যার গ্রাম—তার পাথুরে জীবনটাকে ভালবাসি।

সোমেন বলল, আমার কাছেও ভাল লাগে, তবে আজকের পিকনিক আর আপনার সান্নিধ্য আমার কাছে বেশি ভালো।

সবিতা হেসে বললে, তা হতে পারে, কিন্তু উপলক্ষ কিন্তু ললিতগিরি—ভুলে যাবেন না।

নোট্রাম্‌স্‌

হরিসাধন চট্টোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ান কেমিটেবল প্রডাক্টস ফ্যাক্টরীর ক্লাব জমে রাত বারটায়। এ ক্লাবের শিরোমণির আসন অলঙ্কৃত করে আছেন ম্যানেজারের বড় ভাই সুকুমার গুহ। ফ্যাক্টরীর ক্লাবের সভ্যরা হচ্ছেন অমাত্য।

সুকুমারবাবু কলকাতায় একটা ফার্মের এ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার, রাত সাতটায় রোজ অফিস থেকে ফেরেন, আর রাত আটটা বাজলেই নাকে এক টিপ নস্যি দিয়ে পান চিবোতে চিবোতে বেরিয়ে আসেন বাড়ী থেকে 'ট্রএলস্ত্‌ ও ক্রক ক্লাবে'র দাবের বাতি জ্বালাবার জন্যে।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে পুকুরটা পার হয়েই টাক কোয়ার্টারের সুমুখে এসে টাক দেন অমাত্যদের—ডক্টর রায়, শিবুদা, নির্মল, বেরিয়ে আসুন সবাই।

নির্মল বেরিয়ে আসে প্রথমে। সুকুমারবাবু বলেন—ক্লাব খোলা হয়নি কেন এখনো?

—আর আপনি না এলে কে কবেই বা ক্লাব খোলে?

সুকুমারবাবু হেসে বললেন—আমি যদি কাল মরে যাই?

—ক্লাবও শ্মশান হয়ে যাবে।

—কেন? বি অ্যাকটিভ। একি কথা যে সন্ধ্যে হলেই এরা সব সুরসুর করে ঘরে ঢোকেন। সবাই কি গিন্নীকে ভয় করে নাকি শুধু আমি ছাড়া?

—এই শীতের রাত, কাল শিবুদাকে বৌদি দু'ঘণ্টা বারান্দায় বসিয়ে রেখেছিলেন, দরজা খোলেননি।

এবারে শিবুদা, ক্ষীরবাবু, নরেশবাবু, সবাই একে একে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

সুকুমারবাবু হেসে বলেন—কি শিবুদা, কাল নাকি 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়'—বৌদি নাকি খুব কাল প্রহার করেছে? আরও খানুন ক্লাবে রাত বারোটা পর্যন্ত।

শিবুদা হাসে—মিছে কথা সব। নির্মলের জোয়ান বয়েস কিনা, তাই কত কথা এখন বলবে।

সুকুমারবাবু পকেট থেকে ডিবা বের করে খান, তারপর পানের রঙে-লাল-হওয়া-দাঁতগুলো বের করে হাসেন—বেশ বেশ, অন্যদিন প্রহার করে, কাল করেনি, কিন্তু বাইরে ত বসিয়ে রেখেছিল কাল দু'ঘণ্টা।

—তা বলতে পারেন।

সবাই এসে ক্লাবে ঢুকল। আবার ও পাড়া থেকে এল অজয় সেন।

—আরে আইয়ে আইয়ে, সেনবাবু আইয়ে। লেকিন আব মেহি আনেসে খেলাড়ি মেহি হোতা হায়—সুকুমারবাবু খুব খুসী সেনকে দেখে, সেন এখানকার নতুন লোক—এ ফ্যাক্টরীতে নতুন জেনোগ্রাফার হয়ে এসেছে।

ক্লাব ঘরে আছে দুটো আলমারী—তাতে আছে কিছু বই, আর মেঝেতে ঢালা সতরঞ্চি পাতা—ওপরে রঙীন চাদর—এই হল ব্রিজ খেলার আসর। ব্রিজ খেলার খাতা নামান হল। সবাই সতরঞ্চিটাকে বেড়ে টেনে ঠিক করে নিয়ে বসল।

—বইঠিরে মিঃ সেন—সুকুমারবাবু খুসী চলেই ছিন্দিতে কথা বলেন। অজয় সেনকে বলেন কখনও সেনবাবু, কখনও মিঃ সেন।

সেন বসে ব্রিজ খেলার খাতা খুলল। প্রথম পাতায়ই লেখা—

Twelve o' clock Club

President—Rai Bahadur P. M. Ghose.

Secretary—Dr. N. C. Roy.

এ পাতা অজয় সেনের আগে নজরে পড়েনি। খাতা দেখে সেন বলল—নাম টুয়েলভ ও ক্লক ক্লাব কেন?

নরেশবাবু বললেন—সেভেন ও ক্লক ব্লেড নেননি, এ তেমনি টুয়েলভ ও ক্লক ক্লাব, এ ক্লাব বারটার সময় ভাঙ্গা হয়।

সুকুমারবাবু একটিপ নস্যি নাকে দিয়ে হেসে বললেন—অথবা বলতে পারেন এ ক্লাবে যারা আসেন তাদের বারটা বাজান হয়। অবশ্য আপনার বারটা আমরা কোনদিনই বাজাব না।

সুকুমারবাবুর কথা শুনে সবাই জোরে হেসে উঠল। সেন বললে—রায় বাহাদুর পি. এম. ঘোষ কে? উনি ক্লাব ওপন করার সময় কিছু ডোনেশান দিয়েছিলেন বুঝি?

সুকুমারবাবু হাসেন—রায় বাহাদুরকেই মাসে মাসে আমাদের ডোনেশান দিতে হয়।

—থাকেন কোথায় উনি?

—আপনাদের ফ্যাক্টরীতেই

—রায় বাহাদুর আমাদের ফ্যাক্টরীতে?

এবারে নরেশবাবু হেসে বলেন—প্রিয়মাধববাবু আমাদের সোপ প্ল্যান্ট ইনচারজ।

—প্রিয়মাধববাবু আবার রায় বাহাদুর হলেন কবে? এই বলতে না বলতেই প্রিয়মাধববাবু এসে ঢুকলেন ক্লাবে। নির্মল বললে—এই যে রায় বাহাদুর এসে গেছেন। আপনি রায় বাহাদুর হলেন কি করে বলুন ত মিঃ সেনকে ব্যাপারটা।

সুকুমারবাবু বললেন—ওয়ার টাইম রায় বাহাদুর উনি। ওনার বাঁশের কন্ট্রাক্ট ছিল, আমেরিকানদের উনি বাঁশ সাপ্লাই করতেন যুদ্ধের সময়ে, আমেরিকানরা বাঁশের কোয়ালিটি এবং কোয়ান্টিটিতে খুসী হয়ে টাইটেল দিয়ে যায় ওনাকে যাবার সময়, উনি ব্রিটিশ রায় বাহাদুর নন, উনি আমেরিকান রায় বাহাদুর।

প্রিয়মাধববাবু হেসে বললেন—কিসের মশায়, ও বাজে কথা, যুদ্ধের সময় আমেরিকান ডিপোতে কিছু সাপ্লাই দিয়েছিলাম, তাই থেকে সুকুমারবাবু আমায় বলেন রায় বাহাদুর।

সেন হেসে বলে—ওঃ, এই রায় বাহাদুর। আর সেক্রেটারী ডক্টর এন, সি, রায়? নরেশবাবু, আপনি ডাক্তার কিসের? আপনি ত ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার।

সুকুমারবাবু হেসে বলেন—উনি ডক্টরেট। উনি ম্যাডাগাস্কার ইউনিভারসিটি থেকে ডক্টরেট পেয়েছেন। 'মানুষ তাস খেলে, না তাস মানুষকে খেলায়' এ বিষয়ে থিসিস লিখে।

নরেনবাবু নিজেই হেসে বললেন—আমার মতে তাস মানুষকে খেলায়। না হ'লে সুকুমারদা বসে থাকতে পারেন রাত একটা দুটো পর্যন্ত ?

আবার হাসির রোল উঠল সারা ঘরে, নির্মল বললে—আর দেরী নয়। নিন নিন, এবারে তাস ফেটে বসে পড়ুন।

সুকুমারবাবু তাস টেনে বলেন—মিঃ সেন, তাস তুলুন ত আপনার, দেখি আপনাকে পার্টনার করা যায় কি না।

সেন তাস টেনে বের করার পর সুকুমারবাবু খুশী হলেন—হ্যাঁ—আ-আ, আমি আর আপনি, শিবুদা আর রায় বাহাদুর। আমি আর আপনি হলাম রয়্যাল-পেয়ার—বলুন, আজ পর্যন্ত আমাদের কেউ হারাতে পেরেছে কিনা ? নির্মল আর ফণীবাবু, আপনার একটু বহুন—এই রাবারটা করে ফেললাম বলে।

সুকুমারবাবু বললেন সেনকে—দেখুন, মিঃ সেন, আপনি সব জেনুইন কল দেবেন, নো কারডস, নো কল, দি লেস ইউ স্পিক, দি লেস ইজ দি ট্রাবল।

এবারে সেন হেসে বলে—এই রকম একটা কথা শুনেছিলাম ডক্টর সবপল্লী রাধাকৃষ্ণনের মুখ থেকে 'বসুশ্রী' সিনেমাতে সোভিয়েট ফিল্ম ফেসটিভ্যাল উপলক্ষে, আর শুনলাম আপনার মুখ থেকে। অল গ্রেট মেন থিঙ্ক এলাইক। অর্থাৎ আপনার বক্তব্য হচ্ছে যে আমি বিলো টু এও হাফট্রিকে কোন কল ওপেন করব না, আর আপনি প্রয়োজন বোধে হাফট্রকে নোট্রাম কল দিয়ে দেবেন।

এবারে সবাই জোরে হেসে উঠল। সুকুমারবাবুও হেসে ফেললেন—তা কেন দেব ?

খেলা জমে উঠেছে। সেন কল দিয়েছে—ওয়ান হার্ট। সুকুমারবাবুর সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন—থ্রি হার্টস। আর কল হল না, থ্রি হার্টসেই খেলা রইল। খেলছেন সুকুমারবাবুই, সেন 'ড্যামি' হয়ে বসে আছে। দুটো স্পেডকে নীচের হাতে ট্রাম করিয়ে ডামমণ্ডের টেক্কার পিঠ দিয়ে দিলেন শিবুদাকে। তারপর বললেন—আসুন শিবুদা, এবারে কি খেলবেন।

শিবুদা বলেন—অগ্নি পরীক্ষা, কি খেলি ?

এই ফাঁকে সুকুমারবাবু গান ধরলেন—

বিরহে অধিকা, কাতরা রাধিকা—বলে নে বিশাখা সখী, ও সখী তুই মান জানিস না। ওরে মন দিতে তুই মান হারালি, ও সখী তুই মান জানিস না।

তখন শ্রীরাধা গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বললেন—তবে সখী কি করব ? পূরবে বলিলে পশ্চিমে যাইবি আর ডাকাবি দখিন দিকে-এ। তবে তো হইবি সুখী।

সেন এবারে বলল—সত্যিই সুকুমারদা না থাকলে এ ক্লাবই জমে না।

ফণীবাবু বললেন—এ কি শুনলেন। সুকুমারদার ঠিক অফুরন্ত, আরও অনেক শুনবেন।

সুকুমারবাবু হাসেন—খেলুন খেলুন শিবুদা। ডামমণ্ডের সাহেব আমার কাছে, আর যা খেলবেন তাই ট্রাম করব।

সত্যিই চার ভিলেই একটা 'রাবার' হয়ে গেল, জিতলেন সুকুমারবাবুরা।

সুকুমারবাবু নিজেই খাতা নিয়ে বসেন, আর নিজেই লেখেন। হিসেব করে বললেন—সিক্স পয়েন্টস শিবুদা, সিক্স আনাস প্লিজ।

শিবুদা বললেন—খেলতে বসেই ছ' আনা পয়সা লোকসান ?

সেন বলে—প্রিয়মাধববাবুর বরাত খারাপ, ভাল তাস পেয়ে···

সুকুমারবাবু ধমকে উঠলেন—মিঃ সেন, উইথড্র করুন, যা বলেছেন তা উইথড্র করুন।

—কেন, কি বলেছি।

—প্রিয়মাধববাবু কেন বলবেন? বলবেন রায় বাহাদুর—অলওয়েজ। এ ক্লাবের রীতিনীতি শিখে নেবেন। শিবুদাকে শিবপ্রসাদ বলতে পারবেন না, বলবেন শিবুদা—উনি আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ এবং নমস্য।

এর ভেতরেই ক্লাবে এলেন আর এক ভদ্রলোক; কর্ণবাবু হেসে বললেন—নিশুতি রাতের পাখি এসেছে। সুকুমারবাবু হেসে বললেন—আরে শিল্প, আসুন আসুন। শিল্প মানে, দীনেশবাবু—ক্যাশিয়ারীর টাইমকিপার। শিল্পের বয়েস কিন্তু গুরুর চাইতে বেশী—শিল্পের চুলে পাক ধরেছে, আর গুরুর চুল এখনও কাঁচা, তাহলে দীনেশবাবু সুকুমারবাবুর শিল্প নানা কারণে। প্রথম কথা সুকুমারবাবু যদি 'ব্লাক' কলের রাজা হন, তাহলে দীনেশবাবু 'ব্লাক' কলের প্রধান মন্ত্রী। আজকালকার কেবিনেট ফরম অব গভর্ণমেণ্ট যেমন প্রধান মন্ত্রী রাজাকে ছাড়িয়ে যান, তেমনি দীনেশবাবু কিছুদিন যাবৎ সুকুমারবাবুকে ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। দীনেশবাবু পার্টনারের হাতের ওপর ভরসা করে অবিচলিত ভাবে কল দিয়ে যাবেন তিনটে চারটে পাচটা পর্যন্ত। ইদানীং তাই ওনার নামকরণ হয়েছে 'স্পেকুলেশন মাষ্টার'। দ্বিতীয় কথা যত রাত পর্যন্ত ক্লাবে সুকুমারবাবু থাকবেন, তত রাত পর্যন্ত দীনেশবাবুও থাকবেন। তৃতীয় কথা ক্লাবে বেসুরো গান যা করেন সুকুমারবাবু, তার চাইতেও বেশী বেসুরো করে গান করেন দীনেশবাবু।

আবার তাস কেটে বসে পড়া হল—পুরোনো দুজন 'আউট' নতুন দুজন 'ইন'।

এবারে একদিকে গুরুশিষ্য পার্টনার, অন্যদিকে নির্মল আর শিবুদা পার্টনার। সুকুমারবাবু হঠাৎ কপালে হাত দিয়ে বললেন—জ্বর উঠেছে আমার। শিবুদা বললেন—জ্বর কখন এল।

—এইত এখন। শিল্প কল দেবেন আমায় ভরসা করে, আর আমি কল দেব শিল্পকে ভরসা করে। তারপরই পরশুর মত হবে ছ'শ ডাউন।

শিল্প হেসে বললেন—আজ আর আমি কল দেব না। আপনি খেলুন।

খেলা শুরু হল। দুখানা ক্লাবসের পিঠ পেয়েই শিল্প গান ধরলেন—

ভালবেসে-এ-এ এই বুঝেছি,
সুখের সাথে সে নয়ন জলেরে-এ।

এই গানের সুর তুলে চশমার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখে নিলেন শিবুদার তাসটা—স্পেডের সাহেব ও হাতে। ওপরের হাত থেকে ছোট একটা স্পেড খেললেন, শিবুদা দিলেন ছোট। শিল্প বললেন—নীচের হাত থেকে গোলামটা দিন। পিঠ পেয়ে শিল্প হেসে বললেন—রিষ্কটা তাহলে টিকল।

সুকুমারবাবু ক্লাব থেকে বাড়ী ফেরেন, রাত বারটা, কোনদিন বা একটা। যেদিন জমে যান, সেদিন রাত বারটা বাজলেও বলেন—আসুন আর একটা রাবার। লোক না থাকলেও বলেন—এবারে তিন হাতে একটা রাবার।

নিশুতি রাতে বাড়ী ফেরেন সুকুমারবাবু চোরের মত। বাড়ীর চাকরকে বলা আছে—আমি ডাকলেই কোন রকম শব্দ যাতে না হয় এভাবে দরজা খুলে দিবি। ঠাকুরকে বলা আছে—আমার ঘরের টেবিলে ভাত চাপা দিয়ে রেখো। এর জন্যে আলাদা করে মাসিক বকসিস দেওয়া হয় ঠাকুর এবং চাকরকে। পাশের ঘরে

স্ত্রী প্রমীলা মাঝে মাঝে টের পায়, মাঝে মাঝে টের পায় না। যেদিন প্রমীলা টের পায় সেদিন সুকুমারবাবুকে অশেষ গঞ্জনা সইতে হয়। তবু ক্লাবে যেতেই হবে।

আজ ক্লাবে খেলতে বসে নির্মল সুকুমারবাবুর কানে কানে একটা খবর বললে। সুকুমারবাবু হেসে চেঁচিয়ে উঠলেন—কি শিবুদা, বৌদি নাকি রাগ করে বাপের বাড়ীর চলে গেছেন।

শিবুদা হেসে মাথা নেড়ে স্বীকার করলেন।

সুকুমারবাবু বললেন—না শিবুদা, সংসারও সকলের সয় না আর 'নোট্রাম'ও সকলের সয় না। এই দেখুন না বৌদি আপনায় ছেড়ে বার বার বাপের বাড়ী চলে যাচ্ছেন, আর আমিও বার বার 'নোট্রাম' কল দিয়ে সট দিচ্ছি। আচ্ছা শিবুদা, আপনারা ত সহোদর স্বামী-স্ত্রী, চেহারায় এত মিল, কিন্তু মনের মিল নেই কেন?

—শিবুদারা সহোদর স্বামী-স্ত্রী!—ও-হো-হো—নির্মল হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লো।

এবারে নরেশবাবু নির্মলকে ধমকে উঠল—আরে থামো।

সুকুমারদা এবারে আপনার শনিবারের ব্যাপারটা বলি সবার কাছে?

শিবুদা বললেন—কি হয়েছিল, কি হয়েছিল?

সুকুমারবাবু হেসে বললেন—আমিই বলছি।

—শনিবার দিন গিন্নী বলে দিয়েছিল যে রাত দশটায় ফিরতেই হবে। আমি না ফেরা পর্যন্ত জেগে থাকবে। এদিকে ত আপনাদের পাল্লায় পড়ে রাত একটা বেজে গেছে। এখন বাড়ী ফিরি কি করে? মহা ভাবনায় পড়ে গেলাম—আজ কেলেঙ্কারী হবে। এক ঘণ্টা পায়চারী করলাম ক্যাম্টিনের ভেতরে। তারপর হঠাৎ মাথায় একটা ফন্দি এল। গায়ের জামা, সোয়েটার খুলে ফেললাম, রইল শুধু গেঞ্জি। চুলগুলোকে হাত দিয়ে নেড়ে-চেড়ে উস্কো-খুস্কো করলাম, কাপড় হাঁটুর ওপরে তুলে কোমরে গুঁজলাম, পা থেকে জুতোটা খুলে ফেলে পুকুর থেকে কিছুটা কাদা তুলে দু'পায়ের হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত মাখলাম। তারপর গিয়ে বাড়ীর কড়া নাড়লাম। গিন্নী স্বয়ং এসে দরজা খুলে দিল। ঘরে গিয়ে গিন্নী কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই বললাম—মরা পুড়িয়ে ফিরে এলাম।

—সে কি, কে মারা গেল আবার? তুমি না ক্লাবে গিয়েছিলে?

—ক্লাবেই ত খবর পেয়ে গেলাম। আগড়পাড়া থাকতেন ভদ্রলোক, শৈলেনবাবু—যিনি এসেছিলেন স্ত্রীকে নিয়ে একদিন বেড়াতে। তিনি মারা গেলেন।

—আহা-হা, কি হয়েছিল? উনি কি কোন অসুখে ভুগছিলেন?

বড় বে-কায়দায় পড়ে গেলাম, চট্ করে বলে ফেললাম—থ্রোসিস হয়ে মারা গেলেন। এ রোগে হঠাৎ কোথাও রক্তের চাপ বৃদ্ধি পেয়ে মারা যায়। আমারও ব্লাড-প্রেসার, আমারও এই রকম যে-কোনদিন হতে পারে।

—আবার ও কথা তুমি মুখে এনেছ? যাও, চান করে এসো। ঠাণ্ডা জলে চান করো না, হিটারে একটু গরম জল করে দিচ্ছি। তোমার খাবার টেবিলে রয়েছে।

—না, মরা পুড়িয়ে এসেছি, আর খাব না। হুঁ শনিবার অমাবস্যাতে মারা গেলেন, শৈলেনবাবু বোধ হয় পুরুরা গেলেন।

—ও সমস্ত কথা ছাড় ত এখন।

সুকুমারবাবু গল্প শেষ করে বললেন—ভাই বড় জোর বেঁচে গেছি সেদিন, আর আমি রাত এগারোটার বেশি করব না কখনও।

সবাই জোরে হেসে উঠল। শিবুদা হেসে বললেন—খুব ব্রেন খাটিয়েছিলেন ত।

কিন্তু 'যদিনহং ন মুক্ষতে'—সুকুমারবাবু আবার বারোটা একটা করতে সুরু করেছেন। দিন দশেক পরের কথা। একদিন রাত একটায় ঘরে ঢুকে দেখেন স্ত্রী প্রমীলা নিজের ঘর ছেড়ে সুকুমারবাবুর ঘরে শুয়ে আছে। সুকুমারবাবু কি বলবেন ঠিক করতে পাচ্ছেন না, বললেন—শরীরটা বেশী খারাপ নাকি আজ?

কোন জবাব এল না, প্রমীলা চোখ বুজেই রইল। সুকুমারবাবু প্রমীলার হাত ধরে বললেন—কি রাগ করেছ আমার ওপরে?

—হাত ছাড়ো—বলে ঝাঁকুনি দিয়ে হাত সরিয়ে নিল প্রমীলা। প্রমীলা এবারে কান্নায় ভেঙে পড়লো—

—আমি বুঝি কিছু বুঝি না? কেন এত ছল-চাতুরী আমার সাথে। আমি তোমার পথের কাঁটা হয়ে থাকব না। প্রমীলার কান্না দুপুর রাতের স্তব্ধতা ভঙ্গ করে সারা বাড়ীতে ছড়িয়ে পড়লো। সুকুমারবাবু বোবা হয়ে গেলেন।

হাসপাতাল-কেরং প্রমীলার ইনটেষ্টাইন টি, বি।

দেশের প্রকৃত অবস্থা পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে রাশিয়ার জার পিটার দি গ্রেট প্রতি রাত্রিতে সহরে সহরে ঘুরে বেড়াতেন। তিনি স্বচক্ষে দেখতে চাইতেন দেশের ও দেশের জন-সাধারণের কি অবস্থা। একদিন তিনি অকস্মাৎ উপস্থিত হলেন ওলোনেজ সহরে। স্থানীয় শাসন কর্তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, এখানে আদালতে কতগুলি মামলা এখন চলেছে? গভর্ণর উত্তর দিলেন, একটিও নয়?

—কি করে তা সম্ভব হোল? সম্রাট জানতে চাইলেন।

—গভর্ণর ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলেন, আমি এমন ভাবে আলাপ আলোচনা চালাই যে উভয় পক্ষের মনোমালিন্য দূর হয়ে যায়। ঝগড়া আর কারো সঙ্গে থাকে না। আশাকরি আপনি তা ক্ষমা করবেন।

—এই দৃষ্টান্তই সকলেরই অনুকরণ যোগ্য। পিটার দি গ্রেট বললেন, এতে ঈশ্বর এবং তোমার প্রভু উভয়ই সন্তুষ্ট থাকবেন।

◂এই প্রথম▸

[গল্প-ভারতীতে 'এই প্রথম' পর্যায়ে আমরা সম্ভাবনাপূর্ণ নবাগত লেখক-লেখিকাদের রচনা আজ বহুদিন ধরে ছেপে আসছি। নূতন লেখক সৃষ্টি করা সাহিত্য-পত্রিকার একটি বিশেষ কর্তব্য। এই ভাবে ভাবান্বিত হয়েই আমরা এই অধ্যায়টির রচনা করি। সত্যই যাঁদের প্রতিভা আছে, সুযোগ সুবিধা পেলে যাঁরা একদিন সুনাম ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবেন তাঁদের রচনা পাঠকদের সামনে তুলে ধরে তাঁদের উৎসাহ দান করাই আমাদের উদ্দেশ্য। পৃথিবীর সর্বত্রই এমনি করে নূতন লেখক তৈরী হয়ে থাকে। একদিন এইসব নূতন লেখক লেখিকা যে প্রথম সারিতে স্থান পাবে না তা কে বলতে পারে। লেখকদের কাছে আমাদের অনুরোধ, রচনা পাঠাবার সময় 'এই প্রথম' এই কথাটির যেন উল্লেখ করেন এবং নিজের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি জানিয়ে দেন, কেননা পাঠকদের এইসব জানবার বিশেষ কৌতূহল হয়।]

সম্পাদক—গল্প-ভারতী

দক্ষিণগড়ের সেই পুরানো গল্প

অর্চিনারায়ণ ভট্টাচার্য

দক্ষিণগড়ের সেই পুরনো গল্পটা বহুবার কত লোককে শুনিয়েছি। কিন্তু আশ্চর্য! কাহিনীটা আজও পুরনো হয়ে যায় নি। প্রত্যেকবারই কেন জানি না—গল্পটা বলার সময় নতুন লেগেছে আমার।

রোদে-পোড়া দুপুরে প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা মন্থর গতিতে এসে স্টেশনে থেমেছিল মনে আছে। ছোট্ট স্টেশন। লোকজনের ভীড় নেই। কুলীর হাঁক ডাক সামান্য। যাত্রীরা খুব কমই নামল; আমার এক হাতে মাঝারি সাইজের একটি সুটকেশ—অন্য হাতে ছাতা। গেটের টিকিট কালেক্টারের হাতে টিকিটটা তুলে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলাম।

জায়গাটা নেহাৎই ছোট সন্দেহ নেই। শুধু সামান্য কিছু ব্যবসায়ীর দৌলতে ছোট খাট একটা ব্যবসা কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। স্টেশন ঘরের সামনে চোখে প'ড়ল দণ্ডায়মান অল্প কটি সাইকেল রিক্সা।

শেষ রতনদাসের বাড়ী সকলেই চেনে দেখলাম এ অঞ্চলের ব্যবসায়ীদের মধ্যে অর্থশালী এবং প্রতাপশালী ব'লে নাম আছে রতনদাসের। পাটার ব্যবসায় রতন দাসের সমৃদ্ধি বেশ উচু পর্যায়ে এসে ঠেকেছে—বুঝতে ক ই'ল না।

ট্রেন থেকে আগেও অনেকবার দেখেছিলাম রিক্সার চলার পথে আবার নতুন ক'রে চোখে প'ড়তে লাগল। সত্যি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভারী অপূর্ব জায়গাটার দু'পাশে তাকালেই চোখে পড়ে ছোট ছোট টিলা এক ধারে একটা বালি ধোওয়া পাহাড়ী নদীর চওড় খাত। নদীর ওপারে ঘন বন। নানা জাতের ছো বড় গাছের জঙ্গলে ভর্তি। তাকাতে ভারী ভাল লাগছিল।

দক্ষিণগড়কে সেই প্রথম দেখেছিলাম।

সাইকেল-রিক্সা মন্থর গতিতে এসে বিরাট একা

লতাভরা পাকা বাড়ীর সামনে নামল। এ অঞ্চলের হিসেবে বাড়ীটাকে জমকালোই বলতে হবে। ভিতরেও বিরাট কম্পাউণ্ড। একধারে ভৃত্য-পরিচালকদের আউট-হাউস্। বাড়ীর চত্বরের এক ধারে বিরাট একটা অশ্বত্থ গাছ ডাল-পালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ীটার দরজা-জানলায় লতাপাতার কাজ—আর রঙ্‌চঙে শ্রীবৃদ্ধির ছাপ চোখে প'ড়ল।

একতলার একটা বড় ঘরে শেঠজী নিজেই বসেছিলেন গদীতে। প্রাথমিক নমস্কারের পর ছোট পোস্ট কার্ডখানির উপর চোখে বুলিয়েই হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেন শেঠজী। চিঠিটা অতি সামান্য। শেঠজীর কারবারে হিসাব রক্ষকের পদে বহাল হবার জন্য আমন্ত্রণ লিপি ছিল আমার নামে।

"বসুন। আপনার জন্যই প্রতীক্ষা করছিলাম অভয়-বাবু।" সামনে একটা টুল দেখিয়ে দিলেন শেঠজী।

"আজকের দিনটা বিশ্রাম ক'রে নিন। ক'লকাতা থেকে এতদূর আসতে শরীরে ধকল নিশ্চয় হ'য়েছে। বিকেলে ইচ্ছে করলে বেড়িয়েও আসতে পারেন খানিকটা।"

মুখে হাসি টেনে বলাম, "জায়গাটা প্রথম দিনই ভালো লেগেছে আমার।"

শেঠজীর মুখটা আবার উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল: "এর পর আরো ভালো লাগবে। আজকের দিনটা তা হলে বিশ্রাম করুন। কালকে কের কাজের কথা আলোচনা করা যাবে।"

রতনদাসের মুখের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিলাম। মধ্যবয়সী কর্দা পুরুষ—শরীর স্থূলকায়। উদরের স্ফীতিও লক্ষণীয়। অত্যধিক তাম্বূল সেবনে দাঁতের স্বাভাবিক পরিণতি ঘটেছে। কিন্তু সব কিছুকে ছাপিয়ে শেঠের ছোট ছোট ধূর্ত চোখ দুটি জ্বল্‌জ্বল্ করে উঠছে। সত্যি রতনদাসের চোখ দুটিকে ভোলা প্রায় অসম্ভব।

শেঠজী আরেকবার উদ্বেগ প্রকাশ করলেন: "আপনার স্নান খাওয়া সব কিছু সেরে নিন এখন। একতলার একটা ঘর আপনার জন্য বন্দোবস্ত করে রেখেছি। খাওয়া দাওয়ার খরচ আপনার লাগবে না—এখানেই দু'বেলা ব্যবস্থা থাকবে। চিঠিতেও সে কথা আগেই লিখেছি। মনে আছে তো?"

ধন্যবাদ জানিয়ে চাকরের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিলাম। চাকরীটা সামান্য কেরানীর চাকরী। কলকাতা থেকে বহুদূরে। কিন্তু বহুদিন বেকার জীবনের পর খানিকটা আশা খুঁজে পেয়েছিলাম যেন। রতনদাস আমাকে কিছু সুযোগ-সুবিধা দিলেও তেমন কিছু লোভনীয় পারিশ্রমিক দেবে না তা আমি জানতাম। তবু দূরের চাকরীটায় কেমন যেন একটা অ্যাডভেঞ্চারের নেশা জড়ানো ছিল। তাই রতনদাসের সুপরিচিত আমার শুভার্থী সেই ভদ্রলোকটির প্রতি একটু প্রচ্ছন্ন কৃতজ্ঞতা বোধ না করে পারি নি। কলকাতা থেকে চাকরীটার জন্য তিনিই সুপারিশ করেছিলেন।

কয়েকটা দিন কেটে গেল হু হু করে। কারবারের কাজ—হিসেব রাখার কাজ বুঝে নিতে দেরী হয় নি আমার। কাজটা খুবই নীরস লাগত সন্দেহ নেই। তবু অবসর সময়টা মন্দ কাটত না। বেশ ভালো লাগত দক্ষিণগড়ের সেই উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ। বহুদিন পরে মনে হত অন্তরাত্মাটা যেন ছাড়া পেয়েছে।

এ অঞ্চলে আরও কিছু পাতার ব্যবসায়ীর কারবার আছে শুনেছিলাম। তবে রতনদাসের ব্যবসাই বোধ হয় সব চেয়ে উঁচুতে উঠেছে। অনেকগুলি বড় বড় পাতার গুদামের মালিক রতনদাস। পাতা ভর্তি ট্রাকগুলি নানা শহরের দিকে যায়। কখন কখন রেল স্টেশনের গুডস্ শেডে। দূরপাল্লার ওয়াগনগুলি ভরে ওঠে পাতার পাহাড়ে। তারপর একসময় শ্রেণীবদ্ধ ভাবে যাত্রা সুরু করে তারা।

দক্ষিণগড়ের আশে পাশের জঙ্গলে রতনদাসের লীলাভূমি ছড়িয়ে আছে। সীজন্ টাইমে অসংখ্য শ্রমিকের ক্ষিপ্র হাতের পরিশ্রমে ভরে ওঠে ঝুড়িগুলি, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে নিঃশব্দে কাজ করে ওরা। সারি সারি ছোট ছোট গাছ থেকে পাতা তোলার কাজ—নিয়মানুবর্তিতার ছাঁদে বাঁধা। পাথরে জঙ্গলে সাড়া পড়ে যায়। অনেকগুলি কর্মমুখর মানুষের পদশব্দ। পথের ধারে দীর্ঘ প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে

থাকে ট্রাক্‌গুলি। মাথায় করে কুড়ি বয়ে নিয়ে আসে শ্রমিকের দল। তারপর পীচ্ বাঁধানো রাস্তায় গর্জন করে ছুটে বেরিয়ে যায় বোঝাই করা ট্রাক।

কখনো কখনো ওদের দু এক জন লোভী নেকড়ের সন্ধান পায়নি এমন নয়। গত বছর হিংস্র ভালুকের হাতে দলের থেকে পিছিয়ে পড়া একটি নারী-শ্রমিক জখম হ'য়েছিল সাংঘাতিক ভাবে। কিন্তু এসব ঘটনায় ওদের সাহস এক বিন্দু কমে নি। অটুট র'য়ে গেছে ওদের মনোবল।

মাঝখান দিয়ে চওড়া পাহাড়ী নদীটা সাপের মত এঁকে বেঁকে চলে গেছে জঙ্গলের বুক চিরে। ও পাশটায় জঙ্গলটা আরো ঘন। বালির চর ছাড়িয়ে —মাঝখানটায় জলের ঘূর্ণি। বড় বড় পাথরে টুক্‌রো জমে আছে সেখানে। বেশ স্রোত আছে নদীটায়। বড় বড় পাথরের চাই অবলীলাক্রমে ভাসিয়ে নিয়ে যায় বর্ষার দিনে।

শেঠ রতনদাসের কারবারের পুরনো কাহিনীটা বহুবার শুনেছি। তাই দক্ষিণগড়ের জঙ্গলের সামনে দাঁড়িয়ে দূরের পাহাড়ী পটরেখার দিকে চোখ রেখে বেশ একটু অদ্ভুত লেগেছিল আমার সেদিন। মনে হ'য়েছিল কতদিনকার পুরাণো ইতিহাস লুকিয়ে আছে এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে। কেউ তার হদিশ রাখে না।

• • •

শুনেছিলাম শেঠজী শুধু বিপত্নীক নন— নিঃসন্তানও। এত বড় বাড়ীটার অধিকাংশ ঘরই বোধহয় খালি প'ড়ে থাকে। দোতালায় একটা বড় ঘরে শেঠজী থাকেন শুনেছি—কিন্তু সাধারণতঃ এক তলাতেই আমাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত ছিল। তবু যেন বার বার একটু রহস্যজনক মনে হ'ত গোটা বাড়ীটা।

কিন্তু শেঠজীর আতিথেয়তায় কোন খুঁত চোখে পড়ে নি।

এই প্রকাণ্ড বাড়ীটার এককোণে একতলায় আমার জন্য একটি ঘর রিজার্ভ ক'রে দেওয়া হ'য়েছে। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থার কোন ত্রুটি নেই। দৈনন্দিন কাজটা একটু একঘেয়ে হ'লেও অবসর সময়টা কেটে যেত ভালোই। বিকেলের দিকে হাঁটতে হাঁটতে চ'লে যেতাম নদীটার ধারে। নির্জন জঙ্গল আর উঁচু নীচু টিলাগুলির দিকে তাকিয়ে থাকতাম অনেকক্ষণ। রাত্রে লণ্ঠনের আলোর নীচে গল্পের বই হাতে ক'রে অনেকক্ষণ সময় কেটে যেত আমার। তাকিয়ে দেখতাম হারিকেনের শিখা নিবু নিবু—তেল ফুরিয়ে আসছে। ফুঁ দিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে বিছানায় এলিয়ে দিতাম শরীরটা।

রোজ সকালে রতনদাসের যে পরিচারিকাটি আমার ঘরে মাটির কলসীতে জল দিয়ে যায় আজ সকালে এখনও অবধি সে আসেনি। সামান্য একটু অস্বস্তি বোধ ক'রছিলাম। ঠিক এমন সময় ঘরে ঢুক'ল আর একটি মেয়ে—রতনদাসের অন্য কোন পরিচারিকা হবে হয়ত। মেয়েটিকে আগে কখনো দেখিনি। ওর বেশভূষা অন্য পরিচারিকাদের চাইতে স্বতন্ত্র—সাদার ভঙ্গী আর অলংকারে খানিকটা পারিপাট্যের আভাস। রঙ্‌ বেশ কালো—কিন্তু শরীরের ভরাট মেয়েলী গড়নটা চোখে প'ড়বার মত। এক মিনিট অবাক চোখে তাকিয়ে না থেকে পারলাম না। মেয়েটির বয়স কুড়ি-বাইশের বেশী হবে না। দৃষ্টিতে একটা অদ্ভুত প্রখরতা আছে। ওর দাঁড়াবার ভঙ্গীটাও একটু উত্তেজক।

শান্ত গলায় মেয়েটি ব'ল্ল, "আমি সীতা। দুলারীর আজ বুখার্ হ'য়েছে। আপনার জল আজ আমিই এনে দেব।"

কলসীটা কোমরে নিয়ে সীতা বেরিয়ে গেল। যাবার আগে একটা দ্রুত দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে গেল আমার সমস্ত লোমকূপে—শিরায় শিরায় ছুঁয়ে গেল যেন দৃষ্টিটা।

"বাবু, জল এনেছি।"

সীতার পদশব্দে আবার চমক্ ভাঙল আমার। কলসীটা নামিয়ে রেখে সীতা কের ঘর থেকে চ'লে গেল নিঃশব্দে। কিন্তু ঠিক যাবার আগে ওর সেই প্রখর দৃষ্টি বুলিয়ে গেল আমার শরীরে—প্রত্যেক স্নায়ুতন্ত্রীতে।

এর পরে সীতা আরও অনেকবার আমার ঘরে এসেছিল। চলাফেরার অসঙ্গতির অন্তরালেই বেশ দিন। শেষের দিকে আমি একটু সন্দেহ না ক'রে পারি নি। মনে হ'য়েছিল সীতার কথাগুলি বানানো। লক্ষ্য ক'রেছি —কোন কারণে এই ঘরের প্রতি ওর একটা আকর্ষণ আছে। শুধু তাই নয়, ঘরের অধিবাসীর সঙ্গে কথা বলবার জন্য একটা রহস্যজনক আগ্রহ আছে ওর। তখন কারণটা অবশ্য বুঝে উঠতে পারি নি।

সীতার পরিচয়ও আস্তে আস্তে সংগ্রহ ক'রেছিলাম। রতনদাসের পরিচারিকা হ'লেও এ বাড়ীর আর দশজন পরিচারিকার থেকে তফাৎ আছে সীতার। একটা বিশেষ ইতিহাস জড়ানো র'য়েছে সীতার সঙ্গে।

অন্যান্য বছরের মত দক্ষিণগড়ের আশেপাশের জঙ্গলে পাতা তোলার ধুম পড়ে গিয়েছিল সেবার। চারদিকের গ্রাম থেকে বহু শ্রমিক এসেছিল কাজ ক'রতে। ছেলে মেয়ে যুবক বৃদ্ধ সকলেই।

প্রকাণ্ড একটা পাথরের টুকরোর উপর ব'সে জঙ্গলের পাতা তোলার কাজ দেখছিল রতনদাস। দেখাশুনা ক'রবার কর্মচারীর অভাব না থাকলেও মাঝে মাঝে নিজের হাতে তদারকীর ভার তুলে নিত শেঠজী। তার আশ্চর্য ধূর্ত চোখের সামনে ফাঁকি দেবার পথ মিলত না কোন শ্রমিকের।

দুপুরে রোদ বেশ গরম হ'য়ে উঠেছিল। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে লক্ষ্য করেছিল রতনদাস—নদীর ধারে বড় গাছটার নীচে বিশ্রাম করছে একটি অল্প বয়সী নারী-শ্রমিক। পরিশ্রমে ক্লান্ত—কপালে স্বেদবিন্দু জমে উঠেছে। কিন্তু মেয়েটির চেহারায় ধার আছে—শরীরটা যেন জ্যামিতিক অনুপাতে তৈরী। ঠিক যেন ভরন্ত বিল। বিপত্নীক রতনদাসের লোভী ক্ষুধার্ত চোখটা জ্বলে উঠেছিল তখনই। সর্দার শ্রমিককে হাতের ইসারায় কাছে ডেকে পাঠিয়েছিল শেঠজী।

পরিচয় জানা গিয়েছিল। মেয়েটি খুবই দরিদ্র। পিতৃমাতৃহীন—প্রায় অভিভাবকহীনও বলা চলে। কাছাকাছি কোন এক গ্রামে বাড়ী।

তারপর শেঠ রতনদাসের বিরাট বাড়ীতে পরিচারিকার চাকরী মিলেছিল সীতার। কিন্তু আর দশ জন পরিচারিকার চাইতে স্বতন্ত্র আসনে বসেছিল সীতা। ঘর গৃহস্থালীর কয়েকটা সাধারণ কাজের জন্য এই অংশী ফুলটিকে তুলে আনেনি রতনদাস।

রতনদাসের দৌলতে ভাগ্য ফিরেছিল সীতার। ভালো শাড়ী, নতুন রূপোর গয়না, বসবাসের পৃথক্ ঘর। অন্য পরিচারিকাদের থেকে ওর আলাদা মার্জিত রূপ সহজেই চোখে পড়ত।

কিন্তু রতনদাস এর পরিবর্তে চড়া হারে সুদ আদায় করে নিয়েছিল সীতার কাছ থেকে।

বিপত্নীক রতনদাসের রাত্রির সঙ্গিনীর প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন ছিল নারী সান্নিধ্যের। তাই সাধারণ পরিচারিকা হ'য়েও রক্ষিতার পদ অলংকৃত করেছিল সীতা। একদিন দুদিন নয়। দিনের পর দিন।

কাহিনীটা শুনে প্রথমে একটু চম্‌কে উঠেছিলাম।

কিন্তু তারপর কয়েকদিন মাঝরাতে কয়েকটি ঘটনা দিনেমার ছবির মত ঘটে গিয়েছিল। তখনো জানতাম না আমার জন্য আরও কত বিস্ময় সঞ্চিত হয়ে আছে।

ঘরের ভিতর শুয়ে শুয়ে সে রাত্রে কিছুতেই ঘুম আসছিল না আমার। বোধ হয় গুমোটটা একটু বেশী ছিল অন্যদিনের চাইতে। ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে একতলার বারান্দা দিয়ে অন্ধকারে পায়চারী ক'রছিলাম কিছুক্ষণ। লম্বা টানা বারান্দাটা চ'লে গেছে একদিকে। শেষ প্রান্তে দোতালায় ওঠার সিঁড়ি। এ বাড়ীতে দোতলায় যাবার ঐটিই একমাত্র পথ।

হঠাৎ চম্‌কে ফিরে তাকালাম। কম্পাউণ্ডের এক কোণ দিয়ে আউট্ হাউসের দিক থেকে একটা লণ্ঠনের আলো এসে দাঁড়াল। তারপর বারান্দার একেবারে শেষ প্রান্তে হ্যারিকেনের বাতি জ্ব'লে উঠ'ল ঠিক সিঁড়ির মুখটায়। সৌভাগ্য বশতঃ আমার দিকটায় কারুর নজর পড়ে নি। স্যাণ্ডেলটা খুলে রেখে পা টিপে টিপে অন্ধকারে নিঃশব্দে এগিয়ে গেলাম সিঁড়ির দিকটায়। একটু দূর

থেকে মোটা একটা থামের আড়ালে দাঁড়ালাম নিজের শরীরটাকে যতদূর সম্ভব গোপন ক'রে।

সব কিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। ঠিক সিঁড়ির মুখটায় লণ্ঠন হাতে দাঁড়িয়ে আছে সীতা। পরণে রক্ত লাল শাড়ী। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবছে। ওর চোখে কাজল—কপালে টিপ—হাতে পায়ে রুপোর গয়না। কানে নতুন কর্ণাভরণ। নৈশ অভিসারে চ'লেছে সীতা। কিন্তু দূর থেকে দেখে মনে হ'ল ওর মুখটা একটু ম্লান—একটু বিমর্ষ। দু একবার ইতঃস্তত করার পর আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল সীতা। লণ্ঠনের আলোটাও ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

কয়েক মিনিট স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। সীতার কাহিনী অপরিচিত ছিল না আমার কাছে। কিন্তু আজ যেন একটা চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা হ'ল। রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।

এরপর কয়েকটা দিন কেটে গিয়েছিল। নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছিলাম একদিন বিকেলের দিকে। ভারী একটা পাথরের উপর ব'সে তাকিয়ে দেখছিলাম লাল বালির বাদ। সাদা জলের স্রোত বড় বড় পাথরের চাঁইএর উপর এসে প'ড়ছিল। সামনের আমলকী গাছগুলি দুলে উঠছিল কোড়ো বাতাসে। বেশ লাগছিল দেখতে।

হঠাৎ একটা লঘু পদশব্দে চমকে উঠলাম। কে একজন যেন আমার সামনে দাঁড়িয়ে খিল্ খিল্ ক'রে হাসছে। মসৃণ জলের মত সেই হাসি।

চমকে তাকিয়ে দেখলাম আর কেউ নয় সীতা। তবে ওর বেশ ও প্রসাধনে এখন অতটা জাঁকজমক নেই—অনেকটা ঘরোয়া সাজে সেজেছে ও। মাথার চুলে বুনো লাল ফুল গুঁজেছে একটা। ওর সেই প্রখর দৃষ্টিতে একবার আমার দিকে তাকাল সীতা। অদ্ভুত কামনাতুর মনে হ'ল ওর চাউনিটা। চাবুকের মত ধারালো মনে হ'ল ওর শরীরটাকে।

সীতাকে এই জায়গায় দেখতে পাব স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারি নি। তাই কয়েক সেকেণ্ড স্তম্ভিত হ'য়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সীতাই প্রথমে মুখ খুলল। ব'লল, "আমাকে দেখে খুব অবাক লাগছে বুঝি বাবু?"

ব'ললাম, "তা একটু লাগছে বৈকি। নদীর ধারে তোমাকে কখনো তো দেখি নি।"

সীতা আবার হাস'ল। ব'ল্ল, "নদীর ধারে আপনি রোজ বেড়াতে আসেন শুনেছি। তাই আজ এখানে এলাম আপনাকে দেখতে।"

ভারী পাথরের ঠিক সামনেটায়—প্রায় আমার পায়ের কাছটায় বুনো ঘাসের উপর ব'সে প'ড়ল সীতা। ওর বুকের আঁচলটা অলক্ষ্যে খ'সে প'ড়ল এক সময়। কয়েক মিনিট আত্মবিস্মৃতির মধ্যে থেকে যেন একটা লজ্জার ধাক্কায় নিজেকে সংবৃত ক'রে নিল ও।

কয়েক মিনিট বিস্ময়ে আমার বাক্যস্ফুরণ হয় নি। একটু পরে সীতার দিকে তাকিয়ে একটু কঠোর গলাতেই ব'ললাম: "আমাকে এখানে দেখতে আসার বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে কি? আমি কোন আজব প্রাণী নই। তা ছাড়া আমি একটু একলা থাকতে ভালবাসি।"

একটু যেন লাল হ'য়ে উঠ'ল সীতার মুখটা। মুখটা মাটির দিকে নামিয়ে নিল ও। তারপর ফিস্ ফিস্ ক'রে উচ্চারণ ক'রল সেই ভয়ংকর কথাটা: "কিন্তু আমার যে আপনাকে খুব দেখতে ইচ্ছা করে বাবু! শেঠজীর বাড়ীতে তো সুযোগ হয় না।"

আমার শরীরের সমস্ত শিরায় শিরায় হিমেল স্রোত ব'য়ে গেল একটা। অবাক হ'য়ে আমি সীতার মুখের দিকে তাকালাম।

আমার মুখের উপর চোখ রেখে এক মিনিট অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সীতা। তারপর ব'ল্ল, "আমাকে মাপ ক'রবেন বাবু। হয়ত কথাগুলি বলা আমার ঠিক হ'ল না। হয়ত কসুর করে ফেলেছি।"

আমি এই প্রশ্নের কোন জবাব দিলাম না। এক সেকেণ্ড নিস্তব্ধ থাকার পর গম্ভীর গলায় বলাম: "আমাকে কি তুমি একলা থাকতে দেবে না?"

সীতা কুণ্ঠিত ভাবে উঠে দাঁড়াল। আমার বলার ভঙ্গীটা একটু রুক্ষ হয়েছিল হয়ত। মুখটা কালো দেখাচ্ছিল ওর।

উঠে দাঁড়িয়ে অপরাধীর গলায় সীতা বল "চলি বাবু। আপনার সময় নষ্ট করব না।"

একটু অবজ্ঞার ভাব মনে নিয়েই বিকেলে বাড়ী ফিরেছিলাম। সামান্য একটা অখ্যাত দাসী মেয়ে আমাকে প্রণয় নিবেদনের স্পর্ধা রাখে। গোপনে মনীর ধারে খুলে বলতে হয় নিজের দুর্বলতা। হয়ত উপযুক্ত ব্যবহারই করা হয়েছে ওর সঙ্গে।

কিন্তু সন্ধ্যাবেলা নিজের ঘরে হ্যারিকেনের আলোর সামনে বসে মনে হল। কোথাও ভুল করেছি। আমলকী বন থেকে কি একটা অসোয়াস্তি কুড়িয়ে এনেছি আমি। পুরনো কাঁটা বয়ে নিয়েছি বোধ হয় কোন জায়গা থেকে। সারা রাত্রি অন্ধকারে আমার ভালভাবে ঘুম হল না সেদিন। খালি সীতা আর তার অদ্ভুত প্রখর চোখটার কথা মনে পড়তে লাগল।

কিন্তু এখানেই নাটকের যবনিকা পতন হ'ল না। পরের দিন রাত্রে ঘটল একটি অদ্ভুত ঘটনা।

রাত প্রায় একটা কি দেড়টা হবে। হঠাৎ আমার ঘরের দরজায় বাইরের থেকে কার যেন মৃদু করাঘাত প'ড়ল। প্রথমটায় বিছানা থেকে উঠি নি। কিন্তু করাঘাতটার পুনরাবৃত্তি হ'ল কয়েকবার।

উঠে দাঁড়িয়ে দরজাটা খুলতেই হ'ল। এত রাত্রে আবার কে ডাকে—হয়ত লারোয়ান টারোয়ান হবে। একটু বিরক্ত মুখেই খুলেছিলাম দরজাটা। কিন্তু দরজার সামনেটায় কাউকে দেখে যেন ভূত দেখার মত চমকে উঠলাম।

লণ্ঠন হাতে আমার ঘরের সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে সে আর কেউ নয়, সীতা। ওর আজকের সাজসজ্জা আর প্রসাধনে খুব বেশী আড়ম্বরের চিহ্ন নেই। কিন্তু ভয়ঙ্কর হাঁকাচ্ছে যেন সীতা। ওর কপালে ঘাম জমেছে বিন্দু বিন্দু। নিঃশ্বাস প'ড়ছে ঘন ঘন।

আমার সপ্রশ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে সীতা কাতরভাবে বল, "বাবু, আপনার ঘরে আমাকে এখন একটু আশ্রয় দিতে হবে। আমি খুব বিপদে প'ড়ে এখানে এসেছি।"

প্রায় আমার সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই আমার ঘরে দ্রুত প্রবেশ ক'রল সীতা। পিছনে পিছনে প্রবেশ ক'রলাম আমিও। এক লহমায় দু হাতে ঘরের দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ ক'রে দিল সীতা। তারপর দেওয়ালের দিকে পিঠ রেখে আমার দিকে সোজা হ'য়ে ফিরে দাঁড়াল। মেঝেতে এক কোণে জ্বলতে লাগল লণ্ঠনটা। লণ্ঠনের ম্লান আভায়—অর্ধেক আলো অর্ধেক ছায়া প'ড়েছে সীতার মুখে। দেখলাম কি রকম আশ্চর্য—কি রকম রহস্যময় দেখাচ্ছে ওর মুখ চোখ।

বল্লাম, "ব্যাপার কি? এত রাত্রে? এ সময় আমার ঘরে।"

সীতা বল, "উপায় ছিল না বাবু। শেঠজীর ঘর থেকে পালিয়ে এসেছি এইমাত্র। রোজ রোজ রাত্রে এই অত্যাচার ভালো লাগে না। কিন্তু শেঠজী এখন বাতি হাতে নিয়ে সারা বাড়ী আমাকে খুঁজতে বেরিয়েছে। যেখানেই লুকিয়ে থাকি না কেন ও ঠিক আমাকে খুঁজে বের করবেই—টেনে বের করবেই। তবু এই ঘরটায়—বোধ হয় এই ঘরটায় শেঠজী নাও আসতে পারে।"

এক মিনিট চুপ করে থাকার পর হঠাৎ আমার দুটো হাত নিজের হাতে আকুলভাবে চেপে ধরল সীতা। বল, "আমাকে আজ এই ঘরে এ রাতটা থাকতে দিন বাবু। আপনার ঘুমের কোন ব্যাঘাত হবে না। তা না হলে শেঠজীর হাত থেকে আমার মুক্তি নেই।"

উত্তেজনায় থর্ থর্ করে কেঁপে উঠছে সীতার সারা শরীর। আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে দেখলাম।

বাইরের বারান্দায় কার যেন চটির অস্বস্তিকর শব্দ বেজে উঠল। শব্দটা আমার ঘরের কাছাকাছি এসে থেমে গেল হঠাৎ। কয়েক মিনিটের নিস্তব্ধতা। তারপর বারান্দার অপর প্রান্তে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল শব্দটা। তবে কি শেঠজী ঘরের কাছে এসেছিল? তার পলায়ক রক্ষিতার আশ্রয়স্থল আবিষ্কার করেই ঘরে ফিরে গেল শেঠজী। কেমন একটা শিন্‌ধিনে অনুভূতি ছুঁয়ে চলে গেল আমার সর্বাঙ্গে।

তারপর কয়েকটা ঘণ্টা নিঃশব্দে কেটে গিয়েছিল ঘরের ভিতর। লণ্ঠনটা নিভে গিয়েছিল অনেকক্ষণ আগেই।

বিছানার উপর আমি বসেই ছিলাম—ঘরের মেঝেতে এক-কোণে নির্বাক হয়ে বসেছিল সীতা। কোন কথা বলে নি। অনেকক্ষণ যেন ভাষা হারিয়ে ফেলেছিলাম আমিও।

একই ঘরে কয়েক ঘণ্টা আবদ্ধ ছিলাম আমরা দুজন। অন্ধকারে টের পাচ্ছিলাম একটি নারীদেহের অস্তিত্ব। শুধু যেন পঙ্কাঘাতে চেতনা শিথিল হয়ে পড়েছিল সে রাত্রে।

ভোর রাত্রে সীতা উঠে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল, "চল্লাম বাবু। আপনাকে খুব কষ্ট দিলাম আজ সারা রাতটা।"

খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে অন্ধকারে মিশে গিয়েছিল সীতার ছিপ্‌ছিপে শরীরটা। যেন হারিয়ে গিয়েছিল ওর অস্তিত্ব।

পরের দিন সকালে গদীতে ঢুকবার আগে চোখাচোখি হয়ে গেল রতনদাসের সঙ্গে। কিন্তু শেঠজীর দৃষ্টি দেখে অবাক হয়ে গেলাম—সে চোখ আমি জীবনে ভুলব না। হিংস্র নেকড়ের মত সে চোখ জ্বলছে। কিন্তু সেটা কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার। পরক্ষণেই মুখে স্বাভাবিকতা টেনে এনে শান্ত গলায় কথা বল্লেন শেঠজী। বল্লেন, "আসুন খাজাকি-বাবু। কয়েকজন পার্টির কাছ থেকে কতগুলি নতুন চেক্ এসেছে। সেগুলি ব্যাংকে পাঠাবার বন্দোবস্ত করতে হবে।"

কারবারের কাজে আমি কোন ফাঁকি দিই না। দারাটা দিন ঘাড় গুঁজে কাজ করি। শুধু টাকা পয়সার হিসেব নয়—মালপত্রের হিসেবের কাজও আমি করি এখানে। আমাকে পেয়ে শেঠজীর যে প্রচুর লাভ হয়েছে সন্দেহ নেই। শেঠজীর কথাবার্তায় এ জিনিষটার প্রমাণ পেয়েছি কয়েকবার।

আজকের কাজে কিন্তু ভালো মন বসল না। মনে হল কোথায় একটা প্রকাণ্ড খাদ রয়েছে সামনে হাঁ করে। আমি যেন জলে নেমে কুমীরের সঙ্গে শত্রুতা করে চলেছি। খানিকটা যেন বেপরোয়া বেহিসেবীর মত।

একটা মাস কেটে গিয়েছিল। শেঠজীর পুরনো নরম ব্যবহারে কোন পরিবর্তন চোখে পড়ে নি। খাজাকিবাবুর প্রতি কোন বিদ্বেষের ভাবও নজরে আসে নি আমার। হয়ত কিছুটা অভিনয় দক্ষতা ছিল শেঠজীর।

কিন্তু একটা নতুন খবর সম্প্রতি আমার কানে এসেছিল। সেদিনকার রাতের ব্যাপারটা খুব সহজে মেটে নি। জল অনেক দূর গড়িয়েছিল। বোধহয় সীতার সেদিনের অমার্জনীয় অপরাধটা সহ্য করতে পারে নি শেঠজী। সীতার উপর নাকি হুকুম হয়েছিল জঙ্গলে ফিরে গিয়ে শ্রমিক দলের সঙ্গে কাজে যোগ দেবার—পাতা তোলার পুরনো কাজ। রতনদাসের চক্‌মিলানো বাড়ীতে আর ঠাঁই মিলবে না ওর। রক্ষিতার আদরের সিংহাসন থেকে একেবারে পথের ধূলায়। পুনর্মূষিকের মত অবস্থা হয়েছিল সীতার।

সীতাকে তারপর শেঠজীর বিরাট বাড়ীটাতে বহুদিন দেখি নি। সত্যই বহুদিন। বন জঙ্গলের কাজে আবার গ্রাম্য শ্রমিকদের ভীড়ে নাকি মিশে গেছে ও। হারিয়ে গিয়েছে বোধহয়।

মাস চারেক পরে শুধু একটা ভয়ংকর খবর পেয়ে চমকে উঠেছিলাম। অনেকটা দুঃস্বপ্নের মত জিনিষটা। এ অঞ্চলের সব চেয়ে দুর্গম এবং ঘন জঙ্গল নদীর ওপারে প্রতাপগড়ের রাস্তায়। একটি অর্ধভুক্ত নারীদেহ উদ্ধার করা হয়েছিল সেই জঙ্গল থেকে। হিংস্র বাঘের হাতে প্রাণ হারিয়েছে হতভাগিনী। জঙ্গলটায় বুনো বাঘের উপদ্রব অনেক দিনের। এ অঞ্চলে এই জঙ্গলটাতেই রাতের বিভীষিকা সব চাইতে বেশী।

মৃতদেহটা সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছিল। রতনদাসের দেওয়া কয়েকটা রূপোর গয়না তখনও সংলগ্ন ছিল সেই নারীদেহে। সীতার মর্মান্তিক পরিণতির খবর শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। মর্মাহত হয়েছিল অনেকেই। হয়ত নদীর ওপারে মাণিকপুরের জঙ্গল থেকে পাতা তোলার কাজ করবার সময় ভুলে পথ হারিয়ে ফেলেছিল সীতা। মাণিকপুর খুব দূরে নয় প্রতাপগড়ের রাস্তা থেকে। কিন্তু সমস্ত জিনিষটা যেন অদ্ভুত বেদনাদায়ক।

সেদিন সন্ধ্যায় আলো জ্বালতে ভুলে গিয়েছিলাম নিজের ঘরে। অন্ধকারে বহুক্ষণ বসে বসে স্মৃতি রোমন্থন করেছিলাম। চোখের কোণটায় কখন একটা বাষ্পের আভাস ঠেলে উঠেছে টের পাই নি।

এরপর আরও কয়েকটা মাস কেটে গিয়েছিল। পুরনো জিনিষ আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে আসে—পটভূমি ক্রমশঃ হয়ে ওঠে আবছা। আস্তে আস্তে সীতার স্মৃতি যেন ঝাপ্‌সা হয়ে এসেছিল লোকজনের মনে। কিন্তু সীতাকে আমি ঠিক ভুলতে পারি নি। মাঝে মাঝে এক রাত্রির সেই রোমাঞ্চকর ঘটনার ইঙ্গিত উদাস করে দিত মনটাকে। তার কারণ আজও খুঁজে পাই নি।

শেঠজীর গদীতে বসে হিসেবের দিকে কাজ করছিলাম সেদিন। এমন সময় ছোট একটা চিরকুট্ এসে পৌঁছুল আমার হাতে—দোতলা থেকে পাঠিয়েছেন শেঠজী। ট্রাক্ ড্রাইভার মোহনচাঁদ আর ট্রাক্ খালাসী স্বরূপলালকে কিছু মোটা টাকা পারিশ্রমিক হিসাবে দিতে হবে। ড্রাইভারকে পাঁচশ আর খালাসীকে তিনশ টাকা। টাকার অংকটা একটু বেশী মনে হল। যাইহোক কাগজটা এগিয়ে দিলাম ক্যাসিয়ার দুবেজীর হাতে।

টাকা নিয়ে মোহনচাঁদ আর স্বরূপলাল চলে গিয়েছিল অনেকক্ষণ। দিনের কাজ শেষ করে ক্যাশ বাক্স বন্ধ করছিলেন দুবেজী। আমিও মনোযোগ দিয়ে পড়েছিলাম আমার হিসাবের খাতার উপর।

দুবেজী একবার আড়চোখে আমার দিকে তাকালেন। মনে হল কিছু বলতে চান উনি। জিজ্ঞাসু মুখে তাকালাম দুবেজীর মুখের দিকে। বেশ মুচতুর এই ভদ্রলোক।

একটা বাঁকা হাসির রেখা খেলে গেল দুবেজীর ঠোঁটের গোড়ায়। বল্লেন, "খাজাকিবাবু, আজকের পেমেন্ট্‌গুলি ড্রাইভার আর খালাসীকে শেঠজী শুধু শুধু করেছেন বলে আপনি মনে করেন? আপনি বড় সিধে লোক খাজাকিবাবু।"

অবাক হয়ে বল্লাম, "আপনার কথার হেঁয়ালীটা ঠিক বুঝলাম না দুবেজী। তবে টাকাটা একটু বেশী বলে আমারও মনে হয়েছিল।"

দুবেজীর চোখ দুটো চক্ চক্ করে উঠল: "বিনা কারণে টাকা জলে ফেলবার মত প্রকাণ্ড ভুল রতনদাস শেঠজী কখনো করে নি খাজাকিবাবু। করবেও না কোনদিন।"

"তার মানে?" জিজ্ঞাসায় ভুরুটা উন্নত হল আমার।

"মানেটা অত্যন্ত সোজা। প্রতাপগড়ের জঙ্গলে সীতাকে একা ছেড়ে আসার মেহনতটা খুব কম দামী নয়। তাই মজুরীটাও একটু বেশী দামের দিতে হয়েছে শেঠজীকে।"

লেখকের পরিচিতি:

ছেলেবেলা থেকেই সাহিত্যিক পরিবেশে মানুষ, তাই অতি অল্প বয়স থেকেই সাহিত্য-সাধনা সুরু করার সুযোগ পান। ছাত্রজীবন শেষ করার পর গল্প-উপন্যাস রচনায় হাত দেন।

অর্চিনারায়ণ রায়ধন্ন সম্পাদক বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক অধ্যাপক শ্রীকিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের পুত্র। ইনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র এবং সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে বর্তমানে ভারত সরকারের অধীনে (রেলওয়ে ফিনান্স বিভাগে) ক্লাস ওয়ান্ অফিসার রূপে নিযুক্ত আছেন।

জ্যোতির্ময়

একটি স্মরণীয় এফ. এ. কাপ ফাইনাল

যে খেলায় একই খেলোয়াড় দু' পক্ষের হয়েই গোল করেছিল।

রেফারি বাঁশি বাজালেন। হাফ টাইম। ওয়েম্‌ব্লির মাঠ থেকে বাইশজন খেলোয়াড় তাঁবুতে ফিরলো কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্যে। প্রায় একলক্ষ দর্শক সেই খেলা দেখছিল।

তারিখ হচ্ছে ১৯৬৬ সালের ২৭শে এপ্রিল। যুদ্ধের সময় খেলা বন্ধ ছিল। যুদ্ধের পর এই প্রথম কাপ ফাইনাল। ১৯৩৯ সালে শেষ খেলা হয়েছিল। ফাইনালে ছিলেছিল পোর্টসমাউথ।

অনেক বছর পরে আবার কাপ ফাইনাল। এবার তাই উত্তেজনা যেন চরমে উঠেছে। এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে ডারবি কাউনটি এবং চারলটন অ্যাথেলেটিক।

খেলার শুরু থেকেই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। দু' পক্ষই সমান জোরে লড়ছে। দু পক্ষেই চমৎকার পাসিং, অবিশ্বাস্য ড্রিবলিং, তীব্র সট, অদ্ভুত গোলকীপিং। দেশের সেরা খেলোয়াড়রা সেদিন সেরা খেলা দেখাচ্ছে। কিন্তু প্রথমার্ধে গোল হল না।

দ্বিতীয়ার্ধের খেলা যখন আরম্ভ হল তখন লক্ষ দর্শকদের কেউই ভাবতে পারেনি যে এ খেলার শেষ ভাগে এত শিহরণ লুকিয়ে আছে।

চারলটন এই প্রথম কাপ ফাইনালে উঠেছে। ডারবিদল ইতিপূর্বে তিনবার ফাইনাল খেলেছে কিন্তু কোনবারেই জয়লাভ করতে পারেনি।

একটি গল্প চালু ছিল যে এক বেদে একবার ডারবি দলকে অভিশাপ দিয়েছিল যে তারা কোন দিন কাপ জয় করতে পারবে না। এবার নাকি এক বেদে ডারবি দলের অধিনায়ক নিকোলাসকে জানিয়ে গেছে যে সেই অভিশাপের মেয়াদ শেষ হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দশ মিনিটের খেলা দেখে মনে হচ্ছে ডারবি দলের জয়ের আশা নেই। দারুণ খেলছে চারলটন। যে কোন মুহূর্তে গোল হবে বলে মনে হচ্ছে।

তার পরেই হঠাৎ ঘটল এক অসাধারণ ঘটনা। খেলার ৮১ তম মিনিটে ডারবি দল চারলটনকে চেপে ধরল। একটা তীব্র শট বাঁচালো চারলটনের গোলরক্ষক। বলটা ছিটকে বেরিয়ে এসে লাগল চারলটনের রাইট হাফ বারট টারনার-এর পায়ে এবং ধাক্কা খেয়ে বলটা উলটো মুখে চারলটনের গোলে ঢুকে গেল। ডারবি দল এক গোলে এগিয়ে গেল। চারলটনের রাইট হাফ নিজেই নিজের দলের বিপক্ষে গোল করে বসল।

বারট টারনার আপশোষে লজ্জায় যেন মরে যাচ্ছে। আর মাত্র ন' মিনিট আছে খেলা শেষ হতে। আর সে কিনা এক আত্মঘাতী গোলে নিজের দলকে হারিয়ে দিল!

খেলা সুরু হল। চারলটন মরীয়া হ'য়ে আক্রমণ করল। ডারবির পেনালটি সীমানার বাইরে একটা ফাউলের জন্যে চারলটন ফ্রী কিক পেল। চারলটনের অধিনায়ক বারট টারনারকে আহ্বান করল সেই ফ্রী কিক মারবার জন্যে।

টারনার এসে দাঁড়ালো বলের সামনে। ডারবির খেলোয়াড়রা তাদের গোলের সামনে মানুষের দেওয়াল রচনা করেছে। সেই দেওয়াল ভেদ করে গোল হওয়া বুঝি অসম্ভব।

কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইল টারনার। তারপর বলে শট করল! সে এক আশ্চর্য জোরালো শট—পঁচিশ গজ দূর থেকে বিদ্যুৎ বেগে সেই বল ডারবির গোলে প্রবেশ করল গোলকীপারকে হতভম্ব করে দিয়ে।

চারলটন গোল পরিশোধ করল আর সেই সঙ্গে ইতিহাস সৃষ্টি করল তাদের রাইট হাফ—বারট টারনার। কাপ ফাইনালে ইতিপূর্বে একজন খেলোয়াড় আর কখনো এমন করে দু পক্ষের হয়েই গোল করেনি।

খেলা শেষ হতে আর দেরী নেই। দু'পক্ষই গোল করবার জন্যে যেন ক্ষেপে উঠেছে। ডারবির সেন্টার ফরওয়ার্ড জ্যাক স্ট্যান্সল একটা বল পেয়ে ছুটছে। সামনে প্রতিপক্ষ কেউ নেই।

শুট কর, জ্যাক, শুট কর—চেঁচাচ্ছে ডারবির সমর্থকরা।

শুট করল জ্যাক স্ট্যান্সল! সে বল আটকাবার সাধ্য নেই চারলটনের গোলরক্ষক বারট্রামের। বল গোলে ঢুকছে! ডারবির সমর্থকরা চীৎকার করে গগন বিদীর্ণ করছে—গোল, গোল।

কিন্তু হঠাৎ এ কী! বলটা হঠাৎ যেন নিশ্চল হয়ে ধপাস করে পড়ল চারলটনের গোলকীপারের হাতে!

তারপরেই সে কী হাসি আর চীৎকার! চারলটনের গোলকীপার বলটা হাতে নিয়ে রেফারিকে গিয়ে দেখালো—বলটা কেটে চুপসে গেছে!

এফ. এ. কাপ ফাইনালে এ-রকম ঘটনা এই প্রথম! সেদিক থেকেও এই কাপ ফাইনাল ইতিহাস সৃষ্টি করল।

খেলা শেষ হল—সমান সমান। দু'পক্ষই একটি করে গোল করেছে।

নিয়ম অনুসারে অতিরিক্ত সময় খেলতে হবে।

অর্ধমৃত পরিশ্রান্ত অবস্থায় দু দলই আবার মাঠে দাঁড়াল। নতুন বল আনা হল। এই নতুন বলে যেন যাদু ছিল। আর সে যাদু ডারবির অনুকূলে। পর পর তিনটে গোল করল ডারবি দল। চতুর্থ বারের চেষ্টায় ডারবি কাউন্টি এফ. এ. কাপ জয় করল! খেলার শেষে ডারবির অধিনায়ক জন নিকোলাস-এর মনে পড়ল বুঝি সেই বেদের কথা—অভিশাপ শেষ হয়েছে, এবার তোমরা জিতবে।

অপরাহ্নবতী

(ধারাবাহিক উপন্যাস)

সুবোধ সিংহ

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

ভীষণ ভয় হল পরীক্ষিতের, ভেবে কেঁপে উঠল, নেমে পড়ল খাট থেকে ছুটে গেল বাথরুমের দিকে। এ ধাতের মেয়েরা সবই করতে পারে। ভাব-প্রবণ মেয়েদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। দরজা বন্ধ ছিল না। একটু ঠেলতেই খুলে গেল। সেখানে ঢুকেই থমকে গেল সে। সুমিত্রার মুখ দিয়ে গল গল করে রক্ত পড়ছে। বেসিনে ফুলঝুচো ভরে কেবলই মুখ ধুচ্ছে সে কিন্তু রক্ত পড়া বন্ধ হচ্ছে না।

"কি হল—?"

হঠাৎ সুমিত্রার শাড়ির দিকে চোখ পড়ল। সাদা খোলের শাড়ীও বেশ খানিকটা রক্তে ভিজে গেছে। চারিদিকে তাকাল পরীক্ষিৎ। কোথাও মারাত্মক কোন অস্ত্র দেখল না। সুমিত্রার পায়ের তলায় কি একটা জিনিস ইলেক্ট্রিকের আলোতে ছুরির ফলার মত ঝিক ঝিক করছে যেন। ঝুঁকে পড়ে কুড়াতে গিয়ে দেখল একটা রক্ত মাখা সাবান। সাবানটা রেখে দিয়ে ওর দিকে একটু এগিয়ে গেল সে। একবার একটা হাত বাড়াল, তখনই সরিয়ে আনল সে হাত। একটু দ্বিধা, একটু ইতস্তত, বেসিনে রক্তের ফুলঝুচো, চুড়ির রিং টিং আর ঘরময় বিভৎস নির্লজ্জ আলো।

"কি করে হলো—?"

মুখ না তুলেই সুমিত্রা বলল,—

"ঠোঁটটা কেটে গেছে— বোধ হয় দাঁত লেগে জিবটাও।"

পরীক্ষিৎ বলতে যাচ্ছিল,—'তুমি বড় অসাবধানী,' কিন্তু হঠাৎ চমক খেয়ে হোচট খেল ওর মন—অপরাধ ওর নয়, অসাবধানতা ওর নয়।

"কমেছে একটু ?"

"জানই তো রক্ত -পড়া আমার সহজে বন্ধ হয় না।— এখন একটু কমেছে হয় তো।"

সুমিত্রা মুখ উঠিয়ে পরীক্ষিতের দিকে তাকাল। দুটি বড় বড় লম্বা আয়নাতে চারটি সুমিত্রার নানা দিকের ছবি ফুটে উঠল। সুমিত্রা যেন বহুরূপী হয়ে নানা কলাকার চেহারার রূপ ধরে ওকে চারিদিক থেকে ভয় দেখাচ্ছে। ওর ঠোঁটটা মোটা হয়ে ফুলে পড়েছে—রক্ত মেখে একটা ভোঁক যেন ফুলে ঢোল হয়ে গেছে।

"তখন লেগে গেছে বুঝি হঠাৎ ?"

"হঠাৎ ? হাঁ হঠাৎই বোধ হয়। তোমার কনুইটা লেগে গেছে ঠোঁটে।"

"দাঁড়াও!" পরীক্ষিৎ ছুটে গেল শোবার ঘরে, ফিরে এল টিনচার বেঞ্জইন আর বরিক ওটন নিয়ে। বাঁ হাত দিয়ে সুমিত্রার ঘাড়টা জড়িয়ে ধরে পরীক্ষিৎ তার ডান হাত দিয়ে ওর ঠোঁটের কাটা জায়গাটা বেঞ্জইনতুলো দিয়ে আটকে দিতে লাগল। তুলো দিয়ে আটকে দেওয়ার পরেও তেমনি ভাবে ধরে রাখল সুমিত্রাকে—দেখতে লাগল ওর নীলাভ চোখের নিষ্পৃহ আর উদাসীন দৃষ্টি। কখন যে ওরই চোখের জল সুমিত্রার ফোকাসে গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল তা সে জানে না।

ওরই চোখের জলে সুমিত্রা কাঁদছে।

সুমিত্রার কথা শুনতে পেল কানে,—

"এবার আমাকে তুমি ছুটি দাও—অনেক দিন তো হল !—এবার ছুটী চাইছি তোমার কাছে !"

ওকে ছেড়ে দিয়ে পরীক্ষিৎ ওর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল।

"কোথায় যাবে তুমি ?"

"বাবার সঙ্গে কথা হয়েছে। তার সঙ্গেই সিঙ্গাপুরে যাচ্ছি।"

"কবে যাচ্ছ ?"

"এই মঙ্গলবারের পরের মঙ্গলবারে।"

"তিনি তো যাচ্ছেন চাকরি করতে।—তুমি কেন যাচ্ছ?"

হাসল সুমিত্রা।

"আরও ভালো করে বুঝিয়ে বলতে হবে তোমাকে?"

"সরে যেতে চাইছো?"

একটু একটু করে সুমিত্রার দুচোখে জল জমতে লাগল, আর অল্প অল্প করে সে থেমে থেমে বলতে লাগল,—

"তোমার মন আজ বিগড়িয়ে উঠেছে। তুমি এখন আমাকে আর সহ্য করতে পারছো না। যদি কাছে থাকি, আরো খারাপ লাগবে,—দূরে গেলে হয়তো—হয়তো বুঝবে। তাই চলে যাচ্ছি—।"

"পারবে—?"

"পারতেই হবে। বিয়ের পরে তোমাকে ছেড়ে থাকিনি খুব বেশী দিন, হয়তো কষ্ট হবে—তবু।"

"না—না, আমাকে ছেড়ে থাকবার কথা হচ্ছে না। তা তুমি বেশ ভালই পারবে।—তুমি কি ছেলে মেয়েকে ছেড়ে থাকতে পারবে?"

"তাদেরকে আমার সঙ্গে যেতে দেবে না তুমি? বেশীদিন নয়—ছমাস,—বড়জোর একবছর। ওরা নেহাৎ বাচ্চা। ওরা ছেড়ে থাকতে পারবে না। শুধু এইটুকু অনুমতি তুমি দাও—এই আমার প্রার্থনা।"

"ছ-মাস, এক বছরে এমন কিছু বড় হয়ে উঠবে না তারা। তা তুমিও বোঝ, আমিও বুঝি। হুল ফুটিয়ে বিষাক্ত করতে চাও ওদের মনকে—যেমন করে বিষাক্ত করে তুলেছ আমাকে। ওদেরকে দেখে ঘৃণা, অশ্রদ্ধা করবার শিক্ষা। না,—তা তোমাকে করতে দেবো না! তা তোমাকে করতে দিতে পারি না।"

"হুল ফুটিয়ে আমি তোমাকে বিষাক্ত করিনি। বিষ খেয়েছ তুমি নিজে। নিজেই বানিয়েছ সে-বিষ,—নিজেই খেয়েছ তা।"

"হয়তো তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু কেন বিষ খেয়েছি জান?"

"জানি—" সুমিত্রা তার দুই চোখের পাতা বন্ধ করল আর তখনি গড়িয়ে গেল নিঃশব্দে একটি জলের ধারা —"তোমার আকণ্ঠ বিষে ভরে গিয়েছে"—সুমিত্রা হঠাৎ শিউরে কেঁপে উঠল,—"আকণ্ঠ!"

পরীক্ষিতের ঠোঁটদুটো একবার যেন একটু থর থর করে কেঁপে উঠল। তা দাবলে নিয়ে বলল,—

"সুমিত্রা—! বিষ যে খায় সেও বিষকে ভালবাসে না, ভালবেসে কেউ বিষ খায় না।"

সুমিত্রা অন্য একটি কথার জের টেনে বলল,

"আমি হলে পারতাম না। ছেড়ে দিতাম ছেলে-মেয়েকে। মায়ের কাছ থেকে সন্তানকে ছিনিয়ে রাখতাম না।"

বাঘের মত জ্বলে উঠল পরীক্ষিতের দুটো চোখ। ওকে ভেঙ্গে দেওয়ার জন্যে ওর কথাগুলো যেন বাঘের থাবার মত উদ্যত হয়ে উঠল,—

"অভাব তুমি বোধ করবে না কিছুদিন পরে।"

"বুঝলাম না কথার অর্থটা।"

"কিছুদিন পরে ঠিকই বুঝবে।"

"সকলকেই কি তোমার মত ভাব? কিছুই বুঝতে পারিনি আমি?"

এরপর কয়েকটা দিনের ঘটনা ছায়ার মত অস্পষ্ট হয়ে গেছে। শোভনাদিদের বরযাত্রীর হাঙ্গামা এ-বাড়ীর দুটো ঘরেই নির্বিঘ্নে মিটে গিয়েছে। আরো বিঘ্নহীন হয়েছে আর্টিষ্টের প্রত্যক্ষ তদারকে। সুমিত্রা কিন্তু এ কয়দিনেই আলগা হয়ে গুটিয়ে নিয়েছে নিজকে। নীচে নামেনি এ-কয়দিন—বাক্স-সুটকেশ গুছিয়েছে নিজের, ছেলেমেয়ের জিনিস-পত্র, তাদের জামা-কাপড় পাট করে বড় আলমারীতে রেখে দিয়েছে, নিজের শাড়ী ব্লাউজ এবং আরও অনেক টুকিটাকি রেখেছে কাচের আলমারীতে আর গয়না প্রায় সবই আবরণ সেকে। ওদের বোনের বিয়ের দিন খন্টা দুই একের জন্যে ঘুরে এসেছিল সে—ফিরে এসেও বিশ্রাম করেনি সে। বইয়ের আলমারী নিয়ে পড়েছিল,—বইগুলো নামিয়ে ঝাড় পোছ করে সাজিয়ে রেখেছিল। ছেলেমেয়ের সঙ্গেও আর খুব বেশী মাখামাখি করতে দেখেনি পরীক্ষিৎ। ছেলে ও মেয়ে দুজনেই মনে

মনে কোন রকমে বুঝতে পেরেছিল যে ওদেরকে রেখেই ওদের মা অনেকদূরে চলে যাচ্ছে, আর তাদের মা ফিরে আসবে না। বুঝেছিল বোধহয় ওদের বাবাই ওদের মাকে জোর করে এ-বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। এ-বিষয়ে ওদের সন্দেহ যখন পাকা হয়ে উঠল তখন তারা সহজে আর পরীক্ষিতের কাছে ঘেঁষত না। এই দুর্বৃত্ত ওদেরকে ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে এ-কথা মনে হলেই আতঙ্কে তারা পালিয়ে যেত। মাকে ওরা চোখে চোখে রাখত, এক মুহূর্তের জন্যেও তাকে ছেড়ে থাকত না। মা বাবরুমে গেলে ওরা দরজার বাইরে বিষণ্ণ হয়ে বসে পাহারা দিত। পরীক্ষিতের মনে হয়েছে ওরা সাপের বাচ্চার মত হিংস্র হয়ে উঠছে ক্রমশঃ, কোলে নিয়ে আদর করতে গেলে ওরা সহ্য করবে না,—ছোবল দেবে।

সুমিত্রার সঙ্গে, এরপর, বাক্যালাপ ছিল না বলে তখন কিন্তু পরীক্ষিতের কোন বিকার বোধ হয়নি। বরং খুঁটিয়ে দেখেছে নিজের চরিত্র ও ব্যবহার। বিশেষ কোন মারাত্মক দোষ খুঁজে পায়নি সে—বিশেষ কোন গুরুতর এবং গর্হিত অন্যায়। যাকে রাখা যাবে না তার সঙ্গে প্রণয় অসম্ভব। যার সঙ্গে ভালবাসা অসম্ভব হয়ে উঠল সে আর থাকবে না। নির্বিকারভাবে ভাগ্যকে মেনে নিয়ে পরীক্ষিৎ খুব বেশী অসুখী মনে করেনি নিজকে। সে জানে মানুষের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়। সে যা পেয়েছে তার জন্যে তার অনুরাগ বা আসক্তি নেই; সে যা পায়নি তার জন্যেই তার মনোবেদনা ও বিক্ষোভ।

কবে এসেছিল ওরা দুই ভাইবোন মনে নেই। তবে সুমিত্রা যাওয়ার দু-একদিন আগেই বোধ হয়। শোভনাদি ও অজিত এসেছিল পরীক্ষিতের সঙ্গে দেখা করতে। ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছেয় হোক,—সুমিত্রা অনুপস্থিত ছিল।

মুহূর্তের মধ্যেই গল্প ফেঁদে বসলেন মহিলাটি। বোঝা গেল ইনি বেশ মজলিসি মানুষ; জমিয়ে তুলতে জানেন। অন্যের সংসারের খবর শুনতে কারো খুব ভাল লাগে না কিন্তু এর বলবার ভঙ্গীটি এমনই সুন্দর যে তা-ও পরীক্ষিতের কাছে মন্দ লাগল না। সেদিনের চেয়ে আজ মহিলাটিকে ভাল লাগল বেশী। পরীক্ষিতের মনে হয়—অন্ততঃ আজ মনে হচ্ছে এর কারণ বাড়ীতে কথা বলবার লোক নেই—সে মনে মনে একেবারে হাঁফিয়ে উঠেছিল। বিবাহ: একা একা থাকতে পরেনি, মানুষও পারেনা।

শোভনাদি বললেন,—

"সেদিন একটা কথা বলেছিলাম। মনে আছে বোধ হয়?"

"আছে। বেশ ভালই মনে আছে। একটা জিনিস উপহার দিয়ে অবাক করে দেবেন বলেছিলেন।"

"তাই বলেছিলাম বটে। কিন্তু তা বড্ড শক্ত কথা হয়ে গিয়েছিল। এত শক্ত করে বলাটা উচিত হয়নি আমার। জিনিষটা এনেছি বটে—কিন্তু সকলের কাছে সমান ভাল না-ও লাগতে পারে।"

তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

"আপনার উপকারের কথা আমরা ভুলবো না।—আসুন! বাইরের পর্চে রেখেছি জিনিষটা।"

এগিয়ে গেল ওরা দুজন আর তার পেছনে পরীক্ষিৎ। হাট-রেকে একটা মস্ত বড় চৌকো জিনিস সাদা বনাতের কাপড় দিয়ে ঢেকে ঠেসান দিয়ে রাখা হয়েছে।

আলের দুইচ টিপল আটিষ্ট।—ঝুপ্—কাপড় টানতে গেল দিদি,—আটকে গেল, খুলল না।

"আস্তে—আস্তে!—মাটি করলে তুমি—"

অজিত দৌড়ে গেল, ধরে ফেলল জিনিসটা শক্ত করে,—মস্ত বড় ফ্রেমটা পড়তে পড়তে সামলে গেল।

ভেঙেচুরে গেল দিদির মুখটা আর অজিত জিনিসটির ব্যালেন্সটি ঠিক করে আস্তে আস্তে তুলতে লাগল সাদা বনাতের আবরণ—স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করা সত্ত্বেও পরীক্ষিতের ঔৎসুক্যের দৃষ্টি যবনিকার অন্তরালের দৃশ্যটির দিকে আবদ্ধ হয়ে রইল।

"হ্যাঁ! আপনি আর এগুবেন না—ঐ খানেই দাঁড়িয়ে থেকে দেখুন—।" অজিত পরীক্ষিতকে লক্ষ্য করে ছেড়ে গলায় বলল।

সুমিত্রার অয়েল পেনটিং।

পরীক্ষিতের চোখের কালো মণি গাঢ় হয়ে উঠল দেখতে দেখতে……রাগ করেছ ?…পরীক্ষিৎ তাকিয়ে দেখল আর্টিষ্ট আর তার দিদিকে। ওদের চোখ পড়ে আছে ছবিটির দিকে…একবার আমাকে ছুটি দাও, অনেক দিন তো হলো।…ছবিটির জরির লাল ব্লাউসের ওপর নিয়ন লাইটের তীব্র আলো এসে ঠিকরে পড়েছে…একটু সরে থাকবো কিছুদিন—একটু অজ্ঞাত-বাস……ছবির চোখ, মুখ, ঠোঁট, নাক, রং হঠাৎ এই অন্ধকার ঘেরা রাত্রির মধ্যে মারাত্মক-ভাবে সজীব ও জীবন্ত হয়ে উঠল…তোমার আকণ্ঠ বিষে ভরে গেছে…ছবির মধ্যেও মাথার চুলগুলো এত হাল্কা আর ঝরঝরে যে একটু হাওয়া লাগলেই যেন আঁকা- কালো-চুলও কপালের কাছে উড়ে এসে পড়বে…নিজে বানিয়েছ সে-বিষ,—নিজেই খেয়েছ তা।…

পরীক্ষিৎ ঠিক সুমিত্রার কথাও ভাবছে না অথবা তার চলে যাওয়ার জন্যেও ওর অবচেতন মন সাড়া দিয়ে জেগে ওঠেনি অথচ ওর কয়েকটি কথা তীরের মত কানে এসে বিঁধছে। কিন্তু এই ছবি দেখে তখন শুধু একটি কথাই মনে হয়েছিল। সে কেবল অনুভব করল বহু যুগ ধরে বার বার একটি স্ত্রী-পুরুষের জীবন দ্বিখণ্ডিত হয়ে ভেঙ্গে বিপরীতমুখী দুটি দুঃখের মেরুর দিকে আকর্ষিত হয়ে ধাবিত হয়ে চলে যাচ্ছে।

এই অনুভূতিটাই তাকে বিস্ময়ে অভিভূত করল।

শিক্ষয়িত্রীর প্রশ্ন শুনে পরীক্ষিতের আচ্ছন্ন ও অবিষ্টভাব কেটে গেল সেই মুহূর্তে।

"কেমন দেখলেন ?"

নজরে পড়ল আর্টিষ্টকে। শুদ্ধ কাঠ হয়ে পরীক্ষিতের মন্তব্য শুনবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে সে,—যেন পরীক্ষিতের অভাবের ওপরেই আর্টিষ্টের অনাগত ভবিষ্যৎ জীবনের সফলতা নির্ভর করছে।

"চমৎকার—।"

"সত্য—?" মহিলাটির জিজ্ঞাস্য সমর্থন।

"তবে—।"

"বলুন—" আর্টিষ্টের উৎকণ্ঠিত স্বর-পতন।

"না। ভালই হয়েছে। তবে গলা আর থুতনির সেডটা আরো একটু হাল্কা নীল দিয়ে গালের সোনালি-হলদে রঙের সঙ্গে মিশিয়ে আনলে যেন আরো একটু স্বাভাবিক হত। ওর ঐ রং। ছবিতে যেন একটু লাইট হয়ে গিয়েছে।"

"বলছেন—?" হেড়ে গলায় ভরসা এল,—"ঠিক ধরেছেন—ওখানটায় একটু high light এসে গেছে—এখনও finishing touch দেওয়া হয়নি কিনা—!"

শিক্ষয়িত্রীর গলার ক্ষুব্ধ আওয়াজ ছিটকে এসে পড়ল পরীক্ষিতের কানে,—

"ভালো তবে লাগেনি আপনার কাছে ?"

"না—না, বেশ ছবি ; ওর হাতের কাজ ভাল। ধৈর্য আছে বেশ। আর ধৈর্য না থাকলে এ-সব fine arts হয় না। নিশ্চয়ই খুব পরিশ্রম করতে হয়েছে এর—ঘণ্টার পর ঘণ্টা মডেল দেখে ক্যানভাসে তুলির রঙে মানুষকে জীবন্ত করে তোলা সহজ কাজ নয়। প্রবল অনুরাগ না থাকলে এ-বিদ্যে আয়ত্ত করা যায় না,—অবিশ্যি মডেলেরও ধৈর্যের বাহাদুরী আছে।"

শিক্ষয়িত্রী মাথা নাড়লেন,—

"সে-কথা ঠিক ! কিন্তু এর লেগেছে মোটে এগারো দিন—তা-ও দেড় ঘণ্টা করে। পুরো দেড় ঘণ্টা কোন-দিনই ছবি আঁকেনি ও—বড় জোর আধঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট।"

পরীক্ষিৎ বসেছিল। দাঁড়িয়ে উঠে প্রতি নমস্কারও করেছে সে চলে যাওয়ার আগে বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তাও হয়েছে মহিলার সঙ্গে।

বিদায় নিয়ে অবশেষে একসময় চলেও গেল তারা। তবু স্পষ্ট কিছুই সে জানে না। পরিষ্কারভাবে কিছুই মনে করতে পারে না। সবই অভ্যাসের বশে যন্ত্রের মত ঠিক ঠিক হয়ে গেছে। ঠিক জায়গায় মাথা নেড়ে সায় দিয়েছে,—ওরাও হেসেছে ; প্রশ্ন হয়েছে, উত্তরও পেয়েছে নিশ্চই,—খুসীও হয়েছে কিন্তু পরীক্ষিতের মনে হল সে কিছুই দেখেনি, ওদের কোন কথাই যেন শোনেনি।

[ক্রমশঃ]

বাসে কলকাতা থেকে ভুটান

সুধীর ব্রহ্ম

ভারতের উত্তর পশ্চিমে সিন্ধুনদ থেকে ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব পর্যন্ত হিমালয় পর্বতমালা পৃথিবীর এক মহাদেশকে অর্দ্ধচন্দ্রের মত বিভক্ত করেছে। একদিকে ভারত অপরদিকে চীন। হিমালয়ের এই পার্বত্য অঞ্চল জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেছে। ভুটান হল এই ধরণের ছোট্ট এক স্বাধীন-রাষ্ট্র। ভারতের ঘন বসতিপূর্ণ এলাকা আসাম—বাঙ্গলার সমতলভূমি ও তিব্বত এর প্রবেশ পথে অবস্থিত। দক্ষিণে গ্রীষ্মপ্রধান পাহাড়ের সানুদেশ আর উত্তরে পঁচিশ হাজার ফুট সুউচ্চ কুলা কাঙ্গরীর চিরতুষারাবৃত শৃঙ্গ যুগ যুগ ধরে এক উন্মাদনার প্রাকৃতিক দৃশ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছে। হিমবাহের শুভ্র চাদরে গা ঢেকে পর্ব্বতগুলি বৃত্তাকারে ভুটানকে ঘিরে রাখায় বাইরের কোন জাতি সহজে এদের উত্যক্ত করতে আসে না। হিমালয়ের কোলে এই উপত্যকায় নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া, অজানা গাছের সুস্বাদু প্রচুর ফল, মিঠে জলের নদী সব কিছুর প্রাচুর্য্য রয়েছে।

শখ করে কোন জাতি সমভূমির প্রাচুর্য্য ছেড়ে পর্বতে আশ্রয় নেয় না বা পর্বত অতিক্রম করে না। সুতরাং বিশেষ কোন অন্য কারণে শতাধীত কাল আগে একদল লোক হয়ত এই উপত্যকায় আশ্রয় নিয়েছিল, যেমন ঘটেছিল তিব্বতে। তখন ভুটান ও তিব্বতের মধ্যে যাতায়াতের পথ ছিল। তিব্বতের গড় উচ্চতা প্রায় পনর হাজার ফুট। ঊনবিংশ শতাব্দীতে তিব্বতীরা রাজ্য বিস্তারের লোভে ভুটানে সৈন্য পাঠায়। ভুটান তখন হিন্দু-সাম্রাজ্যভুক্ত। কুচবিহার থেকে আগত অনেক ভুটান অধিবাসী অগত্যা সমতলভূমিতে নেমে আসতে বাধ্য হয়। তিব্বতী ভাণ্ডার প্রাপ্ত প্রাচীন হস্তলিপি থেকে জানা যায় যে কৃষক, রাখাল ও বৌদ্ধ যাজকেরা তিব্বতী যোদ্ধাদের অনুসরণ করে চাম্বি উপত্যকার মধ্য দিয়ে ভুটানে এসে পড়ে। তিব্বতের প্রাচীন নাম বোদ। তিব্বতী ও ভুটানীদের মধ্যে বিবাহ প্রথা চালু হওয়ায় 'বৌদ্ধ লামার' উৎপত্তি।

একদিন দুর্যোগ ঘনিয়ে এল। শুরু হল প্রলয়। একটানা দশ পনর দিন যাবৎ তুমুল বর্ষণ। তারই সাথে ভূমিকম্প। পাহাড়ে মারাত্মক ধস নামল। প্রকৃতি শান্ত হলে হতাবশিষ্ট মুমূর্ষু দেখতে পেল বাইরের জগতের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। গিরিপথের চিহ্নমাত্র নেই। তবু এরা দমল না। সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে রাস্তা তৈরী ও মেরামতের কাজ চলতে থাকে। অক্লান্ত পরিশ্রমে আবার তৈরী হয় পথ; সে পথ এখন এমনই পাকা যে মোটর-বাস, ভারী লরী অবাধে চলাচল করতে পারে। তিব্বত থেকে ভুটানে যাতায়াতের জন্য এখন চৌদ্দটি গিরিপথ। ১৯৬৪ সালে লাসা থেকে ভুটান পর্য্যন্ত রাস্তা তৈরীর সংবাদ পাওয়া যায়। কয়েক বছর আগে ভুটান অনেকাংশেই ছিল নিষিদ্ধ দেশ। আজকের ভুটান ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র। দশ বছর আগে শ্রীনেহেরু তাঁর মেয়ে শ্রীমতী ইন্দিরাকে নিয়ে তিব্বত, চাম্বি উপত্যকার ভিতর দিয়ে ভুটানে ঢুকেছিলেন। সে পথ আজ রুদ্ধ হলেও উপস্থিত নানা পথ তৈরী হওয়ায় ভারত থেকে ভুটান খুবই অল্প সময়ের মধ্যে যাতায়াত করা চলে। ভুটানের তখনকার রাজধানী পারোতে পৌছাতে শ্রীনেহেরুর সময় লাগে প্রায় সাত দিন। কখনও টাট্টু ঘোড়ায় কখনও বা চমরী গাইয়ের পিঠে মাইলের পর মাইল দুর্গম পথ তাঁকে অতিক্রম করতে হয়েছিল। আজ সেই পারোতে বিমান অবতরণ ক্ষেত্র হয়েছে। গত

মার্চ মাসে ভারতের উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই উদ্বোধন করলেন এই বিমান অবতরণ ক্ষেত্র। ভুটানের বর্তমান রাজধানী থিম্পু যেখানে শ্রীনেহেরু যাননি সেটা এখন আর নিষিদ্ধ শহর নয়। ফুন্টশোলিং—পারো জাতীয় সড়কটি প্রায় ১৬৬ কিলোমিটার এবং থিম্পু যাওয়ার রাস্তাটি প্রায় ১৭৯ কিলোমিটার। এই রাস্তা তৈরীর কাজে ১৮২ জন ভারতীয় ও ভুটানবাসী প্রাণ হারিয়েছেন। এই জাতীয় সড়কটি ভারত ও ভুটানের মধ্যে মহান মৈত্রীর প্রতীক। শীঘ্রই ভারতের সঙ্গে ভুটানের প্রধান শহরগুলিতে সরাসরি টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা চালু করা হবে। থিম্পুর সঙ্গে দিল্লীর সরাসরি টেলিফোন যোগাযোগ ইতিমধ্যে চালু হয়েছে।

উত্তরবঙ্গে সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক দৈব-দুর্যোগ ঘটবার আগে আমি কলকাতা—শিলিগুড়ি এক্সপ্রেস বাসে একটি আসন সংরক্ষণ করি। দূরপাল্লার যাত্রীদের আরামে ভ্রমণ সুবিধার জন্য প্রশস্ত নরম আসনগুলি এমনভাবে করা হয়েছে যাতে স্বচ্ছন্দে হেলান দিয়ে বসা চলে। বাসের মধ্যে বৈদ্যুতিক পাখা, শৌচাগার ও যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য সশস্ত্র প্রহরা। গত ২০শে সেপ্টেম্বর থেকে কলকাতা হ'তে রাতের জন্য স্লিপার বাস সার্ভিস চালু হয়েছে। রাত ১০টায় কলকাতা থেকে রওনা হলে পরদিন শিলিগুড়ি পৌঁছান যায় দুপুর আড়াইটায়। ভাড়া প্রথম শ্রেণীর ৫৫ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীর ৩৩ টাকা; ভোরের বাসে আমার যাত্রা হয় শুরু। কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে বাসটি থামে; তারপর দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে। গ্রাম বাংলার পথ ঘাটের শ্যামল দৃশ্য পথ চলার ক্লান্তিকে ভুলিয়ে রাখল। বাসটি মালদার 'গাজল' হয়ে ইয়ার, রায়গঞ্জ, রতনদীঘি থানা ও পূর্ণিয়া সীমার গা ঘেঁসে শিলিগুড়ির দিকে এগিয়ে যায়। রাস্তা তৈরীর কাজ এখন তেমন উন্নতির পথে এগোয় নি; ফারাক্কা সেতুর কাজ পুরাদমে চলছে। কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি পৌঁছাতে সময় লাগল প্রায় ১৫।১৬ ঘন্টা। শিলিগুড়ি থেকে নিউ জলপাইগুড়ির দূরত্ব মাত্র পাঁচ কিলোমিটার।

মহানন্দা 'সেতুর' উপর দিয়ে ভোরের এক বাস আমাকে সেবক বাজারের কাছে পৌঁছে দেয়। ভুটান যাওয়ার এক বেসরকারী বাসে উঠে বসলাম। তিস্তা নদীর উপর সেই 'করোনেশন সেতু' রাণী-ভিক্টোরিয়ার মাথার মুকুট নিয়ে সম্প্রতি বন্যার জলে মিলিয়ে গেছে। পাহাড়ের কোল ঘেঁসে বাস চলে। অজানা পথের আকর্ষণ আমাকে সারা দুপুরটাই সম্মোহিত করে রাখল। ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি ইত্যাদি কয়েকটি স্থানে বাস থামে। মধ্যাহ্ন আহার শেষ করে নিতে হ'ল কোন এক হোটেলে। জলপাইগুড়ি পেরিয়ে বাস চলে দ্রুতগতিতে। চায়ের বিরাট ক্ষেত অতিক্রম করে বাসটি এক বিকট শব্দ করে পথের মাঝে দাঁড়িয়ে গেল। বাসের চাকা নাকি আলগা হয়ে গেছে। সন্ধ্যার আগে মেরামত করে ওঠা সম্ভব নয়। যাত্রীরা সব নেমে এল। অদূরে এক চায়ের দোকান। কলকাতার ছায়াচিত্র সম্বন্ধে তখন আলোচনা চলছিল। আল ক্ষেতের উঁচু জায়গায় দেখা গেল কয়েকটি লোক আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। মাথায় তাদের মাটির কলসী। দুধ বিক্রয় করতে এরা আসে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। দর টাকায় চার সের। কলকাতা সম্বন্ধে তাদের কৌতূহল কম নয়। একের পর এক প্রশ্নের জবাব দিয়ে চলেছি। প্রায় ঘন্টা খানেক পর আর একটি বাস আসতে দেখে যাত্রীরা সভাভঙ্গ করে উঠে দাঁড়াল। আমাদের বাস, কণ্ডাকটর আমাদের মালপত্র সহ অপর বাসটিতে উঠিয়ে দিল। দ্বিতীয় বাসটি আমাদের পৌঁছে দিল "হাসিমারা" নামে ছোট লাইনের রেলওয়ে ষ্টেশনের কাছ বরাবর। এই ছোট লাইনের রেলপথটি জলপাইগুড়ি থেকে আলিপুর দুয়ার ও কুচবিহার পর্য্যন্ত প্রসারিত। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে হাসিমারার দূরত্ব প্রায় ১১০ মাইল। বাস ভাড়া ৫ টাকা। ভুটান যেতে হলে 'হাসিমারা' থেকে বাস বদল করতে হয়। এখান থেকে ভুটান সীমান্ত ফুন্টশোলিং প্রায় বার মাইল—বাস ভাড়া মাত্র বার আনা। জয়গাঁও চেকপোষ্ট এ পুলিশ ও আবগারী বিভাগের কর্মীরা যাত্রীদের মালপত্র পরীক্ষা করে নিল।

গেট পার হলেই ভুটান এলাকা। ভুটানের মহকুমা শহর ফুন্টশোলিং এর প্রবেশ পথে ভুটানী সামরিক অফিসাররা আবার আমাদের সামান্য জিজ্ঞাসাবাদ করে নিলেন। এক নোটিশবোর্ড-এ লেখা—ভারতীয় নাগরিক ছাড়া কোন বিদেশীর প্রবেশাধিকার নেই। অবশ্য বর্তমান ভুটানে প্রবেশ করতে হ'লে অনুমতি-পত্রের প্রয়োজন। গত ১৯শে সেপ্টেম্বর থেকে ভারতীয় বা বিদেশী সকলকেই ভুটান প্রবেশের অনুমতি-পত্র দেখানর নিয়ম চালু হয়।

অপরাহ্নের মেঘ মেদুর আকাশ; গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির মধ্যে আমি পৌঁছই পাহাড়ের গায়ে সাজান শহর ফুন্টশোলিং-এ। বাজারের পাশ দিয়ে খানিকটা এগিয়ে নববিনির্মিত দোতলা পাঞ্জাবী হোটেল। খোঁজ নিয়ে জানলাম সব ঘর সংরক্ষিত। শহরে দুই তিনটি হোটেল আছে, কিন্তু থাকবার ব্যবস্থা নেই। বন্ধুবর প্রাণকৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ের একটু ওপরে 'ডুক হোটেলে' উপস্থিত হলাম। রাত আটটা নাগাদ একটি ঘর হয়ত খালি হতে পারে। মালপত্র হোটেল ম্যানেজারকে তদারক করতে বলে চলে আসি 'মহাকালী রেষ্টুরেন্ট'-এ। দাল, ভাত, মাছ ইত্যাদি আমার মত বাঙ্গালীর উপযোগী আহার; টাকা দুই খরচে রাতের আহার সেরে নিলাম। রাতের মত আশ্রয় পেলাম 'ডুক হোটেলে'। দোতলার পরিচ্ছন্ন ঘর, বৈদ্যুতিক আলো, পাখা, মশারী খাটান শয্যা। আসবাবপত্র ও কাঁচের জানালা ঘেরা ঘর। মনোরম। দুইদিনে ১৬ টাকা কেবল থাকার খরচ।

ঘরে বসেই দেখা যায় অদূরে পাহাড়ের কোলে এক সামিয়ানা খাটান হচ্ছে। নানা রংয়ের কাগজে তৈরী বিচিত্র সব নক্সা, বেলুন, আলোর মালা দিয়ে সে জায়গা সাজান হচ্ছে। জেনারেল পোষ্ট-অফিসের প্রাসাদের দক্ষিণ পাশে এক নববিনির্মিত ভবন। রাজ, ছুতোর, ইলেকট্রিক মিস্ত্রীরা সকলেই অসমাপ্ত কাজগুলি সেরে ফেলতে ব্যস্ত। জানলায় কাঁচ লাগান, মোজাইক পাথর বসা ইত্যাদি চলেছে—বিরাট এক কাঠের দরওয়াজায় পালিশ লাগান হচ্ছে। খবর পেলাম উক্ত ভবনটি Bank of Bhutan এর জন্য নির্দিষ্ট। আগামী কাল সকালে দ্বার উদ্ঘাটন করতে ভুটানের রাজা স্বয়ং আসবেন সেখানে। সুতরাং রাজদর্শন ও সেই সঙ্গে ভুটানী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান স্বচক্ষে দেখার এক অভূতপূর্ব সুযোগ।

সকাল নয়টা আন্দাজ গ্রামের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকেরা আসতে শুরু করেছে চৌরাস্তার মোড়ে। রাজাকে সম্বর্ধনা জানাতে বিচিত্র এক সমাবেশ। কয়েকটি হাতী নিয়ে ভুটানী সৈন্য ও বাদকদল উপস্থিত। অধীর আগ্রহে জনতা অপেক্ষা করছে। সামিয়ানার মধ্যে কয়েক সারি চেয়ার। অতিথি অভ্যাগতদের জন্য সংরক্ষিত। ভুটানে নিযুক্ত এক বাঙ্গালী অফিসারের সৌজন্যে আমি তৃতীয় সারির এক চেয়ার দখল করলাম। দূরে দেখা গেল কয়েকটি জিপ গাড়ী। সংবাদপত্র প্রতিনিধিরা ক্যামেরা হাতে প্রস্তুত। নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেরা দাঁড়িয়ে গেল নির্দিষ্ট স্থানে। ব্যাঙ্কের নবনির্মিত ভবনের কাছে রাজা এসে গেলেন। হাত জোড় করে নমস্কার জানালেন সকলকে। ধীর পদক্ষেপে তিনি এগিয়ে এলেন সামিয়ানার দিকে। চমকপ্রদ তাঁর বেশভূষা। অর্দ্ধেক হাত তাঁর সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা। কটিদেশে ঝোলান আছে এক তরবারী। অল্প দূরেই এক মঞ্চ। রাজা যখন ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসেন অসংখ্য ক্যামেরার ফ্লাসে আলো একই সঙ্গে জ্বলে উঠল। রাজার প্রবেশপথে দেখি এক বাঙ্গালী মহিলা। বঙ্গললনাকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেওয়া হবে না। অথচ সে বলে ছবি না নিয়ে 'পাদব একং ন গচ্ছামি'। ব্যাপারটা একটু ঘোরাল হয়ে উঠবার আগে আমি আমার আসন ছেড়ে এগিয়ে গেলাম ভিড়টা সামাল দিতে। তন্বীটির ক্যামেরা থেকে শব্দ হল, ক্লিক। চেয়ে দেখি মুখটি তার খুশীতে ভরপুর। রাজা মঞ্চে উঠলেন। আমরা সব আসন গ্রহণ করতে গিয়ে আর এক উৎপাতের সম্মুখীন। জন্তু মুখোসধারী ভুটানী ছেলেদের দল খড়ের মশাল জ্বালিয়ে আমাদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হল তাদের তাণ্ডব নৃত্য। বাঘ, সিংহ, ঘোড়ার মুখবিশিষ্ট জন্তুরা যখন আমা কাপড়ে আগুন ধরিয়ে দেবার উপক্রম করছে, আমার পাশের আসন থেকে কে যেন আমাকে

আসন গ্রহণ করতে বলল। তিনি হলেন এক ভুটানী ছাত্রী। ইংরাজীতে কথা বলতে শিখেছে। পোষাক তার ভুটানীদের মত নয়। সাদা জামা, নু রংয়ের স্কার্ট, নাকটি নিটোল না হলেও, চোখ মুখ কান এমন কি হাতের আঙুল গুলো বেশ নিখুঁত। ফর্সা রং, ঘাড় অবধি চুল। অষ্টাদশী তরুণী আমার ভীত চকিত মুখ দেখে বুঝিয়ে দিল এই সব প্রেতের দল আদিম যুগের সংস্কারানুযায়ী অতিথিকে তাড়িয়ে দিল ও রাজাকে অভ্যর্থনা জানাল। উত্তরে আমি তাকে অনুরোধ করি সে যেন এইভাবে আমাকে তাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি বুঝিয়ে দেয়।

রাজা প্রথমে ভুটানী ও বিশুদ্ধ ইংরাজী ও হিন্দিতে ভাষণ দিলেন। ভুটানের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করে তিনি বলেন এ যুগ "বারটার" মাধ্যমে লেন-দেন অচল। ভুটান পরিকল্পনা সার্থক রূপায়ণে পারো ও ফুন্টশোলিং-এর ব্যাঙ্ক নিশ্চয় আধুনিক ভুটানের এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এরপর শুরু হল লোক সঙ্গীত ও নৃত্যের অনুষ্ঠানসূচী। ভুটানের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা রাজ সকাশে ভুটানের সংস্কার ও ঐতিহ্য নৃত্য ও গীতের মধ্যে তুলে ধরলেন। মাস্কনী, পচম বুদা প্রভৃতি নৃত্যের অর্থগুলি পাশের ভুটানী ছাত্রীটি খুবই সাগ্রহে আমাকে বুঝিয়ে দিল। প্রায় ঘন্টাখানেকের অনুষ্ঠান শেষ হয় ভুটানী জাতীয় সঙ্গীতের পরেই। রাজা চলে গেলেন ফুন্টশোলিং এর নীচে সামচী স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ করতে। ভুটানী ছাত্রীটিকে বিদায় জানিয়ে বলি সে আমাকে বুঝিয়ে না দিলে হয়ত এই অনুষ্ঠান আমার কাছে এত মনোজ্ঞ হত না।

পর্ব্বত বেষ্টিত সুরক্ষিত এই উপত্যকার প্রতি জিনিষটিই আমার অচেনা। পাথরে বাঁধানো চলার রাস্তা ঝকঝকে তকতকে। পিচঢালা রাস্তা ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠেছে। দুপুরের আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। বন্ধুবর প্রাণকৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে প্রায় ৫০০ ফুট উপরের দিকে এগিয়ে চলেছি। এখানকার বাড়ীঘরগুলি এলোমেলো ছড়ানো। নানা আকার, নানা আয়তন ও নানা উচ্চতা। দূরে দেখা গেল কাঠের মণ্ডপ বিশিষ্ট এক বাড়ী। সেখানে রয়েছে ভুটানী এক গুম্ফা বা মন্দির—। ছয়টি স্তূপ সার দিয়ে তৈরী করা হয়েছে মন্দির সম্মুখে। মহাভারতের পঞ্চ পাণ্ডবের নামে স্তূপগুলি উৎসর্গীকৃত। মূল মন্দিরে রয়েছে নিত্যপূজিত ভুটানী বিগ্রহ। বিরাট এক জয়ঢাক বাজান হয় ধনুকের মত বাঁকান এক কাঠি দিয়ে। কাঠিটি আঁকশির মত বাঁকান রয়েছে শেষের দিকে। প্রায় পাঁচফুট উচ্চ এক মঞ্চে বৃহদাকার তিনটি বিগ্রহ শোভিত। প্রধান যাজক সস্ত্রীক বাস করেন কাঠের মণ্ডপ বিশিষ্ট বাড়ীতে। অনুমতি নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম। পুরোহিত মহাশয় তখন আহার করছেন। এক কাঁচের বাটিতে মোটা লাল চালের ভাত। আর একটিতে কিছু সব্জী। স্ত্রীর পরণে একটি ওড়না বুক থেকে ঝোলান। তিনি আমাদের আপ্যায়ন করে বসালেন। কাঁচা সুপারী কেটে পান সাজলেন। ও এক প্রকার মদ জাতীয় পানীয় আমাদের দিকে এগিয়ে দিলেন। তিনিও একটি সরু বাঁশের সাহায্যে, সাগ্রহে পান করলেন চা ও মদ। ঘরের মধ্যে একটি বন্দুক ও কার্টিজ রয়েছে কেন জিজ্ঞাসা করায় পুরোহিত জানালেন যে এখানে নাকি হিংস্র প্রাণীর উৎপাত প্রায় লেগে থাকে। আত্মরক্ষার্থে বন্দুকটি প্রায় নিত্য ব্যবহৃত।

পাহাড়ের গা থেকে এক কাঁচা পথ নীচের দিকে নেমে গেছে। পথ সংকীর্ণ ও জঙ্গলময়। শীঘ্র নীচে পৌঁছান যাবে ভেবে আমরা এগিয়ে যাই সেই দিকে। বন-জঙ্গল পাশে রেখে আমরা মেঠো পথ দিয়ে ক্রমশঃ নীচে নেমে চলেছি। বৃষ্টি শুরু হল। গাছের তলাই তখন আমাদের আশ্রয়স্থল। লোকালয় অনেক দূরে। এক নালা অতিক্রম করার সময় দেখি গাছের বড় বড় কাণ্ড বন থেকে মাপমত কেটে এনে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। জলের স্রোত এগুলি ভাসিয়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেবে। জঙ্গলের মধ্যে আল দেওয়া চাষের জমি। সেখানে হয় ধান, গম, যব, ভুট্টা ইত্যাদি। ভুট্টা ভরা সবুজ মাঠে এক প্রকার লোমশ কালো চতুষ্পদ প্রাণী চরে বেড়াচ্ছে। তিব্বতী ভাষায় এদের বলে 'ইয়াক'। এই সব প্রাণী ভুটানীদের কাছে খুবই উপকারী। এদের দুধ, দুগ্ধজাত পনীর, মাংস আহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে

প্রধান স্থান গ্রহণ করে। লোম থেকে তৈরী হয় পোষাক, চামড়ায় তাঁবু। গোবর জ্বালানী এবং সারের কাজ করে। আবার 'ইয়াক' হল ভুটানে অন্যতম প্রধান বাহন।

হিমবাহ গলা জলে পুষ্ট নির্ঝরিণী গুলো উপত্যকার উর্বরা শক্তিকে বাড়িয়ে তোলে। নালা কেটে জমিতে জল দেওয়া হয়। পাইনের বন তুষারের নিম্নমুখী প্রবাহকে আটকে রাখায় বাদামী রংয়ের মাটি হয়ে উঠেছে উর্বরা। আজ সেখানে চাষীরা মনের আনন্দে চাষ করছে। তুষার মণ্ডিত শৈল শিখর থেকে পারো নদীর উৎপত্তি। পারো উপত্যকায় সম্প্রতি এক জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ায় ভুটান আজ উৎপাদিত জলশক্তি ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছে। ভুটানের কেন্দ্রস্থল উর্বরা। বাকি জায়গাগুলি অসমতল ও চালু। সুউচ্চ রুক্ষ পাহাড়ে চাষ আবাদ নিয়ন্ত্রিত। অধিক ফসল উৎপাদনের জন্য প্রায় এক হাজার একর বিরাট কৃষিক্ষেত ও কৃষি-বীজ কেন্দ্র স্থাপন করতে ভারতীয় কৃষি-বিশারদরা সেখানে নিযুক্ত। চা উৎপাদনের এক কেন্দ্র স্থাপন করাও হ'ল বর্তমান ভুটান-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। সজ-শ্যামলা পারো উপত্যকা আজ বৈদ্যুতিক আলোয় ঝলমল। আজ সেখানে বিমান অবতরণের সুব্যবস্থা হয়েছে। ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারদের তত্ত্বাবধানে নির্মিত মাথুর সেতুর উপর থেকে ওয়াঙ্গচুক নদীর ব্যাপক রূপ ও প্রবল গতি সত্যই উপভোগ্য। তুয়ার নদী বর্ষায় আনে প্লাবন ; আজ সেই নদী রেখি শুকনো। ওয়াঙ্গচুক নদী দক্ষিণ ভুটানকে ভিঙিয়ে প্রবল গতিতে নিম্নাভিমুখী হওয়ায় জলশক্তি উৎপাদনের প্রধান সহায়ক। বর্তমান ভুটান সরকার দেশকে প্রগতিশীল করতে সচেষ্ট। কিন্তু উন্নতির প্রধান বাধা হল সুদক্ষ কারিগর এবং শিক্ষিত ব্যক্তির অভাব, সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদ, যাতায়াতের দুর্গম পথ ইত্যাদি। পর্যটন ব্যবস্থার সুবিধা ভুটানে নেই। উপস্থিত রাস্তাঘাট তৈরীর কাজে ভুটান খুবই তৎপর। ফুন্টশোলিং থেকে এখন জীপ গাড়ী ও ভুটান স্টেট ট্রান্সপোর্টএর বাসে নিয়মিত যাতায়াত করে সুউচ্চ পারো ও রাজধানী থিম্পুর দিকে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি নানা ব্যাপারে আজ সেখানে প্রায় শতশত ভারতীয় ভুটান সরকারের অধীনে কাজ করে চলেছে। আধুনিক সভ্য জগতের নানা সুযোগ সুবিধার পথগুলি নির্দেশ করেই ভারতীয় কর্মীরা ফিরে আসবে ভারতে। গবাদি পশুদের চিকিৎসা করতে আজ সেখানে বহু অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সমাবেশ। হাসপাতাল, ডিস্পেন্সারি, স্কুল প্রভৃতি নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সেখানকার সামাজিক অবস্থায় এনেছে অনেক পরিবর্তন। ভুটান প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় দেখা যায় সামাজিক উন্নয়ন ও যোগাযোগ রক্ষার বিষয়ে এক বলিষ্ঠ ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষি উন্নয়ন, কুটীর শিল্পের ব্যাপক প্রসার সূচিত করেছে। উপস্থিত সেখানে বড় রকমের খাদ্য ঘাটতি নেই। শ্রমিকদের জন্য কিছু পরিমাণে খাদ্য অবশ্য বিদেশ থেকে আনাতে হয়। সুতা তৈরী, চুরুট বোনা প্রভৃতি থেকে শুরু করে আজ এখানে বহু প্রকার গার্হস্থ্য দ্রব্য নির্মিত হচ্ছে জীবন যাত্রার তাগিদে। নিজেদের সংস্কার বজায় রেখে ভুটানীরা আজ স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রমশঃ উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। সেই রোমান যুগের রণ পোষাক ও অস্ত্রাদি ব্যবহারে অভ্যস্ত সৈনিকরা এখন ভারতীয় মিলিটারী একাডেমিতে আধুনিক সমর কৌশল শিখে নিতে ব্যস্ত। তারা বুঝেছে আত্ম রক্ষার্থে লোহার টুপী, গণ্ডারের চামড়ার তৈরী বর্ম আজ অচল। ভারতীয় রণ বিশারদদের নিকট প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বর্তমান ভুটানী সৈন্য সংখ্যা প্রায় বার হাজার। চীন হল ভুটানের প্রাচীন সমস্যা। তিব্বত সীমান্তে চীন আজ ভুটানের আটটি গ্রাম দখল করে নিয়েছে। ভুটান সীমান্তে লাসা অঞ্চলে চীনারা উপস্থিত খুব দ্রুত গতিতে রাস্তা তৈরী ও নানা স্থানে রাডারের সমন্বয় স্থাপন করেছে। চীনাদের সুযোগ সন্ধানের তৎপরতা দেখে ভুটান শঙ্কিত। বড় রকমের চীনা আক্রমণ হলে ভুটান সত্যই এক সঙ্কটের সম্মুখীন হবে। ভারত সব সময়েই ভুটানকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র বলে স্বীকার করে এসেছে। ভুটানের প্রতিরক্ষা ব্যাপারে ভারতের সঙ্গে যে চুক্তি হয়, সেই ১৯৪৯ সালের চুক্তির

এমন কোন শর্ত ভারতের উপর আরোপিত হয়নি যার দ্বারা ভুটান সৈন্য পুনরবিন্যাস কাজটা ভারতকেই করতে হবে। বাইরের কোন শত্রু আজ ভুটানকে আক্রমণ করলে, আত্ম প্রতিরোধার্থে ভুটানকে সব ব্যবস্থা করে নিতে হবে। ভারতের পৃষ্ঠপোষকতায় ভুটান আজ বৈদেশিক সাহায্যের অধিকার লাভ করেছে। অদূর ভবিষ্যতে ভুটান নেপালের মত ভারতের সুপারিশে রাষ্ট্রসংঘের সদস্যভুক্ত হয়ে আন্তর্জাতিক মর্যাদার অধিকার লাভ করবে। ১৯৬৭ সালে স্থির হয়েছে যে ভুটান ভারতের মাধ্যমে বৈদেশিক আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করতে পারে। এই প্রসঙ্গে ভুটানের বর্তমান রাজা ওয়াঙ্গচুক সম্প্রতি দিল্লীতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে বলেন :—

"The social and economic progress which Bhutan has made in the last six years with India Government's generous assistance...and welcomes India's willingness to continue to provide the necessary technical and financial assistance to Bhutan in the years to come."

ভারত সরকার ভুটানের উন্নয়ন প্রকল্পে ১৯৬৮ সালে ১৮৭০ কোটি টাকা আর্থিক সাহায্য বরাদ্দ করেছেন। ভুটানের সঙ্গে ভারতের মৈত্রী আজ সুদৃঢ়। আমার মত এক ভারতীয় নাগরিককে কি ভাবে ও কত স্বল্প সময়ে আপন করে নেয়, এখানে তার কিছুটা উল্লেখ করি।

ভুটানী সূচী শিল্পের নিজস্ব এক ঐতিহ্য আছে। দোকানে তারা সাজিয়ে রেখেছে হস্ত শিল্পের নানা লোভনীয় নিদর্শন। প্রৌঢ়া এক মহিলা দোর গোড়ায় বসে আছে এক মোড়ার ওপরে। তিনি জামা তৈরী করছেন ও পণ্য দ্রব্যের দামগুলি আমাদের মৃদু হাস্যে বলে যাচ্ছেন। নানা রং ও নানান ভাবে তৈরী এদের পোষাক বিচিত্র বটে। জামাকে ভুটানীরা বলে 'বাকুই', পোষাকের নিম্নাংশ অর্থাৎ ঘাগরাকে বলে 'লাগডে'। মেয়েদের ব্লাউসকে বলে 'হানজু'। প্রায় এক ফুটের এক কাঁপা বাঁশ নানা কারুকাজে শোভিত রয়েছে পণ্য দ্রব্যের মধ্যে। চা পান করার জন্য তারা কাপ ডিস ব্যবহার করে না। উক্ত বাঁশে ভর্তি করে গরম পানীয়। এক নলের সাহায্যে তারা পান কাজ সেরে ফেলে। ভুটানকে আধুনিক করার সর্ব্ব প্রচেষ্টার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে সে দেশের সংস্কার যেন কোন প্রকার খর্ব্ব না হয়। প্রৌঢ়া পরিচয় করিয়ে দিল তাঁর বৌমা ও ছেলের সঙ্গে। বৌমা স্কুলে পড়ে। পাশেই ছোট্ট এক ঘর। দাল রান্না করার জন্য তিনি তখন বাটনা বাটছেন। মৃদু হাস্যে নমস্কার জানিয়ে তিনি আমাদের বসবার আসন দিলেন। সকালে স্কুল, বাকী সময়টা তাঁকে ঘরকন্নার কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। সরল সাদাসিধে জীবন। চাষ করে, কাপড় বোনে। যথেষ্ট বিশ্রামও করে। অবসর সময়ে গান গায়। খাওয়া পরার কোন অভাব নেই। যা পায় তাতেই সন্তুষ্ট। অহং ভাব নেই। স্বার্থপরতা তো নেই বললেই হয়। প্রতিটি জিনিষই এরা প্রয়োজন মাফিক তৈরী করে নিয়েছে। স্বামীর সঙ্গে কিছুক্ষণ ভুটানের রাজনৈতিক আলোচনাও আলাপ হল। সারাংশ নীচে উল্লেখযোগ্য।

'ধর্মরাজ' হল ভুটানের সর্বময় অধিকর্তা। রাজ্য পরিচালনা ব্যাপারে তাঁর ক্ষমতা অসীম। ভুটানের শেষ ধর্মরাজ ১৯৩০ সালে তিব্বতে মারা যান। ভুটানে তখন দেখা দিল অরাজকতা। ভারত সরকার তখন বৃটিশের অধীনে। ভারতের সঙ্গে ভুটানের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্যন্ত সেখানে ছিল না কোন ক্ষমতা সম্পন্ন কেন্দ্রীয় সরকার। উগিয়েন ওয়াঙ্গচুকের নাতি "ড্রুক গিয়ালপো" জিগমে দরজী ওয়াঙ্গচুক ভুটানে সর্ব্বপ্রথম জাতীয় সরকার গঠন করলেন। ওয়াঙ্গচুক রাজাদের বলা হ'ত 'দেবরাজ', বৃটিশরা 'দেবরাজের' বদলে মহারাজ উপাধি চালু করলেন। কিন্তু ভুটানের আধিপত্য যেন কোন অংশেই খর্ব্ব না হয়, এই কারণে সেখানে 'রাজা' নামই প্রচলিত হ'ল। জিগমী ওয়াঙ্গচুকের জ্যেষ্ঠ পুত্র জোরজী ওয়াঙ্গচুক ২৭শে অক্টোবর ১৯৫২ সালে পিতার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন। বর্তমান ভুটান পেল এক নির্ভীক ও শক্তিমান রাজা। স্কুল বা কলেজে তিনি লেখাপড়া শেখেন নি। রাজ-শিক্ষকের কাছে

তিনি ইংরেজী, হিন্দী ও টিবেটান ভাষায় অনুবাদ করায়। উক্ত ভাষাগুলিতে তিনি খুব ভাল কথা বলতে পারেন। ভুটানের প্রশাসনিক বিধিগুলি আমূল পরিবর্তন করে তিনি স্থাপন করলেন এক প্রতিনিধিমূলক সরকার। ক্রীতদাস প্রথা উঠে গেল। স্ত্রী স্বাধীনতা প্রবর্তন করা হল। ১৩০ জন লোককে নিয়ে গঠিত হল এক জাতীয় পরিষদ—নাম টসঙ্গডু। সমাজ কল্যাণ বিষয়ক বহু নিয়ম ও আইন আজ বিধিবদ্ধ।

সেই পঞ্চদশ শতকের সংস্কারের গোঁড়ামী ভেঙ্গে ভুটানে ফিউডালিসমের বদলে এল বিংশ শতাব্দীর যুগোচিত জাতীয় সংগঠন। সরকার পরিচালনায় মনোনীত সদস্যবৃন্দ পৃথিবীর নানা সভ্য দেশের আদর্শ কাজে লাগিয়েছে ও দেশের বাঁধা ধরা জীবন যাত্রার মোড় ঘুরিয়ে এক রাজনৈতিক চেতনার আবির্ভাব ঘটিয়েছেন। বিরাট সোজন্য এসেম্বলির প্রধান স্পিকার ভিক্ষু পুনাখা এখন আর লাভা পোষাক পরিধান করেন না। বর্তমান তিনি প্রধান স্পীকার রূপে তিন বৎসরের জন্য নিযুক্ত। সেখানে এখন আলোচনা চলে কলম্বো পরিকল্পনায় ভুটানের অন্তর্ভুক্তির বিষয়। নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রভৃতি নানা উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়ণ করার সমস্যাগুলি সরকার ও বিরোধীপক্ষের মধ্যে যে আলোচনা হয়, রাজার সক্রিয় অংশ গ্রহণে সে বিষয়ের নিষ্পত্তি হয়ে থাকে। স্বকীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে ভুটান আজ অগ্রগতির অনেক ধাপ পার হয়েছে। দেশের উন্নতি সাধন করতে আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে ভুটানের রাজনৈতিক ভারতীয় অফিসার শ্রীএন. বি. মেনন গত জুন মাসের ১৭ তারিখে বলেছিলেন—

'The Bhutanese are of their own setting to realise that dependence in terms of grant-in-aid may be demoralising and the country is most willing to accept Indian aid in terms of loan which would make the Bhutan Government and the people more self-reliant.'

এই অদ্ভুত দেশ আমার কাছে পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। পর্বত সম্বন্ধে মানুষ মাত্রেরই কিছু না কিছু দুর্বলতা আছে। আর ধর্ম সংক্রান্ত অনেক কিছুই পর্বতের সাথে জড়িত। এই ত সেই হিমালয় যার পাদদেশে কপিলবাস্তুতে অবতার বুদ্ধের জন্ম। তিব্বতের লাসায় রয়েছে লামাদের বৌদ্ধধর্ম পোতালা প্রাসাদ। সবার মত পাহাড় প্রেমী ছোট্ট উপত্যকা। শীর্ষকায় ঝরণা পাহাড়ের বাধা অতিক্রম করে কাঁপিয়ে পড়ে। গ্রাম, নগর, প্রান্তর মুগ্ধ আবেশে জড়িয়ে ধরতে গেলে এড়িয়ে চলে সীমাহীন তোরষার বক্ষে। দিন রাত্রির কোন হিসেব নেই সেই উচ্ছল নির্ঝরিণীর। ঘন বনের পাশ দিয়ে—এক অজানা পথ দিয়ে ফিরে চলেছি বাজারের দিকে। তোরষার জল পরিশুদ্ধ করার জন্য কল চলছে। এই নদী সারা ফুন্টশোলিঙ্গে পানীয় জল সরবরাহ করে। অপরাহ্ণের বাসে জলপাইগুড়ির পথে যাত্রী হলাম। যে জগৎ পেছনে ফেলে এলাম, সেখানকার সেই নীরবতা শহরে জীবনের চুর্ণার জনস্রোতে গিয়ে মিশে যাবে। প্রায় ঘন্টা তিনের মধ্যে পৌছে যাই জলপাইগুড়ি। সেখান থেকে ট্রেনে কলকাতা। এখন উপত্যকার নিঃসীম নীলাকাশ আঁধারে ছেয়েছে। সূর্যের আলো মুছে গিয়ে সেখানে চাঁদের আলো। আকাশের কোণে তারাগুলো উঁকি মেরে আমাকে কি এখন লক্ষ্য করে প্রশ্ন করবে এর পর আমার যাত্রা কোন দিকে ও কবে?

সাত্ত্বিক

ডাঃ হরেন্দ্রনাথ রায়

—বাবুজি—।

উত্তম চমকে উঠে। হয়ত একটা ঝিমুনির ভাব তার এসেছিল। রিক্সাআলার ডাকে সে ভাব কেটে গেল। তাকিয়ে দেখল রিক্সা এসে থেমেছে একটা বাগান ঘেরা বাড়ীতে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে বেশ কিছুক্ষণ। রাতের অন্ধকারে চারিদিক ঢাকা। দৃষ্টি চলে না। তবুও উত্তম বোঝে সে এসে দাঁড়িয়েছে একটা বাড়ীর প্রাঙ্গনে।

এ সহরে সে নবাগত। সহরের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটলেও, এ অঞ্চল তার সম্পূর্ণ অপরিচিত। এই অপরিচয়ের গণ্ডীকে অতিক্রম করবার জন্যই সে আজ এসেছিল এ অঞ্চলে বেড়াতে। ঘুরে ঘুরে ক্লান্তও হয়ে পড়েছিল বেশ কিছুটা। তাই যে রিক্সাখানা সে সামনে দেখতে পেল, তাইতেই চড়ে বসল।

ক্লান্ত শরীর আর শিরশিরে হিমের বাতাস, এই দুইয়ে মিলে চোখের পাতা দুটিকে তার ভারী করে এনেছিল। তাই রিক্সাআলার ডাকে সে চমকে উঠল। চারিদিকে তাকিয়ে দেখে বলল, এ কোথায় নিয়ে এসে আমাকে?

রিক্সাআলা মাথা চুলকে বলে, বহুৎ আচ্ছি জায়গা হুজুর। দিলখুস হো যায়েগা আপকো।

দিলখুশ-ই হয়ে গেল উত্তমের। আওয়াজ পেয়ে জনা দুয়েক লোক বেরিয়ে এল বাড়ী থেকে। উত্তমকে সবিনয়ে অভ্যর্থনা করে বলল, আসুন হুজুর। এ আনন্দালয়, আপনাদেরই বাড়ী। আপনাদের আনন্দ দেবার জন্যই এর দ্বার অবারিত।

উত্তম বস্ত্র সম্বান। সে বোঝে খপ্পরে পড়েছে সে। এ অবস্থায় অসহায় বোধ করলে চলবে না। তাই সাহসে ভর করেই বলে, বেশ, বলুন, কি আনন্দ দিতে পারেন আপনারা?

—বিলক্ষণ! আনন্দ দিতে পারব না আমরা। কত রাজা উজিরের ছেলে আসে হুজুর, মন্ত্রীর ছেলেরাও বাদ যায় না। তারা সকলেই যদি আনন্দ পায়, আপনি পাবেন না! ভিতরে আসুন, বুঝতে পারবেন সবই। যতক্ষণ আনন্দ পান, থাকবেন, আশা মিটলে চলে যাবেন। কোন বাধা নেই।

ভিতরে যে ঘরখানি এসে বসল উত্তম, সে ঘরখানিতে বেশ সাজান। বিলাসিতার উপকরণের কোন অভাবই সেখানে নাই। সেইদিকে তাকিয়ে বসেছিল উত্তম। সামনে বসেছিল অচেনা লোক দুই। তাদেরই একজন বলল, এখানকার একটা নিয়ম আছে হুজুর। যারা এখানে আসেন, সকলকেই একখানা ক'রে টিকিট কাটতে হয়।

উত্তম বিস্মিত হয়। প্রশ্ন করে, টিকিট? কিসের টিকিট?

লোকটির নাম বেহারী। বেহারী একটু হেসে উত্তর দেয়, লটারী। এ সবাই কাটে। রাজা উজিরও বাদ যায় না।

—কিন্তু আমি রাজাও নই, উজীরও নই।—

—তা নন সত্যি। কিন্তু আপনি একজন অফিসর। অফিসররাও এ নিয়ম মেনে চলে।

—অর্থাৎ আমাকেও মানতে হবে। কিন্তু কি মোক্ষ লাভ হবে আমার?

বেহারী হাসে। ধূর্ত হাসি। এই হাসিই লোকটার প্রকৃতিকে চিনিয়ে দেয় যে সে সরল লোক নয়, সোজা লোক

নয়। সে তেমনি হাসিমুখেই উত্তর দেয়, মোক্ষ দাও হবে বইকি হুজুর। নিশ্চয়ই হবে। আপনার নসীবকে জানতে পারবেন ভাল কি মন্দ। নগদ টাকা পাবেন না সত্যি, তবে টাকার চেয়ে বড় 'চিজ' পাবেন। আর তাই পাবার জন্য হুজুরেরা দুহাতে টাকা খরচ করেন। টাকা তো আপনাদের হাতের ময়লা হুজুর। আসতেও যেমন, যেতেও তেমন। তাতেই ত আমরা বেঁচে আছি।

উত্তম বোঝে এদের বেঁচে থাকার রহস্যটা। টাকা হাতের ময়লার মত তুচ্ছ বস্তু হ'ক বা না হ'ক, তার যেমন তেমন আগমন ঘটুক বা না ঘটুক, এ ক্ষেত্রে নির্গমন তার নির্ঘাৎ। যখন নির্ঘাৎ, তখন মানে মানে হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। সে আর দ্বিরুক্তি করে না। সস্তা সাইনে পাওয়ার নোট বেশ কয়েকখানি তুলে দেয় বেহারীর হাতে। বেহারী দুই হাত কপালে ঠুকে দাঁত বের করে বলে, এই বার নসীবটা একবার যাচাই করে দেখুন হুজুর। এই চাকাটা ঘুরিয়ে দিন, তাহলেই বুঝতে পারবেন আপনার নসীবের জোর কত।

উত্তম ঘাড় নেড়ে বলে, আমার হ'য়ে তুমিই ঘুরিয়ে দাও। ও আমার দ্বারা হবে না।

—হবে, নিশ্চয়ই হবে হুজুর। নিজের নসীব নিজের হাতেই যাচাই করা ভাল। এতে ফল ভাল পাবেন।

উত্তম এদের অসন্তুষ্ট করতে চায় না। যত শীঘ্র সম্ভব এদের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়াই তার কাম্য। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও চাকাটা সে সজোরে ঘুরিয়ে দেয়। এবং তারই অল্প পরে বেহারী সোল্লাসে বলে উঠে, সাবাস বাবুজি! নসীব বহুত জোর। দশ নম্বর উঠেছে। লাকি নম্বর। এই রামাদীন, হুজুরকে দশ নম্বর দেখিয়ে দে। তারপর উত্তমকে বলে, যান বাবুজি, এর সঙ্গে। আনন্দ উপভোগ করুন যতক্ষণ খুশী। কেউ বাধা দেবে না আপনাকে।

রামাদীন উত্তমকে পথ দেখিয়ে দশ নম্বরে পৌঁছে দেয়। দশ নম্বর একখানি ঘর। ঘরের দরজা ভেজান। রামাদীন বলে, ভেতরে যান বাবুজি। কিছু ভয় নেই। যতক্ষণ খুশি বিশ্রাম করুন এখানে।

একটা অজানিত আশঙ্কায় এবং উত্তেজনায় উত্তমের ভিতরটা কেঁপে উঠে। সে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢোকে। উজ্জ্বল আলোকিত ঘর। ফ্লোরেসেন্টের আলোয় ঝকঝক করছে। ঘরের বাতাসে একটা মিষ্টি সুবাস যেন ছড়িয়ে আছে। সৌখীনতা এবং বিলাসিতার উপকরণ ঘরের চারিদিকে ছড়ান। বিস্মিত উত্তম ঘরের মাঝখানে পাতা কার্পেটের উপর এসে দাঁড়ায়। ঘরের একপাশে একখানা আধুনিক ধরণের উৎকৃষ্ট খাট। তারই ধার ঘেঁসে দাঁড়িয়ে একটা মেয়ে। মেয়েটির দিকে তাকিয়েই উত্তমের মনের উপর দিয়ে চমক খেলে যায়, ঠিক এমনিটি, একেবারে এমনিটিই যেন এ ঘরে মানায়। এত যে বিলাসী উপকরণ, এই যে আলোর প্রাচুর্য, সবই যেন এর কাছে নিষ্প্রভ। শুধু এক মুহূর্ত, পর মুহূর্তেই তার তন্দ্রা ছুটে যায়। মেয়েটির তীক্ষ্ণ কণ্ঠ তাকে সচকিত করে তোলে, কে আপনি? কেন, কেন এসেছেন এখানে? কি চাই আপনার?

বিহ্বল উত্তম শুধু বলে, আমি উত্তম। এখানকার সরকারী অফিসের কর্মচারী। মেয়েটি তার দ্বিতীয় প্রশ্নের পুনরুক্তি করে, কেন এসেছেন এখানে?

উত্তম বিহ্বল ভাবটা কাটিয়ে উঠে। উত্তর দেয় নিয়তি আর লটারী এই দুই আমাকে টেনে এনেছে এখানে। আপনার তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলব, কোন কিছুর প্রত্যাশা করে এখানে আসিনি। তবে বেহারীলাল বলেছে এ আনন্দালয়। এখানে আনন্দ পাব প্রচুর।

মেয়েটি এবার ভেঙ্গে পড়ে। বলে, না, না, পাবেন না! আমি পারব না। পারব না আপনাদের ব্যভিচারে খোরাক জোগাতে। দোহাই আপনাকে, আমাকে রেহাই দিন। আমি বড় ক্লান্ত। পাঁচ রাত ঘুমুতে পাই নি। আপনারা ঘুমুতে দেন নি আমাকে। এই পাঁচ রাত ধরে সবাই আমাকে নিংড়ে নিয়েছে। শরীরটাকে কামড়ে ছিঁড়ে খেয়েছে। বর্বরেরা নারীত্বের আর কিছু বাকী রাখেনি আমার। আমি দুমড়ে মুচড়ে ভেঙ্গে গিয়েছি। আজ আমায় বিশ্রাম দিন। দোহাই আপনাকে।

উত্তম অবাক হয়ে বলে, আপনি ক্লান্ত আমি জানতাম না তাছাড়া এ আনন্দ আমার কাম্য নয়। বাঙ্গালীর ছেলে, বিদেশে এসেছি চাকরী করতে। অজান্তে এদের ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছি। এতখানি অধঃপতন হয়নি আমার যে এমন আনন্দে নিজেকে ডুবিয়ে দেব, একটি অপরিচিতা মেয়ের আর্ত হাহাকারের বিরুদ্ধে।

এবার অবাক হয় মেয়েটি। উত্তমের দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে বলে, আপনি বাঙ্গালী? শুনেছি আপনাদের কৃষ্টি, শিক্ষা দীক্ষার বৈশিষ্ট অনেক। আমি যদি সকাতরে মিনতি জানাই, শুনবেন আমার কথা? বাঁচাবেন আমাকে?

মেয়েটির কথায় উত্তমের বিস্ময় বাড়ে। প্রশ্ন করে, বাঁচাব মানে? মেয়েটি করুণ কণ্ঠে বলে, আমার কথা বিশ্বাস করুন বাবুজি, আমার যা ভেবেছেন আমি তা নই। আমি এ লাইনের মেয়ে নই। এরা জোর করে····। মেয়েটি কথা শেষ করতে পারে না। হাতে মুখ চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে উঠে।

উত্তম বোঝে, একটা রহস্যের জাল মেয়েটিকে ঘিরে রাখছে। সে যে এ লাইনের মেয়ে নয়, এ কথা তার দিকে তাকালেই বোঝা যায়। এ পঙ্কে ভগবান নরকের অন্তঃসৃষ্টি করেন নি। হয়ত তাঁরও ভুল হয়েছে।

উত্তম মেয়েটির দিকে এগিয়ে আসে। তাকে আশ্বস্ত করে বলে, আপনাকে অবিশ্বাস করি না। আপনাকে দেখেই বুঝেছি আমি। আমি কথা দিচ্ছি, আপনাকে সাহায্য করব। আপনি কোন সঙ্কোচ না ক'রে আপনার যা কথা, বলতে পারেন। কিন্তু তার আগে আপনাকে কি বলে সম্বোধন করব এটা জেনে রাখা ভাল।

—মঞ্জরী। একদিন ছিলাম মঞ্জরী তেওয়ারী, এখন হয়েছি ত্রিপাঠী।

উত্তম বলে, বুঝেছি। কিন্তু মিঃ ত্রিপাঠী? বর্ত্তমান না—।

—বর্ত্তমান। কিন্তু—। মঞ্জরী ইতস্ততঃ করে।

—বলুন। সঙ্কোচ করবেন না কিছু। আমাকে আপনার হিতৈষী বলে জানবেন।

তিনি বর্ত্তমান। কিন্তু এদের পাল্লায় পড়ে মনুষ্যত্বের সব কিছুকে জলাঞ্জলি দিয়ে বসে আছেন। এদের ভয়ে তটস্থ। একটা জালিয়াতির ব্যাপারে তাকে এরা জব্দ করে জড়িয়ে রেখেছে। এ কথা আগে টের পাইনি আমি। যখন পেলাম, তখন তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে আমি এদের খপ্পরে ধরা পড়েছি। সে আজ দু'মাসের কথা। আমার কাকুতি মিনতি এদের মন গলাতে পারে নি। এরা শুধু পাষাণই নয়, বর্ব্বর। এদের ব্যবসাই এই। আমার মত নিরীহ মেয়ের সর্ব্বনাশ এরা নিয়তই কত যে করছে, তা বলে শেষ করা যায় না। এরা আমায় রেহাই দেবে না।

—জানি। সাত-রাজার ধন মানিক হাতে পেয়ে কে ছাড়তে চায় বলুন?

—মানে?

—একটা কথা বলব? রাগ করবেন না?

—রাগ? কেন? আপনি বলুন।

উত্তম পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে মঞ্জরীকে আপাদমস্তক ভাল করে দেখে। অসামান্য রূপসী মেয়েটি। টল্-টসে নিটোল দেহ। দেহের ভাঁজে ভাঁজে যৌবনের জোয়ার। মদনদেবের লীলা নিকেতন।

উত্তম যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলে। কিন্তু সামলে নিয়ে বলে, বলছিলাম, এমন অপরূপ রূপ নিয়ে জন্মান উচিত হয় নি আপনার।

মঞ্জরী এরূপ একটা প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে অবাক হয়ে বলে, সে দোষ আমার।

—না, ভাগ্যের। দোষ নয়, পরিহাস। এরা বর্ব্বর এদের কথা না হয় বাদ দিলাম। কিন্তু যারা সাধু সন্ত তারাও কি সুস্থির থাকতে পারবে এ রূপের সান্নিধ্য পেলে?

মঞ্জরীর চোখ দুটো একবার দপ করে জ্বলে উঠে। বলে, সে কথা আমার জানবার নয়। সাধু সন্তের মন তাঁরাই জানবেন ভাল। আপনি কি সাধু সন্তেরও ওপর?

—না, নীচে। অনেক নীচে। মিথ্যে বলব না,

আমার মধ্যে ক্ষুধা আছে, তৃষ্ণা আছে। পান করবার বাসনা কামনা সবই আছে। আদিম যুগের বর্বরতাও আছে।

—তবে সে সব চরিতার্থ করছেন না কেন? আমি অপারগম, কিন্তু আপনি ত অপারগম নন। ভোগস্পৃহা চরিতার্থ করবার মত অসুবিধে ত কিছু নেই। মঞ্জরীর স্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠে।

উত্তম একটু হাসে। বলে, তা নেই সত্যি, কিন্তু ও কথা থাক। ও আপনি বুঝবেন না। আমার কৃষ্টি, আমার শিক্ষা-দীক্ষা এরাই সব আমার পথ আগলে আছে। নইলে—।

—নইলে কি? আদিম যুগের বর্বরতা প্রকাশ করতেন? একটা স্থূল, নিস্পৃহ নারী-দেহ নিয়ে পুতুল খেলতেন। আমি চিনতে ভুল করেছি।

উত্তম সে কথায় কান দেয় না। কথার জের টেনে বলে চলে, আর তাছাড়া এ পথের পথিকও আমি নই।

মঞ্জরী যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। বলে, পথিক আপনি নন, পথিক আমি? কি ভেবেছেন আমাকে আপনি? একটু অনুনয় বিনয় করেছি বলেই কি অপরাধ করেছি? হেয় হ'য়ে গেছি?

—না, কিছুই হন নি। তবে কথা যখন দিয়েছি—।

—না কোন কথাই আপনি দেন নি। আর যদি দিয়ে থাকেন, সে কথার মূল্য কিছু নেই। আপনি ফিরিয়ে নিন আপনার কথা। আমি অনুগ্রহ চাই না। বলতে বলতে মঞ্জরী মাথা তুলে ঋজু হয়ে দাঁড়ায়। কণ্ঠস্বরকে তীক্ষ্ণতর করে বলে চলে, আপনারা সব এক, নারী-মাংসলোভীর দল। কৃষ্টি? শিক্ষা-দীক্ষা? সব মিথ্যে। আমি আপনার কোন অনুগ্রহ চাই না। পাঁচ রাত্রি সহ্য করেছি, আর এক রাত্রিও সহ্য করব। নিন, যা খুশি, যত খুশি আদিম বর্বরতা আমার ওপর প্রকাশ করুন, আমি কোন বাধা দেব না। বলতে বলতে সাড়ীর আঁচলখানা সে দেহ থেকে অপসারিত করে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। জামার বোতাম খুলতে উদ্যত হয়ে আবার বলে, আজ সমস্ত দেহ আমার ক্ষত বিক্ষত। এমন স্থান নেই যা বর্বরদের পাশবিকতার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে; নখ—দন্তাঘাতে জর্জরিত না হয়েছে। আপনি আর বেশী কি করবেন। ক্ষতের ওপর আর একটু না হয় ক্ষত সৃষ্টি করবেন। কিন্তু তৃপ্তি পাবেন? আনন্দ? এই স্থূল মাংসপিণ্ড নিয়ে। আসুন, কোন বাধা পাবেন না আমার কাছ থেকে।

মঞ্জরীর অসংবৃত দেহের উপর থেকে উত্তম চোখ ফিরিয়ে নেয়। বলে, থামুন। আপনি খামোকা উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। আপনাকে অসম্মানিত করবার জন্যে কিছু বলিনি আমি। আমি মানুষ। একজন ক্লিষ্ট, আর্ত, জর্জরিত নারী—সে যত বড় রূপসীই হ'ক, তার দেহের ওপর বিন্দুমাত্র লোলুপতা আমার নেই। আপনি স্থির হন। এইখানে বসুন। বলে নিজের পাশটি সে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। শেষের দিকে কণ্ঠস্বর তার আদেশের সুর।

এ স্বরকে অমান্য করতে পারে না মঞ্জরী। সে একবার তাকিয়ে দেখে। বেশ-বাস সংবৃত করে নেয়। তারপর উত্তমের আদেশ পালন করে।

উত্তম বলে, পাঁচ রাত্রি আপনার ঘুম নেই। আপনি ক্লান্ত। আজ বিশ্রাম করুন। আমি চলি। উত্তম সত্য সত্যই উঠে দাঁড়ায়।

—সে কি? এ অসম্ভবতাকে মঞ্জরী যেন বিশ্বাস করতে পারে না। সে বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে।

উত্তম একটু হেসে বলে, অবিশ্বাস করবেন না। এইটুকু আমার কৃষ্টি। নারী-মাংস লোভীদের সঙ্গে আমার দৃষ্টির মিল নেই; সেটা একটু স্বতন্ত্র ধরণের। সে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। এতক্ষণে মঞ্জরীর হুঁস হয়। সে চিনতে পারে এই লোকটিকে, এর নির্লোভী-তাকে। নিজের উন্মত্তবৎ আচরণের কথা মনে হ'তেই সে দিশেহারা হয়ে যায়। দু'হাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়ে। আর্তকণ্ঠে ডাকে, বাবুজি।

উত্তম ফিরে দাঁড়ায়।

—আমার কি হবে বাবুজি? একটা আর্ত হাহাকার বুক চিরে বেরিয়ে আসে তার। এ শোক সান্ত্বনার বাইরে। এর প্রতিকার ক্ষমতারও বাইরে। তবুও উত্তম বলে, একটু ভাববার সময় দিন আমায়। সে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। তারপর এক সময় দ্বিধা-কণ্ঠে আবার বলে, আজ চললাম মঞ্জরী। কাল যদি আবার আসি, আমায় অভ্যর্থনা করবে ত?

—আপনি আসবেন? এ নরক কুণ্ডে আবার আসবেন?

—আসব বইকি। এখানে তুমি যে আছ। না এসে কি থাকতে পারি। মঞ্জরী মুখ তোলে। বলে, না। খবর্দার আর আপনি এখানে আসবেন না। এ নরক কুণ্ড। আপনার যোগ্য জায়গা নয়।

—তা হ'ক, তবুও আসব। আসব শুধু তোমার জন্যেই। তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে মঞ্জরী। আজ আমি অতৃপ্ত বাসনা, কামনা নিয়ে ফিরে যাচ্ছি বটে, কিন্তু কাল এসে সব মিটিয়ে নেব। তারপর একটু দুষ্টুমি করে বলে, কি বল, আমার আহ্বান জানাবে ত? তেমনি করে সাড়ীর আঁচল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বুক টান করে?

মঞ্জরী মুখ নীচু করে। অস্ফুট কণ্ঠে বলে, আমি জানি না।

উত্তম হেসে বলে, তোমার জেনে কাজ নেই। আমি জানলেই হ'ল।

পরদিন।

ঠিক সময়েই উত্তম আসে, হাতে তার একটা সুটকেশ। বলে, আমি আবার এলাম মঞ্জরী। না এসে থাকতে পারলাম না।

মঞ্জরী অবাক হয়ে যায়। এ সে আশা করে নি। চোখ দুটি তার খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠে। বলে, আজও টাকীতে সেই দশ নম্বর উঠল?

—না। গত কালের ব্যবস্থা এ। এড্‌ভান্‌সড্, কিং। এর জন্যে বেহারীলালকে ঘুষ দিতে হয়েছে বশ কিছু।

—তবুও আসা চাই। এক অপমান ছাড়া কাল ত কিছুই পান নি আমার কাছ থেকে। তবে এ কাঙাল-পনা কেন? কি দেখেছেন আমার মধ্যে?

—ভগবান জানেন। আমার শিক্ষাগত ঐতিহ্যই এ পথে আমায় টেনে এনেছে।

—ঐতিহ্য? একটা অত্যাচারিত মেয়ের দেহ সম্ভোগের লালসাকে আপনি ঐতিহ্য বলেন? আর সেই ঐতিহ্যের গর্ব করছেন?

—আমি গর্ব করছি না মঞ্জরী। আশা করছি। আশা করছি কাল যা পারিনি আজ তা পারব। কই এস, তেমনি ক'রে সাড়ীর আঁচল ফেলে দিয়ে এগিয়ে এস।

বাইরে থেকে আওয়াজ আসে। উত্তম উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেয়। বেয়ারা এসে একটা বোতল টেবিলের উপর রেখে যায়।

মঞ্জরী আঁৎকে উঠে। চোখ কপালে তুলে বলে, মদ? আপনি মদ খাবেন? উত্তম হেসে বলে, শুধু আমি নই, তুমিও খাবে। তারপর—

বন্ধনহীন দেহখানি তব, আমি ক্ষণতরে মাগিয়া লব।

মঞ্জরী একেবারে ভেঙে পড়ে। করুণ কণ্ঠে বলে, পাঁচদিন অত্যাচার গেছে দেহের ওপর দিয়ে। সে সবই সহে গেছি। কিন্তু আজ? আজ দেহ মন সবই যাবে। উঃ ভগবান।

উত্তমের স্বরের পরিবর্তন হয়। লঘু স্বর আন্তরিকতায় গাঢ় হয়ে উঠে। বলে, কিছুই যাবে না, যদি আমার কথা শোন, আমার কথা মত কাজ কর। সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। ঠিক রাত বারটায় তোমায় এখান থেকে চলে যেতে হবে মানে পালাতে হবে।

—পালাতে হবে? মঞ্জরী অবাক হয়ে যায়।

—হ্যাঁ পালাতে হবে। এই সুটকেশের মধ্যে পোষাক এনেছি। পোষাক বদলে নাও। আমার ওভার কোটটা গায়ে দাও। মাঙ্কি ক্যাপ দিয়ে মাথা কান সব ঢেকে নেবে। খিড়কী দরজার খবর কাল জেনে নিয়েছি। তোমায় দেখিয়ে দেব। সেখান দিয়ে নেমে যাবে। সোজা পথ। পথের ধারে অপেক্ষা করে আছে একখানা জীপ

নির্ভয়ে তাতে চেপে বসবে। শুধু বলবে, কোয়ার্টারে চল। কোয়ার্টার মানে আমার কোয়ার্টার। সেখানে গিয়ে বিশ্রাম নেবে। সকালে গিয়ে যা ব্যবস্থা করবার, করব। আমার শাশি ব্যাগটাও সঙ্গে রাখ।

মঞ্জরী কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায়। কিছু বুঝতে না পেরে বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে থাকে। উত্তম তাড়া দেয়, বোকার মত দাঁড়িয়ে থেক না মঞ্জু, সময় নেই। মদ আমি ছুঁই না। কিন্তু তোমার জন্যে ছুঁতেও হবে, খেতেও হবে। অন্ততঃ মুখে গায়ে দুর্গন্ধ ছড়াতে হবে। আর এই ঘুমের ওষুধের শিশিটা টেবিলের ওপর পড়ে থাকবে। কাল সকালে উঠেই আমি হামলা সুরু করব। বলব বেহারীলাল তোমার সাহায্যে মদের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে আমার সর্বস্ব অপহরণ করেছে। পুলিশের ভয় দেখাব। যখন সত্য সত্যই তোমাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, তখন বেহারীলাল ভয় পেয়ে যাবে। আমারও উদ্বেগ মিটি হবে। বুঝলে? যাও দেরী ক'র না। ঐখানটা দাঁড়িয়ে সাজ পোষাকটা বদলে ফেল। সেই সঙ্গে তোমার পোষাকটাও সুটকেসের মধ্যে ভরে নেবে। সুটকেসটাও সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে তোমায়। আমি ততক্ষণ মুখ ফিরিয়ে বসছি। তুমি কাজ সেরে নাও।

সেই মুহূর্তে সবকিছু মঞ্জরীর কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। উত্তমের প্রতি শ্রদ্ধায় তার মাথা নত হয়ে আসে। সে আর দ্বিরুক্তি করে না। উত্তমের কথা মত ক্ষিপ্রহাতে পোষাক পরিবর্তন সুরু করে দেয়।

মিনিট পাঁচেক পর উত্তম মুখ ফেরায়। কিছুক্ষণ সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলে, বিলিতি পোষাকে খাসা মানিয়েছে ত তোমায়। কালো পোষাক, অন্ধকার রাত, অভিসার হবে ভাল। এর ওপর ওভার কোটটা চাপিয়ে নাও। মাঙ্কি ক্যাপটা আমি ঠিক করে পরিয়ে দিচ্ছি তোমায়। বলতে বলতে সে উঠে এসে যত্ন করে টুপিটা পরিয়ে দেয় মাথায়। তারপর অতি সন্তর্পণে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় খিড়কীর দরজার দিকে।

পরদিন সকালবেলা।

উত্তম কোয়ার্টারে ফেরে। উঃ খুব বেশ বাস। মঞ্জরী উদ্‌গ্রীবভাবে প্রতীক্ষা করছিল তার জন্য। উত্তম একখানা চেয়ারের ওপর বসে পড়ে বলে, খুব বোকা বানিয়ে এসেছি ব্যাটাকে। ভয়ে জড়সড়। বলে, দোহাই হুজুর, বাঁচান আমাকে। এর বিন্দু বিসর্গ আমি জানি না। তার পেটের মধ্যে যে এতখানি শয়তানী, জানতাম না। অনেক টাকা ঢেলেছি তার জন্যে। একবার তাকে পেলে হয়।

বলি, অমন কাজটি আর ক'র না বেহারীলাল। ওসব মেয়ের পিছনে আর ছুট না। ওরা কোনদিন বশ মানবে না। এবার সত্যি সত্যি খুন করে তোমাকে জড়িয়ে ফাঁসি কাঠে ঠেলে দেবে। তার চেয়ে চুপ করে যাও। আমিও আর পুলিশে যাব না। বেহারী উৎসাহ পায়। বলে, সেই ভাল বাবুজী। এই নাকে খৎ দিচ্ছি আমি, ওসব মেয়ের পেছনে আর না।

উত্তম থামে। তারপর আড় ভেঙে বলে, সারারাত দুশ্চিন্তার মধ্যে কাটিয়ে ভারী ক্লান্ত বোধ করছি মঞ্জরী। বেশ কড়া করে এক কাপ চা খাওয়াতে পার ক্লান্তিটা কেটে যাবে। ও হ্যাঁ, মনে রেখ, এ বাড়ীর কর্ত্রী এখন থেকে তুমি। আমি তোমার অতিথি মাত্র। যা কিছু করণীয় এখন থেকে করতে হবে তোমায়।

মঞ্জরী বড় অসহায় বোধ করে। অসহায় দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকায়। এক সময় চেয়ার ছেড়ে উঠতে যায়। উত্তম বাধা দেয়। বলে, উঁহু! উঠ না। একটা হাঁক দাও, তাহলেই সব এসে যাবে। তুমি বস। অনেক কাজ বাকী। মিঃ ত্রিপাঠীকে একবার ফোন করতে হবে। নম্বরটা বল ডিকিনি।

মঞ্জরী চকিত হয়ে উঠে। ভীত কণ্ঠে প্রশ্ন করে, কেন?

—ভদ্রলোকের একটু উপকার করতে চাই। সেই সঙ্গে একটু আলাপ। চা খেতে খেতেই আলাপ করব, তোমার সামনেই করব।

মঞ্জরী এবার সত্য সত্যই উঠে দাঁড়ায়। দৃঢ় কণ্ঠে বলে, না, কোন উপকার নয়। পরের উপকার মানে নিজের অপকার। জেনে শুনে এ আমি হতে দেব না।

—বেশ দিও না। তবে কোন একটা করতেই হবে। নম্বরটা বল।

বাধ্য হয়ে নম্বরটা বলতে হয় মঞ্জরীকে। উত্তম ফোন তুলে যোগাযোগ করে ত্রিপাঠীর সঙ্গে বলে, একটা জরুরী বার্তা আছে আপনার স্ত্রী সম্বন্ধে। হ্যাঁ আপনার স্ত্রী—কি বললেন? আপনার স্ত্রী মারা গেছেন? কতদিন? প্রায় দু মাস? আপনি ঠিক বলছেন? বলেন কি মশাই, আপনি নিজে তাকে দাহ করে এসেছেন গঙ্গার তীরে! একথা বিশ্বাস করতে বলেন আমায়? কি প্রমাণ আছে? বেশ, সব প্রমাণ নিয়ে আমার বাড়ীতে এখুনি আসবেন একবার। আমি পুলিশ অফিসর। আপনার সঙ্গে এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করতে চাই। আমাদের রেকর্ড আর আপনার জবানবন্দী—এ দুয়ের মধ্যে গরমিল দেখা যাচ্ছে অনেক। আপনি আধ ঘণ্টার মধ্যেই চলে আসুন। আর তা না হলে আমাকেই আপনার কাছে যেতে হবে। তাতে আপনার পক্ষে ফল খারাপই হবে। উত্তম ফোন ছেড়ে দেয়।

মঞ্জরীকে লক্ষ্য করে বলে, শুনলে ত? ভদ্রলোকের স্ত্রী মারা গেছেন। তাকে তিনি নিজের হাতে গঙ্গার তীরে দাহ করে এসেছেন দু মাস আগে। কিন্তু উনি জানেন না, যাকে তিনি দাহ করে এসেছেন, সেই ভদ্রমহিলা বসে আছেন আমার পাশে আমার গৃহকর্ত্রী হয়ে, আমার ঘর আলো করে। একবার আসুন, কি রকম দাহ-কার্য্য করেছেন, টের পাবেন নিজের চোখ দিয়ে দেখে যাক, ভালই হয়েছে। এ বাড়ীর গৃহকর্ত্রী এখন তুমি। তোমাকেই অভ্যর্থনা করতে হবে তাকে। কোন ত্রুটি যেন না হয়। মঞ্জরী সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে। বলে, এ আমি পারব না।

উত্তম বলে, অবুঝ হয়ো না মঞ্জরী। কঠোর পরীক্ষা সামনে। অতিথি এলে চা পরিবেশন করতে হবে তোমাকে। ঘনিষ্ঠতা করতে হবে আমার সঙ্গে। ত্রিপাঠীর দিকে তাকাবে না। যেন তাকে দেখনি কোন দিন। শুধু একবার জিজ্ঞাসা করবে, ক চামচে চিনি দেব আপনার চায়ে। এতেই তোমার শেষ হবে। হ্যাঁ, আর একটা কথা। তোমার হাত ব্যাগে কোন ফটো আছে তোমার? খুঁজে দেখ, আমার বিশেষ প্রয়োজন।

মঞ্জরী আদেশ পালন করে। হাত ব্যাগে একখানা ফটো খুঁজে পায়। ফ্রেমে বাঁধান ছোট ফটো। বিবাহোত্তর ফটো সে রেখেছিল ব্যাগের মধ্যে। এখন উত্তমের হাতে তুলে দেয়।

সুন্দর ফটো। উত্তম খুশি মুখে বলে, তলায় নামও লেখা আছে। এতেই হবে। সে যত্ন করে ফটোখানি টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখে।

অল্প পরই ত্রিপাঠী আসে। উত্তম অভ্যর্থনা করে বলে, বসুন মিঃ ত্রিপাঠী। কিন্তু ত্রিপাঠী বসতে গিয়েই চমকে উঠে টেবিলের উপর ফটোখানি দেখে।

একটা অস্থিরতা মাখান দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে সেই দিকে।

উত্তম একটু হেসে বলে, আমার স্ত্রীর ফটো। আপনাদেরই দেশের মেয়ে। চেনেন নাকি? পরিচয় কিছু আছে?

ত্রিপাঠী হতভম্বের মত প্রশ্ন করে, আপনার স্ত্রী? কিন্তু ইনি ত ত্রিপাঠী।

—হলই বা। এমন বিয়ে ত আজকাল হচ্ছে হামেসাই। দেখা হল, আলাপ পরিচয় হল, মনের মিল হল, তারপর একদিন শুভকাজও শেষ হয়ে গেল। ব্যাস্! শুকি, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন। আপনার সঙ্গে ওঁর পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি এখুনি। উত্তম কলিং বেল টেপে।

ত্রিপাঠী চেয়ারের উপর ধপ করে বসে পড়ে। স্থান, কাল ভুলে গিয়ে ফটোখানি দু হাতের মধ্যে তুলে ধরে সাগ্রহে নিরীক্ষণ করতে থাকে। পর্দা ঠেলে বেয়ারা এসে ঘরে ঢোকে। দু হাতে ধরা চায়ের ট্রে। পিছনে আসে মঞ্জরী। উত্তম উঠে দাঁড়ায়। পরিচয় করিয়ে দেবার ভঙ্গীতে ত্রিপাঠীকে উদ্দেশ করে বলে, ইনিই গৃহকর্ত্রী। তারপর মঞ্জরীর দিকে তাকিয়ে বলে, মিঃ ত্রিপাঠী। সম্প্রতি মিসেসকে হারিয়ে সবিশেষ শোকাভিভূত হয়ে পড়েছেন। কেমন করে হারিয়েছেন সেই আলোচনা

করবার জন্যই এনাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এনেছি। আমার আমন্ত্রণ পেয়েই ভদ্রলোক ছুটে এসেছেন সাত-সকালে। তুমি এনাকে একটু চা খাইয়ে দাও মঞ্জরী।

মঞ্জরী একবার চোখ তুলেই চোখ নামিয়ে নেয়। ট্রে খানি সামনের দিকে টেনে নিয়ে কম্পিত হাতে চা করতে উদ্যত হয়। বুকের মধ্যে তখন তার যে মাতন শুরু হয়েছিল তারই ধাক্কায় সে হয়ত সেইখানেই লুটিয়ে পড়ত, কিন্তু অসহ্য মানসিক বলে সে কোনমতে নিজেকে সামলে রাখে। তারপর এক সময় তোতাপাখীর মত উত্তমের শেখান বুলিগুলিকে আওড়ে যায়।

উত্তম হাসিমুখে বলে, তোমার কড়া শাসনে হাঁপিয়ে উঠেছি মঞ্জু। একটু আগল দাও। তারপর ত্রিপাঠীর দিকে তাকিয়ে রহস্য করে বলে, শুনলেন ত। বলে, বেশী চা তোমায় দেব না। শরীর খারাপ করবে। খেয়েছি ত সেই সকালে এক কাপ। তাই দ্বিতীয় কাপে এত কড়াকড়ি। গৃহকর্ত্রী এত নির্মমা হলে কেমন করে জীবন ধারণ করি বলুন ত? দোহাই মঞ্জু! আমার প্রতি মনোযোগটা একটু শিথিল কর। সময় সময় ভারী অসুবিধে হয় আমার।

ত্রিপাঠীর দিক থেকে কোন উত্তর আসে না। সমগ্র দৃষ্টি তার মঞ্জরীর উপর নিবদ্ধ। সে যেন মঞ্জরীকে গিলে খেতে চায়। এক এক সময় মনে হচ্ছিল সে বুঝি কিছু একটা করে বসতে পারে। কিন্তু মঞ্জরী সতর্ক। কোন সুযোগ তাকে দিল না। দুজনের দিকে দুটি কাপ এগিয়ে দিয়ে উত্তমকে উদ্দেশ করে বলে, চাকরটাকে বসিয়ে রেখে এসেছি সেই পর্য্যন্ত। তাকে একবার বাজারে পাঠাতে হবে। তোমরা ততক্ষণ আলোচনা কর। বলেই সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

মঞ্জরীর এ ছলাটুকু উত্তম বোঝে। এতখানি চাপ যে তার স্নায়ু শিরাগুলি সইতে পারছিল না, এ তথ্য তার কাছে অবিদিত রইল না। সে তাকে বাধা দিল না, বরং সরে গিয়ে পথ ছেড়ে দিল।

এতক্ষণে ত্রিপাঠীর মুখ দিয়ে কথা বেরুল। সে করুণ সুরে বলে উঠল, কসুর হয়ে গেছে, মাপ করুন। বলতে বলতে সে এগিয়ে এসে উত্তমের দুই হাত চেপে ধরল।

উত্তম সবিস্ময়ের ভাণ করে। বলে, কি কসুর হয়েছে ত্রিপাঠীজি।

—আমি সব ঝুট বাত বলেছি বাবুজি। আমার স্ত্রী মারা যায়নি। সে বেঁচে আছে।

—সেকি! আপনি যে বললেন, তাকে নিজ হাতে দাহ করে এসেছেন।

—মিথ্যে কথা বলেছিলাম বাবুজি।

—মিথ্যে কথা বলেছিলেন? তাহলে আপনার স্ত্রী কোথায়?

—যে চলে গেল বাবুজি সে আমার স্ত্রী, সেই মঞ্জরী ত্রিপাঠী।

উত্তম আকাশ থেকে পড়ে। বলে, বলেন কি? আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? পরের স্ত্রীকে বলেন নিজের স্ত্রী—

ত্রিপাঠী প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে বলে, পরস্ত্রীকে দাবী করিনি বাবুজি, করেছি নিজের স্ত্রীকেই। বেয়াদপি মাপ করবেন, আমি হলপ করে বলতে পারি ঐ আমার স্ত্রী মঞ্জরী।

উত্তম বলে, এ বারেও আপনি ভুল করছেন ত্রিপাঠীজি। আমার গৃহকর্ত্রীকে যদি নিজের স্ত্রী বলে দাবী করেন, তাহলে আমি যাব কোথায়?

ত্রিপাঠী আর নিজেকে সামলাতে পারে না। একেবারে ভেঙে পড়ে। দু'হাতে মাথা টিপে ধরে সামনের চেয়ারে নিজেকে এলিয়ে দেয়। তারপর ধীরেধীরে নিজের কুকীর্তির কথা বলে যায়। সন্ধ্যেবেলা মদ খাওয়া থেকে সুরু করে, জুয়া খেলা, রেস খেলা যত কিছু অনাচার সে করেছিল, তারই বিস্তৃত কাহিনী সে শুনিয়ে গেল উত্তমকে। শেষ পর্য্যন্ত কি পরিস্থিতিতে সে জুয়ারী বেহারীলালের খপ্পরে পড়ে দেনার দায়ে এবং জালিয়াতীর ফাঁদে পা দিয়ে মঞ্জরীকে তুলে দিতে বাধ্য হল তার হাতে, সে কথাও বলে গেল একে একে। নিজের এই সব কুকীর্তি ঢাকবার জন্যই তাকে মিথ্যার আশ্রয়

নিতে হয়েছিল, মঞ্জরীর মৃত্যু কাহিনী পর্যন্ত অবতারণা করতে হয়েছিল। এখন তার মোহ ভেঙে গেছে, অন্তর আত্মগ্লানিতে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। কাহিনী শেষে ত্রিপাঠী বলে, এখন আপনি দয়া করুন বাবুজি। মঞ্জরীকে আমায় ফিরিয়ে দিন।

উত্তম বলে, এখানে দেওয়া নেওয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না মিঃ ত্রিপাঠী। মঞ্জরী যদি আপনার স্ত্রী হন আর স্বেচ্ছায় তিনি যদি আপনার সঙ্গে যেতে চান, কেউ বাধা দেবে না। আর তিনি যেতে না চান, জোর করব না। এইখানেই থাকবেন তিনি এই গৃহের গৃহকর্ত্রী হয়ে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ত্রিপাঠীজি, এরপর আবার যে আপনার জুয়ারী বৃত্তি উৎকট হয়ে উঠবে না, পাশব বৃত্তি জেগে উঠবে না. তার প্রমাণ কি?

—প্রমাণ? ত্রিপাঠী ম্লান মুখে বলে, প্রমাণ দেবার মত আমার কিছু নেই বাবুজি, আর দিলেও তা বিশ্বাস করবে কে? আজ আমি বড় অসহায়। তবে এইটুকু আমি আন্তরিক ভাবে বলতে পারি, আজ আমার মধ্যে সব বৃত্তিরই সমাধি হয়েছে। জুয়ারী বৃত্তিরও হয়েছে, পাশব বৃত্তিরও হয়েছে। এ শুধু আমার মুখের কথা নয়। এর জন্যে নাকে খৎ দিয়ে দাসখৎ লিখে দিতে রাজী আছি বাবুজি।

উত্তম একটু চিন্তা করে বলে, বেশ, মঞ্জরীর মতামতটা জেনে দেখি। তবে একটা কথা, তিনি যদি যেতে রাজী হন, তাহলে বেহারীলালের সঙ্গে একই সহরে বসবাস করা চলবে না আপনাদের। তার নজরে পড়লে আর রক্ষে থাকবে না।

ত্রিপাঠী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়, সে কথা আমিও ভেবে রেখেছি। মোগল সরাইয়ে আমার কিছু সম্পত্তি আর একটা ছোট ব্যবসা আছে। এ সমস্তই মঞ্জরীর নামে লিখে দিয়ে সৎভাবে জীবন-যাপন করব।

—উত্তম প্রস্তাব। এ কথা মঞ্জরীকে জানিয়ে আমি আসছি এখুনি। বলতে বলতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে উত্তম।

দরজার পাশটিতে মঞ্জরী দাঁড়িয়েছিল চুপটি করে। বড় গম্ভীর, বড় থমথমে মুখখানি তার। উত্তম প্রশ্ন করে, সব শুনেছ?

মঞ্জরী শুধু ঘাড় নাড়ে। সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়া।

উত্তম হাসে। বলে, এ ভালই হ'ল। ভালয় ভালয় মিটে গেল সব। এবার ট্যাক্সি ডাকতে বলি?

—না। মঞ্জরীর কণ্ঠে দৃঢ়তা।

—'না' কেন? এ বাড়ীর গৃহকর্ত্রী অপেক্ষা মোগল সরাইয়ের রাজরাণী অনেক ভাল।

—না, না, না। এবারে মঞ্জরীর স্বরে সে দৃঢ়তা নাই। স্বর ভাঙ্গা।

উত্তম মঞ্জরীর দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয়ে যায়। তার চোখে জল। সে মুখ লুকোবার চেষ্টা করে।

উত্তম এগিয়ে আসে। প্রশ্ন করে, ব্যাপার কি মঞ্জু?

—আমি যাব না। কোথাও যাব না। সে মুখে আঁচল চাপা দেয়।

—যাবে না? সে কি? মিঃ ত্রিপাঠী ত সব কথাই অকপটে স্বীকার করেছে। সৎ জীবন-যাপন করবার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে। এ ত অবিশ্বাস করবার কথা নয়।

—অপরের কাছে হয়ত নয়, কিন্তু আমি করি। তাছাড়া যার দাহকার্য্য একবার শেষ হয়ে গিয়েছে, সে মৃত। তার ওপর কারও অধিকার থাকতে পারে না। যে নিজ হাতে দাহ করেছে, তার ত নয়ই।

উত্তম বিস্মিত হয়। বিস্ময় ভরা চোখে তাকিয়ে থাকে মঞ্জরীর উত্তেজিত মুখের দিকে।

মঞ্জরী বলতে থাকে, এর পরের কথা শ্রদ্ধা। এখানে শ্রদ্ধা কোনদিনই তার আসন বিছিয়ে বসবে না। অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাসের বিষাক্ত বাতাসে কে সাধ করে বাসা বাঁধতে চায় বলুন।

—তাহলে? তাহলে কি করতে চাও তুমি? উত্তম একটু বিব্রত ভাবেই প্রশ্ন করে।

—জানি না। বিবেককে প্রশ্ন করে জেনেছি, যিনি মৃতসঞ্জীবনী সুরা পান করিয়ে এ দেহে প্রাণ সঞ্চার করেছেন, একে পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছেন, যদি কারও

অধিকার থাকে এ দেহের ওপর, আছে শুধু তাঁরই। তিনি যদি চান তাঁকে যেন বঞ্চিত না করি।

উত্তম স-কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করে, সে ভাগ্যবানটি কে, জানতে পারি? মঞ্জরী পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে উত্তমকে দেখে। তারপর বলে, পারেন। তবে ভাগ্যবান তিনি নন, ভাগ্যবতী আমি। তিনি মহানুভব, নিজের জীবন বিপন্ন করে সেই নরক কুণ্ড থেকে উদ্ধার করে এনেছেন আমাকে, তাঁর গৃহকর্ত্রীর আসনটা ছেড়ে দিয়েছেন আমাকে। এ আসন আজ যদি আমি প্রত্যাখ্যান করি, কোন নরকেও আমার ঠাঁই হবে না।

উত্তম বিহ্বল হয়ে পড়ে। বলে, এ তুমি কি বলছ মঞ্জরী?

—যা সত্যি, তাই বলছি। কাল সারারাত ধরে চলেছিল আমার বিবেকের সঙ্গে সংস্কারের। দুজনে টেনে নিয়ে-চলেছিল আমাকে দুদিকে। সংস্কার অন্ধ, তার যুক্তি নেই। কিন্তু বিবেকের যুক্তি তীক্ষ্ণ। সে-ই পথ দেখিয়ে দিল আমাকে সংস্কারকে নস্যাৎ করে দিয়ে। তাই তোমার গৃহকর্ত্রীর আহ্বানকে আমি উপেক্ষা করতে পারি নি।

উত্তম একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, এ সম্ভবপর নয় মঞ্জু, এ পাগলামি।

—সম্ভবপর নয়? কেন? তা হলে এত কথার কি প্রয়োজন ছিল? নিজের স্ত্রীর আসনে বসিয়ে মর্য্যাদা দিলে যাকে, তাকে নিয়ে এ খেলা কেন? তাহলে সবই কি মেকী, আন্তরিকতার লেশ মাত্রনেই?

উত্তম ভারী গলায় বলে, জানি না। শুধু এইটুকু জানি, এ অভিনয়। আমি অভিনয় করে গিয়েছি মঞ্জু। তোমার মান, তোমার সম্ভ্রম রক্ষা করবার জন্য আজ দুদিন ধরে যা করেছি, তা শুধু অভিনয়।

—অভিনয়? শুধুই অভিনয়? হা ভগবান। মঞ্জরী আর্তনাদ করে উঠে।

—হ্যাঁ, অভিনয়। তবে পাকা অভিনেতা আমি নই, তাই পা ফস্‌কেছে। অর্থাৎ তোমাতে আমি মুগ্ধ হয়েছি। এ কথা গোপন করতে চাই না। প্রথম যুগ্ধ হই যখন তুমি সাড়ীর আঁচল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রায় অনাবৃত বক্ষে আমায় আহ্বান জানিয়েছিলে। তখন তোমার রাগ যত বড়ই হ'ক না কেন, রূপের আগুন ঠিকরে পড়ছিল সারা দেহ দিয়ে। সে রূপের তুলনা হয় না। তাই দু-চোখ ভরে সেই অপরূপ সুধা পান করেছি আর তার স্তাবকও হয়ে উঠেছি। তারপর আবার মুগ্ধ হলাম কাল রাতে যখন সাড়ী ছেড়ে আমার দেওয়া পোষাক বদল করলে তুমি। আয়নায় তোমার অসংবৃত দেহের প্রতিবিম্ব দেখেছিলাম, আর মুগ্ধ হয়েছিলাম। তাই ত অত সহজেই স্ত্রীর আসনে বসাতে পারলাম তোমায় এতটুকু ইতস্ততঃ না করে। তবে এ পাগলামিকে আর আমি প্রশ্রয় দিতে চাই না মঞ্জু, তুমি আমায় ক্ষমা কর।

মঞ্জরী চোখ তোলে। তার চোখ দুটি অশ্রুতে ভরা। তারই ধারা গাল বয়ে গড়িয়ে পড়ে। বলে, আপনি আমার সঙ্গে অভিনয় করছেন, আমি প্রতারিত হয়েছি। অত্যাচারিত নারী আমি। ঘরে বাইরে প্রতারিত। প্রতীকারের আশায় যাঁর আশ্রয় চাইলাম, তাঁর আশ্রয় পেলাম না। তা হলে বলুন এখন আমি কি করি? উত্তম বলে, তুমি আমার আশ্রয় চেয়েছ, জানি। সাধ ছিল দেবার, কিন্তু সাধ্য নাই। অভিনয় যাই করি না কেন, অন্তরে আমিও স্খলিত, পতিত। কিন্তু সামাজিক আইন লঙ্ঘন করতে তোমায় উপদেশ দেব না। ত্রিপাঠী অনুতপ্ত। স্ত্রীর সর্ব্ব-মর্য্যাদা দিয়েই সে তোমায় ফিরে পেতে চায়। তাকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত হবে না তোমার। তুমি ফিরে যাও। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সুখী হও।

মঞ্জরী নিরুত্তরে অপেক্ষা করে থাকে কিছুক্ষণ। কি যেন মনে মনে ভাবে। তারপর বলে উঠে, বেশ ফিরেই আমি যাব। কিন্তু আমার একটা অনুরোধ রাখবেন বলুন?

—রাখব। কি তোমার অনুরোধ বল?

মঞ্জরী বলে, এতদিন পূতি গন্ধময় নরক-কুণ্ডে পড়ে-ছিলাম। আকণ্ঠ পাঁকে ছিলাম নিমজ্জিত। বিষবাষ্পে

শ্বাস রুদ্ধ। চরিত্রহীন, অসাধু সহবাসে শরীর জর্জরিত, ক্লেদে ভরা। তাই সাধু সহবাসে এ তাপ কিছুটা জুড়াতে চাই। কিছু পুণ্য অর্জন করতে চাই। নরক কুণ্ডের বিস্বাদকে স্বর্গের অমিয় পানে কিছুটা ভুলতে চাই। দেবেন ভুলতে আমাকে? এ তাপ জুড়াতে? একটা মুহূর্তের তরেও যদি আপনাকে আমি মুগ্ধ করে থাকি, তারই বিনিময়ে আপনার এ সাহচর্য্য আমার কামনা। মাত্র একটা দিনের সাহচর্য্য। দেবেন আমায়? দেবেন এ সাহচর্য্য?

উত্তম প্রসন্ন মুখে বলে, কথা দিলাম, দেব। তবে আজ নয়।

—আজ নয়? তবে?

ঈশ্বর না করুন, কোনদিন যদি ত্রিপাঠীজির অনাদরে জীবনে হতাশা ঘনিয়ে আসে, জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠে, সেদিন আমার দ্বার তোমার জন্য উন্মুক্ত থাকবে মধু। কোন দ্বিধা, কোন সঙ্কোচ না করে চলে এস আমার কাছে। শান্তি পাবে, তৃপ্তি পাবে, আনন্দ পাবে। একটু থেমে আবেগ মেশান স্বরে বলতে থাকে, তিলোত্তমা নারী তার যৌবন ভারাবনত দেহ উৎসর্গ করতে এসেছে পুরুষের কাছে, অথচ সে দান গ্রহণে পুরুষ অসমর্থ। এ যে কতখানি মর্মান্তিক, তা তুমি বুঝবে না মধু। তোমার ঐ কুসুমিত দেহের সুবাস যদি একবার পাই, যদি ঐ দেহ-রহস্যের দ্বার একবার উদ্ঘাটিত হয় আমার কাছে, আর কি তোমায় আমি ছাড়তে পারব? না, মধু না, রক্ষক হয়ে ভক্ষক হতে পারব না। আমি নিরুপায়, আমি অক্ষম। পুরুষের এ অপারগতাকে যদি পার ত ক্ষমা করো। ত্রিপাঠীকে প্রস্তুত হতে বলি। তুমিও এস। বলতে বলতে এক রকম উদ্ভ্রান্তের মতই সে ঘর ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে যায়।

সহরের শেষ প্রান্তে গল্‌ফ্ খেলবার মাঠের এক পাশে বেদের দল এসে তাঁবু ফেলেছে।

ম্যাথু আরনল্ড প্রাতঃভ্রমণে গেছেন সেদিকে। একজন আধবুড়ো বেদে তাঁকে দেখে সহাস্য মুখে বললেন—"আচ্ছা মশাই, এখানে লাইব্রেরী কোথায় আছে বলতে পারেন? আমার একখানা বই পড়বার খুব ইচ্ছা।"

—"কি বই?" প্রশ্ন করলেন ম্যাথু আরনল্ড।

—"এমন কিছু নয়,—সেক্সপীয়ারের জুলিয়াস সীজার।"

আশ্চর্য্য হলেন আরনল্ড। কিন্তু আরও আশ্চর্য্য হলেন তিনি যখন সেই বেদে অনর্গল সেক্সপীয়ার মিলটন আবৃত্তি করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ আলাপের পর আরনল্ড বাড়ী ফিরে এসে নূতন একখানা উপন্যাস লিখতে বসলেন, নাম দিলেন তার—"The Scholar Gipsy."

"সেদিন একজন ধনী জাপানী তাঁর বাড়ীতে চা-পান অনুষ্ঠানে আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সেদিন এই অনুষ্ঠান দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারলুম জাপানীদের পক্ষে এটা ধর্মানুষ্ঠানের তুল্য। এ ওদের একটা জাতীয় সাধনা।"

• • • •

"জাপান জিনিষটা যে কী, তা এরা জানে। জাপানের চোখ এবং হাত দুইই প্রকৃতির কাছ থেকে সৌন্দর্যের দীক্ষালাভ করেছে—যেমন ওরা দেখতে জানে, তেমন ওরা গড়তে জানে।"

• • • •

(গৃহস্বামীর) "মেয়ে এসে নমস্কার করে চা তৈরীতে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁর প্রবেশ থেকে আরম্ভ ক'রে চা তৈরীর প্রত্যেক অঙ্গ যেন ছন্দের মতো। ধোয়া মোছা, আগুন জ্বালা, চা-দানির ঢাকা খোলা, গরম জলের পাত্র নামানো, পেয়ালায় চা ঢালা, অতিথির সম্মুখে এগিয়ে দেওয়া, সমস্ত এমন সংযম ও সৌন্দর্যে মণ্ডিত যে, সে না দেখলে বোঝা যায় না। এই চা-পানের প্রত্যেক আসবাবটি দুর্লভ ও সুন্দর। অতিথির কর্তব্য হচ্ছে, এই পাত্রগুলিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একান্ত মনোযোগ দিয়ে দেখা। প্রত্যেক পাত্রের স্বতন্ত্র নাম এবং ইতিহাস। কত যে তার যত্ন, সে বলা যায় না।
সমস্ত ব্যাপারটা এই। শরীরকে মনকে একান্ত সংযত ক'রে, নিরাসক্ত প্রশান্ত মনে সৌন্দর্যকে নিজের প্রকৃতির মধ্যে গ্রহণ করা। ভোগীর ভোগোন্মাদ নয়—কোথাও উচ্ছৃঙ্খলতা বা অমিতাচার নেই; মনের উপরতলায় সর্বদা যেখানে নানা স্বার্থের আঘাতে নানা প্রয়োজনের হাওয়ায়, কেবলই ঢেউ উঠছে, তা থেকে দূরে, সৌন্দর্যের গভীরতার মধ্যে নিজেকে সমাহিত করে দেওয়াই হচ্ছে এই চা-পান অনুষ্ঠানের তাৎপর্য। এর থেকে বোঝা যায়, জাপানের যে সৌন্দর্যবোধ সে তার একটা সাধনা, একটা প্রবল শক্তি।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জাপানের চা-উৎসব

শীলিমা সেন

জাপানীদের শিল্প-বোধ আর সুকুমার রুচি জগদ্বিখ্যাত। সব চেয়ে বড় কথা, দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তাদের এই জাতীয় বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট। বাড়ী-ঘর, উদ্যান-চর্চা, বেশ-ভূষা—সব কিছুর ভেতর থেকেই যেন উপচে পড়ছে তাদের সৌন্দর্য-বোধ। জাপানী মনের এই বৈশিষ্ট্য আবার স্বাভাবিক ভাবে সব চেয়ে বেশি ধরা পড়ে তাদের উৎসবের দিনে—বিশেষ ক'রে চা-উৎসবে। ওই উৎসব উপলক্ষ্যে তারা পান করে মিহি সবুজ চা।

প্রামাণ্য ইতিহাস থেকে জানা যায় চীন থেকে জাপানে চায়ের প্রথম আবির্ভাব ৭০০ খৃষ্টাব্দে। অবশ্য চীনে চায়ের ব্যবসা ছিল বহুকাল আগে থেকেই (২৭-২২০ খৃঃ)। তখনও চা-উৎসবের চল হয়নি। সুং বংশের সম্রাটরা যখন চীনে রাজত্ব করছেন, সেই সময়ে চীন থেকে জাপানে চা-উৎসবের প্রচলন হয়। তখনও চা মহার্ঘ বস্তু, সাধারণের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। পূর্ব প্রাচ্যের লোকেরা তখন ওষুধ হিসেবেই চা ব্যবহার করছে। পানীয় হিসেবে চায়ের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়নি। কেবল মাত্র বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের একটি সম্প্রদায় পানীয় ব'লে চা পান করতেন। বহুক্ষণ ধ'রে ধ্যান যাতে করা যায় আর সেই সময় ঘুম এসে উৎপাত না করে তার জন্যই এরা মাঝে-মাঝে চায়ের সাহায্য নিতেন।

জাপানে চা জনপ্রিয় হ'য়ে ওঠে খৃঃ চৌদ্দ শতকে। শুরু হয় চা-প্রতিযোগিতা। এই অনুষ্ঠানটির আমদানী হয়েছিল চীন থেকে। অতিথিদের সামনে অনেকগুলি কাপে ক'রে গরম চা রাখা হত। সেরা উৎপাদন-কেন্দ্রের চা সেই কাপগুলির কোনটিতে আছে যাঁরা চুমুক দিয়ে তা ব'লে দিতে পারতেন প্রতিযোগিতায় জয়ী হ'য়ে তাঁরা পুরস্কার পেতেন। এই অনুষ্ঠানের ফলে জাপানের কয়েকটি অঞ্চলে, বিশেষ ক'রে কিয়োটোর কাছে উজি জেলায় চা উৎপাদন বেড়ে যায়। ওই জেলার চা এখনো জাপানের সেরা চা।

ক্রমে প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার দানের রীতিটি উঠে যায়। জাপানী চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দেখা দেয় উৎসবের আবহাওয়া। শান্ত, আনন্দ-ঘন পরিবেশে চা-পরিবেশন——এই হ'য়ে ওঠে জাপানী গৃহকর্তা আর অতিথিদের লক্ষ্য। সেই সময়ে জাপানের সমাজে সব চেয়ে বেশি প্রতিপত্তি ছিল সামুরাই বা যোদ্ধা-শ্রেণীর। এদের ইচ্ছাক্রমে স্থির হয় যে চা-পান অনুষ্ঠানে বিশেষ কতকগুলি নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে।

নিয়ম কানুনের বাঁধন বজায় রেখেও যিনি চা-পান অনুষ্ঠানকে চা-উৎসবে প্রথম রূপায়িত করেন তাঁর নাম মুরাটা জুকো (১৪২৩-১৫০২)। পরে আরো ক'য়েকজন জাপানী ভদ্রলোক এই উৎসবটিকে আরো প্রাণবন্ত ক'রে তোলার ব্যবস্থা করেন। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে চা-উৎসব বিশেষ

তাৎপর্য লাভ করে। চা পানের মাধ্যমে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা আর আত্মার বিশুদ্ধতা ঘটে—এমন বিশ্বাস ধীরে ধীরে দেখা দেয় জাপানীদের মনে। সরলতার মাঝখানেই যে সুন্দরের অধিষ্ঠান—এই সত্যের অনুসন্ধানও জাপানীরা করেছে চা-উৎসবের ভেতর দিয়ে। এই উৎসবের খুটিনাটি নিয়ম-কানুন আপাতদৃষ্টিতে বিরক্তিকর মনে হলেও, যখন ওই সব নিয়ম যথাযথ মেনে একজন অভিজাত অভিজ্ঞা জাপানী চা তৈরী করতে থাকেন তখন তা দেখে অতিথিদের বেশ ভালোই লাগে। [illegible] তাঁরা কোনো নিপুণ শিল্পীর শিল্প রচনা দেখছেন।

জাপানীদের সৌন্দর্য-বোধ জাগরণে চা-উৎসব অনেকখানি সহায়তা করেছে। কারণ যেখানে সেখানে, যেমন তেমন ক'রে চা পরিবেশন করলে তো চলবে না। যে ঘরে তা পরিবেশন করা হবে যে বাগিচা পাশে থাকবে, যে সব বাসন-পত্র চা তৈরীর জন্য দরকার—সব কিছুই হতে হবে সুন্দর, ছিমছাম। উৎসবের দিন ঘরটিকে সাজাতে হবে নানা বর্ণের ফুল দিয়ে। জাপানের স্থাপত্য, ছবির মতো উদ্যান রচনার রীতি, চীনামাটি-শিল্প, পুষ্প শিল্প—এ সবই চা-উৎসবের কাছে বিশেষ ভাবে ঋণী।

চা-উৎসব উপলক্ষ্যে নিয়ম-কানুন মানতে শিখে জীবনের অন্য পাঁচটি ক্ষেত্রেও জাপানীরা পরিচয় দেয় ভদ্রতা, সংযম, নিয়মানুবর্তিতা আর শৃঙ্খলা বোধের। এক কথায়, চা পান উৎসব জাপানীদের সুসভ্য ক'রে তুলেছে। সেই জন্য বিবাহের আগে প্রতিটি জাপানী তরুণীকে অবশ্যই শিখতে হয় চা-উৎসবের রীতি-নীতি।

• • •

হোটেলের কোণের ঘরটার সামনে এসে এক তরুণী বললেন, ভিতরে আসতে পারি?

—নিশ্চয়ই,—পর্দার ওপাশ থেকে উত্তর এল।

তরুণী ঘরের মধ্যে ঢুকেই রাগত স্বরে বললেন—আপনিই কি মিঃ সমারসেট্ মম্?

—আপনি কি ওঁকেই খুঁজছেন?

—হাঁ, লোকটাকে আমি চাবুক দিতে এসেছি।

—কেন বলুন ত?

—কারণ যা' সত্য নয়, সে কথা তিনি নারী জাতির সম্বন্ধে লেখেন কেন?

—নারী জাতির প্রেম সম্বন্ধে কি আপনি ও-কথা বলছেন?

—নিশ্চয়ই। আপনি কি সত্যিকারের নারী দেখেন নি?

—এইমাত্র দেখছি—আপনার মত নারীর দেখা পেয়ে সত্যিই আমি ধন্য,—আপনার হাতের চাবুক খেতেও আমার খুব ভাল লাগবে।

এক গাল হেসে তরুণী তখন মমের পাশে বসে পড়লেন।

উৎসব—য়ুরোপের শেষ সীমান্তে

য়ুরোপের শেষ সীমান্ত, নিশীথ সূর্য্যের দেশ নরওয়ে। ফিনল্যাণ্ড আর সুইডেনের সঙ্গে এর অন্তরঙ্গ যোগ। গ্রীষ্মের উষ্ণ আমেজটুকু যাই-যাই ক'রেও থেকে যায় পুরো তিনটি মাস। একদিকে গভীর খাদ, অন্যদিকে খাড়া পাহাড়—এই হল দেশটির ভৌগোলিক চেহারা। অবিস্মরণীয় অতুলনীয় এর নিশীথ সূর্যের দৃশ্য। মে থেকে আগষ্ট—এই ক'টি মাস আকাশের দিকে তাকালেই চোখে পড়ে দিগন্ত রেখার ওপর থমকে আছে সূর্য। অস্ত যাবার নামটিও করছে না। সূর্যের রং দেখে মনে হয় সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত যেন এক সঙ্গে মিশে গেছে।

সমস্ত দেশটিতে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য সবুজ বন। আর মাঝে-মাঝেই চোখে পড়ে খর নদী। প্রকৃতির কোলে মানুষ তাই নরওয়ের প্রতিটি বয়স্ক লোকই শিকারী, আর প্রতিটি কিশোর দক্ষ জেলে। অরণ্য, হ্রদ, নদী, পর্ব্বতের আহ্বানে সাড়া দিতে সব-সময়েই যেন উন্মুখ এখানকার মানুষ।

নরওয়েবাসীদের সবচেয়ে প্রিয় ঋতু বসন্ত। বছরের সেরা দিনটি হল 'সংবিধান দিবস'। প্রতিবছর ১৭ই মে উৎসব ক'রে এই দিনটি ওরা উদযাপন করে। সেদিন ওরা হৈ-হল্লা আনন্দ করে মনের সব আগল খুলে দিয়ে। কার্নিভালের মেজাজ নিয়ে। রঙ বেরঙের পোশাক পরে শিশুরা আর সেকেলে সব মজার পোশাক গায়ে দিয়ে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা বেরিয়ে পড়ে পথে। প্রতি বছরই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা মিছিল ক'রে যায় ওস্লো-র রাজপ্রাসাদের সামনে দিয়ে। তাদের আগে আগে থাকে ব্যাণ্ড পার্টি। মিছিলটি প্রাসাদের কাছে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে রাজা এবং রাজ-পরিবারের অন্য সব লোক প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসে গ্রহণ করেন ছেলে-মেয়েদের অভিনন্দন। নরওয়েতে এই প্রথাটি চ'লে এসেছে বহুকাল থেকে।

নানা রঙের ফুলের পসরা সাজিয়ে প্রকৃতি রাণীও যেন মেতে ওঠে উৎসবের মাদ মে-তে। চালু খাদের গায়ে তাকালেই চোখ জুড়িয়ে যায় নানা ফুলের মেলা দেখে। এই সময়ে অনুষ্ঠিত হয় 'বার্জেন আন্তর্জাতিক উৎসব'। গ্রীগ-এর নিজের বাড়িতে ২৩শে মে থেকে ৭ই জুন পর্যন্ত চলে গান—বাজনা, কনসার্ট, অপেরা ইত্যাদি বিচিত্র অনুষ্ঠান। এতে যোগদান করেন বিশ্ব-বিখ্যাত সব কণ্ডাকটার, শিল্পী এবং অর্কেষ্ট্রার দল।

শীতের নরওয়ে তো ছুটির দেশ। বরফে তখন সাদা হয়ে যায় এখানকার মাটি। দেশ-বিদেশের লোকেরা ছুটে আসে আনন্দের সন্ধানে। এখানে ওখানে জমে ওঠে খেলা-ধূলোর আসর, মনোজ্ঞ উৎসব। শুরু হয় বরফের ওপর স্কি খেলা। জানুয়ারীর ৬ থেকে ১৩ আর ১৩ থেকে ২০—এই দুই সপ্তাহ তো স্কি-র সপ্তাহ। জগদ্বিখ্যাত স্কি-খেলোয়াড়রা নানা রকম কলা-কৌশল

মেখিয়ে ও ক'দিনে সম্মোহিত করে রাখেন উপস্থিত দর্শকদের। এই সময়ে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কার্নিং খেলার প্রতিযোগিতাও দেখবার মতো। দ্বি—কার্নিভাল, শোভা-যাত্রা, হাসিখুসি সন্ধ্যা, ফুল-সাজি ইত্যাদি নিয়ে শীতের নরওয়ে হ'য়ে ওঠে পর্যটকের স্বর্গ। বড়-বড় হোটেলগুলিও সরগরম হ'য়ে ওঠে এই সময়ে। প্রতি সন্ধ্যাতেই হোটেলে—হোটেলে বলে নাচের আসর, কার্নিভাল উৎসব। পিয়ানোর টুং টাং আর আর বেহালার করুণ সুরে ভরে পথ! দু-একটি হোটেলে পুরস্কৃত করা হয় সফল দ্বি—খেলোয়াড়দের। গৃহস্থের ঘরে এসেও লাগে সেই আনন্দের দোলা। বাজে, গিটার, বেহালা ইত্যাদি যন্ত্র-যন্ত্র। গ্রামোফোনের গানে মুখর হয়ে ওঠে বাড়ি। হাত ধরাধরি করে নাচে ছেলে-মেয়েরা। সেই পরিবেশে সত্যি হয়তো মনে হয় কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু নেই। আছে শুধু অফুরন্ত প্রাণ, অফুরন্ত জীবন, অফুরন্ত আনন্দের হিল্লোল।

য়ুরোপের ক্রীড়াঙ্গন নরওয়ে। প্রকৃতির লীলাভূমি নরওয়ে। ছুটির শানাই বেজে চলেছে এখানকার আকাশে-বাতাসে। উনিশ শতকের পর থেকে অসংখ্য কল-কারখানা আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে য়ুরোপের বহু দেশ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এই সব দেশ থেকে বিদায় নিয়েছে বললেই চলে। কিন্তু নরওয়ে আজো শিল্প-সভ্যতার কালিমা থেকে মুক্ত। প্রকৃতির কুমারী সত্তা আজো সেখানে অম্লান, অমলিন। তাই অন্য দেশের উৎসবের থেকে স্বতন্ত্র রূপ সে দেশের উৎসবের।

• • •

ক্লাসের সবচেয়ে ভাল ছেলেটির অঙ্কের খাতা দেখে শিক্ষক প্রশ্ন করলেন—এ অঙ্কের নিয়মটা কে বলেছেন, বলত ?

ছেলেটি বলল—আমাদের এক প্রতিবেশী, লোকটা বুড়ো, আর মাথায় বাঁকড়া চুল।

—এ নিয়ম ত দেখছি একেবারে নূতন। আচ্ছা তাঁকে এই অঙ্কটা করতে দিয়ো তো। পরদিন সে অঙ্ক দেখে শিক্ষক অবাক। তিনি আবার সবচেয়ে শক্ত এমন একটা অঙ্ক দিলেন, যেটা করতে খাতার পাঁচ ছয় পাতা লাগে।

পরদিন শিক্ষক ত হতভম্ব। পাঁচ পাতায় অঙ্ক পাঁচ লাইনে। তাও আবার আশ্চর্য নিয়মে।

শিক্ষক বললেন : চল তো তোমার সেই প্রতিবেশীকে দেখে আসি। এমন গণিতজ্ঞ যে পৃথিবীতে আছেন তা' তো জানতাম না!

ছাত্র শিক্ষককে নিয়ে এলেন তাঁর কাছে। তাঁকে দেখেই থমকে উঠলেন, তারপর হেসে বললেন আমি আন্দাজে আপনার কথাই ভাবছিলাম ডঃ আইনষ্টাইন্—আপনি ছাড়া এমন অবাক আর কে করবে।

চিঠি শুধু চিঠি নয়!

[স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত]

আমেরিকা

২০শে নভেম্বর ১৮৯৯

ভিন্নহৃদয়েষু,

ভরতের পত্রে খবর পেলুন। হারডিটের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই, তোমরা এইবেলা perience (অভিজ্ঞতা) করে নাও।...আমার আর কোন রোগ নেই। আমি আবার ঘুরতে লুম জায়গায় জায়গায়। কুছ পরোয়া নেই, মাভৈঃ। সব উড়ে যাবে তোমাদের সামনে, খালি obedient (অবাধ্য) হয়ো না, সব সিদ্ধি হবে।...জয় মা রণরঙ্গিনী! জয় মা, জয় মা রণরঙ্গিনী। ?, ওরা গুরুকী ফতে!

...আসল কথা, ঐ কাপুরুষদের চেয়ে পাপ নেই; কাপুরুষের উদ্ধার হয় না—এ নিশ্চিত। র সব সয়' ঐটি সয় না। ওটি যে ছাড়বে না তার সঙ্গে আমার আর সম্পর্ক চলে কি? এক খেয়ে দশ ঘা তেড়ে মারতে হবে...তবে মানুষ।...কাপুরুষ দয়ার আধার!!

আমি আশীর্ব্বাদ করছি, আজ এই মহামারীর দিনে, এই রাত্রে মা তোমাদের হৃদয়ে নাবুন, ত্রশক্তি তোমাদের বাচতে আসুন। জয় কালী, জয় কালী, জয় কালী। মা নাববেনই নাববেন মহাবলে সর্ব্বজয়—বিশ্ববিজয়; মা নাবছেন, ভয় কি? কাদের ভয়? জয় কালী, জয় কালী। মোদের এক একজনের দাপটে ধরা কাঁপবে। জয় কালী, জয় কালী! আবার onward forward গিয়ে চল, এগিয়ে যাও)! ওরা গুরু, জয় মা, জয় মা, কালী, কালী, কালী। রোগ, শোক, পদ, দুর্ব্বলতা সব গেছে তোমাদের! মহাবিজয়, মহালক্ষ্মী, মহাশ্রী তোমাদের! মাভৈঃ মাভৈঃ। ড়া উতরে গেছে, মাভৈঃ। জয় কালী, জয় কালী!

বিবেকানন্দ

মেয়ে মজলিশ

বর্ষশেষ

"এই বর্ষশেষের শুভ সন্ধ্যায়, হে নাথ, তোমার ক্ষমা হাতে লইয়া সকলকে ক্ষমা করি, তোমার প্রেম হৃদয়ে অনুভব করিয়া সকলকে প্রীতি করি, তোমার মঙ্গলভাব ধ্যান করিয়া সকলের মঙ্গল কামনা করি। আগামী বর্ষে যেন ধৈর্যের সহিত দুঃখ বহন করি, বীর্যের সহিত কর্ম করি, আশার সহিত প্রতীক্ষা করি, আনন্দের সহিত ত্যাগ করি এবং ভক্তির সহিত সর্বত্র সর্বত্র সকলকে করি। হে অনন্ত বিশ্বসংসারের পরম পরমাত্মন্, তুমি আমার সমস্ত চিত্তকে গ্রহণ করো।"

—রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের লেখা এই কথা কয়টী স্মরণ করে আমাদের 'পদ্মভারতী'র মেয়ে মজলিসের সভ্যা ও গ্রাহিকা বোনেদের অভিনন্দন জানাচ্ছি, যাঁদের উৎসাহ ও নানা ভাবে সহযোগিতা পাওয়ায় আমাদের এই বিশেষ ভাগটী সর্ব সাধারণের আনন্দ দান করতে পেরেছে।

আমাদের সামনে নেমে আসছে ১৩৭৮ সালের ১লা বৈশাখ। আমরা সেই নব বর্ষকেও আহ্বান জানাচ্ছি— আজ বর্ষশেষের দিনটীতে আমরা মা বোনেরা প্রার্থনা করবো পুরাতন বছরের যা কিছু অভাব অভিযোগ সব ছুঁড়ে ফেলে নতুন বছরে নতুন পরিকল্পনা নিয়ে নতুন ভাবে রচনা করবো। হাতের কাছে যদি পুরানো বছরের হিসাবের খাতাটী থাকে সেটীও একবার বছর শেষে বের করে রাখবেন সারা বছরে হিসাব নিকাশ কি হল।

এছাড়া আমাদের বাংলাদেশে চৈত্র সংক্রান্তিতে নানা রকম উৎসব, ব্রত অনুষ্ঠানও করা হয়। চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের গাজন হয়। লোকে মানসিক করে কয়েকদিনের জন্যে শিবের সন্ন্যাসী হয়। শিবের গাজন এক বৃহৎ ব্যাপার। ঢাক বাজতে থাকে, প্রচণ্ড গরমে কড়াং কড়াং শব্দ হয়। কোথাও কোথাও অপরাহ্নে চড়ক হয়। সবাই আসে চড়ক দেখতে। কোথাও কোথাও শিবের গাজনের মত ধর্মের গাজন হয়। শিবের গাজনের প্রকৃত ব্যাপার হরকালীর বিয়ে। সন্ন্যাসীরা বরযাত্রী তাদের গর্জনের জন্য 'গাজন' শব্দটী এসেছে। পশ্চিমবাংলায় আবার এই দিনে নীলের ব্রত করেন মেয়েরা সমস্ত চৈত্রমাস ধরে সন্ন্যাস করে শিবপূজা করেন। তারপর সংক্রান্তির আগের দিন, সমস্ত দিন উপবাস থেকে সন্ধ্যায় সব নীলাবতীর পূজো করে নীলকণ্ঠ শিবের ঘরে বাতি জ্বেলে দিয়ে, মা ষষ্ঠীকে প্রণাম করে ব্রতিনীরা জল খেয়ে থাকেন।

'নীলের ঘরে দিয়ে বাতি
জল খাও গো পুত্রবতী।'

এছাড়া বাংলাদেশে চৈত্রসংক্রান্তিতে মেয়েরা জল সংক্রান্তি, অন্নসংক্রান্তি, এয়োব্রত প্রভৃতি ব্রত পালন করে থাকেন। কাজেই চৈত্রমাস বাংলা দেশের অতি প্রিয়মাস। বছরের শেষে সকলের প্রীতি কামনা করেই আমরা বছরটীকে বিদায় দিয়ে থাকি।

"বিগত বৎসর যদি আমার কোনো চিরলালিত অপূর্ণ আশাকে শাখাছিন্ন করিয়া থাকে তবে, হে পরিপূর্ণ স্বরূপ, অদ্য নতমস্তকে একান্ত ধৈর্যের সহিত তাহাকে তোমার নিকট সমর্পন করিয়া নব উদ্যমে পুনরায় বারিসেচন করিবার জন্য প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। তুমি আমাকে পরাকৃত হইতে দিয়োনা।"

গৃহ-সজ্জা

সুরঞ্জনা সেন

"বহুদিন মনে ছিল আশা
ধরণীর এককোণে
রচিব আপন মনে
ধন নয়, মান নয়,
এতটুকু বাসা।"

এই বাসনা শুধু কবির নয়, অনেকেরই। কিন্তু, বাসা টুকু হোক তাতে ক্ষতি নেই, তা যেন হয় পরিষ্কার-ছিন্ন, সুন্দর। তার জন্য আবার গৃহ-সজ্জা সম্পর্কে কিছু না দরকার।

ঘর সাজাবার জন্য যে সব উপকরণ পাওয়া যায় তার সব চেয়ে সস্তা, সুলভ, আর তাড়াতাড়ি ব্যবহারের যোগ্য জিনিস হল দেয়াল-কাগজ। রাণী ভিক্টোরিয়ার যুগে বিশিষ্ট কবি ও চিত্র-শিল্পী উইলিয়াম মরিস দেয়াল-কাগজে নানা মূল্যবান ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। ঘরের ভেতরে কি ক'রে সরল সহজ সৌন্দর্য সৃষ্টি করা যায়, এ বিষয়ে জানীদের কাছেও অনেক কিছু শেখবার আছে।

ঘরের দেয়ালে লাগাবার জন্য আধুনিক নানা ডিজাইনের কাগজ দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। কাগজের নক্সা বা লতাপাতা ফুল ইত্যাদির রং যেন খুব বেশী উগ্র না হয়। চোখের পক্ষে রং যেন প্রীতিকর হয়। ঘরের সবগুলি দেয়ালে, সিলিংএ একই ডিজাইনের কাগজ ব্যবহার করা উচিত। অবশ্য, এই সব বিষয়ে ব্যক্তিগত রুচির দাম অনেকখানি ব'লে বাঁধা ধরা কোনো নির্দেশ দেওয়া সঙ্গত নয়। দেয়াল-কাগজ ব্যবহারের একটা সুবিধা, প্রত্যেক বছর নতুন ডিজাইনের কাগজ ব্যবহার করা যায়। বাইরের পৃথিবীতে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে যেমন গাছপালা নতুন রঙে সেজে ওঠে ঘরের ভেতরেও তেমনি যেন আবহাওয়ার পরিবর্তন আনা চলে। যাদের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল, এবং পয়সা একটু বেশি তাঁরা ইচ্ছে করলে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত ইত্যাদি ঋতুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঘরের ভেতরটা পালটে দিতে পারেন। যাদের ছবি আঁকার হাত রয়েছে তাদের তো আরো সুবিধে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দেয়াল-কাগজের ব্যাপক চাহিদা এবং ব্যবহার রয়েছে। ছাপা হচ্ছে নানা রকম সুন্দর সুন্দর আর আধুনিক ডিজাইনের কাগজ। আমাদের দেশে এর ব্যবহার যে একেবারে নেই তা নয়। নানা পূজা-পার্বণে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এবং উৎসবে দেয়াল কাগজ দিয়ে পূজা-মণ্ডপ, বাঁশের বা কাঠের খুটি, তোরণ ইত্যাদি সাজান হয়। কিন্তু শয্যা কক্ষ বা বাসগৃহ সাজাবার কাজে দেওয়াল-কাগজের ব্যবহার এখনো নিতান্তই সীমাবদ্ধ। আমাদের দেশের মেয়েদের এদিকে একটু নজর দেওয়া দরকার। তাহলে তাদের ঘর যে কেবল স্নিগ্ধ, মনোরম হ'য়ে উঠবে তা নয়, দেয়াল-কাগজ তৈরির ছোট ছোট অনেক কর্ম-কেন্দ্র গড়ে উঠবে। অনেকের আর্থিক সংস্থান হবে।

দেহ ও মনের স্বাস্থ্য অনেকখানি নির্ভর করে ঘরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যের ওপর। পয়সা থাকলেই ঘর সুন্দর রাখা যায় না। এর জন্য দরকার রুচির।

ঘরের দেয়াল কাগজে মুড়ে দিলে যেমন সৌন্দর্য বেড়ে যায়, তেমনি সুন্দর পর্দা দরজা, জানালায় লাগালে বাড়ির চেহারাই যেন পালটে যায়। বাড়ির রং, গঠন ইত্যাদির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পর্দার কাপড় কিনবেন। অনেক বাড়ির মেয়েরা নিজেরাই বেশ সুন্দর পর্দা তৈরী করতে

রেন। এতে কবল যে খরচ কম পড়ে তা নয়, মনের ও পাওয়া যায়

• • •

গৃহ-সজ্জার আরেকটি উপকরণ ছবি। অনেকে ারের রুচিপূর্ণ ক্যালেণ্ডার বা ওই ধরণের ছবি ঘরে দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখেন। মনে রাখবেন, আপনাদের কের বাড়িতেই ছোট ছেলে-মেয়ে আছে। ওই সব র প্রতিক্রিয়ায় তাদের মন বিষময় হ'য়ে উঠতে পারে। সা ক্যালেণ্ডার দেয়ালে টাঙ্গালে ভাল হয়। তবে, ঘরে একটি বা দুটির বেশি ক্যালেণ্ডার না থাকাই সা। দেয়ালে ভালো ছবি টাঙ্গিয়ে রাখার মূল্য য়েই আছে। তবে ঘর বিশেষে ছবির রকম ফের থাকা চায়। যেমন ঠাকুর ঘরে রাখবেন দেব-দেবীর কিংবা -সন্তের ছবি। শোবার ঘরে নানা রকম প্রাকৃতিক বা বড় বড় শিল্পীদের আঁকা ছবির প্রতিলিপি। শহরে কৃতিক পরিবেশের অভাব। তাই দেয়ালে প্রাকৃতিক থাকলে ইট-কাঠ পাথর দেখে দেখে ক্লান্ত চোখ একটু ে পায়। এ ছাড়া দেয়ালে রাখতে পারেন মনীষী-বাণী। শিশু, বয়স্ক নারী, পুরুষ সকলেরই চরিত্র ন, হতাশ মুহূর্তে মনকে চাঙ্গা ক'রে তুলতে, আশার আলো দেখাতে এদের জুড়ি নেই। মাঝে মাঝে বাণীগুলি পাল্টে দিতে পারেন।

যদি সম্ভব হয় একগুচ্ছ ফুল রাখবেন। যাদের স্থান-সমস্যা, তাঁরাও টবে ফুলের চর্চা করতে পারেন। ফুলের জীবন্ত সাহচর্য গৃহের সৌন্দর্যের অনেক সহায়ক। প্রকৃতির সঙ্গে মনের সমাবেশের সুযোগ দেয়।

গৃহ-সজ্জার আরেকটি প্রয়োজনীয় দিক আসবাবপত্রের বিন্যাস। আলমারী, খাট, টেবিল, চেয়ার, আলনা ইত্যাদি সাজিয়ে গুছিয়ে যার যার জায়গায় রাখবেন। ঘরে যেখানে সেখানে জিনিষ-পত্র ফেলে না রেখে ঠিক ঠিক জায়গায় রাখা উচিত। সাজানো ঘর ছন্দবদ্ধ কবিতার মতো। প্রসাধনের টেবিল একটু আড়ালে থাকাই ভালো। ঘরে বই রাখার জন্য যেমন বুককেস থাকবে তেমনি চায়ের সাজ-সরঞ্জাম রাখার জন্য একটা ছোট শেলফের ব্যবস্থা থাকবে। অতিথিদের জন্য গোটা ক'য়েক সুন্দর কাপ ডিস রেখে দিলে ভালো হয়। আর, ঘরের সামনে থাকবে একখানা পায়োদ।

মনে রাখবেন ঘর আপনার মনের রুচির প্রতিফলন, ঘর আপনার নিজস্ব পৃথিবী। তাই নিজে সুন্দর হতে গেলে, তাকেও সুন্দর ক'রে তুলতে হবে।

ঘর না ফুলের বাগান

প্রতিমা চক্রবর্তী

আপনি কি সারাটা বছর নিজের ঘরে বসন্তের কোন ছোঁয়া রাখতে চান? তাহলে পুরানো একটা হাতেই তা করুন না। ফুল পাতা ঘাস ইত্যাদি অতি রণ উপকরণের সাহায্যেই তা সম্ভব। এই সব ফুল ঘাস আপনার নিজের বাগানে বা বাড়ির আশেপাশে ই পেতে পারেন।

কারিগরও প্রয়োজন হয় না বা পয়সা খরচের ব্যাপারও নেই। যে ঘর বেশ শুকনো, তার সিলিং থেকে ঘাস পাতা বা ফুল তোড়া করে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখুন। আর চন্দ্রমল্লিকা জাতীয় ফুল কাঠের বাক্সে বালির মধ্যে রেখে বালি দিয়ে ঢেকে রাখুন। অন্ততঃ চার পাঁচ দিন।

ফুলগুলি যখন বেশ শুকিয়ে যাবে, তখন আলবে

যে সাদা ফুলগুলি শুকিয়ে তাতে রং করলেই রং বেশী খোলে এবং সাদার ওপর প্রত্যেক রং করার পক্ষে সুবিধা। আর যদি ঘন রং দিতে চান তাহলে শুকনো রঙিন ফুলেই তা ব্যবহার করবেন। অবশ্য কি রং দেবেন তা নির্ভর করবে আপনার রুচি শিল্প-সম্মত কিনা তার উপর। রং লাগাবার আগে হাতে রবারের দস্তানা লাগিয়ে নিতে পারেন তাতে আপনার হাতে রং লাগবার ভয় থাকবে না।

শুধু ফুল কেন, চেঁকিশাক, খেজুরের পাতা, কেয়াফুল পাতা, নানাপ্রকার বড়ো বড়ো ঘাস যার আগাগুলি খুব নরম, ইত্যাদি শুকিয়ে নিলেও দেখতে বেশ লাগবে। তিন-ভাগের দুভাগ জল আর তিন ভাগের একভাগ গ্লিসারিন মিশিয়ে তাতে এইসব পাতা, এবং ঘাস সপ্তাহ-খানেক ভিজিয়ে রেখে তারপর তুলে নিন।

এরপর ইচ্ছে করলে আপনি রংও করতে পারেন, নিজের খুশীমতো, কিংবা প্রকৃতির যাতে যে-রকমটি দেখা যায়।

শুধু ফুলের রং নয়, সৌরভকেও যেন কিছুটা সময় ধরে রাখা সম্ভব। এই করতে গেলে গোলাপ, যুঁই, ইত্যাদি ফুলগুলির পাপড়িগুলি শুকিয়ে নিতে হবে। তার-পর বিস্তির আতরে সেই ফুলগুলিকে ডুবিয়ে নিন।

বাগানে ফুল নেই। ঘরে বাইরে সর্বত্র রঙের অভাব? তাতে ভয় কিসের? আপনার ঘরে তো এখন ঘাস-পাতা ফুলের ছড়াছড়ি, শুধু চেহারায় নয়, বর্ণে গন্ধেও তারা আসলের কাছাকাছি। দোকান থেকে প্লাস্টিক কিংবা কাগজের তৈরী ফুল না কিনে শুকনো ঘাস ফুল-পাতা দিয়ে মনের মতো করে ঘর সাজিয়ে দেখুন এতে কতখানি আনন্দ, আর তৃপ্তি।

বাগানে ফুল নিশ্চয়ই সুন্দর। কিন্তু কতটুকুই বা তার আয়ু। কিছু কিছু ফুল তো ভোরের শিশিরের মতোই ক্ষণস্থায়ী। দেখতে দেখতেই শুকিয়ে যায়। কিন্তু ঘরে ব'সে অতি সহজে আপনি যে ঘাস-ফুল-পাতা মনোহারী ক'রে তুললেন তা আপনি রেখে দিতে পারেন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এমনকি বেশ কয়েক বছর, তবু মনে হবে না তার পাপড়ির রং, মিলিয়ে হবে না তার সৌরভ। কারণ তা আর শুধু প্রকৃতির সৃষ্টি নয়, আপনারও রচনা। এই কারণেই এই শিল্পটি পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই ইতিমধ্যে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

আপনার মনের মাধুরী মিশিয়ে যে ফুল-পাতা ঘাস আপনি রচনা করেছেন তা ব্যবহার করতে পারেন নানা-ভাবে। যদি আপনি পুষ্প-বিলাসী হন, কিংবা কোনো ফুলের স্মৃতি নয়, ফুলটিকেই বহুদিন রেখে দিতে চান তাহলে সেই ফুলটিকে ওই ভাবে শুকিয়ে নিয়ে রং ক'রে আসবাবে রেখে দিতে পারেন। যেমন ক'রে আপনি ফটো রাখেন। এই ধরণের অভিনব আসবাব প্রিয়জনকে উপহার দিয়ে আপনি তাকে বিস্মিত শুধু নয়, আনন্দও দিতে পারেন। উজ্জ্বল বর্ণের ফুল ফ্রেমে ছবির মতো করে বাঁধিয়ে দেয়ালে টাঙিয়ে রেখে দেখবেন আপনার ঘরের চেহারাই পাল্টে গেছে। আজে-বাজে ছবি টাঙিয়ে রাখার চাইতে অনেক ভালো লাগবে। কাচের আবরণের আড়াল থেকে ছবিগুলি হাসি-খুশী মুখে আপনার দিকে তাকিয়ে থাকবে। তবে ফুলের রঙের সাথে যাতে ফ্রেমের রং বেশ মানানসই হয় সে-দিকে লক্ষ্য রাখবেন। সাদা ফ্রেমে অনেক ফুলের বেশ রং খোলে। শুকনো ফুল কিংবা পাতা চা বা কফির টেবিলে রেখে কাচের আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখুন, দেখবেন আপনি এবং আপনার অতিথি উভয়ই মুগ্ধ আর অপলক হয়ে তাকিয়ে থাকবেন। আপনার তৈরী ফুল সুন্দর টবে সাজিয়ে রাখুন; বহুদিন আপনার ঘরের আবহাওয়া সজীব, মনোহর রাখবে। টবে আবার ফুল ক'রে জল দেবেন না যেন। দেখুন তো কত সুবিধা। টবে তবে ওই ফুল জানালায় কিংবা বিছানার ধারে টিপয়ে রেখে দিতে পারেন। আর যত্নের ব্যবস্থাও তো আগে থেকেই ক'রে রেখেছেন। বৃষ্টির জন্য বাইরে বেরুতে পারছেন না? তাতে কী হয়েছে, আপনার ঘরখানাকেই তো সুন্দর একটি ফুলের বাগান ক'রে রেখেছেন।

অস্বাভাবিক মোটা যারা তারা কত অসহায়।

অতিরিক্ত মোটা হয়ে উঠলে নিজের চলাফেরা করতে অসুবিধা হয়, তাছাড়া অন্যের বিদ্রূপ শুনতে হয়। কিন্তু যাঁরা মোটা তাঁরা যে কতটা অসহায় সে বোধ কজনের থাকে? কম খেলেই যে রোগা হয়ে যাবেন এই ধারণা কিন্তু অত্যন্ত ভুল। তাতে শরীরের ভেতরটা দুর্বল হয়ে যায়। মুখে নানা রকম দাগ হয়, ছোপ পড়ে, চোখের কোলে কালি পড়ে, মুখে ক্লান্তির ছাপ ফুটে ওঠে। আর সবচেয়ে বড় কথা নানা রকম রোগে ধরে। সব থেকে আগে হবে রক্তাল্পতা কিম্বা অ্যানিমিয়া। তার চেয়ে ভাল যেটুকু খান পুষ্টিকর খাদ্য খান। তবে সর্বপ্রথমে আপনাকে ষ্টার্চ বা শর্করা জাতীয় খাবার একেবারে মন শক্ত করে পরিহার করতে হবে। আর মিষ্টিও খেতে পাবেন না। একটু কষ্ট হবেই. তবে ধীরে ধীরে অভ্যেস হয়ে যাবে। একেবারে যদি শুধু প্রোটিন জাতীয় খাবার খেতে পারেন তবে অতি সহজেই মেদ কমিয়ে ফেলতে পারবেন।

ভোরবেলা পুরো একটি লেবুর রস এক গ্লাস উষ্ণ উষ্ণ জলে মিশিয়ে দু চামচ মধু দিয়ে খেয়ে নিন। এতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হবে। মেদ কমে যাবে; ত্বকও মসৃণ হবে।

এবার ব্যায়াম সুরু করুন—

(১) দুই পা ফাঁক করে দাঁড়ান, দুই হাত দু পাশে ছড়ান—একবার বড় করে নিঃশ্বাস নিন, সেই সঙ্গে পায়ের গোড়ালি তুলুন, হাতও যতটা পারেন উঁচু করুন; এবার নিঃশ্বাস ছাড়ুন, পা নামান হাতও নামান। খোলা জানালার সামনে এটি দশবার অভ্যাস করুন। এতে কোমর, পেট, হাত, পা সবেতেই নাড়া পড়বে। এটি সর্বাঙ্গীন ব্যায়াম।

(২) ঐভাবে পা ফাঁক করে দাঁড়ান, দুই হাত সোজা করে মাথার সমান্তরাল ভাবে ওপরে তুলে রাখুন, এবার দেহের ঊর্ধাংশ একেবারে সোজা রেখে ধীরে ধীরে নীচু হোন। হাত দিয়ে মাটি ছুঁয়ে পায়ের ফাঁক দিয়ে পেছনে তাকাতে পারবেন এই ভঙ্গীতে আসুন। একবারেই পারবেন না, ধীরে ধীরে পারবেন। প্রথম দিন মাত্র তিন বার অভ্যাস করুন। যখন নীচু হবেন তখন পা একেবারে সোজা থাকবে, আর নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে নীচু হবেন, মাটি ছুঁয়ে থাকবেন এক মিনিট সমস্ত নিঃশ্বাস একেবারে বের করে দেবেন। একবার বড় করে নিঃশ্বাস নিয়ে যতটা পারেন পেটটি ভেতরে টেনে নিয়ে উঁচু থাকুন। খুব ধীরে ধীরে উঠবেন একেবারে টান হয়ে দাঁড়ান। তারপর ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছেড়ে দিন। তাতে করে ভুঁড়ি কমে গিয়ে পেটের গড়নটি সুন্দর হবে। তাছাড়া সমস্ত দেহেরই অবাঞ্ছিত মেদ করে গিয়ে দেহটি নিটোল হবে। এই আসনটি বড় কঠিন। ধীরে সুস্থে অভ্যাস করবেন।

(৩) মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ুন। দুটি পা ওপরে তুলুন। একেবারে ওপরে তুলতে হবেনা। সামান্য তুলে পা ঘুরিয়ে একবার বাঁদিকে ফেলুন, তারপর ডানদিকে ফেলুন। মাথা আর হাত মাটি ছুঁয়ে থাকবে। উঠবেন না; এতে পেটের চর্বি খুব তাড়াতাড়ি করে যাবে। ভুঁড়ি কমে যাবে।

(৪) এবার বাঁ পাটি তুলুন, সেটি ঘুরিয়ে নামান। বার তিনেক করুন। আবার ডান পা তুলুন। কয়েক বার ঘুরিয়ে নামান।

(৫) পাশ ফিরে শুয়ে পড়ুন। ধনুকের মত বেঁকে যান। মাথার ওপর দু হাত তুলুন,বাঁ পাশে ফিরে বাঁ হাতে মাথা দিয়ে শুলে ডান হাত ধীরে ধীরে নামিয়ে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল ছুঁইয়ে দিন; আবার আগের অবস্থায় ফিরে যান। আবার ছুঁইয়ে দিন। তবে হাত পা সোজা নামবে উঠবে, ভাঁজ হবে না। ওতে কোমর সরু হবে। ঠিক এই সেটএর ব্যায়াম আবার ডান পাশ-ফিরে করুন।

(৬) উঠে পড়ুন সোজা হয়ে দাঁড়ান। শুধু আঙুলে ভর দিয়ে কয়েক পা হেঁটে আসুন। প্রতিটি ব্যায়ামের মাঝখানে এমনি করে কয়েকবার হেঁটে নেবেন। এতে নিতম্ব সুডৌল হবে আর দেহ বিশ্রাম পাবে।

এবার এই কটি ব্যায়াম অভ্যাস করুন, পরে আরও জানাব।

খাওয়া। যারা সত্যিই খুব শীঘ্র রোগা হতে চান শুধু প্রোটীন ফুড নিন। ভাত, রুটি, বিস্কুট, পাঁউরুটি একেবারে সব বন্ধ করে দিয়ে সারাদিনে এক পো মাংস খান। সবজির মধ্যে আলু, রাঙ্গালু, কুমড়ো, কচু এসব বাদ। শাক খাবেন। তেল ঘি বর্জিত রান্না খাবেন। আর ছানা খেতে পারেন। তবে মিষ্টি একটুও নয়। চায়েও চিনির বদলে স্যাকারীন খান। দই বা পাতলা দুধ খান, সব মিলিয়ে আধসের। ভাত মাখন তোলা দুধ ফলের মধ্যে কলা বাদ। মুসুম্বি, পেঁপে, কমলা লেবু খেতে পারেন।

সকালে ডিম খান একটি আর চা। একটু বেলায় কফি খান এককাপ। কিম্বা চা। তারপর দুপুরে আধপো মাছ, বা আধপো মাংস, একটু স্যালাড আর একটা সবজি একটু ডাল আর দই। মাংসের চর্বি বাদ দেবেন। বিকেলে, শুধু চা, আর একটু ছানা। আবার রাত্রে মাছ-মাংস আধপো আন্দাজ সঙ্গে সবজি আর দই নিন। একমাস যদি এইভাবে খেয়ে যান,—দেখবেন কত শীঘ্র মেদ কমে গিয়ে রীতিমত পুষ্ট হয়ে উঠবেন। অথচ শরীর ভাঙবে না। ভেতরে যথেষ্ট বল পাবেন। অসুখও ধরবেনা; বরং পালাবে। সবগুলি ব্যায়াম কিন্তু এক-সঙ্গে অভ্যাস করবেন না। সুবিধা মত বেছে নিন যেটি সহজ মনে হয় এমন দুটি তিনটি নেকে প্রথমে আরম্ভ করুন।

যুগে যুগে প্রসাধন

জ্যোতির্ময়ী দেবী

মুখে তার লোধ্রেণু কুরুবক মাথে" কালিদাসের কালের মেয়েদের সাজসজ্জা প্রসাধনের কথায় কবি বলেছেন। এবং হাতে আছে লীলাকমলও। (লোধ্রেণু হ'ল কোনো গাছের ছালের গুঁড়ো সেকালের পাউডার; কুরুবক হ'ল কাঁটিফুল)।

এ হ'ল দুহাজার বছর আগের প্রসাধন। পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতেও নরনারীর নানারকম প্রসাধন সামগ্রীর নাম পাওয়া যাবে। কিন্তু সে কথা যাক। আসলে মানব ও মানবী চিরকালই সাজতে ও দেহকে সাজাতে ভালবাসে এই কথাটাই চিরন্তন সত্য। সহনা অলঙ্কার আলতা-চন্দনে তেল-সিঁদুরে ফুলের মালায় পাখীর পালকে পুঁথি পাথরের মালায়—কিসে নয়? আবার কালে রুচিও বদলায়।

তেল চুকচুকে মুখ ও মাথার চুল একালের মানুষের অপছন্দ। এখন সদ্য শুভ্র ধবধবে চামড়া রুক্ষ রুক্ষ ফুলো ছাপা চুলের ফ্যাসান। এই হলো আজকালকার হাওয়া।

অথচ আমাদের মাতামহী পিতামহীরা তেলে জলেই চুল এবং শরীরের শোভা দেখতেন। চুলে তেল দিতেন তাতেও শানাতো না, তখন মোম দিয়ে পেটো পেড়ে আঁট সাঁট করে চুল বাঁধতেন সিঁথিকেটে। উল্কো খুল্কো রুক্ষ মাথা হ'ল 'অলক্ষী ছিরি'। চুল হবে তেলা, খোঁপা হবে মস্ত, তাতে দেওয়া হবে গুঁজিকাঠি (কাঁটা), সোনা ও রূপার ফুল। এবং বাহিরেও ফুল ও মালা। এই হ'ল চুলের সাজ। সামনের চুলের লতাপাতায় বাহারের ভাবনা তাঁরা ভাবতেন না। সেখানে তো আবক্ষ ঘোমটা। মস্ত খোঁপাই হ'ল আসল বস্তু।

তাঁদের সময়ে সাবানের খুব চলন ছিল না এবং সাবানে চর্বি থাকে তাই সাবানটা অশুচিও মনে করা হত। বিশেষ করে বিধবা, ব্রহ্মচারিণী, নিষ্ঠাবতী সধবারাও সাবানকে অস্পৃশ্য পর্যায়ে রাখতেন। এখনো পূজা বার ব্রত পালনের দিনে তাঁরা অনেকেই সাবান ছোন না। তাহলে কি ছিল তাঁদের দেহ ও চুল পরিষ্কারের উপাদান?

ছিল সরিষার খোল, বেসম, রিঠায় ফেনা, গা মাখা ঘসতে। এই গুলিই তাঁদের স্নানের ঘরে, (না সেকালে ঘর কোথা) পুকুর ঘাট ঘুরোতলায় বা নদীতীরে স্নানের পরিচ্ছন্নতার উপকরণ। কখনো কখনো গঙ্গামৃত্তিকা, ব্যবহার করতেন যাঁরা শুচিগ্রস্ত বেশী। মাথার আটা তুলতে গঙ্গামাটি বা খোল ব্যবহার হত। রিঠা ফলের জলেও খুব সাবানের মত ফেনা হয়। সেও ময়লা ছাড়ায়। গায়ে খোল ও বেসম মেখে তারা তেলও ছাড়াতেন। ফর্সাও হতেন নাকি।

যত কুন্দ ধবল ও মুক্তা শ্রেণীর মত দাঁতের কথা কাব্যে থাকনা চার পুরুষ (চার নারী ?) আগের গৃহিণী এবং আমরা কন্যারা দাঁত সাদা পছন্দ করতেন না, দাঁত সাদা কাদাখেকে যেন মড়ার দাঁত। তাই দাঁতে মিশি দেওয়া হ'ত। মিশিটা হ'ল তামাক গোক্তা ও সুগন্ধ মত মসলা মিশানো কিছু গুঁড়ো। এখনো হিন্দুস্থানী অনেক শ্রেণী ও কিছু বাঙ্গনারীদের মধ্যে ঐ মিশি ব্যবহারের চলন আছে। আর ছিল পান খাওয়া। পান খেয়ে ঠোঁট রাঙা করার নিয়ম। অধরে ঠোঁটে আলতা রংয়ের চেয়ে পানের রংটাই খুব চলন এবং সহজ, সব সময়ের জিনিষ ছিল। গৃহিণীরা কম বয়সের বধূ কন্যাদের অনুযোগ করে বলতেন, 'বাছা পান খেলে তো ঠোঁট লাল হয়নি কেন ?' পানে ঠোঁট রাঙা হওয়া চাই তাঁদের। যাঁরা মিশি ব্যবহার করতেন না, পান নিশ্চয়ই খেতেন।

আলতা চিরকালের (কতকালের জানিনা) প্রসাধন হাত পা রাঙাতে ; 'লিপষ্টিক' বা 'নেল-পালিশে'র পূর্ব-পুরুষ। ভারতের সর্বত্রই নামটা আছে। কিন্তু পায়ে আলতাপরা সৌভাগ্য ও প্রসাধন হিসাবে বাংলা বিহার উড়িষ্যা প্রদেশেই চলে। কিন্তু উত্তর প্রদেশের ব্যবহার আছে। বেশী শীতের দেশে পাঞ্জাবে রাজস্থানে আলতার চেয়ে মেহেদীর পাকা রং ব্যবহারের চলন। সেটাও সৌভাগ্যবতীর প্রসাধন।

চন্দন কুঙ্কুমাদির ব্যবহার শুধু দেবকার্যেই বেশী।

সুগন্ধ তেলের ব্যবহার একালে যত হয়েছে সেকালে তা ছিলনা। "মাখা ঘসা" নামের নানারকম বেনে মসলা দিয়ে নারিকেল তেল সুগন্ধি করা হত। এবং সেটা আবার সৌভাগ্যের মাঙ্গলিক অঙ্গবস্তু বটে। তবে এগুলো তত-তাবাসে সিন্দুর আলতা, 'মাখা ঘসার' পাতা কোঁকড় বা লাল শাঁখা নাহলে মাঙ্গলিকী সম্পূর্ণ হয় না। [illegible] বোতলে শিশিতে কুন্তলীন জবাকুসুম কেশরঞ্জনী [illegible] হোক। তবুও আলতাও সেদিনের জিনিষ।

যে দেশে নারিকেল তেল না চলে সেখানে [illegible] তেল নামে সুগন্ধি তেল চলত, তিলের তেল [illegible] আতরের গন্ধ মিশিয়ে। কিন্তু এতে চুল শীঘ্র [illegible] যায়।

কাজল বা সুরমা। চোখের প্রসাধন। এও চির-কালের। পুরাণের কাল থেকে আছে নানা নামে, নানা প্রয়োজন নিয়ে।

কাজল

বৈদ্যমতে কাজল অনেক রকমের—রসুন-কর্পূর তেল বা ঘিয়ের ভুষাতে মনসা পাতা বা পানে ঘি ও তেলে মিশিয়ে করে। পণ্ডিতে বলে, কাজল পরাটা চোখের রূপও বাড়ায়। কাজল নয়নকে আরো কজ্জলিত করে। চোখের পল্লবকে গভীর কালো দেখানোর জন্য। কেউ কেউ ভ্রূতেও কাজলের রেখা আঁকে। চোখের পারিপার্শ্বিক শোভা বাড়ে তাতে।

উল্কী

এটাও এক সময়ে অনেক জায়গায় প্রসাধনের অঙ্গ ছিল। কপালে উল্কীর টিপটা চিরস্থায়ী। কাজলের টিপের মত করে টীপ থাকবে। হাতে পায়েও উল্কীর গহনা আঁকা হত। এগুলি সর্বত্র নয় প্রায় নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে সৌখিনতার ব্যাপার।

ফাটাচটা

হাত পা শীতের দিনে ফেটেচটে গেলে তাঁরা শীত-কালে সরষেবাটা মাখতেন। সেটা এখনো লোকে মাখেন। স্নো ক্রিমটাও। আর ঘরে একটি জিনিষ তাঁরা করতেন

ম গলিয়ে তেল মিশিয়ে একটু সুগন্ধ করা নাম মিষ্টলেদ"। নারিকেল তেলেও কাচা কমায়।

শীতকালের দিনে সেদিনের মেয়েরা শীতের প্রকোপ ক নিজেদের সৌন্দর্যকে কি ভাবে রক্ষা করতেন তা অন্ধকার মেয়েরা অনেকেই জানেন না। শীতের রতেই তাঁরা সুরু করতেন বেশ করে সারা শরীরে ট সরিষার তেল মাখতে। বেশ ভাল করে ধরে ধরে ন মালিশ করতেন এমন করে যে ত্বক সুন্দর মসৃণ ও তেলেই থাকতো। কেউ কেউ নারিকেল তেল বা পাইর তেলও মালিশ করতেন। ত্বকের সজীবতা ও নীয়তা এতটুকুও নষ্ট তো হবে না বরং বাড়বে।

মটর বা মুসুরীর ডাল অনেকক্ষণ ধরে ভিজিয়ে রেখে । বেটে মুখে ও দেহের অন্য বিশেষে বেশ ভাল করে পের মত মেখে রাখতো তারপর পরিষ্কার করে ধুয়ে ন, দিতো। এতে মুখশ্রী সুষমামণ্ডিত হতো. ত্বক ঝকে ও উজ্জ্বল হত।

সরিষার তেলের সঙ্গে কাঁচা হলুদ বাটাও মাখতেন নের মেয়েরা। তাতে করে ত্বক মেচতা মলিনতা বা তা বা বলিরেখা থেকে মুক্ত থাকতো। মুখে ও সারা র সৌন্দর্য্য ফুটে উঠতো।

সেদিনের মেয়েদের স্বাস্থ্যও ছিল সৌন্দর্যও ছিল। রের কাজে সব সময়ই ব্যস্ত থাকার দরুন যে দৈহিক শ্রম করতেন তাঁরা তাতে তাঁদের শরীর পটু থাকতো। ন কোন ব্যাধি আক্রমণ করতে পারতোনা। কাজে ই স্বাভাবিক সৌন্দর্যও অটুট থাকতো।

এছাড়া রয়েছে গহনার প্রসাধন।

এরও রূপ এবং রুচি বদলেছে। নাক কান বিঁধিয়ে গহনা পরার জায়গা উঠে আসছে। সোনার দাম বাড়ার সঙ্গে গহনার ওজনের হালকা রুচি এসেছে। পায়ে গহনার চলন বাংলা দেশে প্রায় নেই। শুধু বিয়ের কনের পায়ে মল লাগে। কোমরের গহনা—সেই সব চন্দ্রহার, সূর্যহার গোট, মেখলা আদি সেকেলে পর্যায়ের গহনা। পিঠে 'পিঠ ঝাঁপা' নামে একটা গহনা ছিল। সেটাতে অনেক ঘুমকো এবং খামি থাকত বৌয়েরা নড়লে চড়লে বাজত। সেটার নামই এখন অনেক লোক জানেন না।

ওপর হাতের তাবিজ বাজু জসম অনন্ত তাগা আদিও, চল ও অচলের মধ্যের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রতিমার মত মুকুট প্রায় অচল। মোগল বেগমদের মত কাঁপটাও অচলের পর্যায়ে। সিঁথি কপাল পাটী অপারেশন।

চমৎকার সাতনরী সাতলহরী হার বুক ভরা সুন্দর সরস্বতী হার, দেবী প্রতিমার কণ্ঠের মত ; সেও অবলুপ্ত হয়েছে। বড় বড় জহরীর দোকানেও আর খোঁজ মিলবেনা তার।

প্রসাধনের অলঙ্কারের সাজ সজ্জায় রুচি বদলেছে, যাদের কাণের কথা লিখলাম তাঁরা এখন মিউজিয়মে মর্যাদার ধনে।

'সরস্বতী' 'মোমফুল' 'মিনি' এখন প্রায় মিউজিয়মের বস্তু। কারুর আসতা এখনো আছে অন্য নামে আর নিজ নামেও।

এছাড়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নানা ধরণের প্রসাধন দ্রব্য আছে আবহাওয়া ভেদে।

গল্প ভারতী

ষষ্ঠবিংশতিতম বর্ষ।
প্রথম সংখ্যা ॥
আষাঢ় ॥ ১৩৭৭

লিলি ব্র্যাণ্ড বার্লি

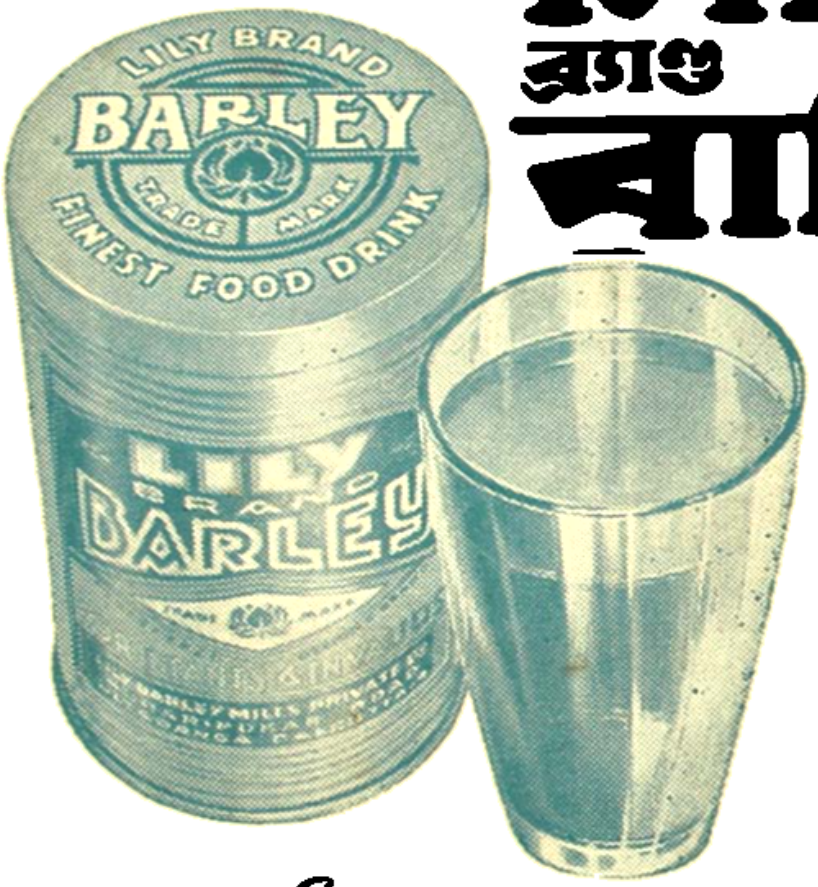

আপনার পরিবারের স্বাস্থ্য রক্ষা করে।

- ডাক্তাররা "লিলি" ব্র্যাণ্ড বার্লি পান করতে বলেন।
- স্বাস্থ্যবান, শিশু, অথর্ব, রুগ্ন ও রোগের পর দুর্ব্বল ব্যক্তি—এদের সকলের পক্ষেই এটি এক পুষ্টিকর পানীয়।
- গ্রীষ্মে এটি এক সুস্বাদু, শীতল পানীয়।
- বাছাই করা সুপক্ক বার্লি থেকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তৈরী।

স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য
লিলি ব্র্যাণ্ড বার্লি

বিবি বাবি মিলস্ প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-৪

LILY

শুধুই কেশ তৈল নয় একটি কেশ রসায়ন

সাধনা আমলা

সুবাসিত আয়ুর্বেদীয় কেশ তৈল

অতুলনীয় গুণাবলীর জন্য যুগ যুগ ধরে সুবিদিত

আমলকীই ইহার প্রধান উপকরণ

কেশের পুষ্টিসাধন ও কেশমূল সুদৃঢ় করে। কেশের সজীবতা ও স্বাভাবিক বর্ণ ফিরিয়ে আনে। কেশপতন ও অকালপক্বতা রোধ করে প্রকৃতিক সুন্দর কেশোদ্গমে সহায়তা করে। মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ ও কর্মক্ষম রাখে।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা
কলিকাতা-৫

SA-2/69

গল্প ভারতী

ষড়্‌বিংশতিতম বর্ষ
দ্বিতীয় সংখ্যা ॥
শ্রাবণ ॥ ১৩৭৭

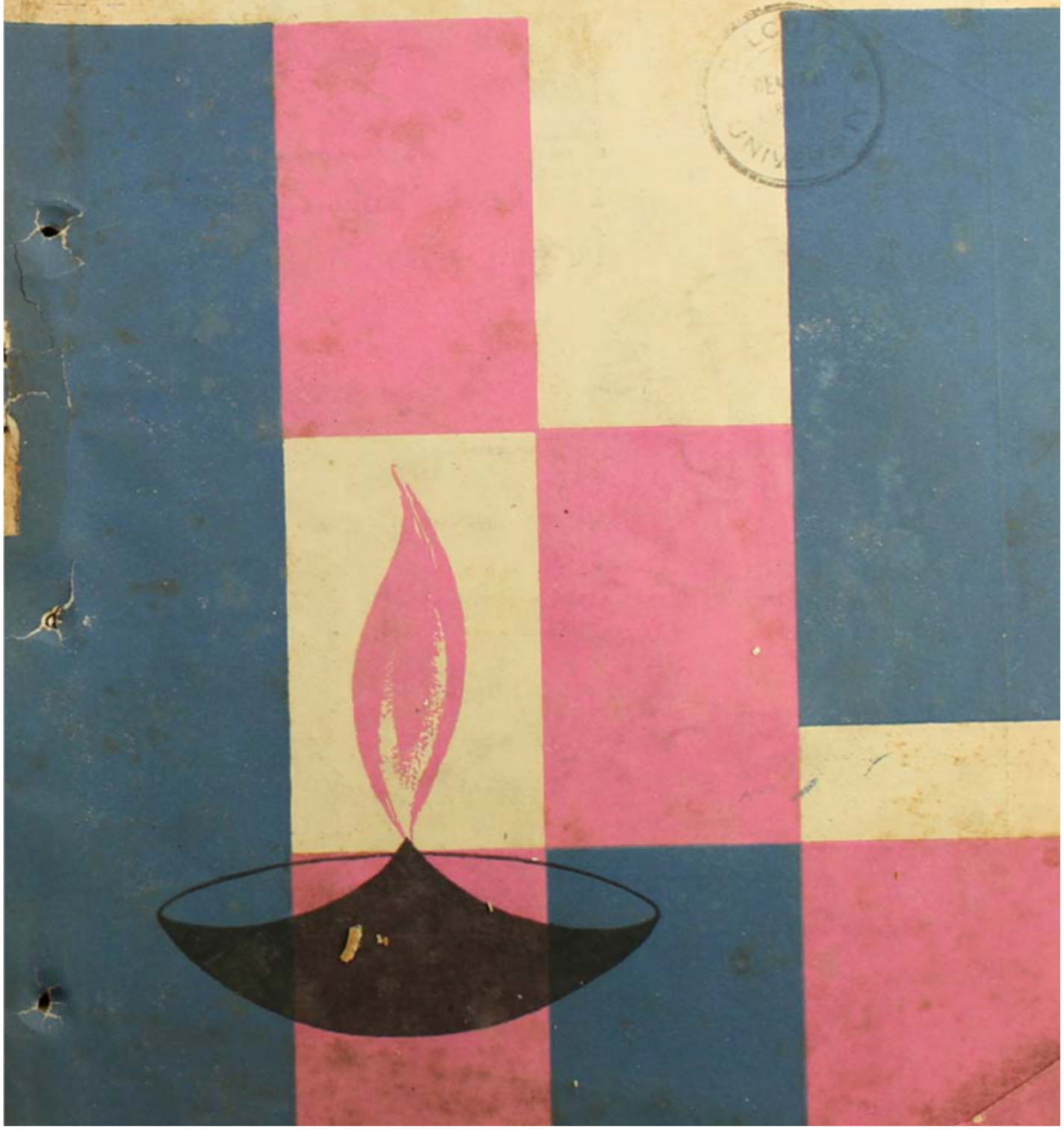

৬৫ বছর ধরে জনপ্রিয়-
আজও সবার সেরা

লিলি'র
থিন এরোরুট
বিস্কুট

লিলি বিস্কুট কোম্পানি (প্রাঃ) লিঃ • কলিকাতা-৪

LC-16

শুধুই কেশ তৈল নয় একটি কেশ রসায়ন

সাধনা আমলা

সুবাসিত আয়ুর্বেদীয় তৈল

অতুলনীয় গুণাবলীর জন্য যুগ যুগ ধরে সুবিদিত

আমলকীই ইহার প্রধান উপকরণ

কেশের পুষ্টিসাধন ও কেশমূল সুদৃঢ় করে। কেশের সজীবতা ও স্বাভাবিক রঙ ফিরিয়ে আনে। কেশপতন ও অকালপক্কতা রোধ ক'রে মনোরম সুন্দর কেশোদ্গমে সহায়তা করে। মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ ও কর্মক্ষম রাখে।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা
কলিকাতা

15 SEP 1979

মন খুশীতে ভরে যায়

লক্ষ্মী ঘিয়ে তৈরী
খাবার খেলে
মন খুশীতে
ভরে যায়

লক্ষ্মী ঘি

খাদ্যদ্রব্য
সুস্বাদু
ও
প্রীতিকর
করে

শুধু উৎকর্ষ নয় সুরুচির পরিচায়ক

LG 11/79

...প্ত ভারত

সুন্দর ...

পালী সংখ্য
১৩৭৭

...NTHAI
LIBRARY
UNI...

C3643

বাটার শো-উইন্ডোর আড়ালে

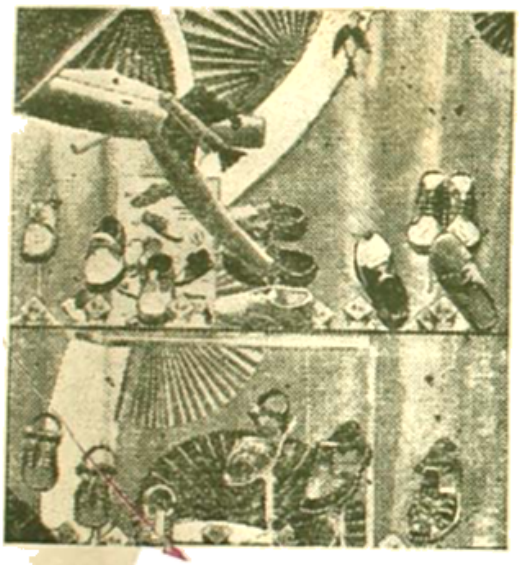

বাটার যে-কোনো শো-উইন্ডোই আপনাকে আকৃষ্ট করবে। চকচকে আধুনিক ডিজাইন হলেও এক সম্পূর্ণ নতুন জগতে। চোখের সামনে ভেসে উঠবে সবিস্ময়ে আবালবৃদ্ধবনিতা সবারই পায়ে সুন্দর ফিটফাট জুতো, যেন সবাই এক্ষুণি ঐ শো-উইন্ডো থেকে বেরিয়ে এলেন।

কিন্তু কী আছে ঐ শো-উইন্ডোর আড়ালে? আছে বাটার উৎপাদন এবং হাইলি বিল্ডিংগুলো।

আছে ২২,০০০ নিপুণ কর্মীর এক বৃহৎ বাহিনী কারখানায় কারখানায় প্রতি আধুনিক যন্ত্রপাতি তৈরি হচ্ছে ১,০০,০০০ জোড়া জুতো প্রতিদিন। আধুনিক ৩৫টিরও বেশি এশিয়া ও ইউরোপের এই উৎপাদন—উৎসেও প্রতি বছর ৩ কোটি ৮০ লক্ষ শিল্পীকারিগরের বাস্তিগত উদ্যোগ সবচেয়ে সুন্দর সাক্ষী।

আরো আছে ১১০০টি বাটার দোকান ও এজেন্সি যেখানে ৬৩০টি বিভিন্ন এশিয়া পাইকারি বিক্রয়কেন্দ্র, ডিলার এবং ডিস্ট্রিবিউটর আছে লোকমুখে-দোকানে বিশ্বকর্মীদের সমস্ত কলাকৌশল দুই—ইঞ্চিকে পায়ে-পায়ে ঠাঁই খুঁজতে দেন ১,৮০০টি জুতো।

শুধু বাটা জুতোর কারখানের জন্য গড়ে উঠেছে আধুনিক ও সুপরিকল্পিত উপনগর। বাটা যে কেবল ভারতের জন্যই জুতো তৈরি করেন তা নয় সারা ভারতেই এমনকি পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলিতেও, তাদের জুতোর জন্য বছরে এই ধরনে তৈরি হয় ১০,০০০,০০০ জোড়া জুতো।

এই পরিচয় যথেষ্ট।

ভবিষ্যতে আরো বিশদভাবে বাটার উৎপাদন সম্বন্ধে বলবার ইচ্ছে রইলো আমাদের—আশা করি আবার দেখা হবে।

Bata

সদ্য বিকশিত গোলাপের মত সুন্দর আনন ও
কুসুম কোমল
পাপড়ি পেলব তনু

সাধনা বিউটি ক্রীম-এর
এইতো সবচেয়ে বড় অবদান।
নিজেদের সৌন্দর্য্য সম্পর্কে
সচেতন আধুনিকারা তাই
এর প্রশংসায় মুখর।

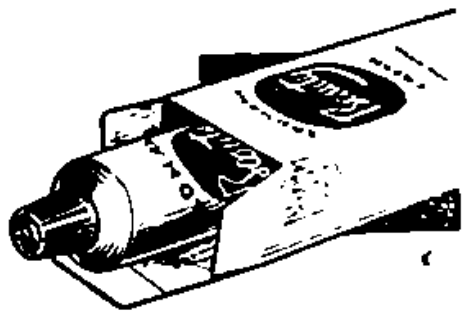

সাধনা
বিউটি
ক্রীম

রূপসাধনায় অপরিহার্য্য
অতি আধুনিক অবদান

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা ● কলিকাতা-৪৮

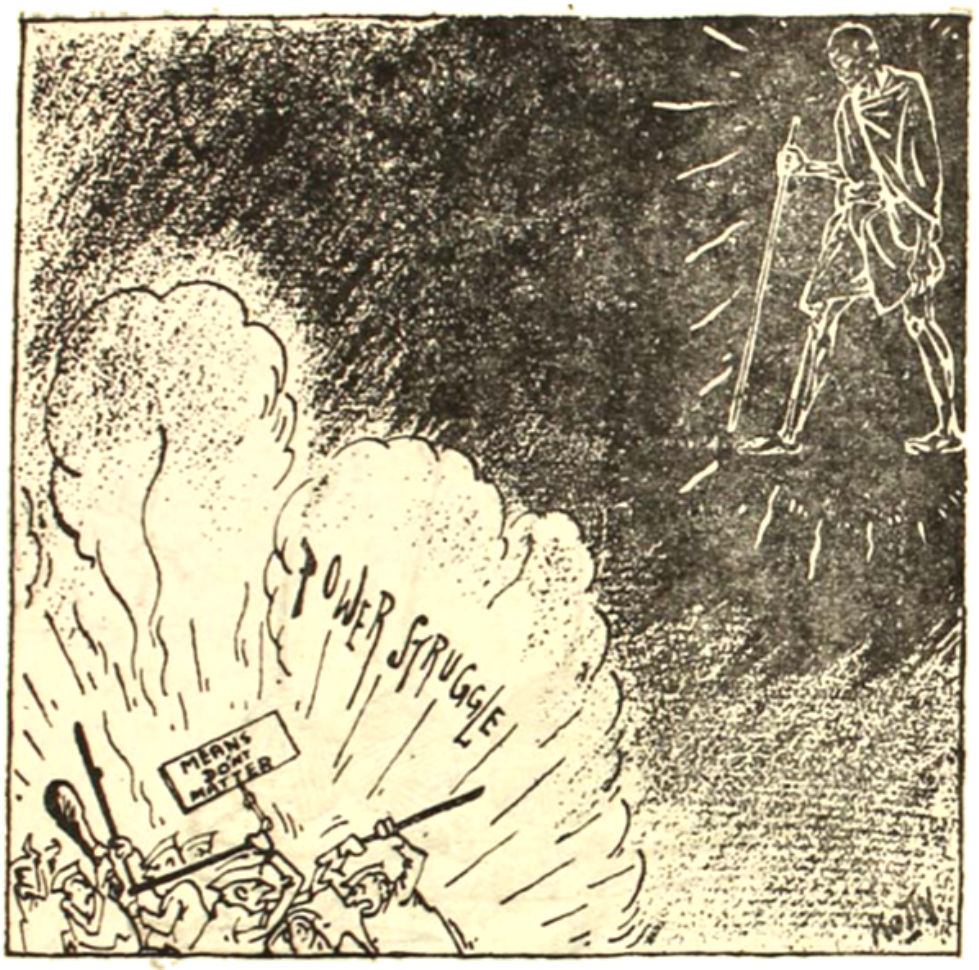

গান্ধিজীর নামে !

.....মানুষ আমরা নহিতো মেষ।

সৌজন্য—নবজীবন প্রাবলিসিটি, আমেদাবাদ

মা যা হবেন !

শিল্পভারতী

অগ্রহায়ণ
১৩৭৭

CALCUTTA UNIVERSITY

Bata
SUNWAY
Designed specially for extra comfort and style, these sandals are light, luxurious and relaxing. You wear them when and where you please. You find yourself wearing them most of the time. They feel that good. Treat yourself to a new experience in sandal pleasure. Slip into a pair of Sunways...by Bata.
Sunway 27
Size 4-10
Price Rs 18.95
Sunway 18
Size 4-10

এই সংখ্যায়

জীবন যেমন

ছোখের আলোয় —ভবানী মুখোপাধ্যায়

খেলাধূলা —জ্যোতির্ময়

● মেয়ের অঙ্গসজ্জা ●

—সংযোজন—শীতে দেহশ্রী ও দেহাবরণ

কাঁথা শিল্প বেলা দে

কাঁথা শিল্প শিবানী ঘোষাল

বালাপোষ হেমপ্রভা মল্লিক

ত্বক শুধু দেহের আবরণ নয় পুতুল রায়

শীতে ত্বক হাত ও পা কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

খোকা খাই-
ষোল-আনা তৃপ্তি চাই!

সিজার্স
সব সময় তৃপ্তি দেয়
—এর স্বাদই আলাদা

সর্বাধিক দাম
৫৮ পয়সায় ১০টি স্থানীয় কর সাপেক্ষ

S 5908R

একখানি কাঁথা তৈরী করতে যথেষ্ট সময় লাগে কাজেই যথেষ্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দরকার। কাজেই এই শিল্পটি অবহেলিত নয়। আধুনিক কালে এই কাঁথা সেলাইয়ের ডিজাইনে মেয়েদের হাতের ব্যাগ, ব্লাউস, ছোটদের ফ্রকে ব্যবহার হচ্ছে। তা ছাড়া আজকাল এই কাঁথার মতো 'খেস' নামে একরকম চাদর তৈরী করছেন এগুলি অবশ্য পুরনো কাপড়েই তৈরী হয় তবে তাঁতে প্রস্তুত হচ্ছে মেয়েরাই করছেন। কলকাতার কয়েকটি শিল্প সমিতিতে মেয়েরা কাঁথার সঙ্গে সঙ্গে এই 'খেস' তৈরী করেও বিশেষ সুনাম অর্জন করছেন। মাঝে মাঝে এই খেসগুলি দেখলে সেই কাঁথা শিল্পের কিছুটা নিদর্শন রয়েছে বলে মনে হয়। কাজেই কাঁথাশিল্পের পুনঃপ্রচলন বাঞ্ছনীয়

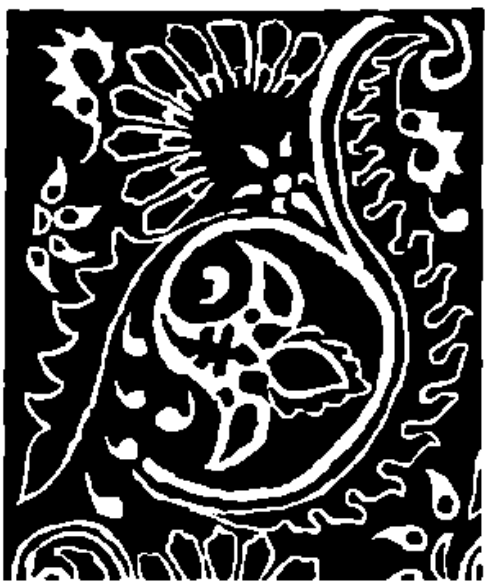

No. C3643

মন খুশীতে ভরে যায়

লক্ষ্মী ঘিয়ে তৈরী
খাবার খেলে
মন খুশীতে
ভরে যায়

লক্ষ্মী ঘি

খাদ্যদ্রব্য
সুস্বাদু
ও
প্রীতিকর
করে

শুধু উৎকর্ষ নয় সুরুচির পরিচায়ক

LG 11/79

গল্প ভারতী

পৌষ
১৩৭৭

দাঁত ও মাড়ির স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য
এই টুথপেস্ট– **নিম।**

নিম টুথপেস্ট শুধু আপনার দাঁত পরিষ্কারই করে না। নিমের হিতকর বিশেষ দ্রব্যগুণ দাঁত শক্ত করে, মাড়িকে রোগের ছোঁয়াচ থেকে বাঁচায়, মুখের দুর্গন্ধ দুর করে শ্বাস-প্রশ্বাসে এনে দেয় মিষ্টি সুবাস।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল-এর তৈরী।

সদ্য বিকশিত গোলাপের মত সুন্দর আনন ও
কুসুম কোমল
পাপড়ি পেলব তনু

সাধনা বিউটি ক্রীম-এর
এইতো সবচেয়ে বড় অবদান।
নিজেদের সৌন্দর্য্য সম্পর্কে
সচেতন আধুনিকারা তাই
এর প্রশংসায় মুখর।

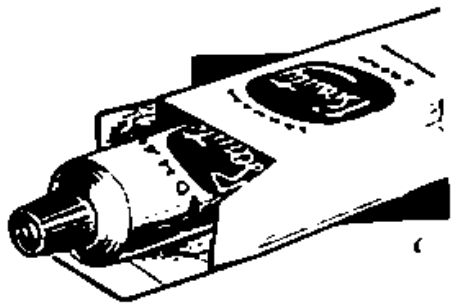

সাধনা
বিউটি
ক্রীম

ত্বকসাধনার অপরিহার্য্য
অতি আধুনিক প্রসাধন

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৬৮।

Bata
বাটা সানওয়ে
আরো আরামভরা, আরো শৌখিন বাটার সানওয়ে স্যান্ডাল সুগোপন স্নিগ্ধ, বিলাসী ও হালকা। যেখানে-খুশি যখন-খুশি পায়ে দিন – দেখবেন তখনো আর পা থেকে খুলতে ইচ্ছে করছে না। এতই ভালো। স্যান্ডাল পরার এ এক নতুন শৌখিন সুখ—স্বাচ্ছন্দ্যের এক নতুন আবেশ। আজই পায়ে গলিয়ে নিন – সানওয়ে—বাটার সর্বাধুনিক স্যান্ডাল। তার নকশায় সুরুচি নকশায় আরাম।

খোট খাই-
ষোল-আনা তৃপ্তি চাই!

সিজার্স
সব সময় তৃপ্তি দেয়
—এর স্বাদই আলাদা

সর্বাধিক দাম
৫৮ পয়সায় ১০টি স্থানীয় কর সাপেক্ষ

S 5908 B

বৃদ্ধ বয়সেও স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তি অটুট থাকে

সাধনা চ্যবনপ্রাশ

বহুমূল্য আয়ুর্ব্বেদীয় রসায়ন

সকল বয়সেই সমান উপকারী

বৃদ্ধ বয়সে সাধারণতঃ মানুষ জরাগ্রস্ত হয়ে দুর্ব্বল ও অক্ষম হয়ে পড়ে। সাধনা চ্যবনপ্রাশ নিয়মিত ব্যবহারে জরার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

সাধনা চ্যবনপ্রাশ শক্তিসম্পন্ন একটি বহুমূল্য রসায়ন। ইহা ব্যবহারে বৃদ্ধ বয়সেও স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তি অটুট থাকে।

প্রচুর ভিটামিন ও
ক্যালসিয়াম ইহাতে আছে

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ,
আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন)
এম,সি,এস, (আমেরিকা) ভাগলপুর
কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র : ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম,বি,বি,এস, (কলি)
আয়ুর্বেদাচার্য

SC-6/70

মন খুশীতে ভরে যায়

লক্ষ্মী ঘিয়ে তৈরী
খাবার খেলে
মন খুশীতে
ভরে যায়

লক্ষ্মী ঘি

খাদ্যদ্রব্য
সুস্বাদু
ও
প্রীতিকর
করে

শুধু উৎকর্ষ নয় সুরুচির পরিচায়ক

L.P. 11/70

গল্প ভারতী

মাঘ
১৩৭৭

CALCUTTA UNIVERSITY
LIBRARY

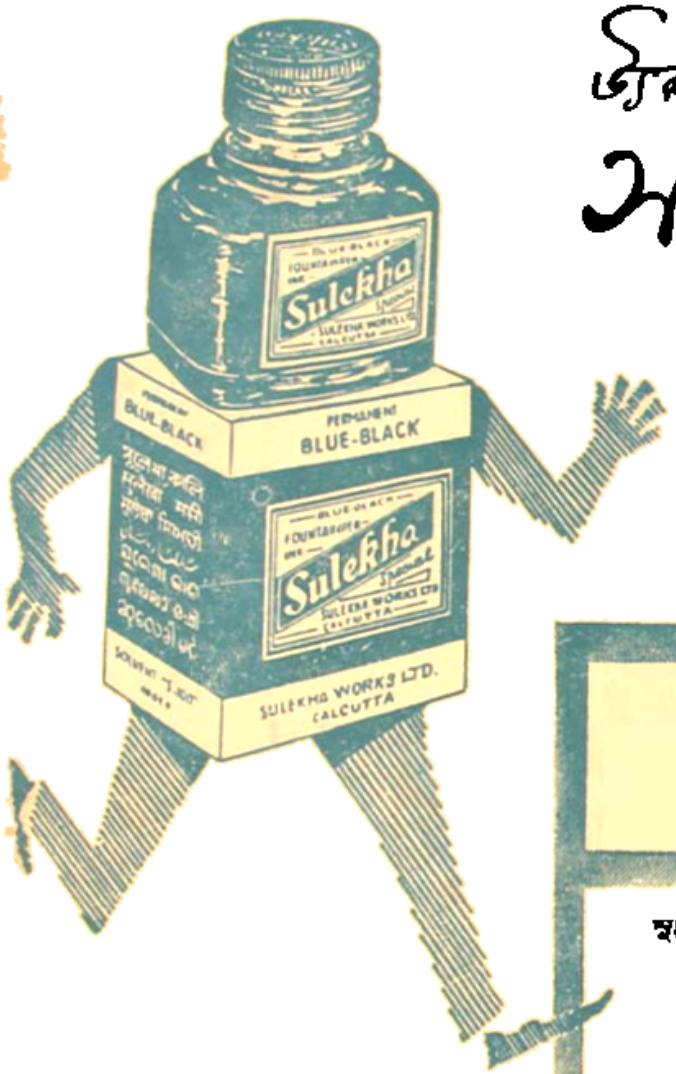

ঐতিহ্য ও ঐকান্তিকতা

সবার আগে সুলেখা

ভারতে সর্বাধিক বিক্রয়ে তো বটেই, ক্রমবর্ধমান রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে সুলেখা আজ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন ক'রে চলেছে।

দেশ-বিদেশে সমাদৃত

সুলেখা-উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে আছে : 'অ্যাডসল' পেস্ট এবং গাম, 'সিকুরিটি' সিলিং ওয়াক্স, 'পেনসল', স্ট্যাম্প প্যাড, বিভিন্ন লেখার কালি এবং স্টেনসিল, স্ট্যাম্পিং, মার্কিং ও ড্রইং-এর কালি।

সুলেখা

ব্যেশাল

ফাউন্টেন পেনের

কালি

ব্লু ব্ল্যাক, রয়াল ব্লু, ব্ল্যাক এবং ব্রাউন [illegible]

এবং ৩০, ৬০, ১২০, ৩৬০ [illegible] এম.এল শিশিতে পাওয়া যায়।

প্রস্তুতকারক : সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ

সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২

ভারত।

বৃদ্ধ বয়সেও স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তি অটুট থাকে

সাধনা
চ্যবনপ্রাশ

বহুমূল্য আয়ুর্ব্বেদীয় রসায়ন

সকল বয়সেই সমান উপকারী

বৃদ্ধ বয়সে সাধারণতঃ মানুষ জরাগ্রস্ত হয়ে দুর্ব্বল ও অক্ষম হয়ে পড়ে। সাধনা চ্যবনপ্রাশ নিয়মিত ব্যবহারে জরার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

সাধনা চ্যবনপ্রাশ শক্তিসম্পন্ন একটি বহুমূল্য রসায়ন। ইহা ব্যবহারে বৃদ্ধ বয়সেও স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তি অটুট থাকে।

প্রচুর ভিটামিন ও
ক্যালসিয়াম ইহাতে আছে

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম,এ, আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন) এম,সি,এস, (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র : ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম,বি,বি,এস, (কলিঃ) আয়ুর্বেদাচার্য্য

৪৫-৩/৭০

Regd. No.

মন খুশীতে ভরে যায়

লক্ষ্মী ঘিয়ে তৈরী
খাবার খেলে
মন খুশীতে
ভরে যায়

লক্ষ্মী ঘি

খাদ্যদ্রব্য
সুস্বাদু
ও
প্রীতিকর
করে

শুধু উৎকর্ষ নয় সুরুচির পরিচায়ক

29 MAR 71

LG 11/70

গল্প ভারতী

চৈত্র
১৩৭৭

মাথা ঠাণ্ডা রাখার কাজে
"মহাভৃঙ্গরাজ" অদ্বিতীয়।

ভৃঙ্গল মহাভৃঙ্গরাজ মাথার তেল
বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদমতে ক্যালকাটা
কেমিক্যালের আধুনিক কারখানায় তৈরি।

ভৃঙ্গল মাথার তেলে আছে
ভৃঙ্গরাজ পাতার রস, তিল তেল
এবং আরো ১২টি গাছগাছড়ার নির্যাস।
এ-সমস্তই মাথা ঠাণ্ডা
রাখে। চুল আরো
সজীব করে।

বিশুদ্ধ
আয়ুর্বেদমতে তৈরি
ভৃঙ্গল
সুগন্ধি
মহাভৃঙ্গরাজ
মাথার তেল

অনুপম আয়ুর্বেদিয় কেশ তৈল

সাধনা আমলা

অতুলনীয় গুণাবলীর জন্য যুগ যুগ ধরে সুবিদিত

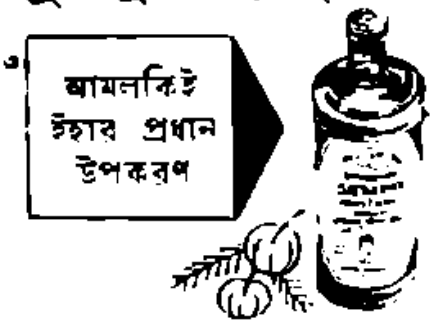

কেশ পতন, অকালপক্কতা ও কেশের রুক্ষতা রোধ করে এবং প্রচুর সজীব, সুন্দর, আকর্ষক কেশোদ্গমে সহায়তা করে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ ও ঠাণ্ডা রাখে।

সাধনা ঔষধালয়-চাকা
কলিকাতা-৯

Regd. No. C3643

12 MAY 1971

মন খুশীতে ভরে যায়

লক্ষ্মী ঘিয়ে তৈরী
খাবার খেলে
মন খুশীতে
ভরে যায়

লক্ষ্মী ঘি

খাদ্যদ্রব্য
সুস্বাদু
ও
প্রীতিকর
করে

শুধু উৎকর্ষ নয় সুরুচির পরিচায়ক

LG. 11/70